জয়ন্ত মাণিক

গোয়েন্দা কাহিনী সমগ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অখন্ড সংস্করণ

জয়ন্ত মাণিক

গোয়েন্দা কাহিনী সমগ্র

হেমেন্দ্রকুমার রায়

জন্ম
সেপ্টেম্বর ২, ১৮৮৮

মৃত্যু
এপ্রিল ১৮, ১৯৬৩

সূচীপত্র

মানুষ পিশাচ
শনি মঙ্গলের রহস্য
সোনার আনারস
নবযুগের মহাদানব
মরণ খেলার খেলোয়াড়
নৃমুন্ড শিকারী
সাজাহানের ময়ূর
মৃত্যু মল্লার
জয়ন্তের কীর্তি
ছত্রপতির ছোরা
রত্নপুরের যাত্রী
ফিরোজা মুকুট রহস্য
কাপালিকের কবলে
বজ্রভৈরবের মন্ত্র
প্রভাত রক্তমাখা

সূচীপত্র

ভেনাস ছোরার রহস্য
আনুবিসের অভিশাপ
হত্যা এবং তারপর
হত্যা হাহাকারে
হত্যাকারী হত্যাকাহিনী
জগতশেঠের রত্নকুঠী
পদ্মরাগ বুদ্ধ
নিতান্ত হালকা মামলা
একখানা উল্টে পড়া চেয়ার
আমার গোয়েন্দাগিরি
নেতাজীর ছয় মূর্তি
কাচের কফিন
একরত্তি মাটি
একপাটি জুতো
খানিকটা তামার তার
অলৌকিক
জয়ন্তের অ্যাডভেঞ্চার

মানুষ পিশাচ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জনশূন্য আলিনগর

সন্ধ্যার আগেই আজ পৃথিবী অন্ধকার হবে। পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা জায়গা জুড়ে অস্তগত সূর্যের বুকের রক্ত-মাখানো আলো ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তার চিহ্ন তাড়াতাড়ি মুছে ফেলবার জন্যে হু-হু করে বিরাট এক কালো মেঘ ধেয়ে আসছে।

চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড় আর বন-জঙ্গল ; মাঝখানের উঁচু-নিচু পথ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি ছুটে আসছে উর্দ্ধশ্বাসে।

গাড়ির ভিতরে বসে রয়েছে তিনজন যুবক ও একটি ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে ; যুবকদের পরনে খাকি শার্ট ও প্যান্ট এবং প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে বন্দুক।

এ-অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেনের পুত্র অমিয় আজ তার তিন অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে পাখি-শিকারে বেরিয়েছে। তার বোন শীলাও আবদার ধরে তাদের সঙ্গে এসেছে। সারাদিন বনজঙ্গলে ঘুরে এখন তারা বাড়ি ফিরছে।

অমিয়র বন্ধু পরেশ বললে, 'অমি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ঝড় উঠল বলে! কাছে কোথাও লোকালয় নেই?'

অমিয় গাড়ি চালাচ্ছিল। সে জবাব না দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে।

নিশীথ বললে, 'অমি, যতই স্পীড বাড়াও, আজকের এই ঝড়কে তুমি কিছুতেই হারাতে পারবে না। ঐ দেখ, আকাশের শেষ আলোও নিবে গেল।'

শীলা আমোদ-ভরে গাড়ির গদির উপর বসে-বসে নেচে উঠে বললে, 'ওহো, কী মজা! বন-জঙ্গলের ভিতরে থেকে আমি কখনো ঝড় দেখিনি! ভাগ্যিস আজ দাদার সঙ্গে এসেছি!'

পরেশ ও নিশীথ হাসিমুখে শীলার দিকে তাকালে। বন-জঙ্গলে ঝড় যে কী ভয়ানক, শীলা যদি তা জানত!

অমিয় বললে, 'পরেশ, আর ঝড়কে এড়াবার চেষ্টা করা মিছে। ঐ দেখ, মাঠের ওপারের গাছপালাগুলো দুলতে শুরু করেছে।'

কালো আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের অভিনয় আরম্ভ হলো। এবং শূন্যে মেঘপুঞ্জের তলায় দূরে এক তীব্রগতি ধুলোর মেঘ জেগে উঠল। এবং তফাত থেকেই শোনা গেল, বাতাসের মধ্যে ফুটল কেমন এক অশান্ত প্রলাপ।

নিশীথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দূরে লোকালয়ের মতো কী দেখা যাচ্ছে না?'

অমিয় এ-অঞ্চলের পথ-ঘাটের খবর রাখত। সে বললে, 'আমি ঐদিকেই যাচ্ছি। ওখানে আলয় আছে বটে, কিন্তু লোক নেই।'

পরেশ বললে, 'তার মানে?'

—'ওটা একটা ছোট শহর। অনেক দিন আগে মড়কে ওখানকার বেশির ভাগ লোকই মারা পড়ে—বাকি সবাই পালিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি। ওর নাম আলিনগর। ওখানে এখন জনশূন্য পোড়ো ভাঙা বাড়ি আর ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তবে, ওরই মধ্যে কোনখানে হয়তো মাথা গুঁজে আজকের মতো ঝড়কে ফাঁকি দিতে পারব।'

পরেশ ও নিশীথ খুশি হয়ে বললে, 'ব্যস, অল রাইট!'

শীলা কিন্তু কেমন যেন কুঁকড়ে পড়ে বললে, 'ও দাদা, এই অন্ধকারে আলিনগরে গিয়ে কাজ নেই! তার চেয়ে মাঠে ঝড়ের ধাক্কা খাওয়া ঢের ভালো!'

অমিয় বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন রে শীলা, আলিনগরে যেতে তোর আপত্তি কিসের?'

শীলা বললে, 'আমাদের বাবুর্চির মুখে শুনেছি, আলিনগরে এখন যারা থাকে, তারা মানুষ নয়!'

—'মানুষ নয়? তুই কি বাঘ, ভালুক, হায়েনার কথা বলছিস?'

—'না দাদা, না! তারা নাকি মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তারা মানুষ নয়! শুনেছি, তারা দিনে কবরে গিয়ে ঘুমোয়, রাত্রে বেরিয়ে এসে দেখা দেয়!'

তিন বন্ধুতে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। এই একেলে মানুষগুলোর কানে সেকেলে ভূতের কথা ঠাট্টা-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজগুবি ভূতের গল্প শুনে বড়-জোর সকৌতুকে সময় কাটানো চলে, কিন্তু তা বিশ্বাস করবে খালি খোকা-খুকী আর মূর্খরা। অতএব অমিয় বললে, 'তুই কি ভূতের কথা বলছিস? ছিঃ শীলা, এখনো তোর ও-সব কুসংস্কার আছে?'

কিন্তু শীলা কোন জবাব দেওয়ার আগেই ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মতো হুঙ্কার দিয়ে তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল। প্রথম আক্রমণেই সে নিশীথের মাথা থেকে টুপি এবং

শীলার হাত থেকে রুমাল কেড়ে নিয়ে ধুলায় ধুলায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে দিলে। অন্ধকার আকাশে বাজ চ্যাঁচাতে লাগল গলা ফাটিয়ে এবং এখানে ওখানে মড়মড় করে দু-তিনটে গাছ ভেঙে পড়ল। এক মুহূর্তেই পৃথিবীর রূপ গেল বদলে।

তীক্ষ্ণ ধূলাবৃষ্টির মধ্যে অনেক কষ্টে তাকিয়ে অমিয় 'হেড-লাইট' জ্বেলে দেখলে, খানিক তফাতেই ভাঙা মসজিদের মতো একখানা সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

তীরের মতো গাড়ি ছুটিয়ে সেইখানে গিয়ে থেমে পড়ে অমিয় বললে, 'পরেশ, নিশীথ! শীলাকে নিয়ে শীগগির নেমে পড়ো! ঐ মসজিদে গিয়ে ঢোকো!'

মসজিদের এক দিক ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আর একটা অংশ তখনো কোনগতিকে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাড়াতাড়ি সেই অংশে গিয়েই আশ্রয় নিলে।

বাইরে তখন যে কাণ্ড হচ্ছে ভাষায় তা বুঝানো যায় না। কষ্টিপাথরের মতো কালো নিরেট অন্ধকারে পৃথিবীকে কানা করে ক্ষ্যাপা ঝড় আজ যেন বিশ্ব লুণ্ঠন করতে চায়। দিকে দিকে বিদ্যুতের শত-শত অগ্নি-সর্প লেলিয়ে দিয়ে বজ্রভেরীতে মৃত্যু-রাগ পূর্ণ করে এবং অরণ্যের যন্ত্রণা-ভরা ছটফটানি শুনে বিপুল অট্টহাসি হেসে প্রলয়-আনন্দে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব চলতে লাগল।

পরেশ সভয়ে বললে, 'অমি, এ ভাঙা মসজিদ থর-থর করে কাঁপছে! মাথার উপরে ভেঙে পড়বে না তো?'

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে অমিয় নাচারভাবে বললে, 'ভেঙে পড়লেই উপায় কী?'

শীলা কাতরভাবে বললে, 'ও দাদা, চল, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

—'পাগল! বাইরে গেলে ঝড়ে উড়ে যাবি!'

প্রায় আধঘন্টা পরে ঝড়ের বেগ কিছু কমে এল বটে, কিন্তু ঝম-ঝম-ঝম-ঝম করে বিষম বৃষ্টি শুরু হলো। মসজিদের একটা দরজা-জানলারও পাল্লা ছিল না, বেগবান হাওয়ায় হু-হু করে ভিতরেও জল ঢুকতে লাগল।

নিশীথ বললে, 'অমি, গাড়ি থেকে টর্চটা এনেছো?'

—'এনেছি। কেন?'

—'একবার জ্বেলে দেখো তো কোনোদিকে শুকনো ঠাঁই আছে নাকি? অন্ধকারে আমার পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে, যদি সাপ-টাপ কিছু থাকে!'

টর্চটা জ্বেলে একদিকে আলোর রেখা ফেলতেই অমিয় চমকে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শীলা প্রায় কান্নার স্বরে বলে উঠলো, 'ও কে দাদা, ও কে?'

প্রকাণ্ড ঘরের আধখানা ছাদ ভেঙে পড়েছে, এবং মেঝের উপরে স্তূপের মতো জমে রয়েছে ভাঙা টালি, ইট, বালি-সুরকির চাঙড়, কড়ি ও বরগা প্রভৃতি। তারই ভিতরে স্থিরভাবে দুই হাঁটুর উপরে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অদ্ভুত এক মানুষের মূর্তি।

দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, লম্বা লম্বা চুল মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পরনে একটা কালো ওভারকোট ও ঢিলে ইজের। কিন্তু তার চোখ দু-টো! মোটরের হেডলাইটের মতো সেই চোখ তীব্র দীপ্তিতে এমন উজ্জ্বল যে, তাদের দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। তার কালো পোশাক আর কালো মুখ কালো অন্ধকারে মিশিয়ে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে চোখ দুটো অপার্থিব বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। দেখলেই বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে থাকে।

অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে তুমি?'
গম্ভীর স্বরে মূর্তি বললো, 'পথিক।'
—'তোমার নাম কী?'

—'আমি পথিক, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।'
—'এখানে কেন?'
—'যেজন্যে তোমরা এখানে এসেছ, আমিও সেইজন্যেই এখানে।'
—'এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?'
—'দরকার হয়নি বলে দিইনি।'

অমিয় টর্চ নিবিয়ে ফেললো, চারিদিকে আবার অন্ধকার নেমে এলো। কিন্তু সকলের মনে হতে লাগলো, সেই অন্ধকারের ভিতর হতে অপরিচিত মূর্তি যেন থেকে থেকে আগুনের ফিন্‌কি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অমিয়কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে শীলা ভয়ার্ত স্বরে চুপিচুপি বললে, 'দাদা, শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে চলো, নইলে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবো!'

পরেশ ও নিশীথও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এতক্ষণ পরে পরেশ বললে, 'অমি, এখানে দাঁড়িয়েও যখন ভিজতে হচ্ছে, তখন গাড়িতে গিয়ে বসাই ভালো।'

বাইরে তখনও আঁধার রাত্রির বুকে মাথা ঠুকে ঝড় চ্যাঁচাচ্ছে গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, গাছেরা পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে ককিয়ে বলছে সর্-সর্-সর্-সর্ এবং শূন্যের অসীম সাগর উছলে জলের ধারা ঝরছে রম্-ঝম্, রম্-ঝম্।

অমিয় কান পেতে শুনে বুঝলে, পাহাড়ে পথের উপর দিয়েও কল্-কল্ করে জলস্রোত ছুটছে। এ-পথে মোটর চালানো এখন মোটেই নিরাপদ নয় বটে, কিন্তু এই ভাঙা মসজিদের ফুটো ছাদের তলায় অন্ধকারে এই বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে এখানে থাকতে তারও আর ইচ্ছা হলো না। সে শীলার হাত চেপে ধরে বললে, 'চলো, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।'

অন্ধকারে ভিতরে একটা অস্ফুট শব্দ হলো—কে যেন চাপা গলায় হাসলে।

অমিয়র ভয়ানক রাগ হলো ;—তারা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে ভেবে ঐ লোকটা কি ঠাট্টার হাসি হাসছে? কিন্তু শীলার কথা ভেবে রাগ সামলে সে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শীলা বললে, 'তখুনি বলেছিলুম দাদা, এখানে এসো না!'

অমিয় জোর করে হেসে বললে, 'আরে গেলো, তুই কি ভেবেছিস লোকটা ভূত?'

শীলা বললে, 'ও ভূত কি না জানি না, কিন্তু ওকে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিলো!'

—'তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি! নে, এখন গাড়িতে উঠে বোস!'

গাড়ির উপরে উঠে ধুপ করে বসে পড়ে শীলা বললে, 'শীগগির স্টার্ট দাও দাদা, এখানে আর আধ মিনিটও নয়!'

পরেশ ও নিশীথ গাড়ির উপরে গিয়ে বসলো। অমিয় স্টার্ট দিয়ে গাড়িতে উঠলো।

কিন্তু পথ তখন ছোটখাটো নদীতে পরিণত হয়েছে—প্রায় হাঁটুভোর জল সশব্দে ছুটে চলেছে। এ-পথে কেমন করে গাড়ি চালাবে তাই ভাবতে ভাবতে অমিয় হেড-লাইট-টা জ্বেলে দিলে।

কিন্তু ওরা আবার কে? হেড-লাইট-এর জোর আলো সুমুখের পথে পড়তেই দেখা গেলো, ছয়জন লোক পাশাপাশি গাড়ির দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পরিত্যক্ত আলিনগর, দিনের বেলাতেই সেখানে মানুষের দেখা মেলে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর ঘুটঘুটে অন্ধকারে, জলে-ঝড়ে-দুর্যোগে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কারা এরা? এই কি পথে বেড়াবার সময়?

শীলা, পরেশ ও নিশীথ তাদের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো।

পাশের জঙ্গল থেকে কতকগুলি শেয়াল সমস্বরে কেঁদে উঠলো। যেন তারা এদের চেনে, যেন তারা এদের ভয় করে, যেন তারা পৃথিবীর জীবদের সাবধান করে দিচ্ছে!

অমিয় ঘন-ঘন মোটরের হর্ন বাজাতে লাগলো।

কিন্তু তারা যেন শুনতে পেলে না,—তালে তালে যেন মেপে মেপে পা ফেলে তারা সমানে এগিয়ে আসছে—যেন সব দম-দেওয়া কলের মূর্তি। প্রত্যেকের পরনে সাদা কাপড়, প্রত্যেকের

দেহের উপর দিকটা আড়ষ্ট এবং প্রত্যেকের হাত দুটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের মতো দু-পাশের স্থিরভাবে ঝুলছে,—চলছে কেবল তাদের পাগুলো—

সেই জলে-ঝড়ে অমিয়র দেহ ঘেমে উঠলো ; চেঁচিয়ে বললে, 'কে তোমরা? আমার হর্ন শুনতে পাচ্ছো না? সরে যাও—নইলে মরবে!'

তারা কেউ সাড়া দিলে না, পথ জুড়ে তালে তালে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। যেন তারা থামতে জানে না, কার অভিশাপ যেন তাদের কিছুতেই থামতে দেয় না, যন্ত্রচালিতের মতো তাদের যেন চলতেই হবে সারা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে অনন্ত—অনন্তকাল ধরে!

অমিয় বললে, 'ডাকাত নয় তো? পরেশ! নিশীথ! বন্দুক নাও!'

সকলে আপন-আপন বন্দুক তুলে নিলে। তবু যারা আসছে তারা থামলো না, ভয়ও পেলো না।

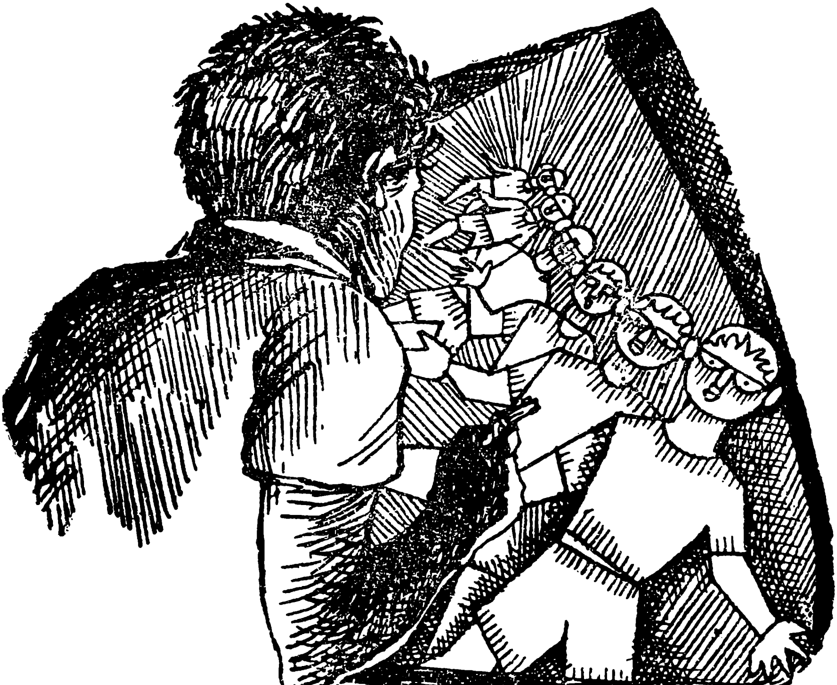

অমিয় চেঁচিয়ে বললে, 'আর এক-পা এগুলেই গুলি করবো!'

ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ করে পায়ের শব্দ তুলে মূর্তিগুলো আরো কাছে এসে পড়লো।

অমিয় মহা ফাঁপরে পড়ে ভাবতে লাগলো—কারা এরা? ডাকাত, না পাগল? না এরা ভাবছে যে বন্দুক ছুঁড়বো বলে আমরা ঠাট্টা করছি? কিন্তু আর তো ওদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, গাড়িতে শীলা রয়েছে, কোনো বিপদ হলে বাড়িতে গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন করে? যা হয় হোক, আমার কথা না শুনলে এবার আমি বন্দুক ছুঁড়বোই!

সে আবার শুষ্ক স্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'এই শেষবার বলছি, পথ ছেড়ে দাও!'

তারা সমানে এগিয়ে আসছে, আসছে, আর আসছেই। 'হেডলাইট'-এর তীব্র আলোকে তাদের রুক্ষ চুল ও বিস্ফারিত স্থির চোখের পাতা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছয়জোড়া নিষ্পলক চোখের পূর্ণদৃষ্টি অমিয়দের দিকে স্থির হয়ে আছে—প্রত্যেক চোখ যেন মড়ার চোখ!

তিনজনেই বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করলো। মূর্তিগুলো যখন গাড়ির কাছ থেকে দশ-বারো হাত তফাতে এসে পড়েছে অমিয় তখন বললে, 'আমি তিন গুনলেই তোমরা বন্দুক ছুঁড়ো!'

তবু তারা থামলো না।

—'এক!'...

—'দুই!'...

—'তিন!'...

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! তিনজনেই বুঝলে, তাদের লক্ষ্য ভুল হয়নি—এত কাছ থেকে ভুল হতেই পারে না, কিন্তু তবু সেই মূর্তিগুলো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে—আরও এগিয়ে—আরও এগিয়ে আসতে লাগলো।

এ-কী অসম্ভব ব্যাপার!

আচম্বিতে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে হা-হা-হা-হা-করে কে বন্য পশুর কণ্ঠে মানুষের স্বরে ভয়াবহ অট্টহাসি হাসতে লাগলো।

শীলা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গদির উপরে লুটিয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরা মানুষের জ্যান্ত চোখ

—'দিনে দিনে হলো কী? দুনিয়ার বড়ো বড়ো সাধুর অভাব হয়েছে অনেক দিনই। আজকাল আবার বড়ো অসাধুরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে দেখছি খালি কতকগুলো গাঁটকাটা আর ছিঁচকে-চোরের ইতিহাস। দুত্তোর খবরের নিকুচি করেছে!'—এই বলে জয়ন্ত খবরের কাগজখানা সজোরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মানিক কফি তৈরি করতে করতে বললে, 'শহরে বড়ো বড়ো চোর-ডাকাত-খুনে নেই, এটা তো পুলিশের কৃতিত্বের পরিচয়। এ-জন্যে আমাদের সুন্দরবাবুও অনায়াসে বাহাদুরির দাবি করতে পারেন।'

—'কিন্তু চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি না থাকলে পুলিশেরও চাকরি থাকবে না, আর আমাদেরও সময় কাটবে না।'

মানিক কফির পেয়ালা জয়ন্তের সামনে এগিয়ে দিলে।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'কেবল তাই নয়। অপরাধীর অভাবে কোনো-কোনো দেশে পুলিশের অত্যন্ত দুর্দশাও হয়। ইউরোপের একটা শহরে চোরেরা একবার ধর্মঘট করেছিল তা জানো?'

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কি রকম? চোরদের ধর্মঘট? এ যে গৃহস্থের পক্ষে মস্ত বড়ো সুখবর!'

—'হ্যাঁ, গৃহস্থের পক্ষে। কিন্তু যে শহরের কথা বলছি, সেখানকার পুলিশ এটা সুখবর বলে মনে করেনি। শহরবাসীরা হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখলে, রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে এই বিজ্ঞাপন : চুরি-ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ এতো বেশি ঘুষ দাবি করে যে, চোরাই মাল বেচিয়া আমাদের আর কোনো লাভ থাকে না। পুলিশের এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এই নগরের চোর-সম্প্রদায় অদ্য হইতে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল।'

—'তারপর।'

—'তারপর আর কী! দু-চারদিন পরেই সেখানকার পুলিশ মানতে বাধ্য হলো যে, অতঃপর চোরদের কাছ থেকে আর অতো বেশি ঘুষ দাবি করবে না। তখন চোরেরা আবার ধর্মঘট বন্ধ করলো।'

এমন সময় পায়ের শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে এবং সুবিপুল ভুঁড়ি দুলিয়ে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এই যে, চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি!'

জয়ন্ত বললে, 'না, আমরা এইমাত্র কফি শেষ করলুম।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কফি? এই গরমে? ওরে বাপ্‌রে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একশো টাকা বখশিশ দিলেও আমি এখন এক কাপ কফি খাবো না!'

জয়ন্ত বললে, 'একশো টাকা বা কফির কাপ কিছুই আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার জন্যে এখনি এক পেয়ালা চা আসবে।'

—'আর টোস্ট, ডিম, জ্যাম?'

—'তাও আসবে। আপনি নির্ভয়ে চেয়ারে বসে পড়ুন।'

ইতিমধ্যে মানিক খবরের কাগজখানা কখন মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সে বললে, 'জয়, তুমি কি আজকের কাগজখানা ভালো করে পড়োনি?'

—'না, পুলিশ-কোর্টের কলম ছাড়া আর কিছু আমি দেখিনি।'

—'চট্টগ্রাম থেকে এদের নিজস্ব সংবাদদাতা কী লিখেছে জানো?'

—'না।'

—'শোনো তা হলে', বলে মানিক পড়তে আরম্ভ করলে :

'বিভীষণ বিভীষিকা!

রহস্যময় মেয়ে-চুরি!

পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুর্দিকস্থ গ্রামে গ্রামে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে। মাসাধিক কালের মধ্যে এখানে তিন-তিনটি পরিবারের তিনটি মেয়েকে কে বা কাহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

'আসল ব্যাপার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এমন অদ্ভুত কাণ্ড এ-অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছে।

'প্রথম ঘটনাটি এই : বীরনগর গ্রামের মধুসূদন কর্মকারের বড়ো মেয়ে প্রমদা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের প্রান্তে পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রথমে সবাই ভাবিয়াছিল, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণীর তলা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার দেহ পাওয়া যায় নাই। প্রমদার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। সবে গত মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে।

'দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ : বীরনগর হইতে দশ মাইল তফাতে চণ্ডীপুর। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরী এখানকার একজন বিশিষ্ট গৃহস্থ। তাঁহার দৌহিত্রীর নাম কুমারী কমলা দেবী, বয়স ষোলো বৎসর। এক রাত্রে গুমোট গরমে ঘুম হইতেছিল না দেখিয়া কমলা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া শয়ন করে। শেষ রাত্রে হঠাৎ কমলার ভীত চিৎকারে বাড়ির আর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। কমলার পিতা ও পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি বারান্দায় ছুটিয়া আসেন। কিন্তু কমলা তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

'পুলিশের তদন্তে আর একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাড়ির সকলে যখন কমলার জন্য খোঁজাখুঁজি ও ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তখন গ্রামের পথ হইতে কে নাকি ভয়াবহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল, সকলে অন্ধকার পথে ছুটিয়া যায় ; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কেবল এক আশ্চর্য শব্দ শোনা যায়। অনেকগুলি লোক যেন একসঙ্গে সৈন্যদলের মতো সমতালে সশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

'তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র দুই দিন আগে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের একমাত্র কন্যা কুমারী শীলা তাঁহার ভ্রাতা মি. অমিয় সেনের সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলেন। পোড়ো শহর আলিনগরের কাছে কাহারা নাকি আক্রমণ করিয়া কুমারী শীলাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ পায় নাই, যথাসময়ে আমরা সব কথা জানাইব।

'এখন প্রশ্ন হইতেছে, একালে ইংরেজ রাজত্বের কোন জায়গায় উপরি-উপরি এমন তিন-তিনটি ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না? যদি সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনর্থক এই বিপুল পুলিশ-বাহিনী পুষিয়া লাভ কী? যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা পর্যন্ত চুরি যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা কাহার মুখ চাহিয়া বাস করিবে? আমরা পুলিশের এই অকর্মণ্যতার দিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।'

ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু শুনতে শুনতে মুখগহ্বরে আধখানা 'টোস্ট' নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাঁর আর টোস্ট খাওয়া হলো না, তিনি চটে-মটে বলে উঠলেন, 'হুম্! যতো দোষ নন্দ ঘোষ! যেখানে যা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছি আমরাই!'

জয়ন্ত জবাব দিলে না, নীরবে নস্যদানি বার করে একটিপ নস্য নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সব ব্যাপারগুলোই আজগুবি! চোরেরা যে চুরি করতে এসে অট্টহাসি হাসে আর গোরাদের মতো তালে তালে পা ফেলে চলে, এটা এই প্রথম

শুনলাম। তারা তো উদয়শঙ্করের মতো তালে তালে নাচতে নাচতে পালালেও পালাতে পারতো।'

বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, 'একজন সায়েববাবু ডাকছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'এখানে নিয়ে এসো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সায়েববাবু আবার কী জীব?'

—'আমাদের বেয়ারা বিলাতি পোশাকে বাঙালীকে ঐ নামে ডাকে।'

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণ যুবক। তার পরনের বিলাতি পোশাক ইস্ত্রিহীন, এলামেলো, মাথায় টুপি নেই—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চক্ষের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। দেখলেই মনে হয় সে যেন অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপদগ্রস্ত।

জয়ন্ত শুধালে, 'আপনি কাকে চান?'

—'জয়ন্তবাবুকে। আমি ভয়ানক বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি—'

—'আমারই নাম জয়ন্ত। আপনার নাম জানতে পারি কি?'

—'আমার নাম অমিয় সেন, আমি চট্টগ্রাম থেকে আসছি।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসুন। খবরের কাগজে বোধহয় এইমাত্র আপনারই নাম দেখেছি। আপনি তো চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের পুত্র?'

অমিয় চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাপারটা যখন আগেই শুনেছেন তখন আমি কেন যে এখানে এসেছি, সেটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছেন?'

—'আপনার ভগ্নীকে আপনি উদ্ধার করতে চান?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, শীলাকে উদ্ধার না করে বাবার কাছে আর মুখ দেখাবো না।'

'তাহলে আগে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন।'

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু সব শুনে আপনি হয়তো পাগল বা মিথ্যাবাদী বলে মনে করবেন।'

—'কেন?'

—'সমস্ত ঘটনাটাই এমন অসম্ভব যে আমার বাবাও আমার কথা বিশ্বাস করেননি। অথচ আমার প্রত্যেক কথাই সত্য।'

—'হোক অসম্ভব, তবু কোনো কথাই আপনি যেন গোপন করবেন না। কিছু লুকোলে আমি আপনার কোনো উপকারেই লাগবো না, এইটুকু খালি দয়া করে মনে রাখবেন।'

অমিয় তার কাহিনী বলতে লাগল। সে যা বললে তার অধিকাংশই আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি—গাড়ির উপরে শীলার মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত। অতএব এখানে অমিয়র কথার শেষ অংশ মাত্র দেওয়া হলো ঃ

'ওদিকে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে সেই অমানুষী হাসি, এদিকে বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েও নির্বিকারের মতো সেই ছয়টা আড়ষ্ট দেহ একেবারে আমাদের গাড়ির কাছে এসে পড়েছে। আমার পাশেই শীলার মূর্ছিত দেহ পড়ে রয়েছে, চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড

নিশ্বাস, বৃষ্টির ঝর্‌-ঝর্‌ কান্না, মাথার উপরে আকাশ ঘন-ঘন জ্বালছে বিদ্যুৎ-চক্‌মকির ফিন্‌কি। আমি যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলুম এবং সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলুম, পরেশ ও নিশীথও গাড়ির ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

'গাড়ির সামনে এসে মূর্তিগুলো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই সময়ে তাদের চোখ-গুলো দেখে আমার বুক শিউরে উঠলো। মরা মানুষ তাকিয়ে দেখলে বোধ করি তাদের দৃষ্টিও এইরকম দেখতে হয়! সে চোখগুলো যেন তাকিয়ে আছে মাত্র, কিন্তু তাদের ভিতরে কোনো ভাবেরই আভাস নেই এবং তারা চোখ খুলে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

'মূর্তিগুলো হঠাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। তিনজন এলো গাড়ির বাঁ পাশে, আর তিনজন এলো ডান পাশে। সঙ্গে সঙ্গে 'হেড-লাইটে'র আলোক-রেখা ছাড়িয়ে তাদের দেহ-গুলো ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

'তারপর আমি কী করবো না-করবো ভাবতে-না-ভাবতেই আচম্বিতে দু-খানা বিষম কঠিন হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে। সে হাত-দু-খানা কেবল কঠিন নয়, কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! আমি প্রাণপণে বাধা দিয়েও তাদের ঠেকাতে পারলুম না, হাত-দুখানা আমাকে এক টানে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—মাটিতে পড়ে মাথায় চোট লেগে আমিও তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে আবার শুনতে পেলুম সেই অমানুষী হা-হা-হা-হা হাসি।

'যখন জ্ঞান হলো তখন মেঘলা আকাশে ঝাপসা ভোরের আলো ফুটে ওঠবার চেষ্টা করছে।

'গাড়ির হুডের উপরে মাথা রেখে পরেশ ও নিশীথ অভিভূতের মতো পড়ে রয়েছে।

'আমি পাগলের মতো গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে ডাকলুম, 'শীলা! শীলা!' পরেশ ক্ষীণ স্বরে বললে, 'শীলা নেই!'

'আমার কথা আর বেশি বাড়াবো না। কেবল এইটুকুই জেনে রাখুন, প্রায় বৈকাল পর্যন্ত আমরা তিনজনে আলিনগরের সমস্তটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু পেলুম খালি পোড়ো বাড়ির পর পোড়ো বাড়ি, ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ—সেখানে কোথায় শীলা, কোথায় সেই ছয়টা অদ্ভুত মূর্তি, আর কোথায় ভাঙা-মসজিদে-দেখা সেই ঘোর কালো লম্বা লোকটা! কারুর কোনো চিহ্ন নেই।

'কি-রকম মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলুম, আর সমস্ত শুনে মা ও বাবার অবস্থাই বা হলো কী রকম, এখানে সে-সব কথা বলবার দরকার নেই।

'নিশীথ আপনার শক্তির কথা জানে। সেই-ই আমাকে পরামর্শ দিলে আপনার কাছে আসতে। তখন আহত দেহে চট্টগ্রাম থেকে আপনার কাছে চলে এসেছি জয়ন্তবাবু, এখন আপনার সাহায্যই আমার শেষ ভরসা।'

অমিয় স্তব্ধ হলো, জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বারবার নস্য নিতে লাগলো।

মানিক খবরের কাগজখানা নিয়ে আর-একবার পড়তে বসলো।

খানিক পরে এই নীরবতা সইতে না পেরে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন 'হুম্‌! মি. সেন, আপনি যা বললেন তার কিনারা করা জয়ন্ত বা পুলিশের কাজ নয়!'

অমিয় করুণ স্বরে বললে, 'তবে আমার কী হবে?'

—'যা শুনলুম তা যদি পাগলের প্রলাপ না হয়, তাহলে রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার বলেই মানতে হয়। জয়ন্ত কি পুলিশ, ভূত ধরতে পারবে না, আপনি কোনো ভালো রোজার খোঁজ করুন। আপনার বোনকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

অমিয় অসহায়ের মতো কাতরভাবে জয়ন্তর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

জয়ন্ত আর-একটিপ নস্য নিয়ে বললে, 'মানিক, জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে নাও অমিয়বাবুর সঙ্গে আজই আমরা চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্ন ও গোরস্থান

জনশূন্য আলিনগর। চারিধারে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো প্রাচীর, বাতাসের ছোঁয়ায় ঐকতান-বাজানো বনভূমির শ্যামলিমা, মাঠে মাঠে জলের আলপনা আঁকতে আঁকতে নদীর রূপালী খেলা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বনমুরগিরা, কোথাও হঠাৎ শিস্ দিয়ে ওঠে অজানা গানের পাখি, কোথাও অনেক দূর থেকে শোনা যায় কার বাঁশির হারিয়ে-যাওয়া সুর। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে নিঃসাড় হয়ে আছে জনশূন্য আলিনগর। পাহাড়ের উপর থেকে তাকে দেখায় একখানি ছবির মতো।

বাড়ির পর বাড়ি—কোনো-কোনো বাড়ির বয়সও বেশি নয়, আকারও জীর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এক-একখানা বাগান-বাড়িও চোখে পড়ে—এখনো দু-চারটে কঠিনপ্রাণ ফুল গাছ অযত্নেও বেঁচে থেকে রঙ ফুটিয়ে আগেকার গৌরবের পরিচয় দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু অধিকাংশ বাড়িই নীরবে যেন প্রচার করতে চায় ধ্বংস-দেবতার মহিমা। তাদের দেখলেই মনে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড মাংসহীন কঙ্কালকে। স্থানে স্থানে ধ্বংসস্তূপের জন্যে চলবার পথ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ-যেন কোনো অভিশপ্ত পৃথিবীর এক অংশ—মৃত মানুষের স্মৃতি আছে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের দেখা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা মসজিদ, কিন্তু তাদের ছায়ায় আজ আর কেউ উপাসনা করতে আসে না। থেকে থেকে এক একটা ঘুঘুর বিষাদমাখা সুর যেন মৌন বিজনতার দীর্ঘশ্বাসের মতো জেগে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত সারাদিন ধরে আজ আলিনগরের জনশূন্যতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার সঙ্গে আছে মানিক, অমিয়, পরেশ, নিশীথ ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্তের সঙ্গে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুর এখানে আসবার কোনোই দরকার ছিলো না, কিন্তু খানিকটা কৌতূহলে পড়ে ও খানিকটা এই নূতন দেশে বেড়াবার ঝোঁকে সুন্দরবাবুও কিছুদিনের ছুটি নিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গী হয়েছেন।

সারাদিন কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেলো না। বৈকালে তারা শহরের প্রান্তে একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো।

সুন্দরবাবু সারাদিনই কাঠ-ফাটা রোদে অমন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন মত প্রকাশ করে আসছিলেন, কিন্তু এবারে তিনি রীতিমতো বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললেন, 'হুম্! আমি বাবা আর এক পা নড়ছি না! তোমাদের খাতিরে পড়ে শেষটা কি আত্মহত্যা করব? এখানে সর্দি-গর্মি হলে দেখবে কে?'

জয়ন্ত একবার সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে তাকালো। মরুভূমিতে দরিয়ার মতো তাঁর বিপুল টাকের উপর দিয়ে দর-দর ঘামের ধারা নেমে আসছে এবং পথশ্রমে তাঁর বিরাট ভুঁড়ি হাপরের মতো একবার ফুলে উঠছে ও একবার চুপসে যাচ্ছে দেখে তার দয়া হলো। বললে, 'আচ্ছা সুন্দরবাবু, এইবারে আমরা খানিকটা বিশ্রাম করতে পারি। আমাদের শহর দেখা শেষ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু উচ্চৈঃস্বরে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করে নদী-তীরের বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

অমিয় বললে, 'তাহলে এর পরে আমরা কী করবো?'

জয়ন্ত বললে, 'আজকের রাতটা আমরা এইখানেই কাটিয়ে দেবো।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক চম্‌কে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, সে কী কথা? থাকবো বললেই তো থাকা হয় না, এখানে থাকবে কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'যদিও আজ চাঁদ উঠবে না, তবু মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া আছে তো!'

—'যদি বৃষ্টি আসে?'

—'এখানে মাথা গুঁজবার জন্যে পোড়ো বাড়ির অভাব নেই। গোটা শহরটাই তো আজ আমাদের দখলে।'

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আ-হা-হা-হা, মরে যাই আর কি! সব ব্যবস্থাই তো করে দিলে দেখছি! কিন্তু পোড়ো বাড়িতে পোড়া পেটের অন্ন জোটাবে কে?'

—'অন্ন আজ জুটবে না।'

—'হুম্! মাফ কর ভাই, আমি বিধবা স্ত্রীলোক নই, উপোস-টুপোস আমার ধাতে সহ্য হয় না!'

—'তাহলে আপনি বাসায় ফিরে যান!'

—'একলা?'

—'কাজেই।'

—'হুম্!' সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন,—সূর্য ডুবু-ডুবু। সন্ধ্যা আসি-আসি করছে। রাত-আঁধারে এখানে কী সব কাণ্ড হয় অমিয়র মুখে তা শুনতে বাকি নেই। একলা এখান থেকে ফেরা অসম্ভব, কারণ সুন্দরবাবু ভূত-পেত্নী মানেন। এবং অমিয়র বোন শীলাকে যে মানুষ চুরি করেছে, এ-কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। একলা বাসায় ফেরবার সময়ে যদি তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়......সুন্দরবাবু অত্যন্ত অসময়ে এখন বুঝতে পারলেন যে, এই সব নির্বোধ, গোঁয়ার ছোকরার দলে ভিড়ে তিনিও বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

জয়ন্ত তাঁর মনের ভাব আন্দাজ করে মৃদু হেসে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ রাত্রে অন্ন না জুটলেও অন্য কিছু জুটতে পারে।...নিশীথবাবু, বলুন তো, আপনাদের গাড়িতে রসদ কী আছে?'

নিশীথ বললে, 'এক কাঁদি মর্তমান কলা, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ, ছয় ডজন চিকেন স্যাণ্ডউইচ, কিছু কেক, আর কিছু বিস্কুট।'

জয়ন্ত বললে, 'অতএব সুন্দরবাবু আজ উপোস করবার ভয় নেই।'

সুন্দরবাবু অল্প একটু হেসে বললেন, 'তাহলে তোমরা এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছ?'

—'কতকটা তাই বটে।'

—'এটা আগে আমাকে জানালেই পারতে! এখানে রাত কাটাবার প্রস্তাব আমার ভালো লাগছে না!'

এমন সময়ে মানিক বললে, 'অমিয়বাবু, আপনি না বলেছিলেন, মানুষ এখানে আসতে চায় না?'

—'হ্যাঁ। এ-জায়গাটার বদনাম আছে। আর সে বদনাম যে মিছে নয়, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি!'

—'তাহলে বালির উপরে এই পায়ের দাগগুলো কিসের?'—বলে মানিক নদীর তীরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

বালুতটে লম্বা পায়ের দাগের সারি,—নদীর জলের দিক থেকে উপর দিকে উঠে এসেছে। আর সবগুলিই হচ্ছে মানুষের পায়ের দাগ।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে জানেন?'

—'পুলিশে কাজ করি, তা আর জানি না?'

—'আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান'-রা পুলিশে কাজ করে না, কিন্তু পায়ের দাগ দেখে অপরাধী ধরতে তারা যেমন ওস্তাদ, পৃথিবীর কোনো বড় ডিটেকটিভও তেমন নয়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আমাদের সামনের এই দাগগুলো দেখে অনেক কথাই বলা যায়।'

—'হুম্! কী বলা যায় শুনি?'

জয়ন্ত পকেট থেকে গজকাঠি বার করে একমনে দাগগুলো মাপতে লাগল। তারপর বললে, 'দাগগুলো যখন এত স্পষ্ট তখন নিশ্চয় পুরানো নয়। হয়ত কালই দাগগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এখান দিয়ে একদল লোক গিয়েছে। যে দলের একজন লোক খুব বেশি ঢ্যাঙা! বেঁটেদের চেয়ে লম্বা লোকদের পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান হয় বেশি। দলের একজন লোক খুব মোটা, তাই তার পায়ের দাগ বালির ভিতরে বেশি গভীর হয়ে বসেছে। দলের একজনের ডান-পা খোঁড়া—বালির উপরে তার ডান পায়ের আঙুলের চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু গোড়ালির চিহ্ন নেই।'

'এখানে ছয়জন লোকের পায়ের দাগ আছে। আমি ছয়জোড়া আলাদা পায়ের দাগ পেয়েছি। অমিয়বাবু, আপনাদের যারা আক্রমণ করেছিল—'

বিবর্ণ মুখে অমিয় বলে উঠল, 'তাদের দলেও ছয়জন লোক ছিল।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এ-গুলো তাদেরই পায়ের দাগ হলে বলতে হয়, তাদের ভূত-প্রেত বলে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। তারা ছায়ামূর্তি হলে এখানে তাদের পায়ের দাগ পড়ত না।'

পরেশ বললে, 'তারা ভূত-প্রেত কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বন্দুকের গুলি খেয়েও তারা যে এগিয়ে এসেছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু তখন আপনাদের মাথার ঠিক ছিল? নিশ্চয়ই আপনাদের গুলিতে তারা আহত হয়নি?'

নিশীথ বললে, 'আমাদের পক্ষে জোর করে কিছু বলা সাজে না, আর অসম্ভবে কেউ বিশ্বাস করবেই বা কেন? কিন্তু জানবেন, তারা আমাদের এত কাছে ছিল যে অতি-বড় আনাড়ীর বন্দুকের গুলিও ব্যর্থ হবার কথা নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'যাক, এখন আর ও-নিয়ে তর্কের দরকার নেই, কারণ সেই মূর্তি-ছটা সামনে না থাকলে ও-তর্কের কোনো মীমাংসাই হবে না। তার চেয়ে এখন দেখা যাক, ঐ দাগগুলো কোন্ দিকে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু তখন 'রসদ' খানাতল্লাস করবার জন্যে নিশীথদের মোটরের ভিতর প্রবেশ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে পায়ের দাগগুলো উঠে গিয়েছে উপর দিকে। সকলে সেই রেখা ধরে ঢালু জমির উপর দিয়ে অগ্রসর হল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। কারণ নদীর প্রায় ধারেই রয়েছে একটা জঙ্গলময় জমি, এক সময়ে তার চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল, স্থানে স্থানে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও বর্তমান রয়েছে। পায়ের দাগগুলো সেই জমির ভিতরেই প্রবেশ করেছে।

সকলে ভাঙা প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সারাদিনের পর একটা হদিস মিলল বটে, কিন্তু আজ বোধহয় আর কিছু নতুনত্ব পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে গিয়েছে।'

পশ্চিমের আকাশে তখন সোনালি ও লাল রঙ গুলে কে যেন নূতন ছবি আঁকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ...সুমুখের জমির ঝোপ-ঝাপের আশেপাশে অন্ধকার এখনি ঘন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে, চারিদিক এমন স্তব্ধ যে একটা সূচ পড়লেও শোনা যায়। সেই মৌনতার ভিতরে মাথার উপর দিয়ে যখন একঝাঁক বক উড়ে গেল তখন তাদের ডানাগুলোর ঝটপট শব্দ শুনে মনে হল, যেন অনেকগুলো ভৌতিক আত্মা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

এমন সময় দেখা গেল, সুন্দরবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে দৌড়ে আসছেন—তাঁর এক হাতে খান-কয় স্যাণ্ডউইচ এবং অন্য হাতে এক ছড়া কলা—কাছে এসেই তিনি বললেন, 'এই ভর সন্ধেবেলায়, এই মারাত্মক জায়গায় আমাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় পালিয়ে যেতে চাও?'

মানিক বললে, 'সে কি সুন্দরবাবু, অমন ঝুড়ি ভরা আম, কলা, কেক, সন্দেশ, বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচের মাঝখানেও নিজেকে আপনি একলা বলে মনে করছিলেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! কিন্তু জয়ন্ত তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

—'ঐ জমির মধ্যে। পায়ের দাগগুলো ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।'

সুন্দরবাবু দু চারবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে বললেন, 'বাব্বাঃ, ওটা যে গোরস্থান বলে মনে হচ্ছে!'

—'হ্যাঁ, ওটা গোরস্থানই বটে! এখনো দু-চারটে কবরের পাথর অটুট আছে। আমি জানতে চাই, পরিত্যক্ত শহরে এই পোড়ো গোরস্থানে ছয় জন মানুষ কী উদ্দেশ্যে এসেছিল? হয়ত তারা এখনো ওর মধ্যেই আছে। কারণ পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ-পথ দিয়ে এখনো তারা বেরিয়ে আসেনি।'

—'হয়ত তারা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'হতে পারে। কিংবা এখনো তারা বেরিয়ে যায়নি।'

—'কিন্তু আর যে আলো নেই!'

—'আকাশের আলো নেই, আমাদের আলো আছে। সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা ছ-টা বড়ো বড়ো পেট্রলের লণ্ঠন এনেছি। সেগুলো জ্বাললে এখানটা আলোয় আলো হয়ে উঠবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শোন জয়ন্ত, রাত্রিবেলায় বেড়াবার পক্ষে গোরস্থান খুব ভালো জায়গা নয়! আমরা তো কাল সকালেও ওর মধ্যে যেতে পারি।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'এক রাত্রের হেরফেরে সমস্ত সুযোগও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি আজকেই এই গোরস্থানটা দেখব।'

আচম্বিতে খানিক তফাতে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর অট্টহাসি জেগে উঠল।

সুন্দরবাবু চমকে একেবারে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর হাত থেকে কলার ছড়া খসে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন ঝাপসা, জয়ন্ত কারুকেই দেখতে পেলে না—সে বুকের উপরে দুই হাত রেখে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য অট্টহাসি শুনতে লাগল।

অমিয় ম্লান মুখে অস্ফুট স্বরে বললে, 'সেদিনও আমরা এই অমানুষী হাসিই শুনেছিলুম!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার সেই মারাত্মক 'ছয়'

নদীর মতো শব্দেরও স্রোত আছে। নদীর স্রোত দেখা যায়, কিন্তু শব্দের স্রোত ধরা পড়ে কানে।

খানিকক্ষণ ধরে সেই ভয়াবহ অট্টহাসির শব্দ ঠিক স্রোতের মতোই শূন্যতার মধ্য দিয়ে অবিরাম বয়ে চলল। তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গেল এবং তার প্রতিধ্বনিগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেন নিস্তব্ধতার মহাসাগরে।

সুন্দরবাবু তখন দুই হাতে দুই কান চেপে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়েছেন।

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ প্রাণপণে পরস্পরের হাত চেপে ধরে আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'যে হাসছে সে হয় পাগল, নয় আমাদের ঠাট্টা করছে।'

মানিক কিছু বললে না, কেবল নিজের বন্দুকের কুঁদোটা মাটির উপরে ঠক্-ঠক্ করে ঠুকতে লাগল।

রাত্রিময়ী বনভূমি, ভয়-ভরা রহস্যময় তার রূপ। মাথার উপরে অন্ধকারে আকাশ-দানবের হাজার হাজার তারকা-চক্ষু মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। তার তলায় আরো ঘন অন্ধকারে পর্বতশিখরগুলো যেন দৈত্যপুরীর বিচিত্র ও বিরাট অভিনয়-ভঙ্গিতে স্থির ও স্তম্ভিত হয়ে আছে এবং তারও তলায় যেন সীমাহারা বিশাল অরণ্য সভয়ে বদ্ধ স্বরে থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে।

ঘুঘুর ম্রিয়মাণ সুরকে ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠছে প্যাঁচার বিরক্ত কর্কশ কণ্ঠ—সে যেন বিপুল বনকে এবং এই বনের ভিতরে আজ যারা এসে পড়েছে তাদের সবাইকে ক্রমাগত অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘন-ঘন বেজে উঠছে কালো বাদুড়দের অলক্ষুণে ডানাগুলো।

সুন্দরবাবু শিউরে শিউরে বলে উঠলেন, 'আলো জ্বালো, আলো জ্বালো, আলো জ্বালো!'

পেট্রলের লণ্ঠন আনবার জন্যে পরেশ গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

জয়ন্ত একখানা হাত ধরে তাকে থামিয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

—'আর যে অন্ধকার সইতে পারছি না, আলোগুলো এনে জ্বেলে ফেলি!'

—'না, যদি এখানে সত্যিই শত্রু থাকে, তাহলে আলো জ্বাললে আমাদের দেখতে পাবে। এখন অন্ধকারই আমাদের বন্ধু।'

সুন্দরবাবু বসে বসেই পিছু হটতে হটতে বললেন, 'কিন্তু শত্রুরা অন্ধকারেই আমাদের দেখতে পেয়েছে—ঐ ঝোপের ভিতর থেকে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!'

মানিক দেখলে, সামনের একটা ঝোপ থেকে সত্য সত্যই চার-চারটে চোখের আগুন জ্বলছে আর নিবছে—জ্বলছে আর নিবছে।

অমিয় ও নিশীথ বন্দুক তুললে।

জয়ন্ত হেসে বললে, 'খুব সম্ভব দুটো শেয়াল আশ্চর্য হয়ে আমাদের দেখছে।'

তারপরেই আগুন-চোখগুলো আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, মিছে ভয় পেয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করবেন না। ভয় বড়ো সংক্রামক। একজন ভয় পেলে আর সকলেও ভয় পাবে! অথচ এখানে ভয় পাবার মতো কিছুই আমি দেখছি না।'

কিন্তু সুন্দরবাবু জয়ন্তর কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না—তিনি তখন কান পেতে অন্য কি যেন শুনছিলেন।

মানিক চুপিচুপি বললে, 'জয়, নদীর জলে ছপ্-ছপ্ শব্দ হচ্ছে। কে যেন নদী পার হচ্ছে!'

তারপরেই শব্দটা থেমে গেল।

খানিক পরে খুব কাছেই শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। কে যেন দ্রুতপদে গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সে যে কে, কিছুই নজরে পড়ল না, ছিদ্রহীন অন্ধকার তার মূর্তিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

অমিয় অস্ফুটস্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, যেখানে দিনের বেলায় মানুষ আসতে ভয় পায়, সেখানে এমন সময়ে এই অন্ধকারে যে বেড়াতে আসে, তাকে কি সাধু বলে মনে হয়?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কিন্তু এখান দিয়ে যে গেল সে কি মানুষ? এই রাত্রে এই পোড়ো শহরের গোরস্থানের সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমরা চোখে দেখছি খালি অন্ধকার, ও কিন্তু দিব্যি হন্-হন্ করে এগিয়ে গেল!'

মানিক বললে, 'জয়, আমরাও কি ওর পিছনে গোরস্থানে গিয়ে ঢুকব?

জয়ন্ত বললে, 'গোরস্থানে ঢুকতে হলে আলো জ্বালতে হয়। কিন্তু এখন আলো জ্বালা আর নিজে-থাকতে ধরা দেওয়া একই কথা। কী যে করব বুঝতে পারছি না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে মানে মানে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়া। নইলে ভূত কি মানুষ শত্রুর হাতে না হোক, সাপ কি বিচ্ছুর কামড়ে আমাদের মৃত্যু হবে অনিবার্য।'

পরেশ বললে, 'এইমাত্র আমার উপর দিয়ে সড়্-সড়্ করে কি চলে গেল!'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে লাফাতে লাফাতে ও পা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'হুম্! আমার পায়ে উঠলে সে নিশ্চয়ই আমাকে কামড়ে দেবে। এই—হুস্ হুস্! এই—হুস্ হুস্!'

মানিক হেসে ফেলে বললে, 'সুন্দরবাবু, হুস্-হুস্ করে আপনি কি কাক তাড়াচ্ছেন?'

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'মরছি নিজের জ্বালায়, এখন আর ঠাট্টা করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না মানিক!....ওরে বাস্ রে, এ কী অন্ধকার! দুনিয়ায় এত অন্ধকারও থাকতে পারে! অ জয়ন্ত, কোন দিকে গাড়ি আছে বলে দাও! তোমরা না-যাও, আমি একলাই গাড়িতে গিয়ে বসে থাকব!'

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন, এবং আচম্বিতে বনের ভিতর থেকে জেগে উঠল বাঘের গভীর গর্জন।...তিনি চমকে আবার পায়ে পায়ে পিছিয়ে দলের মাঝখানে এসে হতাশভাবে বললেন, 'তাহলে উনিও এখানে আছেন?' তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে তিনি আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন ও সাপের ভয়ে মাঝে মাঝে পা ঝাড়তে লাগলেন।

শৃগালদের সম্মিলিত কোলাহল জানিয়ে দিলে, এখন দুপুর রাত্রি। নদীর কলতান শোনাচ্ছে কান্নার মতো। আকাশ একে অন্ধকার কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল অধিকতর পুরু আর-একটা অন্ধকারের ঘোমটা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের তারকা-নেত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, 'মেঘ উঠেছে। আজও হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

অমিয় বললে, 'তাহলে আমাদের দুর্দশার বাকি কিছু আর রইল না। এইবেলা—'

কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল—সেই আসন্ন দুর্যোগের বিভীষিকা, সেই নিবিড় তিমিরের ভয়াল অন্ধতা, সেই নানা-শব্দ-বিচিত্র রাত্রির গভীরতা, সেই পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্রের অমানুষিকতার ভিতর থেকে জাগ্রত হল ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক এক কণ্ঠধ্বনি। কে যেন আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে কাদের ডেকে ডেকে তীব্রস্বরে বলছে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! অন্ধকারে যারা দেখতে পায় তারা আসুক এখন অন্ধকারে যারা দেখতে পায় না তাদের কাছে! আকাশের মেঘ তোদের ডাকছে, নিঝুম রাতের আঁধার তোদের ডাকছে,

মৃত আত্মার বন্ধু তোদের ডাকছে! কবরে কবরে দুয়ার খুলে যাক, কফিনে কফিনে জীবন জাগুক, মরা চোখে চোখে আলো ফুটুক! বেগম-সাহেবা বসে বসে কাঁদছে, বাঁদীরা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, আলো নিয়ে তোরা সবাই আয় আয়—ওরে আয় রে!'

বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ করে হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়ার ঝাপট বয়ে গেল, কড়্-কড়্-কড়্-কড়্ করে বজ্রের ধমক শোনা গেল, মড়্-মড়্-মড়্-মড়্ করে বড়ো-বড়ো গাছের মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়ল। বাঘ আর ভয়ে গর্জন করছে না, প্যাঁচা-বাদুড় ভয়ে আর ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ছে না, শৃগালরা ভয়ে আর আগুন-চোখ মেলে তাকাচ্ছে না।

তারপরেই খল্-খল্-খল্-খল্ করে আবার সেই অট্টহাসির পর অট্টহাসির স্রোত।

অমিয় প্রায় আর্ত স্বরে বলে উঠল, 'ও হাসি আমি চিনি ; কিন্তু অমন করে কথা কইল কে?'

সুন্দরবাবু ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কে ডাকছে, কে আসবে, কে অন্ধকারে দেখতে পায়, কে বেগম আর কেই বা বাঁদী? আমরা কি সশরীরে নরকে এসে পড়েছি?'

জয়ন্তও যেন আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললে, 'বেগমই বা কে, আর বাঁদীই বা কারা? এ কি পাগলের প্রলাপ? মানিক, তোমার কী মত? লণ্ঠনগুলো জ্বেলে আমরা কি গোরস্থানে ঢুকে ঐ পাগলটাকে আক্রমণ করব?'

মানিক সজোরে জয়ন্তর কাঁধ চেপে ধরে বললে, 'চুপ চুপ! ঐ দেখ!'

জয়ন্তর দুই চক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। তাদের কাছ থেকে প্রায় দুইশত গজ তফাতে, গোরস্থানের ভিতরে নড়ে-নড়ে বেড়াচ্ছে কতকগুলো আলো। তাহলে ঐ গোরস্থান নির্জন নয়? ওখানে আলো নিয়ে কারা কী করছে?

আবার সেই কণ্ঠস্বর—'ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! রোশনাই কই, খানা কই। বিছানা কই?'

আলোগুলো এতক্ষণ এলোমেলো ছিল, হঠাৎ এখন সার-বেঁধে একদিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! ও হচ্ছে আলেয়ার আলো!'

পরেশ বললে, 'না, ও আলো নয়। যাদের হাতে আলো আছে, তাদেরও আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে।'

নিশীথ বললে, 'কিন্তু ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কে ওরা? এই গোরস্থানের ভেতরে কি ডাকাতদের আড্ডা আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'অমিয়বাবু, আপনাদের ছয়জন লোকে আক্রমণ করেছিল তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'মানিক, নদীর তীরে আমরাও আজ ছয় জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছিলাম তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন ঐ আলোগুলো গুনে দেখ দেখি।'

মানিক গুনতে গুনতে বললে—'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছ-টা আলো—তার মানে, ছ-জন লোক।'

অমিয় উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্তবাবু! তাহলে ওরাই আমাদের শীলাকে চুরি করেছে! ওরা ভূতই হোক আর মানুষই হোক, কিছুই আমি কেয়ার করি না—আমি এখনই ওদের আক্রমণ করব—আমার বোনকে উদ্ধার করব—হয় আমি মরব, নয় ওদের মারব!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে চেপে ধীরে বললে, 'শান্ত হোন অমিয়বাবু, এখন গোয়ার্তুমি করবার সময় নয়! ওখানে যদি ডাকাতের দল থাকে তাহলে ওদের দলে কত লোক আছে তা কে বলতে পারে? আমরা ওখানে গিয়ে প্রাণ দিলে তো আপনার বোনের উপকার হবে না!'

মানিক বললে, 'আলোগুলো আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!'

জয়ন্ত স্থিরভাবে বললে, 'যাক গে। আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে। কাল সকালে এই গোরস্থানই হবে আমাদের কার্যক্ষেত্র। আজ এই অন্ধকারে অজানা জায়গায় গোলমাল করে কিছুই হয়ত করতে পারব না, মাঝখান থেকে শত্রুরা সাবধান হয়ে সরে পড়বে। বৃষ্টি এল বলে, রাত পোয়াতে আর ঘণ্টা-কয় মাত্র দেরি আছে; বাকি রাতটুকু মোটরে বসে কাটিয়ে দিই গে চল।'

অমিয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তর কথামত নিজেদের মোটর গাড়ির দিকে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনতে পেল, বনের পথে আবার কার একখানা মোটর গাড়ির গর্জন—গাড়িখানা যেন খুব তাড়াতাড়ি ছুটছে!

অমিয় আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এখানকার সবই কি অস্বাভাবিক! এমন জায়গায় এমন সময়ে কে আবার মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে এল?'

নিশীথ বললে, 'একখানা নয়, আবার আর-একখানা মোটর! ঐ শোনো, এখানাও খুব জোরে ছুটে চলেছে!'

মানিক বললে, 'ডাকাতরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কি মোটরে করে দলবল নিয়ে এল?'

আচম্বিতে অরণ্যের ভিতরে দূরে একটা ভয়ানক শব্দ হল। সকলে সবিস্ময়ে শুনছে, এমন সময়ে আবার সেই রকম আর-একটা শব্দ।

অমিয় বললে, 'এ যে কোনো accident-এর শব্দ!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে শুকনো গলায় বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, accident-ই বটে! আমাদেরই সর্বনাশ হল বোধহয়!'

যেখানে তাদের গাড়ি ছিল, সেখানে গিয়ে দু-খানা মোটরই আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, 'আমরা এখন অসহায়! আমাদের অদৃশ্য শত্রু এসে দু-খানা মোটরই চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর চালকহীন গাড়ি দু-খানা খানিক দূরে এগিয়েই গাছে কি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! তাতে শত্রুদের লাভ?'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের পালাবার পথ বন্ধ হল। হয়তো শত্রুরা এখনি আমাদের আক্রমণ করবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আমি এখন পায়ে হেঁটেই পালাতে চাই। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তোমরা আসো আর নাই-ই আসো, এই আমি দৌড় মারলুম!'

সুন্দরবাবু সত্য সত্যই সকলের মায়া কাটিয়ে দৌড় দিলেন, কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তাঁর সুমুখে গিয়ে পড়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, একটু দাঁড়ান! বোধহয় আমরাও আপনার সঙ্গী হতে বাধ্য হব!'

হঠাৎ পিছনে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। মাটির উপরে ধুপ-ধুপ করে পায়ের শব্দ— যেন একদল সৈন্য তালে তালে পা ফেলে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত বললে, 'যা ভেবেছি তাই! ঐ ওরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া উপায় নেই!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবাব

অনেক কষ্টে মাইলের পর মাইল পাহাড়ে-পথ হেঁটে পার হয়ে পরদিন তারা যখন লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেলা দুপুর। তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে বৃষ্টি পড়ছে তখনো। এবং সে বৃষ্টি সে-দিন সে-রাত আর থামবার নাম করলে না।

লোকালয়ে পৌঁছে তারা প্রথমেই পেল পুলিশের একটা ফাঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক ছাড়া বাকি সকলের শরীরের অবস্থা হয়েছিল এমন ভয়ানক যে, ফাঁড়ির সামনে গিয়ে তারা একেবারে ভেঙে পড়ল। কাজেই জয়ন্ত ও মানিক বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে ফাঁড়ির ভিতরেই প্রবেশ করল। তাদের অবস্থা দেখে, কাহিনী শুনে ও পরিচয় পেয়ে দারোগা পীর মহম্মদ সাহেব সকলকে যার-পর-নাই আদর-যত্ন করলেন এবং সেদিনকার মতো তাদের ফাঁড়ির ভিতরেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালকের রাত্রের দুঃস্বপ্ন জয়ন্তর মতো লোককেও আজ পর্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে। সে কী নিরেট অন্ধকার! যেন মুগুরের বাড়ি মারলে সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! সে কী দুর্যোগ! যেন ঝড় আর বৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর আনন্দে আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল অশ্রান্তভাবে। সে কী বিভীষিকা! প্রেতাত্মা-জগতের সিংহদ্বার খোলা পেয়ে যেন মূর্তিমান অভিশাপের দল সেদিন মানুষের জগৎ আক্রমণ করেছিল!

সেই মুহুর্মুহু নব নব ভয়-বিস্ময়ের অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৃষ্টির কনকনে শীতলতায়, বজ্রসাথী ঝড়ের ঝাপটায় ও ধাক্কায়, কখনো উপল-সঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে, কখনো বর্ষাধারায় হঠাৎ-বেগবতী নদীর তীব্র স্রোত ঠেলে ঠেলে, তীক্ষ্ণ কাঁটাঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে এবং কখনো বা ধু-ধু খোলা মাঠের তৃণহীন পিচ্ছিল পাথুরে জমির উপর আছাড় খেয়ে তারা প্রাণপণে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে—এবং তাদের পিছনে পিছনে বরাবর ধেয়ে এসেছে সে যে কারা কেউ তা জানে না, কেবল তাদের কানের কাছে একটানা সমানে বেজে বেজে উঠেছে সেই মহা-অমানুষিক আশ্চর্য পায়ের শব্দ—একদল সৈন্য যেন সমতালে পা

ফেলতে ফেলতে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, আসছে আর আসছে আর আসছে—সে ভয়াবহ পা-গুলো যেন থামতে জানে না, যেন কখনো থামবেও না, যেন তারা চিরদিন ধরে এই মাটির পৃথিবীতে দলিত, শব্দিত ও স্তম্ভিত করে চলে চলে বেড়াবে!

উঃ! সে কথা ভেবে ভেবে জয়ন্ত এখনো থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

জয়ন্তর দেহ লম্বায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি, তার বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়ায় এবং তার ব্যায়ামপুষ্ট সুদীর্ঘ দেহকে দেখায় ঠিক দানবের দেহের মতো। মানিকের দেহ অতটা জাঁকালো দেখতে না হলেও যে-কোন পালোয়ানেরই মতো বলবান। কিন্তু তাদের এমন বলিষ্ঠ দেহও কালকের রাত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছে। দলের অন্যান্য লোকেদের কথা না তোলাই ভালো। তারা আজ শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিশূন্য।

কিন্তু কে তারা এমন একতালে পা ফেলে ফেলে আসে? মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-আলোতে কতকগলো ধবধবে সাদা মূর্তির মতো কি যেন দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেটা চোখের ভ্রমও হতে পারে। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক হি-হি-হি-হি হাসিও শোনা গিয়েছে। হাসেই বা কে, আর আসেই বা কারা? অনেক মাথা ঘামিয়েও জয়ন্ত কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

আর একটা জায়গায় তার মনে খটকা লেগে রয়েছে। ভোরবেলায় পূর্ব-আকাশে উষা যেই সিঁথায় সিঁদুরের রেখা টেনেছিলো, কোথা থেকে বনমুরগি জাগরণের প্রথম ডাক ডেকে উঠেছিলো, আবছা আলো এসে অন্ধকারকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ করে তুলেছিলো, অমনি থেমে গিয়েছিলো তাদের পিছনকার সেই একগুঁয়ে পায়ের শব্দগুলো। যারা তাদের আক্রমণ করেছিল তবে কি তারা রাত্রির রহস্যযাত্রী—প্রভাতকে তারা ভয় করে?

কিন্তু এক বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। জয়ন্ত জানে, সে ঠিক সূত্রই ধরেছে—ঐ গোরস্থানে বা তার আশেপাশেই আছে সমস্ত রহস্যের মূল। ওখানে ভাসা-ভাসা যাদের দেখেছে এবং যাদের হাসি ও পায়ের শব্দ শুনেছে, তারাই হচ্ছে আসল পাপী ও অপরাধী। নইলে একটা পোড়ো শহরের পরিত্যক্ত গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা লুকিয়ে রাত্রিবাস করতে আসে না, নইলে বাইরে থেকে কেউ সেখানে এসেছে জেনে মোটর গাড়ি ভেঙে তারা পালাবার পথ বন্ধ করে দেয় না, নইলে অকারণে কেউ কারুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় না।

আজ সকালে সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতে পারতো, তাহলে কতটা সুবিধাই হতো! ওখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক আবিষ্কার করা যেতে পারে।

কিন্তু আজ আর ওখানে যাবার কোনো উপায় নেই। তাদের গাড়ি দু-খানা শত্রুর চক্রান্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তাদের সঙ্গীদের গতরও চূর্ণ হয়ে গেছে—তার উপর এই অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি।—একটা মূল্যবান দিন মিথ্যা নষ্ট হল।

লম্বা ঘরে পাশাপাশি ছয়খানা খাটিয়ায় জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের জন্যে চা এলো, আর সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও

নিতান্ত চা খাবার লোভেই নারাজভাবে উঠে বসলেন। কিন্তু পিয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে গিয়েই তিনি করে উঠলেন আর্তনাদ।

জয়ন্ত বললে, 'কী হলো সুন্দরবাবু? হঠাৎ অমন করে উঠলেন কেন?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'হুম্! অমন করে উঠলুম কেন? জেনে-শুনে ন্যাকা সাজা হচ্ছে? মনে নেই, কাল পাহাড়ের উপর থেকে এই বুড়ো বয়সে ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলুম? এখনো চোয়াল নাড়বার জো নেই!'

জয়ন্ত বললে, 'ও! আচ্ছা, এইবারে মনে থাকবে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার পাল্লায় পড়েই তো আজ আমার এই দুর্দশা! দিব্যি সুখে ছিলুম, মরতে আমায় ভূতে কিলোলো, তাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি! এ কী কাণ্ড রে বাবা! ভূতে-মানুষে টানাটানি! নিতান্ত এখনও পরমায়ু আছে, তাই এতো বড়ো ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি। হুম্, কাল সকালেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। জয়ন্ত, মানিক, তোমরাও বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো। অমিয়বাবু, আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আর এখনও বলছি, আপনি শীগগির ভালো রোজা ডাকুন। আপনার বোনকে উদ্ধার করা পুলিশ কি শখের ডিটেক্টিভের কাজ নয়! কুমারী শীলাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—আপনি রোজা ডাকুন!'

কিন্তু অমিয় মোটেই সুন্দরবাবুর দামি উপদেশ শুনছিলো না। সে এতক্ষণ চা পান করতে করতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো এবং হঠাৎ এখন চমকে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর চায়ের পেয়ালাটা সশব্দে টেবিলের উপরে রেখেই ঝড়ের মতো বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে বসে যখন সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তখন রাস্তা থেকে অমিয়র উচ্চ চিৎকার শোনা গেল—'জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! শীগগির আসুন—তাকে ধরেছি!'

ঘরের ভিতর থেকে সবাই ছুটে বাইরে গিয়ে পড়লো—এমনকি সুন্দরবাবু পর্যন্ত তাঁর ডিগবাজি খাওয়ার বিষম ব্যথা ভুলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়েই দেখা গেলো, একটা দীর্ঘকায় লোক অমিয়কে ধাক্কা মেরে পথের উপরে ফেলে দিলে—তারপর হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো। যে-রকম অনায়াসে অমিয়কে সে ভূতলশায়ী করলে তাতে বেশ বোঝা গেলো যে, তার শরীরে রীতিমতো ক্ষমতা আছে। কিন্তু অমিয় তবু ভয় পেলো না বা তাকে ছেড়ে দিলো না, সে মরিয়ার মতো পরমুহূর্তেই মাটি থেকে উঠে ছুটে গিয়ে আবার তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলে। এবার তার হাত ছাড়াবার আগেই আর-সকলে গিয়ে লোকটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে।

অমিয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এই সেই লোকটা। যেদিন শীলা চুরি যায়, সেদিন একেই আমি ভাঙা মসজিদের ভেতরে দেখেছিলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাকাতরা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিলো, তখন এই লোকটাই হা-হা করে হেসেছিলো। পথ দিয়ে আজ ফাঁড়ির দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে এ যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখেই একে চিনতে পেরেছি!'

নিশীথ পরেশ একবাক্যে বললে, 'হ্যাঁ, এই সেই লোক!'

জয়ন্ত লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। দীর্ঘদেহ, ঘোর কালো মুখের উপর লম্বা কালো চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, পরনেও কালো ওভারকোট ও কালো পাজামা। তার তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো দেখলেই গোখরো সাপের চোখের কথা মনে হয়। সে-রকম চোখ কেউ কখনো দেখেনি বোধহয়! সে চোখ দু'টোতে যেন পলক পড়ে না! তাদের ভিতর থেকে এমন একটা দুষ্ট ক্ষুধার ভাব ফুটে উঠছে যে একবার দেখবার পর কেউ জীবনে আর কখনো সেই দু'টো চোখকে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না।

দারোগা মহম্মদ সাহেবও গোলমাল শুনে এসে পড়েছিলেন। তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

—'হাজী নবাব আলি।'

—'এই বাবুদের তুমি চেনো?'

—'না। ওঁদের আমি কখনো দেখিনি, ওঁরা কী বলছেন তাও বুঝতে পারছি না।'

—'আলিনগরের ভাঙা মসজিদে তুমি কী করতে গিয়েছিলে?'

—'জীবনে কোনোদিন আমি আলিনগরেই যাইনি।'

অমিয় বললে, 'মিথ্যে কথা!'

নবাবের সাপের মতো চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। কিন্তু মুখে সে শান্ত হাসি হেসে বললে, 'আমি হাজী! মিথ্যে বলা আমার পাপ।'

মহম্মদ সাহেব বললেন, 'তুমি হাজীই হও আর কাজীই হও আর পাজীই হও, আজ তোমাকে ফাঁড়িতে বন্ধ থাকতেই হবে। এখন আমার সময় নেই, কাল সকালে তোমাকে ভালো করে পরীক্ষা করবো।'

নবাবের চোখ আবার ধক্ করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, 'কোন আইনে আপনি আমাকে বন্ধ করে রাখতে চান?'

মহম্মদ সাহেব বললেন, 'আইনের কথা তুমি সেই উকিলদেরই জিজ্ঞাসা কোরো। আমি উকিল নই—আমি দারোগা। এই সেপাই! একে নিয়ে যাও—'

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত সুন্দরবাবুর মনে হলো কে যেন তাঁর কানের কাছে হি-হি-হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

জেগে বিছানার উপরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুন্দরবাবু চ্যাঁচাতে লাগলেন—'জয়ন্ত! জয়ন্ত! তারা এসেছে—তারা এসেছে—তারা এসেছে!'

সেই বিষম চিৎকারে ঘরসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেলো।

জয়ন্ত বললে, 'অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন সুন্দরবাবু, কী হয়েছে?'

—'হুম্! আমার কানের কাছে একটা বিদঘুটে হাসি শুনলুম!'

—'পাগল নাকি?'

বৃষ্টির জন্যে ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। অমিয় আলো জ্বেলে বললে, 'কই, ঘরে তো আর কেউ নেই!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হে, হ্যাঁ! তবু তো আমার ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে, কিন্তু তোমার ঘাড়ে চেপেছে যে আসল ভূত সে খেয়ালটা আছে কি? হুম্, অট্টহাসিতে আমার কান গেলো ফেটে, আমার ঘুম গেলো ভেঙে, তবু ওঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না!'

মানিক একটা জানলা খুলে দিলে। ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো হু-হু করে জোলো হাওয়া। বৃষ্টিপাতের শব্দে বাইরের অন্ধকার মুখরিত।

কিন্তু মানিকের কান আর-একটা কিছু শুনলে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সমতালে পা ফেলে কারা চলে যাচ্ছে।

সে শব্দ জয়ন্তও শুনতে পেলে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এসো মানিক!' এবং তারপরেই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও তার পিছনে চললো।

নবাব যে-ঘরে বন্দী ছিলো জয়ন্ত সিধে সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা খোলা—ভিতরে নবাব নেই।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ফুস্‌মন্ত্র,, ফুস্‌মন্ত্র! ফুস্‌মন্ত্রে নবাব উড়ে গেছে, আর যাবার সময়ে ফুস্‌মন্ত্রেই আমার কানের কাছে মুখ এনে হেসে গেছে!'

জয়ন্ত বললে, 'ফুস্‌মন্ত্রের নিকুচি করেছে! এই দেখুন, দরজার তালায় চাবি লাগানো রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ তালা খুলে নবাবের পালাবার সুবিধা করে দিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কে সে? নিশ্চয়ই মানুষ নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'যদি কোনো মূর্তিমান অলৌকিক শক্তি এসে দরজা খুলতে চাইতো তা'হলে কুলুপ আপনি খুলে যেত, এর মধ্যে আবার চাবি ঢুকিয়ে কুলুপ খুলতে হতো না। যখন চাবির দরকার হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, আমাদেরই মতো কোনো রক্ত-মাংসের হাত এই দরজার কুলুপ খুলেছে। আরো একটা ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অমিয়বাবু ঠিক লোককেই ধরেছেন! এই নবাব আলি যেই-ই হোক, নিশ্চয়ই সে অপরাধিদের একজন। হয়তো সে-ই দলপতি, নইলে এমন করে পালিয়ে যেতো না।'

নিশীথ বললে, 'কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে ফাঁড়ির ভিতরে নবাবের পালাবার সাহায্য করলে কে?'

মানিক বললে, 'দরজার সামনে যে একজন চৌকিদার ছিল, সে কোথায় গেলো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এও বুঝতে পারছো না? ফুস্‌মন্ত্রে উড়ে গেছে!'

জয়ন্ত লণ্ঠনটা মাথার উপরে তুলে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখলে।

মানিক এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'উঠানের উপরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ও কে বসে আছে?'

সেই চৌকিদার। মানিক তার কাঁধে হাত দিতেই সে এলিয়ে একদিকে হেলে পড়লো।

মানিক সচমকে বললে, 'জয়, এ একেবারে মরে কাঠ হয়ে আছে! কিন্তু এর গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই!'

জয়ন্ত লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে চৌকিদারের মরা মুখ দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তার ভুরু দু'টো কপালের দিকে উঠে গেছে, তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে যেন বাইরে ঠিকরে পড়তে চাইছে এবং তার মুখ হাঁ করে আছে। মৃত মানুষের মুখে এমন ভীষণ ভয়ের চিহ্ন সে আর কখনো দেখেনি। সে যেন চোখের সামনে নরক-দৃশ্য দেখেই আত্মহারা হয়ে মারা পড়েছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রান্তর-সমুদ্রে

খানিকক্ষণ পরে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ, এ লোকটিকে কেউ খুন করেনি। কেবল ভয় পেয়েই এ মারা পড়েছে।'

মানিক বললে, 'ভেবে দেখ জয়, যা দেখলে মানুষ মারা পড়তে পারে, সেটা কতদূর ভয়ানক দৃশ্য!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই চৌকিদার বেচারা চোখের সামনে নিশ্চয় কোনো আস্ত জলজ্যান্ত ভূত দেখেছিলো!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'আস্ত বা আধখানা, জ্যান্ত বা মরা—কোনোরকম ভূত-টুতই আমি বিশ্বাস করি না। চৌকিদার সত্যই যদি কোনো ভূত দেখে থাকে তবে বুঝতে হবে যে, ভূতের ছদ্মবেশে সে কোনো মানুষকেই দেখেছে।'

ইতিমধ্যে মহম্মদ সাহেব ও থানার অন্যান্য লোকেরাও গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মৃত চৌকিদারের সেই ভয়বিকৃত ভয়ানক মুখ এবং বিস্ফারিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টি আর তাকিয়ে দেখে সহ্য করা যাচ্ছিল না, একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে লাশের উপরে কাপড় চাপা দিলে।

মহম্মদ ভাবতে ভাবতে বললেন, 'ঈশাক খুব সাহসী চৌকিদার ছিলো, শয়তানের সুমুখে গিয়েও বোধহয় দাঁড়াতে ভয় পেতো না। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিষম ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। তাকে এমন আশ্চর্য ভয় কারা দেখালে? নবাব ছিল ঘরের ভিতরে বন্ধ, আর দরজার কুলুপের চাবি ছিল ঈশাকের পকেটে। কারা এসে সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে নবাবকে খালাস করে দিলে? বুঝতে পারছি, নবাবের একটা দল আছে। কিন্তু তারা এর মধ্যে খবর পেলে কেমন করে? সুন্দরবাবু, আপনি তো কলকাতা পুলিশের পুরানো আর পাকা লোক, আজকের রহস্য কিছু বুঝতে পারছেন কি?'

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হুম! এর মধ্যে আর না-বোঝবার কী আছে? আমি তো গোড়া থেকে বলছি, এ-সব হচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার! শীগগির রোজা না ডাকলে আমাদের সবাইকেই অমনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মরে থাকতে হবে!'

হঠাৎ মানিক বলে উঠল, 'আচ্ছা, এইমাত্র এখানেও তো আমরা তালে তালে পা ফেলে কাদের চলে যেতে শুনেছি। কে তারা?'

গোলে-হরিবোলে জয়ন্তও এতক্ষণ সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলো। সেও উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'মানিক, মানিক! শীগগির আমাদের বন্দুকগুলো আনো! তারাই হচ্ছে নবাবের দল!

মহম্মদ সাহেব, আর এক মিনিটও দেরি নয়—চলুন আমরা তাদের পিছনে ছুটি,—তারা এখনো বেশি দূরে পালাতে পারেনি।'

মহম্মদ নারাজ হলেন না। তখনি সশস্ত্র হয়ে সবাই থানা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়ন্তবাবু, তাদের দলে কতো লোক আছে?'

—'জানি না। হয়তো ছ-সাতজন, হয়তো আরো বেশি।'

—'তাদের দেখেই কি ঈশাক মারা পড়েছে?'

—'হতে পারে।'

—'দূর থেকে খালি কতকগুলো অস্পষ্ট সাদা সাদা মূর্তি দেখেছি।'

সকলে একটা তে-মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তখনো ঝরছে সেই অশ্রান্ত বৃষ্টি এবং থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে ঝোড়ো বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ থেকে ঘন অন্ধকারও যেন পৃথিবীর বুকে ঝর-ধর করে ঝরছে ক্রমাগত। সেই জমাট অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে পুলিশদের লণ্ঠনের আলো বেশি দূর অগ্রসর হতে পারছিলো না।

মহম্মদ বললেন, 'এইবারই তো মুশকিল! পথ গিয়েছে তিন দিকে, কিন্তু সেই বদমাইশরা গিয়েছে কোন দিকে?'

জয়ন্ত বললে, 'এক কাজ করা যাক। মহম্মদ সাহেব আর সুন্দরবাবু যান সামনের দিকে। অমিয়বাবু, নিশীথবাবু যান বাঁদিকে, আমি আর মানিক যাই ডানদিকে। সব দলেই জন-কয় করে চৌকিদার থাকুক।'

মহম্মদ বললেন, 'এ-ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে-দল প্রথমে শত্রুর দেখা পাবে, তখনি যেন তিনবার বন্দুক ছোঁড়ে। তাহলেই অন্য দু-দল তাদের সাহায্য করতে যেতে পারবে।'

ডানদিকের পথ হচ্ছে আলিনগরে যাবার পথ। জয়ন্তর ধারণা, নবাব সদলবলে এই পথই ধরেছে। জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে রইলো ছয়জন চৌকিদার।

জলমাখা অন্ধকারের গায়ে বার-বার ধাক্কা খেতে খেতে দুটো লণ্ঠনের আলো অগ্রসর হচ্ছে এবং তারই পিছনে চলেছে জয়ন্ত, মানিক ও চৌকিদাররা। দুই ধারের ঘনবিন্যস্ত গাছপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন বজ্রাগ্নিদগ্ধ বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাভরা একটানা দীর্ঘ নিশ্বাস। চিরকাল যারা কালো রাত্রির সঙ্গী, সেই নিশাচর পেচক ও বাদুড়দেরও আজ দেখা নেই এবং শৃগালরাও আজ এই বীভৎস রাত্রের কালিমার চেয়ে গর্তের অভ্যস্ত কালিমাকে নিরাপদ ভেবে শিকারের লোভ ছেড়ে বাসার ভিতরে বসে আছে। ঘ্যানঘেনে ঝিঁঝিপোকাগুলোও মুখ বুজে যেন কোনো অভাবিত অমঙ্গলের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বৃষ্টি, বাতাস ও তরুমর্মর ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত এগুতে এগুতে বারংবার বলছে, 'আরো তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো। তারা অনেকটা এগুবার সময় পেয়েছে, তবু তাদের ধরতে হবেই!' যে দুনিয়ায় আজ কীটপতঙ্গের মতো জীবেরও সাড়া নেই সেখানে মানুষের এই উৎসাহিত কণ্ঠস্বর কী অস্বাভাবিকই শোনাচ্ছে! তার গলার আওয়াজ শুনে গর্তের ভিতরে ঘুমন্ত বন্য পশুরা সভয়ে চমকে জেগে উঠতে লাগলো।

লোকালয় পিছনে ফেলে তারা এখন একটা বনের ভিতরে এসে পড়েছে। মানিক হতাশ কণ্ঠে বললে, 'জয়, হয়তো তারা এ-পথে আসেনি।'

জয়ন্ত বললে, 'অন্য দুটো পথের দিক থেকেও তো আমাদের কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনছি না। তুমি কি বলতে চাও তারা কোনো পথে না গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে? তুমিও কি ভূত মানো? যতক্ষণ না ওরা বন্দুক ছোঁড়ে, ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই।'

—'কিন্তু যদি তারা এই বনে ঝোপেঝাপে কোথাও গা-ঢাকা দেয়? অন্ধকারে তাদের কি আর খুঁজে বার করতে পারবে?'

—'সে মুশকিলের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তবু থামলে আমাদের চলবে না। এগিয়ে চলো—আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো!'

সারা বন যেন আজ বিভীষিকার মদে মাতাল হয়ে টলোমলো। বড়ো বড়ো গাছের ডাল-পাতার জালে বাঁধা পড়ে ঝোড়ো হাওয়া কখনো করছে তীক্ষ্ণ স্বরে হাহাকার, কখনো করছে ভৈরব বিক্রমে ভীষণ গর্জন। সেইসঙ্গে ছোট-বড়ো দমকা হাওয়ার দল গলা মিলিয়ে আরো যে কতো রকম অদ্ভুত আওয়াজে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করে তুলেছে, তা বর্ণনা করবার ভাষা কারুর কলমে নেই।

বন শেষ হলো—তারপরেই সকলে একটা মাঠের উপরে এসে পড়লো।

একজন চৌকিদার লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে সামনের দিকে দেখবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, 'হুজুর, মাঠে জল থৈ-থৈ করছে, পথ আর দেখা যাচ্ছে না।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'জল ভেঙে এগিয়ে চলো।'

—'কিন্তু কোনদিকে যাব? পথ কোথায়?'

—'সোজা চলো।'

—'এই মাঠে যে খানা-ডোবা-পুকুর আছে! যদি কোনো পুকুরে গিয়ে পড়ি?'

—'আমি তোমাকে টেনে আবার ডাঙ্গায় তুলবো। কিন্তু এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো!'

আর একজন চৌকিদার বললে, 'হুজুর, এ-মাঠে এখন কোমর ভোর জল আছে, তার ওপরে এ-হচ্ছে বানজল—এর টানে আমরা ভেসে যেতেও পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'এই জল ভেঙে নবাব যখন তার দলবল নিয়ে যেতে পেরেছে, তখন আমরাই বা ভেসে যাব কেন?'

—'না হুজুর, নবাবরা নিশ্চয় এদিকে আসেনি।'

—'যদি এসে থাকে, তাহলে তারা ঐ বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।'

জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, চৌকিদাররা আর এক পা এগুতে রাজী নয়। আর তাদেরই বা দোষ কী? এই অন্ধকার, এই ঝড়ের দাপট, মাঠ দিয়ে এই বন্যার মতো জলপ্রবাহ, এই অবিরাম বৃষ্টির কনকনে ঝাপটা—যা তাদের হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ভিজিয়ে স্যাঁতসেঁতে করে দিয়েছে, তার উপরে অজানা ভয়ানক শত্রুর ভয় তো আছেই। আর, সে বড়ো যে-সে শত্রু নয়—কেবলমাত্র তাদের স্বচক্ষে দেখেই সাহসী চৌকিদার ঈশাক ইহলোক ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে পারেনি।

জয়ন্ত ও মানিক দোমনা হয়ে অতঃপর কী করা উচিত তাই ভাবছে, এমন সময় দেখা গেল সেই জলমগ্ন প্রান্তরের মাঝখানে নিবিড় অন্ধকারের গলায় ঝুলছে যেন একসার আলোর মালা।

জয়ন্ত চমকে বলে উঠলো, 'ও কী ব্যাপার!'

চৌকিদাররা বললে, 'আলেয়া!'

মানিক বললে, 'এতক্ষণ ও-আলোগুলো কোথায় ছিলো?'

জয়ন্ত উচ্চৈঃস্বরে গুনলে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! মানিক, মানিক, আবার সেই ভয়ঙ্কর ছয়!'

—'তাহলে ওরাই হচ্ছে নবাবের সাঙ্গোপাঙ্গ! আঁধারে গা ঢেকে ওরা তো বেশ পালিয়ে যাচ্ছিল, মরতে আলো জ্বেলে আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেন?'

—'আর একটা কথা বুঝে দেখো মানিক। আমাদের লণ্ঠন দু'টো সমানে জ্বলছে; এ-আলো ওরা দেখেছে, আর নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমরা ওদের ধরবার জন্যেই ছুটে এসেছি। সেটা বুঝেও ওরা আমাদের চোখের সামনেই আলো জ্বালতে ভয় পায়নি।'

—'তাহলে কি হঠাৎ ওদের আরো অনেক নতুন লোক এসেছে? ওরা কি ভাবছে যে, আমাদের আর ভয় করবার দরকার নেই?'

—'ওরা কী ভাবছে তা কে জানে! এসো, আগে আমরা তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে আর সবাইকে জানিয়ে দি যে, শত্রুদের দেখা পাওয়া গেছে!'

জয়ন্ত ও মানিক তিনবার বন্দুক ছুঁড়লে—তার তীব্র শব্দে চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দূর থেকে আঁধার রাত্রির বক্ষ ভেদ করে আরো কয়েকটা বন্দুকের গর্জন বাতাস-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শব্দ-তরীর মতো ভেসে এলো। বোঝা গেলো, আর সবাই তাদের সঙ্কেত শুনেই সাড়া দিলো এবং শীঘ্রই তারা তাদের কাছে এসে হাজির হবে।

জয়ন্ত বললে, 'আমরা কোথায় আছি, আলো জ্বেলে রেখে শত্রুদের সেটা আর দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। লণ্ঠন দু'টো নিবিয়ে ফেলো।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আর-একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে মানিক উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'জয়, জয়! ওদের আলোগুলো যে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

সত্যই তাই! ছয়টা আলো দুলতে দুলতে জয়ন্তদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'আলো নেবাও! ওরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!'

চৌকিদাররা চটপট আলো নিবিয়ে ফেলল।

তারপর ওদিককার আলোগুলো আসতে আসতে থেমে পড়লো।

জয়ন্ত বললে, 'এসো আমরা জলে নেমে খানিকটা এগিয়ে থাকি। আমাদের দলবল এসে পড়লেই আমরা ওদের আক্রমণ করবো। বন্দুক তৈরি রাখ, ওরা কাছে আসবার বা পালাবার চেষ্টা করলেই যথাসময়ে আমাদের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করতে হবে।'

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে চৌকিদাররাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের ভিতরে নামল। জল কোথাও প্রায় কোমর পর্যন্ত, কোথাও তার চেয়ে কম।

আঃ, সেই অস্বাভাবিক বৃষ্টি—আকাশে এতো জলও থাকতে পারে! সারা প্রান্তর যেন সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়েছে এবং ঝড়ের উদ্দামতা তার মধ্যে রীতিমতো তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। ধারাপাতের রম্‌ঝম্ রম্‌ঝম্ ধ্বনির সঙ্গে জেগে আছে সেই সুবৃহৎ প্রান্তরদীঘির পাগলা স্রোতের কল্‌কল্ কল্‌কল্ শব্দ। সে জলের কী প্রচণ্ড টান! প্রতি পদেই সকলকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। তার উপরে রাত্রির কালো রঙ এতো পুরু যে প্রান্তরের মাঝে মাঝে যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, একেবারে তাদের উপরে গিয়ে পড়ে ধাক্কা না-খাওয়া পর্যন্ত কারুর অস্তিত্ব জানবার উপায় নেই।

বহু দূরে ছয়টা আলো কালো শূন্যের কোলে কখনো দেখা দিচ্ছে, কখনো নিবে যাচ্ছে। জয়ন্তর মনে হলো, আলোগুলো যেন তাদের চেয়ে উঁচুতেই রয়েছে।

জয়ন্তই সকলের আগে-আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পায়ের তলায় আর মাটি পেলে না এবং অতলের দিকে তলিয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি জলের উপরে ভেসে উঠে সে বললে, 'হুঁশিয়ার! এখানে একটা পুকুর আছে!'

আন্দাজে আন্দাজে পুকুরের গভীরতা এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে তারা আবার অগ্রসর হতে লাগলো।

মানিক সভয়ে বলে উঠলো, 'আমার পায়ের উপর দিয়ে সাপের মতো কি একটা সাঁৎ করে চলে গেলো!'

জয়ন্ত বললে, 'সাপের মতো বলছো কেন মানিক, ওটা সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

একজন চৌকিদার বললে, 'এ-সময়ে মাঝে মাঝে মাঠের জলে কুমিররাও ভেসে আসে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তারাও আর বাকি থাকে কেন? কেবল কুমির নয়, আমি শুনেছি বানের জলে বাঘ-ভাল্লুকও বাধ্য হয়ে সাঁতার কাটে।'

ছয়টা আলো বেশ খানিকটা কাছে এসে পড়েছে। সেগুলো এদিক-ওদিক নড়ছে বটে, কিন্তু অন্য কোনোদিকে আর অগ্রসর হচ্ছে না।

জয়ন্ত বললে, 'নবাব বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমরা তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি। সে হয়তো দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে।'

মানিক নিজের বন্দুকটা আরো জোরে চেপে ধরলে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে জয়ন্ত বললে, 'নবাব খুব চালাক লোক বটে। দেখছো মানিক, আলোগুলো এখনো আমাদের কতো উপরে নড়াচড়া করছে? এই মাঠের কোন-একটা উঁচু জায়গা নিশ্চয় দ্বীপের মতো জলের উপরে জেগে আছে। নবাব তার দল নিয়ে তার উপরে উঠে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ বাধলে আমাদেরই বিপদ।'

মানিক ভাবতে লাগলো, নবাবকে আজ তারা দেখেছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকগুলো দেখতে কেমন? অমিয় যে বর্ণনা করেছে, তাতে তো তাদের আকৃতি অমানুষিক বলেই মনে হয়। চৌকিদার ঈশাকও তাদের চেহারায় অমানুষিক কোনো ভাব দেখে ভয়ে মারা পড়েছে। এ-রহস্যের কারণ কী? কে তারা?

এমন সময়ে দুই-তিনবার বন্দুকের শব্দ হল।

সকলে ফিরে দেখলে, পিছনে—যেদিক থেকে তারা এসেছে সেইদিকে অনেক দূরে চারটে আলো দেখা দিয়েছে।

জয়ন্ত ও মানিক আবার তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলে, কারণ এই নতুন আলোগুলোর সঙ্গে আসছে যে তাদেরই বন্ধুরা সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু শত্রুদের আলোগুলো তখনো নিবে বা পালিয়ে গেলো না।

জয়ন্ত বললে, 'নবাব কী বুঝেছে তা সেই-ই জানে। এতো লোক দেখেও সে ভয় পেলে না? না, বানের জলে তার পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই সে মরিয়া হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে?'

মানিক চোখের সুমুখে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কতকগুলো ভৌতিক মূর্তি দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে তাদের সকলকে এগিয়ে আসবার জন্যে আগ্রহে আহ্বান করছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রক্তশূন্য মড়া

ঘুটঘুটে কালোর কোলে মিটমিটে আলোর মালা। এতোগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনেও মালাকাররা মালা ছিঁড়ে পালিয়ে গেলো না।

অথচ তারা এতো কাছে এসে পড়েছে!

মানিক বললে, 'জলের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা উঁচু জমি আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই জমির উপরেই গাছপালার ভিতর থেকে যে ঐ আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। জয়, ওরা হয় পাগল, নয় মরিয়া। আমার মতে, আমাদের দল যখন সাড়া আর দেখা দিয়েছে, তখন তাদের জন্যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করবো।'

জয়ন্ত বললে, 'তোমার পরামর্শই শুনব। আমাদের পুরো দলে থাকবে পঁচিশটা বন্দুক নিয়ে পঁচিশজন লোক। এদের নিয়ে দস্তুরমতো একটা খণ্ডযুদ্ধের আয়োজন করা যেতে পারে।'

তারা সেইখানে প্রায় বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এতক্ষণ পরে আকাশের বজ্র, মেঘের বৃষ্টি ও ঝড়ের রুদ্রগতি শান্ত ও ক্ষান্ত হবার চেষ্টা করলে। তারপর যখন সদলবলে মহম্মদ, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, তখন বজ্র বৃষ্টি ও ঝড় পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তা ও প্রান্তর-সমুদ্রে বন্যার কলকল্লোল জেগে রইলো আগেকার মতোই।

সুন্দরবাবু এসে জয়ন্তর সুবৃহৎ দেহের উপরে হেলে-পড়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠলেন, 'বাস্ রে বাস্! চরকির মতো ছুটোছুটি করে এক মিনিট যে বসে জিরিয়ে নেব তারও উপায় দেখছি না! এই অগাধ সাগরে বসে পড়লেই ডুবে যাব, আর ডুবে গেলেই ভেসে যাব! হুম্!'

মানিক বললে, 'ভয় কী সুন্দরবাবু, ভেসে গেলে আপনি তো চিত-সাঁতার কাটতে পারবেন।'

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠাট্টা করো না মানিক, এ-ঠাট্টা-ফাট্টা ভালো লাগে না!'

মহম্মদ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, ও-গুলো নিশ্চয়ই শত্রুদের আলো?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এই দুর্যোগে এখানে এসে দেয়ালী-উৎসব করবার শখ হবে কার?'

—'কিন্তু নবাবের আস্পর্ধা তো কম নয়! সে আলো জ্বেলে বসে আছে, যেন আমাদের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভূত আবার কবে মানুষের তোয়াক্কা রাখে? মানুষ হলে ওরা এতক্ষণে বাপ্-বাপ্ বলে পালিয়ে যেত!'

মহম্মদ বললেন, 'রাতও আর বেশি নেই, কথায় কথায় সময় কাটাবারও আর দরকার নেই। চলুন, আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে যাই, ওদের একেবারে ঘিরে ফেলি।'

সকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সামনের উঁচু জমির দিকে এই অবস্থায় যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হল। আলোগুলো তবু নেববার বা পালাবার চেষ্টা করলে না।

মহম্মদ বললেন, 'এখান থেকে বন্দুক ছুঁড়ে আমরা অনায়াসেই ওদের মারতে পারি! আচ্ছা, একবার বন্দুক ছুঁড়ে ওদের ভয় দেখানো যাক।'

মহম্মদ ও তাঁর দেখাদেখি আরো কেউ-কেউ বন্দুক ছুঁড়লেন, ওদিক থেকে তবু কোনো উত্তরই এল না, ফিরে এল খালি তাঁদের নিজেদের বন্দুক-গর্জনের প্রতিধ্বনি এবং বেপরোয়া আলোগুলো তখনো অচল।

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, 'ওরা ভূতই হোক আর রাক্ষসই হোক, ওদের আস্পর্ধা আর আমি সইতে পারছি না! আমরা পুলিশের লোক—বিশেষ আমি হচ্ছি গিয়ে ক্যালকাটা পুলিশের লোক—আমাদের সঙ্গে চালাকি? আমি এইবার সত্যি সত্যি ওদের হাতের আলো টিপ করে গুলি ছুঁড়ব!'

সুন্দরবাবু লক্ষ্য স্থির করে দু-বার বন্দুক ছুঁড়লেন। একটা আলো নিবে গেল, কিন্তু অন্য আলোগুলো তবু সরে গেল না।

অমিয় বললে, 'নাঃ, দেখছি ওরা এইবারে সত্যিই অবাক করলে! ওদের কি ভয়-ডর কিছুই নেই?'

মহম্মদ বললেন, 'চল, আমরা সবাই এইবারে জমির উপরে উঠে ওদের আক্রমণ করি।'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'হুম্! মহম্মদ সায়েব, আমার মনে হয় ওরা অন্ধকারে আমাদের জন্যে কোনো ফাঁদ পেতে রেখেছে! ঐ আলোগুলো হচ্ছে টোপ। এগুলে বিপদ হতে পারে!'

মহম্মদ বললেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে। তবু আমি এগুব। চল সবাই, হুঁশিয়ার!'

সবাই অগ্রসর হল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'মানিক, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে।'

—'কী?'

—'হয়ত আমরা এখনি নিরেট গাধা বলে প্রমাণিত হবো।'

—'তার মানে?'

—'এই তো উঁচু জমির তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। মহম্মদ সায়েব উপরে উঠে গিয়েছেন। আলোগুলো এখনো জ্বলছে। না, এ অসম্ভব!'

জয়ন্ত ও মানিক পাশাপাশি থেকে জমির উপরে উঠতে লাগল। তখনো কোনো শত্রু কি বীভৎস মূর্তির সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল মহম্মদের। নিচে যারা ছিল তারা সবাই শুনলে, মহম্মদ বিপুল বিস্ময়ে চিৎকার করে বলছেন—'কেউ এখানে নেই, কেউ এখানে নেই।'

তারপরই সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর ঃ 'হুম্! গাছের ডালে খালি লণ্ঠনগুলো ঝুলছে। আমাদের ভয়ে ভূতগুলো চম্পট দিয়েছে!'

উঁচু জমির উপরে জল ওঠেনি। বৃষ্টি-ভেজা জমির উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, 'মানিক পূর্বদিকে মেঘের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এ কিরকম ব্যাপার?'

জয়ন্ত পূর্বাকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত মৃদুস্বরে বললে, 'প্রথম ঊষার স্বপ্নময় আলো ফুটছে। বর্ষা-প্রভাতে আলোকের নবজন্ম কী মধুর!'

সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'এখন তোমার কবিত্ব রাখো জয়ন্ত। নবাব কোনদিকে গেল বল দেখি?'

—'যেদিকে রাত্রি গেছে সেইদিকে।'

—'কী বলছ হে?'

—'যারা রাত্রির অনুচর তারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করে না। চেয়ে দেখুন, উষা এখন সিঁথায় সিঁদুর পরেছে। মানিক, ভৈরব রাগে এখন একটা ভজন গাইতে পারো?'

বন্ধুর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে ভেবে জয়ন্তর মুখের দিকে মানিক কটমট করে তাকিয়ে দেখলে।

জয়ন্ত হঠাৎ অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সুন্দরবাবু ভয় পেয়ে দুই-পা পিছিয়ে গেলেন। তিনিও ঠাউরে নিলেন, জয়ন্ত পাগল হয়ে গিয়েছে, হয়ত এখনি সে তাঁকে কামড়ে দেবে!

মহম্মদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, এত হাসছেন কেন? এই কি হাসবার সময়?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতেই বললে, 'বলেন কী মহম্মদ সায়েব! এতবড় প্রহসনেও হাসব না? ঐ লণ্ঠনগুলো আলো নয়, আলেয়ার মতোই আমাদের বিপথে চালনা করে সাত ঘাটের জল খাইয়ে, কাদা ঘাঁটিয়ে এখানে এনে ফেলেছে। বুঝেছেন? নবাব আমাদের চেয়ে ঢের বেশি চালাক। সে অন্ধকারে গাছের ডালে এই লণ্ঠনগুলো ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে কেবল আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে।'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ আমরা যখন আলোর দিকে ছুটে আসব তারা তখন অন্যদিকে ছুটে পালিয়ে কলা দেখাবার সময় পাবে। বাহাদুর নবাব, বাহাদুর! কাজেই এখন প্রভাতের সূর্যোদয় দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি ঐ হতভাগা সূর্যোদয় দেখতে চাই না!'

—'তাহলে কী করবেন?'

—'আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

—'তাহলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে নবাবের নামে একবার জয়ধ্বনি দিন।'

—'হুম্! নিজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে শত্রুর নামে জয়ধ্বনি দেবার ইচ্ছে আমার নেই!'

—'কিন্তু সুন্দরবাবু, আমার ওটুকু উদারতা আছে। আমাদের মতো এতগুলো মাথাকে যে পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল, সে অসাধারণ ব্যক্তি! এমনধারা অসাধারণ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে নেমে যদি কেল্লা ফতে করতে পারেন, তাহলে সেই জয়ই হবে অতুলনীয়। এতদিন পরেই তো খেলা জমে উঠল! এখন দেখা যাক কে হারে, কে জেতে!'

উপর-উপরি বিষম কর্মভোগের পর প্রায় সকলেরই শরীরের অবস্থা হলো এমন শোচনীয় যে, তার পরদিন কেউ আর বিছানা থেকে উঠবার নাম করলে না।

তার পরের দিনের রাত্রি প্রভাত হলে পর মানিক বিছানা থেকে উঠে দেখল, জয়ন্তর শয্যা শূন্য। সে কখন উঠে বেরিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবুও তখন গাত্রোত্থান করে দাড়ি কামাতে বসে গিয়েছেন।

এমন সময় মহম্মদ এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

মানিক শুধোলে, 'কী মহম্মদ সায়েব, এর মধ্যে নবাবের আর কোনো খবর পাননি?'

তিনি বললেন, 'না। কিন্তু এখানকার এক মুসলমান দোকানীর একটি মেয়ে চুরি গিয়েছে।'

মানিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'আবার মেয়ে-চুরি!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু এবারে কেবল মেয়ে-চুরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে খুন।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে দাড়ির উপরে ক্ষুরের কোপ বসাতে বসাতে ভারি সামলে গেলেন।

মহম্মদ বললেন, 'কাল রাত্রে দোকানী বাসায় ছিল না। ঘরের ভিতরে তার প্রৌঢ়া স্ত্রী আর সতেরো বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাত্রে পাড়ার লোকে শুনতে পায়, দোকানীর ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় চিৎকার হচ্ছে। পাড়ার লোক যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, চিৎকার তখন থেমে গেছে। কিন্তু চিৎকারের বদলে তারা তখন আর একটা শব্দ শুনতে পেলে। কারা যেন সমতালে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে গা ঢেকে চলে যাচ্ছে। এই পায়ের শব্দের কথা এখন এ-অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শব্দ শুনেই পাড়ার লোকের সমস্ত সাহস উবে যায়,—সকলে আবার যে যার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়। আজ সকালে উঠে সবাই দোকানীর ঘরে ঢুকে দেখে, তার মেয়ে অদৃশ্য, আর তার বউ মরে কাঠ হয়ে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।'

সুন্দরবাবু ক্ষুর নামিয়ে ঘুরে বসে বললেন, 'হুম্! আধখানা দাড়ি আমি পরে কামাব, আগে সব গল্পটা শুনে নিই!'

মহম্মদ বললেন, 'খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম। ভয়ানক দৃশ্য! একটি আধবয়সী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর তার আতঙ্কভরা চোখ-মুখ দেখে আমার ঈশাক বেচারীর মুখ মনে পড়ে গেল। ঈশাকের মুখ-চোখেও ঠিক এই রকম বীভৎস ভয়ের ভাব মাখানো ছিল। স্ত্রীলোকটির গলায় একটা মস্ত ছ্যাঁদা, কিন্তু ঘরের কোথাও রক্তের একটুও চিহ্ন নেই। অথচ তার দেহ একেবারে সাদা, যেন সমস্ত রক্তই সেই গলার ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘরের কোথাও রক্ত নেই, দেহেও রক্ত নেই—অথচ গলায় অত বড় ছ্যাঁদা! আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি বরাবরই বলছি এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড, তা তোমরা কেউ তো আমার কথায় কান পাতবে না!'

মহম্মদ বললেন, 'তা যদি হয়, তবে এ-সব কাণ্ডের সঙ্গে নবাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ নবাবকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম, সে আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ।'

নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অমিয়ও সব শুনছিল। এখন সে উঠে বসে বললে, 'কিন্তু আলিনগরে যে ছয়টা মূর্তি তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করেছিল, আমাদের বন্দুকের গুলিও যাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি, তাদের চেহারাও ছিল অবিকল সাধারণ মানুষের মতো।'

পরেশ ও নিশীথ উঠে বসে বললে, 'আমরাও এ-কথায় সায় দি।'

মহম্মদ বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময়। নবাব কেমন করে পালাল? কে তার ঘরের দরজা খুলে দিলে? ঈশাক কেন মারা পড়ল? পরশু রাত্রে গাছের ডালে আলো ঝুলিয়ে কারা আমাদের চোখে ধুলো দিলে? কারা মেয়ে চুরি করে? কেন করে? পাড়া জাগিয়ে কারা তালে

তালে পা ফেলে চলে যায়? এ-সব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। আমি স্থির করেছি, আজই সদরে রিপোর্ট পাঠিয়ে সাহায্য চাইব।'

অমিয় বললে, 'কিন্তু এই সব রহস্যেরই মূল আছে সেই আলিনগরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে।'

মহম্মদ বললেন, 'বেশ, সদর থেকে সাহায্য পেলে আমরা সদলবলে আলিনগরেও গিয়ে হাজির হতে পারব।'

এমন সময়ে জয়ন্ত ফিরে এল। তার গম্ভীর মুখে চিন্তার রেখা।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত! ভয়ানক খবর!'

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে সুন্দরবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'এমন কী ভয়ানক খবর থাকতে পারে, যা আমি জানি না?'

—'হুম্! এবারে মেয়ে-চুরির সঙ্গে মেয়ের মা খুন!'

—'আমি জানি। এইমাত্র ঘটনাস্থল থেকেই ফিরে আসছি।'

—'মহম্মদ সায়েব সদর থেকে সাহায্য আনিয়ে আলিনগর আক্রমণ করবেন।'

—'কবে, মহম্মদ সায়েব?'

—'দিন চারেক পরে।'

জয়ন্ত আর কিছু না বলে মানিককে ইশারা করে আবার ঘরের বাইরে গেল।

মানিক তার কাছে গেলে পর জয়ন্ত বললে, 'আমি আরো দিন চারেক অপেক্ষা করতে পারব না। বিশেষ, এত লোকজন নিয়ে শোভাযাত্রা করে আলিনগরে গেলে আসামীরা সাবধান হয়ে পালাতে পারে।'

—'তুমি কী করতে চাও?'

—'তুমি আর আমি কাল রাত থাকতে উঠে চুপিচুপি আলিনগরে যাত্রা করব।'

—'সে কি, পায়ে হেঁটে? আলিনগর যে এখান থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে!'

—'না, এখানে আমার পরিচিত এক জমিদার-বন্ধু আছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনিই মোটর দেবেন। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, তুমি আমি দু-জনে যেতে পারব। আগে নিজেরা খোঁজ নিয়ে আসি, তারপর দরকার হলে মহম্মদ সায়েবের সাহায্য নেব। মানিক, আজ যে অমানুষিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারপর আর এখানে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা চলে না। সেই রক্তশূন্য মড়ার মুখ চিরদিন আমার মনে থাকবে! গলার ছ্যাঁদা দিয়ে নিশ্চয় রক্তের ঝরণা ঝরেছিল, কিন্তু সে রক্ত কোথায় গেল? আর, তার গলার ক্ষতটা কি রকম দেখতে জানো মানিক? যেন কোনো রক্তলোলুপ জন্তু ধারালো দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে ধরেছিল—আর তার দেহের সমস্ত রক্ত সেই-ই প্রাণপণে শুষে পান করে ফেলেছে!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেতের প্রতিহিংসা

ভোর-বেলায় মোটর ছুটে চলেছে আলিনগর।

জয়ন্ত গাড়ির 'হুইল' ধরে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'মানিক, মাঠে মাঠে আর পথের মাঝে মাঝে দেখছি এখনো মন্দ জল জমে নেই। আমরা বেলা দুটো-আড়াইটের আগে আলিনগরে গিয়ে পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমরা দু-জনে আলিনগরে গিয়ে কী করব? সেখানে তুমি কী দেখবার আশা কর?'

—'তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঃ গোয়েন্দার কাজ দল বেঁধে চলে না। তাতে শত্রুরা সাবধান হবার সুযোগ পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম দিনেই আমাদের দলে যদি বেশি লোক না থাকত, তাহলে এতক্ষণে সমস্ত রহস্য হয়ত আমরা আবিষ্কার করে ফেলতে পারতুম। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ঃ আলিনগরে গিয়ে যে কী দেখব, সেটা আমি নিজেই জানি না। গত পরশু পর্যন্ত এই রহস্য সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা ছিল, গেল-কাল সকালে সেই রক্তহীন মৃতদেহ দেখবার পর থেকে সে-ধারণা একেবারে বদলে গেছে। মাঝে মাঝে এখন মনে হচ্ছে, হয়ত সুন্দরবাবুর সন্দেহ-ই সত্য, হয়ত এইসব মেয়ে-চুরির মধ্যে আলৌকিক কোনো ব্যাপারই আছে।'

মানিক চকিত কণ্ঠে বললে, 'অলৌকিক বলতে তুমি কী বুঝেছ? ভৌতিক ব্যাপার?'

জয়ন্ত বললে, 'ভূত বলতে লোকে যা মানে, আমি তা মানি না। ভূতে বেছে বেছে খালি মেয়ে চুরি করবে কেন? তবে, ভূতে যে মানুষ চুরি করে এমন একটা বিলাতী গল্প আমি পড়েছিলুম। আলিনগর এখনো অনেক দূর। সময় কাটাবার জন্যে তুমি যদি সেই গল্পটা শুনতে চাও, আমি বলতে রাজী আছি। কিন্তু মনে রেখো, এটা গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।'

মানিক মোটরের একটা কোণ নিয়ে আরাম করে বসে বললে, 'বল।'

জয়ন্ত গাড়ির গতি একবার থামিয়ে, রুপোর শামুকের ভিতর থেকে একটিপ নস্য নিয়ে নাকে গুঁজে গল্প আরম্ভ করলে ঃ

লন্ডন শহরের পথ। শীতার্ত রাত্রি। একখানা বাস ছুটেছে—আজকের মতো এই তার শেষ যাত্রা। বাসের ভিতরে নিচের তলায় লোকজন বেশি নেই।

দোতলায় কেউ উঠেছে বলে কন্ডাক্টরের মনে হল না। তবু একবার নিশ্চিত হবার জন্যে সে বাসের দোতলায় গিয়ে উঠল।

সামনের আসনে একজন আরোহী।

কন্ডাক্টরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই যাত্রীটি তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন উপরে উঠে বসে পড়েছে?

যাত্রী মাথার টুপিটা মুখের উপরে টেনে নামিয়ে দিয়েছে এবং 'মাফ্‌লার' ও কোটের কলার দিয়ে মুখের নিচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে—শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়ার চোট সামলাবার জন্যে। স্থিরভাবে বসে যেন আড়ষ্ট হয়েই সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বোধহয় সে কন্ডাক্টরের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কারণ সে দুই আঙুলে একটি আনি ধরে হাত বাড়িয়ে বসে আছে।

কন্ডাক্টর বললে, 'ওঃ, ভারি ঠাণ্ডা রাত মশাই!'

যাত্রী জবাব দিলে না।

'কোথায় যাবেন?'

—'ক্যারিক স্ট্রীট।'

যাত্রীর উচ্চারণ অদ্ভুত। কন্ডাক্টর আবার শুধোলে, 'কোথায় বললেন?'

—'ক্যারিক স্ট্রীট—ক্যারিক স্ট্রীট—'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জানি—অতবার আর বলতে হবে না!' বলেই কন্ডাক্টর যাত্রীর হাত থেকে আনিটা টেনে নিলে!

যাত্রী একটুও না ফিরে বললে, 'জানো? কী জানো তুমি?'

কিন্তু কন্ডাক্টরের বুকের ভিতর পর্যন্ত তখন শিউরে শিউরে উঠছে। আনিটা কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন সেটাকে জমাট বরফের ভিতর থেকে টেনে বার করা হয়েছে!

টিকিট কেটে কন্ডাক্টর যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে দিতে গেল।

যাত্রী বললে, 'যেখানে আনি ছিল টিকিটখানা সেইখানে গুঁজে দাও।'

কেন তা সে জানে না, কিন্তু কন্ডাক্টরের ইচ্ছা হল না যে যাত্রীর হাতে হাত দেয়। তার হাতখানা আড়ষ্ট, বোধহয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু। টিকিটখানা কোনোরকমে গুঁজে দিয়ে কন্ডাক্টর বললে, 'কেমন, পেয়েছেন জগন্নাথমশাই?'

তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে কৌতুক করা হচ্ছে ভেবেই বোধহয় যাত্রী বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।'

—'কে কথা কইতে চায়!' বলে কন্ডাক্টর নেমে গেল।

বাস ক্যারিক স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। কণ্ডাক্টর চ্যাঁচাতে লাগল—'ক্যারিক স্ট্রীট! ক্যারিক স্ট্রীট!'

কিন্তু দোতলা থেকে আড়ষ্ট যাত্রী নামবার নাম করলে না।

কন্ডাক্টর আপন মনে বললে, 'ও যদি সারারাত টঙে বসে থাকতে চায়, থাকুক। আমি আর ওপরে উঠছি না।...এও হতে পারে, হয়ত কখন সে নেমে গিয়েছে, আমি দেখতে পাইনি।'

সেইদিন সন্ধ্যাতেই ক্যারিক স্ট্রীটের একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি থেকে মোটঘাট নিয়ে যে ভদ্রলোকটি নামলেন তাঁর নাম মিঃ রামবোল্ড। কয়েক বছর আগে তিনি এই হোটেলেই ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। তারপর অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। এতকাল পরে আবার তাঁর পুরানো হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলের কর্তা তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে এলেন।—'এই যে মিঃ রামবোল্ড! জানি ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করে আবার আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।'

মিঃ রামবোল্ড হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্মীলাভ করেছি। আমি মস্ত ধনীই বটে।'

হোটেলের কর্তা বললেন, 'কিন্তু তবুও আপনি যে আমাদের মতো গরিবদের ভোলেননি এইটেই যথেষ্ট!'

—'কী করে ভুলব? এ হোটেল যে আমার নিজের বাড়ির মতো প্রিয়! এখানকার পুরানো চাকর ক্লুটসাম কোথায়! এখানেই কাজ করে? বেশ, বেশ, তাকেই আমি চাই।'

রাত্রে মিঃ রামবোল্ড নিজের ঘরে বসে কথা কইছিলেন। ক্লুটসাম জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা হুজুর, অস্ট্রেলিয়া দেশটা কেমন?'

—'ভালোই।'

—'সেখানকার আইন বোধহয় এখানকার মতো কড়া নয়?'

—'কি রকম?'

—'ধরুন,' আপনি যদি সেখানে কোনো মানুষ খুন করেন, তাহলে পুলিশ আপনাকে ধরে ফাঁসি দেবে তো?'

মিঃ রামবোল্ড অত্যন্ত বেশি চমকে উঠলেন। শুকনো গলায় থতমত খেয়ে বললেন, 'আমিই বা মানুষ খুন করব কেন, আর আমাকেই বা ফাঁসি দেবে কেন?'

—'না হুজুর, আমি কথার-কথা বলছি! বাপ্‌রে, মানুষ খুন করার কত বিপদ! পুলিশ ফিরবে পাছে পাছে—'

রামবোল্ড বাধা দিয়ে জোরে জোরে বললেন, 'কেন, পুলিশ পাছে পাছে ফিরবে কেন? যদি আমি কারুকে খুন করি, তার লাশ লুকিয়ে ফেলি, কেউ সাক্ষী না থাকে, তাহলে পুলিশ জানতে পারবে কেমন করে?'

—'কিন্তু হুজুর, যাকে খুন করেছেন সে যদি ভূত হয়? প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনাকে খুঁজতে আসে?'

রামবোল্ডের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'থামো থামো!'

ক্লুটসাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওকি হুজুর, আপনি অমন করছেন কেন? আমি কথার কথা বলছি।'

—'আমার গলা শুকিয়ে গেছে! শিগ্‌গির এক গেলাস জল আন!'

ক্লুটসাম তখনি জল এনে দিলে। রামবোল্ড জল পান করে অন্য কথা পেড়ে বললেন, 'আচ্ছা ক্লুটসাম, তোমাদের হোটেল এখন কেমন চলছে?'

—'খুব ভালো চলছে হুজুর। এই আজকের কথাই ধরুন না! আজ রাত্রে যদি কেউ এসে ডবল টাকাও দিতে চায়, তাহলে তাকে আমরা ঘর দিতে পারব না। হোটেলের কোনো ঘরই খালি নেই।'

—'ক্লুটসাম, দেখছ আজকের রাত কী ঠাণ্ডা? বাইরে বরফ পড়ছে। আজ কোনো বেচারী যদি এখানে এসে ঘর না পায়, তাহলে তার কষ্টের আর সীমা থাকবে না। আমার তো দুটো ঘর, দুটো বিছানা। আজ যদি সত্যিই কেউ আসে, তাকে তাড়িয়ে দিও না, অন্তত আজকের জন্যে তাকে আমি আমার একটা বিছানা ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

—'আচ্ছা হুজুর।'

মাঝ-রাত্রি। দেউড়ির ঘণ্টাটা হঠাৎ খুব জোরে খুব তাড়াতাড়ি বেজে উঠল—একবার, দুবার, তিনবার।

হোটেলের দ্বারবান অবাক হয়ে ভাবলে, এই তুষার-ঝরা নিশুতি রাতে কে অতিথি বাইরে থেকে এল!

আবার সেইরকম খুব জোর আর তাড়াতাড়ি তিনবার ঘণ্টাধ্বনি।

দ্বারবান বিরক্ত হয়ে গজ্-গজ্ করতে করতে দেউড়িতে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্তি। তার মাথার টুপিটা মুখের উপর টেনে নামানো, আর তার গলার কলারটা টেনে চিবুকের উপর তুলে দেওয়া। সর্বাঙ্গ ঢাকা মস্ত-বড় ঝলঝলে এক কালো-মিশমিশে ওভার-কোট। ওভার-কোটের একদিকটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে—বোধহয় তার হাতে একটা চুপড়ি কিংবা একটা ব্যাগ আছে।

দ্বারবান বললে, 'সেলাম হুজুর! আপনার কী দরকার?'

আগন্তুক কোনো জবাব না দিয়ে এক কোণে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বললে, 'আমি আজকের রাতের জন্যে হোটেলে একখানা ঘর চাই।'

—'হুজুর, আজ যে হোটেলের সব ঘর ভর্তি হয়ে গেছে!'

—'তুমি ঠিক জানো?'

—'হ্যাঁ হুজুর!'

—'কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখ!'

—'ভালো করে ভাববার দরকার নেই হুজুর! আমি জানি।'

আগন্তুক এতক্ষণে মুখ তুলে দ্বারবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ দেখি।'

কেন তা সে জানে না, কিন্তু দ্বারবানের মনে হল, তার দেহের ভিতর থেকে যেন কি-একটা জিনিস—হয়ত তার জীবনই—ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়ান হুজুর! আমি জেনে এসে বলছি!'

সে হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে খবর নিয়ে ফিরে এসে আগন্তুককে আর দেখতে পেল না। কোথায় গেল সে? হোটেলের ভিতরে না বাইরে?

হঠাৎ তার চোখ পড়ল আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায়। সেখানে মেঝের উপরে লম্বা এক টুকরো বরফ পড়ে চকচক করছে।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। চারিদিক ঢাকা, তবু এখানে বরফ এল কেমন করে?

সেই কনকনে শীতের রাতেও দ্বারবানের কপালের উপর ঘামের ফোঁটা দেখা দিলে। রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজের মনেই সে বললে, 'যাকে এইমাত্র দেখলুম, কে সে? মানুষ?'

দোতলার হলঘরে দাঁড়িয়ে ক্লুটসাম দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে এক অচেনা ভদ্রলোক নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছেন।

এগিয়ে এসে বললে, 'কে আপনি? কাকে চান?'

—'তুমি মিঃ রামবোল্ডকে জিজ্ঞাসা করে এস, আজ রাত্রে তাঁর অন্য বিছানাটা আমি ব্যবহার করতে পারব কি না?'

ক্লুটসাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাল।

মিঃ রামবোল্ডের বাড়তি বিছানার কথা এই অচেনা লোকটি কেমন করে জানতে পারলে? কিন্তু সে কথা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে সে আগন্তুকের অনুরোধ রাখবার

জন্যে ভিতর দিকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, 'মিঃ রামবোল্ড আপনার নাম জানতে চাইলেন।'

আগন্তুক পকেট থেকে বার করলে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ। সেই কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বললে, 'মিঃ রামবোল্ডকে এটা দিয়ে এস। আর তাকে জানিয়ো আমার নাম হচ্ছে, জেম্‌স্ হাগবার্ড।'

ক্লুটসাম সেই কাগজখানা পড়তে পড়তে আবার হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। তাতে লেখা রয়েছে—

'অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের মিঃ জেমস হাগবার্ড কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন, এতদিন সে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বন্দুকের গুলিতে তিনি মারা পড়েছেন। এখন প্রকাশ পেয়েছে, মিঃ রামবোল্ড নামে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি ঐ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেই দিন থেকে মিঃ রামবোল্ডেরও আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

একটু পরে ক্লুটসাম আবার ফিরে এল। তারপর তফাতে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'মিঃ রামবোল্ড বললেন—আপনি নরক থেকে এসেছেন, আবার নরকেই বিদায় হোন!'—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই রামবোল্ডের ঘর থেকে ভেসে এল ঘন-ঘন বিষম আর্তনাদ ও ভীষণ গর্জন-ধ্বনি।

ক্লুটসাম ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কোনো জনপ্রাণী নেই।

ঘরে বিছানা, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি উল্‌টে পাল্‌টে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এবং রক্তের দাগে চারিদিক হয়ে উঠেছে ভয়ানক। এবং ঘরের মাঝখানেই মেঝের উপর পড়ে চকচক করছে ইঞ্চি কয়েক লম্বা এক টুকরো বরফ।

রামবোল্ডের সঙ্গে ক্লুটসামের আর কখনো দেখা হয়নি।

কিন্তু সেই রাত্রে হোটেলের সামনের রাস্তায় যে কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল, সে একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখেছিল।

কালো ওভার-কোট পরা একটা আড়ষ্ট মূর্তি তুষারবৃষ্টির মধ্য দিয়ে হন্‌হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাঁধে রয়েছে মস্ত মোটের মতন কি একটা জিনিস।

কনস্টেবল তাকে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু খানিক দূরে গিয়ে আর তাকে দেখতে পায়নি।

মানিক বললে, 'তাহলে ঘটনাটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, মিঃ জেম্‌স্ হাগবার্ডকে খুন করে মিঃ রামবোল্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর মিঃ হাগবার্ডের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বিলাতে এসে মিঃ রামবোল্ডকে হত্যা করে তার দেহ নিয়ে নরকে ফিরে গেল। তুমি কি বলতে চাও, এখানেও মেয়ে-চুরি করেছে ভূতেরা?'

জয়ন্ত গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প বলছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল! আমি বললুম গাল-গল্প,—কেবল খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে। তার সঙ্গে এখানকার মেয়ে-চুরির কোনোই

সম্পর্ক নেই।—এখন এ-সব কথা থাক। ঐ দেখ, সামনেই আলিনগরের ভাঙা বাড়িগুলোর এলোমেলো চুড়ো দেখা যাচ্ছে। এদিকে পথেই পড়েছে নদী। গাড়ি নিয়ে আর এগুবার উপায় নেই, এগুবার দরকারও নেই। গাড়িখানাকে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এইবারে আমাদের পদব্রজে এগুতে হবে।'

মোটর থামিয়ে দু-জনে নামল। তারপর গাড়িখানাকে লুকিয়ে এবং চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো।

কিন্তু পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে বালির উপরে পাওয়া গেল আবার সেই ছয়জোড়া পায়ের দাগ।

জয়ন্ত হাঁটু গেড়ে বসে খানিকক্ষণ ধরে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করলে। তারপর মুখ তুলে বললে, 'মানিক, এবারের পায়ের দাগে বিশেষত্ব আছে। দাগগুলো বড় বেশি গভীর হয়ে বালির ভিতর বসে গেছে। যেন এরা সকলে মিলে কোনো একটা ভারি মোট বহন করে নিয়ে গিয়েছে।'

মানিক চমকে উঠে বললে, 'ভারি মোট! কী হতে পারে সেটা?'

—'হয়ত কোনো মানুষের—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দেহ! নয় তো অন্য কিছু। সেটা যাই-ই হোক, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের খুব জোর বলতে হবে! এসেই এই দাগগুলো চোখে পড়ে গেল। এ-সূত্র আর ছাড়ছি না, কারণ এই সূত্র ধরেই এবার নিশ্চয়ই সেই ছয় মূর্তিকে আবিষ্কার করব—তারা আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুপুরে

আলিনগরে কোনো বিভীষিকাই তখন সেখানে জেগে নেই। সূর্যকরের সোনার ঢেউ আকাশের নীলিমাকে অম্লান করে তুলেছে। পাখিদের গানের তানের ঢেউ বনের শ্যামলিমাকে উচ্ছ্বসিত

করে তুলেছে, নদীর জলের রুপোলি ঢেউ দুই তটের মাটি, বালি আর পাথরকেও সঙ্গীতময় করে তুলেছে। চারিদিকে আলো আর গান, শান্তি আর কান্তি।

তারই মধ্যে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন বহন করে আনছে কেবল এই ছয়-জোড়া পদচিহ্ন। এই ছয়-জোড়া পায়ের অধিকারী, কে তারা? কেন তারা সর্বদাই একসঙ্গে থাকে, কেন তাদের দলের লোক বাড়েও না কমেও না, কেন তারা একতালে পা ফেলে চলে—আর কেন তারা মেয়ের পর মেয়ে পর মেয়ে চুরি করে? আর, তাদের সঙ্গে নবাবের কোনো সম্পর্ক আছে, কিংবা নেই? আর, আলিনগরে এসে তারা সবাই মিলে কী করে?

জয়ন্ত ও মানিক এই সব কথাই ভাবছিল।

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু এই ছয়টা মূর্তি যে প্রেতমূর্তি নয়, এদের দেহ যে ছায়াময় নয়, এরা যে আমাদের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া, পা দিয়ে মাটি মাড়িয়ে চলে, এখানকার দাগগুলো সে-সত্যও প্রকাশ করেছে। সেদিনের পায়ের দাগগুলোর ভিতর যা লক্ষ্য করেছিলুম আজও তাই লক্ষ্য করছি ; এদের মধ্যে একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, একটা পায়ের গোড়ালি মাটির উপর ফেলতে পারে না। এটাও মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ—খোঁড়া ভূতের কথা কখনো শুনেছ?'

দু-জনে নদীগর্ভের দিকে নামতে লাগল।

মানিক বললে, 'দাগগুলো দেখছি নদীর জলের ভিতরে নেমে গেছে। তার মানে, সেই ছয়টা মূর্তি এইখানেই নদী পার হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তাই আমাদেরও এইখানে নেমেই পার হতে হবে। গেল-দুর্যোগে নদীর জল বেড়ে উঠেছে বটে কিন্তু বোধহয় আমাদের কোমরের বেশি উঠবে না। এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর রীতিই এই—এরা যেমন হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, তেমনি হঠাৎ ছোট হয়ে পড়ে ; এরা যেন প্রকৃতির আবুহোসেন—আজ বড়, কাল ছোট।...এই আমি দুর্গা বলে নেমে পড়লুম,—যা ভেবেছি তাই, জল খুব কম। এসো মানিক, কিন্তু দেখো, বন্দুক রিভলভার আর রসদ যেন জলে ভেজে না।'

নদীর ওপারে উঠে একটুও খুঁজতে হলো না, আবার পাওয়া গেল সেই ছয়-জোড়া পায়ের দাগ। নদীর বালির বিছানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও মাটির উপর দিয়ে চলে গিয়েছে পদচিহ্নের সারি।

মানিক খুশি-গলায় বললে, 'জয়, সেদিনকার বিষম বৃষ্টি আমাদের ভারি কষ্ট দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ আমরা তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি! সেই বৃষ্টিতে ভিজে মাটি খুব নরম ছিল বলেই পায়ের এমন স্পষ্ট আর স্থায়ী ছাঁচ তুলতে পেরেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে, এই ছাঁচগুলো টাটকা, এদের সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির পরেই। প্রথম শ্রেণীর পথপ্রদর্শকের মতো এখন এই পায়ের দাগগুলোও আমাদের নিয়ে যাবে যাদের খুঁজতে এসেছি তাদের ঠিকানায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ দি' বৃষ্টিকে!'

পায়ে-হাঁটা মেটে পথ। কোথাও ঝুপসি গাছের তলা দিয়ে, কোথাও কাঁটা-ঝোপ ও জঙ্গলের তলা দিয়ে, কোথাও ভাঙাচোরা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ বা ঢিপিঢাপার পাশ দিয়ে অজগরের মতো এঁকেবেঁকে, উঠে নেমে, মোড় ফিরে ফিরে অগ্রসর হয়েছে। পথের উপরে পায়ের দাগগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার স্পষ্ট হয়ে গিয়ে তারা জয়ন্ত

ও মানিককে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু জমির অন্য প্রান্ত থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করছে। পায়ের দাগ তাদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা খেলছে।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, পৃথিবীর সব দেশেরই গোয়েন্দাগিরির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবে, পায়ের দাগ, রক্তের দাগ, আর আঙুলের ছাপ দেখেই গোয়েন্দারা বেশির ভাগ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী ধরবার প্রথা একশো বছর আগেও আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু পায়ের দাগ আর রক্তের দাগ মানুষের কাজে লেগে আসছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই—মানুষ যখন সভ্যও হয়নি। এই দু-রকম দাগের কোনো-না-কোনোটি দেখে আদিম মানুষ বনে-জঙ্গলে শিকারের খোঁজ পেয়ে জীবন ধারণ করেছে—এখনকার শখের শিকারীদেরও কাছে ঐ দু-রকম দাগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্বল। আর পাপীদেরও জব্দ করেছে চিরকাল ঐ দু-রকম দাগই। সব পাপীই এই দু-রকম দাগকে ভয় করে, কিন্তু তবু এদের কবল থেকে নিস্তার পায় না—যেমন আজও পাবে না আমাদের হাত থেকে মুক্তি এই ছয়জন মেয়ে-চোর!'

মানিক বললে, 'এরা খালি মেয়ে-চোর নয়, হত্যাকারীও বটে।'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, 'হুঁ। শেষ যে মেয়ে চুরি গেছে, এরা তার মাকে খুন করেছে। কিন্তু মানিক, এখনো এ-রহস্যটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে মৃতদেহের গলায় অত বড় ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু তার দেহের রক্ত গেল কোথায়? এক হতে পারে হত্যাকারী দাঁত দিয়ে তার গলায় ছ্যাঁদা করে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে—আর যেটুকু রক্ত মাটিতে পড়েছিল তাও জিভ দিয়ে চেটে-পুটে তুলে নিয়েছে ; কিন্তু মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব? এই ছয়জন খুনে মেয়ে-চোর যে মানুষ, সে-বিষয়ে তো সন্দেহ করবার উপায় নেই!'

হঠাৎ মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখ জয়, দেখ!'

মানিকের দৃষ্টির অনুসরণ করে জয়ন্ত দেখলে, যে-দুখানা মোটরে চড়ে তারা সেদিন আলিনগরে এসেছিল, তাদেরই ভগ্নাবশেষ। একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ির স্তূপের উপরে দু-জায়গায় গাড়ি দু-খানা চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

জয়ন্ত কৌতূহলী চোখে দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ভিতর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে বললে, 'মানিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?'

—'কী?'

—'গাড়ির ভিতরে আমাদের খাবার ছিল। হয়ত ফল বা পাঁউরুটি প্রভৃতি চারিদিকে ঠিকরে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে বনের পশুপক্ষীরা সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু গাড়ির ভিতরে ছিল বন্ধ একটিন বিস্কুট আর তিন টিন "জ্যাম" আর চায়ের "ফ্লাস্ক"। সেগুলোর একটা ভাঙা টুকরোও এখানে নজরে পড়ছে না। খাবারের চাঙাড়িরও টুকরো এখানে নেই—তাও কি জন্তুরা খেয়ে ফেলেছে?'

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তাই তো দেখছি! সত্যি, অতি বড় পেটুক জন্তুও তো টিন বা ধাতু বা ভাঙা চাঙাড়ি হজম করতে রাজী হবে না! সেগুলো গেল কোথায় তবে?'

—'কোথায় আর? ঐ নবাব, কি ছয়-মূর্তির বাসায়! গাড়ি দুখানাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দেবার আগে খাবারগুলোকে বাজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে আর কি! মানিক, যারা "স্যাণ্ডউইচ" আর কলা খায়, "জ্যাম" আর বিস্কুটের টিন খোলে, নিশ্চয়ই তারা ভূত নয়! এইসব মেয়ে-চুরি আর খুনের মূলে আছে তোমার আমার মতো মানুষ-ই।'

মানিক বললে, 'এ প্রমাণটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! চল তবে আবার সেই খুনে মেয়ে-চোর আর খাবার-চোর মানুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা যাক।'

তারা জনশূন্য আলিনগরের এক প্রান্ত দিয়ে চলেছে। ছোট বড় মাঝারি, বিবর্ণ, সংস্কার-অভাবে জীর্ণ কঙ্কালসার বা একেবারে ভাঙা বাড়ির পর বাড়ি যেন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভারে স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু একদিন তারা অনেক আলোক-মালা দেখেছে, অনেক উৎসব-কোলাহল শুনেছে। তাদের ছায়ায় ছায়ায় কত হাসি আর অশ্রুর বিচিত্র অভিনয়ের যবনিকা বারং-বার উঠেছে ও পড়েছে, সে হিসাব যেন তারা আজও ভুলে যায়নি। যেখানে আগে শত শত সঙ্গীতের ও শত শত নূপুরের ধ্বনি জেগে উঠত ক্ষণে ক্ষণে, সেখানে আজ স্তব্ধতার মৃত্যু নিদ্রা ভঙ্গ করেছে কেবল দেয়ালে দেয়ালে গজিয়ে-ওঠা অশ্বত্থ-বটের শাখায় শাখায় বন্য বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের কান্না। যাদের চাতালে চাতালে আগে জীবন্ত ফুলের মতো শিশুরা করতো সুমধুর লীলাখেলা, সেখানে আজ পাথরে পাথরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেবল সাপ, বিছা ও গিরগিটির দল।

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, 'জয়, আমার পার্সি কবি ওমর খৈয়ামের কবিতা মনে পড়ছে ঃ

'রাজার বাড়ির থামের সারি আকাশ-ছোঁয়া তুলতো মাথা,
রতন মুকুট পরে হেথায় সোনার তোরণ ধরতো ছাতা।
আজ সেখানে আঁধুল মায়ায় বিজন ছায়া দুলিয়ে দিয়ে,
ঘু-ঘু-ঘু-ঘু-র আকুল স্বরে গাইছে কপোত অশ্রুগাথা।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন মনে হচ্ছে, এই ছয়জন দুরাত্মা বাস করবার ঠিক জায়গাই বেছে নিয়েছে! যারা সমাজের আর মানুষের শত্রু, জ্যান্ত শহরের জনতা তাদের ভালোও লাগবে না, সহ্যও হবে না। তাই এসে আস্তানা গেড়েছে তারা এই মরা শহরে। ভাই মানিক, ঘর-বাড়ির আত্মা থাকে না জানি, কিন্তু এখানকার বাড়ি-ঘরগুলোকে দেখলে প্রেতাত্মার ছবি দেখছি বলেই কি সন্দেহ হয় না?'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, এরা প্রেতাত্মার মতোই ভয়ের ভারে প্রাণ-মন অভিভূত করে দেয়!'

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'এই আমরা সেই গোরস্থানের আর একদিকে এসে পড়লুম। এরই মধ্যে সেই ভয়ানক রাতে ছয়টা আলোকে চলাফেরা করতে দেখেছিলুম!'

মানিক বললে, 'পায়ের দাগের রেখা যে এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে!'

—'তাহলে আমরাও এর মধ্যে ঢুকব। মানিক, বন্দুক প্রস্তুত রাখো, হয়ত এইটেই সেই শয়তানদের আড্ডা। হয়ত এইবারে তারা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলে যে জামাই-আদর করবে না, সে-বিষয়ে একতিল সন্দেহ নেই।'

তারা দু-জনেই সেখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকে টোটা ভরে নিলে, নিজের নিজের রিভলভার পরীক্ষা করলে।

মানিক বললে, 'কিন্তু অমিয়বাবু আর তাঁর বন্ধুদের মতে, বন্দুকের গুলি বেমালুম হজম করে তারা আক্রমণ করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। 'গোলা-খা-ডালা'-র যুগ আর নেই। অমিয়-বাবুদের গুলি খেয়েছিল বনের গাছ আর পাহাড়।'

তারা চারিদিকে সাবধানে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভিতরে প্রবেশ করলে। আলিনগরের কোথাও জীবনের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু, এইবারে দেখা দিলে খালি মৃত্যুর চিহ্ন। এখানকার প্রত্যেক উঁচু ঢিপিটাও এক-একটি বিয়োগান্ত জীবন-নাট্যের শেষ নিদর্শন—মানুষের অশান্ত উচ্চাকাঙক্ষার তুচ্ছ পরিণাম? চঞ্চল আলোছায়ার জীবন্ত লীলা বুকের উপরে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে কবরের পর কবরের সার। তাদের তলায় চির-নিদ্রার স্বপ্নহীনতার মধ্যে শুয়ে আছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত কত মানুষের কঙ্কালের পর কঙ্কাল এবং তাদের উপর দলে দলে ফুটে আছে কত আগাছার কত রঙের ফুলের পর ফুল। মানুষের স্মৃতি যাদের ভুলেছে, প্রকৃতির প্রেম তাদের মনে রেখেছে।

দু-ধারের কবরের মাঝখান দিয়ে চলে পদচিহ্নরেখা গোরস্থানের আর-একপ্রান্তে যেখানে গিয়ে শেষ হলো, সেখানেই মস্ত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, এই অট্টালিকাও বহুকালের পুরানো বটে, কিন্তু আলিনগরের অন্যান্য বাড়ির মতো এখানা ততটা জীর্ণ ও ভাঙাচোরা নয়। এর অনেকগুলো দরজার কবাট ও জানলার পাল্লা এখনো অটুট আছে এবং এক সময়ে এখানা যে খুব বড় ধনীর বা রাজা-উজিরের প্রাসাদ ছিল, তাও অনুমান করা যায়।

অট্টালিকার প্রবেশ-পথটিও প্রকাণ্ড। হয়ত আগে এখানে জমকালো সাজ-পরা সেপাই-সান্ত্রীরা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহারা দিত, হয়ত আজ তাদেরও কঙ্কাল নিঃসাড় হয়ে আছে ঐ গোরস্থানেরই কোনো বুজে-যাওয়া গর্তে। কিন্তু আজ এই দেউড়ি হয়েছে শেয়াল কুকুরের আনাগোনার রাস্তা।

কিন্তু দেউড়ির সামনেই কী ওটা পড়ে পড়ে পৈতার মতো সরু সরু ধোঁয়া ছাড়ছে?

ধোঁয়া। জনহীনতার রাজ্যে ধোঁয়া? ধোঁয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে অগ্নি। এবং অধিকাংশ অগ্নির সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে মানুষ। মানিক আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি একটা জিনিস তুলে জয়ন্তর চোখের সামনে ধরলে।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, একটা আধ-পোড়া 'কাঁচি' সিগারেট, তখনো তার আগুন নেবেনি।

দুজনেই বুঝলে, শত্রু একটু আগেই এখান দিয়ে চলে গিয়েছে এবং খুব কাছেই কোথাও আছে—হয়ত আড়ালে গা ঢেকে তাদেরই গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

দুই বন্ধুর সন্দিগ্ধ ও সতর্ক চক্ষু চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল—কিন্তু কোথাও কারুর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, 'এখন কী করবে?'

জয়ন্ত তেমনি স্বরে বললে, 'বাড়ির ভিতরে ঢুকব।'

—'শত্রু আছে জেনেও?'

—'আমরা তো এখানে বন্ধুদের সঙ্গে খোশ-গল্প করতে আসিনি! যত শীঘ্র শত্রুর দেখা পাওয়া যায় ততই ভালো।'

—'তা বটে।'

বন্দুক দুটো তারা পিঠের উপরে বাঁধলে। তারপর 'বেল্ট' থেকে রিভলভার খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে-টিপে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

একটা বুক-চাপা ভয়ানক নীরবতায় সেই বিশাল অট্টালিকার ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। খানিক দূর এগিয়ে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড এক উঠান—তার ভিতরে বোধহয় দুই হাজার লোকের স্থানসঙ্কুলান হয়। উঠানের চারিদিকে সারি সারি থাম ও দালান এবং দালানের পরেই চক-মিলানো ঘর। উঠানের সর্বত্রই বড় বড় ঘাস ও আগাছার ঝোপ। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণ নেই—কেবল গাম্ভীর্য গম্-গম্ করছে,—সে যেন মৃত্যুপুরীর গাম্ভীর্য! দেউড়িতে এইমাত্র সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা না দেখলে জয়ন্ত ও মানিক কিছুতেই সন্দেহ করতে পারত না যে, এই নিদ্রিত অট্টালিকার ত্রিসীমানায় বহু বৎসরের মধ্যে কোনো জ্যান্ত মানুষের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার নির্জনতা যেন ভৌতিক,—বুকের রক্ত জমে যায়, গা ছম্-ছম্ করে, পা এলিয়ে পড়ে। অসহনীয়!

মানিক ফিস-ফিস করে বললে, 'এই বিশালতার মধ্যে আমরাই হারিয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে! এর মধ্যে কোন দিকে কাকে আমরা খুঁজব?'—তার সেই অতি মৃদু গলার আওয়াজও সেই নিঃসাড় পুরীর মাঝখানে উচ্চকণ্ঠের গর্জনের মতো শোনালো।

জয়ন্ত আরো খাটো গলায় মানিকের কানে কানে বললে, 'কিন্তু খুঁজতে হবেই। এস, আগে একতলার সব ঘরেই একবার করে উঁকি মেরে আসি,—তারপর দোতলা, তারপর তেতলা।'

তারা একে-একে প্রত্যেক ঘরে খুব সন্তর্পণে ঢুকে পরিদর্শন আরম্ভ করলে। ঘরে ঘরে বাস করছে যুগ-যুগান্তের ধূলা ও সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। একটা ঘরের কোণ থেকে সাপ ফোঁস করে উঠল। প্রত্যেক ঘরের দরজাই খোলা।

মানিক বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির একতলা ঘরে মানুষ থাকতে পারে না, মানুষের মন এখানে কুঁকড়ে পড়ে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমরা খুঁজছি সেই সব অমানুষিক মানুষকে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যাদের ভূতের চেয়ে কম ভয় করে না। ভালোমানুষের প্রাণ যারা মাটির খেলনার মতো ভেঙে ফেলতে পারে, এমন জায়গায় এলে তারা হয়ে ওঠে খুব বেশি খুশি।'

ডানদিকের দীর্ঘ দালানের শেষ ঘরটায় দরজার বাইরে থেকে শিকল তোলা ছিল। শিকল নামিয়ে মানিক প্রথমেই ঘরের ভিতরে ঢুকল, এবং তার পরমুহূর্তেই চমকে বাইরে বেরিয়ে এল, তার মুখ একেবারে সাদা।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে মাথাটা একবার গলিয়ে দিলে।

ধূলিধূসরিত মেঝের উপরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়টা মানুষের মূর্তি।

দশম পরিচ্ছেদ

জীবনহারা জীবন্তের দল

যে ছয়টা বিভীষণ মূর্তির জন্যে চতুর্দিকে এমন হুলুস্থূল বেধে গিয়েছে, এই আধা-আলোয় ও আধা-অন্ধকারে তারাই শুয়ে আছে পাশাপাশি।

কিন্তু ওরা জেগে, কি ঘুমিয়ে? ওরা তাদের সাড়া পেয়েছে, কি পায়নি? আর অমন আদুড় মাটিতে, ধুলো-জঞ্জালেই বা ওরা শুয়ে আছে কেন? ওরা মটকা মেরে পড়ে নেই তো?

অসম্ভব নয়! এই ছয়টা মূর্তির প্রকৃতি যে হিংস্র, প্রথম দিনেই আলিনগরে এসে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ছয় চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই যে কত বেশি চালাক, প্রান্তর-সমুদ্রে তারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এদের কাছে জয়ন্তদের দুই-দুইবার পরাজিত হতে—এমনকি প্রায় গালে চুন-কালি মাখতে হয়েছে। তারাই এত সহজে এত অসহায়ভাবে ধরা দিতে রাজী হবে? এদের এই চুপ করে শুয়ে থাকা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

জয়ন্ত ও মানিক বাইরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবতে লাগল। এক দুই করে ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল। এই অসম্ভব নিস্তব্ধতার মুল্লুকে মূর্তিদের কেউ পাশ ফিরলেও তারা সেটা টের পেত, কিন্তু ঘরের ভিতরে কোনো সাড়া নেই—একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না। যদি তাদের জন্য কোনোরকম ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে, তবে এ কি-রকম ফাঁদ? ওরা ছয়জন, তারা দুইজন মাত্র ; তবু ওরা আক্রমণ করবার জন্যে একটু উস্‌খুস্‌ পর্যন্ত করছে না কেন?

জয়ন্ত রিভলভারটা ধরে দরজার পাশ দিয়ে ধীরে ধীবে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে আবার চট্‌ করে দেখে নিলে।

তারা ঠিক তেমনিভাবেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। তবে কি সত্যিই তারা ঘুমুচ্ছে? কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কই? দুষ্টুমি করে তারা কি দম বন্ধ করে আছে? কিন্তু দম বন্ধ করে মানুষ আর কতক্ষণ থাকতে পারে?

আরো মিনিট পাঁচেক পরেও তারা তেমনিভাবেই রইল দেখে জয়ন্ত নিজের মুখখানা ভিতরে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। তখনো মূর্তিগুলোর সেই ভাব। শেষটা যা থাকে কপালে ভেবে সে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকল এবং মানিকও সাহস সঞ্চয় করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—

এবং প্রথমেই যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হচ্ছে এই ঃ

একটা মূর্তি ড্যাব্-ড্যাব্ করে তাদের পানে নিষ্পলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

জয়ন্তর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল! মানিক রিভলভারের ঘোড়া টিপে দেয় আর কি, —কিন্তু জয়ন্ত তার হাত চেপে ধরে মৃদু স্বরে বললে, 'অন্য মূর্তিগুলোর চোখ দেখ!'

কোনো মূর্তির চোখ আধ-খোলা, কোনো মূর্তির চোখ একেবারে মোদা। ... যে মূর্তিটা পুরো চেয়ে আছে, তারও চোখে কোন ভাব নেই।

—'জয়! জয়!'

—'মানিক, এগুলো মড়া!'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে একে-একে মূর্তিগুলোর বুকে হাত দিয়ে দেখলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো লক্ষণ নেই। গা কাঁচের মতো ঠাণ্ডা।

—'কিন্তু মানিক, কী করে এরা মরল? কে এদের মারলে?'

—'জয়, ডানদিকের ঐ মূর্তিটার কপালের উপরে তাকিয়ে দেখ!'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'হুঁ, বুলেটের দাগ। এখনো শুকোয়নি, দাগটাও নতুন নয়।'

—'তবে কি অমিয়বাবুদের বুলেটের এই কীর্তি?'

—'হতে পারে। কিন্তু কপালে অমনভাবে গুলি খেয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?—আরে আরে, এই যে! এ মূর্তিটারও পেটে একটা ছ্যাঁদা—এখানেও বুলেট ঢুকেছে! আর, এটারও পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি। হুঁ, এই মূর্তিটাই তাহলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত,—পায়ের দাগ দেখেই আমি যা ধরতে পেরেছিলুম। কিন্তু বাছারা, কে তোমরা? বন্দুকের বুলেট খেয়েও তোমরা মরো না—বড়-জোর খুঁড়িয়ে হাঁটো, কিন্তু আজ তোমরা পটল তুলেছ কেন?'

—'দেখ জয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐ-সব বুলেটই ঐ তিনটে লোকের মৃত্যুর কারণ, তাহলে বাকী তিনটে লোক মরল কেন? ওদের গায়ে তো দেখছি একটা আঁচড় পর্যন্তও নেই। কিসে ওরা মরেছে? বিষে? কেউ বিষ দিয়েছে, না ওরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে?'

—'মানিক, এদের কারুর দেহেই বিষের কোনো লক্ষণ নেই। এদের কেউ কোনো উপায়ে হত্যা করেছে বলেও মনে হচ্ছে না। এরা এসে যেন পাশাপাশি শুয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্ত আর শান্তভাবে মৃত্যুঘুমে ঢলে পড়েছে। অথচ এরা যে পরশু রাত পর্যন্ত বেঁচে ছিল সে প্রমাণও রয়েছে—অবশ্য যদি মানা যায় যে পরশু রাতে এরাই মেয়েচুরি আর খুন করেছিল। এমন বিচিত্র ব্যাপার আমি কখনো কল্পনা করিনি—এমন আশ্চর্য মৃত্যুও কখনো দেখিনি! মানিক, স্বীকার করতে লজ্জা নেই—মনের মাঝে আমি ভয়ের সাড়া পাচ্ছি। ভবতোষ মজুমদারের বজরায় আমরা জ্যান্ত মড়া দেখেছিলুম, কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার, তার মধ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু এ কী কাণ্ড! বুলেট খেয়ে এরা মরে না, অথচ আজ অকারণেই এখানে এসে মরে পড়ে রয়েছে। মানুষের রক্ত-মাংস বুলেটকে অগ্রাহ্য করে, এটাই বা কী অস্বাভাবিক কথা!'

মানিক মূর্তিগুলোর উপরে আর একবার শিউরে-ওঠা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'জয়, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, এ মড়াগুলো কি অনেক দিনের পুরানো পচা মড়া বলে মনে হয় না? এই ঘরের ভিতরে কি একটা কবরের ভাব আড়ষ্ট হয়ে নেই? এখানকার বাতাসেও যেন পচা মড়ার দুর্গন্ধ। আমার দেহ কেমন-কেমন করছে, আমার বমন করবার ইচ্ছে হচ্ছে—চল জয়, এই কবরের বিভীষিকার ভিতর থেকে পালিয়ে যাই!'

আচম্বিতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল।

জয়ন্ত ও মানিক চমকে ফিরে দাঁড়াল এবং ঘরের ভিতরে এক পা বাড়িয়ে আবির্ভূত হলো নবাবের সুদীর্ঘ মূর্তি—কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'মানিক—মানিক!—এস আমার সঙ্গে'—বলতে বলতে জয়ন্ত ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো।

তারা বাইরে বেরিয়ে দেখলে, নবাব তখন দালানের উপর দিয়ে ছুটছে।

—'মানিক, ওকে কিছুতেই আর পালাতে দেওয়া হবে না, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তবু ওকে ধরতেই হবে!'

নবাব হঠাৎ বাম দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হলো। জয়ন্ত সেখানে গিয়েই পেলে প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি—দুম্‌-দাম্‌ পায়ের শব্দে বুঝলে নবাব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। তারাও এক-এক লাফ মেরে দুই-তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে দোতলার দালানে। নবাব আবার এক জায়গায় গিয়ে অদৃশ্য হলো—সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌-দুম্‌ করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

সেইখানে গিয়ে পড়ে মানিক বললে, 'এখন উপায়?'

—'উপায়? মিছেই কি আমি ব্যায়াম করি—ছয়-সাত মণ ওজনের মাল তুলে ছুঁড়ে ফেলে দি?'

মানিক দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করলে—দরজা একটু কাঁপলও না। হতাশভাবে বললে, 'এ দরজা ভাঙতে গেলে হাতি আনতে হবে।'

—'কিছুই আনতে হবে না, আমার মাংসপেশীর জয় হোক'—বলেই জয়ন্ত দরজার উপরে পিঠ রেখে দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে এক-বার, দু-বার, তিন-বার। দড়াম করে খুলে গেল দরজা—সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে পড়ে গেল।

মানিক একলাফে জয়ন্তর দেহ টপকে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলে, নবাব একটা গরাদ-ভাঙা জানলা দিয়ে গলে বাইরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

মাটির উপরে লম্বমান অবস্থাতেই জয়ন্ত মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে, 'দেহের নিচের দিকে গুলি কর মানিক! লাফ মারলে আর ওকে পাব না!'

জয়ন্তর মুখের কথা শেষ হবার আগেই মানিকের রিভলভার গর্জন করে উঠল। বিকট আর্তনাদ করে নবাব জানলা ছেড়ে ঘরের ভিতরে বসে পড়ল।

জয়ন্ত ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ও মানিক এগিয়ে গিয়ে নবাবের দুই পাশে স্থান গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, এর মাথা টিপ করে রিভলভার ধরে থাকো। আমি এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দি'। এ একটু বাধা দিলেই রিভলভার ছুঁড়বে।'—জয়ন্ত হাতকড়া বার করলে, নবাব ভালোমানুষের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

মানিকের রিভলভারের গুলি লেগেছিলো নবাবের উরুর পাশে। সেখান থেকে দরদর ধারে রক্ত ঝরছে।

তার ক্ষতটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, 'না, ভয় নেই। এ মরবে না।...তারপর নবাব, এইবারে তোমার নবাবির খবর বলো!'

তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে—ঘরের ভিতরে একটু একটু করে আসন্ন রাত্রির আভাস জেগে উঠছে। বাহির থেকে গাছের পাতারা তাদের মর্মর-বার্তা প্রেরণ করছে, তা ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

—'কী হলো নবাব, তুমি চুপ করে রইলে কেন?'

নবাবের সেই সাপের মতো নির্দয় চক্ষে এতক্ষণ পরে আবার আগুন ফিরে এলো। সে একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের রৌদ্রহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর জয়ন্ত ও মানিকের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সহজ ও শান্ত স্বরেই বললে, 'তোমরা কী জানতে চাও?'

—'তুমি মেয়েদের চুরি করে লুকিয়ে রেখেছো?'

—'জানি না।'

—'জানো না?'

—'না।'

—'এখানে তুমি কী করো?'

—'জানি না।'

—'তোমার ঐ ছয় স্যাঙাৎ মরলো কেন?'

—'জানি না।'

—'অর্থাৎ তুমি কিছুই বলবে না?'

—'না।'

—'আমি এখনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তোমার চিবুকের তলায় ধরবো—ধীরে ধীরে তোমার দেহের মাংস পোড়াবো।'

—'পোড়াও, তবু কিছু বলবো না।'

—'আচ্ছা, আগে তো তোমায় নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটক করি, তারপর তোমার মুখ খোলবার ভালো ব্যবস্থাই করবো।'

—'একবার তো সে চেষ্টা করেছিলে। পেরেছিলে কি?'

—'ও, ভাবছো আবার তুমি পালাবে? বেশ, দেখা যাবে। এখন তো আমার সঙ্গে চলো।'

—'আমি এখান থেকে যাবো না।'

—'যাবে না? তোমার ঘাড় যাবে! আমরা তোমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবো!'

নবাবের দুই চক্ষু দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। জয়ন্তের দিকে চেয়ে অগ্নিবৃষ্টি করে সে বললে, 'তুমি আমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবে? লাথি মারতে মারতে? পারবে না!'

—'দেখবে, পারি কি না?'

নবাব আর জবাব দিলে না। হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসেছিল। সেই অবস্থায় তার দেহ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠলো, তার অগ্নিবর্ষী চক্ষু দুটো মুদিত হয়ে গেলো,—তাকে দেখলেই মনে হয়, ধ্যানমগ্ন নিষ্কম্প এক প্রতিমূর্তি!

মানিক হেসে ফেলে বললে, 'এ আবার কী নতুন ঢঙ!'

জয়ন্ত বললে, 'জানোই তো প্রবাদ আছে—"দুরাত্মার ছলের অভাব নেই!" নবাব বাহাদুরের কালো আলখাল্লার তলায় কতো কলাকৌশল লুকানো আছে, কে তা জানে? বিড়াল আহ্নিকে বসেছেন, বোধহয় আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে!'

কিন্তু সে-সব কথা যে তার কানে ঢুকলো, নবাব তেমন কোনই ভাব প্রকাশ করলে না। তার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তখন যেন লুপ্ত হয়ে গেছে—কেবল থেকে থেকে তার কপালের উপরের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। ওদিকে তার আহত উরু দিয়ে রক্ত ঝরে যে কাপড় ও ঘরের ধুলো ভিজিয়ে আরক্ত করে তুলছে, নবাবের সে খেয়াল পর্যন্ত নেই। যন্ত্রণাও তার হচ্ছিলো নিশ্চয়, কিন্তু তার মুখে যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই ফুটে ওঠেনি!

মানিক জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো। জানলার ঠিক তলাতেই রয়েছে বালির স্তূপ। সেইদিকে জয়ন্তর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললে, 'জয়, নবাবটা কি রকম ধড়িবাজ দেখ! এখান থেকে বা তিনতলা থেকেও ঐ বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবার কোনো ভয়ই নেই। বিপদের সময়ে পালাবার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তবু সে পালাতে পারলে না, তোমার দেহের অদ্ভুত শক্তির জন্যে।'

—'আর তোমার রিভলভারের জন্যে।'

—'কিন্তু আর কতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবাবের ভণ্ডামি দেখবো? আধঘণ্টার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, নবাবকে এইবার জাগাও!'

কিন্তু তাকে আর জাগাতে হলো না, সে নিজেই আবার চোখ খুলে বললে, 'তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও? পারবে না।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে বললে, 'ওহো হো, তুমি বুঝি ধ্যানদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে যে তোমাকে এখান থেকে সরাবার শক্তি আমাদের হবে না?'

নবাবও দ্বিগুণ জোরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'তোমরা পারবে না—পারবে না! আমাকে এ-ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না! জানো, তোমরা কার সঙ্গে লাগতে এসেছো? আমাকে গুলি মেরে জখমই করো আর আমার হাতে হাতকড়িই পরিয়ে দাও, তবু আমি হবো তোমাদের প্রভু! পৃথিবীর কোনো সম্রাটের যে-শক্তি নেই, আমার বুকে আছে সেই বিপুল শক্তি! মানব-দানব-ভূত-প্রেত—আমার আজ্ঞা পালন করবে সবাই। আমি এই মৃত আলিনগরের একচ্ছত্র সম্রাট, এখানে আমার উপরে আর কারুর আজ্ঞা চলবে না, তোমাদেরও জীবন-মরণ এখন আমারই হাতে। তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, পারবে না, পারবে না! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—' তার ভীষণ ও অলৌকিক অট্টহাস্য সেই সুবিশাল মৃত্যু-প্রাসাদের মহাস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রত্যেক খিলানে খিলানে গিয়ে যেন আছড়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো,—ঘরের ছাদের তলা থেকে শয়তানের অভিশাপের মতোন কালো একঝাঁক বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকার দিয়ে বোনা ডানা ঝট্‌পট্ করে জানলা দিয়ে গলে বাইরে উড়ে গেলো, কোথায় শুয়ে শুয়ে জুতোর কালির চেয়ে কালো একটা বিড়াল বোধহয় ঘুমোচ্ছিল, অট্টহাসির ঘটায় জেগে উঠে দরজার কাছে এসে আগুনচোখে একবার ভিতরে উঁকি মেরে তীক্ষ্ণস্বরে একবার ম্যাও বলে প্রতিবাদ জানিয়েই আবার ছুটে পালালো।

হঠাৎ তার মূর্তির এতো পরিবর্তন হয়েছে যে নবাবের দিকে তাকালেও এখন বুক ধুকপুক করে ওঠে! আচম্বিতে তার এই ভাবান্তরের, এই আস্ফালনের কারণ কী? জয়ন্ত মনের ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ; কিন্তু তখনি জোর করে সেই ভাবটা দমন করে সে ধমকে বলে উঠলো, 'নবাব, তোমার ও বিদঘুটে হাসি থামাও!'

নবাব তার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, 'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় জীবনহারা জীবন্তের দল! সূর্যের চোখ কানা হয়েছে, দিনের আলো নিবে গেছে, বাদুড়ের ঘুম ভেঙেছে, কালো বিড়াল জেগেছে, কবরের দরজা খুলেছে,—এইবারে তোরাও উঠে দাঁড়া, গোরস্থানে আলো জ্বাল, নরকের ফটকে সন্ধ্যাবাতি দে! ঝরে পড়ুক তোদের গায়ের ধুলো, জাগুক তোদের বুকে বুকে রক্ততৃষ্ণা, দুলুক তোদের গলায় গলায় নরমুণ্ডমালা! রাত তোদের ডাকছে, শ্মশান তোদের ডাকছে, আমি তোদের ডাকছি! ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় প্রাণহারা মহাপ্রাণীর দল!'

জয়ন্ত সক্রোধে মাটির উপরে পদাঘাত করে বললে, 'মানিক, মানিক, আমরা কি এখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনবো? ঐ বদমাইসটার ঝাঁকড়া চুল ধরে মাটি থেকে টেনে তোলো তো দেখি, ও আমাদের সঙ্গে যায় কিনা?'

কিন্তু জয়ন্তের কথা মানিকের কানে ঢুকলো না, সে তখন কান পেতে আর একটা শব্দ শুনছিলো। একতলায় সমতালে পা ফেলে কারা চলছে! ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! যেন শিক্ষিত সৈন্যদলের পদশব্দ! ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! যেন কাদের পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনার শব্দ! জয়ন্তেরও মুখ সাদা হয়ে গেলো। তালে তালে সেই পদশব্দ সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উপরে উঠছে।

নবাব আবার ডাক দিলে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় সজীব মৃত্যুর দল! আয়, আয়, আয়, আয়!'

ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! শব্দ ক্রমেই নিকটস্থ হচ্ছে।

মানিক ছুটে দরজার কাছে গেলো। মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সিঁড়ি পার হয়ে প্রথমে যে মূর্তিটা আবির্ভূত হলো, তার কপালে সেই বুলেটের দাগ। তার পিছনেই দেখা দিলো আর এক মূর্তি।

যেটুকু দেখলে তাই-ই যথেষ্ট! খানিক আগে একতলার কোণের ঘরের সেই তাপহীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহগুলোর মধ্যেই মানিক এদের দেখে এসেছে। দ্বিতীয় মূর্তির পিছনে যখন আবার একটা মূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দালানের উপরে এসে উঠলো, মানিক বেগে সেই জানলার কাছে দৌড়ে এসে বললে, 'জয়, জয়! বাইরে লাফিয়ে পড়ো! সেই মড়াগুলো জ্যান্ত হয়েছে!'

নবাব হাঁকলে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় কবরবাসীর দল!'

ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্! দরদালান দিয়ে বাঁধাতালে পা ফেলে তারা এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে, আরও এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেও তারা কেউ যেন বেতালে পা ফেলবে না,—কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই সেই মৃত্যুচরের দল কাছে—আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুক ওরা! আমি ওদের ভয় করি না!'

মানিক তাড়াতাড়ি জয়ন্তের হাত ধরে জানলার দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'জয়, দুঃসাহসেরও সীমা আছে! মনে রেখো, বন্দুকের বুলেটও ওদের গতিরোধ করতে পারে না! ঐ ওরা এসে পড়লো! শিগগির লাফ মারো!

নবাব এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো—মুখে তার নিষ্ঠুর হাসি কিন্তু মানিক তৎক্ষণাৎ তার এক পা লক্ষ্য করে আবার রিভলবার ছুঁড়লে, বিকৃত মুখে নবাব তীব্র চীৎকার করে আবার ভূতলশায়ী হলো।

প্রথমে জয়ন্ত, তারপরে মানিক জানলা গলে নিচেকার বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লো। তখনো একেবারে অন্ধকার হয়নি। শেষ আলোর শিখারা তখনো আকাশে আঁধারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

জয়ন্ত ও মানিক কোনদিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর পথে ছুটলো।

ছুটতে ছুটতে মানিক একবার পেছন ফিরে দেখলে, দোতলার ভাঙা জানলায় মুখ বাড়িয়ে আছে কতকগুলো রক্তশূন্য সাদা মূর্তি।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—'জয়! আরো জোরে—আরো জোরে ছোটো!'

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষে অমানুষে যুদ্ধের আয়োজন

এদিকে ফাঁড়ির সবাই ভেবেই অস্থির।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সকলে যখন জয়ন্ত ও মানিকের দেখা পেলো না তখন মনে করলে, তারা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, যথাসময়েই ফিরবে।

কিন্তু যথাসময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো—কোথায় জয়ন্ত আর কোথায় মানিক!

সুন্দরবাবু মত প্রকাশ করলেন, 'ও দুই ছোকরাই অত্যন্ত বারফটকা! হুম্, এতো যে সাত-ঘাটের জল খেয়ে মরিস, তবু কি বেড়াবার শখ মিটলো না? আরে এ পোড়া দেশে দেখবার আছে কী?'

একটু বেশি বেলা করেই সেদিন দুপুরের খাওয়া শেষ করা হলো। তবু তাদের দেখা নেই।

বৈকালী চা-পানের সময় এলো।

অমিয় একবার জয়ন্ত ও মানিকের মোটঘাট নাড়াচাড়া করে বললে, 'জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই বেরিয়েছেন দেখছি। তাঁদের রসদের ব্যাগ দুটোও নেই। তবে কি তারা আলিনগরেই গিয়েছেন?'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, বলো কী? সেই যমালয়, যেখানে যমদূতেরা হানা দিয়ে ফিরছে, সেইখানে তারা দুটো প্রাণী গিয়ে কী করতে পারবে?'

পরেশ ও নিশীথ বললে, 'অমিয় বোধহয় ঠিক আন্দাজ করেছে। নইলে এতক্ষণে তাঁরা ফিরে আসতেন।'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাদের ফেরবার আশা ছেড়ে দাও! আর তারা ফিরছে না!'—এই বলে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কারুর সঙ্গে আর একটা কথাও কইলেন না।

সন্ধ্যা এলো। রাত হলো। সকলেরই মন খারাপ। মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ টেবিলের ধারে বসে চুপিচুপি পরামর্শ করছেন। সুন্দরবাবু মুড়ি দিয়ে সেইভাবেই পড়ে আছেন।

রাত্রের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হলো। অমিয় ডেকে বললে, 'উঠুন সুন্দরবাবু, খাবেন আসুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আমি খাবো না। জয়ন্ত আর মানিক বেঁচে নেই। আমার মন-কেমন করছে। আমার গলা দিয়ে খাবার গলবে না।' তাঁর গলা ধরা ধরা। বোধহয় মুড়ি দিয়ে কাঁদছেন।

মহম্মদ বললেন, 'আপনি না পুলিশে কাজ করেন! এতো সহজে কাবু হয়ে পড়লেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'পুলিশে কাজ করি বলে কি আমি মানুষ নই? আমার প্রাণ পাথর? আমি খাবো না।'

মহম্মদ বললেন, 'শুনুন সুন্দরবাবু। পরামর্শ করে ঠিক হলো যে কাল সকালেই আমরা সদল-বলে আলিনগরে যাত্রা করবো। সদর থেকে হুকুমও এসেছে। দু-দিন পরেই যেতুম, কিন্তু যে-রকম ব্যাপার দেখেছি, আর দেরি করা চলে না।'

সুন্দরবাবু উঠে বসলেন, 'ঠিক বলছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু জয়ন্ত আর মানিককে কি পাওয়া যাবে? আলিনগর ভূতের রাজ্য!'

—'সুন্দরবাবু, ভূত-টুত সব বাজে কথা! কোনো বদমাইস ভূতের ভয় দেখায়। জয়ন্তবাবু বোকা নন—আত্মরক্ষা করতে জানেন।'

—'হুম্! সে বোকা নয় বটে, কিন্তু গোঁয়ার। তাই তার জন্যে ভয় হয়।'

—'কোনো ভয় নেই। আপনি খেতে বসুন।'

—'হুম্, আচ্ছা! দুটো খাবার মুখে দি' তাহলে। কিন্তু কাল সকালেই যাচ্ছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কতো লোক নেবেন?'

—'আমরা পাঁচজন তো আছিই, আরো জন-বারো চৌকিদারও যাবে।'

—'জন-বারো? জন-চব্বিশ নেওয়া উচিত!'

—'তাহলে আরো দু-দিন অপেক্ষা করতে হয়। আপাতত অতো লোক নেই।'

—'না, না, অপেক্ষা নয়—ঐ জন-বারোতেই হবে।'

আহারাদির পর আরো খানিকক্ষণ পরামর্শ চললো। তারপর রাত বারোটা বাজলো দেখে মহম্মদ উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই সময় ফাঁড়ির দরজায় একখানা মোটর সশব্দে এসে দাঁড়ালো। মহম্মদ বিরক্ত-স্বরে বললেন, 'এত রাত্রে কে আবার 'কেস' নিয়ে জ্বালাতে এলো?'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো—দু'জনের পায়ের শব্দ।

সুন্দরবাবু তার বিপুল ভুঁড়ির ভার ভুলে গিয়ে শূন্যে এক লাফ মারলেন। মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, 'ও, পায়ের শব্দ আমি চিনি! জয়ন্ত আর মানিক আসছে!'

তারাই বটে। গায়ে, কাপড়-চোপড়ে ধুলো আর কাদা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কিন্তু মুখে প্রচণ্ড উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য।

সুন্দরবাবু একসঙ্গে তাদের দু'জনকে চেপে ধরে বললেন, 'আঃ, বাঁচলুম! কী ভাবনাটাই না হয়েছিলো, হুম্!'

মহম্মদ বললেন, 'কোথায় ছিলেন আপনারা। আমরা যে কাল সকালেই আপনাদের খুঁজতে আলিনগরে যাচ্ছিলুম!'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'কাল সকালে? না না, নবাবকে যদি ধরতে চান, আজ, এখনি চলুন!'

—'তার মানে?'

—'নবাবের 'আড্ডা' আমরা আবিষ্কার করেছি, মানিকের দুই গুলিতে তার দুই-পা খোঁড়া হয়ে গেছে, এমনকি নবাবের হাতেও আমরা হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এসেছি—দেরি করলে সে হয়তো সরে পড়বে।'

মহম্মদ বললেন, 'এতোই যখন করেছেন, তখন দয়া করে নবাবকে ধরে আনলেন না কেন?'

—'ধরে আনলুম না কেন'—বলেই জয়ন্ত থেমে গেলো। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে শায়িত সেই ছয়টা মৃতদেহ। নিরালা, নীরব, নির্জন অট্টালিকার ধাপে-ধাপে সেই ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ্ করে জ্যান্ত মড়ার অলৌকিক পদশব্দ আবার যেন সে শুনতে পেলে স্বকর্ণে!—থেমে থেমে বললে, 'মহম্মদ সাহেব, বলতে পারেন, মড়া কখনো বাঁচে?'

—'মড়া?'

—'হ্যাঁ, ছয়টা মড়া আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিলো। তাই নবাবকে আনতে পারিনি। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

—'কী বলছেন!'

—'মানিককে জিজ্ঞাসা করুন! আমি খালি পায়ের শব্দ পেয়েছি, মানিক স্বচক্ষে দেখেছে।'

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আমরাও তাদের দেখেছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আমার কথাই সত্যি হলো। কাঙালের কথা বাসি হলে টিকে!'

মানিক বললে, 'আপনি কাঙাল নন সুন্দরবাবু, তিনশো টাকা মাইনে পান।'

সুন্দরবাবু রেগে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মানিক! এখন ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না!'

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'এর ভিতরে নিশ্চয় কোনো কারসাজি আছে। মড়া আক্রমণ করে? অসম্ভব!'

—'বেশ তো, এখনি দলবল নিয়ে চলুন না।'

—'তাও হয় না। যেতে হলে বড়ো বড়ো মোটর চাই। মোটর কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না।'

জয়ন্ত নাচারভাবে বললে, 'তাহলে কাল সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করি, কী আর করবো!'

পরিত্যক্ত আলিনগরের প্রাচীন পথ ধরে দুখানা সাধারণ মোটরগাড়ি ও একখানা মোটর-বাস অগ্রসর হচ্ছে। জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু ছিলেন একখানা 'টু-সীটারে', জয়ন্ত নিজেই তার চালক। তার পরের গাড়িতে আছেন মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ। 'বাসে' আছে বারজন চৌকিদার, ড্রাইভারদের নিয়ে মোট একুশজন লোক।

জয়ন্তের মতে একুশজন লোকই যথেষ্ট। সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করে বললেন, 'মোটেই যথেষ্ট নয়! হানাবাড়িতে একশো জন লোকও যথেষ্ট নয়! হুম্! একটা ভূত দেখা দিলে একশো জনের একজনেরও আর দেখা পাওয়া যাবে না! আর, এখানে একটা নয়—ভূত আছে নাকি ছয়-ছয়টা! বাপ্‌রে!'

মানিক বললে, 'একজনেরও দেখা পাওয়া যাবে না? তাহলে আপনিও কি পালাবেন?'

—'পালাবো না তো কি, নিশ্চয় পালাবো। আমি হচ্ছি পুলিশ, আমি ভূতের রোজা নই ; ভূত দেখলে পালাবো না তো কি দাঁড়িয়ে থাকবো?'

—'তবে আপনি এলেন কেন?'

—'সেই ছয়টা লোক তো ভূত নাও হতেও পারে? হয়তো তোমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে! বিশেষ, এটা দিন-দুপুর। কে না জানে, দিন-দুপুরে ভূত বড়ো একটা দেখা দেয় না।'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'কেন সুন্দরবাবু, আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য শোনেননি?'

—'কী শাস্ত্রবাক্য?'

—'ঠিক দুপুর-বেলা, ভূতে মারে ঢেলা?'

—'হুম্! আবার ঠাট্টা হচ্ছে?'

গাড়িগুলো গোরস্থানে এসে উপস্থিত হলো। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'এখানেই সকলকে নামতে হবে।'

সকলে একে-একে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একসঙ্গে এতো লোকের ভিড় হতভাগ্য আলিনগর অনেক কাল দেখেনি। পথের উপরে শুয়ে একটা গোখরো সাপ নিশ্চিন্ত মনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিলো, সে তাড়াতাড়ি ফোঁস করে ফণা তুলে উঠেই কালো বিদ্যুতের মতো চকিতে একখানা পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

চারিদিকে তাকিয়ে মহম্মদ বললেন, 'এমন জায়গা কখনো দেখিনি! নগর বললেই লোকের মনে জেগে উঠে জনতার দৃশ্য। কিন্তু জনতাহীন—জলশূন্য সাগর! চারিদিকে খালি ভাঙা বাড়ি আর ঘুঘুর কান্না। দিনের বেলাতেই এখানে বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে ওঠে! এখানে একলা এলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক!'

জয়ন্ত অল্প হেসে বললে, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন, আমরাও রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি? কিন্তু এইটেই আপনার ভ্রম। এই পথে আসুন।'

গোরস্থানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মহম্মদ বললেন, 'কিন্তু একটা কিছু গোলমাল আছেই আছে, আপনারা যা দেখেছেন তা ভূতের চেয়েও আশ্চর্য। জ্যান্ত মড়ার কল্পনাও আমি করতে পারছি না!'

মানিক বললে, 'তারা যদি এখানে থাকে, তাহলে আপনিও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।'

জয়ন্ত বললে, 'অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়েছে। তারা কি আর এখানে আছে?'

সেই বিশাল অট্টালিকার বিবর্ণ উচ্চ চূড়া চতুর্দিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলে সেই বাড়ির যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সুন্দরবাবু একটু একটু করে ততোই পিছিয়ে পড়ছেন। ক্রমে তিনি চৌকিদারের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, পিছিয়ে থাকলে ভূতের আবির্ভাব হলে সর্বাগ্রে তিনিই দৌড় মারতে পারবেন।

মহম্মদ বললেন, 'অতো বড়ো বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে একশোজন লোকের দরকার।'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ি ঘেরাও করে যখন কোনো লাভ নেই, তখন ভিতরের উঠানে চৌকিদাররা অপেক্ষা করুক। আমরা ডাকলেই তারা যেন ছুটে আসে।'

সুন্দরবাবু মনে মনে বললেন, 'তারাই ছুটে আসবে বটে! ছুটে আসবে, না ছুটে পালাবে? ভূতের সঙ্গে লড়বে এই তালপাতার সেপাইরা! হুম!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হুম্-হুম্-হুম্-হুম্

সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। এতগুলো জুতোর শব্দে অট্টালিকাবাসী নির্জনতা যেন চম্‌কে উঠলো সবিস্ময়ে।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবলো, নবাব যদি এখনো এখানে থাকে, তাহলে এ পায়ের শব্দগুলো সেও শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

আর সেই জ্যান্ত মড়াগুলো? তারাও কি এখন উৎকর্ণ হয়ে তালে তালে পা ফেলে আক্রমণ করতে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে না?

সুন্দরবাবু মনে মনে ভাবছেন, এবারে তো খাঁচার ভিতরে ইঁদুরের মতো বাড়ির ভিতরে বন্দী হলুম। কোন্ দিক দিয়ে ভূত এলে কোন্ দিক দিয়ে পালানো উচিত, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। আর চৌকিদারদের সঙ্গে থেকে কোনো লাভ হবে না, এদের হাতে বন্দুক নেই! ...তিনি দৌড়ে মহম্মদের সঙ্গ নিলেন।

জয়ন্ত সর্বাগ্রে একতলা দালানের সেই কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। চারিদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে হতাশভাবে বললে, 'তাঁরা এখানে নেই।'

সুন্দরবাবু আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন,—'তারা নেই, বাঁচা গেছে। আপদ বিদেয় হয়েছে!'

মহম্মদ বললেন, 'আপনি ঘর ভুল করেননি তো?'

জয়ন্ত বললে, 'না। ঐ দেখুন।' বলেই সে 'টর্চ' টিপে মেঝের উপরে আলো ফেললে। মেঝের উপরে পুরু ধুলো। আর ধুলোর উপরে পাশাপাশি ছয়টা দেহের পরিষ্কার ছাপ।

মানিক বললে, 'এ-ঘরে মড়াগুলো ছিলো ঠিক মড়ারই মতো। তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি, নাকে হাত দিয়ে দেখেছি।'

মহম্মদ খালি বললেন, 'আশ্চর্য!'

সুন্দরবাবু সকলের পিছন থেকে উঁকি মেরে দেহের ছাপগুলো একবার দেখেই শিউরে উঠে বললেন, 'হুম্! আমার নাকে পচা মড়ার গন্ধ আসছে!'

মানিক বললে, 'সত্যি সত্যিই সেদিন এখানে মড়া-পচা গন্ধ ছিলো।'

মহম্মদ বললেন, 'সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি বেশি। আমি কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'চৌকিদারদের উঠানের সব ঘর খুঁজে দেখতে বলুন। ততক্ষণে আমরা উপরটা ঘুরে আসি। কিন্তু বোধহয় মিথ্যা ঘোরাঘুরি। শিকার পালিয়েছে। আমরা যে আবার আসবো নবাব সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। সে বোকা নয়।'

দোতলার দালানের কোলে শুয়ে ছিলো সেই কালো বিড়ালটা। লোক দেখেই 'ম্যাঁও' বলে আপত্তি জানিয়ে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে।

মহম্মদ বললেন, 'হানাবাড়ির সব লক্ষণই এখানে আছে দেখছি!'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, কেবল কালো বিড়াল নয়, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দলে দলে কালো বাদুড়ও ঝুলছে। যেন আঁধারে তৈরি অতিকায় প্রজাপতি!'

—'কেবল আসল দ্রষ্টব্যই নেই। ভূত, কি জ্যান্ত মড়া।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভূত আবার দ্রষ্টব্য কী, না থাকাই তো ভালো!'

যে-ঘরে নবাব আহত হয়েছিলো সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরে জনপ্রাণী নেই।

মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিশ্চল জড় পাথরের মূর্তি। তারপর হঠাৎ কি উৎসাহে তার বিপুল বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠলো। তারপর পকেট থেকে রুপোর শামুক বার করে দু-বার সশব্দে নর্স্য নিলে।

মানিক জানে, এটা জয়ন্তর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ সে এমন আনন্দিত হলো কেন?

মহম্মদ বললেন, 'বাড়ির সব ঘরই যে এমন খালি দেখব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

জয়ন্ত খুশি-গলায় বললে, 'সব ঘর হয়ত খালি নেই!'

—'কী করে জানলেন?'

—'এখনো ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না। আসুন আমার সঙ্গে।'

জয়ন্ত অগ্রসর হলো। আর সবাই চলল তার পিছনে পিছনে।

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত খুব ধীরে ধীরে দালান দিয়ে এগুতে লাগল। দালানের পূর্ব প্রান্তে একটা দরজা। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

মহম্মদ বললেন, 'এ দরজা বন্ধ করলে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'যেই-ই বন্ধ করুক, আমি খুলে দিচ্ছি। আপনাদের বন্দুক তৈরি রাখুন।'

তার বিপুল দেহের ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে গেল।

কিন্তু সেটা ঘরের দরজা নয়। অন্দর-মহলের দরজা।

জয়ন্ত আবার অগ্রসর হলো। অন্দরেও একটা উঠান রয়েছে, কিন্তু বাইরের মতো অত বড় নয়। আবার একটা দালান। তারপর আবার একসার সিঁড়ি। জয়ন্ত এবার নিচে নামতে লাগল। তারপর ডানদিকে ফিরে এগিয়ে চলল। সে আবার একটিপ নস্য নিলে, এবং মনের আমোদে শিস দিতে শুরু করলে।

মানিক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, জয়ন্ত কোথায় যাচ্ছে? এ বাড়ির কিছুই সে চেনে না, এদিকে কখনো আসেও নি, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে কোথায় যাচ্ছে সে? জয়ন্ত তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়, কী সূত্র সে পেয়েছে, কখন পেলে এবং কেমন করে পেলে?

দ্বিতীয় উঠানের পূর্ব প্রান্তে ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা ঘর। জয়ন্ত সোজা সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার টর্চটা জ্বেলে কী যেন দেখলে।

সে ঘরেও কেউ নেই।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এলেন কেন?'

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'দেখছি, এ ঘর দিয়ে বেরুবার আর কোনো পথ নেই। তাহলে কোথায় গেল?'

—'কে কোথায় গেল?'

—'নবাব। সে এই ঘরেই ঢুকেছে। কিন্তু দরজা দিয়ে আর বেরোয় নি।'

মহম্মদ একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন, 'আপনার এমন আশ্চর্য অনুমানের কারণ কী?'

—'কারণ? রক্তের প্রমাণ মহম্মদ সাহেব, রক্তের প্রমাণ! আপনারা চোখ ব্যবহার করতে শেখেননি কেন?'

—'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, গৃহতলে একটা সুদীর্ঘ কালো রেখা। ঘর থেকে মুখ বাড়িয়েও দেখলে, সে রেখা দালান দিয়ে সমান চলে গেছে। রক্ত জমাট বাঁধলে কালো

দেখায়। এত বড় একটা সূত্রও তার চোখে পড়েনি বলে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করলে।

জয়ন্ত বললে, 'মহম্মদ সাহেব, শুনেছেন তো, মানিকের রিভলবারের গুলিতে কাল নবাবের উরু আর পা জখম হয়েছিল? নবাব যেখান দিয়ে গিয়েছে, কিংবা তাকে যেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সারা পথেই রক্ত ঝরে ঝরে পড়েছে। সেই রক্তরেখা অনুসরণ করেই উপরের ঘর থেকে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। এখন বুঝতে পারলেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! জয়ন্ত, তুমি আমার কান মলে দাও! আমরা কি চোখের মাথা খেয়েছিলুম? এমন সহজ প্রমাণটাও আবিষ্কার করতে পারিনি!'

মহম্মদ চমৎকৃত স্বরে বললেন, 'ধন্য জয়ন্তবাবু, ধন্য! ...কিন্তু সে শয়তানটা গেল কোথায়?'

—'সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। দেখছেন তো, রক্তের একটা রেখাই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। নবাব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আর একটা রেখাও দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদ সাহেব, আপনি সব চৌকিদারকে এখানে আসতে বলুন, আমি ততক্ষণ নবাবকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করি।'

মহম্মদ বাইরে গিয়ে বার-তিনেক বাঁশি বাজাতেই চৌকিদারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত 'টর্চ' জ্বেলে দেখে বললে, 'মানিক, রক্তের দাগ ঐ দেওয়ালের গায়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু দেওয়ালের সামনে গিয়ে নবাব অদৃশ্য হলো কেমন করে, সে তো আর হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে না? ...হয়েছে, ঐ দেখ, দেওয়ালের গায়ে দুটো কড়া। এ-সব সেকেলে পুরানো বাড়িতে প্রায়ই গুপ্তদ্বার থাকে। মানিক, কড়া দুটো ধরে জোরে টান মারো তো!'

মানিক তাই করলে। খুব সহজেই দেওয়ালের খানিকটা অংশ হড়হড় করে দরজার মতো খুলে গেল। ভিতরে একটা পথ।

জয়ন্ত বললে, 'সবাই রিভলবার নাও। ছয়জন চৌকিদার গুপ্তদ্বারের সামনে পাহারা দিক। ছয়জন আমাদের সঙ্গে আসুক।'

পথটা গিয়ে আর একটা দরজার সামনে শেষ হয়েছে। দরজার সঙ্গে আর একবার জয়ন্তর শক্তিপরীক্ষা শুরু হলো। কিন্তু এ-দরজা জয়ন্তর প্রবল আক্রমণ তিন তিনবার ব্যর্থ করলে।

জয়ন্ত তখন দরজার উপরে পৃষ্ঠদেশ রেখে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল—'টর্চ'-এর আলোতে দেখা গেল, তার সারা মুখ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে।

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব চেষ্টা! মানুষ ও-দরজা গায়ের জোরে ভাঙতে পারে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

হঠাৎ মড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। জয়ন্ত সরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'দেখুন, ভেঙেছে কি না?'

মহম্মদ এগিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, দরজার দু-খানা কবাটই চৌকাট থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সসম্ভ্রমে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি অসাধারণ মানুষ!'

তারপর দু-তিনটে লাথি মারতেই হুড়মুড় করে পাল্লা দু-খানা ভেঙে পড়ল।

খোলা দরজা দিয়েই দেখা গেল, একখানা বড় হলঘর এবং ঘরের এদিককার দেওয়ালের সামনে খাটের বিছানার উপরে হাসিমুখে বসে রয়েছে নবাব স্বয়ং!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'সেলাম আলিনগরের সম্রাট! ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি?'

নবাব খুব মিষ্ট গলায় বললে, 'এস।'

—'তোমার সেই জীবনহীন জীবন্তরা কোথায়?'

নবাব আবার ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বললে, 'বড় হঠাৎ এসে পড়েছ, তাদের জাগাবার আর সময় পেলুম না।'

—'তাহলে এ-জীবনে আর সময় পাবেও না!'—বলেই জয়ন্ত ভিতরে গিয়ে ঢুকল সর্বপ্রথমে। অন্য সবাই তার পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ সুন্দরবাবু 'ওরে বাপরে—হুম্!' বলে চেঁচিয়ে উঠে সামনে অমিয়কে পেয়েই দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

সকলে ফিরে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দরজার দিকের দেওয়ালের তলাতেই পাশাপাশি শুয়ে আছে সেই ছয়টা মূর্তি। তাদের কারুর চোখ মোদা, কারুর চোখ আধা খোলা, কারুর পুরো খোলা। কিন্তু সব চোখই আড়ষ্ট—মড়ার মতো দৃষ্টিহীন!

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের বুকে হাত দিয়ে বললে, 'মহম্মদ সাহেব, দেখে যান—এই ঠাণ্ডা বুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো চিহ্ন আছে কি না!'

কিন্তু মহম্মদের রুচি হলো না। দূর থেকেই বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছি ওগুলো মড়া।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এই মড়াগুলোই সেদিন বেঁচে উঠেছিল।'

মহম্মদ অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

সুন্দরবাবু চোখ ছানাবড়া করে বললেন, 'ওরা আবার যদি জাগে? আবার যদি তেড়ে আসে? এই চৌকিদার! লাশগুলো শীগগির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা!'

কিন্তু চৌকিদাররা কেউ মড়া ছুঁতে রাজী হলো না।

নবাব হাসতে হাসতে বললে, 'ভয় নেই, ওরা কেউ আর জাগবে না। এইবারে আমিও ওদের মতো ঘুমিয়ে পড়ব।'

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়বে—মানে?'

—'হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ব। তোমরা জ্যান্ত নবাবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই দেখ।' নবাব বিছানার উপর থেকে একটা খালি শিশি তুলে নিয়ে দেখালে।

—'তুমি বিষ খেয়েছ?'

—'হ্যাঁ। তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে, নইলে ওদের আর একবার জাগিয়ে শেষ-চেষ্টা করে দেখতুম। বিষ না খেয়ে উপায় কী?'

মহম্মদ বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যিই ঐ মড়াগুলোকে বাঁচাতে পারো?'

—'পারি। অবিশ্বাস হচ্ছে? দেখবে?'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আর দেখে কাজ নেই! আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে!'

নবাব বললে, 'তোমরা কি পিশাচসিদ্ধ মানুষের কথা শোননি? আমি বহু সাধনায় সেই বিদ্যা অর্জন করেছি। নানান দেশের নানান কবর খুঁজে আমি বেছে বেছে খুব জোয়ান আর টাটকা মড়া তুলে এনেছি। যখন দরকার হয় তখন আমি তাদের নিজের আত্মার অংশ দি'। কিন্তু ওদেরও দেহ তাজা রাখবার জন্যে জ্যান্ত জীবের রক্তের দরকার হয়। তাই যখন ঐ মড়ারা বাঁচে, বনের জীব ধরে তাদের ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়, সুবিধা পেলে মানুষের রক্তও পান

করে ; আর তারপর গোলামের মতো আমার হুকুমে ওঠে বসে চলে ফেরে।...তোমরা কী জানতে চাও বল, আমার ঘুমোবার সময় ঘনিয়ে আসছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি মেয়ে চুরি করতে কেন?'

হা-হা করে হেসে নবাব বললে, 'কেন? বলেছি তো, আমি আলিনগরের রাজা। তাই তো আমি নবাব নাম নিয়েছি। আমার বেগম নেই, তাই মেয়ে ধরে আনি বেগম করব বলে। কিন্তু একটা মেয়েও আমার বেগম হবার উপযুক্ত হলো না। তবু তাদের ধরে রেখেছি—মনের মতো বেগম পেলে পর তাদের বাঁদী করে রাখব বলে।'

অমিয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'কোথায় আমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছিস?'

'পাশের ঘরে গিয়ে দেখগে।'

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠল, 'কোন দিক দিয়ে যাব?'

—'ঐ দরজা দিয়ে।'

পশ্চিম দিকে একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল, সেদিকেও একটা পথ রয়েছে। তারা তিনজনে ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—'শীলা, শীলা!'

কে ক্ষীণ, কাতর কণ্ঠে সাড়া দিলে, 'দাদা! দাদা!'

মিনিট-তিনেক পরেই অমিয় তার বোনের হাত ধরে ফিরে এল। নিশীথ ও পরেশের পিছনে পিছনে এল আরো তিনটি মেয়ে, সকলেই ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

ছয়টা মৃত মূর্তির দিকে তাকিয়েই শীলা আর্তনাদ করে আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে বলে উঠল, 'দাদা! দাদা! আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল!'

অমিয় বললে, 'আমরা এসে পড়েছি, আর তোর ভয় নেই শীলা!'

শীলা ভয়ে চোখ মুদে শুকনো গলায় বললে, 'কিন্তু ঐ মড়াগুলো? ওরা যে এখানে রয়েছে! ওরাই যে আমাকে ধরে এনেছে! ওরা যে রোজ আমাকে ভয় দেখায়!'

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে অমিয় বললে, 'ওরা আর কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না! ওদের আবার আমরা মাটির তলায় পুঁতে ফেলব।'

নবাব গম্ভীর স্বরে বললে, 'তোমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো? এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি! আমাকে মরতে দাও।'

মহম্মদ বললেন, 'তা হয় না! তুমি মরবে কি না কে জানে?'

নবাব টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা নির্ভয়ে যেতে পারো।'

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'চোখের সামনে তোমার মৃত্যু না দেখে আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারব না।'

নবাবের ঝিমিয়ে-আসা চোখে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে সে গর্জন করে বললে, 'কী, আমাকে একলা মরতে দেবে না? বটে!' হঠাৎ সে সিধে হয়ে উঠল, এবং তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

মানিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ও মরল নাকি?'

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নবাবের মুখের পানে চেয়ে রইল।

আচম্বিতে সুন্দরবাবু মেঝের উপরে প্রচণ্ড এক ঝাঁপ খেয়ে আছড়ে পড়লেন এবং বেগে গড়াতে গড়াতে নবাবের খাটের তলায় ঢুকে পড়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'হুম্ হুম্ হুম্ হুম্!'

ওদিকে ঘরের ভিতরে আরম্ভ হয়েছে চিৎকার ও আর্তনাদের সঙ্গে বিষম হুটোপুটি ও ছুটোছুটি। চৌকিদাররা দল বেঁধে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্য তিনটি মেয়ে—কেবল শীলা তার দাদার দুই বাহুর উপরে এলিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই ছয়টা মৃতদেহ টলতে টলতে মেঝের উপরে উঠে বসেছে—তাদের প্রত্যেকেরই ভাবহীন চক্ষু একেবারেই বিস্ফারিত।

মহম্মদ পিছনে হটে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

মানিক উপর-উপরি রিভলবার ছুঁড়লে, কোনো-কোনো দেহে গুলি ঢুকে বীভৎস ছিদ্রের সৃষ্টি করলে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একফোঁটাও রক্ত বেরুলো না, কিংবা মূর্তিগুলোর মুখ-চোখে যন্ত্রণার আভাসটুকুও ফুটে উঠল না। কী ভয়ানক! সে অসম্ভব, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলেও বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়!

জয়ন্তের হঠাৎ তখন খেয়াল হলো, নবাব নিশ্চয় মরবার আগে শেষবার মড়া জাগাবার জন্যে ধ্যানাসনে বসেছে। সে এক লাফে বিছানার উপর গিয়ে পড়ে নবাবকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে। নবাব তীব্র কণ্ঠে 'আঃ' বলে শয্যায় এলিয়ে পড়ল।

ওদিকে সেই মুহূর্তেই ছয়টা মূর্তিই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার অবশ হয়ে প্রথমে বসে—তারপর মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। আবার তারা যে মড়া সেই মড়া।

জয়ন্ত হেঁট হয়ে নবাবের বুকে হাত দিলে। তার বুক স্থির। তার নাকে হাত দিলে। নিশ্বাস পড়ছে না।

মানিক খাটের তলা থেকে সুন্দরবাবুর দেহ টেনে বার করলে। তিনি তখন আর 'হুম্' বলছেন না। অজ্ঞান।

শনি মঙ্গলের রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবার সেই ত্রিমূর্তি

ঘন ঘন কড়া-নাড়ার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে চড়া-গলায় চিৎকার ঃ

"জয়ন্ত, জয়ন্ত, ওহে ভায়া! বলি, ঘুম ভাঙল নাকি?"

দরজা খুলে গেল। জয়ন্তের চাকর মধুর আবির্ভাব।

—"এই যে মধু। তোমার মনিব কি করছেন বাপু?"

—"মানিকবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছে।"

—"বল কি! এরি মধ্যে চায়ের আসর বসে গেছে? হুম্!"

ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর সুন্দরবাবু বিপুল উৎসাহে সুমুখ থেকে মধুকে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন—কারণ তিনি জানতেন যে, এ-বাড়ির প্রভাতী চায়ের আসর হচ্ছে দস্তুরমত সমারোহের ব্যাপার! চায়ের নামেই চন্‌মন্ করে উঠেছে তাঁর উদরস্থ ক্ষুধা।

আসরে প্রবেশ করেই সুন্দরবাবু তাঁর সেই বিখ্যাত 'হুম্' শব্দটি সজোরে উচ্চারণ করলেন।

জয়ন্ত বললে, "আরে আরে সুন্দরবাবু যে! আসুন, আসুন।"

—"তোমাদের চা-পর্ব শেষ হয়ে গেছে দেখছি।" সুন্দরবাবুর কণ্ঠে নিরাশার সুর।

জয়ন্ত বললে, "রবীন্দ্রনাথের ভাষা ঈষৎ বদলে আমি বলতে পারি—

'উঁহু, শেষ করা কি ভালো?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
দি নিবিয়ে আলো'!"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আমি কাব্যি-টাব্যি বুঝি না। ওর মানেটা কি হলো?"

—"ওর মানেটা হলো এই যে, তেল যখন ফুরোয়নি আলো আবার জ্বলতে পারে—অর্থাৎ চা আবার আসতে পারে!"

—"চা আবার আসতে পারে? সাধু, সাধু!"

মানিক বললে, "কিন্তু সুন্দরবাবু, আজকে তরল চায়ের সঙ্গে নিরেট আর কিছু প্রার্থনা করবেন না।"

—"কেন? দু-চারখানা ওমলেটও পাব না?"

—"পেতে পারেন, কিন্তু খারাপ ডিমের ওমলেট খেতে হবে!"

—"খারাপ ডিম মানে? পচা?"

—"ধরুন তাই। আমাদের ডিমগুলো এবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

—"কিন্তু তোমাদের প্লেটে তো দেখছি এখনো দু-এক টুকরো ওমলেট বিরাজ করছে!"

—"আমরা খারাপ ডিমের ওমলেট খেয়েছি।"

—"ধেৎ, তাও কি সম্ভব?"

—"কেন সম্ভব নয়? বাজারের বাজে চায়ের দোকানের মালিকরা ডিম খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দেয় নাকি? খদ্দেরদের সেই সব ডিমের ওমলেট খাইয়েই তারা পয়সা আদায় করে। খারাপ ডিমের ওমলেট গরম-গরম খেলে কিছু টের পাওয়া যায় না কিনা!"

—"কিন্তু অসুখ করতে পারে তো?"

—"তা পারে। হয়তো কলেরা হবার সম্ভাবনাও থাকে।"

—"বাপ রে, এ-সব জেনে-শুনেও তোমরা খারাপ ডিমের ওমলেট খেয়েছ?"

—"খেয়েছি। সুন্দরবাবু, লোভ ভারি পাজী জিনিস।"

—"অমন লোভের মুখে আমি মারি ঝাড়ু! আমি আজ ওমলেট খেতে চাই না।"

জয়ন্ত হেসে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে মধু, সুন্দরবাবুর জন্যে—"

জয়ন্তর কথা শেষ হবার আগেই 'ট্রে' হাতে করে মধু হাসতে হাসতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বললে, "আমাকে আর ডাকছেন কেন বাবু? সুন্দরবাবুকে দেখেই আমি খাবার তৈরি করে ফেলেছি।"

—"কি খাবার তৈরি করেছ? ওরে বাবা, ওমলেট?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ওমলেট খেতে ভালোবাসেন বলে—"

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে মাথা এবং হাত নেড়ে বললেন, "না, না, আমি পচা ডিমের ওমলেট খেতে মোটেই ভালোবাসি না! ওগুলো বরং জয়ন্ত আর মানিককে দাও।"

মানিক খিল্‌খিল্ করে হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, ওমলেট না খেলে আপনিই ঠকে যাবেন!"

—"হুম্, ঠকি ঠকব। পচা ডিমের ওমলেট খেয়ে আমি পটল তুলে জিততে চাই না।"

—"কি করে জানলেন পচা ডিম?"

—"তুমিই তো বললে বাপু?"

—"আমি আপনার সঙ্গে একটু মস্করা করছিলুম।"

—"মস্করা? আমার সঙ্গে মস্করা করছিলে? আস্কারা পেয়ে দিনে দিনে তুমি বড্ড বেড়ে উঠেছ? দেখছি একদিন তোমার সঙ্গে আমাকে মল্লযুদ্ধ করতে হবে!"

মানিক নিজের দুই উরুতে চপেটাঘাত করে বললে, "বেশ তো, আজকেই একহাত হয়ে যাক্ না?"

—"যাও যাও ডেঁপো ছোকরা! আমি ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করতে চাই না!"

—"ঠিক কথা বলেছেন, এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন। আপাতত ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ না করাই ভালো, কারণ ঐ হাতেই আপনাকে এখনি ওমলেট ভক্ষণ করতে হবে!"

—"মানিক, তোমার মুখ দেখলে আমার রাগ হয়! জয়ন্ত, তোমার এই বন্ধুটির জন্যে আমাকে এ-বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে দেখছি।"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, সুন্দরবাবুর পিছনে তুমি এমন করে লেগে থাকো কেন বল দেখি?"

মানিক বললে, "ওঁকে ভারি ভালোবাসি কিনা!"

সুন্দরবাবু বললেন, "যাও, যাও! তোমার ভালোবাসা পেতে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি জয়ন্তর সঙ্গে পরামর্শ করতে।"

—"কি পরামর্শ সুন্দরবাবু?" জয়ন্ত বললে।

—"বলছি ভায়া বলছি। আগে রাগটা খানিক সামলে নি। মানিকের জন্যে দেখছি আমার 'ব্লাড-প্রেসার' বেড়ে যাবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শনি-মঙ্গলের কাণ্ড

চা-পর্ব সমাপ্ত হলো। একখানা গদি-মোড়া আরাম-আসনে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে, পরিতৃপ্ত উদরের সমস্ত আনন্দ একটিমাত্র "হুম্" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে সুন্দরবাবু বললেন, "বড়ই গোলক-ধাঁধায় পড়ে গেছি দাদা!"

জয়ন্ত বললে, "কি রকম?"

—"একেবারে নতুন রকম মামলা। মামলার সূত্র ডুব মেরেছে সমুদ্রের অগাধ জলের তলায়। ডুবুরী হয়ে সেই সূত্র উদ্ধার করবার ভার পড়েছে এই হতভাগ্যেরই উপরে।"

—"মামলাটা কিসের?"

—"খুনের। একটা নয়, দুটো নয় তিন-তিনটে খুন।"

—"ঘটনাক্ষেত্র?"

—"রতনপুর, চব্বিশ পরগণার একটি বড় গ্রাম।"

—"আপনি কলকাতা-পুলিশে কাজ করেন, এ মামলার ভার আপনার উপর পড়েছে কেন?"

—"ও-অঞ্চলের পুলিশ এখানকার সাহায্য প্রার্থনা করেছে।"

জয়ন্ত একটু উৎসাহিত হয়ে বললে, "তাহলে বোধ হচ্ছে মামলাটার ভিতর কিঞ্চিৎ বস্তু আছে।"

—"বস্তু না ছাই। আমি তো দেখছি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া।"

—"ধোঁয়ার তলাতেই থাকে আগুন। মামলাটা বুঝিয়ে বলুন দেখি। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করুন।"

—"শোনো তবে। মহেন্দ্রনাথ ঘটক হচ্ছেন রতনপুর গ্রামের একজন বড় গৃহস্থ। এখন তাঁর বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রথম জীবনে কোন রাজ-'স্টেটে' ম্যানেজারের পদে বসে

তিনি বেশ কিছু টাকা রোজগার করেন। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের গ্রামে এসে বসেছেন। যে টাকা জমিয়েছেন, তারই সুদের মহিমায় ইহকালের জন্যে তাঁর আর কোনোই ভাবনা নেই। এমন কি নিজের মোটর ছাড়া রাজপথে তিনি এক পদ অগ্রসর হন না। বাড়িতে প্রায়ই উৎসবাদির সমারোহ হয়। কেবল গ্রামের মাতব্বররা নন, কলকাতা থেকেও তাঁর অনেক হোমরা-চোমরা বন্ধু সেই-সব উৎসবে যোগ দিতে আসেন।

"কিছুদিন আগে এই রকম আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন মহেন্দ্রবাবুর এক মামাতো ভাই, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ। তিনিও খুব ধনী লোক।

"সেদিনটা ছিল শনিবার। সন্ধ্যার সময়ে বৈঠকখানায় বসে মহেন্দ্রবাবু, সুরেন্দ্রবাবু আর রতনপুর থানার দারোগা কৈলাসবাবু আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে করছিলেন গল্পগুজব। কি কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমাদের গ্রামের খুব কাছেই একটি ডাকাতে-কালীর মন্দির আছে। মন্দিরটি অনেককালের পুরানো। আগে সেখানে প্রতি শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে নরবলি দেওয়া হোতো। এখন দেবীর ডাকাত-ভক্তরা আর নেই, প্রতি শনি আর মঙ্গলবারে নরবলিও আর দেওয়া হয় না, এমন কি মায়ের নিত্য পূজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ, যে-কোনো দিন দেবীর মাথার উপরে হুড়মুড় করে ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু ঐ ভগ্ন-মন্দিরের জীর্ণ দেবতার নাম শুনলে এ-অঞ্চলের লোক আজও আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আজও মানুষের রক্ত খাবার লোভে প্রতি শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে ঐ ডাকাতে-কালীর পাষাণ-মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই ঐ দুই দিনের রাত্রে এ-অঞ্চলের কোনো লোকই ঐ মন্দিরের কাছ দিয়েও হাঁটে না। শোনা গেছে, বহুকাল আগে কোনো কোনো দুঃসাহসী লোক শনি-মঙ্গলের রাত্রে গুজবের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে মন্দিরের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। পরদিন প্রভাতে মন্দির-চত্বরে পাওয়া গিয়েছিল তাদের মৃতদেহ।'

"মহেন্দ্রবাবুর কথা শুনে কলকাতা থেকে আগত সুরেনবাবু আর এখানকার থানার দারোগাবাবু একসঙ্গে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

সুরেনবাবু বললেন, 'আমি হচ্ছি পয়লা নম্বরের নাস্তিক, চোখে দেখা যায় না বলে ভগবানকেই মানি না, আর আমাকেই তুমি কিনা এই পাড়াগেঁয়ে গুজবে বিশ্বাস করতে বলো?'

দারোগাবাবু বললেন, 'আমি হচ্ছি পুলিশ। মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ভূত -পেত্নী বা তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই মানি না। কালী বলে কোনো দেবী সত্য সত্যই আছেন কিনা জানি না, কিন্তু এটা আমি জানি আর মানি যে, জড় পাথরের ভিতরে কোনোদিনই জীবনসঞ্চার হয় না।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমি কারুকেই কিছু বিশ্বাস করতে বা মানতে বলছি না। কিন্তু আজই তো শনিবারের রাত। গুজবের সত্যতা পরীক্ষা করবার মতো বুকের পাটা আমার নেই, কিন্তু তোমাদের সাহস থাকে তো তোমরা দু-জনে অনায়াসেই একসঙ্গে ঐ মন্দিরটা একবার দেখে আসতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, এ-বিষয়ে আমার কোনো দায়িত্বই নেই।'

দারোগাবাবু একটু দমে গিয়ে বললে, 'সারাদিন খাটুনি পর এই রাত্রে ছুটোছুটি করবার উৎসাহ আমার নেই। গুজব সত্য কিনা দু-দিন পরেও পরীক্ষা করা যেতে পারে।'

সুরেনবাবু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাল আমায় কলকাতায় ফিরতেই হবে, অতএব আজকেই আমি মন্দিরটা একবার দেখে আসতে চাই।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'কিন্তু সুরেন, তোমাকে একলাই যেতে হবে, কারণ আমার এখানকার চাকর-বাকররা পর্যন্ত তাদের মনিবেরও হুকুমে ঐ মন্দিরের ত্রিসীমানায় যেতে রাজী হবে না।'

সুরেনবাবু বললেন, 'আমি কাপুরুষ নই, একলা যাবার সাহস আমার আছে। কিন্তু আমায় একটা বন্দুক দিতে পারো?'

মহেন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'বন্দুক কি করবে?'

হো হো স্বরে হেসে উঠে সুরেনবাবু বললেন, 'পাথরের মূর্তি যদি জ্যান্ত হয় তাহলে গুলি করে তাকে হত্যা করব। কি বলেন দারোগাবাবু, পাথরের মূর্তিকে হত্যা করতে চাইলে আপনাদের পুলিশের আইন বাধা দেবে না তো?'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'আইনের কেতাবে জীবন্ত শিলামূর্তির কথা কোথাও লেখা নেই।'

মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একটা দো-নলা বন্দুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সুরেনবাবু বললেন, 'আপনারা সকলে এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে ডিনার খাব।'

এক ঘণ্টা গেল, দুই ঘণ্টা গেল, তিন ঘণ্টা গেল। সুরেনবাবুর দেখা নেই। সকলে ভীত, বিস্মিত আর চিন্তিত হয়ে সেইখানে বসে রইলেন। আতঙ্ক এমন সংক্রামক যে, সদলবলে সকলে মিলে সেই রাত্রে মন্দিরের কাছে একবার যাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত হলো না। পূর্বদিকে ভোরের আলো ফুটল—তখনো সুরেনবাবু অনুপস্থিত। তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার হলো সাহসের সঞ্চার। মহেন্দ্রবাবু দলবল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

মন্দিরে যাবার জন্যে একটিমাত্র সুপথ বা প্রধান রাস্তা আছে। পিছন দিক দিয়েও নাকি মন্দিরের ভিতরে আসা যায়, কিন্তু ওদিকে পথের মতো পথের কোনো অস্তিত্ব নেই। অনেক কাঁটাঝোপ, জঙ্গল আর বাঁশঝাড় ভেঙে ঐদিক দিয়ে মন্দিরে আসতে হয়, দিনের বেলাতেও তাই ওদিকে পথিক দেখা যায় না।

সুরেনবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গেল মন্দিরে যাবার প্রধান পথের উপরেই। তাঁর দেহে অস্ত্রাঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, কেবল তাঁর কণ্ঠদেশের ডানদিকে একটি সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম রক্তের দাগ! অর্থাৎ দেহের উপরে আলপিন্ বা সূচ বিঁধিয়ে দিলে সে-রকম দাগ হতে পারে! কিন্তু লাশের আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সূচের মতো কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। পরে ডাক্তারী-পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সুরেনবাবু মারা পড়েছেন বিষের ফলেই।

দারোগা কৈলাসবাবুর উপরই মামলার ভার পড়ল। কিন্তু মামলা হাতে নিয়ে তিনি কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না।

কৈলাসবাবু ভীতু লোক ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, শনি-মঙ্গলের কোনো অলৌকিক কারণে ঐ মন্দির যে মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে, এই অদ্ভুত গুজবের মূলে কিছুমাত্র সত্য নেই। আর এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি পরের মঙ্গলবারের রাত্রে একলা লুকিয়ে মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। সেই হলো তাঁর শেষ যাত্রা। বুধবার সকালে তাঁরও মৃতদেহ পাওয়া যায় মন্দিরের ঐ প্রধান পথের উপরই। তাঁরও বাম হাতের উপরে তেমনি একটা সূচ-বেঁধার মতো রক্তাক্ত দাগ আর তাঁরও দেহে পাওয়া যায় বিষের চিহ্ন। কেবল তাই নয়, ঠিক যে জায়গাটিতে সুরেনবাবুর লাশ পাওয়া যায় কৈলাসবাবুর মৃতদেহও পড়েছিল ঠিক সেই স্থানটিতে।

তার পরের কথা আরও সংক্ষেপে সেরে নি। দ্বিতীয় ঘটনার পরের শনিবারেই আর একজন পুলিশ কর্মচারীও রাত্রে গোপনে মন্দিরের কাছে তদন্ত করতে গিয়ে ঠিক ঐ ভাবেই মারা পড়েছে। এবার সূচ-বেঁধার চিহ্ন ছিল তার বাম পায়ের উপরে। তারও মৃত্যুর কারণ বিষ, আর তারও দেহ পাওয়া যায় ঠিক সেই জায়গাটিতে।

এইবার মামলার ভার পড়েছে তোমাদের এই অভাগা সুন্দরবাবুর কাঁধের উপরে। কিন্তু ভায়া, আমার অতিশয় সন্দেহ হচ্ছে, এ-ভার আমি সহ্য করতে পারব না। এটা কি রকম মামলা? নরহত্যাকারিণী ডাকাতে-কালীকে অপরাধিনীরূপে সামনে রেখে আমি যদি মামলার তদন্তে নিযুক্ত হই, তাহলে আমার নাম শুনলেই সারা দেশ অট্টহাস্য করে উঠবে।

তারপর কেবল শনি আর মঙ্গলবারেই ঐ মন্দিরের কাছে যাওয়াটা বিপজ্জনক কেন? শুনেছি, তৃতীয় ঘটনার রাত্রে যে পুলিশ কর্মচারীটি মন্দিরের পথে নিহত হয়, সে নাকি শনি-মঙ্গলবার ছাড়া অন্যান্য দিনেও গোপনে ঐ মন্দিরের কাছে তদন্ত করতে যেত। কিন্তু অন্যান্য দিনে কোনো দুর্ঘটনাই হয়নি, সে সন্দেহজনক কিছুই দেখেনি আর ফিরেও এসেছিল নিরাপদে। এই-ই বা কি রহস্য? তোমার কি মনে হয় না জয়ন্ত, এর মধ্যে যেন কেমন একটা ভুতুড়ে গন্ধ আছে?

প্রত্যেক হত্যার পিছনেই একটা কোনো উদ্দেশ্য থাকে। এমন কি উদ্দেশ্য না পেলে আইন কোনো হত্যাকারীকেই শাস্তি পর্যন্ত দিতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ড নিয়ে মস্তিষ্কচালনা করা হচ্ছে নিতান্তই পণ্ডশ্রম। এ-মামলাটাও যেন সেই শ্রেণীর।

ধরো, মহেন্দ্রবাবুর মামাতো ভাই সুরেনবাবুর কথা। তিনি স্থানীয় লোক নন। এখানকার কোনো লোকেরই তাঁর উপর আক্রোশ থাকবার কথা নয়। তিনি মাত্র দুইদিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন। তিনি যে প্রথম ঘটনার রাত্রে হঠাৎ ঐ মন্দিরে যেতে চাইবেন, এ-কথাও বাইরের কেউ জানত না। যারা জানত তারা সকলেই সারারাত্রি বসে ছিল মহেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানার ভিতরেই তবু ঘটনাস্থলে গিয়ে কে তাঁকে হত্যা করলে, আর কেনই বা করলে? তাঁকে হত্যা করে কার কী লাভ?

তারপর ধরো, দু-জন পুলিশ কর্মচারীর কথা! তাদেরই বা কেন হত্যা করা হলো, তারা তো সন্দেহজনক কোনো সূত্রেরই সন্ধান পায়নি! দ্বিতীয় পুলিশ কর্মচারী শনি-মঙ্গল ছাড়া অন্য অন্য বারেও যে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল, এ কথাটাও ভুলো না। এই মামলার ভিতরে যদি কোনো মানুষ-খুনীর হাত থাকত, তাহলে সে অন্য অন্য বারের সুযোগ পেয়েও পুলিশের লোককে ছেড়ে দিলে কেন?

পুলিশের কেউ কেউ সন্দেহ করছে, কোনো বিষধর জীবের দংশনেই তিনজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এ-যুক্তি মনে লাগে না। ঐ বিষধর জীব কি শনি-মঙ্গলবারেই ঠিক একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে অপেক্ষা করে? এ কোনো কাজের কথা নয়।

আর ঐ সূচ-বেঁধার ব্যাপারটাই বা কি? কে সূচ বেঁধায়! লাশের সঙ্গে বা কাছে সূচ পাওয়া যায় নাই বা কেন? আর এত অস্ত্র থাকতে সূচের মতোই বা অস্ত্র ব্যবহার করা হয় কেন?

বড়ই জটিল ব্যাপার ভায়া, বড়ই জটিল ব্যাপার! এ-মামলাটা হাতে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে সেই 'মানুষ-পিশাচ' মামলাটার কথা। সন্দেহ হচ্ছে তার মতো এ-মামলাটার সঙ্গেও নিশ্চয় কোনো ভৌতিক যোগাযোগ আছে! সেই ভয়াবহ অপরাধী নবাব আর তার অনুসারী জীবন্ত

মৃতদেহগুলোর কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভুলে যাওনি? আগে আমি ভূত-প্রেত কিছুই বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু সেই মানুষ-পিশাচদের পাল্লায় পড়ে আমি সে-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তারপর থেকে বুঝেছি পৃথিবীতে অপার্থিব অলৌকিক ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

"জয়ন্ত, মানিক, এখন তোমাদের মত কি তাই বলো।"

কাহিনী শেষ করে সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু জয়ন্ত কোনো কথাই বললে না, গম্ভীর ও স্তব্ধ ও স্থিরভাবে বসে রইল।

মানিক বললে, "তাই তো সুন্দরবাবু, আপনার জন্যে আমি দুঃখিত হচ্ছি।"

সুন্দরবাবু মানিকের দুঃখকে আমল দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "তোমার দুঃখ নিয়ে তুমিই থাকো বাপু, আমাকে আর জ্বালাতে এস না।"

নাছোড়বান্দা মানিক বললে, "যত-সব ওঁচা মামলার ভার পড়ে আপনার উপরে! কেন, পুলিশে কি আর যোগ্য লোক নেই!"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে বললেন, "তা যা বলেছ! আমি যেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো!"

মানিক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, "বেচারা সুন্দরবাবু! মাথা-জোড়া টাক, একটু বেশি রোদ লাগলেই ফটাং করে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ; বামন হাতীর মতো নাদুস-নুদুস দেহ, দু-পা দৌড়তে গেলেই হাপরের মতো হাঁপাতে থাকে ; বড় জাতের ধামার মতো ভুঁড়ি, তার খোরাক যোগাতে যোগাতেই সারাদিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়—আর তার উপরেই কি না যত অত্যাচার!"

মহাক্রোধে সুন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তখনি আসন ত্যাগ করে তিনি বললেন, "জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসে আমি ভুল করেছি। যেখানে মানিক আছে সেখানে আর আমি নেই!" সুন্দরবাবু দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

জয়ন্ত বললে, "দাঁড়ান সুন্দরবাবু।"

—"দাঁড়াব? কেন দাঁড়াব? আরো বেশি অপমানিত হবো বলে?"

—"না, না, আর কেউ আপনাকে অপমান করবে না। আসন গ্রহণ করুন। এখন বলুন দেখি, আপনি খালি আমার পরামর্শ চান, না আমার সাহায্য চান?"

—"তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে রাজী হও, তাহলে তো আমার অনেক পরিশ্রমই হাল্কা হয়ে যায়!"

—"হ্যাঁ, আমি রাজী। কবে রতনপুর যাচ্ছেন?"

—"কাল।"

—"বেশ, কালই আমরা আপনার সঙ্গী হবো।"

—"কিন্তু মানিক কি না গেলেই নয়?"

—"না মানিক যে আমার ডান হাত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রতনপুরের ডাকাতে-কালী

রতনপুর গ্রামখানি যে অত্যন্ত পুরাতন, দেখলেই তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। গ্রাম না বলে তাকে অবৃহৎ শহর বলাই উচিত। তার পথে পথে ছোট ও মাঝারি পাকা বাড়ির সংখ্যা তো কম নয় বটেই, অট্টালিকা আখ্যা পেতে পারে কয়েকখানা এমন বাড়িও চোখে পড়ে। কিন্তু একখানা ছাড়া বাকি সব অট্টালিকাই স্মরণ করিয়ে দেয় মান্ধাতার আমলের কথা। যে অট্টালিকাখানি পুরাতন নয় সেখানির অধিকারী হচ্ছেন মহেন্দ্রবাবু, তাঁর বৈঠকখানার মধ্যেই হয়েছে আমাদের এই কাহিনীর সূত্রপাত।

রতনপুরকে একটি ছোটখাটো শহর বলা চললেও তার অবস্থান হচ্ছে বেশ একটু অসাধারণ। তার চারিধারেই বিরাজ করছে বড়ো বড়ো প্রান্তর এবং পশ্চিম দিকের প্রান্তরের মাঝখানে পাওয়া যায় একটি রীতিমতো গহন বন। সেই বনের ভিতরের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকাতে-কালীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গ্রাম থেকে মন্দিরে যেতে গেলে পথের মাঝে পাওয়া যায় ছোট্ট একটি নদী। একটি কাঠের সাঁকোর সাহায্যে সকলে নদীর উপর দিয়ে আনাগোনা করে। রতনপুরের কাছ থেকে রেল লাইন আছে বেশ খানিকটা দূরে এবং সেই জন্যেই তাকে অনায়াসেই বলা চলে একটি বিচ্ছিন্ন গ্রাম বা শহর।

সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক ট্রেন থেকে নেমে পড়ে দেখলে, তাদের বহন করবার জন্যে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে একখানি মোটর গাড়ি। এই গাড়িখানির মালিক মহেন্দ্রবাবু নিজেই এগিয়ে এসে সুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন।

নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পালা শেষ হবার পর সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আপনি কি করে জানলেন যে আজ আমরা এখানে আসবো?"

মহেন্দ্রবাবু বললেন, "গ্রামে যে কাণ্ডটা হয়ে গেলো, তারপর সব খবর না রাখলে যে চলে না। থানায় গিয়ে জানতে পারলুম আজ এখানে আপনার আগমনের কথা। তাই আমি আপনাকে গ্রামে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করেছি।"

সুন্দরবাবু খুশি হয়ে বললেন, "বেশ করেছেন, খুব বন্ধুর কাজ করেছেন। স্টেশন থেকে গ্রাম নাকি পাঁচ ছয় মাইলের কম নয়। শুনেছি এখানে পাল্কী, গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোনোরকম যান পাওয়া যায় না। ঘোড়ার গাড়িতে গেলেও কম সময় লাগতো না। আপনার মোটর আমাদের অনেকটা সময় বাঁচিয়ে দেবে।"

এই প্রাথমিক কথাবার্তার সময় জয়ন্তর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিলো মহেন্দ্রবাবুর উপরে। নূতন কোনো লোক দেখলেই জয়ন্তের সূক্ষ্মদৃষ্টি তার মনের অন্দর-মহল পর্যন্ত লক্ষ্য করবার চেষ্টা করতো, এটি হচ্ছে তার চিরকালের স্বভাব।

মহেন্দ্রবাবু লোকটি হচ্ছেন না-লম্বা না-বেঁটে, না-রোগা না-মোটা। তাঁর গায়ের রঙ ধব্‌ধবে ফর্সা, সাজ-পোশাকে রীতিমতো শৌখিনতার চিহ্ন। চোখে সোনার চশমা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, হাতেও একগাছা সোনায় বাঁধানো বেশ মোটা পাকা বাঁশের লাঠি। তাঁর শৌখিন সাজ-পোশাকের সঙ্গে ঐ পাকা বাঁশের লাঠিগাছা মানাচ্ছিলো না একেবারেই।

জয়ন্ত লক্ষ্য করলে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারার তিনটি বিশেষত্ব প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : তাঁর অতি অমায়িক ভাব, তাঁর দু'টি সরল চক্ষু, তাঁর শিশুর মতো মিষ্ট হাসি।

জয়ন্ত ও মানিকের দিকে দৃষ্টিপাত করে মহেন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'ঐ দু'টি ভদ্রলোকও কি আপনার সঙ্গে এসেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা আমার বন্ধু আর দস্তুরমতো নামজাদা লোক। নাম শুনলে অন্তত ওঁদের একজনকে আপনি হয়তো চিনতে পারবেন।'

মহেন্দ্রবাবু কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, 'বটে, বটে? তা ওঁদের নাম জানতে চাইলে ওঁরা কোনো অপরাধ নেবেন না তো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বিলক্ষণ! অপরাধ আবার কিসের?'

মহেন্দ্রবাবু সঙ্কুচিত স্বরে বললেন, 'আজকাল আমি হচ্ছি পাড়াগেঁয়ে লোক, হালের শহুরে ফ্যাশানের কথা কিছুই জানি না তো! কারুর কারুর মুখে শুনেছি, গায়ে পড়ে নাম জানতে চাইলে আজকালকার শহুরে বাবুরা নাকি মুখভারী করেন।'

সুন্দরবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'আরে না না মশাই, ওরা মোটেই সে-জাতীয় মনুষ্য নয়। ওদের দেখতে ছোকরা বটে, কিন্তু ওরা আপনার আমার মতোই সেকেলে। আপনি কি শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর তার স্যাঙাৎ মানিকের নাম শোনেননি?'

মহেন্দ্রবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বলেন কি স্যর, তাও আবার শুনিনি? আপনি কি বলতে চান ওঁরাই হচ্ছেন জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। ওরা ঐ নামেই পরিচিত বটে।'

তাড়াতাড়ি জয়ন্তকে নমস্কার করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। কাগজে যে আপনার ছবি অনেক বার দেখেছি। আপনার নাম জানে না বাংলাদেশে এমন কে আছে? দেশবিদেশেও যে আপনার নামে ওড়ে জয় পতাকা। আর মানিকবাবু, আপনার নামও—'

মানিক বাধা দিয়ে বললে, 'স্তব্ধ হোন মহেন্দ্রবাবু, স্তব্ধ হোন! অত্যুক্তি করে আপনি যদি আমাকেও আকাশে তোলেন তাহলে জানবেন যে, জয়ন্তচন্দ্রের পাশে আমি হচ্ছি একটি ক্ষুদ্র মানিকতারকা মাত্র।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি দেখছি সুন্দর ভাষায় বিনয় প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু—'

মানিক বাধা দিয়ে বললে, 'ও কিন্তু-টিন্তুর কথা ছেড়ে দিন মহেন্দ্রবাবু! বাজে কথার দরকার নেই, কাজের কথা বলুন।'

মহেন্দ্রবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'কি কাজের কথা বলবো, মানিকবাবু! আমি তো কিছুই জানি না, ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে আছি, আমার নিজের বলবার কথা কিছুই নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'আসুন, আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, গাড়িতে যেতে যেতেই বাকি কথা হবে।'

সকলে গাড়ির উপরে গিয়ে বসলেন। চালক গাড়ি চালিয়ে দিলে। জয়ন্ত চালকের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনার ড্রাইভারটি দেখছি এদেশের লোক নয়।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এর মধ্যে সেটাও আপনি লক্ষ্য করেছেন? হ্যাঁ, আমার এই ড্রাইভারটির স্বদেশ হচ্ছে বোর্নিও। ও চমৎকার গাড়ি চালায় আর আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী। আমার জন্যে ও হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে।'

তখন বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে মোটর গাড়ি। কোথাও ধু-ধু মাঠ, কোথাও তারই মাঝে মাঝে শ্যামল ও নিবিড় তরুকুঞ্জ, কোথাও নদী বা খাল-বিলের শীর্ণ ও সমুজ্জ্বল জলরেখা, এইসব দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে পিছনে ফেলে কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে মোটর গাড়ি।

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, যদি আমি দু-একটি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিতে আপত্তি করবেন না তো?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আপত্তি? কেন আপত্তি করবো? আমার তো আপত্তি করার কোনোই কারণ নেই।'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, 'শুনলুম, প্রথমে যিনি মারা গেছেন, সেই সুরেনবাবু সম্পর্কে আপনার ভাই হন।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'সুরেন আমার মেজো মামার ছেলে।'

জয়ন্ত বললে, 'সুরেনবাবু কি করতেন?'

—'সুরেন কিছুই করতো না। কারণ তার টাকার অভাব ছিলো না।'

—'তাহলে বলতে হবে সুরেনবাবু একজন ধনী লোক?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সুরেনের মাসিক আয় ছিল আট হাজার টাকা।'

—'সুরেনবাবুর বাড়িতে কে আছে?'

—'কেউ নেই। সুরেন ছিল একেবারে একলা।'

—'তাঁর আত্মীয়স্বজন কে আছেন?'

—'আত্মীয়ই বলুন আর স্বজনই বলুন, আমিই হচ্ছি সুরেনের একমাত্র লোক। আমি ছাড়া এ-দুনিয়ায় সুরেনের আর কোনো আত্মীয়ই নেই।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, ঐ কালী-মন্দিরের ব্যাপারটা কি বলুন দেখি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমারও অবস্থা তাই জানবেন। শুনেছিলুম একটা প্রবাদ, বন্ধুদের কাছে সেই গল্পই করেছিলুম। কিন্তু সেই গল্প থেকেই যে এমন ভীষণ ট্রাজেডির সৃষ্টি হবে, সেটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনি কি ঐ ভুতুড়ে গল্পে বিশ্বাস করেন?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আগে হয়তো ঠিক বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস না করে আর কি করি বলুন! পৃথিবীর খাতা থেকে একই ভাবে তিন-তিনটে মানুষের নাম কাটা গেলো! এর পর কি আর অবিশ্বাস করা চলে সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আদালত তো আর ভূতের গল্প মানবে না!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানকার লোকেরাও এই কাহিনীকে ভৌতিক কাহিনী বলে মনে করে না। তারা বলে এ-সব হচ্ছে দেবতার মাহাত্ম্য।'

—'হুম্! আরে মশাই, আমাদের মা-কালীরও যে ভূত-পেত্নী নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো অভ্যাস! যদি ঐ ঘটনাগুলো সত্য হয়, তাহলে তো আমরা নাচার! দুনিয়ার এমন কোনো পুলিশ নেই ভূত কি পেত্নীকে যে গ্রেপ্তার করতে পারে।'

মহেন্দ্রবাবু মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললেন, 'তাহলে এ মামলাটা আপনারা হাতে করে নেবেন না?'

—'আরে কি যে বলেন, সরকারের হুকুম, আমি মামলা হাতে না নিলেও কম্‌লী আমাকে ছাড়বে কেন? আগে তো তদন্ত শুরু হোক্, তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে কি জানেন, দেবদেবী নিয়ে কাণ্ড, এর ভেতরে মাথা গলাতেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছি না।'

গাড়ি রতনপুরের সীমানায় এসে পড়লো। দূর থেকে দেখা গেলো মস্ত বড়ো একখানা লাল রঙের বাড়ি প্রায় চার বিঘা জমি দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারিধারে বেড়ে রেলিং-ঘেরা ফল ও ফুল গাছের বাগান। ফটকের সামনে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে পোশাক পরা দ্বারবান।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঐ হচ্ছে আমার বাড়ি। একবার ওখানে নামবেন নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি প্রথমেই দেখতে চাই ডাকাতে-কালীর মন্দির।'

—'সেখানে গিয়ে সব দেখতে-শুনতে হয়তো অনেক বেলা হয়ে যাবে। তার আগে দাসের এই গোলামখানায় পদার্পণ করে কিঞ্চিৎ জলযোগ আর চা পান করলে বেশি ক্ষতি হবে কি?'

সুন্দরবাবু নিজের ভুঁড়ির উপরে ডান হাতখানি রেখে বললেন, 'জয়ন্ত, ভদ্রলোক নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব করেননি।'

মানিক বললে, 'আমিও এই প্রস্তাবে সায় দিচ্ছি।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তবে তাই হোক্।'

মহেন্দ্রবাবুর নির্দেশে গাড়ি ফটকের ভিতরে ঢুকলো।

জয়ন্ত এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বাগানের গাছগুলো দেখছি অনেক কালের পুরানো।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় দেড়শো বছর আগে, আমার পূর্বপুরুষরা করেছিলেন এই বাগানের পত্তন। শুনেছি এখানকার কোনো কোনো গাছ প্রায় দুই শতাব্দীর হিসাব দাখিল করতে পারে। আমার এ-বাড়িখানিও পৈতৃক, এতো বড়ো বাড়ি তোলবার পয়সা আমার নেই। আমি কেবল ভার নিয়েছি মাঝে মাঝে মেরামত করবার, তাইতেই আমার খরচ হয়ে গেছে হাজার হাজার টাকা।'

একটি বড়ো গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে মোটর থামলো। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সকলে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

মহেন্দ্রবাবু একটা হলঘরে গিয়ে ঢুকে বললেন, 'আমার এই বৈঠকখানায় দয়া করে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করুন। ইতিমধ্যে আমি আপনাদের চায়ের ব্যবস্থাটা ঠিক করে আসি।'

সুন্দরবাবু একটি সুদীর্ঘ "আঃ" শব্দ উচ্চারণ করে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বললেন, 'দেখবেন মহেন্দ্রবাবু, ব্যবস্থায় যেন বেশি বাড়াবাড়িটা না থাকে!'

—'না মশাই, আমরা হচ্ছি গেঁয়ো লোক, বাড়াবাড়ি করবার শক্তি আমাদের নেই। এই একটু চা আর একটু মিষ্টি, তাছাড়া আর কিছুই নয়' বলতে বলতে মহেন্দ্রবাবু ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবু, ঐ যে বাড়াবাড়ির কথা বললেন, ওটা কি আপনার আন্তরিক কথা?'

—'মানে?'

—'আয়োজনের বাড়াবাড়ি কি সত্যিই আপনি ভালোবাসেন না? মহেন্দ্রবাবু যদি একখানার বদলে দু-খানা থালা ভরে মিষ্টান্ন এগিয়ে দেন, তাহলে কি আপনি সভয়ে পশ্চাৎপদ হবেন?'

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, 'মানিক, তুমি কি মনে করো আমি একটি মস্ত বড়ো উদর-পিশাচ?'

মানিক জিভ কেটে বললে, 'আরে ছ্যা ছ্যা, আপনাকে তো আমরা কেবল উদর-সেবক বলেই জানি।'

—'উদর-সেবক?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটি কি খারাপ নাম?'

—'হুম্!' বলেই সুন্দরবাবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে গুম্ হয়ে রইলেন।

জয়ন্ত এ-সব কথাবার্তা কিছুই শুনছিল না, তার দৃষ্টি ঘুরছিলো ঘরের এদিকে সেদিকে। ঘর-খানি আধুনিক আদর্শে বেশ ভালো করেই সাজানো। সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার, পাথরের মূর্তি ও তৈলচিত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব নেই।

মহেন্দ্রবাবু আবার ফিরে এলেন, তাঁর পিছনে পিছনে দুইজন ভৃত্য এলো দু-খানা বড়ো বড়ো 'ট্রে'র উপরে আহার্যের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপ্‌রে, এ-যে দেখছি রীতিমতো যজ্ঞির ব্যাপার! বিনা নোটিশে এক কথায় আপনি এতো বড়ো আয়োজনটা কেমন করে করলেন?'

মহেন্দ্রবাবু বিনীত কণ্ঠে বললেন—'দু-চারজন অতিথি-অভ্যাগত অধীনের বাড়িতে যখন তখন আসা-যাওয়া করে থাকেন, তাই আমাকে কিঞ্চিৎ প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। পল্লীগ্রাম কিনা, শহরের মতো বাজারে লোক পাঠালেই তো খাবার নিয়ে আসা যায় না।'

—'তাই তো, করেছেন কি, করেছেন কি?' বলতে বলতে সুন্দরবাবু একখানা মস্ত ডালপুরীকে আক্রমণ করলেন বিপুল বিক্রমে।

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, ঘরের ঐ কোণে ঐ যে একটি বর্ম দাঁড় করানো রয়েছে, ওটি আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?'

—'ওটি আমি কিনিনি, এক সাহেবের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। ওটি হচ্ছে সেকেলে বিলিতি বর্ম, আগ্নেয়াস্ত্র হবার আগে ইংরেজ যোদ্ধারা ঐ-রকম বর্মে আপাদমস্তক ঢেকে যুদ্ধযাত্রা করতো।'

সুন্দরবাবু এক গ্রাসে একটি বড়ো রসগোল্লা কোঁৎ করে গিলে ফেলে বললেন, 'বাস্ রে বাস্! অতো বড়ো ভারী লোহার বর্ম, ওর ভিতরে ঢুকলে যুদ্ধযাত্রা কি, আমি তো একটিমাত্র পদও অগ্রসর হতে পারতুম না!'

মানিক বললে, 'ওর ভিতরে আপনি ঢুকবেন? অসম্ভব!'

—'কেন, অসম্ভব কেন?'

—'নরহস্তীর জন্যে ও বর্ম তৈরি হয়নি।'

সুন্দরবাবু একবার কট্‌মট্‌ করে মানিকের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

জয়ন্ত বললে, 'ও-বর্মের মধ্যে হয়তো আমার দেহের ঠাঁই হতে পারে। আর হয়তো বর্ম পরে চলাফেরা করতেও আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হবে না। কি বল হে মানিক?'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্ত, ও-বর্ম তোমারই উপযোগী বটে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঐ চিত্তাকর্ষক বর্মটিকে ভালো করে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করবার আগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু আজ আর সময় নেই, সে-চেষ্টা আর একদিন করা যাবে। কি বলেন মহেন্দ্রবাবু, তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

—'আপত্তি? নিশ্চয়ই নেই!'

ওদিকে জয়ন্ত ও মানিকের অর্ধেক খাওয়া শেষ হবার আগেই সুন্দরবাবুর খাবারের থালা ও চায়ের পেয়ালা একেবারেই খালি হয়ে গেলো।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ওকি সুন্দরবাবু, থালায় যে কিছুই নেই, আরো কিছু আনতে বলে দি।'

সুন্দরবাবু বাঁকা চোখে মানিকের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, সে মুখ টিপে টিপে দুষ্টুমির হাসি হাসছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'থাক্‌ মহেন্দ্রবাবু, সকালেই পেট ভারী করে খাওয়া ভালো নয়। তবে আর এক পেয়ালা চা খেতে আমার আপত্তি নেই।'

মানিক চুপি চুপি বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার অদ্ভুত সংযম দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।'

সুন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'স্টুপিড্‌!'

জলযোগ সেরে সকলে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি এবার ছুটলো সোজা কালী-মন্দিরের দিকে। মোটরে করে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে কালী-মন্দিরে গিয়ে পৌঁছতে আট-দশ মিনিটের বেশি লাগলো না।

মন্দিরটি সত্যই পুরাতন। তার উপর দিকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে এবং তার ফাটা জায়গাগুলো থেকে বাইরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অশত্থ ও বটগাছরা। একটা অশত্থ গাছ রীতিমতো বড়ো, মন্দিরের উপরে অনেক অংশ তার শাখা-প্রশাখার মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুরনো মন্দিরটা অতো বড়ো একটা গাছের ভার কি করে যে এখনো সহ্য করে আছে, সেটা ভাবলে বিস্ময় লাগে।

যে পথটা মন্দিরের চাতালে গিয়ে পড়েছে তার দুই দিকেই রয়েছে একটানা জঙ্গল। মন্দিরের পিছনেও অরণ্য, সেখানকার ঝোপঝাপ আরো বেশি নিবিড়। মন্দিরের চাতালের উপরেও আগাছার ভিড়।

বিজনতায় ও মানুষের যত্নহীনতায় এখানে কোনোদিকেই কোনো শৃঙ্খলা নেই বটে, কিন্তু বাহির থেকে দেখলে এই নিরিবিলি জায়গাটিকে বেশ শান্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। দিকে দিকে ছায়াচিত্রের পাশে পাশে রোদ দিয়েছে সোনার আভাস ছড়িয়ে। গাঢ় সবুজের অন্তঃপুরে লুকিয়ে থেকে থেকে ডাকছে কপোত, ডাকছে কোকিল, ডাকছে দোয়েল-শ্যামা! কোথা থেকে বাতাসে ভেসে আসছে অজানা কোন বনফুলের গন্ধ।

মানিক বললে, 'বাঃ, জায়গাটি আমার বেশ লাগছে!'

মহেন্দ্রবাবু বলেলেন, 'এখানকার বাসিন্দা হলে আপনি বোধহয় ও-কথা বলতে পারতেন না।'

—'কেন?'

—'দেখছেন না এতো কাছেই লোকালয়, তবু এখানে অরণ্য কতো নিবিড় হয়ে উঠেছে! লোকালয়ের কাছে এতো নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা আপনারা আর কোথাও দেখেছেন কি? এ ভয়াবহ ঠাঁই, কোনো অতি-বড়ো ভক্তও ভরসা করে দেবীকে এখানে পূজা দিতে আসে না। মানুষের সঙ্গ হারিয়ে এ-জায়গাটা এখন যেন অভিশপ্ত হয়ে আছে।'

দু-দিকের জঙ্গলের দিকেই ঘন ঘন মুখ ফিরিয়ে সুন্দরবাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন অত্যন্ত সাবধানে।

মানিক হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ তো শনিও নয় মঙ্গলও নয়, আপনার অতোটা সাবধান না হলেও চলবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি জানি বাবা, বলা তো যায় না!'

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, যারা মারা পড়েছে, তাদের তিনজনের লাশ কোনখানে পাওয়া গিয়েছে?'

সামনের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঠিক ঐখানে।'

জয়ন্ত সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাম পাশের বনের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। বন সেখানে বেশ ঘন, ঝোপের পর দাঁড়িয়ে আছে ঝোপ, তাদের ঠেলে নজর চলে না।

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'জঙ্গলটার দিকে তুমি অমন করে তাকিয়ে আছো কেন জয়ন্ত?'

জয়ন্ত কোনো জবাব না দিয়ে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হলো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমরাও যাবো নাকি?'

'না' বলে জয়ন্ত ঝোপ ঠেলে বনের ভিতরে প্রবেশ করলে।

পাঁচ-সাত-দশ মিনিট কেটে গেলো। তখনো জয়ন্তের দেখা নেই।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্তের এই রকম সব খামখেয়ালি আমার কাছে যেন কেমন-কেমন লাগে। এতো জায়গা থাকতে ওখানে ঢুকে ও কি করছে? কী ওখানে আছে?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ওখানে আছে কেবল বড়ো বড়ো বুড়ো গাছ, দলে দলে কাঁটা-ঝোপ আর দিনেও সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। বলা বাহুল্য ওখানে কেউটে প্রভৃতি সাপও আছে অনেক।'

এমন সময় দেখা গেলো জয়ন্ত আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি হে, কেমন খাওয়া খেয়ে এলে?'

জয়ন্ত সে-কথা যেন শুনতেই পেলে না। এগিয়ে এসে মহেন্দ্রবাবুকে সে প্রশ্ন করলে, 'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

—'জিজ্ঞাসা করুন।'

—'এখানে শেষ দুর্ঘটনা হয় গত মঙ্গলবারে, কেমন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে কতো রাত্রে, সে কথা বোধহয় আপনি বলতে পারবেন না?'

—'আজ্ঞে না। তবে লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তাররা মত দিয়েছিলো, লোকটি মারা পড়েছে রাত বারোটার খানিক পরে।'

—'সেদিন কি এখানে বৃষ্টি পড়েছিল?'

মহেন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'এ-কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

—'বনের ভিতরে এখনো অনেক জায়গায় ভিজে কাদা রয়েছে। ওখানে তো রোদ ঢুকতে পায় না, কাজেই জলকাদাও সহজে শুকোয় না।'

—'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, সেদিন রাত ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খুব জোরে ঝড়-জল হয়ে গিয়েছিলো।'

—'পুলিশের লোকেরা এখানে তদন্তে এসে ঐ বনের ভিতরে গিয়েছিলো বোধহয়?'

—'তা গিয়েছিলো বৈকি! কিন্তু তারা কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।'

—'পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে কোনো লোক কি ঐ বনের ভিতরে ঢুকেছিলো?'

মহেন্দ্রবাবুর মুখে আবার ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব। খানিকক্ষণ ভেবে তিনি বললেন, 'তদন্তের সময়ে আমিও পুলিশের সঙ্গে ছিলুম। কিন্তু আমাদের কারুরই পা তো খালি ছিলো না। জুতো না পরে ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করাও নিরাপদ নয়।'

—'স্থানীয় লোকেরাও কি খালি পায়ে জঙ্গলের মধ্যে যায় না?'

—'কেউ না, কেউ না! বলেছি তো, এ-জায়গাটাকে সকলে অভিশপ্ত বলে মনে করে। একে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কুসংস্কারের অন্ত নেই, তার উপরে গত মঙ্গলবারের আগেই এখানে উপর-উপরি দু-দু'টো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরও ঐ জঙ্গলে স্থানীয় লোকরা আসতে সাহস করবে? অসম্ভব মশাই, অসম্ভব!'

জয়ন্ত তার রুপোর শামুকের নস্যদানী বার করে নস্য গ্রহণ করতে লাগলো। মানিক বুঝলে, এটা সুলক্ষণ। জয়ন্ত খুব খুশি হলেই নস্য না নিয়ে পারে না। কিন্তু হঠাৎ তার এতো খুশি হবার হেতু কি?

সুন্দরবাবু টুপি খুলে মাথার ঘর্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন, 'জয়ন্ত ভায়া, তোমার প্রশ্নগুলো কেমন যেন খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছে না?

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আপনার তা মনে হতে পারে, কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে আমি কি দেখেছি জানেন?

—'হয় সাপ, নয় শেয়াল, নয় বন-বিড়াল!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানে মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও শোনা যায়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাঃ, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!'

জয়ন্ত বললে, 'ও-সব কিছুই নয়। জঙ্গলের ভিতরে আমি দেখছি, কেবল পায়ের দাগ! গত মঙ্গলবার রাত্রে বৃষ্টি হবার পর খালি-পায়ে কোনো লোক ঐ জঙ্গলের এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, যেখান থেকে ঝোপঝাপের ফাঁক দিয়ে পথের এইখানটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল একটা পায়ের দাগ নয়, একই লোকের অনেকগুলো পায়ের দাগ। কোনো কোনো দাগের গভীরতা দেখে আন্দাজ করতে পেরেছি, লোকটি ঐখানে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলো। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানকার কাদা এখন অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, তাই

পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতে আমার কিছুই কষ্ট হয়নি। খালি পায়ের দাগ নয়, আর একটা চিহ্নও আমি লক্ষ্য করেছি।'

—'কি?'

—'লোকটার হাতে ছিল একটা অদ্ভুত রকমের লাঠি!'

—'অদ্ভুত রকম!'

—'হ্যাঁ। কোনো একটা ফাঁপা দণ্ড বা নলের মতো জিনিসের একটা মুখ আপনি যদি ভিজে মাটির উপরে রেখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে কি রকম চিহ্ন পড়বে বলুন দেখি?'

—'ফাঁপা দণ্ড ভিজে মাটির উপরে চেপে ধরলে খানিকটা মাটি গোলাকার হয়ে বড়ির মতো উপর দিকে উঠে পড়বে।'

—'ঠিক বলেছেন। ঐ রকম একটা ফাঁপা লাঠির একাধিক দাগ আমি মাটির উপরে লক্ষ্য করেছি।'

সুন্দরবাবু ভাবতে ভাবতে বললেন, 'ফাঁপা লাঠি? সে আবার কি? এক তো জানি গুপ্তি। ছোট তরোয়াল রাখবার জন্যে গুপ্তির ভিতরটা হয় ফাঁপা।'

জয়ন্ত বললে, 'না, এ গুপ্তির দাগ নয়। গুপ্তির ভিতরটা ফাঁপা হলেও তার দু-দিকের মুখই থাকে বন্ধ।'

—'তবে তুমি কিসের দাগ দেখেছো?'

—'সেইটেই এখনো ধরতে পারছি না। কিন্তু ঐ লোকটা কে? দিনের বেলাতেই যেখানে মানুষের চলাচল নেই, দুর্যোগের রাত্রে—বিশেষ করে দুর্যোগময় মঙ্গলবারের রাত্রে—ঝড়-বৃষ্টির পরেও কোনো দুঃসাহসী লোক কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নগ্নপদে অদ্ভুত একগাছা লাঠি বা অন্য কিছু নিয়ে ঐ গভীর জঙ্গলের ভিতরে এসে অপেক্ষা করেছিলো? ঐ লোকটিকে যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলেই বোধহয় সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

সুন্দরবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সাবাস্ ভায়া, সাবাস্! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? ঘটনাস্থলে পদার্পণ করতে না করতেই তুমি যে একটা মস্ত বড়ো সূত্র আবিষ্কার করে ফেললে হে!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এটা যে কি রকম সূত্র আমি বুঝতে পারছি না। গেলো মঙ্গলবারের রাত্রে অমন দুর্যোগের পরেও কোনো মানুষ যে ঐ ভয়ঙ্কর জঙ্গলে বেড়াতে আসতে পারে, এ-কথা কিছুতেই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! কেবল ডাকাতে-কালীর সর্বনাশা ক্ষুধা নয়, সত্য সত্যই ঐ বনের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে শত শত বিষধর সর্প আর বন্য বরাহের দল। মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র এসেও তার অস্তিত্ব জানিয়ে যেতে ভোলে না। ঐ বনে অমন সময়ে যে মানুষ আসবে, সে দুঃসাহসী নয়, সে হচ্ছে বদ্ধ পাগল। এমন পাগল এ-অঞ্চলে কেউ আছে বলে আমি জানি না। তারপর ঐ ফাঁপা লাঠি! ফাঁপা লাঠি আবার কি জিনিস? তা দিয়ে কার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে?'

জয়ন্ত বললে, 'যা দেখেছি তাই বলছি। সম্ভব-অসম্ভবের কথা নিয়ে এখন আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনি যদি এখন জোর করে বলেন যে, ঐ পদচিহ্ন মানুষের পদচিহ্ন নয়, তাহলে আমিও এখন জোর করে আপনার কথার প্রতিবাদ করতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'ও বাবা, এ আবার কি রকম কথা হলো? মানুষের পদচিহ্ন নয়? কিন্তু এতকাল পুলিশে চাকরি করছি, কখনো তো শুনিনি ভূতের পদচিহ্নের কথা।'

মানিক বললে, 'ভৌতিক ইতিহাসে আমিও এমন কথা পাঠ করিনি। তারপর ঐ ফাঁপা লাঠি! ভূতেদের লাঠি ফাঁপা হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আপাতত ভূত আর মানুষ দু-এরই কথা ভুলে যাও। চলো, আমরা মন্দিরের ভিতরটা দেখে আসি।'

সকলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো। এবং যেতে যেতে দেখা গেলো একটা নতুন ব্যাপার।

একটা ছোট সাপ ধরেছে একটা মস্ত ব্যাঙকে! ব্যাঙটাকে সে গলাধঃকরণ করতেও পারছে না, মুখ থেকে বার করে ফেলে দিতেও পারছে না। সাপটা ঘন ঘন ব্যাঙটাকে মাটির উপরে আছাড় মারছে, কিলবিল করে সমস্ত দেহ দিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে এবং ব্যাঙটাও চীৎকার করছে প্রাণপণে! মানুষ দেখেও সাপটা পালাবার চেষ্টা করতে পারলে না, সুন্দরবাবু তাঁর হাতের লাঠি চালিয়ে সাপটার মাথা গুঁড়ো করে দিয়ে বললেন, 'হুম্! পৃথিবী থেকে একটা পাপ বিদেয় হলো!'

মানিক বললে, 'কিন্তু পৃথিবীর অনেক পাপই লুকিয়ে আছে এই বনের আনাচে-কানাচে। আপনি সে-সব দিকেও নজর রাখতে ভুলবেন না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নজর আমার কম-জোরি নয় হে! তুমি নিজের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করো।'

আগাছা-ভরা চাতাল পার হয়ে সকলে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চাতালের উপরেই অপরিসর রোয়াক, কিন্তু রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির ধাপগুলো গেছে ভেঙে।

মন্দিরের ভিতরে আধা আলো আধা অন্ধকার। সামনের দিকে তাকিয়েই খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্টরূপে যে মূর্তি দেখা গেলো, তা অবর্ণনীয় বললেও চলে।

জয়ন্তর মতো সাহসী মানুষেরও হৃৎপিণ্ড সে-মূর্তি দেখে ধড়ফড় করে উঠলো।

বাংলাদেশের সর্বত্র কালী-মূর্তি আছে অগুন্তি। কিন্তু সে-সবের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করী হচ্ছে, বঙ্গাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত "যশোরেশ্বরী" মূর্তি। সে-মূর্তির মুখ দেখলে মনের মধ্যে ভক্তির আগে জেগে ওঠে বিষম আতঙ্কের ভাব। কিন্তু তাকেও টেক্কা দিয়েছে রতনপুরের এই ডাকাতে-কালী, এ-মূর্তির বীভৎসতা কল্পনাতেও আনা সহজ নয়।

কষ্টিপাথরে গড়া আট-নয় হাত উঁচু উলঙ্গ দেবীর মূর্তি। মাথার পিছনদিকে আগে বোধহয় সত্যিকার কেশদাম ছিল, সে কেশদামের কিছুই এখন নেই, দেবী মুণ্ডিতমস্তক। চক্ষু কি দিয়ে যে গড়া ঝাপসা আলোয় সেটা বোঝা গেলো না, কিন্তু সকলেরই মনে হলো মূর্তির দুই উগ্র চক্ষু যেন উৎকট রক্ত পিপাসায় জীবন্ত হয়ে ধক্-ধক্ করে জ্বলছে! শ্বাপদ জন্তুর মতো নিষ্ঠুর করাল দন্ত এবং ততোধিক নির্দয় লক্‌লকে রক্তাক্ত জিহ্বা! মূর্তির গলায় রয়েছে যে মুণ্ডমালা তা পাথরের তৈরি নয়, সত্যিকার মনুষ্য-শিশুর মুণ্ড দিয়েই তা তৈরি করা হয়েছে। নিচেকার বাম হস্তেও ঝুলছে রক্তমাংসহীন একটি আসল মানুষের মুণ্ড। প্রায় কুণ্ডলীকৃত মহাদেবের দেহের উপরে মূর্তি যে ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে পদনিক্ষেপ করে দণ্ডায়মান, তা দেখলেও বক্ষের ভিতরে জাগে বিষম একটা আতঙ্কের ঝড়।

সকলেই খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জড় পাষাণ-প্রতিমা যে এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে এটা হচ্ছে ধারণার অতীত।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন মহেন্দ্রবাবু। বললেন, 'শুনেছি, ডাকাতরা আগে প্রতি রাত্রে নরবলি দিয়ে দেবীর হাতে নিত্য নূতন নরমুণ্ড ঝুলিয়ে দিতো। হয়তো আজ আমরা দেবীর হাতে যে মাসংহীন মুণ্ড দেখছি সেটা হচ্ছে এই মন্দিরের শেষ নরবলিরই নিদর্শন!'

নিস্তব্ধ মন্দিরের ছাদের তলায় জেগে উঠলো হঠাৎ কতকগুলো শব্দ!

সুন্দরবাবু সভয়ে একটি লম্ফত্যাগ করলেন। সে-শব্দ শুনে মনে হলো অসীম নিস্তব্ধতা আচম্বিতে যেন জাগ্রত হয়ে মুখরিত হয়ে উঠলো ধ্বনির পর ধ্বনি সৃষ্টি করে।

মহেন্দ্রবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, 'ও কিসের শব্দ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর এখানে নয়! জয়ন্ত, এসো, আমরা সবেগে পলায়ন করি!'

জয়ন্ত একবার হাসলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রকৃতিস্থ হোন্। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে বাসা বেঁধেছে বাদুড়রা। মানুষের সাড়া পেয়ে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, বাদুড়-ফাদুড় আমি জানি না। আমি আর এক মিনিট এখানে থাকতে রাজী নই। এই কি দেবীর মূর্তি? দানবীর মূর্তি তাহলে কী রকম? যেখানে এমন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর এতো হতভাগ্য মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যা-কিছু অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে। জয়ন্ত বনের ভিতরে যে-সব পায়ের দাগ দেখেছে, সেগুলো কখনোই মানুষের পায়ের দাগ নয়। এই মন্দিরের ত্রিসীমানায় মানুষ আসতে পারে না। এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

জয়ন্ত বললো, 'এখানে আমাদের আর কিছু দেখবার নেই! চলো, এখনকার মতো এই পর্যন্ত।'

হঠাৎ মন্দিরের কোণ থেকে আর একটা বিশ্রী শব্দ জেগে উঠলো।

সুন্দরবাবু মানিককে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আর তো পারি না, ও-আবার কী?'

মানিক বললে, 'তক্ষক!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমারও আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। জয়ন্তবাবু, আমি এখন বাইরের হাওয়ায় বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়তে চাই।'

জয়ন্ত বললে, 'সেই কথাই ভালো।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর বিপদ

মহেন্দ্রবাবুর ইচ্ছা ছিলো সুন্দরবাবুরা তাঁরই আতিথ্য স্বীকার করেন। সুন্দরবাবু হয়তো তাতে খুশিই হতেন, কারণ সকালের জলযোগের আয়োজনটা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন যে, ওখানে থাকলে দক্ষিণ-হস্তের কর্তব্যটা খুব ভালো করেই পালিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মহেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। কারণ, থানার লোকেরা ইতিমধ্যেই তাঁর জন্যে বাসায় ব্যবস্থা করে রেখেছিলো।

তাঁদের এই নতুন বাসা-বাড়িখানির অবস্থান হচ্ছে গ্রামের অপর প্রান্তে, বড়ো রাস্তার উপরে। বাড়িখানি সরকারী, কোনো রাজকর্মচারী এ-অঞ্চল পরিদর্শন করতে এলে ঐখানেই তাঁরা বাঁধতেন অস্থায়ী বাসা। দোতলা বাড়ি, সব ঘরই সংসারের পক্ষে দরকারী আসবাব-পত্তর দিয়ে মোটামুটি সাজানো। বাড়ির উপরের ঘরে বসলে গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিচালনা করা যায়। এমন কি কালী-মন্দিরের অরণ্য পর্যন্ত চোখের আড়ালে থাকে না।

রতনপুরে তাদের একদিন কাটলো। কালী-মন্দির থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত জয়ন্ত এখানকার মামলা নিয়ে কারুর সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। সে চুপচাপ বসে বা শুয়ে আছে বটে, কিন্তু মনে মনে সর্বদাই যে শনি-মঙ্গলের রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তার মুখ দেখে মানিক এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। সে জানতো জয়ন্ত যখন চিন্তা করে তখন বাক্য উচ্চারণ করে না ; তাই মামলা নিয়ে জয়ন্তের কাছে সেই কোনো কথা তোলেনি।

কিন্তু সুন্দরবাবু এক মিনিটও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। তিনি বারংবার থানায় বা মহেন্দ্রবাবুর ও গ্রামের অন্যান্য লোকের বাড়িতে ছুটোছুটি করছেন ; নানা লোকের মুখ থেকে হত্যা-রহস্য সম্পর্কিত নানা কথা সংগ্রহ করে নিজের ডায়েরির পাতার-পর-পাতা ভরিয়ে ফেলছেন। এবং মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে জয়ন্তের কাছে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছেন, 'হুম্, ভয়ঙ্কর জটিল মামলা! যতোই তদন্ত করছি, রহস্য যেন ততোই বেড়ে উঠছে! যতোই তদন্ত করছি, ততোই যেন অগাধ জলের আরো নিচে তলিয়ে যাচ্ছি!'

জয়ন্ত একটু হাসে, জবাব দেয় না।

মানিক বলে, 'প্রিয় সুন্দরবাবু, আপনি আর বেশি তলাবার চেষ্টা করবেন না। যদি আরো বেশি তলিয়ে যান, আমরা আর আপনাকে টেনে উপরে তুলে আনতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু বলেন, 'আমি তোমাদেরই মুখ চেয়ে বসে আছি নাকি? উপরে ভেসে ওঠবার শক্তি আমার নিজেরই আছে।'

মানিক জোড়হাত করে বলে, 'তাহলে দয়া করে ভেসে উঠে আমাদের চমৎকৃত করে দিন দেখি।'

সুন্দরবাবু বলেন, 'তোমাদের চমৎকৃত করবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। আমি হচ্ছি সরকারী কর্মচারী, এখানে এসেছি সরকারের হুকুম তামিল করতেই।'

মানিক বললে, 'তাহলে করুন আপনি হুকুম তামিল। বারবার ছুটে এসে কানের কাছে বক্‌বক্ করে আমাদের আর জ্বালিয়ে মারবেন না।'

সুন্দরবাবু অসহায়ভাবে জয়ন্তর দিকে ফিরে বলেন, 'দেখো জয়ন্ত, দেখো। মানিক কি রকম শক্ত শক্ত কথা বলছে, শোনো একবার।'

জয়ন্ত আবার হাসে, কিছু বলে না।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে তাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিলো।

সন্ধ্যার সময়ে ইউনিফরম ছেড়ে সুন্দরবাবু নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যে শৌখিন সাজ-পোশাক পরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় জয়ন্ত ডাক দিলে, 'সুন্দরবাবু!'

—'বলো ভায়া।'

—'আজ আমাদের নিমন্ত্রণে যাওয়া হবে না।'

—'সে কি কথা? কেন?'

—'বিশেষ দরকারে আজ আমাদের অন্যত্র যাত্রা করতে হবে।'

—'আমাদের এমন কি বিশেষ দরকার আছে যা আমি নিজেই জানি না?'

—'আজ শনিবার!'

—'হ্যাঁ, সে-কথা আমিও ভুলিনি।'

—'আজ নাকি পাথরের কালী জ্যান্ত হয়ে ওঠেন।'

—'ও-কথাও আমি জানি।'

—'আজ রাত্রে আমরা জীবন্ত দেবী-দর্শনে যাত্রা করবো।'

সুন্দরবাবু চমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'মানে?'

—'আমি তো কোনো দুর্বোধ্য কথা বলছি না। মানেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ নীরবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলেন জয়ন্তর মুখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জয়ন্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মস্তিষ্ক-যন্ত্র মোটেই বিকল হয়নি। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি বুঝতে পেরেছি, শনি-মঙ্গলের রহস্য ভেদ করতে গেলে ঐ-দুই নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে কালী-মন্দিরে গিয়ে হাজির থাকতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ-কথাটা তোমার আগেও আরো দু-জন পুলিশ কর্মচারী বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বুঝেও তাঁদের কি লাভ হয়েছে জানো তো?'

—'জানি। তাঁরা লাভ করেছেন মৃত্যুকে।'

—'জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি কি আমাদেরও নির্বোধের মতো আত্মহত্যা করতে বলো?'

জয়ন্ত ভালো করে সোজা হয়ে বসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমাদের অগ্রবর্তীরা যে-ভুল করেছিলেন, আমরা তা করবো না। প্রথমত, তাঁরা মন্দিরে পাহারা দিতে গিয়েছিলেন একা একা, আর আমরা তিনজনেই যাবো একসঙ্গে। একজোড়া চোখের চেয়ে তিন জোড়া চোখ একসঙ্গে ঢের বেশি কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মন্দিরে যাবার চলতি পথটাই তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বিপদ ওৎ পেতে থাকে ঐ চলতি পথটারই কোনো এক জায়গায়। তাই আমি স্থির করেছি, মন্দিরের পিছনে যে অরণ্য আছে, তারই ভিতর দিয়ে চুপি চুপি আমরা যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হবো।'

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'বাবা, সেও তো এক অসম্ভব ব্যাপার!'

—'কেন?'

—'সে-হচ্ছে নিবিড় অরণ্য, আর আজ হচ্ছে অমাবস্যার রাত, দুনিয়া আজ একেবারেই অন্ধ হয়ে থাকবে।'

—'আমরা সঙ্গে করে টর্চ নিয়ে যেতে ভুলবো না।'

—'বনে থাকে আরো কতো বিভীষিকা!'

—'বিভীষিকাকে ভয় করলে গোয়েন্দাগিরি চলে না সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু পড়ে গেলেন অতিশয় ফাঁপরে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। সহসা বিপদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহ

তাঁর হয় না। আসল বিপদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কেবল জোর-তদন্তের দ্বারাই তিনি কার্যোদ্ধার করতে চান। কিন্তু জয়ন্ত চায় একেবারে বিপদের উপর গিয়ে পড়ে অন্ধকার থেকে বিপদকে বাইরের আলোকে টেনে আনতে। এইখানেই তাঁর সমূহ আপত্তি। কিন্তু জয়ন্তের কাছে কোনোদিনই তাঁর কোনো আপত্তিই টেকেনি, আজও টিকল না।

অবশেষে দুর্বল কণ্ঠে তিনি তাঁর শেষ যুক্তির কথা জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি মহেন্দ্রবাবুর কথা একবারও ভেবে দেখছো না জয়ন্ত। ভদ্রলোক সারাদিন ধরে আমাদের জন্যে হয়তো আজ কতো আয়োজনই করে রেখেছেন, তুমি কি সমস্তই পণ্ড করতে চাও? তাহলে কাল তাঁর কাছে আমরা মুখ দেখাবো কেমন করে?'

—'কাল তাঁর কাছে মুখ দেখাতে আমার একটুও লজ্জা করবে না। তাঁর আয়োজনের চেয়ে আমাদের আজকের কর্তব্যটা হচ্ছে গুরুতর। আপনি কোনো চাকরকে ডেকে এখুনি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে, অত্যন্ত জরুরী দরকারের জন্যেই আমরা আজ তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

মানিক বললে, 'হায় সুন্দরবাবু, হায় রে অদৃষ্ট! কোথায় রইলো ভূরিভোজন, চললুম কিনা শূন্যোদরে অরণ্যে রোদন করতে?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শনিবারের রাত্রি

চিরদিন যেমন আসে, তেমনিভাবে আজও এলো অমাবস্যার কালো রাত্রি পৃথিবীর বুকে কৃষ্ণ যবনিকাপাত করে।

রাত বারোটার ঢের আগেই ঘুমিয়ে পড়লো রতনপুর গ্রাম। তার পথে এবং গৃহে পথিক এবং গৃহস্থের কোনো সাড়াই আর জেগে নেই। সম্প্রতি বিশেষ করে শনি-মঙ্গলবারেই রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে রতনপুরের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়ে যায় কেমন একটা অপার্থিব থমথমে ভাব। সকলেই যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে নূতন কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্যে।

গ্রামান্তরের লোকেরা সন্ধ্যাদীপের শিখা জ্বলবার আগেই তাড়াতাড়ি গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলে এবং চলতে চলতে মাঝে মাঝে সচমকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে যায় কু-বিখ্যাত কালী-মন্দিরের অভিশপ্ত অরণ্যের দিকে। যদিও মন্দিরের বিপদ কোনো দিন গ্রামের মধ্যে আবির্ভূত হয়নি, তবু দোকানীরা সন্ধ্যার খানিক পরেই দোকানে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে সেদিনের মতো ছুটি নিয়ে সরে পড়ে। পঞ্চাননতলায় প্রতিদিন বসতো পরচর্চার এবং তাস-দাবা-পাশার মস্ত আসর। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে চলতো খেলাধুলো, গল্পগুজব এবং হৈ-চৈ। কিন্তু আজকাল রাত ন-টার সময়েই দেখা যায় আসরের ভিতরে আর জনপ্রাণী নেই।

রাত জাগে কেবল গ্রামের ভিতরে কুকুরগুলো এবং গ্রামের বাইরে শৃগালের দল। তারা মানুষের ভাষা বোঝে না, শনি-মঙ্গলের গল্প তাই তারা জানতে পারেনি। এবং তাই থেকে থেকে

বিকট স্বরে চীৎকার করে তারা বিদীর্ণ করে দেয় রাত্রির স্তব্ধতাকে। আর জেগে থাকে শূন্যে বাদুড় ও পেচকের দল—মানুষ, যাদের জানে নিশাচর বিভীষিকার বন্ধু বলে।

কিন্তু রতনপুরের বাসিন্দারা জানে না, গ্রামের বাইরে আজ এখানে রাত জাগছে তিনটি অপরিচিত মনুষ্য-মূর্তি। মাঠের ঘোর অন্ধকারে গা ঢেকে তারা অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলে কালীমন্দিরের পিছনকার অরণ্যের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে।

অরণ্যের মধ্যে সমস্তই একাকার! অন্ধকার এবং অরণ্যের মধ্যে নেই কোনোই পার্থক্য, টর্চ না থাকলে সেই দুর্ভেদ্য তমিস্রার প্রাচীর ভেদ করে এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই।

কোথাও মস্ত বাঁশগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও একাধিক শতাব্দীর প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ চারিদিকে শত শত ঝুরি নামিয়ে বিশাল অরণ্যের মধ্যে যেন আর একটা ক্ষুদ্রতর অরণ্য রচনা করেছে, কোথাও শত শত লতা অনেকগুলো গাছের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত এমন সুদৃঢ় জাল তৈরি করেছে যে অস্ত্রের দ্বারা তাদের ছিন্নভিন্ন না করলে পথ চলা অসম্ভব। কোথাও খাল, ডোবা বা নালা এবং কোথাও বা অরণ্যের নিম্নভূমি পরিণত হয়েছে জলাভূমিতে। এবং সমস্ত স্থান জুড়ে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুপ্সি কাঁটা-ঝোপগুলো। কোনোরকম সাবধানতার দ্বারাই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না—হিংস্র জন্তুর মতো তারা ওৎ পেতে আছে, মানুষকে দংশন করে রক্তাক্ত করে দেবেই। তার উপরে সর্বত্রই বিরাজ করছে সেই একই রকম অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! উপরে অন্ধকার, নিচে অন্ধকার, এ-পাশে ও-পাশে, সামনে, পিছনে, যেদিকে তাকাও দেখবে যেন অনাদি অসীম অন্ধকারকেই! এই অন্ধকার কি অরণ্যের? না এই অরণ্যই হচ্ছে অন্ধকারের?

মিনিট চার-পাঁচ যেতে না যেতেই সুন্দরবাবু ধপাস্ করে মাটির উপরে বসে পড়ে বললেন, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন, আমি আর এগুতে পারবো না!'

মানিক তাঁর দেহের উপরে টর্চের শিখা নিক্ষেপ করে বললে, 'কি হলো সুন্দরবাবু?'

—'হুম্, হবে আবার কি, একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড! চেয়ে দেখো, কাঁটার কামড়ে খালি আমার পোশাক নয়, আমার গা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে! তার ওপরে—ওরে বাপ রে, গেছি রে!' বিকট চীৎকার করে এক লাফে সুন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠে রীতিমতো তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিলেন।

জয়ন্ত বললে, 'ওকি সুন্দরবাবু, অমন ধেই ধেই করে নাচছেন কেন?'

কিন্তু সুন্দরবাবু নাচ থামাবার নাম করলেন না। জয়ন্ত ভাবলে সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছেন।

মানিকও প্রথমটা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। তারপর সে জোর করে সুন্দরবাবুর নাচ থামিয়ে দিতে গেলো।

কিন্তু সুন্দরবাবু থামলেন না। তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, কাঁকড়া-বিছে। আমার ভুঁড়ির উপরে মস্ত একটা কাঁকড়া-বিছে উঠেছে!'

—'কাঁকড়া-বিছে উঠেছে তো অতো নাচছেন কেন?'

—'আমি নাচছি না মূর্খ, আমি লাফাচ্ছি। লাফিয়ে ঝাঁকুনি মেরে বিছেটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছি।'

মানিক আবার সুন্দরবাবুর দেহের উপর টর্চের আলো ফেলে বললে, 'ও তাণ্ডব-নৃত্যে পৃথিবীর মাটি টলে যায়, কাঁকড়া-বিছে কি আর আপনার দেহের উপরে থাকতে পারে!'

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নৃত্য বন্ধ করে নিজের পোশাক ঝাড়তে ঝাড়তে সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখছো তো জয়ন্ত, কেন যে আমি রাতে এই জঙ্গলে আসতে মানা করেছিলুম, এখন বুঝতে পারছো কি?'

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি, আজ রাতে আমরা চুপি চুপি মন্দিরে যাবো ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি এমন ভীষণ চীৎকার করেছেন যে এক মাইলের ভেতর সমস্ত প্রাণীর ঘুম বোধহয় ভেঙে গেছে।'

—'কি করবো বলো ভায়া, বুনো কাঁকড়া-বিছে কামড়ালে আমি কি আর বাঁচতুম? চ্যাঁচাতে হয়েছে নিতান্তই প্রাণের দায়ে।'

—'এখন আমাদের সঙ্গে আসবেন, না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন?'

—'চলো ভাই, চলো! "পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!" চলো ভাই চলো!'

সকলে আবার কোথাও মাথা হেঁট করে, কোথাও কাঁটা-ঝোপকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও বা রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো মন্দিরের দিকে।

সুন্দরবাবু মানিকের কানে কানে বললেন, 'ভায়া, আমার বড্ডো অস্বস্তি হচ্ছে!'

—'কেন, আবার কি হলো?'

—'মনে হচ্ছে কাঁকড়া-বিছেটা নিশ্চয়ই আমার একটা পকেটের ভিতরে ঢুকে বসে আছে!'

মানিক তাঁর জামার পকেট দুটো টিপে টিপে দেখে বললে, 'না সুন্দরবাবু, পকেটে বিছে-টিছে কিছুই নেই!'

সুন্দরবাবু কিছুদূর গিয়ে বললেন, 'উঃ! আমি জীবনে কখনো এমন অন্ধকার দেখিনি! মনে হচ্ছে, এই অন্ধকারের ছোপ লেগে আমাদের সকলেরই গায়ের রঙ কাফ্রীর মতো কালো কুচ্‌কুচে হয়ে যাবে!'

হঠাৎ জয়ন্ত বললে, 'চুপ!'

সকলে নীরবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিক পরে শোনা গেলো অন্ধকারের ভিতরে খানিক তফাতেই একটা শব্দ হচ্ছে। তারপর গাছের ডালপালা নাড়া দিতে দিতে শব্দটা ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগলো।

মানিক বললে, 'বোধ হচ্ছে কোনো একটা জীব এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে!'

জয়ন্ত আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'বোধ হয় ওটা বাঁদর কি হনুমান! আমাদের সাড়া পেয়ে সরে পড়লো!'

সুন্দরবাবু বুকে হাত দিয়ে বুকের দুপ্‌দুপুনি থামাবার চেষ্টা করে বললেন, 'হুম্! হনুমানই হোক আর বাঁদরই হোক, আমাতে আর আমি ছিলুম না! আমি ভেবেছিলুম মা-কালীর সাঙ্গোপাঙ্গদের কেউ বুঝি আমাদের আদর করতে আসছে!'

মানিক বললে, 'কিন্তু ওটা যে কি, ঠিক করে তো বোঝা গেলো না। বাঁদর আর হনুমান কি রাতের অন্ধকারেও চোখে দেখতে পায়? আমারতো বিশ্বাস অন্ধকারে ওরা মানুষেরই মতো অন্ধ!' এই বলেই সে নিজের হাতের জোরালো টর্চ-এর আলো বনের উপর দিকে নিক্ষেপ করলে।

বেশ খানিকটা তফাতে দেখা গেলো, একটা খুব বড়ো গাছের ডালপালায় জেগে আছে সন্দেহজনক চাঞ্চল্য। কিন্তু কোনো জীবের অস্তিত্ব কারুর নজরেই পড়লো না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কারুর কোনো চর কি গাছের উপরে বসে বনের ভিতরে পাহারা দিচ্ছিলো? আমাদের সাড়া পেয়ে সে কি এখন যথাস্থানে খবর দিতে গিয়েছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর ও-সব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। কেউ যদি আমাদের সত্যি সত্যিই দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলে আর উপায় কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উপায় আছে বৈকি! আমাদের এখন উচিত মানে মানে এখান থেকে সরে পড়া—নইলে শেষটা আমাদেরও বিষাক্ত সূচের খোঁচা খেয়ে পটল তুলতে হবে।' তিনি ভীত চক্ষে অন্ধকারের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, জঙ্গলের চারিদিকেই তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো অমানুষিক ছায়াচর, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁদের আক্রমণ করবার জন্যে তারা রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আছে। অরণ্যের দিকে দিকে জ্বলছে, নিবছে, উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে অসংখ্য জোনাকি ; সুন্দরবাবুর মনে হলো ওরাও বিশ্বাসযোগ্য জীব নয়, ওরাও যেন অন্ধকারে আলো জ্বেলে কোনো ভয়ঙ্করের সামনে তাঁদের তিনজনকে দেখিয়ে এবং ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে!

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি বারবার টর্চ জ্বেলো না। আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে আমাদের এই নৈশ অভিযান নয়। আমরা মন্দিরের পাশেই এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। বন এখানে আর ঘন নয়, উপর দিকে তাকিয়ে দেখো, অন্ধকার ওখানে পাতলা। হ্যাঁ, ঐ যে তারাগুলো ওখানে টিপ্ টিপ্ করছে! ও হচ্ছে আকাশ। এদিকটাতেও চেয়ে দেখো, নিশ্চয়ই ওটা কালী-মন্দিরের ছায়া। আর জোরে কথা কওয়া নয়, পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো, চোখ-কান সজাগ রাখো আর হাতে নাও রিভলভার।'

পায়ের তলাকার জমি এমন এবড়ো-খেবড়ো যে, পদে পদে হোঁচট খেয়ে 'পপাত ধরণীতলে' হবার উপক্রম। তখন তিনজনে হাঁটু গেড়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হাত এবং পায়ের সাহায্যে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? সুন্দরবাবুর হাতে পটাস্ করে বিঁধে গেলো কাঁটার মতো কি। তিনি প্রথমটা তাকে বিষাক্ত সূচের খোঁচা মনে করে বিকট কণ্ঠে আর্তনাদ করতে উদ্যত হয়েই আবার নিজেকে সামলে নিলেন অনেক কষ্টে।

এখানটা মনে হচ্ছে মন্দিরের চাতাল। আগাছার জঙ্গল, কোথাও তা তিনফুট-চারফুট উঁচু। তারই ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে তিনজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

ঝিঁঝিপোকাদের অশ্রান্ত আর্তনাদ ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। বাতাসও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে আছে! সেখানেও অন্ধকারের মধ্যে শত শত অগ্নিকণার ইঙ্গিতের মতো শূন্য দিয়ে ছুটোছুটি করছে পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি। এখানকার ভাবটা হয়ে উঠেছে এমন অসাধারণ যে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে যেন এর কোনো কিছুই মেলে না।

হঠাৎ জয়ন্তের পায়ের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলে গেলো যেন একগাছা জীবন্ত মোটা দড়ি! তুষারের মতো কন্‌কনে ঠাণ্ডা তার স্পর্শ! নিশ্চয় সেটা সাপ। কিন্তু জয়ন্ত কোনোরকম চাঞ্চল্যই প্রকাশ করলে না, স্থির হয়ে বসে রইলো নির্বিকারের মতো।

তারপরই অদূরে শোনা গেল বার কয়েক বিশ্রী হিস্‌হিস্ শব্দ!

সুন্দরবাবু শিউরে বলে উঠলেন, 'বাবা, গোখ্‌রো কি কেউটের গর্জন!'

জয়ন্ত নিম্ন অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'চুপ!'

সর্পের গর্জন আর শোনা যায় না, কিন্তু তার পরিবর্তে কোথায় সজাগ হয়ে উঠলো তক্ষকের কণ্ঠস্বর! সে-স্বর যেন ডেকে আনতে চাইছে আসন্ন কোনো অমঙ্গলকে!

তারপরেই মন্দিরের অদূরেই জাগ্রত হলো শৃগালদের বহু কণ্ঠে আর্তনাদের মতো চীৎকার!

এতক্ষণ সেখানটা ছিলো মৃত্যুপুরীর মতো একান্ত নিস্তব্ধ, আচম্বিতে সেখানে উপরি-উপরি এই শব্দের পর শব্দতরঙ্গ অল্পক্ষণের জন্যে অন্ধকার-তরঙ্গকে যেন আলোড়িত এবং ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে আবার নীরব হয়ে গেলো।

সুন্দরবাবু চুপিচুপি কম্পিত স্বরে বললেন, 'জয়ন্ত, এবার আমার সত্যিই ভয় করছে!

জয়ন্ত বললে, 'চুপ!'

মিনিট চারেক সকলে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে সেইখানেই বসে রইলো। মাথার উপরে কালো আকাশ অগুন্তি তারকাচক্ষু বিস্ফারিত করে যেন এই তিনটি প্রাণীর দিকে তাকিয়ে আছে মৌন, বিপুল বিস্ময়ে! মন্দির চূড়ার উপরকার অশত্থ বটের ডালপালার ভিতরে নিদ্রিত বাতাস হঠাৎ একবার জেগে উঠে যেন ঘুমের ঘোরেই আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো একবার!

মানিক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জয়ন্তের গা টিপলে।

সুন্দরবাবুও উৎকর্ণ হয়ে আরো একটু উঁচু হয়ে বসলেন।

সেই তিমিরাবৃত গভীর নীরবতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে আর একটা অভাবিত ধ্বনি! মরা, ঝরা, শুকনো পাতাদের ভিতরে জীবন সঞ্চার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে যেন অতি সাবধানী পায়ের শব্দ!

তিনজনে রুদ্ধশ্বাসে শুনলে, পদশব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে চাতালের ঠিক মাঝখানে এসে থেমে গেলো। খানিকক্ষণ আর কিছুই শোনা যায় না। যেন যে এসেছে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে নিক্ষেপ করছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি! শব্দটা যেখানে এসে থেমেছিলো, অনুমানে মনে হয় সেখানটা জয়ন্তদের কাছ থেকে পনেরো-ষোলো হাতের বেশি দূর হবে না।

মাটির উপরে আবার জাগলো শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি! অন্ধকার ভেদ করে এই নিশাচর অতিথি আবার ফিরে চলে যাচ্ছে! কিন্তু এবারে সে ধীরে ধীরে যাচ্ছে না, এবারে সে ছুটছে রীতিমতো দ্রুতবেগে! সে যেন বুঝতে পেরেছে, এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কোনো গোপন বিপদ!

জয়ন্ত হঠাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে তার 'টর্চ'-এর চাবি টিপলে। তীব্র আলোক রেখার মধ্যে ধরা পড়লো একখানা অদ্ভুত মুখ। পরমুহূর্তেই তিমির-তরঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেলো সেই অপার্থিব মুখখানা।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'ও কে? ও কে? জয়ন্ত, জয়ন্ত? তুমি ওর মুখখানা দেখেছো?'

জয়ন্ত বললে, 'দেখেছি। আর দেখেছি ওর হাতের লম্বা লাঠিগাছা!'

মানিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ও কার মুখ জয়ন্ত, ও কার মুখ? ও মুখ তো মানুষের মুখ নয়?'

জয়ন্ত সহজ ভাবেই বললে, 'ও মুখ মানুষের হোক আর অমানুষেরই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের ভয়ে ঐ মুখের অধিকারী যে পলায়ন করেছে এইটেই হচ্ছে ভাববার কথা। আজ আমাদের পণ্ডশ্রম হলো, এই অন্ধকারের রাজ্যে ওকে আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

সুন্দরবাবু কাতর স্বরে বললেন, 'জীবনে আমি ও-রকম অসম্ভব মুখ আর কখনো দেখতেও চাই না। আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্তাক্ত জয়ন্তের কাহিনী

পরদিনের প্রভাত।

সূর্য জানলা-পথে ঘরের ভিতরে এসে মানিকের চোখের পাতার উপরে কিরণ-অঙ্গুলি বুলিয়ে দিতেই তার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসে ঘরের ওপাশের বিছানার দিকে তাকিয়ে সে দেখলে, জয়ন্ত এর মধ্যে শয্যাত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছে। সুন্দরবাবুর ঘরে জয়ন্তকে পাওয়া যাবে ভেবে সেও শয্যাত্যাগ করে বেরিয়ে সুন্দরবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, 'সুন্দরবাবু! অ সুন্দরবাবু! বলি দাদা, এখনো ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

বদ্ধ দ্বারের ওপাশ থেকে গর্জন স্বরে শোনা গেলো, 'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিই বটে! কাল তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমার যে হাল হয়েছে!'

মানিক বললে, 'দরজাটা একবার খুলেই দিন না দাদা, তারপর আপনার সব ইতিহাস শুনবো তখন!'

'উঃ', 'আঃ' প্রভৃতি আর্তধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দরজার খিলটা খুলে দিলেন সুন্দরবাবু।

মানিক দেখলে সত্য সত্যই তাঁর অবস্থা দস্তুরমত শোচনীয়। তাঁর মুখ, হাত, পা এবং দেহের যেখানেই চোখ বুলানো যায় সেইখানেই নজর পড়ে, ছোট বড় মলমের পটির পর পটি।

মানিক বললে, 'একি ব্যাপার সুন্দরবাবু?'

—'আবার ইয়ে করা হচ্ছে, ব্যাপার কি বুঝতে পারছো না বুঝি? জঙ্গলে যত কাঁটা ছিল, সব এসে বাসা বেঁধেছে আমার দেহে! কাল কি আর ঘুমিয়েছি? যেটুকু রাত বাকি ছিলো, কেটে গেছে এই পটি লাগাতে লাগাতে!'

মানিক বললে, 'আমার দেহও অবশ্য অক্ষত নেই, কিন্তু আপনার মতো দুরবস্থা তো আমার হয়নি? আপনার দেহখানি শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে যে!'

সুন্দরবাবু গজ্‌গজ্‌ করতে করতে যেন আপন মনেই বললেন, 'বনবেড়ালেরা বনে বেড়ালেও কাঁটাগাছ তাদের কিছুই করতে পারে না। আমি হচ্ছি শহুরে সভ্য মানুষ, আঁধার রাতে বনে বনে দাপাদাপি করে বেড়ানো আমার কি পোষায়? হুঃ!'

—'কিন্তু জয়ন্ত কোথায় গেলো বলুন দেখি?'

—'কেন? সে কি ও-ঘরে নেই?'

—'না।'

—'ভারি আশ্চর্য তো! এত ভোরে উঠে সে কোথায় যেতে পারে?'

—'আমিও তো তাই ভাবছি!'

—'হুম্, সে আবার সেই সর্বনেশে মন্দিরে যায়নি তো?'

—'যেতেও পারে, তার কথা কিছুই বলা যায় না!'

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'বাপ্ রে, রাতের বেলায় আমি আর কখনো ও-মুখো হচ্ছি না!'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আবার জিজ্ঞাসা করছো, কেন? কখনো না, কখনো না! চাকরি যদি যায় তাও ভালো, তবু আমি আর কখনো সেখানে যাবার নাম মুখে আনবো না!'

—'তুচ্ছ কাঁটা-ঝোপের জন্যে এতো ভয়!'

—'কাঁটা-ঝোপের জন্যে নয় হে, কাঁটা-ঝোপের জন্যে নয়।'

—'তবে?'

—'ভূতের ভয়ে!'

—'ভূত?'

—'হ্যাঁ, ভূত ছাড়া আর কি বলতে পারি? টর্চ-এর আলোতে এক মুহূর্তের জন্যে যে মুখখানা আমরা দেখেছিলুম, তার কথা মনে আছে? তুমিও দেখেছো তো?'

মানিক একটু ইতস্তত করে বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মুখখানা অমানুষিক বটে, কিন্তু ওর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারি না।'

—'তোমরা মচ্‌কাবে কিন্তু ভাঙবে না, ঐ তো তোমাদের দোষ!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, চিরকালই শুনে আসছি ভূত দেখলে মানুষ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ দেখে ভূত যে পালিয়ে যায়, এমন কথা কখনো শুনেছেন কি?'

সুন্দরবাবু খানিক্‌ক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'মানিক, তোমার এ-যুক্তিটা আমারও মনে লাগছে বটে, কিন্তু এটাও তো হতে পারে, সে আমাদের দেখে পালিয়ে যায়নি?'

—'তবে কাকে দেখে পালিয়ে গেছে?'

—'আলো দেখে। যারা ভূত নামায়, টেবিল চালায়, তাদের মুখে শুনেছি ভূতেরা আলো সহ্য করতে পারে না। তারপর ঐ বুনো ভূতটা আবার যে সে আলো দেখেনি, তার চোখ ঝল্‌সে গেছে টর্চ-এর তীব্র আলোর ধাক্কায়। জয়ন্ত ছোকরা টর্চ জ্বেলে বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। সে টর্চটা না জ্বাললে ভূত বেটা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে যো পেয়ে বোধহয় আমাদের সকলকেই বধ করতো।'

মানিক হেসে বললে, 'তাহলে আপনি বনে যেতে আর ভয় করছেন কেন?'

—'ও বাবা, ভয় করবো না? কেন ভয় করবো না শুনি?'

—'ভূত তাড়াবার তো খুব সুন্দর উপায় আপনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন! ভূত দেখলেই আলো জ্বালবেন।'

সুন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা অতো সহজ নয় মানিক! ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা করতে আমি রাজী নই। এই ভূতুড়ে মামলার ভার আমি ছেড়ে দেবো বলে মনে করছি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমার কি ইচ্ছা জানেন? এই বিচিত্র রহস্যের ভিতরে আরো ভালো করে প্রবেশ করবার জন্যে আমার মনে জেগে উঠেছে বিষম আগ্রহ। কে এই খুনের পর খুন করছে? প্রতি শনি ও মঙ্গলবারের রাত্রে কে ঐ মন্দিরের আনাচে-কানাচে, ঐ বনের সাপ আর বাঘের সঙ্গে হিংস্র রক্তলোভী জন্তুর মতো পাহারা দিয়ে বেড়ায়? কেন সে বিনা কারণে নর-হত্যা করে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এইসব হত্যার ভিতরে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না বলেই তো আমি হতাশ হয়ে পড়েছি! আর সেইজন্যেই তো মনে হচ্ছে এ-সব হয় ভূতুড়ে কাণ্ড, নয় দৈবী লীলা!'

—'সুন্দরবাবু, আর একটা কথা মনে রাখবেন। অপরাধতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন, সব অপরাধের ভিতর থেকেই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যায় না। এমন অনেক হত্যাকারীর কথা শোনা গিয়েছে, যারা কেবল হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। এর একটা বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইংরেজ হত্যাকারী জ্যাক্ দি রিপার। হত্যা করে তার কোনই লাভ হোত না, আর সে পুরুষকেও হত্যা করতো না, কিন্তু একেবারে অকারণেই নারীর পর নারীকে হত্যা করতো। মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলেন, এই শ্রেণীর হত্যাকারীরা বিশেষ এক রকম উন্মাদগ্রস্ত। অন্য সব বিষয়েই তাদের হাবভাব আচার-ব্যবহার ঠিক সাধারণ মানুষের মতো, কেবল হত্যা করবার সুযোগ দেখলেই তারা আর আত্মসংবরণ করতে পারে না। কে বলতে পারে কালী-মন্দিরের এই মামলাটার ভিতরে সেই রকম কোন হত্যাকারীর হাত আছে কি না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু কালী-মন্দিরে আমরা যাকে দেখেছি সেই-ই যদি হত্যাকারী হয়, তাহলে তো তোমার এ সব যুক্তি কোনই কাজে লাগবে না!'

—'কেন?'

—'যাকে আমরা দেখেছি, আমি কিছুতেই তাকে মানুষ বলে স্বীকার করবো না। কারণ সে-রকম বিভীষণ মুখ নিয়ে কোন মানুষই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি!'

—'কিন্তু তাকেই আপনি হত্যাকারী বলে মনে করছেন কেন?'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'মনে করবো না?'

—'না করতেও পারেন!'

—'তুমি এ-কথা বলছো কেন!'

—'যাকে আমরা দেখেছি সে হত্যাকারী না হতেও পারে।'

—'তুমি কী বলছো হে?'

—'হয়তো যাকে আমরা দেখেছি সে হচ্ছে কোন উন্মাদগ্রস্ত বাজে লোক, রাত-বেরাতে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই তার স্বভাব, হয়তো কোন ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে তার মুখ হয়ে গেছে অমন ভয়ানকভাবে বিকৃত! কে বলতে পারে, আসল হত্যাকারী এখনো এই গভীর রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে নেই?'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'মানিক, তোমাকে প্রশংসা করতে আমি বাধ্য, তুমি আমার সামনে একটা নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়ে দিলে। ঠিক বলেছো! ঐ মন্দিরের আশেপাশে ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ নয়, কোন বিকৃত মুখ উন্মাদগ্রস্ত মানুষ থাকলেও থাকতে পারে। আর তার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো আর কোন মানুষ-অপরাধীই এইসব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করছে!'

এই রকম সব কথাবার্তা কইতে কইতে আরো খানিকক্ষণ কেটে গেলো।

তারপরই সিঁড়ির উপরে জাগলো পদশব্দ!

মানিক বললে, 'জয়ন্ত আসছে। ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি।'

পদশব্দ সিঁড়ি পার হয়ে দরজার সামনে এসে থামলো, তারপর দেখা গেল জয়ন্তকে।

জয়ন্তের মুখ, জামা, কাপড় সমস্তই রক্তে আরক্ত। কিন্তু তার ওষ্ঠাধরে বিরাজ করছে রহস্যময় হাস্যের লীলা!

মানিক তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভীত ও বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়! জয়! তোমার এ কী চেহারা? তুমি কোথায় ছিলে? তোমার এমন দশা করেছে কে?'

জয়ন্ত ঘরের ভিতর ঢুকে এক জায়গায় বসে পড়ে বললে, 'মানিক, চিন্তিত হয়ো না। রক্তের আতিশয্য দেখছো বটে, কিন্তু ভগবানের দয়ায় আঘাত আমার বেশি লাগেনি, খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গিয়েছে মাত্র!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'জয়ন্ত, এই অবস্থায় তোমায় দেখে আমি যে কি বলবো, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার কিছুই বলবার দরকার নেই সুন্দরবাবু! এইবার বলবার পালা হচ্ছে আমার।'

মানিক জয়ন্তের কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'জয়, আগে তোমার রক্ত ধুয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দি' এসো।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আগে আমার সব কথা শোনো। আমি বলছি, আমার বিশেষ কিছুই হয়নি।'

মানিক বললে, 'বেশ, তুমি যা ধরবে তা ছাড়বে না জানি। তাহলে আগে তোমার কথাই বলো।'

জয়ন্ত বলতে লাগলো, 'মানিক, তুমি কিছু মনে করো না। তোমাকে কোন কথা না বলেই আমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলুম! আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কালকের রাত্রের ব্যাপারের পর মানুষের দেহের অবস্থা যে কি রকম হয়, সেটা আমার ধারণাতীত নয়। সেই জন্যেই তোমাকে বিশ্রাম করবার অবসর দিয়ে আবার আমি বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলুম। কোন রকম বিপদের ভয় আমি করিনি, কারণ কালকের ব্যাপারের পর আমি মনে করতে পারিনি যে, আর কোনো রকম নতুন বিপদের আশঙ্কা আছে। আমার মনে ছিলো কতকগুলো খট্‌কা। কাল রাতে যে চেহারা দেখেছিলুম, তাতে এখানকার ঘটনাগুলোকে অলৌকিক বলে মনে করবার কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেই অপার্থিব মূর্তির হাতে ছিল একগাছা লম্বা লাঠি, এ-কথা তোমাদের মনে আছে তো? আর একটা কথাও নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ আছে, প্রথম দিন ঘটনাস্থলে এসেই আমি মাটির উপরে আবিষ্কার করি এমন কোন মানুষের পদচিহ্ন যার হাতে ছিলো একগাছা ফাঁপা লাঠি বা চোঙের মতো কোনো জিনিস।

কালকে রাতের সেই অমানুষিক মূর্তিটাকে আমিও হয়তো অমানুষিক বলেই ধরে নিতে পারতুম, যদি তার হাতে সেই লম্বা লাঠিগাছা না থাকতো। আমি এক দৃষ্টিতেই দেখে নিয়েছিলুম, সেই লাঠিগাছা সাধারণ লাঠির মতো নয়, লাঠির মতো দেখতে সেটা হচ্ছে অন্য কোন রকম জিনিস।

জেগে উঠেছিলো আমার কৌতূহল। মানিক, তাই তুমি যেই ঘুমিয়ে পড়লে, আমি তোমার ঘুম ভাঙাবার কোন রকম চেষ্টা না করে শেষ-রাতেই আবার বেরিয়ে পড়লুম। এখান থেকে ঘটনাস্থলে যেতে না যেতেই পূর্বদিকের আকাশে ফুটে উঠলো উষার রাঙা হাসির লীলা।

তারপর আবার সেই মন্দিরের চাতালে গিয়ে দাঁড়ালুম, আবার দেখলুম একটা কেউটে সাপকে, আমাকে দেখেই সে কালো বিদ্যুতের মতো চাতালের আগাছার ঝোপের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে পড়লো বুঝতেও পারলুম না। মন্দিরের চাতালে দ্রষ্টব্য কোন কিছুর সন্ধান না পেয়ে আবার ফিরে এলুম মন্দিরে যাবার সেই পথের উপরে—যেখানে উপর-উপরি তিন-তিনটি নরহত্যা হয়েছে।

তখন সূর্য উঠেছে। পথের উপরে কোন অন্ধকার নেই—যদিও দুই পাশের জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকারকে তার রাজত্ব থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারেনি। কারণ দুপুর বেলাতেও সে-বনের ভিতরে সূর্যের প্রবেশ নিষেধ।

যেখানে পদচিহ্ন দেখেছিলুম, আবার সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সূর্যের আলোক পায়নি বলে সেখানকার মাটি এখনো কাঁচা অবস্থাতেই আছে। প্রথম দিনেই সেখানকার মাটির উপরে কতকগুলো পায়ের দাগ ছিল; সেটা আমি গণনা করেছিলুম। কিন্তু আজ আমি দেখলুম সেখানে অনেকগুলো নতুন পায়ের ছাপ পড়েছে। তার মানে, কাল শনিবারের রাতে এখানে এসে আবার কোন লোক অপেক্ষা করেছিলো। শুধু পায়ের দাগ নয়, সেই সঙ্গে পেলুম পায়ের দাগের পাশে আবার ফাঁপা লাঠি বা চোঙের মতো কোন জিনিসের চাপ।

তারপরেই আমার কি মনে হলো জানো? মনে হলো কোন অদৃশ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে আমার পানে তাকিয়ে আছে! তৎক্ষণাৎ সচমকে রিভলভার বার করে এদিকে-ওদিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু কারুকে দেখতেও পেলুম না, কারুর সাড়াও পেলুম না। সেখানকার জঙ্গল এমন ঘন যে, প্রভাতেও মনে হলো আমি যেন রাত্রির অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে আছি।

কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার চললুম মন্দিরের দিকে। কিন্তু যেতে যেতে সন্দেহ জাগলো, আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো কেউ পাশের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। হাতের রিভলভার প্রস্তুত রেখেই আমি অগ্রসর হলুম—কোনদিকে বনের পাতাও যদি একটু কাঁপে তখনি সেইখানে গুলি ছুঁড়বো বলে। কিন্তু পথের উপরে রিভলভার ব্যবহার করবার কোনই দরকার হলো না।

ভাবলুম অদৃশ্য শত্রুকে দেখছি আমি মনের ভুলে। তাই আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে চাতাল পেরিয়ে আবার সেই মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

সেই ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার নামে এ-অঞ্চলে এতো সব অসম্ভব বিজ্ঞাপন, অথচ আমি দেখলুম কোন দুরাত্মার কল্পনার আদর্শে জড় প্রস্তরে গড়া কুৎসিত এক দানবী মূর্তি! আমি হিন্দু। আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না যে, যাঁকে আমি মা বলে ভালোবাসি, ভক্তি করি, তাঁর মূর্তি হতে পারে এতো হিংস্র, এত নিষ্ঠুর!

দাঁড়িয়ে ভাবছি, হঠাৎ মন্দিরের তলায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলো বিষম চঞ্চল হয়ে উঠলো! তাদের ডানার ঝট্‌পটানি শব্দে মন্দিরের ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো—মনে হলো যেন তারা কোন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!

উপর দিকে মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, আচম্বিতে মনে হলো মন্দিরের ছাদটার একটা জায়গা কেমন দুলে দুলে উঠলো! পর মুহূর্তে দেখলুম ছাদের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়েছে! তাড়াতাড়ি একদিকে সরে গেলুম—কিন্তু পারলুম না নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা

করতে। মাথার উপরকার ছাদ নিচে নেমে আমার মুখের খানিকটা মাংস আঁচড়ে বার করে নিয়ে গিয়ে সশব্দে মাটির উপরে এসে পড়লো। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি দেখে নিয়েছি যে, তোমাদের ঐ ডাকাতে-কালীর মূর্তি বোধহয় ছাদের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মনে হলো সমস্ত মন্দিরটা এখনি ধসে পড়বে। বিদ্যুৎবেগে বাইরের সেই চাতালে এসে দাঁড়ালুম। তারপর লক্ষ্য করলুম, মন্দিরের ছাদের খানিকটা অংশই ভেঙে পড়েছে। যখন ভাবছি এর কারণ কি, তখন হঠাৎ শুনলুম মন্দিরের পিছনকার অরণ্যে একটা সন্দেহজনক শব্দ। যেন কে তাড়াতাড়ি ছুটে গভীরতর অরণ্যের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। নিজের রক্তের আস্বাদ পেয়েছি, বুঝতে পারছি আমার মাথার উপর থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। তখনো আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিনি—ভাবলুম, হয়তো আমি আর বাঁচবো না—কিন্তু দেখে নেবো কে এখান থেকে ছুটে ওদিকে চলে যাচ্ছে। তড়িৎবেগে এ-কথাটাও মনে হলো, ওখান দিয়ে যে ছুটে চলে যাচ্ছে, আমার মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়বার কারণ হচ্ছে সেই-ই!

ঝোপঝাপের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আমিও তীরের মতো সেইদিকে ছুটে চললুম! এবং যেতে যেতেই আমার এই 'অটোমেটিক' রিভলভার থেকে গুলিবৃষ্টি করতে লাগলুম ঘন-ঘন।

কিন্তু বিফল হলাম আমি! যাকে ধরবার বা মারবার চেষ্টা করছিলুম তাকে পারলুম না ধরতে বা মারতে। তারপর আর কোনো কথাই বলবার নেই। হতাশ ভাবে আবার এখানে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মঙ্গলবারের রাত্রি

আজ মঙ্গলবারের প্রভাত।

সুন্দরবাবু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করছেন একখানি সংবাদপত্র এবং জয়ন্ত ও মানিক আপন আপন আসনে বসে শ্রবণ করছে। এমন সময় এসে হাজির হলেন মহেন্দ্রবাবু। এসেই বললেন, 'সব খবর শুনেছেন বোধহয়?'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর?'

—'সেই অপয়া কালী-মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়েছে? তবে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন? শিবের মূর্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু সেই ডাকাতে-কালীমূর্তির বিশেষ কোনোই ক্ষতি হয়নি!'

জয়ন্ত বললে, 'তাই নাকি?'

এতক্ষণ পরে মহেন্দ্রবাবু ভালো করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। চমকে উঠলেন, 'একি জয়ন্তবাবু, একি! আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন?'

জয়ন্ত একটু হেসে বললে, 'একটা দুর্ঘটনায় মাথায় কিছু চোট লেগেছে।'

—'বলেন কি!'

—'ব্যস্ত হবেন না, বিশেষ কিছুই নয়। সামান্য আঘাত।'

— কালী-মন্দির ভেঙে পড়ার কথা আজ সকালেই আমি শুনেছি। ওদিকে তো কোন লোক পা বাড়াতে সহজে ভরসা করে না! আজ সকালে একটা রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে যে, কালী-মন্দিরের উপর দিকটা নাকি একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে। তাই শুনে লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখলুম রাখাল মিথ্যা বলে নি। মন্দিরের ছাদের খানিকটা গাছপালা-সুদ্ধ ভেঙে পড়েছে। দেবীর মূর্তিও রাবিশের দ্বারা আবৃত। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, অতো রাবিশের চাপেও দেবীমূর্তির বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয়নি! ভেঙে গুঁড়ো হয়েছে কেবল শিবের মূর্তির খানিকটা।'

জয়ন্ত ও মানিক পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনই কথা বললে না।

সুন্দরবাবু বললে, 'আপনাদের দেবী বোধহয় এতো সহজে মরতে রাজী নন। তিনি হয়তো আরো নরবলি চান!'

মহেন্দ্রবাবু শিউরে উঠে সভয়ে বললেন, 'আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক্। আমি আজ এখানে কেন এসেছি জানেন?'

—'না বললে জানবো কেমন করে।'

—'আজ রাত্রে আমার ওখানে আপনাদের আহার করতে হবে, নিমন্ত্রণ করলেও আপনারা নারাজ হন, কিন্তু আজ আর কোন আপত্তিই শুনবো না।'

জয়ন্ত বললে, 'মাপ করবেন মহেন্দ্রবাবু। ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে নিমন্ত্রণে যাত্রা করবার শখ আমার নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি মহেন্দ্রবাবু। ঠিক বেছে বেছে শনি আর মঙ্গলবারেই আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন।'

মহেন্দ্রবাবু নীরবে একটুখানি রহস্যময় হাসি হাসলেন।

মানিক বললে, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে, প্রকাশ করে বলবো কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সন্দেহ? কি সন্দেহ?'

—'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন মহেন্দ্রবাবু? শনি আর মঙ্গলবারে আপনি বোধহয় নিমন্ত্রণ করতে আসেন সাংঘাতিক বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্যেই।'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ আপনি বোধহয় চান না শনি আর মঙ্গলবারে কৌতূহলী হয়ে রাত্রিবেলায় আমরা ঐ মন্দিরের কাছে যাই। কারণ, আপনি দেখেছেন, ঐরকম কৌতূহলের ফলে ওখানে গিয়ে এর আগেই তিনজন লোকের জীবন গিয়েছে!'

মহেন্দ্রবাবু লজ্জিতভাবে মৃদু হেসে বললেন, 'মানিকবাবু, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। আগে আমি ঠিক বিশ্বাস করতুম না যে এখানকার প্রবাদের মূলে আছে কোন সত্য, কিন্তু এখন আমার সে-বিশ্বাস আর নেই! আবার যে বেপরোয়ার মতো কেউ ঐ মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে, এটা আমি চাই না। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, তাই, এই পল্লীগ্রামে এসে শেষ-জীবনটা নির্বিবাদে উপভোগ করতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন 'হুম্! আপনার সুবুদ্ধি দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, শনি আর মঙ্গলবারে ও-মন্দিরের নামও আমি আর মনে আনবো না। আজ রাত্রিবেলায় আমি নিশ্চয় আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো! মানিকের কি মত?

মানিক বললে, 'আমারও কোনই আপত্তি নেই।'

মহেন্দ্রবাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু বলছেন, উনি নাকি আমার বাড়িতে যাবেন না।'

জয়ন্ত বললে, 'অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমি একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো। কিন্তু আজ আমার অবস্থা দেখেছেন তো? এ-অবস্থায় নিমন্ত্রণ রাখতে আমি অভ্যস্ত নই।'

—'কিন্তু সন্ধ্যার পরে এখানে একলা বসে থাকতে আপনার ভালো লাগবে?'

—'আপনি যদি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে আজকের সন্ধ্যাটা আমি একলা বসে অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবো।'

—'বলুন, কি অনুরোধ?'

—'আপনার সেই বিলাতী বর্মটি যদি দয়া করে আজ আমার এখানে পাঠিয়ে দেন, তাহলে একলা থাকতে আমার কোনই কষ্ট হবে না।'

—মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বললেন, 'সে বর্মটা নিয়ে আপনি কি করবেন?

—'সেই বর্ম আর শিরস্ত্রাণের কলকব্জাগুলি আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ভারতবর্ষের অনেক রকম প্রাচীন বর্ম পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু বিলাতী বর্ম পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। নতুন কিছু পেলেই তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবার জন্যে আমার মনে জেগে ওঠে আগ্রহ। আপনি কি আমার এ অনুরোধটি রক্ষা করতে পারবেন?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো! আজ বৈকালেই বর্মটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

—'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!'

—'আমি ধন্যবাদের ভিখারী নই জয়ন্তবাবু, আপনারা তুষ্ট হলেই আমি হবো আনন্দিত। তাহলে সুন্দরবাবু, মানিকবাবু, অন্তত আপনারা আজ সন্ধ্যার পর আমার দীনধামে পদার্পণ করতে রাজী আছেন তো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে গেলো মাসেই ডিস্‌পেপশিয়া রোগ থেকে কোনরকমে আমি আত্মরক্ষা করেছি, ভোজ্য দ্রব্যের তালিকাটা বেশি দীর্ঘ না হলেই বাধিত হবো।'

মহেন্দ্রবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এই পল্লীগ্রামে দীর্ঘ তালিকার কথা ভেবে আপনার চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই! ছোটখাটো ভাজাভুজির কথা ছেড়ে দিন, তার ওপরে আমি আয়োজন করেছি যৎসামান্য! এই দু-একখানা 'ওমলেট', দু-একখানা মাছের 'ফ্রাই', দু-একখানা 'ফাউল কাটলেট', আর 'ফাউল রোস্ট', দু-চারখানা লুচি আর যৎকিঞ্চিৎ পোলাওয়ের আয়োজন করেছি, আশা করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না?'

সুন্দরবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ফাউলে আমার কোন আপত্তিই নেই। ডাক্তার আমাকে রোজই ফাউল খেতে বলেছেন। ফাউল নাকি পেটে পড়লেই হজম হয়ে যায়।'

মানিক সুন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। সুন্দরবাবুর ভয় হলো, পাছে সে আবার কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে! কিন্তু মানিক এ-যাত্রা তাঁকে মুক্তি দিলে, বাক্যবাণের দ্বারা আঘাত করবার কোনই চেষ্টা করলো না!

মহেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সুন্দরবাবুর সঙ্গে মানিক যখন বাসায় ফিরে এলো, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

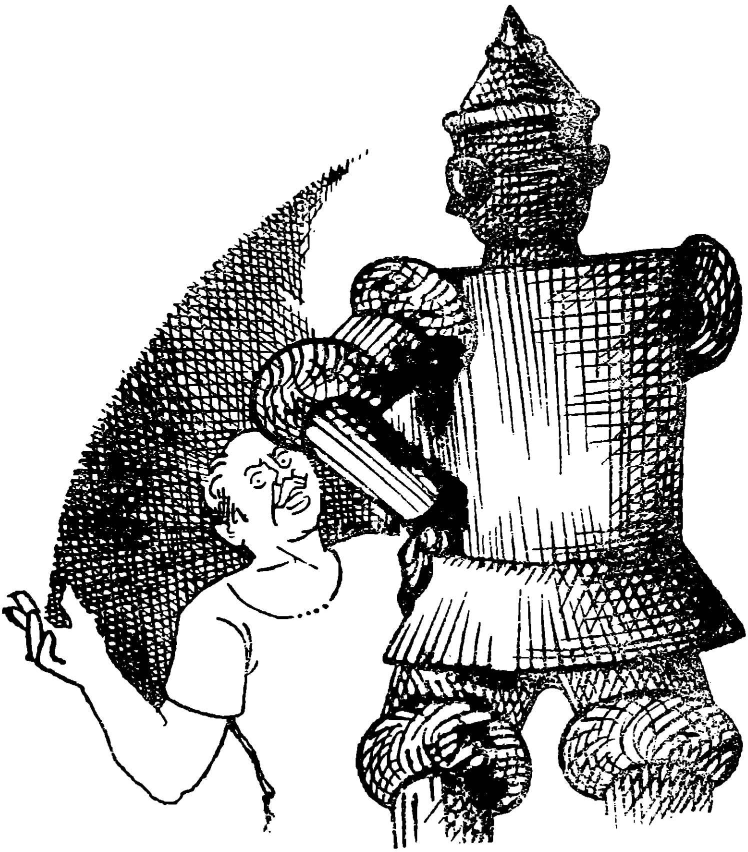

কিন্তু দোতলায় উঠে জয়ন্তের পাত্তা পাওয়া গেলো না। তার শয্যা শূন্য।

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঞ্চিত করে বললেন, 'হুম্! এর মানে কি?'

মানিক জানতো জয়ন্তের অভ্যাস। সে কখন কি করে কাকপক্ষীও টের পায় না। বিনা কারণে জয়ন্ত অদৃশ্য হয়নি নিশ্চয়ই! অতএব সে নিশ্চিন্ত ভাবেই বললে, 'জয়ন্ত বোধহয় একটু বেড়াতে গিয়েছে। আসুন আমরা শুয়ে পড়ি।'

সুন্দরবাবুর চক্ষু তখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছিলো। চারখানা 'ওমলেট,' আটখানা মাছের 'ফ্রাই', গোটা দশ-বারো চপ-কাটলেট, দুটো 'ফাউল রোস্ট', ষোলখানা লুচি এবং এক থালা পোলাও খাবার পর কোনো মানুষই বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। অতএব তিনি আর বাক্য ব্যয় না করে জামাকাপড় বদলে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

গভীর রাত্রে হঠাৎ সুন্দরবাবুর ঘুম গেলো ভেঙে। ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে তিনি শুনলেন, তাঁর ঘরের দরজার বাহির থেকে কে যেন ঘন-ঘন কঠিন আঘাত করছে। যেন ঠোকাঠুকি হচ্ছে কাঠে লোহায়!

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিদ্রাজড়িত চক্ষে আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিয়েই তিনি বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন।

বিষম ভারী ভারী লৌহময় পা ফেলে ভিতরে এসে ঢুকলো, ভয়াবহ এক মূর্তি।

বিস্ময়ে এবং ভয়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে যত পিছিয়ে আসেন, মূর্তি ততই এগিয়ে আসে তাঁর দিকে!

অবশেষে সুন্দরবাবু মহা চিৎকার করে ডাকতে বাধ্য হলেন, 'মানিক! মানিক! মানিক!'

কিন্তু ইতিমধ্যেই মানিকেরও ঘুম গিয়েছিল ভেঙে। সেও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে বললে, 'কি হয়েছে সুন্দরবাবু? ব্যাপার কি?'

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে সুন্দরবাবু হাত তুলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'চেয়ে দেখ মানিক, চেয়ে দেখ! মহেন্দ্রবাবুর সেই বর্মটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! এ আমরা কোন্ দেশে এলুম রে বাবা, এখানে সবই অলৌকিক।'

জীবন্ত বর্ম তার শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেললে এবং তারপরই আত্মপ্রকাশ করলো জয়ন্তের সুপরিচিত মুখ।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'তুমি? জয়ন্ত!'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মৃত বর্মের ভিতরে আমি হচ্ছি জ্যান্ত জয়ন্ত! এখনো আর কোনো সন্দেহ আছে নাকি?' এই বলে জয়ন্ত একে একে বর্মের অন্যান্য অংশগুলো নিজের দেহের উপর থেকে খুলে ফেলতে লাগলো।

মানিক এতক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিল জয়ন্তের দিকে। এখন দু-পা এগিয়ে এসে বললে, 'জয়, এ আবার কি ব্যাপার? তোমার একি অদ্ভুত শখ? এই নিশুত রাতে ঐ সেকেলে ভারী বর্মটা পরে কোথায় তুমি বেড়াতে গিয়েছিলে?'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললে, 'ডাকাতে কালীর ভাঙা মন্দিরে!'

—'আবার তুমি সেখানে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ মানিক।'

—'কিন্তু কেন?'

'আজ যে মঙ্গলবারের রাত্রি! আজ নাকি ডাকাতে কালী জাগ্রত হন, এ-কথা কি ভুলে গিয়েছ?'

মানিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ঐ বিপজ্জনক জায়গায় বারবার কেন তুমি একলা যাতায়াত করছো? এরকম দুঃসাহস অত্যন্ত অন্যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি নিশ্চিন্ত হও! আমার দুঃসাহসের মধ্যে সুযুক্তির অভাব নেই। এই সেকেলে বর্মটা একালেও দুর্ভেদ্য। তার উপরে আমি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য নিতেও ভুলিনি। অনেক ভেবে-চিন্তেই আজ আবার আমি মন্দিরের দিকে গিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বল কি হে, ঐ ভারী বর্মটা পরে হাঁটতে তোমার জিভ বেরিয়ে পড়েনি?'

—'না, জিভ আমার মুখের ভিতরেই ছিল। যে বর্ম পরে মানুষ একদিন যুদ্ধযাত্রা করতে পেরেছে, সেটা পরে আজ আমিই বা মন্দিরে যাত্রা করতে পারব না কেন? আমিও কি মানুষ নই?'

—'সেখানে গিয়ে আজও নতুন কিছু দেখতে পেয়েছ নাকি?'

—'তা পেয়েছি বৈকি!'

মানিক আগ্রহ ভরে বললে, 'আজ আবার কি দেখেছ জয়ন্ত?'

জয়ন্ত বলতে লাগল ঃ

'গোড়া থেকেই সব শোনো। বর্মটাকে আমি কোন বাজে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিইনি। আমার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই স্থির হয়ে ছিল।

তোমরা চলে যাবার পর আমি বেশ খানিকক্ষণ এইখানে বসেই অপেক্ষা করলুম। তারপর বর্মটাকে পরে যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম, আকাশ-পট থেকে অদৃশ্য হয়েছে তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রকলা। কিন্তু চাঁদ অস্ত গেলেও শনিবারের রাত্রির মতো আজকের পৃথিবীও তেমন অন্ধকারের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল না।

কিন্তু মন্দিরের কাছটা আজকেও তেমনি পৃথিবী-ছাড়া একটা অভিশপ্ত স্থানের মতো দেখাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রধান পথটার উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলুম, আজ এই বিপজ্জনক পথ দিয়েই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবো। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রিভলভারটাকে আমি বাগিয়ে ধরলুম। বলা বাহুল্য, আমার আপাদমস্তক বর্ম ঢাকা থাকলেও আমার দৃষ্টিপথ ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সমস্তই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম—অবশ্য ঐ অন্ধকারে যতখানি স্পষ্ট দেখা সম্ভবপর।

তারপর সেই সাংঘাতিক জায়গাটার কাছে এসে পড়লুম, যেখানে বারবার মানুষের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে চিরনিদ্রার দেশে।

চারিদিক স্তব্ধ, এমন কি বাতাসও যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে গাছপালাগুলোকে একেবারে নিঃসাড় করে দিলো।

ঠক্ করে একটা শব্দ হলো আমার বর্মের উপরে, বাম দিকে! যদিও আমি কিছুই অনুভব করতে পারলুম না, তবু সেই শব্দ শুনেই আমার বুঝতে দেরি লাগল না যে, একটা কোন জিনিস এসে আঘাত করেছে আমার বর্মকে!

পর মুহূর্তেই 'অটোমেটিক্' রিভলভার থেকে গুলির পর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলুম অরণ্যের সেই নির্দিষ্ট ঝোপের ভিতরে, যেখানে দেখেছিলুম ফাঁপা লাঠির দাগ

এবং পদচিহ্ন। 'টর্চ'-এর আলো জ্বেলেও আজও কারুকে দেখতে পেলুম না, বনের ভিতরে শুনলুম খালি অতি দ্রুত পদধ্বনি।

পায়ের শব্দের দিকে আরো গোটাকয়েক গুলি নিক্ষেপ করে আবার ফিরে পথের উপরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর পথের দিকে আলোকপাত করে খুঁজে পেলুম একটি অতি তুচ্ছ জিনিস। সেই জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আবার আমি বাসায় ফিরে এসেছি।'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে জিনিসটি কি জয়ন্ত?'

সেটিকে দুই আঙুলে ধরে জয়ন্ত নিজের হাতখানা সুন্দরবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—'ওটা তো দেখছি খুব সরু লিক্‌লিকে একগাছা কাঠি!'

—'হ্যাঁ, কাঠিই বটে!'

সুন্দরবাবু ফস্ করে হাত বাড়িয়ে কাঠিটা ধরতে গেলেন।

জয়ন্ত চট্ করে নিজের হাতখানা টেনে এনে বললে, 'সাবধান সুন্দরবাবু, এ-কাঠিটি হচ্ছে কেউটে সাপের মতো বিষাক্ত!'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ি দুলিয়ে পিছন দিকে একটি লম্ফত্যাগ করে বললেন, 'হুম্। বলো কি হে?'

—'হ্যাঁ, সুন্দরবাবু, এটি সাধারণ কাঠি নয়। শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে এখানে তিনজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, এই রকম মারাত্মক কাঠির আঘাতেই।'

সুন্দরবাবু বলেন, 'কাঠি দিয়ে নরহত্যা? বাবা, এমন বেয়াড়া কথাও তো কখনো শুনিনি!'

—'এটাকে কাঠিই বা বলছি কেন? এটা হচ্ছে কাঠের তৈরি বিষাক্ত শলাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপরে খানিকটা টিনের পাতও আছে। আমি মেপে দেখেছি, লম্বায় এটি নয় ইঞ্চি আর এর বেড় হচ্ছে এক ইঞ্চির দশভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রচ্ছন্ন হত্যাকারী এই শলাকা নিক্ষেপ করে আজ আমাকেও দুনিয়া থেকে সরাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার বর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছে তার সে চেষ্টাকে।

আজ আমার উপরে যে আক্রমণ হবে এটা আমি জানতুম, তাই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলুম এই লৌহবর্ম পরিধান করে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যাক্, রহস্যের একদিকটা পরিষ্কার হলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এখানে শনি-মঙ্গলবারে যে কাণ্ডগুলো হয়েছে তার মধ্যে অলৌকিক কিছুই নেই। তবু অনেকগুলো জিজ্ঞাসার কোনই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। ধরো, প্রথম জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কেবল শনি আর মঙ্গলবারেই অপরাধী এখানে নরহত্যা করে কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'অপরাধী যে অন্য অন্য বারেও মানুষ মারতে চায়, সে প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমার মাথার উপরে পড়ো-পড়ো মন্দিরের ছাদটাকে ফেলে অপরাধী যেদিন আমাকে বধ করতে চেয়েছিল সে দিনটা ছিল রবিবার?'

—'তাতো বটে, মনে পড়েছে! কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কোথায়? এইসব হত্যার উদ্দেশ্য কি?'

—'অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলেই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে বিলম্ব হবে না।'

—'তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন করছি। অপরাধী কে? সে তো এখনো অগাধ জলের মকরের মতোন অতলে ডুবে আছে!'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অপরাধী যে কে সে বিষয়েও আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আমার অনুমান সত্য কিনা, কাল সকালেই তা জানতে পারা যাবে। আপাতত চলুন, নিদ্রাদেবীর আরাধনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুম্পিটান

পরের দিন খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠেই সুন্দরবাবু দেখলেন, সাজ-পোশাক পরে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্ত এবং মানিক।

জয়ন্ত বললে, 'আরে মশাই, আপনাকে ডেকে ডেকে আমাদের গলা যে ভেঙে গেল, কিন্তু আপনার নাক-ডাকা যে বন্ধ হতে চায় না কিছুতেই!'

মানিক বললে, 'তুমি ভুল বলছ জয়ন্ত! আমাদের গলা সুন্দরবাবুকে ডাকছিলো, কিংবা সুন্দরবাবুর নাক ডাকছিলো আমাদের, সেইটেই আগে স্থির হোক! ওঃ, ধন্যি সুন্দরবাবু! হিপোপটেমাসের নাকও বোধহয় এমন উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে পারে না।'

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মানিক সক্কাল বেলাতেই তুমি একটা অপয়া জানোয়ারের সঙ্গে আমার তুলনা করছ!'

—'কখ্খনো নয়। হিপোপটেমাস যে একটা অপয়া জীব, আগে সেইটেই আপনি প্রমাণ করুন।'

সুন্দরবাবু শয্যাত্যাগ করে বললেন, 'প্রমাণ আমি কিছুই করতে চাই না। আমার ইচ্ছা, দয়া করে তুমি স্তব্ধ হও!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন এ-সব বাজে কথা আমার ভালো লাগছে না। সুন্দরবাবু, আপনি চটপট হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন।'

—'কেন, কিসের এত তাড়াতাড়ি?'

—'এখান থেকে কলকাতার প্রথম ট্রেন ছাড়ে বেলা আটটার সময়।'

—'তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি?'

—'আমরা সরকারের চাকর নই আমাদের হয়তো কিছুই আসে যায় না, কিন্তু তাড়াতাড়ি না করলে পরে হয়তো আপনাকেই অনুতাপ করতে হবে।'

—'মানে?'

—'কলকাতার প্রথম ট্রেন যখন ছাড়বে, তখন স্টেশনে হাজির থাকা দরকার।'

—'তোমার এ-কথাটাও যেন কেমন হেঁয়ালির মতো শুনতে হলো না?'

জয়ন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রত্যেক কথায় আমি আর এত জবাবদিহি করতে পারবো না। কালকেই আপনাকে বলেছি, আমি যা অনুমান করেছি তা সত্য কিনা আজ পরীক্ষা করে দেখবো। আমি আর মানিক এখন আগেই স্টেশনের দিকে চললুম— কারণ যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। ইচ্ছা করেন তো, আপনি পরে স্টেশনে গিয়ে আমাদের

সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। যদি যান তো, দয়া করে সঙ্গে দু-জন চৌকিদার নিয়ে যেতে ভুলবেন না।'

হতভম্ব সুন্দরবাবু বোকার মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু আপন মনেই বললেন, 'দু-জন চৌকিদার নিয়ে যেতে বললে কেন? জয়ন্ত কি তাহলে রহস্যভেদ করতে পেরেছে? স্টেশনে গিয়ে কারুকে কি গ্রেপ্তার করতে হবে? নাঃ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, জয়ন্ত-ছোকরা পেটের কথা মোটেই ভাঙতে চায় না—ঐ হচ্ছে তার মস্ত একটা দোষ! দেখছি আমারও না গিয়ে উপায় নেই—কিন্তু এ-সব ধুমধাড়াক্কা আমারও আর পোষায় না! ভোরের বেলায় উঠে কোথায় দু-তিন পেয়ালা চা আর জলখাবার খাব, না, ছোটো এখন ঘোড়ার মতো স্টেশনের দিকে! আবার ডবল্‌ চৌকিদার! কেন রে বাবা, হঠাৎ চৌকিদার দরকার হলো কেন? হুম্‌!'

জয়ন্ত ও মানিক স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই ট্রেন এসে হাজির হলো সশব্দে।

মানিক কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, এখনো তুমি আমাকেও কিছু বলনি। ব্যাপারখানা কি? কেন আমরা এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে এলুম?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমিও সুন্দরবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করবার চেষ্টা করো না! ট্রেনের ঐ দিকে ছুটে যাও, আমি যাচ্ছি এইদিকে।'

—'তারপর?'

—'আমরা এখানে দেখতে এসেছি, মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভার কলকাতার দিকে যাবার চেষ্টা করে কিনা! অর্থাৎ সে এখান থেকে পালাতে চায় কিনা!'

দুইজনে দ্রুতপদে দুইদিকে ধাবমান হবার উপক্রম করলে, কিন্তু তার পরমুহূর্তে দু-জনেই দেখতে পেলে, যার অন্বেষণে তারা এখানে এসেছে, মহেন্দ্রবাবুর সেই ড্রাইভারই টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে আবির্ভূত হলো!

জয়ন্ত সানন্দে চুপিচুপি বললে, 'মানিক, আমার অনুমানই সত্য! আমি কালকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, ঐ লোকটা আজ এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। ঐ দেখ, ও-লোকটাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। লক্ষ্য করছ কি, ওর মুখের ভাবটা কি রকম ম্লান হয়ে গেলো! চলো, এখন আমরা ওর দিকেই অগ্রসর হই। ও-লোকটা বোর্ণিওর বাসিন্দা বটে কিন্তু এখানে এসে বাংলা শিখেছে, সুতরাং ওর সঙ্গে কথা কইতে কোন অসুবিধা হবে না। সুন্দরবাবু না আসা পর্যন্ত বাজে কথায় ওকে আটক রাখতে হবে।'

জয়ন্ত ও মানিক সেই লোকটার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'তুমি মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভার না?'

সে বললে, 'হাঁ হুজুর!'

—'তোমার নাম তো আলি?'

—'হাঁ হুজুর!'

—'তুমি এত সকালে স্টেশনে এসেছ যে?'

—'আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

—'কলকাতায়? কেন?'

—'সেখানে আমার জরুরী কাজ আছে।'

—'মহেন্দ্রবাবুর কাজ নয়, তোমার কাজ?'

—'হাঁ হুজুর। আমারই কাজ।'

—'তুমি চলে গেলে মহেন্দ্রবাবুর কোন অসুবিধে হবে না? তাঁর কি আরো ড্রাইভার আছে?'

—'না হুজুর।'

—'তবে!'

—'আমি বাবুজীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি।'

ঠিক সেই সময় শোনা গেল ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাধ্বনি।

আলি তাড়াতাড়ি ট্রেনের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু জয়ন্ত আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো আলি!'

আলি জয়ন্তকে সুমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললে, 'হুজুর, এখন আর কিছু শোনবার সময় নেই। গাড়ি এখুনি ছেড়ে দেবে।'

—'বেশ তো, তুমি পরের গাড়িতে যেয়ো না! তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে।'

—'আমার আর কোন কথা শোনবার সময় নেই হুজুর। পরের গাড়িতে গেলে আমার চলবে না।' আলির চোখে-মুখে ফুটে উঠলো বিদ্রোহের ভাব।

জয়ন্ত এইটেই আশা করছিলো। সে কঠিন কণ্ঠে বললে, 'আলি, তোমাকে পরের গাড়িতেই যেতে হবে! আগে তুমি আমার কথা শোনো।'

আলি ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বাবুজী কি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে চান?'

'যদি বলি তাই চাই?'

হঠাৎ আলির দেহ হয়ে উঠল সোজা এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে গেল তীব্রবেগে!

জয়ন্ত অসতর্ক ছিল না। কিন্তু সে কোন রকম ব্যস্ততাই দেখালে না, অত্যন্ত শান্ত ও সহজ ভাবেই আলির মুষ্টিবদ্ধ হাত দু-খানা নিজের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করে বললে, 'বাপু, এইবারে পারো তো তুমি আমার হাত এড়িয়ে যাও!'

সঙ্গে সঙ্গে আলির হাতের মণিবন্ধের উপরে জয়ন্তের হাতের চাপ লোহার মতো কঠিন হয়ে উঠলো। আমাদের এই জয়ন্তের সঙ্গে আগে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন তার অমানুষিক শক্তির কথা। তার হাতের টানে লোহার গরাদও বেঁকে যায় সীসের দণ্ডের মতো, সুতরাং আলির অবস্থা যে কি রকম হলো, এখানে তা বিশেষ করে উল্লেখ করবার দরকার নেই।

আলি বিকৃত মুখে আর্তস্বরে বললে, 'হুজুর, ছেড়ে দিন!'

—'ছেড়ে দিলে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।'

—'কেন আপনি আমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন হুজুর?'

—'তোমাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

গাড়ি তখন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আলি হতাশ ভাবে বললে, 'গাড়ি ছেড়ে দিলো। বলুন, আপনি কি জানতে চান?'

—'রতনপুরে এসে 'ব্লো-পাইপ' ব্যবহার করছো কেন?'

আলি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, 'কি বললেন হুজুর?'

—'আমি 'ব্লো-পাইপ'-এর কথা বলছি।'

—'সে আবার কি হুজুর?'

—'ও, তুমি বুঝি 'ব্লো-পাইপ'-এর নাম শোনোনি? আচ্ছা, তুমি তো বোর্ণিওর লোক। 'সুম্পিটান'-এর নাম শুনেছো তো?'

—'সুম্পিটান্?'

—'আলি, আমার সঙ্গে ন্যাকামি করো না। বোর্ণিওতে আমরাও গিয়েছি। সেখানে 'সুম্পিটান'-এর নাম জানে না এমন লোক কেউ আছে কি?'

—'হুজুর কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'বেশ, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। 'সুম্পিটান' হচ্ছে সুদীর্ঘ লাঠির মতো একটা জিনিস, যার ভিতরটা হচ্ছে ফাঁপা। তার এক মুখে থাকে অনেক সময়ে বর্শা-ফলক, তাকে তখন অনায়াসেই বর্শার মতো ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তার ভিতরে থাকে সাগুকাঠে তৈরী একটি নয়-দশ ইঞ্চি সূক্ষ্ম শলাকা, আর সেই শলাকায় মাখানো থাকে 'ইপো', গাছের তীব্র বিষ। তার যে-মুখে বর্শার ফলক নেই, সেই মুখে মুখ দিয়ে সজোরে ফুঁ দিলে ভিতরকার শলাকাটি তীর-বেগে বহুদূরে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে। তারপর কোন জীবজন্তুর দেহে গিয়ে সেই শলাকা যখন বিদ্ধ হয়, তখন তার জীবনের কোনো আশাই আর থাকে না। কেমন, এইবারে 'সুম্পিটান' কাকে বলে বুঝতে পেরেছ কি?'

আলি কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নতদৃষ্টিতে।

জয়ন্ত বললে, 'আলি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। আমি বেশ জানি, তুমি এই বিষাক্ত শলাকা ছুঁড়ে তিনজন মানুষকে হত্যা করেছো। তারপর তুমি কালী-মন্দিরের পড়ো-পড়ো ছাদ কোন রকমে ফেলে দিয়ে আমাকেও যমালয়ে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে। কেবল তাই নয়, তারপর তুমি আমাকে লক্ষ্য করেও শলাকা ত্যাগ করেছিলে। কিন্তু আমি আন্দাজে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। সাগুকাঠের সেই শলাকা আমার বর্মের উপরে 'ইপো' গাছের বিষ ছড়িয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আর তার আগেও গেলো অমাবস্যার রাতে মন্দিরের চাতালে দেখেছিলুম তোমার আর এক অপার্থিব মূর্তি। মুর্খ! আমি অতো সহজে ভোলবার ছেলে? আমি বেশ বুঝতে পারছি, সে রাত্রে তুমি মুখে পরেছিলে একটা অতি কদর্য মুখোশ। কেমন, আমি কি ঠিক বলছি না?'

আলি হঠাৎ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাতর স্বরে বললে, 'হুজুর, আপনি যখন সব জানেন, তখন আমাকে আর এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'সব কথা হয়তো এখনো আমি জানতে পারিনি। তাই তোমাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। মিথ্যা উত্তর দিও না, কারণ মিথ্যা উত্তরে আমি ভুলবো না।'

আলি বললে, 'হুজুর, আমার মিথ্যা বলবার ইচ্ছা নেই। আপনি যা করতে চান, করুন।'

—'কেন তুমি এখানে নরহত্যা করো?'

—'সে-কথাও কি বলতে হবে? আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি?'

—'খানিক খানিক বুঝতে পেরেছি বৈকি! কিন্তু এইসব নরহত্যার ফলে তোমার কি লাভ?'

—'বিশ্বাস করুন, আমার কোনই লাভ নেই।'

—'আচ্ছা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করছি। কিন্তু তুমি অপরাধ স্বীকার করছো তো?'

—'অস্বীকার করবার আর তো কোন উপায় নেই হুজুর।'

এমন সময়ে দেখা গেল দুইজনের বদলে চারজন চৌকিদারের সঙ্গে সুন্দরবাবু তাঁর বিপুল ভুঁড়ি নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করছেন অতি দ্রুতপদে!

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে আলিকে দেখেও সুন্দরবাবু প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে দেখছি, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেরেণ্ডা ভাজছ কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আলির সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করছি।'

—'বটে! এখন আমাকে কি করতে বলো?'

—'আপনিও আলির সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করুন না!

—'এইজন্যেই কি আমাকে এখানে আসতে বলেছো?'

—'ঠিক তাই।'

—'এটা কোন্-দেশী ঠাট্টা?'

—'মোটেই ঠাট্টা নয়।'

সুন্দরবাবু কট্‌মট্ করে তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমরা আলির সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই স্টেশনে এসেছি।'

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'মানে?'

—'আলিকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি শনি-মঙ্গলের গুপ্তকাহিনী শুনতে পাবেন।'

—'হ্যাঁ আলি, এ-কথা কি সত্য?'

আলি হেঁটমুখে চুপ করে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'চলুন, আলিকে নিয়ে আমরা মহেন্দ্রবাবুর কাছে যাই। তার কাহিনীটা মহেন্দ্রবাবুকেও শোনানো দরকার।'

আলি সঙ্কুচিত ভাবে বললে, 'বাবুজীর কাছে কি আমাকে নিয়ে না গেলেই নয়?'

—'না। তোমার কীর্তির কথা শুনে তোমার মনিব কি বলেন, সেটাও আমাদের জানা দরকার!'

নবম পরিচ্ছেদ

শেষ-দৃশ্য

জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু প্রভৃতি যখন মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলো, তিনি তখন স্বহস্তে করছিলেন ফুলগাছের সেবা।

জয়ন্তের পানে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবু সহাস্যে বললেন, 'একি, মেঘ না চাইতে জল। আপনি এসেছেন অনাহুত অতিথির মতো!' তারপরেই দলের আর সবাইকে দেখে তাঁর মুখে ফুটে উঠল অধিকতর বিস্ময়ের রেখা।

জয়ন্ত বললে, 'আলিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন বুঝি?'

—'তা একটু হয়েছি বৈকি!'

—'কেন?'

—'আমার কাছে ছুটি নিয়ে আলি আজ সকালের গাড়িতেই কলকাতায় যাবে বলেছিল।'

—'আলির আজ কলকাতায় যাওয়া হলো না।'

—'ও, তাই নাকি?'

—'আলি বোধহয় এ-জীবনে আর কখনো কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পাবে না।'

—'কেমন করে জানলেন?'

—'আলির কাহিনী শুনলে আপনিও ঐ-কথা বলবেন।'

মহেন্দ্রবাবু একবার আলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। আলির মুখে ভাবান্তর নেই।

জয়ন্ত বললে, 'আলি, এইবার তোমার কাহিনী আমরা সবাই মিলে আর-একবার শুনব।'

মহেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে আলিরও এমন কাহিনী আছে যা আমি জানি না? বেশ, বেশ, আমি শুনতে রাজী! কিন্তু আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে—দেখছেন, আমার হাতে লেগেছে মাটি আর কাদা? বাড়ির ভিতরে গিয়ে আগে হাত-দুটো ধুয়ে ভদ্রলোক হয়ে আসি, কি বলেন?'

মহেন্দ্রবাবু প্রস্থান করবার উপক্রম করলেন। জয়ন্ত তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'হাত ধোবার জন্যে অতটা ব্যস্ত হবেন না মহেন্দ্রবাবু।'

মহেন্দ্রবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ-কথা কেন বলছেন!'

—'এখন হাত ধুয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না। কারণ আলির কাহিনী শোনবার আগে আপনাকে আমার কাহিনীও শুনতে হবে।'

—'ও, আপনারও কাহিনী আছে বুঝি? বেশ, হাত ধুয়ে এসে তাও শুনব।'

—'উঁহু!'

—'মানে?'

—'হাত না ধুয়েই আপনাকে আমার কাহিনী শুনতে হবে!'

—'এ যে অভদ্র আবদার!'

—'এখন ভদ্রতা করতে গেলে পরে পস্তাতে হবে।'

—'কী বলছেন!'

—'এখন বাড়ির ভেতরে হাত ধুতে গেলে আপনাকে আর খুঁজে পাবো না!'

—'আমি কি কর্পূর? উপে যাব?'

জয়ন্ত রুক্ষস্বরে বললে, 'আপনার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করতে পারব না। ঐখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কথা শুনুন!'

আচম্বিতে পিছনে একটা গোলমাল উঠল—'পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো! আসামী ভাগ্‌তা হায়!'

জয়ন্ত চমকে পিছন ফিরে দেখলে, বাগানের ফটকের দিকে আলি দৌড় মেরেছে হরিণের মতো এবং তার পিছনে পিছনে ছুটছে চৌকিদাররা, মানিক এবং সুন্দরবাবু!

তারপরেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে মহেন্দ্রবাবুও বেগে ধাবিত হয়েছেন নিজের বাড়ির দিকে! জয়ন্তও তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করতে দেরি করলে না!

মহেন্দ্রবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন—পিছনে পিছনে জয়ন্ত।

মহেন্দ্রবাবু দোতলায় উঠে একখানা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন সশব্দে। বদ্ধ দ্বারের উপরে গিয়ে জয়ন্ত মারলে এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

এক, দুই, তিন ধাক্কার পর দড়াম করে খুলে গেল দরজা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা সোফার উপরে বসে মহেন্দ্রবাবু হাসছেন শিশুর মতো সরল হাসি!

জয়ন্ত তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, অতঃপর?'

—'অতঃপর কি?'

—'অতঃপর ধরা দেবেন, না আরো কিছু কার্দানি দেখাবেন?'

মহেন্দ্রবাবু নীরবে হাসতে লাগলেন।

—'ও হাসি দেখে আমি আর ভুলব না।'

—'কি করবেন?'

—'আপনাকে গ্রেপ্তার।'

—'পারবেন?'

—'গ্রেপ্তার তো করেছি!'

—'না!'

—'এখনো পালাবার আশা রাখেন?'

—'রাখি বৈকি!'

—'বটে!'

—'হ্যাঁ, ঐ দেখুন!'

মহেন্দ্রবাবু মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখলে সেখানে পড়ে আছে একটা খালি শিশি।

—'আপনি বিষ খেয়েছেন?'

—'ঠিক!' মহেন্দ্রবাবু দুই চোখ মুদে সোফার পরে এলিয়ে পড়লেন।

—'মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু!'

ক্ষীণকণ্ঠে ক্ষীণতর হাস্য করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না। এই আমি পালালুম!'

ঘরের ভিতরে যখন সুন্দরবাবু এবং মানিকের আবির্ভাব হলো, মহেন্দ্রবাবু তখন ইহলোকে দেহ ফেলে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছেন।

—'হুম্, মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছ দেখছি!'

—'না, ধরতে পারি নি।'

—'ঐ তো মহেন্দ্রবাবু!'

—'না, ওটা মহেন্দ্রবাবুর মৃতদেহ।'

—'মৃতদেহ!'

—'হ্যাঁ। মহেন্দ্রবাবু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।'

সুন্দরবাবু অবাক!

—'মানিক, আলি ধরা পড়েছে?'

—'পড়েছে। বলে, সে নিজে পালাবার জন্যে পালায় নি, আমাদের অন্যমনস্ক করে মহেন্দ্রবাবুকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই সে নাকি পলায়নের চেষ্টা করেছিল।'

—'খুব সম্ভব সে মিথ্যা বলে নি। মহেন্দ্রবাবু নিজেই বলেছিলেন, আলি এমন প্রভুভক্ত যে তাঁর কথায় সে প্রাণ দিতে পারে। আর এই মামলাটাই আলির প্রভুভক্তি বিশেষভাবে প্রমাণিত করবে। কারণ সে যে মানুষের পর মানুষ খুন করেছে কেবল তার প্রভুর হুকুমেই, এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই!'

সুন্দরবাবু বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'বাপ্ দেখে-শুনে আমার আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে। এ-সব কী! কোথায় ডাকাতে-কালীর মন্দিরে ভৌতিক কারখানা, আর কোথায় এই আলি, আর কোথায় ঐ মহেন্দ্রবাবু! এখনো আমি বুঝতে পারছি না, এগুলোর মধ্যে যোগাযোগ আছে কোথায়! জয়ন্ত, অন্ধকারে তাড়াতাড়ি আলো দেখাও!'

জয়ন্ত বলতে লাগল ঃ

'গোয়েন্দার পয়লা নম্বরের কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমেই সকলকেই সন্দেহ করা।

আমি গোড়া থেকেই মহেন্দ্রবাবুর বড় বাড়ি, মোটর গাড়ি, মোটা ব্যাঙ্কের খাতা আর শিশুর মতো সরল হাসিখুশি-মাখা মুখ দেখে ভুলিনি। আপনার মনে আছে কি, আমার প্রশ্নের উত্তরে মহেন্দ্রবাবু নিজেই বলেছিলেন তাঁর মামাতো ভাই সুরেনবাবুর তিনি ছাড়া আর কোন আত্মীয়ই নেই? আর সুরেনবাবুর মাসিক আয় ছিল যে আট হাজার টাকা সেটাও আপনি শুনেছেন!

আমার অনুমান করতে দেরি লাগল না যে, সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবেন মহেন্দ্রবাবুই। অতএব ধরে নিলুম যে সুরেনবাবুর মৃত্যুতে মহেন্দ্রবাবুরই লাভ হবে সব চেয়ে বেশি। এই মামলায় মহেন্দ্রবাবুর কোন হাত যদি থাকে তাহলে হত্যাকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, গোড়া থেকেই আমি মহেন্দ্রবাবুকে কেন্দ্র করে মামলাটাকে সাজাবার চেষ্টা করেছি মনে মনে।

কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই মামলার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব বলেই বোধ হয়েছিল। কারণ প্রথমত, সুরেনবাবু যখন হত্যাকারীর হাতে মারা পড়েন, মহেন্দ্রবাবু যে তখন অনেক সাক্ষীর সামনে নিজের বাড়িতেই বসেছিলেন, এটা জানতে পারা গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঘটনাস্থলে কেবল মহেন্দ্রবাবুর মামাতো ভাই সুরেনবাবুই নিহত হন নি, পরে আরো দু-জন পুলিশ কর্মচারীকেও সেইখানে প্রাণ দিতে হয়েছে। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির পরেও অকারণে দু-দুজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে তিনি নিজের বিপদ তিনগুণ

বাড়িয়ে তুলতে চাইবেন কেন? তৃতীয়ত, মামলাটার সঙ্গে রয়েছে একটা প্রাচীন প্রবাদ আর অলৌকিক কাণ্ডের সম্বন্ধ। ঐ প্রবাদ মহেন্দ্রবাবুরও জন্মের আগে এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাই এখানকার লোকেরা শনি-মঙ্গলবারের রাতে কখনো ঐ মন্দিরের ছায়া মাড়াতেও ভরসা করত না। উপরন্তু প্রবাদেই প্রকাশ, আগেও নাকি কেউ কেউ শনি-মঙ্গলবারের রাতে প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে ঐ মন্দিরে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

সুন্দরবাবু, আপনি যে-কল্পনাশক্তিকে বরাবরই নিন্দা করে এসেছেন, আর আমি যাকে বরাবরই বলে এসেছি গোয়েন্দার পক্ষে অপরিহার্য, সেই কল্পনাশক্তিকেই প্রাণপণে ব্যবহার করবার চেষ্টা করলুম। গোড়ার দিকে তা প্রকাশ করলে সকলেই যে তাকে উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিতেন, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

মামলাটাকে আমি সাজালুম এইভাবে ঃ

মহেন্দ্রবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকতেও পারেন। তাঁর হুকুমে অন্য কোন লোক গিয়ে নরহত্যা করতে পারে।

হত্যাগুলো যে হচ্ছে কোন অলৌকিক কারণে, সকলের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলবার জন্যে ঘটনাস্থলে হত্যার পর হত্যা করা হয়েছে কেবল দুই নির্দিষ্ট দিনে!

তার ফলে কারুর দৃষ্টি আসল অর্থাৎ প্রথম হত্যার উদ্দেশ্যের দিকে আকৃষ্ট হবে না।

চলতি ও পুরানো প্রবাদটাকে মহেন্দ্রবাবু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অত্যন্ত চতুরের মতো ব্যবহার করেছেন। কালী-মন্দিরের প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করতে গিয়ে আরো কেউ কেউ যে মৃত্যুমুখে পড়েছে খুব সম্ভব এটা হচ্ছে একেবারে বাজে কথা। ও-ভাবে লোকের মৃত্যু রূপকথাতেই শোভা পায়, বাস্তব জীবনে নয়।

কল্পনায় এই যে আমি একটা কাঠামো গড়ে তুললুম, মামলার মধ্যে ভালো করে প্রবেশ করবার পর তা একেবারে অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেজন্যে আমি হতাশ হলুম না। নতুন নতুন বিরোধী সূত্র পেলে আমি আবার কল্পনায় নতুন নতুন কাঠামোই গড়বার চেষ্টা করতুম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রথম কাঠামো হয়নি ব্যর্থ।

এইবার ঘটনাগুলো একবার পরে পরে ভেবে দেখুন। খুব সম্ভব বাইরে ঐশ্বর্যের জাঁকজমক থাকলেও ভিতরে ভিতরে মহেন্দ্রবাবুর অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়েছিল। কারণ তা নইলে কেউ এমন বিপজ্জনক হত্যার পর হত্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না।

অতএব ধরে নিন, অর্থকষ্ট ঘোচাবার জন্যে মহেন্দ্রবাবুর কুদৃষ্টি পড়ল সুরেনবাবুর উপরে—যে সুরেনবাবুর মৃত্যু হলেই তাঁর বিপুল বিত্তের মালিক হবেন তিনিই।

মহেন্দ্রবাবু জানতেন, সুরেনবাবু হচ্ছেন সাহসী, বেপরোয়া আর একরোখা লোক—কোন রকম কুসংস্কারকেই তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, বরং কুসংস্কার যে মিথ্যা সেইটেই দেখিয়ে দিতে চান হাতে-নাতে।

অতএব এক শনিবারের রাত্রে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে হলো সুরেনবাবুর নিমন্ত্রণ। চারিদিকে বহু সাক্ষী—এমন কি একজন পুলিশ কর্মচারীও যখন উপস্থিত, মহেন্দ্রবাবু তখন সুরেন-

বাবুকে উত্তেজিত করবার জন্যে প্রবাদ কাহিনীটিকে উজ্জ্বল ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর কাহিনী শুনলেই সুরেনবাবু প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবেন না। ইতিপূর্বে তাঁর চর ছিল মন্দির-পথে যথাস্থানে গিয়ে হাজির।

মহেন্দ্রবাবু জানতেন হত্যার পরেই ঘটনাস্থলে হবে পুলিশের আবির্ভাব। নিশ্চয়ই বিশেষ করে ঐ দুই নির্দিষ্ট দিনেই পুলিশের লোক যাবে সেখানে তদন্ত করতে। কিন্তু তদন্তে প্রবাদের সত্যতা বজায় রাখবার জন্যে তারা যাতে ফিরে না আসে সে ব্যবস্থাও হলো।

সুন্দরবাবু, আপনি জানেন, পাছে শনি-মঙ্গলের রাতে আমরাও মন্দির-পথে যাই, সেই ভয়ে মহেন্দ্রবাবু বেছে বেছে ঐ দু-দিনেই আমাদের করতেন নিমন্ত্রণ। আমি আন্দাজ করলুম আমাদের মতো বিখ্যাত (আমরা যে বিখ্যাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই) লোকদের প্রবাদের সত্যতা প্রমাণিত করবার জন্যে তিনি যদি হত্যা করতে বাধ্য হন, তাহলে চারিদিকে উঠবে বিষম আন্দোলন—আর সেটা হবে তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই তিনি চেষ্টা করতেন, এই দুই সাংঘাতিক দিনে আমাদের বন্দী করে রাখতে।

যাক্, আমার কল্পনার কথা ছেড়ে দিন, এইবারে বাস্তব জগতে ফিরে আসাই ভালো।

সুন্দরবাবু, আপনি কলকাতায় প্রথম দিন আমার কাছে গিয়ে এই মামলা সম্পর্কীয় যে অলৌকিক আবহের কথা বলেছিলেন, আমি তা মোটেই আমলে আনিনি! তবে আপনার বর্ণনার ভিতর থেকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম একাধিক সূত্র।

আপনি বলেছিলেন, যে-তিনজন লোক নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই দেহের বাম দিকে ছিল ক্ষতচিহ্ন। আর তারা নাকি নিহত হয়েছিল ঠিক একই জায়গায় গিয়ে। তাই থেকেই আমি ধরে নিলুম, মৃত্যুর কারণ এসেছে বাম দিক থেকেই। সেইজন্যেই প্রথম যেদিন আমরা মন্দির-পথের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন আমি আর কোন দিকে না তাকিয়েই একেবারে প্রবেশ করলুম বামদিকের জঙ্গলে। আমার আন্দাজ যে ব্যর্থ হয়নি, এ-কথা আপনি জানেন। জঙ্গলের ভিতরে খানিকটা অগ্রসর হয়েই একজায়গায় দেখতে পেলুম অনেকগুলো পদচিহ্ন। আমি তখনি বুঝতে পারলুম, খুনী অপেক্ষা করে এইখানে এসেই। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে আমি মন্দিরে যাবার পথটা দেখবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম, জঙ্গলের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে সেখান থেকে মন্দির-পথের উপরে অনায়াসেই দৃষ্টি রাখা যায়। আন্দাজে বুঝলুম, এই ফাঁক দিয়েই হত্যাকারী তার মৃত্যু-অস্ত্র নিক্ষেপ করে।

কিন্তু সে অস্ত্রটা কি? প্রত্যেক লাশের বামদিকে পাওয়া গিয়েছে খুব সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন। প্রত্যেক মৃতব্যক্তির দেহে প্রকাশ পেয়েছে বিষের চিহ্ন। সুতরাং বুঝে নিলুম খুনী এমন কোন বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার করে, যার কথা অনুমান করা কঠিন। সে অস্ত্রটা কি? পদচিহ্নগুলোর পাশে-পাশে দেখতে পেলুম অদ্ভুত সব ফাঁপা লাঠির দাগ, এই কি খুনীর অস্ত্র? কিন্তু সে যে কি রকম অস্ত্র অনেক ভেবেও তা আন্দাজ করতে পারলুম না।

তারপর এক শনিবার রাত্রে মন্দিরের চাতালে গিয়ে আমরা দেখতে পেলুম একটা অদ্ভুত মূর্তিকে—যার মুখ হচ্ছে অমানুষিক আর যার হাতে আছে একটা লাঠি। যদিও সে লাঠিটা আসলে যে কি জিনিস তখন আমি সেটা ধরতে পারিনি, কিন্তু তার অমানুষিক মুখের জন্যে দায়ী যে কোন বীভৎস মুখোশ, সেটা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন হলো না।

হত্যাকারী আর তার প্রভু বুঝলে, জয়ন্ত নামে কোন শৌখিন গোয়েন্দা শনিবারের রাত্রে ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। কেবল তাই নয়, ছদ্মবেশ ধরলেও হত্যাকারীকে সে দেখতে পেয়েছে স্বচক্ষে।

তাদের টনক নড়ল। তাই রবিবার প্রভাতেও দুরাচার জয়ন্তকে এমনভাবে হত্যা করবার চেষ্টা হলো, লোকে যাতে ভাবে সেটা দৈব-দুর্ঘটনা।

ইতিমধ্যে আমি আবার আমার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করলুম। তার ফলে অনুমান করলুম, হত্যাকারী যে অস্ত্র ব্যবহার করে দেখতে তা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড নয়। সূক্ষ্ম ক্ষত, অতএব সূক্ষ্ম অস্ত্র এবং খুব সম্ভব নীরব বিষাক্ত অস্ত্র। কোমল মাংস ভেদ করতে পারলেও কঠিন জিনিস ভেদ করবার শক্তি তার নেই। তাই পরের মঙ্গলবারের রাত্রে সুকঠিন লৌহবর্ম পরিধান করে ঘটনা-স্থলে হলো জয়ন্তের আবির্ভাব।

যা ভেবেছিলুম হলো তাই! একটা শলাকা এসে আমার বর্মকে ভেদ করতে না পেরে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল। আগে আগে অস্ত্র প্রয়োগ করে হত্যাকারী সেইখানেই অপেক্ষা করত। তারপর বিষের প্রভাবে যখন আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন সে জঙ্গলের বাইরে এসে শলাকাটি ক্ষতস্থান থেকে খুলে নিয়ে আবার হতো অদৃশ্য।

কিন্তু এবারে তা আর হল না। তার অস্ত্র যেই আমার বর্মের উপরে এসে পড়ল, তখনি আমার রিভলবার ঘন-ঘন উদ্‌গার করতে লাগল উত্তপ্ত 'বুলেট'! হত্যাকারী প্রাণভয়ে পলায়ন করলে। আমি খুঁজে পেলুম সেই শলাকাটিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। সে-শলাকা আমি চিনি—কারণ আমি বেড়িয়ে এসেছি বোর্ণিও দ্বীপে! সে শলাকা হচ্ছে 'ব্লো-পাইপ'-এর মৃত্যুবাণ।

ভাবতে লাগলুম। ভারতবর্ষে 'ব্লো-পাইপ'-এর ব্যবহার কখনো তো শোনা যায়নি। এটা কি করে সম্ভবপর হলো।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভারের কথা। তিনি নিজেই বলেছিলেন, তাঁর মোটর গাড়ির চালকের জন্মভূমি হচ্ছে বোর্ণিও দ্বীপ।

আমার কল্পনা যে-কাঠামো গড়ে তুলেছিল তার কোন জায়গাই আর অপূর্ণ রইল না। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল ছবির পর ছবি!

আর একটা সত্য আন্দাজ করলুম। হত্যাকারী যা কখনো করেনি আজ তাই করেছে। অর্থাৎ তার মৃত্যুবাণটিকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখেই সে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে! আর সেই মৃত্যুবাণ যে জয়ন্তের হস্তগত হয়েছে, তার পক্ষে সেটুকু অনুমান করাও কঠিন নয়। অস্ত্র যখন পুলিশের হস্তগত, কোন রকম অলৌকিক আবহাওয়াই তখন আর কাজে লাগবে না।

অতএব মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন,—'আলি, তুমি এইবেলা পলায়ন করো। কালকের সকালের ট্রেনেই এই ক্ষুদ্র গ্রাম ত্যাগ করে তুমি ভারতবর্ষের মানব-সাগরে তলিয়ে যাও! তোমাকে আবিষ্কার করতে না পারলে পুলিশ আমার ছায়াকেও স্পর্শ করতে পারবে না!'

দেখছেন সুন্দরবাবু, এ-বাণীও আমি শুনেছিলুম কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে? কিন্তু বাস্তব জগতে এসেও আমার কল্পনা যে বিফল হয়নি, তার প্রমাণ তো পেয়েছেন আপনি আজ সকালেই স্টেশনে গিয়ে? আলি বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করেছে। মহেন্দ্রবাবু বাধ্য হয়ে পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে আত্মহত্যা করেছেন আর আপনিও এখন বাধ্য হয়ে শ্রবণ করছেন বাস্তব জগতে কতখানি কাজ করতে পারে এই বহু-নিন্দিত কল্পনা!

বলুন, আপনার আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

দুই বাহু বিস্তার করে জয়ন্তকে আলিঙ্গন করে সুন্দরবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'হুম্! তুমি হচ্ছ 'জিনিয়াস্'—অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী! তোমার কাছে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে ভাই, আমি আগে ছিলুম তোমার অনুরাগী—আজ থেকে হলুম তোমার গোঁড়া ভক্ত!

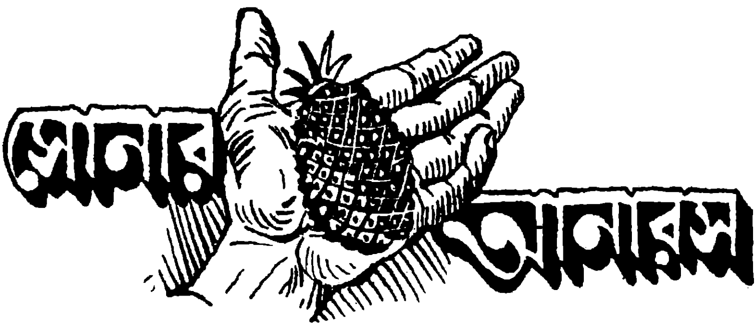
সোনার আনারস

প্রথম

নূতন অভিযান

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'আর পড়তে হবে না মানিক, ফেলে দাও তোমার ওই খবরের কাগজখানা! আমি রাজনীতির কচকচি শুনতে চাই না, আমি জানতে চাই নূতন নূতন অপরাধের খবর! কিন্তু আমি যা চাই, তোমার ওই খবরের কাগজে তা নেই। অপরাধীরা কি আজকাল ধর্মঘট করেছে? এ হল কী? এত বড়ো কলকাতা শহর, কিন্তু কেউই অপরাধের মতন অপরাধ করতে পারছে না!'

মানিক কাগজখানা মেঝের উপরে নিক্ষেপ করে হাসতে হাসতে বললে, 'কারুর পোষ মাস, কারুর সর্বনাশ! তুমি চাও অপরাধীদের, কিন্তু সাধু নাগরিকদের পক্ষে তারা কি দুঃস্বপ্ন-লোকের জীব নয়?'

জয়ন্ত বললে, 'অপরাধ হচ্ছে বিচিত্র! সাধু মানুষদের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে অপরাধীরাই। মহাভারত পড়বার সময় তুমি কি অনুভব করোনি মানিক, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্যোধন আর দুঃশাসনের কথা জানবার জন্যেই আমাদের বেশি আগ্রহ হয়? মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়ে দ্যাখো। তার মধ্যে রামের চেয়ে বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাবণের চরিত্রই! আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন হচ্ছে একেবারেই বেরঙা, কিন্তু রঙের পর রঙের খেলা দেখা যায় অপরাধীদের জীবনেই।'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'তা যা বলেছ ভাই, একথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কী আর করবে বলো, কলকাতা পুলিশের সুন্দরবাবুও তিন মাসের ছুটি নিয়ে বসে আছেন, তিনিও যে 'হুম' বলে কোনও নূতন মামলা নিয়ে আমাদের এখানে ছুটে আসবেন, তারও আশা নেই। অগত্যা আমাদের বাধ্য হয়েই বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।'

ঠিক এমনি সময়ে মধু চাকর এসে খবর দিলে, একজন লোক নাকি জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কী রকম লোক মধু?'

—'একটি ছোকরা বাবু। বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি যেন ভারী ভয় পেয়েছেন।'

—'আচ্ছা মধু, বাবুটিকে এখানেই নিয়ে এসো।'

তার একটু পরেই সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে একটি লোক ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'জয়ন্তবাবু কোথায়? আমি এখনই জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!'

—'আমারই নাম জয়ন্ত। আপনি বড়োই উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি, ওই চেয়ারখানার উপরে গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসুন।'

আগন্তুক সামনের চেয়ারখানা টেনে ধপাস করে তার উপরে বসে পড়ে বললে, 'উত্তেজিত

না হয়ে কী করি বলুন দেখি! কাল রাত্রে আর একটু হলেই আমার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছিল যে!'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'তাহলে ঘটনাটা নিশ্চয়ই গুরুতর বটে! কিন্তু কী জানেন, শান্তভাবে না বললে কোনও ঘটনার ভিতর থেকেই আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি না।'

আগন্তুক অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এইবার আমার কথা বলতে পারি কি?'

—'বলুন। আপনার কথা শোনবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহের অভাব নেই।'

—'আপনাদের তো আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু কাল আমার ঘাড়ে চেপেছিল মস্ত বড়ো এক কুগ্রহ! আজ যে বেঁচে আছি, সে হচ্ছে ভগবানের দয়া।'

—'বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। অতএব বেঁচে যখন আছেন, তখন নির্ভয়ে আপনার সমস্ত ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নামটি কী?'

—'সুব্রত সরকার।'

—'বেশ, এইবার আপনার কী বলবার আছে বলুন।'

সুব্রত বললে, 'কাল রাত্রে মশাই, আমার বাড়িতে ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড হয়ে গেছে! আমি এখনও বিবাহ করিনি, নিজের বাড়িতে একলাই থাকি। কাল রাত্রে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হল অনেকগুলো হাত দিয়ে অন্ধকারে কারা যেন আমাকে চেপে ধরেছে! আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারলুম না; কারণ চার-পাঁচখানা হাত দড়ি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে, আমার মুখেও গুঁজে দিলে বিছানার চাদরের খানিকটা, আর চোখের উপরেও বাঁধলে একখানা কাপড়! সেই অবস্থাতেই অনুভব করলুম, 'সুইচ' টিপে কারা আলো জ্বাললে। তারপর শুনলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলার শব্দ! তার খানিক পরেই ঘরের আলো গেল আবার নিবে। কয়েক জনের পায়ের শব্দ বাইরে চলে গেল, তারপর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, তারপর আর কারুর কোনও সাড়াশব্দ পেলুম না বটে, কিন্তু আমাকে সেই অবস্থাতেই কানা আর বোবার মতন চুপ করে থাকতে হল। সকালবেলায় চাকর এসে আমাকে মুক্তিদান করলে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার ঘরের ভিতরে বাইরের লোক এল কেমন করে?'

—'দরজা দিয়ে মশাই, দরজা দিয়ে! আমার একটি বদ-অভ্যাস আছে, গ্রীষ্মকালে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে পারি না।'

—'তারপর? বিছানা থেকে নেমে আপনি কী দেখলেন?'

—'দেখলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলা পড়ে রয়েছে। তার ভিতরে শ-পাঁচেক টাকার নোট আর কিছু গয়নাও ছিল, কিন্তু সেসব কিছুই চুরি যায়নি। চোরেরা নিয়ে গেছে কেবল একটি জিনিস, যা ছিল সোনার আনারসের মধ্যে।'

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'সোনার আনারস? সে আবার কী?'

মানিক বললে, 'সোনার পাথরবাটির কথা শুনেছি, কিন্তু সোনার আনারসের কথা শুনলুম এই প্রথম!'

সুব্রত বললে, 'তাহলে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। কোন খেয়ালে জানি না, আমার প্রপিতামহ পিতল দিয়ে গড়িয়েছিলেন এই আনারসটি। এই আনারসের উপরে সোনার কলাই করা ছিল বলে আমরা একে সোনার আনারস বলেই ডাকি। আমার প্রপিতামহ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই সোনার আনারসটি পিতামহের হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'যদি কোনওদিন তোমার বিশেষ অর্থাভাব হয়, তাহলে এই আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান!' আমার পিতামহও মৃত্যুকালে আমার বাবাকে ঠিক এই কথাই বলে গিয়েছিলেন। বাবাও যখন মৃত্যুন্মুখ, তখন তাঁর মুখেও শুনেছিলুম এই কথাই। এই সোনার আনারসটি টানলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমার পূর্বপুরুষরা ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু আমি ধনী নই, তাই সোনার আনারসের ভিতর থেকে অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছিলুম খালি এক টুকরো কাগজ, আর সেই কাগজের উপর লেখা ছিল যে কথাগুলো, তা প্রলাপের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'কথাগুলো কী?'

সুব্রত একটু ভেবে বললে, 'কাগজে লেখা ছিল একটি ছড়া, কিন্তু তার প্রথম আর শেষ দিকটার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়ছে না।'

—'যেটুকু মনে পড়ছে, বলুন দেখি।'

সুব্রত বললে, 'ছড়ার প্রথম দিকটায় আছে এই কথাগুলি—

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।'

বলতে পারেন জয়ন্তবাবু, এর মধ্যে কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি? বৃদ্ধ বট নাকি আয়নাতে তার মুখ দেখে গান ধরেছে! এমন কথা শুনলে কি হাসি পায় না?'

জয়ন্ত মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বললে, 'আমার একটুও হাসি পাচ্ছে না সুব্রতবাবু! ছড়ার শেষ-দিকটায় কী আছে?'

সুব্রত বললে, 'শেষ-দিকটায় আছে—

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা!'

হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, এগুলো কি পাগলের প্রলাপ নয়?'

জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ ও স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, 'ছড়ার মাঝখানকার কোনও কথাই আপনার মনে নেই?'

—'এ-রকম একটা বাজে ছড়ার কথা মনে রাখবার কেউ কি চেষ্টা করে জয়ন্তবাবু? চোর ব্যাটারা কী নির্বোধ! তারা কিনা লোহার সিন্দুক খুলে কেবল এই ছড়ার কাগজখানা নিয়েই সরে পড়েছে!'

জয়ন্ত বললে, 'চোরেরা বেশি নির্বোধ কি আপনি বেশি নির্বোধ, সেটা আমি এখনই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ছড়ার কিছু কিছু অর্থ আমি যেন আন্দাজ করতে পারছি।'

—'পারছেন নাকি? আমি তো কতবার ওই কাগজখানা পড়ে দেখেছি, কিন্তু অর্থ বা অনর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'এখনও আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি, এটা হচ্ছে আশ্চর্য কথা! আপনার বাড়িতে একদল চোর এল, তারা আপনার লোহার সিন্দুক খুলে মূল্যবান কিছুই নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল কেবল এক টুকরো কাগজ, যার উপরে লেখা ছিল এই ছড়াটি, আর আপনার পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন যার মধ্যে পাবেন আপনি দুঃসময়ে অর্থের সন্ধান। 'সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।' এটুকু পড়েও আপনার মনে কোনও সন্দেহের ইঙ্গিত জাগেনি?'

সুব্রত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'কিছু না, কিছু না। সর্পনৃপই বা কী, আর তার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কই বা কী?'

জয়ন্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'একটি সম্পর্ক থাকতে পারে বইকী! মানিক, তুমি কিছু বুঝতে পারছ কি?'

মানিক বললে, 'পাগল, ধাঁধা নিয়ে আমি কোনও কালেই মাথা ঘামাবার চেষ্টা করি না!'

জয়ন্ত মৃদু হাস্য করে বললে, 'কিন্তু ওই চেষ্টাই হচ্ছে আমার জীবনের তপস্যা! চিরদিনই আমি ধাঁধার জবাব খুঁজতে চাই। যাক গে সে-কথা। সুব্রতবাবু, আপনাকে আমি দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।'

—'করুন।'

—'এই ছড়ার কথা আপনি আগে আর কারুর কাছে বলেছিলেন কি?'

—'তা বলেছিলুম বইকী! অনেক লোকের কাছেই ওই ছড়াটা দেখিয়েছিলুম। যে দেখেছে সেই-ই অবাক হয়ে গেছে, ওর মধ্যে কোনও মানেও খুঁজে পায়নি। যার মানে নেই, তার মধ্যে আবার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত সেই জিজ্ঞাসার কোনওই জবাব না দিয়ে বললে, 'সুব্রতবাবু আপনি বললেন যে, আপনার পূর্বপুরুষরা নাকি ধনী ছিলেন। তাঁরাও কি কলকাতাতেই বাস করতেন?'

—'না। আমাদের আদি বাস হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার কোদালপুর গ্রামে। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। দেশে আজও আমার কিছু জমি-জমা আছে, আর তার ব্যবস্থা করতে এখনও আমি মাঝে মাঝে দেশে যাই বটে; কিন্তু নিজেকে আর জমিদার ভেবে আত্মগৌরব লাভ করতে পারি না।'

—'দেশে আপনাদের বসতবাড়ি আছে তো?'

—'আছে, এইমাত্র। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চার-চারটে মহল, তার চারিধার ঘিরে মস্তবড়ো বাগান, কিন্তু সে-সমস্তই আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে আর বন-জঙ্গলে, বসতবাড়ির একটা মহলের কিছু কিছু সংস্কার করে খান-ছয়েক ঘর কোনওরকমে মানুষের উপযোগী করে নিয়েছি, যখন দেশে যাই, সেই ঘরগুলো ব্যবহার করি।'

—'আপনাদের দেশের বাগানে পুকুর আছে?'

—'নিশ্চয়ই আছে, প্রকাণ্ড পুকুর—কলকাতার গোলদিঘির চেয়ে প্রায় চার-গুণ বড়ো—'

—'আর সেই পুকুরের ধারে কোনও পুরানো বটগাছ আছে কি?'

—'ভারী আশ্চর্য তো, আপনি এমন প্রশ্ন করছেন কেন? হ্যাঁ মশাই, পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা মস্ত বটগাছ, তার বয়স কত কেউ তা জানে না।'

—'আর সেই বটগাছের উপরে বাস করে বকের দল?'

সুব্রত বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'একথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

—'পরে বলব। আপাতত আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিন।'

—'সেই বটগাছের উপরে চিরদিন ধরেই বাস করে আসছে বকের দল, ও-গাছটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি!'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রুপোর শামুকের ভিতর থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'মানিক, জাগ্রত হও।'

—'ব্যাপার কী বন্ধু? খুব খুশি না হলে তুমি নস্য নাও না। কিন্তু খুশির কারণটি কী?'

—'আর আমরা অলস হয়ে বসে থাকব না। ওঠো, মধুকে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে বলো। আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের নতুন অভিযান!'

—'কিন্তু যাবে কোন দিকে?'

—'সুব্রতবাবুর দেশে, কোদালপুর গ্রামে।'

সুব্রত খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, 'ও জয়ন্তবাবু, ওই ছড়ার প্রলাপের ভিতর থেকে আপনি কোনও অর্থ খুঁজে পেয়েছেন নাকি?'

—'আপনার পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন, ছড়ার মধ্যে অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই এই ছড়াটির ভিতরে আছে গভীর অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি সমস্ত ছড়াটার কথা আমাকে বলতে পারলেন না; তাহলে হয়তো এখনই সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।'

—'এমন জানলে আমি যে ছড়াটা একেবারে মুখস্থ করে রাখতাম।'

—'যাক গে, যেটুকু সূত্র পেয়েছি, তাই নিয়েই এখন কাজ আরম্ভ করে দি। মানিক, সুন্দরবাবুকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করে এসো—তিনি এখন ছুটিতে আছেন। সুন্দরবাবু সঙ্গে না থাকলে আমাদের কোনও অভিযানই ভালো করে জমে না!'

দ্বিতীয়

ভূযোপাগলা

জয়ন্তরা কোদালপুর গ্রামে গিয়ে দেখলে, সুব্রত কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেনি। তাদের পৈতৃক অট্টালিকাখানি কেবল প্রকাণ্ড বললেই যথার্থ বলা হয় না, অত বড়ো অট্টালিকা রাজধানী কলকাতাতেও বোধ হয় দু-চারখানার বেশি নেই। আর সেই অট্টালিকার চারিপাশ ঘিরে বিরাজ করছে যে উদ্যান, তার সীমানা নির্দেশ করাও হচ্ছে রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং এক সময়ে যে তার সৌন্দর্যও ছিল অপূর্ব, সে-বিষয়ে নেই কোনওই সন্দেহ। কিন্তু তার বর্তমান রূপ দেখলে মন হা-হা করে ওঠে।

অট্টালিকার কোনও কোনও অংশ ধ্বসে পড়ে রচনা করেছে পাহাড়ের মতন স্তূপ। এবং তার কোনও কোনও অংশ কোনওক্রমে এখনও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের বর্ণহীন, বালুকাহীন ও গঠনহীন বড়ো বড়ো ফাটল-ধরা গায়ের উপরে বিরাজ করছে রীতিমতো বন-জঙ্গল। মস্ত মস্ত অশথ, বট ও নিমগাছের দল প্রায় তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে আছে, আর সেই সব গাছের ডালে ডালে বাদুড়, প্যাঁচা ও আরও নানা-জাতীয় পাখিরা এসে বাসা বেঁধেছে। এবং সেইসব গাছের তলদেশ জুড়ে আছে নানা-শ্রেণীর আগাছার ঝোপ-ঝাপ।

অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি, আগে যার নাম ছিল উদ্যান, এখন তারও অবস্থা ভয়াবহ বললেও চলে। আজ কেউ তাকে কল্পনাতেও উদ্যান বলে সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ, তার নানা স্থানেই আশ্রয় নিয়েছে এমন গভীর জঙ্গল, যা দেখলে মহা অরণ্য 'সুন্দরবন'-এর কথাই মনে পড়ে। এক সময়ে যখন এখানে ছিল ফুলবাগান আর ফলবাগান, তখন যে চারিদিকেই ছিল উচ্চ ও কঠিন প্রাচীর, নানা জায়গায় আজও তার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ প্রাচীরের অধিকাংশই ভেঙেচুরে একেবারে হয়েছে ভূমিসাৎ।

সুন্দরবাবু রীতিমতো ভীতকণ্ঠে বললেন, 'হুম! জয়ন্ত, তুমি কী বলতে চাও, গভীর অরণ্যের মধ্যে এই বিপুল ভগ্নস্তূপের ভিতরেই এখন কিছুকাল ধরে আমাদের বাস করতে হবে? উঁহু, উঁহু, কিছুতেই আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই কেউ আমাকে এখানে থাকতে রাজি করাতে পারবে না। যত সব পাগলার পাল্লায় এসে পড়েছি! বাব্বাঃ, বেড়াতে এসে শেষটা কি পৈতৃক প্রাণটিকে নষ্ট করব? এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিষধর সর্প যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই! তার উপরে এখানে যে বাঘ-ভাল্লুক জাতীয় বদ-মেজাজি জানোয়াররা নেই, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। আমি আজই এখান থেকে সবেগে পলায়ন করতে চাই।'

সুব্রত বললে, 'মাভৈঃ সুন্দরবাবু, মাভৈঃ। এই ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যা ছোট্ট হলেও একেবারে আধুনিক বলেই মনে হবে। যে কয়দিন আমরা এখানে থাকব, সেই অংশটাই হবে আমাদের বাসস্থান।'

জয়ন্ত অধীর কণ্ঠে বললে, 'সুব্রতবাবু, এসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দিন। আপনি যে বড়ো পুষ্করিণীর কথা বলেছিলেন, আমি আগে সেইখানেই যেতে চাই।'

সুব্রত অগ্রসর হয়ে বললে, 'আসুন আপনারা, আমি এখন সেই দিকেই যাত্রা করছি।'

বহু আগাছার ঝোপ এবং লতাপাতার জাল দিয়ে ঘেরা বনস্পতির মতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের 'জনতা' ভেদ করে মিনিট-পাঁচেক ধরে অগ্রসর হয়ে খানিকটা খোলা জায়গার উপরে এসে পড়ল তারা। সেখানেও ঝোপ-ঝাপ আছে বটে, কিন্তু বড়ো গাছের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তারই মাঝখানে দেখা গেল যেন ঘাসের সবুজ-মাখা একটা সমতল জমি।

মানিক বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনাদের বাগানের ভিতরে এত বড়ো একটা সবুজ মাঠ কেন?'

সুব্রত হেসে বললে, 'ওটা মাঠ নয় মানিকবাবু, ওইটে হচ্ছে আমাদের বাগানের প্রধান পুষ্করিণী। ওর অধিকাংশই ভরে গিয়েছে পানায় আর পানায়, তাই ওকে দেখাচ্ছে সবুজ মাঠের মতন! ওখানে লাফ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁজে পাবেন না, তলিয়ে যাবেন একেবারে অতল তলে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম। এত বড়ো পুকুর আমি কলকাতাতেও দেখিনি! এ কি পুকুর, এ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ! উঃ! সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা কী ধনীই ছিলেন!'

এইরকম সব কথা বলতে বলতে সকলে সেই সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, 'দেখছি, পুকুরের ওই ভাঙাঘাটের কাছে পানার অত্যাচার নেই।'

সুব্রত বললে, 'বাগানের পাঁচিলের বেশির ভাগই ভেঙে গিয়েছে, গ্রামের লোকজনরা তাই

অবাধে এইখানে এসে ওই পুকুরের জল ব্যবহার করে। একটি নয় মানিকবাবু, এই পুকুরের চারিদিকে এখনও আটটি ঘাট বর্তমান আছে। সব ঘাটেরই অবস্থা শোচনীয়, তবু দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন এখানকার সব পুকুরই জলশূন্য হয়ে যায়, তখন গাঁয়ের লোকেরা এসে এই পুকুরেরই জল ব্যবহার করে, কারণ, আমাদের এই পুষ্করিণী এত গভীর যে, এখানে কোনওদিনই জলের অভাব হয় না।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা তো দেখছি পুকুরের উত্তরদিক। সুব্রতবাবু, আপনি বলেছেন, এই পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটার কাছেই যেতে চাই।'

সুব্রত বললে, 'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।'

সরোবরের পূর্ব তীর দিয়ে সকলে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অগ্রসর হল। তারপর পাওয়া গেল সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত।

সুব্রত অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, 'ভাঙাঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ওই সেই বুড়ো বটগাছ! জয়ন্তবাবু, দেখুন, এর ভিতর থেকে আপনি কোনও রহস্যের চাবি আবিষ্কার করতে পারেন কি না!'

জয়ন্ত সেই বটগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, 'এ বটগাছটা দেখছি শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর বিখ্যাত বটগাছটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! এর চারদিক দিয়ে যেসব ঝুরি মাটির উপরে এসে নেমেছে, তার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক একটা গাছের গুঁড়ির মতন!'

সুব্রত বললে, 'শুনতে পাচ্ছেন কি, ওই বটগাছের ভিতর থেকে জেগে উঠছে কত চিৎকার? ও চিৎকার হচ্ছে বক আর তাদের বাচ্চাদের। দিনে-রাতে এই অশ্রান্ত চিৎকার কখনও থামে না। তাই গাঁয়ের লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ না বলে 'বকগাছ' বলে ডাকে।'

হঠাৎ শোনা গেল, চিৎকার করে কে যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছে!

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'কথাগুলো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে হল!'

তারপরেই শোনা গেল চেঁচিয়ে কে বলছে—

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এ-যে সোনার আনারসের ভিতরে পাওয়া সেই ছড়াটারই গোড়ার দিক।'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ! ছড়ার পরের অংশ শোনো।'

শোনা গেল—

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলদ টিকটিকি।'

এই পর্যন্ত বলেই কণ্ঠস্বর আবার হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে উঠল, 'এ যে দেখছি ছড়ার দ্বিতীয় শ্লোক!'

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, ছড়াটা আমার মুখস্থ নেই বটে, কিন্তু এখন শুনে বেশ বুঝতে পারছি এটা তার দ্বিতীয় শ্লোকই বটে!'

জয়ন্ত আবার বললে, 'চুপ! শোনো!'

অজানা কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল—

'অগ্নিকোণে নেইক আগুন,
—কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্টভাগে!'

কণ্ঠস্বর আবার স্তব্ধ হল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, 'ও ছড়াটা কে বলছে জানেন? ও হচ্ছে এই গাঁয়েরই একটি লোক। ওর নাম হচ্ছে ভূষণ। এখানকার লোক ওকে ভূষোপাগলা বলে ডাকে! শুনেছি ওর বাবা ছিলেন আমাদের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ওই ছড়াটা কী করে যে ওর কণ্ঠস্থ হল সে-রহস্য আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখনই এখানে এসেছি, তখনই ওর মুখে শুনতে পেয়েছি ওই ছড়ার পঙ্‌ক্তিগুলি। লোকে বলে, ওই ছড়া মুখস্থ করতে করতেই ও পাগল হয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু আপনাদের ওই ভূষোপাগলা থেমে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে ওই ছড়াটার নতুন কোনও অংশ ওর মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।'

ঠিক সেই সময়ে পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে উঠল একটি মূর্তি! তার একেবারে শীর্ণ দেহ, মাথার চুলে জট বেঁধেছে, মুখে রাশীকৃত দাড়ি-গোঁফ এবং সর্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কেবল কটিদেশে একখণ্ড কৌপীনের মতন বস্ত্র তার লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করছে।

ভূষণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে সুব্রত শুধোলে, 'কী গো ভূষোপাগলা, এই দুপুরের রোদে ঘাটে বসে তুমি কী করছ?'

ভূষণ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে যেন আপন মনেই বললে, 'কিছুই করছি না, কিছুই করছি না, অনেক কিছুই করবার আছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।'

—'করতে পারছ না কেন?'

—'করতে পারছি না কেন, করতে পারছি না কেন? ছড়ার সঙ্গে পৃথিবী মিলছে না।'

—'মিলছে না কেন?'

—'যে পৃথিবীতে সোনার আনারস ফলে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কোনওদিনই তার মিল হয় না। সোনার আনারস, সোনার আনারস হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।'

—'তুমি ও ছড়াটা শিখলে কোথায়?'

—'বাবা শিখিয়েছেন গো, বাবা শিখিয়েছেন—বাপ ছাড়া ছেলেকে আর কে শেখাবে বলো?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু ছড়ার সবটা তো তুমি এখনও আমাদের শোনালে না?'

ভূষণ সে-কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল—তার মুখে চোখে ফুটল রীতিমতো ভয়-ভয় ভাব! তারপর চারিদিকে ব্যস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল!

সুব্রত বললে, 'হঠাৎ কী হল ভূষোপাগলা, চারিদিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

সুব্রতের কথা সে শুনতে পেলে বলে মনে হল না। বিড়বিড় করে কী বকতে লাগল তাও বোঝা গেল না।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'কী তুমি বিড়বিড় করছ? আমাদের কথার জবাব দাও!'

ভূষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল এক দিকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জয়ন্তও ফিরে দেখতে পেলে অল্প দূরেই রয়েছে একটা বড়ো ঝোপ।

কিন্তু সে ঝোপটা একেবারেই স্থির। সেখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই।

হঠাৎ ভূষণ বলে উঠল, 'দুশমন, দুশমন!'

সুব্রত বললে, 'দুশমন আবার কে?'

—'আমি দুশমনদের গন্ধ পাচ্ছি!'

—'কোথায়?'

—'এই বাগানে।'

—'বাগানে খালি তো আমরাই আছি!'

—'যেখানে ভগবান, সেইখানেই থাকে শয়তান।'

—'কী পাগলামি করছ!'

ভূষণ গান ধরলে—

'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলা ছেলে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'ভূষণ, ও-গান থামিয়ে তুমি সেই ছড়ার সবটা আমাদের শুনিয়ে দাও।'

—'সোনার আনারসের ছড়া?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে ছড়া তো তোমাদের শোনাতে পারব না!'

—'কেন বলো দেখি?'

—'তোমরা শুনলে দুশমনরাও শুনতে পাবে।'

—'দুশমন এখানে নেই।'

—'আছে গো, আছে গো, আছে। আজকাল রোজই এখানে দুশমনদের গন্ধ পাই!'

—'তারা কারা?'

—'জানি না। তারা থাকে দূরে দূরে আর আনাচে-কানাচে মারে উঁকিঝুঁকি!'

—'তুমি ভুল দেখেছ!'

—'না গো, না গো, না! আমার চোখ ভুল দেখে না।'

—'বেশ তো, তুমি চুপি চুপি ছড়াটা আমাদের শোনাও না। তাহলে দূর থেকে দুশমনরা কিছুই শুনতে পাবে না।'

—'তোমরা দুশমন নও। ছড়াটা তোমাদের শোনাতে পারি।'

—'বেশ, তবে শোনাও।'

ভূষণ শুরু করলে—

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট—

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে পড়ে ত্রস্ত চক্ষে আবার সেই ঝোপটার দিকে তাকালে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তেরও দৃষ্টি ফিরল সেই দিকে। তার দেখাদেখি আর সকলেও ফিরে দাঁড়াল।

মুহূর্ত-দুই পরে দেখা গেল, খানিকটা ধোঁয়া ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে!

প্রায় আধ মিনিট পরে আবার সেই দৃশ্য।

ভূষণ বলে উঠল, 'দুশমন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, ঝোপের ভিতর বসে নিশ্চয় কেউ বিড়ি কী সিগারেট খাচ্ছে!'

ভূষণ আবার বললে, 'দুশমন!'

জয়ন্ত বললে, 'এগিয়ে দেখতে হল।'

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আর সকলেও অগ্রসর হল—কেবল ভূষণ ছাড়া। সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বকতে লাগল।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই সকলে গিয়ে হাজির হল ঝোপের কাছে। বিড়ি বা সিগারেটের ধোঁয়া তখন অদৃশ্য। ঝোপটা বেশ বড়ো, তার ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারো জন লোকের ঠাঁই হতে পারে।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল না জনপ্রাণীকে। তবে পাওয়া গেল একটা প্রমাণ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ!

জয়ন্ত হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে কী তুলে নিয়ে সকলকে দেখালে। সেটা হচ্ছে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের অর্ধাংশ।

মানিক বললে, 'তাহলে এখানে বসে নিশ্চয়ই কেউ ধূমপান করছিল। এখন আমাদের আসতে দেখে সিগারেট ফেলে লম্বা দিয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা কী সিগারেট দেখছ?'

—'হুঁ। স্টেট এক্সপ্রেস ৯৯৯।'

—'যে এ-রকম দামি সিগারেট ব্যবহার করে, তার ধনবান হওয়াই উচিত। ঝোপের ভিতর সিগারেটের গন্ধ ছাড়া আর একটা গন্ধও পাচ্ছি। এসেন্সের মিষ্টি গন্ধে এখানকার বাতাস এখনও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি এতক্ষণ লুকিয়েছিল, সে কেবল ধনবান নয়, রীতিমতো শৌখিনও।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই ঝোপটার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, ওদিকে বিশ-পঁচিশ হাত

তফাতে আরও একটা বড়ো ঝোপ রয়েছে। সেই শৌখিন ধনবান ব্যাটা এখান থেকে পালিয়ে ওইখানে গিয়ে লুকিয়ে নেই তো?'

জয়ন্ত বললে, 'এখনই সে সন্দেহভঞ্জন করা যেতে পারে। চলুন।'

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে পুষ্করিণীর দিক থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। তারপরেই চারিদিক আবার স্তব্ধ।

জয়ন্ত এক লাফ মেরে ঝোপের ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ল।

তারপর চটপট চারিদিকে বুলিয়ে নিল নিজের খরদৃষ্টি। কিন্তু কোনও দিকেই কারুকে দেখতে পেলে না।

তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'কই, কেউ তো কোথাও নেই। তবে আর্তনাদ করলে কে?'

—'আমার বিশ্বাস আর্তনাদ করেছে ভূষোপাগলা।'

—'কিন্তু সে পাগলাই বা কোথায়? তারও যে টিকি দেখতে পাচ্ছি না।'

—'এসো, আর একবার ঘাটের কাছে যাওয়া যাক।'

সুব্রতবাবু জয়ন্তের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে হতে বললেন, 'এ কী রকম ম্যাজিক বাবা? ঝোপের মাথায় সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে, কিন্তু ঝোপের ভিতরে মানুষ নেই। পুকুরের ধারে আর্তনাদ জাগে, কিন্তু কারুকে দেখতে পাওয়া যায় না। এসব তো ভালো কথা নয়।'

কিন্তু পুকুরের ধারে গিয়েও আর্তনাদের বা ভূষণের অদৃশ্য হওয়ার কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। জয়ন্ত পুকুরের ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'ঘাটের ধাপে ওটা কী পড়ে রয়েছে?'

মানিক এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, 'এ যে দেখছি বাঁশের বাঁশি?'

সুব্রত বললে, 'ও হচ্ছে ভূষোপাগলার বাঁশি! সে বাঁশি বাজাতে ভারী ভালোবাসে, আর ও-বাঁশিটিকে কখনও কাছছাড়া করে না।'

জয়ন্ত বললে, 'যখন অমন প্রিয় বাঁশিকে সে পুকুর ঘাটে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

—'দুর্ঘটনা!'

—'হ্যাঁ। ভূষোপাগলা হয় ভয়াবহ কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে বাঁশি ফেলেই বেগে পলায়ন করেছে, নয় কেউ বা কারা তাকে বন্দি করে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কোনও অর্থই বোঝা যাচ্ছে না। এখানে ভয়াবহ কিছুই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আর ভূষণের মতন একটা পাগলাকে বন্দি করে কার কী লাভ হতে পারে?'

জয়ন্ত কেবল বললে, 'বোধ হয় শীঘ্রই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।'

তৃতীয়

তির এবং ধোঁয়া

সুব্রত মিথ্যা বলেনি। সেই মস্ত ভাঙা অট্টালিকার একটা মহলকে মেরামত করে সত্যই সে আবার তার পূর্বশ্রী উদ্ধার করেছে। এ অংশটা যেন আলাদা একখানা বাড়ি।

উপরে-নীচে খান ছয়েক বড়ো বড়ো ঘর এবং উপরে-নীচে উঠানের চারিপাশেই আছে বেশ চওড়া দালান। কোথাও অযত্ন বা মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বৈঠকখানা-ঘরটির মধ্যে আসবাবের সংখ্যাধিক্য নেই বটে, কিন্তু তার সাজসজ্জার ভিতরে পরিচয় পাওয়া যায় সুরুচির। এক দিকে আছে দুখানি কোচ ও একখানি সোফা এবং আর-এক দিকে ধবধবে চাদর-পাতা চৌকি, তার উপরে কয়েকটি মোটা-সোটা, শুভ্র ও কোমল তাকিয়া যেন অতিথিদের আহ্বান করছে সাদর মৌন ভাষায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মার্বেল বাঁধানো গোল টেবিল এবং তার চারিপাশে ঘিরে রয়েছে খান-ছয়েক গদিমোড়া চেয়ার। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে একটি নীলবর্ণপ্রধান চিনামাটির ফুলদানিতে কয়েকটি রক্ত-গোলাপ এবং ধূম্রসেবকদের ব্যবহারের জন্যে দুটি কাচের ছাইদান।

দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করছে প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতিতে আঁকা আটখানি ছবি। এখানে বিদ্যুৎ-বাতি নেই বটে, কিন্তু ছাদ থেকে ঝুলছে পেট্রলের এমন একটি বড়ো লণ্ঠন, যা প্রচুর আলোক বিতরণ করে অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসেই।

ঘরের তিন দিকের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের পানে তাকালেও এখানকার যা প্রধান বিশেষত্ব, সেই বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ বা আগাছাদের ভিড় চোখে পড়ে না। দেখা যায় শুধু ঘাসের সবুজ মখমলে মোড়া পরিষ্কার সমতল জমি এবং এখানে-ওখানে ছোটো বড়ো ফুলগাছদের বর্ণ বৈচিত্র্য।

সুন্দরবাবু ধপাস করে একখানা কোচের উপরে বসে পড়ে বললেন, 'হুম! এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ত্যাগ করে আমরা আবার সভ্যজগতে ফিরে এলুম। দিব্যি ঘরখানি! চোখ জুড়িয়ে যায়!'

মানিক বললে, 'সুব্রতবাবু জঙ্গল সাফ করে বাড়ির এই অংশটিকে এমন উপভোগ্য করে তুলতে আপনার তো কম খরচ হয়নি। প্রবাদের কথাই সত্যি—মরা হাতিরও দাম লাখ টাকা।'

সুব্রত একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, 'পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়া বড়োই কঠিন। আমি একেলে বাঙালিবাবুদের মতন নই মানিকবাবু। কত যুগ ধরে যেখানকার আকাশে-বাতাসে আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, কেমন করে ভুলব সেখানকার মাটির প্রেমকে? তেমন সামর্থ্য থাকলে সমস্ত অট্টালিকা আর উদ্যানের নষ্ট-শ্রী আবার আমি উদ্ধার করতুম, কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই। অট্টালিকার ওই একটি অংশকেই বাসোপযোগী করে তুলতে গিয়ে মহাজনের কাছে আমাকে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনার উপরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ল। যারা নিজেদের বংশগৌরব আর অতীত মহিমা ভুলে যায়, তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখতে পাই এমনি অমানুষের দল। তারা আজ নিজেদের গ্রাম ভুলে নব্য আর শহুরে হওয়ার জন্যে কলকাতায় এসে সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল-ক্রিকেট আর হোটেল-রেস্তোরাঁ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। মুখময় তাদের 'স্নো' আর 'পাউডারে'র প্রলেপ, চোখে তাদের শখের চশমা, ওষ্ঠাধরে সিগারেট, হাতে 'রিস্টওয়াচ' আর নট-নটীদের ছবি, পরনে ফিরিঙ্গি পোশাক আর পায়ে মেয়েলি চলনের ভঙ্গি। অথচ তাদের অবহেলায় তাদের গ্রাম যে অরণ্যের নামান্তর হতে বসেছে, সেদিকে কারুরই খেয়াল—এমনকী খেয়াল করবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। আমি এদের কীটপতঙ্গ বলে মনে করি—এরা কেবল নরাধম নয়, পশুরও অধম! আপনি যে এ-জাতীয় জীব নন, আপনার মধ্যে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তারই প্রমাণ পেয়ে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত হলুম।...কিন্তু যাক সে কথা। এখন কাজের কথা হোক। কোদালপুরের মধ্যে এখন সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কে?'

—'বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে?'

—'সবচেয়ে ধনী বা প্রতিপত্তিশালী।'

সুব্রত একটু ভেবে বললে, 'এখানে এমন কেউ নেই, যাকে খুব ধনী বলা যায়। তবে এখানে এমন একজন লোক আছে, স্থানীয় বাসিন্দারা যাকে খুব মানে।'

—'মানে কেন?'

—'ভয়ে।'

—'ভয়ে?'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ। তার নাম প্রতাপ চৌধুরি। সে একজন দুর্দান্ত লোক। যে তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেই বিপদে পড়তে হয়েছে। বার-দুয়েক খুনের মামলাতেও তাকে আসামি হতে হয়েছিল, কিন্তু দুই বারেই প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায়। এখানকার কোনও লোকই তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে না।'

জয়ন্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'বটে, বটে? তাহলে আরও ভালো করে লোকটির কথা বলুন তো সুব্রতবাবু।'

—'প্রতাপকে চোখে দেখে কিছু বোঝবার জো নেই। ফরসা রং, নাদুস-নুদুস মাঝারি চেহারা, সর্বদাই মিষ্টি হাসিমাখা মুখ, এক জামা দুদিন পরে না—এমনি শৌখিন সে।'

—'তাহলে সে ধনবান?'

—'এইখানেই একটা আশ্চর্য রহস্য আছে। তার পৈতৃক সম্পত্তি নেই, সে নিজেও কোনও কাজকর্ম করে না, অথচ তার টাকার অভাব নেই। মাঝে-মাঝে সে বেশ কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়—কেন যায়, কোথায় যায়, কেউ তা জানে না। প্রতাপের সঙ্গে সর্বদাই একদল লোক থাকে, সে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হলে তাদেরও আর দেখতে পাওয়া যায় না। লোকগুলোর চেহারা ভদ্র না হলেও চাকর-দারোয়ানেরও মতো নয়—কিন্তু তারা সকলেই জোয়ান।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রতাপ কী রকম লোক বলে মনে করেন?'

—'সন্দেহজনক।'

—'কেন?'

—'যে অর্থবান নয়, অথচ যার অর্থের অভাব নেই, সে লোকের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানকার পুলিশের কাছে খবর নিলে প্রতাপ সম্বন্ধে হয়তো আরও নতুন কথা জানতে পারব।'

—'তার চেয়ে চলুন না, আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতাপবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে আসি।'

সুব্রত বললে, 'আপনার এ আশা আজ সফল হবে না। আমি এখানে এসেই খবর পেয়েছি, প্রতাপ এখন কোদালপুরে নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'যাক, তাহলে আপাতত প্রতাপকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এইবারে স্নানাহারের চেষ্টা করা যাক।'

সে উঠে দাঁড়াল এবং সেই মুহূর্তেই জানলা-পথ দিয়ে কী একটা জিনিস সাঁ করে তার মাথার পাশ দিয়ে ছুটে দেওয়ালে বাধা পেয়ে ঘরের মেঝের উপরে সশব্দে গিয়ে পড়ল!

জয়ন্ত সচমকে জিনিসটার দিকে তাকিয়েই এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক তাড়াতাড়ি জিনিসটা মাটির উপর থেকে তুলে নিলে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'হুম! ওটা যে দেখছি তির!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু! ওটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারত, তাহলে আর আমার স্নানাহারের দরকার হত না।'

সুব্রত বললে, 'কে তির ছুড়লে? কেন ছুড়লে?'

—'কে ছুড়লে জানি না। জানলার কাছে এসে তো জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। তবে কেন যে ছুড়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এই কোদালপুরে এমন কোনও মহাত্মা আছেন, যাঁর ইচ্ছা নয় যে, আমি আর ধরাধামে বর্তমান থাকি।'

—'সে কী জয়ন্তবাবু, এখানে তো কারুরই আপনার উপরে রাগ থাকবার কথা নয়! এখানে কে আপনাকে চেনে?'

—'যাদের চেনা উচিত, তারাই চেনে! আমি সোনার আনারসের রহস্য উদ্ধার করতে এসেছি, আমাকে আবার তারা চিনবে না?'

—'তারা কারা?'

—'যারা আপনাকে আক্রমণ করে সোনার আনারসের ছড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, যারা বাগানের ঝোপে বসে আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছিল, যাদের দেখে ভূষোপাগলা আর্তনাদ করে উঠেছিল, তাদেরই অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়েছে আজ আমার উপরে। এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। সুন্দরবাবু, মানিক, আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে—এ শত্রু বড়ো সামান্য শত্রু নয়, এরা এখন আমাদের পিছনে পিছনেই ঘুরবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সুব্রতবাবু, এই বিশ শতাব্দীতেও তির ছোড়ে তো খালি অসভ্য দেশের লোকেরা! আরে ছ্যাঃ, আপনাদের কোদালপুর আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, বিশ শতাব্দীতেও সময়ে সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের চেয়ে তির বেশি

কাজে লাগতে পারে। তির-ধনুক বন্দুকের মতন গর্জন করে পাড়া মাত করে না, কাজ সারে চুপিচুপি।...আরে আরে সুন্দরবাবু, আঙুল বুলিয়ে তিরের ফলার ধার পরীক্ষা করছেন কেন? ও তির যদি বিষাক্ত হয়?'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তিরটা মাটির উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ও বাবা, ঠিক তো! এটা তো আমি ভাবিনি! একটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কী, হুম!'

—'যাক, তিরন্দাজের কথা ভুলে এইবার স্নান-আহার সেরে নেওয়া যাক। বড়োই বেলা হয়েছে।'

সন্ধ্যার কিছু আগে জয়ন্ত বললে, 'সুব্রতবাবু চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

বাইরে বেরিয়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়ন্তবাবু, কোন দিকে যাবেন?'

—'যেদিকে প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি।'

—'কিন্তু সেখানে গিয়ে কী হবে? প্রতাপকে তো পাবেন না।'

—'প্রতাপকে না পাই, তার বাড়িখানাকে তো পাব।'

—'প্রতাপ যখন দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়, তখন তার বাড়ি তালাবন্ধ থাকে।'

—'থাকুক তালাবন্ধ। বাড়িখানাকে আমি একবার বাইরে থেকে দেখতে চাই। যে কোনও বাড়ি তার মালিকের অল্প-বিস্তর পরিচয় দিতে পারে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী যে বলো জয়ন্ত, কিছু মানে হয় না।'

—'খুব হয়। একখানা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তার মালিক কোন প্রকৃতির লোক! সে ধনী, না মধ্যবিত্ত, না দরিদ্র? সে শৌখিন, না সাদাসিধে? এমন আরও অনেক কিছুই বাড়ি দেখে আমি বলে দিতে পারি।'

—'ইশ তাহলে আর ভাবনা ছিল না! কারুর বাড়ি দেখেই তুমি বলে দিতে পারো, সে সাধু, না চোর? সে গাঁজা খায়, না চণ্ডু খায়? যত সব বাজে ধাপ্পা।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি বড্ড বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন, অতটা আমি পারি না।'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার বসত-বাড়ি দেখে জয়ন্ত কিছুতেই বলতে পারবে না যে, তার মালিকের মাথায় আছে কাচের মতন তেলা টাক আর কোমরে আছে মস্ত বড়ো ঝোঝুল্যমান ভুঁড়ি! হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তুমি তা বলতে পারবে কি?'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'মানিক, চিরদিনই কি তুমি সুন্দরবাবুকে চটাবার চেষ্টা করবে?'

সুন্দরবাবু প্রাণপণে মনের রাগ দমন করতে করতে বললেন, 'হুম, মানিকের মতন ছ্যাঁচড়ার কথায় আমি আবার নাকি রাগ করব! আরে ছোঃ! মানিককে আমি ছুঁচোর মতন বাজে জীব বলে মনে করি।'

সুন্দরবাবুকে আরও বেশি রাগাবার জন্যে মানিক আবার কী বলবার উপক্রম করছিল, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সময় আমার নেই। চলুন সুব্রতবাবু, প্রতাপের বাড়ি আমাকে চিনিয়ে দিন।'

সকলে অগ্রসর হল।

কোদালপুর গ্রামখানি বিশেষ বড়ো গ্রাম নয়। কাঁচা পথ, তার এধারে-ওধারে মাঝে মাঝে দু-চারখানা মেটেঘর এবং মাঝে মাঝে দু-একখানা কোঠাবাড়ি।

খানিক দূর অগ্রসর হয়ে পাওয়া গেল একখানা লাল রঙের তিনতলা বাড়ি। তার চারপাশে আছে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ন্যাড়াজমি।

সুব্রত বললে, 'এই হচ্ছে প্রতাপের বাড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত ভায়া, তুমি বাড়ি দেখে বাড়ির মালিককে না কি চিনতে পারো? এ বাড়িখানাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার কী মনে হয়? আমার মনে হয়, এ বাড়ির মালিক অত্যন্ত সাবধানী!'

—'মানে?'

—'মানে ওই বাড়ির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ির জানলায় থাকে সোজা চার কি পাঁচটি গরাদ। কিন্তু এ বাড়ির জানলায় দেখছি, সোজা গরাদের সঙ্গে

আড়াআড়ি লোহার গরাদ দেওয়া! তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির মালিক চান যে, বাইরের কোনও লোক সহজে যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে! এতটা সাবধানতার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে!'

সুব্রত বললে 'জয়ন্তবাবু, প্রতাপের বাড়ি দেখলেন তো?'

জয়ন্ত বললে, 'দেখলুম বইকী! বাড়ির ফটকে মস্ত এক তালা লাগানো রয়েছে। তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির ভিতরে কোনও লোক নেই। আচ্ছা, আসুন! যখন বাড়িখানাকে পেয়েছি, তখন এর চারিদিকটা একবার প্রদক্ষিণ করে দেখা যাক!'

—'তাতে আমাদের কী লাভ হবে?'

—'লাভ? হয়তো কিছুই লাভ হবে না, তবু আরও কিছুক্ষণ পদচালনা করলে বিশেষ ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই বোধ হয়?'

সকলে বাড়ির চতুর্দিকে একবার ঘুরে এল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নজরে পড়ল না। বাড়ির প্রত্যেক জানলা বন্ধ, কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই নেই।

গ্রামের উপরে তখন ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। পাখির দল বাসায় ফিরে গিয়েছে, এখানে-ওখানে গাছের ওপর থেকে ভেসে আসছে তাদের বেলা-শেষের কলরব।

জয়ন্ত এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আবার থমকে দাঁড়ালে কেন বাপু? শেষটা কি অন্ধের মতো সাপের খপ্পরে গিয়ে পড়বে?'

জয়ন্ত চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনি তো বললেন, এ বাড়ির ভিতরে লোকজন কেউ নেই?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বচক্ষেই তো দেখলেন বাড়ির বাইরে তালা দেওয়া!'

—'তা দেখেছি বটে। কিন্তু এখন আর একটা জিনিসও লক্ষ করছি।'

—'কী?'

—'ধোঁয়া।'

—'ধোঁয়া আবার কী?'

—'বাড়ির দোতলার কোণের ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া।

জয়ন্ত বললে, 'ধোঁয়া কি মানুষের অস্তিত্বই প্রমাণিত করে না?'

মানিক বললে, 'বোধ হয় ওটা রান্নাঘর। কেউ উনুনে আগুন দিয়েছে।'

—'হুঁ। এখন আমাদের কী করা উচিত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন আমাদের কিছুই না করা উচিত। সোজা বাসায় ফিরে চল।'

—'তাই যাব। কিন্তু তারপর গভীর রাত্রে আবার আমরা এইখানেই ফিরে আসব।'

—'কেন?'

—'বাড়ির ভিতরটা দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

—'দেখবে কেমন করে? দরজায় তো তালা বন্ধ! দরজা ভাঙবে?'

—'উঁহু। আগে বাইরের প্রাচীর লঙ্ঘন করব।'

—'তারপর?'

—'তেতলার ছাদ থেকে ওই যে বৃষ্টির জল বেরুবার নলটা মাটির দিকে নেমে এসেছে, ওইটে অবলম্বন করে সোজা ছাদের উপর গিয়ে উঠব।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বলো কী হে? ওসব আমাকে দিয়ে হবে-টবে না বাপু! তারপর যদি ফস করে হাত ফসকে—উঃ!' তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শিউরে উঠে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, 'আপনি সুব্রতবাবুর সঙ্গে বাসাতেই থাকবেন। আমার সঙ্গে আসবে খালি মানিক।'

মানিক বললে, 'রাজি!'

চতুর্থ

সেই রাত্রে

ঢং ঢং ঢং ঢং—

জয়ন্ত প্রথম রাত্রেই শয্যাগ্রহণ করেছিল এবং মানিকও। কিন্তু তাদের ঘুম অত্যন্ত সজাগ।

ঘড়ি বার-চারেক বাজতে না বাজতেই জয়ন্ত বিছানার উপরে ধড়মড় করে উঠে বসে ডাকলে, 'মানিক!'

মানিকও ততক্ষণে বিছানার উপরে উঠে বসেছে। দুই হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, 'শুনেছি। রাত বারোটা বাজছে।'

—'আমাদের পোশাক পরাই আছে। উঠে পড়ো। ওই ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুলো না। চলো, আর দেরি নয়।' জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে নিজের ব্যাগটার দিকে বাহু বিস্তার করলে।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর নাক এখনও গান গাইছে। যাবার সময় ওঁকে বলে গেলে হয় না?'

—'হুম! না, আমার নাক এখনও গান গাইছে না! তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি!'

মানিক সবিস্ময়ে ফিরে দেখল, সুন্দরবাবু জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন তারই মুখের পানে! বললে, 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। স্বচক্ষে দেখলুম আপনার নিদ্রিত চক্ষু, আর স্বকর্ণে শুনলুম আপনার জাগ্রত নাসিকা-ধ্বনি! অথচ আপনি—'

সুন্দরবাবু উঠে বসতে বসতে বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার নাক ডাকলেও আর আমার চোখ বুজে থাকলেও আমি নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়িনি। তোমরা যাবে হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে আর আমি ঘুমিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকব? আমি কি অমানুষ? আমি কি তোমাদের ভালোবাসি না?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রতাপ চৌধুরির বাড়িখানাকে আপনি হাঁড়িকাঠ বলে মনে করেন নাকি?'

—'নিশ্চয়! প্রতাপ চৌধুরির যেটুকু বর্ণনা শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট! তার উপরে, এই কালো ঘুটঘুটে রাতে, নর্দমার নল বয়ে তোমরা ওঠবার চেষ্টা করবে এক অজানা শত্রুপুরীর তেতলায়! এমন অপচেষ্টার কথা কেউ কখনও শুনেছে নাকি? উঃ! তোমাদের এই মতলব শুনে পর্যন্ত বুক এত ধড়ফড় করছে যে, হয়তো আমার কোনও শক্ত ব্যামো হবে। এসব শুনেও কেউ কখনও নাকে সরষের তেল দিয়ে অঘোরে ঘুমোতে পারে?'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'আপনি নাসিকার জন্যে সরিষার তৈল ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু আপনার নাসিকা যে ভীষণ কোলাহল করছিল, সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই!'

সুন্দরবাবু বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মারমুখো হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আমার নাসিকা কোলাহল করছিল, বেশ করছিল! আমার নাসিকা যত খুশি কোলাহল করতে পারে, তাতে তোমার কী হে বাপু? ফাজিল ছোকরা! খালি খালি আমার পিছনে লাগা?'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'শান্ত হোন সুন্দরবাবু, শান্ত হোন! মানিক, এখন মশকরা করবার সময় নেই। জানো, আমাদের সামনে রয়েছে কী গুরুতর কর্তব্য?'

মানিক বললে, 'জানি জয়ন্ত, জানি! কিন্তু সুন্দরবাবুর মাথার উপরে ওই লাউয়ের মতন তেলা টাক, আর কাঁকড়ার দাড়ার মতন ওঁর ওই একজোড়া গোঁফ, আর ওঁর ওই থলথলে বিপুল ভুঁড়িটিকে দেখলেই আমার মন যেন অট্টহাস্য না করে থাকতে পারে না। বেশ সুন্দরবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন! আজকের মতো আমি মৌনব্রত অবলম্বন করলুম।'

সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল একেবারে। তিনি হঠাৎ এগিয়ে এসে ডান হাতে জয়ন্তের কাঁধ এবং বাম হাতে মানিকের কাঁধ চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত! ভাই মানিক! আমাকে এখানে একলা ফেলে কেন তোমরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি তো আপনাকে একলা থাকতে বলছি না। আপনিও তো অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।'

সুন্দরবাবুর দুই ভুরু উঠে গেল কপালের দিকে এবং তাঁর সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা প্রবল উত্তেজনার শিহরণ। আড়ষ্টভাবে তিনি বললেন, 'হুম! ছাতের জল বেরুবার নল বয়ে আমি উঠব তেতলার উপরে? জয়ন্ত, তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? হুম, হুম, হুম! আমার এই শরীরটিকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?'

—'বেশ তো, আপনি না হয় মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থেকেই পাহারা দেবার চেষ্টা করবেন!'

—'পাগল! আজ আমি এখানে এক দিনেই তিন বার তিনটে গোখরো সাপকে স্বচক্ষে দেখেছি! এখানকার মাটি ছাতের জল বেরুবার নলের চেয়েও বিপজ্জনক। আমি ভাই ছাপোষা মানুষ—ঘরে আছে স্ত্রী আর আধ-ডজন ছেলেমেয়ে। আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি যমালয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।'

জয়ন্ত দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বললে, 'বেশ, তাহলে আপনি নিরাপদে এইখানেই অবস্থান করুন। আমাদের আর বাধা দেবেন না—আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি জয়ন্তের সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তার চেয়ে জয়ন্ত, আমার আর একটা পরামর্শ শোনো।'

—'কী পরামর্শ?'

—'কালকেই টেলিগ্রাফ করে আমি এখানে একদল পুলিশফৌজ আনাব। তারপর সদল-বলে গিয়ে ঘেরাও করব প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'তা হয় না সুন্দরবাবু। হয়তো গ্রামের দিকে দিকে আছে প্রতাপ চৌধুরির চরেরা। এখানে হঠাৎ পুলিশফৌজের আবির্ভাব দেখলেই যথাস্থানে সেই খবর গিয়ে পৌঁছোবে। তারপর? তারপর আমরা দেখব গিয়ে খাঁচা খালি—পাখিরা কোথায় অদৃশ্য! এখন আর কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই। এসো মানিক!'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে শয্যার উপরে বসে পড়লেন। তিনি আর একটিও বাক্যব্যয় করবার অবসর পর্যন্ত পেলেন না। জয়ন্ত এবং মানিক ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে।

আলো-হারা কালো রাতের বুকে জাগছিল খালি ঝিল্লিদের কণ্ঠ এবং থেকে থেকে তিমির-তুলি দিয়ে আঁকা গাছপালার পাতায় পাতায় বাতাস ফেলছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস। কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। রাতের নিজস্ব একটা ঝিমঝিম ধ্বনি আছে বটে, কিন্তু সে ধ্বনি কানে কেউ শোনে না, প্রাণে করে অনুভব।

নির্জন পল্লি-পথ। কাছে বা দূরে কোনও কুটির বা বাড়ির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে না এক টুকরো আলোকরেখাও।

খানিক দূর অগ্রসর হবার পর জয়ন্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মানিক শুধোলে, 'দাঁড়ালে কেন?'

—'পিছনে একটা শব্দ শুনলুম।'

—'কী রকম শব্দ?'

—'শুকনো পাতার উপরে পায়ের শব্দ।'

—'কুকুর কি শেয়াল যাচ্ছে।'

—'হতে পারে। চলো।'

কিছু দূর এগিয়ে জয়ন্ত আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'আবার পায়ের শব্দ শুনছি।'

এবারে মানিকও শুনতে পেয়েছিল। সে বললে, 'জয়ন্ত, কেউ কি আমাদের অনুসরণ করছে?'

—'অসম্ভব নয়। কেউ হয়তো আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছে। টর্চ জ্বালো।'

জয়ন্ত ও মানিক দুজনেই টর্চ জ্বেলে দিকে দিকে আলোক নিক্ষেপ করলে। কোনও মনুষ্য-মূর্তির বদলে দেখা গেল, একটা শৃগাল ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'কিন্তু আমরা যে শব্দ শুনেছি, তা শেয়ালের পায়ের শব্দ নয়। চুলোয় যাক। এগিয়ে চলো মানিক।'

—'কিন্তু পিছনে শত্রু নিয়ে কি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

—'কত ধানে কত চাল দেখাই যাক না। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

দুজনে অগ্রসর হল। কাছে এবং দূরে দুই গাছের ডালে বসে দুটো প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করছিল। রাত্রি-জগতের বিপুল কালো প্রজাপতির মতো একটা বাদুড় উড়ে গেল বাতাসকে সশব্দে ডানা দিয়ে আঘাত করতে করতে। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

পিছনে সেই পদশব্দ।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, 'শুনছ?'

—'হুঁ।'

—'এই ঝোপটার আড়ালে তাড়াতাড়ি বসে পড়ো।'

দুজনে গা-ঢাকা দিলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে।

খানিকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। তারপর মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল পায়ের শব্দ। বেশ বোঝা গেল, কেউ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা অস্পষ্ট অপচ্ছায়া।

ঝোপের প্রায় পাশে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মূর্তি নিজের মনেই বললে, 'কী আশ্চর্য! এইখানেই তো ছিল, গেল কোথায়?'

জয়ন্ত হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাঘের মতন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজের দুই অতি বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে তাকে করলে প্রচণ্ড আলিঙ্গন।

আর্ত, অবরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বললে, 'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

বাহুর বন্ধন একটু আলগা করে জয়ন্ত বললে, 'কে তুই?'

—'আমি এই গাঁয়েই থাকি।'

—'তুই আমাদের পিছু নিয়েছিস কেন?'

—'না, আমি আপনাদের পিছু নিইনি। আমি ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলুম, ফিরতে রাত হয়ে গেল।'

—'তোর নাম কী?'

—'শ্রীমানিকচাঁদ বিশ্বাস।'

—'আরে, তুমিও মানিক? তাহলে এ যে হয়ে দাঁড়াল মানিক-জোড়! ওহে আমাদের পুরাতন মানিক, এখন এই নতুন মানিকটিকে নিয়ে কী করা যায় বলো দেখি?'

—'আপাতত হাত-পা-মুখ বেঁধে ওকে এই ঝোপের ভিতরে ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তারপর বাসায় ফেরবার সময়ে ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমালেই চলবে।'

—'উত্তম প্রস্তাব। তাহলে এসো, আমাকে সাহায্য করো।'

—'আমাকে ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! আমি নির্দোষ, নিরীহ ব্যক্তি!'

তার পকেট হাতড়ে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে একখানা মস্ত বড়ো শাণিত ছোরা। বললে, 'তুমি যে কী রকম নিরীহ ব্যক্তি, এই বাঘ-মারা ছোরাখানা দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। মানিক, চটপট বেঁধে ফ্যালো এই খুনে গুণ্ডাটাকে। আমাদের অনেক কাজ বাকি।'

লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে ঝোপের ভিতরে নিক্ষেপ করে জয়ন্ত ও মানিক আবার হল অগ্রসর।

আরও খানিক পরে তারা এসে দাঁড়াল প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির সুমুখে।

চারিদিক নিঃসাড় এবং নিবিড় অন্ধকারের কালো বনাত দিয়ে মোড়া। বাড়ির কোনওখানেই কোনও জীবনের লক্ষণ নেই।

অতি অনায়াসেই তারা পাঁচিল টপকে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তারা কান পেতে রইল, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে শুনতে পেলে না কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ।

জয়ন্ত ফিসফিস করে বললে, 'মানিক, আমাদের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি—অর্থাৎ বৃষ্টির জল বেরুবার সেই নলটা ওই দিকের কোথাও আছে। এখানে টর্চ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাদের নলটাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

চক্ষু অন্ধকারে অন্ধ, কাজটা খুব সহজ হল না। কিন্তু অবশেষে পাওয়া গেল নলটাকে।

—'মানিক, একসঙ্গে আমাদের দুজনের ভার এই নলটা হয়তো সইতে পারবে না। তুমি নীচেই দাঁড়াও। আগে আমি ছাতে গিয়ে উঠি—তারপর তুমি।'

দুজনেই যখন ছাতের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে কোথা থেকে চিৎকার করে উঠল একটা কুকুর। বার-তিনেক কেঁউ-কেঁউ করেই আবার সে চুপ করলে।

জয়ন্ত চিন্তিত স্বরে বললে, 'মানিক, কুকুরটা হঠাৎ কেন ডাকলে?'

—'কুকুর কেন ডাকলে, কুকুরই তা জানে। কুকুরের ভাষা আমি শিখিনি।'

—'কিন্তু ওই কুকুরটার ডাক অস্বাভাবিক বলে মনে হল নাকি?'

—'তা হল বটে।'

—'আমার কী মনে হল, জানো?'

—'কী?'

—'ও যেন নকল কুকুরের ডাক।'

—'মানে?'

—'কুকুরের স্বরের অনুকরণে চিৎকার করলে যেন কোনও মানুষ।'

—'তুমি কী বলতে চাও জয়ন্ত?'

—'আমি বলতে চাই, ওটা কুকুরের ডাক নয়, মানুষের সঙ্কেত-ধ্বনি, কেউ যেন কাকে কোনও কারণে সাবধান করে দিলে।'

—'তাহলে শত্রুরা কি জানতে পেরেছে যে, তাদের আড্ডায় আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মতন দুজন অনাহুত অতিথি?'

—'খুব সম্ভব, তাই।'

—'এ ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?'

—'এখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ভুলে যাও মানিক। এখন ছাতের উপরেই থাকি, আর নল বয়ে আবার নীচেই নেমে যাই, দুটোই হচ্ছে এক কথা। ওই কোণে রয়েছে চিলের ছাত। ওর তলায় আছে বাড়ির ভিতরে নামবার সিঁড়ি। এসো, মরবার বা বন্দি হবার আগে দেখে নি, এই বাড়ির ভিতরটা কী রকম! কোনও ভয় নেই, বিপদ নিয়েই তো আমাদের কারবার! এরও চেয়ে ঢের বেশি বিপদকে আমরা ফাঁকি দিয়েছি, আজও কি আর পারব না? এসো, দেখি—সাধুর সহায় ভগবান!'

চিলের কুঠুরির তলাতেই ছিল সিঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে নীচের দিকে নেমে গেল—টর্চের আলো করলে তাদের পথনির্দেশ।

টর্চের আলো ফেলে ফেলেই খুব তাড়াতাড়ি তারা দেখে নিলে, এদিকে বারান্দার কোলে রয়েছে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরের দরজা তালাবন্ধ, কিন্তু তৃতীয় ঘরখানা তালাবন্ধ নয়—যদিও বাহির থেকে তার শিকল ছিল তোলা।

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তিনতলা থেকে দোতলায় নামবে কী নামবে না, এমন সময় শোনা গেল বোধহয় একতলার সিঁড়িতে উচ্চ পদশব্দ! একজনের নয়, দুইজনের নয়—অনেক লোকের পদশব্দ। এবং তারা উপরে উঠছে অত্যন্ত দ্রুতপদেই।

—'মানিক, মানিক!"

—'কী জয়ন্ত?'

—'ফাঁদে পড়েছি—এক রকম যেচেই। আর ভাববার সময় নেই। এই দুটো ঘরই তালাবন্ধ, কিন্তু ও-ঘরটার বাহির থেকে কেবল শিকল তোলা আছে। চলো, আমরা ওই ঘরেই ঢুকে ভিতর থেকে খিল এঁটে দি।'

—'কিন্তু তাহলে যে আমাদের অবস্থা হবে কলে-পড়া ইঁদুরের মতন!'

—'মোটেই নয়। অকারণেই আমরা 'অটোমেটিক' রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। একটা কোণ পেলে হয়তো আমরা যুদ্ধ করে অনেক শত্রু বধ করতে পারব।'

চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে জয়ন্ত ও মানিক তৃতীয় ঘরের শিকল খুলে ভিতরে

ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে। বাইরের দ্রুত পদশব্দগুলো তখন হাজির হয়েছে ত্রিতলের বারান্দার উপরে।

অকস্মাৎ অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই বিকট স্বরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্য করে কে বলে উঠল, 'এসেছ বন্ধুগণ? এসো, এসো, আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে আছি! হা-হা-হা-হা-হা!'

ঘরের বাইরে এবং ভিতরেও শত্রু। জয়ন্ত ও মানিক দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। এতটা তারা কল্পনা করতে পারেনি!

পঞ্চম

তারপর

হা-হা-হা-হা-হা-হা! ঘরের ভিতরে আবার অট্টহাসি!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের হাত ধরে টেনে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল যে-দিক থেকে অট্টহাসি আসছিল না সেই দিকে। তারপর এমনভাবে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

ঘরের ভিতরে আবার বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠস্বর জাগল—'এসেছ বন্ধুগণ! এসো, এসো, আমি যে তোমাদেরই জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি!' তারপরই শুরু হল গান ঃ

'এসো এসো বঁধু এসো,
আধ আঁচরে বোসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!'

উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠের এই হাসি, কথা ও গান শুনে সচকিত জয়ন্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'কে তুমি? তোমার গলা যে চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।'

—'হচ্ছে না কি? হচ্ছে না কি? হা-হা-হা-হা! বন্ধু আর বন্ধুর গলা চিনবে না?'

—'তুমি হচ্ছো ভূষোপাগলা!'

—'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।

হা-হা-হা-হা-হা-হা! সোনার আনারসের এই ছড়া তোমরা জানো? তাহলে—'

কিন্তু ভূষোপাগলার কথা আর শেষ হল না, হঠাৎ বাহির থেকে ঘরের দরজার উপরে শোনা গেল দমাদ্দম পদাঘাতের শব্দ। একসঙ্গে অনেকগুলো পা দরজার পাল্লা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ঘরের ভিতরের বিপদ সম্বন্ধে জয়ন্ত তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে—কারণ, পাগলা হলেও ভূষো নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নয়! জয়ন্ত ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, 'দরজা ভাঙবার চেষ্টা করো না! আমরা নিরস্ত্র নই!'

বাহির থেকে হো-হো করে হেসে সচিৎকারে কে বললে, 'ওরে ছিঁচকে চোর! তুই কি ভেবেছিস আমরাও সশস্ত্র নই?'

—'আমাদের কাছে 'অটোমেটিক' রিভলভার আছে—এক মিনিটে তারা কতগুলো গুলিবৃষ্টি করতে পারে তা জানো?'

—'আমাদের দলে লোক আছে পনেরো জন। তোমরা দু-একটা গুলি ছুড়তে না ছুড়তেই আমরা তোমাদের দুজনকে কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব।'

—'বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো। ব্যাপারটা যা ভাবছ ততটা সহজ নয়।'

—'দেখ, ভালো চাস তো ভালোমানুষের মতন ধরা দে।'

—'তারপর?'

—'তারপর আবার কী?'

—'তারপর আমাদের নিয়ে তোমরা কী করবে?'

—'আগে ধরা তো দে, তারপর সেসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।'

—'চমৎকার! তোমার নাম কী বাছা?'

—'আমার নাম তো একটু আগেই তোরা শুনেছিস!'

—'কী রকম?'

—'আমার নাম মানিকচাঁদ বিশ্বাস।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠে সকৌতুকে বললে, 'আরে, আরে, তুমি সেই ছোরাধারী মানিকচাঁদ—যাকে আমরা ঝোপের ভিতরে ঘাস-বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছিলুম? তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলে কে হে?'

—'ওরে গঙ্গারাম, তুই কী ভেবেছিস এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তোদের ওপরে দৃষ্টি রাখেনি? তোরা চলে আসবার তিন-চার মিনিট পরেই আমি মুক্তি পেয়েছি!'

—'বটে, বটে, বটে! তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার হিংসে হচ্ছে যে!'

—'তার মানে?'

—'তুমি তো দিব্যি চট করে মুক্তি পেয়েছ। কিন্তু আমরা কি অত সহজে তোমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারব?'

—'সে আশায় জলাঞ্জলি দে। তোরা বাঘের গর্তে ঢুকেছিস। আমাদের গুপ্তকথা জানতে পেরেছিস। তোরা কি আর কখনও ছাড়ান পাবি বলে আশা রাখিস?'

—'আশা রাখি বইকী মানিকচাঁদ, আশা রাখি বইকী, খুব রাখি! কিন্তু বাপু, ওই যে গুপ্তকথাটা উল্লেখ করলে, ওর অর্থ কী? তোমাদের কোন গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?'

—'ভূযোপাগলা যে এখানে আছে, এ কথা কি তোরা জানতে পারিসনি?'

—'এও আবার একটা গুপ্তকথা না কি? ভূযো তো পাগলা মানুষ, ও যেখানেই থাকুক তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন?'

—'তোরা তো ভূযোকে পাবার জন্যেই এখানে এসেছিস রে!'

—'মোটেই নয়।'

—'তবে কি তোরা এখানে এসেছিস হাওয়া খাবার জন্যে?'

—'আমরা এসেছি অন্য একটা কথা জানবার জন্যে।'

—'কী কথা?'

—'যে-বাড়ি সবাই জানে খালি বাড়ি, তার ভিতরে মানুষ থাকে কেন?'

—'এ কথা জেনে তোদের লাভ?'

—'লাভালাভের ধার ধারি না, আমরা এসেছি কৌতূহল চরিতার্থ করতে।'

—'কৌতূহল চরিতার্থ, না আত্মহত্যা করতে?'

—'আমরা আত্মহত্যা করতে মোটেই রাজি নই। যাক, এসব বাজে কথা! মানিকচাঁদ তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ আলাপ হল, এইবার আমরা আর একজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

—'কার সঙ্গে?'

—'তোমাদের কর্তা প্রতাপ চৌধুরিকে ডাকো।'

—'তিনি তো এখন কলকাতায়!'

—'এটা কি সত্য কথা?'

—'তিনি এখানে থাকলে তোর মতো পাজির-পা-ঝাড়ার সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে মুখ-ব্যথা করতে হত না।'

—'ও, আপাতত তুমিই বুঝি এখানকার প্রধানসেনাপতি?'

—'না, আপাতত আমিই এ-বাড়ির মালিক।'

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, 'তার মানে?'

—'প্রতাপবাবুর সঙ্গে এখন এ-বাড়ির আর কোনওই সম্পর্ক নেই।'

—'সম্পর্ক নেই! কেন?'

—'বাড়িখানা তিনি আমার কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতাপবাবু এ গ্রামে আর থাকতে চান না।'

—'কেন, এ গ্রামটি তাঁর পক্ষে কি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে?'

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। নতুন এক গলায় শোনা গেল,—'মানিক, তুমি লোকটার সঙ্গে এত কথা কইছ কেন বলো দেখি? তুমি কি বুঝতে পারছ না, ও তোমার পেটের কথা আদায় করবার চেষ্টা করছে?'

—'ঠিক বলেছিস ভজা! ধড়িবাজটার সঙ্গে আর কোনও কথা নয়। ওহে জয়ন্ত, এইবার শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি, দরজা তোমরা খুলবে, না আমরা ভেঙে ফেলব?'

—'দরজা আমরা খুলব না, ভাঙতে চাও তো তোমরাই ভাঙো।...আমরা তোমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত। মানিক, রিভলভার বার করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াও। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজনে গুলিবৃষ্টি করব। হতভাগারা বোধহয় 'অটোমেটিক' রিভলভারের মহিমা জানে না।' শেষের কথাগুলো জয়ন্ত এমন চিৎকার করে বললে যে বাইরের সবাই শুনতে পেলে।

কিন্তু বাহির থেকে দরজা ভাঙার কোনও চেষ্টাই হল না। কেবল শোনা গেল, মানিকচাঁদরা পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে। তারপর তাদের কণ্ঠস্বর হল একেবারে নীরব।

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে ঘরের অন্য দিকের একটা খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু দেখা গেল কেবল অন্ধকার। রাত্রি তখন দিবসের দিকে অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের কালিমা পাতলা হবার কোনও লক্ষণই নেই। পৃথিবীও যেন বোবা হয়ে আছে।

মানিক চুপি চুপি বললে, 'জয়ন্ত, ওরা বোধহয় আজ রাতে কোনও গোলমাল করবে না।'

—'হুঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। ওরা ভোরের জন্য অপেক্ষা করছে, রাতের অন্ধকারে ওরা আমাদের গুলি হজম করতে রাজি নয়। এখন দেখা যাক, এই অন্ধকারের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি না! আস্তে আস্তে একবার জানলার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো দেখি!'

মানিক জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর ফিরে এসে বললে, 'নীচের জমির দিকে তাকিয়ে মনে হল, কারা যেন এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে।'

—'মানিকচাঁদ তাহলে ওদিকেও পাহারা রাখতে ভোলেনি। দেখছ আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। কালকের প্রভাত হয়তো আমাদের পক্ষে সুপ্রভাত হবে না!'

এতক্ষণ পরে ভূষোপাগলা হঠাৎ মুখ খুলে বলে উঠল,—'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! আমি জানি আমার জীবনে আর সুপ্রভাত আসবে না। কিন্তু তোমরা কে বাপু? তোমরা এখানে কেন?'

জয়ন্ত বললে,—'মানুষ নিজের বিপদকে কতখানি বড়ো করে দেখে বুঝেছ তো মানিক! ভূষোপাগলা যে আমাদের সঙ্গেই আছে, এ-কথা আমরাও ভুলে গিয়েছিলুম। যাক, এ তবু মন্দের ভালো। ভূষোর সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।' এই বলে সে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে ভূষোপাগলা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

মানিক বললে,—'এ কী ভূষণ, তোমার মাথায় আর মুখে যে চাপ চাপ শুকনো রক্ত!'

ভূষো হেসে বললে,—'দুশমনরা লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে ধরে এনেছে। এই দ্যাখো না, আমার হাত-পা-ও বাঁধা!'

জয়ন্ত বললে,—'আহা, বেচারি! মানিক, ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'

বাঁধন খুলে দিতে দিতে মানিক বললে,—'আচ্ছা ভূষণ, তোমার মতন নিরীহ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার কেন? তুমি কি ওদের কোনও অনিষ্ট করেছ?'

ভূষো মাথা নেড়ে বললে,—'কিছু না, কিছু না। নিজের উপকার কী পরের উপকার, কিছুই আমি করতে পারি না। আমি খালি খাই-দাই, বগল বাজাই আর সোনার আনারসের গান গাই!'

—'তবে ওরা তোমাকে ধরে রেখেছে কেন, সে-কথা কি জানো?'

—'ওদের মুখেই শুনে জেনেছি।'

—'কী জেনেছ?'

—'আমি সোনার আনারসের ছড়া জানি বলেই ওরা আমাকে ধরে রেখেছে!'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। ওরা আমাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। ওদের বিশ্বাস, আমি আরও অনেক কথা জানি।'

জয়ন্ত বললে,—'বটে, বটে? তুমি আরও অনেক কথা জানো নাকি?'

—'অনেক কথা জানি গো, আবার অনেক কথা জানি না!'

—'তুমি কী কী কথা জানো ভূষণ?'

ভূষোর দুই চক্ষে ফুটল সন্দেহের ভাব। সে বললে,—'আমার কথা তুমি জানতে চাও কেন? ও, তুমিও বুঝি ওই দলে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমার মনের কথা জেনে নিতে চাও!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে,—'না ভূষণ, আমরা তোমার বন্ধু, তোমাকে উদ্ধার করতেই এখানে এসেছি।'

—'হা-হা-হা-হা! আমরা তিনজনেই যে ইঁদুর-কলে ধরা-পড়া ইঁদুর! এখন কে কাকে উদ্ধার করে?'

—'ভূষণ, লোকে তোমাকে পাগল বলে বটে, কিন্তু তোমার কথাবার্তা তো ঠিক পাগলের মতন নয়!'

—'লোকে ঠিক বলে গো, ঠিক বলে! আমি পাগল নই তো কী? ওই সোনার আনারসের ছড়াই আমাকে পাগল করেছে।'

—'ছড়া আবার কারুকে পাগল করতে পারে নাকি?'

—'সোনার আনারসের ছড়ার মানে বুঝলে পাগল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও বড়ো বিষম ছড়া গো, মানুষকে মত্ত করে তোলে!'

—'কিন্তু ছড়ার শেষটা তো তুমি এখনও আমাদের শোনাওনি!'

—'শুনবে? তা শোনাতে আমার আপত্তি নেই। আমার মুখে এ ছড়াটা তো আরও কত লোকে শুনেছে, কিন্তু কেউ পারেনি এর মানে বুঝতে!'

—'আমিও মানে বুঝতে পারব না, তবু ছড়ার সবটা শুনতে ক্ষতি কী?'

—'তবে শোনো—'

ভূষোকে বাধা দিয়ে হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে সগর্জনে কে চিৎকার করে উঠল,—'খবরদার ভূষো, খবরদার! ছড়াটা ওদের কাছে বললে তোকে আমরা এখনই খুন করে ফেলব!'

ভূষো ভয়ে কুঁচকে পড়ে বললে,—'শুনছ তো? ঘরের বাইরে দুশমনরা আড়ি পেতেছে? আর ছড়া বলে কাজ নেই বাবা!'

জয়ন্ত বললে,—'কাকে তুমি ভয় করছ ভূষণ? ওদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! দেখলে তো, আমাদের ভয়ে ওরা দরজা ভাঙতে সাহসই করলে না!'

দরজার দিকে ত্রস্ত চক্ষে বার বার তাকাতে তাকাতে ভূষো বললে—'তাহলে ছড়ার শেষটা বলব?'

—'নিশ্চয়ই বলবে! দেখি কে তোমার কী করে!'

ভূষো বললে ঃ

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।
সেইখানেতে জলচারী,
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে,
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ ধরে লাইনগুলো মনে মনে আউড়ে নিয়ে বললে,—'ভূষণ, তোমার ছড়ার সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।'

—'মানে বুঝতে পারলে?'

—'পরে সে চেষ্টা করে দেখব বইকী!'

—'পরে কি আর সময় পাবে?'

—'কেন পাব না?'

—'আমরা যে কলে-পড়া ইঁদুর!'

জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাইরে অন্ধকার তখন আর ততটা নীরন্ধ্র নয়। পুবের আকাশে আলোকের প্রথম ইঙ্গিত জাগতে আর বেশি দেরি নেই। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন প্রভাতের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা।

আচম্বিতে ওদিককার খোলা জানলাটার ওপাশে হল কালো অপচ্ছায়ার মতন একটা মূর্তির আবির্ভাব এবং চোখের পলক পড়বার আগেই মূর্তিটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, ঘরের ভিতরে কী একটা জিনিস নিক্ষেপ করে!

পরমুহূর্তে ভীষণ এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটা ভরে উঠল বিষম তীব্র এক দুর্গন্ধে!

জয়ন্ত প্রায়বদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'জানলার দিকে চলো—জানলার দিকে চলো! ওরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুড়েছে! উঃ!'

কিন্তু তারা কেউ জানলা পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারলে না, সবাই মাটির উপরে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল!

ষষ্ঠ

'ডোল ডোল'

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দেখলে, তার বুকের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একখানা উদ্বিগ্ন মুখ! সে মুখ সুন্দরবাবুর।

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'হুম, বাঁচলুম! জয়ন্তের জ্ঞান হয়েছে!'

জয়ন্ত শান্তস্বরে বললে, 'আমার কী হয়েছে সুন্দরবাবু? চোখে কেন ঝাপসা দেখছি—মাথার ভিতরে বিষম যন্ত্রণা, নিঃশ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তা কি মনে পড়ছে না?'

—'কোথায়?'

—'প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে।'

ধাঁ করে জয়ন্তের মনের পটে ফুটে উঠল যেন একখানা বিদ্যুতে আঁকা চলচ্চিত্র! দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তন! নিশীথ রাত্রি, মানিকচাঁদের আবির্ভাব, প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি, শত্রুদের আক্রমণ, অন্ধকার ঘর, ভূষোপাগলার অট্টহাসি—তারপর বিষাক্ত বোমার বিস্ফোরণ!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সুন্দরবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না জয়ন্ত, না! ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছেন, এখনও দু-তিন দিন তোমাকে বিছানাতেই শুয়ে থাকতে হবে।'

—'মানিক কোথায়, মানিক?'

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ক্ষীণস্বরে জবাব এল, 'জয়, এই যে আমি! তোমার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু শরীরে যেন আর পদার্থ নেই!'

—'ভগবানকে ধন্যবাদ, মানিকও আমার সঙ্গে আছে! ভুষোপাগলার খবর কী?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাকেও এনেছি, তার জ্ঞান হয়েছে সকলের আগে!'

—'কোথায় সে?'

—'এই বাড়িরই অন্য একটা ঘরে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।—কালকের নাট্যাভিনয়ে আপনার আবির্ভাব হল কোন ভূমিকায়, কখন আর কোথায়?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি বড়ো বেশি বকাবকি করছ। আগে আর একটু সুস্থ হও, তারপর কাল সব শুনো।'

সত্য কথা। জয়ন্তের মাথার ভিতরটাও তখনও রীতিমতো ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে হয়ে ছিল এবং থেকে থেকে তার দমও যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমন করে সে বললে, 'সুন্দরবাবু, সব কথা না শুনলে মন আমার শান্ত হবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তা আবার আমি জানি না? ও মন আবার শান্ত হবে? হুম! ও মন যে দুর্দান্ত মনঃ! সব জানি, সব জানি!'

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'জানেন তো কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এই আমি দুই চোখ বন্ধ করে খুলে রাখলুম কেবল দুই কান! এখন খুলুন আপনার মুখ!'

ওদিককার বিছানা থেকে মানিক তেমনি ক্ষীণ স্বরেই বললে, 'কিন্তু সাবধান সুন্দরবাবু, সাবধান!'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে ঘরের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'সাবধান হতে বলছ কেন মানিক?'

—'ম্যালেরিয়ার মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়।'

—'হোক গে, তাতে আমার কী?'

—'এখানে ম্যালেরিয়ার মশা আছে।'

—'এই বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে যে লাখো লাখো ম্যালেরিয়ার মশা আছে, তা কি আমি জানি না? কিন্তু আচমকা তুমি ধান ভানতে শিবের গান গাইছ কেন?'

—'জয়ন্ত আপনাকে মুখ খুলতে বলছে। কিন্তু যে মশারা বাইরে থেকে কুটুস করে কামড়ালেই ম্যালেরিয়ায় ধরে, মুখ খোলা পেয়ে সেই বেপরোয়া মশারা যদি দল বেঁধে আপনার বিপুল ভুঁড়ির অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে আপনি তাদের হজম করতে পারবেন কি? তারা হুল ফুটিয়ে দেবে আপনার পিলে, লিভার আর হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির উপরে! তখন? তখন কী হবে? এইসব ভেবেচিন্তেই আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি! এখানে মুখ খোলা নিরাপদ নয় সুন্দরবাবু! আমি আপনার বন্ধু, আপনার হাপরের মতন মস্ত উদর যে ম্যালেরিয়ার আস্তানায় পরিণত হয়, এটা আমি ইচ্ছা করি না। সাবধান!'

সুন্দরবাবু রেগে তিড়বিড় করতে করতে বললেন, 'মানিক! তুমি হচ্ছ ঝাল ধানি-লঙ্কার মতো অসহনীয়! প্রায় মরতে বসেছ, তবু জোঁকের মতো আমার পিছনে লাগতে ছাড়বে না?'

মানিক ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাকে যে বড্ড ভালোবাসি সুন্দরবাবু। আপনাকে কি ছাড়তে পারি?' এই বলেই সে বিছানার উপরে টপ করে উঠে বসে দুই বাহু বিস্তার করে বললে, 'আমি আপনাকে ছাড়ব? আমি এখনই শয্যা ছেড়ে আপনাকে পরম শ্রদ্ধাভরে আলিঙ্গন করব!'

সুন্দরবাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললেন, 'মানিক! আমি নিষেধ করছি—তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না! ডাক্তার বলেছেন, তাহলে তোমার অসুখ বাড়বে। শুয়ে পড়ো, এখনই শুয়ে পড়ো!'

মানিক খাট ছেড়ে নামবার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমি আপনাকে ছাড়ব না! আমি আপনাকে আলিঙ্গন করবই করব!' সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর তাকে ধীরে ধীরে আবার বিছানার উপরে শুইয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানিক, অকারণে বাক্য-বিষ ছড়িয়ে কেন আমায় জ্বালাও বলো দেখি? কেন তুমি খালি খালি আমাকে রাগিয়ে দাও? তুমি কি জানো না, জয়ন্ত আর তোমাকে আমি কত ভালোবাসি? হুম!'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'মানিক, তোমার এই অসাময়িক প্রহসনের অভিনয় আজ আমার ভালো লাগছে না! যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ, সেখানে প্রহসন আমি পছন্দ করি না। আসুন সুন্দরবাবু, বলুন আপনার কথা।'

মানিক খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'ভাই জয়, জীবন আর মৃত্যু নিয়ে শখের খেলাই হচ্ছে যে আমাদের ব্যাবসা! প্রহসনের অভিনয় তো এখানেই সাজে!'

—'হাত জোড় করি ভাই মানিক! তোমার দার্শনিকতার লেকচার থামাও, সুন্দরবাবুর কথা শুনতে দাও।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার কথা বলব কী ভাই জয়ন্ত, সব কথা আমি নিজেই এখনও ভালো করে বুঝতে পারিনি।'

'রাত্রিবেলায় তুমি আর মানিক তো প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির দিকে যাত্রা করলে, আমি একলা ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগলুম কত রকম দুর্ভাবনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, শেষ-রাতের অন্ধকার ঠেলে ফুটল সকালের আলো, তবু তোমাদের দেখা নেই!

'ভেবে ভেবে আমি পাগলের মতন হয়ে উঠলুম। বুঝলুম নিশ্চয়ই তোমরা কোনও বিপদে পড়েছ। হয়তো তোমরা আর বেঁচে নেই, এমন সন্দেহও হল। সুব্রতবাবুও বললেন, মানুষ খুন করতে নাকি প্রতাপ চৌধুরির একটুও বাধে না।

'হাজার হোক আমি পুলিশের লোক তো, এই কাজে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি—হুম, ভেবে সারা হলেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি না! দুশ্চিন্তার কালো মেঘের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম একটুখানি আশার আলো!

'সুব্রতবাবুকে নিয়ে ছুটলুম এখানকার থানায়। নিজের আর তোমাদের পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুর কাছে সব কথা খুলে বললুম। তিনি তখনই কয়েকজন চৌকিদার নিয়ে থানা

থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তোমাদের খোঁজে সকলে মিলে ছুটলুম প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির দিকে।

'বাড়ির সদর দরজায় তখন আর বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল না। পাল্লা দু-খানা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকেই। কিন্তু যখন ডাকাডাকির পরেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দরজা ভেঙেই আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর দেখলুম, উঠানের উপরে পড়ে রয়েছে তোমাদের তিনজনের অচেতন দেহ। তারপর—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের দেহ ছিল কোথায়?'

—'বাড়ির একতলার উঠানের উপরে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বোমায় আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে।'

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে শত্রুরা আমাদের দেহগুলোকে একতলায় নামিয়ে এনেছিল।'

—'কিন্তু কেন?'

—'খুব সম্ভব তারা চেয়েছিল আমাদের দেহগুলোকে স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলতে! কিন্তু যথাসময়ে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হয়েছিল তাই রক্ষা, নইলে আমাদের কি দুর্দশা হত কে জানে?'

—'জয়ন্ত, তুমি 'শত্রু শত্রু' করছ বটে, আমরা কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও শত্রুর একগাছা টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'তারা আপনাদের দেখে চম্পট দিয়েছিল।'

—'তাও সম্ভবপর নয়। পাছে তারা পালায় তাই আমরা চারিদিক থেকে বাড়িখানাকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছিলুম।'

—'তাহলে তারা পালাল কেমন করে?'

—'সেইটেই তো সমস্যা! আর একটা কথাও মনে রেখো, বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকে।'

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, 'হ্যাঁ, এটা একটা ভাববার কথা বটে। ও-বাড়ির সদরে বাইরে তালা দেওয়া থাকলেও ভিতরে বাস করে মানুষ। আবার ও-বাড়ির সদর ভিতর থেকে বন্ধ থাকলেও ভিতরে ঢুকে মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত রহস্য!'

ঠিক সেই সময়ে একটি নতুন লোক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'নমস্কার দারোগাবাবু। নতুন কোনও খবর আছে?'

—'আছে।'

—'কী?'

—'প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে আমার এক চৌকিদারকে পাহারায় রেখে এসেছিলুম জানেন তো? আজ সে মারা পড়েছে।'

—'কেন?'

—'কে তাকে খুন করেছে।'

—'খুন?'

—'হ্যাঁ। আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই, তখনও সে বেঁচেছিল বটে, তবে সেটা না-বাঁচারই সামিল। কারণ দু-চার বার অস্ফুট স্বরে 'ডোল' 'ডোল' বলেই সে মারা পড়ে। তার বুকে আর মুখে ছোরা মারার চিহ্ন।'

জয়ন্ত বললে, 'ডোল মানে?'

—'চৌকিদার ঠিক কী বলতে চেয়েছিল, আমিও তা বুঝতে পারিনি! তবে এটা দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির একতলায় সিঁড়ির খিলানের তলার একটা চৌবাচ্চার মতন বড়ো লোহার ডোল বা জলাধার আছে! চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায় ঠিক তার পাশেই। কিন্তু তার সঙ্গে চৌকিদারের মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বোধহয় মরবার সময়ে লোকটা প্রলাপ বকছিল।'

—'আমারও তাই বিশ্বাস!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার বিশ্বাস অন্য রকম।'

—'কী রকম?'

—'আপনারা খুব সহজেই ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই হালকা নয়।'

—'কেন?'

—'চৌকিদার যে প্রলাপ বকছিল, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

—'প্রলাপ বলে অর্থহীন কথাকেই।'

—'কে বললে চৌকিদারের কথা অর্থহীন? আপনারা তার মুখে শুনেছেন 'ডোল' শব্দটি। আপনারা কি 'ডোল' বা জলাধার খুঁজে পাননি?'

—'কিন্তু খুঁজে পেয়েও আপনাদের কোনও সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

—'সেইটেই বিবেচ্য। অন্তিমকালে চৌকিদারের কথা বলবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। সে-সময়েও সে যখন কোনওরকমে 'ডোল' শব্দটি উচ্চারণ করে ওইদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন তার কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ অর্থ আছে। এই বিশেষ অর্থটি ধরতে পারলেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হতে দেরি লাগবে না।'

দারোগাবাবু বললেন, 'ডোলটি আমি পরীক্ষা করেছি। তার তলায় পড়ে আছে ইঞ্চি পাঁচেক অতি ময়লা পোকা-ভরা জল—ব্যাস, আর কিছুই নেই।'

—'অতি ময়লা পোকা-ভরা জল? তার মানে সে জল কেউ ব্যবহার করত না?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'তাহলে খানিকটা অব্যবহার্য জল ভরে ওখানে অত বড়ো একটা ডোল বসিয়ে রাখবার কারণ কী?'

—'কেমন করে বলব?'

জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'দারোগাবাবু, এখানে পালকি পাওয়া যায়?'

—'যায়। কিন্তু কেন?'

—'আমি এখনই ঘটনাস্থলে যেতে চাই।'

সুন্দরবাবু হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন, 'তোমার দেহের এই অবস্থায়? অসম্ভব, অসম্ভব!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব! আমি তো পায়ে হেঁটে যাচ্ছি না! আমি [illegible]নতুম আপনি আপত্তি করবেন, তাই তো পালকিতে চড়ে যাব রুগির মতো।'

[illegible]ক বললে, 'আর আমি?'

—'আপাতত তুমি শয্যাগত হয়েই থাকো। এক সঙ্গে দু-দুটো রুগিকে সুন্দরবাবু সামলাতে পারবেন কেন?'

আবার প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি। তার চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা।

উঠানের উপর দাঁড়িয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'সিঁড়ির খিলানের তলায় ওই দেখুন সেই ডোলটা। ওরই পাশে চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায়।'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। একটা গোলাকার লোহার জলাধার। উচ্চতায় আড়াই হাত এবং চওড়ায় তিন হাত। তলার দিকে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঘোলা জল।

দারোগাবাবু কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, 'এর ভিতর থেকে আপনি কোনও বিশেষ অর্থ আবিষ্কার করতে পারলেন কি?'

—'কই, এখনও তো কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'পরেও পারবেন না মশাই, পরেও পারবেন না! আমাদের হচ্ছে পেশাদার শিকারির চোখ, যা দেখবার তা আমরা একদৃষ্টিতে দেখে নি!'

—'তা আর বলতে? আপনাদের সঙ্গে আবার আমার তুলনা? কিন্তু দারোগাবাবু, আপনার কাছে আমার একটি আরজি আছে।'

—'বলুন।'

—'ডোলটার ভিতরে জল আছে অল্পই, ওটা বোধহয় বেশি ভারী নয়। অনুগ্রহ করে আপনার চৌকিদারদের হুকুম দিন, অন্ধকার খিলানের তলা থেকে ডোলটাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আনতে। আমি ওটাকে আরও ভালো করে দেখতে চাই।'

—'খুব ভালো করে দেখুন, ভালো করে, প্রাণ ভরে, নয়ন ভরে দেখুন, আমার একটুও আপত্তি নেই। ওরে, তোরা ডোলটাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আন তো! আমাদের শখের গোয়েন্দামশাই ওটাকে ভালো করে দেখতে চান!'

দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাসতে লাগলেন, কিন্তু সুন্দরবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন না। জয়ন্তকে তিনি চিনতেন। আগে আগে তাঁকেও হাস্য করে বারংবার ঠকতে হয়েছে। জয়ন্ত অকারণে কিছু করে না, দারোগার হাসি বন্ধ হতে আর দেরি নেই বোধহয়। জয়ন্তের কথাবার্তায় পাওয়া যাচ্ছে যেন কী এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত। হুম!

চৌকিদাররা ডোলটাকে সশব্দে টানতে টানতে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এল। জয়ন্ত সেদিকে ফিরেও তাকালে না।

দারোগাবাবু বললেন, 'ও মশাই, বলি আপনার হল কি? ডোলটাকে ভালো করে দেখবেন বললেন না? তবে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কী দেখছেন? ডোল তো আর ওখানে নেই। ...আরে, আরে, ও আবার কী!' তাঁর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল চরম বিস্ময়ে!

সুন্দরবাবু দুই পদ অগ্রসর হয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'হুম, হুম!'

ঠোঁট টিপে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে জয়ন্ত বললে, 'দারোগাবাবু, সিঁড়ির তলায় ডোলটা যেখানে ছিল, সেখানে এটা কী দেখছেন তো?'

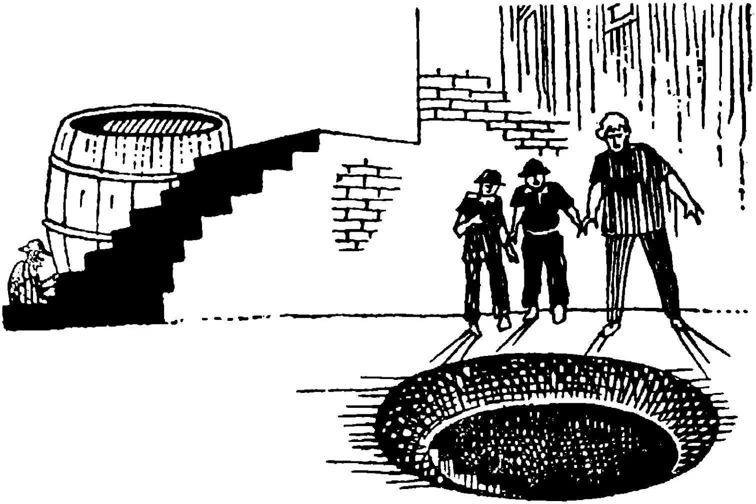

হাঁদারামের মতন মুখ করে দারোগা বললেন, 'একটা বড়ো গর্ত!'

—'খালি গর্ত নয়, গর্তের ভিতর দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সিঁড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'গুপ্তপথ।'

—'হ্যাঁ। যখনই দেখলুম সদর দরজা ভিতর বা বাহির থেকে বন্ধ থাকলেও বাড়ির লোকেরা ভিতরে বা বাহিরে আনাগোনা করতে পারে, তখনই আন্দাজ করলুম, এ-বাড়ির কোথাও-না-কোথাও গুপ্তপথের অস্তিত্ব আছে। তারপর শুনলুম চৌকিদারের অন্তিম উক্তি—'ডোল' 'ডোল'! এও শোনা গেল, চৌকিদারের যেখানে মৃত্যু হয় তার পাশেই পাওয়া গিয়েছে একটা মস্ত ডোল। অবশ্য গুপ্তপথ পাওয়া যাবে যে ডোলের তলাতেই, তখনও পর্যন্ত সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চিতরূপেই বুঝেছিলুম যে, এই ডোলটাকে অবহেলা করে উড়িয়ে না দিলে কোনও-না-কোনও মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পাবেই। আমার ধারণা যে ভুল নয়, এটা কি এখন আপনি স্বীকার করেন দারোগাবাবু?'

কিন্তু দারোগার অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল, তিনি করুণ চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, নীরবে।

—'আরও একটা কথা আন্দাজ করতে পারছি। চৌকিদারের দেহ কেন এইখানে পাওয়া গিয়েছে। চোখের সামনে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা 'ট্রাজেডি'র শেষ দৃশ্য! বাড়ির পলাতক লোকগুলো বোধহয় জানত না, এখানে কোনও চৌকিদার মোতায়েন করা হয়েছে।

কিংবা জেনেও, বিশেষ কোনও প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তারা আবার এই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল গুপ্তদ্বার দিয়ে। চৌকিদার তাদের দেখতে পায়! তারা পলায়ন করে। চৌকিদার তাদের পিছনে পিছনে এখান পর্যন্ত ছুটে আসে। পাছে সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে যায় সেই ভয়ে তারা তখন চৌকিদারকে করে মারাত্মক আক্রমণ! তারপর গুপ্তপথে নেমে ডোলটাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে সরে পড়ে সকলে মিলে। আর একটা বিষয় লক্ষ করুন! অত বড়ো ডোলে জল আছে মাত্র ইঞ্চি পাঁচেক। অতটুকু জল না রাখলেই চলত, তবু রাখা হয়েছে কেবল দুটি কারণে। প্রথমত জল থাকলে বাইরের কোনও অতি কৌতূহলী চক্ষু সন্দেহ করতে পারবে না যে, ডোলটা জলাধার ছাড়া অন্য কোনও কারণে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত অল্প জল না রাখলে ডোলটাকে নীচে থেকে ঠেলে সরাতে বা টেনে গর্তের মুখে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হত। কিন্তু অতি চালাক লোকেরা অতি বোকা হয় প্রায়ই। অত বড়ো ডোলে অত কম জল—তাও পচা, পোকায়-ভরা আর অব্যবহার্য। একথা শুনেই আমার মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহে যে, ওই ডোলে জল রাখা হচ্ছে একটা লোক-দেখানো কাণ্ড! খুব সূক্ষ্ম সন্দেহ, না দারোগাবাবু? এরকম সন্দেহের নিশ্চয়ই কোনও মানে হয় না, কি বলেন?'

দারোগা দুই হাত জোড় করে বিনীতভাবে বললেন, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্তবাবু। আমি মাপ চাইছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! জয়ন্তের কাছে যে শেষটা আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। কিন্তু যাক সেকথা। এখন এই গুপ্তপথ নিয়ে কী করা যেতে পারে? হয়তো এই গুপ্ত পথের ভিতরে গেলে আশে-পাশে আমরা দেখতে পাব গুপ্তগৃহও, কী বলো জয়ন্ত?'

—'তা আমি জানি না।'

—'হয়তো কোনও গুপ্তগৃহের ভিতরে আমরা দেখতে পাব অপরাধীর দলকে। এখন আমাদের কী করা উচিত? সদলবলে গর্তের ভিতর গিয়ে নামব না কি?'

দারোগা বললেন, 'সেইটেই উচিত বলে মনে হচ্ছে। আমরা সশস্ত্র, দলেও ভারী। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার এমন সুযোগ হয়তো আর পাব না। আপনার কী মত জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত রিভলভার বার করে বললে, 'সুড়ঙ্গের ভিতরে যে আমাদের নামাই উচিত, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই প্রস্তুত রাখুন নিজের নিজের অস্ত্র।'

সপ্তম

সুড়ঙ্গ

সকলে সুড়ঙ্গ-পথের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। সর্বাগ্রে দারোগাবাবু।

কয়েকটা ধাপের পরেই সোজা পথ—অন্ধকার ও স্যাঁৎসেতে।

টর্চের আলোতে অন্ধকার তাড়িয়ে প্রত্যেকেই যে-কোনও মুহূর্তে রিভলভারের ঘোড়া টেপবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

কেবল তাদের জুতোর শব্দগুলোই পাতালের স্তব্ধতা ভেঙে দিতে লাগল, তা ছাড়া অন্য কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ নেই।

এক জায়গায় একটা কুঠুরির মতো ঠাঁই পাওয়া গেল। তার তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক খোলা। দরজা-টরজা কিছুই নেই এবং সেখানেও নেই জনপ্রাণীর চিহ্ন।

আরও খানিক এগুবার পর সুড়ঙ্গপথ শেষ হল। সেখানেও কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছে উপর দিকে।

জয়ন্ত বললে, 'বোঝা যাচ্ছে এই সুড়ঙ্গটা কেবল লুকিয়ে আনাগোনার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সুড়ঙ্গের এই মুখটা ওরা বাইরের চোখের আড়ালে রেখেছে কেমন করে, সেইটেই এখন দ্রষ্টব্য।'

সে ধাপ দিয়ে উঠে গিয়ে উপর দিকে দুই হাত বাড়ালে। হাতে ঠেকল ঠান্ডা ধাতুর স্পর্শ। কী এ? লোহার দরজা?

একটু জোর করে ঠেলা দিতেই গঙ্গাজলের 'সিস্টার্ন'-এর ডালার মতো একটা গোলাকার ভারী জিনিস উলটে বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল। এবং সুড়ঙ্গের ভিতরে নেমে এল মুক্ত পৃথিবীর আলো।

সকলে সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

হাত পনেরো-ষোলো চওড়া এবং হাত পঁচিশ-ছাব্বিশ লম্বা ঘাস-জমি,—জঙ্গল ও কাঁটা-ঝোপে ঘেরা।

জয়ন্ত এক-মনে কিছুক্ষণ লোহার ঢাকনাখানা পরীক্ষা করে বললে, 'চিত্তাকর্ষক বটে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী?'

—'এই ঢাকনাখানা। দেখুন, এটা একটা বড়ো পাত্রের মতো। এর ভিতরে মাটি ভরে ঘাস পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এইবারে দেখুন!' সে ঢাকনাখানা আবার উলটে সুড়ঙ্গের মুখে স্থাপন করলে।

দারোগাবাবু বললেন, 'বাঃ, আশপাশের ঘাসজমির সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখটা একেবারে মিলিয়ে গেল যে! একে তো চারিদিকের কাঁটা-ঝোপের ভয়ে এখানে বাইরের কারুর আনাগোনা নেই—তার উপরে চোখে ধুলো দেবার এই সহজ, কিন্তু চমৎকার ফন্দি! কেউ এখানে এলেও কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না। আমরাও পারতুম না—যদি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে না আসতুম!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'সুড়ঙ্গের এক মুখে জলের ডোল আর এক মুখে ঘাস-মাটি ভরা ঢাকনা! দুই-ই আছে প্রকাশ্য স্থানে, অথচ আসল রহস্য প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কত অল্প!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এত অনায়াসে যে চোখ ঠকাতে পারে, আমি তাকে মস্ত বড়ো ওস্তাদ বলে মানতে রাজি আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কে সে?'

জয়ন্ত বললে, 'নিশ্চয়ই প্রতাপ চৌধুরি!'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিন্তু তার আর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। আপনাদেরই মুখে শুনলুম, মানিকচাঁদের কাছে বাড়ি বেচে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'মানিকচাঁদের কথা তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আর এখন বিশ্বাস না করবার মতো একটা বড়ো সূত্রও পেয়েছি।'

—'সূত্র? কী সূত্র?'

—'সূত্রটা নতুন নয়, পুরানো। সেই ৯৯৯ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট!'

—'মানে?'

—'ওই দেখুন। শৌখিন প্রতাপ চৌধুরি যে সিগারেট খায়, তারই একটি আধ-পোড়া নমুনা এখানকার ঘাসজমিকেও অলঙ্কৃত করেছে! সিগারেটটা যদিও এখন নিবে গিয়েছে, কিন্তু ভালো করে দেখলেই বোঝা যায়, ওটা টাটকা। খুব সম্ভব কাল রাত্রেই ওটা শোভা পেয়েছিল প্রতাপ চৌধুরির মুখে। ওটা যদি বেশি দিন রোদে আর খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকত, তাহলে ওর কাগজের উপরে পড়ত দাগ আর সোনালি অংশটার রংও যেত জ্বলে। হায় প্রতাপ চৌধুরি, তুমি এত বড়ো ধূর্ত, কিন্তু তুচ্ছ সিগারেট কিনা বারবার তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য তোমার পক্ষেও বলবার কথা আছে। তুমি বলতে পারো,—'তোরা যে এত সহজে আমার এত সাধের সুড়ঙ্গ-রহস্য আবিষ্কার করে ফেলবি, সেটা স্বপ্নেও জানলে আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট টানবার চেষ্টা করতুম?' কিন্তু ওই তো মুশকিল প্রতাপ চৌধুরি, ওইখানেই তো মুশকিল! অতি ধূর্তরা সেয়ানাপনায় নিজেদের অদ্বিতীয় বলে মনে করে, আর শেষ পর্যন্ত সেই নির্বুদ্ধিতাই তাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক! নয় কি দারোগাবাবু? আমি আপনার কাছে শিক্ষানবিস মাত্র, কিন্তু আমি কি ভুল বলছি?'

দারোগা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'নিজেকে শিক্ষানবিস বলে জাহির করে আর আমাকে আক্রমণ করবেন না জয়ন্তবাবু! আপনি যদি শিক্ষানবিস হন, আমাকে তাহলে মানতে হয় যে, আমি এখনও গোয়েন্দাগিরির অ-আ পর্যন্ত শিখিনি। যে ছোটো বক্তৃতাটি দিলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ; আর আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিও আশ্চর্য! আপনি হয়তো আকাশের শূন্যতার ভিতর থেকেও আসামি আবিষ্কার করতে পারেন।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'না, অতটা পারি না! আমার ডানা নেই, আকাশের খবর রাখব কেমন করে?'

—'কিন্তু জয়ন্তবাবু, তবে মানিকচাঁদ কেন বলেছে যে প্রতাপ চৌধুরি এই বাড়ি বিক্রি করে স্থানান্তরে গিয়েছে?'

—'মানিকচাঁদ হচ্ছে প্রতাপের প্রধান সাকরেদ, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। প্রতাপ নিজে আড়ালে থেকে সুতো টেনে মানিকচাঁদের দলকে পুতলোবাজির পুতুলের মতো অভিনয় করাতে চায়। যদি দৈবগতিকে প্রতাপের সব ওস্তাদি ভেস্তে যায়, তা হলে ধরা পড়বে মানিকচাঁদ অ্যান্ড কোম্পানি, কিন্তু সে নিজে থাকবে একেবারে নিরাপদ ব্যবধানে!'

হঠাৎ সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি উঠল চমকে এবং তাঁর চক্ষে জাগল ত্রস্ততা। তিনি তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে বললেন, 'জয়ন্ত, দ্যাখো, দ্যাখো!'

জয়ন্ত সহজভাবেই বললে, 'দেখেছি সুন্দরবাবু! এই শত্রুপুরীতে এসে আমার চোখ ঘুরছে চতুর্দিকেই। দারোগাবাবু, খানিক তফাতেই একটা ঝোপ কী রকম দুলছে দেখুন। বড়োই সন্দেহজনক। বাতাসের জোর নেই, ঝোপ কেন দোলে?'

দারোগাবাবু সেই দিকে তাকালেন, ঝোপটা দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে এল। বললেন, 'মনে হচ্ছে, ওই ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে কেউ যেন আমাদের লক্ষ করছে!'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, 'আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে।'

—'এখন কী করা উচিত?'

—'দারোগাবাবু, আপনারা হচ্ছেন সরকারের দুলাল, আইন আপনাদের হাত-ধরা। আমারও কাছে রিভলভার আছে বটে, কিন্তু সহসা গুলিবৃষ্টি করলে হয়তো সরকারের আইন এই শখের গোয়েন্দাকে ক্ষমা করবে না। আপনার উচিত ওই সন্দেহজনক ঝোপটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো। তারপর নরহত্যা হলেও একটা ওজর দেখিয়ে আপনি হয়তো আইনের নাগপাশকে ফাঁকি দিতে পারবেন অনায়াসেই!'

দারোগাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয় মশাই! আর কি সে দিন আছে? এখন

একটু এদিক-ওদিক হলেই সারা দেশ জুড়ে খবরের কাগজওয়ালারা শেয়ালের মতো এক-স্বরে কী রকম 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করে চ্যাঁচাতে থাকে তা কি আপনি জানেন না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সব জানি। কিন্তু এটা কি আপনি বুঝছেন না, ওই ঝোপের আড়ালে যে আছে সে হয়তো এখন নিস্পন্দ হয়ে আমাদেরই পানে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করছে?'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করলেন। যতদূর সম্ভব চুপি চুপি বললেন, 'পালিয়ে এসো জয়ন্ত, তুমিও পালিয়ে এসো!'

দারোগাবাবু ম্রিয়মাণের মতো বাধো-বাধো গলায় বললেন, 'তাহলে রিভলভার ছুড়ব নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'নিশ্চয়! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, জানেন না?'

সেই বিশেষ ঝোপটির দিকে লক্ষ্য করে দারোগাবাবু রিভলভার তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।

রিভলভার গর্জন করতেই ঝোপের ভিতর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল মানুষ নয়, একটা শূকর! পরমুহূর্তেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে চোখের আড়ালে সরে পড়ল।

জয়ন্ত সকৌতুকে হাসতে হাসতে বললে, 'মাভৈঃ, মাভৈঃ! শুয়োরটা যখন ওই ঝোপের ভেতর ঢোকে তখনই তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, ওখানে মানুষ-জাতীয় কোনও শত্রুই নেই।'

দারোগাবাবু খাপের ভিতর রিভলভার পুরতে পুরতে অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'তাহলে আমাদের মিছে ভয় দেখাবার জন্যে আপনি এতক্ষণ মশকরা করছিলেন?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হুম। জয়ন্তও মানিকের দলে ভিড়ল? আমাদের নিয়ে তামাশা? নাঃ, এ অসহনীয়।'

জয়ন্ত আরও জোরে হেসে উঠে বললে, 'মানিক যে আজ আমার সঙ্গে নেই সুন্দরবাবু! তাই আমি তারই অভাব পূরণের জন্যে মানিকের ভূমিকায় অভিনয় করবার চেষ্টা করছি! কিন্তু যাক সে কথা। এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। প্রতাপ চৌধুরি আর তার দলবল

আজ বোধ করি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে না। চলুন, আমরাও যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করি। ...হ্যাঁ, ভালো কথা। দারোগাবাবু, সুড়ঙ্গের দুই মুখ যেমন ছিল, সেইভাবেই বন্ধ করে যেতে ভুলবেন না যেন।'

—'কেন?'

—'শত্রুরা যেন সন্দেহ করতে না পারে যে, আমরা তাদের সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।'

—'আপনি কি মনে করেন নরহত্যার পরেও তারা আবার এখানে আসতে সাহস করবে?'

—'না করাই তো উচিত। তবু সাবধানের মার নেই।'

রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দেখুন সুন্দরবাবু, ওই প্রতাপ চৌধুরির কথা ভুলে গিয়ে আমাদের এখন কাজ করতে হবে ভূষোপাগলাকে নিয়ে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'বিলক্ষণ! এত বড়ো একটা খুনের মামলা ভুলে যাব? যা তা খুন নয়, পুলিশ খুন!'

জয়ন্ত বললে, 'খুনের মামলা নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে হবে আপনাকেই। কোনও খুনের মামলা তদারক করবার জন্যে আমরা এ গ্রামে আসিনি।'

দারোগাবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'তাহলে আপনারা আমাকে আর সাহায্য করবেন না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'নিশ্চয়ই করব। আগে আমার সব কথা শুনুন। আমরা এখানে এসেছি সুব্রতবাবুর অনুরোধে। তিনি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন এক রহস্যময় মামলা। তার কথা এখানে বলবার দরকার নেই, তবে এইটুকু জেনে রাখুন, তার সঙ্গেও জড়িত আছে ওই প্রতাপ চৌধুরি। সুতরাং আসলে প্রতাপ চৌধুরিকে আমরা ছাড়ব না, আর সেও বোধহয় আমাদের ছাড়বে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি ভূষোপাগলার কথা কী বলছিলে জয়ন্ত?'

—'এইবারে ভূষোপাগলাকেই আমাদের দরকার।'

—'একটা বাজে পাগলার জন্যে হঠাৎ তোমার টনক নড়ল কেন?'

—'এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

—'কী?'

—'ভূষোপাগলা বরাবরই সোনার আনারসের ছড়া চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে করতে এখানকার হাটে-ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। এত দিন কেউ তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু প্রতাপ চৌধুরি আজ হঠাৎ তাকে বন্দি করতে চায় কেন?'

সুন্দরবাবু কোনও জবাব না দিয়ে কেবল মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত বললে, 'কেন, তা বুঝতে পারছেন না? প্রতাপের সন্দেহ হয়েছে যে, ভূষো সোনার আনারসের গুপ্তকথা কিছু কিছু জানে।'

—প্রতাপ তো এখানকারই লোক। এত দিন তার এ সন্দেহ হয়নি কেন?'

—'এতদিন সে সোনার আনারস নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করেনি। এ-সম্বন্ধে সে হঠাৎ সজাগ হয়েই আগে দিয়েছে সুব্রতবাবুর উপরে হানা। তারপরেই তার দৃষ্টি পড়েছে ভূষোপাগলার উপরে। বুঝেছেন?'

—'হুম। জয়ন্ত তোমার অনুমানই সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে।'

—'তাই আমাদেরও ওই ভূযোপাগলাকে ছাড়লে চলবে না। তার সঙ্গে কথা কয়ে আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, সোনার আনারসের অনেক গুপ্তকথাই সে জানে। সৌভাগ্যক্রমে সে আছে এখন আমাদেরই হাতে। তার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে দেখা যাক, আমার সন্দেহ সত্য কি না।'

বাসায় ফিরে এসে দেখা গেল, মানিক বিছানার উপরে বসে সুব্রতর সঙ্গে গল্প করছে।

জয়ন্ত বললে, 'কী হে মানিক, এখন কেমন আছ?'

মানিক মুখ ভার করে বললে, 'যাও, যাও!'

জয়ন্ত হেসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে অভিমান হয়েছে? তোমার শরীরের অবস্থা দেখেই নিয়ে যাইনি ভাই, আমার উপর অবিচার কোরো না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! তুমি সঙ্গে ছিলে না, বেঁচেছিলুম। অন্তত খানিকক্ষণ তোমার বাক্য-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম।'

মানিক ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'তাহলে বাক্য-যন্ত্রণা আবার শুরু হবে নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'না মানিক, আজকের মতো সুন্দরবাবুকে ক্ষমা করো! সুব্রতবাবু, ভূযো-পাগলা কেমন আছে?'

মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই ভালো আছে। এই তো পাঁচ মিনিট আগেও সে চিৎকার করে সোনার আনারসের ছড়া আউড়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'সুব্রতবাবু, দয়া করে ভূযোকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পারবেন কি?'

'যাচ্ছি' বলে সুব্রত ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে সুব্রত ফিরে এসে বললে, 'ভূযোকে দেখতে পেলুম না।'

জয়ন্ত চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'মানে?'

—'ভূযো ঘরেও নেই, এই বাড়ির ভিতরেও কোথাও নেই। কেবল তার ঘরের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে—'সোনার আনারস! সোনার আনারস! আমি চললুম সেই সোনার আনারসের সন্ধানে!'

অষ্টম

জলগ টিকটিকি

গভীর রাত্রে জয়ন্ত হঠাৎ ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মানিকের।

মানিক ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে বললে, 'ব্যাপার কী জয়? আবার কোনও বিপদ ঘটল না কি?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'বিপদ নয় মানিক, বিপদ নয়। শোনো—'

শোনা গেল, খানিক দূর থেকে কে আবৃত্তি করছে—

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।'

মানিক বললে, 'ওই তো পলাতক ভূষোপাগলার গলা।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, ভূষো যে এখানকার মাটি ছেড়ে নড়তে পারবে না, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। মানিক, তোমার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

—'খুব সম্ভব ভূষো বাগানের পুকুরপাড়েই আছে। আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখতে চাই সেখানে সে কী করছে। তুমিও কি আমার সঙ্গে আসবে?'

এক লাফে নীচে নেমে মানিক বললে, 'সে কথা আবার বলতে।'

তাড়াতাড়ি জামা পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে একাদশীর চাঁদ। রাত্রেও মানুষের দৃষ্টি অচল নয়।

জয়ন্তের অনুমান সত্য। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল একটা মানুষের মূর্তি। নিশ্চয়ই ভূষোপাগলা।

মিনিট-কয়েক সে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বটগাছের পশ্চিমদিক ধরে হনহন করে এগিয়ে যেতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর ভূষোর সঙ্গ ছাড়া হবে না। ও কোথায় যায়, দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।'

—'কেন বলো দেখি?'

—'আমি ভূষোকে সাধারণ পাগল বলে মনে করি না। আমার বিশ্বাস, ও অকারণে পাগলামির ঝোঁকে ওদিকে যাচ্ছে না, ওর ওই পথ-চলার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।'

—'জয়ন্ত, তোমার এই সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

মানিক বললে, 'আমরা বোধহয় আধ ঘণ্টা ধরে পথ চলছি। এইভাবেই আজকের রাতটা পুইয়ে যাবে না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'যেতে পারে। মানিক একটা বিষয় লক্ষ করেছ?'

—'কী?'

—'ভূয়ো মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একবারও বাঁয়ে কী ডাইনে ফিরছে না, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে একেবারে সোজাসুজি।'

—'তার দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?'

—'একটু পরেই বুঝতে পারব।'

আরও খানিকক্ষণ গেল। মানিক বললে, 'ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়ে আমরাও ক্ষেপে গেলুম নাকি?'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'না মানিক, না। ওই দ্যাখো, ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা আজ এক ক্রোশ পথ পার হয়েছি।'

—'এতটা নিশ্চিত হলে কেমন করে?'

—'কারণ ভূষোপাগলা এইখানে এসে থেমেছে।'

—'এ কী রকম হেঁয়ালি?'

—'হেঁয়ালি নয় হে, হেঁয়ালি নয়! হেঁয়ালির ভিতরে আমি পেয়েছি অর্থের সন্ধান! দ্যাখো, দ্যাখো, ভূষোর রকম দ্যাখো!'

ভূষো এইবারে সত্য-সত্যই পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে!

মানিক একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে বললে, 'ভূষোর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন কী খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না!'

—'কিন্তু কী খুঁজছে?'

—'ভগবান জানেন। হয়তো পাগলটা ভেবেছিল এখানেই ফলে সোনার আনারস!'

—'আমিও তো ওই রকমই একটা অসম্ভব আশা করেছিলুম।'

—'যাও, যাও, বাজে বোকো না!'

—'বাজে নয়, সত্যি বলছি। আমার দৃঢ় ধারণা, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভূষো প্রায়ই এই পর্যন্ত আসে। কিন্তু যা পাবার আশায় এত দূর আসে, তা আর খুঁজে পায় না। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর!' কিন্তু কোথায় পরশপাথর? সেই দুঃখেই বোধহয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, ভূষো এতখানি পথ পার হয়ে ঠিক এইখানেই বা এসে থামল কেন?'

মানিকের পিঠ চাপড়ে জয়ন্ত বললে, 'ঠিকই বলেছ। তোমার এই প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন। এবারে ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।'

—'কার কাছে উত্তর খুঁজবে? ভূষোকে কিছু জিজ্ঞাসা করা মিছে, কারণ নিজেই সে কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি।'

—'ভায়া, উত্তর খুঁজব আমার নিজের মনের ভিতরেই। ভূষোর মুখ চেয়ে তো আমরা এখানে আসিনি।'

হঠাৎ ছুটোছুটি থামিয়ে ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে আউড়ে গেল—

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি।—

হায় রে হায়, সব গুলিয়ে গেল, সব গুলিয়ে গেল। ওরে বাবা জলগ টিকটিকি, কোথায় আছিস তুই, কে তোকে তাড়িয়ে দিলে বাপধন?'

ঠিক সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল আর এক মনুষ্যমূর্তি। সে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিছন থেকে ভূষোর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'প্রশান্ত চৌধুরির চর এখনও ভূষোর পিছনে লেগে আছে? নিশ্চয়ই ওকে আবার ধরে নিয়ে যেতে চায়। চলো মানিক, আমরাই ওকে গ্রেপ্তার করি!'

জয়ন্ত ও মানিক গাছের আড়াল ছেড়ে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু লোকটা যেমন সাবধানি, তেমনি চটপটে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখে ফেললে। পর-মুহূর্তেই সে একটা জঙ্গলের দিকে দৌড় মারলে তিরের মতো!

তার পা লক্ষ্য করে জয়ন্ত ছুড়লে রিভলভার। কিন্তু রাত্রের ঝাপসা আলোয় লক্ষ্যভেদ করতে পারলে না। লোকটা জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হল।

জয়ন্ত ও মানিক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু পলাতকের কোনও পাত্তাই মিলল না। দেখলে খালি চাঁদের আলোর ফিতে দিয়ে গাঁথা অন্ধকারকে।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে ভূষোপাগলাকেও দেখতে পেলে না।

মানিক বললে, 'পাগলা ভয় পেয়ে আবার পালিয়েছে। এখন কী করবে?'

—'অতঃপর ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরব। তারপর ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর সকালে

উঠে সুব্রতবাবুকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তারপর সদলবলে আবার এখানে আগমন করব।'

—'আবার এখানে আসবে?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়!'

—'কেন?'

—'জলগ টিকটিকি প্রভৃতি আরও অনেক কিছুর সন্ধানে।'

—'ভূষোর সঙ্গে তুমিও টিকটিকি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও না কি?'

—'মাথা না ঘামিয়ে উপায় নেই!'

—'বুঝেছি জয়! তুমি একটা কোনও হদিস পেয়েছ।'

—'রহস্যের সিংহদ্বার খোলবার জন্যে একটা চাবিকাঠি কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু অনেক কালের পুরানো মরচেপড়া চাবি, এখনও কুলুপে ভালো করে লাগছে না। অপূর্ব এই সোনার আনারসের ছড়া! এর প্রত্যেক কথাটির অর্থ যে-কোনও শ্রেষ্ঠ কবিতারও চেয়ে গভীর। কিন্তু জেনে রেখো, এ মামলার কিনারা হতে দেরি নেই।'

নবম

মরা নদীর শুকনো খাত

প্রভাত। জানলার বাইরে দুলছে নতুন রোদের স্বচ্ছ সোনার আঁচল এবং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সবুজের দোলনায় দুলদুলে ফলশিশুদের হাসি-রঙিন মিষ্ট মুখগুলি।

প্রভাতী চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়েই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, এদেশে কখনও বাঘরাজা বলে কেউ ছিলেন কি?'

সুব্রত বললে, 'বাঘরাজা......বাঘরাজা? হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, অনেক কাল আগে এ-অঞ্চলে এক প্রতাপশালী রাজবংশ ছিল, তাদের উপাধি 'বাঘ'।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! বাঘ আবার মানুষের উপাধি হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'হয় সুন্দরবাবু, হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যেই 'বাঘ' উপাধিধারী লোক আছেন। হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ একাই কোনও ব্যাঘ্র বধ করেছিলেন, আর তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে দিয়েছিল ওই উপাধি। পরে তাঁর বংশধররাও ওই 'বাঘ' বলেই পরিচিত হয়। কেবল 'বাঘ' নয়, বাংলাদেশে 'হাতি' উপাধিধারী লোকও আছে। কিন্তু যাক ও-কথা। সুব্রতবাবু, আপনার কথায় আমার কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আপনি ওই বাঘরাজাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারেন কি?'

সুব্রত বললে, 'আমি বিশেষ কিছুই জানি না, আর আমার পক্ষে জানবার কথাও নয়। কারণ বাঘরাজাদের বংশ নাকি পলাশির যুদ্ধের আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে শুনেছি, আমার প্রপিতামহেরও আগে আমাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ কোনও এক বাঘরাজার দেওয়ানের পদ লাভ করেছিলেন।'

—'বাঘরাজাদের কোনও চিহ্নই কি এ-অঞ্চলে বর্তমান নেই?'

—'কিছু না। আমার পিতামহ বলতেন, যেখানে বাঘরাজাদের রাজধানী ছিল, এখন সেখানে বিরাজ করছে নিবিড় জঙ্গল।'

—'সে জায়গাটা কোথায়?'

—'তাও আমি জানি না।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, আপনাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোনও নদী-টদী আছে কি?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমি এই রকম একটি নদী খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।'

সুব্রত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার প্রত্যেক প্রশ্নই কেমন রহস্যময়। হঠাৎ নদীর কথা কেন আপনার মনে উঠল?'

—'সেকথা পরে বলব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

—'না, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোনও নদী নেই।'

জয়ন্ত হতাশভাবে বললে, 'নেই! তাহলে কি আমি মিছাই এত জল্পনা-কল্পনা করে মরলুম? সোনার আনারসের ছড়াটা কি একেবারেই বাজে?'

সুব্রত প্রায় আধ মিনিট ধরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিস্ময়চকিত চোখে। তারপর থেমে থেমে বললে, 'সোনার আনারসের ছড়া? তার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক একটা আছে বলেই অনুমান করেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার অনুমান সত্য নয়।'

সুব্রত বললে, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে আগে একটা নদী ছিল বটে।'

জয়ন্ত অত্যন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ছিল নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-অঞ্চলে আগে একটা নদী ছিল, কিন্তু এখন সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় তার শুকনো খাত?'

—'তারপর, তারপর?'

—'এখনও বর্ষাকালে সেই খাত কিছুদিনের জন্যে জলে ভরে যায়। কিন্তু সেটা তো গ্রামের পশ্চিমে নয়—এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে মাইল তিন কী আরও কিছু বেশি পথ পেরিয়ে গেলে তবে সেই খাতটা পাওয়া যায়।'

জয়ন্ত যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললে, 'উত্তর-পশ্চিমদিকে। তাহলে আবার যে আমার হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে!' অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, 'সুব্রতবাবু, যদিও আমি থেই খুঁজে পাচ্ছি না, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

—'মানে?'

—'সেই মরা নদীর শুকনো খাতটা স্বচক্ষে একবার দর্শন করব। এখনই চলুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে ধ্যেৎ! খামখেয়ালের একটা মাত্রা থাকা উচিত। কোনও মরা নদীর শুকনো খাত দেখে আমাদের কী ইষ্টলাভ হবে? তার চেয়ে সুব্রতবাবু যদি আরও এক

পেয়ালা চা, আরও এক প্লেট চিঁড়ে-আলুভাজা আর বেগুনি-ফুলুরির ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'মানিক, তোমারও কি এই মত?'

মানিক এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে জয়ন্ত ও সুব্রতের কথাবার্তা শ্রবণ করছিল। সে মুখ তুলে বললে, 'ভাই জয়ন্ত, তোমাদের কথা শোনবার পর আমিও গভীর আঁধারে যেন কিঞ্চিৎ আলোর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি! হুঁ, 'নায়ের পরে যায় কত না, খেলছে জলগ টিকটিকি!' এটি একটি মূল্যবান সঙ্কেত। কিন্তু 'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া, সূয্যিমামার ঝিকমিকি'— এ লাইনটির কোনওই সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না যে!'

—'আগে তো উত্তর-পশ্চিমদিকে যাত্রা করা যাক, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।'

—'উত্তম। আমি প্রস্তুত। সুন্দরবাবু আপাতত চা এবং চিঁড়ে, আলুভাজা এবং বেগুনি-ফুলুরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, আমরা ততক্ষণে খানিকটা 'মর্নিং ওয়াক' করে আসি।'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি যদি এখনই তোমাদের সঙ্গে এই চায়ের আসর ত্যাগ না করি, তাহলে এর পরে মানিকের দুষ্ট জিহ্বা যে কতখানি অসংযত হয়ে উঠবে, তা কী আমি জানি না? হুম, আমি আর চা-টা খেতে চাই না, আমিও সকলের সঙ্গে যেতে চাই।'

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু এসে হাজির। জয়ন্ত দলে টেনে নিলে তাঁকেও।

দশম

রহস্যের চাবিকাঠি

সুব্রত বললে, 'এই সেই মরা নদীর শুকনো খাত।'

জয়ন্ত বললে, 'সরস্বতী নদীও শুকিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ঠিক এই রকমই খাত সৃষ্টি করেছে। এই মরা নদীটাও দেখছি আকারে আগে সরস্বতীর মতোই ছিল।'

খাতটা চওড়ায় কলকাতার আদিগঙ্গার চেয়ে বড়ো হবে না। দক্ষিণ থেকে বরাবর উত্তর দিকে চলে গিয়েছে। খাতটা মাঝে মাঝে ভরাট হয়ে আছে এবং তার উপরে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল।

দক্ষিণদিকে খাতটা যেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে নীরবে কী ভাবতে লাগল জয়ন্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'মানিক, খাতটা অর্থাৎ নদীটা বোধহয় দক্ষিণ দিকেও এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা আর দেখা যাচ্ছে না; কারণ, তা একেবারে ভরাট হয়ে সমতল মাঠের সঙ্গে মিলিয়ে আছে।'

মানিক বললে, 'তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।'

দারোগাবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'একটা খাত নিয়ে এমন গভীর গবেষণার কারণ কী বুঝছি না।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমারও ওই মত। আমি বাসায় ফিরে যেতে চাই।'

সুব্রতও বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার কী উদ্দেশ্য বলুন দেখি?'

জয়ন্ত কারুর কোনও কথার জবাব না দিয়েই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হয়েছে মানিক, হয়েছে! আমি চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি!'

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'চাবিকাঠি? কিসের চাবিকাঠি মশাই?'

—'রহস্যের।'

—'রহস্য আবার কী?'

—'যদি জানতে চান, আমার সঙ্গে আসুন। এসো মানিক?' জয়ন্ত দ্রুতপদে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে লাগল।

সুন্দরবাবু খানিকটা এগিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ও জয়ন্ত, একটু আস্তে চলো ভাই, তোমার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব কেন—আমার বপুখানি দেখছ তো?'

জয়ন্ত গতিও কমালে না, উত্তরও দিলে না—সমানে এগিয়ে চলল।

দারোগাবাবু বললেন, 'এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে।'

সুব্রত বললে, 'সোনার আনারসের ভিতরে যে ছড়াটা ছিল, জয়ন্তবাবু বোধহয় তার মানে খুঁজে পেয়েছেন।'

দারোগাবাবু তপ্তস্বরে বললেন, 'ওই ছড়াটার কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভূষো হচ্ছে আস্ত পাগল, একটা বাজে ছেলেভুলোনো ছড়া নিয়ে তার সঙ্গে মেতে থাকা আমাদের কি শোভা পায়? ছড়া হচ্ছে ছড়া। তার মধ্যে কোনও অর্থই থাকে না।'

সুব্রত বললে, 'আমারও তো ওই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জয়ন্তবাবুর বিশ্বাস অন্য রকম।'

—'নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেই থাকুন, কিন্তু তিনি আমাদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? ঘাড়ে পড়েছে খুনের মামলা, এখন তার কিনারা করব, না ছড়ার অর্থ খুঁজে মরব? আরে ছিঃ, এ যে দস্তুরমতো ছেলেমানুষি!'

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্ত বলে, 'মানিক, কাল রাত্রে ভূষো ঠিক এইখানে এসেই চারদিকে ছুটোছুটি করেছিল না?'

মানিক এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্ত।'

—'পূর্ব-দক্ষিণদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।'

—'ওদিকে তো দেখছি মাঠের পরে রয়েছে একটা নিবিড় অরণ্য।'

—'সোনার আনারসের জয় হোক। এইবারে আমরা ওই বনের ভিতরে প্রবেশ করব। পূর্ব-দক্ষিণদিক ধরেই এগিয়ে চলব—কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়, আমাদের পদচালনা করতে হবে স্বাভাবিকভাবেই। কতক্ষণ অগ্রসর হতে হবে জানো? ঠিক এক প্রহর।'

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললে, 'অর্থাৎ আরও তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের বনে বনে ঘুরতে হবে। ওরে বাবা!'

দারোগাবাবু বললেন, 'আরও তিন ঘণ্টা কী বলছেন মশাই? তিন ঘণ্টা লাগবে তো খালি এগিয়ে যেতেই, ফিরতেও তো লাগবে আরও তিন ঘণ্টা! তার মানে কোদালপুরে ফিরব আমরা রাতের অন্ধকারে!'

—'হুম, তাই না কি? সারাদিন খালি তবে পথই হাঁটব, দানা-পানি কিছুই জুটবে না?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'আমি কি পাগল? আমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে? আমি পারব না—ব্যাস, আমার এক কথা।'

জয়ন্ত কোনও রকমে হাসি চেপে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, আপনাকে উপোস করতে হবে না।'

—'উপোস করতে হবে না কী রকম? নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হোটেল পাওয়া যায় নাকি?'

—'সুন্দরবাবু, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। মানিকের কাঁধে ওই যে ব্যাগটি ঝুলছে, ওর ভেতরে খুঁজলে যৎকিঞ্চিৎ খাবার-টাবারও পাওয়া যেতে পারে।'

প্রবল মস্তক আন্দোলন করে সুন্দরবাবু বললেন, 'ডবল খাবারের লোভেও আমি আর ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে হাঁটতে পারব না। এখনই আমার জিভ বেরিয়ে পড়তে চাইছে—হুম!'

দারোগাবাবু বললে, 'আমিও সুন্দরবাবুর দলে। আমি খুনের মামলার আসামি খুঁজছি—সোনার আনারসের ছড়া নিয়ে আমার কী লাভ হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'কী লাভ হবে? আপনি কি জানেন, ওই খুনের মামলার আসামি প্রতাপ চৌধুরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো আছে এই সোনার আনারসের রহস্য?'

—'কী সেই রহস্য?'

—'যদি জানতে চান, আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের আর অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতাপ চৌধুরিও এই রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজছে, কিন্তু আমরা কার্যোদ্ধার করতে চাই তার আগেই। আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন না—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ আপনারা দেখতে পাবেন একটা কল্পনাতীত দৃশ্য!'

একাদশ

মানিকের ব্যাগে অশ্বডিম্ব নেই

গহন বন তো গহন বন! অরণ্যের এমন নিবিড়তা কেউ কল্পনা করেনি। এত বুড়ো-বুড়ো গাছ খুব কম বনেই চোখে পড়ে—জন্মেছে তারা কোন মান্ধাতার আমলে, তাও আন্দাজ করবার জো নেই। কোথাও কোথাও তারা পরস্পরকে এমন জড়াজড়ি করে আছে এবং তাদের উপর দিকটায় লতাপাতারা এমনভাবে ঘন জাল বুনে রেখেছে যে, দুপুরের রোদও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পায়নি বললেও চলে।

সর্বত্রই ঝোপ-ঝাপ, কাঁটা-জঙ্গল এবং মানুষের মাথা-ছাড়িয়ে-ওঠা আগাছার ভিড়। সেইগুলোকে ঠেলে ঠেলে কোনও রকমে পথ করে নিতে হয়। গায়ে পট-পট করে কাঁটা বেঁধে, আশেপাশে ফোঁস ফোঁস করে ভয়াবহ শব্দ শোনা যায়, মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পথিকদের দেহ হয় পপাতধরণীতলে, কিন্তু তবু নির্বাপিত হল না জয়ন্তের উৎসাহবহ্নি!

সুন্দরবাবু মুখব্যাদান করে বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'দারোগাবাবু, ডানপিটে জয়ন্তটা আজ আমাদের শমন-সদনে প্রেরণ করতে চায় নাকি?'

রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে ফুলতে দারোগাবাবু বললেন, 'জানি না। এমন চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামি জীবনে আর কখনও দেখিনি।'

—'হুম! কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যাচ্ছি পূর্ব-দক্ষিণদিকে।'

—'তাই নাকি? চোখে তো দেখছি খালি ঝোপ-ঝাপ আর অন্ধকার। এর মধ্যে এসে তুমি কি দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালোনি?'

—'উঁহু!'

—'কেমন করে জানলে?'

হাত তুলে একটা জিনিস দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এই আমাদের পথ-প্রদর্শক।'

—'কী ওটা হে? ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।'

—'কম্পাস।'

—'কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণদিকে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে এগিয়ে তুমি কী পরমার্থ লাভ করবে?'

—'শুনলে বিশ্বাস করবেন না।'

—'বিশ্বাস করব না কী রকম?'

—'উঁহু, বিশ্বাস করবেন না।'

—'আলবৎ করব, হাজার বার করব। তোমার ল্যাজ ধরতে যখন বাধ্য হয়েছি, তখন সোনার পাথরবাটি দেখেও আমার আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।'

—'সোনার পাথরবাটি তো একটা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। এ হচ্ছে তারও চেয়ে অবিশ্বাস্য।'

—'ও বাবা, তাই নাকি? শুনেই যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে!'

—'তা যাবেই তো!'

—'অত প্যাঁচ কষছ কেন ভায়া? আসল ব্যাপারটা খুলেই বলো না!'

—'শুনবেন তাহলে?'

—'শুনব বলে তো উভয় কান খাড়া করে আছি। স্পষ্ট করে বলো, পথের শেষে গিয়ে তুমি কী দেখতে চাও?'

—'একটি প্রকাণ্ড অখণ্ডমণ্ডলাকার, দুগ্ধফেননিভ অশ্বডিম্ব।'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ অতি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হলেন। তারপর আহত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত, তুমিও?'

—'মানে?'

—'তুমিও আমার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা শুরু করলে মানিকের মতো?'

—'ঠাট্টা নয় সুন্দরবাবু, ঠাট্টা নয়! পথের শেষে গিয়ে যে কী দেখব, তা নিজেই আমি জানি না। কে জানে, আমার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষটা অশ্বডিম্বের মতোই অলীক বলে প্রতিপন্ন হবে কি না!'

দারোগাবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'চমৎকার জয়ন্তবাবু, চমৎকার! তাহলে আপনি

আমাদের এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাতে চান কেবল কাদা ঘেঁটে ফিরে আসবার জন্যে?'

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, কোনও জবাব দেওয়ার দরকার মনে করলে না।

দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'সুন্দরবাবু!'

—'হুম, হুম! বড্ড রেগেছেন দেখছি।'

—'হ্যাঁ, তাই।'

—'কিন্তু—'

—'এখন আর কিন্তু-টিন্তু নেই।'

—'তবে?'

—'আপনি আর আমি দুজনেই পুলিশের লোক।'

—'বলা বাহুল্য।'

—'আমরা হচ্ছি কাজের মানুষ!'

—'অত্যন্ত!'

—'আমরা কী পাগলের মতো, গাধার মতো, অন্ধের মতো অশ্বডিম্বের পিছনে ছুটতে পারি?'

—'হুম, হুম, কিছুতেই না!'

মানিক এইবারে মুখ খুললে। বললে, 'এ কথা আপনি কী করে জানলেন দারোগাবাবু?'

—'কী কথা?'

—'গাধারা আর পাগলরা আর অন্ধেরা অশ্বডিম্বের পশ্চাতে ধাবমান হয়?'

—'মানিকবাবু, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সুন্দরবাবু!'

—'উঁ।'

—'আমাদের এখন কী করা উচিত জানেন?'

—'মোটেই জানি না।'

—'আমাদের এখন উচিত, এইখান থেকেই ধুলো-পায়ে বিদায় নেওয়া।'

—'অর্থাৎ আবার কোদালপুরে ফিরে যাওয়া?'

—'ঠিক!'

দারোগাবাবুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সুন্দরবাবু করলেন একবার জয়ন্তের এবং আর একবার মানিকের মুখের উপরে দৃষ্টিপাত। তারপর মাথা নেড়ে করুণ সুরে বললে, 'হুম, অসম্ভব!'

—'কী অসম্ভব?'

—'এখন কোদালপুরে ফিরে যাওয়া।'

—'কেন?'

—'জয়ন্তের পাগলামি আর মানিকের দুষ্ট রসনাকে আমি সমর্থন করি না বটে, কিন্তু বোধহয় ওদের আমি কিছু কিছু—ওর নাম কী—ভালোবাসি। আমার পক্ষে ওদের ছেড়ে চলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। নিতান্তই যদি যেতে চান, তাহলে আপনাকে যেতে হবে একলাই।'

দারোগাবাবুর দুই চক্ষে ফুটল তীব্র ভাব। কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অগ্রসর হতে লাগলেন সকলের পিছনে পিছনে। বোধ করি তিনি বুঝতে পারলেন যে, একলা এই বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে পথ হারাবার সম্ভাবনাই হবে বেশি।

জয়ন্ত নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমরা প্রায় পথের শেষে এসে পড়েছি—আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনলেন তো দারোগাবাবু! এতক্ষণ ধরে এত যমযন্ত্রণা যখন ভোগ করলুম, তখন আর মিনিট পনেরোর জন্যে অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কী? বিশেষ, উদরে হয়েছে এখন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার উদয়—আর খোরাক আছে ওই মানিকেরই ব্যাগের জঠরে! আমরা এখান থেকে এখনই বিদায় নিতে চাইলে মানিক কি আর ব্যাগ খুলতে রাজি হবে?'

জোর মাথা নাড়া দিয়ে মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই নয়!'

—'ওরে বাবা, ব্যাস! এর ওপরে আর কোনও কথা বলাই বাতুলতা! হাতের খোরাক পায়ে ঠেলে উপোস করে ধুঁকতে ধুঁকতে আমি যাব কোদালপুরে ফিরে? হুম, হুম, হুম! অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব! অন্তত মানিকের ব্যাগের ভিতরে যে অশ্বডিম্ব নেই, সেটা আমি রীতিমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি!'

দারোগাবাবু নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তাঁর অবস্থা দেখলে মনে হয় একেবারে যাকে বলে—নাচার আর কি!

তারপর খানিকক্ষণ আর কোনও কথাবার্তা হল না। অরণ্যের অবস্থা তখনও একই রকম—আধা আলো আঁধার-মাখা রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অগণ্য বনস্পতি মর্মর-ভাষায় রচনা করছে কোন অজানার পূজার মন্ত্র।

মানিক দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'পায়ের তলায় মাটি এখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে কেন?'

জয়ন্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, 'মানিক, মাটি এদিকে ঢালু হয়ে নেমে, ওদিকে আবার উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আগে নিশ্চয়ই এখানে একটা জলভরা খাত ছিল।'

সেই শুকনো খাতের অন্য পাড়ের উপরে রয়েছে একটা জঙ্গলময় উঁচু ঢিপি,—যেন একটা ছোটোখাটো পাহাড়। ঢিপিটা দখল করে আছে অনেকখানি জায়গা।

ঢিপির উপরে উঠে দেখা গেল তার চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ে আছে রাশি রাশি সেকেলে ইট। আর একটা দৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ওপাশে ঢিপিটা যেখানে নীচের দিকে নেমে শেষ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানা অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ! একেবারে ধ্বংসস্তূপ বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ সর্বাঙ্গে ছোটো-বড়ো অশথ-বট-নিম গাছের ভার বহন করে অট্টালিকার একটা অংশ এখনও দাঁড়িয়েছিল মহাকালের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো।

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমার কল্পনাদেবী মিথ্যে কথা বলেননি। এই আমাদের পথের শেষ।'

সুন্দরবাবু উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'সমাপ্তিটা আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'আরে মশাই, আমরা কোথায় এসেছি বুঝতে পারছেন না? সুব্রতবাবু, সারা পথটাই আপনি বোবার মতন কাটিয়ে দিয়েছেন। এইবারে মুখ খুলুন। বলুন দেখি, কোথায় এসেছি আমরা?'

—'আমি কেমন করে বলব?'

—'তাহলে শুনুন। এই যে চারিদিকে খাত-ঘেরা উঁচু ঢিপিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে কোনও পুরাতন দুর্গের শেষচিহ্ন। আর ওই ভাঙাচোরা অট্টালিকা হচ্ছে সেকালকার কোনও রাজার বাড়ি! খুব সম্ভব ওইখানেই বাস করতেন সেই বাঘরাজারা, যাঁদের সম্বন্ধে সোনার আনারসের ছড়ায় বলা হয়েছে

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

বুঝলেন?'

সুব্রত বললে, 'আপনি কেমন করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এখনও তা বুঝতে পারছি না।'

—'যথাসময়ে তা বলব। এতক্ষণ পর্যন্ত ছড়া আমাদের ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে। এইবারে দেখতে হবে ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না। সুব্রতবাবু, অতঃপর হতভম্ব ভাবটা ত্যাগ করে আপনি কিঞ্চিৎ জাগ্রত হবার চেষ্টা করুন!'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'হয়তো আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হেঁয়ালি ছেড়ে সাদা ভাষায় কথা কও জয়ন্ত! তুমি কী করতে চাও?'

—'ওই ভাঙা অট্টালিকার ভিতরে ঢুকতে চাই।'

—'কারণ?'

—'কারণ ছড়ার রচয়িতার হুকুম?'

দারোগাবাবু একটা শ্রান্ত, বিরক্তিজনক মুখভঙ্গি করলেন নির্বাকভাবে।

দ্বাদশ

অন্দর-মহলের কূপঘর

অট্টালিকার এ-অংশটাকে বাইরে থেকে যতটা ভাঙাচোরা বলে মনে হচ্ছিল, ভিতরে এসে দেখা গেল তার দুর্দশা হয়নি ততটা।

মস্ত একটা উঠান—তার সর্বত্র আগাছার রাজত্ব। উঠানের চারিদিকেই চকমিলানো ঘর। কোনও কোনও ঘরের ছাদ বা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এবং কোনও কোনও ঘরের দরজা বা জানলা নেই বটে, কিন্তু কয়েকটা ঘর এখনও অটুট অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে।

এ-ঘর সে-ঘরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত বললে, 'মনে হচ্ছে এ-অংশে ছিল রাজবাড়ির অন্দর-মহল। মানিক, এখানকার ভিত আর দরজা-জানলার স্থূলতা দ্যাখো। এ-অংশটাকে বোধহয় সুদৃঢ় আর সুরক্ষিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল।'

মানিক বললে, 'হয়তো সেই জন্যেই রাজবাড়ির এদিকটা এখনও ভেঙে পড়েনি।'

—'খুব সম্ভব তাই।'

তখনও ভালো করে সন্ধ্যা নামেনি বটে, কিন্তু বাড়ির উঠানে হয়েছে আবছায়ার সঞ্চার। এবং নীচেকার ঘরগুলোর ভিতরে ঢুকলে চোখ হয়ে যায় প্রায় অন্ধ।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের সঙ্গে একটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। মানিক, সেটা জ্বেলে ফ্যালো তো, ওদিকের ঘরগুলো এখনও পরীক্ষা করা হয়নি।'

সুন্দরবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, 'সন্ধে না হতেই বাড়িখানাকে হানাবাড়ি বলে সন্দেহ হচ্ছে। এখানে এত পরীক্ষা-টরীক্ষার দরকার কী আছে বাপু? এখানে দেখবার কী আছে?'

—'বলেছি তো আমি এখানে এসেছি অশ্বডিম্বের সন্ধানে। যতক্ষণ না তা পাই, খুঁজতে হবে বইকী!' জয়ন্ত বললে গম্ভীর কণ্ঠে।

মানিক আলো জ্বালতে জ্বালতে ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললে, 'অশ্বডিম্বের ওমলেট অতিশয় সুস্বাদু। সুন্দরবাবু যদি ভক্ষণ করতে রাজি হন, আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করতে পারি।'

হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই বললেন না সুন্দরবাবু, কেবল মানিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন একটি জ্বলন্ত ক্রোধকটাক্ষ। বোধ করি এই রকম কোনও কটাক্ষেরই দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেব একদা ভস্ম করে ফেলেছিলেন মদন ঠাকুরকে। ভাগ্যে সুন্দরবাবু মহাদেব নন, এ-যাত্রায় তাই বেঁচে গেল মানিক।

পেট্রলের প্রদীপ্ত লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে জয়ন্ত একটা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, 'মানিক!'

—'কী?'

—'ঘরের মাঝখানে কী রয়েছে দেখছ?'

—'হ্যাঁ। একটা বড়ো কূপ।'

—'কিন্তু ঘরের ভিতরে কূপ!'

—'তোমার মতে এদিকটা হচ্ছে রাজবাড়ির অন্দরমহল?'

—'হ্যাঁ।'

—'হয়তো এই ঘরটা ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের স্নানাগার। সেকালে তো কলের জল ছিল না, তাই অন্তঃপুরের জন্যে এই কূপ খনন করা হয়েছিল।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, 'মানিক, তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু—কিন্তু—' বলতে বলতে থেমে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর সে অগ্রসর হয়ে একটা তীব্র শক্তিসম্পন্ন মস্ত টর্চের আলোক-শিখা নিক্ষেপ করলে কূপের মধ্যে।

রীতিমতো গভীর কূপ। জল চকচক করে উঠল তার অনেক নীচে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ ফিরে বললে, 'মানিক, বার করো একগাছা লম্বা আর মোটা দড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! দড়ি নিয়ে কী হবে শুনি?'

—'দড়ি অবলম্বন করে আমি এই কূপের ভিতরে গিয়ে নামব।'

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, কেন?'

—'হয়তো ওইখানেই পাব অশ্বডিম্বের সন্ধান!'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু রসগোল্লার মতন করে তুলে বললেন, 'জয়ন্ত! ভাই জয়ন্ত! মিনতি করি, ক্ষান্ত হও! ছড়ার কথা তুমি সত্যি বলে মানো, অথচ ভুলে যাচ্ছ কেন যে, ছড়ায় লেখা আছে এখানে ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়?'

মানিক বললে, 'পানাই মানে কি জানেন?'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না। আর জেনেও দরকার নেই আমার। কারণ ব্রহ্মপিশাচ যখন 'পানাই' বাজায়, তখন নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে কোনওরকম ভয়ঙ্কর সৃষ্টিছাড়া বাদ্যযন্ত্র—মানুষের পক্ষে যা স্পর্শ করাও অসম্ভব!'

—'মোটেই নয়। 'পানাই' বলতে বোঝায় 'খড়ম'! ব্রহ্মদৈত্যেরা পায়ে খড়ম পরে, জানেন তো? এ হচ্ছে সেই খড়ম।'

—'হুম! ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের খড়ম! আমরা যেমন হাততালি দি, তারা বুঝি তেমনি পা-

তালি না দিয়ে পায়ের খড়ম খুলে খটাখট আওয়াজ সৃষ্টি করে? হতে পারে—ব্রহ্মদৈত্যদের পক্ষে অসম্ভব কী বাবা? ভাই জয়ন্ত, দোহাই তোমার! ও পাতকুয়োর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা তুমি কোরো না—হুম!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবু, ও-কথা যাক। কিন্তু এইবারে আপনিও আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন দেখি!'

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'এ রকম ব্যাপারে আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি?'

—'দড়ি বয়ে আমি যখন কূপের ভিতর নামব, তখন আর একগাছা দড়িতে পেট্রলের লণ্ঠনটা বেঁধে ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়ে দিতে হবে। কেমন, এ কাজটা পারবেন তো?'

—'তা কেন পারব না!'

জয়ন্ত দড়ি ধরে কূপের গহ্বরে প্রবেশ করলে। পেট্রলের ঝুলন্ত লণ্ঠনটাও চারিদিক আলোকে সমুজ্জ্বল করে নীচের দিকে নামতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই বহুযুগের পুরাতন ও অব্যবহৃত কূপের জঠরে আচম্বিতে এই অভাবিত আলোক সমারোহে বিস্মিত হয়ে নানা ছিদ্র ও ফাটলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে হিলবিলে বৃশ্চিক ও ঊর্ধ্বপুচ্ছ কাঁকড়াবিছে প্রভৃতি জীব। এক জায়গায় মুহূর্তের জন্যে মুখ বাড়িয়ে দুটো অগ্নিময় ক্রুদ্ধ চক্ষে তীব্র ঘৃণা বৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অন্ধকারেরও চেয়ে কালো সাপ। কোনও গর্তের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চিৎকার।

সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, পাতালের ভিতরে ওটা আবার চ্যাঁচায় কে?'

সুব্রত বললে, 'তক্ষক।'

কূপের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে লণ্ঠনটা আস্তে আস্তে উপরে তুলে নিন।'

জয়ন্ত আবার উপরে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্ত আনন্দের আভাস।

মানিক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী দেখলে জয়ন্ত?'

—'আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়।'

—'অর্থাৎ?'

—'অনেক নীচে, কূপের জল থেকে খানিক উপরে দেওয়ালের গায়ে আছে একটা লোহার দরজা।'

—'লোহার দরজা?'

—'হ্যাঁ। বন্ধ দরজা। তার বাইরে রয়েছে মস্ত দুটো কুলুপ।'

সুব্রত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললে, 'এর অর্থ কী জয়ন্তবাবু?'

—'আমার বিশ্বাস, ওই দরজার ও-পাশেই আছে সোনার আনারসের সমস্ত রহস্য!'

—'সোনার আনারসের রহস্য?'

—'হ্যাঁ সুব্রতবাবু। বাঘরাজাদের গুপ্তধন!'

পর-মুহূর্তেই চারিদিকের স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে বজ্রস্বরে গর্জে উঠল দু'দুটো বন্দুক! দুটো বুলেট এসে লাগল দেওয়ালের উপরে সশব্দে।

জয়ন্ত বলে উঠল, 'শত্রুরা আসছে আক্রমণ করতে। ওই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলো...শিগগির!'

কূপঘরের ভিতর দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা। তার একখানা পাল্লা ভাঙা। সে-ঘর থেকেও অন্য ঘরে যাবার আর একটা দরজা। তার পাল্লা আছে বটে, কিন্তু অর্গল নেই। তারও ওদিকে আছে দরজা দিয়ে ও-পাশের ঘরে যাবার পথ—সকলে দ্রুতবেগে সেই তৃতীয় ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজার অর্গল তুলে দিলে।

খানিকক্ষণ কারুর মুখেই কথা নেই। শত্রুরা যে পিছনে আসছে, এমন সাড়াও পাওয়া গেল না।

হঠাৎ এ-ঘরের দরজার উপরে খট করে একটা শব্দ হল। জয়ন্ত তিক্তহাসি হেসে বললে, 'মানিক, আমরা বন্দি হলুম। এ-ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে শিকল তুলে দিলে। সোনার আনারসের স্বপ্ন বুঝি ফুরিয়ে যায়!'

ত্রয়োদশ

ঈশ্বর-প্রেরিত দূত

দারোগাবাবু বললেন, 'বেশ জয়ন্তবাবু! অকারণে এখানে টেনে এনে আপনি খুব বিপদে ফেললেন যা হোক!'

জয়ন্ত বললে, 'আমি নই, আমাদের এই বিপদের জন্যে দায়ী আপনার আসামি প্রতাপ চৌধুরিই।'

—'কী বলছেন?'

—'প্রতাপ চৌধুরির কথা বলছি। আমরা এখন তারই হাতে বন্দি। সুব্রতবাবু, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা অন্তিমকালে উত্তরাধিকারীদের কী বলে যেতেন?'

—'বলে যেতেন, 'যদি কোনও দিন বিশেষ অর্থাভাব হয় তাহলে সোনার আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান'।'

—'সোনার আনারসের মধ্যে একটা ছড়ায় কৌশলে লেখা ছিল ওই অর্থের ঠিকানা, আজ আমরা যা আবিষ্কার করেছি। প্রতাপ চৌধুরিও এত দিন ধরে সেই ঠিকানাটাই আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিল। এখানকার যত হাঙ্গামার আসল কারণই হচ্ছে তাই। আজ সে তার দল-বল নিয়ে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল,—উত্তেজনার মুখে পড়ে যে-সম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে আমি বোকামি করেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, প্রতাপ চৌধুরি বেটা এখন কী করতে চায়?'

—'নিশ্চয়ই সে আড়াল থেকে আমাদের সব কথা শুনেছে—আমাদের সব কার্যকলাপ লক্ষ করেছে। তাই গুপ্তধনের ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আক্রমণ করেছিল। এখন আমরা অসহায়ভাবে বন্দি। সে স্বাধীন। এইবারে সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের লোহার দরজা খোলবার চেষ্টা করবে। হায় রে কপাল, আমাদের নৌকো কিনা ঘাটে এসেও ডুবে গেল!'

মানিক বললে, 'জয়, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি ও-দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারব না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না। একেলে দরজা হলে আমার কোনওই ভাবনা ছিল না—আমি একলাই পারতুম ভেঙে ফেলতে। কিন্তু এই সেকেলে দরজাটা বিশেষ কারণে বিশেষভাবে তৈরি। মত্ত মাতঙ্গও ভাঙতে পারবে না এ দরজা! নীচেকার এই ঘরটাও অদ্ভুত, একটা জানলা পর্যন্ত নেই—দেওয়ালের অনেক উপরে আছে কেবল গোটাকয়েক ফোকর, কিন্তু তাদের ভিতর দিয়ে মানুষের মাথাও গলবে না। কে জানে, কী উদ্দেশ্যে এ-রকম ঘর তৈরি করা হয়েছিল! আগে কি এখানে থাকত কয়েদিরা? হতে পারে, আশ্চর্য কী!'

সকলে গুম হয়ে বসে রইল বেশ খানিকক্ষণ। কারুরই যেন নেই কথা কইবার ইচ্ছা।

আচম্বিতে বাইরেকার নিস্তব্ধ রাত্রিকে বিদীর্ণ করে জাগ্রত হল বহু কণ্ঠস্বরে আনন্দ-কোলাহল!

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'ও আবার কী?'

জয়ন্ত শ্রান্ত, বিষণ্ণ স্বরে বললে, 'ওই আনন্দ কোলাহল শুনেই বুঝতে পারছি, আজ প্রতাপ চৌধুরির হস্তগত হয়েছে বাঘরাজাদের গুপ্তধন!'

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

তার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে মানিক দরদভরা কণ্ঠে বললে, 'সুব্রতবাবু, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে বললে, 'ধ্যেৎ! দুঃখের নিকুচি করেছে! মানিক, চটপট বার করো 'ফ্লাস্কে'র চা আর ডিম। দু-একখানা হাতে-তৈরি রুটি আর দু-একটা কদলীও বোধহয় এখনও আমরা প্রত্যেকেই পেতে পারি! প্রতাপ চৌধুরি যখন কদলী-প্রদর্শন করলে, তখন দু-একটা কদলী আমরাই বা ভক্ষণ করব না কেন? আসুন দারোগাবাবু, আসুন সুব্রতবাবু, আসুন সুন্দরবাবু! এত গোলযোগের পর কিঞ্চিৎ জলযোগ নিশ্চয়ই আপনাদের মন্দ লাগবে না?'

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ হলেন উৎফুল্ল। বললেন কেবল—'হুম!'

—'মানিকের ব্যাগে কালকের জন্যে হয়তো আরও কিঞ্চিৎ খাদ্যের অস্তিত্ব থাকবে। তারপরে আমাদের ভাগ্যে আছে উপবাস—যত দিন না মরি ততদিন পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস! মন্দ কী? এই উপবাসকে আমরা যদি বলি প্রায়োপবেশন, তাহলে তো আমাদের মৃত্যু হবে গৌরবজনক! গ্রিক-বিজয়ী মহাবীর, অখণ্ড ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও তো যেচেই প্রায়োপবেশনে করেছিলেন প্রাণত্যাগ! আমরাই বা পারব না কেন?'

সুন্দরবাবু অভিযোগভরা কণ্ঠে বললেন, 'ওই তো তোমাদের দোষ! খাবার আগেই উপবাস আর মৃত্যুর কথা তুলে মেজাজ খারাপ করে দাও কেন ভায়া! হুম, আমার গলা দিয়ে আর রুটিও গলবে না!'

ঠিক সেই সময়ে বন্ধ দরজা ভেদ করে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অস্বাভাবিক অট্টহাস্য!

হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা,—সে অট্টহাসি যেন আর থামতেই চায় না!

সকলের দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! এমন অট্টহাসি কল্পনাতীত!

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মপিশাচ—এইবারে আসছে ব্রহ্মপিশাচ!'

দারোগাবাবু অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝের উপরে! সুব্রতর মুখ দেখে মনে হয় সেও যেন অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে!

মানিক রিভলভার বার করে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তের মতন বললে, 'ভূতই আসুক, আর মানুষই আসুক, আমি গুলির পর গুলি ছুড়ে তাকে ছিদ্রময় না করে ছাড়ব না!'

জয়ন্ত নিশ্চল এবং নিস্তব্ধ। এমন যুক্তিহীন অট্টহাস্যের অর্থই খুঁজে পেলে না।

তারপরেই হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে কে বলে উঠল, 'হায় রে হায়, হায় রে পোড়াকপাল আমার! বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে কিন্তু ছিল তাদের গুপ্তধন! তাও নিয়ে গেল দুশমনরা! আমার সুখের স্বপন ভেঙে গেল—এ দুঃখ রাখব কোথায় গো, রাখব কোথায়? হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা!'

জয়ন্তের ছুটে গেল সমস্ত জড়তা! বন্ধ-দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে করাঘাতের পর করাঘাত করতে করতে সে বললে, 'ভূষোপাগলা, ভূষোপাগলা, ভূষোপাগলা!'

দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল, 'আমাকে চিনেছ? চিনবেই তো, চিনবেই তো! তোমরা যে আমার বন্ধু! আমি যে এখানে এসেছি তোমাদের মুক্তি দিতেই!'

—'দাও, দাও, আমাদের মুক্তি দাও—তুমি হচ্ছো ঈশ্বর-প্রেরিত দূত!'

শিকল খোলার শব্দ। তারপরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে ভূষোপাগলা। জয়ন্ত সাদরে ভূষোকে আলিঙ্গন করে বললে, 'তুমি কী করে এখানে এলে?'

—'কী করে এলুম? কী করে এলুম? সে অনেক কথা! এখন খালি একটুখানি শুনে রাখো। তোমরাও যে এদিকে এসেছ আমি তা জানতুম না। বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরি দলে বেশ ভারী হয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। মনে কৌতূহল জাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের পিছু নিলুম। সোজা হাজির হলুম এইখানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠোনের লম্বা আগাছার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে বসে এখানকার সব অভিনয় দেখলুম। তোমরা বন্দি হবার পরও কত কাণ্ডই যে হল! শেষটা দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরির দল আটটা বড়ো ঘড়া আর একটা মাঝারি আকারের সিন্দুক কাঁধে করে এখান থেকে সরে পড়ল! হায় রে হায়, কেমন করে এমন ব্যাপার সম্ভব হল, এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না গো! আয়নাতে মুখ দেখে বৃদ্ধ বট এখনও গান গাইছে, কিন্তু একটাও জলগ টিকটিকি দেখা দিলে না বলেই তো আমার সব হিসাব একেবারে গুলিয়ে গেল! সোনার স্বপন ভেঙে গেছে, আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব?'

জয়ন্ত তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, 'কোনও ভয় নেই ভাই, মুক্তি যখন পেয়েছি, তোমার স্বপ্নকে সফল না করে আমরা ছাড়ব না! কিন্তু কী বললে? প্রতাপ চৌধুরির দল কী কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে?'

—'আটটা ঘড়া আর একটা সিন্দুক!'

—'গুপ্তধন!'

—'হায় হায় হায় হায়—হুম!'

—'এখানে বসে হায় হায় করে কোনওই লাভ নেই সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন—উঠে দাঁড়ান—ছুটে চলুন!'

—'ও বাবা, কোথায়?'

—'প্রতাপ চৌধুরিদের পিছনে।'

—'বলো কী হে? এমন রাতে, এমন অন্ধকারে, ওই সর্বনেশে বনে?'

—'নিশ্চয়! চলুন, এখন প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান!'

—'তারা তো অনেকক্ষণ আগে রওনা হয়ে গিয়েছে, আমরা তাদের পিছু ধরতে পারব কেন?'

—'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না। প্রতাপ চৌধুরিরা জানে আমরা বন্দি, তারা নিষ্কণ্টক। এত পরিশ্রমের পর আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তারা কোদালপুর ত্যাগ করবার চেষ্টা করবে না। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।'

—'কিন্তু চা-রুটি-ডিমগুলো খেয়ে একটু চাঙ্গা হতেও কি পারব না?'

দারোগাবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবুর কথা শুনেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি—চুলোয় যাক চা-রুটি-ডিম! আসামিকে ধরতে হবে আজই।'

চতুর্দশ

সোনার আনারসের ছড়া

অন্ধকার অরণ্য! আকাশে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু দিনের সূর্য যেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেখানে রাতের চাঁদের কথা না তোলাই ভালো। ভয়াবহ বন হয়ে উঠেছে অধিকতর বিভীষণ।

জয়ন্ত বললে, 'ভাগ্যে সকালে বেরুবার আগে মানিকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলুম! সঙ্গে পেট্রলের লণ্ঠন আর 'টর্চ' না থাকলে এখানে আমাদের কী দুর্দশাই হত!'

সুন্দরবাবু বললে, 'সঙ্গে আলো না থাকলে আমি এখানে আসতুম নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, পথ চলতে চলতে আমি এইবারে কতগুলো কথা বলব, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কথাগুলো আর কিছু নয়, সোনার আনারসের গুপ্তকথা।

সোনার আনারসের ছড়ার কথা মনে করুন। সহজভাবে দেখলে ছড়াটাকে অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু একটা অর্থহীন ছড়াকে বংশানুক্রমে এত যত্নে রক্ষা করা যায় না, আর কেবল সেই ছড়াকেই চুরি করবার জন্যে বাড়িতে চোর আসে না। বিশেষ, সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—অর্থাভাবের সময়ে ওই ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যাবে অর্থের সন্ধান! এই সব কারণে প্রথমেই করলুম ছড়াটার মানে বোঝবার চেষ্টা।

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা
খুঁজছে মাটি মোটকা জট!'

আমি যা মানে করলুম তা হচ্ছে এই ঃ আয়না—অর্থাৎ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে এক

প্রাচীন বটবৃক্ষ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে পত্র-মর্মরধ্বনি করছে। তার মাথায় আছে বকের বাসা। আর তার ডাল থেকে মোটাসোটা জটগুলো নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত। সুব্রতবাবুর বাগানে ঠিক এই রকম একটি বটগাছের সন্ধান পেয়ে আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হল।

ছড়াটার মানে কেবল আমিই বুঝিনি। ভূষোপাগলা আর প্রতাপ চৌধুরিও বুঝেছিল। কিন্তু বিশেষ এক জায়গায় তারা অর্থের খেই হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে আমিও সেই পর্যন্ত এগিয়ে সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছিলুম, তারপর মাথা খাটিয়ে হঠাৎ পাই আলোকের সন্ধান। সে-জায়গাটা হচ্ছে এই ঃ

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি।'

মানে হচ্ছে, বটগাছের পশ্চিমদিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ অগ্রসর হতে হবে। সেখানে চারিদিকে ঝিকমিক করছে সূর্যালোক। নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছে নৌকোর ('না' বলে নৌকোকেই) পর নৌকো, আর জলে খেলা করছে কারা? না 'জলগ টিকটিকি'রা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এখানে জলবাসী টিকটিকি হচ্ছে কুমির—কারণ তাকে দেখতে অনেকটা গৃহবাসী টিকটিকির বৃহৎ সংস্করণেরই মতো!

অর্থ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোল বাধল। কারণ, বটগাছ পিছনে রেখে পশ্চিমদিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ এগিয়ে কোনও নদী দেখা যায় না। এই জন্যেই এই পর্যন্ত এসে ভূষোপাগলা রোজ হতভম্ব হয়ে ঘুরে মরত; আমাকেও প্রথমটা বোকা বনে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু আমি এত সহজে হার মানতে রাজি নই। মাথা খাটিয়ে সুব্রতবাবুকে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, সত্যই এ অঞ্চলে আগে একটি নদী ছিল কিন্তু এখন তা শুকিয়ে গিয়েছে, কেবল কোদালপুরের উত্তর-পশ্চিমদিকে তিন মাইলের কিছু বেশি দূরে গেলে আজও তার মরা খাত দেখা যায়। তারপর যথাস্থানে গিয়ে কী করে আন্দাজ করলুম যে, নদীটার গতি ছিল সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে, আপনারা সকলেই তা জানেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেইখানে ফিরে এলুম,—বটগাছ থেকে পশ্চিম মুখে সোজা পাঁচ পোয়া পথ পেরুলে যেখানে এসে উপস্থিত হওয়া যায়।

'অগ্নিকোণে নেইক আগুন,
—কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্ট ভাগে।'

অর্থ—(পশ্চিমে পাঁচ পোয়া পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখবে) অগ্নিকোণে—অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণদিকে এক অরণ্য। কাঙাল যদি ঐশ্বর্য চায় তাহলে ওই গভীর বনের ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণের দিকে লক্ষ রেখে এক প্রহর বা তিন ঘণ্টা (দিন-রাতকে আট অংশে ভাগ করলে এক প্রহর হয়) ধরে অগ্রসর হবে।

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

ছড়ার এইখানটায় কিঞ্চিৎ কবিত্ব প্রকাশ করে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে, এক প্রহর ধরে এগুবার পর পাওয়া যাবে বাঘরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

অর্থ—বাঘরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন একটি ঠাঁই আছে, যেখানে জলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে আলো আর আঁধার। 'সর্পনৃপ' কে? বাসুকি—রাজ্য যাঁর পাতালে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কে? ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বাসুকির রাজ্য জলময় পাতালে লক্ষ্মী বাস করছেন ঐশ্বর্য নিয়ে।

এতক্ষণে আপনারা বুঝেছেন বোধহয়, ঘরের ভিতর কূপ দেখে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল কেন? প্রথমত, ঘরের ভিতরে কূপ, বেশ একটু অসাধারণ নয় কি? দ্বিতীয়ত, কূপের তলদেশটাই সর্পরাজ বাসুকির জলময় পাতালের এক অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে এও শুনেছি যে, কোনও কোনও সেকেলে কূপ আর পুষ্করিণীর ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তধন।

গুপ্তধনের গুপ্তকথা শুনলেন, এইবার অন্য দু-চারটে কথা শুনুন। আমার কী বিশ্বাস জানেন? প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে এখনও পুলিশ পাহারা আছে, সুতরাং সে বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। অন্তত আজকের রাত্রের জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হবে সেই সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই। তারপর কাল সে হয়তো লোকজন আর গুপ্তধন নিয়ে কোদালপুর থেকে হবে অদৃশ্য।

অতএব ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে সুড়ঙ্গপথের মধ্যে। শত্রুরা দলে হালকা নয়। কাজেই আমাদেরও দলে ভারী হতে হবে। সঙ্গে যখন দারোগাবাবু আছেন তখন সেজন্যে ভাবনা নেই! সুড়ঙ্গে হানা দেবার আগে থানা থেকে একদল চৌকিদার সংগ্রহ করলেই চলবে। কিন্তু খুব সম্ভব আমরা সহজেই আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারব। প্রতাপের এখন শত্রুভয় নেই। সে আর তার দলের লোকরা পথশ্রমে নিশ্চয়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমরা গিয়ে দেখব তারা সকলেই করছে নিদ্রাদেবীর আরাধনা।

এই প্রতাপ চৌধুরিকে চোখে দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে। সেই-ই আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের সর্বত্রই সে অভিনয় করছে, বারবার আমাদের নাস্তানাবুদ করে মারছে, অথচ একবারও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে না। অপরাধীদের জগতে তাকে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে স্বীকার করতে হয়। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।'

পঞ্চদশ

অন্ধকারের পর আলো

গল্প এক রকম ফুরিয়েই গিয়েছে। আর বেশি কিছু বলবার নেই।

জয়ন্তের অনুমানই সত্য হল। শেষ-দৃশ্যে বইল না রক্তগঙ্গার ঢেউ! নেই চমকানি, নেইক রোমাঞ্চ।

সুড়ঙ্গে চুপি-চুপি নেমে জয়ন্তরা দেখলে, প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে নিদ্রিত। প্রত্যেকেই দেখছিল বোধ করি সফল আশার সুখস্বপ্ন।

কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই চৌকিদাররা তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো। ঘুমের জড়তা ছোটবার আগেই প্রত্যেকের হাতে পড়ল দড়ি বা হাতকড়ি। যেটুকু ধস্তাধস্তি হল তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

রিভলভারটা আবার খাপে পুরে রেখে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'সুব্রতবাবু, কোন মহাত্মার নাম প্রতাপ চৌধুরি?'

সুব্রত অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে যে তিনদিক-ঘেরা ও একদিক-খোলা কুঠুরির মত জায়গা ছিল, সেইখানে একটা খুব সেকেলে পেটিকার উপরে একটি লোক ঘাড় হেঁট করে বসে ছিল। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্র চেহারা, ধবধবে ফরসা রং, অতি শৌখিন জামা-কাপড়। দেহে কোথাও এতটুকু শয়তানির ছাপ নেই। সে যে-কোনও সম্ভ্রান্ত সমাজে গিয়ে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারে। অন্যান্য দুশমন চেহারার পাশে তাকে দেখাচ্ছিল কেমন খাপছাড়া। যেন বাংলা সাপ্তাহিকের পদ্যগুলোর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

জয়ন্ত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতাপ মুখ তুললে—মিষ্ট হাসিমাখা মুখ। বললে, 'কী দেখছ?'

—'তুমি প্রতাপ চৌধুরি?'

—'আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।'

—'সিংহের মতো বিক্রম প্রকাশ করে তুমি কলে পড়লে ইঁদুরের মতো?'

—'কপাল?'

—'কপাল নয়, নিজের বোকামি।'

—'কী রকম?'

—'এই সুড়ঙ্গে না এলে তুমি ধরা পড়তে না।'

—'কেমন করে জানব তোমরা সুড়ঙ্গের খবর রাখো?'

—'গল্পের এক-চক্ষু হরিণও এই রকম বোকামি করেছিল।'

—'তার উপরে তোমরা ছিলে দূর-বনে বন্দি।'

—'এক ঈশ্বর-প্রেরিত দূত এসে আমাদের মুক্তি দিয়েছে।'

—'কে?'

—'ভূষোপাগলা।'

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে ভূষোর দিকে তাকালে। তার হাসিমুখ হল গম্ভীর। তার দুই চক্ষে ঠিকরে নিবে গেল দুটো বিদ্যুৎ-কণিকা।

ভূষো পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

জয়ন্ত বললে, 'ভয় কী ভূষো, ভয় কী? পিঞ্জরের সিংহ হয় পরম বৈষ্ণব।'

প্রতাপ হাসতে লাগল। বললে, 'ঠিক। যখন পিঞ্জরের বাইরে ছিলুম তখন আমার উচিত ছিল, ও আপদটাকে পথ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া। তা দিইনি বলে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে।'

—'যা গত, তা নিয়ে বুদ্ধিমান শোচনা করে না।'

—'তাও ঠিক। ধন্যবাদ। তুমি দেখছি দার্শনিক।'

—'আপাতত তোমার সঙ্গে আর বেশি আলাপ করবার সময় নেই, এইবার তোমাকে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

—'আমি প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলে যাই। ওই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা ঘড়া দেখছ, ওর প্রত্যেকটার মধ্যেই আছে দুই হাজার করে বাদশাহী মোহর। ঘড়াগুলোও পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই সোনার ঘড়া। আর এই যে পেটিকার উপরে আমি বসে আছি,

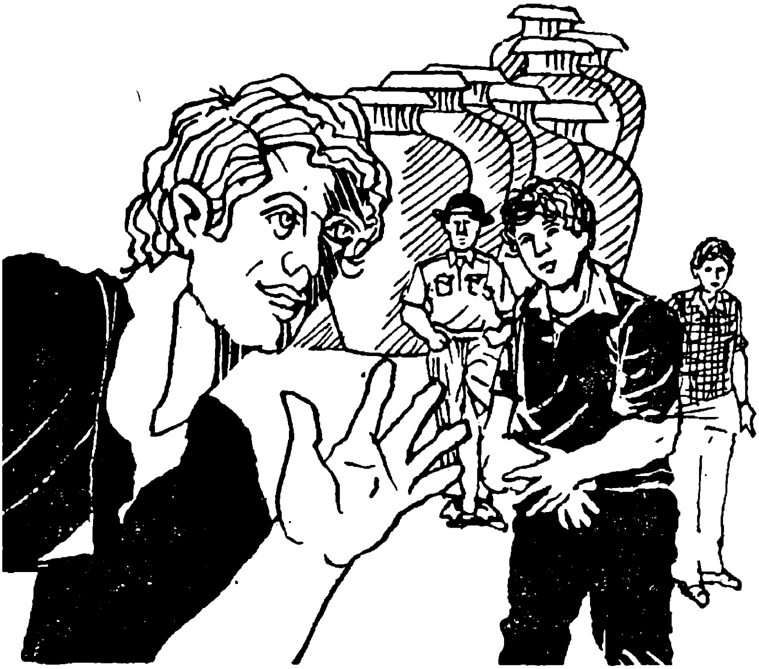

এর ভিতরে আছে রাশি রাশি জড়োয়া গয়না আর নানারকম রত্ন—তাদের দাম ঠিক করবার সময় এখনও পাইনি। তোমরা জানো তো, এই গুপ্তধনের উপরে এখন তোমাদের কোনওই দাবি নেই। কারণ, অলিখিত আইনবলে, বেওয়ারিশ গুপ্তধনের অধিকারী হয় আবিষ্কার-কর্তাই। এই গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি আমিই। অতএব আমিই এর অধিকারী। কেমন, এ কথা মানো তো?'

—'তারপর?'

—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমার জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে তোমাকে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝলে জয়ন্ত?'

—'হিসাব নেবে কে?'

—'আমি।'

—'তুমি না তোমার প্রেতাত্মা?'

—'মানে?'

—'তুমি নরহত্যা করেছ। তোমার তো শেষ অবলম্বন ফাঁসিকাঠ সম্বল।'

—'আমিই যে নরহত্যা করেছি, আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারবে তো?'

—'ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিলেও তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা কারাগারে বাস করতে হবে।'

—'মূর্খ! কোনও কারাগার বা ফাঁসিকাঠ আমার জন্যে তৈরি হয়নি আজও।'

—'বেশ, দেখা যাবে।'

—'হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। দেখা যাবে।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'দারোগাবাবু, কয়েদিদের যথাস্থানে প্রেরণ করুন।'

প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে যাত্রা করলে চৌকিদার প্রভৃতির সঙ্গে থানার পথে।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, 'এইবারে দেখা যাক ঘড়াগুলো আর ওই পেটিকার মধ্যে কী আছে!'

জয়ন্ত বললে, 'গুপ্তধন সুব্রতবাবুর হাতে তুলে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলুম। আমার আর মানিকের আর কিছুই দেখবার দরকার নেই।'

—'হুম, সে কী হে?'

জয়ন্ত সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফিরে বললে, 'সুব্রতবাবু, এই রইল আপনার গুপ্তধন। কিন্তু বিদায় নেবার আগে আপনার কাছে আমার অনুরোধ আছে।'

—'আজ্ঞে, অনুরোধ নয়,—হুকুম!'

—'বেশ, তাই। শুনুন। ভূষোপাগলা গুপ্তধনের বিফল স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনকে প্রায় ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ সে না থাকলে আপনি প্রাণেও বাঁচতেন না, আর গুপ্তধন থেকেও হতেন বঞ্চিত। অতএব এই বিপুল ঐশ্বর্যের যোলো ভাগের মাত্র এক ভাগ তাকে দান করতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

—'নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। আজ থেকে ভূষো হবে আমার পরম আত্মীয়ের মতো।'

—'উত্তম। তারপর, যোলো ভাগের আর এক ভাগ থেকে আপনি যদি সুন্দরবাবু আর দারোগাবাবুকে আধা-আধি বখরা দেন, তাহলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।'

—'অবশ্যই দেব। আপনাদেরও তো এই গুপ্তধনের উপর দাবি আছে।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠল। বললে, 'গুপ্ত বা ব্যক্ত কোনও ধনের লোভেই আমরা কোনও কাজ করি না। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে শখ। ভগবান আমাকে আর মানিককে যা দিয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। তাতেই আমরা খুশি। এসো হে মানিক! সুড়ঙ্গের ভিতর আর কীটের মতন বাস করি কেন, বাইরে এতক্ষণে পাখিরা গাইছে প্রভাতী গান—নতুন সূর্য সোনায় মুড়ে দিচ্ছেন পৃথিবীকে। চলো, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমরাও যোগ দিই শুভ্র আলোকের পবিত্র অভিনন্দনে।'

নবযুগের মহাদানব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অলৌকিক দস্যু

কলকাতার মায়া-রজ্জু ছেদন করেছিল জয়ন্ত ও মানিক।

বাসা বেঁধেছিল তারা পুরীর সমুদ্রতটে, একেবারে এক দিকের শেষ বাড়িতে। সেখানে মানুষের আনাগোনা খুব কম, চোখ খুললেই দেখা যায় কেবল নীল সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সাদা ফেনার মালা পরে সুদীর্ঘ সৈকতের উপরে ভেঙে পড়ছে আর পড়ছে আর পড়ছে—ভেঙে পড়ছে অহরহ, কিবা রাত কিবা দিন! সূর্য এসে চন্দ্র এসে সেই সদাচঞ্চল চলৎচিত্রের উপরে মাখিয়ে দিয়ে যায় সোনালী-রূপোলী আলোর পালিশ। আরো দূরে নজর চালিয়ে যাও, পাবে কেবল নিস্তরঙ্গ, নিশ্চেষ্ট নীলিমার অসীমতা এবং সর্বক্ষণই মুগ্ধ চোখে ঐ দেখতে দেখতে তৃপ্ত শ্রবণে শুনতে পাবে তুমি সেই রোমাঞ্চকর, সুগম্ভীর মহাসঙ্গীত, পৃথিবীতে মনুষ্য-সৃষ্টিরও লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে থেকে মহাসাগর প্রত্যহই যা গেয়ে আসছে বিপুলোৎসাহে!

নিশ্চিন্ত আলস্যের ভিতর দিয়ে শুয়ে, গড়িয়ে, স্বপন দেখে পরম সুখে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনের পর দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সাগর-সৈকতে পদচারণ, বালুকা-শয্যা থেকে সাগরতরঙ্গের দেওয়া বিচিত্র উপহার সংগ্রহ, দুপুরে সমুদ্রের নীল জলে ডুবে এবং ভেসে এবং সাঁতার কেটে অবগাহন, বৈকালে নুলিয়াদের ডিঙায় চেপে সাগর ভ্রমণ এবং

রাত্রে সমুদ্রের নৃত্যশীল বীচিমালার উপরে হীরার গুঁড়ো ছড়িয়ে জ্যোৎস্নার লীলা দর্শন। কলকাতার কথা তাদের মনেও পড়ত না। কিন্তু আচম্বিতে কলকাতা একদিন জানিয়ে দিলে নিজের অস্তিত্ব। নগর ত্যাগ করে জনতার নাগালের বাইরে পলায়ন করলেও নাগরিকদের মুক্তি দেয় না নগরের নাগপাশ।

এল একখানা টেলিগ্রাম, বহন করে এই সমাচার ঃ

'জয়ন্ত, অবিলম্বে কলকাতায় চলে এস—ভয়াবহ মামলা—কোন গতিকে বেঁচে গিয়েছি—ঘটনার পর ঘটনা—তোমরা নেই বলে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি—সুন্দর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত কেবল বললে, "হুঁ।"

মানিক বললে, "আমরা ছাড়তে চাইলেও কমলী আমাদের ছাড়বে না।"

—"নিশ্চয়ই খুব জটিল, রহস্যময় মামলা।"

—"বলা বাহুল্য। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন কিংকর্তব্য?"

—"বাঁধো তল্পিতল্পা, কেনো কলকাতার টিকিট।"

পুরী থেকেই জয়ন্ত টেলিগ্রামে সুন্দরবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিল—কবে, কখন তারা কলকাতায় এসে পৌঁছবে।

কাপড়-চোপড় বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে তারা সবে চা পান করতে বসেছে, এমন সময়ে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। রীতিমত হন্তদন্ত মূর্তি।

জয়ন্ত বললে, "আসতে আজ্ঞা হোক্। চা-টা আনতে বলি?"

—"আরে, থ্রো কর তোমার চা-টায়ের কথা। আগে মামলাটার কথা শোন।"

—"বসুন।"

মানিক বুঝলে, সুন্দরবাবু যখন চায়ের সঙ্গে টায়ের লোভ সংবরণ করলেন, ব্যাপার তখন নিশ্চয়ই গুরুতর।

সুন্দরবাবু উপবেশন করে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া একটা অংশ জয়ন্তের হাতে দিয়ে বললেন, "প্রথমে এইটে পড়ে দেখ। ঘটনাটা ঘটেছে তেসরা মে তারিখে।"

জয়ন্ত পাঠ করলে ঃ

কলকাতায় অলৌকিক অতিকায় দস্যু

গতকল্য রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে চিনুভাই চুনিলাল ও হীরালাল গোবিন্দলাল নামে দুইজন রত্ন ব্যবসায়ী নিজেদের দোকান বন্ধ করিয়া বাসার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ দুইটি ছোট ব্যাগ। বড়বাজারে বাসার সামনে আসিয়া তাঁহারা যখন রিকশা হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন পিছন হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটর গাড়ি আসিয়া রিকশার উপর ধাক্কা মারে, রিকশাখানি তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া যায় এবং আরোহী দুইজনও পথের উপরে পড়িয়া গিয়া আহত হন।

ঠিক সেই সময়ে মোটরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় অদ্ভুত এক মূর্তি। তাহার সঠিক বর্ণনা কেহই দিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু মোটামুটি এইটুকু জানা গিয়াছে যে, মূর্তিটার মাথার উচ্চতা অন্তত সাত ফুটের কম হইবে না। তাহার মুখ মানুষের মতো, কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া নির্গত হইতেছিল বিদ্যুতের মতো তীব্র এমন দুইটি অগ্নিশিখা, যাহা পথের অন্ধকারকে আলোকিত

করিয়া তুলিয়াছিল মোটরের 'হেড-লাইটের' মতো। তাহার দেহও মানুষের মতো, কিন্তু সেই দেহের উপরে ছিল লোহার বর্ম বা ঐ রকম কঠিন কোন-কিছু।

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই বীভৎস মূর্তিটা রত্ন-ব্যবসায়ীদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মূল্যবান ব্যাগ দুইটি ছিনাইয়া লয়, চিনুভাই বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই সে তাঁহাকে এমন সজোরে ঘুসি মারে যে, চোয়ালের হাড় ভাঙিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়েন। পরমুহূর্তে মূর্তিটা আবার মোটরে গিয়া ওঠে এবং ড্রাইভারও তীরবেগে গাড়ি চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

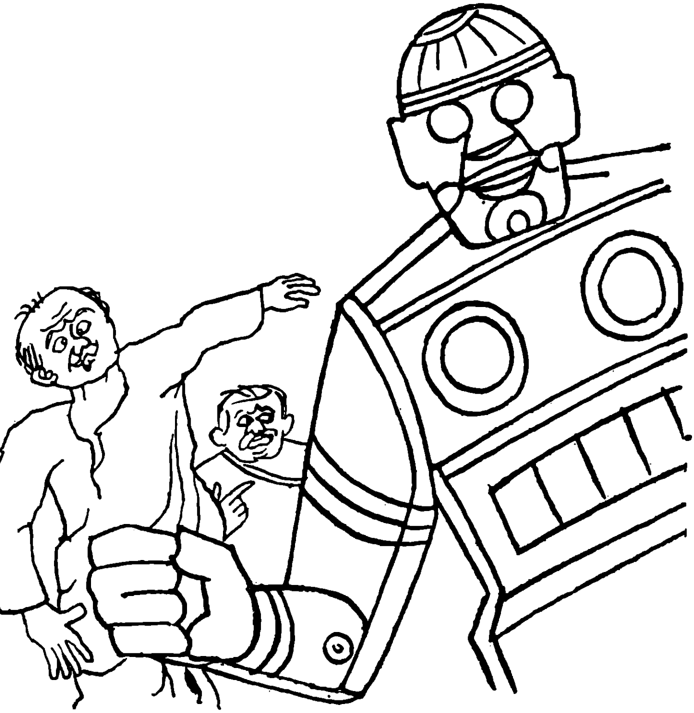

এমন অমানুষিক দস্যু কেহ কখনো দেখে নাই এবং এমন অসম-সাহসিক রাহাজানির কথাও কেহ কখনো শ্রবণ করে নাই। বড়বাজারে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে! অনেকেই ব্যাপারটাকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে লৌকিক রহস্য হইতেছে যে, হতভাগ্য রত্ন-বণিকদের প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস খোয়া গিয়াছে। পুলিস জোর তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছে। খোঁজখবর লইয়া আমরা পরে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।"

জয়ন্তের পাঠ শেষ হলে পর সুন্দরবাবু আর এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ঐ কাগজেই দ্বিতীয় একটি ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে। এগারোই মে তারিখের ঘটনা।"

জয়ন্ত আবার পড়লে ঃ

আবার সেই অমানুষিক দস্যু

অতিকায় অমানুষিক দস্যু দ্বিতীয়বার দেখা দিয়াছে।

গুলজারিমল আগরওয়ালা একজন বিখ্যাত মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। গতকল্য সন্ধ্যার পর তিনি নিজের মোটরে মফস্বল হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল মোট পনেরো হাজার টাকা মূল্যের কয়েকটি সোনার 'বার' বা তাল। সেগুলো একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে বন্ধ ছিল। গাড়ির মধ্যে ছিল আরো তিনজন লোক—চালক ও দুইজন দ্বারবান, তাদের মধ্যে একজন বন্দুকধারী।

গাড়ি যখন দমদমা ছাড়াইয়া আসিয়াছে, তখন বিপরীত দিক হইতে হঠাৎ একখানা কালো রঙের প্রাইভেট মোটর ছুটিয়া আসিয়া পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। গুলজারিমলের ড্রাইভারও তার গাড়ি থামাইতে বাধ্য হয়।

আচম্বিতে কালো রঙের গাড়ির ভিতর হইতে একটা ভয়াবহ মূর্তি পথের উপরে লাফাইয়া পড়ে! মাথায় সে প্রায় সাত ফুট লম্বা এবং তার দুই চক্ষে জ্বল্‌জ্বলে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা! তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া গাড়ির আরোহীদের দেহ-মন-চক্ষু দারুণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তাদের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিতে না কাটিতেই মূর্তিটা গাড়ির ভিতরে লাফাইয়া পড়ে। তারপর প্রত্যেক আরোহীকেই এমন বিদ্যুৎবেগে শিশুর মতো শূন্যে তুলিয়া পথের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় যে, কেউ একখানা হাত পর্যন্ত নাড়িবারও অবসর পায় না।

পথের উপরে গিয়া পড়িয়া কেউ অর্ধ-চেতন ও কেউ বা একেবারেই অচেতন হইয়া যায়। তারপর ভালো করিয়া জ্ঞান ফিরাইয়া পাইবার পর তারা দেখে, গুলজারিমলের গাড়ির ভিতর হইতে সোনার তালের বাক্সটা অদৃশ্য এবং সেই কালো গাড়িখানারও আর কোন পাত্তা নাই।

বেশ বুঝা যাইতেছে, এই আশ্চর্য ও ভয়াল মূর্তিটাই গত তেসরা তারিখের রাত্রে বড়বাজারে গিয়া রাহাজানি করিয়াছিল। এমন রহস্যময় ঘটনা কলিকাতায় আর কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। পুলিস যদি অবিলম্বে এই রহস্যের কিনারা করিতে না পারে, তাহা হইলে কলিকাতার কোন ধনীই আর নিজের ধনপ্রাণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না।"

পড়া শেষ করে জয়ন্ত বললে, "এর পরেও আর কোন ঘটনা ঘটেনি তো?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঘটেছে বৈকি! কিন্তু এবারে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করবেন সুন্দরবাবু স্বয়ং।"

—"বলেন কি!"

—"এইবার তোমরা আমার মুখেই শুনতে পাবে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।"

—"তাহলে সেই অমানুষিক মূর্তির সঙ্গে আপনারও চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, শোনো!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নিচক্ষুর কাণ্ড

সুন্দরবাবু বললেন, "সতেরোই মে তারিখের রাত্রি। কলকাতার পথে পথে আজকাল গুণ্ডার অত্যাচার বড়ই বেড়ে উঠেছে। রোজই থানায় থানায় নালিশের পর নালিশ হয়। তাই সেদিন রাত বারোটার পর জনকয় লোক নিয়ে রোঁদে বেরিয়েছিলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটে রাত্রিবেলাতেই।

হঠাৎ কান্‌হাইয়ালাল হরগোবিন্দের গদির সামনে গিয়ে দেখি হুলুস্থুলু কাণ্ড! লোকজনের ছুটোছুটি হুটোপুটি, চিৎকার, আর্তনাদ—সে কী হল্লা! তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে সেইদিকে দৌড়ে গেলুম। গদির ভিতর থেকে একজন লোক বাইরে বেরিয়ে ছুটে পালিয়ে আসছিল, তার একখানা হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি?' সে সভয়ে পিছনপানে একবার তাকিয়েই কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'ভূত! দৈত্য! রাক্ষস!' তারপরই প্রাণপণ শক্তিতে এক টান মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে চটপট পা চালিয়ে পালিয়ে গেল!

ভূত? দৈত্য? রাক্ষস? তোমরা বুঝতেই পারছ তো, তার আগেই কলকাতার ঐ দুটো আশ্চর্য ঘটনার কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। আমারও মনটা তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল। হুম্, পুলিসের কাছে ভূত-দৈত্য-রাক্ষস বলে কিছুই নেই—'ডিউটি ইজ ডিউটি!' সাক্ষাৎ শমনের নামেও ওয়ারেন্ট বেরুলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করব। ভগবানের হুকুমের উপরেও থাকে আমাদের উপরওয়ালার হুকুম। সুতরাং সেই ভূত কিংবা রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাহারা-ওয়ালাদের ডেকে নিয়ে গদির ভিতরে ঢুকব ঢুকব করছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম, বাড়ির ভিতর থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে কেমন একটা ধাতব শব্দ—ঘটাং, ঘটাং, ঘটাং! তারপরই চোখের সামনে দেখা দিলে যে বিভীষণ মূর্তি, ভাষায় তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, কারণ তেমন সৃষ্টিছাড়া মূর্তি বর্ণনা করবার জন্যে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয়নি।

তার উচ্চতা সাত ফুটের কম হবে না। কেশলেশহীন গোলাকার মাথা বেড়ে হয়েছে তিনখানা চাকার মতো কি! প্রায় মানুষের মতো মুখ, কিন্তু মড়ার মতো ভাবহীন। মানুষেরই মতো দুইখানা হাত আর দুইখানা পা, কিন্তু তার আপাদমস্তক যেন অদ্ভুত এক লোহার বর্ম দিয়ে ঢাকা! আর তার সেই চোখ! সে দুটো সত্যই যেন চোখ নয়—যেন 'হেড লাইটের' তীব্র আলো! তার সেই অতি-আজব আলোক-চক্ষুদুটো ঘুরে ঘুরে এদিকে-ওদিকে যেদিকে ফিরছে সেই দিকটাই হয়ে উঠছে আলোয় আলোয় আলোময়!

আমি তো অবাক! দস্তুরমত কিংকর্তব্যবিমূঢ়! তা না হয়ে উপায়ও ছিল না। অতি ভীষণ দুঃস্বপ্নেও যা কোনদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি, তাকেই দেখছি চোখের সামনে এই রাজধানী কলকাতার রাজপথে একেবারে সাকার অবস্থায়! তখনি যে মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়ে চিৎপটাং হইনি, এজন্যে নিজেই আমি নিজেকে যথেষ্ট বাহাদুরি দিতে পারি।

মূর্তিটা কথা কইলে, বেয়াড়া গলায় বললে, 'ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ।'

ভোঁ-ভোঁ কি রে বাবা? ওর মানে কি? মূর্তির হাতে একটা বেশ বড়সড় মোড়ক রয়েছে, তার ভিতরেই বা কি আছে? ওটা গদি থেকে লুট করা কোন চোরাই মাল নয় তো?

আমি তখনি সজাগ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "এই সেপাই! পাকড়ো, পাকড়ো!"

ছয়-ছয়জন বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট পশ্চিমা পাহারাওয়ালা চারিদিক থেকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করলে মূর্তিটাকে।

"কিন্তু চোখের নিমেষে যে কাণ্ডটা হল, বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। মূর্তিটা মাত্র একখানা হাত ও একখানা পা ব্যবহার করে কারুকে মারলে ঘুসি এবং কারুকে মারলে লাথি—একবারের বেশি দ্বিতীয় বার কারুকে মারতে হল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ছয়-ছয়জন জোয়ান পাহারাওয়ালা দারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে পপাত ধরণীতলে! তাদের কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল, কেউ বা ছটফট করতে লাগল। জয়ন্ত, তোমার গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে, তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু সেই মূর্তিটার পাল্লায় পড়লে তুমিও যে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তার যে অবিশ্বাস্য শারীরিক শক্তির প্রমাণ

পেলুম, আমার তো বিশ্বাস সে একলা অনায়াসেই মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে পারে।

"হঠাৎ মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে আগুন-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ওষ্ঠাধর ফাঁক করে হাসলে যেন একটা মৌন হাসি! তারপরেই তার অপার্থিব কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একসঙ্গেই অনেকগুলো গলায় আশ্চর্য সব আর্ত চিৎকার—একসঙ্গেই সেই ছয়-ছয়জন পাহারাওয়ালার কণ্ঠনিঃসৃত আর্তনাদের অবিকল পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ যেন আবার তার গলার ভিতর দিয়ে ছয়জন পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে কেঁদে-ককিয়ে উঠল ছয় রকম স্বরে! বিশ্বাস কর ভাই জয়ন্ত, একটা কথাও আমি একটুও ভুল শুনিনি, স্বকর্ণে আর সজ্ঞানে শ্রবণ করলুম, মূর্তিটার মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল প্রত্যেক পাহারাওয়ালার বিভিন্ন স্বরের ক্রন্দনধ্বনি!

"তিনজন পাহারাওয়ালা নিদারুণ আঘাতেও অজ্ঞান না হয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছিল, এই আজব ব্যাপারে যন্ত্রণা ভুলে তারা সভয়ে চোখগুলো বিস্ফারিত করে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

"এই সব দেখে-শুনে আমার নাড়ী যখন প্রায় ছাড়ি ছাড়ি করছে, মূর্তিটা হঠাৎ তীরের মতো দৌড়তে শুরু করলে। তাও সাধারণ মানুষের দৌড় নয়, কারণ দৌড়োবার সময়ে আমরা যেমন দ্রুতবেগে পদচালনা করি, সে মোটেই তা করলে না। মনে হল তার দুই পায়ের তলায় আছে একজোড়া 'স্কেট' বা তুষারপাদুকা, আর তারই সাহায্যে পা না বাড়িয়েই চোঁ করে সে চলে গেল ফুটপাথের উপর দিয়ে সোজা! মোড় ফিরে সে অদৃশ্য হল, তারপরই শোনা গেল একখানা চলন্ত মোটরের শব্দ। বোধ হয় ওখানে মোড়ের মাথায় এতক্ষণ তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল কোন মোটর গাড়ি।

"পরে জানা গেল, সেদিন কানহাইয়ালালের গদিতে বাহির থেকে এসেছিল মোট ষাট হাজার টাকার একশো টাকার নোট। সেগুলো একটা মোড়কের মধ্যে বাঁধা ছিল। আগে থেকে কোন রকম জানান না দিয়ে মূর্তিটা হঠাৎ গদির ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং অনায়াসেই লোহার আলমারির চাবির কল ভেঙে হস্তগত করে নোটগুলো। তার অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখেও ভয় না পেয়ে কিংবা কর্তব্যের খাতিরে বোকার মতো যারা তাকে বাধা দিতে গিয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই পাঠাতে হয়েছে হাসপাতালে।

"জয়ন্ত, মানিক, মোটামুটি এই হল আমার কাহিনী। এখন তোমাদের মতামত কি?"

জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে খানিকক্ষণ ধরে কি ভাবলে। তারপর শুধোলে, "আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, ঘটনার দিন আপনার কাছে রিভলবার ছিল?"

—"ছিল বৈকি!"

—"সেটা আপনি ব্যবহার করেননি কেন?"

—"আরাম-কেদারায় বসে এরকম প্রশ্ন করা খুবই সহজ বটে কিন্তু ঘটনাস্থলে হাজির থাকলে তুমিও আমার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারতে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। ঘটনাগুলো বলতে এতক্ষণ লাগল কিন্তু ঘটেছিল বোধ হয় মিনিট খানেকের মধ্যেই। আর সেই এক মিনিট সময় মূর্তিটাকে আর তার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, রিভলবারের কথা আমার মনেই পড়েনি। সেটা ভূত না মানুষ না অন্য কোন কিছু, এখনো পর্যন্ত আমি তা আন্দাজ করতে পারছি না।"

—"আমার বিশ্বাস, আপনি রিভলবার ছুঁড়লেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেত। যাক সে কথা গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেই কালো রঙের মোটরখানার চালককে কেউ দেখেছে কি?"

—"চালককে অনেকেই দেখেছে বটে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে কেউ তাকে ভালো করে দেখতে পায়নি।"

—"সেখানা কি গাড়ি?"

—"ফোর্ড।"

—"নম্বর পেয়েছেন?"

—"প্রথম ঘটনায় চিনুভাই যেদিন আহত হয়, সেইদিনই নম্বর পাওয়া গেছে। কিন্তু ভুয়ো নম্বর। সে নম্বরের কোন গাড়ি নেই।"

—"মূর্তিটার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই ঃ—চোখ দিয়ে অতি উজ্জ্বল আলো বেরোয়। বর্মধারী। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বরে কথা কয়। নীরবে হাসে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে। গোলাকার মাথা ঘিরে চাকার মতো কি তিনখানা আছে। জুতোর তলায় চাকা বা 'স্কেট' পরে। অদ্ভুত সব বিশেষত্ব—মানুষী ভাবের সঙ্গে অমানুষী ভাবের মিল। কিন্তু মূর্তিটার মস্তিষ্ক আছে। চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে ভাবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে, অনায়াসেই পুলিসকে ফাঁকি দেয়, আবার মানুষদের মধ্যে শারীরিক শক্তিতেও অতুলনীয়— ছয়-ছয়জন বলবান পাহারাওয়ালাকেও এক এক আঘাতে ভূমিসাৎ করে। আমার সামনে এক আশ্চর্য সমস্যা এনে দিলেন সুন্দরবাবু! ফস করে এ সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন কলকাতা হয়ে থাকবে একটা বিপদজনক জায়গা।"

—"উপায় কি, অবলম্বন করবার মতো কোন সূত্রই তো খুঁজে পাচ্ছি না। অপরাধী যদি বর্ম পরে, তবে তার আসল রূপ কেউ দেখতে পায় না, তার হাতের আঙুলের বা পায়ের ছাপেরও কোন মূল্য থাকে না। এই বিংশ শতাব্দীতে বর্ম পরে রাহাজানি করা একটা নতুন ব্যাপার বটে। চোখ দিয়ে আগুন বার করা, হয়তো কোন যান্ত্রিক কৌশল। কিন্তু কোন মানুষ একসঙ্গে বহু কণ্ঠে কথা কয়, এটা কখনো শুনেছেন? আবার দেখুন, মূর্তিটা মানুষের মতো মাথা খাটিয়ে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। তিনটি ঘটনাস্থলেই মূর্তিটা বেছে বেছে আক্রমণ করেছে কেবল অবাঙালীদেরই।"

—"এথেকে কি বুঝতে হবে?"

—"এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা একটা উল্লেখযোগ্য সূত্র বটে। এরও দুটো দিক আছে। অপরাধী নিজেও হয়তো মারোয়াড়ী, তাই মারোয়াড়ীদের হাঁড়ির খবরই ভালো করে রাখতে পারে।"

—"কিন্তু কেবল মারোয়াড়ীদের সম্পত্তিই সে লুণ্ঠন করেনি।"

—"হ্যাঁ তাও জানি। চিনুভাই চুনীলাল হচ্ছে গুজরাটি নাম। কিন্তু সে তো অবাঙালী।"

—"তাহলে কি মারোয়াড়ীদের উপরেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে?"

—"তাইই বা বলি কেমন করে? অপরাধী নিজে বাঙালী হতেও পারে। তাই যে সব অবাঙালী এদেশে এসে বাংলার টাকা লুণ্ঠন করছে, তাদের উপরেই তার জাতক্রোধ। তবে একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অপরাধ যাদের পেশা, সেই পুরাতন পাপীরা যে পদ্ধতিতে অপরাধ করে, আমাদের কাছে তা অজানা নেই। বর্তমান ক্ষেত্রের পদ্ধতি হচ্ছে সম্পূর্ণ নূতন। এ-সব রাহাজানির পিছনে কাজ করেছে কোন সুশিক্ষিত, আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক। মারোয়াড়ী মহলে এ শ্রেণীর মস্তিষ্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমার সন্দেহ হয়, অপরাধী বাঙালী—সে

বিশেষরূপে শিক্ষিত আর বিজ্ঞান নিয়ে কেবল নাড়াচাড়াই করে না, হয়ত সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।''

—''তাহলে আপাতত এই সূত্র ধরেই আমাকে কাজ আরম্ভ করতে বল?''

—''হ্যাঁ। তবে আরো একটা ছোট সূত্র আছে বটে—কালো রঙের ফোর্ড। কিন্তু কলকাতায় ও-রকম গাড়ির অধিকারীর সংখ্যা অল্প নয়, সুতরাং এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—যদিও সূত্রটা পরে কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে।''

সুন্দরবাবু বললেন, ''হুম্, এইবারে আমি চা পান করতে পারি। চায়ের সঙ্গে আর কি আছে?''

—''আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট আর এগ্-টোস্ট।''

—''চমৎকার, চমৎকার! অবিলম্বে আনয়ন কর।''

পরিতৃপ্ত মুখে পানাহার করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, ''সেই দুঃস্বপ্ন-হারিয়ে-দেওয়া মূর্তিটাকে প্রথম যখন চোখের সামনে দেখেছিলুম, তখন আবার যে তোমার এখানে এসে চা আর এগ-টোস্ট প্রভৃতি ওড়াতে পারব, সে আশায় একেবারেই দিয়েছিলুম জলাঞ্জলি।''

মানিক বললে, ''আমি বলতে পারি, আপনি নিশ্চয়ই মূর্তিটাকে ভালো করে দেখতে পাননি।''

—''হুম্, কেমন করে জানলে?''

—''চোখের সামনে আপনি খালি দেখেছিলেন রাশি রাশি সরষের ফুল। সে সময়ে আর কিছু দেখা চলে না।''

—''তোমার এ অনুমান সত্য। চোখের সামনে আমি সরষের ফুল দেখেছিলুম বটে। কিন্তু সেটা কারণ নয়, কার্য। কেননা মূর্তিটাকে আরো ভালো করে দেখতে না পেয়ে সেদিন কখনোই স্বচক্ষে আমি সরষের ফুল দেখতে পেতুম না! বুঝলে হে নিরেট?''

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ির ভোজ

সাতদিন কেটে গেল পরে পরে।

জয়ন্ত যখনই অবসর পায়, চোখ মুদে কি ভাবে ইজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায়। এই কয় দিন সে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তার নিত্য-নৈমিত্তিক ভ্রমণ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। রোজ সে একবার না একবার বাঁশি বাজাতই। কিন্তু তার বাঁশি এখন বোবা। খুশি হলেই নস্য নেওয়া তার স্বভাব। কিন্তু তার মেজাজ আজকাল নিশ্চয়ই খুশি নয়, কারণ এ হপ্তায় একবারও নস্য নেয়নি। এমন কি আহারও করে নামমাত্র। বলে, ''পূর্ণোদরে মস্তিষ্ক উচিতমত কাজ করে না।''

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল বৃষ্টিকাতর। মানিককে ডেকে জয়ন্ত বললে, ''দেখ, জটিল আর আশ্চর্য মামলা আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ মামলাটার ভিতর সূত্রগুলো এমন জট পাকিয়ে আছে যে, অসম্ভবকে সম্ভবপর মনে না করলে স্থানে স্থানে একেবারেই খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। মূর্তিটার চোখে আগুন, পায়ে চাকা আর গায়ে বর্ম আছে শুনে আমি ততটা বিস্মিত হইনি, যতটা হয়েছি একসঙ্গে সে বহু কণ্ঠে কথা কইতে পারে শুনে। এটা হচ্ছে অপার্থিব ব্যাপার, পৃথিবীর কোন মানুষই তা পারে না। অথচ ভেবে ভেবে আমি এমন কিছু আন্দাজ করে নিয়েছি, কেউ যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করবে না।''

মানিক শুধোলে, ''আন্দাজটা কি, শুনতে পাই না?''

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, ''না, আমার আন্দাজ নিয়ে তোমাকে চমকে দিতে চাই না।''

—''কিন্তু এ-রকম উদ্ভট মূর্তি সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে তুমি কিছু চিন্তা করেছ?''

—"করেছি বৈকি! কেবল আমি নই, পাশ্চাত্য দেশেও এ বিষয় নিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যথেষ্ট মস্তিষ্ক চালনা করেছেন।"

মানিক সোৎসাহে বলে উঠল, "কি রকম?"

—"সম্প্রতি একখানা ইংরেজী কাগজে দেখলুম, ক্যানাডার Defence Research Board-এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ এম সোল্যান্ড মত প্রকাশ করেছেন—"

তার কথায় বাধা দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘন্টিকা।

জয়ন্ত মুখের কথা শেষ না করেই উঠে গিয়ে 'রিসিভার' ধরে বললে, "হ্যালো! সুন্দরবাবু নাকি? কি খবর? অ্যাঁঃ, আবার অলৌকিক দস্যুর আবির্ভাব? কোথায় বললেন? রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে? কোথা থেকে ফোন করছেন? মহারাজা বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ সিংহের প্রাসাদ থেকে? হ্যাঁ, সে প্রাসাদ আমি চিনি। আমাকে এখনি যেতে হবে? তথাস্তু!"

'রিসিভার' রেখে দিয়ে জয়ন্ত ফিরে বললে, "সব শুনলে তো মানিক? যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও। আমিও জামা-কাপড় বদলে নি।"

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কি নির্ভীক দস্যু? এখনো রাত গভীর হয়নি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মতো জনবহুল বড় রাস্তার উপরে—"

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "না মানিক, তোমাদের ঐ অলৌকিক দস্যু নির্ভীক হলেও নির্বোধ নয়। আকাশের ঘোর ঘটা, মেঘের জটা, বিদ্যুতের ছটা আর ধারাপাতের পটাপট শব্দ শুনেও কি আন্দাজ করতে পারছ না যে, কবিদের ভাষায় এখন 'পন্থ বিজন, তিমির সঘন'? গিয়ে দেখবে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এখন রীতিমত ফাঁকা জায়গা।"

মোটরে বেরিয়ে তারা দেখলে, শহরের যে সব রাস্তা জনতার জন্যে বিখ্যাত, আজ হয়ে পড়েছে প্রায় জনহীন। আকাশ কালিমাখা, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে, এঁকেবেঁকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে ডেকে উঠছে বজ্র, হেঁকে হেঁকে ছুটছে ঝোড়ো হাওয়া এবং ঝম-ঝম করে ঝরছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা। কোন কোন পথ আবার হয়ে উঠছে তরঙ্গময় নদীর মতো। নিতান্ত দায়ে না পড়লে মানুষ তো দূরের কথা কুকুর-শেয়ালও আজ বাইরে বেরুতে রাজী হবে না।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ হয়ে পড়েছে নির্জন। খরিদ্দারের অভাব দেখে দোকানদাররাও আলো নিবিয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছে। কেবল সরকারি আলোগুলোই কলকাতার রাস্তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না, তাকে যথার্থরূপে সমুজ্জ্বল করে তোলে দোকানীদেরই দেওয়া সন্ধ্যাদীপ; তার অভাবে বহু স্থানেই দেখা যাচ্ছে আলো-আঁধারির লীলা! মাঝে মাঝে দেখা যায় এক-একজন বৃষ্টিস্নাত শীতকাতর জড়সড় পথিককে, হাতে তার ছাতা আছে, কিন্তু খোলবার উপায় নেই, কারণ বোঁ বোঁ করে বইছে এমনি জোর হাওয়া যে খুললেই ছত্র উল্টে গিয়ে পরিণত হবে আকাশের জলপাত্রে।

জয়ন্ত বললে, "দেখছো তো মানিক, চারিদিকের অবস্থা। যে অপরাধী এমন সুযোগ ত্যাগ করে তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে না।"

মোটর মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের ফটক ও বাগান পার হয়ে গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়াল! মোটরের শব্দ শুনেই বাইরে এসে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "জয়ন্ত-ভায়া নাকি?"

গাড়ির গতি থামিয়ে জয়ন্ত বললে, "হুঁ।"

—"বাড়ির ভিতরে ভারি লোকের ভিড়। আমি আগে তোমার সঙ্গে গোপনে কথা কইতে চাই।"

—"বেশ তো, গাড়ির ভিতরে আসুন না!"

সুন্দরবাবু ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের পাশে এসে বসলেন।

জয়ন্ত বললে, "সমাচার?"

—"অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে, আক্রমণ করেছে এবং পালিয়ে গিয়েছে।"

—"পালিয়ে গিয়েছে!"

—"হ্যাঁ, যাকে বলে দস্তুরমত পিটটান!"

—"কার ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছে?"

—"বন্দুকের বুলেটের ভয়ে।"

—"কেউ বন্দুক ছুঁড়েছিল?"

—"হ্যাঁ। তাই লুট করতে এসেও সে জুৎ করতে পারেনি।"

—"তারপর?"

—"বলতে গেলে গোড়ার দু-চারটে কথা খুলে বলতে হয়। মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রথম পুত্রের বিবাহ হবে মধ্য প্রদেশের এক সামন্ত রাজার কন্যার সঙ্গে। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর পুত্রবধূকে লক্ষ টাকা মূল্যের জড়োয়া গহনা যৌতুক দেবার ব্যবস্থা করেছেন। গহনাগুলি নির্মাণ করবার ভার পড়েছিল কলকাতার এক বিখ্যাত রত্নজীবীর উপরে। এই পর্যন্ত হল গোড়ার কথা।"

—"তারপর?"

—"আজ সন্ধ্যার পর রত্নজীবী স্বয়ং সমস্ত গহনা নিয়ে প্রাসাদে আসবেন শুনে মহারাজ নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়ির ভিতরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ছিল চালক আর একজন সশস্ত্র শিখ সেপাই। অলৌকিক দস্যুর কীর্তি মহারাজেরও কানে উঠেছিল, তাই এই সাবধানতা। রত্নজীবীকে দোকান থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি ফিরে আসছিল প্রাসাদের দিকে। আজকের দুর্যোগটা দেখছ তো? এরই ভিতর দিয়ে গাড়ি যখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে এসে পৌঁছয়, পথে তখন লোকজন ছিল না বললেই চলে। হঠাৎ পাশের একটা রাস্তা থেকে একখানা কালো রঙের মোটর মহারাজার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে গতি বন্ধ করে দেয়। পর মুহূর্তেই নূতন মোটরখানার ভিতর থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ে সেই অলৌকিক দস্যু, তার চেহারার নূতন বর্ণনা দেবার আর দরকার নেই। বীভৎস মূর্তিটা বেগে ছুটে এল মহারাজার গাড়ির দিকে। তার অভাবিত আকৃতি দেখে শিখ সেপাইটা আমারই মতো আতঙ্কে আর বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল, তার কাছে যে বন্দুক আছে এ কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। চালকের অবস্থাও তথৈবচ, রত্নজীবী সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

"কিন্তু বাহবা দি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে! বিপদে পড়ে তিনি উপস্থিত-বুদ্ধি হারালেন না। খবরের কাগজে অলৌকিক দস্যুর কীর্তি-কাহিনী পাঠ করে তিনি নাকি আগে থাকতেই সতর্ক হয়ে ছিলেন। অলৌকিক দস্যু যেই মারমুখো হয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, তিনি তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে পড়ে শিখ সেপাইটার প্রায় অবশ হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন।

"কিন্তু অলৌকিক দস্যু অত্যন্ত হুঁশিয়ার ব্যক্তি, অত্যন্ত চতুর। সেক্রেটারি বন্দুকের ঘোড়া টেপবার আগেই সে চট করে গাড়ির পাশে পথের উপরে বসে পড়ল, গুলি তার গায়ে লাগল না। পর মুহূর্তেই সে নিজের আসুরিক শক্তির আশ্চর্য পরিচয় দিলে। সেক্রেটারি দ্বিতীয়বার বন্দুক ছোঁড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আচম্বিতে মহারাজার গাড়িখানা হুড়মুড় করে উল্টে গেল, আরোহীরা

ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে! মানুষ শিশুদের খেলনার গাড়ি যত সহজে উল্টে দিতে পারে, অলৌকিক দস্যু তেমনি অনায়াসেই গাড়িখানাকে তুলে আছড়ে ফেলে দিল।

"মাটির উপরে অতর্কিতে বিষম আছাড় খেয়ে আর জখম হয়েও সেক্রেটারি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন না। চোখের নিমেষে আবার তিনি উঠে পড়ে পথের উপর থেকে হস্তচ্যুত বন্দুকটা তুলে নিলেন, কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অলৌকিক দস্যু লাফ মেরে নিজের কালো রঙের মোটরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানাও দৌড় মারলে তড়িৎ-বেগে! সেক্রেটারি তবু আর একবার বন্দুক ছুঁড়লেন ছুটন্ত গাড়িখানাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু গাড়ির গতি বন্ধ হল না।

গাড়ি থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রত্যেক আরোহীই অল্পবিস্তর চোট খেয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার অলঙ্কার থেকে মহারাজাকে বঞ্চিত হতে হয়নি। তারপর রাজবাড়ি থেকে ফোন পেয়ে আমি এখানে এসেছি তদন্ত করতে।"

জয়ন্ত নীরবে সব শুনে প্রথমেই বললে, "দেখছেন তো সুন্দরবাবু, আপনাদের অলৌকিক দস্যু আগ্নেয়াস্ত্রকে কতখানি ভয় করে?"

—"দেখছি তো। তাহলে ব্যাপারটা অপার্থিব নয়, পার্থিব?"

—"পৃথিবীতে অসাধারণ ব্যাপার থাকতে পারে, অসামান্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার থাকতে পারে, কিন্তু অপার্থিব কোন কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

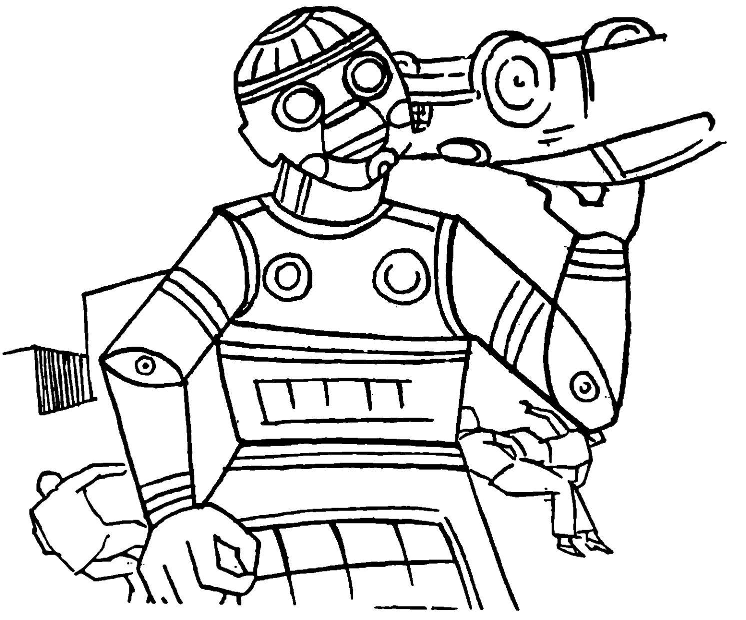

—"তাহলে সেদিন আমি যদি রিভলবার ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতুম, তাহলে এই অদ্ভুত ডাকাতটার হাতেনাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল?"

—"তাইতো মনে হয়।"

—"হায় হায় হায় হায়, বোকার মতো গাধার মতো খামোকা ভয় পেয়ে কত বড় গৌরব থেকে আমি বঞ্চিত হলুম!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, এখনো আপনি বোকার মতো গাধার মতো বক্ বক্ করছেন।"

—"হুম্, করছি নাকি?"

—"করছেন না তো কি? যে দুধ চলকে পড়ে গিয়েছে তা নিয়ে আবার হায় হায় করা কেন?"

—"তা যা বলেছ। তবে কি জানো, পোড়া মন যে সহজে বোঝ মানে না।"

জয়ন্ত বললে, "যেতে দিন ওকথা! এখন কাজের কথা হোক। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি দেখছি অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি!"

—"তা আবার একবার করে বলতে?"

—"কালো রঙের ফোর্ড গাড়িখানার নম্বর দেখতে নিশ্চয়ই তিনি ভুল করেননি?"

—"নম্বর তিনি দেখে নিয়েছেন বৈকি! কিন্তু সেই ভুয়ো নম্বর।"

—"যাক। আপনার কাছে আর কিছু নতুন তথ্য আছে?"

—"ছোট একটি তথ্য আছে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের কাজে লাগবে না।"

—"তথ্যটা কি?"

—"অনতিবিলম্বেই ঘটনাস্থলে এসে আমি একবার তদারক করে গিয়েছি। একজন সার্জেন্টের মুখে শুনলুম, ঘটনা যখন ঘটে সেই সময়ে সে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর পাশের একটা রাস্তা দিয়ে আসছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি অতিরিক্ত বেগে পথের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে গাড়িখানা থামাতে বলে। কিন্তু চালক তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি, বরং আরো জোর গাড়ি চালিয়ে দেয়। সার্জেন্টের সন্দেহ হয়, সে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িখানা মোড় ফিরে নিউ স্ট্রিটের ভিতর গিয়ে ঢোকে। সার্জেন্টও নিউ স্ট্রিট পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু গাড়িখানাকে আর দেখতে পায় না। এইটুকু তথ্য নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে জয়ন্ত? নিউ স্ট্রিটের ভিতর দিয়ে গাড়িখানা কত দূরে গিয়ে পড়েছে কে তা বলতে পারে?"

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল প্রায় তিন মিনিট। তার দুই চক্ষু মুদ্রিত।

সুন্দরবাবু অধীর হয়ে বললেন, "কি হে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

—"উহুঁ!"

—"তবে?"

—"ভাবছি।"

—"কি ভাবছ?"

—"আপনার এই তথ্যটি ছোট্টও নয়, সামান্যও নয়।"

—"মানে?"

—"সার্জেন্টের উচিত ছিল নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত না গিয়ে দৌড়ে তার ভিতর প্রবেশ করা।"

—"কেন?"

—"তাহলে খুব সম্ভব সে কোন অত্যন্ত দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পারত।"

—"কেমন করে?"

—"কেমন করে জানি না। তবে এটুকু জানি যে, নিউ স্ট্রিট সত্য সত্যই একটি নতুন রাস্তা। বালিগঞ্জের অনেক নতুন রাস্তার মতো এটিও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। পূর্বদিকে খানিকটা এগুবার পর দেখা যায়, অসম্পূর্ণ রাস্তার দুই ধারে আর সামনে আছে এবড়ো-খেবড়ো খণ্ড খণ্ড খোলা জমি, তার উপর দিয়ে মোটর চলা অসম্ভব। নিউ স্ট্রিটের যে অংশটুকুর ভিতরে লোকের বসতি আছে, তার কোন জায়গা দিয়েও মোটরের বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ নেই। এথেকে কি বুঝতে হবে সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ নীরব ও চমৎকৃত হয়ে রইলেন। তারপর অভিভূতের মতো বলে উঠলেন, "তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত? সেই কালো রঙের গাড়িখানা ছিল নিউ স্ট্রিটের ভিতরেই?"

—"আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না, প্রশ্ন করুন নিজের সহজ বুদ্ধিকেই।"

—"হায়রে কপাল, আমরা কেল্লা ফতে করবার আর একটা মস্ত সুযোগ হারালুম!"

—"সুন্দরবাবু, এখন আমাদের কি কর্তব্য জানেন?"

—"হতাশভাবে বাসায় ফিরে যাওয়া।"

—"মোটেই নয়। আমাদের এখনি বিপুল উৎসাহে নিউ স্ট্রিট বেড়াতে যাওয়া উচিত!"

—"এই রাত্রে, এই ঝড়-জলে?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি কি মনে কর, আমাদের হাতে ধরা পড়বার জন্যে কালো রঙের গাড়িখানা এখনো সেখানে অপেক্ষা করছে?"

—"আমি কি মনে করি না করি তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? চলুন না, খানিকটা ঝোড়ো বায়ু সেবন করে আসি।"

—"দুটো বাধা আছে ভায়া। প্রথমত, আমার সর্দির ধাত, ঝোড়ো ভিজে হাওয়া হয়তো সামলাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, লাখ টাকার মাল পয়মাল হয়নি বলে মহারাজা খুশি হয়ে আজ আমাদের সকলের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছেন। ভেবে দেখ জয়ন্ত, রাজবাড়ির ভোজ, খাদ্য-তালিকা কতখানি দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা!"

—"তাহলে আপনি রাজবাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করুন, আমরা দুজনেই চললুম নিউ স্ট্রীটে।"

—"সে কি, মহারাজা বাহাদুর আমার মুখে তোমাদের কথা শুনে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন যে!"

মানিক বললে, "আমরা দীর্ঘকর্ণ নই, দীর্ঘ তালিকার লোভে রবাহুত অতিথির আসনও অধিকার করতে পারব না।"

—"দীর্ঘকর্ণ? ঠারে-ঠোরে আমাকে গাধা বলে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে? আমি গাধা?"

—"সেটা তো একটু আগে আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন।"

—"জয়ন্ত, মানিকের নষ্টামি অসহনীয়! চল, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। হুম্!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক, ঠিক, ঠিক!

ঝর-ঝর-ঝর-ঝর ঝরছে তখনো আকাশ-ঝরনা, হু-হু-হু-হু পড়ছে ভিজে বাতাসের এলোমেলো দীর্ঘশ্বাস। পথের ধারে ধারে রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একটা জানলাতেও

দেখা যাচ্ছে না আলো-হাসির এতটুকু আভাস। পৃথিবীকে আজ গ্রাস করেছে পরিত্যক্ত সমাধির বিজনতা!

বর্ষাতির প্রান্তগুলো ভালো করে দেহের উপরে গুছিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবু সেই যে গুম্ হয়ে গাড়ির কোণ ঘেঁসে বসেছেন, মুখ দিয়ে একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ করছেন না। তিনি মনে মনে কি ভাবছেন? রাজবাড়ির সুদীর্ঘ খাদ্য-তালিকা? সম্ভব।

নিউ স্ট্রিট। জয়ন্ত গতি মন্থর করে গাড়িকে মোড় ফিরিয়ে বললে, "মানিক, এ রাস্তায় বাড়ি আছে মোটে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ খানা। এইবারে আমি আরো ধীরে ধীরে গাড়ি চালাব। আমি ডানদিকে চোখ রাখি, তুমি রাখো বামদিকে। হাতে টর্চ নাও। দেখ, এ পাড়ায় মোটর রাখবার গ্যারাজ আছে কতগুলো।"

সুন্দরবাবু কানে সব শুনলেন, তবু মুখ খুললেন না।

গাড়ি পায়ে-হাঁটা পথিকের মতো আস্তে আস্তে চলতে লাগল এবং জয়ন্ত ও মানিক টর্চ ফেলে ফেলে প্রত্যেক বাড়ি লক্ষ্য করতে লাগল। মিনিট সাত এইভাবে অগ্রসর হবার পর আর কোন বাড়ি পাওয়া গেল না। তারপরই পথ বন্ধ। মোটরের 'হেড-লাইট' ফেলে দেখা গেল, জলমগ্ন খণ্ডখণ্ড জমি। কোন কোন জমির উপরে নূতন নূতন বাড়ি নির্মাণের কাজ সবে শুরু হয়েছে, কোথাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "আমরা মোটে তিনটি গ্যারেজ পেলুম। চার নম্বর বাড়িতে একটা, সতেরো নম্বর বাড়িতে একটা, আটাশ নম্বর বাড়িতে একটা। মানিক, নম্বরগুলো একখানা কাগজে টুকে নিয়ে সুন্দরবাবুর হাতে দাও।"

সুন্দরবাবু রাগত স্বরে বললেন, "এ নিয়ে আমি কি স্বর্গে যাব?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বালাই, কেউ কি বন্ধুকে অসময়ে স্বর্গে পাঠাতে চায়? ঐ তিনখানা বাড়িতে কে কে থাকে, তাদের মালিক কে, তারা কে কি কাজ করে, তাদের কি কি গাড়ি আছে, অনুগ্রহ করে এই খবরগুলো নিয়ে কাল আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কেমন পারবেন কি?"

—"অগত্যা পারতেই হবে।"

—"চলুন, এইবারে আপনাকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দি। আমরা আপনার বেশি সময় নিইনি, রাজভোজ এখনো আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে!"

গাড়ি ফিরল। সুন্দরবাবুও জাগ্রত হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে। বললেন, "জয়ন্ত, তোমার কার্যপদ্ধতিটা ঠিক ধরতে পারছি না। তুমি কি বিশ্বাস কর অলৌকিক দস্যুর বাসা আছে এই রাস্তাতেই?"

—"আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় নয় সুন্দরবাবু! আমি কিছু কিছু আন্দাজ করছি মাত্র। কালো গাড়ির চালক বা মালিক সার্জেন্টের চোখের সামনে নিউ স্ট্রিটের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়নি। এখান থেকে বাইরে বেরুবার আর কোন পথ নেই। তবে সে গেল কোথায়? খুব সম্ভব, সার্জেন্ট নিউ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এসে উঁকি মারবার আগেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছুটিয়ে নিজের গ্যারাজের কাছে এসে গাড়ি তুলে ফেলেছে। এইটুকুই আমার আন্দাজ। আপাতত এর উপরেই নির্ভর করে একটু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এই তো রাজবাড়ি। সাবধান সুন্দরবাবু, কাল আপনার হাতে জরুরি কাজ আছে, রাজভোজের আতিশয্যে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বেন না!"

—"জানি হে, জানি। ডিউটি ইজ ডিউটি!"

পরদিন সকালে সুন্দরবাবুর দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু বৈকালী চায়ের আসরকে তিনি বয়কট করলেন না, হাজির হলেন একেবারে ধড়াচুড়ো পরেই।

—"কি সংবাদ?"

—"অশুভ নয়। কিন্তু সারাদিন যথেষ্ট দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে—উদরে শূন্যতা, কণ্ঠে মরুতৃষা। আগে কিঞ্চিৎ পানভোজনের ব্যবস্থা কর।"

মানিক বললে, "আজকের ব্যবস্থা মন্দের ভালো। কি কি আছে শুনবেন? 'পোট্যাটো স্যালাড', 'টি কেক', 'চকোলেট স্যান্ডউইচ' আর চা।"

—"বাসরে, এই কি তোমার মন্দের ভালো? এ যে ভালোর চেয়েও ভালো।"

জয়ন্ত বললে, "এইবারে আশ্বস্ত হলেন তো? তবে উপবেশন এবং সন্দেশ পরিবেশন করুন।"

—"তিন ঠিকানার সন্দেশই সংগ্রহ করেছি।"

—"যথা—"

—"নিউ স্ট্রিটের চার নম্বর বাড়িতে থাকেন উত্তর বঙ্গের এক বিধবা জমিদার-গৃহিণী, নাম অপর্ণা দেবী। তাঁর সন্তান নেই, বিধবা ভ্রাতৃবধূর ছেলেমেয়েদের নিয়েই সংসার। ছেলেমেয়েরা সবাই নাবালক। বাড়িতে আছে চাকর, পাচক, দ্বারবান আর দুজন আধবুড়ো কর্মচারী। তাঁর দুখানা মোটর—একখানা 'অস্টিন', আর একখানা 'স্টুডিবেকার'। নিজের বাড়ি।"

—"তারপর, সতেরো নম্বর বাড়িতে?"

—"ডাক্তার তপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। ভাড়া বাড়ি। ভালো পসার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্ত্রী আছেন। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স পনেরো। ছেলের বয়স এগারো। ছোট মেয়েটি আট বছরের। ডাক্তারবাবু একখানা 'মরিস' গাড়ির অধিকারী।"

—"এখন বাকি রইল খালি আটাশ নম্বরের বাড়ি।"

—"ও বাড়ির মালিক মোহনেন্দু মিত্র! একেবারে নতুন বাড়ি। আট বৎসর আমেরিকায় বাস করে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন যন্ত্রবিৎ রূপে। নিজেকে 'মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার' বলে পরিচয় দেন। এখনো বিবাহ করেননি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। বাড়িতে ঠিকে পাচক আর ঝি নিয়ে থাকেন। তাঁর বাড়ির পিছনের জমিতে কারখানার মতো কি একটা আছে। তাঁর সম্বন্ধে পাড়ার লোক বিশেষ কিছু জানে না, কারণ তিনি মিশুক মানুষ নন। একখানা ফোর্ড গাড়ির অধিকারী, নিজেই গাড়ি চালান—গাড়িখানা কালো রঙের। কি হে জয়ন্ত, আর কিছু জানতে চাও?"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, "না, যেটুকু জেনেছি আপাতত তাইতেই কাজ চলবে। মানিক, নস্যের ডিবেটা এগিয়ে দাও তো ভাই!"

মানিক জানত অতিরিক্ত খুশি হলেই জয়ন্তের দরকার হয় নস্য। ডিবেটা এগিয়ে দিলে।

ভৃত্য মধু এসে সুন্দরবাবুর সামনে একে একে সাজিয়ে দিলে পানভোজনের পাত্র। সুন্দরবাবুর হাত ও মুখ অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জয়ন্ত চুপ করে ভাবতে ভাবতে নস্য নেয় মাঝে মাঝে। এইভাবে যায় কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যে শেষ হয় সুন্দরবাবুর পানাহার।

জয়ন্ত হঠাৎ উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, "ঠিক, ঠিক, ঠিক!"

—"কি ঠিক জয়ন্ত?"

—"এর পর যেদিন অলৌকিক দস্যু দেখা দেবে, সেই দিনই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অমাবস্যার রাত

কেটে যায় দিন পনেরো।

সবাই ভাবে মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের সেক্রেটারির তৎপরতায় হাতে হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোন গতিকে বেঁচে গিয়ে অলৌকিক দস্যুর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। কারণ আজ পনের দিনের মধ্যে তার আর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তবু পুলিসের সচেতনতার সীমা নেই। রাস্তায় কালো রঙের 'ফোর্ড' বেরুলেই পাহারাওয়ালাদের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। কালো রঙের 'ফোর্ড', কালো রঙের 'ফোর্ড'—সারা শহরে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে কালো রঙের 'ফোর্ড'।

পুলিস অনেক কালো রঙের ফোর্ডকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে গাড়ির ভিতরে চালনা করেছে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু কোন গাড়ির কোন আরোহীরই চেহারায় খুঁজে পাওয়া যায়নি কিছুমাত্র অলৌকিকতা।

প্রত্যেক বারেই অলৌকিক দস্যু দেখা দিয়েছে রাত্রিকালে। তাই রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের লোক দলে ভারি হয়ে উঠেছে রীতিমত। কালো বা সাদা বা হলদে রঙের কোন মোটর-গাড়িই আর ফাঁকি দিতে পারে না তাদের কড়া পাহারাকে।

মানিক বললে, "জয়ন্ত, অলৌকিক দস্যু যে আর হানা দিতে বেরোয় না, হয়তো তার মূলে আছে দুটো কারণ।"

—"কি, কি কারণ।"

—"প্রথম কারণ হচ্ছে, ধনবানরা সাবধান হয়ে গিয়েছে। রাত্রে বাড়ির বাইরে মূল্যবান কিছু নিয়ে আনাগোনা করে না। বাড়ির ভিতরেও তারা হানাদারকে বাধা দেবার জন্যে অধিকতর প্রস্তুত হয়ে আছে।"

—"দ্বিতীয় কারণ?"

—"পুলিস বড় বেশি জাগ্রত। অলৌকিক দস্যু জানে, নাগরিকদের আর পুলিসের সাবধানতা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিছুদিন পরে স্বাভাবিক নিয়মেই আবার তারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে, তখন আবার আসবে অলৌকিক দস্যুর মাহেন্দ্রক্ষণ।"

—"তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হয়। নিরাপদ ব্যবধানে বসে অলৌকিক দস্যু দিনের পর দিন গুণছে। কিন্তু যে কোন দিন আবার সে আচম্বিতে দেখা না দিয়ে ছাড়বে না।"

এক অমাবস্যার রাত। চন্দ্রহারা আকাশে সে রাতেও জমে উঠেছে মেঘের পর মেঘ। অত্যন্ত গুমোট—ঝড়বৃষ্টির পূর্ব-লক্ষণ, পথিকরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে বাসার দিকে। কোথাকার একটা বড় ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে বাজল রাত দশটা।

নিউ স্ট্রিট। অসম্পূর্ণ নূতন রাস্তা, বাড়ির সংখ্যা কম, লোক চলাচলও বেশি নয়। ও-অঞ্চলটা রাত দশটার সময়েই প্রায় নিঃসাড় হয়ে আসে। তখন শব্দ সৃষ্টি করে কেবল ঝিঁঝি পোকাগুলো। থেকে থেকে ডেকে উঠছে একটা-দুটো প্যাঁচা।

আচম্বিতে শোনা গেল একখানা মোটরগাড়ির আওয়াজ। গ্যাসের আলোতে দেখা গেল একখানা কালো রঙের 'ফোর্ড'। রাস্তার মাঝখান থেকে সরে গেল দুটো পথচারী কুকুর।

মোটরখানা দুটো রাস্তার সংযোগ-স্থলে এসে মোড় ফিরতে উদ্যত হল। সহসা খুব কাছেই বেজে উঠল তীব্র স্বরে একটা বাঁশি এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়েই জেগে উঠল দলে দলে

মানুষ—'ফোর্ডে'র এপাশে ওপাশে, সামনে পিছনে! প্রত্যেকেরই হাতে বন্দুক—মিলিটারি পুলিস!

কোথা থেকে হল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব—তাঁর পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু রিভলবার তুলে গর্জন করে বলে উঠলেন, "এই 'ফোর্ড' গাড়ি! দাঁড়াও! নইলে—"

গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

চালক ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, "কে আপনারা? কী চান?"

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গী করে বললেন, "কে আমরা? তাও কি মুখ ফুটে বলতে হবে? কী চাই? তাও কি বুঝতে পারছেন না?"

চালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "বুঝেছি আপনারা পুলিসের লোক। কিন্তু আপনারা যে কি চান, সেইটেই এখনো বুঝতে পারছি না।"

—"বটে, বটে, বটে? আমরা চাই অলৌকিক দস্যুকে? এইবারে বুঝতে পারলেন?"

—"উঁহু!"

দূর থেকেই পরম সাবধানে গাড়ির ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করে সুন্দরবাবু বললেন, "ওহে, তোমরা সবাই গাড়ির দরজা খুলে দেখ তো, ভিতরে কোন বেটা ধুমসো দুশমন হুমড়ি খেয়ে লুকিয়ে বসে আছে কিনা? কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! সবাই বন্দুক তৈরি রেখো—হুম, বড় বড় ধড়িবাজ আসামী!"

অনেকগুলো তীক্ষ্ণদৃষ্টি গাড়ির ভিতরটা ভালো করে অন্বেষণ করলে, কিন্তু কোন-কিছুই হল না দৃষ্টিগোচর। চালক ছাড়া গাড়ির ভিতরে নেই দ্বিতীয় ব্যক্তি।

চালক সকৌতুকে বললে, "কলকাতার পুলিস কি আজ কাল অলৌকিক স্বপ্ন দেখবার ব্যবসা ধরেছে?"

তার ব্যঙ্গোক্তি গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সুন্দরবাবু একবার ফিরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হল না, কারণ জয়ন্ত তখন একান্ত নির্বিকারের মতো ঊর্ধ্বমুখে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে যেন বর্ষণোন্মুখ ও চলিষ্ণু মেঘগুলোকে দেখবার চেষ্টা করছিল। তিনি হতাশ ভাবে ফিরলেন মানিকের দিকে।

মানিক নিজের পকেটে হাত পুরে দিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আসবার সময়ে আপনার জন্যে চকোলেট এনেছি। দু-একটা খাবেন?"

মনে মনে রেগে আগুন হয়ে সুন্দরবাবু আবার ফিরলেন মোটর-চালকের দিকে। শুধোলেন, "আপনার নাম কি?"

—"শ্রীমোহনেন্দু মিত্র।"

—"কি করেন?"

—"আমি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার।"

—"ঠিকানা?"

—"আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট।"

—"আপনার গাড়ির নম্বর কত?"

মোহনেন্দু নম্বর বললে।

—"আপনার লাইসেন্স দেখি।"

লাইসেন্সেও পাওয়া গেল মোহনেন্দুর নাম ও গাড়ির নম্বর।

কোন দিকেই কিছু জুৎ করতে না পেরে সুন্দরবাবু অবশেষে বললেন, "গাড়ি নিয়ে আপনি এখন কোথায় যাচ্ছিলেন?"

—"বেড়াতে।"

—"এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে। এই কি বেড়াতে যাবার সময়?"

—"আমার খুশি। নির্বোধের মতো প্রশ্ন করবেন না। দয়া করে পথ ছাড়বেন কি?"

—"হুম্, না!"

—"না মানে?"

—"আমি আপনার বাড়ির ভিতরে খানাতল্লাশ করব।"

—"আপনার কাছে সার্চ-ওয়ারেন্ট আছে?"

—"আছে।"

—"আগে আমি দেখতে চাই।"

সুন্দরবাবু পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জয়ন্ত তাঁর হাত চেপে ধরে বললে, "না সুন্দরবাবু, আজ আর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে না। মোহনেন্দুবাবু বেড়াতে যেতে চান, ওঁকে বেড়াতে যেতে দিন।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন সুন্দরবাবু।

মোহনেন্দু বললে, "তাহলে আমি গাড়িতে 'স্টার্ট' দিতে পারি?"

জয়ন্ত পায়ে পায়ে গাড়ির ঠিক পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

হতভম্বের মতো তার চালচলন লক্ষ্য করতে করতে সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ মোহনেন্দুবাবু,

আজ আপনার যেখানে খুশি বেড়াতে যেতে পারেন।''

মোহনেন্দু গাড়িতে 'স্টার্ট' দিলে এবং পরমুহূর্তে জয়ন্ত সুকৌশলে নিজের দেহকে সংলগ্ন করে ফেললে মোটরের পশ্চাদভাগে। তাকে সেই অবস্থায় নিয়ে গাড়িখানা বেগে বেরিয়ে গেল। সুন্দরবাবু নিজের টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, ''এ আবার কি কাণ্ড রে বাবা!''

মানিক বললে, ''ভালো সেনাপতি শত্রুপক্ষের প্ল্যান দেখে নিজের প্ল্যান স্থির করে। জয়ন্ত বুঝে নিয়েছে মোহনেন্দু তার প্ল্যান বদলে ফেলেছে, তাই সেও নিজের প্ল্যান বদলাতে চায়।''

—''জয়ন্ত কেমন করে বুঝলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।''

—''এইজন্যেই তো আপনার নাম সুন্দরবাবু আর জয়ন্তের নাম জয়ন্ত। সুন্দরবাবু যা বুঝতে পারেন না, জয়ন্ত তা বুঝতে পারে।''

—''জয়ন্ত কি বুঝেছে তুমি তা জানো?''

—''ঠিক জানি না বটে, তবে আন্দাজ করতে পারি কিছু কিছু!''

—''আন্দাজটা শুনি!''

''মোহনেন্দু ধূর্ত ব্যক্তি। যেমন করেই হোক সে বুঝতে পেরেছে, পুলিসের নজর তার উপরে। অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, সেটা আমরা জানি না বটে, তবে এই নিউ স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তাকে যে সে সরিয়ে ফেলেছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। আজ তার বাড়ি খানাতল্লাশ করলে নিশ্চয় আমরা কিছুই আবিষ্কার করতে পারতুম না।''

—''মোহনেন্দুর গাড়ির ভিতরে অলৌকিক দস্যু নেই। তার গাড়ির নম্বর ভুয়ো নয়। মানিক, আমরা বোধ হয় ভুল সূত্র ধরে বোকা বনে গেলুম। মোহনেন্দুর সঙ্গে অলৌকিক দস্যুর সম্পর্ক নেই।''

—''আমার কি বিশ্বাস জানেন? পুলিসের নজর তার উপরে আছে কিনা এটা নিশ্চিতরূপে জানবার জন্যেই মোহনেন্দু এমন অসময়ে নিজের গাড়ি বার করেছিল।''

—''হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু ওর গাড়ির পিছনে অমন গোঁয়ারের মতো চড়ে জয়ন্ত আজ নিজের জীবন বিপন্ন করতে চায় কেন?''

—''ঠিক বলতে পারি না। খুব সম্ভব জয়ন্তের সন্দেহ হয়েছে, মোহনেন্দু এই ফাঁকে অলৌকিক দস্যুর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে।''

—''নূতন কোন ঠিকানায় গিয়ে?''

—''হ্যাঁ।''

—''হুম্!''

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কালো রঙের ফোর্ড

তারপর কেটে গেল একমাস।

দেড় মাসের মধ্যে একবারও অলৌকিক দস্যুর সাড়া-শব্দ না পেয়ে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল কলকাতা শহর। অনেকেই মত প্রকাশ করলে, মহারাজা দুর্গাপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারির বন্দুকের দ্বিতীয় গুলিটা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি, অলৌকিক দস্যু পটল তুলেছে।

কিন্তু জয়ন্তের ধারণা অন্যরকম। সে আজ এক মাস ধরে সুরেন রায় রোডে তার এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সঙ্গে আছে মানিক। আজ এক মাসের মধ্যে তারা এই বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।

ও ফুটপাথের একখানা মাঝারি আকারের লাল রঙের দোতালা বাড়ির উপরে সর্বদাই নিবদ্ধ থাকে তাদের দৃষ্টি। একমাস কেটে গেছে, তবু একটুও কমেনি তাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা।

অথচ তারা সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায়নি। ও বাড়ির ভিতরে কেউ বাস করে বলেও মনে হয় না, কারণ বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা সর্বদাই বন্ধ থাকে। রাত্রেও সেখানে দেখা যায় না কোন আলোর চিহ্ন, পাওয়া যায় না কোন মানুষের সাড়া।

কেবল মাঝে মাঝে কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। একটি লোক গাড়ি থেকে নেমে নিজের চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। খানিকক্ষণ পরে আবার সে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

'সার্চ-ওয়ারেন্ট' এনে বাড়িখানার ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে একাধিক বার উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন সুন্দরবাবু।

তাঁকে নিরস্ত করে জয়ন্ত বলছে, "অলৌকিক দস্যু ওখানে আছে কিনা তাও জোর করে বলতে পারি না। আমরা খালি দেখেছি মোহনেন্দুকে আসা-যাওয়া করতে। সে যে অলৌকিক দস্যু নয়, এও আমরা সকলেই জানি। সে একবার আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি দ্বিতীয় বার আর ঠকতে রাজী নই। কারণ এখনো আমরা পিছু ছাড়িনি জানলে পাখি ভয় পেয়ে একেবারেই উড়ে পালাবে। তার চেয়ে ওকে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে কিছুদিন সময় দিন, তাহলেই আমরা কেল্লা ফতে করতে পারব।"

—"কিন্তু আমি যে আর কৌতূহল দমন করতে পারছি না!"

—"সবুর করুন, সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে জানেন তো? এ বাড়িতে ফোন আছে, যথাসময়েই আপনি খবর পাবেন।"

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "আজ একমাস তোমরা বাড়ি ছাড়া। আজ একমাস তোমাদের লোভনীয় চায়ের আসর আর বসেনি। তোমরা যেন এখানেও চা-টা উড়িয়ে মজা করছ, কিন্তু আমি আসতে চাইলেই তোমরা হাঁ-হাঁ করে ওঠ!"

—"অবুঝ হবেন না দাদা! আপনার মতো সুপরিচিত পুলিস কর্মচারী এ পাড়ায় ঘন ঘন আগাগোনা করলে আমাদের অজ্ঞাতবাস করা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

ঢং ঢং করে বাজল রাত বারোটা।

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বললেন, "এতদিনে কি সময় হল জয়ন্ত?"

—"বোধ হয় হল। আজ কালো গাড়িখানা একবার দুপুরে, আর একবার বৈকালে এসেছিল। তারপর আধ ঘণ্টা আগে আবার এসে দাঁড়িয়ে আছে। আসবার সময়ে লাল বাড়ির সামনে আপনিও গাড়িখানা দেখেছেন তো?"

—"তা আবার দেখিনি! আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি।"

—"কি?"

—"গাড়িতে মোহনেন্দুর গাড়ির নম্বর নেই! তার মানে ভুয়ো নম্বর।"

—"এত রাত্রে মোহনেন্দুর এখানে আগমন, গাড়িতে ভুয়ো নম্বর, আজ একটা কোন ঘটনা ঘটবেই। চলুন, আমরা নীচেয় নেমে সদর দরজার পাশে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আপনার লোকজন?"

—"সব যথাস্থানে ঘাপটি মেরে আছে।"

—"চলুন।"

কিন্তু আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

লাল বাড়ির ভিতর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। সে গাড়ির চালকের সামনে উঠে বসতেই দেখা গেল আর একটা বৃহত্তর ছায়ামূর্তি। রাতের অন্ধকারে কোন মূর্তিকেই স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। দ্বিতীয় মূর্তি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়ে উঠল এঞ্জিনের শব্দ—

এবার সঙ্গে সঙ্গে বাজল পুলিসের বাঁশি, চারিদিকে দপদপিয়ে উঠলো অনেকগুলো টর্চ, ধেয়ে এল দলে দলে সশস্ত্র লোক!

সুন্দরবাবু গাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বললেন, "থামাও গাড়ি!"

কিন্তু গাড়িখানা থামল না, সাঁৎ করে উল্কাগতিতে সকলের চোখের সামনে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল।

—"বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!"

সেপাইরা গুলিবৃষ্টি করলে, কোন গুলি গাড়ির গায়ে লাগল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তার গতি বন্ধ হল না। তারপর ডানদিকে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা।

সুন্দরবাবু প্রাণপণে গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের গাড়ি আছে ও-রাস্তায়। শিগগির এখানে নিয়ে এস!"

কিন্তু পুলিসের গাড়ি নিয়ে এসে আবার সেই পলাতক গাড়ির সন্ধানে যাত্রা করতে মিনিট চার সময় কেটে গেল।

মানিক হতাশ ভাবে বললে, "মিছেই এই ছুটোছুটি! আর মোহনেন্দুর পাত্তা পাওয়া অসম্ভব! চোখের সামনে পেয়েও যাকে ধরা গেল না, চোখের আড়াল থেকে তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়?"

জয়ন্ত বললে, "তবু হাল ছাড়া উচিত নয়।"

পুলিসের গাড়িও মোড় ফিরে ধরলে ডানদিকের রাস্তা। শূন্য পথ সিধে চলে গিয়েছে, দুইপাশে তার দাঁড়িয়ে রয়েছে আলোকস্তম্ভগুলো বোবা সাক্ষীর মতো! একান্ত স্তব্ধ রাত্রেও দূর থেকে অন্য কোন গাড়ি-চলার শব্দ পর্যন্ত ভেসে আসছে না!

সুন্দরবাবু আপসোস করতে লাগলেন, "হা রে আমার পোড়া কপাল! এ কী আসামী রে বাবা! হাতে পেয়েও হাতে পাওয়া যায় না, পারার মতো পিছলে পালায়।"

তবু পুলিসের গাড়ি ছোটে। ঘুমন্ত গৃহস্থদের সুখ ভেঙে দিয়ে ছোটে আর ছোটে যেন কোন অদৃশ্য আলেয়ার উদ্দেশে।

প্রায় মাইলখানেক পরে গাড়িখানা এসে পড়ল একটা তেমাথায়। এবং বাঁ-দিকের রাস্তার উপরে তাকিয়েই দেখা গেল দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি।

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "হুম্!"

ফোর্ডের ভিতর থেকে প্রশান্ত স্বরে কে বললে, "আপনাদের শুভাগমনের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি!"

—"কে আপনি?"

—"আমি মোহনেন্দু।"

সুন্দরবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, "সবাই গাড়িখানা ঘিরে ফ্যালো! বন্দুক উঁচিয়ে রাখো! আবার যেন কলা দেখিয়ে চম্পট না দেয়!"

—"আজ্ঞে না, চম্পট আমি দেব না।"

—"দেবে না মানে? এইমাত্র তো চম্পট দিয়েছিলে!"

—"মোটেই নয়। আপনাদের সঙ্গে একটু মজা করেছি মাত্র।"

—"পুলিসের সঙ্গে মজা?"

—"আপনাদের দেখিয়ে দিলুম যে, ইচ্ছা করলেই আমি পালাতে পারতুম, কিন্তু আমি পালালুম না। কেন আমি পালাব? কোন দোষ করিনি, আমি পালাব কেন বলতে পারেন?"

—"বলতে পারি অনেক কিছুই, আর তোমাকেও বলতে হবে অনেক কথাই। এখন তুমি গাড়ির ভিতর থেকে সুড়-সুড় করে নেমে এস দেখি। তোমার সঙ্গে যে আছে, তাকেও নামতে বল।"

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে মোহনেন্দু বললে, "আমার সঙ্গে আর কেউ নেই।"

—"আলবত আছে! আমরা স্বচক্ষে গাড়ির ভিতরে আর একটা লোককে উঠতে দেখেছি।"

—"ভুল দেখেছেন। গাড়িতে আমি একা।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ির ভিতরে খোঁজাখুজি হল। কিন্তু আর কারুকেই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "দেখ মোহনেন্দু, তোমার এই চালাকি একটা শিশুকেও ভোলাতে পারবে না। আমাদের চোখের আড়ালে তুমি পালিয়ে এসেছ আসল আসামীকে সরিয়ে ফেলবার জন্যেই।"

মোহনেন্দু নির্বিকার ভাবে বললে, "কে আসল আসামী, আর কে নকল আসামী তা নিয়ে আপনারা যত খুশি মাথা ঘামাতে পারেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, আমার গাড়িতে আর কেউ ছিল না।"

—"নেই বললেই সাপের বিষ থাকে না নাকি! আমরা তাকে দেখেছি।"

—"বলছি তো ভুল দেখেছেন।"

—"না, ঠিক দেখেছি!"

—"যাকে দেখেছেন আগে তাকে এনে হাজির করুন। নইলে পুলিসের মুখের কথা আদালতেও প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না।"

—"বেশ, আর একটা কথার জবাব দাও। তোমার গাড়িতে ভুয়ো নম্বর কেন?"

—"এ প্রশ্নের অর্থ বুঝলুম না।"

—"উত্তম, বুঝিয়ে দিচ্ছি।" সুন্দরবাবু গাড়ির পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "বটে, বটে? মোহনেন্দু তুমি কাজের ছেলে বটে! ভুয়ো নম্বরের প্লেটখানাও এই ফাঁকে সরিয়ে ফেলেছ দেখছি যে! কিন্তু একটু আগে সেটাও আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

—"কলকাতার পুলিস আজকাল যে এত ভুল দেখে, এ খবর আমার জানা ছিল না!" মোহনেন্দুর কণ্ঠে শ্লেষের আভাস।

সুন্দরবাবু বললেন, "যাক ও-সব কথা। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

—"কেন?"

—"কেন, পরেই বুঝতে পারবে।"

—"আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান?"

—"না। তবে পরে করলেও করতে পারি।"

—"কী অপরাধে?"

—"যদি গ্রেপ্তার করি, পরে শুনতেই পাবে।"

—"দেখছি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে আমি ভালো কাজ করিনি।"

—"অপেক্ষা করেছিলে কি সাধে? ভেবেছিলে সেদিনের মতো আজকেও তোমার কথা শুনে আমরা বোকার মতো আবার তোমাকে ছেড়ে দেব। একই চালে বার বার বাজী মাত করা যায় না বাপু!"

—"আমি নিরপরাধ।"

—"বেশ তো, তাহলে তোমার ভয়টা কিসের? এস এখন আমাদের সঙ্গে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার ভোঁ ভোঁ

পরদিন। প্রাতঃভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য পালন করে বাড়ির দিকে ফিরে এল জয়ন্ত এবং মানিক। তারা প্রত্যহই সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, তারপরে গঙ্গার ধারে বেশ খানিকক্ষণ পদচালনা করে ফিরে আসে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। এ-সময়টায় জয়ন্ত গুরুতর কোনকিছু নিয়েই আলোচনা করতে রাজী হয় না, অন্ধকারের মধ্যে শিশু আলোকের ক্রমবিকাশ দেখতে দেখতে এবং স্নিগ্ধ প্রভাত সমীরণকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দে গ্রহণ করতে করতে নিজের মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম দিতে চায়।

কিন্তু সেদিন বাড়ির কাছে এসেই তারা সবিস্ময়ে দেখলে, এত ভোরে সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একখানা সুপরিচিত মোটরগাড়ি।

জয়ন্ত বললে, "কি আশ্চর্য! ওখানা সুন্দরবাবুর গাড়ি বলে মনে হচ্ছে না?"

মানিক বললে, "সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

—"এত সকালে সুন্দরবাবু তো কোন দিনই বিছানার মায়া ত্যাগ করেন না!"

—"নিশ্চয় আবার কোন অঘটন ঘটেছে!"

—"কি অঘটন ঘটতে পারে? মোহনেন্দু কি পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়েছে।"

—"কিংবা এও হতে পারে, অলৌকিক দস্যু আবার দৃশ্যমান হয়েছে।"

দেখা গেল কৌচের উপরে অর্ধশয়ান অবস্থায় সুন্দরবাবুকে। তাঁর দুই নেত্র মুদ্রিত এবং থেকে থেকে স্ফীত হয়ে উঠেছে তাঁর নাসারন্ধ্র—বোধ হয় গর্জন করে উঠবে অবিলম্বেই।

কিন্তু আজ সুন্দরবাবুর শ্রবণ-বিবর নিশ্চয়ই অত্যন্ত জাগ্রত। কারণ তাঁর নাসিকাকে গর্জন করবার কোন অবসরই তিনি দিলেন না, জয়ন্ত ও মানিকের পদশব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, "ব্যাপার কি সুন্দরবাবু? সকাল হতে না হতে সর্বাগ্রে জাগে কাক আর শালিখ পাখিরা। আপনি কি আজ তাদেরও আগে নিদ্রাদেবীকে তাড়িয়ে দিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছেন?"

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাদান করে হাই তুলতে তুলতে বললেন, "নিদ্রাদেবীকে তাড়াব কি, তাঁকে কাল আমাকে একেবারেই 'বয়কট' করতে হয়েছে, বুঝেছ ভায়া? কাল তিনি আমার কাছে ঘেঁষতে

পারেননি। এতক্ষণ পরে তোমার এখানে আমাকে একলা পেয়ে তিনি আমার উপরে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে তোমাদের পদশব্দ—হুম্! বুঝলে?"

মানিক বললে, "কিছুই বুঝলুম না। নিদ্রাদেবীর বিরুদ্ধে আপনার এই অভাবিত বিদ্রোহের কারণ কি?"

—"কারণ কি? কারণ কি? শোনো তবে বলি। কাল তোমরা দুজনে তো চলে গেলে! আমি মোহনেন্দুকে 'লকআপে' রাখবার ব্যবস্থা করে থানা থেকে যখন বেরিয়ে এলুম রাত তখন চারটে বাজে। হঠাৎ দেখি একখানা মোটর গাড়ি থানার সামনে এসে থেমে পড়ল এবং একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তেমন অসময়ে তাঁর আবির্ভাব দেখে আমার মন কৌতূহলী হয়ে উঠল। ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলুম।

প্রথমেই তিনি বলে উঠলেন, "অলৌকিক দস্যু, অলৌকিক দস্যু!"

শুনেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল আমার শ্রমক্লান্ত দেহ। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, "অলৌকিক দস্যু কি মশাই?"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অলৌকিক দস্যু। আমি খবরের কাগজে তার চেহারার আর কার্যকলাপের বর্ণনা পড়েছি। এ অলৌকিক দস্যু না হয়ে যায় না!" তারপর ভদ্রলোক যে-সব কথা বলতে লাগলেন তা অত্যন্ত অসংলগ্ন। বুঝলুম দারুণ আতঙ্কে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, ভালো করে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে তার সারমর্ম এই ঃ

ভদ্রলোকের নাম বসন্ত চৌধুরী, চব্বিশ পরগনায় তাঁর জমিদারি আছে, বাস করেন টালিগঞ্জে। গত লগ্নে তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন, কাল ছিল বৌভাতের রাত। সেই উপলক্ষে তাঁর বাড়ির সামনেকার খোলা জমিতে মেরাপ বেঁধে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

রাত্রি আড়াইটার পর আসর ভাঙে। অতিথিদের বিদায় দিয়ে আলো-টালো নিবিয়ে অন্যান্য কাজ চুকোতে চুকোতে সাড়ে তিনটে বেজে যায়। চারিদিক যখন নিরালা হয়ে পড়ল, বসন্তবাবু মণ্ডপ ছেড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকব ঢুকব করছেন, এমন সময়ে হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘটাং ঘটাং করে কেমন একটা ধাতব শব্দ! তাঁর বাড়ির পাশেই খানিকটা জঙ্গলভরা বেওয়ারিস জমি ছিল, শব্দ আসছে সেইদিক থেকেই।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বসন্তবাবু একটা লণ্ঠন হাতে করে সেইদিকে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে যা দেখলেন, তাতে তাঁর বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। একটা প্রায় সাত ফুট লম্বা দানবের মতো মূর্তি—দুই চক্ষে তার স্থির বিদ্যুতের মতো তীব্র অগ্নিশিখা—সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

বীভৎস মূর্তিটা তখনও তাঁকে দেখতে পায়নি। তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এলেন। তাকে অলৌকিক দস্যু বলে চিনতে তাঁর একটুও বিলম্ব হল না, তিনি ধরে নিলেন সে এখানে এসেছে তাঁরই বাড়ি আক্রমণ করবার জন্যে। তাই তিনিও কালবিলম্ব না করে থানায় খবর দিতে এসেছেন।

জয়ন্ত, আসল ব্যাপারটা আমি অনায়াসেই আন্দাজ করতে পারলুম। মোহনেন্দুর গাড়ি থেকে পুলিসের ভয়ে নেমে পড়ে অলৌকিক দস্যু ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দলবল নিয়ে ছুটে গেলুম ঘটনাস্থলে। কিন্তু আবার হল সেই 'লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ'—পেলুম অশ্বডিম্ব, নষ্ট হল গোটা রাতের ঘুম, অলৌকিক দস্যু ফাঁকি দিলে আবার আমাকে। তারপর এই

খবরটা দেবার জন্যেই আমার এখানে আগমন। এখন কি করা যায় বল তো ভায়া! 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'—কিন্তু তারও সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে তো? পুলিসে চাকরি নিয়েছি বলে আহার-নিদ্রা তো একেবারে ত্যাগ করতে পারি না! একটা কিছু বিহিত করতেই হবে—কিন্তু কী করতে হবে বল দেখি?"

জয়ন্ত বললে, "আপাতত চা-চর্চা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?"

—"তা যেন করলুম, কিন্তু তারপর?"

—"তারপর হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করুন।"

—"কিসের অপেক্ষা?"

—"অলৌকিক দস্যুর জন্যে।"

—"সাত ঘাটের জল খেয়ে, আহার নিদ্রা ভুলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এত সাধ্য-সাধনা করেও যার নাগাল পাচ্ছি না, তার জন্যে অপেক্ষা করব?"

—"হ্যাঁ। অলৌকিক দস্যুর দেখা পাবেন খুব শীঘ্রই। হয় আজ, নয় কাল, নয় পরশু।"

—"তাই কি তুমি মনে কর?"

—"নিশ্চয়ই! তার পক্ষে আশ্রয়হীনের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। তার কথা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। যারা তাকে দেখেনি তারাও তার মূর্তির বর্ণনা পড়ে তাকে চিনে ফেলবে—যেমন চিনে ফেলেছেন বসন্তবাবু। তাকে যেখানে হোক আশ্রয় নিতে হবেই। তার দুটো ঠিকানাই আমরা জানি। এক আটাশ নম্বর নিউ স্ট্রিট। সেখানে গুপ্তচর মোতায়েন করা আছে তো?"

—"নিশ্চয়!"

—"তার আর এক বাসা আছে সুরেন রায় রোডে—কাল যেখান থেকে সে হানা দিতে বেরিয়েছিল।"

—"সেখানেও পাহারা মোতায়েন করা আছে।"

—"তবে আর কি, মা ভৈঃ! এখন আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। ও মধু, ওহে শ্রীমধুসূদন! তুমি এখন আমাদের যে কার্যে নিযুক্ত করবে, আমরা খুশি মনে তাই-ই করব। দাও মধু, চা দাও, খাবার দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে চা ও খাবার নিয়ে মধুর প্রবেশ। এমন সদাপ্রস্তুত ভৃত্য দুর্লভ।

গতকল্য নিদ্রা ত্যাগ করে আজ সুন্দরবাবুর পানাহার গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিটা বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত। পরমাগ্রহে গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করলেন পাঁচটা সিদ্ধ ডিম, আটখানা 'গোল্ডেন পাফ্' বিস্কুট, ছয়খানা 'টোস্ট', দুটো ল্যাংড়া আম, চারটে মর্তমান কলা ও তিন পেয়ালা চা। জয়ন্ত ও মানিক প্রত্যেকেই খেলে কেবল একটা করে সিদ্ধ ডিম, দুখানা করে 'টোস্ট' ও এক এক পেয়ালা চা।

তারপর সুন্দরবাবু পরিতৃপ্ত বদনে পা ছড়িয়ে বসে একটা সিগার ধরাবার উপক্রম করছেন, সহসা টেলিফোন-যন্ত্রের ঘণ্টি বেজে উঠল ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং।

জয়ন্ত উঠে গিয়ে 'রিসিভার' কানে দিয়ে শুধোলে, "হ্যালো, কাকে চান? সুন্দরবাবুকে? হ্যাঁ, তিনি এখানেই আছেন, ডেকে দিচ্ছি। ধরুন।" ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু, থানা থেকে আপনাকে ডাকছে।"

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাজার করে বললেন, "স্থান নেই, কাল নেই, দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে জিরুবার যো

নেই—কেবলই ডাকাডাকি। আর পারি না বাবা, হুম্!'' তারপর গাত্রোত্থান করে ফোন ধরেই তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠল বিরক্তির বদলে মহা বিস্ময়ের ভাব।

সচকিত কণ্ঠে বললেন, ''অ্যাঁঃ, কি বললে? আচ্ছা, আচ্ছা, এখনি যাচ্ছি! তোমরা এখুনি অকুস্থলে যাও—বাড়িখানা চারধার থেকে ঘেরাও করে রাখো—হ্যাঁ, ভালো কথা! মোহনেন্দুকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলো না।''

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, ''জয়ন্ত, তোমার অনুমান যে এত শীঘ্র সফল হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। যাক্ সে কথা, এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়, সব কথা হবে গাড়িতে।''

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে জয়ন্ত বললে, ''বুঝেছি। অলৌকিক দস্যু আবার দেখা দিয়েছে।''

—''হ্যাঁ।''

—''কোন বাড়িতে?''

—''সুরেন রায় রোডে।''

—''তারপর?''

—''এবারে সে প্রায় একটা নরহত্যা করেছে।''

—''কি রকম?''

—''আজ সকালে পাহারা বদলের সময়ে দেখা যায় রাতের পাহারাওয়ালা বাড়ির দরজার সামনে রক্তাক্ত দেহে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে তখনি হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ!''

—''আর অলৌকিক দস্যু?''

—''তাকে কেউ চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু সে ঐ বাড়ির ভিতরেই আছে।''

—''কি করে বুঝলেন?''

—''মোহনেন্দু কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সদর দরজায় তালা দিয়েছিল। আজ সকালে সেই তালাটা পাওয়া গিয়েছে ভাঙা অবস্থায়, পাহারাওয়ালার দেহের পাশে। কিন্তু বাড়ির সদর দরজাটা খোলা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। এথেকে কি বুঝতে হয়?...কিন্তু আমি কি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি জানো? এত কাণ্ড করে বার বার পুলিসকে অত সহজে ফাঁকি দিয়ে, অলৌকিক দস্যু কি শেষটা এমন নির্বোধের মতো আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়বে?''

রহস্যময় হাস্য করে জয়ন্ত বললে, ''এজন্যে আমি একটুও বিস্মিত নই। সুন্দরবাবু, আপনাদের ঐ অলৌকিক দস্যুর অবস্থা হয়েছে এখন চালকহীন চলন্ত গাড়ির মতো।''

—''তার মানে?''

—''চালককে আপনারা 'লক আপে' রেখেছেন?''

—''মোহনেন্দুর কথা বলছ?''

—''হ্যাঁ। দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। অলৌকিক দস্যুর মস্তিষ্ক এখন আপনাদের হস্তগত হয়েছে। এখন তাকে বুদ্ধি দেবার কেউ নেই। তাই সে নির্বোধের মতো আচরণ করতে পারে।''

—''তুমি কি বলতে চাও, যত নষ্টের মূল ঐ মোহনেন্দুই?''

—''নিশ্চয়ই!''

—''তোমার যুক্তি বুঝতে পারলুম না।''

—''এখনি বুঝতে পারবেন। আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি।''

সেই দোতলা লালরঙের বাড়ি। সামনে কৌতূহলী জনতা ও দলে দলে পুলিস—কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে বন্দুক।

সদর দরজার সামনে গিয়ে সুন্দরবাবু মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সেখানে রক্তের দাগ।

সুন্দরবাবু সদর দরজার উপরে সজোরে ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে বললেন, "বাড়ির ভিতরে কে আছ? দরজা খোলো, দরজা খোলো।"

সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কেউ সাড়াও দিলে না, দরজাও খুললে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আগে মোহনেন্দুকে এখানে নিয়ে এস। যদি তার ডাকেও কেউ সাড়া না দেয়, তাহলে দরজাটা ভেঙে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।"

কিন্তু এমন সময়ে ঘটল এক বিচিত্র অঘটন! ঝনাৎ করে বাড়ির দরজা খুলে পথের উপরে লাফিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক শরীরী দুঃস্বপ্ন—দুই চক্ষে তার ধক ধক করে জ্বলে উঠল দু-দুটো সুদীর্ঘ ও উগ্র অগ্নিশিখা—পায়ে পায়ে সে সুন্দরবাবুর দিকে এগুতে এগুতে বললে, "ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-ভোঁ! অলৌকিক দস্যু!"

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, "আবার ভোঁ-ভোঁ? বন্দুক ছোঁড়ো, বন্দুক ছোঁড়ো!"

এমন সময় মোহনেন্দু কোথা থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসে সকাতরে বলে উঠল, "বন্দুক ছুঁড়বেন না—বন্দুক ছুঁড়বেন না—আমি ওকে এখনি নিশ্চল করে দিচ্ছি!"

কিন্তু ইতিমধ্যেই গর্জন করে উঠেছে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক! সেই বর্মাবৃত, অতিকায়, অবিশ্বাস্য মূর্তিটা তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হল ঠিক ছিন্নমূল বৃক্ষের মতই—সে একটিমাত্র আর্তনাদও করলে না, মাটিতে পড়ে একবারও ছটফট করলে না। এত সহজে যে এত বড় শত্রুনিপাত হবে, এটা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

মোহনেন্দু অত্যন্ত ভগ্নস্বরে বলে উঠল, "করলেন কি? এ আপনারা করলেন কি? আমার কত সাধনার সফল স্বপ্ন একেবারে বিফল করে দিলেন! আমি এক মুহূর্তের মধ্যেই ওকে নিশ্চল করে দিতুম, কিন্তু আপনারা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলেন না?"

সুন্দরবাবু বললেন, "মোহনবাবু, ও আপনার কে?"

—"আমার মানসপুত্র।"

জয়ন্ত এগিয়ে এসে বললে, "মানসপুত্রকে মনের ভিতরে রাখলেই আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। কিন্তু তাকে একটা কৃত্রিম আর ভীষণ আকার দিয়ে বাইরের পৃথিবীতে পাঠিয়ে এমন উপদ্রব সৃষ্টি করবার অধিকার আপনার নেই।"

মোহনেন্দু বললে, "সব কথা যদি আপনারা জানতেন!"

—"আমি জানি, এ হচ্ছে যন্ত্রমানব।"

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "যন্ত্রমানব?"

মানিক সচমকে বললে, "যন্ত্রমানব?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, ও হচ্ছে যন্ত্রমানব।"

মোহনেন্দু বললে, "তাহলেও সব কথা জানা হল না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখন যা জানা হল না, আদালতেই তা প্রকাশ পাবে।"

মোহনেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "আদালতে কি প্রকাশ পাবে মহাশয়? অর্থলোভে কে কোথায় রাহাজানি করেছে, কত মানুষকে জখম করেছে, কত বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে—কেমন এই সব তো? ওসব তো অতি সাধারণ ব্যাপার, পৃথিবীর রাম-শ্যাম, যদু-মধুর দলও তো প্রতিদিন

যা করছে, ধরা পড়ছে, জেল খাটছে! কিন্তু আদালতে কি প্রকাশ পাবে আমার বিচিত্র পরিকল্পনার পিছনে আছে উচ্চতর, মহত্তর, কোন্ উদ্দেশ্য? আদালতে বড় জোর প্রমাণিত হবে যে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে এই যন্ত্রমানব। কিন্তু সেইটেই যে বড় সত্য নয়, এটা নিজের হাতে লিখে আমি কালকেই আপনাদের জানাব। আজ আর আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না, রাম-শ্যাম যদু-মধুর মতো ধরা যখন পড়েছি, তখন আমাকে থানায় বা হাজতে বা জেলখানায় যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যেতে পারেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোবট

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে দেখলে, মানিক একমনে খবরের কাগজ পাঠ করছে।

সে শুধোলে, "কালকের ব্যাপারটা কাগজে বেরিয়েছে নাকি?"

—"বেরিয়েছে বৈকি।"

চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, "পড় তো শুনি।"

মানিক পাঠ করে যা শোনালে, তা আমাদের পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু বর্ণনার শেষে কাগজের সংবাদদাতা এই মতটুকু প্রকাশ করেছেন।

—"যন্ত্রমানব! বিলাতী পুঁথিপত্রে যখন চন্দ্রলোকের যাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করা হয়, তখন তাহা সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও আমরা সাগ্রহে পাঠ করি। বিলাতী পুঁথিপত্রে যন্ত্র-মানবদের লইয়াও বহু আলোচনা হইয়াছে এবং সে-সব আলোচনাও আমরা অল্প উপভোগ করি নাই। মাঝে মাঝে এ-সংবাদও পাঠ করা যায় যে, পাশ্চাত্যদেশের যান্ত্রিকরা সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন কলের মানুষ নির্মাণ করিয়াছে এবং তাহারাও সাহায্য করিতেছে সত্যকার মানুষদের নানা কার্যে। কিন্তু সে-সব যন্ত্রমানুষ আসলে খেলাঘরের কলে দম-দেওয়া পুতুলের উন্নততর ও বৃহত্তর সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

কিন্তু কল্পনায় যন্ত্রমানুষকে প্রায় আসল মানুষের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন সর্বপ্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়ার কারেল ও জোসেফ ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল, প্রায় একত্রিশ বছর আগে। তাঁদের একখানি পৃথিবীবিখ্যাত নাটক, প্রতীচ্যের দেশে দেশে তাহার অভিনয় হয়। ক্যাপেক ভ্রাতৃযুগল তাঁদের কল্পনায় সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের নাম রাখিয়াছিলেন "রোবট"। ক্রমে ঐ রোবট কথাটি এতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, যন্ত্রমানুষ বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক ইংরেজী অভিধানেই 'রোবট' শব্দটি স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বাস্তব জগতে এই রকম প্রায় মানুষের সমকক্ষ রোবট প্রস্তুত করিয়া একজন বাঙালী অপরাধী যে এমনভাবে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবে, এটা ছিল আমাদের নিরঙ্কুশ কল্পনার অতীত! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মোহনেন্দু নিজের অপূর্ব প্রতিভাকে সৎপথে চালনা করিয়া দেশের ও দশের কাছে ধন্যবাদভাজন হইতে পারিল না।"

জয়ন্ত বললে, "রিপোর্টারের একটু ভুল হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সবাই জানে, অনেক বিষয়েই প্রায় মানুষের সমকক্ষ—এমন কি কোন ক্ষেত্রে মানুষেরও চেয়ে কার্যকর—রোবট প্রস্তুত করা অনায়াসেই সম্ভবপর। এই হালেই এ সম্বন্ধে এক একটি টাটকা খবর পাওয়া গেছে। সেদিন তোমার কাছে আমি ক্যানাডার Defence Research Board-এর চেয়ারম্যান ডক্টর এইচ এম সোল্যান্ডের কথা তুলেছিলুম মনে আছে?"

মানিক বললে, "আছে।"

—"তিনি কি বলেন শোনো: 'প্রথম মহাযুদ্ধে যেমন অশ্বের স্থান অধিকার করেছিল 'ট্যাঙ্ক', ভবিষ্যতের যুদ্ধে পদাতিক সৈন্যদের স্থান দখল করবে তেমনি রোবটরাই। তাদের থাকবে কৃত্রিম শ্রবণ, দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের শক্তি এবং তারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও করতে পারবে। তারা জলে জাহাজ আর শূন্যে বিমান চালাবে, রিপোর্ট লিখবে ও রেডিওর সাহায্যে

নির্দেশ গ্রহণ করবে। আমাদের সৈনিকরা শত্রুদের অগ্নিবর্ষণের ফলে অশান্ত বা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে না। তারা হবে 'ইলেকট্রনিক' স্নায়ু আর স্মৃতিশক্তির অধিকারী।' এও প্রকাশ পেয়েছে যে, ডক্টর সোল্যান্ড এ-রকম যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করবার পদ্ধতি জানেন এবং এঞ্জিনিয়াররা সেই পদ্ধতিতে কাজ করলেই তা সম্ভবপর হবে।"*

মানিক বললে, "আচ্ছা জয়ন্ত, তুমি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলে যে ঐ ঘটনাগুলো হচ্ছে যন্ত্রমানুষের কীর্তি?"

—"প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।"

—"কেমন করে?"

—"যা অপ্রাকৃত বা অলৌকিক, তা আমি বিশ্বাস করি না, তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে চাই। মানুষ বা অন্য কোন জীব-জন্তুর চোখে মোটরের 'হেডলাইটে'র মতো আলো জ্বলতে পারে না। ধরে নিলুম ওটা যান্ত্রিক কৌশল। তারপর একসঙ্গে একই কণ্ঠে বহু কণ্ঠের ধ্বনি, ওটাও জীবজগতে অসম্ভব। সুতরাং ধরে নিলুম, মূর্তিটার লোহার আবরণের তলায় আছে ফোনোগ্রাফের মতো কোন রেকর্ড করবার যন্ত্র—যা একসঙ্গে নানা কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তারপর মূর্তিটার আপাদমস্তক লৌহ আচ্ছাদনে ঢাকা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল পাশ্চাত্য দেশের রোবটদের কথা। কিন্তু এখনো আমার সব প্রশ্নের উত্তর পাইনি, তাই মোহনেন্দু লিখিত স্বীকার-উক্তির জন্যে অপেক্ষা করছি। ঐ যে, সিঁড়ির উপরে সুন্দরবাবুর ভারী ভারী পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি, দেখি উনি কি সমাচার বহন করে আনছেন।"

সুন্দরবাবুর প্রবেশ...জয়ন্ত শুধোলে, "মোহনেন্দু স্বীকার-উক্তি লিখে দিয়েছে?"

খানকয় কাগজ টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই নাও। বাব্বাঃ, কী কাণ্ড!"

কাগজগুলো তুলে নিয়ে জয়ন্ত পড়তে বসল!

নবম পরিচ্ছেদ

মোহনেন্দুর কথা

আপনারা কেউ ভাববেন আমি চোর, কেউ ভাববেন আমি রাহাজান, কেউ ভাববেন আমি ডাকাত এবং কেউ বা ভাববেন আমি ওদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব।

নিজেকে সাধু বলে প্রচার করতে চাই না, তবে আমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আমি ওদের কারুরই দলের লোক নই।

---

* "According to Dr. H.M. Solandt Chairman of the Canadian Defence Research Board, *Robots* will replace the infantry "Foot-sloggers" in the next war just as the tank replaced the horse in World War I. Instead of Tomy Atkins, 'Private Robot', equipped with artificial hearing, sight, touch, smell, sensitivity to pressure changes and the ability to make decisions, will fire the gun, man the ships and fly the planes, sending reports and receiving orders by radio. Dr. Solandt and his soldiers will remain cool and collected under heavy fire. Dr, Solandt, already knows how to produce such men and it only remains for engineers to build them. They will have electronic nerves and memories."

ক্যাপেকদের R. U. R. নাটক পাঠ করে সর্বপ্রথমে এদিকে আমার মন ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার পর পাশ্চাত্য দেশের নানা বিশেষজ্ঞের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হই। ক্রমে খবর পাই ওদেশে সত্যসত্যই কেউ কেউ যন্ত্রমানুষ তৈরি করেছেন; তারা ক্যাপেকদের কল্পিত রোবটদের মতো অতটা উন্নত না হলেও তাদের কার্যকলাপ দেখে জনসাধারণ বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি।

কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তারই উপরে নির্ভর করে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হলুম, কারণ আধুনিক যন্ত্র-যুগে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। সেখানে সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল থেকে বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্যাবিশারদদের অধীনে শিক্ষালাভ ও হাতে-নাতে কাজ করে ফিরে আসি আবার বাংলাদেশে। বলে রাখা উচিত, ঐ সময়ের মধ্যে আমি বিজ্ঞানের আরো নানা বিভাগে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেছি।

তারপর কত গভীর চিন্তা, কত প্রাণপণ সাধনা, কত দুরূহ পরীক্ষা আর বার বার ব্যর্থতার পর আমার আদর্শানুযায়ী যন্ত্রমানব সৃষ্টি করলুম, এখানে তার দীর্ঘ ইতিহাস দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

সফল হয়ে বেড়ে উঠল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কথায় আছে, "আশাবধিং কো গতঃ"— আশার শেষ নেই। আর তাই-ই হল আমার পতনের কারণ। ভাবলুম, সৃষ্টি করব দলে দলে এমন যন্ত্রমানুষ—যাদের সংখ্যা কেউ গুণে উঠতে পারবে না, যারা সত্যিকার মানুষের চেয়ে হবে ঢের বেশি শ্রমশীল, আজ্ঞাপালক ও কষ্টসহিষ্ণু। সেই সব নকল মানুষের সাহায্যে আমি আসল মানুষের সমাজকে অধিকতর উন্নত ও শ্রীমন্ত করে তুলব।

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হল আমার কাল। কারণ প্রথম যন্ত্রমানুষ তৈরি করবার জন্যে আমাকে বিবিধ পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত হতে হয়েছিল এবং তাইতেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আমার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশই। দলে দলে নূতন যন্ত্রমানুষ প্রস্তুত করতে গেলে দরকার হবে প্রচুর টাকা। সে টাকা পাব কোথায়?

সেই সময়েই আমার মাথায় আসে যন্ত্রমানুষের সাহায্যে রাহাজানি করবার দুর্বুদ্ধি। স্থির করলুম যে সব অবাঙালী বাংলার রক্তশোষণ করতে আসে, তাদের পিছনে যন্ত্রমানুষকে লেলিয়ে দিয়ে যোগাড় করব আমার মূলধন। তারপর সেই টাকায় নূতন নূতন যন্ত্রমানুষ তৈরি করে তাদের নিযুক্ত করব বাংলাদেশের গঠনমূলক কার্যে। রাহাজানির জন্যে যে পাপ হবে, সে পাপ ক্ষালন করব স্বদেশের মঙ্গলসাধন করে, এই ছিল আমার যুক্তি। হয় তো এই যুক্তি ভুল। সাফল্যের গর্বে আগে তা বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। সমাজবিরোধী কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গলসাধন হয় না।

এখন আমার সৃষ্ট যন্ত্রমানুষের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা সংক্ষেপে বলব।

এর শরীরের অধিকাংশই ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এর পায়ের তলায় আছে 'রোলার'—সমতল মেঝের উপর দিয়ে বেগে ছুটবার জন্যে। এ চিন্তা করতে পারে। এর মধ্যে খানিকটা 'ব্রেন টিস্যু' রাখবার ব্যবস্থা করেছি— তবে মানুষের মতো এর মাথার ভিতরে তা থাকে না, থাকে তামার আধারে বুকের ভিতরে। এর স্মৃতিশক্তি আছে।

এর দুই চক্ষুর জায়গায় যে দুটো অগ্নিশিখা আছে, সে দুটো সত্য-সত্যই কেবল 'হেড-লাইটে'র কাজ করে—ওর আসল চোখগুলো আছে পূর্বকথিত ঐ তামার মস্তিষ্ক-বাক্সের মধ্যে এবং সংখ্যায় তারা দশটি। ঐ তামার আধার বা বাক্সটিই হচ্ছে প্রায় এর সর্বস্ব, কারণ ঐখানেই মস্তিষ্ক ও চোখের সঙ্গে আছে ওর শ্রবণযন্ত্র ও ঘ্রাণযন্ত্রও! আপনাদের অজ্ঞ সেপাইরা যন্ত্রমানুষের

প্রাণপদার্থের মতো ঐ তামার বাক্সটিই গুলি ছুঁড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ধাতু দিয়ে একটা ছোট বা বড় পুতুল গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়, কিন্তু প্রাণপদার্থ নষ্ট হলে নষ্ট হয় তার সর্বস্বই।

যন্ত্রমানুষ একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে বটে, কিন্তু কথা কইতে পারে না। তবে সে কানে যা শোনে 'রেকর্ড' করতে পারে এবং সেইজন্যই তার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম তার-জড়ানো একটি কাঠিম আছে। সে আঁক কষতে পারে, হিসাব রাখতে পারে, ফোনে ডাক এলে 'রিসিভার' ধরতে পারে। সে করতে পারে আরো অনেক কিছুই।

আমার হুকুম দেবতার হুকুম বলে মানতে বাধ্য। কিন্তু কল-কব্জার কথা জোর করে কিছুই বলা যায় না। যাতে হঠাৎ অবাধ্য হয়ে সে কোন অকার্য-কুকার্য করতে না পারে, সেইজন্যে তারও উপায় রেখেছি আমার নিজের হাতেই। পকেট-ক্যামেরার মতো ছোট্ট একটি জিনিস সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। যন্ত্রমানুষ যত দূরেই যাক না কেন, সে আমার মতবিরুদ্ধ কোন কাজ করলেই আমি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ জানতে পারব এবং বহুদূর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে কল টিপে হরণ করব তার সকল শক্তিই।

আরো অনেক কথাই বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না এইজন্যে যে, বিশেষজ্ঞ ছাড়া সে-সব অন্য কেউ বুঝতে পারবেন না। আর বলেই বা কি হবে? আমার আশার স্বপন তো ভেঙে গিয়েছে, এখন দিন-রাত কেবল চোখের সামনে দেখছি, খোলা রয়েছে কারাগারের দ্বার।

একপাটি জুতো

এক

জয়ন্তকে ঠিক সাধারণ গোয়েন্দা বলা চলে না; কারণ গোয়েন্দাগিরি তার পেশা নয়, তার নেশার মতো। শখের খাতিরে মানুষ অনেক কাজই করে, সেও করে গোয়েন্দাগিরি।

সাধারণতঃ পেশাদার গোয়েন্দার মতো স্বাধীনভাবে কোন মামলায় হাত দেবার জন্যে সে আগ্রহ প্রকাশ করত না। অধিকাংশ মামলাতেই সে পুলিসের—বিশেষ করে সুন্দরবাবুর সহযোগী পরামর্শদাতা রূপেই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। নিজে আড়ালে থেকে সে পুলিসকে সাহায্য করত, জনসাধারণ তার নাম পর্যন্ত জানতে পারত না।

এর আগে যে কাহিনীটি আপনারা পাঠ করলেন, তার মধ্যে আছে বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহ, উত্তেজনার পর উত্তেজনা, হানাহানি এমন কি রক্তপাতও বাদ যায়নি। কিন্তু চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমারোহের জন্যেই গোয়েন্দা-কাহিনী সমাদৃত হয় না। গোয়েন্দা যদি উচ্চশ্রেণীর মনীষার অধিকারী হন, তবে কাহিনীর সাধারণতা বা অসাধারণতার উপর কিছুই নির্ভর করে না। শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার আখ্যানবস্তু অসামান্য না হলেও পাঠকের আগ্রহ ও ধীশক্তি অনায়াসেই পরিতৃপ্ত করতে পারে।

কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা হচ্ছেন শার্লক হোমস। তাঁর কোন কোন মামলার আখ্যানবস্তু মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবু সেগুলি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে কেবল শার্লক হোমসের বিচিত্র মনীষার প্রসাদেই। ভালো গোয়েন্দাকাহিনী পাঠ করবার সময়ে রীতিমত মস্তিষ্কের অনুশীলন না করলে চলে না। কেবল চিত্তোত্তেজক ঘটনার জন্যে যাঁরা গোয়েন্দাকাহিনী রচনা ও পাঠ করেন, তাঁরা হচ্ছেন নিম্নশ্রেণীর লেখক ও পাঠক।

মাঝে মাঝে দৈবক্রমে জয়ন্তকে এমন কোন কোন মামলাতেও হাত দিতে হয়েছে, যার মধ্যে চমকদার ঘটনাও নেই এবং পুলিসেরও আবির্ভাব ঘটেনি। এমন সব ঘটনা সর্বত্রই ঘটে, তা নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামায় না কেউ। কিন্তু তেমন সব কাহিনীও যে গোয়েন্দার কৃতিত্বের গুণে

চিত্তরোচক হয়ে উঠতে পারে, অতঃপর সেই শ্রেণীর একটি ঘটনার কথাই বর্ণনা করব।

দুই

প্রভাতী ভ্রমণ সেরে বাড়িমুখো হয়েছে জয়ন্ত ও মানিক। রাস্তা দিয়ে তারা গল্প করতে করতে আসছে, হঠাৎ একখানা বাড়ির দোতলা থেকে ডাক এল—"ও জয়ন্ত, ও মানিক!"

তারা মুখ তুলে দেখে, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরাতন বন্ধু নবীনচন্দ্র। সে জমিদার। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জমিদারীতে শিকার করতে যায়।

জয়ন্ত বললে, "কি খবর নবীন?"

নবীন বললে, "তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বোসো। আমি যাচ্ছি।"

বৈঠকখানায় ঢুকেই জয়ন্তের হুঁশিয়ার চোখ দেখলে দুটো ব্যাপার। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে মেঝের উপরে। এবং পূর্বদিকের জানালায় একটা গরাদ নেই, সেটাকে কে খুলে মেঝের উপরে ফেলে রেখেছে। জানালার কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, জানালার তলাকার কাঠের ফ্রেমে বাটালি বা কোন অস্ত্র চালিয়ে কেউ স্থানচ্যুত করেছে গরাদটাকে।

সে ফিরে বললে, "মানিক, এই ঘরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নবীন বোধ হয় সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।"

"ঠিক আন্দাজ করেছ জয়ন্ত! সেইজন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি বটে।" বলতে বলতে নবীন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

আসন গ্রহণ করলে সকলে। বেয়ারাকে চা, টোস্ট ও এগপোচ আনবার হুকুম দিয়ে নবীন বললে, "কাল রাতে এই ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে। গুরুতর চুরি নয়, তোমার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই মনে হবে। চুরি গিয়েছে আমার একটা রেডিও-যন্ত্র!"

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, "তোমার ঘরে রেডিও-যন্ত্র!"

নবীন হেসে বললে, "হ্যাঁ মানিক! তোমরা সকলেই জানো, রেডিওর একটানা একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি আমার ধাতে সহ্য হয় না, তাই এত দিন এ বাড়িতে ও-উপদ্রবের ছিল না কোন ঠাঁই। কিন্তু বড় মেয়েটা রেডিওর জন্যে এমন বিষম আব্দার ধরেছে যে, কাল বৈকালে নগদ আটশত পঞ্চাশ টাকা মূল্য দিয়ে একটা বেতার যন্ত্র না কিনে এনে আর পারা গেল না। যন্ত্রটা ঐ টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু চোর তাকে এখানে রাত্রিবাসও করতে দেয়নি।"

জয়ন্ত বললে, "চোর এসেছে ঐ গরাদটা খুলে?"

—"হ্যাঁ।"

—"পূর্বদিকের ঐ সরু গলিটা কি?"

—"মেথর আসবার পথ। চোর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ গলিতে দাঁড়িয়ে ফ্রেম কেটে গরাদ খোলবার সুযোগ পেয়েছিল।"

—"ঘড়িটা মেঝের উপর নামানো কেন?"

—"ওটাও চোরের কীর্তি। তার ইচ্ছা ছিল ঘড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরের ভিতরে সন্দেহজনক শব্দ শুনে বেয়ারা এসে পড়ায় সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সে নিজের একপাটি জুতোও নিয়ে যেতে পারেনি।"

এইবারে জয়ন্ত কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, "জুতো? কোথায় সেই জুতো?"

—"ঐ যে, জানালার তলাতে পড়ে রয়েছে।"

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিলে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, "নবীন, এ হচ্ছে এমন কোনো লোকের জুতো, যার পদতল বিকৃত, জুতোর বেডৌল গড়ন দেখেই তা ধরা যায়। বাটার কারখানায় তৈরি সস্তা দামের ছয় নম্বরের রবারের জুতো। এর ভিতরে সাদা কি রয়েছে দেখছ?"

—"বোধ হয় গুঁড়ো চুন।"

জয়ন্ত কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালে, না।

বেয়ারা চা প্রভৃতি নিয়ে এল এমন সময়ে।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, "বেতারযন্ত্রটা কাল রাতে এই টেবিলের উপরে ছিল তো? বেশ, আমি এইখানে বসেই চা পান করব।"

জয়ন্ত নীরবে চা ও খাবার খেতে খেতে উত্তরদিকে জানালাগুলো দিয়ে বারংবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

তিন

পানাহার শেষ করে জয়ন্ত বললে, "নবীন, তোমার বাড়িতে বেতারের গণ্ডগোল কেউ কোন দিন শোনেনি, এ বাড়িতে ঐ উপসর্গ আছে, বাইরের লোক এমন সন্দেহ করতে পারবে না। অথচ যেদিন তুমি রেডিও-যন্ত্র কিনেছ, ঠিক সেই দিনই তা চুরি হয়ে গেল। সুতরাং বেশ বোঝা যায়, এ হচ্ছে পাড়ার কোন সন্ধানী চোরের কাণ্ড। যন্ত্রটা সে বৈকালেই রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিল।"

নবীন বললে, "কিন্তু সে যে কে, বুঝতে পারব কেমন করে?"

—"এখান থেকে রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি দুখানা বাড়ি। ও বাড়ি দুখানা কাদের?"

—"লাল বাড়িখানায় থাকেন হাইকোর্টের এক উকিল। পাশের হলদে বাড়িখানা ভাড়াটে। একখানা কি দুখানা ঘর নিয়ে ওখানে বাস করে ছয়-সাতটি পরিবার। আমাদের সরকারবাবুও থাকেন ঐ বাড়ির দোতলায়।"

—"বটে, বটে! একবার তাঁকে এখানে আসতে বলবে?"

অবিলম্বে সরকারবাবুর প্রবেশ। জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার নাম?"

—"শ্রীবিনয়কুমার প্রামাণিক।"

—"সামনের ঐ বাড়িতে আপনি কতদিন বাস করছেন?"

—"প্রায় তিন বৎসর।"

—"ওখানকার আর সব ভাড়াটেকে আপনি চেনেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই।"

—"দোতলায় আপনার সঙ্গে থাকেন কারা?"

—"পরিবার নিয়ে আর তিনটি ভদ্রলোক।"

—"তাঁদের পেশা?"

—"দুজন কেরানী, একজন স্কুল-মাস্টার।"

—"নিচেয় কারা থাকেন?"

—"সবাই পূর্ববঙ্গের লোক।"

—"তাঁরা কি কাজ করেন?"

—"বেশির ভাগ লোকই কাটা-কাপড়ের ব্যবসা করে। একজন কেবল শাঁখারীদের দোকানের কারিকর।"

—"নাম জানেন?"

—"হ্যাঁ! দুলাল।"

—"বিনয়বাবু, একটা কাজ করুন। দয়া করে দুলালকে একবার এখানে ডেকে আনুন। তাকে বলবেন, নবীনবাবুর স্ত্রী দুডজন শাঁখা কিনতে চান তিনিই তাকে ডেকেছেন।"

—"যে আজ্ঞে।"

সরকারের প্রস্থান। নবীন বিস্ময়ে বললে, "তোমার এ কি অদ্ভুত খেয়াল, জয়ন্ত? দুডজন কি, আমার স্ত্রী একগাছাও শাঁখা কিনতে চান না।"

—"তোমার স্ত্রী আজ আলবৎ দুডজন শাঁখা কিনতে চান। তুমি জানো না।"

—"আমি জানি না, তুমি জানো?"

—"নিশ্চয়!"

—"জয়ন্ত, তুমি একটি পাগল।"

—"নবীন, তুমি একটি সুবৃহৎ হাঁদারাম।"

—"মানে?"

—"মানে এখনি বুঝতে পারবে।"

—"দেখা যাক্। কিন্তু দুডজন শাঁখার দাম দিতে হবে তোমাকেই।"

চার

ঘরের বাইরে পদশব্দ। সরকারবাবুর পিছনে একটি মূর্তির আবির্ভাব। বয়স হবে না উনিশ-বিশের বেশি। সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গী, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। পরনে আধ-ময়লা গেঞ্জী ও লুঙ্গী। খালি পা।

জয়ন্ত শুধোলে, "তোমার নাম দুলাল?"

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

জয়ন্ত লক্ষ্য করলে তার ডান পায়ের পাতা এমন ভাবে বিকৃত যে, সোজা ভাবে মাটিতে পা ফেলে সে দাঁড়াতে পারে না। তার দুই পায়েরই নিচের দিকে লেগে রয়েছে সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো!

জয়ন্ত বললে, "দুলাল, আমার কাছে এস।"

দুলাল প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল।

ফস করে সেই রবারের জুতোর পাটি বার করে জয়ন্ত শান্ত স্বরে বললে, "দুলাল, কাল রাতে তোমার একপাটি জুতো এই ঘরে ফেলে গিয়েছিলে। ফিরিয়ে নাও তোমার জুতো।"

প্রথমটা চমকে উঠে, তারপরে সবেগে মাথা নেড়ে দুলাল বলে উঠল, "ও জুতো আমার নয়!"

—"এ জুতো তোমারই। পায়ে পরে দেখ—তোমার দুমড়ানো পায়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাবে।"

দুলাল চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ধরা-পড়া চোরের মতো।

জয়ন্ত বললে, "নবীন, এই একপাটি জুতোর মধ্যেই আছে চোরের স্বাক্ষর। জুতোর ভিতরে যে সাদা গুঁড়োগুলোকে তুমি চুনের গুঁড়ো বলে ভ্রম করেছিলে, আসলে তা হচ্ছে শাঁখের গুঁড়ো।

আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। শাঁখারীরা ঠিক দুই পায়ের উপরে শাঁখ রেখে যখন করাত চালায়, তখন তাদের দুই পায়ের উপরেই ছড়িয়ে পড়ে শঙ্খচূর্ণ। দুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে

দেখ—শাঁখের পাউডার মেখে পদযুগল এখনো শ্বেতবর্ণ হয়ে রয়েছে! ওর দুই পদ জুতোর মধ্যে প্রবেশ করলে তার ভিতরেও লেগে থাকবে শাঁখের গুঁড়ো। বেডৌল জুতোর পাটি পরীক্ষা করে খুব সহজেই ধরে ফেলেছিলুম এর মালিক হচ্ছে এমন কোন শাঁখারী, যার দক্ষিণ পদতল বিকৃত। তবু যদি দুলাল এখনো অপরাধ স্বীকার না করে, তুমি অনায়াসেই পুলিসের সাহায্য নিতে পারো। এস মানিক, আমাদের এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে।''

মরণ খেলার
খেলোয়াড়

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

শ্মশানবাসী হত্যাকারী

ইটের কোটরের বাসিন্দা। গঙ্গানদীর তরঙ্গতানে শুনত কল্পনদীর গীতিময়ী আলপনা!

রোজ সেখানে যায় সন্ধ্যাবেলায়। সেদিনও মানিকের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো ভাই, সায়েবরা বলে গড়ের মাঠ হচ্ছে কলকাতার হৃদয়। হতে পারে। আমি কিন্তু এই গঙ্গাকে বলি কলকাতার প্রাণ।'

—'কারণ?'

—'জল না থাকলে প্রকৃতির রূপ পূরন্ত হয় না। এই জন্যেই কৃত্রিম বাগান গড়েও তার মধ্যে আমরা জলে-টলোমল সরোবর রাখতে চাই। কিন্তু সরোবরের জল হচ্ছে বদ্ধ। আর গঙ্গাজলে আছে গতিশীল জীবনের চঞ্চল উচ্ছ্বাস। দিনে সূর্যকরে হাজার হিরার মালা পরে গান গেয়ে নাচে। রাত্রে নীলাকাশের চাঁদতারাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেখায় স্বপ্ন-লোকের সংগীতময় পরিপুরী, অন্ধকারেও তার গভীর কল-কোলাহলে পাওয়া যায় কোনও অজানা রহস্যলোকের বাণী! এই ইট-কাঠ-পাথরের শুকনো শহরে কর্কশ চিৎকার আর শব্দের মধ্যে গঙ্গা করে চলেছে দিন-রাত নব-নব গীতিকাব্যের সৃষ্টি! এটা কি কম কথা? বাগান বা মাঠ নিত্যই এক দৃশ্য দেখায়, কিন্তু গঙ্গা দেখায়, নিত্য-নূতন সৌন্দর্য। এর এই জলকণা মাখা স্নিগ্ধ হাওয়ায় এসে দাঁড়ালে শহুরে কর্মক্লান্ত জীবন দু-দণ্ডে জুড়িয়ে যায়।'

মানিক বললে, 'কিন্তু গঙ্গাতীরকে করে রাখা হয়েছে কত কুৎসিত, তাও দেখছ তো? কিছু কিছু সবুজ ঘাস আর গাছপালা থাকলে যে জায়গা হয়ে উঠত দুর্লভ স্বর্গের মতো, সেখানে বিশ্রী লোহার লাইনের উপর দিয়ে হরদম ছুটছে কান-ফাটানো চিৎকার করে কুৎসিত রেলের গাড়ির পর রেলের গাড়ি!'

—'কলকাতা যদি ফ্রান্সের কোনও শহর হত, তা হলে গঙ্গাতীরের রূপ বদলে যেত একেবারে। অন্তত আমার বিশ্বাস তাই।'

গঙ্গাতীরের রাজপথে তখন গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে বটে, কিন্তু আজকের বাদল-সন্ধ্যায় পশ্চিমের মেঘ-মহলে এখনও সূর্যের বিদায় সভার রাঙা প্রভাটুকু মিলিয়ে যায়নি নিঃশেষে। সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত ও মানিক খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পশ্চিমে রঙের রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার-যবনিকায় অদৃশ্য হয়ে গেল, দুই বন্ধু বাড়ির পথ ধরলে।

যখন তারা প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে তখন দেখলে, ইন্‌স্পেকটার সুন্দরবাবু আর একটি লোকের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন হন্তদন্তের মতো!

মানিক বললে, 'আমাদের সুন্দরবাবু যে! বোঁ-বোঁ করে কোথায় ছুটে চলেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, কোথায় আবার? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত! যাচ্ছি জয়ন্তেরই বাড়িতে।'

জয়ন্ত বললে, 'তা এত তাড়াতাড়ি কেন?'

—'তাড়াতাড়ির কারণ আছে হে! বিষম কারণ। ভয়ানক কারণ।'

—'একটু আভাস দেবেন কি?'

—'একটু আভাস কেন, সমস্ত প্রকাশ করব। তোমার বাড়িতে চলো!'

সকলে একসঙ্গে অগ্রসর হল। জয়ন্তের বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানায় একখানা কৌচের উপর বসে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু শশাঙ্ক। বিশেষ প্রয়োজনে এঁকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।'

জয়ন্ত ও শশাঙ্ক পরস্পরকে অভিবাদন করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওরা দুই ভাই। শশাঙ্ক আর মৃগাঙ্ক। সহোদর নয়, খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই। ওরা নতুনপুরের জমিদার।

জয়ন্ত এইবারে একটু মনোযোগ দিয়ে শশাঙ্ককে দেখতে লাগল। মাথায় ছয় ফুট লম্বা, মস্ত চ্যাটালো বুক, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি খুব বলবান এবং বড়ো-ঘরের ছেলে। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উশকোখুশকো, চোখে-মুখে ভয়-দুর্ভাবনার ভার এবং বেশভূষা ছন্নছাড়ার মতো।

জয়ন্ত বেশ বুঝলে, সুন্দরবাবু স্বয়ং যখন এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকটিকে নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এসে হাজির হয়েছেন, মামলাটি তখন সামান্য নয়।

সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'নতুনপুর আমি চিনি। সে তো কলকাতার খুব কাছেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কলকাতা থেকে বিশ-বাইশ মাইল হবে।'

—'এখন প্রয়োজনটা কী শুনি?'

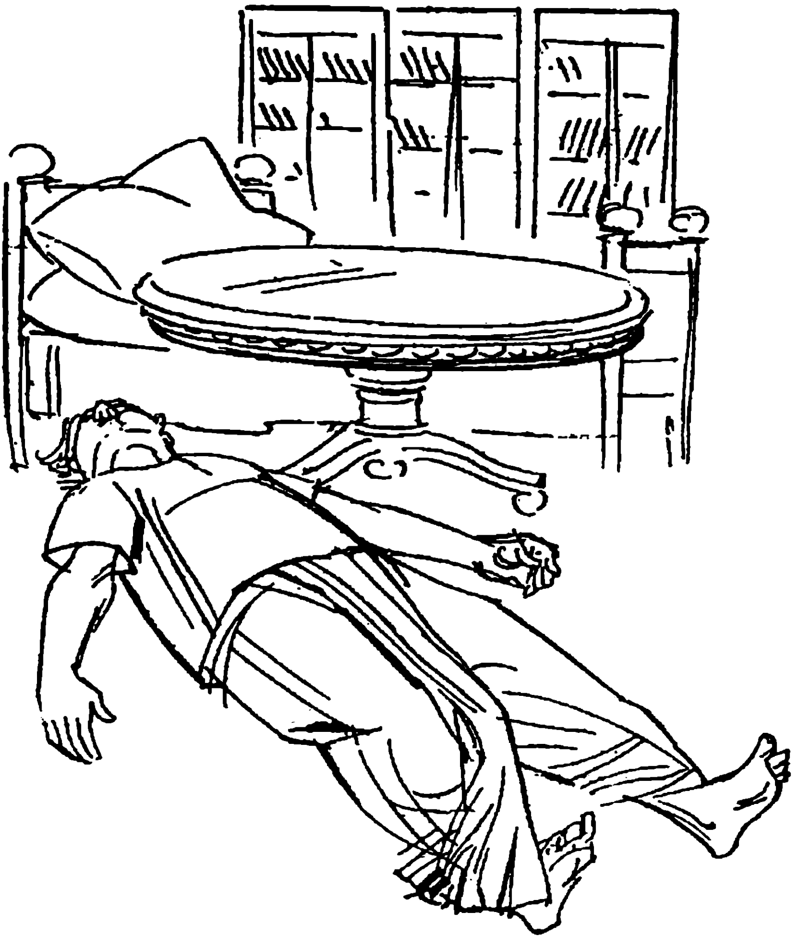

—'কাল শেষ-রাতে শশাঙ্কের ছোটোভাই মৃগাঙ্ককে কে খুন করে গেছে।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'খুনি তা হলে ধরা পড়েনি?'

—'না। খুনি ধরা পড়লে শশাঙ্ক নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসত না।'

—'কিন্তু নতুনপুরে পুলিশ থাকতে উনি আমার কাছে এলেনই বা কেন? সাধারণ খুনের পক্ষে সাধারণ পুলিশই যথেষ্ট।'

শশাঙ্ক ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'না জয়ন্তবাবু, পুলিশই যথেষ্ট নয়। মৃগাঙ্কের এই অপঘাত-মৃত্যুতে আমার বুক ভেঙে গেছে! যত শীঘ্র সম্ভব, এই দুরাত্মা হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দিতে না পারলে প্রাণ আমার শান্ত হবে না। শুনেছি, অপরাধী আবিষ্কার করবার শক্তি আপনার অসীম। আমার বিশ্বাস, আপনার সাহায্য পেলে পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি এ মামলার কিনারা করতে পারবে।'

—'আমার সম্বন্ধে মহাশয়ের উচ্চ ধারণা দেখে গর্ব অনুভব করছি। বেশ, তা হলে সমস্ত ঘটনা আমার কাছে খুলে বলুন।'

শশাঙ্ক বললে, 'আপাতত আমার মুখ থেকে আপনি বেশি কিছু জানতে পারবেন না। কারণ আমি নিজেই অন্ধকারে পড়ে আছি। ....আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বড়ো বাগান আছে। সেই বাগানের ধারেই দোতলায় আমার আর মৃগাঙ্কের ঘর। পাশাপাশি নয়, মাঝে আরও চারখানা ঘর আছে। কাল রাত বারোটা পর্যন্ত জমিদারি কাগজপত্র নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তারপর ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এল, আমিও শুতে গেলুম। ভোরবেলায় জেগেই শুনি বাড়ির ভিতরে মহা গোলমাল কান্নাকাটি উঠেছে। ঘর থেকে বেরুতেই দাসী ছুটে এসে বললে, ছোটোবাবুকে কে খুন করে গেছে! আমি তো হতভম্ব, বিশ্বাসই হল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি মৃগাঙ্কের ঘরে গিয়ে স্বচক্ষে যে শোচনীয় দৃশ্য দেখলুম তা মনে করে এখনও আমার বুক শিউরে উঠছে! ঘরের মেঝেতে মৃগাঙ্কের দেহ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, তার গলায় কতকগুলো আঙুলের দাগ। দেখলেই বোঝা যায়, কেউ তাকে নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করেছে।

জয়ন্ত বললে, 'মৃগাঙ্কবাবু কি বিবাহ করেননি? তাঁর ঘরে কি আর কেউ ছিল না?'

—আমি বিপত্নীক আর মৃগাঙ্ক বিবাহ করেনি!'

—'খুনি কী করে বাড়ির ভিতর এল?'

—'পুলিশের মত হচ্ছে, খুনি খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল।'

—'আপনাদের খিড়কির দরজা কি বন্ধ থাকে না?'

—'থাকে। তবে ঘটনার পরদিন—অর্থাৎ আজকে সকালে দরজা খোলা অবস্থাতেই পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, খুনি পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে পালাবার সময়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

—'সম্ভব।'

—'কিন্তু পুলিশের মত হচ্ছে অন্যরকম। পুলিশ বলে, খুনি খোলা খিড়কির দরজা দিয়েই বাগানে ঢুকেছিল।'

—'পুলিশের এমন মতের কারণ কী?'

—'খিড়কির দরজার ওপরে অনেকগুলো পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে।'

জয়ন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'পায়ের দাগ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেছি তো, কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। পথের পুরু কাদায় অনেক পায়ের

দাগ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সেই পদচিহ্ন পরীক্ষা করে বলেছে, খুনি সিধে এসে খোলা খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানের ভিতর ঢুকেছে। পুলিশ আরও অনেক আশ্চর্য কথা বলছে।'

—'কী রকম?'

—'আমাদের বাড়ির খিড়কি থেকে নতুনপুরের শ্মশান পর্যন্ত একটা সরু কাঁচা পথ আছে। পথটা আমাদের জমির উপর দিয়ে গিয়েছে। এ-পথ দিয়ে বড়ো-একটা লোক-চলাচল নেই। পুলিশের মতে খুনি শ্মশান থেকে ওই পথ দিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে এবং খুন করে ওই পথ দিয়েই আবার শ্মশানে ফিরে গেছে।'

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বাপ রে, হুম! শ্মশান থেকে আগমন, শ্মশানেই প্রস্থান? খুনি কি তবে মানুষ নয়?'

শশাঙ্ক বললে, 'পুলিশের মতে, খুনির দলে আরও একজন লোক ছিল।'

জয়ন্ত বললে, 'তা হলে তো অনেক কথাই জানা গিয়েছে দেখছি। আচ্ছা, আপাতত আবার ঘটনাস্থলে ফিরে আসা যাক। খিড়কি দরজা দিয়ে খুনিরা বাগানে ঢুকেছে। বাগানে তাদের পায়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে?'

—'না! বাগানের পথে লাল কাঁকর ঢালা। সেখানে পায়ের ছাপ পড়ে না।'

—'বাগান থেকে বাড়িতে ঢোকবার জন্যে নিশ্চয়ই কোনও দরজা আছে?'

—'আছে। কিন্তু সে দরজা ঘটনার পরেও বন্ধ ছিল। খুনিরা নিশ্চয়ই অন্য কোনও উপায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'তারা মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে ঢুকল কেমন করে?'

—'মৃগাঙ্কের একটা বদ-অভ্যাস ছিল। গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালের গুমোটের সময়ে সে ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করত না।'

—'জমিদার-বাড়িতে অনেক লোকজন থাকাই স্বাভাবিক। কেউ খুনিদের সাড়া পেয়েছে?'

—'কেউ না। তারা এসেছে-গিয়েছে যেন ছায়ার মতো নীরবে।'

—'মৃগাঙ্কবাবুর ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়েছে?'

—'একটা কুটোও না।'

—'তবে তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্য কী? কারুর সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল?'

শশাঙ্ক অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আমার মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, শুনুন। নতুনপুরের শ্মশানে কালভৈরবের একটি পুরানো মন্দির আছে। আমাদেরই মাহিনা-করা এক পূজারি রোজ সেখানে পূজা করে আসে। দিন-তিনেক আগে পূজারি সেখানে গিয়ে দেখে, কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে সেই মন্দির দখল করে বসেছে। বলে, এবার থেকে সেইই হবে সেখানকার সেবাইত, আর কারুকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না। পূজারি এসে আমাদের কাছে নালিশ জানায়। এ হচ্ছে পরশু সকালের কথা। মৃগাঙ্ক ভারী রাগি মেজাজের লোক ছিল। সে তো তখনই খেপে উঠে শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসীকে ধরে খুব মারপিট করে বলে, 'কাল থেকে তোকে যদি এখানে দেখতে পাই, তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব।' সন্ন্যাসী পরশু রাত্রেই অদৃশ্য হয়, কিন্তু যাবার সময়ে নাকি অভিশাপ দিয়ে যায়, তেরাত্রি পোয়াবার আগে সে অপরাধের প্রতিশোধ নেবে!'

—'তা হলে আপনার বিশ্বাস, এই খুনের মূলে আছে সেই সন্ন্যাসীই?'

—'বিশ্বাস নয়, সন্দেহ।'

—'সন্ন্যাসীকে নতুনপুরের কেউ চেনে না?'

—'না, লোকে তাকে সেই প্রথম দেখলে।'

—'তা হলে সে কেমন করে আপনাদের বাড়ির পথ-ঘাট চিনলে? কেমন করে জানলে, মৃগাঙ্কবাবু কোন ঘরে শয়ন করতেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।'

—'আপনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে, এখন আগে আমাদের দরকার, আপনাদের বাড়িটা দেখা। মোটরে নতুনপুর যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। সুন্দরবাবুও কি আমাদের সঙ্গের সাথি হবেন?'

—'হুম না! ছুটি নেই। পারি তো পরে যাব!......আর সত্যি কথা বলতে কী, খুনি যেখানে শ্মশান থেকে আসে আর শ্মশানে ফিরে যায়, সেখানে তোমরা কেউ আমাকে পাবার আশা কোরো না!'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

শব-সাধনায় বিশ্বাসী শশাঙ্ক

বড়ো বড়ো চারিটি মহল ও মস্ত বাগান নিয়ে নতুনপুরের জমিদারবাড়ি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘে জমি দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। বহুকালের পুরাতন অট্টালিকা, নিয়মিত সংস্কার-অভাবে মলিন ও জীর্ণ। অধিকাংশ ঘরই অন্ধকার, মাঝে-মাঝে দূরে দূরে মিটমিট করে কেরোসিনের আলো জ্বলছে, অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই সব লক্ষ করে জয়ন্ত ও মানিক মনে মনে বুঝলে, শশাঙ্কবাবু জমিদার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়।

শশাঙ্ক তাদের নিয়ে আগে গেল বাগানের ভিতরে। বাগান বলতে আমরা যা বুঝি, একে তা বলা যায় না। ছোটো-ছোটো ফুলগাছের চারা সেখানে নেই বললেই হয়, মান্ধাতার আমলের বুড়ো-বুড়ো অশ্বত্থ-বট-আম-জাম-কাঁঠাল-তাল-নারিকেল গাছ যেখানে-সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রীতিমতো অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। 'ইলেকট্রিক টর্চের' আলো ইতস্তত চালনা করে জয়ন্ত ও মানিক দেখলে প্রকাণ্ড একটা পুকুরে সবুজ পানার চাদর ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে চক্-চক্ করছে কালো জল।

মানিক বললে, 'শশাঙ্কবাবু, আমি তো দেখছি আপনারা দস্তুরমতো ম্যালেরিয়ার চাষ করেন। ওই পুকুরে রোজ কত লক্ষ মশার জন্ম হয়, তার হিসাব রেখেছেন?'

শশাঙ্ক ম্লান হেসে বললে, 'আজ আমাদের ভগ্নদশা। শুনেছি আগে আমাদের বাৎসরিক আয় ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই আয় এখন দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক বিশ হাজারে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'মৃগাঙ্কবাবু যখন বিবাহ করেননি, তখন তাঁর সম্পত্তি তো আপনিই পাবেন?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু ভাইকে হারিয়ে সম্পত্তি আমার বিষের মতন মনে হচ্ছে। মৃগাঙ্কের বউ-ছেলে থাকলেই আমি খুশি হতুম।'

পায়ে-পায়ে সকলে খিড়কির সামনে এসে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক দরজার পাল্লা খুলে বললে, 'এইখানে পদচিহ্ন পাওয়া গেছে।'

জয়ন্ত মাটির উপরে আলো ফেলে পরীক্ষা করে বললে, 'আজ দিনের বেলাতেও এখানে বৃষ্টি হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ, খুব জোরে।'

—'দেখতেই পাচ্ছি। সমস্ত চিহ্ন প্রায় ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। আমারই দুর্ভাগ্য! ও-গুলো দেখতে পেলে উপকার হত। শশাঙ্কবাবু, আজ হাজার-হাজার বৎসর ধরে ওই পদচিহ্নই হাজার-হাজার চোর-ডাকাত-খুনিকে ধরিয়ে দিয়ে আসছে। যাঁদের চোখ আর মস্তিষ্ক শিক্ষিত, পদচিহ্নের ভিতর থেকে তাঁরা বহু গুপ্ত ইতিহাস আবিষ্কার করতে পারেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'তাই তো শুনেছি। কিন্তু ভাববেন না; পুলিশের কাছ থেকে আপনি পদচিহ্নের অনেক কথাই জানতে পারবেন।'

—'নিজের চোখে দেখায় আর পরের মুখে শোনায় যথেষ্ট তফাত। তবু এও মন্দের ভালো। এখানে তদারক করতে এসেছিলেন কে?'

—'থানার এক সাব-ইন্‌স্পেকটার। নাম কুমুদবাবু। বয়স অল্প, কিন্তু উৎসাহ তাঁর অসীম।'

—'কাল সকালেই তাঁর কাছে নিয়ে গেলে খুশি হব। এখন চলুন আপনার বাড়ির দিকে।'

বাড়ির কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'বাগান থেকে বাড়িতে ঢোকবার দরজা কোথায়?'

—'ওইখানে। কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, খুনি ও-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেনি! খুনের পরেও ও-দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বাড়িখানাকে বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বললে, 'মানিক, তুমি শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা কও। ততক্ষণ আমি বাড়িখানাকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসি।'

জয়ন্ত চলে গেল।

শশাঙ্ক বললে, 'মানিকবাবু, আপনার বন্ধুর নাম-ডাক তো খুব শুনি। আপনার কি মনে হয়, উনি এ-মামলার কিনারা করতে পারবেন?'

—'জয়ন্ত এর চেয়ে ঢের শক্ত মামলার কিনারা করেছে।'

শশাঙ্ক আর কিছু বললে না।

মিনিট-পনেরো পরে জয়ন্ত বাড়ির অন্য দিক দিয়ে ফিরে এল। তাকে ঘন-ঘন নস্য নিতে দেখে মানিক আশ্বস্ত হল। কারণ সে জানে, কোনও দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে ঘন-ঘন নস্য নেয় তার বন্ধু।

জয়ন্ত এসে বললে, 'শশাঙ্কবাবু, আপনার যে পূর্বপুরুষ এই বাড়িখানা তৈরি করেছিলেন তিনি খুব হুশিয়ার ব্যক্তি।'

—'এ-কথা কেন বলছেন?'

—'চারিদিকে আমি নিজে বার-বার চেষ্টা করে দেখলুম, কিন্তু বাহির থেকে কোনও কৌশলেই উপরে উঠতে পারলুম না।'

—'তা হলে খুনি কেমন করে বাড়ির দোতলায় উঠল?'

জয়ন্ত সহজ স্বরেই বললে, 'বাড়ির-ভিতর থেকে খুনের আগে আর পরে কেউ এই দরজা খুলে আর বন্ধ করে দিয়েছে।'

শশাঙ্ক প্রবল মস্তকান্দোলন করে বললে, 'না, অসম্ভব!'

—'তা হলে বলতে হয়, খুনের আগে আর পরে এ-দরজা খোলা ছিল।'

—'না, তাও অসম্ভব! আমি নিজে দেখেছি দরজা বন্ধ।'

—'তবে বাড়ির কোথাও গুপ্তদ্বার আছে, খুনি সে-খবর জানে।'

ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে শশাঙ্ক বললে, 'আর বাড়ির মালিক আমি, সে-খবর জানি না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'বাড়ির মালিককে আমি আর একটা নতুন খবর দিতে পারি। জানেন, আমি যখন চারিদিক পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলুম, তখন অন্ধকারে গাছপালার আড়ালে-আড়ালে গা ঢেকে একজন লোক আমার কার্যকলাপ লক্ষ করছিল! বলতে পারেন, কে সে?'

শশাঙ্ক প্রথমটা অবাক হয়ে রইল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বললে, 'বলেন কী? আচ্ছা, দাঁড়ান একটু, আমি এখনই দরোয়ানদের হুকুম দিচ্ছি, দুরাত্মাকে ধরে আনুক। কী সর্বনাশ, বাড়ির ভেতরে শত্রু! চোবে! পাঁড়ে!'

—'মিছে দরোয়ানদের ডাকবেন না। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। এতক্ষণে সে নাগালের বাইরে সরে পড়েছে।'

—'কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! বাড়ির ভেতরে শত্রু! শেষটা আমিও অপঘাতে মরব নাকি?'

—'সাবধানে থাকলে ভয় কী? এখন চলুন, মৃগাঙ্কবাবুর ঘরটা দেখে আসি।'

বাড়ির ভেতর ঢুকে জয়ন্ত টর্চের আলো দেওয়ালের গায়ে বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চলল। তারপর সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'শশাঙ্কবাবু, খুনি গলা টিপে ধরাতে মৃগাঙ্কবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল?'

শশাঙ্ক বিস্মিত স্বরে বললে, 'উঠেছিল। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

—'দেখুন, বলেই জয়ন্ত সিঁড়ির দেওয়ালের এক জায়গায় টর্চের আলো স্থির করলে।

মানিক ও শশাঙ্ক দুজনেই দেখলে, দেওয়ালের গায়ে খানিকটা লাল দাগ লেগে রয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'খুনির হাতে রক্ত লেগেছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সেই রক্তের ছাপ কোনও-গতিকে দেওয়ালে লেগে গিয়েছে।'

শশাঙ্ক বিস্ফারিত নেত্রে চুপ করে রইল।

মানিক বললে, 'এই দাগই প্রমাণিত করছে খুনের পর খুনি সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নেমেছে, তখন বাগানের দরজা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ। অথচ শশাঙ্কবাবু দেখেছেন দরজা বন্ধ। সে-দরজা বাড়ির ভেতর থেকে কে বন্ধ করলে?'

মানিক বললে, 'সেই-ই কি আজ অন্ধকারে তোমার উপরে পাহারা দিচ্ছিল?'

—'শশাঙ্কবাবু, আপনার বাড়ির প্রত্যেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

শশাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'যে আজ্ঞে।'

—'এখন চলুন মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে!'

মৃগাঙ্কের ঘরখানি একেবারে বাগানের উপরে। মৃতদেহ সেখানে আর ছিল না বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে তবু যেন সকলে অনুভব করলে, অদৃশ্য মৃত্যুর কেমন একটা থমথমে ভয়-ভয়

ভাব! অন্ধকার বাগান থেকে বাতাসে সেখানেও ভেসে আসছিল হাস্নুহানা আর চাঁপার মিশ্র গন্ধ। গতকল্য এ-গন্ধ হয়তো হতভাগ্য মৃগাঙ্কও উপভোগ করেছিল, কিন্তু আজ সেই সৌরভকেই মনে হচ্ছে প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো।

ঘরখানি বেশ সাজানো-গুছানো।—

একদিকে খাট, মাঝখানে একটি গোল মার্বেলের টেবিল, খান-কয় গদিমোড়া চেয়ার আর একদিকে তিন আলমারি-ঠাসা বই। এখানে-ওখানে ছোটো-ছোটো ত্রিপায়ার উপরে মর্মর মূর্তি, দেওয়ালেও ঝুলছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বাছা-বাছা চিত্রাবলী।

জয়ন্ত বললে, 'ঘর দেখলে ঘরের মালিকের স্বভাব বোঝা যায়। মৃগাঙ্কবাবু শৌখিন, রসিক আর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'ঠিক। কিন্তু সে যে পণ্ডিত ছিল এ-কথা কেমন করে বুঝলেন?'

—'আলমারির বইগুলির নাম পড়ে। সব বই উঁচুদরের।......... আচ্ছা শশাঙ্কবাবু, এ-ঘরে আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। এইবারে আপনার ঘরখানা একবার দেখাবেন?'

—'কেন দেখাব না? এইদিকে আসুন।'

খান-চারেক ঘর পেরিয়ে এবারে সকলে যে-ঘরে গিয়ে ঢুকল, সেখানে প্রথমেই চোখে পড়ে কালো মার্বেলের একটি জলচৌকির উপর সাজানো পাঁচটি সিন্দুর-লিপ্ত মড়ার মাথা! আর এক পাশে ব্যাঘ্রচর্মের আসনের সামনে জবার মালাপরানো, কষ্টিপাথরে গড়া ছোট্ট একটি কালিকা-মূর্তি। তারই পিছনে দেওয়ালের তাকে-তাকে রয়েছে অনেকগুলি বাঁধানো বহু-ব্যবহৃত পুস্তক। জয়ন্ত বইগুলোর নামও লক্ষ করলে। বৃহৎ তন্ত্রসার, শ্যামা-রহস্য, মহানির্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতি।

বললে, 'আপনি তান্ত্রিক?'

শশাঙ্ক বললে, 'স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি পূজা-অর্চনা নিয়েই কাল কাটাই।'

—'ওই মড়ার মাথাগুলো?'

—'ওগুলো তান্ত্রিক সাধনের উপকরণ। আমার কাছে জপ-তপই জীবন।'

—'হ্যাঁ, অনেকেই যে মড়ার দেহে জীবন খুঁজে নিজেদের সারা জীবন মিছে আশায় কাটিয়ে দেয়, এ-কথা আমি জানি।'

শশাঙ্ক আহত স্বরে বললে, 'মন্ত্রগুণে মড়া যে জ্যান্ত হয়, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন না?'

—'না। প্রাকৃতিক বিধানে যে-দেহ থেকে জীবন পালিয়েছে, তান্ত্রিক মন্ত্রের গুণে তা যদি আবার জ্যান্ত হত, লোকে তা হলে তাকে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলত না। এই বিংশ শতাব্দী জানে,—ম্যাজিকের আসল অর্থ হচ্ছে চোখে ধুলো দেওয়া; তাকে নিয়ে মজা করা চলে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না।'

—'ভারতবর্ষের লোক হয়ে এমন কথা বললেন জয়ন্তবাবু? জানেন, ক্রিশ্চান-ফিরিঙ্গির দেশ আমেরিকাও এখন তান্ত্রিক মন্ত্রের গুণে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করছে?'

—'হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'তন্ত্র' পত্রিকায় ও-রূপ কথা পড়েছি বটে। কিন্তু আমেরিকায় ছাপার হরফে যত আজগুবি কথা প্রকাশিত হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। তান্ত্রিক তন্ত্রের যদি এত গুণ, তবে মৃগাঙ্কবাবুকে আবার বাঁচাবার চেষ্টা করুন না?'

শশাঙ্ক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিভূত স্বরে বললে, 'ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা থাক।'

—'ঠিক বলেছেন! তার চেয়ে এই জামাটার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এর সবটাই তো দেখছি কাদায় ভর্তি—বিশেষ করে হাতা দুটো। এমন জামা আলনায় টাঙানো কেন?—হুঁ, এর হাতায় গোটাকয় ঘাসের কুচিও লেগে রয়েছে যে?'

শশাঙ্ক হেসে বললে, 'ওটা আমারই জামা। আজ সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে পথে-ঘাটে কত ছুটোছুটি করতে হয়েছে, বুঝেছেন তো? পা হড়কে একবার কাদায় পড়েও গিয়েছিলুম। তারপর জামা-কাপড় বদলে ওটাকে ভুলে আবার আলনাতেই টাঙিয়ে রেখেছি,—আজ কি আর আমার মাথার ঠিক আছে?'

জয়ন্ত সহানুভূতির স্বরে বললে, 'সত্যকথা। আজ আপনার বড়োই দুর্দিন। এখনও ভেঙে পড়েননি, এইটেই আশ্চর্য!'

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

শ্রীমান সুরেন ও জয়ন্তের আরশি

পরদিন প্রভাত। জয়ন্ত ও মানিক বিছানায় বসে চা পান করছে।

জমিদারবাড়ির সদর মহলের বেশ একখানি বড়োসড়ো ঘর তাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের সামনেই খানিকটা খোলা জমি, তারপর ফটক, তারপর একটা বড়ো রাস্তা।

জয়ন্ত বললে, 'ভোরে উঠে আমার নিত্যকর্মের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, বাঁশি বাজানো। কিন্তু বাঁশিটি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।'

মানিক হেসে বললে, 'তবেই তো মুশকিল দেখছি। তুমি আবার বলো, সকালে বাঁশি না বাজালে তোমার বুদ্ধি নাকি খোলে না!'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস। কিন্তু আজ আমার বুদ্ধি খুব বেশি না খুললেও চলবে।'

—'সে কী হে, তোমার হাতে আজ এত বড়ো একটা মামলা—'

—'না মানিক, এ-মামলাটাকে আমি বড়ো মামলা বলি না'—বলেই জয়ন্ত চায়ের পেয়ালা রেখে কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

মানিক বললে, 'কারণ?'

—'কারণ, কালকেই আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি,—হয় খুনি নিজে, নয় তার সহকারী এই বাড়ির ভেতরেই আছে। পুকুর যখন পেয়েছি, জাল ফেলে মাছ ধরতে বেশি দেরি লাগবে না।'

—'কিন্তু পুকুরের কোন মাছটি হবে তোমার লক্ষ্য, সেটা তুমি জানো না।'

—'শীঘ্রই জানতে পারব। ধরতে গেলে, এখনও আমি কাজ শুরুই করিনি। আগে থানায় গিয়ে সাব-ইন্স্পেকটার কুমুদবাবুর মতামত শুনি, এ বাড়ির কে কী এজাহার দিয়েছে দেখি, পায়ের দাগের মাপ নিই, তারপর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

—'না জয়ন্ত, ব্যাপারটা খুব সোজা না হতেও পারে। একটা কথা ভেবে দ্যাখো। ঝড়-জলের ভেতর দিয়ে খুনি এল বাড়ির ভেতরে, তারপর খুন করে সেই দুর্যোগে সে গেল

কোথায়? না, শ্মশানে!—এটা কি অস্বাভাবিক নয়? শ্মশানে তার কী কাজ থাকতে পারে? আর শ্মশান থেকেই বা সে কোথায় অদৃশ্য হল?'

—'হ্যাঁ মানিক, ওইখানেই একটা-কোনও রহস্য আছে'—বলেই সে মানিককে ইশারায় কাছে ডাকলে।

মানিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জয়ন্ত অতি মৃদুস্বরে বললে, 'শোনো! কামাবার এই আরশির ভেতর দিয়ে দেখছি, দরজার পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কে একজন লোক আমাদের কথা শুনছে। এ ঘরে আর একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে সহজভাবে বাইরে গিয়ে লোকটাকে তুমি গ্রেপ্তার করো।'

মানিক অত্যন্ত উদাসীনের মতো বাঁ দিকের একটা দরজার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, জয়ন্তও নির্বিকারের মতো দাড়ির উপরে বুরুশ দিয়ে সাবানের ফেনা লাগাতে লাগল।

আধ মিনিট যেতে না যেতেই ঘরের বাইরে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ উঠল। তারপর সশব্দে ডান দিকের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মানিকের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে একটা লোক ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গালের উপরে ক্ষুর চালাতে চালাতে বললে, 'এসো বন্ধু, বোসো। ওহে মানিক, বন্ধুর জন্যে একখানা চেয়ার এগিয়ে দাও। ততক্ষণে আমি কামিয়ে নিই।'

মানিক হাসতে হাসতে একখানা চেয়ার টেনে আনলে। কিন্তু লোকটা বসল না, দাঁড়িয়ে রইল বেজায় হতভম্বের মতো। তাকে দেখতে হৃষ্টপুষ্ট, তার রং কালো, দেহের তুলনায় মাথাটা বড়ো এবং মুখের তুলনায় চোখ দুটো ছোটো।

জয়ন্ত বললে, 'বসবে না বন্ধু? গলাধাক্কা ভক্ষণ করে অভিমান হয়েছে? কিন্তু আমাদের এসব তো বাসরঘর নয়, বোকার মতন আড়ি পাততে এসেছিলে কেন?'

লোকটা বললে, 'না মশাই, আমি আড়ি পাততে আসিনি, আমি আপনাকে ডাকতে এসেছিলুম।'

—'এতটা অনুগ্রহ কেন?'

—'শশাঙ্কবাবু আপনাকে ডাকতে বললেন।'

—'তুমি কে?'

—'এ বাড়ির সরকার।'

—'নাম?'

—'সুরেন্দ্রমোহন দে।'

জয়ন্ত কামাতে কামাতেই কথা কইছিল। একটু নীরব থেকে ঠোঁটের উপরটা সাফ করে বললে, 'ওহে মানিক, তুমি একবার শশাঙ্কবাবুর কাছে যাও। জেনে এসো, তিনি আমাকে কেন ডেকেছেন?'

মানিক চলে গেল।

কামাতে কামাতেই জয়ন্ত বললে, 'আরে আরে সুরেন, কোথা যাও? আরশির ভেতর দিয়ে তোমার চলন্ত ছবি যে আমি জ্বলন্ত দেখতে পাচ্ছি।...দাঁড়াও সুরেন, যেয়ো না!'

কিন্তু সুরেন থামল না, বরং গতি বাড়িয়ে দিলে—পালায় আর কী!

জয়ন্ত চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে দুই লাফে বাঘের মতো সুরেনের কাছে গিয়ে পড়ল এবং তারপর এক হাতে তার গলা চেপে ধরে তাকে বিড়াল-ছানার মতোই মাটি থেকে টেনে শূন্যে তুলে আবার ঘরের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিলে।

ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ে সুরেন আর্তনাদ করে উঠল।

আবার আরশির সুমুখে গিয়ে বসে ক্ষুর তুলে নিয়ে জয়ন্ত শান্ত স্বরেই বললে, 'চুপ করে ওইখানে বসে থাকো। এবারে নড়লে বাঁচবে না।'

সুরেন বুঝলে, সে আজ কোনও মিষ্টভাষী যমের খপ্পরে পড়েছে; সে আর পালাবার চেষ্টা করলে না।

মানিক ফিরে এসে বললে, 'শশাঙ্কবাবু বললেন, তিনি তোমাকে ডাকেননি।'

জয়ন্তের কামানো শেষ হল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বললে, 'সুরেন, এখন তোমার বক্তব্য কী?'

সুরেন মাথা হেঁট করে বসে রইল, জবাব দিলে না।

—'তা হলে কাল রাতে বাগানে আমার পিছু নিয়েছিলে তুমিই?'

সুরেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, আমি নই।'

—'হুঁ', এ-কথা সত্যি হলে বলতে হবে শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে তোমার মতন জীব আরও আছে? খুনিকে দরজা খুলে দিয়েছিল কে? তুমি?'

সুরেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'দোহাই মশাই, এ খুনোখুনির ভেতরে আমাকে আর জড়াবেন না! আমি দীন-দুঃখী, সামান্য মাইনের চাকরি করি, খুন-ডাকাতির ধার ধারি না—দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।'

তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়ন্ত খানিকক্ষণ মৌনমুখে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। সুরেনের মনে হল দু-দুটো প্রচণ্ড চক্ষু যেন দস্যুর মতন তার মনের ভেতরে ঢুকে সমস্ত গুপ্তকথা লুণ্ঠন করছে!

হঠাৎ জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'সুরেন, আমি বুঝেছি তুমি মস্ত এক কাপুরুষ! যাও, বিদায় হও! কিন্তু সাবধান, এ-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ো না, পালালেই মরবে! কাল কী পরশু তোমাকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ঠিক জবাব দিলে তোমার ভয় নেই।'

সুরেন দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

মানিক বললে, 'ওকে ছেড়ে দিলে কেন? ও হয়তো অনেক কথাই বলতে পারত।'

—'তা পারত। পরে আমাকে বলবেও। আপাতত ওকে আমি হাতে রাখতে চাই।'

এমন সময়ে শশাঙ্কের প্রবেশ। এসেই প্রশ্ন—'আমি যে আপনাকে ডেকেছি, এ-কথা আপনার কাছে কে বললে?'

—'আপনাদের সরকার।'

—'সুরেন? ভুল বলেছে। এজন্যে তাকে আমি শাস্তি দেব।'

—'দরকার নেই। ...চলুন শশাঙ্কবাবু, এইবারে আমরা থানার সাব-ইন্‌স্পেকটার কুমুদবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে যাই। পদচিহ্নের ইতিহাস শুনতে হবে! আপনি প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ।'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

পদচিহ্ন কাহিনি

সাব-ইন্‌স্পেকটার কুমুদচন্দ্র সেনের বয়স ত্রিশের ভেতরে। থানার প্রধান কর্মচারী অসুস্থ বলে এই খুনের মামলার ভার পড়েছে তারই উপরে।

কুমুদ খুব উৎসাহী পুলিশ-কর্মচারী, এদেশের সাধারণ পুলিশের লোকের মতো নয়। সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা পুস্তক নিয়মিতরূপে পাঠ করে এবং যা পড়ে, তা নিয়ে স্বাধীন চিন্তা করতেও ভোলে না। উল্লেখযোগ্য মামলা হাতে পেলে, সে কাজও করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে।

শশাঙ্কের মুখে জয়ন্তের পরিচয় পেয়েই কুমুদ বিপুল পুলকে বলে উঠল, 'সুপ্রভাত জয়ন্তবাবু, সুপ্রভাত! আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ই ছিল না, কিন্তু আপনার সমস্ত কীর্তিকলাপই আমি জানি। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়াও সৌভাগ্য! শশাঙ্কবাবুর সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিই, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক লোককেই স্মরণ করেছেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।'

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার কাছে আমার এক আবেদন আছে।'

বিনয়ে কুমুদও কম নয়, বললে, 'আবেদন নয় জয়ন্তবাবু, আদেশ!

জয়ন্ত বললে, 'বাপ রে, বলেন কী! অনেক পুলিশের লোকই তো দেখলুম, মেজাজ তাঁদের লাট-বেলাটের মতো। বাইরের লোক আদেশ দিলে, তাঁরা কি আর রক্ষা রাখবেন?'

মুখ টিপে হেসে কুমুদ বললে, 'আমি শিক্ষার্থী মাত্র, বিশেষজ্ঞের সম্মান রাখতে জানি। এখন কী আদেশ বলুন!'

জয়ন্ত বললে, শশাঙ্কবাবুদের বাগানের খিড়কি-দরজার সামনে আপনি যে পদচিহ্নগুলো দেখেছিলেন, দয়া করে তাদের কথা কিছু বলুন।'

—'খালি শুনবেন? চোখে কিছু দেখবেন না?'

—'কালকের বৃষ্টি চোখে দেখবার আর কোনও উপায়ই রাখেনি কুমুদবাবু। সব পদচিহ্ন ধুয়ে-মুছে গেছে।'

কুমুদ হাসি-ভরা মুখে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটি আলমারি থেকে কাগজে-মোড়া চারটে জিনিস বের করে সন্তর্পণে টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

—'এগুলো কী?'

—'মোড়ক খুলেই দেখুন না। কিন্তু খুব সাবধানে খুলবেন।'

জয়ন্ত মোড়ক খুলেই বলে উঠল, 'এ যে দেখছি 'প্লাস্টার অফ প্যারিস' দিয়ে তৈরি পায়ের ছাপের ছাঁচ। দু-জোড়া পায়ের দু-জোড়া ছাঁচ!'

—'জানেন তো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করলে ধুলো, কাদা, বালি আর বরফের উপর থেকে সমস্ত পদচিহ্নের নিখুঁত ছাঁচ তুলে নেওয়া যায়?'

—'জানি, কারণ আমি নিজেও ওই পদ্ধতিতে কাজ করি। কিন্তু বাংলাদেশের পুলিশও যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা আমি জানতুম না। এইবারেই আমার অন্ন মারা গেল দেখছি!'

—'নির্ভয় হোন জয়ন্তবাবু, আপনার দিন এখনও ফুরোয়নি। বাংলা পুলিশ এখনও এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। আমার সহকর্মীরা বলেন, এসব হচ্ছে অনাবশ্যক তুচ্ছ ছেলেখেলা, বাজে সময় নষ্ট করা মাত্র!'

—'পুলিশ-লাইনে আপনি দেখছি অতুলনীয় বাঙালি, আপনার পক্ষে আমার সাহায্য অনাবশ্যক।'

—'না, খুবই আবশ্যক জয়ন্তবাবু, আপনার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই আমার চেয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে। এখন শুনুন।

এই ছাঁচজোড়া হচ্ছে প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ যে শ্মশান থেকে আগে এসে আবার শ্মশানে ফিরে গেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্ন থেকে এই ছাঁচজোড়া তুলেছি, যে খিড়কির দরজা থেকে বেরিয়ে শ্মশানে গেছে, আবার ফিরে এসে শশাঙ্কবাবুদের বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে।'

—'কী করে এসব অনুমান করছেন?'

—'এ তো খুবই সোজা! ধরুন, আমি শ্মশান থেকে কর্দমাক্ত পথ দিয়ে শশাঙ্কবাবুর বাড়ির খিড়কির দরজায় গিয়ে হাজির হলুম। তারপর ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আবার শ্মশানে ফিরে গেলুম। তারপর আপনি বেরুলেন খিড়কি দিয়ে ওই এক পথেই। তখন আপনার পায়ের চিহ্ন প্রায়ই পড়বে আমার পায়ের চিহ্নের উপরে। তারপর আপনি যখন শ্মশান থেকে ফিরবেন তখন আপনার পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে কেবল আমার উপরে নয়, আপনার নিজেরও আগেকার শ্মশানমুখো পদচিহ্নের উপরে গিয়ে পড়বে। কেমন, তাই নয় কি?'

—'আপনার যুক্তি অকাট্য।'

—'মোটকথা, প্রথম ব্যক্তি শ্মশান থেকে এসে আবার সেইখানেই ফিরে গেছে! আশ্চর্যের বিষয় তারপর সে যে কোথায় গেল, পদচিহ্ন দেখে আর তা বোঝবার উপায় নেই। শ্মশানে উপস্থিত হয়েই সে যেন অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! সে শ্মশানেও নেই অথচ সে যে শ্মশান থেকেও বেরোয়নি, এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যে শ্মশানে গিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে, পদচিহ্ন তার যথেষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে।

প্রশংসাভরা কণ্ঠে জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলুম।'

মানিক এতক্ষণ পরে বললে, 'কুমুদবাবু, আমার দৃষ্টি আপনার মতো সূক্ষ্ম নয় বটে, কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, তার উপরে কি নির্ভর করা উচিত?'

—'কেন উচিত নয়?'

—'এক নম্বরের প্রশ্ন : খুনি কে? সে যদি সেই সন্ন্যাসী হয়, তা হলে সে তো খুনের আগের রাত্রেই শ্মশান থেকে বিদায় হয়েছিল, আর আপনাদের মতে এ-খুনি এসেছে শ্মশান থেকেই।

দুই নম্বরের প্রশ্ন খুনি শ্মশান থেকেই বা এল কেন আর খুনের পরে আবার ওই শ্মশানেই বা ফিরে গেল কেন?

তিন নম্বরের প্রশ্ন খুনি শ্মশান থেকে কী উপায়ে অদৃশ্য হল? আপনারা বলছেন, খুনি যে শ্মশান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়েছে, কাদার উপরে এমন কোনও চিহ্ন নেই।

চার নম্বরের প্রশ্ন খুনির সহকারি বা শশাঙ্কবাবুর বাড়ির কোনও লোক কী উদ্দেশ্যে খুনের পরে আবার শ্মশানে গিয়ে ফিরে এসেছিল? সে কি খুনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, না খুনিকে ধরতে গিয়ে দেখা না পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল?

পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন এই দ্বিতীয় ব্যক্তি খুনির বন্ধু, না শত্রু?'

কুমুদ বললে, 'নিশ্চয়ই বন্ধু নইলে এতক্ষণে সে আত্মপ্রকাশ করত।'

ইতিমধ্যে শশাঙ্ক প্লাস্টারের একজোড়া পদচিহ্ন তুলে নিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছিল, আচম্বিতে সে-দুটো তার হাত ফসকে মাটির উপরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সে 'ওই যাঃ!' বলে চিৎকার করে উঠল!

কুমুদ হতাশভাবে ভগ্নাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে বললে, 'কী করলেন শশাঙ্কবাবু! এত পরিশ্রম মিথ্যে করে দিলেন!'

শশাঙ্ক কাঁচু-মাচু মুখে বললে, 'আমাকে মাফ করুন কুমুদবাবু! আপনাদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, তাই এই বিপত্তি। ছাঁচ কি নতুন করে তোলা যায় না?'

—'অসম্ভব। কাদার উপরে পায়ের ছাপ আর নেই।'

চিন্তিত মুখে শশাঙ্ক বললে, 'তবে কী হবে?'

জয়ন্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বললে, 'আপনি বেশি ভাববেন না শশাঙ্কবাবু। কিছু ক্ষতি হল বটে, কিন্তু ও-রকম ছাঁচ তোলবার আগে পায়ের ছাপের 'ফোটো' আর সঠিক মাপ নেওয়া হয়। তাই নয় কি কুমুদবাবু?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজ চালাবার পক্ষে তাইই যথেষ্ট।'

শশাঙ্ক উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'আঃ, শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। আমার যা ভয় হয়েছিল!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মা ভৈ! কিন্তু বাকি ছাঁচজোড়ার দিকে দয়া করে আর নজর দেবেন না!'

শশাঙ্ক জিভ কেটে বললে, 'পাগল! আর আমি ওদিকে তাকাই?' বলেই হড়-হড় করে চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের কাছ থেকে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে বসল।

কুমুদ বললে, 'ডিটেকটিভের পক্ষে এমন সুন্দর ছাঁচ পাবার সুযোগ বড়ো-একটা ঘটে ওঠে না। এখানে আমার সৌভাগ্যের কারণ হচ্ছে তিনটি।

প্রথম, বিষম দুর্যোগ হলেও মাটিকে নরম করে ঘটনার আগেই বৃষ্টি থেমে গেছে।

দ্বিতীয়, শশাঙ্কবাবুর বাড়ি থেকে শ্মশানে সরু পথ দিয়েও বড়ো একটা লোক চলাচল নেই।

তৃতীয়, নতুনপুরের শ্মশান নির্জন জায়গা; ঘটনার রাত্রি ও পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে কেউ মড়া পোড়াতে যায়নি।

কাজেই পায়ের ছাপগুলো এমন নিখুঁত অবস্থায় পেয়েছি যে, ছাপানো গল্পের বইয়ের মতোই তাদের কথা অনায়াসে পাঠ করা যায়। ওই ছাপগুলো না পেলে আমি ধরতেই পারতুম না যে, শশাঙ্কবাবুর বাড়ির ভিতরেই সব রহস্য জানে এমন কোনও লোক আছে।'

শশাঙ্ক বিমর্ষ মুখে ভগ্নস্বরে বললে, 'আমার দুর্ভাগ্যের দেখছি শেষ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু পায়ের ছাপ না দেখেই জয়ন্ত সে-কথা জানতে পেরেছেন।'

কুমুদ সবিস্ময়ে বললে, 'তাই নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, শশাঙ্কবাবুর বাড়ির ভিতর থেকেই খুনিকে কেউ দরজা খুলে দিয়েছিল।'

শশাঙ্ক তেমনি বিষণ্ণভাবেই বললে, 'এ-কথা শুনে পর্যন্ত আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মন সর্বদাই ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে।'

কুমুদ বললে, 'কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়?'

শশাঙ্ক বললে, 'যদিও আমাদের আসল পরিবার বড়ো নয়, তবু বাড়িতে আশ্রিত, পোষ্য, আত্মীয়, কর্মচারী, দাস-দাসী আছে অনেক। হঠাৎ তাদের কার ওপরে সন্দেহ করি বলুন?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু কাল রাতে আমি যখন বাগানে ছিলুম, তখন কে একজন লোক লুকিয়ে আমায় অনুসরণ করছিল। আবার আজ সকালেই ও-বাড়ির সরকার সুরেন আড়ি পেতে মানিকের সঙ্গে আমার কথা শুনছিল।'

শশাঙ্ক প্রায় স্তম্ভিতের মতো বললে, 'অ্যাঁঃ! বলেন কী? এতবড়ো আস্পর্ধা সুরেনের? কই, এতক্ষণে এ-কথা তো আমাকে বলেননি?'

—'দরকার হয়নি তাই বলিনি!'

শশাঙ্ক ক্রোধে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বললে, আজকেই সুরেনকে আমি তাড়িয়ে দেব। হতভাগা, পাজি, নিমকহারাম!'

কুমুদ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনি তাড়িয়ে দেবার আগেই সুরেনকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

মানিক বললে, 'কিন্তু কী প্রমাণে? আড়ি পাতলেই কেউ খুনির সহকারী হয় না।'

কুমুদ বললে, 'তা জানি। আইনের কেতাবে আড়ি-পাতা একটা অপরাধ বলে গণ্য নয়। কিন্তু সুরেন যখন লুকিয়ে আপনাদের কথা শুনছিল, তখন নিশ্চয়ই তার মনের ভেতরে পাপ আছে। হয়তো তার পায়ের মাপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে মিলে যাবে। আপাতত পরীক্ষা করব বলেই গ্রেপ্তার করব!'

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে নিতে বললে, 'হ্যাঁ, গ্রেপ্তার করবেন—ইতিমধ্যে সে যদি না চম্পট দিয়ে থাকে!'

কুমুদ বললে, 'পালাবে? অসম্ভব! শশাঙ্কবাবুর বাড়ির চারিদিকেই পুলিশ-পাহারা বসেছে। সেখান থেকে এখন একটা মাছিও আর পালাতে পারবে না।'

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'আপনি দেখছি অতিসজাগ ব্যক্তি। আমার সাহায্য আপনার কাছে বাহুল্য মাত্র!...চলুন তা হলে। শ্রীমান সুরেনের সন্ধানে মহাসমারোহে যাত্রা করা যাক!'

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

তিন ব্যক্তি খুন, তিন ব্যক্তি উধাও

সুরেনকে গ্রেপ্তার করে কুমুদ এল জয়ন্ত ও মানিকের কাছে।

সুরেন কাঁদছিল।

জয়ন্ত বললে, 'শশাঙ্কবাবু কোথায় গেলেন?'

কুমুদ বললে, 'বাড়ির ভেতরে পুজো করতে। তাঁর আবার ওসব বাতিক আছে কিনা! পৃথিবী না ওলটালে ঠিক সময়টিতে পুজোয় তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'সুরেন, তুমি যে এত-শীঘ্র পুলিশের দয়া-দৃষ্টিতে পড়বে, তা আমি জানতুম না। ভেবেছিলুম কাল-পরশু তোমাকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু কাল-পরশু তুমি তো থাকবে থানায় বা হাজতে, অতএব কথাগুলো এখনই জিজ্ঞাসা করব কি?'

সুরেন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি নির্দোষ। আমি কিছুই জানি না।'

কুমুদ ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ কর বলছি! সব বদমাইসই আগে ওই কথাই বলে, তারপর রুলের গুঁতো খেলেই সুর বদলায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, সুরেনকে নিয়ে একবার আমি পাশের ঘরে যেতে পারি কি?'

—'অনায়াসেই। কিন্তু দেখবেন, পালায় না যেন!'

—'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' এই বলে সুরেনকে নিয়ে জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট-পনেরো পরে আবার তারা ফিরে এল। মানিক লক্ষ করলে সুরেনের কান্না বন্ধ হয়েছে এবং জয়ন্ত নিচ্ছে ঘন-ঘন নস্য।

জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, আপাতত সুরেনের বিরুদ্ধে তো কোনও 'কেস' নেই?'

—'না, তবে 'কেস' তৈরি করতে কতক্ষণ?'

'নাই বা তৈরি করলেন! সুরেনকে ছেড়ে দিন।'

কুমুদ সবিস্ময়ে বললে, 'সে কী! আপনিই তো বললেন—'

—'আমি যা বলেছি, মনে আছে। কিন্তু সুরেন আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে। ওর আর থানায় যাবার দরকার নেই। ওর জন্যে আমিই দায়ী রইলুম—ওকে ডাকলেই দেখতে পাবেন।'

—'আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনি কি ওর চোখের জল দেখে ভুলে গেলেন?'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে কুমুদের কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'ভুলিনি। এটা আমার একটা চাল। ওকে ছেড়ে দিন। আমি বলছি, ও পালাবে না।'

—'বেশ, তাই হোক! যাও সুরেন, আজ আর তোমাকে থানায় যেতে হবে না।'

সুরেন মহাবেগে প্রস্থান করল—ব্যাঘ্রদলের মধ্যে থেকে মেষশাবকের মতো।

কুমুদ একটু অসন্তুষ্ট স্বরে বললে, 'আপনার এ-চালের মহিমা বুঝলুম না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সব জিনিসেরই মহিমা কি সব সময়ে বোঝা যায়?'

'আমার দেখবার ইচ্ছা ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে ওর পায়ের মাপ মেলে কি না!'

—'ও তো পালাচ্ছে না, দুদিন পরে মেলালেই বা ক্ষতি কী?'

—'অকারণে দেরি করেই বা লাভ কী?'

—'দেরি? কিচ্ছু দেরি হবে না মশাই! আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ঠিক আর দুদিনের মধ্যেই শশাঙ্কবাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হবে—অর্থাৎ তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীকে কুমুদবাবু গ্রেপ্তার করবেন।'

কুমুদ মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, না! আমি ডিটেকটিভ উপন্যাসের অমানুষিক গোয়েন্দা নই—সেই যাদের কানের পাশ দিয়ে বোঁ বোঁ করে শত শত গুলি ছুটে যায়, কিন্তু গায়ে লাগে না। আপনার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ, কিন্তু অত শীঘ্র তাকে সফল করবার শক্তি আমার হবে না!'

—'বেশ, আমার ভবিষ্যদ্বাণী না হয় ব্যর্থই হবে! কিন্তু ও-কথা রেখে এখন বলুন দেখি, আপনি আর কোনও নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি না?'

—'নতুন তথ্য?......হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু কথাটা হচ্ছে ভারী অদ্ভুত।'

—'কী রকম?'

—'আমাদের এলাকায় গেল দেড় মাসের মধ্যে তিনটে খুন হয়েছে।

প্রথম খুনটাও হয় এই নতুনপুরেই, হত ব্যক্তির নাম শ্যামাকান্ত বকশি—তার ব্যাবসা ছিল সুদে টাকা খাটানো।

দ্বিতীয় খুন হয় পাশের গ্রাম নন্দনপুরে, হত হয় একজন মাড়োয়ারি; তারও ব্যাবসা ছিল টাকা লেনদেন করা!

তৃতীয়বারে মারা পড়েছেন মৃগাঙ্কবাবু।'

—'কিন্তু এর মধ্যে তো অদ্ভুত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

—'শুনুন।

প্রথমত, লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে, তিন ব্যক্তিকেই গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিন বারেই খুনি কাজ সেরে পালাতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, তিন বারেই খুনের আগের দিন একজন করে মানুষ অদৃশ্য হয়েছে!'

জয়ন্ত উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'তার মানে?'

—'প্রথম খুনের আগের দিন থেকেই নতুনপুরের চাঁড়াল-পাড়ার একটি লোকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় খুনের আগের দিন এখানকার এক গোয়ালা অদৃশ্য হয়েছে, এখনও তার সন্ধান মেলেনি। মৃগাঙ্কবাবু যেদিন খুন হন, তারও আগের দিন শ্মশান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এক সন্ন্যাসী, এ-কথা তো আপনারাও জানেন।'

—'জানি। কিন্তু শশাঙ্কবাবুর বিশ্বাস সত্য হলে মানতে হয়, সেই সন্ন্যাসী হয়তো খুনি, সুতরাং তার অন্তর্ধানের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।'

—'অপরাধী পালায় অপরাধের পর, কিন্তু সন্ন্যাসী গা-ঢাকা দিয়েছে খুনের আগের দিনে!'

—'সন্ন্যাসী তো নতুনপুরের লোক নয়, তাড়িয়ে দেবার পর সে যে এখান থেকে চলে যাবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। হয়তো সে খুনিও নয়।'

—'কী জানি, আমার মন যেন বলছে, এই তিনটে খুনের মধ্যে কী একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক বারেই গলা টিপে হত্যা, আর ঘটনার ঠিক আগের দিন একজন করে মানুষের অন্তর্ধান। হুঁ, বড়োই সন্দেহজনক!'

মানিক বললে, 'কিন্তু যারা অদৃশ্য হয়েছে, তাদের সঙ্গে হত্যাকারীর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না। এক চাঁড়াল আর এক গোয়ালা অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু তাদের অদৃশ্য হবার কথা নয়। তারা বাসা থেকে অন্য কাজে বেরিয়ে আর ফেরেনি। তাদের আত্মীয়েরা আর পুলিশ অনেক খুঁজেও সন্ধান পায়নি। তাদের সঙ্গে দুই ব্যক্তির পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। যদি মানুষ-চুরি বলি, তা হলে প্রশ্ন ওঠে, তাদের মতো গরিব লোককে চুরি করে কার কী লাভ হবে? তারা শিশু নয়, জোয়ান ব্যক্তি। সন্ন্যাসী না হয় চলে গেছে বা পালিয়েছে;—কিন্তু তারা কোথায় গেল? জয়ন্তবাবু, প্রায় উপরি-উপরি এইসব মামলার কিনারা হচ্ছে না বলে আমাদের থানার ভারী দুর্নাম হয়েছে।'

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বললে, 'কুমুদবাবু, আপনি ঘটনার ধারাকে আবার অন্য দিকে নিয়ে গেলেন যে! ভেবেছিলুম আপনার সঙ্গে আজ একবার নতুনপুরের শ্মশান পরিদর্শনে যাব, তা আর হল না দেখছি।'

—'কেন?'

—'শ্মশান পরিদর্শন কালকের জন্যে তোলা রইল। প্রথম আর দ্বিতীয় বারে যারা খুন আর অদৃশ্য হয়েছে তাদের ঠিকানা দিন দেখি, আমি কিছু খবরাখবর নিয়ে আসি।'

'পুলিশ যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এতদিন পরে সেখানে গিয়ে আপনি আর নতুন কী আবিষ্কার করবেন?'

—'তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ আছে কি?'

—'বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু বলছি, এ-মাকড়সার জালের কোনওই হদিস পাবেন না।'

জবাবে জয়ন্ত কেবল একটুখানি মুচকে হাসলে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

কাঠের বাক্সে কী ছিল?

সন্ধ্যার পর জয়ন্ত বাসায় ফিরে এল।

মানিক বললে, 'আমাকে সারাদিন একলা ফেলে নিজে তো দিব্যি টহল দিয়ে এলে! আমি গুনছি কড়িকাঠ, আর তুমি টানছ নস্যি! তোমার যত নস্যি তত ফুর্তি! এ মামলাটা হাতে নিয়ে পর্যন্ত তুমি যেন আনন্দে আটখানা হয়ে আছ! এত আনন্দ কেন হে বন্ধু?'

—'মামলাটা ছেলেখেলার মতন সহজ বলে।'

—'সহজ? আমি তো কোনও থই পাচ্ছি না।'

—'সেইজন্যেই তোমার নাম মানিক আর আমার নাম জয়ন্ত।'

—'আমি যথেষ্ট ভেবে দেখছি। খুনি কে? সেই সন্ন্যাসী? কাল রাতে বাগানে যে তোমার পিছু নিয়েছিল, সে? সুরেন? না শশাঙ্কবাবুর বাড়ির আর কোনও লোক? না শ্মশানে গিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছে সেই ব্যক্তি? সারাদিন ধরে তো তদ্বির করে এলে, সঠিক কোনও উত্তর পেলে?'

—'অপেক্ষা করো, হয়তো কাল উত্তর দিতে পারব। হয়তো আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবে না।'

—'তুমি চলে যাবার পর কুমুদবাবু আমাকে কি বললেন জানো?'

—'কী?'

—কুমুদবাবু বললেন, 'তিনি কাল এ-বাড়ির সকলকার পায়ের মাপ নেবেন।'

—'তারপর?'

—'সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে যার পা মিলবে তাকেই তিনি গ্রেপ্তার করবেন।'

—'কী অপরাধে?'

—'খুনির সহকারী বলে?'

—'তিনি গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

—'পারেন না?'

'না। আসামি বলবে, আমি খুনিকে ধরবার জন্যে তার পিছু নিয়েছিলুম। তারপর ধরতে না পেরে ফিরে এসেছি!'

—'তা হলে প্রশ্ন ওঠে, পুলিশকে আগে সে-কথা জানায়নি কেন?'

—'সে বলবে, ভয়ে! বুঝেছ মানিক, আইন আছে বটে, কিন্তু আইনেই আইনকে ফাঁকি দেবার উপায়ও আছে। কুমুদবাবু এত সহজে কেল্লা ফতে করতে পারবেন না। আগে তাঁকে

আবিষ্কার করতে হবে, শ্মশান থেকে এসে খুন করে আবার শ্মশানে ফিরে গিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছে, সে কে? তার পায়ের ছাপের সঙ্গে যার পা মেলে তাকে না ধরতে পারলে কোনও সুবিধাই হবে না।'

—'তুমি তার সন্ধান পেয়েছ?'

—'এখনও পাইনি।'

—'তবু ভবিষ্যদ্বাণী করেছ?'

—'হুঁ। হয়তো শ্মশানে গিয়ে কাল তার পাত্তা পাব।'

—'যদি না পাও?'

—'আশা হচ্ছে, কিছু-না-কিছু পাবই। মানিক, তুমি জানো না, একে-একে আমি অনেক গুপ্তকথাই আবিষ্কার করেছি। আমি যে ঠিক পথ ধরেছি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই; অগ্রসরও হয়েছি অনেকখানি, যদিও পথের শেষে কী আছে সেটা এখনও আমার কাছে অজানা। হয়তো পথের শেষ পাব ওই শ্মশানেই! দেখা যাক, কী হয়!'

সে রাতে যেমন গুমোট তেমনি মশা। মশারি ফেললে আরও গরম হয় এবং মশারি তুললে প্রাণ যায়-যায়।

জয়ন্ত মহা জ্বালাতন হয়ে বললে, 'ধ্যাত, মশার সঙ্গে আর লড়তে পারি না! মানিক তোমার অবস্থা কেমন?'

—'ভয়াবহ! শত শত হুলের খোঁচায় সর্বাঙ্গে হয়েছে শত-শত ছিদ্র। প্রাণপক্ষীকে আর বুঝি দেহের ভিতরে ধরে রাখা যায় না, সেইসব ছিদ্রপথ দিয়ে সে উড়ে যেতে চায়! গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছি।'

—'বাগানে গিয়ে খানিকটা পায়চারি করে আসবে?'

—'সাধু প্রস্তাব। সমর্থন করবার জন্যে এই আমি গাত্রোত্থান করলুম।'

দুই বন্ধুতে ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশুতি রাত। কাছেই কোথাও পাঁড়ে, চোবে, দোবে প্রভৃতির নাকে-নাকে নানা সুরের বাজনা বাজছে। চারিদিক থেকে তাদের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্যে ব্যাঙের দলও বসিয়েছে জলসা। ঝিঁঝি-পোকারাও হার মানতে রাজি নয়, তাদেরও পাড়ায় চলছে ঝিঁঝি-রাগিণীর আলাপ। গাছে-গাছে বসে প্যাঁচারাও বলছে—আমরাই বা চুপটি মেরে থাকব কেন? আলাপ করতে না পারি, প্রলাপই বকব,—শোনো!

শব্দময়ী রাত্রি। শহুরে রাত তবু খানিকটা স্তব্ধ হয়, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে কিংবা বন্য রাত্রি মৌনব্রত অবলম্বন করতে শেখেনি।

বাতাস আজ ধর্মঘট করেছে বলে গাছের দল গোলমাল ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কবিদের অত-সাধের মর্মরধ্বনি গেছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে।

চাঁদের আলোর এমন জোর নেই যে, আকাশের রং বোঝা যায়। বিরক্ত তারাদের চোখ করছে পিটপিট, পিটপিট।

জয়ন্ত বললে, 'চলো, পুকুরের দিকে পা-চালানো যাক! সেখানে গেলে একটু-আধটু ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যেতে পারে।'

আলোআঁধারি-মাখা রহস্যের মধ্য দিয়ে দুজনে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

যখন তারা শশাঙ্কবাবুর ঘরের নীচে গিয়ে পড়েছে তখন উপর থেকে শোনা গেল সুগম্ভীর সুরে মন্ত্র-উচ্চারণ ঃ

'চিন্তয়ানি চ তন্নাম রক্ষ মাং সর্বতঃ সদা।
দিগম্বরীং করালাস্যাং ঘোরদংষ্ট্রাং ভয়ানকাং।।
কর্ণমূলে শবযুগ্মং স্থূলতুঙ্গপয়োধরাং
মহারৌদ্রীং মহাঘোরাং শ্মশানালয়বাসিনীং।।—'

মানিক বললে, 'শশাঙ্কবাবু পূজায় বসেছেন। দক্ষিণা-কালিকার মন্ত্র আউড়ে বে'হয় গুমোটের কবল থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টায় আছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যে মন্ত্র-তন্ত্র জানি না! জানলে হয়তো আজকের বেয়াড়া গুমোটকে জব্দ করে দিতুম দস্তুরমতো!'

তারা পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসল। সত্যি, সেখানটি বেশ ঠান্ডা। খানিক আলোয় খানিক ছায়ায় ভরা জল করছে ঢলঢল,—মাঝে-মাঝে আকাশে মেঘ এসে তার বুকে ঘনিয়ে তুলেছে অন্ধকার।

দুজনে নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ—এবং সেখান থেকেই শুনতে লাগল ভক্ত শশাঙ্কবাবুর রসনা মন্ত্রপাঠ করছে ক্রমাগত।

বাড়ির কোনও বড়ো ঘড়ি হঠাৎ ঢং-ঢং-ঢং করে জানিয়ে দিলে—রাত এখন তিনটে।

জয়ন্ত বললে, 'এইবার ওঠা যাক মানিক! রাতের পরমায়ু এল ফুরিয়ে। ঘরের শিকার পলাতক দেখে মশারাও এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ে, পাঁড়ে চোবে দোবেদের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু বাঙালিদের সরস দেহের গন্ধ পেলে নিশ্চয়ই তারা এখুনি শুকনো ছাতুর লোভ ত্যাগ করে ছুটে আসবে। আমার ইচ্ছে এইখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।'

—'তা হয় না মানিক! কোথায় এসেছি জানো তো? এখানে আমরা অজাতশত্রু নই। ওঠো।'

তারা উঠল। কিন্তু ফিরতেই দেখলে, কে একজন লোক বাগানের পথ দিয়ে আসতে-আসতে তাদের সাড়া পেয়েই লম্বা দৌড় মেরে বাগানের তলায় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'গতিক সুবিধের নয়। কে ও? আমাদের দেখে অমন করে পালাল কেন?'

উপরে শশাঙ্ক তখনও নিজের মনে ভক্তিভরে দক্ষিণা-কালিকার মন্ত্র আবৃত্তি করছে।

মানিক বললে, 'শশাঙ্কবাবুকে ডাকব নাকি?'

—'ডাকবার দরকার নেই। ভক্তের পুজোয় বাধা দেওয়া কখনও উচিত নয়।'

—'তবে? ওই অন্ধকারের মধ্যে ওখানে গিয়ে আমরা কি ওকে খুঁজে পাব?'

—'ওকে খুঁজতে গেলে ঘর থেকে আমাদের 'টর্চ' নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে ও রাসকেল লম্বা দেবে।'

—'আমাদের কাছে রিভলভার পর্যন্ত নেই। এখন কী করা যায় বলো দেখি?'

—'কুইক মার্চ করো! যেন আমরা ওকে দেখতে পাইনি। ঘরে পৌঁছে আপাতত নিদ্রাদেবীর আরাধনা, তারপর কাল সকালে উঠে কর্তব্য স্থির করা যাবে।'

তারা দ্রুতপদে ঘরের দিকে এগুতে লাগল। লোকটাকে আর দেখা গেল না।

তাদের ঘর যে-দিকে, সে-দিকের দালানে ওঠবার সিঁড়ির সামনেই গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'আমরা যখন ঘর থেকে বেরুই, তখন এখানে এ-বাক্সটা ছিল না তো!'

মানিক বললে, 'হয়তো ছিল—হয়তো ছিল না। অত আমি লক্ষ করিনি।'

জয়ন্ত বাক্সটা নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'গোয়েন্দার সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হচ্ছে দৃষ্টিকে সজাগ রাখা সর্বদা। অন্যমনস্ক গোয়েন্দা গাধার চেয়েও নিচু দরের জীব।'

বাক্সটা সাধারণ প্যাকিং-কেসের মতন দেখতে। তার দরজাটা টেনে তুলে ভেতরে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বিশ্রী বুনো-বুনো গন্ধ বেরুচ্ছে। মানিক, এর ভেতরে কোনও জানোয়ার ছিল।'

—'এখন তো নেই?'

—'না। কিন্তু সে গেল কোথায়? বাক্সটা এখানে ছিল না, কোত্থেকে এল? এর মধ্যে যে জন্তু ছিল, সে কোথায় গেল?'

—'চুলোয়। জয়ন্ত, মিছে মাথা ঘামাও কেন? চলো, আমার ঘুম পেয়েছে।'

'কী ঘুম মানিক? অনন্ত ঘুম নয় তো?'

—'মানে?'

—'পৃথিবী এখন ঘুমোচ্ছে। এমন সময়ে আমাদের ঘরের ঠিক সামনেই কেন এই বাক্সের আবির্ভাব? বাগানে এই মাত্র যে-লোকটা আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল, সে কে? বাক্সের ভেতরের জানোয়ার বাইরে গেছে, আর পাঁচ-ছয় হাত তফাতেই আমাদের ঘরের জানালা ছিল খোলা। আমাদের দেখে খুশি নয়, এ-বাড়িতে এমন সব লোকের অভাব নেই। ভেবে দ্যাখো মানিক, ভালো করে ভেবে দ্যাখো!'

—'ভাবছি।'

—'দুই আর দুইয়ে কত হয়?'

—'চার।'

'অতএব আজ রাত্রে জয়ন্তের ও মানিকের গৃহপ্রবেশ নিষেধ। ঘরে আলো জ্বালা নেই। অন্ধকারে হয়তো ওখানে অনন্ত নিদ্রা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব সকাল না-হওয়া পর্যন্ত উদ্যান ভ্রমণই প্রশস্ত।'

—'আমার আর ঘুম পাচ্ছে না জয়ন্ত!'

'অপরাধীদের ওপরে নিয়তির কী অভিশাপ আছে জানি না, খুব মাথা খাটিয়ে গুছিয়ে কাজ করেও প্রায়ই তারা শেষ রক্ষা করতে পারে না। এই জন্যেই তারা মরে। দ্যাখো না, খালি বাক্সটা এমন চোখের সামনে ফেলে রেখে যাবার কী দরকার ছিল?'

পরদিন সকালে বিছানার ওপরে এবং খাটের তলায় আবিষ্কৃত হল, মস্ত মস্ত দুটো কেউটে সাপ। কিন্তু ছোবল মারবার আগেই রিভলভারের গুলিতে তাদের উদ্যত ফণা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

নতুনপুরের শ্মশান

বেলা আর একটু বাড়লে পর কুমুদ এসে হাজির। সমস্ত শুনে এবং মরা সাপ দুটো স্বচক্ষে দেখে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল।

তারপর বললে, 'আপনাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়।'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'আমাদের তো আর বেশিক্ষণ এখানে থাকবার প্রয়োজন হবে না! আমার ভবিষ্যদ্বাণী মনে আছে তো? কালকের মধ্যেই আপনি খুনিকে গ্রেপ্তার করবেন।'

—'ঠাট্টা করে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্তবাবু! আমার এলাকায় তিন তিনটে খুনি পলাতক, তাদের একজন আবার আমাদের কাছে-কাছে থেকেই নতুন খুন করবার চেষ্টায় আছে, আর আমি কিছুই করতে পারছি না! হ্যাঁ, ভালো কথা। শশাঙ্কবাবুকে সমস্ত বলেছেন?'

—'না। মিছে তাঁকে ব্যস্ত করে লাভ কী?'

—'কাল রাতে বাগানে যাকে দেখেছিলেন, সে সুরেন নয় তো?'

'দূর থেকে চিনতে পারিনি। সুরেন হলেও হতে পারে। সে কাপুরুষ আর নির্বোধ দুই-ই। ও-শ্রেণীর লোক ভয় পেলে সব করতে পারে।'

'আর আপনি তাকেই ছেড়ে দিলেন! না জয়ন্তবাবু, আর আমি আপনার কথা শুনছি না। আজ এখনই সুরেনকে গ্রেপ্তার করব।'

—'আজকের দিনটাও দয়া করে অপেক্ষা করুন। এখন আগে আমাকে একবার শ্মশানটা দেখিয়ে আনুন।'

—'মিথ্যেই সেখানে যাওয়া। সেখানে গিয়ে দেখবেন খালি কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি, দু-চার টুকরো হাড় আর ছাইয়ের গাদা। পদচিহ্নগুলো পর্যন্ত আর নেই।'

—'তবু একবার যাব। যে-পথ দিয়ে খুনি গিয়েছিল, সেই পথ দিয়েই আমি যাব। চলো মানিক! কুমুদবাবু, আপনি জনচারেক পাহারাওয়ালা সঙ্গে নেবেন।'

—'কেন?'

—'সাবধানের মার নেই।'

—'যা বলেছেন। যেসব কাণ্ড হচ্ছে!'

—'আসুন! আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে শ্মশানের পথ ধরব।'

বাগান দিয়ে সকলে খিড়কির দরজার দিকে যাচ্ছে হঠাৎ শশাঙ্ক তাদের দেখতে পেলে। ওপরের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'একী ব্যাপার! সকলে মিলে দল বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

মানিক বললে, 'শ্মশান ভ্রমণে।'

—'হ্যাঁ, বেড়াবার মতো জায়গা বটে! আমিও আপনাদের সঙ্গী হব নাকি?'

—'স্বচ্ছন্দে।'

মিনিট-দুয়েক পরেই শশাঙ্ক তাদের দলে এসে জুটল। তখন সে বোধহয় সবে পুজো সেরে উঠেছে—কারণ, তার পরনে গরদের ধুতিচাদর, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। সেই পোশাকেই শশাঙ্ক শ্মশানের পথ ধরলে।

মানিক বললে, 'কাল অত রাত পর্যন্ত দক্ষিণা-কালিকার পুজোর মন্ত্র আউড়েও আপনার আশা মেটেনি? এর মধ্যেই আবার আর এক দফা পুজো সারা হয়ে গেল?'

—'কী আশ্চর্য, রাত্রের কথা আপনি কী করে জানলেন?'

—'কাল যা গুমোট গেছে! আমি আর জয়ন্ত বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আপনার গলা শুনতে পেয়েছি!'

শশাঙ্ক লজ্জিতভাবে বললে, 'অসার সংসারে একটু-আধটু মায়ের নাম করি, ওর ওপরে আর দৃষ্টি দেবেন না!'

কুমুদ বললে, 'আপনি পুণ্যাত্মা, তাই পরলোকের পথ পরিষ্কার করছেন। আমরা হচ্ছি মহাপাপিষ্ঠ, দিন-রাত কেবল মায়াকেই আঁকড়ে পড়ে আছি।'

জয়ন্ত বললে, 'শশাঙ্কবাবুও মায়ার ভক্ত। তবে ছার মায়া নয়,—মহামায়া!'

তারা শ্মশানের পথে এসে পড়ল। পথ চওড়ায় পুরো চার হাতও হবে না বোধহয়। কখনও ছোটো ছোটো মাঠের ওপর দিয়ে, কখনও কাঁটা-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এবং কখনও বা বাঁশবনের পাশ দিয়ে সেই পথ এঁকে-বেঁকে এগিয়ে প্রায় মাইলখানেক পরে শ্মশানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ-পথটা হচ্ছে শশাঙ্কবাবুদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে। এর ধারে হাট-বাজার বা বাড়িঘর নেই, কাজেই এখানে বড়ো-একটা পথিকের দেখা পাওয়া যায় না। নতুনপুরের লোক শ্মশানে যায় বড়ো রাজপথ দিয়ে।

কুমুদ আঙুল দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'ঘটনার পর তিন-চারবার বৃষ্টি হওয়াতে পদচিহ্নগুলো অনেক জায়গাতেই লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওই দেখুন, মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট ছাপ এখনও দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি না হলে কঠিন কাদার ওপরে ছাপগুলো আরও সুস্পষ্ট থাকত। ঘটনার পর পুলিশের লোক ছাড়া আর কেউ বোধহয় এ-পথে আসেনি। এ-পথে লোক না চলার আরও একটা কারণ আছে। অনেকের বিশ্বাস, এটা হচ্ছে ভূতুড়ে পথ,—রাত্রে এখানে যারা দেখা দেয়, তারা মানুষ নয়। পথটা মাঝে-মাঝে জলার পাশ দিয়ে গেছে তাই আলেয়া জ্বলে। সেইজন্যেই এই কুসংস্কার আর কী!'

শশাঙ্ক বললে, 'কেবল তাই নয়। কোনও-কোনও ডানপিটে লোক রাত্রে এ-পথে এসে আর বাড়িতে ফেরেনি।'

কুমুদ বললে, 'তাই নাকি? তাদের মৃতদেহ এই পথে পাওয়া গিয়েছে?'

শশাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বললে, 'না। তাদের মৃতদেহ আর পাওয়া যায়নি।'

কুমুদ সচমকে বললে, 'পাওয়া যায়নি মানে? দেহসুদ্ধ লোকগুলোর প্রাণ কি পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে গেল?'

শশাঙ্ক তেমনি গম্ভীর স্বরেই বললে, 'কী হল, কোথায় গেল, কেউ জানে না! তবে তারা যে আর বাড়িতে ফেরেনি, বা তাদের দেহও যে আর পাওয়া যায়নি, এটা সত্যি কথা।'

কুমুদ যেন নিজের মনে-মনেই বললে, 'তা হলে এ অঞ্চলে মানুষের অদৃশ্য হওয়া দেখছি খুবই সাধারণ ঘটনা! মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য হয়, পুলিশও তাদের খুঁজে পায় না!'

যেন একটু ব্যঙ্গের স্বরেই শশাঙ্ক প্রতিধ্বনি করে বললে, 'না, পুলিশও তাদের খুঁজে পায় না। কুমুদবাবু, আপনি দু-দিন তো এখানে এসেছেন, আপনি কেমন করে জানবেন? কিন্তু আমরা সকলেই জানি আর বিশ্বাস করি, শ্মশানের এ-পথটা হয়েছে অনেকের পক্ষেই মহাপ্রস্থানের পথ। যাক ও-কথা। এই আমরা শ্মশানে এসে পড়েছি।'

ছোটো শ্মশান। একদিকে কালভৈরবের ছোটো একটি পুরানো মন্দির ছাড়া আর কোনও

ঘর নেই। পাশেই একটা পুকুর,—তার ঘাট ভাঙা, জল নোংরা। শ্মশানের দু-দিকে রয়েছে দুর্ভেদ্য অরণ্য; চিতার কাঠ কাটবার সময় ছাড়া মানুষ তার কাছে যায় না এবং তার ভিতরে প্রবেশ করবার কোনওরকম পথই দেখা গেল না।

জয়ন্ত একলা চারিদিকটা একবার ঘুরে এল।

কুমুদ বললে, 'আমি কি ভুল বলেছি জয়ন্তবাবু? দেখছেন তো, এখানে এসে আপনার কোনওই লাভ হবে না?'

জয়ন্ত সে-কথা কানে না তুলে বললে, 'প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ খুনির পায়ের দাগ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল!'

কুমুদ অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বললে, 'এইখানে।'

জয়ন্ত দেখলে, তারপরেই রয়েছে ছোটো একটা জঙ্গল, কাঁটাগাছে ভরা।

সে বললে, 'এ-জঙ্গলে মানুষ ঢুকতে পারে শশাঙ্কবাবু?'

শশাঙ্ক জোরে মাথা নেড়ে বললে, 'অসম্ভব!'

—'যদি ঢোকে?'

'কাঁটাগাছে সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

—'কিন্তু খুনের পরে মানুষ হয় মরিয়া। খুনি যদি আহত হয়েও ওর মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে?'

শশাঙ্কের চেয়ে জোরে মাথা নেড়ে কুমুদ বললে, 'তা সে যায়নি জয়ন্তবাবু, তা সে যায়নি। ও-সন্দেহ আমারও মনে আছে। জঙ্গলটার চারদিকে আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও একটাও পায়ের দাগ দেখতে পাইনি।'

—'খুনি যদি শ্মশানের অন্য কোনও দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে?'

—'পায়ের দাগ সে-কথা বলে না, শ্মশানের আর কোথাও তার পদচিহ্ন নেই। যেখানে তার পায়ের দাগ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর সে যে ফিরে শ্মশান থেকে বেরিয়ে শশাঙ্কবাবুর বাড়ির দিকে গিয়েছে, পায়ের দাগ দেখে তা ধরতে পেরেছি।'

জয়ন্ত কোনও জবাব না দিয়ে হঠাৎ কী-যেন দেখে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার করলে। এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'নস্যি খুব ভালো জিনিস কুমুদবাবু! মাথা সাফ হয়। এক টিপ নেবেন নাকি?'

—'না, ধন্যবাদ। আর আমাদের এখানে কোনও কাজ আছে?'

—'আপনি ঠিক বলেছেন। খুনি শেষ পদচিহ্ন ফেলেছিল এইখানেই। আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্নতা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু কেবল দৃষ্টির তীক্ষ্নতাই সব নয়, তার পরেও আর একটা শক্তি না থাকলে চলে না।'

—'কী শক্তি?'

—'মস্তিষ্ক-চালনার শক্তি। সে শক্তিকে আপনি কখনও কাজে লাগাননি।'

কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট স্বরে কুমুদ বললে, 'কেন?'

—'মানুষ কর্পূর নয়, উবে যায় না। সে মাটির ওপরে দাগ ফেলে চলতে বাধ্য; তার ডানা নেই যে উড়ে পালাবে।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে কুমুদ বললে, 'আমিও সে-কথা জানি জয়ন্তবাবু! কিন্তু—'

—'এখানে কোনও কিন্তু নেই। খুনি যখন বেরিয়ে যায়নি, তখন সে শ্মশানেই আছে।'
—'এখনও?'
—'এখনও।'
—'কী বলছেন!'
—'ঠিক বলছি। ওই দেখুন!'—জয়ন্ত জঙ্গলের এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ওখানে বুনো ঝোপের তলায় লোহার ডান্ডার মতো কী-যেন দেখা যাচ্ছে না?'

—'হ্যাঁ। বোধহয় শাবল।'

কুমুদ হাত বাড়িয়ে সেটা টানতেই কিসের শব্দ হল—লোহায়-লোহায় ঠোকাঠুকির মতো। জয়ন্ত বললে, 'বোধহয় ওখানে কোদালও আছে।'

সত্য! কুমুদ হস্তচালনা করে একটা কোদালও বার করলে। বললে, 'এর অর্থ কী?'

—'অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। খুনি এখনও এখান থেকে পালাতে পারেনি।'

—'সে কি জঙ্গলে লুকিয়ে আছে?'

—'পাগল! সে ঠিক আমার পায়ের তলায় মাটির ভেতরে লুকিয়ে আছে। দেখছেন না, আশপাশের জমিতে ঘাস রয়েছে, কেবল এইটুকু জায়গাতেই নেই!'

কুমুদ এক মুহূর্ত কী ভাবলে, তারপর হঠাৎ লাফ মেরে দুহাতে জয়ন্তের দুখানা হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু! স্বীকার করছি, গোয়েন্দাগিরিতে আপনার কাছে আমি শিশু! আপনি এত সহজে যে সত্য আবিষ্কার করলেন, তার জন্যে এত দিন ধরে আমরা অন্ধের মতো অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছিলুম! ঠিক, ঠিক! জমির এই অবস্থা, এই শাবল আর কোদাল দেখেই সব বোঝা যাচ্ছে!'

—'হুঁ! খুনিকে কেউ খুন করে এইখানে পুঁতে রেখেছে। তাই সে শ্মশান থেকে বেরুতে পারেনি।'

—'তা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি খুনির বন্ধু নয়, শত্রু?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে!'

—'সে কে? সুরেন?'

—'না অন্য কেউ। তার পায়ের মাপ আপনার কাছে আছে। সুতরাং প্রমাণের অভাব হবে না।'

—'তাকে আপনি জানেন?'

—জানি বইকী! ওই যে, ওই যিনি শ্মশানের পথ দিয়ে দৌড় মেরেছেন রেসের ঘোড়ার মতো!'

—'উনি তো শশাঙ্কবাবু! কিন্তু উনি অত ছুটছেন কেন!'

—'পাছে আপনি ওঁর পায়ের মাপ নেন!'

—অ্যাঁঃ, অ্যাঁঃ! বলেন কী? আপনি কি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন? আপনি কি যাদুকর? সেপাই, সেপাই! শিগগির ওই বাবুর পিছনে ছোটো। ও যেন পালাতে না পারে। ওকে ধরে আনো...কিন্তু—কিন্তু, এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না...তবে অসম্ভবই বা কী? রাগ সামলাতে না পেরে খুনিকে খুন করে উনি প্রতিশোধ নিয়েছেন!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'কিন্তু হয়তো উনি অতটা সাধুও নন। আমার বিশ্বাস—খুনিকে উনিই নিজের ভাইয়ের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, আসল ব্যাপার নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে—আগে তো এখানকার মাটি খুঁড়ে দেখা যাক!'

জয়ন্ত শাবল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং কুমুদ কোদাল নিয়ে মাটি তুলতে লাগল। মাটি বেশ আলগাই ছিল, বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে হল না—প্রথমেই দেখা গেল, মানুষের দুখানা বিবর্ণ ও স্ফীত পা!

মানিক নাকে কাপড়-চাপা দিয়ে পিছিয়ে আসতে আসতে ঘৃণাভরে বলে উঠল, 'জয়ন্ত,

তুমি কী করে এ-বিকট গন্ধ সহ্য করছ? প্রমাণ তো পেলে, এখন উঠে এসো—মুদ্দোফরাস ডেকে এনে মড়াটাকে বার করো!'

জয়ন্ত শাবলটা ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ কুমুদবাবু, এ-গন্ধ সহ্য করা অসম্ভব! মুদ্দোফরাসদের খবর দিন।'

একজন জমাদারও কুমুদের সঙ্গে এসেছিল, সে তখনই গিয়ে চারজন মুদ্দোফরাস ডেকে আনল।

যে মৃতদেহটা তারা ওপরে টেনে তুললে, পচে ফুলে তা হয়ে উঠেছিল বীভৎস! মাথায় তার লম্বা চুল, শরীরের স্থানে-স্থানে এখনও দেখা যাচ্ছে সিন্দুরের ও রক্তচন্দনের চিহ্ন এবং গলায় ঝুলছে তখনও শুকনো জবাফুলের মালা!

কুমুদ বললে, 'এই বোধহয় সেই খুনি সন্ন্যাসী! কিন্তু এমনভাবে রক্তচন্দন, সিন্দুর মেখে আর জবার মালা পরে কেউ কখনও খুন করতে যায়!'

মুদ্দোফরাসরা সবিস্ময়ে জানালে, গর্তের মধ্যে আরও দুটো লাশ আছে!

কুমুদ যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, 'বলিস কী রে, বলিস কী রে!'

জয়ন্তের মুখ বিষম গম্ভীর হয়ে উঠল।

এবারে যে দুটো দেহাবশেষ বেরুল, তাদের অবস্থা অভাবিতরূপে ভয়ানক। একটা তো একেবারে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে আর একটা কঙ্কালের স্থানে স্থানে কিছু-কিছু গলিত মাংস লেগে আছে, এইমাত্র।

কুমুদ হতভম্বের মতো বললে, 'এ দুটো কাদের শেষ চিহ্ন? কে এদের খুন করলে?'

জয়ন্ত বললে, 'খুনি যে শশাঙ্ক তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে এরা যে কারা, সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। এদের এখানে দেখব বলে আমি আশা করিনি।'

মানিক বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার এলাকা থেকে আরও দুজন লোক অদৃশ্য হয়েছে বলেছিলেন না? এরা তারা নয় তো?'

—'তা কী করে হবে? তাদের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক কী?'

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বললে, 'তাদের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক আছে কি না জানি না। তবে তাদের অদৃশ্য হবার পরে-পরেই শ্যামাকান্ত বকশি আর এক মাড়োয়ারি খুন হয়—যাদের টাকা লেনদেনের ব্যাবসা ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের দুজনেরই কাছে শশাঙ্ক প্রচুর টাকা ধার করেছিল!'

কুমুদ যেন আপন মনেই বললে, 'তিনটে খুন একরকম—হত্যা করা হয়েছে গলা টিপে! তিন বারেই খুনের আগের দিনে একজন করে লোক গুম হয়। এখানেও একত্রে পাওয়া গেল তিনটে লাশ! জয়ন্তবাবু, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, যুক্তি খেই হারিয়ে ফেলছে! এ কী রহস্য!'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত আমি তোমাকে জানি—তুমি অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু মানতে চাও না। কিন্তু এখানে যেন কোনও অপার্থিব রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে। অন্তত সেইটুকু অস্বাভাবিকতাকে মেনে নিলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে আসে।'

জয়ন্তও ঠিক সেইরকম কিছু ভাবছিল কি না প্রকাশ করলে না, কেবল বললে, 'তোমার কী মনে হয় মানিক?'

মানিক বললে, 'শশাঙ্ক যে তান্ত্রিক, কুমুদবাবুও তা জানেন বোধহয়?'

—'আপনি কী বলতে চান তা জানি না মানিকবাবু। তবে আমি কানাঘুষোয় শুনেছি, শশাঙ্ক নাকি প্রায়ই গভীর রাতে একলা শ্মশানে এসে পুজোটুজো করত। কিন্তু এসব শোনা কথা নিয়ে আমি কোনওদিন মাথা ঘামাইনি।'

মানিক বললে, 'মন্ত্রগুণে মড়া যে জ্যান্ত হয়, শশাঙ্কবাবু পরশু রাতে আমাদের কাছে সেই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি নিজেও ছিলেন শবসাধক।'

জয়ন্ত অধীর স্বরে বললে, 'বেশ তো, তার সঙ্গে এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কী?'

—'তন্ত্রোক্ত শবসাধকদের কথা নিশ্চয়ই তুমি পড়ে দেখেছ। বিশ্বাস করো আর না করো, কিন্তু নানা তন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে শবসাধকরা অপঘাতে মরা শবকে বাঁচাতে পারে, আর নানারকম অলৌকিক উপায়ে ঘটনাস্থলে হাজির না হয়েও—অর্থাৎ দূরে বসে শত্রু বধ করতে পারে।'

—'বেশ। তারপর?'

—'ধরো আমিই যেন শশাঙ্ক। আমি জনকয় শত্রু নিপাত করতে চাই। এক-একবারে এক-একজনকে নিয়ে পড়লুম। আগে এমন এক-একজন গরিব বা ভবঘুরে লোক বেছে নিলুম, যারা অদৃশ্য হলেও খুব বেশি গোলমাল হবে না। প্রথম বারে নির্বাচন করলুম এক গরিব চাঁড়ালকে। যারা শবসাধক তাদের কাছে মড়া খুব প্রিয়। চাঁড়ালকে ভুলিয়ে গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলুম। নতুনপুরের শ্মশান অতি নির্জন। শবকে রাত্রে এখানে এনে মন্ত্রপ্রভাবে করলুম জীবন্ত। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিলুম শত্রুসংহার করবার জন্যে। ঘটনার সময়ে যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলেও আমার ভয় নেই—আমি আছি শ্মশানে বসে। শব ফিরে এলে পর মন্ত্রপ্রভাবেই তার জীবনহরণ করলুম। তারপর শ্মশানের মধ্যেই একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে শবকে পুঁতে ফেললুম। এইভাবে বারেবারে আমি দিলুম তিন শত্রুকে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে, অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাতে প্রাণ গেল আরও তিন বেচারি গরিবের!'

—'মানিক, তুমি কি আমাকে এইসব বিশ্বাস করতে বলো?'

—'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না। তবু তুমি বা আমি যা কুসংস্কার বলে মনে করি, সেইদিক দিয়েই এই রহস্যটার একটা অস্বাভাবিক—কিন্তু সঙ্গত কারণ খোঁজবার চেষ্টা করছি। দ্যাখো কুমুদবাবু বলছেন একজন চাঁড়ালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর দ্যাখো, সন্ন্যাসীর যে-লাশ পাওয়া গেছে, তাকে রক্তচন্দন মাখিয়ে, জবার মালা পরিয়ে পুজো করা হয়েছিল তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কে না জানে, শবসাধকরা এমনিভাবে মড়া পুজো করে? অন্য দুটো মড়াকেও ওইভাবে পুজো করা হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু তাদের পচা মাংসের সঙ্গে পুজোর চিহ্নগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর দ্যাখো, শশাঙ্ক তান্ত্রিক, তার ঘরে সাজানো মড়ার মাথা; আর মড়া যে মন্ত্রে জ্যান্ত হয়—এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তর্কও করেছে। রাত্রে শ্মশানে গিয়ে তার যে পুজো করার অভ্যাস আছে, তাও শোনা যাচ্ছে। জয়ন্ত, এ-সবের কী অর্থ তুমি করতে চাও?'

জয়ন্ত কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিরক্তভাবে।

কুমুদ বললে, 'দেখুন, ঝাড়-ফুঁক, মারণ-উচাটন, শবসাধন, প্রেততত্ত্ব—আইন এসব মানে না। সুতরাং আইনের দিক দিয়ে এসব প্রমাণ বলেই গণ্য নয়। কিন্তু অলৌকিক হলেও আপনি যা বললেন, তার মধ্যে যুক্তি পাওয়া যায়। নইলে অদ্ভুত এই তিন ব্যক্তির একইভাবে মৃত্যু, অদ্ভুত এই তিন ব্যক্তির ঘটনার আগের দিনেই অদৃশ্য হওয়া, আর অদ্ভুত এই তিন মৃতদেহের একই স্থানে আবিষ্কার—এ-সবের মধ্যে কোনও যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক পাওয়া যায় না।'

জয়ন্ত হঠাৎ উচ্চস্বরে হাস্য করে বলে উঠল, 'ওসব আজগুবি যুক্তির কোনও ধার আমি ধারি না। কেন যে এখানে তিন-তিনটে দেহ বা কঙ্কাল পাওয়া গেল, তা নিয়ে আমার বেশি মাথাব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, সত্যিকার গোয়েন্দা-রূপে আমি হত মৃগাঙ্ক আর তার হত্যাকারীকে কেমন করে আবিষ্কার করেছি, তার আইন-সম্মত ইতিহাসের উল্লেখ করতে পারি, শুনুন!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

কার্য ও কারণের ইতিহাস

জয়ন্ত বলতে লাগল

'কুমুদবাবু! মানিক! ডিটেকটিভের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। ডিটেকটিভের উচিত, বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে কিছুই সত্য বলে গ্রহণ না করা।'

শশাঙ্ক খুনিকে ধরবার জন্যে খুব-বেশি জিদ দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু গোড়া থেকেই আমি তার উপরে সন্দেহ করেছিলুম। মুখে জিদ দেখিয়ে তলে-তলে সে আমাদের বিপথে চালনা করতে চেয়েছিল।

অকারণে কেউ কাউকে খুন করে না। প্রত্যেক খুনের মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। শশাঙ্ক আমাদের সন্দেহকে সন্ন্যাসীর দিকে চালনা করবার চেষ্টায় ছিল বটে, কিন্তু সে-চেষ্টা আমার কাছে সফল হয়নি। সত্য, মৃগাঙ্কের ওপরে সন্ন্যাসীর রাগ ছিল। মার খেলে কার না রাগ হয়? কিন্তু কোথাকার এক ভবঘুরে, সহায়-সম্পদহীন সন্ন্যাসী, মার খেয়েও সে যে মৃগাঙ্কের মতো প্রতাপশালী এক জমিদারের বাড়িতে একা ঢুকে তাকে হত্যা করতে সাহস করবে, এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তার উপরে সে বিদেশি, শশাঙ্কদের বাড়ির পথঘাট জানবে কেমন করে? তাই প্রথমে আমি সন্ন্যাসীকে সন্দেহ করিনি, তবে পরে করেছিলুম—আর তার কারণও পরে বলব।

যখন শুনলুম মৃগাঙ্কের মৃত্যুর পর তার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে শশাঙ্ক, তখন তাকেই আমি সন্দেহ না করে পারিনি। প্রত্যেক হত্যাকারীই নিজেকে অতিরিক্ত চালাক বলে মনে করে। কেউ-কেউ ভাবে, পুলিশকে সাহায্য করলে তাদের আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কেননা তারা জানে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নেই।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বেশ বুঝতে পারলুম, হাতে-নাতে যেইই খুন করে থাকুক, বাড়ির কোনও লোকই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে হত্যাকারীকে পথ দেখিয়ে এনেছে, আর ঘটনার পর দরজা বন্ধ করে সকলের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছে। সন্ন্যাসী যদি রাগের মাথায় মৃগাঙ্ককে একলা খুন করে সরে পড়ত, তা হলে বাড়ির দরজা খোলাই থাকত। পুলিশের চোখে এ-রহস্যটা ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু পদচিহ্ন দেখে তারাও বুঝতে পেরেছিল, বাড়ির ভেতরে এমন কোনও লোক আছে, যে খুনির বন্ধুও হতে পারে—অন্তত খুনের ও খুনির কথা জানে।

শশাঙ্কের ঘরে ঢুকে আর-একটা সন্দেহজনক প্রমাণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটা হচ্ছে একটা কাদামাখা জামা—অর্থাৎ কোট। শশাঙ্ক বললে বটে, ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবার সময়ে কাদায় আছাড় খেয়ে তার জামার ওপর কাদা লেগেছে, কিন্তু তার ও-ওজরে আমি

ভুলিনি। সাধারণত কাদায় আছাড় খেলে মানুষের জামা-কাপড়ের একদিকটাই হয় বেশি কর্দমাক্ত। কিন্তু এই কোটটার চারিদিকেই ছিল কাদা। বিশেষ করে হাত দুটো ছিল পুরু কাদায় যেন বারংবার চোবানো, তার ওপরে আবার ঘাসের কুচিও লেগে ছিল। দেখলেই মনে হয়, এ-জামার মালিক যেন বৃষ্টির দিনে মাঠে-ময়দানে ভিজে, জমি খুঁড়ে গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাটি তুলেছে। তখন ও-ব্যাপারটার কারণ খুঁজে পাইনি বটে, কিন্তু মনে একটা খটকা লেগে রইল।

ইতিমধ্যে আরও দু-একটা ছোটো ঘটনা আমার লক্ষ্যকে একটু বিক্ষিপ্ত করে দিলে। যে-রাত্রে শশাঙ্কের বাড়ি পরিদর্শন করি, লুকিয়ে কে আমার পিছু নেয়। তারপর আমার ঘরে আড়ি পাততে গিয়ে সুরেন ধরা পড়ে। এই দুটি কারণে শশাঙ্কের ওপর থেকে আমার সন্দেহের মূল খানিকটা আলগা হয়ে গেল। ভাবলুম, শশাঙ্ক নয় তার বাড়ির অন্য কোনও লোক বা কর্মচারীই হয়তো খুনের ব্যাপারে জড়িত আছে, খুনিকে সাহায্য করেছে।

কিন্তু সুরেনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মনে হল, লোকটা বোকা আর ভীরু—এমন একটা ভয়াবহ অপরাধের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। নিশ্চয়ই সে অন্য মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হচ্ছে। কিন্তু কার মস্তিষ্ক?—তার ওপরে প্রভুত্ব আছে এমন কেউ। এখানে তার প্রভু হচ্ছে শশাঙ্ক, মনিবের কথা সে শুনতে বাধ্য। কিছুক্ষণ পরেই আমার সে-সন্দেহ পাকা হল, যথাস্থানে তা বলছি।

তারপর আর এক কাণ্ড। কুমুদবাবু যাকে খুনির শত্রু বা মিত্র বলে সন্দেহ করেছিলেন, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের ছাপের ছাঁচ শশাঙ্কের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। এ-রকম দৈব-দুর্ঘটনা অসম্ভব নয়, বরং প্রায়ই এটা ঘটে থাকে। কিন্তু সে-সময়ে আমি ছাড়া আর কেউ একটা বিষয় লক্ষ করেননি। আমাদের হাত ফসকে হঠাৎ কোনও জিনিস পড়ে যাবার পরই আমরা 'ওই যাঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠি,—কিন্তু মনে রাখবেন, পড়ে যাবার আগে নয়,—পরে!

আমি বেশ ভালো করেই লক্ষ করলুম, শশাঙ্ক আগে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যাঃ' বলে,—ছাঁচ-জোড়া হাত থেকে ছেড়ে দিলে তার পরমুহূর্তেই!

এ থেকে কী বোঝায়? সে ইচ্ছা করেই ছাঁচ-জোড়া ফেলে দিলে,—'ওই যাঃ' বলে চ্যাঁচালে কেবল আমাদের ঠকাবার জন্যেই। কেমন, তাই নয় কি?

খুব তুচ্ছ, ছোটো ঘটনা! কিন্তু সময়ে সময়ে নগণ্য ঘটনাও যে কতবড়ো হয়ে উঠতে পারে, এটা তারই মস্ত প্রমাণ! এই একটি ছোটো ঘটনাই আমার মনে সব রহস্য পরিষ্কার করে দিলে!

দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের ছাঁচ শশাঙ্ক স্বেচ্ছায় ফেলে দিলে কেন? ও ছাঁচ নষ্ট করে তার কী লাভ?

তা হলে শশাঙ্কই কি দ্বিতীয় ব্যক্তি? ঘটনার পর সেইই কি খুনির পেছনে শ্মশানে গিয়ে ফিরে এসেছিল একাকী? তাই কি সে তার বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড়ো চাক্ষুষ প্রমাণ নষ্ট করতে চায়?

কিন্তু শশাঙ্ক জানত না, ছাঁচ তোলবার আগে পুলিশ পায়ের ছাপের ফোটো তোলে ও সঠিক মাপ নেয়। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

এই ঘটনাতেই ধাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল, শশাঙ্কের কাদা মাখা জামার কথা! শ্মশানে

ফিরে যাবার পর সন্ন্যাসীর সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে! সন্ন্যাসীর লাশটাকেই লুকিয়ে রাখবার জন্যে শশাঙ্ক কি স্বহস্তে শ্মশানের মাটি খুঁড়েছিল?...

তার খানিক পরেই সুরেন পড়ল পুলিশের কবলে। আমি তার চরিত্র-বিচার করতে ভুল করিনি। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বললুম, 'সুরেন, আমি জানি যে, তোমার মনিব শশাঙ্কের হুকুমেই তুমি আমার পিছু নাও, আমার ঘরে আড়ি পাতো। এ কথা যদি স্বীকার করো, তা হলে এখনই ছাড়ান পাবে; নইলে খুনের দায়ে তোমার হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে।'

সুরেন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে তখনই আমার পায়ে ধরে সব কথা স্বীকার করলে।

তারপর কুমুদবাবুর মুখে শুনলুম এক বিচিত্র কথা! দেড় মাসের মধ্যে একই থানার এলাকায় একইভাবে তিন ব্যক্তির হত্যা ও প্রত্যেকবারেই ঘটনার আগের দিনে এক-এক ব্যক্তির অন্তর্ধান!

এর কোনও মানে হয় না। মানিকের আজগুবি ব্যাখ্যার পরেও এর মানে হয়েছে বলে মনে করি না। তবে একটা সন্দেহ হয় যে, এই তিন হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাজ করেছে একই মস্তিষ্ক।

শ্যামাকান্ত বকশি আর মাড়োয়ারি—অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় হত ব্যক্তির খাতাপত্র পরীক্ষা করে আমি আবিষ্কার করলুম, ওদের কাছ থেকে শশাঙ্ক 'হ্যান্ড-নোটে' ধার নিয়েছিল যথাক্রমে দশ হাজার আর আট হাজার টাকা এবং খুনের পর 'হ্যান্ড-নোট' দুখানা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এইটুকু প্রমাণের ওপরেই নির্ভর করে বলা যায় না যে, শশাঙ্কই তাদের হত্যা করেছে বা করিয়েছে। তবে এ-প্রমাণ পেয়ে আমার লাভ হল। আমি বুঝতে পারলুম, জমিদার হলেও শশাঙ্ক ভোগ করছে অত্যন্ত অর্থকষ্ট।

কুমুদবাবুর কাছ থেকে পদচিহ্নের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করে আমি এইভাবে শেষটা আমার মামলা খাড়া করলুম

যে-কারণেই হোক শশাঙ্কের বড়োই টাকার টানাটানি। টাকার জন্যে সে সব পাপ করতেই প্রস্তুত।

সে ভেবে দেখলে, মৃগাঙ্কের মৃত্যু হলে তার আর টাকার ভাবনা থাকে না। কিন্তু কেমন করে মৃগাঙ্কের মৃত্যু হবে? স্বহস্তে ভ্রাতৃহত্যা করতে পারবে না সে—বিশেষ, কেউ যদি দেখে ফেলে, বা হঠাৎ সে ধরা পড়ে যায়? অতএব মৃগাঙ্ককে মারতে হবে অন্যের হাতে এমনভাবে, যাতে কেউ শশাঙ্কের ওপরে সন্দেহ করতে না পারে।

দৈবগতিকে সুযোগ মিলল। নতুনপুরের শ্মশানে এল এক বিদেশি সন্ন্যাসী এবং মৃগাঙ্কের হাত থেকে সে খেলে মার। সন্ন্যাসী অভিশাপ দিলে, তা চারিদিকে রটতে বিলম্ব হল না।

শশাঙ্ক লুকিয়ে গেল সন্ন্যাসীর কাছে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে গরিব ও ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীকে রাজি করালে মৃগাঙ্ককে হত্যা করতে। তারই পরামর্শে সন্ন্যাসী শ্মশান থেকে অদৃশ্য হল।

দুর্যোগের রাত্রে সন্ন্যাসী আবার শ্মশানে ফিরে এল। বৃষ্টি থামবার পর সে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করলে। শশাঙ্ক অপেক্ষা করছিল—তাকে খিড়কির দরজা ও বাড়ির দরজা খুলে দিলে নিজের হাতে।

খুনের পর শশাঙ্ক তাকে আবার নির্জনে শ্মশানে ফিরে যেতে বললে—খুব সম্ভব এও জানালে যে, বকশিশের টাকা সে নিজে শ্মশানে গিয়ে একটু পরেই তার হাতে দিয়ে আসবে।

খানিক পরে শ্মশানে শশাঙ্কের প্রবেশ ও তার হস্তে সন্ন্যাসীর মৃত্যু। মাটি খুঁড়ে সন্ন্যাসীকে কবর দিয়ে শাবল ও কোদাল ঝোপে লুকিয়ে শশাঙ্কের প্রস্থান।

কিন্তু অপরাধীরা কেউ জানলে না, তাদের নৈশ ভ্রমণ-কাহিনি লেখা রইল কর্দমাক্ত পৃথিবীর বুকে, পদচিহ্নের রেখায় রেখায়।

শশাঙ্ক নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল, আমি তার অনেক কীর্তি জেনে ফেলেছি। সেইজন্যেই আমাদের মতো বিপজ্জনক অতিথির মুখ বন্ধ করতে এসেছিল দুই কেউটে সাপ। আমাদের মৃত্যুর পর পুলিশ ভাবত, দৈব-দুর্ঘটনা। পল্লিগ্রামে বর্ষাকালে এমন ঘটনা নিত্যই ঘটে।

সাপ-দুটোকে আমাদের ঘরে রেখে গিয়েছিল কে,, সেটা আবিষ্কার করবার ভার রইল পুলিশেরই ওপরে। সে সুরেনও হতে পারে, অন্য কেহও হতে পারে।

আমি এসেছি মৃগাঙ্কের হত্যাকারীকে ধরতে। অন্য দুটো লাশের কথা নিয়ে আপাতত আমার মাথাকে ভারাক্রান্ত করব না। অতএব এইখানেই আমার কথা ফুরুল।

কুমুদ খানিকক্ষণ চমৎকৃত হয়ে রইল। তারপর অভিভূত কণ্ঠে বললে, আজ বুঝলুম, কেন আপনার এত নাম! আমার হাতের কাছে সব প্রমাণ রয়েছে, তবু আমি ঠিক সূত্র ধরতে পারিনি! কিন্তু আপনি অনায়াসেই জুলিয়াস সিজারের ভাষায় বলতে পারেন—'আমি জয় করলুম! ধন্য।'

জয়ন্ত বললে, 'না কুমুদবাবু, নিজেকে অতটা তুচ্ছ মনে করবেন না। আপনি এ-মামলাটার জন্যে যে তোড়জোড় করছেন, বাংলা-পুলিশের ইতিহাসে তা দুর্লভ! সত্যিকথা বলতে কী, আপনার রচিত পদচিহ্নের অপূর্ব ইতিহাসই আমার সাফল্যের প্রধান কারণ।'

কুমুদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'সন্ন্যাসীর তো কিনারা হল! কিন্তু আপনি আমার ঘাড়ে দু-দুটো বেওয়ারিস মড়া চাপিয়ে গেলেন। আদালতে মানিকবাবুর যুক্তি শুনলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতুম! কিন্তু সেখানে ওসব কথা তুললে আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবে পাগলা গারদে।'

মানিক আহত স্বরে বললে, 'আমার যুক্তি কি এতই বাজে?'

জয়ন্ত বললে, 'না মানিক, প্রেততত্ত্ববিদদের কাছে তোমার যুক্তি বাজে নয়। কিন্তু তুমি জানো, আমরা প্রেততত্ত্ববিদ নই। ...এখন চলো, শশাঙ্কের খোঁজে যাই। দেখি, সে অপরাধ স্বীকার করে কি না।'

কিন্তু তাদের আর শশাঙ্কের খোঁজে যেতে হল না, দুজন পাহারাওয়ালা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সেইখানেই জানিয়ে দিলে শশাঙ্কের শেষ-সংবাদ।

তারা যা বললে তার মর্ম হচ্ছে এই

শশাঙ্ক প্রাণপণে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গলায় দড়ি দিয়ে কলা দেখিয়েছে ফাঁসিকাঠকে।

সুতরাং জয়ন্ত বা মানিক কার অনুমান সত্য, সে-কথা বোঝবার আর কোনও উপায়ই রইল না। কেবল জানা গেল, আসল অপরাধী হচ্ছে শশাঙ্কই।

নৃমুন্ড শিকারী

নৃমুণ্ড শিকারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্দর-সন্ন্যাসী

দুনিয়ায় শুভ ঘটনা বেশি ঘটে না।

আজকের পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনার ফর্দের দিকে তাকালে ভয়ে চমকে উঠতে হয়।

জাপান তার জ্ঞাতি ভাই চীনের বিরাট দেহ কেটে টুকরো টুকরো করবার চেষ্টায় আছে। ইতালি আবিসিনিয়াকে খুন করে আবার ফ্রান্সের গলা টেপবার মতলব আঁটছে; জার্মানি প্রায় সারা ইউরোপের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বিরাট এক জগন্নাথের রথের মতো এবং সমগ্র ইংলন্ডের আকাশে করছে প্রচণ্ড মৃত্যু-বৃষ্টি!

অথচ ভেবে দেখ। যে সব দেশে ঐ সব অশুভ হানাহানি চলছে সেখানকার উপাস্য হচ্ছেন শান্তি ও প্রেমের ঠাকুর খ্রিস্ট ও বুদ্ধদেব!

কিন্তু ও সব তো হচ্ছে মহা মহা ঘটনা। ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়। ওদেরই সঙ্গে দুনিয়ায় ওসবের তুলনায় ঢের ছোট অথচ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অশুভকর এত ঘটনা নিত্যই ঘটে যার হিসেব রাখা অসম্ভব; বলতে গেলে বলতে হয়, অশুভ ঘটনার তরঙ্গের পর তরঙ্গে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে মানুষ বেঁচে আছে কায়ক্লেশে কোনরকমে।

এত কথা মনে হচ্ছে কেন, জান? সম্প্রতি কলকাতায় আর তার আশেপাশে এমন কাণ্ড নিত্যই ঘটছে যা কেবল অশুভ বা ভীষণ নয়, বীভৎসও বটে।

এ অঞ্চলে নৃমুণ্ড শিকারীর আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথম ঘটনা ঘটে জগন্নাথ ঘাটের কাছে। একজন মাড়োয়ারি শেষ রাতে গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছিল! সকালবেলায় তার মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেল পথের ওপরে।

পরদিন সকালে টালার কাছে খালের ধারে আবিষ্কৃত হল এক পাহারাওয়ালার মৃতদেহ, তারও মুণ্ড পাওয়া গেল না।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে খিদিরপুর ডকের কাছে। রাতের গুমোটে এক কুলি খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। কে বা কারা এসে বেচারার মুণ্ড কেটে নিয়ে যায়।

এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটল উপরি উপরি পনের বার। কখনও কাশীপুরে—কখনও খিদিরপুরে, কখনও ব্যারাকপুরে, কখনও কালীঘাটে, কখনও হাওড়া-শিবপুর-শালিখায় এবং কখনও কলকাতার প্রান্তবর্তী জায়গায় পাওয়া যেতে লাগল মুণ্ডকাটা দেহের পর দেহ।

আতঙ্কে নগরবাসীরা স্তম্ভিত! পুলিশের দলবল পাগলের মত শহরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল—কিন্তু বৃথা! নরবলি বন্ধ হল না।

রাত নটার পর শহরের পথে আর জনপ্রাণীকে দেখা যায় না। থিয়েটার বায়স্কোপ-এর রাত্রের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। একদিন সকালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে এক মাতাল ইংরেজ নাবিকের স্কন্ধকাটা মৃতদেহ পাবার পর থেকে চৌরঙ্গিতেও মহা বিভীষিকার সঞ্চার হল।

কেল্লা থেকে গোরা ফৌজ আনিয়ে পথে পথে পাহারা বসান হল। তখন নরবলি হয় শহরের বাইরে অন্য কোন জায়গায়। ফৌজ আর কতদূর পাহারা দেবে?

এমন চুপি চুপি খুনিরা কাজ সেরে চম্পট দেয় যে, কাকপক্ষীও টের পায় না। এতগুলো খুন হল—কিন্তু খুনিদের দেখা তো দূরের কথা! টুঁ শব্দও কারোর কানে ওঠেনি। খুনিরা যেন ইন্দ্রজাল জানে, তারা যেন মৃত্যুর মত নিঃশব্দ ও অদৃশ্য।

কাগজওয়ালারা পুলিশের অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল। টাউনহল-এ মস্তবড় আন্দোলন সভা বসিয়ে নগরবাসীরা প্রশ্ন তুলল—আমরা ট্যাক্স দিয়ে পুলিস পুষছি কেন? আমাদের মাথাগুলো ঢুকল হাঁড়িকাঠে আর পুলিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে বলে? মুশকিলে পড়ে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করলেন, যে এই নৃশংস হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা এক আর হত্যাকারীকে ধরা এক। হত্যার সংখ্যার সঙ্গে পুরস্কারের টাকার সংখ্যাই কেবল বাড়তে লাগল।

পাথুরেঘাটার মেয়ো হাসপাতালের কাছে এক দিন একসঙ্গে দুটো লোকের মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেল। পুলিস তদন্তে প্রকাশ পেল তারা দুজনেই দুটি গুণ্ডা। তাদেরও ব্যবসা দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাহাজানি খুনখারাপি। খুব সম্ভব, পুরস্কারের লোভেই রাত্রে খুনি ধরতে পথে বেরিয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রধান নগর কলকাতার বুকের ওপর যে এমন অসম্ভব সব ঘটনা ঘটতে পারে, এটা কেউ দুঃস্বপ্নেও মনে আনতে পারেনি। বিলাতের পার্লামেন্টেও এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ভারত গভর্নমেন্ট থেকে কলকাতা পুলিসের ওপরে এল জোর হুমকি।

কিন্তু বেচারা পুলিস করবে কি? হত্যাকারীরা এমন সুচতুর ও সাবধানী যে ঘটনাস্থলের কোথাও সামান্য একটা সূত্র রেখে যায় না। আর এইসব অদ্ভুত হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি! কোথাও নিহত ব্যক্তিদের ট্যাঁক বা পকেট থেকে একটা পয়সাও চুরি যায়নি। এ খুনির দল জাত মানে না, উচ্চ-নিচ, বৃদ্ধ-জোয়ান, গরিব-ধনী, সাহেব বা বাঙালি বা মাড়োয়ারি বা মুসলমান কিছুই বিচার করে না—যেন তেন প্রকারে সে কেবল কাটা মুণ্ড হস্তগত করতে চায়। মানুষের মাথা তো পাঁঠার মুড়ি নয়, এত মুণ্ড নিয়ে খুনিরা করে কি? আর একটা রহস্যও লক্ষ্য করবার মত! যারা মারা পড়েছে, সবাই পুরুষ। খুনিরা নারী হত্যা করে নি।

ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে গরমাগরম ধমক খেয়ে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু আর কোন উপায় না দেখে শখের গোয়েন্দা জয়ন্তের কাছে ধর্না দিয়ে পড়লেন।

চৌকির কোণে বসে পা নাচাতে নাচাতে জয়ন্ত বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশি, আর তার সঙ্গে তবলার সঙ্গত করছে মানিক।

সুন্দরবাবু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—হুম। আমার চাকরি যায়-যায়। আর তোমরা করছ আনন্দ। মজায় আছ।

জয়ন্ত বাঁশি থামিয়ে বলল—আনন্দ তো করছি না সুন্দরবাবু, চিন্তা করছি।

সুন্দরবাবু বললেন—চিন্তা করছি বললেই হল—স্বচক্ষে দেখছি প্যাঁ প্যাঁ কঁরে বাঁশি বাজাচ্ছ, স্বকর্ণে শুনছি বাঁশির পোঁ আওয়াজ—এর নাম তোমার চিন্তা করা?

—আমি যে বাঁশি বাজাতে বাজাতেই চিন্তা করি, সুন্দরবাবু।

—চিন্তা করো, না ছাই করো। বাঁশি বাজিয়ে চিন্তা। যত সব অনাসৃষ্টি। দুশ্চিন্তায় পড়েছি বটে আমি, তোমার আবার কিসের চিন্তা হে?

জয়ন্ত হেসে বলল—গভর্নমেন্টের দশ হাজার টাকার পুরস্কার পনের হাজারে উঠেছে। এর পরেও একটু চিন্তা করব না?

—হুম। তা হলে এই ভুতুড়ে খুনখারাপিগুলো গিয়ে তোমারও টনক নাড়িয়েছে?

—টনক না নড়লে উপায় কি? নইলে আপনাকে সাহায্য করব কেমন করে? আপনি যে সাতঘাটের জল খেয়ে আমার কাছেই সাহায্য চাইতে আসবেন, এটা তো জানা কথা। কাজেই আগে থাকতেই কাজ সেরে রাখছি।

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন—আমাকে সাহায্য করবে, না কচুপোড়া করবে। এবারে সে-গুড়ে বালি। এ সব খুনের কোন মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—মানে না পাওয়া যাক, দুটো সূত্র আমি খুঁজে পেয়েছি।

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির ওপরে দুই হাত রেখে মস্ত এক লাফ মেরে সবিস্ময়ে বললেন—দুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছ! কোথায়?

—সেই গুণ্ডা দুজনের লাশ আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছি। আমার মতে খুনিদের দলে এমন একজন লোক আছে, গায়ের জোরে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে বলবান লোককেও টিপে মেরে ফেলতে পারে। আর একজন লোক আছে, যে খুব শৌখিন। সে যদি বাঙালিই হয় তবে তার নাম ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুজ্যে হলেও অবাক হব না। সে উচ্চ শ্রেণীর দামি এসেন্স ব্যবহার করে, দোক্তা দিয়ে পান খায়।

দুচোখ বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে—তা হলে তুমি খুনিদের চেন?

—না অনুমানে বলছি। গুণ্ডাদের দেহ দুটো দেখেছেন? হত্যাকারীর আলিঙ্গনে বা হাতের চাপে তাদের দেহের হাড়গুলো নানাস্থানে ভেঙে গেছে—তারা কোন আশ্চর্য শত্রুর কবলে পড়েছিল। তার পাল্লায় পড়লে আমিও বাঁচতাম না, অথচ আমার শক্তির নমুনা আপনার অজানা নেই। মৃতদেহ দুটো গঙ্গার ধারে রাস্তার ওপর পড়েছিল। আমি রাস্তা ছেড়ে গঙ্গার গর্ভে নেমে এই রুমালখানা দৈবগতিকে কুড়িয়ে পেয়েছি। দেখছেন, রুমালখানা রক্তমাখা? হত্যাকারী হাতের রক্ত মুছে রুমালখানা গঙ্গাজলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু রুমাল যে জলে না পড়ে ডাঙায় গিয়ে পড়ল, অন্ধকারে অতটা তার নজরে আসে নি। রুমালের এককোণে তিনটে ইংরেজি হরফে তোলা রয়েছে—I., B. B.। ওতে আন্দাজ করতে পারি, রুমালের মালিকের নাম—যদি সে বাঙালি হয়, ইন্দুভূষণ বসু বা বাঁড়ুজ্যে বা অন্য কিছু! রুমালে রীতিমত দামি এসেন্স আর দোক্তার গন্ধ পাওয়া গেছে—দোক্তা দেওয়া পান খেয়ে সে মুখ মুছেছিল।

সুন্দরবাবু সানন্দে বলে উঠলেন—রুমালের আর এককোণে ধোপার মার্কাও রয়েছে। জয় ভগবান, হুম।

জয়ন্ত বলল—সেইজন্যেই তো রুমালখানা আপনার হাতে দিলাম! খোঁজ নিয়ে দেখুন কোন থানার এলাকায় কোন ধোপা ঐ মার্কা, কার জামা-কাপড়ে ব্যবহার করে!

সুন্দরবাবু বেজায় ফুর্তির সঙ্গে বললেন—আঃ বাঁচলাম! এতদিনে একটা সূত্রের মত সূত্র পাওয়া গেল! বিলাতি পার্লামেন্টের এক সভ্য নাকি বলেছেন, কলকাতা পুলিসে অনেক অকেজো লোকের ভিড় হয়েছে! লজ্জায় আমাদের মুখ দেখাবার যো নেই।

মানিক এতক্ষণ পরে বলল—বিলাতি পুলিসের বাহাদুরিই আমরা দেখি, কিন্তু তারাও 'জ্যাক-দি-রিপারে'র কি করতে পেরেছিল?

সুন্দরবাবু বললেন—জ্যাক-দি-রিপার কে?

—একজন অজানা হত্যাকারী। নারীদের হত্যা করে অকারণেই সে তাদের দেহ ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে রেখে যেত! সেইজন্যে তাকে Ripper অর্থাৎ ছেদনকারী উপাধি দেওয়া হয়েছিল। লন্ডন শহরে বিলাতি পুলিসের বুকের ওপর বসে রাত্রের পর রাত্রে সে নারীর পর নারী হত্যা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিস তাকে পোল্যান্ড থেকে আগত এক ইহুদি বলে সন্দেহ করে, তার চেহারারও বর্ণনা পায়, এমন কি বিলাতি পুলিসের বড়কর্তার সামনে সে নিজে সশরীরে এসে দেখাও দেয়। তবু তাকে বন্দী করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবাবু, এসব উপন্যাসের বাজে কথা নয়, একেবারে সত্যি কথা।

জয়ন্ত বলল—মানিক, জ্যাক-দি-রিপারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি উপকার করলে। জ্যাক-দি-রিপারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এখানকার এই সব হত্যাকাণ্ডের এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে। জ্যাকের মত এ হত্যাকারীও অকারণেই নরহত্যা করছে। এ টাকাকড়ি নেয় না, খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে পালায়। এমন মুণ্ড চুরি অর্থহীন। বিলাতি পুলিসের মতে, জ্যাক ছিল বাতিকগ্রস্ত উন্মত্ত। এও তাই নাকি?

সুন্দরবাবু বললেন, পাগলে কখনও এমন চালাকের মত পুলিস আর সারা শহরের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে?

—বাতিকগ্রস্ত পাগলদের আপনি চেনেন না, সুন্দরবাবু। কেবল বিশেষ বাতিক ছাড়া তাদের মধ্যে উন্মাদ রোগের আর কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

সুন্দরবাবু বললেন—দাঁড়াও না, আগে ধোপাকে খুঁজে বের করি, তারপর তার বাতিক ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

জয়ন্ত বলল—ধোপা সম্বন্ধে অত বেশি নিশ্চিন্ত হবেন না সুন্দরবাবু! কারণ হত্যাকারী যদি কলকাতার লোক না হয়, তবে? ধোপার খবর তাহলে পাবেন কেমন করে? তারচেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ধরবার জন্যে আর এক চেষ্টা করা যেতে পারে।

—কি চেষ্টা? যা বল; আমি রাজি আছি।

—রাজি আছেন? তাহলে ছদ্মবেশ পরে দু-এক রাত বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, সেইখানে বসে থাকতে পারেন?

—কেন?

—দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল হচ্ছে গঙ্গা বা খালের কাছাকাছি জায়গায়। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীরা শেষ রাতে নৌকোয় চড়ে রোঁদে বেরোয়। তারপর মনের মত শিকারের সন্ধান পেলেই নরবলি দিয়ে আবার নৌকোয় চড়ে পালায়। আপনি থাকলে বাইরে প্রকাশ্যভাবে আজ আমরা দলবল নিয়ে কাছেই লুকিয়ে থাকব। আপনার মাথার লোভে হত্যাকারীরা যদি এগিয়ে আসে—

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন—ধন্যবাদ, এ প্রস্তাবে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে। আমার মুণ্ডটা যদি হঠাৎ খোয়া যায়, তাহলে খালি ধড়টা নিয়ে আমি কি করব? হুম! এ হচ্ছে মারাত্মক প্রস্তাব!

জয়ন্ত বলল—আপনার ভয় পাবার কোনও কারণই নেই! আমরা বন্দুক নিয়ে আপনার মূল্যবান টাকমাথার ওপরে কড়া পাহারা দেব।

অনেকবার না না করে সুন্দরবাবু শেষটা রাজি হলেন।

—বেশ, তাই হবে। আমি পোর্ট পুলিসের লোককেও একখানা মোটর বোট নিয়ে কাছাকাছি কোথাও হাজির থাকতে বলব।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল—সর্বনাশ, ও কথা মনেও আনবেন না! হত্যাকারীরা কি এতই বোকা যে, পোর্ট পুলিসের বোট চিনতে পারবে না? তারা নিশ্চয়ই অন্ধ নয়! বেশি লোকেরও দরকার নেই, আমি আর মানিকই আপনার মাথা বাঁচাবার পক্ষেই যথেষ্ট। বেশি লোক থাকলেই গোলমাল হবে।

রাত সাড়ে তিনটের সময়ে সুন্দরবাবু প্রাণটি হাতে করে গুটি গুটি খাল ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এসে হাজির হলেন।

তাঁর মাথায় জটাজুট, মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি, পরনে গৈরিক বস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম।

খালের মুখে রেলওয়ে ব্রিজ, তার কোলেই গঙ্গার ধারে একটুখানি বাঁধান জায়গা। সেইখানে বসে পড়ে সুন্দরবাবু চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, জয়ন্ত ও মানিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

বোঝা গেল না। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এতটা পথ হেঁটে আসবার সময়েও সুন্দরবাবুর সঙ্গে অন্যলোক তো দূরের কথা, একটা পাহারাওয়ালারও দেখা হয়নি। সারা শহর যেন ভয়ে দম বন্ধ করে বোবা হয়ে আছে!

কলকাতা শহর যে গোরস্থানের মত এত নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে, এ কথা ধারণা করা যায় না। আগে আগে শেষরাতে যারা প্রাতঃস্নান করতে আসত, আজকাল তারাও দরজায় খিল লাগিয়ে ঘরের ভেতরে বসে থাকে।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করলেন সুন্দরবাবু। জয়ন্ত আর মানিক যদি কাছাকাছি না থাকে? যদি তারা ঠিক সময় আসতে না পারে? তাহলেই তো খাঁড়ার এক কোপে তাঁর মুণ্ড উড়ে যাবে।

আকাশে চাঁদ নেই, শেষ রাতে গ্যাসের আলোগুলোও নিভে গেল। গঙ্গার বুকে দূরে মাঝে মাঝে নৌকোর দাঁড় ফেলার শব্দ হয়, আর সুন্দরবাবু চমকে ওঠেন, আর ভাবেন—ওই রে, এল বুঝি রে!

সুন্দরবাবু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। জপ করবার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে তিনি বসে রইলেন এবং মনে মনে সত্য সত্যই দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এল। সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে 'হুম' বলে উঠে দাঁড়ালেন। হত্যাকারীরা এল না বলে তাঁর মনে এক তিলও দুঃখ হল না।

কিন্তু নাছোড়বান্দা জয়ন্তর তাড়নায় তাঁকে পরদিনও সন্ন্যাসীর এই বিপজ্জনক অবস্থায় অভিনয় করতে হল।

সে রাতেও চাঁদের ছুটি। গ্যাসের আলো নিভে গেল। সুন্দরবাবুর বুক ঢিপ ঢিপ, ঘর্মাক্ত কলেবর।

চোখ কপালে তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, ও-মা দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী। কালরাত পুইয়ে দাও মা, এরপর চাকরি গেলেও আর আমি এ মুখো হচ্ছি না। ও-মা, কখন ভোর হবে মা, কখন কাক-চড়াই ডাকবে, কখন ধাঙড়েরা রাস্তা ঝাঁট দিতে বেরোবে!

কাছেই কোথাও তিন-চারটে কুকুর যেন কি দেখে আতঙ্কে কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। সুন্দরবাবুর সন্দিগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি অন্ধকারের চারিদিকে ডুবে ডুবে যাকে দেখা যায় না সেই ভয়ঙ্করকেই খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল।

হঠাৎ তাঁর গায়ে কাঁটা দিল—গঙ্গার একটানা কুলু কুলু শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন! খালের জলে নৌকো চলার শব্দ। সুন্দরবাবুর মনে হল, সে যেন মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি!

শব্দ থামল। সব চুপচাপ। তারপর লোহার সাঁকোর রেলিঙের ওপর থেকে যেন বিষম ভারি কি একটা লাফিয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি একটু ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকালেন। অন্ধকার ভেদ করে বৃহৎ আর ছায়ার মত কি একটা মূর্তি গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে! দুটো প্রদীপ্ত চক্ষু, হিংস্র পশুর দৃষ্টি। ওগুলো কি চকচকিয়ে উঠছে? দাঁত! মানুষের মতই বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মানুষের আকার।

অমানুষিক মূর্তি আরও কাছে এল। সুন্দরবাবুর নাকে ঢুকল একটা বোঁটকা দুর্গন্ধ।

এখনও জয়ন্ত আর মানিকের সাড়া নেই। তাঁর মুণ্ড কচাং করে কাটা না গেলে কি তাদের হুঁশ হবে না? তারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে...না, আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। মূর্তিটাকে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। সুন্দরবাবু রিভলবার বার করে খট করে ঘোড়া টিপে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—জয়ন্ত! মানিক! আমাকে বাঁচাও।

রিভলবারের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই মহা আক্রোশে ও যন্ত্রণায় কে যেন বিকট এক গর্জন করে উঠল। সুন্দরবাবু সন্দেহ হল, সে গর্জন মানুষের নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোমাঞ্চকর উপহার

বাগবাজারের খাল যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে সেখানে যে রেলপথের সাঁকো আছে, কলকাতায় সেটি একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। সাঁকোটি হচ্ছে দোতলা। সেটি এমন কায়দায় তৈরি যে, যখন তলা দিয়ে বড় বড় নৌকো আনাগোনা করতে চায়, তখন সাঁকোর সমস্ত একতলার অংশটি রেললাইন সুদ্ধ শূন্যে অনেকটা ওপরে উঠে যায়।

এই সাঁকোর কাছে একখানা খালি মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তারই ভেতরে লুকিয়ে ছিল জয়ন্ত আর মানিক। সেইখান থেকেই তারা সুন্দরবাবুর ব্যাকুল চিৎকার শুনতে পেল।

তখন একেবারে শেষ রাত; কিম্বা সে সময়টাকে উষার আসন্ন জন্মমুহূর্তও বলা যায়! যদিও তখনও আলো ফোটেনি কিন্তু রাত-আঁধারি পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ!

জয়ন্ত ও মানিক চোখের নিমেষে গাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়ল! আর তার পরেই তাদের মনে হল, সাঁকোর পাশের লোহার মই বেয়ে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি প্রতি পদক্ষেপে মহাশব্দ সৃষ্টি করে খুব তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে যাচ্ছে। অত বৃহৎ মূর্তির অতখানি তৎপরতা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়।

ওদিক থেকে সুন্দরবাবু রিভলবারে আরও তিন-চার বার অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

জয়ন্ত ও মানিক যখন সাঁকোর কাছে এসে পড়ল, সুন্দরবাবু হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, জয়ন্ত ভাই! আমাতে আর আমি নেই। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি।

কিন্তু তারা কেউ তাঁর কাঁদুনি শোনবার জন্যে ফিরে তাকিয়ে দাঁড়াল না, তীব্র বেগে ছুটে এসেই লোহার মই বেয়ে সাঁকোর দোতলায় উঠতে লাগল!

সুন্দরবাবু আবার একলা। ভয়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটল হাজার হাজার সর্ষে ফুল এবং তাঁর কানে ঢুকল আর একটা আওয়াজ। একখানা নৌকো জলে ছপাং ছপাং শব্দ তুলে খালের এপার ছেড়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

গঙ্গার ধারে সারি সারি নৌকো বাঁধা ছিল। তার ভেতরে যে সব মাঝি-মাল্লা ঘুমোচ্ছিল, সুন্দরবাবুর বিকট চিৎকারে ও রিভলবারের শব্দে তাদের ঘুম গেল ভেঙে—তারাও বাইরে বেরিয়ে এসে মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলল। তাদের গোলমাল শুনে সুন্দরবাবু কতকটা ধাতস্থ হলেন—অন্ধকারের ভয়াবহ নির্জনতা ও বুক-চাপা স্তব্ধতার কবল থেকে নিস্তার পেয়ে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেই হাতির মত ভারি অদ্ভুত জীবটা সাঁকোর দোতলায় উঠে ধুম ধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছিল, এখন সে সব গেছে থেমে থুমে। জয়ন্ত ও মানিকেরও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপার কি? তাদের দেহের সঙ্গে মুণ্ডের সম্পর্ক এখনও বজায় আছে তো?—মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হতেই সুন্দরবাবুর কান্না পেল। কিন্তু তবু তাঁর এমন ভরসা হল না যে, সাঁকোর ওপরে উঠে ব্যাপার কী, উঁকি মেরে দেখে আসেন।

মিনিট পনেরর মধ্যেই পূর্ব আকাশে যখন ঊষার প্রথম আলোর ঝর্ণা খুলে গেল, গাছে গাছে পাখিরা যখন প্রভাত সূর্যের উদ্দেশ্যে বন্দনা-গীত রচনা করতে লাগল, তখন দেখা গেল—জয়ন্ত ও মানিক সাঁকোর রেলপথের ওপর দিয়ে আবার ফিরে আসছে।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম! তোমরা উঠলে সাঁকোর দোতলায়, নেমে পড়লে কখন হে?

জয়ন্ত বলল—অনেকক্ষণ। সেই মূর্তিটাকে ধরবার জন্যে আমরা সাঁকোর ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর আবার কি! আপনি অসময়ে রিভলবার ছুড়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তাকে ধরব কেমন করে?

—হুম! অসময়েই রিভলবার ছুড়েছি বটে! স্বচক্ষে দেখলাম, পাঁচ ছ হাত তফাতে একটা কিম্ভূতকিমাকার রাক্ষস! তার চোখ দুটো করছে দপ দপ আর দাঁতগুলো করছে চক চক! আর তার গায়ে কী বোঁটকা গন্ধ রে বাবা! রিভলবার ছুড়তে আর এক সেকেন্ড দেরি করলে তোমরা কি আমার মাথাটা আর কাঁধের ওপরে খুঁজে পেতে?

—রিভলবার ছুড়ে তাকে যদি বধ করতে পারতেন, তা হলেও একটা কথা ছিল!

—কি করব ভাই, টিপ যে ঠিক হল না, আমার হাত যে ঠক ঠক করে কাঁপছিল! আমি তো তবু রিভলবার ছুড়ে তাকে ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তাকে দেখলে নিশ্চয়ই তোমাদের দাঁত কপাটি লেগে যেত!...কিন্তু সে পালাল কোন দিকে?

—খালের ওপারের গুদামের পর গুদাম, তারই অলিগলির ভেতরে বোধহয় সে লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না, কিছুই দেখা গেল না, কিন্তু আমরা আরও তিন-চারজন লোকের জুতো পরা পায়ের শব্দ পেয়েছি। যেন তারাও দৌড়ে পালাচ্ছিল!

—হুম! গলা কাটারা নিশ্চয়ই দল বেঁধে এসেছিল, সেই কিম্ভূত কিমাকারের আবির্ভাবের আগে আর পরে খালের মুখে আমি নৌকোর শব্দ শুনেছি। নৌকোয় চড়ে তারা এসেছিল, আবার পালিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত বলল—সেকথা আমরাও জানি। আমরা যখন সাঁকোর দোতলায়, নৌকাখানা তখন খালের ওপারে গিয়ে লাগল। তারপরেই শুনলাম দুড়দাড় করে পায়ের শব্দ। কিন্তু নিচে নেমে নৌকোর মধ্যে জন-প্রাণী দেখতে পেলাম না।

মানিক বললে—কিন্তু নৌকোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এই রামদাখানা। তাড়াতাড়িতে তারা ভুলে গেছে। সে একখানা বড় চকচকে রামদা তুলে দেখাল।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন—বাপরে, ঐ রামদাটা এনেছিল তাহলে আমার গলাতেই বসাতে?

মানিক বলল—রামদার বাঁটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওখানে একটি 'S' হরফ খোদা আছে।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন—তাই তো হে, তাই তো!...কিন্তু জয়ন্ত, সেই রুমালের কোণে ছিল। I. B. B. এই তিনটে অক্ষর!

জয়ন্ত বলল—হয়ত এটা হচ্ছে দলের আর কোনও লোকের নামের আদ্যাক্ষর।

—সে নৌকোখানা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

—নৌকোখানা একজন পাহারাওয়ালার জিম্মায় রেখে এসেছি। কিন্তু সেখানা পরীক্ষা করে নতুন কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না। তার গায়ের নম্বর তুলে ফেলা হয়েছে। হয় সেখানা চোরাই নৌকো, নয় রাতের অন্ধকার ছাড়া তাকে চালান হয় না। কিন্তু সুন্দরবাবু, যদিও আজকে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল তবু আমরা অন্ধকার হাতড়ে গোটা কতক দরকারি সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমতঃ দলের একজনের আদ্যাক্ষর হচ্ছে 'I', আর একজনের 'S'; দ্বিতীয়ত আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে, ওদের দলে একজন অদ্ভুত চেহারার অতিকায় লোক আছে, আর সেই সর্বপ্রথমে চুপি চুপি এসে আক্রমণ করে; তৃতীয়ত তারা মানুষের মুণ্ড কেটে নেয় রামদার কোপ মেরে, কারণ এর বাঁটের ধারে শুকনো রক্তের দাগ লেগে রয়েছে; চতুর্থত এরা বলি দেবার মানুষ খুঁজে বেড়ায় শেষ রাতে গঙ্গার ধারে নৌকোয় চড়ে। উপরন্তু, ধোপার একটা মার্কাও পাওয়া গেছে। এতোগুলো সূত্র এত সহজে পাওয়া ভাগ্যের কথা, ওর একটা না একটা নিশ্চয়ই আমাদের কাজে লেগে যাবে।

সুন্দরবাবু বললেন—তোমার কথা যদি সত্যি হয়, ওই হতচ্ছাড়া গলাকাটার দল নৌকোয় চড়েই আনাগোনা করে থাকে, তাহলে এ মামলা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে মরি কেন? এসবের তদন্ত করুক পোর্ট পুলিস, আমাদের পক্ষে মানে মানে সরে দাঁড়ানোই ভাল।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বলল—তা আর হয় না সুন্দরবাবু! মামলাটা হাতে যখন নিয়েছি, আমাদের কৌতূহল যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনি সরে পড়লেও আমরা আর ছাড়ব না। পোর্ট পুলিসের সঙ্গেই কাজ করব।

সুন্দরবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন—ওই তো তোমাদের রোগ—একগুঁয়েমির জন্যই একদিন তোমরা পটল তুলবে! বেশ! আমিও তোমাদের সঙ্গেই থাকব না হয়, কিন্তু তোমাদের কাছে এই মিনতি, আমাকে আর কখনও সন্ন্যাসী সাজতে বল না! ছিপ ধরে মৎস্য শিকার করবে তোমরা আর

আমার মাথাটা হবে তোমাদের শখের টোপ—এ মারাত্মক ব্যবস্থাটা তেমন যুৎসই বলে মনে হচ্ছে না।

মানিক বলল—সুন্দরবাবু, এতদিন আমি ভাবতাম যে, আপনি নিজের দেহের মধ্যে টাক পড়া দুঃখিত মাথাটার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন! কিন্তু আজ দেখছি আপনি মাথার জন্যেও মাথা ঘামান।

সুন্দরবাবু মুখ খিঁচিয়ে বললেন—মানিকের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে হাড় যেন জ্বলে যায়! চল জয়ন্ত, এখন বাসার দিকে ফেরা যাক।

তখন সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মাণিকের চারিদিকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত জনতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা সবাই বিশেষ আগ্রহে ঠেলাঠেলি করে সব কথা শোনবার চেষ্টা করছিল। আকাশে তখন সূর্য দেখা দিয়েছে অন্ধকারের সব রহস্য চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে। দু-তিনজন পাহারাওয়ালাও এতোক্ষণ পরে নিরাপদ গুপ্তস্থান থেকে অকুতোভয়ে আত্মপ্রকাশ করে বুক ফুলিয়ে লাঠি হাতে ভিড় তাড়াতে তাড়াতে নিজেদের জীবন্ত অস্তিত্বের প্রমাণ না দিয়ে পারল না।

সুন্দরবাবু তাদের দেখেই খাপ্পা হয়ে বললেন—ওরে ডাল রুটি চোট্টা হনুমান পাঁড়ে আর জাম্বুবান চোবের বাচ্চারা। এতক্ষণ কোন গর্তে ঢুকে হিল্লী-দিল্লী ফতে করছিলে, যাদু? গরিব-নিরীহদের গলাধাক্কা দিয়ে এখন তো খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছ। কিন্তু একটু আগে আমি যখন স্কন্ধ কাটা হবার ভয়ে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটাচ্ছিলাম, তখন তোমরা কানে তুলো গুঁজে কোথায় ছিলে, বাপধন? রোসো, সব রাস্কেলের নামে রিপোর্ট করছি।

সকলে গঙ্গার ধার ছেড়ে খালের পাশ দিয়ে বাড়িমুখো হল।

জয়ন্ত কড়া নাড়ামাত্র বেয়ারা এসে ভেতর থেকে দরজাগুলো খুলে দিল। তারপর বলল—একটা হিন্দুস্থানী লোক এসে আপনাকে খুঁজছিল।

জয়ন্ত একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—এত সকালে কে সে?

—জানি না হুজুর। একটা কাঠের বাক্স হাতে দিয়ে বলল, তার বাবু নাকি সেটা হুজুরকে ভেট দিয়েছেন। বলেই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাক্সটা আমি বৈঠকখানার টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছি।

জয়ন্ত আরও বেশি বিস্মিত হয়ে বলল—দুনিয়ায় মানিক ছাড়া এমন বন্ধু কে আছেন, কাক-চিল ডাকতে না ডাকতেই আমাকে ভেট পাঠাবার জন্যে যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? চল তো, বৈঠকখানায় ঢুকে আগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা যাক।

সকলে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখল, মাঝখানের বড় টেবিলটার ওপরে বসান রয়েছে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স। তার চারিদিকেই পেরেক আঁটা। একদিকের পেরেকগুলো খুলতে খুলতে জয়ন্ত বলল, উপহারের কিঞ্চিত নূতনত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। বাক্সটা বেশ ভারি।

একটু পরেই ডালাটা খুলে গেল। বাক্সের ভেতর দিকে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—চমৎকার উপহার! সুন্দরবাবু, এরকম উপহার পেলে আপনি বোধ হয় খুবই খুশি হতেন?

সুন্দরবাবু বললেন—উপহার লাভের ভাগ্য আমার নেই। আমার বরাত চিরদিনই খারাপ। দেখি, তুমি কি পেলে? কিন্তু এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে একবার মাত্র উঁকি মেরেই তিনি যেন বিষম ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসে বিকট স্বরে বলে উঠলেন—হুম হুম, হুম হুম!

মানিকও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ভেতরে তাকিয়ে সভয়ে দেখল, তার চোখের পানে

আকৃষ্ট চোখে চেয়ে আছে একটা রক্তহীন রোমাঞ্চকর কাটামুণ্ড। সে মুণ্ড ভারতীয়র নয়, ইংরেজের।

জয়ন্ত কঠোর রবে অট্টহাস্য করে উঠল—হে অজানা বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ! এ উপহারের কথা জীবনে আমি ভুলব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেল্লা মার দিয়া

এ কী ভয়ানক ভেট!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে আরও পিছিয়ে পড়ে একখানা চেয়ারের ওপরে তাঁর প্রায় অবশ বিপুল দেহখানি স্থাপন করলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—ফ্যান খুলে দাও, ফ্যান খুলে দাও। হুম! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মানিক বিজলি-পাখা চালিয়ে দিল। জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাক্সের ভেতরটা আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

নৃমুণ্ড শিকারীরা যে একজন ইংরেজ খালাসিকেও বলি দিয়েছে, খবরের কাগজে সে কথাটাও প্রকাশ পেয়েছে যথাসময়ে। জয়ন্ত বুঝল, এ হচ্ছে সেই খালাসিটারই কাটামুণ্ড। কোনও ধারালো অস্ত্রের এক কোপে বেচারার মুণ্ডটাকে দেহ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ দেখে হঠাৎ কাটামুণ্ডের মাথার সোনালি চুলের ভেতর একবার হাত বুলিয়ে নিল।

তারপর একটু বিস্মিত স্বরে বলল—দেখছি, মুণ্ডটাকে স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। চুলগুলো এখনও ভিজে রয়েছে, বাক্সের ভেতর থেকেও স্পিরিটের গন্ধ বেরোচ্ছে।

মানিক বলল—তার মানে?

—মুণ্ডটাকে বোধ হয় জিইয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল!

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন—ও বাবা, সে কি? বরফ-টরফ দিয়ে লোকে মাছ মাংসই টাটকা রাখে জানি, খাবে বলে। স্পিরিটের মধ্যে ফেলে এরা কাঁচা মড়ার মাথা টাটকা রাখতে চেয়েছে কেন? এরা মানুষের মুড়ো খায় নাকি?

মানিক বলল—হতে পারে। আর সেইজন্যেই হয়ত আপনার মুড়োর ওপরে ওদের লোভ পড়েছিল।

সুন্দরবাবু রেগে টং হয়ে বললেন—তুমি কি বলতে চাও, মানিক?

—আমি বলতে চাই, আপনার মুড়োটাও পেলে ওরা হয়ত পচতে দিত না, স্পিরিটে ভিজিয়ে টাটকা রাখত। তারপর কোনও শুভদিনে হয়ত সুন্দরবাবুর মুড়ো দিয়ে সুন্দর ডাল রেঁধে ফেলত। তবে দুঃখের কথা এই যে, সে মুড়োর ডাল খাবার জন্যে কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ করত না।

সুন্দরবাবু এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত বেরোল না।

জয়ন্ত বলল—মানিক, ঠাট্টা-ঠুট্টি রেখে এখন কাজের কথা শোন।...এই কাটামুণ্ডটা আমাদের কাছে কেন পাঠানো হয়েছে?

মানিক বলল—নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে। খুনিরা আমাদের চেনে আর ভয় করে, তাই তারা বলতে চায়, আমরা যদি ওদের পথ থেকে সরে না দাঁড়াই, তাহলে আমাদেরও ঐ দশা হবে।

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বলল—বোধ হয় তোমার আন্দাজ ভুল নয়! কিন্তু এখন কতকগুলো কথা ভেবে দেখ। আমরা যে এই মামলা হাতে নেব, কালকের আগে আমরাই তা জানতাম না। সুতরাং এটা বোঝা শক্ত নয় যে, খুনিরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে পরে। কিন্তু পরে—কখন? কাল রাতে আমরা যে তাদের ধরবার জন্যে কোনও ফাঁদ পেতেছি, সেকথা নিশ্চয়ই তারা জানত না, কারণ জানলে তারা ফাঁদে পা দিত না। সেটা জোর করেই বলা যায়। আর কাল রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারেও তারা আমাদের চিনতে পারে নি। তাহলে তারা কখন আমাদের আবিষ্কার করেছে?

মানিক একটু ভেবে বলল—খুব সম্ভব আজ সকালে।—বেশ, তোমার এই অনুমান ধরেই অগ্রসর হওয়া যাক। ভোর হবার পর আমরা গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করেছিলাম আধ ঘণ্টার বেশি নয়। তারপর সেখান থেকে বাসায় ফিরতে আমাদের সময় লেগেছে বড় জোর পনের মিনিট।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন—তোমাদের জ্বালায় আর পারি না, জয়ন্ত! এই কি আধঘণ্টা আর পনের মিনিটের হিসেব রাখবার সময়?

জয়ন্ত বলল—সুন্দরবাবু, আপনি এখন আমাদের কথায় কান পাতবেন না—তার বদলে চা, টোস্ট আর এগপোচ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন!

সুন্দরবাবু বললেন—ওই কাটামুণ্ডের সামনে এসে আমি খাবার খাব? হুম, থুঃ থুঃ।

—তা হলে চুপ করে বসে থাকুন, কারণ এখন খুনিদের আড্ডা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন—ছাই করছ।

সে টিপ্পনি কানে না তুলে জয়ন্ত বলল—শোন মানিক, দেখা যাচ্ছে, সকাল হবার পর আমরা বাড়ির বাইরে ছিলাম মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র। তাহলে বুঝতে হবে যে, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই কেউ আমাদের দেখেই ছুটে বাসায় গিয়ে, 'স্পিরিটে' চোবানো মড়ার মাথা তুলে নিয়ে—প্যাকিং বাক্সে পুরে, তাড়াতাড়ি আমাদের আগেই এখানে রেখে পালিয়ে গেছে।

মানিক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—শাবাশ জয়ন্ত, শাবাশ! তুমি তো বলতে চাও, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে লোক এতগুলো কাজ করেছে, সে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি থেকে দূরে বাস করে না!

—ঠিক তাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আড্ডা গঙ্গা কি খালের ধার থেকে খুব কাছেই। দেখছ মানিক, আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কতটা ছোট্ট হয়ে পড়ল? সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?

সুন্দরবাবু বললেন—হুম, কিছুই না। তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে হতভম্ব হয়েছি! এত সহজে এত বড় আবিষ্কার। আশ্চর্য!

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি বার করে নস্য নিতে নিতে বলল—এখন কথা হচ্ছে, খাল আর গঙ্গার আশেপাশে বড় কম রাস্তা আর বাড়ি নেই। কোন রাস্তায় আর কোন বাড়িতে গেলে আমরা খুনিদের আড্ডা খুঁজে বার করতে পারব?

সুন্দরবাবু আবার হতাশ হয়ে পড়ে বললেন—হুম, ওটা কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব।

জয়ন্ত 'প্যাকিং' বাক্সের দিকে অল্পক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর চুল ধরে মুণ্ডটাকে টেনে

তুলে বলল—প্যাক করার সময়ে মুণ্ডটার চারপাশে দেখছি কতকগুলো খবরের কাগজ পুরে দেওয়া হয়েছে। মানিক, কাগজগুলো বের করে ফেল তো?

মানিক, কাগজগুলো টেনে নিয়ে বলল—তিনদিনের তিনখানা স্টেটসম্যান।

জয়ন্ত মুণ্ডটাকে আবার বাক্সের ভেতরে রেখে বলল—হুঁ। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুনিদের দলের কেউ নিয়মিতভাবে 'স্টেটসম্যান' পড়ে। তাহলে আমরা কোনও মূর্খ, সাধারণ অপরাধীর পাল্লায় পড়িনি—তার পেটে অন্তত কিঞ্চিৎ ইংরেজি বিদ্যা আছে! হয়ত সে স্টেটসম্যানের বাঁধা গ্রাহক। —বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন—জয়ন্ত অমন ছুটে পাগলের মত হঠাৎ কোথায় গেল হে?

মানিক বলল—বোধহয় আপনার জন্যে চা আর খাবার আনতে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন—যে হাতে সে ওই কাটামুণ্ড ছুঁয়েছে, সেই হাতে আমার খাবার আনবে? আমি কখনও খাব না।

—খাবেন না কি, খেতেই হবে!

—খেতেই হবে? ইস, জোর নাকি? ওর ছোঁয়া খাবার যদি খাই, তা হলে আমি তো অনায়াসেই মড়ার মাংসও খেতে পারি! হুম, জয়ন্তকে মানা করে দাও, আমার এখনই গা বমি বমি করছে। হুম, ওয়াক—ওয়াক!

মানিক বহু কষ্টে সুন্দরবাবুকে শান্ত করে বলল—ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ আর আপনাকে খেতে অনুরোধ করব না, আপনার গা বমি বমি থামিয়ে ফেলুন।

—তা যেন থামালাম, কিন্তু আজ আমি এখুনি বিদায় হতে চাই।

—না না না, আর একটু বসুন। জয়ন্ত আগে ফিরে আসুক।

মিনিট পনের পরে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত ফিরে এসে বলল— আমি 'স্টেটসম্যান' অফিসের এক বিশেষ বন্ধুকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—আমি জানি এ অঞ্চলের খুব কম বাঙালিই স্টেটসম্যান-এর বাঁধা গ্রাহক। সুতরাং গঙ্গা আর খালের সঙ্গমস্থলে কাছাকাছি রাস্তাগুলোর মধ্যে স্টেটসম্যানের কোন কোন নিয়মিত গ্রাহক আছেন, ফোনে সেই খবরটাই জানবার চেষ্টা করছিলাম।

—কি জানতে পারলে?

—জনকয়েক গ্রাহকের নাম আর ঠিকানা জানতে পেরেছি।

—তারপর?

—একজনের কিছু সন্ধান নিতে হবে। তাঁর নাম সত্যচরণ চৌধুরী, তিনি ১৫নং বিষ্ণুবাবু লেনে থাকেন। বিষ্ণুবাবু লেন থেকে গঙ্গার ধারে যেতে বা আমার বাড়িতে মিনিট কয়েকের বেশি লাগে না।

সুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে কারুর ওপর সন্দেহ করা ঠিক নয়।

—সুন্দরবাবু, আপনি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন যে, রামদার ওপরে S হরফ খোদা আছে। কে বলতে পারে, ওটা সত্যচরণ চৌধুরীর নামের আদ্যাক্ষর নয়?

সুন্দরবাবু লাফ মেরে বলে উঠলেন—ঠিক! হুম!

জয়ন্ত বলল—সেই রক্তাক্ত রুমালের কোণে ছিল I.B.B. এই তিনটে অক্ষর। সুন্দরবাবু, আপনি

এখন S-কে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে থানায় গিয়ে খবর নিন, রুমালে ধোপার মার্কার কোনও কিনারা হল কিনা।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় জয়ন্তর ফোন টুং টুং করে বেজে উঠল।

—মানিকের তবলার সঙ্গতের সঙ্গে জয়ন্ত তখন তার নিয়মিত সাধনায় নিযুক্ত ছিল। তাড়াতাড়ি বাঁশি ফেলে ফোন ধরল।

—হ্যালো!

—হুম।

—কি ব্যাপার, সুন্দরবাবু?

—বিষম ব্যাপার! ধোপার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলেরই ধোপা! তার সঙ্গে গিয়ে যার রুমাল তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার নাম ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। মার্চেন্ট অফিসে কেরানীগিরি করে।

—তাঁর বাড়ির ঠিকানা কি?

—১৫-এ, বিষ্ণুবাবু লেন। তোমার সত্যচরণ চৌধুরীর বাড়ির গায়েই তার বাড়ি।

—কিন্তু আপনি কি সত্য চৌধুরীর বাড়িতেও কোন খোঁজ নিয়েছেন?

—না, বলত এক্ষুণি নিই।

—আপনাকে সে সব কিছুই করতে হবে না। খোঁজ যা নেবার আমিই নিয়েছি। আপনি বরং ইন্দুভূষণকে নিয়ে আমার এখানে আসুন।

—হুম, এখনি যাচ্ছি। জয়ন্ত, আমার প্রাণটা ভারি খুশি হয়ে উঠেছে—কেল্লা মার দিয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবন্ত ও সবাক বস্তা

ফোনের রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে জয়ন্ত যেন আপনমনেই বলল, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবু লেনে থাকে সত্যচরণ চৌধুরী, আর ১৫-এ নম্বরে থাকে ইন্দুভূষণ ব্যানার্জি। আশ্চর্য!—সে ফোনে এইমাত্র যা শুনল, মাণিকের কাছে সব খুলে বলল।

মানিক উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল—বল কি জয়ন্ত, বল কি! রামদার ওপরে খোদা ছিল S অক্ষর আর রুমালে ছিল I.B.B. এই তিন অক্ষর। দুই ঘটনাস্থল থেকে আমরা এই দুটি সূত্র পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এ সূত্র দুটির কোনোই দাম ছিল না। কলকাতায় কত হাজার লোকের নামের সঙ্গে ওই S আর I.B.B. অক্ষরগুলি মিলে যায়, কে তার হিসেব রাখে? দৈবক্রমে কত সহজে আসল লোকদের ঠিকানা আবিষ্কার করে ফেললাম। জয়ন্ত, ভাগ্যদেবী আমাদের সহায়, নইলে এটা সম্ভবপর হত না।

জয়ন্ত বলল—গোয়েন্দারা যত বুদ্ধিমানই হোক, ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। আবার, অপরাধীদের ওপর চালাকিও তাদের অনেক কাজে আসে। ধর, এই নৃমুণ্ড শিকারীদের কথা। কাটামুণ্ড ভেট পাঠিয়ে ওরা যদি আমাদের মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা না করত, তাহলে বিষ্ণুবাবু

লেনের সত্যচরণ চৌধুরীর ওপরে আমাদের কোনও সন্দেহই হত না। ওরা তিন-তিনটে মারাত্মক ভুল করেছে। প্রথম, রক্তাক্ত রুমালখানা ঘটনাস্থলের কাছে ফেলে গেছে। দ্বিতীয়, রামদাখানাও নৌকো থেকে তুলে নিয়ে যায় নি। তৃতীয়, উপরি উপরি তিন দিনের 'স্টেটসম্যান' প্যাকিং বাক্সে রেখে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদের দলের কেউ ওই কাগজখানার নিয়মিত পাঠক। হ্যাঁ, ওদের চার নম্বরের ভুলের কথাও বলি। ওরা আজ সকালেই অত শিগগির আমাদের ভয় না দেখালেই ভাল করত। ঘণ্টাকয়েক অপেক্ষা করার পর মুণ্ডটা পাঠালে আমরা তো কিছুতেই ধরতে পারতাম না যে, খুনিরা আমাদের বাড়ির এত কাছে থাকে।

মানিক বলল—তুমি তো আজ বিকেলে বাইরে বেরিয়েছিলে। কোথায় গিয়েছিলে কিছুই তো বললে না?

—গিয়েছিলাম বিষ্ণুবাবু লেনে সত্য চৌধুরীর খবর নিতে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। বিষ্ণুবাবু লেনের ১৫ নম্বর বাড়ির সামনেই এক মুদিখানা আছে। মুদির সঙ্গে ভাব করে জানলাম, সত্য চৌধুরী হচ্ছে নাকি বিহার অঞ্চলের এক জমিদার! কলকাতার ও বাড়িখানা সে গেল বছরে কিনেছে। মাঝে মাঝে ওখানে থাকে, মাঝে মাঝে দেশে যায়। বয়স হবে চল্লিশ। ভীষণ শক্তি, এ বছরে এমন ঘটা করে কালীপুজো করেছে যে, তেমন ঘটা এখানকার কেউ কখনও দেখেনি। দারুণ লম্বা-চওড়া আর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা—তাকে দেখলে শৌখিন জমিদার বলে মনে হয় না—মনে হয়, সেকালকার কাপালিক বলে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা! প্রতি অমাবস্যায় রক্তবস্ত্র পরে কালীপুজোয় বসে। পাড়ার কারোর সঙ্গে মেলামেশা করে না, তবে তার লোকের অভাব নেই। অনেক চাকর, দারোয়ান আর কর্মচারী সেখানে বাস করে।

মানিক বলল—১৫-এ নম্বরের বাড়ি থেকে সুন্দরবাবু যে ইন্দু বাঁড়জ্যেকে ধরেছেন, সেও নিশ্চয়ই তাহলে ঐ সত্য চৌধুরীরই চ্যালা?

—তাই তো হওয়া উচিত। নইলে ইন্দুর নাম লেখা রক্তাক্ত রুমাল ঘটনাস্থলে পাওয়া যেত না। সত্য চৌধুরীর বাড়ির পাশেই আছে হাত তিনেক চওড়া সরু গলি! তারপরই ছোট ছোট তিনখানা বাড়ি। তাদের নম্বর হচ্ছে ১৫-এ, ১৫-বি, ১৫-সি। সে বাড়িগুলি দেখলে মনে হয়, একখানা বাড়িকেই যেন তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর বেশি আর কিছু আমি লক্ষ্য করিনি।...ব্যস, আর কোনও কথা নয়। ঐ শোন, সুন্দরবাবুর 'হুম' বলে হুহুঙ্কার। (উচ্চকণ্ঠে) আসুন সুন্দরবাবু, আসামীকে নিয়ে ওপরে আসুন!

সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের শব্দ। তারপর প্রথমেই আবির্ভূত হলেন বিজয়ী বীরের মত স্ফীত বক্ষে, দীপ্ত চক্ষে, গর্বিত ভঙ্গিতে সুন্দরবাবু! তারপর দুজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দেখা গেল হাতকড়ি পরা ও কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় আসামীকে।

সুন্দরবাবু সদন্তে বললেন—হুম! এই নাও ভায়া তোমার মুণ্ড শিকারী ইন্দু বাঁড়ুজ্যেকে। দেখছ তো, কত চটপট কাজ হাসিল করে ফেললাম? হেঁ হেঁ বাবা, তোমাদের মত শখের গোয়েন্দার সঙ্গে এই আমাদের তফাৎ।

কিন্তু জয়ন্ত ও মানিক তখন সুন্দরবাবুর মুখ-শাবাশি শুনছিল না। তারা নিষ্পলক নেত্রে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়েছিল আসামী ইন্দু বাঁড়ুজ্যের দিকে।

এই কি এতগুলো হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়কের মূর্তি? তার অতিশয় রোগা লিকলিকে দেহখানা

সামনের দিকে বেঁকে পড়েছে কুমড়োর ফালির মত—একটা ঠেলা মারলেই সে দেহ যেন মাটিতে পড়ে ঠুনকো কাচের পেয়ালার মত ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। মুখখানা ভয়ে মড়ার মত সাদা, চোখ দুটো তাড়া খাওয়া খরগোসের মত বিস্ফারিত এবং হাত-পাগুলো কাঁপছে থর থর করে।

জয়ন্ত ও মাণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে ইন্দু ধপাস করে মাটির ওপরে বসে পড়ল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কলকাতার বুকের ওপরে বেপরোয়ার মত যারা এমন ভয়াবহ খুনের পর খুন করতে পারে, তাদের কেউ কখনও এমন কাপুরুষ হয়!

সুন্দরবাবু হুমকি দিয়ে বলে উঠলেন—থাক থাক, ঢের হয়েছে! আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যখন আমার মুণ্ডটা কচ করে কেটে ফেলতে এসেছিলে তখন নিজের প্রাণের মায়া হয়নি চাঁদ?

জয়ন্ত দুপা এগিয়ে গিয়ে নরম স্বরে বলল—তোমার নাম কি?

অশ্রুকাতর কণ্ঠে আসামী বলল—শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম, শ্রীইন্দুভূষণ, না ছাই। বিশ্রী ইন্দুভূষণ।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল—তুমি কি কর?

—টমসন-মরিসনের অফিসে চাকরি করি।

—কত টাকা মাইনে পাও?

—ষাট টাকা।

—১৫-এ বিষ্ণুবাবু লেনে তোমার সঙ্গে আর কে কে থাকে?

—আমার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। ওখানে আমাদের অনেক কালের বাস। আমরা তিন ভাই পাশাপাশি তিনখানা বাড়িতে থাকি, আগে ও বাড়িগুলো এক ছিল, এখন ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

—সত্য চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

—খুব অল্প। তিনি জমিদার মানুষ, আমাদের মত গরীব লোককে মোটেই কেয়ার করেন না। আমাদের বাড়িগুলো তিনি কিনে নিতে চান আমরা রাজি নই। এই সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একবার আমার কথাবার্তা হয়েছিল।

—আচ্ছা ইন্দু, তুমি জান তো কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে ডবল খুন হয়েছিল আর সেইখানেই তোমার একখানা রক্তমাখা রুমাল কুড়িয়ে পাওয়া গেছে?

ইন্দু আবার কাঁদতে লাগল।

—কাঁদছ কেন? ও রুমাল কি তোমার নয়?

ইন্দু সে-কথার জবাব না দিয়ে এবার হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বলল—ইনস্পেক্টরবাবু, আমি নির্দোষ। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

জয়ন্ত মিষ্টি স্বরে বলল—ইন্দু কেঁদ না। যা জিগ্যেস করি ঠিক ঠিক জবাব দাও। তুমি নির্দোষ হলে তোমার কোনও ভয় নেই।

চোখের জল মুছতে মুছতে ইন্দু বলল—কি জিগ্যেস করবেন, করুন। আমি মিথ্যে বলব না।

সুন্দরবাবু বললেন—ইস, উনি মিথ্যা বলবেন না, ধর্মপুত্তুর।

মানিক টিপ্পনি কাটল—সুন্দরবাবু, আপনার উপমায় ভুল হল। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—হুম! বলেছিলেন—বেশ করে ছিলেন।— তাহলে ইন্দুও আজ একবার মিথ্যা বলতে পারে।

—ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ইন্দুর তুলনা হয় না। যুধিষ্ঠির কোনও দিন মুণ্ড শিকার করেননি—হুম!

জয়ন্ত বলল—ইন্দু, ভাল করে মনে করে দেখ। কোনওদিন তোমার রুমাল হারিয়েছে?

ইন্দু খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠল—হ্যাঁ মশাই, মনে পড়েছে।

—কি?

—হপ্তাখানেক আগে আমার ঘর থেকে একখানা রুমাল আশ্চর্য উপায়ে অদৃশ্য হয়েছিল।

—আশ্চর্য উপায়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিন আমার ময়লা জামা কাপড় ছাড়বার কথা। আমার স্ত্রী ফর্সা জামা কাপড় আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন আর একখানা রুমাল পাট করে রাখলেন টেবিলের ওপরে। অফিস যাবার সময়ে খেয়ে দেয়ে উপরে উঠে আমি কিন্তু রুমালখানা আর খুঁজে পেলাম না। স্ত্রী বললেন, বোধহয় জোর হাওয়ায় কোনগতিকে সেখানা উড়ে গেছে। অগত্যা সেই কথাই আমাকে মানতে হল।

—যে টেবিলের ওপর রুমালটা রেখেছিল, তার সামনে—অর্থাৎ খুব কাছেই একটা জানলা ছিল তো?

—কী আশ্চর্য, ঠিক বলেছেন! টেবিলের গায়েই জানলা আছে।

—জানলার বাইরে কি আছে?

—একটা খুব সরু গলি।

—তারপর?

—সত্যবাবুর বাড়ির বারান্দা।

—সেই বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে আমি কি তোমার জানলার ভেতর দিয়ে টেবিলের ওপরে হাত দিতে পারি?

ইন্দু বিস্মিত স্বরে বলল—তা পারেন। কিন্তু আপনার কথার অর্থ কি?

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নস্যদানি বার করল।

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—জয়ন্ত, তুমি কি আমার মামলাটা ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টায় আছ? তুমি কি বলতে চাও, পাশের বাড়ি থেকে অন্য কেউ রুমালখানা চুরি করেছে? কেন? ভারি তো দামি জিনিস! আমি ইন্দুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

ইন্দু কাতরস্বরে বলল—আমি সত্যি কথাই বলছি ইনস্পেক্টরবাবু। আমার স্ত্রীকে জিগ্যেস করে দেখতে পারেন।

সুন্দরবাবু বললেন—নিশ্চয়ই জিগ্যেস করব। তোমার ঘর, টেবিল আর জানলাও দেখব!...এই সেপাই! বদমাইসটাকে ধরে নিয়ে চল! আমি এখনি ওদের বাড়িতে যাব। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা? দেখাচ্ছি মজাটা!

জয়ন্ত বলল—চলুন সুন্দরবাবু, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি সত্য চৌধুরীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন—তুমি যা খুশি করতে পার, কিন্তু দয়া করে আমাকে আর সাহায্য করতে এস না। হুম, তুমি সাহায্য না করলেও আমার চলবে।

সুন্দরবাবু আসামী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মানিক বলল—জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর যে, ইন্দুর রুমাল সত্য চৌধুরী বা অন্য কেউ চুরি করেছে?

—হতে পারে!

—কিন্তু কেন?

—পুলিসকে বিপথে চালনা করবার জন্যে! কিন্তু ও কথা এখন থাক। এস, আগে একটু চা খেয়ে চাঙা হয়ে নিই, তারপর সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাত্রা করব!

চা পান করে মিনিট পনের পরে জয়ন্ত ও মানিক যখন বাড়ি থেকে বেরুল, রাত তখন দশটা হবে।

একে তো এ অঞ্চলের পথঘাটগুলো এ সময়ে নির্জন হয়ে পড়ে, তার ওপর আগেই বলা হয়েছে, নৃমুণ্ড শিকারীদের উৎপাতে গঙ্গার আশেপাশের রাস্তায় রাত্রে আজকাল লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত ও মানিক জনপ্রাণীকে দেখতে পেল না। নিঝুম স্তব্ধতার মধ্যে পথের ওপরে শব্দ সৃষ্টি করতে লাগল কেবল তাদের দুজনের পায়ের জুতোগুলো।

এদিক থেকে বিষ্ণুবাবু লেনের গলিতে ঢোকবার আগেই মাঝে পড়ে ছোটখাট একটা মাঠ। তারই ধার দিয়ে যেতে হঠাৎ তাদের কানে জাগল অদ্ভুত একটা শব্দ! কে যেন হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ রবে আর্তনাদ বা গর্জন করছে।

জয়ন্ত ও মানিক সচমকে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল। আকাশে ক্ষীণ চাঁদের রেখা মাত্র, গ্যাসের আলোও স্পষ্ট নয়।

মানিক ভ্রূ সঙ্কুচিত করে দেখে বলল—মাঠের ওপরে বস্তার মত ওগুলো কি পড়ে রয়েছে?

জয়ন্ত বলল—খালি পড়ে রয়েছে নয়, বস্তাগুলো ছটফট করছে।

তারা এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল।

অমনি একটা বস্তা আবার বলে উঠল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।

বড় বড় তিনটে চটের থলে, মুখগুলো বাঁধা।

থলেগুলোর বাঁধন কাটতেই বেরিয়ে পড়ল সুন্দরবাবু ও দুই পাহারাওলার মূর্তি! প্রত্যেকেরই হাত-পা মুখ বাঁধা।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর মুখ ও হাত-পা মুক্ত করে দিয়ে বলল—কী ভয়ানক। এ কি কাণ্ড!

সুন্দরবাবু করুণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—ঐ তেমাথার মোড়ে আসতেই গলির ভেতর থেকে কারা বেরিয়ে এসে আমাদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলল, তারপর থলের ভেতরে পুরে আমাদের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখে সরে পড়ল!

—তাদের দেখতে পান নি?

—কি করে দেখব ভাই? দেখ না, ওখানকার গ্যাস বাতি দুটো নিবিয়ে রেখেছে! ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ইন্দু? ইন্দু কোথায় গেল?

—হুম, লম্বা দিয়েছে। পাপী কখনও সত্যি কথা কয়? তুমি সেই শয়তানের কথায় ভুললে বলেই তো আমার এই দুর্দশা! নইলে আজ রাত্রে আমি কি আর এ-মুখো হতাম? তারই দলবল এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে! হায় হায়, হাতে পেয়েও হারালাম!

জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মানুষ চেনা কি এতই শক্ত? তার চোখেও ইন্দু ধুলো দিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহা-ভয়ঙ্কর

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বলল—সেই তালপাতার সেপাই ইন্দু! বাঁখারির মত লিকলিকে হাত-পা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ছিঁচকে চোরের চেয়েও ভীতু—সে খালি নৃমুণ্ড শিকারীই নয়। সুন্দরবাবুর মত জাঁদরেল পুলিশ অফিসারকেও কুপোকাৎ করে লম্বাও দিতে পারে! অবাক কাণ্ড!

সুন্দরবাবু বললেন—ভুল মানিক, ভুল! সেই পাজি-ছুঁচোটা মোটে ভীতুই নয়, আমাদের সামনে ভয়ের অভিনয় করছিল। তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েই তো আমার এই দুর্দশা।

মানিক বলল—তবু চরম দুর্দশার হাত থেকে আপনি আজও বেঁচে গেছেন।

—তার মানে?

—আপনাদের বস্তায় না পুরে, তারা যে আপনাদের মুণ্ডগুলো কচাকচ কেটে নিয়ে বাড়ি চলে যায় নি, এইটুকুই রক্ষা!

মুণ্ড কাটার কথা মনে করিয়ে দিতেই সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হুম। চল, বাসার দিকে ফেরা যাক।

জয়ন্ত বলল—না, এখন ১৫-এ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাব।

—কেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আসামী আজ আর কখনও নিজের বাড়িতে ফেরে? এতোক্ষণে সে হয়ত কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিয়েছে!

—তবু আমি যাব। এস মানিক!

—আমি বাবা আজ ও-মুখো হচ্ছি না। হুম, এই রাতের অন্ধকারে আবার কোনও নতুন বিপদ ঘটতে পারে। আমি কাল সকালে তদন্তে বেরোব!

জয়ন্ত ও মানিক আর দাঁড়াল না, হন হন করে বিষ্ণুবাবুর গলির দিকে এগোতে লাগল।

জয়ন্ত যেতে যেতে বলল—মানিক, খুব সাবধান। এ গলিটা সাপের মত ক্রমাগত পাক খেয়ে এঁকে বেঁকে গেছে, প্রতি মোড়েই অতর্কিতে আমাদের ওপরে আক্রমণ হতে পারে। রিভলবার তৈরি রাখ।

এক জায়গায় পেছনে যেন দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, কিন্তু কারুকে দেখা গেল না। আর এক জায়গায় রোয়াকের ওপর কাপড় মুড়ি দিয়ে কে একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল; খানিকটা এগিয়ে যাবার পর জয়ন্ত হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখল, সে লোকটা উঠে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বলল—ঘুমিয়ে পড় ভায়া, আবার ঘুমিয়ে পড়। নইলে, বল আমরাই তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি। লোকটা রোয়াক থেকে নেমে পড়েই চোঁ-চাঁ দৌড় মারল। পথে আর কোনও ঘটনা ঘটল না। তারা বিষ্ণুবাবুর লেনে ১৫-এ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, ভেতর থেকে মেয়ে-গলায় কাতর কান্না।

জয়ন্ত বলল—নিশ্চয়ই ইন্দু বাঁড়ুজ্যের বৌ। স্বামীর জন্য কাঁদছেন।

মানিক বলল—বোঝা যাচ্ছে, ইন্দু তাহলে বাড়িতে ফেরেনি আর তার পালানোর খবর এখনও এখানে এসে পৌঁছোয়নি।

জয়ন্ত ফিরে দেখল, তার পূর্বপরিচিত মুদি তখন ঝাঁপ তুলে সে রাতের মত দোকান বন্ধ করবার চেষ্টায় আছে। সে মুদির কাছে গিয়ে বলল—কি হে বাপু, ঐ বাড়ির ইন্দুর কোনও খবর রাখ?

—ইন্দুবাবু? হ্যাঁ, তিনি তো আমার খদ্দের। আহা, অমন নিরীহ ভদ্রলোক আর দেখিনি। কিন্তু কেন জানিনা, আজ পুলিস এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে।

—এখনও ছাড়েনি?

—পুলিস কি সহজে ছাড়ে বাবু? জানেন না, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! শুনছেন না, তাঁর ইস্ত্রী তাই কাঁদছেন!

—সত্য চৌধুরী এখন বাড়িতে আছেন কি?

—জমিদারবাবু? না, হঠাৎ কি জরুরি তার পেয়ে সন্ধ্যের গাড়িতেই তিনি দেশে চলে গেছেন। বাড়িতে আছে খালি এক বুড়ো দারোয়ান। যাই মশাই, রাত হল। নমস্কার।

মুদি চলে গেল। জয়ন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে সত্য চৌধুরীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাড়িখানা বেশ বড়সড়। তেতলা। কিন্তু তার সমস্ত জানলা বন্ধ। দারোয়ান তখন বোধহয় ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারণ বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

মানিক বলল—সত্য চৌধুরী লোকজন নিয়ে হঠাৎ সরে পড়ল কেন? সে কি আন্দাজে বুঝে নিয়েছে, আমরা তার ওপরে সন্দেহ করেছি?

কিন্তু জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল—দেখ মানিক, সত্য চৌধুরীর বাড়ির পাশের ঐ হাত তিনেক চওড়া অন্ধকার কানাগলিটা। গলির এ পাশেই ইন্দুর বাড়ি।

মানিক বলল—ও গলিতে দেখবার কি আছে?

—কিছুই নেই, অন্ধকার ছাড়া। আমরা এইবারে ঐ গলির ভেতরে ঢুকব।

—কি আশ্চর্য, কেন হে?

—সঙ্গে এলেই দেখতে পাবে।

জয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে মানিক টর্চের আলো জ্বেলে দেখে, সে পথে আবর্জনার অভাব একটুও নেই। মরা পচা ইঁদুরের আশপাশ দিয়ে জ্যান্ত ইঁদুররা আনাগোনা করছে।

সত্য চৌধুরীর বাড়ির নিচের তলায় দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা অগ্রসর হয়ে জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—মানিক, আজ আমরা সত্য চৌধুরীর বাড়ির ভেতরে বেড়াতে যাব।

—কি করে?

—গায়ের জোরে। এই দেখ, এখানকার একটা জানলা খোলা আছে। তুমি জান তো, এরকম লোহার রেলিং আমার কাছে মোমের মত নরম! বলতে বলতে সে দুই হাতে একটা রেলিং চেপে ধরে টানাটানি করতেই সেটা বিশ্রী ভাবে দুমড়ে খুলে বেরিয়ে এল। তারপর আরেকটা রেলিঙেরও হল সেই অবস্থা।

মানিক এর আগেই জয়ন্তের আসুরিক শক্তির আরও অনেক প্রমাণ পেয়েছে, সুতরাং কিছুমাত্র অবাক হল না। সে খালি বলল—চোরের মত এ বাড়িতে ঢুকে তুমি কি করতে চাও?

—দেখতে চাই, নতুন কোনও সূত্র মেলে কিনা। সত্য চৌধুরী তার দলবল নিয়ে কোথায় গেছে জানিনা, বাড়িতে খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে মাত্র একজন বুড়ো দারোয়ান। লুকিয়ে খানাতল্লাসির এমন সুযোগ আর মিলবে না। বলতে বলতে জয়ন্ত জানলা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মানিকও করল তার অনুসরণ!

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, সেটা হচ্ছে খুব সম্ভব দারোয়ানের রান্নঘর। গোটা চারেক উনুন ও এখানে সেখানে খানকয়েক পেতলের বাসন ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘর থেকে

বেরিয়ে দুজনে গিয়ে পড়ল দালানে। তারপরেই উঠোন। এবং তারই এক কোণে খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে দারোয়ানের ঘুমন্ত মূর্তি।

বাড়ির ভেতরে কোথাও আলো নেই, অন্য কোনও শব্দও নেই।

দুজনে পা টিপে এগিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি খুঁজে পেল। কাঠের বাহারি সিঁড়ি। তার আশেপাশের দেওয়ালে কতকগুলো ছোট বড় বাঁধানো ফটো টাঙানো। টর্চের সাহায্যে ফটোগুলো দেখতে দেখতে জয়ন্ত চুপি চুপি বলল—মানিক, ভাল করে এই ছবিখানা দেখ।

ব্যাঘ্র চর্মের আসনের ওপরে বসে আছে বিরাটবক্ষ, বিপুলবপু, এক সুদীর্ঘ পুরুষ—পরনে মাত্র একটি কপনি। মাথায় লম্বা চুল, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় মস্ত মস্ত রুদ্রাক্ষের মালা। ফটোতেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার গায়ের রং মোষের মত কালো। স্কন্ধের, বুকের ও পেটের দুই পাশের ডুমো ডুমো স্ফীত মাংসপেশীগুলো দেখলেও ধরা যায়, দেহের বল বিক্রমে সে সিংহের মত। মুখের প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়া ফুলে ফেঁপে গালপাট্টার মত হয়ে দুই কানের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু কী কুৎসিত তার চোখ দুটো। অতবড় মুখে অত ছোট অথচ অদ্ভুত চোখ আর দেখা যায় না, দেখলেই মনে পড়ে হিপোপটেমাসের চোখকে। সেই ক্ষুদে চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন দুই ক্ষুরধার বিদ্যুৎ ছুরিকার মত কেটে বসে হৃদপিণ্ডের মধ্যে। তার মুখে আর এক দ্রষ্টব্য হচ্ছে, বাঘের দাঁতের মতন নিষ্ঠুর ও হিংস্র একটা মাত্র দাঁত—ওষ্ঠাধর ভেদ করে যা প্রায় চিবুকের দিকে এগিয়ে এসেছে। এ রকম আশ্চর্য দাঁতও মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মানিক শিউরে উঠে বলল—জয়, এটা ফটো না হলে বলতাম, এ ছবি হচ্ছে চিত্রকরের আঁকা মনগড়া ছবি! মাথাতেও এ লোকটা বোধহয় তোমার মত অস্বাভাবিক লম্বা।

জয়ন্ত ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—মনের ক্যামেরায় এ মূর্তি আমি তুলে রাখলাম, জীবনে আর ভুলব না।

—কিন্তু কে ঐ ভয়ানক লোকটা? যোগী সাধকের বেশে ছবি তুলিয়েছে বটে, কিন্তু এ ব্যক্তি কি করে সাধনা করে?

—মুদির মুখে যার বর্ণনা শুনেছি, এ বোধহয় সেই মহাপুরুষ—অর্থাৎ সত্যচরণ চৌধুরী!

শুনেই মানিক আগ্রহ ভরে ওপরে আরও ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলার দালানে উঠে তারা প্রথম যে ঘরখানা পেল, তার দরজায় তালা বন্ধ। পাশের ঘরখানা খোলা বটে, কিন্তু সে ঘরে খান দুয়েক খাট ও খান দুয়েক চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। তার পাশের ঘরখানা হলঘরের মত বড়, এবং সে ঘরে অনেক আসবাবপত্রও রয়েছে।

কোথাও মার্বেলের বড় গোল টেবিল, কোথাও সাধারণ লেখাপড়া করার টেবিল, কোথাও সোফা, কৌচ, ইজিচেয়ার, কোথাও বড় বড় আলমারি। এই সাজানো গোছানো ঘরখানি দেখলেই বোঝা যায়, এখানে যে থাকে সে খুব গোছানো লোক!

একটা টেবিলের তলায় রয়েছে এক থাক খবরের কাগজ। জয়ন্ত প্রথমেই সেইখানে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বলল—এগুলো দেখছি পুরনো 'স্টেটসম্যান'—ফেলে না দিয়ে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দুই চোখ তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেইখানে বসে পড়ে সে একখানা করে কাগজ তুলে তারিখ দেখতে দেখতে যেন আপন মনেই আবার বলল—হুঁ, গেল দেড় মাসের সব

কাগজই এখানে রয়েছে, কেবল এপ্রিল মাসের ২৩, ২৪ আর ২৫ তারিখের কাগজ নেই! কিন্তু ঠিক ঐ তিন তিনখানা কাগজ আজ সকালেই আমি উপহার পেয়েছি কাটামুণ্ডুর সঙ্গে।

মানিক চমকে উঠে বলল—জয়, জয়। তুমি কি বলছ!

জয়ন্ত হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে রুপোর নস্যদানি বার করে একটিপ নস্য নিয়ে বলল—মানিক আমাদের এখানে আসা সার্থক হল! সাধারণ পুলিস-ডিটেকটিভের মস্ত কি দোষ, জান? তারা কেবল বড় বড় প্রমাণ খুঁজতেই ব্যস্ত, ছোট ছোট প্রমাণ তাদের চোখেই পড়ে না। সুন্দরবাবু এখানে এলে ঐ খবরের কাগজগুলোর দিকে ফিরেও তাকাতেন না, অথচ ওর মধ্যে আজ আবিষ্কার করা গেল কত বড় দরকারি সূত্র! এই বাড়িতে যারা থাকে, আজ সকালে তারা এই ঘরে বসেই একটা কাটামুণ্ডকে তিনখানা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে, প্যাকিং বাক্সে পুরে আমাদের কাছে রাক্ষুসে ভেট পাঠিয়েছে। এই প্রমাণ হয়ত আদালতে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আমরা এখন নৃমুণ্ড শিকারীদের বাড়িতেই অযাচিত অতিথিরূপে প্রবেশ করেছি! কি বল মানিক? আমার অনুমান কি তোমার মনে লাগছে?

মানিক অভিভূত কণ্ঠে বলল—জয়ন্ত! তোমার প্রতিভাকে আমি নমস্কার করি! মাত্র একদিনের চেষ্টায় তুমি আজ যতগুলো আবিষ্কার করলে, তা শার্লক হোমসেরও গর্বের বিষয়।

জয়ন্ত বলল—দুর্গম অরণ্যে পথহারা ক্ষুধার্ত পথিক দেখতে পেল, দূরে একটা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রেখা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। দেখেই তার খুব আনন্দ হল, কারণ দূরে কোথাও হয়ত আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে তারই প্রমাণ ঐ ধোঁয়ার রেখা! কিন্তু ক্ষুধার্ত পথিকের সে আনন্দ স্বল্পজীবী হয়, যদি না সে পথ খুঁজে আগুনের কাছে যেতে পারে! সমস্ত প্রমাণেরই ঐরকম মূল্য। আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রমাণ ছিল—যেমন, রুমাল, রামদা, স্টেটসম্যানের তিনটি কপি, কাটামুণ্ড প্রভৃতি। কিন্তু এসব প্রমাণই ঐ ধোঁয়ার মত ব্যর্থ হবে, যদি না এদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করতে পারি। গোয়েন্দার কাজ কেবল প্রমাণ আবিষ্কার করা নয়, সে সব প্রমাণ হাতেনাতে কাজে লাগাতে না পারলে তার কর্তব্য পালন করা হয় না। কিন্তু আমি—বলতে বলতে সে হঠাৎ থেকে পড়ল।

জয়ন্তের কথা শুনতে শুনতে মানিক তার টর্চের আলোটা বুলিয়ে ঘরের চারিদিকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। এখন টর্চের আলোক রেখার মধ্যে এসে পড়েছে মস্ত বড় একটা কাঁচের জার তার ভেতরে টল টল করছে সাদা জলের মত কোনও পদার্থ। জয়ন্ত একলাফে সেইখানে গিয়ে পড়ে বলল—মানিক, আলোটা ভাল করে ধর তো!

কাঁচের জারটা লম্বায় দেড় হাত ও চওড়ায় এক হাত। এবং খালি একটা জারই নয়, চারটে তাকে আরও চারটে একই রকম জার সাজান রয়েছে। সব জারেরই মধ্যে রয়েছে সাদা জলের মত কি!

একটা জারের কাঁচের ঢাকনা খুলে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বলল—হুঁ। জারের ভেতরে রয়েছে স্পিরিট! আমরা যে কাটামুণ্ডটা বখশিস পেয়েছি তাও যে স্পিরিটে ভেজানো ছিল, সে প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই জারগুলোর যে কোনটার মধ্যেই সেই কাটামুণ্ডটার ঠাঁই হতে পারে।

আচম্বিতে একতলায় দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ শুনে তারা দুজনেই দারুণ চমকে উঠল। জয়ন্ত তীরের বেগে ঘর ছেড়ে দালানে বেরিয়ে পড়ে প্রায়ান্ধকার উঠোনের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বলে উঠল—মানিক, দুমদাম করে ও কী ছুটে যাচ্ছে? আমি ভূত মানি না, কিন্তু ওটা মানুষের মূর্তিও নয়।

ততক্ষণে মানিকও দালানের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেও আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, জয় জয়! অন্ধকারে সবই আবছায়ার মত দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, ও-মূর্তি হচ্ছে মহা-ভয়ঙ্কর!

—মানিক! মূর্তিটা যে সিঁড়ির দিকে গেল! ঐ শোন, সিঁড়ির ওপরে যেন মত্তহস্তীর পদশব্দ! মূর্তি আমাদেরই আক্রমণ করতে আসছে!

—উঠোনের ওপর দিয়ে অনেকগুলো মানুষও ছুটে আসছে। জয়ন্ত, আমরা ফাঁদে পড়েছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শত্রুপুরে

জয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল—হ্যাঁ মানিক, ফাঁদে পড়েছি বটে! কিন্তু এখনও পালাবার উপায় আছে।—বলেই সে সিঁড়ির দরজার দিকে বেগে ছুটে গেল এবং পরমুহূর্তে দরজার পাল্লা দুখানা টেনে বন্ধ করে শিকল লাগিয়ে দিল।

—মানিক, টর্চটা জ্বালো।

টর্চের আলোয় দেখা গেল দালানের কোণেই তেতলায় ওঠবার সিঁড়ি।

—মানিক, তেতলায় চল।

দুজনে দ্রুতপদে তেতলার বারান্দায় গিয়ে উঠল। সেখানেও সিঁড়ির মুখে আর একটা দরজা ছিল এবং সে দরজাও বন্ধ করে দিল।

বারান্দায় পাশাপাশি দুখানা ঘর। একটা ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগান, আর একটা ঘরের দরজা খোলা।

জয়ন্ত বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল—কী মুশকিল! এখান থেকে ছাদে ওঠবারও সিঁড়ি নেই, নামবার পথও বন্ধ।

মানিক হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল—না জয়ন্ত। ঐ শোন, আমাদের বন্ধুরা নামবার পথ খুলে দেবার চেষ্টা করছে।

দোতলার সিঁড়ির দরজায় বিষম জোরে ঘন ঘন আঘাতের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বলল—সিঁড়ির দরজা ভেঙে যারা ওপরে উঠতে চায়, তাদের সঙ্গে আছে সেই মূর্তিটাও।

মানিক বলল—একটু আগেই ছবিতে আমরা বোধ হয় সত্য চৌধুরীকে দেখেছি। মনে হল, সেও তোমার মত হয়ত প্রায় সাত ফুট লম্বা। তার সেই মোষের মত কালো বীভৎস মূর্তিকেই আমরা উঠোন দিয়ে ছুটতে দেখেছি। অন্ধকারে তাকে আরও ভয়ানক দেখাচ্ছিল।

জয়ন্ত বলল—না মানিক, না। যদিও স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পাইনি, তবু জোর করে বলতে পারি, সে মূর্তির মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব ছিল না। মানুষ তেমন ভাবে ছোটে না। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনেছি, মানুষের পায়ের শব্দও অত ভারি হয় না।

—কী আশ্চর্য, তবে ওটা কী?

—তোমার প্রশ্নের জবাব এখুনি পাবে। শুনছ না, দোতলার সিঁড়ির দরজা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল? ওরা ওপরে আসছে। কিন্তু আমরা এখন কি করব?

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দুজনেই তখন খোলা ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। জয়ন্ত ভেতর থেকে সে ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিল।

মানিক টর্চ জ্বেলে দেখল, সে ঘরে চারটে জানালা আছে—দুটো বারান্দার দিকে এবং দুটো রাস্তার দিকে!

রাস্তার দিকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত দেখল, নিঝুম রাতের শূন্যপথ যেন খাঁ খাঁ করছে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকল, পুলিস, পুলিস, পুলিস—!

কিন্তু সে অঞ্চলে পুলিসের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হল না।

মানিক বলল—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ ভায়া, বিদ্যুতের চকমকি জ্বালিয়ে ঘন মেঘ ছুটে আসছে।

—তার মানে এখনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি আসবে।

—পথে এর মধ্যেই পুলিসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একটু পরে হাজার চেঁচালেও কেউ আমাদের সাড়া পাবে না।

—তাহলে এস, সময় থাকতে আমরা দুজনে মিলে চেঁচাই।

জয়ন্ত ও মানিক একসঙ্গে চিৎকার শুরু করল, পুলিস! পুলিস! খুন! খুন!!

আকাশকে তখন দেখাচ্ছে অদ্ভুত। আধখানা আকাশ অজস্র তারকায় ভরা—যেন চুমকি বসানো কালো শাড়ি। বাকি আধখানা আকাশ অদৃশ্য হয়েছে অন্ধকারের চেয়ে কালো মেঘদলের জঠরে, কিন্তু সেখানেও থেকে থেকে জ্বল জ্বল করে উঠছে বিদ্যুতের চকমকি। যেন সেগুলো হচ্ছে অন্ধ মেঘের অগ্নিদন্ত। ঐ সব দাঁত দিয়েই সে সাদা আকাশকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে।

খানিক তফাতে গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চঞ্চল বিজলী মুহূর্তে মুহূর্তে নিচে নেমে জলের দোলায় দুলে রূপে গঙ্গা আলো করেই চকিতে আবার পালিয়ে যাচ্ছে সকৌতুকে। বিজলী সকলেরই কাছে যায়, কিন্তু কারুকে ধরা দিতে ভালবাসে না। কিন্তু এসব দেখবার বা ভাববার অবসর তখন জয়ন্ত ও মাণিকের ছিল না। তাদের মাথার ওপরে তখন নৃশংস আনন্দে জেগে উঠেছে নৃমুণ্ড শিকারীর ক্ষমাহীন খড়্গ—আসন্ন ঝড়কে বুকে করে যেন সেই মহাবিপদেরই পূর্বাভাস দিতে ধেয়ে এসেছে আকাশের কাজল কালো পুঞ্জমেঘ!

তাদের সমস্ত চিৎকার ব্যর্থ হল। কোন পাহারাওলার সাড়া মিলল না। নৃমুণ্ড শিকারীদের ভয়ে গঙ্গার কাছে রাতে কোনো পাহারাওলাই থাকে না। হয়ত কোনও কোনও গৃহস্থ ঘুম থেকে সচমকে জেগে উঠে তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তারাও জানে নৃমুণ্ড শিকারীদের কাহিনী! পরের মাথা বাঁচাবার জন্যে নিজের মাথা দেবার আগ্রহ কারোর হল না।

মানিক হাল ছেড়ে দিয়ে বলল—না, এ কলকাতা শহরে সবাই কাপুরুষ, কেউ সাড়া দেবে না।

জয়ন্ত বলল—তেতলার সিঁড়ির দরজায় কি রকম ধাক্কা পড়ছে, শুনছ তো? ও দরজাও ভেঙে পড়ল বলে।

মানিক বলল—ওদের দলে কত লোক আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না!

—বোঝাবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। হয়ত পাঁচ-সাত জন, হয়ত দশ-পনের জন। ওরা বিশ-পঁচিশ জন হলেও আমি মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আমি খালি ভাবছি একজনের কথা। কে সে, তা জানি না— কিন্তু আমার মন বলছে, চতুষ্পদ না হলেও সে মানুষ নয়। কেন সে মানুষের সঙ্গে থাকে, কেন সে আমাদের আক্রমণ করতে চায়, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। মানিক, আমি হতভম্ব হয়ে গেছি।

হঠাৎ বাড়ি কাঁপিয়ে হুড়মুড় হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল।

মানিক বলল—ওই যাঃ! তেতলার সিঁড়ির দরজাও ভেঙে পড়ল!

জয়ন্ত কঠিনভাবে হাস্য করে বলল—এবারে এই ঘরের দরজার পালা।

—কিন্তু তারপর?

বাইরের বারান্দায় ধুপ ধুপ করে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হল—তার মধ্যে একজনের পায়ের শব্দ বিষম ভারি। প্রত্যেক পদক্ষেপে তেতলার মেঝে থর থর করে কাঁপছে!

তারপরেই দরজার ওপরে পড়ল দড়াম করে এক জোর ধাক্কা। প্রথম ধাক্কাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে আর কি!

জয়ন্ত এক লাফে বারান্দার একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর ডান হাতে রিভলবার বার করে হঠাৎ জানলার একটা পাল্লা খুলে উপরি উপরি চারবার গুলি বৃষ্টি করেই পেছনে সরে এল!

অন্ধকারে কারুর দিকেই সে লক্ষ্য স্থির করতে পারেনি বটে, কিন্তু আচম্বিতে আর্তনাদ শুনেই বুঝে নিল যে, তার রিভলবারের একটা গুলি অন্তত যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তারপরেই আবার ধুপধাপ করে অনেকগুলো অতি-ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা বুঝল, শত্রুরা প্রাণের ভয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত তাদের শুনিয়ে খুব চেঁচিয়ে বলল—মানিক, তুমিও রিভলবার তৈরি রাখ। বারান্দায় যে আসবে তাকেই আমরা কুকুরের মত গুলি করে মারব। সহজে আমরা প্রাণ দেব না।

আচম্বিতে কড় কড় কড় কড় রবে বজ্র ভীষণ গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হল ঝটিকার ভৈরব হুহুঙ্কার। গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তরঙ্গে পাগলামির মাতন জাগিয়ে, টলমলগাছে গাছে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়ে, বাড়ির জানলায় প্রচণ্ড করতাল বাজিয়ে দুরন্ত ঝড় প্রবল ধুলোভরা নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ও বজ্রভরা বিদ্যুৎ ছুড়তে ছুড়তে শহরের ওপর ভেঙে পড়ল বিপুল বিক্রমে।

জয়ন্ত বলল—বাইরে থেকে সাহায্য পাবার যেটুকু আশা ছিল, তাও গেল। এ গোলমালে সিংহ গর্জন করলেও কেউ শুনতে পাবে না।

মানিক কিছু না বলে টর্চ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চাপা গলায় বলে উঠল—জয়! জয়! টেলিফোন।

জয়ন্তর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। হ্যাঁ তাই তো, ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন রয়েছে যে।

সে আগে আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারল, কিন্তু বিদ্যুতালোকেও সেখানে শত্রুদের কারুকে দেখা গেল না। তবে তারা যে আনাচে কানাচে কোথাও লুকিয়ে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাছে তারা ভরসা করে আবার কাছে আসে, তাই তাদের ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত আর একবার রিভলবার ছুড়ল। তারপর ছুটে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল—বড়োবাজার-টু, ও, থ্রি, ওয়ান। ইয়েস, প্লীজ।

—হ্যালো, থানা? সুন্দরবাবু কোথায়? ঘুমোচ্ছেন? এখনই তাঁকে জাগিয়ে দিন। আমার নাম? হ্যাঁ, জরুরি দরকার। ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবু লেনে এসে আমরা বন্দী হয়েছি। হ্যাঁ, সেই কাটামুণ্ডর মামলায়। আমরা তেতলার একটা ঘরের ভেতরে আছি। ওরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। পুলিসের আসতে দেরি হলেই আমরা মারা পড়ব। আসতে কত দেরি হবে? আন্দাজ আধঘণ্টা হয়ত আমরা আত্মরক্ষা করতে পারব, কারণ আমাদের কাছে দু-দুটো রিভলবার আছে। কিন্তু কিসে কি হয় বলা যায় না, ওরা দলে বেশ ভারি। আরও তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবু লেনের সত্য চৌধুরীর বাড়ি। একেবারে তেতলায়—

জয়ন্তর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভেতরে গ্রুম করে বেজায় একটা শব্দ হল। তারপরেই বিষম উগ্র একটা দুর্গন্ধ।

জয়ন্তর হাত থেকে রিসিভারটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝেয়, রাস্তার ধারের জানলার কাছে সরে গিয়ে ফাঁকে মুখ রেখে রুদ্ধস্বরে সে বলল—মানিক, শিগগির এদিকের জানলার ধারে এস। বারান্দার জানলা দিয়ে ওরা বিষাক্ত গ্যাস বোমা ছুড়েছে।

কিন্তু গ্যাসের ঝাঁঝে মাণিকের মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, কারণ বোমাটা ফেটেছে তারই কাছে। টলতে টলতে কয়েক পা এগিয়ে এসেই সে অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

জয়ন্তও জানলার ধারে গিয়ে রক্ষা পেল না, বিষময় যন্ত্রণায় তাকেও মেঝের ওপরে প্রথমে বসে, তারপর শুয়ে পড়তে হল। সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা শুনল, ঘরের বন্ধ দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধড়াস করে খুলে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূত, রাক্ষস না দানব?

এমন ঝড় বাদলের রাতে সুন্দরবাবু তাঁর বিছানায় কুঁকড়ে-সুঁকড়ে ঘুমোচ্ছিলেন বেশ আরামেই; হঠাৎ জরুরি ডাক শুনেই তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে নিচে নেমে এলেন মহা খাপ্পা হয়ে।

থানার সাব-ইনস্পেক্টর মনোহরকে ইউনিফর্ম পরে প্রস্তুত দেখে তিনি আরও গরম হয়ে গেলেন। মুখ খিঁচিয়ে বললেন, হুম, এই একটা রাত আমাকে না ডাকলে কি চলত না? ভগবান কি তোমার মগজে একফোঁটা বুদ্ধি দান করেননি? বলি, আর কত কাল আমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খাবে বাপু? এত রাতে এমন দুর্যোগে কি আবার জরুরি মামলা এল?

—আজ্ঞে, জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন, আমরা এখনই সেপাই নিয়ে সেখানে না গেলে নাকি মারা পড়বেন।

শুনেই বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কায় সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ আর বিরক্তি কোথায় ভেসে গেল, সচমকে বললেন—য়্যাঁ, বল কি? হুম, তাও কি হয়?...আর হবে নাই বা কেন? ছোকরারা যা গোঁয়ার, যেচে বিপদকে ডেকে নিয়ে আসে।

—স্যর, আমরা তা হলে কি করব? শুনছি আসামীরা দলে বেশ ভারি।

—এখন আর ভাববার সময় নেই, সেপাইদের শিগগির তৈরি হতে বল, হুম, আমি চোখের নিমেষে পোশাক পরে আসছি।—সুন্দরবাবু ঘর থেকে যেই যাবার উপক্রম করলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোন যন্ত্রে আবার ঘন ঘন সঙ্গীতের সৃষ্টি হল।

—আঃ, কে আবার রিং করে?...হ্যালো! হ্যাঁ, আমি সুন্দরবাবু। আপনি কে? হুম, কি বললেন? জয়ন্ত? কী আশ্চর্য! তুমি এখন কোথায়? নিজের বাড়িতে? হুম, আসামীরা তোমাদের রিভলবারের ভয়ে পালিয়ে গেছে? ১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে আমাদের আর যেতে হবে না? হুম, তোমরা কাল সকালে এসে সব কথা খুলে বলবে! বহুৎ আচ্ছা, হুম হুম! কি বলছ? আমি এত বেশি 'হুম' বলছি কেন? তা কি তুমি জান না? হুম! ...আচ্ছা, আজ আর আমরা যাব না। আচ্ছা, সুন্দরবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন।

সাব-ইনস্পেক্টর মনোহর বলল—তাহলে স্যার আমাদের আর যেতে হবে না?

—হুম! যেতে হবে না কি রকম? আলবৎ যেতে হবে...এক্ষুণি যেতে হবে... আরও তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—আজ্ঞে, ঐ যে শুনলাম, জয়ন্তবাবুরা বাড়িতে ফিরেছেন, আর আসামীরা পালিয়েছে—

—ও সব ধাপ্পা! আমাকে এত হুম বলতে শুনে জয়ন্ত কখনও আশ্চর্য হয়? যে আমাকে চেনে, সে-ই জানে, কেন আমি হুম বলি?...ওহে মনোহর, সেপাইদের সাজতে বল, আমরা এখনি পনের নম্বর বিষ্ণুবাবুর লেনে যাব। অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেক না, বুঝছ না। ফোনে এতক্ষণ জয়ন্ত কথা কইছিল না! পাছে আমরা এখনই দল বেঁধে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে আসামীদেরই কেউ জয়ন্তের নামে আমাদের সেখানে যেতে মানা করেছে! হুম, পুলিসের কাজে আমার কালো চুল সাদা হয়ে গেল আর আমাকেই ঠকাবার চেষ্টা? আমি কি গাড়োল? আমি কি মনোহর?

মনোহর দুঃখিত স্বরে বলল—আজ্ঞে স্যার, আপনার মতে কি গাড়োল বলতে আমাকেই বোঝায়?

—হুম, তা নয়ত কি? তুমি হলে এখনই ঠকে যেতে।

—আজ্ঞে।

—আবার 'আজ্ঞে' বলে। যাও, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক কর না, নিজের কাজে যাও। আর সময় নেই। আমি চট করে পোশাক পরে আসি।

কলকাতার নির্জন পথে পথে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া তখন গোঁ গোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুড় হুড় হুড় হুড় করে জল ঢালতে ঢালতে। কালো মেঘ তখনও ঘন ঘন আগুন-দাঁত খিঁচিয়ে গঙ্গার বুক যেন চিরে ফালা ফালা করে দিয়েই হুঙ্কার ছাড়ছে আর হুঙ্কার ছাড়ছে।

১৫ নম্বর বিষ্ণুবাবু লেন! আকাশের অন্ধকারের সঙ্গে মিলে গেছে গলির অন্ধকার, কারণ পথের গ্যাসের আলোগুলো কারা নিভিয়ে দিয়েছে।

সুন্দরবাবু ত্রস্ত স্বরে বললেন—হু, গতিক সুবিধের নয়, মনোহর।

—আজ্ঞে, কেন স্যর?

—গ্যাসের আলো নেভানো। আজ সন্ধ্যায় ওই কায়দাতেই ওরা আমায় ফাঁদে ফেলেছিল। অন্ধকারের ভেতর শত্রুরা লুকিয়ে আছে।

—বড়ই মুশকিল, স্যর! তাড়াতাড়িতে টর্চ আনা হয়নি।

—রিভলবার বার করো! সেপাইদের লাঠি বাগিয়ে ধরতে বল। ওই দেখ, ১৫ নম্বর বাড়ির তেতলায় একটা আলো জ্বলছে। কাদের সব ছায়াও দেখা যাচ্ছে। ওরা ভেবেছে, আজ রাত্রে আমরা আর আসব না, জয়ন্ত আর মানিককে খুন করে ধীরেসুস্থে ওরা সবাই সরে পড়তে পারবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। জয়ন্তবাবু ফোন করবার পরেই আসামীরা যখন ফোন করেছে তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা শত্রুদের খপ্পরে পড়েছেন। আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়।...ওই দেখুন স্যার, বাড়ির নিচে, অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে, কারা যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ তেতলার আলোও নিভে গেল—মনে হল যেন বিশ্বব্যাপী অন্ধকার হাঁ করে আলোটাকে গিলে ফেলল।

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বললেন—ওরা টের পেয়েছে আমরা এসেছি, সবাই দৌড়ে বাড়ির ওপরে গিয়ে পড়। সদর দরজা যদি বন্ধ থাকে লাথি মেরে ভেঙে ফেল। যাকে পাবে তাকেই গ্রেপ্তার করো! যে বাধা দেবে তাকেই আমরা গুলি করে মেরে ফেলব, হুম।

তখন ঝড় বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে ঝম ঝম করে। আঁধারের মধ্যে পথের ওপর বেজে উঠল পাহারাওয়ালাদের ভারি জুতোর শব্দ। সুন্দরবাবু শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে আকাশের দিকে রিভলবার তুলে একবার আওয়াজ করলেন। তারপরেই তাঁর মনে হল শত্রুরা দস্তুরমত ভয় পেয়েছে। কারণ বাড়ির নিচে যারা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের আর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

সদর দরজা খোলা।

সুন্দরবাবু বললেন—মনোহর, দুজন সেপাইকে এখানে পাহারায় রেখে বাড়ির ভেতরে দল বেঁধে ঢুকে পড়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে সকলেরই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল! অন্ধকার সেখানে পুঞ্জীভূত। সে অন্ধকার এমন নিরেট, মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে মানুষের দেহ যেন চুরমার হয়ে যাবে। সেখানকার স্তব্ধতাও বিস্ময়কর।

মনোহর বলল—আজ্ঞে স্যর, এখানে বোধ হয় জনপ্রাণী নেই। আসামীরা লম্বা দিয়েছে।

—লম্বা দিলেই হল! এইমাত্র তেতলায় আলো জ্বলতে দেখেছি। এরই মধ্যে যাবে কোথায়? চল তেতলায়। জয়ন্ত তো ফোনে আমাদের তেতলায়ই যেতে বলেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর! কিন্তু তেতলায় যাব কোনদিক দিয়ে? অন্ধকারে তো কোনও দিকই দেখা যাচ্ছে না।

—হুম, মনোহর! আকাট্য প্রমাণ পেলাম, তুমি একটি আস্ত গাড়োল। কোন আক্কেলে আলোর ব্যবস্থা করলে না, বল দেখি? বলি, সিগারেট-টিগারেট খাও, পকেটে দেশলাই আছে তো?

—আজ্ঞে না, স্যর।

—কথায় কথায় অত আজ্ঞে আজ্ঞে করো না, ভাল লাগে না। এ কি বিদঘুটে ঘুটঘুটে অন্ধকার রে বাবা! সেই সঙ্গে মস্ত এক গাড়োল আমার ঘাড়ে চেপেছে—আমি এখন কাকে সামলাই?

—আজ্ঞে স্যর, অত ব্যস্ত হবেন না। একটু ভেবে দেখা যাক। এই তো সদর দরজা। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা একটা লম্বা পথ বলে মনে হচ্ছে। পথের শেষে একটি উঠোন থাকাই সম্ভব। উঠোনের কোনো একদিকে তেতলার সিঁড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কি বলেন স্যর?

—আমি কিছুই বলি না, আমি খালি এগিয়ে যেতে চাই। যেদিকে হোক এগিয়ে চলো। এই সেপাইরা, এগিয়ে চল সব।

পাহারাওয়ালারা আবার জুতো বাজিয়ে এগিয়ে চলল। তিন-চার সেকেন্ড পরেই সুন্দরবাবু বললেন, এই সেপাইরা, দাঁড়াও।

তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আজ্ঞে, ওদের দাঁড়াতে বললেন কেন, স্যার?

—হুম, কান খাড়া করে শোন তো মনোহর, ওপর থেকে কি একটা দুম দুম করে নিচের দিকে নেমে আসছে না?

মনোহর কান খাড়া করে শুনল কিনা জানি না, কিন্তু চমকে উঠে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসছে স্যর।

—কি আসছে?

—আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না স্যর! হাতি যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারত, তাহলে ওই ধরনেরই শব্দ হত বটে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। হাতি আবার কবে সিঁড়ি দিয়ে নামে স্যর?

—হুম, হাতি কখনও সিঁড়ি দিয়ে নামে না, তবু অমন শব্দ হয় কেন? শব্দটাকে যে ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। শব্দটা যে একেবারে নিচে নেমে এসেছে! শব্দটা যে নিচে নেমে আমাদের দিকেই আসছে!

তারপরেই বাধল সে এক বর্ণনাতীত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড একটা অজানা ক্রুদ্ধ গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের আর্তনাদ। ঝড়ের ফুৎকারে কলাগাছ পড়ার মত ধপাধপ দেহ পড়ার শব্দ! কে এক অতিকায় দানব যেন পাহারাওয়ালাদের দেহগুলো শিশুর মত তুলে চারিদিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সুন্দরবাবু অন্ধকারে রিভলবারও ছুড়তে পারলেন না, পাছে সেপাইদের কারোর গায়ে গুলি লাগে। হতভম্ব হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকলেন, অ মনোহর!

রাস্তা থেকে আওয়াজ এল, আজ্ঞে স্যর। আমি পালিয়ে এসেছি স্যার! আপনিও পালিয়ে আসুন স্যর! ওরা আমাদের পেছনে রাক্ষস লেলিয়ে দিয়েছে, স্যর।

ভূত হোক, রাক্ষস হোক, যেই-ই হোক সেই ভয়াবহ বিপদ যে তাঁর সামনে এসে পড়েছে, সুন্দরবাবু স্পষ্টতই তা বুঝতে পারলেন। তিনি আড়ষ্টভাবে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একেবারে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন।

আচম্বিতে সদর দরজার ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকালো। এক পলকেই সুন্দরবাবু দেখে নিলেন, সদর দরজার আলো ভরা ফাঁকের পটে ফুটে উঠেছে অতি ভয়ানক এক দানব মূর্তি। তিনি তার অন্ধকার মাখা মুখ-চোখ-নাক কিছুই দেখতে পেলেন না, তাঁর নজরে পড়ল কেবল মূর্তির কাঁধ থেকে দুখানা মোটা মোটা লম্বা বাহু বেরিয়ে একেবারে মাটির ওপর এসে পড়েছে।

এরপরেও আর কোনও ভদ্রলোকের জ্ঞান থাকে? তাই সুন্দরবাবুরও রইল না। মাত্র একটি হুম শব্দ উচ্চারণ করে তিনি দস্তুরমত অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুন্দরবাবুর মুদ্রাদোষ নেই

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি চোখ মেলে দেখলেন, খালি ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনুভব করলেন, তাঁর পিঠের তলায় রয়েছে ঠাণ্ডা ভিজে মাটি এবং মুখে-বুকে ঝরছে ঝর ঝর করে বৃষ্টির জল।

একে একে সব কথা মনে হল। সেই ভয়াবহ বাড়ির ভেতর ঢুকে মূর্তিমান এক দুঃস্বপ্নকে দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি খোলা আকাশের তলায় মাটিতে শুয়ে ভিজছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন এবং নৃমুণ্ড শিকারীরা যে রামদা তুলে তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে বলি দেয়নি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে তাঁকে এখানে আনল এবং এ জায়গাটা কোন জায়গা?

হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে কে একখানা কনকনে ঠাণ্ডা হাত রাখল।

সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে সুন্দরবাবু শুয়ে শুয়েই হড়াৎ করে খানিকটা সরে গেলেন এবং তার পরেই চটপট উঠে অদ্ভুত বেগে মারলেন এক লম্বা দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ! শত্রুরা ধরতে আসছে! হাতে তাদের ধারাল খাঁড়া! একথা মনে হতেই সুন্দরবাবুর গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠল। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। জয়ন্ত ও মানিক সবিস্ময়ে একাধিকবার লক্ষ্য করেছে, বিপদ এড়িয়ে পালাবার সময়ে সুন্দরবাবু তাঁর প্রকাণ্ড দেহের ও প্রচণ্ড ভুঁড়ির বিপুল ভার একটুও অনুভব করেন না এবং ইচ্ছা করলে তখন তিনি যেন পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন।

কিন্তু ছিদ্রহীন অন্ধকারে এমন দ্রুত গতির বিপদ অনেক। সুন্দরবাবু হয়ত অনুসরণকারীদের নাগালের বাইরে গেলেন, কিন্তু তারপরেই বুঝলেন, একটা বিষয় ঢালু জায়গা দিয়ে তিনি হুড় মুড় করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন! কোথায় যাচ্ছেন? সেই অবস্থাতেই তিনি শুনতে পেলেন, পেছন থেকে চিৎকার করে কে বলছে, আজ্ঞে স্যার! এত বেশি ছুটবেন না, স্যর! সামনেই খাল।

আর খাল! সুন্দরবাবু কেবল ঝপাৎ করে খালেই প্রবেশ করলেন না, গতির বেগ সামলাতে না পেরে এগিয়েও গেলেন অগাধ জলে।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মনোহর ষাঁড়ের মত চেঁচাতে লাগল—এই চন্দন সিং, এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির, আমাদের স্যর জলে পড়ে গেছেন, শিগগির তাঁকে টেনে তোল।

অথৈ জলে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সুন্দরবাবু আকুল স্বরে ডাকলেন, অ মনোহর! আমি যে দু-তিন মিনিটের বেশি জলে ভাসতে পারি না। শিগগির এসে আমায় ধর, হুম!

—আজ্ঞে স্যর! আমি যে একটুও সাঁতার জানি না, স্যর! এই চন্দন সিং, এই পাঁড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির। ওরে বাবা, কি হবে গো! হায়, হায়, হায়, হায়! আজ্ঞে স্যর, আপনি কি এখনও ওপরে ভেসে আছেন? না, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, স্যার?

সুন্দরবাবু জবাব দিতে পারলেন না, খালি বললেন, হুম! তাঁর পা দুটো এরই মধ্যে যেন দু'মণ ভারি হয়ে তাঁকে পাতালে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু চার-পাঁচজন সেপাই সাঁতরে গিয়ে পাতালে প্রবেশের দায় থেকে সে যাত্রা তাঁকে উদ্ধার করল।

ডাঙায় উঠে সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ ধরে হুম হুম শব্দে হাঁপ ছাড়তে লাগলেন। হাঁপ ছাড়ার শব্দ যখন ক্ষীণ হয়ে এল, মনোহর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ্ঞে এখন কি একটু সামলেছেন স্যর?

—হুম।

—বড্ড বেশি জল খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে কি স্যর?

—উহুঁ, হুম।

—অমন করে পালালেন কেন, স্যর?

—আমার মুখে কে হাত রেখেছিল যেন!

—সে তো আমি স্যর।

—তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর! আমি মুখে হাত বুলিয়ে দেখছিলাম, আপনার জ্ঞান হয়েছে কিনা।

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—মনোহর, তুমি আস্ত গাড়োল! হাত দিয়ে কখনও দেখা যায়? ভগবান তবে চোখ সৃষ্টি করেছেন কেন?

—আজ্ঞে স্যর, ভগবান যে অন্ধকার সৃষ্টি করে চোখকে অন্ধও করে দেন। দেখুন না, অন্ধকারে এখনও আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু হাত-পা-মাথা দিয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঝুপ ঝাপ করে বৃষ্টি পড়ছে!

—মনোহর, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে তর্ক কর না। তুমি কেবল গাড়োলই নও, তুমি কাপুরুষ। আমাকে ভূত না রাক্ষসের মুখে ঠেলে ফেলে তুমি অনায়াসেই পিঠটান দিয়েছিলে!

—আজ্ঞে, দিয়েছিলাম স্যর! কিন্তু আপনি ভির্মি যাবার পর আবার ফিরে গিয়েছিলাম। সবাই মিলে আপনাকে ধরাধরি করে আমরাই তো বাইরে এনেছিলাম!

—কিন্তু সেই রাক্ষসটা এখন কোথায়?

—বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হল, সে তখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

—তাকে দেখতে কি রকম?

—একটা কালো হাতির মত।

—হুম, আবার আস্ত গাড়োলের মত কথা বললে? হাতি কখনও বাড়ির ভেতর থাকে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের মত তার দুটো হাত ও দুটো পা আছে।

—আজ্ঞে, তার আছে বড় বড় দাঁত, যাকে বলে বিকট দন্ত।

—তার গা দিয়ে বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছিল।

—আর তার চোখ দিয়ে বেরোচ্ছিল আগুন।

—হুম, তুমি আর কি কি দেখেছ, মনোহর?

—আজ্ঞে, আর কিছুই দেখিনি স্যর! তারপরেই বিদ্যুৎ নিভে গেল! তারপরেই মাটির ওপরে ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ হল। শব্দটা চলে গেল খালের দিকে।

—তারপর?

—তারপর আর একটা নতুন শব্দ।

—নতুন শব্দ মানে?

—আজ্ঞে স্যর, জলে ছপ ছপ করে দাঁড় ফেলার মত শব্দ। মনে হল, কারা যেন দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাচ্ছে।

—সুন্দরবাবু নিরবে ভাবতে লাগলেন। নৃমুণ্ড শিকারীদের ধরবার জন্য বাগবাজার খালের সাঁকোর ওপরে তিনিও এক কিম্ভূতকিমাকারকে দেখেছিলেন আবছায়ার মত। এবং সেদিন তিনিও শুনেছিলেন, খালের জলে ছপ ছপ করে দাঁড়ি ফেলে নৌকো চালানোর শব্দ। এ সব অদ্ভুত রহস্যের অর্থ কি? কলকাতার খালে নদীতে আজকাল কি কোনও অমানুষিক রাক্ষস-মাঝি নৌকো নিয়ে আনাগোনা করে? তারই রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্যে শহরে মানুষের পর মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। কিন্তু এ রাক্ষস খালি মুণ্ড কেটে নিয়ে যায় কেন? সে কি মুণ্ড খেতেই শুধু ভালবাসে? কিন্তু তার সঙ্গে যে মানুষের যোগ আছে, এরও তো প্রমাণ রয়েছে! ভূত-রাক্ষস-দানবের সঙ্গে মানুষের মিতালি? আশ্চর্য!

পুরাতন পুলিস-কর্মচারির পাকা মাথা এইখানে খুঁত খুঁত করতে লাগল। সুন্দরবাবু ঘুটঘুটে রাতে

খুব জোর করে হয়ত বলতে পারবেন না যে, তিনি ভূত মানেন না মোটেই; কিন্তু ভূত-রাক্ষস-দানব মানানসই হয় শিশুদের সেকালের রূপকথায়। তাদের শ্রদ্ধা বা স্বীকার করলে পুলিশের কাজে দিতে হয় ইস্তফা। সেকালের জীবজন্তুদের মত যক্ষরক্ষ, দৈত্যদানাও পৃথিবীতে আর বাস করে না এবং ডাইনোসরের মত ভূত প্রেতের গল্পও পড়তে-বা শুনতে ভাল লাগে বলেই আজকের দিনেও লেখকেরা আর কথকরা তাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন অত বেশি। আসলে ও সবের মধ্যে কোনও পদার্থই নেই। কিন্তু!...হুঁ 'কিন্তু' থেকে যায় তবু একটা। ওই ভৈরব অবতারটি কে? সুন্দরবাবুর চোখের সুমুখেই আবির্ভূত হয়ে সে একলাই আজ এতগুলো পুলিশের লাঠিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, গণ্ডা গণ্ডা যণ্ডা চেহারার কুস্তি-লড়া পাহারাওয়ালাকে খেলা ঘরের পুতুলের মতন তুলে আছাড়ের পর আছাড় মেরেছে! পাহারাওয়ালাদের কেউ একটা হাত পর্যন্ত তোলবার ফাঁক পায়নি। ও শক্তি কি মানুষের?

খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু আজ যেমন তল খুঁজে পাননি, এই গভীর চিন্তার সাগরে ডুবেও তাঁর হাল হল সেই রকম। ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেল, তিনি আর পারলেন না—উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, হুম!

—আজ্ঞে, স্যর?

—মনোহর, এই রাক্ষসটার চেয়েও কথায় কথায় তোমার ওই 'আজ্ঞে স্যর' হচ্ছে বেশি ভয়ানক! হুম, আর আমি সইতে পারছি না।

—আজ্ঞে, ওরকম একটু-আধটু কথার দোষ সকলেরই থাকে, কি করব স্যার, উপায় নেই।

—উপায় নেই? নেই বললেই হল? হুম, আমিও তো মানুষ, আমার কোনও মুদ্রাদোষ আছে?...কি, চুপ করে রইলে যে বড়? বল, বল না, আমার কোনও মুদ্রাদোষ আছে? ওটি বলবার জো নেই, হুম!

—আজ্ঞে স্যর, কিছু দোষ নেবেন না স্যর, কিন্তু কথায় কথায় আপনার ঐ 'হুম'টা কি স্যর?

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মনোহর, তুমি একটি আস্ত গাড়োল। বড্ড বাজে বক।

—আজ্ঞে, আমরা এখন কি করব স্যর?

—তোমরা সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইখানে বসে পাহারা দাও।

—আজ্ঞে, কার ওপরে পাহারা দেব স্যর?

—হুম, সেই কিম্ভূতকিমাকার হয়ত তার দলবল নিয়ে এখনও বিষ্ণুবাবুর গলিতেই লুকিয়ে আছে।

—লুকিয়ে আছে, স্যার? সর্বনাশ! তা হলে তারাও তো আমাদের ওপরে পাহারা দেবে! আমার বিশ্বাস, অন্ধকারেও তারা দেখতে পায়।

—হতে পারে।

—হতে পারে? বলেন কি স্যর? যদি তারা তেড়ে আসে, স্যর?

—লাঠি চালিও।

—আজ্ঞে, লাঠি তোলবার সময় কি পাব?

—তাহলে চম্পট দিও। হুম, আমি এখন চললাম।

—কোথায় স্যর, কোথায়? আবার ওই বাড়িতে?

—তুমি কেবল গাড়োলই নও, মস্ত পাগল। ও বাড়িতে আবার পা বাড়াব? ও বাড়িকে আমি ঘৃণা করি। আমি এখন থানায় চললাম।

—আজ্ঞে, আপনি কি ভয় পেয়েছেন স্যর?

—ভয়! হুম, ভয়ডর কিছুই আমার নেই। পুলিসের কি ভয় পেলে চলে হে? কিন্তু আমার শরীর আর বইছে না। আমি আজ অজ্ঞান হয়েছি...আছাড় খেয়েছি...জলে ডুবেছি। হয়ত কালই আমায় নিউমোনিয়া ধরবে। তার ওপরে শোকে দুঃখে আমার মনমেজাজও নেতিয়ে পড়েছে।

—আজ্ঞে, শোক দুঃখ আবার কেন স্যর? আপনি তো জলজ্যান্ত এখনও বেঁচে রয়েছেন।

—গাড়োল! আমার শোক দুঃখ তুমি কি বুঝবে? জয়ন্ত আর মাণিকের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে। হয়ত তারা আর বেঁচে নেই, আমি বন্ধু হয়েও তাদের উদ্ধার করতে পারলাম না। কিন্তু সেকথা যাক, শোন মনোহর, তোমরা রাতটা এইখানে বসে কাটাও। তারপর সকাল হলে ওই বাড়িখানা খানাতল্লাসি করে থানায় গিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট দাখিল করবে।

—কিন্তু ও বাড়িতে আমাদের যদি ঢুকতে না দেয়, স্যর?

—কে ঢুকতে দেবে না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকালে তোমরা খালি বাড়িতে ঢুকেই খানাতল্লাসি করবে।

—আজ্ঞে, তাহলে আর খানাতল্লাসির দরকার কি, স্যর?

—মনোহর, তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মূর্খ জীবনে আমি দেখিনি। আসামীরা পালালেও পেছনে কত প্রমাণ রেখে যায়, জান না? আচ্ছা, সকলে তোমরা আর এক কাজ করো। তোমরা ওই বাড়িখানা ঘেরাও করে, লক্ষ্মীছেলের মত চুপটি করে বসে থেক, তারপর আমিই আবার এসে খানাতল্লাসি শুরু করব। এখন আমি চললাম।

সকাল বেলা মেঘেরা বিদায় নিল না বটে, কিন্তু আকাশ ধরল।

সুন্দরবাবু যথাসময়ে উঠে ইউনিফর্ম পরে ওপরের ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। তাঁর মুখে গভীর চিন্তার আভাস।

হঠাৎ তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত স্বরে বলে উঠলেন—মনে পড়েছে, ঠিক লোকের কথা মনে পড়েছে। তাদের সাহায্য পেলেই আমি জয়ন্ত আর মানিককে ঠিক খুঁজে বার করতে পারব।

সুন্দরবাবু দ্রুতপদে নিচে নেমে এসে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। নম্বর বলে সাড়া পেয়েই বললেন—হ্যালো, কে? বিমলবাবু কি? নমস্কার। কি করছেন? কুমারবাবু আর বাঘার সঙ্গে চা পান করছেন? আচ্ছা, আপনারা দুই বন্ধুতে একবার থানায় আসতে পারেন কি? হ্যাঁ, এখনই। কি দরকার? সব কথা পরে শুনবেন। এখন খালি এইটুকু জেনে রাখুন, আমরা এক কিম্ভূতকিমাকারের হাতে পড়েছি। হ্যাঁ, মশাই, কিম্ভূতকিমাকার। তাকে ভূতও বলতে পারেন, রাক্ষসও বলতে পারেন, দানবও বলতে পারেন। আসছেন? আচ্ছা, হুম!

নবম পরিচ্ছেদ

কে এই ভীমাবতার?

শেষ চাটুকু দুচুমুকে নিঃশেষ করে কুমার বলল—সুন্দরবাবু, আবার হঠাৎ কি বিপদে পড়লেন হে?

ড্রয়ার খুলে রিভলবারটা বার করে পকেটে ফেলে বিমল বললে—থানায় গেলেই জানা যাবে। চল।

রাস্তায় বেরিয়ে কুমার বলল—খবরের কাগজে দেখেছি, সুন্দরবাবু এখন নৃমুণ্ড শিকারীর মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমাদের ডাক পড়েছে বোধ হয় সেইজন্যই।—খুব সম্ভব তাই। কিন্তু সুন্দরবাবুর

বন্ধু ডিটেকটিভ জয়ন্ত থাকতে আমাদের ডাক পড়বে কেন? আমরা তো হচ্ছি মাত্র অ্যাডভেঞ্চারার!...আরে, আরে! বাঘা, তোকে আমরা ডাকিনি, তুই এলি কেন রে?

বাঘা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করল না। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাদের আগে যেতে লাগল। বাঘাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে তারাও কিছু বলল না।

থানায় ঢুকতেই সুন্দরবাবু ছুটে এলেন সবেগে। তাড়াতাড়ি বিমলের হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলেন—ভয়ানক কাণ্ড বিমলবাবু, ভয়ানক কাণ্ড! জয়ন্ত আর মানিক বোধ হয় বেঁচে নেই।

বিমল প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন চুপ করে রইল। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' মামলায় জয়ন্ত ও মাণিকের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয়, সে আজ বেশিদিনের কথা নয়। কিন্তু এই অল্প দিনেই তারা পরস্পরের বন্ধুর মতন হয়ে উঠেছে। কাজেই খবরটা শুনে তার বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা লাগল।

কুমার বলল—কেন, তাঁদের কি হয়েছিল?

—হুম, তারা নৃমুণ্ড শিকারীদের পাল্লায় পড়া মানেই তো হচ্ছে মুণ্ড উড়ে যাওয়া!

বিমল বলল—আচ্ছা, সব কথা খুলে বলুন দেখি।

সুন্দরবাবু বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে খুলে বলবার সময় নেই। চলুন, ট্যাক্সিতে উঠে সংক্ষেপে সব বলছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। এরকম রহস্যময় ব্যাপারে আপনাদের বাহাদুরি তো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। বিমল ও কুমারের সঙ্গে বাঘাও এক লাফে গাড়ির ভেতরে গিয়ে হাজির। দেখেই সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে গাড়ি থেকে আবার নেমে পড়বার উপক্রম করলেন।

কুমার তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলল—কি হল সুন্দরবাবু, যান কোথায়?

—হুম, রাস্তায়। আপনাদের শখের নেড়ি কুকুর গাড়িতে চড়েছে। বাপরে! ওকে দেখলেই ভয় হয়।

—আমি বলছি, কোনও ভয় নেই।

—আমি বলছি, রীতিমত ভয় আছে। আমার ওপর এখন শনির দৃষ্টি। জানেন, ঘণ্টা কয়েক আগে আমি আছাড় খেয়েছি, অজ্ঞান হয়েছি, জলে ডুবেছি! এর ওপর ধাড়ি নেড়ি কুকুরের কামড় আর সইবে না।

—কিন্তু বাঘা যে আজ গোঁ ধরেছে, আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। বাঘা, তুই ড্রাইভারের পাশের সিটে বসগে যা। এই বলে কুমার সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

বাঘাও অমনই অত্যন্ত সুবোধের মত টুপ করে ছোট্ট একটি লাফ মেরে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করল। সে বুঝতে পেরেছিল তাকে নিয়েই একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। একবার আড়চোখে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন—এত বড় এত মোটা আর এত ভারি নেড়ি-কুকুর জীবনে আমি আর দেখিনি।

কুমার বলল—বাঘা আমাদের দেশি কুকুর, নেড়িকুত্তা বলে ওকে তাচ্ছিল্য করবেন না সুন্দরবাবু। বরং যত্ন করলে আমাদের দেশি কুকুরও যে কত বড়, আর কত সবল হতে পারে, সেইটেই ভেবে দেখুন।

—কুকুর নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এখন সব কথা বলি, শুনুন।

ট্যাক্সি বিষ্ণুবাবু লেনে ঢুকে থামল যথাস্থানে।

মনোহর বোঁ বোঁ করে ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়েই স্যালুট ঠুকে বলল—স্যর, স্যর, এসেছেন স্যর? বাঁচলাম স্যর। শেষ রাতটুকু যে দুর্ভাবনায় কেটেছে!

—হুম, তোমার আবার দুর্ভাবনা কিসের বাপু? বিপদ দেখলেই যে লোক রেসের ঘোড়ার মত দৌড়তে পারে তার আবার দুর্ভাবনা?

মনোহর যে কাল রাতে রাক্ষসের মুখে তাঁকে ফেলে লম্বা দৌড় মেরে পালিয়ে গিয়েছিল, সুন্দরবাবু সে রাগ তখনও হজম করতে পারেননি।

—আজ্ঞে স্যর, দৌড়ের কথা কেন বলছেন, স্যর? আমি তো আপনার কাছে একেবারেই নাবালক। আমি দৌড়ই খালি ডাঙায়, আর আপনি যে জলেস্থলে সমান দৌড়তে পারেন, স্যর! খালের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন স্যর?

—আঃ, সুপিরিয়র অফিসারের সঙ্গে বাজে তর্ক করো না। কাজের কথা বল।

—কাজের কথা আর কি বলব, স্যর? সকলে মিলে ওই মরা বাড়িখানার ওপরে পাহারা দিচ্ছি।

—মরা বাড়ি? সে আবার কী? বাড়ি কখনও জ্যান্ত আর মরা হয়?

কুমার বলল—মনোহরবাবু বোধ হয় বলতে চান যে, ও বাড়িতে কোনও মানুষের সাড়া-শব্দ নেই।

মনোহর সোৎসাহে বলল—আজ্ঞে স্যর, ঠিকই ধরেছেন। আমি তো ওই কথাই বলতে চাই, স্যর। মশামাছি আর পিঁপড়ে ছাড়া ও বাড়ির ভেতরে এখন আর কেউ নেই।

—সেই রাক্ষসটা আর দেখা দেয়নি?

—আজ্ঞে, না স্যর!

—কোনও রকম তর্জন-গর্জনও করেনি?

—টুঁ শব্দটি শুনিনি, স্যর।

—হুম, শুনে হাঁপ ছাড়লাম। চলুন বিমলবাবু, এবারে আমরা ও-বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ি।...দুর্গা, দুর্গা।

সবাই অগ্রসর হল। সর্বাগ্রে বাড়ির মধ্যে ঢুকল বাঘা! কিন্তু দরজা পার হয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চারিদিকে ঘ্রাণ নিতে লাগল।

বিমল বলল—বাঘার মনে বোধ হয় কোনও সন্দেহ হয়েছে।

সুন্দরবাবু আচমকে বললেন—কিসের সন্দেহ?

—সে বুঝতে পেরেছে, এটা শত্রুপুরী।

—বুঝতে পেরেছে না ছাই।

হঠাৎ বাঘা গরর গরর করে গজরাতে লাগল।

—ও বাবা আপনাদের কুকুর অমন করে কেন মশাই? কামড়াবে নাকি?

—না, বাঘা বলছে, আমি এখানে কোনও শত্রুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।

—শত্রুর গায়ের গন্ধ? বলেন কি? শত্রু তা হলে এখনও এইখানেই আছে? হুম?

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলেন এবং তালে তালে তাল মিলিয়ে পিছু হটতে লাগল মনোহর।

বিমল কোনও রকমে হাসি চেপে বলল—মাভৈঃ।

—হুম!

—আজ্ঞে স্যর, সে মূর্তিটাকে আপনি তো দেখেননি, তাহলে আর মাভৈঃ বলতেন না। পালিয়ে আসুন, স্যর। এখনও পালাবার সময় আছে।

কিন্তু বিমল ও কুমার একবারও পেছন ফিরে তাকাল না, দৃঢ়পদে বাঘার অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর দিকে অগ্রসর হল। বাঘা তখন কিসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মনোহর বলল—ওঁরা যে পাগলের মত মরতে চললেন! চলুন স্যর, আমরা এইবেলা লম্বা দিই।

রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু বললেন—না মনোহর, সেটা ভাল দেখায় না। ডিউটি ইজ ডিউটি। কিন্তু কুকুরটা কিসের গন্ধ পেল, বল দেখি?

—আজ্ঞে স্যর, বিপদের গন্ধ।

—মনোহর, মাঝে মাঝে তুমি এমন বিটকেল কথা কও, কোনও মানে হয় না। খানিক আগে বললে—'মরা বাড়ি'। এখন আবার বলছ 'বিপদের গন্ধ'। বিপদের আবার গন্ধ কি হে? যাক, এখন আমার সঙ্গে চল।

—আজ্ঞে স্যর, আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে পাহারা দিলেই ভাল হয় না?

—ও, তার মানে আবার তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাও? না না, ও সব হবে-টবে না। এবারে তোমার পালাবার পথ আমি বন্ধ করব। এবারে তুমি আমার সামনের দিকে থাক।

তখন বাঘার সঙ্গে বিমল ও কুমার একতলার একখানা প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতরের গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বাঘার গজরানি আরও বেড়ে গেল। বিমল ও কুমার অনুভব করল, সমস্ত ঘরখানা একটা উগ্র ভয়াবহ দুর্গন্ধে ভরপুর।

কুমার বলল—এ ঘরে কে থাকত?

বিমল আঙুল দেখিয়ে বলল—জানলার লোহার গরাদগুলো দেখছ? দুইঞ্চিরও বেশি মোটা!

—দরজার সামনেও কোলাপসিবল গেট।

—তার মানে, এ ঘরে কারুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বলেই বিমল মেঝের ওপরে বসে পড়ে কি যেন তুলে নিতে লাগল।

—কি করছ বিমল?

—চুপ! এই দেখ। এখন কারুকে কিছু বল না। আগে ভাল করে পরীক্ষা করি।

এমন সময়ে সুন্দরবাবু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন—খবর কি?

—খবর শুভ। চলুন সুন্দরবাবু, বাইরে যাই। এস কুমার। বিমল বলল।

সুন্দরবাবু বললেন—কাল আমরা যখন এখানে আসি, তখন তেতলার ওই কোণের ঘরটায় আলো জ্বলছিল। আমাদের দেখেই কারা আলো নিভিয়ে দেয়। চলুন, আগে আমরা ওই ঘরেই যাই।

বিমল বলল—না, আগে একতলার আর দোতলার সব ঘর পরীক্ষা না করে তেতলায় ওঠা নিরাপদ নয়।

একতলা আর দোতলার অন্য সব ঘর দেখে তারা সেই সাজানো গোছানো হল ঘরে প্রবেশ করল। জয়ন্ত ও মানিক সেই হলঘরটাকে যে অবস্থায় দেখেছিল এখনও তার কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা বা সাড়া নেই। মনোহর ঠিকই বর্ণনা দিয়েছে—মরা বাড়ি।

সুন্দরবাবু বললেন—যা ভেবেছিলাম তাই। আসামীরা পালিয়েছে। তবু চলুন, একবার তেতলাটা দেখেই যাই।

বিমল জবাব দিল না, ঘরের লেখবার টেবিলের দিকে হেঁটমুখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমারও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন সুন্দরবাবুও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন।

বিমল বলল—দেখ তো কুমার, ব্লটিং প্যাডের ওপরে কি যেন লেখা রয়েছে?

কুমার ভাল করে দেখে বলল—কেউ কারও ঠিকানা লিখে, খামখানা প্যাডের ওপর চেপে কালি শুকিয়ে নিয়েছে। উল্টো ছাপ পড়েছে—সব জায়গায় স্পষ্টও নয়। তবে নামের গোড়ার অক্ষরটা S, আর উপাধি হচ্ছে চৌধুরী। আর একটা কথা যা পড়া যাচ্ছে— 'ফ্রেজারগঞ্জ' বোধ হয়। বিমল বলল—আমিও ঠিক ওইটুকুই পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি।

সুন্দরবাবু বললেন—এস চৌধুরী, অর্থাৎ সত্য চৌধুরী। সেই-ই এ বাড়ির মালিক, আর বোধ হয় পালের একজন গোদা। আমরা খবর পেয়েছি, সে এখন কলকাতায় নেই।

বিমল বলল—খুব সম্ভব চিঠিখানা কালই লেখা হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন—কি করে জানলেন?

অক্ষরের ছাঁদগুলো দেখলেই বোঝা যায়, খুব তাড়াতাড়িতে লেখা। চেয়ে দেখুন, কলমদানিতে কালো কালির কলম নেই, সেটা পড়ে রয়েছে টেবিলের তলায়।

—তাতে কি বোঝায়?

—লোকটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখে কলমটা যথাস্থানে রাখবার সময় পায়নি। ছুড়ে ফেলে দিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গেছে। কাল এখানে যেসব কাণ্ড ঘটেছে, তার ব্যস্ততার আর উত্তেজনার কারণ বোধহয় তাই।

—হুম, ওসব বাজে কথা রেখে তেতলার ঘরে চলুন।

—কিন্তু তেতলার ঘরও খালি।

মনোহর বলল—স্যর! ওই দেখুন টেলিফোন। জয়ন্তবাবু তাহলে এই ঘর থেকেই ফোনে আমাদের ডেকেছিলেন।

সুন্দরবাবু ম্রিয়মান মুখে বললেন—কিন্তু জয়ন্ত আর মাণিকের কি হল?

বিমল বলল—জয়ন্তবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, খুব সম্ভব তাঁকে এখনও হত্যা করা হয়নি। বাড়ির কোনও ঘরে এক ফোঁটা রক্ত বা হত্যার কোনও চিহ্নই নেই। সম্ভবত এখনকার মত তিনি আর মানিকবাবু বন্দী হয়ে আছেন।

—কিন্তু কি করে তাঁদের উদ্ধার করব? কোথায় গেলে তাঁদের পাব?

বিমল খানিকক্ষণ চিন্তিত মুখে নীরব হয়ে রইল। তারপর যেন নিজের মনেই বলল—একটি মাত্র সূত্র পেয়েছি, কিন্তু সেটা কি কোনও কাজে লাগবে?

—হুম, আমি তো সূত্র-ফুত্র কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! সব অন্ধকার।

—আপনার মুখে শুনলাম, সত্য চৌধুরী আসামীদের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি, আর সে এখন কলকাতায় নেই। ধরুন, সে আছে ফ্রেজারগঞ্জে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসামীরা জয়ন্তবাবুদের বন্দী করে পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে, চিঠি লিখে সত্য চৌধুরীকে খবর জানিয়ে চিঠিখানা এখানকার কোনও ডাকবাক্সে ফেলে গেছে।

—হতেও পারে, না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব।

—তা বটে। শুধু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—কি চেষ্টা করব?

—এখন বেলা মোটে সাতটা। কাল শেষ রাতে যদি কেউ চিঠি লিখে থাকে তবে সেখানা এখনও বোধ হয় এই পাড়ার ডাকঘরেই বা ডাকবাক্সে জমা আছে। সেখানা কোনও রকমে সংগ্রহ করা যায় নাকি?

সুন্দরবাবু বললেন—কিছু ফল হবে বলে মনে হয় না। তবু ডাকঘরেই যাচ্ছি। এখানকার পোস্ট মাস্টার আমার বিশেষ বন্ধু।

—বন্ধু না হলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ আপনি যাচ্ছেন রাজকার্যেই। আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আমরাও বাড়িতে যাই। খবরটা দেবেন।

আধ ঘণ্টা পরেই বিমল ও কুমারের বৈঠকখানায় দিগ্বিজয়ীর মত বুক ফুলিয়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। তাঁর দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে সমুজ্জ্বল।

বিমল হাসিমুখে বলল—কি সংবাদ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন—আশ্চর্য, আশ্চর্য! বিমলবাবু, আপনি গোয়েন্দা না হয়েও আমাদের সবাইকে যে হারিয়ে দিলেন! জয়ন্তকে যদি ফিরে পাই, বলব—দুয়ো জয়ন্ত!

—কেন বলুন দেখি?

—ব্লটিং প্যাডে উল্টো ছাঁদে তুচ্ছ দুটো কালির আঁচড় আর ঘরের মেঝেতে একটা স্থানচ্যুত কলম! এইমাত্র দেখেই আপনি কতবড় একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন! হুম, আশ্চর্য!

—কি আবিষ্কার?

নৃমুণ্ড শিকারীদের আস্তানা আবিষ্কার, তাদের দলপতিকে আবিষ্কার, এতদিন ধরে আমরা কেউ যা করতে পারিনি! তার ওপরে জয়ন্ত আর মানিককে আবিষ্কার।

—তা হলে সত্য-সত্যই ওখানে কাল রাতে কেউ চিঠি লিখেছিল?

—পকেট থেকে একখানা খাম বার করে সুন্দরবাবু বললেন—এই নিন সেই চিঠি।

খামের ভেতর থেকে চিঠিখানা বার করে বিমল পড়ল:

মাননীয় মহাশয়,

আজ রাতে ডিটেকটিভ জয়ন্ত আর তার বন্ধুকে আমরা বন্দী করিয়াছি, জানিবেন। তারপর পুলিসের সহিত আমাদের দাঙ্গা হইয়াছে। ভীমাবতারের হাতে মার খাইয়া পুলিস পলাইয়া গিয়াছে, হয়ত এখনই আবার ফিরিয়া আসিবে। আপনার অনুমতি পাই নাই বলিয়া বন্দীদের বধ করিতে পারিলাম না। তাহাদের লইয়া আমরা নৌকায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িব। তারপর পথে আপনার বাগান বাড়ি হইতে মোটর বোট লইয়া ফুলছড়ি দ্বীপের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইব। আপনিও যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানে যাইলে ভাল হয়। আর কিছু লিখিবার সময় নাই। ইতি—

আপনার অনুগত
শ্রীপশুপতি হাজরা

দশম পরিচ্ছেদ

ভূত. অসামাজিক, অমানুষিক, অস্বাভাবিক

বিমল চিঠিখানা হাতে করে খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলল, তাহলে জয়ন্তবাবুরা এখন ফুলছড়ি দ্বীপের দিকে যাত্রা করছেন!

সুন্দরবাবু বললেন—ফুলছড়ি দ্বীপের নাম আমি শুনেছি।

কুমার বলল—কিন্তু আমরা সেখানে একবার গিয়েছিলাম। সুন্দরবন ছাড়িয়ে মাতলা আর জামিরা নদী যেখানে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সেখানে কতকগুলো দ্বীপ আছে। তাদেরই একটি হচ্ছে ফুলছড়ি দ্বীপ। ফ্রেজারগঞ্জ থেকে জলপথে ওই দ্বীপে যাওয়া যায়।

সুন্দরবাবু বললেন—তা হলে এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরাও কি পোর্ট পুলিসের লঞ্চ নিয়ে পশুপতিদের পিছনে তাড়া করব?

বিমল বলল—না। কারণ প্রথমত তারা অনেক আগে বেরিয়েছে, হয়ত তাদের ধরতে পারব না। দ্বিতীয়ত, আসামীদের নাগাল পেলেও জলপথে তাদের সতর্ক চোখগুলোকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে কাছে যেতে পারব না! দূর থেকে পুলিসের লঞ্চ দেখলেই তারা নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবুকে হত্যা করে জলে ফেলে দিয়ে নির্দোষী সাজবার চেষ্টা করবে। আমাদের চুপি চুপি যেতে হবে একেবারে তাদের আড্ডায়, অর্থাৎ ফুলছড়ি দ্বীপে।

সুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু তাদের আড্ডা আছে হয়ত গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোনও গোপন স্থানে। আমরা তার সন্ধান পাব কেমন করে?

—সন্ধান পাওয়া খুবই সহজ।

—সহজ?

—হ্যাঁ। আগে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে আমরা সত্য চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করব। সত্যই তার আড্ডার সন্ধান বলে দিতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু দেরি হলে পশুপতিরা যদি জয়ন্ত আর মানিককে মেরে ফেলে?

—পশুপতির চিঠিতেই দেখছেন তো সত্য চৌধুরীর হুকুম পায়নি বলেই সে বন্দীদের খুন করেনি।

—হুম, সে কথা সত্যি। কিন্তু বলা তো যায় না, সত্য চৌধুরী যদি আমাদের আগেই ফুলছড়ি দ্বীপে গিয়ে হাজির হয়?

—কেন যাবে সে? জয়ন্তবাবুরা যে বন্দী হয়েছেন, এ খবর সে জানেনা। পশুপতির চিঠি আমাদের হাতে। এ চিঠি আমরা ফেরৎ দেব না। চিঠির বদলে তার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হব সদলবলে আমরাই। তারপর বোঝা যাবে, সে আমাদের পথ দেখিয়ে ফুলছড়ি দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজি হয় কিনা।

কুমার বলল, আমিও বিমলের প্রস্তাব সমর্থন করি। সুন্দরবাবু, আপনি এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেজারগঞ্জে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলুন। সঙ্গে একদল সশস্ত্র পুলিস নিতে ভুলবেন না। জয়ন্তবাবুদের উদ্ধার করবার আগে হয়ত আমাদের একটা খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

সুন্দরবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, হুম, যুদ্ধে আমি ভয় পাই না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু আমার ভয়, সেই বীভৎস ভীমাবতারকে! আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে, সেপাইরা কি তাকে কাবু করতে পারবে!

কুমার মুখ টিপে হাসতে হাসতে বিমলকে বলল—কিহে, ভীমাবতারের গুপ্তকথা সুন্দরবাবুর কাছে খুলে বলব নাকি?

বিমল মাথা নেড়ে বলল—না, এখন নয়!

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন—হুম, হুম! ভীমাবতার কে, আপনারা তা জানেন?

বিমল বলল—জানি।

—কী আশ্চর্য! জানেন তবু বলবেন না?

—না।

—কেন শুনি?

—বললে হয়ত আরও বেশি ভয় পাবেন।

—হুম, যা ভয় পেয়েছি তারই তুলনা হয় না। তার চেয়ে আর বেশি ভয় পাবার উপায়ই নেই। আপনি অনায়াসেই বলতে পারেন। ভীমাবতার কে? সে কি মানুষ, না ভূত?

—যদি বলি ভূত, তা হলে কি করবেন?

—তা হলে তার সঙ্গে আর দেখা করব না। জয়ন্ত আর মানিক জানে—আপনারাও জেনে রাখুন, ভূত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিত দুর্বলতা আছে। কারণ ভূতেরা হচ্ছে অসামাজিক, অমানুষিক আর অস্বাভাবিক। তাদের সঙ্গে কোনও ভদ্র লোকেরই সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি জানতে চাই, ভীমাবতারটা ভূত কিনা?

বিমল বলল—তা হলে খালি এইটুকু জেনে রাখুন, যে ভীমাবতার হচ্ছে ভূতের চেয়েও অসামাজিক, অমানুষিক আর ভয়ানক।

—তার মানে?

—তার মানে কোন বিশেষ প্রমাণ পেয়ে এই ভীমাবতারটির সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু শেষটা সে সন্দেহ সত্য না হতেও পারে। কাজে কাজেই ভীমাবতার সম্বন্ধে আপাতত বেশি কিছু আর বলতে পারব না। বিশেষ, এখন আমরা যাচ্ছি ফ্রেজারগঞ্জে, যেখানে ভীমাবতার নেই। সুতরাং আপনি নির্ভয় হতে পারেন।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নির্ভয় হব, না ছাই হব! হুম নমস্কার! চললুম আমি সশরীরে যমের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা উইল করে গেলেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে বোধ হয়। দুর্গা, দুর্গা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের জাগরণ

এইবারে জয়ন্ত আর মাণিকের খবর নেবার সময় হয়েছে।

জ্ঞান হবার পর জয়ন্ত সর্বপ্রথমে দেখল, সে শুয়ে আছে ঠাণ্ডা মাটির ওপরে, একটা আধা অন্ধকার ঘরে।

ওঠবার চেষ্টা করল, পারল না। তার হাত দুটো পিছু-মোড়া করে বাঁধা এবং পা দুটোও বাঁধা শক্ত

দড়িতে। তখন নাচার ভাবে শুয়ে শুয়ে সে ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু দেখবার বিশেষ কিছু নেই। চার দেওয়ালে চারটা ছোট ছোট জানলা এবং একদিকে একটা দরজা। একদিকের একটা জানলা খোলা—তার বাইরে দেখা যাচ্ছে ওপরে আলোকিত আকাশ এবং নিচে মর্মরিত অরণ্যের চূড়া।

হঠাৎ তার ডানপাশ থেকে সাড়া এল—জয়ন্ত।

চমকে সেদিকে ফিরে জয়ন্ত দেখতে পেল মানিককে। তারও অবস্থা এক।

—জয়ন্ত, এবারে বোধ হয় আমাদের লীলা খেলা ফুরোল।

—হ্যাঁ মানিক, সেই রকম তো মনে হচ্ছে! সুন্দরবাবু আর কোনও নতুন মামলায় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন না। সুন্দরবাবুর হতাশ মুখ মনে করে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।

—কিন্তু আমরা কোথায় আছি?

—বলা অসম্ভব। তবে কলকাতায় নয় নিশ্চয়ই। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ। শহরের আকাশ এমন পরিষ্কার আর নীল হয় না। চারিদিকের স্তব্ধতার ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে কেবল বাতাস আর গাছপালার কানাকানি আর পাখিদের ডাক। মানুষ বা অন্য কোনও জীবজন্তুর সাড়া নেই। খুব সম্ভব আমরা কোনও নির্জন বনের ভেতর আছি। শহর বা গ্রাম এখান থেকে অনেক দূর।

—আমরা কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম বলে মনে হয়?

—তাও বলা শক্ত। একদিনও হতে পারে, দুদিনও হতে পারে!

—কি করে বুঝলে?

—আমরা যখন বিষ্ণুবাবু লেনে গিয়েছিলাম, তখন রাত্রিকাল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখ, এখন রোদ উঠছে গাছের মাথায়! তার মানে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে, সন্ধ্যা হবে, আবার রাত আসবে। আমরা যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন কালকেও আর একবার দিন আর রাত এসেছে গিয়েছে কিনা, তা কে জানে?

—শোন জয়ন্ত, স্বপ্নের মত আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, কতক্ষণ আগে জানি না, কিন্তু আর একবার আমার অল্প অল্প জ্ঞান হয়েছিল। মনে হল আমার কানের কাছে যেন স্রোতের কলকল শব্দ হচ্ছে। যেন মোটর বোটের আওয়াজও শুনলাম। কিন্তু ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই নাকের কাছে কেমন একটা বিষম উগ্র গন্ধ জাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

—তোমার এ স্বপ্ন সত্য হলে বলতে হয়, জলপথে আমাদের শহরের বাইরে অন্য কোথাও নিয়ে আসা হয়েছে আর যাতে আমাদের জ্ঞান না হয়, বরাবর চেষ্টা করা হয়েছে।...কিন্তু ও কিসের শব্দ?...চুপ।

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি। কালো রং, জোয়ান চেহারা, কুৎসিত, নিষ্ঠুর মুখ। হাতে এক গাছ তেলে পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি।

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক বন্দীদের দেখল। তারপর কালো মুখে সাদা দাঁত খেলিয়ে বলল—এই যে জয়ন্ত! তা হলে আর তোমরা অজ্ঞান হয়ে নেই?

—না, এখন আমরা জ্ঞানবান হয়েছি। কিন্তু তুমি কে বাপু?

—আমি? আমি পশুপতি। বলেই সে হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগল।

—অত হাসির ঘটা কেন, বন্ধু?

—হাসছি তোমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

—আমাদের ভবিষ্যৎ কি এত হাস্যকর? বেশ বন্ধু, তা হলে তোমার মুখে আমাদের ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে আমরা খুব খুশি হব।

—ওরে হাঁদারাম, ভবিষ্যতের বর্ণনা শুনলে তোদের পেটের পিলে চমকে যাবে।

—আমরা পিলে রুগী নই হে!

—তাহলে শোন। কাল কি পরশুর মধ্যে দেহ দুটো হবে তোদের স্কন্ধকাটা। আর তোদের মুণ্ড দুটো থাকবে কাচের জারের ভেতরে স্পিরিটে ডোবানো।

—স্পিরিটে ডোবানো? এ আবার কি খেয়াল?

—খেয়াল নয়রে মূর্খ, খেয়াল নয়। আমাদের কর্তা সত্যবাবু হচ্ছেন সম্ভবত তান্ত্রিক সাধক, তাঁর ওপরে মা-কালীর অসীম করুণা। স্বপ্নে মা জানিয়েছেন, তাঁর আসল নরমুণ্ডের মালা পরবার সাধ হয়েছে। তাই মায়ের কাছে কর্তাও মহাপ্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একশ আট নরমুণ্ডের মালা তাঁর চরণে উপহার দেবেন। কিন্তু এই বিধর্মী ফিরিঙ্গিদের রাজত্বে একশ আটটা নরমুণ্ড জোগাড় করা তো আর দু চার দিনের কাজ নয়। তাই আমরা এক একটা মুণ্ড কাটি আর স্পিরিটে ডুবিয়ে টাটকা রাখি। তেষট্টিটা মুণ্ড আমরা পেয়েছি—তোদের নিয়ে হবে পঁয়ষট্টিটা। আর তেতাল্লিশটা পেলেই মুণ্ডমালা গাঁথা হবে।

—সুন্দর প্রস্তাব। মায়ের গলার মালায় দুলব শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের এই মা কোথায় আছেন?

—এই ফুলছড়ি দ্বীপ। এখানেই আমাদের কর্তার সাধন-আশ্রম কিনা!

—বটে! তা হলে কলকাতা থেকে আমরা বেড়াতে এসেছি ফুলছড়ি দ্বীপে?

—বেড়াতে নয়রে গাধা, মরতে।

—তুমি কি দয়া করে এখনই আমাদের স্কন্ধকাটা করতে চাও?

—না, কর্তার কাছে খবর পাঠিয়েছি। তাঁর হুকুম পাইনি বলেই তোরা এখনও বেঁচে আছিস।

—তবে এখন তুমি কি করতে এখানে এসেছ? চাঁদ মুখ দেখাতে?

—আমার মুখ যে চাঁদের মত নয়, সে কথা আমিও জানি রে হনুমান।

—আর আমার মুখ যে হনুমানের মত নয়, সে কথা আমিও জানি হে, বন্ধু! কিন্তু তুমি দয়া করে এখানে এসেছ কেন? কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে?

—না রে গঙ্গারাম, না। বলির পাঁঠাকেও দানাপানি দিতে হয়, জানিস না? আমি জানতে এসেছি তোদের খিদে তেষ্টা পেয়েছে কিনা?

—মানিক, তোমার কোনটা পেয়েছে, খিদে না তেষ্টা?

—তেষ্টা।

—আমারও তাই।

—আচ্ছা। বলে পশুপতি বেরিয়ে গেল। একটু পরেই সে দু বোতল জল নিয়ে ফিরে এল। জয়ন্ত ও মানিককে মুখের কাছে বোতল ধরে সে একে একে দুজনকেই জলপান করাল।

জয়ন্ত বলল—জল দিয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করলে বলে ধন্যবাদ। কিন্তু যখন আমাদের খাবার আসবে তখন আমরা খাব কেমন করে? আমাদের হাত-পা বাঁধা।

—যতক্ষণ না জবাই হোস, ততক্ষণ তোদের হাত-পা বাঁধাই থাকবে রে ছুঁচো! আমরা এসে খাইয়ে যাব।

—বন্ধু, জীবতত্ত্বে তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আমি গাধা...আমি হনুমান...আমি ছুঁচো! তোমার কৃপায় আমি আরও কত নব নব মূর্তি ধারণ করব, বলতে পার?

পশুপতি হেসে ফেলে বলল—সে-কথা পরে এসে বলব, এখন আমি চললাম। সে বেরিয়ে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর তার পায়ের শব্দও দূরে মিলিয়ে গেল।

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল—মানিক, মনে আছে?

—কি?

—এ মামলাটা যখন হাতে নিই তখন তুমি বিলাতের পৃথিবী-প্রসিদ্ধ হত্যা-বাতিকগ্রস্ত 'জ্যাক দি রিপারে'র কথা তুলেছিলে?

—হুঁ।

মনে আছে, আমিও তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে, এই নৃমুণ্ড শিকারীও হচ্ছে সেই কোনও বাতিক গ্রস্ত হত্যাকারী?

—হুঁ।

—দেখছ, আমার সন্দেহই সত্য? সত্য চৌধুরী হচ্ছে বাঙালি জ্যাক দি রিপার। অপরাধ বিভাগে এই শ্রেণীর অপরাধীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। এদের উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায় কেবল বিশেষ এক বাতিকের ক্ষেত্রে।

—ও আলোচনা এখন থাক! আমার ভাল লাগছে না, জয়ন্ত। চোখের সামনে চক চক করছে নৃমুণ্ড শিকারীর খাঁড়া! ওই দুরাত্মা পশুপতিটার সঙ্গে তুমি এই দুঃসময়ে হাসি ঠাট্টা করছিলে বলে গা আমার জ্বলে যাচ্ছিল।

জয়ন্ত অট্টহাস্য করে বলল—যে পূজার যে মন্ত্র মানিক, যে ব্রত আমরা নিয়েছি তাতে এইভাবেই আমাদের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং দুঃখ করে লাভ কি?

—দেখ জয়ন্ত, মাঝে মাঝে আমার মনে আশার সঞ্চারও হচ্ছে।

—কি আশা?

—মুক্তিলাভের একটা কোনও উপায় তুমি আবিষ্কার করবেই। ভগবান তোমার ঐ অপূর্ব মাথা নৃমুণ্ড শিকারীর খাঁড়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। আমি জানি জয়ন্ত, বিপদ যত গভীর হয়, তোমার বুদ্ধি তত খোলে।

—আশা কুহকিনী মানিক, আশা কুহকিনী। আশার ছলনায় ভুলো না। অসম্ভবের বিরুদ্ধে কি চেষ্টা করব ভাই? হাত দুটো যদি পিছুমোড়া করে বাঁধা না থাকত, তাহলেও কিছু আশা ছিল। ওই জানলাগুলোর লোহার গরাদ এক ইঞ্চির চেয়ে বেশি মোটা নয়। তুমি আমার এই বাহুর শক্তি জান মানিক, ওরকম গরাদ আমি মোমের মত নরম বলে মনে করি। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। কোনও আশাই নেই।

মানিক বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—দিনের আলো নিভে আসছে, বকের দল বাসায় ফিরছে, পাখিরা বিদায়ী গান গাইছে। জানি না, কালকের সন্ধ্যা এসে আর আমাদের দেখতে পাবে কিনা। জয়ন্ত, ফাঁসির আগের দিনে অপরাধীদের মনের ভাব কেমন হয়, বুঝতে পারছ?

—মোটেই পারছি না। আমি এখন নিস্পলক নেত্রে ওই বোতল দুটোর দিকে তাকিয়ে আছি।

—বোতল?

—হ্যাঁ। দেখ না আমাদের পশুপতি তাচ্ছিল্য করে বোতল দুটো এইখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে।

—পশুপতিকে তুমি 'আমাদের বন্ধু' বলো না, জয়ন্ত।

—নিশ্চয়ই বলব। এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম, এইবারে গম্ভীর ভাবেই বলব।

—কেন?

—কারণ গ্রীক পণ্ডিত আর্কিমেডিসের ভাষায় এখন আমরা অনায়াসেই বলতে পারি—ইউরেকা! ইউরেকা!

—তোমার কথার অর্থ কি, জয়?

—মানিক, আমার এক টিপ নস্য নিতে সাধ হচ্ছে।

মানিক সানন্দে বলল—জয়ন্ত, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছ! কারণ নস্যি নেওয়ার সাধ হচ্ছে তোমার বিপুল খুশির লক্ষণ!

—হ্যাঁ বন্ধু, ওই বোতলই আমাদের উদ্ধার করবে।

—কি বলছ তুমি, জয়ন্ত?

জয়ন্ত জবাব দিল না। বোতল ছিল তার পায়ের কাছে। সে হঠাৎ তার বাঁধা পা দুটো দিয়ে একটা বোতলের ওপর সজোরে আঘাত হানল। বোতলটা ছিটকে দেয়ালের ওপরে গিয়ে পড়ে ভেঙে গেল সশব্দে।

—কী আশ্চর্য জয়ন্ত, ওই বোতলই যদি আমাদের বাঁচায়, তবে ওটা ভাঙলে কেন?

—মানিক, তুমি কি কখনও ভাঙা কাচের ধার পরীক্ষা করোনি? ভাঙা কাচ ক্ষুরের কাজ করতে পারে—এমন কি, তা দিয়ে দাড়িও কামানো যায়।

—জয়! জয়! বুঝেছি বুঝেছি! কিন্তু আমাদের হাত যে বাঁধা ভাই।

জয়ন্ত কোনও কথা না বলে গড়িয়ে গড়িয়ে ভাঙা বোতলের টুকরোগুলোর কাছে গেল! তারপর বলল—মানিক, তুমি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুয়ে থাক দিকি।

মানিক কথামত কাজ করল। জয়ন্ত কিছুক্ষণ ভাঙা কাচগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বড় একখণ্ড কাচ বেছে নিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেটাকে দাঁত দিয়ে চেপে গড়িয়ে গড়িয়ে মাণিকের পেছন দিকে এল। তারপর সেই কামড়ে ধরা কাচখানা দিয়ে মাণিকের পিছু-মোড়া করে বাঁধা হাতের দড়ির ওপরে ঘষতে লাগল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই মাণিক্যের হাত দুটো দড়ির বন্ধন থেকে পেল মুক্তি।

কাচখানা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে জয়ন্ত বলল—বন্ধু, এইবারে স্বাধীন হাতের সাহায্যে তুমি নিজের পায়ের বাঁধন খোল। তারপর ভগবান ছাড়া এই দুনিয়ায় কারুকে আমি গ্রাহ্য করি না।...

দুই বাহু বার কয়েক বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করে জয়ন্ত আগে তাদের আড়ষ্টতা দূর করল। গোটা কয়েক ডন বৈঠকও দিয়ে নিল।

—ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাইরে জাগল কার যেন পায়ের শব্দ! মানিক ত্রস্তস্বরে বলল—নিশ্চয়ই সেই শয়তান পশুপতি! হয়ত আমাদের খাবার নিয়ে আসছে।

—একজনের নয় মানিক, আমি দু-তিনজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বলেই সে এক লাফ মেরে জানলার কাছে গিয়ে পড়ল।

—জানলা ভাঙো জয়ন্ত! শিগগির!

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জানলার দুটো লোহার গরাদ জয়ন্ত এক হ্যাঁচকা টানে বেঁকিয়ে খুলে ফেলল। একটা গরাদ মাণিকের হাতে দিয়ে বলল—দরকার হলে, এটা অস্ত্রের মত ব্যবহার করো।

দরজায় কুলুপ খোলার শব্দ হল। পরমুহূর্তে জয়ন্ত ও মানিক জানলা গলে একে একে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

ওদিকে ঘরের মধ্যে জেগেছে তখন বিষম হট্টগোল, ভাঙা জানলার ফাঁকে পশুপতির হতভম্ব মুখ। জয়ন্ত ও মানিককে দেখতে পেয়েই সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—কোথায় পালাবি? তোদের পেছনে যাবে মূর্তিমান যম। ডাক ভীমাবতারকে।

ছুটতে ছুটতে মানিক বিস্মিত স্বরে বলল—ভীমাবতার কে, জয়ন্ত?

নিজের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলল—হয়ত সেই ভয়াবহ বিভীষণ। আরও জোরে পা চালাও, মানিক।

মিনিট খানেক পরেই তাদের পেছনে দূর থেকে জেগে উঠল এক বীভৎস গর্জন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভীমাবতারের জাগরণ ও নিদ্রা

মানিক শিউরে উঠে বলল—ও কোন জীবের গর্জন, জয়?

জয়ন্ত বলল—ভগবান জানেন! তবে মানুষের গর্জন নিশ্চয়ই নয়।

—হয়ত ওটা এই বনেরই কোনও জীব! মানুষ দেখে গর্জন করছে।

—ওটা অজানা জীবের গর্জন। ও রকম গর্জন করতে পারে, সুন্দরবনে এমন কোনও জানোয়ার আছে বলে জানি না।

তারা দুজনেই ছুটতে ছুটতে কথা কইছিল। গর্জন হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু তার বদলে শোনা গেল আর এক রকম বেয়াড়া শব্দ। মনে হল, পেছনের গাছপালার ভেতরে মড়-মড় শব্দ তুলে লতাপাতা ডাল ছিঁড়ে ভেঙে কোন এক মত্ত হস্তীর মতন বৃহৎ জীব তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে।...কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল, শব্দটা তাদের দিকেই সবেগে এগিয়ে আসছে!

এদিকে যে সরু পথ দিয়ে তারা ছুটছিল, সে এসে পড়ল একটা মাঝারি মাঠের ওপরে। মাঠের ওধারে প্রায় সিকি মাইল পরে আবার বনজঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। মাঠের ডান ও বাম প্রান্তেও অরণ্যের প্রাচীর। জয়ন্ত দৌড় থামিয়ে বলল—দাঁড়াও মানিক, আর ছুটো না। মানিক দাঁড়িয়ে পড়ল।

শেষ গোধূলির ঝাপসা আলোয় মাঠের চারিদিকে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বলল—এখন কি করা যায়, বল দেখি?

—বিনা বাক্যব্যয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।

—উঁহু, ওই খোলা মাঠ দিয়ে পালাতে গেলে আমরা বোধ হয় ধরা পড়ব। শুনছ না, পেছনের শব্দ আমাদের কত কাছে এসে পড়েছে? যে ওই শব্দের সৃষ্টি করেছে তার গতি আমাদের চেয়ে দ্রুত বলেই মনে হচ্ছে।

—তাহলে উপায়?

—একমাত্র উপায় হচ্ছে, চটপট পথ ছেড়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে থাকা। আমরা মাঠ দিয়ে পালিয়েছি ভেবে শত্রু যদি অন্য দিক দিয়ে বিদায় হয়—সে তো বহুৎ আচ্ছা! নাহলে—এস মানিক, এস! পা টিপে টিপে বনের মধ্যে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়ো। তারপর একটু নড়া নয়, একটি টুঁ শব্দও নয়।

বনের মধ্যে ঢুকে একটা ঝুপসি ঝোপের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

শব্দ তখন আরও কাছে এসে পড়েছে। খোলা মাঠের ওপর ঝাপসা আলো তখনও নিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি বটে, কিন্তু অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার তখন অবিচ্ছিন্ন না হলেও জমে উঠেছে রীতিমত।

এতক্ষণ পরে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপারে বোঝা গেল—শব্দের উৎপত্তি জঙ্গলের নিচে নয়, গাছের ওপরে! কে যেন গাছের পর গাছের বড় বড় ডাল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। কি ওটা? হাতি? না দৈত্যদানব?

মানিক আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে উঠল—জয়!

—চুপ!

পর মুহূর্তেই একটা বিপুল দেহ গাছে গাছে লাফ মেরে মূর্তিমান ঝড়ের মত মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে তার আসল চেহারা কিছু বোঝা গেল না। খালি মোটা মোটা দুখানা হাত আর দুখানা পা! তারপরেই গাছেদের আর্তনাদ স্তব্ধ।

জয়ন্ত ফিসফিসিয়ে বলল—মূর্তিটা মাঠের ধারের শেষ গাছে গিয়ে পড়ে আমাদের দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

হঠাৎ মাটি কাঁপিয়ে ধুপ করে একটা শব্দ হল।

—মূর্তিটা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। এখন দেখ, সর্বনেশে আমাদের খুঁজতে আসে কিনা।

জয়ন্ত ও মানিক দৃঢ় মুষ্টিতে লোহার ডাণ্ডা ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শত্রুর দেখা নেই, পায়েরও শব্দ নেই!

আরও মিনিটখানেক কাটল।

সবাই চুপচাপ।

জয়ন্ত বলল—যাক, বোধ হয় আমরা ওর চোখে ধুলো দিতে পেরেছি। ও হয়ত আমাদের খোঁজবার জন্যে মাঠের ওপারে যাত্রা করেছে।

—কিন্তু কি ওটা? ওই কি ভীমাবতার? না, ওটা কোনও বড় জাতের বানর?—নিজের মনেই গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, আমরা মিছেই ওর জন্যে ভয় পেয়েছি!

—মানিক, ওসব ভাববার সময় নেই, ওই শোন, বনের ভেতর দূর থেকে নতুন গোলমাল শোনা যাচ্ছে! বন্ধু পশুপতি নিশ্চয়ই সদলবলে 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' রবে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে! এখন কি করবে? লড়বে না পালাবে?

—হরিণের মত ছুটে পালাব।

—আমারও ওই মত। দুজন একটা দলকে হয়ত ঠেকাতে পারব না। নাও, উঠে পড়। চালাও পা।

তারা বনের আঁধার ছেড়ে মাঠের আলো-আঁধারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, যেন প্রকাণ্ড একটা ঘনীভূত ছায়া দ্রুতবেগে মাঠের ওপারকার অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে! কিন্তু তখনও আসল রূপ ধরা গেল না। বলল—মূর্তিটা গেছে সামনের দিকে। আমরা মাঠের কোন দিকে যাব? ডাইনে না বাঁয়ে?

—আমরা এখানকার কোনও দিকই চিনি না, সুতরাং যেদিকে খুশি যাই, চল।

—চল তবে ডান দিকে। কিন্তু খুব জোরে ছুটতে হবে। পশুপতিরা যেন আমাদের টিকি পর্যন্ত দেখতে না পায়।

তারা যখন আবার দৌড়তে আরম্ভ করল, অশরীরী অভিশাপের মত চলন্ত কালো ছায়াটা তখন মাঠের ওপারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে! চারিদিক এমন মৌন, যেন এ আমাদের নিত্য-পরিচিত পৃথিবী নয়। বনের পাখিরা পর্যন্ত বাসায় ফিরে নীরব হয়ে পড়েছে। চাঁদ আজ অন্ধকারের আসর ভাঙতে আসবে অনেক রাতে। বাতাস স্পন্দনহীন। গাছের পাতাও তাই নীরব। সমস্ত বনভূমি যেন কোনও ভীষণ নৈশ নাটকের আসন্ন অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত ও মানিক যখন ডানদিকে ছুটে প্রায় মাঠের প্রান্তে গিয়ে পড়ল, আচম্বিতে তাদের সুমুখের বনের ভেতর থেকেও অত্যন্ত দ্রুত পদশব্দ জেগে উঠল—কে যেন মাঠের দিকেই ছুটে আসছে।

মানিক হতাশভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমাদের আর কোন আশা নেই, জয়ন্ত। এদিকেও শত্রু।

জয়ন্তও দাঁড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল আর এক নতুন মূর্তি। প্রথমটা সে তাদের দেখতে পায়নি—কিন্তু খানিকটা এগিয়ে এসেই সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহা বিস্ময়ে।

জয়ন্ত সচকিত চোখে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল—কী আশ্চর্য! তুমি! তুমিও এখানে আছ? আমি যে তোমাকে চিনি, সত্য চৌধুরী! আমার মনের ক্যামেরায় তোমার চেহারা যে ধরা আছে।

তার বলিষ্ঠ দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমন চওড়া। দুটো ক্ষুদ্র তীব্র চোখে জ্বলছে যেন তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-শিখা।

মানিক সবিস্ময়ে বলে উঠল—আমিও যে এর ফটো দেখেছি, এ যে সত্য চৌধুরী!

সত্য কোনও জবাব না দিয়ে দৌড়ে তাদের পাশ কাটাতে গেল। কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তার সামনে গিয়ে পড়ে মাথার ওপরে লোহার ডাণ্ডা তুলে কঠিন স্বরে বলল— দাঁড়াও সত্য চৌধুরী! হাতে যখন পেয়েছি তখন আর তোমাকে পালাতে দেব না।

সত্য হা হা করে হেসে উঠেই চোখের নিমেষে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ন্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। জয়ন্ত এই আকস্মিক আক্রমণের আশা করেনি—তাকেও তখন বাধ্য হয়ে হাতের ডাণ্ডা ফেলে সত্যকে জড়িয়ে ধরতে হল।

আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি। জয়ন্তের দেহ যেমন পেশীবদ্ধ, পরিপুষ্ট ও সুদীর্ঘ—সত্যরও তেমনি। দুজনের কেউই কাবু হবার পাত্র নয়! মানিক একবার ভাবল, ডাণ্ডা মেরে সত্যকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু তারপরেই ভাবল, না জয়ন্ত যদি জেতে তো ন্যায় যুদ্ধেই জিতুক। জয়ন্তকে সে কখনও হারতে দেখেনি। তার পরাজয়ের সম্ভাবনা সে কখনও কল্পনাও করতে পারে না।

হঠাৎ পাশের নিস্তব্ধ অরণ্য যেন জেগে উঠল পায়ের শব্দের পর শব্দে! অনেক লোক যেন ছুটে আসছে—যেন একটা জনতা!

পরক্ষণেই পেছনেও হই হই শব্দ! দূরে—মাঠের ওপরেও অনেকগুলো ছুটন্ত ছায়ামূর্তি!

মানিক ব্যাকুল স্বরে বলল—চারিদিকে শত্রু! আমরা বেড়াজালে ধরা পড়ে গেছি, জয়।

জয়ন্ত তার সমস্ত শক্তি একত্র করে সত্যকে মাটির ওপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সত্যর দেহে অসুরের মত ক্ষমতা।

বনের ভেতরকার পায়ের শব্দ এবং মাঠের ওপর ছায়ামূর্তিগুলো তখন আরও কাছে এসে পড়েছে।

জয়ন্ত চিৎকার করে বলল—মানিক! শত্রুরা যখন চারিদিক থেকে দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসছে তখন আর ন্যায়-যুদ্ধ নয়। মার এর মাথায় লোহার ডাণ্ডা, পৃথিবীর একটা আপদ দূর হোক।

মানিক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এলে, সত্য তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল, কিন্তু জয়ন্তর দুই বাহুর লৌহবন্ধন শিথিল করবার সাধ্য তার হল না।

মানিক মাথার ওপরে ডাণ্ডা তুলল। ঠিক সেই সময়ে কাছ থেকে শোনা গেল—ডাণ্ডা নামান মানিকবাবু। আমরা এসে পড়েছি—আর ভয় নেই।

মানিক থমকে ফিরে দেখে, তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে বিমল ও কুমার—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রাইফেল! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর থেকেও বেরিয়ে আসছে বন্দুক হস্তে দলে দলে পুলিস।

দারুণ বিস্ময়ে মানিক 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলের মত। তার মনে হল, হয় সে একটা অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে, নয় তো দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কিন্তু জয়ন্তর তখন বিস্মিত হবার অবকাশ নেই, সত্যর মারাত্মক আক্রমণ ঠেকাতেই সে ব্যতিব্যস্ত। চারিদিকে পুলিস দেখে সত্য তখন মরিয়া হয়ে লড়ছে।

বিমল এগিয়ে রাইফেল তুলে কর্কশস্বরে বলল—স্থির হয়ে দাঁড়াও সত্য, নইলে তোমার মাথার খুলি ফুটো করে দেব।

সত্য পাগলের মত বলে উঠল—ছোড় তুই গুলি! কিন্তু তার আগে জয়ন্তকে মেরে মরব আমি।

কথা কইতে কইতে সত্য বোধ হয় একটু আনমনা হয়েছিল, জয়ন্ত সেই সুযোগে এক প্যাঁচে তাকে একেবারে মাটির ওপরে ছুড়ে ফেলে দিল। সত্য মাটির ওপরে পড়ে ভয়ানক হাঁফাতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠে বলল—তোরা যদি দল বেঁধে না এসে পড়তিস, তাহলে দেখতাম ওই জয়ন্তকে।

জয়ন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—স্বীকার করি সত্য, আমাদের দুজনের মধ্যে বাহুবলে কে শ্রেষ্ঠ, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

সত্য চৌধুরী বলল—তোর জন্যই আমি মা-কালীর মুণ্ডমালা গাঁথতে পারলাম না। ওরে পাষণ্ড, নৃমুণ্ড মালিনী তোর সর্বনাশ করবেন।

জয়ন্ত হাসিমুখে বলল—কিন্তু আমি স্বপ্ন পেয়েছি, তুমি ফাঁসিকাঠে ওঠবার আগে মা-কালী আমাকে কিছুই করবেন না।

মানিক মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখল, যে মূর্তি তাদের দিকে ছুটে আসছিল তারা আবার অদৃশ্য হয়েছে, কে কোথায়। এমন সময়ে পাশের বনের ভেতরে জাগল এক বিষম আর্তনাদ! কে পরিত্রাহি চিৎকার করে বলল—বিমলবাবু, কুমারবাবু! বাঁচান! ভীমাবতার...হুম হুম হুম হুম।

এ যে সুন্দরবাবুর গলা! বিমল, কুমার, জয়ন্ত ও মানিক বনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তারা কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই সুন্দরবাবু জঙ্গল ভেদ করে এক লাফে মাঠের ওপরে ধপাস করে পড়ে গেলেন। তারপর পেটমোটা লাটাইয়ের মতন গড়াতে গড়াতেই পালাতে লাগলেন।

অকস্মাৎ আর এক সুবৃহৎ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। তখন আকাশে আর আলো নেই বললেই হয়,

মূর্তিটাকে দেখাচ্ছিল একটা ঘন অন্ধকারের মত—কেবল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ও দাঁতগুলো চকচক করে উঠছে।

বিমল ও কুমারের হাতের বন্দুক তৎক্ষণাৎ গর্জন করে উঠল, পরমুহূর্তেই বিরাট আর্তনাদ ও গুরুভার দেহ পতনের শব্দ!

সুন্দরবাবু দুই চোখ মুদে তখনও মাঠে গড়াতে গড়াতে আরও দূরে পালিয়ে যাচ্ছেন। মানিক তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে দুহাতে চেপে ধরে বললেন—থামুন, থামুন! আর গড়াবেন না সুন্দরবাবু! ভীমাবতার পটল তুলেছে।

অন্ধকার-মূর্তিটা যেখানে ভূতলশায়ী হয়েছে জয়ন্ত সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু বিমল বাধা দিয়ে বলল—এখনই ওদিকে যাবেন না, জয়ন্তবাবু। হয়ত এখনও ও মরেনি, কাছে গেলে মরণ কামড় দিতে পারে।

—কিন্তু ও কে?

—ওরাং ওটাং।

—ওরাং ওটাং? কি করে জানলেন আপনি?

—বিষ্ণুবাবুর গলিতে ওর ঘর থেকে আমি কয়েকগাছা লালচে তামাটে রংয়ের চুল আবিষ্কার করেছি। সে চুল ওরাং ওটাংয়ের।

—আশ্চর্য! বোর্নিও-সুমাত্রা দ্বীপের বনমানুষ বাংলাদেশে এল কেমন করে?

—সেকথা আমরা সত্য চৌধুরীর মুখেই শুনতে পাব। তবে এইটুকু জানি, বাচ্চা অবস্থায় ধরলে ওরাং ওটাং মানুষের পোষ মানে। সত্য চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে অনেক দিন ধরে পোষ মানিয়েছে, ওকে নরহত্যা করতে শিখিয়েছে।

—কিন্তু বিমলবাবু, এখনও কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।

বিমল হেসে বললে—যথাসময়েই সে সব কথা সুন্দরবাবুর মুখেই শুনতে পাবেন। আপাতত খালি এইটুকু জেনে রাখবেন যে, ফ্রেজারগঞ্জে আমরা গিয়েছিলাম সত্য চৌধুরীকে ধরতে। তার বাসা ঘেরাও করেছিলাম। কিন্তু সে ভয়ানক লোক। আমাদের তিনজন সেপাইকে গায়ের জোরে কাবু করে পালিয়ে গিয়ে মোটরবোটে চড়ে এই দ্বীপের দিকে আসে, আর আমরাও তার পেছনে লঞ্চ নিয়ে তাড়া করে এসে উঠেছি এই দ্বীপে। ভাগ্যি ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, নইলে কি হত বলা যায় না।

জয়ন্ত অভিভূতের মত বিমলের হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলল—আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন! আর তিন-চার মিনিট দেরি হলে আমরা মারা পড়তাম।

বিমল বলল—সাধুর জীবন রক্ষার ভার নেন স্বয়ং ভগবান, আমরা নিমিত্ত মাত্র।

এতক্ষণ পরে সুন্দরবাবুর হাঁফ কমল। বিমলের দিকে অভিমানভরা চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন—আপনারা বেশ লোক যা হোক! গহন বনে যমের মুখে আমাকে পেছনে ফেলে আপনারা কিনা অনায়াসে চলে এলেন!

মানিক সহাস্যে বলল—ভুল বলবেন না সুন্দরবাবু। ওঁরা তো আপনাকে পেছনে ফেলেননি, আপনাকে পেছনে ফেলেছে আপনারই আশ্রিত ওই বিপর্যয় ভুঁড়ি।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম, মানিক! এই কি তোমার ঠাট্টার সময়? জান, তোমাদের বাঁচাতে এসেই আমি মরতে বসেছিলাম? এর পরেও আমার ভুঁড়ির ওপরে নজর দিচ্ছ? অকৃতজ্ঞ।

এমন সময়ে হঠাৎ চারিদিকের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূরে একখানা মোটরবোটের শব্দ জেগে উঠল।

সুন্দরবাবু চমকে বললেন—ও আবার কি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বলল—পশুপতি সদলবলে পলায়ন করছে! কিন্তু তাদের পালাতে দেওয়া হবে না। বিমলবাবু চলুন, আমরা জনকয় সেপাই নিয়ে লঞ্চে উঠে ওদের গ্রেপ্তার করি। সুন্দরবাবু বাকি লোকজন নিয়ে এখানে পাহারা দিন, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

সুন্দরবাবু একবার ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে দৃঢ়স্বরে তাড়াতাড়ি বললেন—না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। কারণ আমি হচ্ছি এ দলের মধ্যে সুপিরিয়র অফিসার—সব দায়দায়িত্ব আমার।...মনোহর!

মনোহর এগিয়ে এসে বলল—আজ্ঞে, স্যর।

—এক ডজন সেপাই নিয়ে তুমি এখানে পাহারা দাও।

মনোহর কাঁচুমাচু মুখে বলল—আজ্ঞে স্যর, সেটা কি ঠিক হবে স্যর।

—ছিঃ মনোহর, ভয় পেওনা। ডিউটি ইজ ডিউটি! আমরা দুরাত্মা সত্য চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তবে আর তোমাদের ভয়টা কিসের?

—আজ্ঞে স্যর, ভরসাও তো কিছু দেখছি না। এ রাক্ষুসে দলে যদি আরও দু-তিনটে ওরাং থাকে স্যর।

—তোমাদের বন্দুক আছে। তাদের বন্দী কর। তাও না পার পলায়ন করো।

—স্যর, স্যর! পালিয়ে কোথায় যাব স্যর? এটা যে দ্বীপ স্যর। চারিদিকেই লোনা জল।

—সাঁতার কেটে পালিও।

—আজ্ঞে স্যর। সাঁতার স্যর?

—হুম।

সুন্দরবাবু এমন জোরে হুম বলে গর্জন করলেন যে, বেশ বোঝা গেল, এটা হচ্ছে তাঁর চরম হুম। মনোহর আর 'আজ্ঞে স্যর' বলতে ভরসা করল না।

সাজাহানের ময়ূর

এক

পত্রবাহক তীর

প্রভাতী চায়ের আসর। ধড়াচূড়াধারী সুন্দরবাবুর আবির্ভাব যথাসময়ে।

মানিক শুধোলে, "চায়ের আসরেও আপনি কি ধড়াচুড়ো ত্যাগ করে আসতে পারেন না?"

—"উঁহু! সময় নেই ভায়া, সময় নেই। সর্বদাই 'ডিউটি'তে থাকি, ধড়াচুড়ো ছাড়বার সময় পাই না।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "চেম্বারলেনের যেমন ছাতা, চার্চিলের যেমন চুরোট, গান্ধীজীর যেমন ট্যাঁক-ঘড়ি, তেমনি সুন্দরবাবুরও বিশেষত্ব হচ্ছে ঐ ধড়াচুড়ো। ওর দিকে আর নজর দিও না মানিক!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, মানিকের কথা ছেড়ে দাও, এই ধড়াচুড়োর উপরে জোর-নজর দেবার জন্যে অন্য লোকেরও অভাব নেই।"

—"কি-রকম?"

—"অদূর-ভবিষ্যতেই বোধহয় ঐ ধড়াচুড়ো পরেই আমাকে পরলোকে যাত্রা করতে হবে।"

মানিক বললে, "তা আর আশ্চর্য কথা কি? ঢেঁকি তো স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে!"

—"না হে ভায়া, ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়—দস্তুরমতো মারাত্মক।"

—"কেন, বলুন দেখি?"

—"যে কোন মুহূর্তে আমি পটল তুলতে পারি।"

—"বলেন কি? আপনার 'ব্লাড-প্রেশার' বেড়েছে নাকি?"

—"বাড়েওনি, কমেওনি। আসল কথা কি জানো? আমার পিছনে পিছনে শত্রু ঘুরছে।"

—"শত্রু?"

—"হ্যাঁ, ভয়াবহ শত্রু, অদৃশ্য শত্রু!"

—"ব্যাপারটা খুলে বলুন।"

—"তাই বলতেই তো এসেছি। কিন্তু রোসো ভায়া, আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে, পেটের ফাঁকটা একটু ভরিয়েনি। আজকের খাদ্যতালিকা কি?"

—"শুনলে প্রফুল্ল হবেন আশা করি।"

—"বল কি, বল কি! আমি তো না শুনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছি! প্রকাশ করে বল শুনি!"

—"চায়ের সঙ্গে আজ পাবেন 'অ্যাস্‌পারাগাস ওম্‌লেট', 'চকোলেট স্যান্ডউইচ', 'স্পঞ্জ কেক' প্রভৃতি।"

—"আবার 'প্রভৃতি'? নৈবেদ্যের উপরে চুড়ো-সন্দেশ! সাধু, সাধু! খেয়ে-দেয়ে নাও রে যাদু, ক'দিন বই তো নয়!"

সুন্দরবাবু সহর্ষে এত জোরে চেয়ারের উপরে নিজের বিপুল বপুখানি স্থাপন করলেন যে চেয়ারখানা প্রতিবাদ করে উঠল সশব্দে।

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু মানিক কি বলে জানেন?"

—"মানিকের স্বভাব তো আমি জানি, নিশ্চয়ই সে ভালো কথা বলে না!"

মানিক বললে, "ওহো, শালুক চিনেছেন গোপাল-ঠাকুর!"

জয়ন্ত বললে, "মানিকের মত হচ্ছে, দেশ এখন স্বাধীন, ইংরেজদের আমরা বর্জন করেছি, ঐ সঙ্গে বিলিতি খাবারগুলোও বর্জন করা উচিত।"

মানিক হাসতে হাসতে বললে, "আমি কি মন্দ প্রস্তাব করেছি সুন্দরবাবু?"

—"অতিশয় মন্দ প্রস্তাব। রীতিমতো অসাধু প্রস্তাব।"

—"কেন?"

—"ইংরেজদের ত্যাগ করেছি বলে তাদের ভালোকেও ত্যাগ করতে হবে নাকি? তুমি এ-সব বাজে কথায় কান পেতো না জয়ন্ত! আর দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ইংরেজদেরই বা ত্যাগ করব কেন? যে জাত ফাউল-কাটলেট আবিষ্কার করেছে, সে কি বড় যে-সে জাত?"

মানিক বললে, "আর যে জাত সন্দেশ-রসগোল্লা আবিষ্কার করে, তাকে আপনি কি বলেন?"

—"তাকেও আমি ধন্যবাদ দি। আমি কাটলেট বা সন্দেশ কিছুই ছাড়তে রাজি নই। গদাধরের মতো আমি দুধও খাব, তামাকও খাব।"

—"এই যে এতকাল ধরে ইংরেজরা আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে, তবু কি তারা সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে চেয়েছে?"

—"স্বাদ পায়নি, তাই চায়নি।"

—"কখ্‌খনো না। সন্দেশ-রসগোল্লা ইংরেজদের ধাতে সয় না। তেমনি বিলিতি খাবারগুলোও আমাদের ধাতে সইতে না পারে।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তুমি কে বট হে? তুমি বললেই সইবে না? এত কাল সয়ে এল, ভবিষ্যতেও সইবে না কেন? আর ফাউল-কাটলেট যার ধাতে সইবে না, সে মনুষ্য-নাম ধারণের যোগ্য নয়! যাক্ সে বাজে কথা। কোথায় হে জয়ন্ত, কোথায় তোমার চা এবং টা? আমি যে যুগপৎ তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত! হুম্ হুম্!"

চায়ের পালা সাঙ্গ করে সুন্দরবাবু চাঙ্গা হয়ে বললেন, "হুম্! এইবারে আমার পালা শুরু করি?"

"নিশ্চয়!" জয়ন্ত বললে।

সুন্দরবাবু একখানা ইজি চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে একটা বার্মা চুরোট ধরিয়ে বললেন, "বড়ই শক্ত পাল্লায় পড়েছি ভায়া! কাল বৈকালে আমার থানায় একটা

ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। একটা মামলার তদন্ত নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। এমন সময়ে থানার রামলাল নামে এক পাহারাওয়ালা একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—প্যাকেটটা আমারই নামে ডাকে এসেছিল। প্যাকেটটা শক্ত সুতো দিয়ে ভালো করে বাঁধা ছিল। আমার কাছে ছুরি বা কাঁচি ছিল না বলে আমি তাকে অন্য ঘরে গিয়ে সুতো কেটে প্যাকেটটা খুলে আনতে বললুম। সে চলে গেল, আমিও নিজের কাজে মন দিলুম।

মিনিট কয়েক পরেই ভীষণ এক শব্দে থানাটা কেঁপে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক আর্তনাদ! তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরের মেঝের উপরে রামলালের রক্তাক্ত দেহ ছটফট করছে, ঘরের ভিতরে ধোঁয়া উড়ছে, আর পাওয়া যাচ্ছে যেন কোন বিস্ফোরকের গন্ধ! আমার এক সহকারী সামনের আর এক ঘরে ছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম, রামলাল টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটা প্যাকেটের মতো কি খোলবার চেষ্টা করছিল, তারপরেই হঠাৎ ঐ ভয়াবহ কাণ্ড!

আমি তো তখনি রামলালকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু সেখানে যাবার অল্পক্ষণ পরেই বেচারার মৃত্যু হয়েছে। আমার তো দৃঢ়বিশ্বাস, ঐ সাংঘাতিক প্যাকেটটাই তার মৃত্যুর কারণ। তাই যদি হয়, তাহলে এটুকু অনুমান করাও কঠিন নয় যে, আমাকেই হত্যা করবার জন্যে এ প্যাকেটটা আমার নামে পাঠানো হয়েছিল।"

জয়ন্ত বললে, "প্যাকেটটা দেখতে ছিল কিরকম?"

—"আমি সঠিক জবাব দিতে পারব না। কাজে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, প্যাকেটের দিকে ভালো করে তাকাবার সময় পাইনি—এমনকি সেটা দেখিনি বললেও চলে।"

জয়ন্ত বললে, "য়ুরোপে-আমেরিকায় মাঝে মাঝে এই রকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও জেলিগ্‌নাইট (Gelignite) ভরা বিপদজনক প্যাকেট খুলে কেউ কেউ মারা পড়েছে।"

—"জেলিগ্‌নাইট (Gelignite)?"

—হ্যাঁ। একরকম বিষম বিস্ফোরক। তাতে থাকে শতকরা ৬৫ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন, সাতাশ ভাগ পোটাসিয়াম নাইট্রেট, সাত ভাগ উড্‌মীল (Wood meal) প্রভৃতি। অবশ্য আপনার এই প্যাকেটের ভিতরে কি-রকম বিস্ফোরক ছিল, তা আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না।"

—"পুলিশের কাজ দুরাত্মাদের নিয়ে। দুরাত্মারা পুলিশের বন্ধু হয় না। কিন্তু আমার কে শত্রু আছে, যে এইভাবে আমাকে হত্যা করতে চায়?"

—"আপনি কারুকে সন্দেহ করতে পারছেন না?"

—"উঁহু!"

—"উপস্থিত আপনার হাতে কি কি মামলা আছে?"

—"বিশেষ জটিল কোন মামলাই নেই। না, না, একটা উল্লেখযোগ্য মামলা আছে বটে!"

—"মামলাটা কিসের?"

সুন্দরবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জানলা দিয়ে কি একটা জিনিস ঘরের মাঝ-বরাবর এসে ঠকাস্ করে মেঝের উপরে গিয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, "ও আবার কি?"

মানিক বললে, "খুব সরু একটা কঞ্চি। কেউ ওটা ধনুকে জুড়ে তীরের মতন ব্যবহার করেছে। কঞ্চির পিছনে ঝুলছে সুতোয় বাঁধা একখানা কাগজ।"

জয়ন্ত উঠে গিয়ে কঞ্চি থেকে কাগজখানা খুলে নিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করলে, "জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু আপনি যদি কোন বিশেষ মামলা নিয়ে সরকারি পুলিশকে সাহায্য করেন, তাহলে জেনে রাখবেন, আপনার জীবনের কোনই মূল্য থাকবে না।"

মানিক বললে, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! মামলা হাতে না নিতেই শাসানি চিঠি।"

সুন্দরবাবু দৌড়ে জানলার ধারে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, "রাস্তার কোন লোককেই তো দেখে সন্দেহ হচ্ছে না!"

জয়ন্তও জানলার ধারে গিয়ে বললে, "রাস্তা থেকে কেউ ঐ কঞ্চি ছোঁড়েনি।"

—"কি করে জানলে?"

—"আমরা আছি দোতালায়! নিচের রাস্তা থেকে কেউ ঐ তীর ছুঁড়লে ওটা জানলা দিয়ে ঢুকে উপরদিকে উঠে ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, তীরটা সোজাসুজি ঢুকে ঘরের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে।"

—"বটে, বটে, হুম্! আমাদের সামনে রাস্তার ওধারে তো দেখছি একখানা মাত্র বাড়ি। তাহলে কি ঐ বাড়ির দোতালার কোন ঘর থেকেই ঐ তীরটা ছোঁড়া হয়েছে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

—"তাহলে এখনি চল ঐ বাড়িতে।"

—"চলুন।"

দুই

বারোয়ারি বাড়ি

রাস্তায় এসে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "ও বাড়িখানা কার জয়ন্ত?"

—"ওখানা হচ্ছে বারোয়ারি বাড়ি।"

—"বারোয়ারি পুজোর কথাই শুনেছি, বারোয়ারি বাড়ি আবার কি বাবা?"

—"ওটা হচ্ছে মেস। ওর ভিতরে কেরানী থাকে, ছাত্র থাকে, ব্যবসাদার থাকে, আরো কোন কোন শ্রেণীর লোক থাকে।"

—"কিন্তু মেসের একজন কর্তা আছে তো?"

—"তা আছে বৈকি! তার নাম শুনেছি সুরেনবাবু। লোকটির সঙ্গে আমার চোখের পরিচয়ও আছে।"

—"বেশ, আগে আমার তাকেই দরকার।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না, সুরেনবাবুর সঙ্গে পরে আলাপ করলেও চলবে। আমার দোতালার ঘরের সরাসরি মেস-বাড়ির ঐ যে দোতালা ঘরখানা আছে, আগে আমি ঐখানেই যেতে চাই। ওটা মেস, সুতরাং কারুরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। দেরি করলে সব সূত্রই হারিয়ে যাবে। আসুন। এস মানিক!"

তিনজনে মেস-বাড়ির ভিতরে ঢুকে একসার নোংরা সিঁড়ি বয়ে দোতালায় গিয়ে উঠল। তিন-চার জন লোক সুন্দরবাবুর 'ইউনিফর্মের' দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকালে বটে, কিন্তু কেউ কোন কথা বললে না।

একখানা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, "তীর ছোড়া হয়েছে খুব সম্ভব ঐ ঘর থেকেই।"

কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে তালাবদ্ধ!

ঠিক এই সময়ে একটি বেঁটেসেটে, কালোকোলো, হৃষ্টপুষ্ট লোক হন্তদন্তের মতো এসে বললে, "নমস্কার জয়ন্তবাবু, হঠাৎ আমার এখানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল কেন?"

জয়ন্ত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে বললে, "ইনিই মেসের কর্তা সুরেনবাবু।"

সুন্দরবাবু কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুরেনের আপাদমস্তকের উপরে একবার নিজের পুলিশ-চক্ষু বুলিয়ে নিলেন। সুরেন সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে কে থাকে?"

সুরেন বললে, "আজ্ঞে, ওটা একটা সমিতির ঘর। জাতীয় সেবক-সমিতি।"

জয়ন্ত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "এ বাড়িতে আবার কোন সমিতি আছে নাকি?"

—"আজ্ঞে, আগে ছিল না। জাতীয় সেবক-সমিতি ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে মোটে দিন পনেরো আগে।"

—"সমিতির সভ্য-সংখ্যা কত?"

—"আমি জানি না। তবে রোজ সন্ধ্যার পর এখানে দশ-পনেরো জন লোক এসে জড়ো হয়। মাঝে মাঝে দুই-একটি মেয়েও আসে। তারা নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা কয় বলতে পারি না, তবে তারা ঘন ঘন খাবার আর চা আনায় বটে! তারপর রাত দশটা কি এগারোটার সময়ে সকলে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।"

—"সকালে তাদের কেউ এখানে আসে না?"

—"সকালেও নয়, দুপুরেও নয়, বিকালেও নয়। তাদের আসর বসে সন্ধ্যার পর।"

—"আপনি ঠিক জানেন, আজ তাদের কোন লোক ঐ ঘরে ঢোকেনি?"

—"কেমন করে হলপ্ করে বলি? আমি একলা মানুষ, নানান কাজে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করতে হয়। তবে সমিতির কোন লোককে কোনদিন সকালে

আসতে দেখিনি।"

জয়ন্ত আর কিছু না বলে বাইরের বারান্দার দিকে গেল। সেদিকে ছিল তালাবদ্ধ ঘরের তিনটে জানলা—তার মধ্যে একটা জানলা খোল। একবার সে নিজের বাড়ির দিকে তাকালে। সেখান থেকে তার নিজের দোতালা ঘরের ভিতরটা বেশ দেখা যায়। তারপর সে ফিরে জানলার ফাঁক দিয়ে মেস-বাড়ির ঘরের ভিতরটা উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে।

ঘরের ভিতরে নজর চলে প্রায় সর্বত্রই। আসবাব-পত্তর বেশি নেই। একদিকে একখানা সতরঞ্চি-মোড়া চৌকি, আর মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারিপাশে সাজানো রয়েছে কয়েকখানা চেয়ার—এইমাত্র।

আর একটা জিনিস জয়ন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। সে মৃদু হেসে ডাকলে, "সুরেনবাবু, একবার এদিকে আসবেন কি?"

—"আঁজ্ঞে, কি বলছেন?"

—"আপনি বললেন, সমিতির কেউ সকালে এ ঘরে আসে না?"

—"আঁজ্ঞে, তাই তো জানি।"

—"জানলার কাছে এসে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখুন।"

কথামতো কাজ করলে সুরেন। অজানা কোন বিপদের সম্ভাবনায় তার ভাবভঙ্গি জড়োসড়ো।

জয়ন্ত বললে, "গোল টেবিলটার উপরে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন?"

—"হুঁ। একটা 'অ্যাশ্-ট্রে'।"

—"তারপর?"

সুরেনের দুই ভুরু কুঞ্চিত হল। থেমে থেমে সে বললে, "আশ্চর্য! 'অ্যাশ্-ট্রে'র ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে!"

জয়ন্ত বললে, "কাল রাত্রে কেউ যদি খানিকটা জ্বলন্ত সিগারেট ঐ 'অ্যাস-ট্রে'র মধ্যে ফেলে থাকে, তাহলে আজ সকালে নিশ্চয়ই সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুত না?"

—"না।"

—অতএব বোঝা যাচ্ছে, একটু আগেই এই ঘরের ভিতরে কারুর আবির্ভাব হয়েছিল?"

একটা ঢোক গিলে আম্‌তা আম্‌তা করে সুরেন বললে, "কিন্তু দোহাই আপনার, আমি তাকে দেখিনি।"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "বন্ধ ঘরের ভিতরে রয়েছে জ্বলন্ত-সিগারেটের ধোঁয়া, কিন্তু সিগারেট-ধারী কোথায় গেল বলতে পারেন?"

সুরেন কিছুই বলতে পারলে না।

সুন্দরবাবু এগিয়ে এসে কঠোর স্বরে বললেন, "সুরেনবাবু, এ ঘর প্রথমে কে ভাড়া নিতে আসে?"

—"তারাপদবাবু। পরে জেনেছি তিনিই সমিতির সম্পাদক।"

—"তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। তবে একদিন কথায় কথায় জানতে পেরেছিলুম, গেল যুদ্ধের আগে তিনি থাকতেন সিঙ্গাপুরে।"

সুন্দরবাবু সচমকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সিঙ্গাপুরে?"

—"আঁজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আর কিছু জানতে পেরেছেন?"

—"আঁজ্ঞে না। তারাপদবাবু আর তাঁর সমিতির লোকরা মেসের কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলেন খুব নিচু-গলায়। কেউ যদি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের ঘরের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারে, তাহলেও বিরক্ত হন তাঁরা।"

—"তাদের ব্যবহার আপনার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়নি?"

—"তা হয়েছে বৈকি!"

—"এই তারাপদ লোকটিকে দেখতে কেমন?"

—"একেবারে চমৎকার! রাজপুত্তুর বললেও হয়। দুধে-আল্‌তার মতো গায়ের রং, ভুরু-চোখ-নাক-ঠোঁট যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কিন্তু পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় কাঁধ-ছোঁয়া কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁটের উপরে খুব সরু একটি গোঁফের রেখা। দোষের মধ্যে তাঁর দেহে পুরুষালি ভাব কম, আর মাথাতেও তিনি বেশ খাটো।"

—"তার বয়স কত হবে?"

—"ছাব্বিশ-সাতাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।"

—"পোশাক-পরিচ্ছদ কি-রকম?"

—"অত্যন্ত সৌখীন। জামা-কাপড়-জুতো সবই দামী। সিল্কের পাঞ্জাবি ছাড়া আর কোনরকম জামা তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি, তার উপরে থাকে কোনদিন হীরার, আর কোনদিন মুক্তার বোতাম। দুই হাতের আঙুলেই আছে দামী দামী পাথর-বসানো আংটি,—এমনকি তাঁর সোনার হাতঘড়িরও উপরে আছে সারি সারি হীরার ঝলক। তারাপদবাবু যেখান দিয়ে যান, সেইখানেই খানিকক্ষণ পর্যন্ত ছড়ানো থাকে অতি মধুর এসেন্সের সুগন্ধ! বলতে কি মশায়, তারাপদবাবুর মতন ফুলবাবু আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। তিনি যে ধনকুবেরের ছেলে, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! ধন্যবাদ সুরেনবাবু, আপনার কাছ থেকে তারাপদর চমৎকার একখানি ফোটোগ্রাফ পেলুম। চল হে জয়ন্ত, এইবারে আমরা যেতে পারি।" দুই পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ে আবার বললেন, "হ্যাঁ, শুনুন সুরেনবাবু, আর একটা কথা বলে যাই। যদি নিজে বিপদে না পড়তে চান তাহলে আপনি—"

ভয়ে চমকে উঠে সুরেন বললে, "বিপদ? কেন? তারাপদবাবুরা কি বিপ্লববাদীর দল?"

সুন্দরবাবু বললেন—অতিরিক্ত গম্ভীর স্বরেই বললেন,—"ওরা যে কি, তা

আমরাও জানি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন—নিজের ভালোর জন্যে খুব ভালো করেই মনে রাখবেন। আমরা যে আজ এখানে এসেছি, সমিতির কোন লোক যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। চল জয়ন্ত, চল হে মানিক!"

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, তারাপদ সিঙ্গাপুরে থাকত শুনে হঠাৎ আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন?"

সুন্দরবাবু অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন, "এখানে নয় ভায়া, এখানে নয়। বাড়িতে চল, সব বলছি।"

এমন সময়ে পথিমধ্যে জয়ন্তের পুরাতন ভৃত্য মধুর আবির্ভাব। তাড়াতাড়ি এসে সে বললে, "বাবু, একটি মেয়ে আপনাকে ডাকতে এসেছে।"

ভ্রূ সংকুচিত করে জয়ন্ত বললে, "মেয়ে? কোথায় সে?"

—"বটুকখানায় বসিয়ে রেখেছি বাবু! সে বললে, 'তোমার বাবুকে এখুনি দরকার, শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস!' তাই আমি ছুটতে ছুটতে খবর দিতে আসছি।"

তারা দ্রুতপদে বাড়িতে এসে বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে।

জয়ন্ত এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বলল, "কৈ মধু, এখানে তো কেউ নেই!"

মধু হতভম্বের মতো বললে, "আমি তো ঐ চেয়ারের উপরেই মেয়েটিকে বসিয়ে আপনাকে খবর দিতে গিয়েছিলুম!"

জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে বললে, "চেয়ারের উপরে কোন মানব বা মানবীর মূর্তি নেই বটে, কিন্তু একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে দেখছি।"

সে কাগজখানা তুলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে ঃ "জয়ন্তবাবু, সাবধান! **আপনি আমার অনুরোধ রাখলেন না, সুন্দরবাবুর পক্ষই অবলম্বন করলেন। উত্তম! ভিমরুলের চাকে যখন হাত দিয়েছেন, দংশনের জ্বালা আপনাকে সহ্য করতেই হবে! এ দংশন কি জানেন? অনিবার্য মরণ—নিশ্চিত মরণ!"**

তিন

মস্ত-বড় অ্যাডভেঞ্চার

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। জয়ন্ত-ভায়া, বুঝতে পারছ কি, আমরা নিশ্চয়ই কোন একটা মস্ত-বড় অ্যাডভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে চলেছি।"

মানিক সায় দিয়ে বললে, "হুঁ, বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার। আসল ব্যাপার কি জানলুম না, অথচ গোড়া থেকেই উত্তেজনার ধাক্কা। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি চুপ করে আছ কেন?"

জয়ন্ত বললে, "কতকগুলো কথা ভাবছি।"

—"কি কথা?"

—"একদল লোক যে কারণেই হোক্, আপনাকে পথ থেকে সরাতে চায়। আপনাকে যে সাহায্য করবে তাকেও তারা ক্ষমা করবে না! তারা আমাদের প্রত্যেকের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে। খুব সম্ভব ঐ মেস-বাড়ির সঙ্গেও তাদের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। তারা চালাক বটে, কিন্তু উপর-চালাক। নইলে এ-রকম সেকেলে পদ্ধতিতে চিঠি লিখে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করত না। কিন্তু তারা যে সাংঘাতিক লোক, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাদের দলে যে স্ত্রীলোকও আছে, সে প্রমাণও আজ পাওয়া গেল। কিন্তু কে তারা? কেন তারা আমাদের পিছনে লাগতে চায়? সুন্দরবাবুর কাছে বোধ হয় এ প্রশ্নের জবাব আছে।"

সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, "হয়তো আছে, হয়তো নেই। আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না।"

—"সুরেনবাবুর মুখে সিঙ্গাপুরের নাম শুনে আপনি উত্তেজিত হলেন কেন?"

—"আমি যা জানি বলছি শোনো। তোমরা তো জানো, মাস-পাঁচেক আগে একজন জালিয়াতকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমাকে সিঙ্গাপুরে যাত্রা করতে হয়েছিল?"

—"তা জানি। কিন্তু মামলাটার কথা ভালো করে জানি না।"

—"সংক্ষেপে বলি শোনো। বীরেন্দ্রলাল একজন শিক্ষিত লোক আর সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু বদখেয়ালিতে পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শেষটা অর্থাভাবে জালিয়াতি ব্যবসা অবলম্বন করে। নোট জাল করতে সে অদ্বিতীয়। জাল নোট চালিয়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দলের কয়েকজন লোক ধরা পড়ে যায়, আর সেও হয় নিরুদ্দেশ। এটা হচ্ছে দুই বছর আগেকার কথা। তারপর মাস কয়েক আগে আমরা খবর পাই, সিঙ্গাপুর-অঞ্চলে নাকি জাল নোটের বড়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে। গুপ্তচরের মুখে আরো শুনি, কলকাতা থেকে এক বাঙালী বাবু নাকি সিঙ্গাপুরে গিয়ে একদল জালিয়াতের সর্দার হয়ে বসেছে! সেই দলের লোকেরা নাকি কেবল জালিয়াতি নয়, মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না। আমাদের সন্দেহ হল, সিঙ্গাপুরের ঐ বাঙালী বাবু আর কলকাতা থেকে নিরুদ্দিষ্ট বীরেন্দ্রলাল অভিন্ন ব্যক্তি।

আমাদের সন্দেহ সত্য কিনা জানবার জন্যে ইন্‌স্পেক্টার চারুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিঙ্গাপুরে গিয়ে হাজির হই। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, আমাদের সন্দেহ মিথ্যা নয়। বীরেন্দ্রকেও প্রায় গ্রেপ্তার করেছিলুম, কিন্তু একটুর জন্যে সে আবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে। বীরেনের বাসা হাতড়ে পেলুম খালি তার ডায়েরি আর ফোটোগ্রাফ। ডায়েরিখানা বাজে কথায় ভরা, আমাদের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু ফোটোগ্রাফখানা পেয়ে আমার ভারি উপকার হয়েছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কি-রকম উপকার?"

—"জানতে পেরেছি যে কলকাতায় আবার বীরেন্দ্রলালের শুভাগমন হয়েছে।"

—"কেমন করে জানতে পারলেন?"

—"তোমাদের ঐ সুরেনবাবুর কথায়! উনি তারাপদর যে বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে বীরেনের চেহারা হুবহু মিলে যায়!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে, "আপনার আর কিছু বলবার নেই?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, আমার আসল বক্তব্য তো এখনো বলাই হয়নি। বীরেন কলকাতায় এসেছে জানতে পেরে আমাদের চোখের সামনে থেকে অনেকখানি অন্ধকার সরে গিয়েছে। শোনো! দিন-পনেরো আগে আমার হাতে আসে একটা খুনের মামলা। হত ব্যক্তির নাম মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। পাড়ার লোকের মুখ থেকে কেবল এইটুকু শুনেছি,—মাস-ছয়েক আগে তিনি বাহির থেকে কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া করে বাস করছিলেন। মুকুন্দবাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়। তিনি বিপত্নীক। তাঁর দুই ছেলে। জ্যেষ্ঠের নাম সনৎকুমার, কনিষ্ঠের নাম অশোককুমার। আন্দাজি বয়স যথাক্রমে ছাব্বিশ আর চব্বিশ। দুইজনেই অবিবাহিত। পিতা-পুত্র সকলেরই স্বভাব ছিল একরকম। পাড়ার কারুর সঙ্গেই তাদের মেলামেশা ছিল না। তারা বাইরের লোককে এড়িয়ে চলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করত।"

জয়ন্ত শুধালে, "তাদের কি পেশা ছিল?"

—"আশ্চর্য এই, তাদের কোনই পেশা ছিল না। কোন ব্যাঙ্কেও মুকুন্দবাবুর নামে টাকা গচ্ছিত নেই। হয়তো তাঁর হাতে নগদ টাকা ছিল, তাই ভাঙিয়েই সংসার চলত।"

—"বাড়িতে ঝি-চাকর-পাচক ছিল তো?"

—"পাচকও ছিল না, চাকরও ছিল না। একটা ঠিকে ঝি দুই বেলা কিছুক্ষণের জন্য এসে কাজ সেরে চলে যেত। মুকুন্দবাবুদের খাবার আসত হোটেল থেকে।"

জয়ন্ত বললেন, "রহস্যময় পরিবার! মুকুন্দবাবুর বাড়ি খানাতল্লাস করে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুর কোন চিঠি পাননি?"

—"পেয়েছি কেবল একখানা চিঠির একটা টুকরো। তার কথা পরে বলছি।"

—"মুকুন্দবাবু ফেরারি আসামী নন তো?"

—"তার কোন প্রমাণ নেই!"

—"তাহলে মুকুন্দবাবু হয়তো কোন বিপদজনক শত্রুর ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছিলেন।"

—"খুব সম্ভব তাই!"

—"মুকুন্দবাবুর ছেলেরা কি বলে?"

—"আরে, তাদেরও যে পাত্তা নেই! হত্যাকাণ্ডের পরে তাদেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না!"

জয়ন্ত সোজা হয়ে বসে বললে, "আপনি কি তাদেরই পিতৃহত্যার জন্যে দায়ী মনে করছেন?"

—"তা ছাড়া আর কি করি বল? তারা পালালো কেন? যে বাড়িতে বাইরের কোন লোকের যাতায়াত নেই, সেখানে বাহির থেকে কেউ খুন করতে আসবে কেন?"

—"আপনার এই যুক্তি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়! হয়তো যে ভয়ে মুকুন্দবাবু আত্মগোপন করেছিলেন, সেই ভয়েই তাঁর পুত্রেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।"

—"এটা তোমার অনুমান মাত্র!"

—"যাক্ সে কথা। এখন কিভাবে মুকুন্দবাবু মারা পড়েছেন তাই বলুন।"

—"মুকুন্দবাবু রাত্রে খাটের উপরে যে শয়ন করেছিলেন বিছানা দেখেই আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাঁর দেহ পাওয়া যায় খাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা টেবিলের কাছে। খুনী কোন ধারালো ভারি অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, কারণ তাঁর মুণ্ডটা দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘরের ভিতরে আমরা কোন অস্ত্র বা পদচিহ্ন দেখতে পাইনি। ঘরের আসবাবের মধ্যে ছিল একখানা খাট, একটা আলমারি, একটা টেবিল, একখানা সাধারণ চেয়ার আর একখানা ইজি-চেয়ার। আলমারির ভিতরের সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, টেবিলের দুটো দেরাজের অবস্থাও তাই। কোন জিনিস চুরি গিয়েছে কিনা বলতে পারি না, কারণ আলমারি আর দেরাজের ভিতরে কি কি ছিল, তা আমরা জানি না। তবে দেরাজের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে দু'খানা একশো টাকার আর পঁচিশখানা দশ টাকার নোট। ঘরে আর কোন মূল্যবান জিনিস ছিল না।"

—"খুনী ঘরে ঢুকলো কেমন করে?"

—"তাও জানি না। তবে মুকুন্দবাবুর শয়নগৃহের আর সদরের দরজা সকাল পর্যন্ত খোলাই ছিল।"

—"কি একটা চিঠির টুকরোর কথা বলছিলেন?"

—"মৃত মুকুন্দবাবুর মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভিতর থেকে এই কাগজের টুকরোটুকু পাওয়া গিয়েছে।"

জয়ন্ত সেটি গ্রহণ করে পাঠ করলে।*

জয়ন্তের দুই চক্ষে ফুটল উৎসাহের দীপ্তি। সে বললে, "এটা একখানা পত্রের ছিন্নাংশ। খুব সম্ভব হত্যাকারী যখন এই পত্রখানা হস্তগত করেছিল, মুকুন্দবাবু সেই সময়ে তার হাত থেকে এখানা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে মারা পড়েছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য হচ্ছে, পত্রখানা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১৩ তারিখে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গাপুর থেকে। সুন্দরবাবু, এইবারে তৃতীয় দ্রষ্টব্য কি, দেখবেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরো কিছু দ্রষ্টব্য আছে নাকি?"

---

* মূল চিঠিখানার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

জয়ন্ত পকেট থেকে আরো দু'খানা কাগজ বার করে ছিন্ন পত্রের পাশে টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে বললে, "এই আপনার ছেঁড়া চিঠির টুকরো! আর দু'খানা পত্রের প্রথমখানা এসেছে তীরের সঙ্গে, আর দ্বিতীয়খানা এসেছে একটি স্ত্রীলোকের হাতে। এখন তিনখানা পত্রেরই হাতের লেখা মিলিয়ে দেখুন দেখি!"

কাগজ তিনখানার দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর দৃষ্টি ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল।

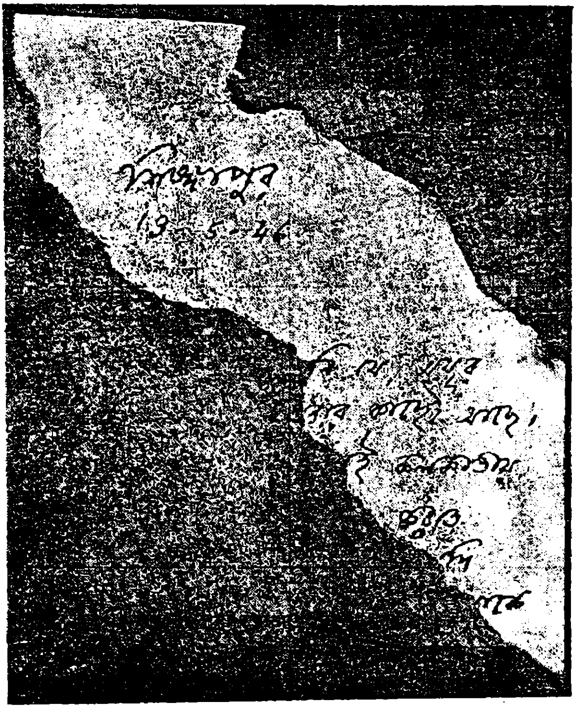

ছিন্নপত্রের প্রতিলিপি

মানিক চমৎকৃত হয়ে বললে, "এই তিনখানা কাগজেই যে একই হাতের লেখা!"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক তাই! বীরেন মুকুন্দবাবুকে খুন করেছে কিনা জানি না, তবে সেইই যে তাঁকে সিঙ্গাপুর থেকে চিঠি লিখেছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হুম! দেখে নেব—এইবারে বীরেনকে আমি দেখে নেব! সাধে কি তোমার কাছে আসি জয়ন্ত? একসঙ্গে আমার দুটো মামলার ভার হাল্‌কা হয়ে গেল। আগে তো আজ সন্ধ্যাতেই জালিয়াতির মামলার জন্যে বীরেনকে গ্রেপ্তার করি, তারপর বোঝা যাবে মুকুন্দবাবুর হত্যার

সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কতখানি! জয়ন্ত, মানিক! আজ সন্ধ্যার সময়ে 'জাতীয় সেবক-সমিতি'র আসরে তোমাদেরও আমন্ত্রণ রইল!"

চার

প্রহসন

সন্ধ্যার আগেই জয়ন্তের বাড়িতে হল সুন্দরবাবুর আবির্ভাব।

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, "যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত?"

—"হুম্!"

মানিক বললে, "এক্ষেত্রে 'হুম্' মানে কি সুন্দরবাবু? হুঁ?"

—"হুম্! হ্যাঁ, তাই। সমস্ত প্রস্তুত। আনাচ-কানাচ থেকে ঐ মেস-বাড়ির উপরে এখন দৃষ্টি রেখেছে দু-ডজন লালপাগড়ি। চম্পট দেবার কোন ফাঁকই নেই। আরে, একি? রাস্তার দিকের জানলাগুলোয় কালো কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছ কেন জয়ন্ত?"

—"শত্রুর চোখের আড়ালে থাকব বলে। আজ ধনুকের তীর ঘরে ঢুকেছে, কাল বন্দুকের বুলেট ঢুকতে পারে।"

—"তা যা বলেছ! মারাত্মক শত্রুর পাল্লায় পড়েছি। শয়তান বেটারা কিনা আমাকে বিস্ফোরক দিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন করবার ফিকিরে ছিল! আচ্ছা বাপধন, একটু সবুর কর! আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ছি না!"

জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "সুন্দরবাবু, তারাপদ ওরফে বীরেনের দল আজ যদি তাদের এই লোক-দেখানো সমিতির দরজা না খোলে?"

—"কেন খুলবে না?"

—"আমরা যে সন্দেহ করে ওখানে তদন্ত করতে গিয়েছি, এ খবর নিশ্চয়ই তাদের অজানা নেই।"

—"কিন্তু সে তো সন্দেহ মাত্র! বীরেন্দ্রলাল ঝানু ছেলে, সে জানে তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। যদি আমরা অভিযোগ করি, 'মেসের ঐ ঘর থেকে পত্রবাহী তীর ছোঁড়া হয়েছে', সে অম্লানবদনে বলতে পারে, 'মিথ্যাকথা। ওখান থেকে কোন তীরই ছোঁড়া হয়নি।' আমাদের কথা সে সত্য, তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণও আমরা দিতে পারব না। সে নিশ্চয়ই এ সন্দেহ করতে পারবে না যে, আমরা জানতে পেরেছি তারাপদই হচ্ছে বীরেন্দ্রলাল।"

জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, "শত্রুকে নিজের চেয়ে বোকা মনে করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ তপ্তকণ্ঠে বললেন, "বেশ, দেখা যাক্। আপাতত এ-সব কথা থো কর ভায়া! তোমার শ্রীমান মধুসূদনকে স্মরণ কর, একটু চা এবং টা নিয়ে

এলে ধন্য হই।"

জয়ন্ত ডাক দিলে, "মধু! অ মধুসূদন!"

পাশের ঘর থেকে পুরাতন ভৃত্য মধুর সাড়া এল, "আজ্ঞে!"

—"সুন্দরবাবুর তেষ্টা পেয়েছে।"

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "খালি তেষ্টাই নয় মধু, বিলক্ষণ ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে।"

সাড়া এল, "আজ্ঞে, বুঝেছি! একটু সবুর করুন।"

—"সবুর করছি মধু, সবুর করছি! সবুরে যে মেওয়া ফলে!"

চা এবং টা এল অনতিবিলম্বে। এবং তারই পালা শেষ করতে করতে পৃথিবীর উপরে ঘনিয়ে উঠল আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ কালো ছায়া।

সুন্দরবাবু 'ন্যাপ্‌কিন' দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আসন ত্যাগ করে একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পর্দা একটু টেনে উঁকি মেরে সোল্লাসে বললেন, "জয়ন্ত হে, তোমার ধারণাই ভ্রান্ত!"

জয়ন্ত কেবল বললে, "তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! জাতীয় সেবক-সমিতির ঘরে আলো জ্বলেছে। একাধিক সভ্যের শুভাগমন হয়েছে!"

—"শুনে সুখী হলুম।"

সুন্দরবাবু আবার একবার উঁকি মেরে বললেন, "কেবল সভ্য নয় হে, দুটি সভ্যাকেও দেখছি যে!"

—"বটে! হয়তো ওঁদেরই মধ্যে একটি শ্রীমতী আজ আমাদের এখানে এসে মধুকে ভোগা দিয়ে গিয়েছেন। মধু, অ শ্রীমধুসূদন!"

মধু এসে বললে, "আজ্ঞে!"

—"জানলায় গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে এস তো, মেসবাড়ির দোতলার ঘরে যে দুটি মেয়ে আছে, তাদের কারুকে তুমি চেন কিনা?"

মধু দেখে এসে বললে, "উঁহু, ঠাকরুণদের কারুকেই চিনি না তো!"

—"আচ্ছা, যাও।"

মধুর প্রস্থান। মিনিট-কয়েক কাটলো।

জয়ন্ত শুধোলে, "অতঃপর?"

সুন্দরবাবু বললেন, "সভ্যের পর সভ্য আসছে, আসছে, আসছে! ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে বহু সিগারেটের ধোঁয়া! একজন লোক টেবিলের ধারে উঠে দাঁড়াল। বোধ হয় সে বক্তৃতা দিতে চায়!"

—"তাই নাকি? তাহলে সকলেই বোধ হয় এসে পড়েছে! আমরাই বা আর এখানে বসে থাকি কেন?"

সুন্দরবাবু জানলার ধার ত্যাগ কর ভারিক্কে গলায় বললেন, "তবে এইবারে শুরু হোক্ আমাদেরও অভিযান!"

মানিক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, "যো হুকুম, জেনারেল!"

* * *

কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে সমিতি-গৃহে সুন্দরবাবু প্রভৃতির প্রবেশ।

ঘরের ভিতরে ছিল এগারো জন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক। পুলিশ দেখে কেউ বিস্মিতও হল না, ভয়ও পেলে না। যে যার আসনে স্থির ও শান্ত ভাবে বসে রইল।

সকলের মুখের উপরে একবার তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবু হুম্‌কি নিয়ে বললেন, "এই! কার নাম বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী?"

একজন বললে, "কারুর নাম নয়।"

—"মানে?"

—"মানে, বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী এখানে হাজির নেই।"

—"কোথায় সে?"

—"কলকাতার বাইরে।"

—"কলকাতার বাইরে, কোথায়?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"কলকাতার বাইরে সে গিয়েছে কেন?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"কবে সে ফিরবে?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"তুমি তো ভারি ধড়িবাজ দেখছি হ্যা!"

—"আমি ধড়িবাজ নই।"

—"তবে তুমি কি।"

—"এই সমিতির সহকারী সম্পাদক।"

—"বীরেন এখানকার কি?"

—"সম্পাদক।"

—"ও, তুমি তাহলে বীরেনের ডান হাত?"

—"দেখতেই পাচ্ছেন আমি বাঁ কি ডান কোন হাতই নই, পুরোপুরি একটা গোটা মানুষ।"

—"তুমি তো ভারি ফাজিল হে!"

—"আমি ফাজিল নই।"

—"হুম্‌!"

ঘরের ভিতরে যে নারী দুটি ছিল তারা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "ব্যাপারটা ক্রমেই প্রহসন হয়ে উঠছে মানিক! এখান থেকে অদৃশ্য হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

মানিক বললে, "তথাস্তু।"

বাড়িতে ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, "আমি তো জানতুম সবই অষ্টরম্ভায় পরিণত হবে! পায়রারা যত সহজে ফাঁদে পা দেয়, কাকরা তা দেয় না। বীরেন হচ্ছে কাক-জাতীয় অপরাধী।"

মানিক বললে, "আচ্ছা জয়, তুমি কি মনে করো বীরেনই হচ্ছে মুকুন্দবাবুর হত্যাকারী?"

—"অসম্ভব নয়। তবে মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয়ই বীরেনের কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে।"

—"কি প্রমাণে এ কথা বলছ?"

—"বীরেনের হাতে লেখা চিঠিখানার কথাই ধর। তার উপরে হত্যাকারীর লোভ হল কেন? নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল চিঠিখানা ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে না ফেললে হত্যাকারী ধরা পড়তে পারে। আর এ কথা ভাবতে পারে কে? নিশ্চয়ই এমন কোন লোক, যে নিজে হত্যাকারী বা তার সাহায্যকারী। সুতরাং দুই দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে, মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডে বীরেন্দ্রলাল গ্রহণ করেছিল কোন বিশিষ্ট ভূমিকা। মানিক, পুরো চিঠিখানা পেলে আমাদের সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, আমরা তা পাইনি।"

মানিক বললে, "কিন্তু মুকুন্দবাবুর দুই পুত্রই পলাতক কেন?"

—"ভয়ে মানিক, ভয়ে। পুলিশের ভয়ে নয়, যে ভয়ের জন্যে মুকুন্দবাবু আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর পুত্ররাও পলায়ন করেছে সেই অজ্ঞাত ভয়ের তাড়নাতেই। তারা হত্যাকারী নয়।"

—"তুমি এতটা নিশ্চিত কেন?"

—"আমি নিশ্চিত নই, এটা আমার সহজ বুদ্ধির অনুমান মাত্র। প্রথমত, পিতৃহত্যা অস্বাভাবিক। বিশেষত, দুই ভাই একজোট হয়ে পিতৃহত্যা করবে, এটা আবার আরো অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, মনে করে দেখ, মুকুন্দবাবুর দেরাজের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে দুখানা একশো টাকার আর পঁচিশখানা দশ টাকার নোট। সনৎ আর অশোক পিতৃহত্যা করলে অতগুলো টাকা ফেলে রেখে যেত না।"

—"যদি অন্য লোকই হত্যাকারী হয়, তবে সেও তো ঐ টাকাগুলো নিয়ে যায়নি?"

—"নিশ্চয়ই সে অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যের লোভে মুকুন্দবাবুর বাড়িতে এসেছিল। আর এও হতে পারে, পিতা নিহত হয়েছেন জেনে পুত্ররা যখন সভয়ে পলায়ন করে, হত্যাকারীও তখন জানাজানি হবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বাধ্য হয়, নোটগুলো হস্তগত করবার অবকাশ পায়নি। যাক, আজ আর এ-সব নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বাঁশি বাজানো যাক্, তুমি তবলায় ঠেকা দাও।"

*　　*　　*　　*

পরের দিন প্রভাতী ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফিরে এল জয়ন্ত ও মানিক।

মানিক ঢুকল বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়তে, জয়ন্ত উপরে গেল জামা-কাপড় ছাড়তে।

একটু পরেই জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাক দিলে, "মানিক! শীগ্‌গির উপরে এস।"

উপরে গিয়ে মানিক দেখলে, একখানা কাগজ হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্ত।

—"ব্যাপার কি জয়?"

—"কাগজখানা পড়ে দেখ।"

কাগজের উপরে লেখা ছিল ঃ "আজ রাত দশটার সময়ে আমরা তোমার প্রাণবধ করব। ভগবানও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না।"

পাঁচ

পদচিহ্ন

জয়ন্ত বললে, "আশ্চর্য! চিঠিখানা আমার দোতালা ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?"

মানিক বললে, "নিশ্চয়ই উড়ে আসেনি, কোন মানুষ ওখানা বহন করে এনেছে।"

—"বলা বাহুল্য। কিন্তু মানিক, আমরা যখন বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরুই চিঠিখানা তখন যে ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল না, এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি।"

—"তাহলে আমরা বেরুবার পর চিঠিখানা এসেছে।"

জয়ন্ত হাঁকলে, "মধু!"

মধুর প্রবেশ।

—"আমরা বাইরে যাবার পর কেউ আমাকে ডাকতে এসেছিল?"

—"কৈ, না তো!"

—"কেউ তোমাকে কোন চিঠি দিয়ে যায়নি?"

—"না বাবু, কেউ না।"

—"তাহলে আমার দোতালা ঘরে এই চিঠিখানা রেখে গেল কে?"

জয়ন্তের হাতের পত্রের দিকে মধু হতভম্বের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "এ যে আজব কাণ্ড বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"দেখ মধু, ভালো করে ভেবে দেখ।"

—"আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, আজ আর কেউ এ বাড়িতে আসেনি। বাইরের কোন লোককে দারোয়ানই বা বাড়িতে ঢুকতে দেবে কেন?"

—"আচ্ছা, দারোয়ানকেও জিজ্ঞাসা করে এস দেখি!"

মধু ঘরের বাইরে গেল। জয়ন্ত রাস্তার দিকের জানালাগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "জানলার সব গরাদে ঠিক আছে। বন্দুকের গুলির মতো পর্দা ফুঁড়েও চিঠিখানা ঘরে ঢুকতে পারে না।"

সে কার্পেটের উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে দরজার কাছে গেল। তারপর হেঁট হয়ে কি দেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

মধু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

—"দারোয়ান কি বললে মধু?"

—"বাইরের জনপ্রাণী বাড়ির ভিতরে আসেনি।"

—"আমরা বাইরে বেড়াতে গিয়ে একঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছি। এ সময়টায় তুমি কোথায় ছিলে?"

মধু বললে, "প্রথমে তেতালার ঘরগুলো ঝেড়ে-পুঁছে এই ঘরে আসি।"

—"তখন কি আমার বসবার সোফার উপরে এই চিঠিখানা দেখেছিলে?"

—"উঁহু, চিঠি-ফিটি কিছুই ওখানে ছিল না।"

—"তারপর?"

—"সিঁড়ির পাশের ঘরে বসে বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করছিলুম!"

—"আর কোথাও যাওনি?"

—"না।"

—"সে সময়ে আর কোন বাইরের লোক দোতালায় এলে নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পেতে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আচ্ছা, তুমি যাও। মানিক, সিঁড়ির পাশের ঘর থেকে এ ঘরের দরজাটা দেখা যায় না বটে, কিন্তু এদিকে আসতে গেলে যে-কোন লোককে তো সিঁড়ির পাশের ঘরের সুমুখ দিয়ে আসতেই হবে। অথচ মধু বলছে বাইরের কারুকে সে দেখেনি।"

মানিক বললে, "দারোয়ান কারুকে দেখেনি, মধুও কারুকে দেখেনি, কিন্তু কেউ যে এখানে এসেছে তার প্রমাণ এই চিঠি!"

—"একটা প্রমাণ নয় মানিক, দ্বিতীয় প্রমাণেরও অভাব নেই।"

মানিক সবিস্ময়ে বললে, "দ্বিতীয় প্রমাণ?"

—"হ্যাঁ। এগিয়ে দরজার কাছে এস। কার্পেট যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রয়েছে সাদা মার্বেলের খোলা মেঝে। ঐখানে তাকিয়ে দেখ।"

মানিক হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'তাইতো, একটা অস্পষ্ট কাদা-মাখা পায়ের ছাপ না?"

—"হ্যাঁ। কঠিন মার্বেলের উপরে আগন্তুকের পায়ের ছাপ পড়বার কারণ কি? প্রথমত, সে এসেছিল খালি পায়ে। দ্বিতীয়ত, তার পা কেবল ধুলোমাখাই নয়, জলমাখাও ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ হচ্ছে ভিজে পায়ের ধুলো, তাই অস্পষ্ট কাদার মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মানিক, এখানেও আর এক বাধা আছে।"

—"কি রকম?"

—"আমরা ধরে নিলুম যেন, নিঃশব্দে চলা-ফেরা করবার জন্যেই আগন্তুক পাদুকা ত্যাগ করেছিল, আর তাই তার পায়ে লেগেছিল ধুলো। কিন্তু তার পায়ে জল লাগল কেন? কাল কি আজ বৃষ্টি হয়নি, আমার বাড়ির চারিদিক করছে শুক্‌নো খট্‌-খট্। তবু আগন্তুকের পায়ে জল লাগল কেন? এস, এ ধাঁধার উত্তর পাবার

জন্যে আর একটু চেষ্টা করে দেখা যাক্।"

ঘরের বাইরেও ছিল মার্বেলে বাঁধানো মেঝে। একখানা আতসী কাঁচ নিয়ে জয়ন্ত মেঝের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর মেঝের উপরটা পরীক্ষা করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হল তার বাথরুমের দরজা পর্যন্ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এতক্ষণে তবু একটা হদিস পেলুম!"

—"কিসের হদিস?"

—"এখানেও অস্পষ্ট পায়ের কতগুলো চিহ্ন আছে, আর সেগুলো এসেছে আমার স্নানঘরের ভিতর থেকেই। এই দেখ, স্নানঘরের চৌকাঠের বাইরেই যে পদচিহ্নটা রয়েছে, সেটা কেবল স্পষ্টই নয়, দস্তুরমতো কর্দমাক্ত। নিশ্চয়ই এটা স্নানঘর থেকে আগন্তুকের প্রথম পদক্ষেপের চিহ্ন—তার পা যখন খুব বেশি ধূলিধূসরিত ছিল। তারপর দেখ, পায়ের দাগগুলো ক্রমেই বেশি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সবশেষে আমার ঘরের ভিতরে যে পায়ের ছাপটা আছে, সেটা এত অস্পষ্ট যে ভালো করে লক্ষ্য না করলে চোখে সহজে ধরাই পড়ে না।"

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু স্নানঘরের তো একটিমাত্র দরজা, আর তাও রয়েছে বাড়ির ভিতর দিকেই!"

জয়ন্ত বললে, "আগন্তুক যে বাড়ির ভিতর দিকের বারান্দা পার হয়েই এইদিকে এসেছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

—"কিন্তু বারান্দায় তার পায়ের ছাপ পড়েনি।"

—"পড়বে কেন, বারান্দায় তো জল ছিল না। সে বারান্দা পার হয়ে এইদিক দিয়ে প্রথমেই যায় আমার স্নানঘরে। বেড়াতে যাবার আগে আমি স্নান করেছিলুম, কাজেই স্নানঘরের মেঝেটা ছিল জলে জলময়। আগন্তুকের পা তাইতেই ভিজে যায়।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, মধু নিশ্চিত ভাবেই বলছে, বারান্দা দিয়ে কোন লোকই তোমার ঘরের দিকে আসেনি।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মৃদুস্বরে যেন আপন মনেই বললে, "হুঁ, সেইটেই হচ্ছে সমস্যা! কেবল সে বারান্দা দিয়ে আসেনি, তাকে যেতেও হয়েছে ঐ বারান্দা দিয়েই। সে অশরীরী নয়। অথচ সে মধুর চোখে পড়েনি!"

—"আর আগন্তুক প্রথমে স্নানঘরেই বা গিয়েছিল কেন?"

—"ঠিক! মানিক, তুমি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ! এও আর এক সমস্যা! কিন্তু হয়তো এ সমস্যার সমাধান আমি করতে পারব।"

মানিক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে তুমি কোন সূত্র পেয়েছ?"

—"সূত্র? সেটা কেবল আমার কেন, তোমারও চোখের সামনে তো পড়েই রয়েছে! এখন কিঞ্চিৎ কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করে সূত্রটাকে যদি আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যেতে পারো, তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যাক্, আপাতত সুন্দরবাবুকে সংবর্ধনা করবার জন্যে প্রস্তুত হও—ঐ শোনো তাঁর কণ্ঠস্বর আর

পদশব্দ!"

সুন্দরবাবু দেখা দিলেন, রহস্যময় আগন্তুকের আবির্ভাবের কথা শুনলেন, ভয়-দেখানো চিঠিখানা পড়লেন এবং পদচিহ্নগুলো পরিদর্শন করলেন। তারপর বললেন, "হুম্! সন্দেহ হচ্ছে, সন্দেহ হচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে!"

মানিক বললে, "বটে?"

—"হ্যাঁ, জয়ন্তের চাকর মধু আর রাঁধুনির উপরে আমার সন্দেহ হচ্ছে! তারাই তো এ বাড়িতে খালি-পায়ে আনাগোনা করে। এই পদচিহ্নগুলোর সঙ্গে তাদের পা মেলে কিনা আমি দেখতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "পদচিহ্নগুলো পালিয়ে যাচ্ছে না, দরকার হলে পরে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন। আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্নের জবাব দিন দেখি!"

—"সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আবার কি?"

—"ধরলুম আমাকে ভয় দেখিয়ে ঐ চিঠিখানা লিখেছে বীরেন্দ্রলালই! সে বলেছে আজই আমাকে নিশ্চয়ই যমের বাড়িতে পাঠাবে! কাল নয়, পর্শু নয়, আজই! সে এতটা নিশ্চিত কেন?"

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য-ভরে বললেন, "যেতে দাও ভায়া, বীরেনের কথা যেতে দাও। আজ এই বাড়ি ঘিরে এমন পুলিশ-পাহারা বসাব যে, একটা মশা কি মাছি পর্যন্ত তোমার ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না!"

জয়ন্ত বললে, "পুলিশ-পাহারাই প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় নয়। পুলিশ যেখানে গিস্-গিস্ করছে সেই থানার ভিতরে বসেই তো বিস্ফোরকের মহিমায় আপনি আর একটু হলেই স্থূল কলেবর ত্যাগ করতেন! আমার মাথায় জেগেছে আর এক সন্দেহ! এস মানিক, আমাকে সাহায্য করবে এস!"

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকল—পিছনে পিছনে মানিক ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, "মানিক, এস আমরা ঘরের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজি! সুন্দরবাবুও সাহায্য করতে পারেন। দেখা যাক্ বিপদজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা!"

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ঘরের চারিদিকে চলল খোঁজাখুঁজি। সোফা-কৌচ সরিয়ে, আলমারি টেনে, দেরাজ খুলে, এমনকি কার্পেট উল্টেও কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। অবশেষে বইয়ের শেল্‌ফের একসার কেতাবের পিছনে হাত চালিয়ে জয়ন্ত একটা জিনিস বার করলে।

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, "কী ওটা?"

জয়ন্ত সহজ কণ্ঠে শান্ত ভাবে বললে, "মাত্র একটি ঘড়ি-বোমা! পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরকম ঘড়ি-বোমা ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে এটা ফেটে যেত, আর আমাকে পথ থেকে সরিয়ে বীরেন্দ্রলালও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত! কিন্তু তখন আপনার পুলিশ-পাহারা আমার কি উপকারে লাগত সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু স্তম্ভিত! মানিকের অবস্থাও তাই!

জয়ন্ত বললে, 'আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলুম, বীরেনের চর কেবল

একখানা চিঠি বিলি করবার জন্যেই আমার বাড়িতে পদার্পণ করেনি! যদিও ঐ চিঠিখানা না লিখলে নিশ্চয়ই আমি কোন সন্দেহ করতে পারতুম না। এই অতি-ধূর্ততার জন্যেই অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। ভালো কথা সুন্দরবাবু! কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে আপনার কোন সুদক্ষ গুপ্তচর নিয়ে আমার এখানে আসতে পারবেন?"

—"কেন বল দেখি?"

—"আজ বোমা ফাটল না দেখে ক্রুদ্ধ বীরেন্দ্রলাল আমাকে ভয় দেখাবার জন্য কাল সকালে আবার তার চরকে এখানে প্রেরণ করতে পারে।"

—"কিন্তু কেমন করে জানলে সকালেই সে আসবে?"

—"সে যদি আসে তো সকালেই আসবে। লোকটা যে কে, আমি তা অনুমান করতে পেরেছি!"

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বলে উঠলেন, "কে সে, কে সে?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "ব্যস্ত হবেন না—অতি-ব্যস্ততা গোয়েন্দার শত্রু! যা বলবার কাল সকালেই বলব!"

ছয়

ডিউটি ইজ্ ডিউটি

পরদিনের সকাল। বেলা সাড়ে সাতটা হবে। তেতালার বারান্দার পর্দা নামিয়ে দিয়ে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

তার পিছনেই দণ্ডায়মান মানিক, সুন্দরবাবু ও আর একটি লোক। তার নাম নবীন, পুলিশের চর।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর হঠাৎ জয়ন্তের দেহ সোজা হয়ে উঠল। পর্দার ফাঁকে তার দৃষ্টিও হয়ে উঠল অতিশয় জাগ্রত।

কেটে গেল মিনিট পাঁচ।

জয়ন্ত ফিরে মৃদুস্বরে ডাকলে, "নবীন, এগিয়ে এস।"

নবীন কাছে এসে দাঁড়াল।

—"নবীন, পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখ, একটা লোক দোতালা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।"

নবীন পর্দার ফাঁকে চোখ চালিয়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ওর পিছু নাও। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকটা কোথায় যায় দেখে এস।"

নবীনের দ্রুতপদে প্রস্থান।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "ব্যাপার কি জয়ন্ত?"

—"বীরেনের চর এসেছিল।"

—"সে কি, তাকে ছেড়ে দিলে কেন?"

—"আপাতত তাকে ছেড়ে দিয়ে পরে গ্রেপ্তার করলেও চলবে। আগে আমি দেখতে চাই, সে বীরেনের আড্ডায় যায় কিনা!"

—"লোকটা কে?"

—"সব পরে বলছি, আগে নিচে নেমে চলুন।"

সেদিনও দোতালায় সিঁড়ির পাশের ঘরে বসে চায়ের জল গরম করছিল মধু। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "মধু, এ ঘরে তুমি কতক্ষণ আছ?"

—"তা আধঘণ্টা হবে বাবু।"

—"এর মধ্যে কোন লোককে তুমি এখান দিয়ে যেতে দেখনি?"

—"দেখেছি।"

—"কাকে?"

—"আপনাদের সঙ্গে যে বাবুটি উপরে ছিলেন, এইমাত্র তাঁকে নেমে যেতে দেখেছি।"

—"বটে! আর কেউ নয়?"

—"উঁহু, বাইরের আর কারুকে তো দেখিনি।"

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, "মধু, তুমি একটি আস্ত গাড়ল!"

মধু কাঁচুমাচু মুখে বললে, "কেন বাবু, কি অপরাধ আমি করেছি?"

—"কিছুই না। তবু তুমি একটি গাড়ল। আসুন সুন্দরবাবু!" জয়ন্ত নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে। তারপর বললে, "না, বীরেন আজও পত্রে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়নি। সে বুঝে নিয়েছে, শত্রুকে আগে থাকতে সাবধান করে দিলে ফল ভালো হয় না। এইবারে দেখ মানিক, মেস-বাড়ির জানালা থেকে বীরেন আমাদের সকলের অভ্যাসই লক্ষ্য করে দেখেছে। সে জানে ভিতর-দিককার জানালার ধারে টেবিলের সামনে ঐ গদীমোড়া চেয়ারখানায় আমি ছাড়া আর কেউ বসে না। তেতালার বারান্দায় আমি যেখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে ঐ চেয়ারখানার খানিকটা দেখা যায়। আমি দেখেছি, বীরেনের চর ঐ চেয়ারখানার উপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল?"

মানিক বললে, "ব্যাপারটা যে ক্রমেই আশ্চর্য হয়ে উঠছে। কে বীরেনের চর? তুমি তাকে দেখলে, নবীন তাকে দেখলে, অথচ মধু তাঁকে দেখতে পেলে না!"

জয়ন্ত বললে, "না মানিক, মধু নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে, কাল দরোয়ানও তাকে দেখেছে!"

—"দেখেও তারা বলছে, দেখেনি! তবে কি তারা মিথ্যাকথা বলছে?"

—"না।"

—"একি হেঁয়ালি!"

—"তাকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেনি।"

—"কেন?"

—"কারণ সে রোজ সকালে এখানে আসে, আর নীরবে নিজের কাজ সেরে চলে যায়। যেমন গয়লা। রোজ সকালে সে এখানে আসে, কালও নিশ্চয় এসেছিল। কিন্তু মধু বা দারোয়ান তার কথা একবারও উল্লেখ করেনি।"

—"তুমি তাকেই সন্দেহ করছ?"

—"মোটেই নয়।"

—"তবে?"

—"আমার সন্দেহ ঝড়ু ধাঙড়কে। রোজ সকালে একমাত্র সেই-ই দোতালায় উঠে স্নানঘরের ভিতর দিয়ে পাইখানা পরিষ্কার করতে যায়। কাল যখন আমার ঘরের ভিতরে চিঠি আর ঘড়ি-বোমা পেলুম, তখন বেশ বোঝা গেল, শত্রুপক্ষের কেউ না কেউ এখানে এসেছিল। কিন্তু মধু বললে, সে কারুকে দেখেনি। এটা অসম্ভব। অথচ মধু হচ্ছে অনেককালের বিশ্বাসী চাকর, সে মিথ্যা বলবে না। ঘরের মেঝেতে আবিষ্কার করলুম আগন্তুকের ধুলোমাখা সিক্ত পদচিহ্ন, আর তা এসেছে স্নানঘরের ভিতর থেকেই—যেখানে রোজ সকালেই ঝড়ুর আবির্ভাব হয়। তখনই আন্দাজ করলুম মধু ঐ ঝড়ুকে সন্দেহযোগ্য বা উল্লেখযোগ্য জীব বলে মনে করে না। এখন দেখছ তো মানিক, আমার আন্দাজ মিথ্যা নয়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহলে তুমি বলতে চাও, ঐ ঝড়ু-বেটা হচ্ছে বীরেনের দলের লোক?"

—"আগে ছিল না, এখন আমাকে পথ থেকে সরবার জন্যে বীরেন ওকে দলে টেনেছে আর কি! টাকার লোভ দেখিয়ে একটা ধাঙড়কে ভোলাতে কতক্ষণ লাগে!"

—"হুম, তোমার চেয়ারখানার কাছে দাঁড়িয়ে ঝড়ু আজ আবার কি করছিল, সেটাও এইবারে দেখতে হয় তো!" সুন্দরবাবু সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "উঁহু! ঘড়ি বোমা-টোমা কিছুই নজরে ঠেকছে না তো! এক্কেবারে ফোক্কা!"

জয়ন্ত চেয়ারের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর একখানা আতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে চেয়ারের গদী ভালো করে পরীক্ষা করে বললে, "নতুন গদী, কিন্তু এর মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট্ট ফুটো। আশ্চর্য।"

সে একটু ভেবে আবার বললে, "মানিক, আমাকে একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি দাও তো।"

মানিক ছুরি এনে দিলে। জয়ন্ত ফুটোর চারিপাশ থেকে গদীর চামড়ার খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে কাটা অংশটা তুলে নিয়ে বললে, "এইবারে দেখুন সুন্দরবাবু!"

—"কি ওটা? গদীর ভেতরে সোজা ভাবে গাঁথা রয়েছে একটা চক্‌চকে

ইস্পাতের শলাকা।"

—"হ্যাঁ, আমার মারণ-অস্ত্র! আজ এই গদীতে বসলে সেই বসাই হত আমার শেষ-বসা! ও শলাকাটা যে বিষাক্ত, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!"

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, "হুম্ রে বাবা, এবারে আমরা সত্যিই এক নরপিশাচের পাল্লায় পড়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, সামনের ঐ মেসবাড়ির উপরে পাহারা বসানো দরকার।"

—"বলা বাহুল্য ভায়া, বলা বাহুল্য! ঐ বাড়িখানার উপরে পাহারা দিচ্ছে দুই দিক থেকে দু'জন লোক। মেসের মালিককে দস্তুরমতো ধমক দিয়ে বলে এসেছি, যদি সে বাঁচাতে চায়, বীরেনের আবির্ভাব হলেই যেন আমাকে খবর দিতে দেরি না করে!"

—"বীরেন নির্বোধ নয়, আপাতত এ পাড়া মাড়াবে বলে মনে হয় না। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এখানে থেকে আমাদের খবরাখবর নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে দিয়ে আসছে, আর সে দূরে নিরাপদে বসে আমাদের চারিদিক ঘিরে জালের পর জাল ফেলছে।"

সুন্দরবাবু দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, "একবার যদি শয়তানের নতুন আড্ডার সন্ধান পাই!"

জয়ন্ত বললে, "নবীন ফিরে এলে হয়তো একটা কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা সুন্দরবাবু! আপনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুরে বীরেনের একখানা ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে।"

—"হ্যাঁ, পাওয়া গেছে তো!"

—"সেখানা একবার দেখব!"

—"আর ধেৎ, নিতান্ত বাজে ডায়েরি, একটাও কাজের কথা নেই!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "কি যে কাজের আর কি যে বাজে, তা বলা সহজ নয়। দেখলেন তো, ঝড়ুকে আমাদের মধু এতটা বাজে লোক ভেবেছিল যে, তার কথা মনের কোণেও ঠাঁই দেয়নি। এ-রকম ভ্রম যে স্বাভাবিক, যথাসময়ে তা ধরতে পেরেছিলুম বলেই এখনো আমি সশরীরে বাহাল-তবিয়তে বিদ্যমান আছি। সুতরাং ঐ নিতান্ত বাজে ডায়েরিখানা দয়া করে একবার যদি আমার দৃষ্টিগোচর করেন তাহলে নিরতিশয় বাধিত হব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। এদিকে কথায় কথায় বেলা গেল, এখনো 'ব্রেক্‌ফাস্টে'র দেখা নেই কেন? মধু কি ঠাউরেছে, আমরাও ঝড়ুর মতন বাজে লোক?"

মানিক চেঁচিয়ে হাঁক দিলে, "ওহে মধু, সুন্দরবাবু বাজে লোক নন, জল্‌দি তাঁর জন্যে চা-টা নিয়ে এস।"

চায়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই নবীনের পুনরাবির্ভাব।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "কি খবর?"

নবীন বললে, "স্যার, আপনারা কি আমাকে একটা ধাঙড়ের পিছু নিতে

বলেছিলেন? ধাঙড়টা এখান থেকে রাস্তায় গিয়ে এ-বাড়িতে ঢোকে, ও-বাড়িতে ঢোকে, তারপর আবার ময়লা নিয়ে বেরিয়ে আসে। এমনি সাত-আটখানা বাড়ির কাজ সেরে মাইলখানেক পথ পার হয়ে সে আবার আর একখানা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রায় চল্লিশ মিনিট সেইখানে কাটিয়ে সে ফের বেরিয়ে এল। তারপর ফিরে গেল ধাঙড়দের আস্তানায়।"

জয়ন্ত বললে, "শেষ যে বাড়িতে সে ঢুকেছিল তার ঠিকানা কি?"

—"চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীট।"

—"সুন্দরবাবু, আমাদের দরকার ঐ বাড়িখানাই।—পালের গোদা বোধ হয় ঐখানে গিয়েই নূতন বাসা বেঁধেছে।"

—"ডিউটি ইজ্ ডিউটি! ভেবেছিলুম আরো দু-এক পেয়ালা চা আর আরো খান-দুয়েক ওমলেট ওড়াব, কিন্তু সে আশায় পড়ল ছাই! চট্‌পট্ একখানা 'সার্চ-ওয়ারেন্ট' বার করে বীরেনের নতুন বাসায় গিয়ে হাজির হতে হবে। ডিউটি ইজ্ ডিউটি!" বলতে বলতে সুন্দরবাবু চেয়ারের উপর থেকে অঙ্গভার উত্তোলন করলেন।

সাত

ললিতা দেবী

পরের দিন সকালবেলায় সুন্দরবাবু এসে হাজির, তাঁর দেহে ও মুখে হতাশার ভাব।

মানিক বললে, "ব্যাপার কি সুন্দরবাবু, আপনাকে ভগ্নদূতের মতো দেখাচ্ছে যে!"

—"আমি প্রায় ভগ্নদূতই বটে! বহন করে এনেছি পরাজয়ের বার্তা।"

জয়ন্ত বললে, "আপনি কাল বৈকালে চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীট সার্চ করতে গিয়েছিলেন না?"

—"হুম্!"

—"কি হল?"

—"পর্বতের মূষিক-প্রসব!"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, ঐ রাস্তায় ঐ ঠিকানায় বীরেন্দ্রলাল বলে কেউ থাকে না।"

—"তবে কে থাকে?"

—"ললিতা দেবী নামে একটি মহিলা, তাঁর স্বামী এখন আমেরিকায়।"

—"বাড়িতে আর কোন লোক নেই?"

—"আছে। পাচক, বেয়ারা, দাসী। ললিতা দেবীকে দেখে যা বুঝলুম, একেবারে

'আপ-টু-ডেট' মেয়ে। নিজের ভার নিজেই নিতে পারেন।"

—"বাড়িখানা সার্চ করেছিলেন তো?"

—"নিশ্চয়ই! সন্দেহজনক মানুষ বা জিনিস কিছুই পাইনি।"

—"ললিতা দেবীর বর্ণনা দিন।"

—"মাথায় বেশ লম্বা। ছিপছিপে, কিন্তু সুগঠিত দেহ। রং ধব্‌ধবে ফর্সা। বিলাতী কেতায় খাটো করে ছাঁটা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে। একেলে মেয়েদের মতো রঙ-পাউডার মাখা মুখ। ভুরু দুটি খুব সূক্ষ্ম দেখাবার জন্যে বোধ হয় ক্ষুরের আশ্রয় নেওয়া হয়। ডাগর চোখে ফ্রেমহীন চশমা, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট, ডান গালের উপরে একটি বড় কালো আঁচিল আছে। সাজপোশাক অত্যন্ত সৌখীন। পায়ে শ্লিপার। বয়স সাতাশ-আটাশ। ভারিক্কে চালচলন।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দার মতো ললিতা দেবীর বিশেযত্ব আপনি বেশ লক্ষ্য করেছেন দেখছি।"

—"লক্ষ্য করব না? লক্ষ্য করাই যে আমাদের পেশা! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত লক্ষ্য করাও ব্যর্থ হল। ললিতা দেবী আমাদের কোন কাজে লাগবেন না।"

জয়ন্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, "হয়তো লাগবেন না, হয়তো লাগবেন।"

—"এ কথা কেন বলছ?"

সে কথার জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, "আমার বাড়িতে ঝড়ুর আসবার সময় উৎরে গিয়েছে। ঝড়ু আজ কাজে কামাই করলে কেন?"

—"তবে কি সে বুঝতে পেরেছে, আমরা তার স্বরূপ ধরে ফেলেছি?"

—"তা ছাড়া আর কি?"

—"কেমন করে বুঝতে পারলে?"

—"সুন্দরবাবু, আপনি কি ললিতা দেবীকে ঝড়ু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

—"পাগল! আমি ও-ধারও মাড়াইনি। ঝড়ুকে যে চিনি তার আঁচটুকু পর্যন্ত দিইনি!"

জয়ন্ত ভাবতে লাগল গম্ভীর মুখে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, "ঝড়ু কেমন করে জানলে, পুলিশ তার পিছু নিয়েছে?...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা সে জানতে পেরেছে, নইলে আজ এল না কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আপাতত ও-সমস্যা নিয়ে তুমিই থাকো, আমি এখন গা তুললুম।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার হাতে কাগজে-মোড়া ওটা কি?"

—"বীরেনের ফোটো। কাগজে ছাপাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।"

—"দেখি একবার।"

ফোটোখানা নিয়ে জয়ন্ত খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। কেবল খালি চোখে দেখে খুশি হল না, আতসী কাঁচেরও সাহায্য গ্রহণ করলে। তার দৃষ্টি কেবল তীক্ষ্ণ

নয়, কঠিন হয়ে উঠল।

সুন্দরবাবু বললেন, "অতক্ষণ ধরে তুমি কি দেখছ হে?"

—"কিছু না।" ফোটোখানা সে আবার ফিরিয়ে দিলে।

মধু প্রবেশ করে বললে, "নবীনবাবু সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাকে আসতে বল। জয়ন্ত, আমি এখনো হাল ছাড়িনি, নবীন এখনো ললিতা দেবীর বাড়ির উপরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু সে পাহারা ছেড়ে এখানে এল কেন?"

নবীনের আগমন।

—"কি ব্যাপারে হে?"

—"সেই ঝড়ু ধাঙড়টা আজ আবার চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীটে গিয়েছিল। একঘণ্টা পরে বেরিয়ে এসে আবার নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "শুনলেন তো সুন্দরবাবু? ঝড়ু এখানে এল না, কিন্তু ললিতা দেবীর বাড়িতে যেতে ভোলেনি! আর একঘণ্টা ধরে সেখানে সে কি করছিল?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঝড়ু যে দু-দিন তোমার বাড়িতে সাংঘাতিক জিনিস রেখে গিয়েছে, এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। ভাবছি আজই তাকে গ্রেপ্তার করব।"

—"তাই করুন।"

বৈকালে গোটাকয় জিনিস কেনবার জন্যে মোটরে চড়ে জয়ন্ত ও মানিক চলল হগ্ মার্কেটের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছিল জয়ন্ত নিজে। মানিক আসন গ্রহণ করেছে তার পাশেই।

কথা কইতে কইতে গাড়ি চালাচ্ছে জয়ন্ত। মানিক কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা জয়ন্ত, মৃত মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় যে ছেঁড়া চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তুমি তার ভিতর থেকে কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছ কি?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু! ছেঁড়া অংশের মধ্যে কথা ছিল এত অল্প যে, অর্থ করতে গেলেই সব খাপছাড়া বলে মনে হয়। কেবল তার একটি শব্দই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

—"শব্দটি কি?"

—"ময়ূর। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যেন, এই 'ময়ূর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কোন বিশেষ কারণেই।...আরে আরে, কি বিপদ!" সে চট্ করে 'ব্রেক' কষে থামিয়ে ফেললে গাড়ি!

একটি তরুণী মহিলা অন্যমনস্ক হয়ে পথ পার হতে গিয়ে গাড়ির সামনে এসে পড়েই নিজেকে সামলে নিতে গেলেন—কিন্তু পর-মুহূর্তেই পা মচ্‌কে লুটিয়ে পড়লেন রাজপথের উপরে! চারিদিক থেকে লোকজনরা হাঁ-হাঁ করে উঠল, কিন্তু জয়ন্তের গাড়ি তখন নিশ্চল।

মহিলাটি তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—"উঃ!" বলে আর্তনাদ করে আবার পথের উপরেই শুয়ে পড়লেন।

গাড়ি ছেড়ে টপাটপ্ লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত ও মানিক। বিনাবাক্যব্যয়ে দুই বন্ধুই

পাঁজাকোলা করে মহিলাটির দেহ পথ থেকে তুলে স্থাপন করলে গাড়ির ভিতরে। তারপর নিজেরাও যথাস্থানে গিয়ে বসে আবার গাড়ি চালিয়ে দিলে। রাজপথে সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকে যারা ভিড় সৃষ্টি করে মজা দেখবার জন্যে, তারা দস্তুরমতো নিরাশ হয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত মোটরখানার দিকে।

জয়ন্ত ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাকে কোন্ ঠিকানায় পৌঁছে দেব?"

মহিলাটি আধ-শোয়া অবস্থায় যাতনা-বিকৃত মুখে দুই চক্ষু মুদেছিলেন। প্রশ্ন শুনে চোখ একটু খুলে ক্ষীণস্বরে বললেন, "বারো নম্বর মদনলাল স্ট্রীটে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি যথাস্থানে গিয়ে হাজির। মানিক গাড়ি থেকে নেমে বারো নম্বর বাড়ির কড়া নাড়তেই একজন দাসী এসে দরজা খুলে দিলে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দেব?"

মহিলা বললেন, "আমি নিজে হাঁটতে পারছি না। আমার স্বামী নিশ্চয়ই এখনো আপিস থেকে ফেরেননি। আপনারা যখন এতটাই করলেন, তখন কি আমাকে দয়া করে বাড়ির উপর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবেন না?"

—"বেশ।"

জয়ন্ত ও মানিক আবার ধরাধরি করে মহিলাটিকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একতালা, দোতালা, তেতালা। তরুণীর নির্দেশমতো তারা তাঁকে একখানি ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে।

মহিলাটি একখানি সোফার উপরে এলিয়ে পড়ে শ্রান্ত স্বরে বললেন, "আপনাদের ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে। আমার স্বামীর ফিরতে আর দেরি নেই। যতক্ষণ না তিনি আসেন, আপনারা এখানে অপেক্ষা করলে বড় ভালো হয়।"

জয়ন্ত নাচারের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মহিলাটি বললেন, "মোক্ষদা, এঁদের পশ্চিমের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে আয়।"

জয়ন্ত ও মানিক দাসীর সঙ্গে সঙ্গে একখানা ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর দাসী বেরিয়ে এল এবং পর-মুহূর্তেই ঘরের দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে কে হাহা হাহা করে হেসে উঠে বললে, "জয়ন্ত, ভগবানের নাম স্মরণ কর, আজ তোর অন্তিমকাল উপস্থিত!"

আট

তারের 'কয়েল'

জয়ন্ত চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "মানিক, ভদ্রতা করতে গিয়ে ফাঁদে পা দিলুম নাকি?"

মানিক নীরস কণ্ঠে বললে, "সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি! এটা কঠোর বিংশ শতাব্দী,

'শিভাল্‌রি'র যুগ আর নেই।"

—"তাই তো দেখছি হে! তাহলে কি ঐ মেয়েটার মোটরের সামনে এসে দাঁড়ানো, পা মুচকে পথের উপরে পড়ে যাওয়া, যন্ত্রণায় ছটফট করা, সবই মিথ্যা অভিনয়?"

মানিক বললে, "হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর অভিনয়—যা দেখে আমাদের মতো লোককেও বোকা বনতে হয়েছে।"

—"নিশ্চয় ঐ স্ত্রীলোকটা বীরেনদেরই সমিতির কেউ। বীরেন দেখছি নূতন পদ্ধতি ধরেছে। মেয়েদের লোকে সহজে সন্দেহ করে না বলে তাদেরই সে নিযুক্ত করেছে নিজের পাপকার্যে। এখন উপায়? দরজা ধরে টানাটানি করে লাভ নেই, বাহির থেকে শিকল তুলে দেওয়ার শব্দ আমি শুনেছি।"

যেদিকে দরজা সেই দিকেই ছিল একটা জানলা। জয়ন্ত জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের শব্দ! একটা বুলেট এসে খটাং করে লাগল জানলার লোহার গরাদের উপরে! গরাদেটা না থাকলে বুলেটটা যে জয়ন্তের বক্ষ ভেদ করত তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!

ক্ষিপ্র হস্তে জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখছি পয়লা নম্বরের নরহন্তার পাল্লায় এসে পড়েছি। নরহত্যা করতে একটুও ইতস্তত করে না!"

বাহির থেকে কে চিৎকার করে বললে, "জয়ন্ত, তিন-তিনবার চেষ্টার পর হাতের মুঠোয় তোকে পেয়েছি! এবারে তোর প্রাণপাখি মুক্তি পাবে, আর তোর মৃতদেহটা পড়ে থাকবে ঘরের মেঝের উপরে।"

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজার খিলটা লাগিয়ে দিলে।

—"দরজায় খিল তুলে দিচ্ছিস্? খিল তুলে দিয়ে বাঁচবি ভাবছিস্? দাঁড়া, আগে আমাদের দলবল এসে পড়ুক, তারপর তোর কি দশা করি দেখবি!"

জয়ন্ত শুধোলে, "কে তুমি?"

—"সে কথায় তোর কাজ কি?"

—"তুমি কি তারাপদ?"

—"ধর্ তাই!"

—"তাহলে তোমার আর একটা নাম আমি জানি।"

—"আমার আর কোন নাম নেই।"

—"আছে হে বাপু, আছে।"

—"শুনি, বল্ তো!"

—"বীরেন্দ্রলাল।"

সচকিত কণ্ঠে সে বললে, "কি বল্‌লি?"

—"বীরেন্দ্রলাল। জালিয়াত বীরেন্দ্রলাল, সে মুকুন্দবাবুকে হত্যা করে এখনো ধরা পড়েনি।"

মিনিট খানেকের স্তব্ধতা। তারপর সগর্জনে শোনা গেল, "না, না, না! বীরেন্দ্রলালকে আমি চিনি না!"

—"তাহলে তুমি তারাপদ তো?"

—"হতেও পারি, না হতেও পারি!"

—"তুমি যদি তারাপদ না হও, তাহলে তুমি বীরেন্দ্রলাল না হয়ে যাও না।"

—"না, আমি বীরেন্দ্রলাল হতে চাই না।"

—"কেন, ফাঁসি যাবার ভয়ে?"

—"আমি যাব ফাঁসি!"

—"তোমার জন্যে ফ্াঁসির দড়ি তৈরি হয়েই আছে।"

—"বটে! সে দড়ি আমার গলায় পরাবে কে?"

—"আমি।"

—"তুই! তোর প্রাণবায়ু তো একটু পরেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে রে!"

—"আমার প্রাণবায়ু যে আজ দেহের ভিতর থেকে বহির্গত হবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি।"

—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

—"হ্যাঁ, দেখা যাবে। আমরাও নিরস্ত্র নই।"

—"আমাদের দলে কত লোক আছে জানিস্?"

—"জানতে চাই না। ভেড়ারা দলে ভারি হলেও বাঘ কোনদিন ভয় পায় না।"

—"ভেড়া? আমরা ভেড়া?"

—"হুঁ। মেড়াকান্ত।"

দরজার বাহির থেকে আর সাড়া এল না।

বিপদের গুরুত্ব যত বাড়ে, জয়ন্তের ভাবভঙ্গি হয় ততই প্রশান্ত। তার মস্তিষ্ক তখন কাজ করে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। তখন সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনেও গিয়ে দাঁড়াতে পারে একান্ত অকুতোভয়ে।

জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একবার বুলিয়ে নিলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোশ, তার উপরে মাদুর পাতা। একদিকে একটা কাঠের আলমারি আর একদিকে একটা লোহার সিন্দুক। জয়ন্ত হেঁট হয়ে একবার তক্তাপোশের তলায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সেই অবস্থায় রইল প্রায় অর্ধ মিনিটকাল। তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তার মুখের উপরে ফুটে উঠল নিশ্চিন্ত হাসির রেখা!

এমন সংকটকালেও বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে মানিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অসময়ে হাসবার চেষ্টা কেন?"

—"বলছি। আপাতত দুজনে মিলে ঐ লোহার সিন্দুকটা টেনে এনে দরজার গায়ে ঠেলে রাখি এস।"

সিন্দুকটা বেশ ভারি। কিন্তু প্রায় অতুলনীয় বলবান্ বলে জয়ন্তের ছিল বিশেষ খ্যাতি। তার সমকক্ষ না হোক্, দৈহিক শক্তিতে মানিকও ছিল অসামান্য। সুতরাং সিন্দুকটাকে দরজার কাছে টেনে আনবার জন্যে তাদের খুব বেগ পেতে হল না।

মেঝের উপরে ভারি সিন্দুক টানার শব্দ শুনে বাহির থেকে তারাপদ চেঁচিয়ে

বললে, "ঘরের ভিতরে ও-সব হচ্ছে কি?"

জয়ন্ত বললে, "বিশেষ কিছুই নয়। লোহার সিন্দুকটা দরজার গায়ে ঠেসিয়ে রাখছি।"

—"বটে, বটে!"

—"হুঁ, হুঁ! খিল ভাঙলেও দরজা খোলা সহজ হবে না। তার উপরে সিন্দুকের আড়ালে আমরা দু'জনে হুমড়ি খেয়ে বসে থাকব দুটো 'অটোমেটিক রিভলভার' নিয়ে। ঘরের ভিতরে তোমরা একে একে প্রবেশ করবে একে একে শমন ভবনে গমন করবার জন্যে। বুঝলে মেড়াকান্ত?"

কেউ আর উচ্চবাচ্য করলে না।

মিথ্যাকথা বললে জয়ন্ত। তাদের কাছে রিভলভার তো দূরের কথা, একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি পর্যন্ত ছিল না।

তারপর জয়ন্ত তক্তাপোশের তলায় ঢুকে যা বার করে আনল তা হচ্ছে একরাশ ইলেকট্রিক তারের খুব মোটা একটা 'কয়েল' (coil)!

মানিক বললে, "এ আবার কি?"

—"দেখতেই তো পাচ্ছ বন্ধু! এ হচ্ছে আমাদের জন্যে ঈশ্বরদত্ত উপহার! আমরা তো সাধু-ঋষিদের আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিনি, হয়তো এদের কারা কবে কোন ইলেকট্রিক জিনিসের দোকানে অসাধু উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিল, এই তারের কুণ্ডলীটি হচ্ছে তারই স্মৃতিচিহ্ন! কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই, এটি যে যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হল, এই কথাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা!"

মানিক দ্বিধাভরে বললে, "কিন্তু এ জিনিস নিয়ে এখন আমাদের কি উপকার হবে?"

জয়ন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বললে, "মানিক, দিনে দিনে তুমিও যেন সুন্দরবাবুর মতো ভোঁতা হয়ে যাচ্ছ। এই কুণ্ডলীতে যে তার আছে তা এত মজবুত যে অনায়াসে মানুষের ভার বহন করতে পারে। আমি সাবধানতার খাতিরে তিন বা চার গাছা তারকেই একসঙ্গে একগাছা অবলম্বন-রজ্জুর মতন ব্যবহার করতে চাই। তারপর যা করতে হবে, তোমাকে নিশ্চয় বলতে হবে না।"

এই সহজ কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেনি বলে মানিক লজ্জিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ওদিকে দরজার বাইরে শোনা গেল অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। বীরেনের দলবল এসে পড়েছে!

ঘরের অন্য দিকে পাশাপাশি তিনটে জানলা। জয়ন্ত দ্রুতপদে মাঝের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, জানলার পরেই রয়েছে একটা গলি, তারপর একটা মাটকোঠা, তারপর একটা ছোট মাঠ। সেদিকটায় কোন মানুষ আছে বলে মনে হল না।

জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, "মানিক, পালাবার পথ খোলা! জানলার একগাছা

লোহার গরাদে খুলতে বেশি গায়ের জোর দরকার হবে না। এখন চট্‌পট্ এস দেখি, দু'জনে মিলে কুণ্ডলীর তার নিয়ে অবলম্বন-রজ্জু তৈরি করে ফেলি।"

বাহির থেকে দ্বারে করাঘাত করে তারাপদ বা বীরেন্দ্রলাল আবার বললে, "তোরা খিল খুল্‌বি, না আমরা দরজা ভাঙব?"

কুণ্ডলীর তার খুলতে খুলতে জয়ন্ত বললে, "তোমরাই দরজা ভাঙো। মনে রেখ, দু-দুটো অটোমেটিক রিভলভার তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।"

বাহিরে আবার স্তব্ধতা।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, "মানিক, ওরা হচ্ছে কাপুরুষ। সহজে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে ভরসা পাবে না। ততক্ষণে আমরা কাজ হাসিল করতে পারব।"

নয়

দ্বিতীয় হত্যা

টেলিফোনের কাছে গিয়ে সুন্দরবাবুকে ডাকতেই তিনি বলে উঠলেন, "এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে হে জয়ন্ত? তোমার বাড়িতে গিয়েও দেখা পাইনি, তারপর 'ফোন' করেও সাড়া পাইনি।"

—"খালি আজ কেন সুন্দরবাবু, আর কোনদিনই হয়তো আমাদের দেখা বা সাড়া পেতেন না। কারণ, এক মায়াবিনী আমাদের ধোঁকা দিয়ে শত্রু-শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছিল। আমাদের পরলোকে পাঠাবারও চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সে চেষ্টা সফল হয়নি। বিস্তৃত বিবরণ পরে বলব, কিন্তু আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?"

—"আজ সকালে তোমাদের ওখান থেকে এসেই আবার এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের খবর পেলুম। মামলাটা অবশ্য আমার ঘাড়ে পড়েনি, কিন্তু মুকুন্দবাবুর হত্যার সঙ্গে যেন এ ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।"

—"সন্দেহের কারণ?"

—"এবার যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে হচ্ছে মুকুন্দবাবুর বড় ছেলে সনৎকুমার।"

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "মুকুন্দবাবুর ছোট ছেলে অশোককুমার কোথায়?"

—"তারা দুই ভাই একসঙ্গে একটা হোটেলে থাকত, কিন্তু সনৎকুমারের মৃত্যুর পর অশোকের আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না!"

—"এসব ব্যাপার নিয়ে ফোনে আলোচনা করার সুবিধে হয় না। আপনি অবিলম্বে আমার এখানে চলে আসুন।"

—"যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি!"

—"আর আসবার সময় বীরেনের ডায়েরিখানা আনতে ভুলবেম না।"

—"ডায়েরি, ডায়েরি, ডায়েরি! তোমাকে আচ্ছা ডায়েরি-রোগ পেয়ে বসেছে যা-হোক্! বেশ, ডায়েরিখানা নিয়ে যেতে ভুলব না! হুম্!"

মিনিট-পঁচিশের মধ্যেই সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। ঘরে ঢুকেই তিনি বলে উঠলেন, "কোন্ মায়াবিনী তোমাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হে?"

জয়ন্ত বললে, "আমার কাহিনী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। আগে এই নতুন হত্যাকাণ্ডের কথা ভালো করে শুনতে চাই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "মুকুন্দবাবু খুনীর হাতে মারা পড়বার পর সনৎ আর অশোক দুই ভাই দক্ষিণ কলকাতার 'সুইট হোম' নামে এক হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দু'খানা ঘরে ছদ্মনামে তারা বাস করত।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তারাই যে সনৎ আর অশোক, এটা কেমন করে জানা গিয়েছে?"

—"সনতের মৃত্যুর পর ঘটনাস্থলেই তার ডায়েরি পাওয়া যায়। ডায়েরির শেষের দিকে সন্দেহজনক কতকগুলো কথা ছিল, তাও আমি টুকে এনেছি। শোনো।"

পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সুন্দরবাবু পাঠ করলেন ঃ

"এই ময়ূরের জন্যই বাবাকে সিঙ্গাপুর থেকে পালিয়ে আসতে হয়। এই ময়ূরের জন্যই বাবাকে প্রাণ হারাতে হয়। এই ময়ূর নিয়ে আমরাও এখন অজ্ঞাতবাস করছি। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না। এই ময়ূরের সার্থকতা কি, মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হয়। বাবার আদেশে প্রাণপণে একে রক্ষা করব বটে, কিন্তু এই অভিশপ্ত আর মারাত্মক ময়ূর নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "অবশেষে একটা মূল্যবান সূত্র পাওয়া গেল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই ময়ূরের লোভেই মুকুন্দবাবুর বাড়িতে হয়েছিল হত্যাকারীর আগমন। মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় যে চিঠির টুক্‌রো পাওয়া গিয়েছে, তাতেও ময়ূরের উল্লেখ আছে, এটা আপনি ভোলেননি বোধহয়?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কথায় এখন মনে পড়ছে বটে! কিন্তু ময়ূর নিয়ে এত হানাহানি কেন বাবা? ময়ূরটা মণি-মুক্তা দিয়ে তৈরি নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "সনতের ডায়েরির কথাগুলো পড়লে তা মনে হয় না। ময়ূরটার সার্থকতা সে বুঝতে পারেনি। ওটা মণি-মুক্তা দিয়ে তৈরি হলে নিশ্চয়ই সে জানতে পারত।"

মানিক বললে, "বীরেন্দ্র যদি মুকুন্দবাবুর হত্যাকারী হয়, আর ময়ূরের লোভেই সে যদি খুন করে থাকে, তাহলে ময়ূরটা যে মহামূল্যবান এটা তার নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

—"তোমার অনুমান খুবই সঙ্গত। ময়ূরটা তুচ্ছ হলে মুকুন্দবাবুকে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেও প্রাণ হারাতে হত না। সনৎকেও অকালে মারা পড়তে হয়েছে ঐ

ময়ূরের জন্যই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী এবারে ময়ূরটা হস্তগত করতে পেরেছে কিনা?"

—"সে কথা জানা যায়নি। তবে হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি শোনো। 'সুইট হোম'-এ আরো অনেক লোক বাস করত। কাল রাত আড়াইটের সময় হঠাৎ ভীষণ আর্তনাদ হয়—'খুন! খুন! বাঁচাও! রক্ষা কর!' সেই চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। চিৎকারটা আসছিল সনৎদের ঘরের ভিতর থেকে। সকলে ছুটে গিয়ে দেখে সনতের ঘরের দরজা বন্ধ, আর ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে বিষম হুটোপুটির শব্দ! তারপরই এক ভয়াবহ চিৎকার, তারপর সব চুপচাপ। সকলে মিলে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে, মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে সনতের রক্তাক্ত মৃতদেহ, কিন্তু ঘরের ভিতরে আর কেউ নেই। সেখান থেকে পাশের ঘরে যাবার জন্য একটা দরজা ছিল—অশোকের নিজের ঘরে। সে ঘরেও বাইরে বেরুবার জন্য আর একটা দরজা ছিল, আর সেটা ছিল খোলা। ঘরে অশোককে দেখতে না পেয়ে সকলে প্রথমে তাকেই সন্দেহ করে। কিন্তু তারপর দেখা যায়, সনতের ঘরের একটা জানলার একটা গরাদে খোলা। ঘরের মেঝের রক্তের ওপরেও তিনজন অজ্ঞাত লোকের পায়ের ছাপ আছে, আর সেগুলোর সঙ্গে অশোকের জুতোর মাপ মেলে না। আমি মোটামুটি এইটুকুই জানি, মামলাটা আমার নয়, তাই এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।"

জয়ন্ত বললে, "আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীদের আবির্ভাবের পরেই অশোক সেই ময়ূরটা নিয়ে বাইরে পালিয়ে যেতে পেরেছে।"

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "দেখ জয়ন্ত, এখন আর একটা কথা স্মরণ হচ্ছে! কথাটা আগে আমি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করিনি।"

—"কথাটা কি?"

—"বীরেনের ডায়েরির এক জায়গায় লেখা আছে ঃ 'ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস'। কিন্তু বাজে গালগল্প ভেবে তার দিকে আমি দৃষ্টি দিইনি।"

জয়ন্ত বিপুল আগ্রহে বলে উঠল, "ডায়েরিখানা এনেছেন তো?"

—"এনেছি। এই নাও।"

ঠিক সেই সময়ে মধু এসে বললে, "পুলিশ থেকে কারা এসে সুন্দরবাবুকে খুঁজছে।"

জয়ন্ত বললে, "তাঁদের এইখানে নিয়ে এস মধু!"

একটু পরেই দু'জন পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে ছন্নছাড়ার মতন দেখতে একটি যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

একজন কর্মচারী বললে, "আপনার থানায় গিয়ে শুনলুম, আপনি এখানে এসেছেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আপনাদের সঙ্গে উনি কে?"

—"এঁর নাম অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।"

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "নিহত মুকুন্দবাবুর ছোট ছেলে?"

—"হ্যাঁ।"

দশ

ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস

জয়ন্ত কৌতূহলী নেত্রে অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলে। বয়সে সে অতি তরুণ, তার আকার মাঝারি, গড়ন ছিপ্‌ছিপে, রং শ্যামল। তার মুখশ্রী সুন্দর, কিন্তু সারা মুখে মাখানো ছিল এমন দারুণ ভয়ার্ত ভাব যে, তার মৌখিক সৌন্দর্যের দিকে মোটেই আকৃষ্ট হয় না দৃষ্টি।

সুন্দরবাবু বললেন, "অশোক, এখন তোমাকেই আমাদের দরকার। কাল রাত্রে তুমি হোটেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কেন?"

—"ভয়ে। পালিয়ে না গেলে আমিও বাঁচতুম না।"

—"আচ্ছা অশোক, তুমি ঐ চেয়ারখানায় বোসো! এখন শোনো। যে রাত্রে তোমার বাবা মারা পড়েন, সেবারেও তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?"

—"একই কারণে। ভয়ে।"

—"ভুল করেছিলে। পুলিশের আশ্রয় নিলে তোমার দাদার জীবন নষ্ট হত না। যাক্ ও-কথা। এখন সব কথা খুলে আমাদের বল দেখি। তোমার বাবার মৃত্যু-দিন থেকে আরম্ভ কর।"

জয়ন্ত বললে, "অশোকবাবু, তার আগে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। কোন ময়ূরের কথা আপনি জানেন কি?"

—"জানি। আমরা যখন সিঙ্গাপুরে থাকতুম, ওখানকার কোন পুরানো জিনিসের দোকান থেকে বাবা একটি ময়ূরের মূর্তি কিনে এনেছিলেন। গোটা নয়, আধখানা—কেবল ময়ূরের সামনের দিকটা। সেটা ভাঙা মূর্তি বললেও চলে।"

—"সেটা কি দিয়ে তৈরি?"

—"আমি তা বলতে পারব না। কিন্তু মূর্তির সেই আধখানাই ছিল অত্যন্ত ভারি—ছয়-সাত সেরের চেয়েও বেশি হতে পারে। তার উপরে মাখানো ছিল কি এক জিনিসের কালো প্রলেপ। কেন জানি না, সেই ভাঙা ময়ূরের মূর্তিটাকে বাবা খুব দামী—এমনকি অমূল্য বলে মনে করতেন। সিঙ্গাপুরের কোন ভদ্রলোক মূর্তিটা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার বাবা বেচতে রাজি হননি। তারপর বাবার নামে সব বেনামা চিঠি আসতে লাগল। সে-সব চিঠির মর্ম কি জানি না, কিন্তু বাবা অতিশয় ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর একরাত্রে বাড়িতে চোরের দল ঢুকে ময়ূরটা চুরি করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বাবা তখন আমাদের দুই ভাইকে

নিয়ে সিঙ্গাপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে যায়। তারপর বাবার মৃত্যুর কয়েক দিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে আবার একখানা ভয়-দেখানো চিঠি আসে। বাবা তখন আমাদের ডেকে বললেন, 'দেখ, এই ময়ূরটা আর আমার ঘরে রাখা নিরাপদ নয়, এটাকে তোমাদের ঘরেই লুকিয়ে রাখো। যদি আমার কোন বিপদ হয়, ময়ূরটা নিয়ে তখনি তোমরা পালিয়ে যেও। এ হচ্ছে বহুমূল্য ময়ূর, এর প্রসাদে ফকিরও হতে পারে আমীর।' তারই দুইদিন পরে বাবা মারা পড়েন।"

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে?"

—"ঠিক বলতে পারব না। বাবার আর্তনাদে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। দাদা তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়েই আবার ফিরে এসে সভয়ে বললেন, 'কারা এসে বাবাকে খুন করে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজছে! ওরা এ ঘরে আসবার আগে শীগগির পালাই চল্, নইলে আমরাও বাঁচব না!' হাতের কাছে যা পেলুম কোনরকমে তাই নিয়ে চুপিচুপি সিঁড়ি দিয়েই নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।"

—"আর সেই ময়ূরটা?"

—"সেটা ছিল দাদার হাতে কাপড় দিয়ে মোড়া।"

—"তারপর?"

—"তারপর আমরা 'সুইট-হোম'-এ এসে উঠি। ওখানে কয়েকদিন নিরাপদে কেটে যায়। তারপর কাল রাত্রে কারা দাদাকেও আক্রমণ করে। আমি ছিলুম পাশের ঘরে, ময়ূরটাও আমার ঘরেই ছিল। দাদার আর্তনাদ শুনেই আমি প্রাণভয়ে পাগলের মতো হয়ে ময়ূরটাকে নিয়ে পালিয়ে আসি।"

—"কোথায় সেই ময়ূর?"

—"শুনুন। কাল শেষ-রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে আজ সারাদিন পথে পথে টো টো করে ঘুরেছি। তারপর ক্ষুধায় আর পরিশ্রমে শরীর যখন নেতিয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ সন্দেহ হল, দু'জন অচেনা লোক আমার পিছু নিয়েছে। আমি যে পথে যাই, তারাও সেই পথ ধরে। আমি আস্তে চললেও তারাও আস্তে চলে, আমি তাড়াতাড়ি চললে তারাও চলে তাড়াতাড়ি। আমি যখন কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে, তারা তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। তারপরই দেখলুম, তাদের সঙ্গে আরো দুজন নতুন লোক এসে যোগ দিয়েছে। আমি আর পারলুম না, যে সাংঘাতিক ময়ূরটার জন্যে এত কাণ্ডকারখানা, সেটাকে রাস্তার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম, তারপর ছুটতে ছুটতে একেবারে থানায় এসে উঠলুম। আমার মুখে সব কথা শুনে এঁরা আমাকে এখানে এনে হাজির করেছেন। আর কিছু আমি জানি না, আর কিছু বলবার শক্তিও আমার নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। বাপ হারালে, ভাই হারালে, শেষটা ময়ূরও হারালে বাপু?"

অশোক বললে, "ময়ূরটাকে ত্যাগ না করলে আমাকে প্রাণ হারাতে হত।"

জয়ন্ত বললে, "আপাতত ও-প্রসঙ্গ থাক্। আমি এখন বীরেনের ডায়েরি থেকে ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস পাঠ করব। আপনারাও শুনুন।"

ডায়েরির কয়েকখানা পাতা উল্টে সে পড়তে লাগল ঃ

"নাদির শা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্যে তোড়জোড় করছিলেন, দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শা তখন তাঁকে ক্ষমা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠিয়ে দেন।

উত্তরে নাদির শাহ বলে পাঠান; 'ক্ষমা? আমার কাছে ক্ষমা নেই! আমি হচ্ছি ভগবানের চাবুক! পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে পৃথিবীতে এসেছি আমি!'

তা অধঃপতিত দিল্লী-সাম্রাজ্যকে রীতিমতো শাস্তি দেবার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপণেই। দিল্লী কেবল রক্ত-সমুদ্রের মধ্যে মগ্নপ্রায় হল না, যুগে যুগে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত সম্রাটরা যে কুবের-বাঞ্ছিত বিপুল সম্পত্তি পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলেন, তার অধিকাংশই হল পার্সী দস্যুর কবলগত। যাকে বলে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাওয়া!

ঐতিহাসিকদের হিসাবে জানা যায়, নাদির শাহ ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন নগদ পনেরো ক্রোর টাকা এবং পঞ্চাশ ক্রোর টাকা মূল্যের জড়োয়ার জিনিস, দামী সাজ-পোশাক ও আসবাব প্রভৃতি।

তারই মধ্যে ছিল সম্রাট সাজাহানের সেই দুটি বিশ্ববিখ্যাত ঐশ্বর্য—কোহিনূর এবং ময়ূর-সিংহাসন।

ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরটি ছিল অতুলনীয় রত্নরাজির দ্বারা খচিত। সে-সব রত্নের মূল্য যে কত, তার সঠিক হিসাব বোধ হয় নেই। সে হচ্ছে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের কথা।

তারপর ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাদির যখন তাঁর শিবির-প্রাসাদে বাস করছিলেন, তখন পারস্যের 'লাল-মাথা' নামে খ্যাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তারই ফলে নাদিরের আফগান সেনাপতি আহম্মদ শা আবদালির সৈন্যদের সঙ্গে 'লাল-মাথা'দের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

সেই গোলমালের সময়ে দুই দলই মৃত নাদিরের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে—কতক যায় 'লাল-মাথা'দের হাতে এবং কতক হয় আফগানীদের হস্তগত। কোহিনূর হীরকটি যে আহম্মদ শা আবদালি পেয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কিন্তু ময়ূর-সিংহাসন সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই জানা যায় যে, লুণ্ঠনকারীদের পাল্লায় পড়ে ললিতকলার অমন দুর্লভ জিনিসটি একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং এক-এক ব্যক্তি নিয়ে গিয়েছিল তার এক-এক অংশ!

জাভিদ খাঁ নামে একজন আফগান সেনানী সিংহাসন থেকে ময়ূরের দেহের উপরার্ধ বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অংশ নিয়ে তিনি আবদালির সঙ্গে কান্দাহারে গিয়ে উপস্থিত হন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে আবদালি যখন লাহোর অধিকার করেন, জাভিদ খাঁও তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। লাহোর থেকে আবদালি দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। তারপর মানপুরের যুদ্ধে তিনি মোগলদের কাছে পরাজিত হন এবং সেই যুদ্ধে জাভিদ খাঁ মারা পড়েন। বিজয়ী মোগল-পক্ষে অনেক রাজপুত সৈন্যও

ছিল, পরাজিত আফগানদের শিবির-লুণ্ঠনের সময়ে জাভিদের ময়ূর তাদেরই একজনের হাতে পড়ে। সে ঐ ময়ূরের মর্যাদা বুঝতে না পেরে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলে। তারপর গত দুই শত বৎসর ধরে ময়ূরটি নানা হাতে ফিরে অবশেষে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের কাছে এসে পড়েছে, যার কাছে তার গুপ্তকথা অজানা নেই।

এই ময়ূর আমার চাই—ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক্! এই রত্নখচিত ময়ূরটি কেবল অমূল্য ও অতুল্য নয়, জগদ্বিখ্যাত বাদশাহ সাজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের প্রধান অংশ বলেও এর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদা রক্ষার জন্যে আধুনিক আমেরিকার খেয়ালী ধনকুবেররা কল্পনাতীত অর্থব্যয় করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। ময়ূরটি পেলেই আমি আমেরিকায় যাত্রা করব এবং তারপর? তার পরের রঙিন স্বপ্ন এখনি দেখবার চেষ্টা করব না—আগে তো ময়ূরটি হস্তগত করি!"

জয়ন্তের পাঠ শেষ হল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, "মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে বীরেন্দ্রলাল জড়িত আছে, এই ডায়েরিই হচ্ছে তার মস্ত প্রমাণ!"

জয়ন্ত ভর্ৎসনার স্বরে বললে, "আর এমন মস্ত প্রমাণও এতদিন আপনি কাজে লাগাতে পারেননি!"

সুন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন লজ্জিত মুখে।

অশোক বললে, "আমি কিন্তু ময়ূরের গায়ে কোন রত্নেরই চিহ্ন দেখিনি! হয়তো এক সময়ে ওর উপরে মণি-মুক্তা বসানো ছিল, কিন্তু পরে সে সমস্তই খুলে নেওয়া হয়েছে।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই ময়ূরটি এখনো মহামূল্যবান! নইলে বীরেনের মতন চতুর লোক তাকে হস্তগত করবার জন্যে এমন হত্যার পর হত্যা করত না! শেষ পর্যন্ত সেইই যে ময়ূরের অধিকারী হয়েছে তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে বললেন, "কিন্তু বীরেন এখন কোথায়?"

জয়ন্ত বললে, "সে এখন আমেরিকায় পিটটান দেবার জন্যে আয়োজন করছে।"

—"কিন্তু কোথায় বসে আয়োজন করছে? আজ যেখানে গিয়ে তোমরা বিপদে পড়েছিলে, সেখানে গিয়ে একবার সন্ধান নিয়ে আসব নাকি?"

—"পাগল! গিয়ে দেখবেন পাখি নেই, খাঁচা খালি।"

—"হুম্! তাহলে তো দেখছি আমরা যে অতলে ছিলুম, সেই অতলেই আছি!"

জয়ন্ত হেসে উঠে বললে, "একেবারে হাল ছাড়বেন না সুন্দরবাবু! বীরেনের ফোটোখানা আপনার কাছে আছে তো?"

—"আছে বৈকি!"

—"তাহলে বীরেন তো আছে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যেই!"

—"ঠাট্টা করা হচ্ছে? ছবি আর মানুষ এক?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "না সুন্দরবাবু, ঠাট্টা-তামাশা নয়! এখনি থানায় ফোন করে সেপাইদের আসতে বলুন। আমি আপনাদের বীরেনের কাছে নিয়ে যাব—সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করব ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরও!"

এগারো

নোটে গাছটি মুড়ুলো

জয়ন্ত নিজে গাড়িতে উঠে চালকের আসনে চাকা ধরে বসল।

গাড়ি খানিক দূর অগ্রসর হবার পর সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, বীরেনের ঠিকানা তুমি কোথা থেকে পেলে?"

—"শুনলে আপনি অবাক হবেন।"

—"কেন?"

—"কারণ বীরেনের ঠিকানা জানতে পেরেছি আপনার কাছ থেকেই।"

—"ধেৎ, বাজে ধাপ্পা দিও না। বীরেনের ঠিকানা আমি জানি না।"

—"বেশ, তবে মুখে চাবি দিয়ে বসে থাকুন।"

একটু পরেই সুন্দরবাবু আবার মুখের চাবি না খুলে পারলেন না। বললেন, "তুমি আমাদের এখন বীরেনের বাসাতেই নিয়ে যাচ্ছ তো?"

—"আপাতত আমরা যাচ্ছি চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীটে।"

—"সে তো ললিতা দেবীর বাড়ি!"

—"আগে ললিতা দেবীকেই আমাদের দরকার।"

—"তিনি কি বীরেনকে চেনেন?"

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"তিনিও কি বীরেনের দলভুক্ত?"

—"শিশুর মতো আপনার এত কৌতূহল কেন সুন্দরবাবু?"

আবার সুন্দরবাবুর মুখ বন্ধ। আরো মিনিট কয় পরেই গাড়ি এসে থামল যথাস্থানে।

জয়ন্ত নেমে পড়ে সুন্দরবাবুর সহকারী পুলিশ-কর্মচারীকে ডেকে বললে, "বাড়ির চারিদিকেই যেন কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকে। মানিক, তুমি দরজার কড়া নাড়ো।"

রাত তখন এগারোটা। বাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে বললে, "কাকে চাই?"

জয়ন্ত বললে, "ললিতা দেবীকে।"

—"এত রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব।"

—"সবই সম্ভব বাপু, সবই সম্ভব। সুন্দরবাবু, একে পাহারাওয়ালার জিম্মায় দিন।"

একজন পাহারাওয়ালা এসে লোকটাকে টেনে নিয়ে গেল।

—"সুন্দরবাবু, আগে আগে চলুন। ললিতা দেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন।"

দোতালায় উঠেই দেখা গেল, একটা ঘরের দরজার কাছে একটি সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, ইনিই হচ্ছেন ললিতা দেবী।"

তীক্ষ্ণ চোখে মহিলার মুখের পানে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "নমস্কার ললিতা দেবী!"

—"নমস্কার। এত রাতে আপনারা আমার বাড়িতে কেন?"

—"গুটিকয় জিজ্ঞাস্য আছে।"

—"বেশ, ঘরের ভিতরে এসে বসুন।"

ঘরের ভিতরে গিয়ে সকলে এক-একখানা আসন অধিকার করলে। ললিতা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন।

জয়ন্ত বললে, "ললিতা দেবী, বীরেন্দ্রলাল বলে কোন লোককে আপনি চেনেন কি?"

—"না।"

—"সুন্দরবাবু, সেই ফোটোখানা আমায় দিন তো!...ললিতা দেবী, এই লোকটিকে আপনি কখনো দেখেছেন কি?"

—"না।"

—"বেশ ভালো করে দেখুন। এর আর এক নাম হচ্ছে তারাপদ।"

—"আমি একে জীবনে দেখিনি।"

—"তাই তো, বড়ই দুঃখের কথা, বড়ই দুঃখের কথা। আচ্ছা ললিতা দেবী, ফোটোতে দেখা যাচ্ছে, লোকটির ডান গালের উপরে একটি বড় আঁচিল আছে। এ-রকম আঁচিল কখনো দেখেছেন কি?"

ললিতা দেবী অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "আপনারা কি আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে এখানে এসেছেন? তাহলে আমি চললুম।"

একলাফে প্রস্থানোদ্যত ললিতা দেবীর সামনে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, "কোথা যান? দাঁড়ান! আরে, আবার কাপড়ের ভিতরে হাত দেয় যে!"

সে বজ্র-মুষ্টিতে ললিতার দু'খানা হাতই চেপে ধরে কঠোর স্বরে বললে, "কাপড়ের ভিতরে কি লুকানো আছে? রিভলভার? সুন্দরবাবু, এর কাপড়ের ভিতরে হাত চালিয়ে দেখুন তো! ইতস্তত করছেন কেন? আরে, মশাই, এ স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ! আমি ওর পা দেখেই বুঝতে পেরেছি! চেয়ে দেখুন, ওর দুই পায়ের প্রত্যেক আঙুলেই পুরুষের মতো বড় বড় কড়া! ওর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যম অঙ্গুলির ডগার দিকেও তাকিয়ে দেখুন! ক্রমাগত সিগারেট টেনে ওর আঙুলের ডগা দুটো 'নিকোটিনে'র মহিমায় হল্‌দে হয়ে গিয়েছে! এর নাম ললিতা নয়, বীরেন্দ্রলাল!"

"হুম্!" বলে চিৎকার করে সুন্দরবাবু সহসা-জাগ্রত ব্যাঘ্রের মতো বীরেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার কাপড়ের ভিতর থেকে সত্য-সত্যই পাওয়া গেল একটা রিভলভার! তখনি তার হাতে পরিয়ে দেওয়া হল হাতকড়া।

সুন্দরবাবু মহানন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বললেন ঃ

"বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এবারে বধিব ঘুঘু, তোমার পরাণ!"

জয়ন্ত বললে, "গোড়া থেকেই ললিতার উপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ঝড়ুর মতো ধাঙড়ের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? ঝড়ু আমার বাড়িতে কামাই করলেও তার বাসায় যায়, অনেকক্ষণ থাকে। এটা অস্বাভাবিক। তারপর সুন্দরবাবুর মুখে শুনলুম, ললিতার ডান গালে একটা বড় কালো আঁচিল আছে। তারপর সুন্দরবাবুর কাছেই বীরেনের ফোটো দেখলুম, তারও ডান গালে আছে একটা বড় আঁচিল। আমার সন্দেহ বেড়ে উঠল দস্তুরমতো। কিন্তু এখন একেবারে সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেল!"

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, "হুম্, হুম্, হুম্! একেই বলে বুদ্ধির খেল্! ভেল্‌কি বলাও চলে!"

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে 'ড্রেসিং টেবিলের' উপর থেকে একটা 'ভ্যানিটি ব্যাগ' তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়ই এই 'ভ্যানিটি ব্যাগে'র মালিক তথাকথিত ললিতা দেবী? আরে একি দেখি 'ভ্যানিটি-ব্যাগে'র ভিতরে! এ যে মৃত মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় পাওয়া সেই ছেঁড়া চিঠির বৃহত্তর অংশটা! চিঠির ছোট অংশটা আমার কাছেই আছে।"

দুটো অংশ পাশাপাশি রেখে পুরো পত্রের মর্ম হল এই ঃ

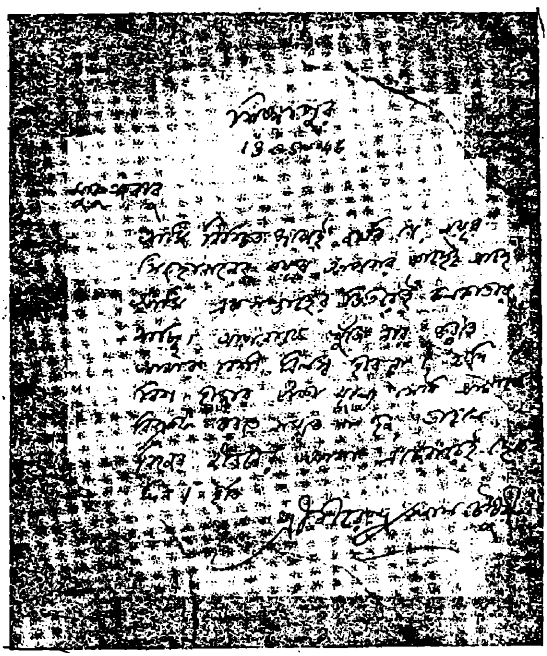

জয়ন্ত বললে, "বীরেন, তোমার বিরুদ্ধে এই সবচেয়ে বড় প্রমাণটা তুমি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলে, কিন্তু তোমার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এখন এই পত্রের মধ্যেই আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড!"

দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে বীরেন বললে, "প্রথম থেকেই বুঝেছি তুমিই আমার প্রধান শত্রু! তাই বার বার তোমাকে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করেছিলুম! কিন্তু বিধি বাম, উপায় কি?"

মানিক বললে, "বাহবা কি বাহবা! বীরেনের কণ্ঠসাধনা ধন্য! এতক্ষণ দিব্যি মেয়ে-গলায় কথা কইছিল, কিন্তু এখন ওর মুখে শুনছি পুরুষের কণ্ঠস্বর!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরটা কোথায়? ডানা মেলে উড়ে পালায়নি তো?"

জয়ন্ত বললে, "উড়ে পালাবার সময় পায়নি। খানাতল্লাস করলেই বেরিয়ে পড়বে।"

জয়ন্তের কথাই সত্য। ময়ূরের ভগ্নদেহটা তল্লাস করে পাওয়া গেল। ঘোর কালো রঙের আধখানা ময়ূর।

জয়ন্ত সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে একখানা ছুরি বার করে ময়ূরের দেহের একটা জায়গা সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চাঁচ্‌তে লাগল। কালো প্রলেপটা বিশেষ কঠিন নয়। ইঞ্চিখানেক প্রলেপ সরিয়েই দেখা গেল, দামী দামী পাথর-বসানো অপূর্ব ও বিচিত্র জড়োয়ার কাজ!

সকলেই চমৎকৃত!

জয়ন্ত বললে, "কৌতূহলী লুব্ধ দৃষ্টি থেকে নিরাপদে রাখবার জন্যে কবে কে যে ময়ূরটির উপরে কালো প্রলেপ ব্যবহার করেছে, তা আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু অশোকবাবু, আপনি ভাগ্যবান্! বাদশাহ সাজাহানের এই ময়ূরটি সত্যসত্যই অতুল্য আর অমূল্য!"

মৃত্যু মল্লার

প্রথম

পৈশাচিক কাণ্ড

সকালবেলা। জানলা-পথ দিয়ে ঘরের মেঝের উপরে এসে পড়েছে কাঁচা রোদের দুটি সোনার রেখা।

প্রতিদিনের মতন সেদিনও মানিক খুব মন দিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজখানা। সকালবেলার খবরের কাগড় পড়বার ভার থাকে মানিকের উপরেই। উল্লেখযোগ্য কোনও খবর থাকলেই সে জয়ন্তকে শোনাবার জন্যে পাঠ করত উচ্চকণ্ঠে।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে চুপ করে বসে ছিল। মধু এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে পড়তে পড়তে জয়ন্ত হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'কী হল গো বন্ধু? অকস্মাৎ সক্রোধে গর্জন কেন?'

জয়ন্ত চিঠিখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে বললে, 'দেশে উচ্চশ্রেণির অপরাধীর অভাব হয়েছে একথা মানি বটে, কিন্তু তা বলে আমার এমন অধঃপতন হয়নি, ভালো মামলার অভাবে টাকার লোভে হারানো কুকুরের উদ্দেশে ছুটোছুটি করব!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না জয়! হারানো কুকুর আবার কী?'

—'এক সুবর্ণগর্দভের—অর্থাৎ মস্ত ধনীর একটা আদরের কুকুর পথে হারিয়ে গিয়েছে। থানায় খবর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, যে এই সারমেয়-অবতারটিকে পুনর্বার আবিষ্কার করতে পারবে, তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সুন্দরবাবু চিঠি লিখে আমাকে এই মামলার ভার গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই অমূল্য উপদেশটিও দিয়েছেন যে, আপাতত আমাদের হাতে যখন ভালো মামলা নেই তখন এই সুযোগটি যেন আমরা ত্যাগ না করি, সুন্দরবাবুর যতই বয়স হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি যেন ততই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে! তিনি কি জানেন না, ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের অর্থের অভাব নেই, গোয়েন্দাগিরি করি আমরা নিতান্ত শখের খাতিরেই, অর্থের লোভে কোনও দিনই আমরা কোনও সারমেয়-অবতারের পশ্চাতে ধাবমান হব না।'

মানিক খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'সুন্দরবাবু ঠিক সুন্দরবাবুর মতোই কথা বলেছেন, ও নিয়ে তোমার মাথা গরম করবার দরকার নেই। ও-কথা ভুলে চুপ করে ওই চেয়ারের উপরে গিয়ে বোসো। আজকের কাগজে একটি শোনবার মতন খবর আছে। আমি পড়ি, তুমি শোনো।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে খুশি হয়ে বললে, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে সুবর্ণগর্দভ আর তার পলাতক কুকুরের কথা চুলোয় যাক, আমি একান্ত মনে তোমারই পাঠ শ্রবণ করব।'

মানিক খবরের কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরে পড়তে লাগল :

'ভীষণ ঘটনা! অলৌকিক কাণ্ড?

বাংলা দেশের সীমারেখায় যেখানে সাঁওতাল পরগনা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে মদনপুর নামে একখানা বড়ো গ্রাম বা ছোটো শহর আছে। সম্প্রতি সেখানে এমন-সব রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোনও হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিয়াছে দিন-পঁচিশ আগে।

বুদ্ধু এক গরিব গৃহস্থ। সে স্থানীয় এক কারখানায় কাজ করিত। তাহার অভ্যাস ছিল গ্রীষ্মকালের রাত্রে খোলা হাওয়ার উঠানে খাটিয়া পাতিয়া শয়ন করা। ঘটনার দিনেও সে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া, রাত্রের আহারের পর অভ্যাসমতো উঠানে গিয়া শয়ন করিয়াছিল।

হঠাৎ মধ্য-রাত্রে বিষম এক শব্দ শুনিয়া বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তারপরই শোনা যায় বুদ্ধুর বিকট আর্তনাদ ও একটা প্রচণ্ড ঝটাপটির শব্দ।

সকলে বাহিরে উঠানের উপরে ছুটিয়া আসে। কিন্তু সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি, কাজেই কেহ বিশেষ কিছুই দেখিতে পায় নাই। কেবল সকলে শুনিতে পাইয়াছিল একটা বন্য ও হিংস্র পশুর মতো কণ্ঠে অবরুদ্ধ গর্জন!

সকলে যখন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন বুদ্ধুর এক ভাই তাড়াতাড়ি একটি লণ্ঠনের আলো জ্বালাইয়া উঠানের উপরে ছুটিয়া আসে।

কিন্তু তখন ঝটাপটির শব্দ এবং সেই বন্য গর্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। লণ্ঠনের আলোকে কেবল দেখা গেল যে বুদ্ধুর মুণ্ডহীন দেহ মাটির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। এবং সেখানে বাহিরের অন্য কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নাই।

অনেক অন্বেষণ করিয়াও বাড়ির ভিতরে বা বাহিরে বুদ্ধুর ছিন্ন মুণ্ড আর পাওয়া যায় নাই।

এটা ব্যাঘ্র বা অন্য-কোনও বন্য পশুর অপকীর্তি বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। কারণ প্রথমত, হত্যাকারী বাড়ির সদর দরজা গায়ের জোরে ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল—সাধারণত ব্যাঘ্র বা অন্য কোনও বন্য পশু যাহা করে না।

দ্বিতীয়, বুদ্ধুর রক্তে সিক্ত মাটির উপরে পাওয়া গিয়াছে মানুষের হস্তের ছাপ ও পদচিহ্ন!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে ওই গ্রামেরই কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িতে। বাড়িখানি দ্বিতল। বাড়ির মালিক ছিলেন উপরতলায় নিজেরই শয়ন-কক্ষে। সেও ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি এবং ঘরের আলোক ছিল নির্বাপিত।

ভয়াবহ আর্তধ্বনিতে মালিকের স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া ত্রস্তকণ্ঠে শুনিতে পান, ঘরের মেঝের উপরে কারা যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। সেই সঙ্গে আরও শোনা যায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হিংস্র গর্জন!

মালিকের স্ত্রী স্বামীকে জাগাইবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে শয্যায় হাত দিয়া দেখেন, তাঁহার স্বামী বিছানার উপরে নাই! তখন তিনিও ব্যাকুল স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠেন এবং বাড়ির অন্যান্য লোকজনরাও ছুটিয়া আসিয়া বাহির হইতে দরজায় করাঘাত করিতে থাকে।

তারপরেই দেখা যায়, অপচ্ছায়ার মতো একটা মনুষ্য-মূর্তি ঘরের জানলার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎগতিতে বাহিরে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা-ক্ষেত্রেও পাওয়া গিয়াছে কেবল মালিকের মুণ্ডহীন দেহ এবং রক্তধারার মধ্যে মানুষের হস্ত ও পদের চিহ্ন!

ঘরের প্রত্যেক জানলায় ছিল লোহার গরাদে। কিন্তু একটা জানলার দুইটি লোহার গরাদে বাহির হইতে কে বা কাহারা একেবারে দুমড়াইয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই গরাদে-দুটিকে পরে বাড়ির বাহিরে রাস্তার উপরে পাওয়া যায়। ব্যাপার দেখিয়া পুলিশের লোকেরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে, কারণ এইভাবে দুই-দুইটি লোহার গরাদে উৎপাটন করা যে-সে শক্তির কাজ নয়।

তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে আরও পাঁচ-ছয় দিন পরে। সুখাই এক মনিহারী দোকানের মালিক। রাত্রে দোকান বন্ধ করিয়া সে ভিতরেই শয়ন করিত।

একদিন সকালে দেখা যায়, সুখাইয়ের দোকান খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, দোকানঘরের মেঝের উপর দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে এবং সুখাইয়ের কোনওই খোঁজ নাই।

এখানেও চাপরক্তের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে হাতের ও পায়ের ছাপ। পুলিশ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাতের ও পায়ের চিহ্নগুলো একই ব্যক্তির।

প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রে হত্যাকারী কেবল ছিন্নমুণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয়বারে সে লইয়া গিয়াছে একটা গোটা মানুষকেই!

মদনপুর এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলির মধ্যে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে। এই তিন-তিনটি নরহত্যার অর্থ কী? হত্যাকারী কোথাও মূল্যবান কোনও দ্রব্য স্পর্শ করে নাই এবং নিহত কোনও ব্যক্তিই ধনবান নয়। পুলিশ তদন্তে হত ব্যক্তিদের কোনও শত্রুরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে সে কেন হত্যা করে, এবং হত্যার পর কেনই বা মৃতের ছিন্ন মুণ্ড বা দেহ লইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়?

তদন্তে আর একটি আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। মুণ্ডহীন মৃতদেহ দুটোর কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের

কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গিয়াছে কেবল ধারালো দাঁতের দাগ। দেখিলেই বোঝা যায়, কোনও হিংস্র জন্তু তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা মুণ্ড দুটিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে! এটাও এক অদ্ভুত রহস্য! ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় কেবল মানুষের হস্ত-পদের চিহ্ন, কিন্তু মানুষ কি কখনও অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া এমনভাবে মুণ্ডকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? এও যদি মানা যায় তাহা হইলেও বলিতে হয়, এ-ভাবে দেহকে মুণ্ডহীন করিতে গেলে মানুষের পক্ষে দরকার হয় যথেষ্ট সময়। কিন্তু প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রে হত্যাকারী সে সময় পায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিয়াছে, দুইবারই হত্যাকারী আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছে মাত্র মিনিট তিন-চারের মধ্যে।

হত্যাকারী যে দানবের মতন মহা বলবান, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। গায়ের জোরে সে সদর দরজা ভাঙিয়াছে, দুটো মোটা লোহার গরাদে দুমড়াইয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে।

কে এই ভয়াবহ হত্যাকারী? স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃঢ়বিশ্বাস, হত্যাকারী মানুষ নয় এবং ঘটনাগুলো হইতেছে ভৌতিক ব্যাপার। কারুর কারুর মতে, মদনপুরে পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে, কারণ পিশাচরাই নররক্ত শোষণ করিতে ভালোবাসে।

স্থানীয় লোকেরা এত ভয় পাইয়াছে যে, সন্ধ্যার পর কেউ আর বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইতে ভরসা করে না। বাড়ির ভিতরে থাকিয়াও নিরাপদ হইবার উপায় নাই, কারণ এই হিংস্র হত্যাকারী দ্বার বা জানলার বাধাও মানে না। প্রত্যেক বাড়ির লোকজনরা তাই একসঙ্গে এক ঘরে বসিয়া প্রায় জাগিয়া জাগিয়াই সারা রাত কাটাইয়া দিতেছে। মদনপুরের জনহীন-পথঘাট নিদ্রিত হইলেও রাত্রে গৃহস্থরা হইয়া থাকে অতি-জাগ্রত।'

মানিকের পাঠ সাঙ্গ হল! জয়ন্ত চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে কেবল বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার বটে!'

মানিক বললে, 'কেবল আশ্চর্য কেন, অলৌকিক ব্যাপারও বলতে পারো।'

—'না। পৃথিবীতে যা ঘটে তাকে আমি অলৌকিক বা অপার্থিব ব্যাপার বলে মনে করি না। ওই ঘটনাগুলো শুনলে মনের ভিতরে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আমার বিশ্বাস উচিতমতো তদন্ত করলে প্রত্যেক প্রশ্নেরই স্বাভাবিক আর সঙ্গত উত্তর পাওয়া যেতে পারে।'

—'পুলিশ কিন্তু তদন্ত করেও সদুত্তর দিতে পারেনি।'

—'পুলিশকে তুমি কি চেনো না মানিক? তার উপরে এক্ষেত্রে আবার তদন্ত করছে মফস্‌সলের পুলিশ!'

—'আমার কিন্তু এখনই মদনপুরে ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে।'

—'আমারও। কিন্তু কেমন করে যাব? রহস্য ভেদ করবার জন্যে কেউ তো আমাদের আহ্বান করেনি।'

—'নাই-বা করলে! আমরা তো অনায়াসেই মদনপুরে বেড়াতে যেতে পারি?'

...'হুঁ, তা পারি বটে! তাহলে যাবার চেষ্টা করব নাকি?'

ঠিক এই সময়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, দিন-কয়েকের জন্যে ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে মদনপুরে বেড়াতে যাবেন?'

—'হুম, রাখো তোমার মদনপুর! এদিকে আমার প্রাণ যায়! ঝুনঝুনওয়ালা মাড়োয়ারি ক্রমাগত 'ফোন' করে আমাকে আর হাঁপ ছাড়তে দিচ্ছে না।'

—'ঝুনঝুনওয়ালা?'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই যার একটা কুকুর হারিয়েছে! কুকুরের শোকে মানুষ যে এমন খেপে যায় তা আমি জানতুম না। জয়ন্ত, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ তো?'

—'চুলোয় যাক আপনার চিঠি, ঝুনঝুনওয়ালা মাড়োয়ারি আর তার পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার! ও-ব্যাপারে আমি নেই। তার চেয়ে বসে পড়ুন! এই খবরের কাগজখানা পড়ুন।'

খবরের কাগজখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু ক্রমেই ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল। পড়া শেষ হলে পর ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, 'ঠিক, ঠিক। আমারও সেই বিশ্বাস!'

—'অর্থাৎ?'

—'মদনপুরে পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। এসব পৈশাচিক কাণ্ড!'

—'এই পিশাচকে বন্দি করতে চান?'

—'পাগল! তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত, আমার এই কাঁচা মাথাটা আমি যেচে গিয়ে পিশাচের হাতে উপহার দান করব?'

—'আমরা আছি, আপনার ভয় কী?'

—'হুম, ভরসাই বা কী বাবা? পিশাচ কি তোমাদেরও মাথার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না?'

—'দৃষ্টিপাত করবার আগেই তার হাতে-পায়ে পড়বে বেড়ি। বাজে কথা রাখুন সুন্দরবাবু, ছুটি নিয়ে চলুন মদনপুরের দিকে। আমরা আপনাকে ছাড়ব না!'

দ্বিতীয়

খুন এবং চুরি

মদনপুরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সুতরাং গ্রাম না বলে একে একটি ছোটো শহর বলা যেতে পারে। এর মধ্যে ছোটো এবং বড়ো বাড়ির সংখ্যাও কম নয়। খান-চারেক প্রকাণ্ড অট্টালিকাও আছে। সব-চেয়ে বড়ো অট্টালিকাখানি হচ্ছে স্থানীয় জমিদারদের। জমিদাররা জাতে বাঙালি নন বটে, কিন্তু তাঁদের সাজগোজ, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার সবই খাঁটি বাঙালির মতোই। জমিদারবাড়ির যিনি কর্তা তাঁর নাম প্রতাপনারায়ণ সিংহ। গেল বছর সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

মদনপুরের পূর্ব দিকে আছে একটি প্রান্তর—এত বড়ো প্রান্তর যে, দেখলে মনে হয় তার বিস্তার দিক্‌চক্রবালরেখা পর্যন্ত। তারই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশাল এক অরণ্য এবং তারই মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো-বড়ো পাহাড়।

মদনপুরের খুব কাছেই প্রান্তরের উপর দিয়ে দুই তীরে শুভ্র বালুকা-শয্যা বিছিয়ে, রোদের আলোতে চিকমিকে হিরার হার বুনতে বুনতে ঝির ঝির বয়ে যাচ্ছে একটি ছোটো নদী। কিন্তু বর্ষাকালে এ নদী আর ছোট্ট থাকে না, তখন দুই ধারের বালুকা-শয্যা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার গতিও হয় অত্যন্ত তুরন্ত ও দুরন্ত।

মদনপুর থেকে প্রায় মাইল-খানেক তফাতে নদীর ধারে প্রান্তরের উপরে ছিল একখানি সরকারি ডাকবাংলো। সুন্দরবাবু ও মানিককে নিয়ে তারই ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করলে জয়ন্ত।

মদনপুরে গিয়ে তারা পৌঁছেছিল খুব ভোরবেলায়। খানিক বিশ্রাম করে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু যে সব আশ্চর্য ঘটনা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি, সেগুলো ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে। সুতরাং আপাতত ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনওই লাভ নেই। কিন্তু এখন আমাদের কী করা উচিত বলুন দেখি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন আমাদের উচিত এখানকার থানায় যাওয়া। খবরের কাগজে যা প্রকাশ পায়নি, পুলিশের মুখ থেকেই আমরা তা জানতে পারব।'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক বলেছেন। চলুন তবে থানার দিকেই।'

থানায় গিয়ে দেখা গেল, ইনস্পেকটার জিতেনবাবু টেবিলের সামনে বসে একমনে একখানা মস্ত বাঁধানো খাতার উপরে করছেন লেখনী চালনা।

আগন্তুকদের দেখে খাতা থেকে মুখ তুলে তিনি ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললেন, 'কে মশাই আপনারা? এখানে কী দরকার?'

সুন্দরবাবু দুই-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।'

জিতেনবাবু আবার খাতার দিকে মুখ নামিয়ে বললেন, 'এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমার নেই।' বলেই তিনি আবার খাতার উপরে লেখনী চালনা করতে উদ্যত হলেন।

সুন্দরবাবু একগাল হেসে অমায়িকভাবে বললেন, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমাদের আছে। অধীনদের সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা কইলে বড়োই অন্যায় হবে কি?'

জিতেনবাবু আবার মুখ তুলে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কে মশাই আপনারা?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আমরা? পরিচয় দিলে কি চিনতে পারবেন? আমাকে সবাই সুন্দরবাবু বলে ডাকে, আমি হচ্ছি কলকাতা-পুলিশের একজন সামান্য ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার। আর এঁরা হচ্ছেন দুটি নবীন শৌখিন গোয়েন্দা। এঁর নাম জয়ন্তবাবু, আর ওঁর নাম মানিকবাবু। আর কিছু পরিচয় জানতে চান কি?'

দেখতে দেখতে জিতেনবাবুর মুখের ভাব গেল বদলে। লেখনী ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত জোড় করে তিনি বললেন, 'আপনাদের সকলেরই নাম আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত! দয়া করে আমার অসভ্যতাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। দেখুন, পুলিশে চাকরি করি, দিন-রাত যত বাজে লোক এসে করে জ্বালাতন। কাজেই মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার জন্যেই লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে হয়। সুন্দরবাবু, জয়ন্তবাবু, মানিকবাবু, অনুগ্রহ করে আপনারা আসন গ্রহণ করুন', বলে তিনি নিজেই এগিয়ে এসে তিনজনের কাছে তিনখানা চেয়ার টেনে এনে স্থাপন করলেন।

সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মানিক আসন গ্রহণ করলে পর জিতেনবাবু হাসতে হাসতে আবার বললেন, 'আপনারা যে কেন এখানে এসেছেন, আমি তা অনুমান করতে পারছি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'পারছেন নাকি?'

—'নিশ্চয়। মদনপুরে যে আশ্চর্য ঘটনাগুলো ঘটেছে, খবরের কাগজে তাই পাঠ করেই আপনারা যে কৌতূহলী হয়ে এখানে ছুটে এসেছেন, সে-বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যখন বুঝিতেই পেরেছেন তখন আমাদের আর-কোনও গৌরচন্দ্রিকা করবার দরকার নেই। কিন্তু জানেন মশাই, আমার কৌতূহল মোটেই প্রবল নয়, আমি এই পৈশাচিক কাণ্ডের

ভিতরে আবির্ভূত হবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। জয়ন্ত আর মানিকই আমাকে জোর করে এখানে টেনে এনেছে। এই দুই ডানপিটে ছোকরার জন্যে শেষটা আমাকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে দেখছি!'

জিতেনবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! আপনারা দয়া করে এখানে এসেছেন বলে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি! আপনাদের কীর্তির কথা কে না জানে? এই রকম এক অদ্ভুত আর জটিল মামলায় আমি যদি আপনাদের সাহায্য পাই, তাহলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করব। আমি তো মশাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, প্রাণপণে তদন্ত করেও কোনওই খেই পাচ্ছি না। সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!'

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, 'সুন্দরবাবু জানেন, এর আগেও আমরা ভৌতিক ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু ভূত সেখানে আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেই রীতিমতো টিট হয়ে গিয়েছিল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! তুমি বুঝি সেই 'মানুষ-পিশাচ' মামলাটার কথা বলছ?'*

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু সে-কথা এখন থাক। জিতেনবাবু, এখানকার মামলার বিবরণ খবরের কাগজে যেটুকু পড়েছি, ইতিমধ্যে আপনি তার চেয়ে বেশি-কিছু অগ্রসর হতে পেরেছেন কি?'

জিতেনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়! এ মামলার ভিতরে ঢোকবার শক্তি কোনও মানুষের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ-এক অসম্ভব মামলা!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'জিতেনবাবু, খবরের কাগজের 'রিপোর্টে' যে-টুকু পড়েছি, তার বেশি আর কিছুই আমি জানি না। হত্যাকারী প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রে মানুষের মুণ্ড নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে সে হত ব্যক্তির সমস্ত দেহটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ কী আপনি বলতে পারেন?'

জিতেনবাবু নাচারের মতন বললেন, 'আমি কিছুই বলতে পারি না। আমি এখন অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, বুঝেছেন মশাই?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার কী মনে হয় জানেন, প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রেই আক্রান্ত দুই ব্যক্তির আর্তনাদ শুনে বাড়ির লোকজনেরা সবাই ছুটে এসেছিল। হত্যাকারী তাই সময়ের অভাবেই হত ব্যক্তিদের গোটা দেহ নিয়ে পালাতে পারেনি, তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়েছিল তাদের মুণ্ড কেটে নিয়েই। কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে সুখাই ছিল একলা তার দোকানঘরে শুয়ে। হত্যাকারীকে কেউ সেখানে বাধা দিতে আসেনি, তাই সে সুখাইয়ের গোটা দেহটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল ঘটনাক্ষেত্র থেকে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এর দ্বারা এমন কী প্রমাণিত হয় জয়ন্ত?'

—'কী প্রমাণিত হয় জানেন? হত্যাকারী ভূত-প্রেত কিছুই নয়, সে হচ্ছে আমাদের মতন মানুষ!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার যুক্তির কোনওই অর্থ বুঝতে পারছি না।'

—'অর্থ খুবই সহজ। আপনারা এই ঘটনাগুলোকে ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নেই। প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রে হত্যাকারী তাড়াতাড়ি কেবল মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে

---

* 'মানুষ-পিশাচ' উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

পালিয়ে গিয়েছিল কেন? সে পালিয়ে গিয়েছিল মানুষদের ভয়েই—কারণ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজনরা সবাই জেগে উঠেছিল। কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে দোকানঘরে সুখাই ছিল একলা! হত্যাকারী তাই কোনও বাধা না পেয়ে সুখাইকে হত্যা করে তার গোটা দেহটাকেও ঘটনাক্ষেত্রে রেখে যায়নি।'

—'হুম! এ থেকে কী বুঝতে হবে?'

—'বুঝতে হবে যে, এই হত্যাকারী অমানুষ বা অলৌকিক নয়। মানুষের আক্রমণকে সে ভয় করে। মানুষ যেখানে বাধা দিতে পারে, সেখানে সে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ হতে চায়। সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, এই মামলার ভিতরে পৈশাচিক বা ভৌতিক কোনও ব্যাপারই নেই।'

জিতেনবাবু বললেন, 'কিন্তু এভাবে দেহ চুরি করে হত্যাকারীর কী লাভ হবে?'

—'সেটা আমিও অনুমান করতে পারছি না। এ এক আশ্চর্য হত্যাকারী। এ খুন করবার পর মূল্যবান কিছুই চুরি করে না, চুরি করতে চায় কেবল লাশটাকেই।'

মানিক বললে, 'এমন উদ্দেশ্যহীন হত্যা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, হত্যাকারী বোধহয় উন্মাদগ্রস্ত।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, 'আমারও মনে এইরকম একটা সন্দেহ জেগেছে। আচ্ছা জিতেনবাবু, হত্যাকারীর হাত-পায়ের ছাপের মাপ আপনি নিয়েছেন তো?'

—'নিয়েছি বই কি! কিন্তু তার পদচিহ্নের ভিতরে একটু নূতনত্ব আছে।'

—'সে আবার কী?'

—'তার পায়ের গড়ন বিকৃত। খুব সম্ভব সে ভালো করে হাঁটতে পারে না।'

—'এটা একটা মূল্যবান তথ্য। ঘটনাস্থলের বাইরে আর কোথাও কি আপনি অপরাধীর পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে পেরেছেন?'

—'না।'

—'মদনপুর ছোটো শহর। এখানে কি আপনি এমন কোনও লোকের খোঁজ নিয়েছেন, যে খুঁড়িয়ে হাঁটে বা যার পায়ের গড়ন বিকৃত?'

—'অনেক খুঁজেছি মশাই, অনেক খুঁজেছি। মদনপুরের ভিতরে যত খোঁড়া আর যত বিকৃত চরণের অধিকারী আছে, সকলকেই পরীক্ষা করে দেখেছি। এমনকি এ-অঞ্চলে অন্যান্য গ্রামেও খোঁজ নিতে ছাড়িনি। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে হত্যাকারীর পায়ের ছাপ মেলে না।'

ঠিক এই সময়ে একটি ভদ্রলোক বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন! তাঁর চোখ মুখ উদ্ভ্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। রুদ্ধশ্বাসে তিনি চিৎকার করে বললেন, 'মশাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!'

জিতেনবাবু বললেন, 'ব্যাপার কী?'

—'গেল রাতে প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে কারা খুন করে গিয়েছে।'

জিতেনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, 'জমিদার প্রতাপনারায়ণবাবু?'

—'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। কেবল খুন নয়, খুনিরা লোহার সিন্দুক খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়না আর নগদ বিশ হাজার টাকাও নিয়ে গিয়েছে!'

—'অ্যাঃ, এবারে আবার খুন আর চুরি একসঙ্গে! লাশ পাওয়া গেছে তো?'

—'না, ঘরময় বইছে রক্তের ঢেউ, প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর দেহ অদৃশ্য! পাওয়া গিয়েছে কেবল জমিদারবাবুর হাতের একটা কাটা আঙুল!'

তৃতীয়

মই

জিতেনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। রায়বাহাদুর প্রতাপনারায়ণ সিংহ বড়ো যে-সে লোক নন। এ অঞ্চলে তাঁর মতন ধনী আর প্রতিপত্তিশালী জমিদার আর দ্বিতীয় নেই। সাধারণ সৎকাজে তিনি টাকাও দান করেছেন যথেষ্ট। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে। সাক্ষাৎ শয়তান ছাড়া আর কেউ তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে পারে না। তাঁর মস্ত অট্টালিকায় পাহারা দেয় অনেক দারোয়ান। এমন জায়গায় ডবল খুন হল কেমন করে, কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। আশ্চর্য!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেবল কি খুন মশাই? আবার ডবল লাশ চুরি! এ যে অসম্ভব কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে!'

যিনি থানায় খবর দিতে এসেছিলেন জিতেনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?'

—'জমিদারবাবুর ম্যানেজার।'

—'নাম?'

—'শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।'

—'দেশ?'

—'হুগলি।'

—'কতদিন এখানে কাজ করছেন?'

—'দশ বছর।'

—'শুনেছি প্রতাপনারায়ণবাবু অপুত্রক। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?'

—'তাঁর একমাত্র বিবাহিত কন্যা। মেয়ে আর জামাই জমিদারবাড়িতেই থাকেন।'

—'জামাইয়ের নাম কী?'

—'সূর্যশঙ্করবাবু।'

—'তিনিও কি বড়ো ঘরের ছেলে?'

—'বংশগৌরব থাকলেও সূর্যবাবুর নিজস্ব আয় কিছুই নেই।'

—'আচ্ছা সতীশবাবু, রাত্রে যদি খুন হয়ে থাকে, থানায় খবর দিতে এত দেরি হল কেন?'

—'খুনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই খানিকক্ষণ আগেই। জমিদারবাবু আর তাঁর স্ত্রী একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতেন। তার উপরে বাবুর শরীরটা কাল খুবই খারাপ ছিল। তাই বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ নেয়নি।'

—'খুনের কথা প্রথমে কে জানতে পারে?'

—'বাবুর পুরোনো চাকর বিশু।'

—'বাড়িতে এত লোকজন, রাত্রে কেউ সন্দেহজনক কোনও শব্দই শুনতে পায়নি?'

—'না। বাবু থাকতেন বাড়ির এক প্রান্তে। তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন বলে তাঁর শোবার ঘরের কাছাকাছি কোনও ঘরেই কেউ বাস করত না। ধরতে গেলে বাবুর মহলটা ছিল বাড়ি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন।'

—'জমিদারবাবু কোন তলায় থাকতেন?'

—'দোতলায়।'

—'খুনিরা নিশ্চয় দলে ভারী ছিল, নইলে তারা দোতলা থেকে দু-দুটো মৃতদেহ নিয়ে পালাতে পারত না। কিন্তু তারা কেমন করে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল, সেটা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

—'জমিদারবাড়ির দোতলায় কোনও ঘরের জানলাতেই গরাদে নেই। বাগান থেকে মই বেয়ে যদি কেউ দোতলার বারান্দায় ওঠে, তাহলে সে অনায়াসেই যে কোনও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।'

—'হঠাৎ মইয়ের কথা তুললেন কেন?'

—'বাবুর মহলের দিকে বাগানে একখানা রক্তমাখা মই পাওয়া গিয়েছে।'

—'রক্তমাখা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'মইখানা কার?'

—'বাগানের মালিদের।'

—'মইখানা কোথায় থাকত?'

—'মালিদের ঘরের পাশে।'

—'সতীশবাবু, আপনি বললেন জমিদারবাবুর শোবার ঘরের মেঝে হয়েছে রক্তময়। সেখানে একটা বিষয় লক্ষ করেছেন কি?'

—'কী বিষয়, বলুন।'

—'রক্তের ভিতরে অনেকগুলো হাত আর পায়ের ছাপ?'

—'হাত আর পায়ের ছাপ? না মশাই, ওসব কিছুই আমরা দেখতে পাইনি! চারিদিকে খালি দেখছি রক্ত, জমাট রক্ত! খালি কি মেঝেয়? ঘরের দেওয়ালের গায়েও রক্ত আর রক্তের ধারা! সেই ভীষণ রক্তাক্ত ঘরের কথা ভাবতেও আমার বুক ধুকপুক করে উঠছে! এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি—এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখতেও চাই না!'

—'ঘটনাস্থল থেকে মূল্যবান কিছু চুরি গিয়েছে?'

—'বিশেষ কিছু নয়।'

—'বিশেষ কিছু নয় মানে?'

—'জমিদারবাবুর ঘরে মূল্যবান দ্রব্য আর নগদ টাকাকড়িও ছিল যথেষ্ট। হত্যাকারী ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সে-সব নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে কিছুই স্পর্শ করেনি। তবে জমিদার গৃহিণীর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের অলঙ্কারগুলিও অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু সেগুলির উপরে হত্যাকারীর বিশেষ লোভ থাকবার কথা নয়।'

—'কেন?'

—'জমিদার-গৃহিণী ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। মূল্যবান অলঙ্কার পরতে তিনি মোটেই ভালোবাসতেন না। সধবা বলে বাধ্য হয়ে আটপৌরে যে দু-চারখানি গহনা পরতেন, তার দাম বোধহয় তিন-চারশো টাকার বেশি নয়। হত্যাকারী নিশ্চয়ই সেই তুচ্ছ গহনার লোভে এমন ডবল খুন করতে আসেনি!'

সতীশবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে জিতেনবাবু বললেন, 'আপনাকে বেশ

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আপনি বিলক্ষণ মস্তিষ্ক চালনা করেছেন দেখছি। হ্যাঁ, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। অর্থলোভে এই হত্যাকাণ্ড হয়নি। এখানে এর আগে আরও যে তিনটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার মধ্যেও হত্যাকারীর অর্থলোভের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই অদ্ভুত হত্যাকারী চায় কেবল মানুষের দেহ!'

জিতেনবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপাতত আমার কোনও জিজ্ঞাস্য নেই। এইবার ঘটনাস্থলের দিকেই যাত্রা করা যাক। সুন্দরবাবু, আপনারাও কি আমার সঙ্গী হবেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আদেশ পেলেই সঙ্গী হতে পারি।'

জিতেনবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ আমার আদেশ নয়, বিনীত অনুরোধ। আপনি হচ্ছেন কলকাতা-পুলিশের ডিটেকটিভ। আর জয়ন্তবাবুদের শক্তির কথা দেশের কে না জানে? আপনাদের সাহায্য লাভ করা বড়ো কম কথা নয়। জানেন তো, 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'—এবারেও যদি হারি তাহলে শ্রেষ্ঠদেরই সঙ্গে হারব, উপরওয়ালারা আর হুমকি দিতে পারবেন না।"

পুলিশের থানা থেকে জমিদারবাড়ি বেশি দূরে নয়। দশ মিনিটের মধ্যে সকলেই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেখলেই মনে হয় যেন রাজার প্রাসাদ। আর সেই অট্টালিকার চারিধার ঘিরে রয়েছে অনেক বিঘে জমি জুড়ে মস্ত এক বাগান। সেই বাগানে খালি ফুলের গাছ নয়, বহু সুবৃহৎ বনস্পতির মতো বৃক্ষেরও অভাব নেই। এক-একটি গাছ দেখলেই বোঝা যায় তাদের বয়স অন্তত শতাধিক বৎসরের কম নয়। এবং উদ্যানের কোনও কোনও স্থানে আশ্রয় নিয়েছে রীতিমতো জঙ্গল ও ঝোপঝাপ।

জয়ন্ত সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'দেখছি প্রতাপনারায়ণবাবু তাঁর বাগানের সবটাকেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেননি! বাগানের ফটকে বন্দুক ঘাড়ে করে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে আর এর চারিধারে রয়েছে মাত্র হাত-দশেক উঁচু পাঁচিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারোয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে যে-কোনও মূর্তিমান বিপদ ওই পাঁচিল ডিঙিয়ে এখানকার যে-কোনও ঝোপঝাপের ভিতর গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এমন জায়গায় অনেক দারোয়ান নিযুক্ত করলেও কেউ কোনও দিন নিরাপদ হতে পারবে না।'

জমিদারবাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল, বাগানের সেই অংশটা বেশ সযত্নে রাখা হয়েছে, সেখানে জঙ্গল বা ঝোপঝাপের অত্যাচার নেই। একটি সরোবরে পরিষ্কার নীল জল থই থই করছে, চারিদিকেই রয়েছে দেশি ও বিলেতি ফুল-গাছের নানারকম বর্ণ-বৈচিত্র্য।

অট্টালিকার একটি প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সতীশবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে আমাদের বাবুর মহল। একেবারে শেষের দিকে বারান্দার ওইখানটায় আছে বাবুর ঘর। খুন হয়েছে ওই ঘরেই। আর ওই দেখুন, সেই মইখানা পড়ে রয়েছে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ওই মইখানার উপরে আজ আপনারা কেউ হাত দিয়েছেন কি?'

সতীশবাবু বললে, 'না মশাই, আমি সবাইকেই ওই মইয়ের উপরে হাত দিতে মানা করেছি।'

—'কেন?'

—'আমি নিতান্ত বোকা লোক নই মশাই। আমার ঘরে রাশি রাশি ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের বই আছে। আমি বেশ জানি, যেখানে খুন হয়, পুলিশ না আসা পর্যন্ত সেখানকার কোনও জিনিসেই হস্তক্ষেপ করতে নেই।'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে সেই মইয়ের কাছে গিয়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। তারপর পকেট থেকে একখানা আতশিকাচ বার করে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেই মইখানা পরীক্ষা করতে লাগল। মিনিট-দুয়েক পরে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'জিতেনবাবু, এই মইয়ের কাছে একজন চৌকিদারকে দাঁড় করিয়ে রেখে যান।'

—'কেন বলুন দেখি!'

—'এই রক্তমাখা মইয়ের উপরে অনেকগুলো হাতের আঙুলের ছাপ আছে। এই ছাপগুলো পরে আমাদের কাজে লাগবে।'

সেখান থেকে সবাই বাড়ির ভিতরে ঢুকে দোতলার সেই ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল।

সতীশবাবু যা বলেছেন, মিথ্যা নয়, ঘরের ভিতরটা দেখলে যে-কোনও লোকের চোখ আর মন স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। রক্ত, রক্ত, রক্ত—চারিদিকে কেবল রক্তধারার বীভৎস উচ্ছ্বাস! পালঙ্কের বিছানার উপরে রক্ত, চারিধারে দেওয়ালের গায়ে রক্ত, আর ঘরের সমস্ত মেঝে জুড়ে জমে আছে রোমাঞ্চকর রক্তের ধারা!

জিতেনবাবু বললেন, 'গেল তিনবার তিনটে খুন হয়েছে। তিন জায়গাতেই দেখেছি রক্তের উপরে অনেকগুলো করে হাত আর পায়ের ছাপ। কিন্তু এখানে রক্তের উপরে কোনও ছাপই দেখতে পাচ্ছি না। খুনিরা যেন সন্তর্পণে কাজ করেছে, রক্তের ভিতরে নিজেদের হাত-পায়ের কোনও ছাপই পড়তে দেয়নি। এ-রহস্য বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত তখন মেঝের উপরে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হঠাৎ সে বসে পড়ে সেই রক্তময় মেঝের উপর থেকে কী-একটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

জিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কী দেখছেন জয়ন্তবাবু?'

—'হাড়ের ছোট্ট একটি টুকরো!'

—'হাড়ের ছোট্ট একটি টুকরো? কিন্তু ঘরের ওই কোণে একটা গোটা আঙুলই পড়ে রয়েছে, সেটা দেখতে পেয়েছেন কি?'

—'নিশ্চয়ই দেখেছি! কিন্তু এখানে একটা হাড়ের টুকরোই নেই—চেয়ে দেখুন, রক্তের ভিতরে আরও অনেকগুলো হাড়ের টুকরো রয়েছে!'

—'এথেকে আপনি কী অনুমান করছেন জয়ন্তবাবু?'

—'অনুমান? না, অনুমান নয়! এত-বেশি হাড়ের টুকরো দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি, খুনিরা এখানে বসে এক বীভৎস কাজ করেছে।'

—'বীভৎস কাজ? সে আবার কী?'

—'খুনিরা কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের দেহদুটোকে করেছে খণ্ড বিখণ্ড!'

জিতেনবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আগেকার তিন ঘটনা-ক্ষেত্রেই খুনি কোনও-রকম অস্ত্র ব্যবহার করেনি। এখানে তার ব্যতিক্রম হল কেন?'

জয়ন্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'এ-প্রশ্নের উত্তর পরে পাবেন। আপাতত এ-ঘরের ভিতরে আমাদের আর দেখবার কিছুই নেই। এইবার হচ্ছে আমাদের শোনবার পালা। এখন বাড়ির লোকজনরা কালকের রাত্রের কথা কী বলেন শোনা যাক। একে একে ডাকুন সবাইকে।'

ঠিক সেই সময়ে একজন চৌকিদার দরজার বাইরে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকলে জিতেনবাবুকে।

জিতেনবাবু তাকে দেখেই ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'তুমি এখানে কেন? তোমাকে না আমি মইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেছিলুম?'

—'হাঁ হুজুর! কিন্তু একজন লোক গিয়ে বললে আপনি নাকি আমাকে ডেকেছেন।'

—'আমি তোমাকে ডেকেছি? কে বললে তোমাকে এই কথা?'

—'আমি তাকে চিনি না হুজুর!'

—'না, আমি তোমাকে ডাকিনি! যাও, সেই মইয়ের কাছে গিয়ে পাহারা দাও, সেখানে আর কারুকে যেতে দিয়ো না!'

জয়ন্ত শুষ্ককণ্ঠে মৃদু হাসি হেসে বললে, 'আর পাহারা দেবার দরকার নেই জিতেনবাবু! আমি বেশ বুঝতে পারছি, মই যেখানে ছিল, সেখানে গেলে আর সে-মই খুঁজে পাওয়া যাবে না! আমি ভুল করেছি! মইয়ের উপরে যে হাতের আঙুলের ছাপ ছিল, এ-কথা প্রকাশ্যে আমার পক্ষে বলা উচিত হয়নি।'

জিতেনবাবু ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললেন, 'আপনার কথার অর্থ কী?'

—'অর্থ কী আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাগানে গিয়ে আপনি সেই মইখানাকে আর খুঁজে পাবেন না!'

সকলে দ্রুতপদে দোতলা থেকে নেমে আবার সেইখানে গিয়ে হাজির হল, যেখানে পড়ে ছিল সেই মইখানা।

দেখা গেল, চৌকিদার সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হতভম্বের মতন। মই অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে!

জিতেনবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'কী আশ্চর্য! মইখানা এখান থেকে সরালে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'হত্যাকারী। কিংবা হত্যাকারীরা।'

—'তাহলে আমরা আসবার পরও হত্যাকারী এখানে হাজির ছিল?'

—'কেবল হাজির ছিল না, সে আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছে, আমাদের কার্যকলাপ সব লক্ষ করেছে। তারপর করেছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

—'তাহলে হত্যাকারী এখনও এখানে হাজির আছে?'

—'না থাকতেও পারে। কার্যোদ্ধারের পর বুদ্ধিমানরা বিপজ্জনক স্থানে অপেক্ষা করে না।'

জিতেনবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'না মশাই, না! আমার বিশ্বাস অন্যরকম। প্রতাপবাবুর জামাই সূর্যবাবু কোথায়?'

একটি লোক বললে, 'বাড়ির ভিতরে!'

—'তাঁকে এখানে ডেকে আনো।'

লোকটি চলে গেল। জয়ন্ত বললে, 'জিতেনবাবু, হঠাৎ সূর্যবাবুকে ডাকলেন কেন?'

—'প্রতাপবাবুর অবর্তমানে সূর্যবাবুই তো বাড়ির কর্তা, আমি আগে তাঁকেই গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই।'

যে লোকটি সূর্যবাবুকে ডাকতে গিয়েছিল, অল্পক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বললে, 'সূর্যবাবু বাড়ির ভিতরে নেই।'

—'সে কী?'

—'একটু আগেই তিনি খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন।'

জিতেনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'সূর্যবাবুর শ্বশুর-শাশুড়ি খুন হয়েছেন। পুলিশ এসেছে বাড়িতে তদন্ত করতে। আর সূর্যবাবু সব জেনেশুনেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন! এর অর্থ কী? এর অর্থ কী?'

চতুর্থ

সূর্যবাবু কোথায়?

জয়ন্ত বললে, 'জিতেনবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে নিয়ে তদন্তে নিযুক্ত থাকুন, মানিককে নিয়ে আমি একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে আসি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! হঠাৎ তোমার এদিকে-ওদিকে ঘোরবার শখ হল কেন বলো দেখি?'

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'এখানকার রহস্যময় ব্যাপার দেখে আমি দস্তুরমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। খানিকটা সুশীতল বায়ু সেবন না করলে মস্তিষ্ক আমার প্রকৃতিস্থ হবে না।'

জিতেনবাবু বললেন, 'অন্য তদন্তের আগে আমি চাই সূর্যবাবুকে।'

—'কেন?'

—'তাঁর উপরে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কী-রকম সন্দেহ?'

—'আমার বোধ হচ্ছে পুলিশের প্রশ্ন এড়াবার জন্যেই সূর্যবাবু এখান থেকে সরে পড়েছেন।'

—'তিনি পুলিশের প্রশ্ন এড়াতে চাইবেন কেন?'

—'কে বলতে পারে, এই খুনের সঙ্গে তিনি কোনও না কোনও দিক দিয়ে জড়িত নেই?'

—'আপনার সন্দেহ সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে। আপাতত এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার শক্তি নেই। এসো মানিক!'

মাথা নিচু করে যেন কী ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত অগ্রসর হল। মানিক চলল পিছনে পিছনে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মানিক বললে, 'বন্ধু, হঠাৎ তুমি মিথ্যাকথা বললে কেন?'

—'কী মিথ্যাকথা?'

—'ওই যে বললে, এখানকার ব্যাপার দেখে তুমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছ। এত সহজে তুমি হতভম্ব হবে? এমন অসম্ভব কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'শাবাশ ভায়া, তুমি ঠিক ধরেছ! তাই তো কথায় বলে—'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর'!'

—'তোমাকে আমি চিনব না তো চিনবে কে?'

—'এও ঠিক। দ্যাখো মানিক, মইয়ের উপরে রক্তমাখা আঙুলের ছাপ আছে—প্রকাশ্যে এই কথা বলেছিলুম বলেই মইখানা এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে। আবার মনের কথা প্রকাশ করে দ্বিতীয়বার আমি বিপদে পড়তে চাই না।'

—'বিপদ! কী বিপদ?'

—'হত্যাকারীর চর এখনও হয়তো এখানে হাজির আছে।'

—'তাতে হয়েছে কী?'

—'মই কোন দিকে গিয়েছে আমি জানতে পেরেছি।'

—'কেমন করে?'

—'মাটির দিকে চেয়ে দ্যাখো।'

—নীচের দিকে তাকিয়ে মানিক বললে, 'মাটির উপরে দেখছি তো পাশাপাশি দুটো সরল রেখার দাগ।'

—'হ্যাঁ! খুনিদের কেউ মইখানাকে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে।'

—'মই তো উঁচু করে তুলে নিয়ে যেতেই পারত, মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার কারণ কী?'

—'সে হেঁট হয়ে মইখানাকে নিয়ে গিয়েছে।'

—'কেন?'

—'চারিদিকে সতর্ক পাহারা, সকলের চোখকে যে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল।'

—'দুটো সরল রেখা ধরে তারা মাটির উপর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। তারপর পাওয়া গেল খানিকটা ঘাসজমি—সরল রেখাদুটো অদৃশ্য। কিন্তু সেখানেও মই টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আবিষ্কার করলে জয়ন্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জমির অনেক ঘাস হয়েছে ছিন্নভিন্ন—তার দ্বারাও বোঝা যায়, মই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এইখান দিয়েই। ঘাসজমির পর আবার কাঁচা মাটি। সেখানেও মইয়ের দাগ।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, সমস্ত দেখে বেশ বুঝতে পারছি, খুনিরা অত্যন্ত চতুর। রক্তাক্ত ঘটনাস্থলে তারা একখানা হাত বা পায়ের চিহ্ন রেখে যায়নি। আমরা যদি চটপট না আসতুম, তাহলে মাটির উপরে নিশ্চয়ই মইয়ের এই চিহ্ন থাকত না।'

—'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খুনিরা মই টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও বিলুপ্ত করে দিত?'

—'নিশ্চয়!'

তারা বাগানের প্রান্তে এসে হাজির হল। সেখানে প্রাচীরের গায়ে রয়েছে একটা ছোটো দরজা।

জয়ন্ত বললে, 'দরজার খিল খোলা। মই নিশ্চয়ই এই দরজা দিয়েই বাইরে গিয়েছে।'

দরজার পাল্লা খুলে তারা বাগানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে খানিকটা খোলা জমির পর দেখা যাচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি। তার ওপারে রয়েছে সবুজ বন।

জয়ন্ত বললে, 'এখানে মাটির উপরে আর মইয়ের চিহ্ন নেই। তারা নিজেদের নিরাপদ ভেবে এখানে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মইখানাকে নিয়েছিল কাঁধের উপরে। এগিয়ে চলো মানিক, এগিয়ে চলো, জলাভূমির প্রান্তে মাটি হবে স্যাঁতসেঁতে। দেখা যাক, তার উপরে কোনও পায়ের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কি না!'

চলতে চলতে মানিক বললে, 'জয়ন্ত, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।'

—'কী?'

—'সূর্যবাবু এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সত্যসত্যই জড়িত কি না?'

—'কেন তুমি এমন সন্দেহ করছ?'

—'প্রতাপনারায়ণের আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির অধিকারী হবেন।'

—'বেশ। তারপর?'

—'বাড়িতে পুলিশ আসছে শুনেই তিনি সরে পড়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাপী মন।'

—'একেবারে 'নিশ্চয়ই' বলে ফেললে?'

—'কেন বলব না?'

—'সূর্যবাবু জানতেন, প্রতাপনারায়ণের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবেন তিনিই। স্বাভাবিকভাবে যে সম্পত্তি তাঁর হস্তগত হবে, তার জন্যে তিনি এমন একটা বীভৎস, বিয়োগান্ত নাটকে দুরাত্মার ভূমিকায় অভিনয় করবেন কেন?'

—'তবে কেন তিনি পুলিশ দেখে পালিয়েছেন?'

—'মানিক, এত সহজে তুমি মানুষের বিচার কোরো না। তবে এইটুকু বলতে পারি, হয়তো তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। সূর্যবাবু হয়তো পুলিশ দেখেই পালিয়ে নিজের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। আবার এটাও হতে পারে, সূর্যবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না অন্য কোনও কারণে?'

—'এমন কী অন্য কারণ থাকতে পারে?'

—'জানি না। আপাতত ও-সব কথা নিয়ে আলোচনা করবারও দরকার নেই। এই আমরা জলাভূমির কাছে এসে পড়েছি। দ্যাখো মানিক, যা ভেবেছি তাই! স্যাঁতসেঁতে মাটির উপরে রয়েছে মানুষের পদচিহ্নের পর পদচিহ্ন!'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ সেইখানে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক গিয়ে সেখানকার ভিজে মাটি খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'এখানে দেখতে পাচ্ছি চারজন লোকের পায়ের দাগ!'

আরও কিছু এগিয়ে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'মানিক, মানিক, এ কী ব্যাপার?'

মানিক শিউরে উঠে বললে, 'এ যে রক্ত! চারিদিকে বইছে রক্তের ঢেউ?'

'হ্যাঁ, টাটকা রক্ত! মাটি এখনও রক্ত শুষে নেয়নি। আর ওই দ্যাখো, একটা ভারী জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন! আর ও চিহ্নও রক্তাক্ত! নিশ্চয় একটু আগেই এখানে কোনও হত্যাকাণ্ড হয়েছে! তারপর হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির দেহকে জলাভূমির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত সেই রক্তাক্ত চিহ্নের অনুসরণ করে একেবারে জলাভূমির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ জামা খুলে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে জলাভূমির ভিতরে গিয়ে পড়ল।

প্রায় এক কোমর জল। খানিকক্ষণ হেঁট হয়ে জলের তলায় হাত চালাতে চালাতে জয়ন্ত বলে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

—'কী পেয়েছ, জয়?'

জলের ভিতর থেকে জয়ন্ত টেনে তুললে একটা লাশ! যুবকের মৃতদেহ!

মানিক অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'ও আবার কী!'

মৃতদেহটাকে কাঁধে করে তীরের দিকে আসতে আসতে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, দৌড়ে যাও! শিগগির জিতেনবাবুর সঙ্গে আর সকলকে ডেকে আনো! আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি!'

পঞ্চম

আবার হত্যারহস্য

ইনস্পেকটার জিতেনবাবু, সুন্দরবাবু ও মৃত জমিদারের ম্যানেজার সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মানিক ফিরে এল।

জলা থেকে তুলে আনা মৃতদেহটাকে মাটির উপরে শুইয়ে রেখে গম্ভীর ও চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত।

সতীশবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ! এ যে প্রতাপনারায়ণবাবুর জামাই সূর্যশঙ্করবাবুর দেহ!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মনেও মাঝে মাঝে সেই সন্দেহই জাগছিল। তাহলে দেখছি আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়!'

—'কিন্তু সূর্যবাবুকে খুন করলে কে?'

—'যারা জমিদারবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছে, যারা আজ রক্তাক্ত মইখানাকে সরিয়েছে, তারাই।'

—'কিন্তু কে তারা?'

—'কেমন করে বলব? আপনি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। তবে মনে হচ্ছে আর বেশিদিন তিমির-রাজ্যে বাস করতে হবে না।'

জিতেনবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়ন্তবাবু, তাহলে আপনি কোনও হদিস পেয়েছেন?'

—'উঁহু, বিশেষ কিছুই নয়। সতীশবাবু, আপনাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

সতীশবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, 'কী আর জিজ্ঞাসা করবেন মশাই, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

—'সূর্যশঙ্করের কোনও আত্মীয় আছেন?'

—'আছেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রশঙ্কর। তিনি ছাড়া সূর্যবাবুর আর কোনও আত্মীয় বেঁচে নেই।'

—'তিনি কোথায় থাকেন?'

—'কলকাতায়।'

—'তাঁকে এই বিপদের খবর দিতে হবে তো?'

—'নিশ্চয়ই!'

—'তাহলে তাঁকে আসার জন্যে আজকেই তার করে দিন।'

—'তাঁকেও কি আপনার দরকার আছে?'

—'আছে বই কি। সূর্যশঙ্করের পরিচিত লোকদের কথা আপনাদের চেয়ে তিনিই ভালো করে বলতে পারবেন। আমার দৃঢ় ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে সূর্যবাবুরই কোনও পরিচিত ব্যক্তি।'

জিতেনবাবু বললেন, 'আপনার এমন ধারণার কারণ বুঝতে পারলাম না।'

—'আপাতত ওটা আর বোঝবার চেষ্টাও করবেন না। চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সূর্যবাবুর বন্ধুদের তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সেই তালিকা দেখেই আমি আমার কর্তব্য স্থির করব। সতীশবাবু, সূর্যবাবুর মৃত্যু হয়েছে, এখন প্রতাপনারায়ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?'

—'তাঁর একমাত্র সন্তান করুণাদেবী।'

—'সূর্যবাবুরও সন্তান হয়নি?'

—'না।'

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, 'হুম! কিছু বোঝা যাচ্ছে না! কিছু বোঝা যাচ্ছে না! মদনপুরে হত্যার পর হত্যা হচ্ছে। হত্যাকারী কোথাও দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নরমুণ্ড নিয়ে সরে পড়ছে, কোথাও নিয়ে যাচ্ছে গোটা লাশটাকেই, আবার কোথাও তারা ঘটনাস্থলে বসেই খুনের পর লাশ কেটে টুকরো টুকরো করে সঙ্গে নিয়ে যায়, আবার কোথাও বা তারা লাশ ফেলে দেয় জলের ভিতরে। কোথাও বা ঘটনাস্থলে রক্তধারার মধ্যে তাদের হাতের বা পায়ের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না,

আবার কোথাও বা পাওয়া যায় হাতের আর বিকৃত পায়ের চিহ্ন। হত্যাকারী কোথাও খুব সাবধান, আবার কোথাও অত্যন্ত অসাবধান!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখে খুশি হলুম। আমিও এখানকার হত্যাকাণ্ডগুলোর ভিতরে এই সব বিশেষত্ব লক্ষ করেছি। কেবল লক্ষ নয়, একটা বড়ো সত্যও আবিষ্কার করেছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বলো কী? বড়ো সত্য! ছোটো নয়, মেজো নয়—একেবারে বড়ো সত্য? ভায়া, তোমার আবিষ্কার-কাহিনি শ্রবণ করবার জন্যে আমার যে আগ্রহ হচ্ছে!'

—'আপনার ওই অসাময়িক আগ্রহকে তাড়াতাড়ি দমন করে ফেলুন, সুন্দরবাবু! যথাসময়েই সত্য হবে স্বপ্রকাশ।'

সুন্দরবাবু অভিমান-ভরে বললেন, 'ওই তো তোমার চিরকেলে দোষ, জয়ন্ত! তুমি সর্বদাই আমাদের অন্ধকারে ফেলে রাখতে চাও! আমরা কি প্যাঁচা? আমরা কি ভালোবাসি অন্ধকারকেই? আচ্ছা লোক যা হোক!'

মানিক চিমটি কাটবার সুযোগ পেয়েই বললে, 'মোটেই তা নয় সুন্দরবাবু! নরহস্তীকে পেচক বলে সন্দেহ করবে, জয়ন্তের চোখ এখনও এত বেশি খারাপ হয়নি।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু পাকিয়ে বললেন, 'আমার দেহ নিয়ে ব্যঙ্গ করবার অধিকার তোমার নেই মানিক!'

মানিক কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত তাকে বাধা দিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, 'মানিক চুপ করো। তোমার কি স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই! আমাদের চারিদিকেই ট্রাজেডির দৃশ্য, আমাদের সামনেই পড়ে রয়েছে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ, এখন কি চটুল কথা-কাটাকাটি করবার সময়? ছিঃ!'

মানিক অনুতপ্ত, মৃদুকণ্ঠে বললে, 'ভাই, আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আমাকে ক্ষমা করো।'

মানিকের কাঁধের উপরে একখানি হাত রেখে জয়ন্ত স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'ভাই মানিক, অন্যায় স্বীকার করে যে ক্ষমা চাইতে পারে, সেই-ই দেয় যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়। তুমি হচ্ছ খাঁটি মানুষ, তা কি আমি জানি না?'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনিও আমাকে ক্ষমা করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে যাও হে যাও! কে তোমাকে ক্ষমা করতে চায়? তুমি কি 'ক্রিমিন্যাল'? আমি কি জানি না তুমি আমাকে ভালোবাসো? তবে মাঝে মাঝে তুমি আমাকে নিয়ে কিছু মজা করতে চাও, আর সে মজায় মজতে আমি রাজি না হয়ে আমার মেজাজ যায় বিগড়ে, এই যা মুশকিল! হুম!'

জিতেনবাবু যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'ঘাড়ে আবার একটা নতুন খুনের মামলা চাপল। ছয়-ছয়টা খুনের মামলা! এতগুলো মামলার ভার সইতে পারে, আমার ঘাড় এমন শক্ত নয়। এখন আমার কর্তব্য কী, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'শুনুন জিতেনবাবু! এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, জলাভূমির স্যাঁতসেঁতে মাটির উপরে যে পায়ের ছাপগুলো আছে তার ছাঁচ তুলে নেওয়া। লক্ষ করলে দেখবেন, সেগুলো যাদের পদচিহ্ন, তাদের কারুরই পা বিকৃত নয়।'

জিতেনবাবু বললেন, 'আরে মশাই, পদচিহ্নের ছাঁচ আর কত তুলব? খুনির টিকি দেখবার জো নেই, ছাঁচ নিয়ে কি ধুয়ে খাব?'

—'ব্যস্ত হবেন না মশাই, ব্যস্ত হবেন না। আপনার মুখে মামলার সব কথা শুনে, আর এখানকার পায়ের দাগগুলো দেখে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে-সব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। আপাতত শুনুন আর একটা কথা।'

—'বলুন।'

—'আজ রাত্রে আমাদের লুকিয়ে এই জমিদারবাড়িতেই বাস করতে হবে।'

জিতেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেন?'

—'প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দেওয়ার সময় এখনও হয়নি। খালি আজ নয়, হয়তো এখনও উপর-উপরি কয়েক রাত ধরেই আমাদের এখানে পাহারা দিতে হবে। খুনিকে ধরবার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কী বলছ হে জয়ন্ত? খুনি আবার এখানে কী করতে আসবে?'

—'তার আসল উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ হয়নি।'

—'কী উদ্দেশ্য?'

—'আবার প্রশ্ন করছেন? শুনুন জিতেনবাবু, আমাদের পাহারা দিতে হবে খুব গোপনে—যেন কাকপক্ষীটি টের না পায়!'

'তাও কি সম্ভব? এটা হচ্ছে মস্ত জমিদারবাড়ি, চারিদিকে গিজগিজ করছে লোকজন। এখানে কার মুখে চাপা দেবেন?'

—'আপনি কি ভাবছেন, রাত্রে আমরা এখানে আসব জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা করে? মোটেই নয়। আমরা আসব অন্ধকারে গা-ঢেকে, চোরের মতো।'

—'চোরের মতো?'

—'ঠিক তাই। আমরা জমিদারবাড়ির বাগানে ঢুকব পাঁচিল টপকে। তারপর অদৃশ্য হব যে কোনও ঝোপঝাপে ঢুকে।'

—'বিস্ময়কর প্রস্তাব।'

—'রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার আগে বিস্ময়কর প্রস্তাবই করতে হয়। মশাই, আমার কার্যপদ্ধতি হচ্ছে স্বতন্ত্র। আপনারা পুলিশের লোক, বাঁধাধরা পথে চলেন মেশিনের মতো, বাঁধা লাইনের বাইরে একটি পা ফেলবেন না। কিন্তু আমি মেশিন হতে রাজি নই, কারণ আমার আছে নিজস্ব কল্পনাশক্তি। এক-এক মামলায় আমি এক-এক রকম পদ্ধতিতে কাজ করি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি নতুন নতুন! এমনকি দরকার হলে বেআইনি কাজও করি, আপনারা যা পারবেন না।'

'ঘাট মানছি। আপনার কথা আর কার্যপদ্ধতি দুই-ই আমার কাছে দুর্বোধ্য।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আমার কাছেও। এতদিন ধরে জয়ন্তকে দেখছি, তবু ওকে বুঝতে পারি না। ও হচ্ছে মূর্তিমান হেঁয়ালি।'

জয়ন্ত বললে, 'জিতেনবাবু, আপনাকে আর এক কাজ করতে হবে।'

—'বে-আইনি কাজ নয়?'

'না। আজকেই জাল ফেলে জলাভূমিটা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করুন।'

—'কেন?'

—'আমার সন্দেহ হচ্ছে, হত্যাকারীরা প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর খণ্ডবিখণ্ড দেহ হয়তো ওর মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।'

—'আপনার সন্দেহ হয়তো মিথ্যা নয়। বেশ, আজকেই এর ব্যবস্থা করব।'

ষষ্ঠ

নিশাচরদের আবির্ভাব

সেই রাত্রি। আকাশে ছিল এক-ফালি চাঁদ, কিন্তু রাত্রি গভীর হবার আগেই হল অদৃশ্য। চারিদিকে ঝরতে লাগল নিবিড় অন্ধকারের ঝরনা। দেখা যায় না কোলের মানুষ, দেখা যায় না অন্য কিছু।

অবশ্য একটা দৃশ্য কিছু কিছু দেখা যায়। কালির পটে আরও ঘন কালি দিয়ে আঁকা বড়ো বড়ো গাছগুলোর ঝাপসা পত্রছত্র। থেকে থেকে প্রবল বাতাসের তাড়নায় সেখানে জাগছিল আর্ত মর্মর-স্বর!

চারিদিকে নিঝুম। ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী। ওরই মধ্যে নীরবতাকে শব্দিত করে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়েছে পেচকের কণ্ঠ, মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে শৃগাল-সভার কোলাহল।

মানিক নিম্নকণ্ঠে বিরক্ত স্বরে বললে, 'আরে মোলো, মশাগুলো ঘুমোতেও জানে না, তাদের রক্তপিপাসারও অন্ত নেই। গেলুম যে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেটারা মানুষের রক্ত খেতে আসে আবার গান গাইতে গাইতে! হুম, ভগবান এমন সৃষ্টিছাড়া জীব কেন যে সৃষ্টি করেছেন, তার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না।'

জিতেনবাবু বললেন, 'বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, উদ্ভিদের ভিতরেই মশাদের যথেষ্ট খোরাক আছে, তাদের রক্তপান করবার দরকার নেই। তবু অকারণেই তারা রক্তপানের জন্যে লালায়িত হয়। এমন হিংসুক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই—গান্ধিজিকেও তারা রেহাই দেবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনারা মশা নিয়ে গবেষণা বন্ধ করুন। আমি যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

সবাই চুপ।

তারা বসেছিল বেশ-একটা বড়ো ঝোপের মধ্যে। ঝোপের দুই পাশেই খানিকটা করে খোলা জমি।

মাটির উপরে সর্বত্রই ছড়ানো ছিল শুকনো ঝরা পাতা, কিছু দূরে মড় মড় করে শব্দ হচ্ছে, যেন কে বা কারা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আসছে শুকনো পাতা।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই একদিকের খোলা জমির উপরে দেখা গেল কয়েকটা অস্পষ্ট চলন্ত ছায়া। পরে পরে দশটা ছায়া। তারা এত নীরব যে, ওই শুকনো পাতাগুলো না থাকলে তাদের অস্তিত্ব কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করত না।

যে দিকে জমিদারবাড়ি আছে সেই দিকে তারা চলে গেল একে একে।

জিতেনবাবু চুপি চুপি বললেন, 'ধন্য জয়ন্তবাবু, আপনার কী সঠিক আন্দাজ! ওরা যে আবার জমিদারবাড়ি আক্রমণ করতে আসবে, আমি তো এটা কল্পনাও করতে পারিনি।'

—'তার মানে আপনার কল্পনাশক্তি নেই।'

—'স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কী?'

—'হত্যা।'

—'আবার হত্যা! কাকে?'

—'পরে বলব। এখন কথার সময় নয়। আসুন, আমরা ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।'

—'তারপর?'

—'লোকগুলো এইবারে জমিদারবাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার আগেই ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ওইদিকে এগিয়ে চলুন। বাজান আপনার বাঁশি!'

জিতেনবাবুর বাঁশি তীক্ষ্ণস্বরে বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল বাগানের চারিধার! নানা ঝোপঝাপ, আনাচ-কানাচ থেকে আত্মপ্রকাশ করল দলে দলে সশস্ত্র পুলিশের লোক—দিকে দিকে উঠল দ্রুত পদশব্দ!

জয়ন্ত বললে, 'টর্চগুলো জ্বেলে ছুটুন সবাই!'

রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢেকে যারা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, এই অভাবিত ও আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা না করেই তারা বিশৃঙ্খলভাবে এদিক-ওদিক দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করলে—

কিন্তু পালাতে পারলে না, পুলিশের বেড়াজালে তাদের বন্দি হতে হল।

জয়ন্ত তাদের উপরে টর্চের আলো ফেলে বললে, 'দেখছি এরা নয় জন। কিন্তু আমরা এদিকে আসতে দেখেছি দশটা ছায়ামূর্তিকে। আর একজন কোথায় গেল?'

হঠাৎ খানিক তফাত থেকে শোনা গেল রিভলভারের শব্দ এবং মানুষের আর্তনাদ!

জয়ন্ত বেগে সেই দিকে দৌড়ে গেল, তার পিছনে পিছনে সুন্দরবাবু, জিতেনবাবু এবং মানিকও।

বেশিদূর যেতে হল না। একটা লোক ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে মাটির উপরে বসে আছে। সে চৌকিদার।

জিতেনবাবু বললেন, 'ব্যাপার কী?'

চৌকিদার যাতনাবিকৃত স্বরে বললে, 'একজন আসামি এই দিক দিয়ে পালাচ্ছিল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করি। সে আমাকে গুলি ছুড়ে জখম করে পালিয়ে গিয়েছে হুজুর!'

—'কোন দিকে গিয়েছে সে?'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর ওপ্রশ্ন করে লাভ নেই। পলাতককে আজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

গোলমাল শুনে সতীশবাবুও নীচে নেমে এসেছেন। তিনি বললেন, 'আজ আবার একী কাণ্ড!'

জয়ন্ত বললে, 'এই অযাচিত অতিথিরা আজ আবার আপনাদের ধন্য করতে এসেছিলেন। ভালো করে দেখুন দেখি, এই মহাত্মাদের কারুকে চিনতে পারেন কি না?'

সকলের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সতীশবাবু বললেন, 'এদের তো দেখছি গুণ্ডার মতন চেহারা। না মশাই, এদের কারুকে জন্মে আমি দেখিনি। এরা এ অঞ্চলের লোকই নয়।'

জয়ন্ত তাদের দিকে ফিরে বললে, 'ওগো বাছারা, তোমাদের যে বন্ধুটি লম্বা দিয়েছেন তাঁর নামটি বলবে কি?'

কেউ জবাব দিলে না।

—'হ্যাঁ, বাপু-বাছা বললে তোমরা যে জবাব দেবে না তা আমি জানি। যাক, তোমাদের মুখ

খোলবার উপায় পুলিশের হাতে আছে, আমাকে ভাবতে হবে না। আচ্ছা সতীশবাবু, কাল 'আপ' বা 'ডাউনে'র প্রথম ট্রেন এখানকার স্টেশনে কখন আসবে?'

—'সকাল সাতটার সময়ে।'

—'উত্তম। এখন রাত সাড়ে তিনটে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। সতীশবাবু, মোটর প্রস্তুত রাখুন। সকাল সাড়ে ছয়টার ভিতরে আমার সঙ্গে আপনাকে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোতে হবে।'

—'আমাকেও! কেন?'

—'আপনি আসল অপরাধীকে শনাক্ত করবেন।'

সপ্তম

ছদ্মবেশীর পরিচয়

মদনপুর স্টেশন। সকাল সাতটার গাড়ি এখনও আসেনি।

একখানা মোটর স্টেশনের সামনে এসে থামল। গাড়ির ভিতর থেকে আগে নামল জয়ন্ত ও মানিক, তারপর সতীশবাবু ও জিতেনবাবু। সুন্দরবাবু আসতে রাজি হননি, কাল রাত জেগে তাঁর শরীর কাবু হয়ে পড়েছে। শয্যা আশ্রয় করার আগেই তিনি 'নোটিশ' দিয়ে রেখেছেন, আজ বেলা দুটো না বাজলে কেউ যেন তাঁর নাসিকাগর্জন স্তব্ধ করার চেষ্টা না করে।

স্টেশনে ঢুকে জয়ন্ত একবার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে বললে, 'দেখুন তো সতীশবাবু, এখানে আপনার পরিচিত কোনও লোককে দেখতে পান কি না?'

ইতস্তত দৃষ্টিপাত করে সতীশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, জন দুয়েক চেনা লোককে দেখছি।'

—'কে কে?'

—'ওই যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পায়চারি করছেন। ওঁর নাম সুরেনবাবু—এখানে ডাক্তারি করেন।'

—'আর একজন কে?'

—'আমাদের প্রজা অছিমুদ্দী। পোটলার পাশে উবু হয়ে বসে আছে, দেখতে পাচ্ছেন?'

কিন্তু অছিমুদ্দীকে দেখবার জন্য জয়ন্তের আর কোনওই আগ্রহ হল না। সতীশবাবুর হাত ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে জয়ন্ত 'ওয়েটিং রুমে'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইজিচেয়ারের উপরে বসে একটি ভদ্রলোক কী একখানা বই পড়ছিলেন।

—'সতীশবাবু, ওঁকে চেনেন?'

—'উঁহু। জীবনে এই প্রথম দেখলুম।'

—'বয়সে যুবক, মুখে একরাশ দাড়ি। অথচ আজকালকার যুবকরা বিশেষ করে 'বয়কট' করতে চায় ওই দাড়িকেই। ভদ্রলোকের দাড়িটিও উল্লেখযোগ্য।'

—'কেন?'

—'অত্যন্ত রুক্ষ্ম আর অস্বাভাবিক। তারপর দেখুন ওঁর সাজপোশাক। শৌখিন, দামি জামা, কাপড়, জুতো। কিন্তু জামার একটা হাতা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাপড় আর জুতো কর্দমাক্ত। এর কারণ কী?'

সতীশবাবু বললেন, 'কারণ উনিই জানেন, আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

ভদ্রলোক হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন জয়ন্তের দিকে। তারপর এমনভাবে বইখানা উপরে তুলে ধরলেন যে, তাঁর মুখ হয়ে গেল অদৃশ্য।

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ, ভদ্রলোক চান না যে আমরা ওঁর মুখদর্শন করি। বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক। আর একটু নিকটস্থ হয়ে দেখতে হল।'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে 'ওয়েটিং রুমে'র ভিতর গিয়ে দাঁড়াল; বললে, 'মশাইয়ের হাতে ঘড়ি আছে দেখছি। সাতটা বাজতে আর কত দেরি?'

—'পনেরো মিনিট।'

'ও, তাহলে গাড়ি আসতে এখনও দেরি আছে। তবে এইখানেই বসে একটু বিশ্রাম করা যাক।' তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, 'মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

—'নরকধামে।'

—'রাগ করলেন? না ঠাট্টা করছেন?'

ভদ্রলোক নিরুত্তর। বই থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

জয়ন্ত সহজ ভাবেই বললে, 'নরকধামে যেতে গেলে কি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়?'

—'মানে?'

—'আপনার মুখে পরচুলের দাড়ি কেন?'

—'আপনি তো দেখছি বড়োই অসভ্য?' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্তও উঠে দাঁড়াল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্র হস্তে ভদ্রলোকের দাড়ি ধরে মারলে এক টান—খসে পড়ল পরচুলের দাড়ি!

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'একী দেখছি? চন্দ্রশঙ্করবাবু!'

চন্দ্রশঙ্কর তাড়াতাড়ি প্রস্থান করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জয়ন্ত এক লাফ মেরে তার উপরে গিয়ে পড়ল এবং নিজের বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বললে, 'মানিক, খুঁজে দ্যাখো, এর কাছে বোধ হয় রিভলভার আছে!'

চন্দ্রশঙ্করের জামার তলায় সত্য-সত্যই পাওয়া গেল একটা রিভলভার!

জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেকটারবাবু, চন্দ্রশঙ্করবাবুকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করলুম।'

চন্দ্রশঙ্কর গর্জন করে বললে, 'কী অপরাধে?'

—'প্রতাপনারায়ণবাবু, তাঁর স্ত্রী আর আপনার ভ্রাতা সূর্যশঙ্করকে হত্যা করার জন্যে।'

—'আপনারা কি বিনা প্রমাণেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান? আপনারা কি পাগল?'

—'প্রমাণের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না চন্দ্রশঙ্কর! তোমার দলবল ধরা পড়েছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাদের কেউ না কেউ 'রাজার সাক্ষী' হবে নিশ্চয়ই। জলার নরম মাটিতে অনেকগুলো পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। খুব সম্ভব তার ভিতরে তোমার পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার থাকবার কথা কলকাতায়, কিন্তু এই খুনোখুনির সময়ে তুমি এখানে কেন? তোমার মুখে পরচুলের দাড়ি কেন? তোমার কাছে রিভলভার কেন? আর ওই রিভলভারই প্রমাণ করে দেবে, কাল রাত্রে তুমি দলবল নিয়ে জমিদারবাড়ি আক্রমণ করতে গিয়েছিলে!'

—'কী রকম?'

—'পালাবার সময়ে তুমি একজন চৌকিদারকে গুলি ছুড়ে আহত করেছ। কোন রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়েছে, সেটা প্রমাণ করা একটুও কঠিন নয়।'

সতীশবাবু এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবারে কতকটা আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'চন্দ্রশঙ্করবাবু, মানুষ চেনা এতই কঠিন? আপনাকে অত্যন্ত নিরীহ বলেই জানতুম! কিন্তু কী লোভে আপনি এমন মহাপাপে লিপ্ত হয়েছেন?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রতাপনারায়ণের সম্পত্তির লোভে।'

—'কিন্তু করুণাদেবী বর্তমান থাকতে সে সম্পত্তির উপরে তো আর কারুরই অধিকার নেই!'

—'আমরা কাল ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে করুণাদেবীও আজ ইহলোকে বর্তমান থাকতেন না।'

—'কী বললেন?'

—'চন্দ্রশঙ্কর কাল জমিদারবাড়িতে গিয়েছিল করুণাদেবীকেও ইহলোক থেকে সরিয়ে দিতে।'

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে চন্দ্রশঙ্কর বললে, 'মিথ্যাকথা!'

—'আচ্ছা, সত্য-মিথ্যা নিয়ে এখন আর মস্তক ঘর্মাক্ত করবার দরকার নেই। চলুন জিতেনবাবু আমরা আসামিকে নিয়ে এইবারে থানার দিকে যাত্রা করি।'

জিতেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'জয়ন্তবাবু আজ আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু মামলাটার অনেক জায়গাই এখনও পরিষ্কার হল না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'আপাতত অগ্রসর হোন তো! তারপর গাড়িতে যেতে যেতে অপরিষ্কার জায়গাগুলো একেবারে পরিষ্কার খটখটে করে দেবার চেষ্টা করব।'

অষ্টম

অপরিষ্কারকে পরিষ্কার

চলন্ত মোটরে বসে জয়ন্ত বলতে লাগল

'জিতেনবাবু, প্রতাপনারায়ণ নিহত হবার আগে এ-অঞ্চলে যে তিনটে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেগুলোর জন্যে দায়ী কে এখনও আমি সেটা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু জমিদারবাড়ির খুনের মামলার সঙ্গে তার যে কোনও সম্পর্ক নেই এটা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।'

সুন্দরবাবুর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনিও লক্ষ করেছিলেন, আগেকার তিনটে হত্যাকাণ্ডের সময়ে খুনি ছিল অত্যন্ত অসাবধান, ঘটনাক্ষেত্রে নিজের হাত আর পায়ের অনেক ছাপ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদারবাড়ির হত্যাকাণ্ডের অপরাধীরা নিজেদের কোনও চিহ্নই রেখে যায়নি। এমনকি আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পরে রক্তমাখা মইখানা পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছিল।

এই দু-রকম কার্যপদ্ধতির ভিতরে বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় খুব স্পষ্ট। এক জায়গায় দেখা যায়, ঘটনাস্থলে নিজের হাত-পায়ের ছাপ পড়ল কি পড়ল না, হত্যাকারীরা সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। এথেকে আরও একটা কথা প্রমাণিত হয়। খুব সম্ভব খুনি মোটেই বুদ্ধিমান নয়।

কিন্তু জমিদারবাড়ির হত্যাকাণ্ডে অপরাধীরা রীতিমতো মস্তিষ্ক-চালনা করেছে। ঘটনাক্ষেত্রে তারা নিজেদের সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত করে দিয়ে গিয়েছে! মাটির উপর দিয়ে মই টেনে-নিয়ে-যাওয়ার যে চিহ্ন অবলম্বন করে আমি জলাভূমিতে গিয়ে হাজির হয়ে সূর্যবাবুর দেহ আবিষ্কার করি, তাও তারা নিশ্চয়ই বিলুপ্ত করে দিত, কিন্তু আমরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম বলে সে সময় তারা পায়নি।

এখন বুঝে দেখুন, একই হত্যাকারীর পক্ষে দুই জায়গায় দুই পদ্ধতিতে কাজ করা স্বাভাবিক কি না? আপনারও উচিত ছিল, এটা আগেই বুঝে দেখা। অপরাধতত্ত্বের প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই জানেন, একই অপরাধী কখনও দুই পদ্ধতিতে কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশের গোয়েন্দারা কত বার যে কেবল হত্যা-পদ্ধতি দেখেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছেন, একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

জমিদারবাড়ির খুনের সঙ্গে যে আগেকার ঘটনাগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই, এ-বিষয়ে যখন নিশ্চিত হলুম, তখন চেষ্টা করলুম মামলাটাকে নতুন দিক দিয়ে দেখতে।

প্রথমেই একটা সন্দেহ হল। জমিদারবাড়ির অতি-চতুর হত্যাকারী হয়তো মদনপুরের অন্যান্য রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করবার ফিকিরে আছে। মোটামুটিভাবে দেখলে মনে হয়, এখানকার সব হত্যাকাণ্ডই এক রকম। হত্যার কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। হত ব্যক্তির মূল্যবান দ্রব্য হারায় না। হত্যার পর মৃতদেহ হয় অদৃশ্য।

ক্রমে আমার এই সন্দেহই দৃঢ় হয়ে উঠল। জমিদারবাড়ির হত্যাকারী নিশ্চয়ই আগেকার খুন তিনটের সুযোগ নিয়ে পুলিশকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করেছে। আর কেবল সেইদিকেই দৃষ্টি রেখে জমিদারবাবু আর তাঁর স্ত্রীর দেহ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলেছে। নইলে খুনের পর এরকম লাশ চুরির কোনও মানে হয় না।

কিন্তু কে এই নতুন হত্যাকারী? তার আসল উদ্দেশ্য কী? এ দুটো প্রশ্নের কোনও উত্তরই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ দৈব হল আমার সহায়। জলাভূমির ভিতরে পাওয়া গেল সূর্যবাবুর দেহ।

সূর্যবাবুকে হত্যা করা হল কেন? মাথা ঘামিয়ে একটা কারণ পেলুম এই

আমরা যখন তদন্তে নিযুক্ত, সূর্যবাবু তখন বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশ এসে যে তাঁকেই খুঁজবে এটা নিশ্চয়ই তাঁর অজানা ছিল না। সে সময়ে তাঁর পক্ষে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক। তবু তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছন দিয়ে খিড়কির দরজা খুলে ঠিক যেন পালিয়ে গেলেন কেন?

খুব সম্ভব আমরা যখন প্রাথমিক তদন্তে ব্যস্ত, সূর্যবাবু তখন দোতলার কোনও ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, বাগানের ভিতর দিয়ে কারা চুপিচুপি একখানা মই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখলেন, তাদের সঙ্গে আছে তাঁরই বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রশঙ্কর—যার থাকবার কথা কলকাতায়!

বিপুল বিস্ময়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে খিড়কির দরজা খুলে সূর্যবাবু ছুটলেন তাদের পিছনে পিছনে।

তারপর বোধহয় ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম

চন্দ্রের কাছে গিয়ে সূর্য করলেন কৈফিয়ত দাবি। চন্দ্র করলে সূর্যকে খুন।

অবশ্য তখন পর্যন্ত চন্দ্রনামধারী কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব আমি জানতুম না। আমার ধারণার ভিতরে ছিল অজ্ঞাতনামা হত্যাকারীরা।

পরে সতীশবাবুর মুখে শুনলুম চন্দ্রের কথা। আমাদের গোয়েন্দার মন, ধাঁ করে পেলে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত!

সূর্য ও তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন প্রতাপনারায়ণের উত্তরাধিকারী। সূর্যবাবুর অবর্তমানে তাঁর সন্তানহীনা স্ত্রী পাবেন সমস্ত সম্পত্তি। তিনি পোষ্যপুত্র নিতে পারেন। নইলে তাঁর মৃত্যু হলে সম্পত্তি যাবে চন্দ্রের হাতে, কারণ সূর্যবাবুর আর কোনও আত্মীয় নেই।

চন্দ্রের মাথায় এমন কোনও শয়তানি বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর কি না ভাবতে লাগলুম। অন্তত এটা সত্য হলে এই অদ্ভুত হত্যার একটা উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।

চন্দ্র কি আগে থাকতেই স্থির করে রেখেছিল যে, প্রতাপনারায়ণ ও স্ত্রীকে হত্যা করবার পরে সূর্যবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেবে? সূর্যবাবুকে হঠাৎ জলাভূমিতে পেয়ে সে তাঁকে হত্যা করেছে, তারপর সে কি আক্রমণ করবে করুণাদেবীকেও?

ব্যাপারটা প্রথমে খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হল না—যদিও আমি জানি প্রথম শ্রেণির দুরাত্মার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমার ধারণা সত্য হলে অতঃপর চন্দ্র কী করতে পারে, সেটাও আন্দাজ করবার চেষ্টা করলুম। সে নিশ্চয় সময় ও সুযোগ নষ্ট করবে না। মদনপুরে বার বার রহস্যময় ও উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, ক্ষেত্র প্রস্তুত। করুণাদেবীও যদি এই সময়ে নিহত হন এবং তাঁর দেহ খুঁজে না পাওয়া যায়, পুলিশের দৃষ্টি তাহলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে না নিশ্চয়ই!

আমি ছুড়লুম আঁধারে ঢিল। রাত্রের অন্ধকারে চন্দ্রের উদয় দেখবার আশায় সদলবলে নিলুম বাগানের ঝোপের ভিতরে আশ্রয়। তার পরের কথা আপনারা সব জানেন।'

জিতেনবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, বিচিত্র আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা!'

সতীশবাবু বললেন, 'আমি বলি, বিচিত্র ওঁর মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতা! কী বলেন মানিকবাবু।'

মানিক বললে, 'আমি কিছুই বলি না। সোনা যে সোনা কে না তা জানে? জয়ন্ত হচ্ছে জয়ন্তই, ওকে আর নতুন সুখ্যাতি করব কী?' হাতকড়ি পরে চন্দ্রশঙ্কর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বললে, 'একটা অসম্ভব রূপকথা শুনলুম। জয়ন্তবাবুর নামে মানহানির আর ক্ষতিপূরণের মামলা আনব।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'উত্তম!' গাড়ি থানার সামনে এসে থামল।

একজন পুলিশ কর্মচারী সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, 'স্যার, জলাভূমির ভিতর থেকে প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর খণ্ডবিখণ্ড দেহ পাওয়া গিয়েছে।'

নবম

কিল মারবার গোঁসাই

দু-দিন পরের সকাল। ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু। সামনের টেবিলে সাজানো খাবার ও পানীয়—টোস্ট, ডিম আর চা।

দুই গ্রাসে দুটো ডিম উদর-দেশে প্রেরণ করে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম!'

মানিক বললে, 'মানে?'

—'আমার পক্ষে দুটো ডিম তো দুই টিপ নস্যের সামিল। আরও গোটা-চারেক হলে অন্তত মন্দের ভালো হয়।'

—'কাল থেকে চায়ের সঙ্গে আপনাকে দুটো গোটা মুরগির রোস্ট দিতে বলব।'

—'ওটা হবে অধিকন্তু। আমি কি অতটা বাড়াবাড়ি করতে বলছি ভায়া?'

জয়ন্ত নিজের ডিমের থালাখানা সুন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আজ আমার খিদে নেই, আরও দুটো ডিম আপনিই গ্রহণ করুন।'

মানিক বললে, 'আমার কিন্তু খিদে আছে। আমি জয়ন্তের মতো উদার হতে পারব না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কে তোমার কাছে ভিক্ষে চায়?'

—'এই তো আপনি বললেন আরও চারটে ডিম ভক্ষণ করতে চান। নিশ্চয়ই আমাদের থালার দিকেই আপনার দৃষ্টি ছিল!'

—'না, কক্ষনো নয়! অন্তত তোমার থালার খাবার আমার পক্ষে গোমাংস!'

—'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, জয়ন্তের থালার দিকে আপনার দৃষ্টি ছিল?'

মানিকের কথা যেন শুনতে পাননি এমনি ভাব দেখিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, আর আমার এখানে থাকবার সাধ নেই।'

—'কেন?'

—'তুমি জমিদারবাড়ির মামলার কিনারা করেছ বটে, কিন্তু যেজন্যে আমরা এখানে এসেছি সেই আসল মামলার তো কিছুই হল না! আর কতদিন এখানে বসে বসে আজে বাজে লোকের মুখনাড়া সহ্য করব?'

—'ব্যস্ত হবেন না সুন্দরবাবু, 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্'!'

ঠিক এই সময়ে সেখানে এসে দাঁড়ালেন জিতেনবাবু। তাঁর মুখ-চোখ উত্তেজিত।

—'কী খবর?'

—'আবার নতুন কাণ্ড!'

—'অর্থাৎ?'

—'মদনপুরের হত্যাকারী আবার দেখা দিয়েছে!'

—'আবার খুন? লাশ উধাও?'

—'না, অতটা নয়।'

—'তবে?'

—'এবারে সে খুন করতে পারেনি।'

—'তবে সে কী করেছে?'

—'খুনের চেষ্টা।'

—'ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

আসন গ্রহণ করে জিতেনবাবু বললেন, 'শুনুন। হরিহরবাবু এখানকার একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। কাল রাত্রে হত্যাকারী তাঁরই বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছিল।'

—'সে যে হত্যাকারী, তার প্রমাণ কী?'

—'হরিহরবাবুর কথা শুনলে এবিষয়ে কোনওই সন্দেহ থাকে না।'

—'হরিহরবাবু কী বলেছেন?'

—'গোড়া থেকে শুনুন। জানেন তো, উপর-উপরি এইসব কাণ্ডের জন্যে আজকাল মদনপুরের গৃহস্থরা রাত্রেও সজাগ হয়ে থাকে? রাত্রে কোথাও খুট করে একটা শব্দ হলেই তারা চমকে না উঠে পারে না।

'কাল রাত প্রায় তিনটার সময়ে হঠাৎ কী একটা উচ্চশব্দে হরিহরবাবুর ঘুম ভাঙে। তিনি সাহসী লোক, শিকারের শখ তাঁর ষোলো আনা, প্রায়ই শিকার করতে যান, বাড়িতে বন্দুকও আছে। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে তিনি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

'চাঁদ তখন অস্তে গিয়েছিল। কিন্তু বারান্দায় জ্বলছিল একটা হারিকেন লণ্ঠন। বারান্দায় এসেই হরিহরবাবুর মনে হল সিঁড়ির উপরে যেন কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। যেন কেউ সন্তর্পণে উপরে উঠছে! শব্দ এত মৃদু যে, অন্য কেউ হলে হয়তো শুনতেই পেত না। কিন্তু হরিহরের কান হচ্ছে শিক্ষিত শিকারির কান।

'বারান্দার ধারে গিয়ে হরিহরবাবু সিঁড়ির দিকে করলেন দৃষ্টিপাত। লণ্ঠনের আলো সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছোয়নি বটে, কিন্তু তারই আলোর আভায় সেখানকার অন্ধকার ঘন হতে পারেনি।

'ভালো করে না হোক, আবছায়ার মতো দেখা গেল, একটা মূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে ধীরে ধীরে! মনে হল মানুষেরই মূর্তি, কিন্তু সে সোজা হয়ে উপরে উঠছিল না, উঠছিল হাত ও পায়ের

সাহায্যে সিঁড়ির উপরে লম্বমান হয়ে! চতুস্পদ জন্তুরা ঠিক সেইভাবে সোপান অতিক্রম করে! কিন্তু মূর্তিটা যদি মানুষ না হয়, তবে সেটা কী জন্তু তাও বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু জন্তুটা যে খুব বড়ো, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'হরিহরবাবুর মনে সন্দেহ হল, মূর্তিটা মানুষেরও নয়, জন্তুরও নয়—সে কোনও ভৌতিক দুঃস্বপ্নের অস্পষ্ট ছায়া! তিনি সাহসী হলেও তাঁর বুকের ভিতরে জাগল কেমন এক অপার্থিব আতঙ্ক! তবু প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কোনও রকমে তিনি বন্দুক তুললেন এবং ঘোড়া টিপে দিলেন।

'বন্দুকের প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটাও গর্জন করে উঠল। সে গর্জন নাকি অত্যন্ত ভয়াবহ—শুনলে বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায় বরফের মতো! এবং সে-রকম গর্জন নাকি কোনও মানুষেরই কণ্ঠ থেকে বেরুতে পারে না, তা হচ্ছে একেবারেই অমানুষিক।

'মূর্তিটা বিদ্যুৎবেগে সিঁড়ির নীচের দিকে সুদীর্ঘ একটা লম্ফ ত্যাগ করলে—ধুপ করে একটা শব্দ হল, তারপর সব চুপচাপ!

'রাত্রে হরিহরবাবু আর নীচে নামতে ভরসা করেননি, তবে এটুকু বুঝতে পারলেন, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে।

'আজ খুব ভোরে উঠে নীচে নেমে তিনি দেখেছেন, তাঁর বাড়ির সদর দরজা খোলা—কার প্রচণ্ড ধাক্কায় তার খিল গিয়েছে ভেঙে।

'এই তো ব্যাপার জয়ন্তবাবু, এখন এই ঘটনা থেকে আমরা কী বুঝব?'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, 'একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

—'কী?'

—'মূর্তিটা পালিয়ে গেছে বন্দুকের ভয়ে।'

—'তা থেকে কী প্রমাণিত হয়?'

—'প্রমাণিত হয়, সে আগ্নেয় অস্ত্রের মহিমা জানে।'

—'কিন্তু এ প্রমাণ পেয়ে আমাদের লাভ কী? আমরা জানতে চাই সে মানুষটা জন্তু না ভূত?'

—'ভূতের কথা বাদ দিন। ভূত বন্দুক বা কামানকে ভয় করবে কেন? যারা ভূত মানে, তারা তো বলে—ভূত হচ্ছে অশরীরী!'

—'মানলুম সে ভূত নয়, কিন্তু তবু তো হালে পানি পাচ্ছি না।'

—'আমি অথই জলে।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, 'বাব্বাঃ! এই ডাকবাংলোর চারিদিকেই মাঠ আর জঙ্গল! কোনদিন হয়তো এর ওপরেই সেই না-মানুষ না-জন্তুটার দৃষ্টি পড়তে পারে! জানলা-দরজার বাধা তার কাছে বাধাই নয়! আমি যে কী করব বুঝতেই পারছি না—হুম!'

মানিক বললে, 'উপবাস করে রোগা হবার চেষ্টা করুন সুন্দরবাবু! শুনেছেন তো, ওই মূর্তিটার লোভ হচ্ছে মানুষের দেহেরই উপরে? আপনার এই একটিমাত্র নধর দেহ, মাংস আছে তিন-তিনটে নরদেহের মতন। আপনার দেহ একবারমাত্র নিরীক্ষণ করলে মূর্তিটার জঠরানল জ্বলে উঠতে পারে দাউ দাউ করে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'থামো বাপু, তুমি আর ফোড়ন দিয়ো না! ভাত দেবার কেউ নন, কিল মারবার গোঁসাই! তুমি হচ্ছ তাই!'

জয়ন্ত আর কোনও কথাই বললে না, কী যেন ভাবতে লাগল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে।

দশম

ভাঙা কুলো নিয়ে টানাটানি কেন

দিনকয় সব চুপচাপ। মদনপুরের হত্যাকারীর আর কোনও পাত্তাই নেই।

কেউ কেউ বললে, 'হরিহরবাবুর বন্দুকের গুলিতে সে আহত হয়েছে।'

কিন্তু হরিহরবাবু সে কথা মানেন না। বলেন, 'সে জখম হলে ঘটনাস্থলে রক্তের দাগ থাকত। আমার গুলি তার গায়ে লাগেনি। তবে বন্দুকের ধমক খেয়ে সে বোধ হয় ভয় পেয়েছে, হয়তো কিছুকাল আর এপথ মাড়াবে না।'

হত্যাকারী দেখা দিক আর নাই-ই দিক, কিন্তু যে-রহস্য, সেই-রহস্যই থেকে গেল! কেন সে অকারণে এমন খুন আর লাশ চুরি করতে চায়? সে কে? কোথা থেকে আসে? কোথায় অদৃশ্য হয়?

মাঝে মাঝে মনে হয় সে হচ্ছে নরখাদক হিংস্র জন্তু। মুণ্ডহীন দুটো মৃতদেহের কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু ধারালো দাঁতের দাগ পাওয়া গিয়েছে। হরিহরবাবু তাকে চতুষ্পদ জন্তুর মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছেন। তার গর্জন যারাই শুনেছে তারাই বলেছে, অমানুষিক।

কিন্তু ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় জন্তুর নয়—মানুষের হাত-পায়ের দাগ। সে গায়ের জোরে দরজা ভেঙে বা জানলার লোহার গরাদে দুমড়ে বার করে নিয়ে লোকের বাড়িতে ঢোকে। নরখাদক জন্তুরা এ ভাবে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়েছে বলে শোনা যায় না।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে যে নরমুণ্ডকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে?

এই অদ্ভুত হত্যাকারীর মনুষ্যত্ব বা পশুত্ব—দুই-ই প্রমাণ করবার উপায় নেই! তাকে ভূত বলে মানলে অনেকগুলো প্রশ্নের নিশ্চিত বা অনিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায়, কারণ প্রেতের আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কারুর কোনও সঠিক ধারণা নেই। ভূতের মূর্তি নাকি যে-কোনও রকম হতে পারে আর সে নাকি করতে পারে যে-কোনও রকম অলৌকিক কাজ।

কিন্তু বেশি লোকের ভিড় দেখলে বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে টেনে লম্বা দেয়, কে কবে শুনেছে এমন ভীরু ভূতের কথা?

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! মাথাকে অনেক খাটিয়ে আর ঘামিয়ে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে হাজির হয়েছি।'

মানিক বললে, 'বলেন কী?'

'আমি তোমাকে কিছুই বলছি না। আমার বক্তব্য আমি জয়ন্তকে শোনাতে চাই।'

জয়ন্ত বললে, 'শোনান।'

—'মানুষ হয়েও জন্তুর মতন ব্যবহার করতে পারে কে?'

—'পাগল।'

—'ঠিক। এ-সব হচ্ছে কোনও ভীষণ উন্মত্তের কীর্তি।'

—'ও কথা এক-একবার আমারও মনে হয়েছে, কিন্তু ওর উপরে আমি কিছুতেই জোর দিতে পারছি না।'

—'কেন?'

—'এইসব হত্যাকাণ্ডে যুক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু পাগলামিরও কোনও লক্ষণ নেই।'

—'কী রকম?'

—'প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যাকারী একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করেছে। পাগল কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতির ধার ধারে না।'

সুন্দরবাবু চুপ করে রইলেন।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, অকারণেই আপনার মাথা খেটে আর ঘেমে মরল—আহা, বেচারি! আসুন, পাখার বাতাস দিয়ে তাকে একটু ঠান্ডা করি!'

মানিক পাখার দিকে হাত বাড়ালে, রেগে গসগস করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন সুন্দরবাবু।

একজন চৌকিদার এসে জয়ন্তের হাতে দিলে একখানা চিঠি!

জিতেনবাবু লিখেছেন

'জয়ন্তবাবু,

গত রাত্রে আবার হত্যাকারীর আবির্ভাব হয়েছিল। এবারে সে খালি হাতে ফিরে যায়নি—আবার এক হতভাগ্য মারা পড়েছে আর তার দেহ হয়েছে অদৃশ্য।

এখনই আমি ঘটনাস্থলে যাত্রা করব। আমার সঙ্গে যাবার জন্যে আপনাদেরও আহ্বান করছি। ইতি।'

পত্র পাঠ করে জয়ন্ত বললে, 'যাক, এবারে আর পরের মুখে ঝাল খেতে হবে না।'

মানিক বললে, 'একথা কেন বলছ?'

—'মদনপুরের হত্যাকারী প্রথম যে তিনটে খুন করেছিল, তার কাহিনি আমরা পাঠ করেছি খবরের কাগজে। বাকি কথা শুনেছি পুলিশের মুখে। আমরা ঘটনাস্থল হাতে-নাতে পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। ঘটনাস্থলের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে গোয়েন্দাকে কাজ করতে হয় অন্ধের মতো। আর ঘটনার অনেকদিন পরে ঘটনাস্থলে গেলেও বিশেষ কোনও ফল হয় না। এই জমিদার-বাড়ির মামলাটাই দ্যাখো। আমরা যদি যথাসময়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির না হতুম, তাহলে কোনও সূত্রই দেখতে পেতুম না, অপরাধীও হয়তো ধরা পড়ত না, চন্দ্রশঙ্কর হত আজ প্রতাপনারায়ণের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী!'

—'তাহলে এবারে তুমি অন্ধ রাত্রির পর সূর্যোদয় দেখবার আশা করছ?'

—'অতটা না হোক, একটা কিছু আশা করছি বটে। নাও, এখন ওঠো। সুন্দরবাবুকে ডাকো।'

—'সুন্দরবাবু! অ সুন্দরবাবু!'

বারান্দা থেকে কর্কশ জবাব এল—'বাক্যি-বাণে জ্বালিয়ে মেরে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন?'

—'আরে মশাই, আবার একটা খুন হয়েছে। আমাদের এখনই ঘটনাস্থলে যেতে হবে।'

—'তা যাও-না তোমরা। আমার মতো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোকে নিয়ে টানাটানি কেন।'

—'বাপরে, তাও কি হয়? আপনি সঙ্গে না থাকলে আমাদের ঘটে বুদ্ধি সরবরাহ্ করবে কে? আসুন আসুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন।'

—'হুম!'

একাদশ

রক্তচিহ্নের অনুসরণ

ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হতে হতে জিতেনবাবু বললেন, 'এবারে খুন হয়েছে এক বিদেশি ভিখারি। কাল সন্ধ্যার সময়ে সে এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চেয়ে কিছু খাবার পায়। তাই খেয়ে সেই বাড়িরই বাইরেকার রোয়াকে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। সকলে তাকে সেখানে শুতে মানা করে, বিপদের কথাও বলে। সে কিন্তু কারুর মানা মানেনি। বোধ হয় ভেবেছিল, মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সকলে তাকে সেখান থেকে তাড়াবার ফিকিরে আছে!'

—'তারপর?'

—'গভীর রাত্রে বিকট আর্তনাদে বাড়ির সকলের ঘুম যায় ছুটে? একটা মানুষ চিৎকার করে বলছে—'রক্ষা করো, রক্ষা করো!' তারপরই শোনা গেল একটা জন্তুর হিংস্র গর্জন। তারপর মানুষ বা জন্তু আর কারুরই সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়ির একজন লোক কৌতূহল দমন করতে না পেরে ছাদে গিয়ে উঠল। কাল চতুর্দশীর রাত গিয়েছে—চারিদিকে ছিল ধবধবে চাঁদের আলো। লোকটি ছাদের ধারে গিয়ে দেখলে, খানিক তফাতে একটা মিশকালো চতুষ্পদ জন্তু মানুষের দেহের মতো কী একটা জিনিস মুখে করে কামড়ে ধরে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!'

—'সেটা কী জন্তু?'

—'চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু দূর থেকে জন্তুটাকে চেনা যায়নি।'

—'জন্তুটা কত বড়ো, তাও বোঝা যায়নি?'

—'এইটুকু শুনেছি, জন্তুটা নাকি চিতাবাঘের চেয়ে ছোটো নয়।'

—'সে চার পায় ভর দিয়ে যাচ্ছিল?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু এও শুনলুম, চিতাবাঘ যেমন করে হাঁটে তার হাঁটুনি নাকি তেমনধারা নয়।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর বলবার কথা বেশি নেই। জন্তুটা চলে যায় মদনপুরের পুব-প্রান্তরের দিকে। .....এই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি। এই বাড়ির ওই রোয়াকের উপরেই ভিখারিটা শুয়েছিল। দেখুন জয়ন্তবাবু, রোয়াকের উপরে আর তলায় কত রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এই দেখুন হত্যাকারীর হাতের আর বিকৃত পায়ের ছাপ!'

—'এ তো জন্তুর হাত-পায়ের চিহ্ন নয়!'

'না, মানুষের। এই দাগগুলোই তো আমাদের মাথা একেবারে গুলিয়ে দিয়েছে। দেখা দেয় জন্তু, গর্জন করে জন্তু, কিন্তু রেখে যায় মানুষের হাত-পায়ের ছাপ! এ কী রকম অলৌকিক কাণ্ড!'

জয়ন্ত মাটির উপরে হেঁট হয়ে পড়ে একমনে হাত ও পায়ের চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু আর একবার মাথা খাটাবার এবং ঘামাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'জয়ন্ত!'

—'আজ্ঞে।'

—'আমার কী সন্দেহ হয় জানো?'

—'কী?'

—'কোনও মানুষই জন্তুর ছদ্মবেশ পরে আর জন্তুর মতো হেঁটে এই সব খুন করছে।'

—'কেন?'

—'পুলিশের চোখে ধুলো দেবে বলে, আবার কেন?'

—'মানলুম। কিন্তু মৃতদেহগুলো নিয়ে সে কী করে বলুন দেখি? সে টাকাকড়ি চায় না, তার লোভ কেবল মৃতদেহের উপরে। কেন?'

সুন্দরবাবু জবাব খুঁজে পেলেন না।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'জিতেনবাবু, কাল যিনি জন্তুটাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি এখানে হাজির আছেন?'

পুলিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। জিতেনবাবুর ইঙ্গিতে একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনি কাল যে-জন্তুটাকে দেখেছিলেন সেটা চিতাবাঘের মতো বড়ো, কিন্তু চিতাবাঘ নয়?'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

—'এমন বিশ্বাসের কারণ?'

—'তার চালচলন চিতাবাঘের মতন নয়।'

—'আপনি চিতাবাঘ দেখেছেন?'

—'অনেকবার।'

—'কোনও কোনও জাতের কুকুরও চিতাবাঘের মতো বড়ো হয় জানেন?'

—'জানি। কিন্তু সে জন্তুটা কুকুরও নয়।'

—'তবে সেটা কী হতে পারে?'

—'জানি না। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি।'

—'তার ল্যাজ আছে?'

—'থাকতে পারে, কিন্তু আমি দেখিনি।'

—'সে এখান থেকে কত দূরে ছিল?'

হাত তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ওইখানে।'

যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত মাটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ধুলোর উপর দিয়ে একটা রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। এই চিহ্ন ধরে যে কোনও শিশুও অগ্রসর হতে পারে। আসুন সবাই, আমরাও অগ্রসর হই। দেখা যাক জন্তুটা কোথায় গিয়েছে!'

রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মদনপুরের প্রান্ত ছাড়িয়ে প্রান্তরের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর সেই দাগ চলে গিয়েছে পূর্ব-দক্ষিণের অরণ্যের দিকে। সকলে জয়ন্তের পিছনে পিছনে অরণ্যের দিকে এগিয়ে গেল।

অরণ্য। সেখানেও রক্তের দাগ। আরও খানিক এগিয়ে দেখা গেল, দাগটা প্রবেশ করেছে মস্ত একটা ঝোপের ভিতরে।

জয়ন্ত বাহির থেকেই ঝোপটার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারলে। ঝোপের উপরে হাতের লাঠি দিয়ে বার-কয়েক আঘাত করলে।

জিতেনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন জন্তুটা ওই ঝোপের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে?'

—'তাই মনে করছিলুম বটে। কিন্তু সে এখানে নেই। আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি আগে ঝোপের ভিতরটা দেখে আসি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু খুব সাবধান!'

জয়ন্ত হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। মিনিটখানেক পরে আবার ঝোপের বাইরে ফিরে এল সেই ভাবেই। মুখ তার গম্ভীর।

মানিক বললে, 'কী দেখলে?'

—'বীভৎস দৃশ্য?'

—'হ্যাঁ। ঝোপের ভিতরে রয়েছে একটা আধখান-খাওয়া মানুষের দেহ। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো আছে মাংসহীন হাড়ের টুকরো আর নাড়িভুঁড়ি। জন্তুটা এখানে নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, ওই জন্তুটা মানুষ মারে মাংস খাবার জন্যে?'

জিতেনবাবু ঝোপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, জয়ন্ত বললে, 'ওদিকে যাবেন না।'

—'কেন?'

—'সেই জন্তু বা কিম্ভুতকিমাকার জীবটা আবার ওই ঝোপে ফিরে আসবে।'

—'কী করে জানলেন?'

—'ধরুন বাঘের কথা। কোনও জীব বধ করে একদিনে সে তার সবটা খেতে পারে না। বাকি অংশটা পরে খাবে বলে ঝোপঝাপের ভিতরে লুকিয়ে রেখে যায়। আমার বিশ্বাস এই জন্তুটাও তাই করেছে। এখানে যখন আধখানা খাওয়া মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে গিয়েছে, সে আবার এখানে আসবে—খুব সম্ভব আজ রাত্রেই। আমি চাই ঝোপের ভিতরটা যেমন আছে তেমনি থাক। সে যেন সন্দেহ করতে না পারে ওখানে বাইরের কেউ এসেছিল।'

—'এখন আমাদের কী কর্তব্য?'

—'ঝোপের পাশেই রয়েছে ওই প্রকাণ্ড বটগাছটা। তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে এসে, জনচারেক মানুষ বসতে পারে এমন একটা মাচান তৈরি করে ফেলুন ওই গাছের ডালে।'

—'আজ আমাদের ওইখানেই রাত্রিবাস করতে হবে নাকি?'

—'নিশ্চয়ই। ওই জন্তুটা কী, তা জানতে পারলেই মদনপুরের সমস্ত হত্যারহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

সুন্দরবাবু বিড় বিড় করে বললেন, 'সারলে রে! জয়ন্ত আমাকেও দেখছি ছাড়বে না। আমার এই বিপুল বপু, আর ওই উঁচু গাছের মচমচে মাচান! সর্বনাশ, হুম!'

দ্বাদশ

আলোকমণ্ডলে অপচ্ছায়া

পূর্ণিমার রাত্রি।

মদনপুরের ধু ধু প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে আজ জ্যোৎস্নার বন্যায়, সেখান দিয়ে যেন যে-কোনও মুহূর্তে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে পারে রূপকথার পরমসুন্দর রাজকুমার।

কিন্তু তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল অরণ্য, তার মধ্যে ঢুকলে পূর্ণিমাকে আর পাওয়া যায় না পরিপূর্ণ রূপে। তবে সেখানেও দেখা যায় আর এক রূপের ছবি। সেখানে চন্দ্রকিরণ খেলে অন্ধকারের সঙ্গে লুকোচুরি। সেখানে আলো আর আঁধার দেখায় যেন আশা আর নিরাশার ছন্দর।

কিন্তু সেখানে খালি রূপের ছবি নয়, কানের কাছে ধরা দেয় যে অভাবিত শব্দময় জগৎ, তার

সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক অল্প। সাপ করে ফোঁশ ফোঁশ, হিংস্র জন্তু করে বুভুক্ষু চিৎকার, আক্রান্ত জীব করে অন্তিম আর্তনাদ।

যেখানেই অন্ধকার সেখানেই মনে হয়, ভয়াবহ মৃত্যুদূতরা গোপনে বসে ষড়যন্ত্র করছে জীবনের বিরুদ্ধে। তার উপরে আছে গহন রাত্রির রোমাঞ্চকর, রহস্যময় ভাষা, যা কানে শোনা যায় না, অনুভব করতে হয় প্রাণে প্রাণে।

বটগাছের মাচানের উপরে আছে চার মূর্তি—জয়ন্ত, মানিক, জিতেনবাবু ও সুন্দরবাবু।

কারুর মুখেই টুঁ-শব্দটি নেই। প্রত্যেকেই বসে আছে স্থির পাথরের পুতুলের মতো। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ নীচেকার মস্ত ঝোপের দিকে। যে-কোনও সময়ে ওখানে যে আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা হতে পারে তার জন্যে যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রস্তুত হয়ে আছে সকলেই।

এইভাবে কেটে গেছে প্রায় তিন ঘণ্টা।

সুন্দরবাবুর মনে হয়েছে এই তিন ঘণ্টা যেন তিন যুগ। এখানে আছে আবার সেই পাজির পা-ঝাড়া মশার দলের সঙ্গে নতুন নতুন জাতের অজানা কীটপতঙ্গ। তাদের অনেকেই কামড়ায় তো বটেই, তার উপরে আবার সুবিধা পেলে নাক আর কানের ছ্যাঁদায় ঢুকে পড়তেও ছাড়ে না। কানে পোকা ঢুকলে কান ভোঁ ভোঁ করে বটে, বাইরে তা শোনা যায় না। কিন্তু নাকের ভিতরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করলে মানুষ কি না-হেঁচে কিংবা সশব্দে ফ্যাচ ফ্যাচ না-করে থাকতে পারে? এরই মধ্যে সুন্দরবাবু তিনবার জোরে হেঁচে ফেলেছেন এবং সশব্দে ফ্যাচ-ফোচ করেছেন অন্তত বার ছয়েক।

নীচের ঝোপটার উপরে এতক্ষণ খানিকটা চাঁদের আলো জেগে ছিল, এখন তা সরে গেল ধীরে ধীরে। ঝোপটা এখনও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

হঠাৎ দুটো ছোটো জানোয়ার সভয়ে শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে বেগে পালিয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, ওরা পালিয়ে গেল কাকে দেখে?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল অবিলম্বেই। কিছু দূরে ছিল চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল খানিকটা জায়গা। আচম্বিতে সেই আলোকমণ্ডলের ভিতর দিয়ে মূর্তিধারী জীবন্ত অভিশাপের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কী একটা বৃহৎ জন্তু প্রচণ্ড তীব্রগতিতে বড়ো ঝোপটার দিকে ছুটে এল।

ঝোপ থেকে একটু তফাতে এসে মূর্তিটা যে স্থির হয়ে দাঁড়াল, এটুকুও বেশ বোঝা গেল।

দুটো কটমটে, বন্য ও দপদপে চক্ষু বটগাছের উপরদিকে তাকিয়ে আছে! তার দেহ প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু দৃশ্যমান জ্বলন্ত চক্ষু!

জয়ন্ত বুঝলে, জন্তুটা তাদের আবিষ্কার করে ফেলেছে! সে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে ধরলে।

জন্তুটা একবার চাপা গর্জন করলে, তারপর একলাফ মেরে ফিরে আবার সেই আলোকমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তির বেগে!

জয়ন্ত এরই জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। তার বন্দুক হুঙ্কার দিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আকাশ-ফাটানো বন-কাঁপানো অমানুষিক চিৎকার করে জন্তুটা মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। দু-একবার ছটফট করলে, তারপরেই একেবারে আড়ষ্ট।

আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জয়ন্ত তার নিশ্চেষ্ট দেহ লক্ষ্য করে আবার একবার বন্দুক ছুড়লে। কিন্তু মূর্তি আর নড়ল না।

জয়ন্ত গাছ থেকে নামতে নামতে বললে, 'জিতেনবাবু, আপনারাও আসুন!'

সবাই আলোকমণ্ডলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সকলেরই দৃষ্টি বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ওটা কীসের মূর্তি? মানুষের না জন্তুর?

টর্চের আলোতে দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গ মানুষের মতন বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই তার কোথাও! সমস্ত দেহটাই লম্বা লম্বা কালো লোমে আচ্ছন্ন, মাথায় জট-পাকানো দীর্ঘ, রুক্ষ চুল, কর্কশ ও বৃহৎ দাড়ি-গোঁফে মুখখানা প্রায় ঢাকা। বোজা চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল না। নাসারন্ধ্র অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত। পশুভাবপূর্ণ পুরু পুরু ফাঁক-করা ওষ্ঠাধরের ভিতর থেকে বড়ো বড়ো হিংস্র ও বিবর্ণ দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীর কোনও মানুষেরই দাঁত ও-রকম হয় না। হাতের ও পায়ের আঙুলেও অত্যন্ত লম্বা ও ধারালো নখ। পায়ের চেটোও বিকৃত—এরকম পা নিয়ে কেউ মানুষের মতন সোজা হয়ে মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে না!

এ যেন অর্ধ-মানব ও অর্ধ-পশুর দেহ!

সকলের আগে কথা কইলে মানিক। বললে, 'গুলি খেয়ে এই মূর্তিটা যখন চেঁচিয়ে উঠেছিল, তখন আমার মনে হয়েছিল, যেন একটা নেকড়ে-বাঘ চিৎকার করছে!'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক বলেছ মানিক! আমারও বিশ্বাস, এ হচ্ছে নেকড়ে-মানুষ!'

জিতেনবাবু বললেন, 'নেকড়ে-মানুষ আবার কী?'

—'নেকড়ে-বাঘের দ্বারা পালিত মানুষ।'

—'তাও আবার হয় নাকি?'

—'এদেশের সংবাদপত্রে—এমনকি মাসিক পত্রিকাতেও এই রকম সব নেকড়ে-মানুষের বিবরণ আর ছবি বারকয়েক প্রকাশিত হয়েছে। একটি নেকড়ে-মানুষের ফটোও আমার কাছে আছে। তবে সে পুরুষ নয়, মেয়ে। রাঁচি অঞ্চলের বনে তাকে পাওয়া যায়। এক পাদরিসাহেব তাকে পালন করেন।'

—'আশ্চর্য ব্যাপার!'

—'কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়তো নেকড়ে-বাঘিনীর বাচ্চাগুলো কোনও গতিকে মারা গিয়েছিল; তারপর খুব শিশু অবস্থায় এই মানুষটাকে সে চুরি করে নিয়ে যায়—নেকড়েদের মনুষ্য-শিশু চুরি করার বদ-অভ্যাসও আছে। তারপর যে কোনও কারণেই হোক নেকড়ে-মায়ের প্রাণে মায়া বা স্নেহের উদ্রেক হয়, শিশুকে সে বধ না করে প্রথমে নিজের দুগ্ধ দিয়ে, পরে শিকার-করা জীবজন্তু খাইয়ে পালন করে। নেকড়ের সঙ্গে থেকে থেকে এই মানুষটাও ক্রমে নেকড়ে-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আফ্রিকায় একবার একটি মানুষের মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল, তাকেও শিশু-বয়সে চুরি করে পালন করেছিল গরিলারা, আর তারও প্রকৃতি হয়ে গিয়েছিল গরিলাদেরই মতো। এই মাসকয়েক আগেই সংবাদপত্রে আর মাসিক পত্রিকায় একটি হরিণ-মানুষের ছবি আর বিবরণ বেরিয়েছে, আপনারা দেখেননি? সে বাস করত বনের হরিণদের সঙ্গে, হঠাৎ ধরা পড়েছে বলেই আমরা তার কথা জানতে পেরেছি।'

জিতেনবাবু একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অদ্ভুত এই পৃথিবীর রহস্য, আমরা কতটুকু খবরই বা

রাখতে পারি? যাক, নেকড়ে-মানুষ আর ইহলোকে নেই, মদনপুরের বাসিন্দারা এইবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমিও বাঁচলুম! আর আগ-ডালে মগ-ডালে মাচানে বসে কীটপতঙ্গের খোরাক হতে হবে না—বাব্বা!'

মানিক বললে, 'আবার 'বাব্বা' কেন সুন্দরবাবু? আপনার সুবিখ্যাত 'হুম' শব্দটি উচ্চারণ করে এখন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে আজ্ঞা হোক!'

সুন্দরবাবু হাসতে হাসতে বললেন—'অবশ্য, অবশ্য! হুম!'

জয়ন্তের কীর্তি

রহস্যময় চুরি

সকাল বেলা। শীতকাল। খিড়কির ছোট বাগানে একপাশে, একখানা ইজি-চেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত একমনে বিলাতী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছে আর তার গায়ের উপর দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে, কাঁচা সোনার মতো কচি রোদের মিষ্টি হাসিটুকু।

এমন সময় মানিকলাল ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে ছুটে এসে বললে, "জয়, জয়—"

জয়ন্ত বই থেকে মুখ তুলে বললে, "হয়েছে কি? অমন করে ছুটে আসচ কোথেকে?"

—"মুকুন্দ নন্দীর গদী থেকে।"

—"কিন্তু ছুটে আসচ কেন? কেউ তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেচে নাকি?"

ইজি-চেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়ে মানিকলাল বললে, "হুঁঃ, আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে, এ-অঞ্চলে এমন লোক তো কাউকে দেখি না! আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আসচি তোমাকে একটা মস্ত খবর দেবার জন্যে। কাল মুকুন্দ নন্দীর গদীতে একটা রহস্যময় চুরি হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত সিধে হয়ে বসে বললে, "রহস্যময় চুরি?"

—"হুঁ। এই দেখ খবরের কাগজ।"

—"তুমি পড়ে শোনাও।"

মানিকলাল খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনাতে লাগল ঃ—

রহস্যময় চুরি

"গতকল্য গভীর রজনীতে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল নন্দীর গদীতে এক রহস্যময় চুরি হইয়া গিয়াছে। গদীর কার্য শেষ হইয়া যাইবার পর মুকুন্দবাবু যথারীতি হিসাব মিলাইয়া শয়ন করিতে যান। গদীতে সেদিন অনেক টাকার কাজ হইয়াছিল এবং সে টাকা লোহার সিন্দুকের ভিতরে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। সিন্দুকের পাশেই মুকুন্দবাবুর এক কর্মচারী শয়ন করিয়াছিল। গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কে তাহাকে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া জানালা দিয়া দ্বিতলের উপর হইতে নিম্নতলে নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে জানালার নিচেই মেদি-পাতার ঝোপ ছিল, তাই তাহার উপরে পড়িয়া লোকটি অজ্ঞান হইয়া গেলেও তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পর তাহার আর্তনাদে গদীর আর সকলকার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহার মুখ হইতে সমস্ত শুনিয়া মুকুন্দবাবু তখনি লোহার সিন্দুকের ঘরে যান। কিন্তু ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তখন দ্বার ভাঙিয়া ফেলা

হয়। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সকলে দেখেন যে, লোহার সিন্দুকের দরজা ভাঙা, — ভিতরে টাকাকড়ি কিছুই নাই। একটা জানালার চারিটা লোহার শিক দুম্‌ড়াইয়া কে বা কাহারা খুলিয়া ফেলিয়াছিল,—শিকগুলি বাড়ির বাহিরে জানালার ঠিক নিচেই পাওয়া গিয়াছে। চোরেরা যে এই ভাঙা জানালা দিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া আবার বাহির হইয়া গিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মুকুন্দবাবুর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সিন্দুক হইতে অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করিয়াছে।"

জয়ন্ত সমস্ত শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে, "আচ্ছা মানিকলাল, মাস-তিনেক আগে ভবানীপুরের এক বড় জুয়েলারের দোকান থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি যায়, মনে আছে?"

—"আছে। কিন্তু সে-চুরির সঙ্গে এ-চুরির সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু সে-চুরির সঙ্গে এ-চুরির মিল আছে অনেকটা।"

—"হ্যাঁ, তা বটে। চোরেরা সেখানেও জানালার লোহার গরাদ ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল আর লোহার সিন্দুকের কপাট ভেঙে গহনা নিয়ে পালিয়েছিল—ঠিক কথা।"

জয়ন্ত বললে, "কেবল তাই নয়, একজন দরওয়ানকে ধরে তুলে এমন আছাড় মেরেছিল যে, তার প্রাণ প্রায় যায়-যায় হয়েছিল।"

মানিকলাল উৎসাহিত হয়ে বললে, "ঠিক, ঠিক! তুমি কি বল, সেই চোরের দলই মুকুন্দ নন্দীর গদীতে এসে হানা দিয়েচে?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "আমি এখন ও-সব কিছুই বলতে চাই না। আমি এখন খালি জানতে চাই যে, মুকুন্দ নন্দীর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে কি না?"

মানিকলাল বললে, "হ্যাঁ, অল্প-স্বল্প আলাপ-পরিচয় আছে বৈকি! মুকুন্দবাবু আমাকে তো চেনেনেই, তোমারও খ্যাতি তাঁর অজানা নেই। এইমাত্র আমি যখন গদী থেকে আসি, তিনিও আমার সঙ্গে তোমার কাছে আসতে চাইছিলেন।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল, তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, একবার গদীটা দেখেই আসি।"

বেনামা চিঠি

এইবার আগে জয়ন্ত আর মানিকলালের একটুখানি পরিচয় দেওয়া দরকার।

জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না—তবে তার লম্বা-চওড়া চেহারার জন্যে বয়সের চাইতে তাকে অনেক বেশি বড় দেখায়। তার মতন দীর্ঘদেহ যুবক বাঙালী জাতির ভিতরে বড়-একটা দেখা যায় না—তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ভিড়ের ভিতরেও সে নিজেকে লুকোতে পারত না, সকলের মাথার উপরে জেগে থাক্‌ত তার মাথাই। রীতিমতো ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমনাস্টিক করে

নিজের দেহখানিকেও সে তৈরি করে তুলেছিল! বাঙালীদের ভিতরে সে একজন নিপুণ মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত। আপাতত এক জাপানী মল্লের কাছ থেকে যুযুৎসুর কৌশল শিক্ষা করছে।

মানিকলাল বয়সে জয়ন্তের চেয়ে বছর দুই-এক ছোট হবে। নিয়মিত ব্যায়ামাদির দ্বারা যদিও তারও দেহ খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু তার আকার সাধারণ বাঙালীরই মতন—ইচ্ছে করলেই সে আর পাঁচজনের ভিতরে গিয়ে অনায়াসেই আপনাকে লুকিয়ে ফেলতে পারত।

জয়ন্ত ও মানিকলাল দুজনেই এক কলেজে পড়াশুনা করত—কিন্তু 'নন-কো-অপারেশন' আন্দোলনের ফলে তারা দুজনেই কলেজী পড়াশুনো ত্যাগ করেছিল। তারা দুজনেই মাতা-পিতৃহীন, কাজেই স্বাধীন। দুজনেরই কিছু-কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে, কাজেই তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ও নেই।

ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভারি শখ, বিলাতী ডিটেক্‌টিভের গল্প পড়বার। এ-সব গল্প তারা একসঙ্গে বসেই পড়ত এবং গল্প শেষ হলে তাদের ভিতরে 'উত্তপ্ত' আলোচনা চলত! এড্‌গার অ্যালেন পো, গে-বোরিও, কন্যান ডইল ও মরিস লেব্‌লাঙ্ক প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের কাহিনী তো তারা একরকম হজম করেই ফেলেছিল এবং হাতে সময় থাকলে অবিখ্যাত লেখকদেরও রচনাকে তারা অবহেলা করতে পারত না। কিন্তু তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মতন ছিলেন কন্যান ডইল সাহেবের দ্বারা সুপরিচিত ডিটেক্‌টিভ শার্লক্ হোম্‌স্।

একটি বোতাম, এক টুক্‌রো কাগজ বা একটা ভাঙা চুরোটের পাইপের মতন তুচ্ছ জিনিস দেখে শার্লক্ হোম্‌স্ বড় বড় চুরির বা খুনের আসামীকে ধরে ফেলতে পারতেন, জয়ন্ত ও মানিকলাল রুদ্ধশ্বাসে তাঁর সেই বাহাদুরির কথা পাঠ করত এবং বসে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্নে দেখত, তারাও যেন গোয়েন্দা হয়ে শার্লক্ হোম্‌সের মতন তুচ্ছ সূত্র ধরে বড় বড় চুরি-রাহাজানি-খুনের কিনারা করে ফেলে লোকের চোখে তাগ্ লাগিয়ে দিচ্ছে!

এই ভাবে আলোচনা করতে করতে ক্রমে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি এতটা বেড়ে উঠল যে, পাড়ার কয়েকটা ছোটখাটো চুরির আসামীকে পুলিশের আগেই ধ'রে ফেলে সত্য-সত্যই সবাইকে অবাক্ করে দিলে। তারপর একটা শক্ত খুনের 'কেসে' তারা খুবই নামজাদা হয়ে পড়ল। পুলিশ যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সময়েই 'কেস'টা হাতে নিয়ে জয়ন্ত হপ্তাখানেকের ভিতরে খুনীকে ধরে পুলিশের কবলে সমর্পণ করেছিল!...এই রকম আরো চার-পাঁচটা জটিল চুরি ও খুনের রহস্য ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিকলালের নাম এখন চারিদিকেই সুপরিচিত।

* * *

জয়ন্ত ও মানিকলাল এসেছে শুনে মুকুন্দবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাদের খুব আদর করে গদীর ভিতরে নিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের একেবারে চুরির ঘরে নিয়ে চলুন। আমি বাজে কথায়

সময় নষ্ট করতে চাই না।"

যে-ঘরে চুরি হয়েছিল সে-ঘরে ঢুকে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে। ভাঙা লোহার সিন্দুকটা পরীক্ষা করে বললে, "আচ্ছা, এই সিন্দুক ভাঙার শব্দেও আপনাদের ঘুম ভেঙে যায়নি?"

মুকুন্দবাবু বললেন, "আমার ঘুম খুব সজাগ আর আমি পাশের ঘরেই থাকি। অথচ শুনলে আপনি অবাক্ হবেন যে, কাল আমার ঘুম ভাঙেনি!"

—"আপনার যে কর্মচারী আহত হয়েছেন, তিনি এখন কোথায়?"

—"হাসপাতালে!"

—"কারা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি কিছু বলেছেন?"

—"সে বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি, কারণ, অন্ধকারে সে কারুকেই দেখতে পায়নি। তবে যখন তাকে জানালা গলিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে চকিতের মধ্যে দেখ্তে পেয়েছিল যে, নিচে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

—"হুঁ" বলে জয়ন্ত একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে জানালায় আগে ছয়টা লোহার শিক ছিল, এখন মাত্র দুইটা অবশিষ্ট আছে। জয়ন্ত একটা শিক ধরে টেনে বুঝল, এ-রকম চার-চারটে শিক দুম্‌ড়ে খুলে ফেলা বড় সামান্য শক্তির কাজ নয়! হঠাৎ সেই শিকের এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। শিকটার লোহার গায়ে একটু চিড় খেয়েছে, এবং সেইখানেই একগোছা কটা চুল বা লোম আট্‌কে রয়েছে। জয়ন্ত সাবধানে ও সযত্নে সেই চুলের গোছা টেনে নিয়ে একখানা কাগজে মুড়ে পকেটের ভিতরে রাখলে এবং একটি শামুকের নস্যদানী থেকে এক টিপ্ নস্য নিয়ে নাকের ভিতরে গুঁজে দিলে।

মানিকলাল জানত, জয়ন্ত যখনি মনে মনে কোন কারণে খুশি হয়ে ওঠে, তখন এক টিপ্ নস্য না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আপাতত তার খুশি হবার কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে, এগিয়ে এসে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি?"

জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, "একটা ভালো সূত্র পেয়েচি। বৈকালে বলব।"

মুকুন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ওকি জয়ন্তবাবু, এখনি চললেন যে?"

জয়ন্ত বললে, "আমার যা জানবার তা জেনেচি। নতুন কিছু ঘটনা ঘট্‌লে আমাকে তখনি জানাবেন।"

মুকুন্দবাবু বললেন, "অবশ্যই তা জানাব। জয়ন্তবাবু, আপনার শক্তির কথা আগেই শুনেচি। দেখবেন, আমাকে যেন ভুলবেন না। পুলিশের চেয়ে আমি আপনাকেই বেশি বিশ্বাস করি। পুলিশ ঘুষ খায়, আপনি খাঁটি লোক।"

জয়ন্ত ফিরে রুক্ষস্বরে বললে, "আমি খাঁটি লোক, আপনি তা জানলেন কি করে? মিছে তোষামোদ আমি ভালোবাসি না।"

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, "মানিকলাল, বাড়িতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু

বিশ্রাম করেই আবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো”—বলেই সে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

মানিকলাল নিজের বাড়ির পথ ধরে অগ্রসর হল। যখন সে প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ একজন লোক পিছন থেকে তার নাম ধরে ডাক্‌লে।

মানিকলাল ফিরে দেখলে, কিন্তু তাকে চিনতে পারলে না।

লোকটা বললে, “আপনারই নাম তো মানিকবাবু?”

মানিকলাল ঘাড় নেড়ে জানালে, “হ্যাঁ।”

—“আপনার নামে একখানা চিঠি আছে, এই নিন।”

মানিকলাল হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলে। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়লে ঃ—

“মানিকবাবু, আমাদের চোখ সর্বত্র। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে চুরি হইয়াছে তো আপনাদের কি? যদি প্রাণের মায়া রাখেন, এ-ব্যাপার থেকে সরিয়া দাঁড়ান। নহিলে, মৃত্যু অনিবার্য।”

পত্রে লেখকের নাম নেই।

পত্র থেকে দৃষ্টি তুলে মানিকলাল দেখলে, যে চিঠি নিয়ে এসেছিল সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে!

মানিকলালের আর নিজের বাড়িতে যাওয়া হল না, সে আবার জয়ন্তের বাড়ির দিকে ছুটল।

দুই হাতের উপর মুখ রেখে জয়ন্ত চুপ করে টেবিলের সামনে বসে ছিল।

মানিকলাল ঘরে ঢুকেই চিঠিখানা টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, “জয়, আর এক নতুন কাণ্ড!”

জয়ন্ত একটুও নড়ল না, চিঠির দিকে তাকিয়েও দেখলে না। সহজ ভাবেই বললে, “চিঠিতে কি লেখা আছে আমি তা জানি।”

—“জানো?”

—“হ্যাঁ। আমিও এখনি ঐ-রকম একখানা চিঠি পেয়েচি।”

একটি বেশি-খুশি মনুষ্য

মানিকলাল সবিস্ময়ে বললে, “তুমিও এইরকম একখানি চিঠি পেয়েচ?”

—“হ্যাঁ।”

—“যে চিঠি দিয়েছে তাকে ধরতে পারোনি?”

—“না। কিন্তু তার চেহারা দেখে নিয়েচি, তাকে আবার দেখলেই চিনতে পারব। তবে আমার বিশ্বাস চিঠি সে লেখেনি, সে পত্রবাহক ছাড়া আর কেউ নয়।”

—“তোমার এ বিশ্বাসের কারণ কি?”

—“কারণ, চিঠিখানা এরই মধ্যে আমি কিছু-কিছু পরীক্ষা করে দেখেচি।”—এই বলে জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে মানিকলালের চিঠিখানাও তুলে নিলে,

তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরটি হচ্ছে জয়ন্তের পরীক্ষাগার। মানিকলাল বুঝলে, তার চিঠিখানা ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যেই জয়ন্ত ও-ঘরে গেল। সে চুপ করে বসে আজকের ঘটনাগুলি নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল—কিন্তু কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

খানিকক্ষণ পরেই জয়ন্ত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্যমনস্ক ভাবে যেন নিজের মনেই বললে, "না, কোন সন্দেহ নেই—কোন সন্দেহ নেই!"

মানিক বললে, "তোমার কথার অর্থ কি জয়?"

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে বসে পড়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "এই চিঠি দু'খানা যে লিখেচে, তার সম্বন্ধে কতকগুলি দরকারী কথা আমি জানতে পেরেচি।"

—"যথা?"

—"শোনো। পত্রলেখক বাঁ-হাতে চিঠি লিখেচে। যাঁরা হাতের লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁরা সকলেই জানেন, ডান-হাতের আর বাঁ-হাতের লেখার ছাঁদ হয় আলাদা রকম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে; পত্রলেখক বাঁ-হাত ব্যবহার করেছে কেন? তুমি হয়তো মনে করবে, সে তার ডান-হাতের লেখা লুকোবার জন্যেই বাঁ-হাতে চিঠি লিখে আমাদের ফাঁকি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অনভ্যাসের জন্যে বাঁ-হাতের লেখা এতটা পাকা হত না। সুতরাং তার বাঁ-হাতে চিঠি লেখবার তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক ঃ কারুর কারুর মতন সে হয়তো দুই হাতেই চিঠি লিখতে পারে। দুই ঃ কারুর কারুর মতন তার হয়তো ডান-হাতের চেয়ে বাঁ-হাতই ভালো চলে। তিন ঃ হয়তো তার ডান-হাত নেই বা থাকলেও অকর্মণ্য, কাজেই তাকে বাঁ-হাতে লেখার অভ্যাস করতে হয়েচে।"

মানিকলাল বললে, "আর কিছু জানতে পেরেচ?"

জয়ন্ত বললে, "পেরেচি বৈকি। ভালো করে লক্ষ্য করবার সময় পেলে তুমিও বুঝতে পারতে যে, পত্রলেখক ফাউন্টেন পেনে, সবুজ কালিতে লেখে। খাম আর চিঠির কাগজ কিরকম পুরু আর দামী দেখেচ তো? সাধারণ লোক চিঠি লেখার জন্যে এত অর্থ ব্যয় করে না, আবার অনেক ধনী লোকেও করে না; সুতরাং পত্রলেখক কেবল ধনী নয়, বিলাসীও। এই চিঠি লিখে সে মস্ত ভ্রম করেছে, আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমরা বুঝতে পারচি ঃ সে বাঙালী, ধনী, বিলাসী আর বাঁ-হাতে লেখে। অপরাধীকে ধরবার জন্যে আমাদের আর কলকাতার নানান্ জাতের লোকের পিছু নিতে হবে না।"

মানিকলাল বললে, "কিন্তু কলকাতায় বাঙালীর সংখ্যাও তো কম নয়!"

জয়ন্ত টেবিলের উপরে নস্যদানীটা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বললে, "মানিক, আমি আরো কিছু কিছু দরকারী কথা জানতে পেরেচি। অপরাধী যদি য়ুরোপের লোক হ'ত তাহ'লে কখনো চিঠি লিখে আমাদের এমন করে শাসাতে সাহস করত না। য়ুরোপের

পুলিশকে বিজ্ঞান এখন শাসন করে! চোর-ডাকাত-খুনীদের বিরুদ্ধে সেখানকার পুলিশ এখন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে বসে প্রমাণ সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত ছোটখাটো কোন জিনিস দেখেও অনেক রহস্য ধরে ফেলা যায়। পত্রলেখক আমাকে চেনে, কিন্তু আমারও যে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে এটা জানলে সে চিঠি লেখবার সময়ে আরো-বেশি সাবধান হত! মানিক, পত্রলেখক হচ্ছে—হয় রাসায়নিক, নয় তার টেবিলের উপরে নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে!"

—"তাই নাকি, তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ। আমি খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম, চিঠির খামের পিছন দিকে তিন-চার রকম রাসায়নিক চূর্ণ লেগে রয়েছে—সাদা চোখে তা দেখা যায় না। খুব সম্ভব, পত্রলেখক জল দিয়ে খাম এঁটে সেখানাকে টেবিলের উপরে চেপে ধরেছিল—লোকে প্রায়ই যা করে থাকে। সাদা চোখে অদৃশ্য ঐ সব রাসায়নিক চূর্ণ তার টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিল,—তারই কিছু কিছু খামের গায়ে লেগে গিয়েচে।"

মানিকলাল চমৎকৃত হয়ে বললে, "এ যে আলিবাবার গল্পের কুন্‌কের সঙ্গে মোহর উঠে আসার মতো হল।"

—"হ্যাঁ, প্রায় সেই রকমই বটে। এখন বুঝে দেখ, কোন সাধারণ লোকের টেবিলেই নানারকম রাসায়নিক চূর্ণ ছড়ানো থাকে না। সুতরাং আমাদের এই প্রেরক যে 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানিক, সে বাঁ-হাতে ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লেখে আর আমাদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে।"

মানিকলাল বললে, "তাহলে এটাও বুঝতে হবে যে, সে আমাদেরও নাগালের বাইরে নেই!"

জয়ন্ত বললে, "এই চিঠি দু'খানিই সে-প্রমাণও দিচ্ছে!"

মানিকলাল হাসতে হাসতে বললে, "এইবারে আমার মাথাও একটু একটু করে খুলচে। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আমরা বেশিক্ষণ ছিলুম না। কিন্তু আমরা বাড়ি আসবার পথেই এই চিঠি দুখানা পেয়েচি। পত্রলেখক নিশ্চয়ই খুব কাছেই ছিল!"

জয়ন্ত বললে, "খুব কাছে—হ্যাঁ, কাছের এক বাড়িতে।"

মানিকলাল বললে, "বাড়িতে?"

—"নিশ্চয়! বাড়ির নামে তুমি যখন সন্দেহ করচ, তখন তোমার বুদ্ধি খুলতে এখনো দেরি আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা গাড়িতে বসে চিঠি লিখলে খামের পিছনে ঐ রাসায়নিক গুঁড়োগুলো উঠে আসত কি?"

মানিক উৎসাহ-ভরে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, ঠিক! অপরাধী তাহলে বাগবাজারেই থাকে, তাকে গ্রেপ্তার করা শক্ত হবে না!"

জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বললে, "এত সহজেই উৎসাহিত হয়ো না মানিক! চারে মাছ থাকলেই সে যে ডাঙায় উঠবে, এমন কোন কথা নেই। আমি কেবল এইটুকু

বলতে পারি যে, অপরাধী চিঠি লিখে অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েচে। কিন্তু ও-কথা এখন থাক, আমার আর-একটা আবিষ্কারের কথা শোনো। দেখ দেখি, এটা কি?" এই বলে, সে টেবিলের উপর থেকে ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক তুলে মানিকের দিকে এগিয়ে দিলে।

মোড়ক খুলে মানিক দেখলে, এক টুকরো শুক্‌নো মাটি।

জয়ন্ত বললে, "কিছু বুঝতে পারচ?"

মানিক বললে, "দেখে মনে হচ্ছে, গঙ্গামাটি।"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "ঠিক বলেচ। মুকুন্দ নন্দীর গদীর যে-জানালার গরাদ ভেঙে চোরেরা ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল, সেই জানালায় এই মাটিটুকু লেগে ছিল— ভিতর-দিকে নয়, বাইরের দিকে। অমন জায়গায় গঙ্গামাটি থাকার কারণ কি? খুব সম্ভব, চোরদের কারুর পায়ে তা ছিল, ঘরে ঢোকবার সময়ে জানালার গায়ে লেগে গিয়েচে।"

মানিক অল্পক্ষণ ভেবে বললে, "মুকুন্দ নন্দীর গদী বাগবাজারের অন্নপূর্ণা-ঘাট থেকে বেশি দূরে নয়। তবে কি চোরেরা গঙ্গার দিক্ থেকে এসেচে?"

—"সবাই এসেচে কিনা জানি না, তবে একজন যে এসেচে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।" ...জয়ন্ত হঠাৎ চম্‌কে উঠে সামনের জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকালে, তারপর বললে, "মানিক, ঐ দেখ, যে আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে, সে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছে!"

মানিক তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখলে, একজন ময়লা কাপড়পরা নিম্নশ্রেণীর লোক রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। সে উত্তেজিত স্বরে বললে, "আমারও যেন মনে হচ্ছে ঐ লোকটাই আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে!"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ওকে এখানে ডেকে আনতে পারো?"

—"যদি না আসে?"

—"জোর করে ধরে আনবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, গায়ের জোরের দরকার হবে না। ও-লোকটা বোধ হয় চোরদের দলের লোক নয়, দেখচ না ওর ভাবভঙ্গি কেমন নিশ্চিন্ত!"

জয়ন্তের কথাই সত্য। মানিক গিয়ে ডাক্‌বামাত্রই লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে এল বিনা আপত্তিতে। জয়ন্ত শুধোলে, "তুমি কোথায় থাকো?"

—"কুমোরটুলিতে।"

—"কি কর?"

—"চায়ের দোকানে চাকরি করি, খাই-দাই আর বেড়িয়ে বেড়াই।"

—"বেশ, বেশ, তাহলে তুমি তো দেখচি বেশ খুশিতে আছ!"

—"তা আর থাকব না মোশয়! আমি কারুর কোন ধার ধারি না,—একটা বই পেট নয়, ভাবনা-চিন্তে কিছুই নেই! তার ওপরে আজকে আবার বেশি-খুশিতে

আছি!"

—"বেশি-খুশিতে আছ! কেন বল দেখি?"

—"তা যেন বলচি, কিন্তু আপনারা এত কথা জানতে চাইচেন কেন?"

—"তোমাকে আরো-বেশি খুশি করব বলে। তুমি নগদ একটাকা রোজগার করবে?"

—"কে দেবে?"

—"আমি!"

—"আমায় কি করতে হবে?"

—"আগে তোমার এত খুশির কারণ শুনি, তারপর বলব।"

—"তবে শুনুন মোশয়! আজ সকালে গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরচি, হঠাৎ এক বাবু এসে আমাকে বললে, 'ঐ যে দুজন লোক দু'দিকে চলে যাচ্ছে ওদের একজনের নাম জয়ন্ত, আর একজনের নাম মানিক। ওদের এই চিঠি এক-একখানা দিয়ে যদি ছুটে পালিয়ে আসতে পারিস্, তাহলে নগদ একটাকা বখ্শিস্ পাবি।' আমি তখনি রাজি হয়ে গেলুম, এ আর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "বুঝেচি, আর বলতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো। সেই বাবুটিকে কেমন দেখতে, তোমার মনে আছে কি?" সে বুঝলে, এই বেশি-খুশি লোকটি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাদের কারুকেই চিনতে পারেনি।

লোকটা বললে, "খুব খুঁটিয়ে বলতে পারব না মোশয়! তবে তার রং কালো নয় আর দেহ খুব লম্বা-চওড়া, আর,—"

—"আর? থামলে কেন, বল না!"

—"বাবুটি যখন আমাকে টাকা দেয় তখন আমি দেখেছিলুম, তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই!"

মানিক সচমকে জয়ন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু জয়ন্তের মুখ স্থির।

লোকটা বললে, "এখন আমাকে কি করতে হবে মোশয়?"

জয়ন্ত পকেট থেকে একটা টাকা বার করে লোকটার হাতে দিয়ে বললে, "তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি এখন যাও।"

লোকটা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "বোম্ মহাদেব! মা লক্ষ্মী দেখচি আজ টাকা বৃষ্টি করচেন।"

জয়ন্ত বললে, "শুনলে মানিক, তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেই! কাজেই তাকে বাঁ-হাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করতে হয়েচে!"

মানিক অভিভূত স্বরে বললে, "জয়, জয়, তুমি কি যাদুকর?"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ভগবান্ সবাইকে চোখ দিয়েচেন, কিন্তু সবাইকে সমান দেখবার ক্ষমতা দেননি। যেমন, সকলেই লিখতে পারলেও সকলেই কবিতা লিখতে

পারে না, তেমনি সকলেই দেখতে পেলেও সকলেই আসল জিনিসটুকু দেখতে পায় না। আমি যাদুকর নই ভাই, আমি তোমার বন্ধু!" —এই বলে সে খুব বড় এক টিপ্ নস্য নাকের গর্তে গুঁজে দিল।

ধুলো-হাওয়া-ভক্ষণ

বৈকালবেলায় মানিক যখন আবার জয়ন্তের কাছে ফিরে এল তখন দেখলে, সে ইজি-চেয়ারে চোখ মুদে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

মানিক শুধোলে, "এখনো তোমার ঘুম ভাঙেনি নাকি? বেলা যে পড়ে এল!"

চোখ না খুলেই জয়ন্ত বললে, "বীরপুরুষ, তুমি সজাগ আছ দেখে আমার সাহস বাড়ল। চোখ মুদলেই মানুষ যে ঘুমোয়, তোমাকে এ শিক্ষা কে দিলে?"

মানিক বললে, "মানুষ ঘুমোলেই চোখ মোদে।"

জয়ন্ত বললে, "মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে বসে থাকে না। কিন্তু মানুষ যখন দাঁড়িয়ে থাকে না, তখন সে বসতেও পারে, শুতেও পারে, দৌড়োতেও পারে। মানুষ যখন চোখ মুদে থাকে, তখন সে ঘুমোতেও পারে কিংবা জেগে চিন্তা করতেও পারে।"

—"তাহলে তুমি চিন্তা করছিলে?"

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, "হ্যাঁ, গভীর চিন্তা। মুকুন্দ নন্দীর গদীর চোরেরা যে পথ দিয়ে শুভাগমন করেছে, আমার মন সেই পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।"

—"তাহলে পথ চিনতে পেরেচ?"

—"হয়তো পেরেচি, হয়তো পারিনি। চল, একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খেয়ে আসি।"—বলেই জয়ন্ত জামা পরতে লাগল।

জয়ন্তের জোলো হাওয়া আর পথের ধুলো খাবার আগ্রহ মানিক আর কোনদিন দেখেনি। সুতরাং সে আন্দাজ করে নিলে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

দুজনে মিনিট-পনেরো গঙ্গার ধারে এদিক-ওদিক করে বেড়ালে। তারপর অন্নপূর্ণা-ঘাটের কাছে এসে জয়ন্ত বললে, "ধুলো আর হাওয়া খেয়ে পেট ভরে গিয়েচে। এখন এইখানে একটু বসে বসে গঙ্গার ঢেউ গোনা যাক্!"

দুজনে গঙ্গার ধারে বসে পড়ল। সেখানটায় পাশাপাশি খড়ের নৌকোর পরে খড়ের নৌকো সাজানো রয়েছে, খড়বোঝাই প্রত্যেক নৌকোকে এক একখানা কুঁড়ে-ঘরের মতন দেখাচ্ছে—হঠাৎ তাকালে মনে হয়, গঙ্গার বুকে যেন এক ভাসন্ত পল্লীগ্রাম বিরাজ করছে! এ-জায়গাটা খালি অন্নপূর্ণা-ঘাট নয়, খোড়ো-ঘাট বা বিচিলি-ঘাট নামেও পরিচিত—প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খড়ের দালাল, মুটে-মজুর, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও মাঝি-মাল্লাদের হৈ-চৈ আর গণ্ডগোলে এখানে কেউ কান পাততে পারে না।

এখন সে-সব গোলমাল আর নেই। বাঁধানো পাড়ের উপরে বসে পাঁচ-ছজন

দাঁড়ী ও মাঝি গল্পগুজব করছিল, জয়ন্ত খুব সহজেই তাদের ভিতর গিয়ে আলাপ জমিয়ে ফেললে।

কথায় কথায় জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ভাই, ঘাটের ঠিক গায়েই ঐ যে খড়ের নৌকোখানা রয়েচে, ওখানা কার?"

একজন বললে, "আমার, বাবু।"

খানিকক্ষণ জয়ন্ত তাদের আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। মানিকের দিকে ফিরে বললে, "মানিক, বয়ার কাছে একখানা বড় বজ্‌রা বাঁধা রয়েচে, দেখেচ?"

বজ্‌রাখানা ইতিমধ্যেই মানিকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কারণ হচ্ছে, এত বড় ও এমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র সৌখীন বজ্‌রা গঙ্গার বুকে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

বজ্‌রাখানা তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে দেখে একজন মাঝি বললে, "বাবু, ও বজ্‌রাখানা কাল বিকাল থেকে এই ঘাটেই বাঁধা ছিল। আজ দুপুরে ওখানাকে বয়ার কাছে নিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার বজ্‌রা! ওখানা কার তা জানো?"

—"না বাবু। ও-রকম বজ্‌রা আমি এখানে আর কখনো দেখিনি। তবে বজ্‌রার ভিতরে তিন-চারজন বাঙালী বাবু আর একজন হাব্‌সী লোককে আমি দেখেচি।"

জয়ন্ত অকারণেই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "ঠিক দেখেচ? হাব্‌সী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, হাব্‌সী! মাথায় বেজায় উঁচু, দেহ যেন লোহা দিয়ে তৈরি, গায়ের রং কয়লার মতো,—উঃ, দেখলেই ভয় হয়।"

জয়ন্ত নস্যদানী বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাঝিদের দলের একটা লোক আর-একজনকে ডেকে বললে, "দ্যাখ্ ভাই ছিদু! ঐ বজ্‌রার লোকগুলো বোধ হয় কাল সারা রাত ঘুমোয়নি।"

ছিদু বললে, "কেমন করে জানলি তুই?"

—"আমারও যে কাল রাতে ঘুম হয়নি! ঐ বজ্‌রার লোকগুলো কাল রাতে তিন-চারবার ডাঙায় নেমেছিল।"

জয়ন্ত বললে, "ওঠ মানিক, এইবারে আরো দু-চার পা বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা যাক্।"

দুজনে কাশী মিত্তিরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হল।

জয়ন্ত হঠাৎ মাঝের আর-একটা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "একখানা পান্সী নিয়ে জলবিহারে রাজি আছ?"

মানিক হেসে ফেলে বললে, "বুঝেচি হে, বুঝেচি! ঐ বজ্‌রার কাছে না গিয়ে তুমি আর থাকতে পারচ না।"

জয়ন্তও হেসে বললে, "তুমি দেখচি অন্তর্যামী হয়ে উঠেচ!"

তখনি একখানা পান্সী ভাড়া করা হল, মাঝি শুধোলে, "কোন্ দিকে যাব বাবুজী?"

—"ঐ বজ্‌রার কাছ দিয়ে এগিয়ে চল।"

দুজনে প্রথমটা বজ্‌রার দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল। তারপর মানিক বললে, "মাঝিদের মুখে যা শুনলুম, বজ্‌রার লোকগুলোর ব্যবহার সন্দেহজনক বলেই মনে হচ্ছে। ও-রকম বজ্‌রা কোথা থেকে এখানে এল, আর কেনই বা এই ঘাটে এসে লেগেছিল? কাল সারা রাত বার-বার ওরা ঘাটে নেমেছিল কি কারণে? মুকুন্দ নন্দীর গদী এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সেখানে চুরি হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, "হুঁ, আর বজ্‌রায় একজন হাব্‌সী আছে।"

—"যদিও বাঙালীর সঙ্গে হাব্‌সী-জাতের লোক বড়-একটা দেখা যায় না, তবু তার নামেই একটু আগে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন?"

—"তোমার মনে আছে মানিক, মুকুন্দ নন্দীর গদীর জানালায় গরাদের উপরে কয়েকগাছা চুল আমি পেয়েচি? সে চুল আমি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখেচি। চুলগুলো এমন কোঁকড়ানো আর পুরু যে, কাফ্রী-জাতের লোকের মাথার চুল না হয়ে যায় না!"

মানিকও অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "বল কি জয়! এত বড় প্রমাণ তুমি পেয়েচ?"

—"প্রমাণটা এতক্ষণ খুব বড় ছিল না, বরং এই চুলগুলো ব্যাপারটাকে আরো-বেশি রহস্যময় করে তুলেছিল। বাংলাদেশে বাঙালীর গদীতে হাব্‌সীর মাথার চুল অস্বাভাবিক নয় কি? এই চুলগুলোর জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছিল, মাঝিদের কথায় এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়ে গেল।" —বলতে বলতে গঙ্গাতীরের দিকে চেয়ে জয়ন্ত হঠাৎ চম্‌কে উঠে থেমে পড়ল।

মানিকও সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে একজন লোক একটা লাল নিশান নিয়ে ঘন ঘন নাড়ছে!

জয়ন্ত বললে, "মানিক, ও-লোকটা বজ্‌রার লোকদের সঙ্কেতে কিছু জানাচ্ছে।"

মানিক বললে, "বোধ হয় আমরা ওদিকে যাচ্ছি সেই খবরই দিচ্ছে।"

জয়ন্ত বললে, "খুব সম্ভব তাই। মানিক, একবার যদি ঐ বজ্‌রায় গিয়ে উঠতে পারি!"

পান্সী তখন বজ্‌রার খুব কাছে এসে পড়েছে। জয়ন্ত ও মানিক দেখলে, বজ্‌রার ছাদের উপর প্রকাণ্ড আকারের একটা লোক মস্তবড় এক পাথরের মূর্তির মতো স্থির ভাবে বসে আছে—তার লক্ষ্যও স্থির হয়ে আছে যে-পান্সী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "মানিক, রিভলভারটা আনতে ভোলোনি তো?"

মানিক বললে, "না।"

কালো আঁধারে, কালো ঝড়ে, কালো গঙ্গায়

সূর্য তখন অস্ত গেছে,—পশ্চিমের ভাঙা-ভাঙা মেঘের গায়ে আলোময় আল্‌তার ছোপ-মাখিয়ে। আকাশ থেকে আল্‌তা-আলো ঝরে পড়ে গঙ্গাজলকেও রঙিন করে তুলেছে,—সে জল যেন পিচকারিতে ভরে নিলে অনায়াসেই হোলিখেলা করা চলে!

বজ্‌রাখানা ভালো করে দেখবার মতোই বটে। দোতলা বজ্‌রা—তাকে ছোটখাটো একখানা ভাসন্ত বাড়ি বলাও চলে। দেওয়ালগুলো লাল রঙের ও জানলা-দরজাগুলোর রং সবুজ। ছাদগুলো চক্‌চকে পিতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে রঙিন টবে চারা বসিয়ে বাগান রচনারও চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সব চারার থোলো থোলো নানারঙা ফুল ফুটে বজ্‌রাখানাকে দেখতে আরো সুন্দর করে তুলেছে।

বজ্‌রার একতলায় ছাদের উপরে বসে সেই পাথরের মতো স্থির মস্ত মূর্তিটা তখনো নিষ্পলক চোখে পান্সীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। বজ্‌রার আর কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

পান্সী এগিয়ে যাচ্ছিল, জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে বললে, "মাঝি, নৌকোখানা বজ্‌রার চারদিকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে চল! চমৎকার বজ্‌রা! আমি আরো ভালো করে দেখতে চাই!"

জয়ন্তের কথা বজ্‌রার উপরকার সেই মূর্তিটা শুনতে পেলে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। একেবারে ধারে এসে, পিতলের রেলিঙের উপরে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, "আপনারা আমার বজ্‌রা দেখতে চান? বেশ তো, বজ্‌রার ওপরেই আসুন না, বাইরে থেকে দেখবেন কেন?"

লোকটার গলার আওয়াজ কী গম্ভীর! এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বর শোনাই যায় না!

জয়ন্তের দিকে ফিরে মানিক চুপিচুপি বললে, "ওহে, লোকটা আবার আমাদের ডাকে যে! এখন কি করবে?"

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "আমরা বজ্‌রায় উঠলে আপনি তাহলে রাগ করবেন না?"

—"রাগ? রাগ করব কেন? আপনাদের মতো আরো অনেকেই আমার বজ্‌রা দেখতে আসেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য!"—বলেই সে ফিরে ডাকলে, "ওরে, কে আছিস্ রে!"

একটা জোয়ান পশ্চিমী লোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেলাম করলে।

লোকটা বললে, "বাবুদের ওপরে তুলে নে! সব ঘর ভালো করে দ্যাখা!"

বজ্‌রার উপরে উঠে জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, এ একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার বটে! বজ্‌রার মালিকের শখও আছে, টাকাও আছে! এর কামরার যে সব ছবি, পোর্সিলেনের আস্‌বাব, সোফা, কৌচ, 'ডাইনিং টেবিল' ও কার্পেট প্রভৃতি চোখে

পড়ে, অনেক নামজাদা ধনীর বাড়িতেও তার তুলনা মেলে না।

একতলার একটা ঘরে বসে কয়েকজন পশ্চিমী লোক গল্পগুজব করছিল। জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের কারুর ভিতর থেকে সন্দেহজনক কোন-কিছু আবিষ্কার করতে পারলে না।

দোতলার একটা ঘরে ঢুকে দেখা গেল, যার আমন্ত্রণে তারা বজ্‌রায় এসেছে, সেই লোকটি টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে।

—"এই যে, আসুন! সব কামরা দেখা হল? কেমন দেখলেন?"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার! আজকাল এ-রকম বজ্‌রা চোখেই পড়ে না। বজ্‌রার মালিক বোধহয় আপনিই?"

—"হ্যাঁ। এখনকার বাবুদের শখ হচ্ছে 'লঞ্চ' আর 'মোটর-বোট' কেনা। আমি ও-সব কল-কব্জার জিনিস দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা কল বিগড়োলেই সব অচল!"

জয়ন্ত লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগল। লোকটির বয়স হবে বছর চল্লিশ। রং উজ্জ্বল-শ্যাম, দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখলেই শক্তিমান বলে বোঝা যায়। দুই চোখের দৃষ্টি এমন তীব্র যে, বেশিক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

—"আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বসুন।"

জয়ন্ত ও মানিক এক-একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

মানিক দেখলে, জয়ন্ত একদৃষ্টিতে একটা 'শেল্‌ফে'র দিকে চেয়ে আছে। সেও সেইদিকে চেয়ে দেখলে, 'শেল্‌ফে'র উপর কতকগুলো ইংরেজি বই সাজানো রয়েছে—সব বই-ই রসায়ন-তত্ত্ব-বিষয়ক। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, যে-ব্যক্তি তাদের ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে, জয়ন্তের বিশ্বাস সেও 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে আলোচনা করে! মানিক বুঝতে পারল, জয়ন্ত অমন করে বইগুলো লক্ষ্য করছে কেন!

টেবিলের এককোণে রয়েছে একটা বক-যন্ত্র। জয়ন্ত হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটা নাড়তে নাড়তে বললে, "এখানে এ জিনিসটা কেন?"

লোকটি হেসে বললে, "আমার একটি বাতিক আছে। আমি 'কেমেস্ট্রি' নিয়ে অল্প-স্বল্প নাড়াচাড়া করি।"

জয়ন্ত বললে, "আমারও 'কেমিস্ট্রি' শিখতে ইচ্ছে হয়। আপনি যদি দয়া করে ও-সম্বন্ধে দু-চারখানা বইয়ের নাম লিখে দেন, তাহলে বাধিত হই।"

লোকটি বললে, "এ আর শক্ত কথা কি, এখনি দিচ্ছি।"—বলেই টেবিলের টানার ভিতর থেকে কাগজ ও কলম বার করে খানকয় বইয়ের নাম লিখে কাগজখানা জয়ন্তের হাতে দিলে।

জয়ন্ত বললে, "ধন্যবাদ! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করলুম, কিন্তু মহাশয়ের নাম আমরা জানি না!"

—"আমার নাম ভবতোষ মজুমদার! কলকাতায় বাগবাজারে থাকি!"

এমন সময়ে নিচে থেকে পান্সীর মাঝির চিৎকার শোনা গেল—"বাবুজী, আকাশে মেঘ জমেচে, এখনি ঝড় উঠবে, শীগগির আসুন!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার বজ্‌রা দেখে বড় খুশি হলুম, আজ তাহলে আসি? নমস্কার!"

কাম্‌রা থেকে বাইরে বেরিয়েই তারা দেখলে, সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতরে আধখানা আকাশ জুড়ে মেঘের কালিমা ঘন হয়ে উঠেছে। কষ্টিপাথরের উপরে ক্ষণস্থায়ী সুবর্ণরেখার মতো থেকে থেকে বিদ্যুতের দীপ্ত লীলা দৃষ্টিকে ঝল্‌সে দিচ্ছে!

মাঝি বললে, "বাবুজী, ঝড় এল বলে। আপনারা এখন পান্সীতে আসবেন কী?"

জয়ন্ত পান্সীতে নেমে পড়ে বললে, "ঝড়কে আমরা ভয় করি না, পান্সী চালাও।"

মানিক বললে "জয়, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হল না, মেঘগুলো কি-রকম হু-হু করে এগিয়ে আসচে তা দেখেচ?"

—"দেখেচি। কিন্তু মানিক, ঝড়ের সময়ে এই গঙ্গার চেয়ে ঐ বজ্‌রা যে আরো ভয়ানক হয়ে উঠত না, তাই-বা কে বলতে পারে?"

মানিক সচমকে বললে, "তোমার এমন সন্দেহের কারণ?"

—"সকালে আমরা যে-দুখানা চিঠি পেয়েচি, তার কথা তুমি ভোলোনি বোধ হয়?"

—"না।"

—"সেই চিঠি দুখানা ঐ বজ্‌রার ভিতরে বসেই লেখা হয়েচে।"

মানিক বললে, "তোমার বিশ্বাস, সেই চিঠি দুখানার লেখক 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে চর্চা করে। ভবতোষ যে 'কেমিস্ট্রি' নিয়ে আলোচনা করে তাও স্বকর্ণেই শুনলুম বটে। কিন্তু এইটুকু প্রমাণই যথেষ্ট নয়।"

জয়ন্ত বললে, "সে কথা আমিও জানি। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি-কিছু জানতে পেরেচি। এই কাগজখানা দেখচ? ভবতোষ তোমার সামনেই এই কাগজে কতকগুলো বইয়ের নাম লিখে দিয়েচে। আর এই দেখ সেই চিঠি দু'খানা!" —এই বলে সে পকেটে হাত দিয়ে সকালের সেই চিঠি দু'খানা বার করলে।

মানিক কাগজ দু'খানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "ভবতোষ লিখেচে কালো কালিতে ইংরাজী হরফে, আর চিঠির লেখা বাংলায় সবুজ কালিতে। তোমার মতে, চিঠির লেখা—বাঁ-হাতের। কিন্তু ভবতোষ তো আমার সামনেই ডান-হাতে লিখলে! এই কাগজের লেখার সঙ্গে চিঠি লেখার কোন মিলই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

জয়ন্ত বললে, "আরও ভালো করে দেখ মানিক, আরো ভালো করে দেখ!"

মানিক হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল, "এ কী ব্যাপার! চিঠিখানার কাগজ আর ভবতোষের কাগজ যে একেবারে এক।"

জয়ন্ত কাগজখানা আর চিঠি আবার পকেটের ভিতরে পূরে ফেলে সহাস্যে বললে, "ভায়া, তোমার চোখ একটু দেরিতে ফোটে দেখচি! ভবতোষের কাগজ আর চিঠির কাগজ যে এক, আমি তো সেটা মিলিয়ে দেখবার আগেই টের পেয়েছিলুম। ঐ চিঠি দু'খানা ভবতোষ নিজে লেখেনি বটে, কিন্তু চিঠির কাগজ সরবরাহ করেচে সে নিজের হাতেই! খুব সম্ভব, চিঠি দু'খানা লেখা হয়েচে তার হুকুমেই! মানিক, ও-বজ্‌রা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়!"

মানিক বললে, "ঐ ঝড় উঠল!"

হাঁ, ঝড় উঠল—আর সে বড় সহজ ঝড় নয়! ভীষণ কালো মেঘের দল সারা আকাশকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আচম্বিতে উন্মত্ত ঝটিকা গোঁ গোঁ শব্দে চিৎকার করে উঠল এবং তার পরেই ছুটে এল চোখ-কানা-করা রাশি রাশি ধুলোর কণা—সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল ক্ষেপে উঠে খল-খল-খল অট্টহাস্যে প্রলয়-নাচ শুরু করে দিলে। এক মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ-বাতাস-পৃথিবীর রূপ গেল একেবারে বদলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে, মেড়ের অন্ধকারে, ধুলোর অন্ধকারে—চোখে কিছু দেখা যায় না; বজ্রের গর্জনে, ঝড়ের হুঙ্কারে, তরঙ্গের কোলাহলে—কানে কিছু শোনা যায় না; বাতাসের ও জলের টানে পান্সীখানা কোন্‌দিকে ছুটে চলেছে তীরবেগে, তা কেউ বুঝতেও পারলে না!

সেই হট্টগোলের ভিতরেও জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান আর একটা শব্দ আবিষ্কার করলে! হঠাৎ চোখ তুলেই সে দেখলে, একখানা মোটর-বোট একেবারে পান্সীর উপরে এসে পড়েছে! আর রক্ষা নেই।

—"মানিক, মানিক! লাফিয়ে পড়—জলে লাফিয়ে পড়!"—প্রাণপণে চেঁচিয়ে এই কথা বলেই মানিককে টেনে নিয়ে জয়ন্ত গঙ্গার সেই মৃত্যু-স্রোতের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

সঙ্গে সঙ্গে মোটর-বোটখানা ভীষণ শব্দে পান্সীর উপরে বিষম এক ধাক্কা মারলে! দাঁড়ী-মাঝিরা তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল,—এবং পান্সীখানাও চোখের নিমেষে উল্টে গেল।

জয়ন্ত ও মানিক জলের উপরে ভেসে উঠেই দেখলে, মোটর-বোটখানা আবার তাদের দিকে বেগে ছুটে আসছে!

জয়ন্ত আবার চেঁচিয়ে বললে, "মানিক, ও মোটর-বোট আমাদেরই বধ করতে চায়! আবার ডুব দাও,—ডুব-সাঁতারে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর!"

দপ্‌ করে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, —এবং ডুব দেবার পূর্বমুহূর্তে জয়ন্ত ও মানিব দুজনেই সচমকে দেখলে, মোটর-বোট চালিয়ে আসছে মূর্তিমান্ যমের মতন কালো একটা কাফ্রী!

গরম খিচুড়ি

ডুব দিয়ে তারা সেই উন্মত্ত জলরাশি ঠেলে খানিকদূর এগিয়ে গেল। কিন্তু জলের ভিতরে দম বন্ধ করে মানুষ আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? মিনিটখানেক পরেই আবার তাদের উপরে ভেসে উঠতে হল, হাঁপ ছাড়বার জন্যে।

প্রায়-অন্ধকারে ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে তারা ত্রস্ত নেত্রে দেখলে, আকাশে চিলেরা যেমন ছোঁ মারবার আগে মণ্ডলাকারে ঘোরে, সেই মোটর-বোটখানা গঙ্গার অস্থির ও ফুটন্ত জলে তেমনি চক্র কেটে আবার বেগে ঘুরে আসছে! প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হওয়াতে এবারে তার রোখ্ আরো বেড়ে উঠেছে!

মেঘ আর ঝড়—আর গঙ্গা তেমনি প্রলয়ের চিৎকার করছে, পৃথিবীর সর্বাঙ্গে অন্ধকার তেমনি কয়লার রং মাখিয়ে দিচ্ছে এবং চারিদিকে ফেনা ছড়াতে ছড়াতে ও মরণ-নাচ নাচতে নাচতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তেমনি নিষ্ঠুর কৌতুকে ছুটে তেড়ে আসছে!

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "জয়, আবার ডুব দাও!"

জয়ন্ত বললে, "এমন বার বার ডুব দিয়ে কতক্ষণ চলবে?"

—"তাছাড়া আর উপায় কি? ঐ দেখ, মোটর-বোটখানা আবার এসে পড়ল!"

—"মানিক, আমাদের রিভলভার আছে। শীগ্‌গির বার কর!"

পরমুহূর্তে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে দুটো রিভলভার উপর উপর গর্জন করে উঠল! মোটর-বোটখানা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো বেগে আসতে আসতে হঠাৎ মোড় ফিরে আঁধারের ভিতরে গোঁৎ খেয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

জয়ন্ত বললে, "মানিক, রিভলভারের গুণ দেখ! আমাদের কাছে রিভলভার আছে জানলে শত্রু বোধ হয় এতটা বীরত্ব দেখাতে আসত না।"

দু-হাতে জল ঠেলতে ঠেলতে মানিক বললে, "জয়, তোমার এ অনুমানও সত্য, —ওদের দলে কাফ্রী-জাতের লোক আছে।"

জয়ন্ত বললে, "আমার অনুমান মিথ্যা হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক্। এখনো আমরা নিরাপদ নই। চল, আগে ডাঙ্গার দিকে চল।"

ঝড় আজ গঙ্গাকে যে-ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, স্রোতের টান যে-রকম প্রখর, তাতে ডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল বাগবাজারের কাছে, কিন্তু পায়ের তলায় মাটি পেলে নিমতলার ঘাটের কাছে গিয়ে।

তারা যখন পথ দিয়ে বাড়িমুখো হল, তখন ঝড়ের আক্রোশ একেবারে কমে গেছে। শূন্য থেকে কালো মেঘের পর্দাও সরে গেল বটে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না, খুব জোরে বৃষ্টি ঝরতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "দেবতা দেখছি আজ আমাদের ওপরে মোটেই খুশি নন। ভেবেছিলুম, ঝড়ের পর আকাশ পরিষ্কার হবে, আর আমিও সেই কাফ্রী-বন্ধুর মোটর-বোটখানা আর একবার খোঁজবার চেষ্টা করব। কিন্তু আজ আর খোঁজাখুঁজি

করে কোন লাভ নেই—চারিদিকে যে অন্ধকার! তবে মোটর-বোটখানা পরেও বোধ হয় আমরা খুঁজে বার করতে পারব।"

—"কেমন করে?"

—"পোর্ট-পুলিশে খবর দিয়ে। মোটর-বোট এখানে বেশি নেই। যে-ক'খানা আছে, পোর্ট-পুলিশের কাছেই তাদের সন্ধান মিলবে।"

মানিক বললে, "কিন্তু কোন্ মোটর-বোট আমাদের আক্রমণ করেছিল, কেমন করে তা বুঝতে পারবে?"

জয়ন্ত বললে, "আমার রিভলভারের গুলিগুলো যে ব্যর্থ হয়নি, আমি তা জানি। তোমারও টিপ্ খারাপ নয়। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, কোন্ মোটর-বোটের গায়ে গুলির দাগ আছে। এটুকু আবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন হবে না, কি বল হে?"

মানিক বললে, "আপাতত ও-সব কথা আমার আর ভালো লাগছে না। আমার গায়ের হাড়গুলো পর্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেছে। ডাঙায় উঠেও এখনো ভিজতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। আগে দু'পেয়ালা গরম চা—"

—"তারপর গরম খিচুড়ি! ঠিক বলেছ মানিক, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধিই বেশি খোলে! চল বন্ধু, ঘরমুখো বলদের মতো ঘরের দিকেই দৌড় দেওয়া যাক্!"

হাইড্রোজেন আর্সেনাইড

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর মানিক ঘরের জানলা খুলে বাইরেটা একবার দেখেই নিজের মনে অপ্রসন্ন স্বরে বললে, "উঃ, কী একগুঁয়ে বৃষ্টি! কাল থেকে শুরু হয়েছে, এখনো থামবার নাম নেই!"

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা থেকে জয়ন্তের ডাক শুনলে, "মানিক, ওহে মানিক!"

তাড়াতাড়ি আবার জানলা খুলে মানিক বললে, "কিহে, এত সকালে—এই বৃষ্টিতে তুমি কোত্থেকে আসছ?"

—"মানিক, জামা-কাপড় পরে শীগ্গির নিচে নেমে এস।"

কথামতো কাজ করে মানিক নিচে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি জয়, আবার কোন নতুন বিপদ হয়েছে নাকি?"

—"বিপদ? হ্যাঁ। তবে আমাদের বিপদ নয়।"

—"তার মানে?"

—"আমাদের পাড়ার—অর্থাৎ বাগবাজারের, সদানন্দ বসুর নাম শুনেছ বোধ হয়? তিনি খুব ধনী হলেও খুব কৃপণ বলেই বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস, সকালে তাঁর নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই সবাই তাঁকে হাঁড়ি-ফাটা বসু বলে ডাকে। এই সদানন্দ বসুর বাড়িতে কাল রাত্রে মস্ত চুরি হয়ে গেছে।"

—"মস্ত চুরি!"

—"হ্যাঁ! ঘটনাটা আমি লোকের মুখে যতটা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই ঃ সদানন্দবাবু তাঁর বাড়িতে একলাই বাস করেন; কারণ, সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। একমাত্র মেয়ে, সেও শ্বশুরবাড়িতে। বাড়িতে থাকে কেবল একজন চাকর ও একজন দ্বারবান। ঠিকে-পাচক রান্না সেরে বাসায় চলে যায়! সদানন্দবাবুও শখ করে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। এমন শখ তাঁর হয় না, বোধ করি পাশ পেয়েছিলেন। থিয়েটারে বড় বড় দুটো পালা ছিল—সারা রাত তাঁর অভিনয় দেখবার কথা। কিন্তু একটা পালা দেখবার পর আর তাঁর ভালো লাগেনি, তাই তিনি রাত সাড়ে-বারোটার সময়েই বাড়িতে ফিরে আসেন। দ্বারবান সদর দরজা খুলে দেয়। তিনি সোজা উপরে গিয়ে দেখেন, তাঁর শয়ন-ঘরের দরজা খোলা। অথচ দরজায় তিনি নিজের হাতেই চাবি বন্ধ করে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢোকেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে পর দেখলেন, তাঁর লোহার সিন্দুক ভাঙা, টাকাকাড়ি আর মূল্যবান যা-কিছু ছিল, সব অদৃশ্য!"

—"আশ্চর্য! কিন্তু ঘরে ঢুকেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান কেন?"

—"এখনো সেটা জানতে পারিনি।...সদানন্দবাবুর জুয়েলারি ব্যবসা আছে, সুতরাং তাঁর লোহার সিন্দুকে যে হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্নার অভাব ছিল না, এটুকু অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি। চোর এসেছিল খিড়কির দরজা দিয়ে। আপাতত এর বেশি আর কিছু জানি না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তিনি আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন, পুলিশেও খবর দিয়েছেন।"

আরো-খানিক পথ চলেই দুজনে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল। তখনো পুলিশ আসেনি, উপরে খবর দিয়ে জয়ন্ত বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

শয়ন-ঘরে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে সদানন্দবাবু শুক্নো মুখে হতাশ ভাবে শুয়ে ছিলেন, জয়ন্তকে দেখেই মাথা নেড়ে হাহাকার করে উঠলেন।

সে-হাহাকার জয়ন্তের কানে ঢুকল বলে মনে হল না, সে নস্যদানী থেকে নস্য নিতে নিতে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

ঘরখানি খুব ছোটখাটো, একটা লোহার সিন্দুক ও টুলের উপরে একটা কুঁজো ছাড়া আসবাব-পত্তর আর কিছুই নেই।

লোহার সিন্দুকটা ভালো করে দেখে জয়ন্ত মৃদুস্বরে বললে, "মানিক, কলকাতায় বৈজ্ঞানিক চোরের দল ক্রমেই পুরু হয়ে উঠছে। এই লোহার সিন্দুক খোলবার জন্যে Oxy-acetylene torch ব্যবহার করা হয়েছে! মুকুন্দ নন্দীর গদীতেও চোরেরা ঠিক এই উপায়ই অবলম্বন করেছিল!"

মানিক চম্‌কে উঠে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

এমন সময়ে নিচে একটা গোলমাল উঠল, তারপরেই সিঁড়ির উপরে একাধিক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত বললে, "পুলিশ এসেছে। এখনি আমাদের পুরনো বন্ধু ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হবে।"

ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু সদলবলে উপরে এসে হাজির হলেন। সম্ভবত তাঁর পিতৃদেব ঠাট্টা করেই ছেলের নাম রেখেছিলেন—"সুন্দর!" কারণ, তাঁর দেহ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা এবং গায়ের রং নিগ্রোদের চেয়ে বেশি ফর্সা নয়। চোখ আর নাক প্রায় চীনেম্যানদের মতো এবং শোনা যায়, জন্মগ্রহণের পরে তাঁর মাথায় কেউ কোনদিন একগাছি চুলও দেখতে পায়নি!"

জয়ন্তকে দেখেই সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, "এই যে, শখের টিক্‌টিকি-ভায়ারা যে! চোরের ঠিকুজী বোধ হয় জানতে পেরেছ?"

জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে না, আপনার আগে চোর ধরব, এমন সাধ্য আমাদের নেই!"

সুন্দরবাবু খুশি হয়ে বললেন, "তা সত্যিকথা ভায়া! শখের গোয়েন্দাগিরি আর শার্লক্ হোম্‌সের বাহাদুরি নভেলেই ভালো লাগে, আসলে তার কোন দামই নেই! যাক্ সে কথা। কৈ, কোন্ সিন্দুক ভেঙে চুরি হয়েছে দেখি!"

সিন্দুকটার দিকে তাকিয়েই সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! ওর ভেতরে কত টাকা ছিল?"

সদানন্দবাবু বিহ্বলের মতো হাহাকার করতে লাগলেন।

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ও-সব কান্না-টান্না এখন রাখুন মশাই! কাজের কথা বলুন। কী চুরি গেছে?"

সদানন্দবাবু অনেক কষ্টে হাহাকার থামিয়ে জানালেন, চোরেরা চারখানা হাজার টাকার নোট ও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না নিয়ে গেছে।

সুন্দরবাবু বললেন, "বেশ করেছে। অত টাকার জিনিস এখানে রেখেছিলেন কেন? চোরকে লোভ দেখিয়ে পুলিশের কাজ বাড়াবার জন্যে?...আপনি আর যা জানেন বলুন।"

সদানন্দবাবু যা বললেন, জয়ন্তের কাছ থেকে মানিক আগেই তা শুনেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! কিন্তু ঘরে ঢুকেই আপনি কচিখোকার মতো অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন?"

—"জানি না। কিসের একটা শব্দ হল, আর অমনি আমার সর্বাঙ্গ কি রকম করে উঠল! তারপর কি হল, আমার মনে নেই!"

—"হুম্! তাহলে কোন লোককে আপনি দেখতে পাননি?"

—"কি করে দেখব, ঘরে আলো ছিল না।"

তারপর চাকর-দ্বারবানের ডাক পড়ল। তারা কিছুই জানে না।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! সেপাই, এ দুই বেটাকে বেঁধে থানায় নিয়ে চল। ...ওকি, জয়ন্ত-ভায়া, ঘয়ের মেঝেয় তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছ কেন? তোমার আবার কি হল?"

জয়ন্ত ঘরের মেঝে থেকে সযত্নে কি-কতকগুলো তুলে একটা কাগজে মুড়ে রেখে বললে, "এখানে অনেক কাঁচের টুক্‌রো পড়ে রয়েছে। সেগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখলুম।"

সদানন্দবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "আমার ঘরে কাঁচের টুক্‌রো কেমন করে এলো?"

সুন্দরবাবু বললেন, "কৈ, দেখি একবার টুক্‌রোগুলো!"

জয়ন্ত দেখালে। সেগুলো এত ছোট যে, কাঁচের টুক্‌রো না বলে কাঁচচূর্ণ বলাই উচিত,—খুব পাৎলা ও হাল্‌কা কাঁচের গুঁড়ো।

সুন্দরবাবু হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "ফেলে দাও ভায়া, ফেলে দাও! ওগুলো হীরকচূর্ণ নয় যে এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছ!"

জয়ন্ত বললে, "এগুলো হীরকচূর্ণ হলে এত যত্ন করে নিয়ে যেতুম না।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে একটা মুখভঙ্গি করে এবং সদানন্দবাবুকে আরো গোটাকয়েক প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত বললে, "সদানন্দবাবু, আপনার জলের কুঁজোর পাশে একটা কাঁচের গেলাসে আধ গ্লাস জল রয়েছে। ও জল কি আপনি পান করেছিলেন?"

সদানন্দবাবু বললেন, "না। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি ও-গেলাসটা হাতে করিনি। গেলাসটা তো বরাবর কুঁজোর মুখে ঢাকা দেওয়াই থাকে, ওটাকে নামিয়ে রাখলে কে, তাও জানি না।"

জয়ন্ত এক টিপ্ নস্য নিলে। তারপর সাবধানে গেলাসের তলাটা ধরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস' দিয়ে গেলাসটা পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু একটি ছোটখাটো লাফ মেরে তাড়াতাড়ি বললেন, "হুম্! সাধু শার্লক হোম্‌স্! ও-বুদ্ধি তো আমার মাথায় ঢোকেনি! ওতে আঙুলের ছাপ আছে নাকি?"

—"আছে। তবে চোরেদের কারুর কিনা জানি না। গেলাসটা আপনি নিয়ে যান, আঙুলের ছাপের ফোটো তুলে দেখবেন, কিছু আবিষ্কার করতে পারেন কিনা! ...চল হে মানিক, আমরা বিদায় হই। হ্যাঁ, ভালো কথা! সুন্দরবাবু, দয়া করে যদি একবার আমার বাড়িতে আসেন, তাহলে আপনাকে একটা খুব দরকারী নতুন কথা শোনাতে পারি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার কথা যদি নভেলের রূপকথা না হয়, তাহলে আমি যেতে পারি। মনে রেখো, আমরা পুলিশের লোক, রূপকথা শোনবার সময় নেই।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বেশ বেশ, আপনি যে পুলিশের একজন ছোটখাটো কর্তা, সে কথা আমি ভুলব না। আসতে আজ্ঞা হোক।"

* * *

সকলে যখন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, তখনো বৃষ্টি থামেনি। সুন্দরবাবুকে বৈঠকখানায় বসিয়ে জয়ন্ত বললে, "মানিক, তুমি সুন্দরবাবুদের সঙ্গে মিনিট-কয়েক গল্প কর। আমি একবার পরীক্ষাগারের ভিতরে যেতে চাই।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত ছট্‌ফটে লোক, চুপ করে বসে থাকা তাঁর পক্ষে মস্ত শাস্তি। তিনি টেবিলের উপর থেকে একবার খবরের কাগজ তুলে নিলেন, দু-এক লাইন পড়েই আবার কাগজখানা ফেলে দিলেন। একবার একটা জানলা খুললেন, তারপর জলের ছাঁট আসছে দেখে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "হুম্! মানিক-ভায়া, আমার প্রতিমুহূর্ত মূল্যবান্। আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না!"

মানিক বললে, "ঐ যে, চা আর টোস্ট্ নিয়ে এসেছে, একটু খেয়ে দেখুন না।"

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে বললেন, "হ্যাঁ, এ প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আরো খান-দুই 'টোস্ট্' পেলেও আমি আপত্তি করব না।"

মানিক হেসে বললে, "খালি 'টোস্ট্' কেন, আপনি ডিম খান? মুর্গীর ডিম?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! মুর্গীর ডিম হচ্ছে উপাদেয় খাদ্য।"

বেয়ারা তখনি আরো 'টোস্ট্' ও মুর্গীর ডিম দিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চা ও খাবার নিঃশেষ করে অত্যন্ত খোস্‌মেজাজে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললেন, "এর পরে জয়ন্ত-ভায়া যদি গোটাদুই রূপকথা বলেন, তাহলে পুলিশের লোক হয়েও আমি রাগ করব না!"

এমন সময় জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—তার হাতে সেই কাগজের মোড়কটা। সে বললে, "সুন্দরবাবু, এগুলো কি জানেন? কাঁচের 'বাল্‌বে'র ভাঙা টুক্‌রো! এর ভেতরে কি ছিল জানেন? 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্'...ও কি, ও কি!"

হঠাৎ একটা খড়খড়ির পাখি খোলার শব্দ হল—তারপরেই আরো তিন-চারটে অদ্ভুত শব্দ!

চোখের পলক না ফেলতেই জয়ন্ত দুটো প্রবল ধাক্কায় সুন্দরবাবু ও মানিককে ঘরের দ্বারপথ দিয়ে বাইরে ঠেলে দিলে এবং সেই সঙ্গে নিজেও একলাফে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ঠেলা সাম্‌লাতে না পেরে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবু ঠিকরে একেবারে উঠানে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লেন। কোনরকমে উঠে বসে যন্ত্রণাবিকৃত ক্রুদ্ধস্বরে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত! এর অর্থ কি?"

জয়ন্ত শান্তস্বরে বললে, "এর অর্থ আর কিছুই নয়, ও-ঘরে আর এক সেকেন্ড থাকলে হয়তো আমরা প্রাণে মারা পড়তুম!"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, "প্রাণে মারা পড়তুম?"

—"হ্যাঁ। 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড'!"

স্বপ্নের অগোচর বিভীষিকা

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, "কি বললে? হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্?"

—"হ্যাঁ।"

—"সে আবার কি?"

—"একরকম মারাত্মক বিযাক্ত গ্যাস। সদানন্দবাবুর ঘরে যে-কাঁচের টুকরোগুলো পেয়েছি, সেগুলো যে খুব ছোট কাঁচের 'বাল্‌বে'র অংশ, এ-কথা আগেই বলেছি। সেইরকম 'বাল্‌বে'র ভিতরে 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্‌' ভরে কেউ এইমাত্র আমাদেরও ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নভেল পড়ে পড়ে তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আমার মাথা নিয়ে আপাতত আপনি আর মাথা ঘামাবেন না। ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনো আপনি আন্দাজ করতে পারেননি। আমরা যখন সদানন্দবাবুর বাড়ি থেকে আসি, চোরেদের কেউ নিশ্চয় আমাদের পিছু নিয়েছিল। হঠাৎ আমি দেখলুম, জানলার খড়খড়ি তুলে ঘরের ভিতরে কে কি ছুঁড়ে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে 'বাল্‌ব্‌' ফাটার শব্দ! তখন সবে আমি পরীক্ষা করে আন্দাজ করেছি সদানন্দবাবু কাল রাতে ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কেন! কাজেই চোখের পলক ফেলবার আগেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি আপনাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে—অর্থাৎ পালিয়ে এলুম। একটু দেরি হলে আর রক্ষে ছিল না!"

সুন্দরবাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, "হুম্‌! একটু দেরি হলে কি হত শুনি?"

—"হয়তো আমরা প্রাণে বাঁচতুম না।"

—"হুম্‌! কিন্তু সদানন্দবাবু তো কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন!"

—"সদানন্দবাবু ঘরে ঢুকেই খোলা দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। চোরেরা ঠিক সময়ে 'বাল্‌ব্‌' ছুঁড়তে পারেনি। বন্ধ ঘরে 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্‌' গ্যাস অব্যর্থ। সদানন্দবাবু খোলা দরজার কাছে ছিলেন বলেই গ্যাসটা তাঁকে ভালো করে কাবু করতে পারেনি।"

মানিক বললে, "কিন্তু ঘরের ভিতরে চোরেরা তো ছিল?"

জয়ন্ত বললে, "যে-সব চোরের এত বেশি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থাকে, তারা আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই তারা গ্যাস-মুখোশ ব্যবহার করেছিল।"

সুন্দরবাবু কষ্টেসৃষ্টে এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গি করে বললেন, "দেখ জয়ন্ত, তোমার রূপকথা বরং সহ্য করতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার ভুঁড়ির ওপরে তুমি আজকের মতো এত জোরে ধাক্কা মেরো না। ভুঁড়ির ওপরে ধাক্কা আমি পছন্দ করি না।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি এখনো আমার কথা রূপকথা বলে মনে করছেন? বেশ, আসুন আমার সঙ্গে ঘরের ভেতরে!"

সকলে আবার বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে গিয়েই সুন্দরবাবু হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, "হুম্‌! জয়ন্ত, যদি তোমার কথাই সত্যি হয়? ঘরের ভেতরে এখনো—ঐ যে কি বললে—সেই গ্যাসটা যদি থাকে?"

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "না, সে গ্যাস এতক্ষণ থাকবার কথা নয়।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না ভায়া, মনে তুমি খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছ! প্রাণ বড় মূল্যবান্ জিনিস হে! ঘরের ভেতরে তুমিই আগে ঢোকো!"

জয়ন্ত ও মানিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। সুন্দরবাবু দরজার ভিতর দিয়ে আগে ভয়ে ভয়ে মাথাটি গলিয়ে দিলেন, ভয়ে ভয়ে তিন-চারবার নিঃশ্বাস টেনে দেখলেন, তারপর অতি-সন্তর্পণে পায়ে পায়ে ঘরের ভিতরে গিয়েই ব্যস্ত স্বরে বললেন, "জানলা খুলে দাও—ঘরের ভেতরে বাইরের হাওয়া আসতে দাও।"

মানিক জানলাগুলো খুলে দিলে।

জয়ন্ত ঘরের মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, "দেখুন!"

সুন্দরবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, সদানন্দবাবুর ঘর থেকে জয়ন্ত যে-রকম অতিসূক্ষ্ম কাঁচের টুক্‌রো বা গুঁড়ো সংগ্রহ করেছিল, এখানেও ঘরময় তেমনি টুক্‌রো ছড়িয়ে রয়েছে!

জয়ন্ত বললে, "দেখুন সুন্দরবাবু, আর এক চোরের শাস্তি দেখুন!"

সুন্দরবাবু ফিরে দেখলেন, চৌকির তলায় একটা বিড়াল চার পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে!

জয়ন্ত বললে, "ও-বিড়ালটা নিশ্চয় কিছু খাবারের লোভে এই ঘরে ঢুকেছিল। তারপর চৌকির তলায় গা-ঢাকা দিয়েছিল আমাদের সাড়া পেয়ে। 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইডে'র মহিমায় এখন ওর অবস্থা কি হয়েছে দেখুন!"

সুন্দরবাবু কপালে দুই চোখ তুলে আড়ষ্ট ভাবে বললেন, "ও কি একেবারে মরে গিয়েছে?"

—"একেবারে। ঘরের ভেতরে থাকলে আমাদেরও ঐ অবস্থা হত!"

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলেন; এবং তারপর অভিভূত স্বরে বললেন, "হুম্! জয়ন্ত, আজ তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে! এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমি সব সময়ে রূপকথা বল না!"

জয়ন্ত আহত স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, রূপকথা বলবার বা শোনবার বয়স আমাদের কারুরই নেই। আমি যে রূপকথা বলি না, এর প্রমাণ আগেই আপনি পেয়েছেন। সেই শ্যামপুকুরের চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, না, ভুলিনি। সে ব্যাপারে তুমি যথার্থই বাহাদুরি দেখিয়েছিলে বটে! বর্ষার রাত্রে চোর চুরি করে পালিয়েছিল। বাগানের ভিজে মাটির একটা জায়গা দেখে তুমি বললে, 'চোর এইখানে পা হড়কে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে।' আমরা তোমার কথা গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু তুমি সেইখান থেকে চোরের দুটো হাতের, আর মুখের খানিকটার এমন সুন্দর প্লাস্টারের ছাঁচ তুললে যে, আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলুম! পরে তোমার সেই ছাঁচের সাহায্যেই চোর ধরা পড়ে শাস্তি পায়! তোমার সে কেরামতির কথা কখনো আমি ভুলব না!"

জয়ন্ত বললে, "ভবিষ্যতেও আমার কথায় নির্ভর করলে আপনার ক্ষতি হবে

না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু ভায়া, আজ যে বড় ভয়ানক কথা শোনা গেল! য়ুরোপে-আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক চোর আছে বলে শুনেছি, কিন্তু বাংলাদেশেও যে তারা দেখা দিতে পারে, এটা তো কখনো কল্পনাও করিনি। আর, এরা কেবল চোর নয়, দরকার হলে এরা মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আমার বিশ্বাস, কলকাতায় ভীষণ একটা দল গড়ে উঠেছে; সে-দলের লোকেরা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা খুনজখম করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এদের যে দলপতি, সে হচ্ছে একজন শিক্ষিত লোক। মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দবাবুর বাড়িতে যে চুরি হয়েছে, তা এই একই দলের কীর্তি!"

সুন্দরবাবু চম্‌কে উঠে বললেন, "তোমার এমন আশ্চর্য বিশ্বাসের কারণ কি জয়ন্ত!"

জয়ন্ত বললে, "কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আপাতত আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। সদানন্দবাবুর ঘরে যে কাঁচের গেলাস পাওয়া গেছে, তার উপরে কার আঙুলের ছাপ আছে, সেটা আপনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করুন। সেটা যদি কোন পুরাতন পাপীর হাতের ছাপ হয়, তাহলে আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। যদিও 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস' দিয়ে একটা বিষয় আমি এর মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছি।"

মানিক কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি আবিষ্কার করেছ?"

জয়ন্ত বললে, "লোকে সাধারণত গেলাস ধরে ডান-হাতে। কিন্তু এ-গেলাসের ওপরে ছাপ আছে বাঁ-হাতের আঙুলের।"

মানিক চকিত স্বরে বললে, "বাঁ-হাতের আঙুলের! যে আমাদের চিঠি লিখে শাসিয়েছিল, সেও চিঠি লিখেছিল বাঁ-হাতে!"

জয়ন্ত বললে, "তার কারণও পরে আমরা জানতে পেরেছি। তার ডান-হাতের বুড়ো আঙুল নেই। এখন এটাও আমাদের জানা দরকার, এই গেলাসটা যে ব্যবহার করেছে, তারও ডান-হাতের বুড়ো আঙুল আছে কিনা! অবশ্য, আমার এ সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। কারণ সময়ে সময়ে আমরা সকলেই ডান-হাত থাকতেও বাঁ-হাতে গেলাস ধরে থাকি।"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই চোখ অত্যন্ত বিস্ফারিত করে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন বললেন, "হুম্! তোমরা আবার হেঁয়ালিতে কথা কইতে শুরু করলে কেন? ডান-হাত, বাঁ-হাত,—এ-সবের অর্থ কি?"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছড়িয়ে হাই তুলে বললে, "বড্ড পরিশ্রম হয়েছে সুন্দরবাবু! আজ আর কোন কথা নয়। এখন আমি ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করব—অর্থাৎ বাঁশী বাজাব!"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচ্‌কে বললেন, "বিশ্রাম করবে—অর্থাৎ বাঁশী বাজাবে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঁশী বাজিয়েই আমি বিশ্রাম করি, আর মানিক বিশ্রাম করে

আমার বাঁশী-বাজানো শুনতে শুনতে। এটা আমাদের অনেকদিনের অভ্যাস। না মানিক?''

মানিক হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! তোমরা রাগ কোরো না, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের দুজনেরই মাথা দস্তুরমতো খারাপ হয়ে যায়''—বলেই তিনি প্রস্থান করলেন।

* * *

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা। জয়ন্ত ও মানিক চা-পান শেষ করে বসে বসে পরামর্শ করছিল, আজ রাত্রে বায়স্কোপ দেখতে গেলে কেমন হয়,—এমন সময় নিচের তলা থেকে সুন্দরবাবুর হাঁকডাক শোনা গেল।

মানিক হতাশ ভাবে ইজি-চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে বললে, "ব্যাস, বিদায় গ্রেটা গার্বোর মায়া-লীলা! ঐ শোনো, তোমার সুন্দরবাবু এলেন মুরুব্বিয়ানার ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে!''

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, "আসুন সুন্দরবাবু, ওপরে উঠে আসুন!''

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই উত্তেজিত স্বরে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি মন্তর-টন্তর কিছু জানো?''

জয়ন্ত বললে, "কেন বলুন দেখি?''

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহলে সেই মন্তরটা আমাকে শিখিয়ে দাও!...গেলাসে যার হাতের ছাপ আছে, সত্যিই তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেই। কিন্তু পুলিশের কাছে তার বাঁ-হাতের ছাপ আছে।''

জয়ন্ত দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, "তাহলে সে পুরনো পাপী?''

—"হ্যাঁ। সে ভয়ানক লোক। তার নাম বলরাম চৌধুরী। পঁচিশ বছর আগে সে একটা খুনের মামলার আসামী হয়। কিন্তু বিচারে প্রমাণ-অভাবে খালাস পায়। বিশ বছর আগে একটা ডাকাতির মামলায়ও সে আসামী হয়েছিল। কিন্তু সেবারও সে শাস্তি পায়নি। উনিশ বছর আগে বড়বাজারে রাহাজানি করে সে ধরা পড়ে। এবার সে আইনকে ফাঁকি দিতে পারেনি, বিচারে তার তিন বছর জেল হয়। জেলে থাকতে থাকতেই এক হাবসীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়—''

মানিকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "এক হাবসীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়?''

—"হ্যাঁ। তার সঙ্গে বলরাম জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। তারপরও এক বছরের ভেতরে তারা যে দুটো খুন আর তিনটে ডাকাতি করেছে, পুলিশের কাছে এমন প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তাদের ধরতে পারিনি। কেবল তাই নয়, তারা যেন পৃথিবী থেকে উপে গিয়েছিল। খুন আর ডাকাতি যাদের জীবিকা, তারা বেশিদিন চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু আজ যোলো বৎসরের মধ্য দেশ-বিদেশের কোথাও তাদের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। আমরা ভেবেছিলুম, তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজ এতকাল পরে বলরাম যে কোথা থেকে আবার দেখা দিলে, ভগবান

জানেন!"

জয়ন্ত বললে, "বলরাম যখন এমন গুণী ব্যক্তি, তখন পুলিশ নিশ্চয়ই তার ফোটো নিতে ভোলেনি!"

সুন্দরবাবু একখানা মোটা বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, "এই দেখ বলরামের ফোটো আর ইতিহাস। এর চেহারা দেখলেই তোমাদের ভয় হবে।"

সত্যিই তার চেহারা ভয়ঙ্কর,—শয়তানের চেহারাও বোধ হয় এত ভয়ানক নয়। চোখ দুটো সাপের মতো ক্রূর ও তীক্ষ্ণ, নাক বুলডগের মতো থ্যাব্ড়া, চোয়াল হচ্ছে হাঙরের মতো।

জয়ন্ত অনেকক্ষণ ধরে বলরামের ইতিহাস পড়ে যেন নিজের মনেই বললে, "দেখছি এই ফোটোখানা তোলা হয়েছে পঁচিশ বছর আগেই,—বলরামের বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। না, না, এ অসম্ভব!"

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "কি অসম্ভব?"

—"এ-কথা সত্য হলে বলতে হয়, বলরামের বয়স এখন সত্তর বৎসর!"

—"অসম্ভব নয়। আমরা এমন সব পাপীকেও জানি, সত্তর বছর বয়সেও যাদের স্বভাব শোধরায়নি।"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "না সুন্দরবাবু, আমি সে কথা বলছি না। চোরেদের দলে যে বুড়ো-আঙুল-কাটা লোক আছে, তাকে স্বচক্ষে দেখেছে আমরা এমন একজনকে জানি। মানিক, কুমোরটুলির চায়ের দোকানে কাজ করে, আমি সেই বেশি-খুশি লোকটির কথাই বলছি। সে তো সেই বুড়ো-আঙুল-কাটা লোকটিকে বুড়ো বলেনি!"

সুন্দরবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, "আঙুলের ছাপ মিথ্যা হতে পারে না।"

জয়ন্ত বললে, "আমার তাই বিশ্বাস। সেইজন্যেই তো আমি আশ্চর্য হচ্ছি! তবে কি চোরেদের দলে দুজন বুড়ো-আঙুল-কাটা লোক আছে? না, তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে!"

হঠাৎ মানিক সভয়ে চিৎকার করে উঠল, "সাপ, সাপ! অজগর সাপ! সুন্দরবাবু, সাবধান!"

জয়ন্ত সচকিতে ফিরে দেখলে, বিপুল এক অজগর সাপ জানলার দুটো গরাদের মধ্যেকার শূন্য পরিপূর্ণ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে, এবং তার দুটো ক্ষুধিত চক্ষু দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে যেন হিংসার আগুন!

অজগরটা বিষম গর্জন করে সুন্দরবাবুকে লক্ষ্য করে এক ছোবল মারলে, কিন্তু তিনি তার আগেই "বাপ্" বলে বিরাট এক লম্ফত্যাগ করে সরে গেলেন এবং লক্ষ্যচ্যুত অজগরের মাথাটা মাটির উপরে এসে সশব্দে আছড়ে পড়ল!

সেই ভয়াবহ অজগরের দেহের সাত-আট হাত অংশ ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে, কিন্তু তখনো তার দেহের অপর অংশ জানলার বাইরেই অদৃশ্য হয়ে আছে! এমন প্রকাণ্ড অজগর তারা কেউ কখনো দেখেনি!

অজগরটা আবার এক প্রচণ্ড গর্জন করে বিদ্যুৎ-বেগে মাথা তুললে—এবারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে!

অসম্ভব মৃত্যু যেন মূর্তিমান হয়ে আজ এই ঘরের ভিতরে আচম্বিতে আবির্ভূত হয়েছে!

প্রতিশোধ চাই!

অজগর আবার মাথা তুলেছে,—তার ক্রূর ও তীব্র দৃষ্টি জয়ন্তের দিকে আকৃষ্ট!

জয়ন্তও তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে যথাসময়ে লাফ মারবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তখন নিজেকে তার কী অসহায় বলে মনে হচ্ছিল! হাতে এমন কোন অস্ত্র নেই যে, কোনরকমে আত্মরক্ষা করে। এখন তার আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষিপ্র-গতিতে ডাইনে বা বামে অজগরের নাগালের বাইরে সরে যাওয়া। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে? এইটুকু ঘরে এমন ভাবে একটা এতবড় অজগরের আক্রমণ বার বার ঠেকানো তো সম্ভবপর নয়! একমুহূর্তের মধ্যে এই সব চিন্তা বিদ্যুতের মতন তার মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। সঙিন মুহূর্তে মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরবাবু ভাবছিলেন, এই অজগরটা এখনি তাঁর দেহ জড়িয়ে ধরে হাড়গোড় ছাতু করে ফেলে তারপর তাঁকে গিলে হজম করবে! দুনিয়ায় আজ তাঁর শেষ-দিন! তিনি এমন নেতিয়ে পড়লেন যে, সাপটা এখন আবার যদি তাঁকে ছোবল মারে, তাহলে তিনি আগের বারের মতো আর লম্বা লম্ফত্যাগ করে সরে যেতেও পারবেন না!

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই মানিক তীরবেগে হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর পকেট থেকে রিভলভারটা একটানে বার করে নিলে! সুন্দরবাবু যখন প্রথম ঘরে এসেছিলেন মানিক তখনি তাঁর পকেটের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করেছিল।

অজগর আবার সোঁ করে এগিয়ে ছোবল মারতে এল এবং জয়ন্ত সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল!

লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অবলম্বন না পেয়ে সাপটা আবার মাটির উপরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ল! ততক্ষণে তার দেহের প্রায় তিনভাগ ঘরের ভিতর এসে পড়েছে।

অজগর তৃতীয়বার আক্রমণ করবার জন্যে মাথা তোলবার আগেই মানিক তার মাথা টিপ্ করে উপরি-উপরি দু-বার রিভলভারের গুলি-বৃষ্টি করল এবং তারপর যে কাণ্ড হল ভাষায় তা ভালো করে বুঝানো যাবে না!

অজগরের ভীষণ গর্জনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তার সেই বিপুল দেহটা পাক্‌সাট্ খেয়ে ঘরের মেঝের উপরে আছ্‌ড়া-আছ্‌ড়ি করতে লাগল—তারই বা শব্দ কি! ঘরের গোল মার্বেলের টেবিলটা ও একখানা সোফা ঠিক্‌রে উল্টে পড়ল এবং অজগরের কুণ্ডলীর মধ্যে পড়ে একখানা চেয়ার পল্‌কা দেশলাইয়ের

বাক্সের মতোই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! অজগরটা রাগে অন্ধ হয়ে সেই ভাঙা চেয়ার লক্ষ্য করেই উপরি-উপরি দু'বার ছোবল মারলে!

ততক্ষণে এই বিষম ধুমধাড়াক্কা শুনে বাড়ির অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে ঘরের বাইরে দরজার কাছেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবং জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু লাফিয়ে উঠে পড়েছে ঘরের উঁচু খাটের উপরে! সেইখান থেকে মানিব আরো দু-বার রিভলভার ছুঁড়লে! কিন্তু সেই অতিকায় অজগর তবু কাবু হয়েছে বলে মনে হল না।

জয়ন্ত চিৎকার করে বললে, "বন্দুক, বন্দুক! আমার বন্দুক এনে ছোঁড়ো!"

অজগরের ল্যাজটা একবার উঁচু হয়ে খাটের উপরে আছড়ে পড়ল—মজবুত খাটখানাও মড়্-মড়্ আর্তনাদ করে উঠল! সে-ল্যাজের একটা আঘাত যদি জয়ন্তদের কারুর গায়ে লাগে, তাহলে তখনি তার নিশ্চিত মৃত্যু! অজগরের ল্যাজ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বড় বড় মোষকেও কাৎ করে দেয়!

এর মধ্যে কে ছুটে গিয়ে বন্দুক নিয়ে এল! কিন্তু সে ঘরের ভেতরে ঢুকতে সাহস করলে না; দরজার কাছ থেকেই পরে পরে দু-বার গুলিবৃষ্টি করলে! মানিকও সাপের মাথা লক্ষ্য করে আর-একবার রিভলভার ছুঁড়লে!

অজগর মারাত্মক আক্রোশে খাটের একটা পায়াকে জড়িয়ে ধরলে, পায়াটা তখনি মড়াৎ করে ভেঙে গেল এবং খাটখানাও একদিকে নিচু হয়ে পড়ল! টাল সাম্‌লাতে না পেরে সুন্দরবাবু খাটের নিচে পড়ে যাচ্ছিলেন, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাঁকে টেনে নিয়ে অন্য পাশে সরে গেল।

এই হল অজগরের শেষ-প্রচেষ্টা! তার মাথা তখন গুলির চোটে থেঁৎলে গুঁড়িয়ে গেছে! কিন্তু সে মরলেও তার দেহ দেখলে সেটা বুঝবার উপায় নেই, তা তখনো পাক্‌সাট্ খাচ্ছে এবং কুণ্ডলী রচনা করছে—এ-কুণ্ডলীর মধ্যে এখনো কোন জীবজন্তু গিয়ে পড়লে আর তার রক্ষা নেই!

এই প্রাণহীন ভীম অজগরের দেহ তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত 'জীবন্ত' হয়ে ছিল!

সুন্দরবাবু তখন একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন এবং মানিক খাটের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে পড়ে গভীর উত্তেজনায় কাতর হয়ে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছে!

জয়ন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'মানিক, আজ তুমি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম না!'

মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "সে কথা এখন থাক্। দেখ, সুন্দরবাবু 'হার্ট্ ফেল্' করল কিনা!"

... ...

সুন্দরবাবুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি প্রথমেই বলে উঠলেন, "আমি বেঁচে আছি তো?"

জয়ন্ত বললে, "সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই!"

—"হুম্! সে অজগর-ব্যাটা কোথায়?"

—"পরলোকে। তার দেহটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

—"হুম্ আমি আর তোমাদের বাড়িতে আসব না—এই নাক-কান মল্‌ছি।"

—"কেন সুন্দরবাবু?"

—"কেন? তাও আবার জিজ্ঞেস করছ! তোমার বাড়ি বিপদজনক। সেদিন শুনলুম, 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্'—ভগবান জানেন, সে কি জিনিস! আজ আবার দেখছি হ্যারিসন রোডের মতো লম্বা অজগর! কাল আবার এসে হয়তো দেখব আফ্রিকার সিঙ্গী, হিপো, গণ্ডার, হাতি! বাপ্, এখানে কোন ভদ্রলোক আসে? হুম্, তোমার বাড়িকে নমস্কার, আর আমি এমুখো হচ্ছি না!"

মানিক হেসে ফেলে বললে, "কিন্তু আপনি তো রিভলভার নিয়ে আসতে পারেন, আপনার ভয়টা কিসের?"

সুন্দরবাবু মুখ ভার করে বললেন, "ঠাট্টা করো না মানিক! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। কলকাতায় ঘরের ভেতরে অজগর দেখলে রিভলভারের কথা কারুর মনে থাকে?...কিন্তু অজগরটা এল কোত্থেকে? বাড়ির ওদিকে বাগানের মতো আছে দেখছি! জয়ন্ত, তুমি কি অজগর পোষো?"

জয়ন্ত বললে, "না! ও-শখ এখনো আমার হয়নি। আমি বাগানে গিয়ে চারিদিকে দেখে এসেছি। খিড়কির দরজা খোলা থাকে না, কিন্তু আজ খোলা রয়েছে। খালের ধারে আমাদের বাড়ির কাছে রাতে লোক-চলাচল খুব কম। আমাদের খিড়কির পিছনে একটা সরু কানা গলি আছে—অত্যন্ত নোংরা গলি। সেখান দিয়ে কেউ হাঁটে না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না; কিন্তু আমার বিশ্বাস, রাত-আঁধারে কেউ বা কারা এসে কোনরকমে এই অজগরকে নিয়ে বাগানে ঢুকে আমার ঘরের জানলায় তুলে দিয়েছে। অজগরটা নিশ্চয়ই তাদের পোষা।"

—"বল কি! কাদের এ কাজ?"

—"আমাদের শত্রুদের—যাদের কাছে 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্' আছে, যারা মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দবাবুর বাড়িতে চুরি করেছে, যারা চায় না আমরা এ-ব্যাপারের মধ্যে থাকি!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বললেন, "হুম্! তাহলে তোমার ধারণা, একই দল মুকুন্দ নন্দীর গদীতে আর সদানন্দের বাড়িতে চুরি করেছে?"

—"ধারণা নয় সুন্দরবাবু, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেদিন মুকুন্দ নন্দীর গদীর ব্যাপারটা হাতে নিই, সেই দিনই কারা আমাদের শাসিয়ে চিঠি লিখেছিল। তারপর সদানন্দবাবুর বাড়ির চুরির পর থেকে আমাদের ওপরে তাদের রাগ যেন আরো বেড়ে উঠেছে। এবার নিয়ে তিন-তিনবার আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা হল। কিন্তু আর নয়, এইবারে আসল অপরাধীকে অন্ধকার থেকে টেনে বার করতে হবে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তুমি কি বলরাম চৌধুরীর ওপরে সন্দেহ কর?"

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, "বলরাম চৌধুরী! পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যে প্রথমে ধরা পড়ে, বহু বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে সত্তর বৎসর বয়সে আবার সে আবির্ভূত হয়েছে! না, না, এ অসম্ভব সুন্দরবাবু, অসম্ভব! নিশ্চয়ই এর মধ্যে গভীর কোন রহস্য আছে! তাহলে ভবতোষ মজুমদার কে? মানিক, এর মধ্যেই ভবতোষকে তুমি নিশ্চয়ই ভোলোনি—বিশেষ করে তার চোখ দুটো?'

সুন্দরবাবু হতাশজনক মুখভঙ্গি করে বললেন, "এই রে, আবার হেঁয়ালি! আচ্ছা জয়ন্ত, থাকো থাকো আর এমন হয়ে যাও কেন বল দেখি তুমি? হচ্ছিল বলরাম চৌধুরীর কথা, কোত্থেকে এল আবার ভবতোষ মজুমদার আর তার দুটো চোখ! বলি, তার দুটো চোখ নিয়ে আমরা করব কি? ধুয়ে খাবো? হুম্, যত অনাসৃষ্টি!"

জয়ন্ত বললে, "চোখ নিয়ে অনেক-কিছু হয় সুন্দরবাবু, অনেক-কিছুই হয়! চোখ হচ্ছে মনের আর্সি,—সে আর্সিতে ভেসে ওঠে লুকানো স্বভাবের আসল ছবি! অসাধুর সমস্ত ছদ্মবেশের ভিতর থেকেই ঐ চোখ দুটোই তাকে আগে ধরিয়ে দেয়। ভবতোষ মজুমদার হচ্ছে মানুষের নাম, কিন্তু তার চোখ দুটো হচ্ছে শয়তানের চোখ! সে চোখের আসল ভাব ঢাকবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে! যাবেই তো! চোখের আসল ভাব বেশিক্ষণ কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ভবতোষও তা পারেনি! তার চোখ দুটো ভীষণ নয়, রহস্যময়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আপদ! কে ভবতোষ? তার চোখের এত ব্যাখ্যানা কেন?"

জয়ন্ত বললে, "বলব সুন্দরবাবু, তার সব কথা আপনাকে বলব! কিন্তু আপাতত আপনি একটু চুপ করুন—আমার মাথায় একটা ফন্দি আসছে, বোধ হয় খুব ভালো ফন্দি!...সুন্দরবাবু, আর একবার চা খেতে আপনার আপত্তি আছে? নেই? ওরে, আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা দিয়ে যা!...সুন্দরবাবু, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, সব কথাই আপনাকে বলব!"—এই বলে সে জানলার ধারে গিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল এবং মাঝে মাঝে এক এক টিপ্ নস্য নিতে লাগল।

সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বিরক্ত ভাবে আপন মনে বললেন, "আমি তোমার ভবতোষের চোখের ইতিহাস শুনতে চাই না! চা খেয়েই আমি পাগলা গারদ থেকে পালাব।"

খানিক পরেই চাকর চায়ের 'ট্রে' নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

জয়ন্ত ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু, এই চোরেদের ধরবার এক চমৎকার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি। চা খেতে খেতে সব কথা আপনাকে বলছি।"

আচম্বিতে বাইরে থেকে গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল এবং ঘরের

দেওয়ালের উপরের একখানা বড় ছবির কাঁচ ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত ধুপ করে মেঝের উপর বসে পড়ল!

মানিক তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গিয়ে আর্তস্বরে বলে উঠল, "জয়—জয়! কি হল?" সে সভয়ে দেখলে, জয়ন্তের গাল বেয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ করে রক্ত ঝরছে!

সুন্দরবাবু একলাফে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন।

জয়ন্ত গালের উপর রুমাল চেপে ধরে বললে, "ভয় নেই মানিক, ভয় নেই! এ-যাত্রাও বেঁচে গেলুম,—গুলি আমার গালের মাংস ঘেঁষে চলে গেছে! জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ানোই আমার ভুল হয়েছিল! আমি ভাবতে পারিনি যে, অজগর লেলিয়ে দেবার পরেও আমাদের স্যাঙাতরা বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকতে ভরসা করবে!"

মানিক বললে, "আমরা এ-কী ভয়ানক লোকের পাল্লায় পড়েছি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌! আমি আর চা খাব না। এখান থেকে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি!"

জয়ন্ত বললে, "মুখের চা ফেলে গেলে নরকে পচতে হয়। আসুন, পেয়ালা নিন, আমিও চা খাব। সুন্দরবাবু, যে ফন্দি আমি করেছি, দু-চার দিনের ভেতরই এই চোর আর খুনীর দল আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা পড়বে। তারা আমার রক্তপাত করেচে,—আমি প্রতিশোধ চাই।"

দুটি হাঁচি ও দ্বাদশ দস্যু

যাকে বলে, রাত ঝাঁ ঝাঁ!

নবমীর চাঁদ এখন মড়ার মতন হল্‌দে-মুখে যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে পশ্চিম আকাশে। পৃথিবীর উপরে থম্‌-থম্‌ করছে না-আলো, না-অন্ধকার! দেখাও যায়, দেখাও যায় না!

এমন আলো-আঁধারির চেয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঢের ভালো লাগে। সমুদ্রের নীল জলের মতো, শূন্যের কালো অন্ধকার তার ভিতরের সমস্ত বিভীষিকাকে একেবারে ঢেকে রাখে। কিন্তু খানিক তফাতে যদি একটা গাছের ডাল-পাতা নড়ে, এই আলোমাখা অন্ধকারে তাও স্পষ্ট নজরে আসে না—সন্দেহ হয় বুঝি কোন অপার্থিব ছায়া দেখলুম! দূর দিয়ে হয়তো একটা ভীতু শিয়াল ছুটে পালায়, আর আমাদের চোখে ধাঁধা লাগে—বুঝি কোন ভৌতিক দেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল!

রাতের সভায় আজ জন-মানবের সাড়া নেই। কেবল ঝিঁঝিপোকা আর কোলাব্যাঙের দল যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটানা চেঁচিয়ে চলেছে! আর এ-পাড়া ও-পাড়ার কুকুরগুলো থেকে থেকে অকারণেই খাপ্পা হয়ে গলাবাজি করে এ-ওকে দমিয়ে দেবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড। দুই ধারে সারি সারি বাগানবাড়ি রাত্রের গভীর নির্জনতায় ঘুমিয়ে পড়েছে! মাঝে মাঝে গরীবদের দু-একখানা মেটে ঘর আর ছোট ছোট বস্তী—সেখানেও অনিদ্রার কোন লক্ষণই নেই। পথের দু'ধারে তেলের আলোগুলো নাচার হয়ে অত্যন্ত মিট্ মিট্ করে জ্বলছে, যেন ঘুমিয়ে পড়তে পারলে তারাও বাঁচে! আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে সজাগ জোনাকিরা কেবল ব্যস্ত হয়ে শূন্যপথে আনাগোনা ওঠা-নামা ছুটোছুটি করছে—তারা যেন স্বপ্নপরীদের ছোট্ট হাতে উড়িয়ে-দেওয়া অগুন্তি খেলার ফানুস!

দু'খানা বড় বড় মোটরগাড়ি যথাসম্ভব নীরবে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের জানলায় জানলায় পর্দা তোলা, আরোহীদের দেখবার উপায় নেই।

দু'খানা গাড়িই একখানা মস্তবড় বাগানবাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে-বাড়িখানার চারিদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার কোন জানলায় আলোর আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। ফটকও বন্ধ।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই প্রকাণ্ড বাগানবাড়িখানা ভাড়া নিয়েছেন। তিনি মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন! তাঁর নাম নবাব মহম্মদ আলি খাঁ বাহাদুর।

আজ দিন-পনেরো ধরে নবাব-সাহেবকে নিয়ে কলকাতার লোকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কারণ নবাব-সাহেব হচ্ছেন একজন ধনকুবের। তাঁর হীরা-জহরতের ভাণ্ডার নাকি অফুরন্ত!

এই ভাণ্ডারের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক হচ্ছে একছড়া হীরার হার। অনেক খবরের কাগজে এই অমূল্য রত্নহারের ছবি ও ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি এই রত্নহারটি নূরজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন। তারপরে এই হারছড়া মোগল রাজবংশের ভিতরেই থাকে। নাদির শা দিল্লী লুটে ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোহিনূর ও এই রত্নহারের কোন সন্ধান পাননি। তারপর ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আহম্মদ শা এসে কোহিনূরের সঙ্গে ঐ রত্নহারও কেড়ে নিয়ে যান। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ যখন আহম্মদের বংশধরকে হারিয়ে কোহিনূর পুনরধিকার করেন, তখন রত্নহারটিও তাঁর হস্তগত হয়। তারপর কোহিনূর যায় ইংরেজদের হাতে, কিন্তু কেমন করে ঐ হারছড়া যে নবাব-সাহেবের পূর্বপুরুষের অধিকারে আসে, সে ইতিহাস কেউ জানে না। সম্প্রতি একজন বড় জহুরী হারছড়া পরীক্ষা করে বলে গেছেন, তার এখনকার বাজারদর এক কোটি টাকার কম নয়।

ঐ ঐতিহাসিক হারছড়া একবার খালি চোখে দেখে ধন্য হবার জন্যে নবাব-সাহেবের বাড়িতে প্রতিদিন দলে দলে দর্শক এসে ভিড় করেছে। দর্শকদের আগ্রহে বাধ্য হয়ে নবাব-সাহেব রত্নহারছড়াকে তাঁর বৈঠকখানায় নামিয়ে এনে একটি গ্লাস-কেসের ভিতরে রেখে দিয়েছেন। বৈঠকখানার দরজায় দিবারাত্র সর্বদাই একজন সশস্ত্র সেপাই পাহারা দেয়।

এইবারে সেই রহস্যময় মোটরগাড়ি দু'খানা কি করে দেখা যাক্।

একখানা গাড়ির ভিতর থেকে দুজন লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এল! তারপর চোরের মতো সন্তর্পণে এগিয়ে নবাব-সাহেবের বাড়ির এপাশে-ওপাশে উঁকিঝুঁকি মেরে আবার মোটরের কাছে ফিরে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির ভিতর থেকে খুব মৃদুস্বরে কে বললে, "পথ সাফ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে।"

তার সঙ্গী বললে, "কিন্তু ভিতরে বৈঠকখানার সেই সেপাই ঘুমোচ্ছে কিনা জানি না।"

গাড়ির লোকটি বললে, "তা জানবার দরকারও নেই। সেই সেপাই-ব্যাটা আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ঘুষ খেয়েছে। সে আমাদের বাধা দেবে না। এখন শোনো। বাড়ির ডানদিকের ঐ গলিতে যাও। রেলিং টপ্‌কে ফটকটা খুলে দাও। সাবধান, যদি কোন দারওয়ান জেগে ওঠে, তখনি তার মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করবে—বুঝেচ? যাও।"

অল্পক্ষণ পরেই একে একে বারোজন লোক ঠিক ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দেই নবাব-সাহেবের বাড়ির ফটক পার হল। মোটর দু'খানা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল,—কিন্তু তাদের কল সমানে চলতে লাগল!

নূরজাহানের রত্নহার আজ আবার বুঝি আর-একজনের হাতছাড়া হয়!

অনেক কালের পুরনো বাগান—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে মস্ত মস্ত অন্ধকার সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। আসল মালিকের যে বাগানের সৌন্দর্য-রক্ষার দিকে তেমন দৃষ্টি নেই, তাও বেশ বোঝা যায়। কারণ সর্বত্রই সাজানো ফুলগাছের চেয়ে এলোমেলো ঝোপঝাপই বেশি। নবাব-সাহেবের মতো ধনী ও সৌখীন লোকের পক্ষে এ-রকম বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া উচিত হয়নি!

ঐ-সব বোপঝাপের পাশ দিয়ে, বড় বড় গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে নিবিড়তর ছায়ার মতো লোকগুলো একে একে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! কেবল একজন লোক একটা মস্ত আমগাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো। বোধ হয় সে পাহারা দিতে লাগল।

অতগুলো লোক বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তবু সেখানে খুব-অস্পষ্ট কোন শব্দও জেগে উঠল না। বাগানও গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে চমকিত করে পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে হেঁচে উঠল—হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!

গাছের তলায় যে পাহারা দিচ্ছিল, সে আঁৎকে লাফিয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই ডান-হাতের রিভলভার ধরে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি করতে ও বাঁ-হাতে একটা বাঁশী বার করে খুব জোরে বাজাতে লাগল!

ঝোপের ভিতর থেকে অমনি কে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হুম্! জমাদার, সেপাই, জয়ন্ত!"

সারা বাগানখানার ভিতরে চারিদিকে দুদ্দাড় পায়ের শব্দ জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও ঘন ঘন রিভলভারের শব্দ। রাত্রের সমস্ত তন্দ্রার স্তব্ধতা ছুটে গেল এক সেকেন্ডে।

যে ঝোপের হাঁচির জন্ম, তার ভিতর থেকে আবির্ভূত হল সুন্দরবাবুর বিশাল ভুঁড়ি। কিন্তু বাড়ির দিক্ থেকে সাত-আটজন লোক রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে তীরের মতো বোঁ বোঁ করে ছুটে আসছে দেখে সুন্দরবাবু "হুম্!"—বলে আবার ভুঁড়িসুদ্ধ ঝোপের ভিতর ঝম্প প্রদান করলেন।

আরো নানা ঝোপের ভিতর থেকে পাহারাওয়ালার পর পাহারাওয়ালা বেরিয়ে আসতে লাগল—এখানকার সমস্ত ঝোপঝাপই যেন কেবল পাহারাওয়ালায় ভরা!

খানিক তফাৎ থেকে জয়ন্তেরও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জমাদার, ঐদিকে। মানিক, এইদিকে। আরে—আরে—শীগ্‌গির!"

সুন্দরবাবু ঝোপের ভিতর থেকে খুব সাবধানে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, আর কেউ এদিকে ছুটে আসছে না। তখন তিনি আর একবার বাইরে লাফিয়ে এসে চ্যাঁচাতে শুরু করলেন—"সেপাই, সেপাই! জল্‌দি। ডাকু-লোক ভাগ্‌তা হ্যায়। পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো!"

জয়ন্ত বেগে ছুটে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে, চোরেরা সকলেই অদৃশ্য হয়েছে, কেবল একজনকে তখনো দেখা যাচ্ছে—পরমুহূর্তে সেও মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাবে!

সে আর ইতস্তত করলে না, পলাতকের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়লে এবং সে-লোকটাও টক্কর খেয়ে মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

সুন্দরবাবু মহা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলে উঠলেন, "এক ব্যাটা কুপোকাৎ! এক ব্যাটা কুপোকাৎ! উল্লুক, শুয়োর। আমাকে টিপ্ করে গুলি ছোঁড়া? এখন কেমন জব্দ। বাহাদুর জয়ন্ত।"

কিন্তু জয়ন্ত তাঁর কথা কানেও তুললে না, সে আহত লোকটার দিকে ছুটে এগিয়ে গেল—তার পিছনে পিছনে মানিকলাল।

আহত ব্যক্তি মাটির উপরে উঠে বসে দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আচম্বিতে আবার একবার রিভলভারের শব্দ হল এবং সেও আর্তনাদ করে আবার ঘুরে পড়ে গেল।

তারপরেই ট্রাঙ্ক রোডের উপর দু'খানা মোটরগাড়ি গর্জন করে ছুটতে লাগল।

জয়ন্ত যখন সেই ভূপতিত লোকটার কাছে এসে পড়ল, তখন সে আর নড়ছে না। তাড়াতাড়ি তার বুকে হাত দিয়ে দেখে বললে, "মানিক, এ আর এ-জীবনে চুরি করবে না!"

মানিক বললে, "কিন্তু জয়, সব-শেষে রিভলভার ছুঁড়লে কে?"

—"চোরেরা। আমি একে মারতে চাইনি, তাই এর পায়ে গুলি করেছিলুম। কিন্তু একে বধ করলে এর দলের লোকেরাই।"

—"সে কি?"

—"হ্যাঁ। পাছে ওদের আহত সঙ্গী সমস্ত গুপ্তকথা ফাঁস করে দেয়, সেই ভয়ে। আমি একে জ্যান্তো ধরবার চেষ্টা করেছিলুম, ওরা আমার সে আশায় ছাই দিয়ে গেল।"

এমন সময়ে সুন্দরবাবু সেখানে হাঁসফাঁস করতে করতে এসে হাজির! চিৎকার করে বললেন, "কোথায় সেই ডাকাত-ব্যাটা? এইবারে মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি!"

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, আজ পনেরো দিন ধরে যে ফাঁদ পাতলুম—নকল নবাব-সাহেব, ঐতিহাসিক জাল রত্নহার, খবরের কাগজে কাগজে অমূলক আন্দোলন, চোরেদের মিথ্যে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা,—কিন্তু সমস্ত পণ্ড করে দিলে আপনার ঐ বিদ্‌কুটে হাঁচি! আটাশ বছর পুলিশে চাকরি করছেন, দুটো হাঁচি চাপতেও পারলেন না? ঘাটে এনে নৌকো ডোবালেন? ছিঃ!"

কিছুমাত্র দমে না গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। যে-রকম হাঁচি আমার এসেছিল, কোন ভদ্রলোকই সে-রকম বিশ্রী হাঁচি সামলাতে পারে না। আমি অন্যমনস্ক হলুম, মাথা-ঝাঁকানি দিলুম, দু'হাতে মুখ চাপলুম, কিন্তু কিছুতেই কিচ্ছু হল না—সে ভয়ঙ্কর ভণ্ডুলে হাঁচি মুখ ঠেলে বেরিয়ে এল একেবারে তেড়ে-ফুঁড়ে! আমার দোষ কি?"

জয়ন্ত বললে, "আমারই ভাগ্যের দোষ! আর পাঁচ মিনিট পরে হাঁচলে পালের গোদা ভবতোষের সঙ্গে সমস্ত দলটাকেই আমরা গ্রেপ্তার করতে পারতুম।"

জয়ন্তের পিঠ চাপড়ে সুন্দরবাবু বললেন, "এত সহজে মুষ্‌ড়ে পোড়ো না ভায়া, ভয় কি? ইস্কুলের কেতাবে পড়োনি—'ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন'? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, আবার চেষ্টা কর! চেষ্টায় কী না হয়?"

মানিক বললে, "কিন্তু জয়, তুমি তো সুন্দরবাবুর বাহাদুরিটা দেখচ না! ওঁর দুটি মাত্র তুচ্ছ হাঁচির ভয়ে বারো-বারোজন জোয়ান ও জ্যান্তো ডাকাত এক দৌড়ে পালিয়ে গেল! একেই বলি বীরত্ব!"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "ঠাট্টা কোরো না মানিক, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!...হুম্! এইবারে দেখা যাক্, এ ডাকাতটা কি বলে।"

জয়ন্ত শুক্‌নো হাসি হেসে বললে, "ও আর এ-জীবনে আপনার সঙ্গে কথা কইবে না।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন,"তাহলে ও মরে গিয়েচে?...দেখচি, আজকের যাত্রাই খারাপ! যাক্, তবু ওর মুখখানাই দেখি! মানিক, তোমার 'টর্চ'টা ওর মুখের ওপর ধর তো একবার!...ও বাবা, ও কী! ওকি মানুষের মুখ?"—তিনি চম্‌কে দু'পা পিছিয়ে এলেন!

জয়ন্ত বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ও ভূত-টুত নয়। ওর মুখে বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচবার মুখোশ আছে, গ্যাসের মুখোশ দেখতে এমনি বেয়াড়াই হয়!"

—"গ্যাসের মুখোশ? কেন?"

—"আপনি কি এর মধ্যেই 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইডে'র কথা ভুলে গেলেন? এখানেও ঐ গ্যাস ব্যবহার করবার জন্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল!" এই বলে জয়ন্ত মৃতদেহের মুখোশ খুলে দিলে।

লোকটির দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, গায়ের ডুমো ডুমো মাংসপেশীগুলো যেন চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখখানা ভয়ানক, দেখলেই দুর্গা-প্রতিমার অসুরের মুখ মনে পড়ে! কপালের বাঁ-দিকে, ভুরুর উপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রচণ্ড একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন,—এমন মারাত্মক চোট খেয়েও কেউ যে বেঁচে থাকতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না!

মানিক শিউরে উঠে বললে, "কী ভয়ানক!"

সুন্দরবাবু তার মুখ দেখে এমন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, খানিকক্ষণ একটাও কথা কইতে পারলেন না! তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "না, না—এ অসম্ভব! আমি কি স্বপ্ন দেখচি? আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে...মানিক, 'টর্চে'র আলোটা আরো ভালো করে এর মুখের ওপর ফেল তো!... না, না, এ যে একেবারে সেই মুখ! কপালের সেই বিষম কাটা দাগটা পর্যন্ত যে মিলে যাচ্ছে! জয়ন্ত, আমার মাথা ঘুরচে, তুমি একবার এর বুকটা খুলে দেখ তো, ডানদিকে একটা এক-বিঘৎ-লম্বা লাল জড়ুলের দাগ আছে কিনা! আমার ভয় করচে, আমি পারব না!"

জয়ন্ত লাশের জামার বোতামগুলো খুলে ফেললে। তার বুকের ডানদিকে সত্যসত্যই একটা এক-বিঘৎ-লম্বা লাল জড়ুলের দাগ রয়েছে। সে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি একে চেনেন নাকি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "চিনি বললে বলতে হয়, চোখের সামনে আমি একটা ভূতের মড়া দেখচি!...হ্যাঁ, ঠিক হয়েচে! মহম্মদ একবার এদিকে এগিয়ে এস তো! এ কদিন তো নকল নবাব সাহেব সেজে খুব আয়েস করে নিলে, এখন একটা কাজ কর দেখি! তুমি হচ্ছ আমারই মতো পুলিশের পুরনো লোক। এই লাশটা কি সনাক্ত করতে পারো?"

মহম্মদ এগিয়ে এসে মৃত ব্যক্তিকে দেখেই সভয়ে ও সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল!

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, "কে এ মহম্মদ? তুমি চিনতে পেরেচ?"

—"হ্যাঁ হুজুর! এ মহাদেও কাহার!"

সুন্দরবাবু চিৎকার করে বললেন, "তাহলে আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়,—এ মহাদেও কাহার!"

জয়ন্ত বললে, "মহাদেও কাহার! কে সে?"

সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি যখন সবে পুলিশে চাকরি নিয়েচি, মহাদেও কাহার ছিল তখন এক নামজাদা ডাকাত! সে নিজের হাতে কত মানুষ

খুন করেচে, তা আর গুনে বলা যায় না। অনেক কষ্টে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। তার উপরে ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগেই সে জেল ভেঙে পালায়। কিন্তু হাওড়ার পোলের কাছে পুলিশ তাকে আবার ধরে ফেলে। তবু কোনগতিকে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে মহাদেও গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর তাকে বা তার লাশকে পাওয়া যায় না। আমরা সবাই জানি সে মরে গিয়েচে। কারণ আজ সাতাশ বৎসরের মধ্যে মহাদেওকে কেউ চোখে দেখেনি। সাতাশ বৎসর আগে যে গঙ্গাজলে ডুবে মরেচে, আজ সেই মহাদেওর লাশ আবার আমরা খুঁজে পেলুম।''

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, ''না, না, সম্পূর্ণ অসম্ভব!''

মানিক বললে, ''এ লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের বেশি হতে পারে না। এ অসম্ভব কথা।''

সুন্দরবাবু বললেন, ''আমিও বলি, এ অসম্ভব কথা! কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব কি জানো? সাতাশ বছর আগে মহাদেও যখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তার বয়স ছিল ঠিক পঁয়ত্রিশ বৎসর। তাহলে আজ তার বয়স হত বাষট্টি বৎসর! কিন্তু এই কি বাষট্টি বৎসরের বৃদ্ধের দেহ? অথচ এ যে সেই মহাদেও, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই! সেই মুখ-চোখ, কপালের বাঁদিকে সেই কাটা দাগ, বুকের ডানদিকে সেই জড়ুলের চিহ্ন!''

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, ''বলরাম চৌধুরী! পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের পরে অদৃশ্য হয়ে সত্তর বৎসর বয়সে আবার দেখা দিয়ে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করচে! তার ওপরে আবার মহাদেও কাহার! পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে জলে ডুবেচে, বাষট্টি বৎসর বয়সে ডাঙ্গায় উঠে আবার মরল, কিন্তু এই সাতাশ বৎসরে তার চেহারা একটুও বদ্‌লায়নি!—আমাদের সকলের মাথাই কি একসঙ্গে বিগ্‌ড়ে গিয়েচে? যা নয় তাই!''

সুন্দরবাবুর তৈরি রিভলভার

জয়ন্ত ও মানিক দু'জনে দুখানা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়েছিল। জয়ন্তের চোখ মোদা—বোধহয় কিছু ভাবছে; মানিকের চোখ খোলা—বোধহয় কড়িকাঠ গুনছে।

হঠাৎ মানিক বলে উঠল, ''জয়, আজকের কাগজ পড়েচ?''

জয়ন্ত চোখ বন্ধ রেখেই বললে, ''না। আজকালকার খবরের কাগজে খবর থাকে না—অর্থাৎ আমি যে-রকম খবর চাই।''

মানিক বললে, ''আজকের কাগজ ও-কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েচে। অর্থাৎ তোমার

মনের মতো খবর দিয়েচে।”

জয়ন্ত বললে, “আচ্ছা, আগে খবরটা তোমার মুখে শুনি, তারপর আমি চোখ খোলবার চেষ্টা করব।”

—“শ্যামবাজারের মস্ত ধনী তারিণী বিশ্বাসের বাড়িতে কাল রাত্রে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না অদৃশ্য হয়েছে।”

—“হ্যাঁ, এমন খবর শুনে চোখ খুলতে পারা যায় বটে! তারপর?”

—“ঘটনাস্থলে বাড়ির একজন দ্বারবানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কি-করে তার মৃত্যু হয়েচে এখনো জানা যায়নি। তার দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।”

জয়ন্ত বললে, “হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্!”

মানিক বললে, “সে কি! তুমি কি এটাও ভবতোষের কীর্তি বলে মনে কর?”

—“খুব সম্ভব তাই। কারণ 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্' যাদের মারে, তাদের মৃত্যুর কারণ ধরা বড় কঠিন। ডাক্তাররা হয়তো ঐ দ্বারবানের দেহ পরীক্ষা করে বলবেন, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে তার মৃত্যু হয়েছে।”

মানিক বললে, “জয়, ভবতোষের অপরাধ সম্বন্ধে যখন কোনই সন্দেহ নেই, তখন এমন ভয়ানক লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?”

—“মানিক, তুমি ছেলেমানুষের মতো কথা বলচ! হ্যাঁ, আমরা জানি বটে এ-সব কাণ্ডের মূলে আছে ভবতোষই। কিন্তু আদালত তা শুনবে কেন? চাক্ষুষ প্রমাণ কোথায়?”

মানিক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, “আচ্ছা জয়, সেই যে মোটর-বোট নিয়ে কাফ্রীটা আমাদের আক্রমণ করেছিল, পোর্ট-পুলিশ তার কোন পাত্তা পেলে?”

জয়ন্ত বললে, “ও, সে খবরটা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েচি! সে মোটর-বোটখানা যে ভবতোষের, এটুকু জানতে পারা গিয়েচে।”

মানিক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললে, “তবে? অন্তত আমাদের আক্রমণ করার জন্যে তো মূল চক্রী বলে ভবতোষকে গ্রেপ্তার করা যায়?”

জয়ন্ত হেসে বললে, “বোসো মানিক, বোসো,—অত ব্যস্ত হয়ো না। তুমি কি ভবতোষকে এমনি কাঁচা ছেলেই মনে করেচ? ঘটনার পরদিনই খবরের কাগজে কি বিজ্ঞাপন দেখলুম জানো? ভবতোষ এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েচে...'আমার ত্রিবেণীর বাগানের ঘাট থেকে একখানা মোটর-বোট আজ দুই দিন হল চুরি গিয়েছে। যিনি তার খোঁজ দিতে পারবেন তাঁকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে'—প্রভৃতি।”

মানিক বললে, “তারপর?”

—“তারপর আর কি, পোর্ট-পুলিশ সেই মোটর-বোটখানাকে বাগবাজারের

খালের ভিতরে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বোটে তখন কেউ ছিল না।"

মানিক বললে, "বুঝেছি! এখন ভবতোষকে প্রশ্ন করলে সে বলবে,—'বোট যে চুরি করেছে সমস্ত দোষ তার,' আর চোর যখন পলাতক, তখন কেউ তাকে ছুঁতেও পারবে না!"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে।...মানিক, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে! খুব ভারি ভারি পায়ের শব্দ! নিশ্চয় সুন্দরবাবু আসছেন—ওঁর ভুঁড়ির ভারেই পায়ের শব্দ অত ভারি!"

সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে ঢুকেই বলে উঠলেন, "জয়ন্ত, আমার মান আর চাকরি—দুই-ই বুঝি যায়! আমার এলাকায় উপরি-উপরি এতগুলো চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম—অথচ একটারও কিনারা হল না! কেন বাবা, শহরে তো আরো ঢের থানা আছে, তাদের এলাকায় যা না! একলা আমার ওপরেই এত অত্যাচার কেন?"—বলেই তিনি ধপাস্ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

মানিক বললে, "আপনার সেই দুটো মারাত্মক হাঁচির কথা...সেই বারোজন ডাকাত তাড়ানো বলিষ্ঠ হাঁচির কথা স্মরণ করুন! আপনার মান আর চাকরি যদি যায়, তবে সেই দুটো হাঁচির জন্যেই যাবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঠাট্টা কোরো না মানিক! মর্‌চি নিজের জ্বালায়, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না!"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা সুন্দরবাবু, তারিণী বিশ্বাসদের দ্বারবানের লাশ যেখানে পেয়েছেন, সেখানেও নিশ্চয় খুব-মিহি কাঁচের গুঁড়ো ছড়ানো ছিল?"

সুন্দরবাবু সচমকে বলে উঠলেন, "হুম্! এ কথা তুমি জানলে কেমন করে? হ্যাঁ, কাঁচের গুঁড়ো ছিল বৈকি!"

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! আবার 'হাইড্রোজেন আর্সেনাইড্'! আবার সেই ভবতোষ মজুমদার।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "তোমার ঐ হাইড্রোজেন না মাথামুণ্ডু আর ভবতোষই আমাকে হত্যা না করুক, পাগল না করে ছাড়বে না! এ কী প্যাঁচে পড়লুম রে বাবা, কোন হদিসই পাওয়া যায় না!"

এমন সময়ে ঘরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল! তার পরনে তালি-মালা ময়লা কাপড়, গায়ে ধুলোমাখা ছেঁড়াখোঁড়া চাদর আর মাথার চুলগুলো রুক্ষ উস্কোখুস্কো!

তাকে দেখেই সুন্দরবাবু তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন, এবং ষাঁড়ের মতো গর্জন করে বললেন, "চুপ করে ঐখানে দাঁড়াও! আর এক পা এগিয়েছ কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই! ও শত্রু নয়, আমারই চর!"

মানিক বললে, "ওঃ, সুন্দরবাবু কি চট্‌পটে! রিভলভার একেবারে তৈরি।"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "ঠাট্টা কোরো না মানিক! তুমি কি জানো না, তোমাদের বাসাটা বাঘের খাঁচার চেয়েও বিপজ্জনক? হাইড্রোজেন না কি আছেন, অজগর সাপ আছেন, আরো যে কত কি আছেন না-আছেন, কেমন করে বুঝব বাবা? হুম্! ভদ্দরলোকের বাড়ির ভেতরে এমন দুশমন চেহারা দেখলে কার না ভয় হয়?"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "সে কথা ঠিক! কিন্তু আমার এই চরটি যে এখন ছদ্মবেশে আছে! ও আমারই একটা কাজে গিয়েছিল।...তারপর শিবলাল, ব্যাপার কি? কোন খবর আছে?"

আগন্তুক জয়ন্তের কাছে এসে চুপিচুপি বললে, "সেই বজ্‌রাখানা ঘুঘুড়ির কাছে এসে নঙ্গর করেছে। তারপর সঙ্গে একখানা মোটর-বোটও আছে।"

—"আচ্ছা, তুমি এখন যাও।"

শিবলাল অদৃশ্য হল। জয়ন্ত ফিরে বললে, "এস মানিক, আমাদের এখনি বেরুতে হবে। সুন্দরবাবু, আপনি আপাতত এখানে বসে বিশ্রাম করুন, চা-টা যা দরকার হবে, হুকুম করলেই আসবে।"

—"আর তোমরা?"

—"আমরা এখন নৌকোয় চড়ে গঙ্গায় বেড়াতে যাব। আমি বাঁশী বাজাবো আর মানিক গান গাইবে। এস মানিক!"

জয় ও মানিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, "হুম্! বরাবরই জানি, ছোকরাদের মাথা খারাপ! ওরা কি যে বলে আর কি যে করে, কিছুই বোঝবার যো নেই! আবার বলে গেল, হুকুম করলেই চা পাবেন! বাব্বাঃ! এ-বাড়িতে একলা খানিকক্ষণ থাকলে আর রক্ষে আছে!"

আবার সেই আঙুল-কাটা বলরাম চৌধুরী

জয়ন্ত ও মানিক আজকেও একখানা পান্সীতে চড়ে ওপারে ঘুঘুড়ির দিকে চলল! দূর থেকেই দেখা গেল, সেই পরিচিত বাহারী বজ্‌রাখানা গঙ্গার উপরে ভাসছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে একখানা মোটর-বোট।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, "সেদিন এই বজ্‌রা দেখতে এসেই আমরা বিপদে পড়েছিলুম। আবার আজ—"

জয়ন্ত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললে, 'আবার আজ এই বজ্‌রা দেখতে গিয়েও আমরা বিপদে পড়তে পারি। তবু আমি ওখানে যাব।"

—"কেন?"

—"সেদিন ঐ বজ্‌রাতে উঠেছিলুম বলেই আসল অপরাধীকে চেনবার উপায়

হয়েছিল। আবার দেখতে চাই, নতুন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না!"

—"কোন্ অছিলায় বজ্‌রায় গিয়ে উঠবে?"

—"বল্‌ব, বজ্‌রাখানা খুব ভালো লেগেচে, তাই আবার দেখতে এসেচি। কিংবা অন্য কোন ছুতো!"

—"ভবতোষ বিশ্বাস করবে কেন?"

—"বিশ্বাস না করুক্, বাইরে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারবে না। খুব সম্ভব, আমাদের সন্দেহ দূর করবার জন্যে এবারে সে আর কোন গোলমাল করবে না। আর গোলমাল যদি করেই, বিপদে যদি পড়ি, তাহলে আমরাও প্রস্তুত। এ-সব কাজে সিদ্ধিলাভ হয় কেবল বিপদ-আপদের মাঝখান দিয়েই!...এই যে, আমরা বজ্‌রার কাছে এসে পড়েচি। মানিক, হুঁশিয়ার থাকো, চোখ-কান সজাগ রাখো!"

বজ্‌রার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। সে একদৃষ্টিতে পান্সীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল।

পান্সীখানা বজ্‌রার গায়ে গিয়ে লাগল। জয়ন্ত শুধোলে, "ভবতোষবাবু আছেন?"

—"আছেন।"

—"আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

—"ওপরে আসুন।"

জয়ন্ত ও মানিক বজ্‌রার উপরে গিয়ে উঠল।

—"ভবতোষবাবু কোথায়?"

লোকটা হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিলে।

তারা সেইদিকে এগুলো।...হঠাৎ ছাদে ওঠবার সিঁড়ির পাশ থেকে দুজন লোক বেরিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তারাও সতর্ক ছিল, পাশ কাটিয়ে এক লাফে পাশের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানেও জন-চারেক লোক যেন তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। তারাও এত তাড়াতাড়ি আক্রমণ করলে যে, জয়ন্ত ও মানিক আত্মরক্ষা করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না। তারা সকলে মিলে তাদের দুজনের হাত ও পা শক্ত করে বেঁধে ফেললে। তারপর তাদের সেই অবস্থায় সেইখানেই ফেলে রেখে সকলে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

শোনা গেল, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন বলছে, "হতভাগারা যে এমন বোকার মতো সাধ করে মরতে আসবে, তা আমি জানতুম না! এখন বোটে করে কেউ গিয়ে বড়বাবুকে এই সুখবরটা দিয়ে আস্‌গে যা! তিনি এসে ওদের ব্যবস্থা করুন!"

আর একজন বললে, "কিন্তু পান্সীর লোকগুলো যদি ওদের খোঁজে?"

—"মাঝির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বল্ যে, বাবুরা এখন যাবেন না।"

আর একজন কে বললে, "ওদের এ-ঘরে রাখা হয়েছে দেখলে বড়বাবু বোধ হয় রাগ করবেন।"

—"ওরা নিজেরাই যে ও-ঘরে ঢুকে পড়ল! তা, আজ ওরা ওখানে যা দেখবে, সে কথা কি পরে আর কারুকে বলবার দিন পাবে? এখন যা, যা—দেরি করিস্ নে!"

তারপর কতকগুলো পায়ের শব্দ এবং তারপর সব স্তব্ধ।

বিপদ যে এমন অভাবিত ভাবে অতর্কিতে তাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে, জয়ন্ত সেটা কল্পনা করতে পারেনি মোটেই। সে ভেবেছিল, এমন পরিষ্কার দিনের বেলায় এরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা না করলেও এতটা বেপরোয়ার মতো কাজ করবে না, অন্তত খানিকক্ষণ ভাববে এবং তারা যথাসময়েই সাবধান হতে পারবে! সে নিজের সৌভাগ্যের উপর বড়-বেশি নির্ভর করে একরকম নির্বোধের মতোই এখানে এসেছিল, ভাগ্যদেবী কিন্তু তার পানে মুখ তুলে চাইলেন না!

মানিকেরও রাগ হচ্ছিল তার বন্ধুর উপরে। মুখ বাঁধা, ভাষায় রাগ প্রকাশ করবার উপায় নেই, তাই অত্যন্ত ভর্ৎসনা-ভরা চোখে সে জয়ন্তের দিকে মুখে ফেরালে।

কিন্তু জয়ন্তের মুখ-চোখের অদ্ভুত ভাব দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তার দৃষ্টির অনুসরণ করে সেও ঘরের একদিকে তাকিয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

পরে পরে দুটো কফিনের মতো গ্লাস-কেস সাজানো রয়েছে এবং তাদের ভিতরে শোয়ানো রয়েছে কী ও-দুটো? মোমের মূর্তি? না—না, মৃতদেহ! মানুষের মৃতদেহ!

একটা হচ্ছে অত্যন্ত ঢ্যাঙা এক হাব্‌সীর মড়া, তার দেহ যেন কষ্টিপাথরে ক্ষোদা!

আর একটা হচ্ছে বাঙালীর মড়া! সেও খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও কুৎসিত তার মুখ যে, দেখলে শয়তানও যেন ভয়ে আঁতকে উঠবে!

আর—আর তার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা নেই!

এই কি সেই বলরাম চৌধুরী? কিন্তু তার বয়স তো সত্তর বছর! আর, এর মাথার চুল কালো-কুচ্‌কুচে, দেহও যুবকের মতোই জোয়ান!

আর, ঐ কি সেই হাব্‌সীটা,—মোটর-বোটে চড়ে সেদিন যে তাদের আক্রমণ করেছিল? কিন্তু তারা মরল কেমন করে? আর তাদের দেহ এমন কাঁচের কেসেই বা রাখা হয়েছে কেন?

বড়বাবুর আগমন

কি অসম্ভব রহস্য! পুলিশের রেকর্ড মানলে বলতে হয়, এই বলরাম চৌধুরী ও হাব্‌সী ভূতটার মৃত্যু হয়েছে বহু বৎসর আগে এবং বেঁচে থাকলেও আজ তারা থুত্থুড়ো বুড়ো হয়ে পড়ত। কিন্তু এরা এতদিনে মরেওনি, বুড়োও হয়নি! আজ তারা

সত্যসত্যই মরেছে বটে, কিন্তু তাদের দেহে বার্ধক্যের আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। তবে কি ঐ যৌবনের ভাবটা মিথ্যা, নকল! ওদের দেহের উপরে কি ছদ্মবেশ আছে? এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ, যা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না?

আবার মানিকের মনে সেই প্রশ্ন জাগল—কিন্তু এরা হঠাৎ মরল কেন এবং কেমন করে? আর, এদের দেহ কফিনে—কাঁচের কফিনে রাখা হয়েছে কেন? যদি ধরে নেওয়া যায়, নতুন কোন জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে বা হঠাৎ কোন অসুখে এরা মারা পড়েছে এবং ঐ হাব্সীটা হয়তো মুসলমান বা ক্রীশ্চান বলেই তার দেহ কফিনে পোরা হয়েছে, কিন্তু বলরাম চৌধুরী? সে তো হিন্দু! তার দেহও কফিনে কেন? আবার যে-সে কফিন্ নয়, কাঁচের কফিন্! কাঁচের কফিনের কথা কেউ কি কখনো শুনেছে?

নিজেদের মারাত্মক বিপদের কথা ভুলে এই অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে মানিকের মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল! মৃতের মৃত্যু! চিরযুবক মানুষ! কাঁচের কফিন্! এর পরেও পৃথিবীর কোন মাথা না গুলিয়ে থাকতে পারে?

একটা শব্দে চমকে ফিরে মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, বন্ধন-রজ্জু-জালের ভিতর থেকে জয়ন্ত ইতিমধ্যেই তার ডান-হাতখানা বার করে নিয়ে নিজের মুখের বাঁধনও খুলে ফেলেছে!

সে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে দেখে, দড়ির ভিতর থেকে বাঁ-হাতখানা বার করতে করতে জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "মানিক, আমার এ-বিদ্যার কথা জানো না বলে তুমি বোধ হয় অবাক্ হয়ে যাচ্ছ? কিন্তু এর মধ্যে অবাক্ হবার কিছু নেই। যারা 'মাস্ল্-কন্ট্রোল্' করতে পারে, তাদের কাছে এটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়! ওরা যখন আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধে, তখন আমি দেহের সমস্ত মাংসপেশী দ্বিগুণ ফুলিয়ে রেখেছিলুম। দেহ এখন আবার আল্গা করে দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঁধনও শিথিল হয়ে পড়েছে।...ব্যাস্, আমি এখন স্বাধীন! এস, তোমার বাঁধনও খুলে দি।"

জয়ন্ত মানিকের হাত-পা-মুখ আবার খুলে দিলে এবং তারপর তাড়াতাড়ি উঠে কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, "জয়, এ-সব কি ভুতুড়ে ব্যাপার?"

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কফিনদুটো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "চুপ, এখন বাজে কথা বলো না! আমাকে একটু ভালো করে দেখতে আর ভাবতে দাও! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

মিনিট-পাঁচেক দেহদুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে জয়ন্ত যেন নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, "হুঁ, তুমি হচ্ছ সেই হাব্সী বন্ধু, আর তুমি হচ্ছ আঙুল-কাটা বলরাম চৌধুরী! তোমরা সেকেলে লোক, কিন্তু এখনো বুড়ো হওনি—যৌবন তোমাদের হাতে-ধরা, তাই না? কিন্তু তোমরা আজ কুপোকাৎ কেন? তোমাদের

দেহে কোন অসুখ-বিসুখের চিহ্ন নেই, কোন আঘাতেরও দাগ নেই, তবে তোমরা মরলে কেমন করে? কিন্তু তোমাদের দেহ দেখলে তো মনে হয় না যে, তোমরা পটল তুলেছ? মড়ার দেহ তো রক্তহীন হলদে হয়ে যায়, তোমাদের দেহ তো হয়নি? অথচ তোমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ। আর এই কাঁচের কফিনেই বা শুয়ে আছ কেন?...হুঁ, জানি তোমরা কোন জবাব দেবে না! তা জবাব যদি না দাও তো কী আর করা যাবে! হে বন্ধু, ভেবো না, তোমরা জবাব না দিলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না! তোমাদের প্রভু ভবতোষ খুব বুদ্ধিমান, ভীষণ ধড়িবাজ আর অসাধারণ মানুষই বটে,—সৎপথে থাকলে সে আজ অমর হতে পারত! কিন্তু ভবতোষের সব রহস্য আমি বুঝে নিয়েছি—বুঝেছ হাব্সী-বন্ধু? বুঝেছ বলরাম চৌধুরী? আর কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না! ওঃ, মানিক,—কি সুক্ষণেই আমরা আজ এই ঘরে বন্দী হয়েছিলুম। আনন্দে আমার অট্টহাস্য করতে সাধ হচ্ছে!"

মানিক ব্যস্ত হয়ে বললে, "না, না, তুমি অট্টহাস্য কোরো না জয়! এখনো আমরা বন্দী।...কিন্তু হঠাৎ তুমি আবার কি রহস্য আবিষ্কার করলে?"

জয়ন্ত বললে, "রহস্য বলে রহস্য? এমন রহস্যের কথা পৃথিবীর কেউ কখনো শোনেনি। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রহস্য। বিজ্ঞান যে স্বপ্ন দেখেছে, ভবতোষ তাকে সত্যে পরিণত করেছে! কিন্তু সে কথা এখানে গুছিয়ে বলবার সময় হবে না—ঐ শোনো, গঙ্গার বুকে দূরে একখানা মোটর-বোটের গর্জন শোনা যাচ্ছে!"

মানিক কান পেতে শুনে বললে, "হ্যাঁ। আমরা বন্দী হয়েছি খবর পেয়ে মোটর-বোটে চড়ে ভবতোষ বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে!"

জয়ন্ত চারিদিকে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি বললে, "দেখা করতে নয় মানিক, আমাদের জবাই করতে! যে রহস্য আমরা জানতে পেরেছি, ভবতোষ এর পরে আর এক মুহূর্তও আমাদের বাঁচতে দেবে না। আর এখন আমাদের মরাও অসম্ভব! ভবতোষ হচ্ছে শয়তান—মানুষ-দেহে শয়তান! আমাদের জীবনের উপরে এখন বাংলাদেশের মঙ্গল নির্ভর করছে—মানিক, তুমি জানো না, আমি কি সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।"

মোটর-বোটের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে এল।

বজ্‌রার বন্ধ-দরজার বাইরে ব্যস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কে একজন বললে, "ওরে রামচরণ, শীগগির নেমে আয়! বড়বাবুর বোট আসছে!"

জয়ন্ত বললে, "হয়েছে! মানিক, ঐদিকের জানলাটা খুলে ফেলো! তারপর এস, আমরা গঙ্গায় ঝাঁপ দি! এ ছাড়া আর উপায় নেই। কেউ বাধা দিলেই গুলি ছুঁড়বে! তারপর ডুবসাঁতার! কিন্তু ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, বোধ হয় আমাদের পালানো দেখতে পাবে না!"

জানলা খুলে আগে মানিক ও পরে জয়ন্ত প্রায়-নিঃশব্দে গঙ্গার জলে গিয়ে

ডুব দিলে। বজ্‌রার সবাই বড়বাবুর মোটর-বোটেরই অপেক্ষা করছে—বন্দীদের বন্ধন-মুক্তি তারা কল্পনাও করতে পারেনি!

বড়বাবু যখন বজ্‌রায় এসে উঠলেন, জয়ন্ত ও মানিক তখন অনেক দূরে।

ক্যারেল্-সাহেব বাজে লোক নন*

ঘরের ভিতরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হতেই জয়ন্ত বলে উঠল, "এই যে, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, এতক্ষণ আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম!...ওরে, সুন্দরবাবুর জন্যে চা আর 'এগ্-পোচ্' নিয়ে আয়!"

সুন্দরবাবু দুই হাঁটু ফাঁক করে ভুঁড়ির জন্যে স্থান সংকুলান করে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, "হুম্! আজ আমি চা আর 'এগ্-পোচ্' খেতে এখানে আসিনি। তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, সেই খুনী ডাকাতদের সন্ধান দেবে বলে। আগে আমি তাদের চাই।"

জয়ন্ত বললে, "আজ্ঞে, তারা আমার বাড়িতে এখনো ভ্রমণ করতে আসেনি। তাদের নিমন্ত্রণ করবার জন্যে আমাদেরই যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আপাতত আমি একটি বক্তৃতা দেব।"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "বক্তৃতা? আমি ফাঁকা কথা চাই না, কাজ চাই। আমি কাজের মানুষ। হুম্!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বক্তৃতায় স্বদেশোদ্ধারের কথা থাকবে না, কাজের কথাই থাকবে। আমার বক্তৃতা না শুনলে আপনি আসামী ধরতে পারবেন না।"

সুন্দরবাবু নাচার ভাবে বললেন, "তবে দাও তোমার বক্তৃতা!"

চা ও 'এগ্-পোচ্' এল। জয়ন্ত তার বক্তৃতা শুরু করলে ঃ—

"আপনারা কেউ জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিনা জানি না। করলে দেখতে পেতেন, মৃত্যু নিশ্চিত বটে, কিন্তু জীবনকে সুদীর্ঘস্থায়ী করা চলে।

মানুষের দেহ হচ্ছে মেসিনের মতো। মেসিনের কল-কব্জা বেশিদিনের ব্যবহারে খারাপ হয়ে যায়। তখন সেগুলোকে মেরামত করে নিলে মেসিন আবার সচল হয়।

মানুষের দেহে কল-কব্জা বিকল হয়ে গেলেও কি মেরামত করা চলে না?

---

* পাঠকরা যেন শুষ্ক ও নীরস বলে জয়ন্তের বক্তৃতার অংশ বাদ দিয়ে না যান। এই অংশে যা আছে, তা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য, ওর প্রত্যেক লাইনটি মন দিয়ে না পড়লে এই উপন্যাসের কোন সার্থকতাই থাকবে না। ইতি—লেখক।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি দেহের কল-কব্জা মেরামত করবার জন্যেই। কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকরা মেরামতি-কাজ এখনো ভাল করে শিখতে পারেননি। `

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত জীবন্ত পদার্থই ধরতে গেলে একরকম অমরই বটে। তরুণ জীবের দেহ থেকে 'টিসিউ' বা 'বিধানতন্তু' নিয়ে তুলে রেখে দিয়ে দেখা গেছে, তার ভিতরকার cell বা অণুকোষগুলি মরে না বরং দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। অসম্পূর্ণ দেহের ত্রুটির জন্যেই মৃত্যু হয় এবং সেইজন্যেই tissue বা বিধানতন্তুও মারা পড়ে; নইলে তাদের প্রায়-অমর বলা চলে।

মানুষ বুড়ো হয় কেন? তার দেহের ভিতরকার secretion বা সার বা রস শুকিয়ে যায় বলে। বৈজ্ঞানিক Steinach সাহেব অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা রসগ্রন্থি বা gland-এর বিধানতন্তুগুলি আবার কার্যক্ষম করার চেষ্টা করেছেন। Voronoff সাহেব বানরের বিধানতন্তু নিয়ে বুড়ো মানুষের দেহে ঢুকিয়ে তাকে আবার সরস ও তরুণ করে তুলতে চেয়েছেন এবং যথেষ্ট সুফলও পেয়েছেন। এই উপায়েই একেবারে শক্তিহীন, নুয়েপড়া বুড়ো ষাঁড়কে আবার তেজীয়ান যুবক করে তুলতে পারা গিয়েছে।

এই সব দৃষ্টান্ত দেখে বেশ বোঝা যায়, পৃথিবী থেকে মৃত্যুকে তাড়াতে না পারলেও এবং একেবারে অমর হতে না পারলেও, যৌবন বজায় রেখে মানুষের পক্ষে কয়েক শত বৎসর বেঁচে থাকা হয়তো অসম্ভব নয়।"

সুন্দরবাবু হাই তুলে বললেন, "ওরে বাবা, আমরা কি মেডিকেল কলেজের মাস্টার-মশায়ের লেকচার শুনছি? জয়ন্ত কত ঢংই জানে!"

তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেই জয়ন্ত বলতে লাগল—"সুন্দরবাবু, আপনি রজনীগন্ধা গাছ দেখেছেন? জানেন তো তার মূলগুলো তুলে নিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে তারা মরে না? এরকম লিলিজাতের মূলও এইভাবে গুদামজাত করা চলে। পরের বৎসরে যথাসময়ে সেই মূলগুলো আবার মাটিতে পুঁতলে নতুন গাছে নতুন ফল দেখা যায়। এই জাতের আরো অনেকরকম গাছ আছে। তাদের জীবনী-শক্তি অমর।

কিছুদিন আগে বিলাতের 'টাইম্‌স্‌' পত্রে এই খবরটি বেরিয়েছে ঃ

রুসিয়ায় লেনা নদীর মুখে লিরাখোবস্ক দ্বীপ। কেপ্‌টারেফ্‌ সাহেব সেখানে বরফের তলায় আদিম যুগের এমন একটি অরণ্য আবিষ্কার করেছেন, যা শিলীকৃত (fossilized) হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, fossil বা শিলক বলতে বোঝায়, যা প্রায় পাথরে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আর কোন প্রাণশক্তি থাকে না। কিন্তু ঐ অরণ্যের গাছপালা হাজার হাজার বছর পরেও তেমন জড় পদার্থ হয়ে পড়েনি। এইটুকুই লক্ষ্য করবার বিষয়।

গত ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে ঐ কেপ্‌টারেফ্‌ সাহেব রুসিয়ার আর-এক জায়গায় আর-একটি নতুন আবিষ্কার করেছেন। কয়েকজন লোক সোনার খনি বার করবার জন্যে এক স্থানে ষোল ফুট গভীর করে বরফ কেটেছিল। সেখানেও হাজার হাজার বৎসর

আগেকার যে-সব গাছপালা ও ঘাস পাওয়া গিয়েছে, তা শিলীকৃত হয়নি। ঘাসগুলো টাট্‌কা ঘাসের মতোই নোয়াতে পারা গিয়েছে।

রুসিয়ার স্কোভোরোডিনো নামক স্থানে কেপ্‌টারেফ্‌ সাহেব তৃতীয় যে আবিষ্কার করেছেন, তা আরো আশ্চর্য! বারো ফুট গভীর তুষার-স্তূপের তলায় পাওয়া গিয়েছে ঘাসের মতন একরকম উদ্ভিদ্‌। নিশ্চয় সেখানে অনেক আগে বোদমাটির জলাভূমি ছিল, উদ্ভিদ্‌ হচ্ছে তারই অংশবিশেষ,—কিন্তু শিলীকৃত হয়নি। পনেরো দিন পরে ঐ কালো উদ্ভিদে ক্রমে সবুজ রং ধরতে লাগল। মাসকয়েক পরে তা শৈবালের আকার ধারণ করলে—সামুদ্রিক শৈবাল! বরফের তলায় সুরক্ষিত ছিল বলে হাজার হাজার বৎসর পরেও উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি!"

সুন্দরবাবু প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "হুম্‌! থামো জয়ন্ত, থামো! আর আমার সহ্য হচ্ছে না! তুমি কি আমাকেও তোমাদের মতন পাগলা বলে ধরে নিয়েছ? হাজার হাজার বৎসর আগেকার শৈবালের গল্প আমি আর শুনতে চাই না। আসামীর কথা কিছু জানো তো বল, নইলে আমি থানায় চললুম।"

জয়ন্ত বললে, "আমার বক্তৃতার আর অল্পই বাকি আছে, আপনি আর একটু ধৈর্য ধরে শুনুন!

এতক্ষণ আমি এই কথাই বোঝাতে চাইছি যে, ঠিক ভাবে রাখতে পারলে কোন সজীব পদার্থই মরে না—অন্তত প্রায়-অমর হতে পারে।

দেহের ভিতরে নূতন ও সতেজ রস সঞ্চার করে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে সহজে বুড়ো হতে দেন না। যতদিন না মানুষ বুড়ো হয় ততদিন মৃত্যু তার কাছে আসে না।

উদ্ভিদ্‌ নিম্নশ্রেণীর সজীব পদার্থ। হাজার হাজার বৎসর পরেও সে যদি আবার ঘুমন্ত থেকে পুনর্জীবনের লক্ষণ নিয়ে বেঁচে উঠতে পারে, তবে তার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষেরও পক্ষে তা সম্ভবপর হবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাই আমেরিকার রক্‌ফেলার ইন্‌স্টিটিউটের ডাঃ আলেক্সিস্‌ ক্যারেলের কাছ থেকে। সুন্দরবাবু, আপনি ক্যারেল্‌ সাহেবের নাম শুনেছেন?"

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড মাথা নাড়া দিয়ে বলে উঠলেন, "ও-সব বাজে লোকের নাম আমি শুনতে চাই না। তোমাদের মতো আমারও মাথা খারাপ নয়!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, ক্যারেল্‌ সাহেব বাজে লোক নন, তাঁর নাম আজ পৃথিবী-জোড়া। ১৯১২ খৃস্টাব্দে তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন! তাহলে ক্যারেল্‌ সাহেব বাজে লোক নন!"

জয়ন্ত বললে, "আপনার সার্টিফিকেট পেয়ে ক্যারেল্‌ সাহেব ধন্য হলেন। এই ক্যারেল্‌ সাহেব কি বলেন জানেন? তাঁর মতে, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। মানুষের দেহকে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে যদি দীর্ঘকালের জন্যে গুদামজাত করে রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে তাকে যদি গুদাম থেকে বার করে আবার লীলাখেলা করতে দেওয়া হয়, মানুষও তাহলে শত শত বৎসর বাঁচতে

পারে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “হুম্! হতে পারে তোমাদের ক্যারেল্ সাহেব ‘নোবেল প্রাইজ’ পেয়েছেন, হতে পারে তিনি বাজে লোক নন, কিন্তু ও-কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

জয়ন্ত বললে, “কেন বিশ্বাস করেন না? প্রাণের লক্ষণ না থাকলেও মানুষের দেহ যে নষ্ট হয় না, এর তো প্রমাণ আছে। আপনি সমাধির কথা শুনেছেন তো? কোন কোন যোগীর সমাধিস্থ দেহ এই আধুনিক কালেও মাটির তলায় কবর দেওয়া হয়েছে। প্রায় চল্লিশ দিন পরে মাটি খুঁড়ে সেই মৃতবৎ দেহ উপরে তোলা হয়েছে, তখন তার মধ্যে আবার পূর্ণজীবন ফিরে এসেছে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “হ্যাঁ, এ কথা আমি শুনেছি বটে!”

জয়ন্ত বললে, “তবে গুদামজাত করলে মানুষের দেহ নষ্ট হবে কেন? অবশ্য, দেহকে এখানে যোগবলে ঘুম পাড়ানো হবে না—বৈজ্ঞানিকেরা রসায়ন-বিদ্যা বা অন্য কিছুর সাহায্য নেবেন। ক্যারেল সাহেব বলেন, মানুষের দেহে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই তাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে গুদামে তুলে ফেলা হয়, তাহলে অনেককাল পরেও তাকে জাগালে সে আবার তাজা আর সবলরূপেই জেগে উঠবে—যেমন নূতন জীবন পায় রজনীগন্ধা,—যেমন নূতন জীবন পেয়েছে কেপ্টারেফ্ সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হাজার হাজার বৎসর আগেকার উদ্ভিদ্!”

মানিক এতক্ষণ নীরবে একাগ্রভাবে জয়ন্তের কথা শুনেছিল, এইবারে সে মৌনব্রত ভঙ্গ করে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, “জয়, জয়! এতক্ষণ পরে আমি তোমার বক্তৃতার অর্থ বুঝেছি! তুমি তো এই কথাই বলতে চাও যে, ভবতোষও কোনরকম রাসায়নিক ঔষধের গুণে মানুষের দেহকে ঘুম পাড়িয়ে গুদামজাত করে ফেলতে শিখেছে?”

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, “হ্যাঁ!”

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, “হুম্! জয়ন্ত, তুমি বরং বাঁশী বাজাও, আমি সহ্য করব। তোমার আজকের পাগ্‌লামি সহ্য করা অসম্ভব। হচ্ছিল ক্যারেল্ সাহেবের কথা, কিন্তু তার মধ্যেও ভবতোষ? ‘ভবতোষ ভবতোষ’ করেই তুমি ক্ষেপে গেলে দেখছি!”

জয়ন্ত বললে, “আপনার সঙ্গে আপাতত আমি আর বকতে পারব না, আগে এক পেয়ালা চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে আসি। মানিক, আজকে বজ্‌রায় গিয়ে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি, ততক্ষণ তুমি সুন্দরবাবুর কাছে তা বর্ণনা কর।”—এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে পুনঃপ্রবেশ করে জয়ন্ত দেখলে, ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে সুন্দরবাবু স্তম্ভিতের মতন বসে আছেন। জয়ন্তকে দেখে মুখ বুজেই আবার খুলে ফেলে তিনি বলে উঠলেন, “এতক্ষণে তোমার লেক্‌চারের মানে বুঝলুম। কিন্তু,

এও কি সম্ভব? আর ভবতোষের এমন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করবার কারণই বা কি?"

জয়ন্ত বললে, "কারণ কি, বুঝছেন না? যে-সব আসামী প্রাণদণ্ড বা গুরুতর শাস্তি পেয়েছে, ভবতোষের আশ্রয়ে তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে ঘুমিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে দেয়। তারা আপত্তি করে না, কেননা মৃত্যুভয়ও নেই, পুলিশের ভয়ও নেই! বরং লাভ আছে, কেননা বুড়ো হবার ভয় নেই! এতে ভবতোষেরও দু-রকম সুবিধা। প্রথমত পাপ-কাজ হাসিল করবার জন্যে চুরি-জুয়াচুরি-জালিয়াতি-খুন-ডাকাতিতে একেবারে শিক্ষিত পাকা লোকের সাহায্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত পুলিশ যখন বেশি প্রমাণ পেয়ে বেশি গোলমাল করবে, তখন আসামীদের সরিয়ে ফেলে কফিনে পুরে গুদামজাত করলেই হবে। আসল আসামীদের না পেয়ে পুলিশ ভবতোষের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বলরাম আর সেই হাব্সীটা যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা আন্দাজ করতে পেরেই ভবতোষ নিজের আবিষ্কৃত অদ্ভুত উপায়ে কৃত্রিম মৃত্যুঘুমের সাহায্যে তাদের আবার সরিয়ে ফেলতে চায়। কোন গুদামে কাঁচের কফিনে করে তাদের মৃতবৎ দেহ আপাতত সরিয়ে ফেলা হবে। পাঁচ-দশ-বারো বৎসর পরে আমরা যখন তাদের কথা ভুলে যাব, তখন আবার হয়তো তাদের সজীব হবার পালা আসবে! দৈবক্রমে গুদামজাত করবার আগেই আমি সেই হাব্সীটার আর বলরামের সমাধিস্থ দেহ দেখে ফেলেছি তাই রক্ষা, নইলে এ বিষয়ে আমার পড়াশোনা থাকলেও কোনকালেই আসল ব্যাপারটা হয়তো সন্দেহ করতে পারতুম না। এ যে অস্বাভাবিক কাণ্ড! বৈজ্ঞানিকরা চিরস্থায়ী মানব-দেহের স্বপ্ন দেখেছেন বটে, কিন্তু কোন অজানা মানুষ নিজের পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে সেই স্বপ্নকে গোপনে এমনভাবে সত্য করে তুলেছে, আমিও এটা কল্পনা করতে পারতুম না! জানি না ভবতোষের গুদামে এমন আরো কত পাপী ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিয়ে আবার জাগবে বলে ঘুমিয়ে আছে! পুলিশ তাদের দেখলেও মড়া ছাড়া আর কিছু ভাববে না, ডাক্তারী পরীক্ষাও তাদের মড়া বলেই স্থির করবে, তাদের গুপ্তকথা জানে কেবল ভবতোষই, তাদের জাগাবার ঔষধও আছে কেবল তার হাতেই!"

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। এখনি পোর্ট-পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলব—তাদের 'লাঞ্চে' উঠে সদলবলে সেই বজ্‌রা আর ভবতোষকে গ্রেপ্তার করব।"

মানিক বললে, "তাদের বজ্‌রা কি আর সেখানে আছে?"

জয়ন্ত বললে, "বজ্‌রাখানা তারা যদি ডুবিয়ে দিয়ে না থাকে, তাহলে গঙ্গার যেখানেই হোক, তাকে আবার পাওয়া যাবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "চল চল, আর দেরি নয়! এমন আশ্চর্য আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারলে আমার সুনাম আর উন্নতির সীমা থাকবে না!"

সুন্দরবাবুর বীরত্ব

একখানা 'লাঞ্চ্' ও একখানা 'মোটর-বোট' সশব্দে গঙ্গার জল কেটে হু-হু করে ছুটে চলেছে। বোটে আছে জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু প্রভৃতি এবং 'লাঞ্চে' আছে একদল পুলিশের লোক।

গঙ্গার আর্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না করে দু-ধারে ফেনার মালা দোলাতে দোলাতে 'লাঞ্চ্' ও 'বোট' যখন সাগ্রহে ঘুষুড়ির কাছে গিয়ে হাজির হল, তখন ভবতোষের বজ্‌রার চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না!

এটা সকলেই আশা করেছিল! যে-ভবতোষ ধারণাতীত শয়তানী চক্রান্তে অদ্বিতীয়, সে যে বোকার মতন এত সহজে ধরা দেবে, এটা কেউই মনে করেনি।

সুন্দরবাবু বললেন, "বজ্‌রা আর 'মোটর-বোট' তো ডাঙা দিয়ে হাঁটে না, তাদের জলের ওপরে কোথাও-না-কোথাও থাকতেই হবে।"

জয়ন্ত বললে, "জলের ওপরে না থেকে তারা যদি জলের ভেতরে থাকে? কে বলতে পারে, তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়নি?...আচ্ছা, খোঁজ নিয়ে দেখা যাক্।"

খোঁজ পেতে বেশি দেরি হল না। উত্তর দিক্ থেকে যে-সব নৌকা আসছিল, তাদের একখানার ভিতর থেকে খবর পাওয়া গেল, ত্রিবেণীর খানিক আগে তারা মোটর-বোটের পিছনে একখানা বজ্‌রাকে যেতে দেখেছে।

জয়ন্ত বললে, "মানিক, তুমি বোধহয় ভোলোনি যে, ত্রিবেণীতে ভবতোষের একখানা বাগানবাড়ি আছে?"

সুন্দরবাবু প্রচণ্ড রোখে বলে উঠলেন, "ত্রিবেণী, ত্রিবেণী! চল সবাই ত্রিবেণীর দিকে! মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! হুম্!"

'লাঞ্চে'র ও 'বোটে'র গতি দ্বিগুণ বাড়ল, তবু সুন্দরবাবু তুষ্ট নন! মহা-বিরক্ত স্বরে বার বার তিনি বলতে লাগলেন, "তোমাদের মড়াখেকো 'লাঞ্চ্' দৌড়ে কচ্ছপকেও হারাতে পারবে না! আরো জোরে—আরো জোরে! হুম্, আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি, না, লড়াই করতে যাচ্ছি?"

মানিক চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসেছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, "একখানা মোটর-বোট এদিকে আসছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেখানা আবার তীরের মতো উত্তরদিকে চলে গেল!"

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বলরাম আর হাব্‌সীটার দেহ লুকিয়ে ফেলে ভবতোষ নিশ্চয়ই পালাবার ফিকিরে ছিল। আমাদের দেখে আবার ফিরে গেল।"

সুন্দরবাবু আরো উত্তেজিত হয়ে দু'হাতে মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, "আমরা মোটর-বোটে যাচ্ছি, না, গাধা-বোটে যাচ্ছি? আমরা লন্ডনে যাচ্ছি, না ত্রিবেণীতে যাচ্ছি? এ-জীবনে কি সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব?"

'লাঞ্চ্' ও 'বোট' ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে—এত জোরে তারা বোধ হয় আর কোনদিন

ছোটেনি! বালি-ব্রীজ্, ডাইনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বাঁয়ে বেলুড় ও উত্তরপাড়া পিছনে পড়ে আছে, দু'ধারে আকাশের ভাঙা থামের মতো কলের চিম্‌নিগুলোও তাড়াতাড়ি পিছনে চলে যাচ্ছে এবং গঙ্গার পান্সী ও অন্যান্য নৌকোগুলো তাদের উন্মত্ত গতি দেখে ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে!

সুন্দরবাবু বললেন, "ওরে, কেউ আমাকে দু'খানা ডানা দে না রে! তাহলে আমি এখনি বাজপাখির মতো ভবতোষের ঘাড়ে গিয়ে ছোঁ মারি!"

মানিক চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বললে, "ত্রিবেণীর কাছেই আমরা এসে পড়েছি। কিন্তু আকাশের গায়ে ও-আগুনের শিখা কিসের?"

জয়ন্ত দূরবীণটা মানিকের হাত থেকে নিয়ে নিজের চোখে লাগিয়ে বললে, "হুঁ। ওখানে কোথাও আগুন লেগেছে! ত্রিবেণীও তো ঐখানেই!"

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, গঙ্গার ঠিক ধারেই একখানা বাড়ি অগ্নির কবলে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে! টকটকে-লাল শত শত সাপের মতো আঁকাবাঁকা ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে অগ্নিশিখারা ক্রমাগত আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করছে, গঙ্গার তীরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে, অনেকে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করছে, তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের হৈ-হৈ রবে, ভীত পশু-পক্ষীদের আর্তনাদে ও অগ্নির প্রচণ্ড গর্জনে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে!

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ভাই সব! যেখানে আগুন লেগেছে ঐখানে চল!"

সুন্দরবাবু তার চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "খবর্দার সিধে চল। আমার মাথার ভেতরে এখন আগুন জ্বলছে, ও-বাজে আগুন দেখবার শখে আর কাজ নেই!"

জয়ন্ত বললে, "কি মুস্কিল! দেখছেন না, যে-বাড়িতে আগুন লেগেছে তার সাম্‌নের ঘাটেই একখানা বজ্‌রা আর মোটর-বোট বাঁধা রয়েছে? এই তো ত্রিবেণী! আর আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই ভবতোষের বাগানবাড়িতেই!"

সুন্দরবাবু পরম বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে বললেন, "অ্যাঁ!"

জয়ন্ত বললে, "খুব সম্ভব, আমরা আসছি দেখে ভবতোষ বুঝে নিয়েছে, তার লীলাখেলার দিন ফুরিয়েছে। সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পথ বন্ধ দেখে আবার এখানে ফিরে এসে নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! কেন?"

জয়ন্ত বললে, "তার বিরুদ্ধে যে-সব প্রমাণ আছে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবে বলে। এই বাগানবাড়িতেই বোধ হয় তার প্রধান আড্ডা।"

মানিক বললে, "তুমি কি বলতে চাও যে, এই বাড়িতেই ভবতোষের পাপ-সঙ্গীদের অচেতন দেহগুলো গুদামজাত করা আছে?"

—"আমার তো বিশ্বাস, তাই!"

মানিক শিউরে উঠে বললে, "কী ভয়ানক! ভবতোষ কি তার বন্ধুদের ঘুমন্ত

দেহ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে চায়?"

জয়ন্ত বললে, "তা ছাড়া তার পক্ষে উপায় কি? ঐ দেহগুলোই যে এখন তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী!"

কথা কইতে কইতে জয়ন্ত বরাবরই অগ্নিময় বাড়িখানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। হঠাৎ সে ব্যস্ত স্বরে বললে, "মানিক, দূরবীণ দিয়ে দেখ তো, কে একটা লোক মোটর-বোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ঐ বাগানবাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে?"

মানিক দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "ঐ তো ভবতোষ!"

জয়ন্ত বললে, "শীগ্‌গির ঐখানে চল! ভবতোষ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আবার চম্পট দিচ্ছিল! কিন্তু এবারেও পালাতে পারলে না,—চল, চল!"

পুলিসের 'লাঞ্চ' ও 'মোটর-বোট' তীরবেগে তীরের দিকে চলল।

মানিক বললে, "বাতাসে কী পেট্রলের গন্ধ!"

জয়ন্ত বললে, "পেট্রল ঢেলেই ঐ আগুন সৃষ্টি করা হয়েছে!"

সুন্দরবাবু ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বললেন, "সেপাইরা, শোনো! বন্দুকে গুলি ভরে নাও! ঐ বাগানবাড়ির চারিদিক ঘেরাও কর! ওখান থেকে একটা মাছি বেরুলেও গুলি করে মেরে ফেলবে।"

মানিক হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার ভুল হল যে! মাছি মারবার জন্যে তো জন্মায় খালি কেরানিরাই। মাছি মারবার জন্যে বন্দুক তৈরি হয় না!"

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "এমন সময়ে ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না মানিক! হুম, উনি এলেন আবার কথার ছল ধরতে।"

'লাঞ্চ' ও 'বোট' তীরে গিয়ে লাগল। বন্দুকধারী পুলিশ দেখে তখন সেখানকার জনতা আরো বেড়ে উঠেছে—সকলেরই মুখে নতুন বিস্ময় ও কৌতূহল, অগ্নিকাণ্ডের দিকে তখন আর কারুরই দৃষ্টি নেই!

সুন্দরবাবু এত চট্‌পট্‌ বোট থেকে লাফিয়ে পড়ে বাগানবাড়ির দিকে ছুটে গেলেন যে, দেখলে সন্দেহ হয় না, তাঁর দেহের মাঝখানে মস্ত-ভারি একটা দোদুল্যমান ভুঁড়ি বলে কোন নিরেট উপসর্গ আছে!

অগ্নিদেবের নৃত্যোৎসব চলেছে তখনো পূর্ণ উদ্যমে। তার চিৎকারও তেমনি নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড! রক্তের আভায় চারিদিক লাল হয়ে উঠেছে, কুণ্ডলী-পাকানো ধূমে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ও দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, জ্বালাকর উত্তাপে তার কাছে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব!

কেবল 'পেট্রলের' নয়, আর-একটা ভয়াবহ দুর্গন্ধে বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে!

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অভিভূত স্বরে বলল, "মানিক, শ্মশানের শবদাহের গন্ধ! কতগুলো জীবন্ত দেহ আজ ঐখানে পুড়ে ছাই হচ্ছে, কে তা জানে?"

মানিক কিছু বলতে পারলে না, তার প্রাণ তখন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল! মনে মনে সে ভাবলে, ওরা পাপ করেছিল বলেই ওদের এমন শোচনীয় পরিণাম হল—কিন্তু পাপীর হাতেই পাপীর কী ভয়ানক শাস্তি! জীবন্তে পুড়লেও অচেতন ওরা যে সে-যন্ত্রণা ভোগ করছে না, এইটুকুই যা সান্ত্বনার কথা।

আচম্বিতে সেই অগ্নিময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা মূর্তি টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তার জামা-কাপড়ে আগুন জ্বলছে!

সে ভবতোষ, আগুন তাকে বাড়ির ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

আগুনের উত্তাপকে গ্রাহ্য না করে সুন্দরবাবু দ্রুতপদে তার দিকে অগ্রসর হলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তুলে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ভবতোষ বললে, "যদি বাঁচতে চাও, আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও!"

সুন্দরবাবু তবু এগুতে লাগলেন।

ভবতোষ গর্জন করে কি-একটা জিনিস ছুঁড়লে!

জিনিসটা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে খানিক তফাতে এসে মাটির উপরে পড়ে বিষম শব্দে ফেটে গেল এবং পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সুন্দরবাবুর দেহ!

জয়ন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল, "বোমা, বোমা! ভবতোষ বোমা ছুঁড়েছে!"

সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, রক্তাক্ত দেহে সুন্দরবাবু মাটির উপরে বসে আছেন!

কর্কশ কণ্ঠে ভবতোষ বললে, "এখনো সরে যাও, নইলে আবার আমি বোমা ছুঁড়ব!"

আহত সুন্দরবাবু হঠাৎ পাশের সেপাইয়ের হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, "প্রাণ থাকতে আমি এখান থেকে নড়ব না!"

ভবতোষ শুষ্ক, নিষ্ঠুর অট্টহাস্য করে বললে, "আমি তো মরবই, তবে তোরা বেঁচে থাকতে নয়!"—বলেই সে আবার বোমাসুদ্ধ হাত তুললে।

কিন্তু চোখের পলক পড়বার আগেই সুন্দরবাবুর বন্দুক গর্জন করে উঠল।

শূন্যে দুই বাহু ছড়িয়ে ভবতোষ ঘুরে মাটির উপর পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বোমাটা ফেটে গিয়ে রাশীকৃত ধোঁয়ার আড়ালে তাকে একেবারে ঢেকে দিলে।

সেপাইরা যখন ছুটে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখলে, নিজেরই বোমার আঘাতে ভবতোষের কলঙ্কিত দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে!

জয়ন্ত চমৎকৃত গাঢ় স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, এতদিনেও আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার বীরত্ব আমার মাথা আজ শ্রদ্ধায় নত করে দিয়েছে!"

দেহের রক্ত মুছতে মুছতে সুন্দরবাবু হাসিমুখে বললেন, "হুম্‌!"

ছত্রপতির ছোরা

॥ এক ॥

সুন্দরবাবুর শাস্তিভোগ

—'আজ সাত দিন আপনার দেখা নেই। আজ সাত দিন চায়ের আসরে আপনার আসন খালি পড়ে আছে! সুন্দরবাবু, এজন্যে আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।'

—'কী শাস্তি দিতে চাও জয়ন্ত?'

—'সুকঠোর শাস্তি! আজ একাসনে বসে গলাধঃকরণ করতে হবে সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট আর সাতটা এগ-পোচ!'

—'ওঃ! তাহলে তো সুন্দরবাবু আনন্দের সপ্তমস্বর্গে আরোহণ করবেন! ভারী শাস্তি দিতে চাও তো জয়ন্ত!' মানিক বললে হাসতে হাসতে!

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের ছেঁড়া কথায় কান পেতো না জয়ন্ত! তোমার শাস্তি যে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দ্যাখো, দস্তুরমতো ম্লানমুখে আর দুঃখিত ভাবেই ওই শাস্তি আমি গ্রহণ করব। আনন্দিত হব কী, মুখ টিপে একটুখানি হাসব না পর্যন্ত।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে চেয়ারে বসে পড়ুন। শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হোন।'

—'হুম! আমি প্রস্তুত।'

—'এত দিন আসেননি কেন?'

—'পরে বলব। আগে শাস্তি দাও। সাত পেয়ালা চা, সাতখানা টোস্ট, সাতটা এগ-টোস্ট। উঃ, কল্পনাতীত শাস্তি!'

মিনিট সাতেকের মধ্যে সাত-সাতখানা করে টোস্ট আর এগ-পোচ বদনবিবরের মধ্যে নস্যাৎ করে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবারে তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সপ্তপেয়ালা চায়ের সদ্ব্যবহার করব। কী জানতে চাও জয়ন্ত?'

—'এতদিন কী করছিলেন?'

—'তদন্ত।'

—'নতুন মামলা বুঝি?'

—'হুঁ। এমন মামলা যে সামলানো দায়।'

—'কী রকম?'

—'খুনের মামলা কিন্তু একেবারে সূত্রহীন—অর্থাৎ খুনি কুত্রাপি সূত্র-টুত্র কিছুই রেখে যায় নি। অগাধ জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছি ভায়া!'

—'মামলাটার বিবরণ শুনতে পাই না?'

—'শুনবে বইকি, শুনবে বইকি! শোনাবার জন্যেই তো আমার শুভাগমন। আচ্ছা, একটু সবুর করো। আর মোটে দু-পেয়ালা চা বাকি আছে। রোসো, এক এক চুমুকে সেটুকু সাবাড় করে দি। হুম, এখন তোমার মত কী মানিক? আমি কি রীতিমতো হর্ষহীন বিমর্ষ মুখে জয়ন্তের দেওয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করলুম না? আমি কি একবারও হেসেছি— একবারও আনন্দ প্রকাশ করেছি? অতএব সাবধান, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না।'

মানিক বললে, 'আজ একটা ব্যাপার আপনি প্রমাণ করলেন বটে।'

—'কী?'

—'পুলিশ কেবল জবরদস্তি করতেই জানে না, খাসা অভিনয় করতেও জানে।'

—'অভিনয়?'

—'হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণির অভিনয়। আপনি ইচ্ছা করলে শিশির ভাদুড়ির অন্নও মারতে পারেন।'

—'জয়ন্ত, তোমার স্যাঙাতটি হচ্ছে অতিশয় হাড়-টেঁটা। ও আমাকে আবার নতুন দিক দিয়ে আক্রমণ করতে চায়। এবার কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হবার চেষ্টা করব।'

মানিক কৃত্রিম অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'দোহাই সুন্দরবাবু, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—আপনি দয়া করে একটিবার ক্রুদ্ধ হোন!'

সুন্দরবাবু থতোমতো খেয়ে বললেন, 'মানে?'

—'মানে হচ্ছে এই। আপনি ক্রুদ্ধ হলেই আপনাকে নিয়ে বেশি মজা করা যায়।'

—'আমাকে নিয়ে মজা?'

—'হ্যাঁ দাদা!'

—'আমাকে নিয়ে মজা করতে চাও?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'তাহলে আমি কিছুতেই ক্রুদ্ধ হব না।'

—'তবে হাস্য করুন।'

—'না, আমি আর ক্ষুব্ধ কি ক্রুদ্ধও হব না, হাস্যও করব না।'

—'তবে মুখটি বুজে চুপটি করে বসে থাকুন।'

—'না, আমি মুখটি বুজে চুপটি করে বসেও থাকব না। আমি এখন জয়ন্তের কাছে আমার মামলার কথা বলব।'

মানিক নাচার ভাবে বললে, 'তথাস্তু।'

॥ দুই ॥

হত্যানাট্যের পাত্র-পাত্রী

সুন্দরবাবু বললেন! 'জয়ন্ত তুমি বসন্তপুরের স্বর্গীয় জমিদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম শুনেছ?'

—'শুনেছি। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।'

—'হ্যাঁ তাঁর দুই পুত্র—হীরেন্দ্রনারায়ণ, দীনেন্দ্রনারায়ণ। এক কন্যা সৌদামিনীদেবী। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরেন্দ্র চিরকুমার, কনিষ্ঠ দীনেন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই বিপত্নীক হয়ে এক পুত্র রেখে মারা পড়েন, ছেলেটির নাম দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নানাদিক দিয়ে গুণী হয়েও অত্যন্ত একরোখা ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হত না। ব্যাপার ক্রমে এমন চরমে ওঠে যে, হীরেন্দ্র আর দীনেন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যান। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন কন্যা সৌদামিনীদেবীকে। সৌদামিনীর বিবাহ হয়। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে মারা পড়েন। তারপর জননী হবার আগেই বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই সৌদামিনী হন বিধবা।'

জয়ন্ত বললে, 'এ যে দেখছি দুর্ভাগ্যের ইতিহাস!'

—'হ্যাঁ, এর সমাপ্তিও বিয়োগান্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের একখানা অট্টালিকা আছে। বিধবা হবার পর থেকে সৌদামিনী সেইখানেই বাস করে আসছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে মাসিক হাজার টাকা করে সাহায্য পেতেন। তিনি মাঝে মাঝে ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করেও যেতেন। কনিষ্ঠ দীনেন্দ্রের পুত্র দ্বিজেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর পিতামহের বাড়িতেই বাস করেন, বলা বাহুল্য যে সৌদামিনীর ইচ্ছানুসারেই। সৌদামিনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই ভ্রাতুষ্পুত্রই। এখন আমার সঙ্গে ব্যাপারটার সম্পর্ক কী শোনো: আজ আট দিন হল, সৌদামিনীদেবী হঠাৎ মারা পড়েছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অপঘাত-মৃত্যু।'

—'হত্যাকাণ্ড?'

—'হ্যাঁ! একদিন সকালে দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে সৌদামিনীর মৃতদেহ—বক্ষে তাঁর অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। হত্যাকারী যে কে, ধরবার কোনও উপায়ই নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমি একটিমাত্র সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি। কেবল এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছি, হত্যাকারী বাড়ির বাইরে থেকে আসেনি।'

—'এমন আন্দাজের কারণ?'

সৌদামিনীর শয়নগৃহের প্রত্যেক জানালা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরের দরজা রাত্রে অর্গলবদ্ধ থাকত না বটে, কিন্তু সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হলে আরও দুটি এমন ঘরের ভিতর দিয়ে আসতে হয়, যার প্রত্যেকটিতেই থাকে অন্য অন্য লোক।'

—'আপনি কি সন্দেহ করেন, বাড়ির লোকই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী?'

—'বাড়ির সব লোককেই প্রশ্ন করে বুঝেছি, তারা প্রত্যেকেই সন্দেহের অতীত।'

—'বাড়ির লোকদের কথা বলুন।'

—'প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েও সৌদামিনী একান্ত সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করতেন। প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে বাসিন্দা আছে মাত্র গুটিকয়। তিন মহলা বাড়ি। প্রথম দুটো মহল একরকম তালাবন্ধ থাকে বললেই চলে। একটিমাত্র মহলই ব্যবহার করতেন সৌদামিনী। যে-ঘরের ভিতর দিয়ে সৌদামিনীর ঘরে ঢোকা যায়, সেখানে থাকে তাঁর নিজস্ব পুরাতন দাসী। বয়স পঞ্চান্ন, নাম উমাতারা। সে সাধারণ দাসী নয়, গরিব কায়স্থের মেয়ে, বিধবা। ঘটনার দিন সে পাড়ার এক বিয়ে বাড়িতে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। রাত একটার সময়ে ফিরে আসে। সৌদামিনীদেবী তখন জীবিত ছিলেন কি না সে বলতে পারে না, কারণ নিজের ঘরে ফিরে এসেই সে শোয় আর ঘুমিয়ে পড়ে। সেই-ই সকালে উঠে প্রথমে সৌদামিনীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

তার ঘরের দরজা দিয়েই আসা যায়, পবিত্রবাবুর ঘরে। তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর—এই পরিবারের কাজ করছেন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। এখন নায়েবের পদে মোতায়েন। একরকম ঘরেরই লোক আর অত্যন্ত বিশ্বাসী। নিঃসন্তান। সহধর্মিনী সুরবালার সঙ্গে এই বাড়িতেই বাস করেন। কথায়-বার্তায় হাব-ভাব-ব্যবহারে অতিশয় অমায়িক। তিনিও পাড়ার ওই বাড়িতে গিয়ে খানিকক্ষণ থিয়েটার দেখে রাত এগারোটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। সুরবালার বয়স বিয়াল্লিশ। তিনি হাঁপানি রোগে প্রায় শয্যাশায়িনী। ঘটনার দিন বাড়িতেই ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘরের পাশেই একখানা ছোট্ট ঘর। সেখানে থাকে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী। বিধবা। রান্নাবান্নার ভার তার উপরেই। নাম বিন্দুবালা। সঙ্গে থাকে তার অবিবাহিতা কন্যা সিন্ধুবালা। বয়েস পনেরো। রান্নাঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে।

মহলের একদিকে তিনখানা ঘর নিয়ে বাস করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। বয়স পঁচিশ। সুশিক্ষিত। কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছে। কাব্যব্যাধিগ্রস্ত, মাসিকপত্রে কবিতা লেখে। খবর নিয়ে জেনেছি সচ্চরিত্র। স্বভাব কিঞ্চিৎ রোমান্টিক। মাসে দুশো টাকা হাত-খরচা পায়। পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

বাকি রইল আর একজনের কথা। নাম তার মানসী। বয়স বিশ বৎসর। পরমাসুন্দরী। সুমধুর প্রকৃতি। সুশিক্ষিতা। সৌদামিনীর স্বামীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে একান্ত অসহায় হয়ে পড়াতে সৌদামিনী তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। আজ দুই বৎসর সে এখানে বাস করছে। উঠতে-বসতে তাকে ছাড়া সৌদামিনীর একদণ্ডও চলে না। আগে নায়েব পবিত্রবাবুই ছিলেন সৌদামিনীর ডানহাতের মতন, মানসী আসবার পর থেকেই তাঁর প্রভুত্ব ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পবিত্রবাবুর কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, এজন্যে তিনি মনে মনে মানসীর উপরে বিশেষ খুশি নন। তা এটা স্বাভাবিক।

বাড়ির ভিতরে বাস করে এই কয়জন লোক। আর আছে দুজন দারোয়ান, তিনজন বেয়ারা, দুজন মালি, সকলেই পরীক্ষিত, পুরাতন লোক। তারা রাত্রে বাড়ির ভিতরেও থাকে না। তাদের জন্যে বাড়ির বাইরে, বাগানের ভিতর আলাদা ঘর আছে। আর তারা কীসের লোভে নরহত্যা করবে? সৌদামিনীর ঘর থেকে মূল্যবান কোনও জিনিসই চুরি যায়নি। একজন ঠিকে ঝি আছে, বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যায়।

যে-সব বাড়ির লোকের কথা বললুম, সৌদামিনীর জীবনের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত। সৌদামিনী বেঁচে থাকলেই লাভ। সৌদামিনীর মৃত্যুর পর তাদের চাকরি যাবার সম্ভাবনা। সম্পত্তি পেয়ে দ্বিজেন কী করবে না করবে, কে বলতে পারে? মানসী চাকরি করে না বটে, কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুর পর আবার তার অবস্থা হয়েছে অসহায়। সে দ্বিজেনের কেউ নয়! দ্বিজেন তার ভার গ্রহণ করবে কি না সন্দেহ!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সৌদামিনীর মৃত্যুতে দ্বিজেন কি লাভবান হবে না?'

—'মানিক, অপরাধীদের নিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, দুষ্ট লোক কি আমার চোখে ধুলো দিতে পারে? অপরাধীদের টাইপই আলাদা। দ্বিজেনের সম্বন্ধে নানা জনের কাছ থেকে খবরাখবর দিয়ে আমি তার কোনও দোষই আবিষ্কার করতে পারিনি। বিশেষ দ্বিজেনের মুখের উপরেই আছে তার মনের উজ্জ্বল পরিচয়। এমন শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'সৌদামিনীর দাদা হীরেন্দ্রনারায়ণ কী রকম লোক?'

'খোঁজ নিয়েছি। সুবিধের লোক নয়, মাতাল, জুয়াড়ি। একা থাকে, অথচ হাজার টাকা মাসোহারা পেয়েও নিজের খরচ কুলোতে পারে না। সৌদামিনীর মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগেও সে বোনের কাছে আরও টাকা চাইতে এসেছিল, কিন্তু টাকা পায়নি। তাই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। হীরেন রাগ করে চলে যায়। কিন্তু তবু তাকে সন্দেহ করবার উপায় নেই।'

—'কেন?'

—'প্রথমত, খুনি বাইরে থেকে এসেছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ভগ্নীহত্যা করে হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে যাবে কেন? সৌদামিনীর মৃত্যুতে সঙ্গে সঙ্গেই তার হাজার টাকা মাসোহারা বন্ধ হবার সম্ভাবনা।'

—'এখন সৌদামিনী সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন।'

—'পারি। মৃত্যুকালে সৌদামিনীর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি। একহারা শুকনো চেহারা, কিন্তু খুব শক্ত। আরও পনেরো-বিশ বছর অনায়াসে যমকে কলা দেখাতে পারতেন। বাপের মতন তিনিও ছিলেন বিষম একরোখা, কোপন-প্রকৃতি। ভালো-মন্দ যা-কিছু স্থির করতেন, তার আর নড়চড় হবার জো ছিল না। বাড়ির লোকের কারুর তুচ্ছ ত্রুটিবিচ্যুতিও সহ্য করতে পারতেন না, একেবারে আগুন হয়ে উঠতেন। তার উপরে ছিলেন বেজায় রাশভারী

মানুষ, মানসী আর পবিত্রবাবু ছাড়া আর কেউ সহজে তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। বাড়ির প্রত্যেকেই তাঁকে ভয় করত, কেউ ভালোবাসত বলে মনে হয় না।'

—'এতদিনে নিশ্চয়ই শব-ব্যবচ্ছেদ হয়েছে?'

'তা হয়েছে বই কি!'

'হত্যাকারী কী রকম অস্ত্র ব্যবহার করেছে?'

'ডাক্তারের মতে ছোরা। কিন্তু ঘটনাস্থলে ছোরা-টোরা কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'পদচিহ্ন, আঙুলের ছাপ?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'ডাক্তারের মতে সৌদামিনী মারা পড়েছেন কখন?'

—'আন্দাজ রাত এগারোটা কি বারোটা।'

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, মামলাটা বেশ অসাধারণ। বুড়ি মেরে অকারণে কেউ খুনের দায়ে পড়তে চায় কেন?'

—'হুম, আমারও তো ওই প্রশ্ন!'

—'কিন্তু বুড়িকে নিশ্চয়ই কেউ অকারণে খুন করেনি। তলে তলে মস্ত একটা রহস্য আছে। আমি এইরকম রহস্যময় মামলাই পছন্দ করি।'

সুন্দরবাবু জোরে মস্তকান্দোলন করে বললেন, 'আমি কিন্তু মোটেই পছন্দ করি না। সূত্রহীন মামলা ঘাড়ে পড়লে পুলিশকে কেবল নাকানি-চোবানি খেয়ে মরতে হয়।'

—'সূত্রহীন মামলা প্রমাণিত করে অপরাধীর চাতুর্য। কিন্তু কে বললে এ মামলাটা সূত্রহীন?'

—'সূত্র আছে কুত্র, দেখিয়ে দাও দেখি?'

—'সূত্র আছে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির ভিতরে।'

—'কী ছাই বলো! আজ ক-দিন ধরে বাড়ির ভিতরটা কি আমি খুঁজতে বাকি রেখেছি? সেখানে সূত্রের নামগন্ধও নেই।'

—'তাহলে হত্যাকারী বাইরের লোক!'

—'অসম্ভব!'

—'দেখা যাক। আপনি এক কাজ করতে পারেন?'

—'বলো।'

—'বললেন, নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির দুটো মহলে কেউ বাস করে না। আমি আর মানিক ওই দুটো মহলের কোনও একটায় হপ্তাখানেক থাকতে পারি, এমন ব্যবস্থা কি হয় না?'

—'খুব সহজেই হয়। ধরতে গেলে দ্বিজেনই এখন বাড়ির মালিক! আমি প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই সে নারাজ হবে না।'

—'তবে তাই করুন।'

—'ওখানে গিয়ে থাকলেই কি সূত্র বেরিয়ে পড়বে মাটি ফুঁড়ে?'

—'মাটি ফুঁড়ে না বেরোক, মানুষের মন ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তো? অপরাধী যদি বাড়ির ভিতরে থাকে তাহলে আমি তাঁকে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারব।'

॥ তিন ॥

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ

কলকাতার উপকণ্ঠ বটে, কিন্তু জায়গাটার মধ্যে আছে পল্লিগ্রামের ছাপ।

মাঠের পর মাঠ সবুজ, মাঝে মাঝে তাল-নারিকেল কুঞ্জ, বড়ো বড়ো বনস্পতির ভিড়। একদিকে কালীঘাট থেকে এগিয়ে এসেছে আদিগঙ্গার একটি শীর্ণ ধারা। তার ঝির ঝিরে জলে ঝিক মিক করছে সূর্যকরচূর্ণ! অনেক দূরে দূরে দেখা যায় এক একখানা বাড়ি। তারা মনের ভিতরে মনুষ্য-বসতির স্মৃতি জাগায় বটে, কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে না নিরালা শ্যামল পল্লিশ্রী।

জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, দিনের বেলায় এমন জায়গায় ওই ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলিকে দেখতে খুব শান্ত, খুব সুন্দর। কবি আর শিল্পীরা নাকি ওই রকম সব বাড়িতেই বাস করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এমনি নিরালা, নির্জন, অন্ধকার গভীর রাত্রে ওই বাড়িগুলো শহরের যে-কোনও বাড়ির চেয়ে ভয়াবহ আর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

—'এ কথা কেন বলছ?'

—'এই রকম সব বাড়িতেই বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ আর সুবিধা থাকে বেশি। এ-সব জায়গায় অপরাধীরা যথেষ্ট অসঙ্কোচে কাজ করতে পারে। তাই এমন সব বাড়ি দেখলে আমার মনে কবিত্ব জাগে না, জাগে আতঙ্ক।'

মানিক হেসে বললে, 'অপরাধ-তত্ত্ব ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার মনের গড়ন বদলে যাচ্ছে।'

—'হয়তো তাই মানিক, হয়তো তাই।'

একখানা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, তার চারিধারে বাগান। ফটক দিয়ে জয়ন্তের মোটর বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে নরেন্দ্রনারায়ণের শহরতলির প্রাসাদ।'

মানিক বললে, 'এক সময়ে হয়তো এটা প্রাসাদই ছিল, কিন্তু এখন ওর মধ্যে প্রাসাদত্ব কিছুই নজরে পড়ে না। কত বৎসর সংস্কার হয়নি কে জানে! বাগানেও নেই বাগানত্ব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুঁ, সৌদামিনীদেবী ও-সব বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। কেবল যে

মহলে নিজে বাস করতেন, একটু-আধটু নজর দিতেন তার দিকেই। ওই যে, আমাদের মোটরের শব্দ পেয়ে দ্বিজেন নিজেই নীচে নেমে এসেছে।'

গাড়ি এসে থামল গাড়িবারান্দার তলায়। একটি তরুণ যুবক এসে নমস্কার করে বললে, 'সুন্দরবাবু, এঁরাই কি দয়া করে আমাদের এখানে অতিথি হবেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এঁদেরই নাম জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু। জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়।'

দ্বিজেন্দ্র বললে, 'দুনিয়ার ভালো-মন্দ কিছুই ব্যর্থ হয় না। আমার দুর্ভাগ্যের জন্যেই এঁদের মতন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য অর্জন করলুম।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমি হয়তো আবার এখানকার কারুর না কারুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াব!'

দ্বিজেনের মুখের উপর ঘনিয়ে উঠল একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি সে হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসিটা ভালো করে জমল না।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'দ্বিজেনবাবু, আমার বন্ধুরা ঠাঁই পাবেন কোন মহলে?'

দ্বিজেন বললে, 'সদর মহলে। ঠাকুরদাদার আমলে এখানে অনেক অতিথি-অভ্যাগতদের আগমন হত। অনেকেই পাঁচ-দশ দিন থেকে যেতেন, তাঁদের জন্যে যে ঘরগুলো নির্দিষ্ট ছিল, তারই দু-খানা ঘর, ওঁদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি। একেবারে সেইখানেই চলুন।'

গোড়া থেকেই জয়ন্ত লক্ষ করছিল দ্বিজেনের চেহারা, ভাবভঙ্গি ও সাজসজ্জা। সুন্দর সুমিষ্ট মুখশ্রী, ছিপছিপে সুগঠিত দেহ, পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জায় শৌখিনতা নেই, আছে রুচির পরিচয়। মৌখিকভাবে শিশুসুলভ সরলতা থাকলেও চিন্তাশীলতার অভাব নেই। কণ্ঠস্বর মার্জিত। অপরাধীদের মধ্যে এ-শ্রেণির লোক দেখা যায় না।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা বিশেষত্ব আকৃষ্ট করলে জয়ন্তের দৃষ্টিকে। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গি কেমন সঙ্কুচিত এবং তার চক্ষে কেমন একটা সন্দেহের ছাপ। জয়ন্তের মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল—কেন, কেন, কেন?

দ্বিজেনের সঙ্গে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। কার্পেট পাতা প্রশস্ত সোপান-শ্রেণি—তার পাশের দেওয়াল বড়ো বড়ো তৈলচিত্রে অলঙ্কৃত। বড়ো বড়ো হলঘর, দামি দামি ছবি, মস্ত মস্ত আয়না, পাথরের বা পিতলের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি, সোফা, কৌচ, গদিমোড়া চেয়ার, নানা আকারের টেবিল ও বিজলিবাতির ঝাড়া প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। ঐশ্বর্যের কোনও মালমশলার অভাব নেই, কিন্তু অনাদরে ও মার্জনার অভাবে সমস্তই যেন একান্ত শ্রীহীন বলে মনে হয়। যেখানে রয়েছে এমন সব মূল্যবান আসবাব, তাদেরই উপরে এবং আশেপাশে চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-ধূলি, মাকড়সার জাল এবং আরও যত কিছু মালিন্য ও কলঙ্ক।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সৌদামিনীদেবী পিতার সম্পত্তির মালিক হয়েও তার সদ্ব্যবহার করেননি কেন?'

দ্বিজেন বললে, 'বিধবা হবার পর থেকেই আমার পিসিমা সংসারের উপরে সমস্ত আস্থাই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

—'কিন্তু আপনি আছেন তো?'

—'পিসিমা বলতেন, 'আমি বেঁচে থাকতে কেউ যেন আমার বাবার শখের জিনিসে হাত না দেয়!' তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যাবার সাহস ছিল না।'

—'অথচ আপনিই তাঁর উত্তরাধিকারী!'

দ্বিজেন শুষ্ক মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'না, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী নই।'

সচমকে ফিরে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী।'

—'আমি আগে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর নই।'

—'আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।'

দ্বিজেন ম্লান হাসি হেসে বললে, 'মৃত্যুর তিন দিন আগে পিসিমা এক নতুন উইল করে সমস্ত সম্পত্তি জ্যাঠামশাইকে দিয়ে গিয়েছেন।'

—'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এ কথা এতদিন আমাকে বলেননি কেন?'

—'আমি নিজেই সঠিক খবর জানতুম না। দিন-তিনেকের জন্যে আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম—নতুন উইল হয় সেই সময়ে আমার অজ্ঞাতসারেই। তারপর কাল আমাদের অ্যাটর্নিবাবু হরিদাস চৌধুরির মুখে এই খবরটা জানতে পেরেছি।'

—'তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন মারা পড়েন, তখনও আপনি এ খবর জানতেন না?'

—'না।'

সুন্দরবাবু নিজের মনে মনেই কী যেন ভেবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'আপনার জ্যাঠামশাই নতুন উইলের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন?'

—'না।'

—'কেন?'

—'শুনেছেন তো পিসিমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের টাকা নিয়ে মতান্তর হয়েছিল? তার দুই-এক দিন পরেই জ্যাঠামশাই কারুকে কিছু না জানিয়েই কলকাতার বাইরে কোথায় গিয়েছেন; কবে ফিরবেন তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই নতুন উইল বা পিসিমার মৃত্যুর খবর এখনও তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়নি।'

—'আপনাদের অ্যাটর্নির ঠিকানা কী?'

দ্বিজেন ঠিকানা দিলে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ আসি জয়ন্ত! একটা জরুরি তদন্ত আছে! কাল আবার আসব।'

॥ চার ॥

কায়ার ছায়া

দু-খানি পাশাপাশি মাঝারি আকারের ঘর জয়ন্ত ও মানিকের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল। প্রত্যেক ঘরের দু-দিকেই বারান্দা—একটি ভিতরকার আঙিনার দিকে, আর একটি বাইরেকার বাগানের দিকে।

দ্বিজেন বললে, 'এ ঘর দু-খানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে আপনারা অবাক হবেন না। এ দু-খানা আপনাদের বাসোপযোগী করে তোলবার ভার নিয়েছিলেন নায়েবমশাই নিজেই। আপনারা আসছেন শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কেন?'

—'নায়েবমশাইয়ের মতে সরকারি পুলিশ কোনোই কর্মের নয়। আপনারা একটু চেষ্টা করলেই নাকি খুনির ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না।'

—'আপনারা কি এ কথা বিশ্বাস করেন?'

—'করি।'

—'আপনার বিশ্বাস হয়তো ভ্রান্ত।'

—'না জয়ন্তবাবু, আপনার অদ্ভুত শক্তির কথা কে না জানে? অসাধারণ আপনার প্রতিভা! কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনাদের ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

—'হয়েছে।'

ঠিক এই সময়েই ঘরের ভিতরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা। শ্যাম বর্ণ। মিষ্ট স্মিত মুখ। সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। নিরহঙ্কার ভাবভঙ্গি। বয়স প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের সীমারেখায় এসে উপস্থিত হয়েছে বটে কিন্তু মাথার চুলে ও দাড়ি গোঁফে দেখা দেয়নি এখনও শুভ্রতার চিহ্ন।

তিনি ঘরে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্বাগত জয়ন্তবাবু! স্বাগত মানিকবাবু! আমাদের কী সৌভাগ্য! নমস্কার, নমস্কার!'

জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করে বললে, 'আসুন পবিত্রবাবু!'

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আমাকে চিনলেন আর আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

'মন্ত্রবলে নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি আপনি আমাদের উপস্থিতির খবর পেয়েছেন এইমাত্র।'

'কী আশ্চর্য! সত্যিই তাই!'

'আরও বুঝতে পারছি, খবর পেয়েই দুধের বাটি রেখে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছেন।'

দুই চক্ষু সভয়ে বিস্ফারিত করে পবিত্রবাবু বললেন, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! মশাই, আপনি যাদুকর!'

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, 'না মশাই, আমি একান্ত সাধারণ ব্যক্তি।'

—'না, না, আপনি অসাধারণ মানুষ, তৃতীয় নেত্রের অধিকারী।'

—'চোখ আমার দুটির বেশি নয়, তবে দুটো চোখকেই সর্বদা আমি সজাগ রাখি বটে। শুনুন তবে। আমি জানি এ বাড়িতে দুজন মাত্র ভদ্রলোক থাকেন—দ্বিজেনবাবু আর আপনি। কাজেই আপনিই যে পবিত্রবাবু, সেটা বোঝা একটুও কঠিন নয়।'

—'ঠিক, ঠিক! কিন্তু—'

—'আগে শুনুন। আমাদের দেখবার জন্যে আপনি আগ্রহান্বিত ছিলেন—নয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত! ধরতে গেলে আমি আপনার পথ চেয়েই বসেছিলুম।'

—'কে আপনাকে খবর দিলে যে আমরা এসেছি?'

—'বেয়ারা।'

—'তখন আপনি দুগ্ধপান করছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সকালে আমি চায়ের বদলে একটু গরম দুই খাই। কিন্তু কী আশ্চর্য আপনি—'

—'কিছুই আশ্চর্য নয়, আপনার গোঁফের ডগায় এখনও দুধের দাগ লেগে রয়েছে। এখানে আসবার আগ্রহ আপনার এত বেশি, আপনি মুখ ধোবার, দাগ মোছবার সময় পর্যন্ত পাননি। খুব তাড়াতাড়ি—প্রায় ছুটেই আপনি এসেছেন, কারণ ঢোকবার সময়ে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল দ্রুত। তাড়াতাড়ি—প্রায় দুটো মহল পার হতে হয়েছে, এই বয়সে একটু হাঁপাবেন বই কি!'

চমৎকৃতভাবে পবিত্রবাবু বললেন, 'রহস্যটা আপনি খুব সোজা করে আনলেন বটে, কিন্তু তবু বলব, অদ্ভুত! এক-মুহূর্তে এত বেশি দেখা আর ভাবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব! দেখছ তো দ্বিজেন, কত সহজে ইনি কত অজানা কথা জানতে পারেন! আপনার আগমনে আমরা ধন্য হলুম, ধন্য হলুম!'

—'ক্ষান্ত হোন পবিত্রবাবু, এত বেশি প্রশংসা-বাণে বিদ্ধ করলে আমরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ব।'

—'আপনাদের জন্যে চা আর জলখাবার আনতে বলে দি?'

—'না, ধন্যবাদ। ছোটো হাজারি বাড়িতেই সেরে এসেছি।'

—'দুপুরে কী-রকম খাবার খাবেন?'

—'আপনাদের যা খুশি। আমাদের এটা খাই না, ওটা খাই না বলার অভ্যাস নেই। যা পাই তাই খাই।'

—'বেশ, তাহলে আগে আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থাটাই করে আসি। তারপর আপনার

সঙ্গে প্রাণ খুলে ভালো করে আলাপ করব।' পবিত্রবাবু যেমন দ্রুতপদে এসেছিলেন, চলে গেলেন তেমনি দ্রুতপদেই।

জয়ন্ত একটা গোলটেবিলের সামনে বসে পড়ে সামনের আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'বসুন দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

জয়ন্তের কণ্ঠস্বর শুনে দ্বিজেন একটু বিস্মিতভাবে তাকালে তার মুখের পানে। তারপর টেবিলের ওধারের নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে উপবেশন করলে বিনা বাক্যব্যয়ে।

দ্বিজেনের মুখের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর কাছে আপনি বললেন, সৌদামিনীদেবী যে নতুন উইল করেছেন, তিনি মারা যাবার পরেও তার সঠিক খবর আপনার জানা ছিল না।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সঠিক খবর মানে নিশ্চিত খবর তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু অনিশ্চিত—অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোনও খবর কি আপনি পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন প্রথমটা ইতস্তত করে তারপর বললে, 'নিশ্চিত বা অনিশ্চিত কোনও খবরই আমি পাইনি। তবে নতুন উইল যে হতে পারে এটুকু আন্দাজ করেছিলুম।'

—'কেন? স্পষ্টাস্পষ্টি বলুন, কেন?'

অতিশয় অসহায়ের মতো দ্বিজেন নতমুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন, এটা বলে রাখা উচিত মনে করছি। একটু চেষ্টা করলেই অন্য উপায়ে আপনার গুপ্তকথা নিশ্চয়ই আমি জানতে পারব।'

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর নিতান্ত নাচারের মতো দ্বিজেন বললে, 'ব্যাপারটা একেবারেই ঘরোয়া। এর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্কই আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন না।'

—'তবু আমি শুনতে চাই।'

দ্বিজেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ, শুনুন। সুন্দরবাবুর মুখে মানসীর পরিচয় আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ। শুনেছি তিনি সুরূপা আর সুশিক্ষিতা।'

—'কিন্তু ও তো তার বাইরের পরিচয়। মানসীর মনের পরিচয় পেলে আপনি তাকে দেবী বলে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না।'

—'বেশ মানলুম।'

—'মানসী আজ দুই বৎসর আমাদের এখানে বাস করছে। পিসিমাকে দেখাশোনা করবার সমস্ত ভারই থাকত তার উপরে। কিন্তু সত্যকথা বলতে কী, বাড়ির সবাই জানে

পিসিমার প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, মুখ ছিল অতিশয় তিক্ত। অনাথা মানসীকে কেবল আশ্রয় দিয়েই তিনি তাঁর উচ্চমনের পরিচয় দেননি, মানসীর ভবিষ্যতের সম্বলের জন্য পুরাতন উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর কটু কথায় রূঢ় ব্যবহারে মানসীকে বড়োই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হত—এমনকি প্রায়ই সে গোপনে না কেঁদেও থাকতে পারত না। এ বাড়িতে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার লোকও আর কেউ ছিল না। দু-দিনের মধ্যেই সে পিসিমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এজন্যে সবাই তাকে হিংসা করত। নায়েবমশাইয়ের মতো অমায়িক লোকও নিজের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। সে সহানুভূতি পেত কেবল আমার কাছ থেকেই। সে নিজের মন খোলবার আর সান্ত্বনার কথা শোনবার সুযোগ লাভ করত।

'আমারও অবস্থা কল্পনা করতে পারছেন তো? ছেলেবেলাতেই হারিয়েছি পিতামাতাকে। সংসারে আত্মীয় বলতে জেনেছি কেবল পিসিমাকেই। কিন্তু তিনি আমাকে ভালোবাসতেন তাঁর নিজের প্রকৃতি অনুসারেই—যা নয় মোহনীয়, নয় সহনীয়। কখনও শুনিনি তাঁর মুখ থেকে আদরের কথা। আমিও সন্তর্পণে তাঁর কাছ থেকে থাকতুম দূরে দূরে। এ সংসারে আমার মনের মানুষ বলতে কেউ ছিল না—আমি সাবালক হয়ে উঠেছি দাসদাসী-কর্মচারীদের প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যেই। আমার অভাব-অভিযোগ শুনতেন কেবল নায়েবমশাই-ই। তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবীও আমাকে ভালোবাসেন, যত্ন করেন। ছেলেবেলায় তাঁর কোলে চড়েছি বলেও স্মরণ হয়। কিন্তু তাঁরাও কেউ আমার আত্মীয় নন।

'অনাথা মানসী আর অনাদৃত আমি—আমরা দুজনেই যে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হব, এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দুজনের মন বুঝতুম কেবল আমরা দুজনেই। নিজেদের সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতুম সুবিধা পেলেই। ক্রমে আমাদের সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যে আমরা স্থির করলুম, পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। জয়ন্তবাবু, এইখান থেকে আমাদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

'পিসিমার কাছে যেদিন আমাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, তিনি বিষম রাগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'এ বিবাহ হতে পারে না, হতে পারে না, হতে পারে না!'

'আমি যত বোঝাই, তিনি তত বেঁকে দাঁড়ান। এইটেই ছিল তাঁর চিরকেলে স্বভাব—তাঁর সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারত না। কেবল তাঁর কেন, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই নাকি প্রকাশ করেছেন ওই-রকম স্বভাব। হয়তো ওটা আমাদেরই রক্তের গুণ বা দোষ। কাজেই আমিও বংশ ছাড়া নই। পিসিমা যত বেঁকে দাঁড়ান, আমার সংকল্প তত দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'পিসিমার আপত্তির প্রধান কারণ—মানসী অনাথা, গরিব, বংশগৌরব থেকে বঞ্চিত—

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পৌত্রের সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। সেই সেকেলে যুক্তি—খাপ খায় না যা নব্যযুগের সাম্যবাদের সঙ্গে। আমি বললুম, 'ও যুক্তি আমি মানি না, মানসী ছাড়া আর কারুকে বিবাহ করব না!'

পিসিমা বললেন, 'তাহলে তোমাকে আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব।' আমি বললুম, 'তাই সই', তার কয়েকদিন পরেই পিসিমার মৃত্যু।

'জয়ন্তবাবু, আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে যে নতুন উইল হবার সম্ভাবনা আছে, এটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম কি না? তা পেরেছিলুম বইকি! পিসিমা ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে মানুষ; যা ধরতেন, তা আর ছাড়তেন না। আপনি আর কিছু জানতে চান?'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, 'আপাতত আর কিছু জানতে চাই না। হ্যাঁ, একটা কথা। মানসীদেবী কি পর্দানসীন মহিলা?'

—'মানে?'

—'তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা আর বাক্যালাপ করতে পারবেন?'

—'অনায়াসে। কিন্তু মানসীর সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে না দিলেও চলবে।'

—'সে বেচারির সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, 'সে-বিচার করব আমি। জানেন দ্বিজেনবাবু, গোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সকলকেই সন্দেহ করা। আপনাদের দাস-দাসী দারোয়ানরা পর্যন্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়।'

দ্বিজেন চেয়ার ত্যাগ করে বললে, 'বেশ, আপনার যা ইচ্ছা। মানসীকে কি এখনই পাঠিয়ে দেব এখানে?'

—'না। আজ আপনার মুখে যা শুনলুম আগে তাই পরিপাক করি। মানসীদেবীর সঙ্গে আলাপ করব কাল সকালে।'

দ্বিজেন নমস্কার করে চলে গেল। তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

মানিক বললে, 'ভাই জয়ন্ত, এতদিনেও সুন্দরবাবু যা করতে পারেননি, তুমি একবেলাতেই তা পেরেছ।'

—'কী রকম?'

—'অন্ধকার ভেদ করে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছ।'

—'পেরেছি কি? আমার তো তা মনে হয় না। এই তো সবে গৌরচন্দ্রিকা, আসল উপন্যাস এখনও শুরুই হয়নি।'

—'কিন্তু তুমি একটা মস্ত আবিষ্কার করেছ।'

—'কী আবিষ্কার?'

—'এতদিন হত্যাকাণ্ডটা ছিল উদ্দেশ্যহীন। এইবারে উদ্দেশ্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।'

—'যথা?'

—'ঠিক স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। তবে সন্দেহ হচ্ছে যেন, ওই নতুন উইলের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের একটা যোগাযোগ আছে।'

—'হয়তো আছে। হয়তো নেই। আমার পরিকল্পনা এখনও কোনও নির্দিষ্ট আকার পায়নি।'

—'মানুষ হিসাবে দ্বিজেন সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারলে?'

—'এক আঁচড়েই মানুষ চেনা যায় না ভাই! মোটামুটি দ্বিজেনকে আমার ভালোই লাগল। সরল, উদার, ভদ্র। যে স্বীকারোক্তি করলে তার মধ্যে কোনও মারপ্যাঁচ নেই। কিন্তু আমি এখন ভাবছি আর একটা কথা। ওই জানলাটার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে গোপনে কে এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করছিল?'

মানিক সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি? পুরুষ, না স্ত্রীলোক?'

—'তা বোঝা গেল না। পর্দাটা পুরু আর গাঢ় রঙের। কিন্তু বাইরের আলো আর জানলার পর্দার মাঝখানে আমি কোনও মানুষের স্পষ্ট ছায়া দেখেছি। দ্বিজেনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াটাও সরে গেল। কার কায়া থেকে এই ছায়ার জন্ম? আমি জানতে চাই, আমি জানতে চাই!'

॥ পাঁচ ॥

ছত্রপতির ছোরা

পরদিন। প্রভাতি চায়ের আসর। জয়ন্ত আছে, মানিক আছে, আর আছেন সুন্দরবাবু আর পবিত্রবাবু। দ্বিজেনও হয়তো সেখানে হাজির থাকত, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়েছে কোনও জরুরি কাজে।

কথায় কথায় পবিত্রবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরি দেখেছেন?'

—'না।'

—'আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন?'

—'অত্যন্ত!'

—'রাজার লাইব্রেরিতে অনেক দামি দামি কেতাব আছে। মস্ত লাইব্রেরি। দেখবেন তো চলুন।'

—'চলুন।'

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধেৎ, লাইব্রেরি দেখে লাভ? এখন কেউ যদি খুনিকে দেখাতে পারে তবেই আমি খুশি হই।'

পবিত্রবাবু হেসে বললেন, 'খুনিকে দেখাবার ভার তো আপনাদেরই উপরে!'

লাইব্রেরিঘরটা প্রকাণ্ড। তার চারিদিকেরই দেওয়ালের অনেকখানি পর্যন্ত ঢেকে দাঁড় করানো আছে সারি সারি আলমারি এবং আলমারির থাকগুলো রোগা আর মোটা কেতাবে কেতাবে ঠাসা।

জয়ন্ত বইগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি এখানে কোনও হালের বই নেই।'

পবিত্রবাবু বললেন, 'রাজার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই লাইব্রেরির জন্যে বই কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে তো আজকের কথা নয়, আমিই তখন এ বাড়িতে আসিনি।'

ঘরের মাঝখানে রয়েছে লম্বা একটা কাচের ডালাওয়ালা কাষ্ঠাধার। সেইদিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত শুধোলে, 'ওটা কী?'

—'শো-কেস।'

—'কী আছে ওর মধ্যে?'

—'সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার শখ ছিল রাজার। ওর মধ্যে সেইগুলোই সাজানো আছে।'

—'বড়ো চিত্তাকর্ষক সংগ্রহ তো!' জয়ন্ত কৌতূহলী হয়ে কাষ্ঠাধারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের হরেক-রকম অস্ত্র—ধনুক-তির, তরবারি, ছোরা-ছুরি, খড়্গ, কুঠার ও বর্শা প্রভৃতি আরও কত কী! প্রত্যেক অস্ত্রের গায়ে তেরঙা গোলাপি ফিতার সঙ্গে সংলগ্ন এক-একখানা কার্ড—তার উপরে দুই-এক লাইনে লেখা অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জয়ন্ত লক্ষ করলে, এক জায়গায় ফিতায় সংলগ্ন কার্ডের উপরে লেখা রয়েছে—'ছত্রপতির ছোরা', কিন্তু তার সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। সে পবিত্রবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট করলে।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন পবিত্রবাবু। বিস্ফারিত চক্ষে সবিস্ময়ে বললেন, 'এ কী ব্যাপার। বাড়িতে হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও যে ছোরাখানাকে দেখেছি যথাস্থানে! কোথায় গেল সেখানা? কে চুরি করলে?'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ছত্রপতির ছোরা ব্যাপারটা কী?'

—'ছত্রপতি শিবাজি নাকি ছোরাখানা ব্যবহার করতেন। তাই ওই নাম।'

এতক্ষণে সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হুম, হুম! বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক! আপনি ঠিক বলছেন, হত্যাকাণ্ডের আগের দিনেও ছোরাখানা এইখানেই ছিল?'

পবিত্রবাবু বললেন, 'তাতে কোনও সন্দেহই নেই'। আমার বেশ মনে আছে। সৌদামিনীদেবীর হুকুম ছিল, তাঁর পিতার বহু যত্নে সংগ্রহ করা বইগুলি যেন কীটপতঙ্গের অত্যাচারে নষ্ট না হয়ে যায়, বেয়ারাদের সাহায্যে আমি যেন হপ্তায় একবার করে লাইব্রেরিঘর পরিষ্কার করি। দেখছেন না, এ মহলের অন্যান্য ঘরের মতো এ ঘরখানাও দুর্দশাগ্রস্ত নয়?'

'হুম! তোমার মত কী জয়ন্ত?'

—'আমারও ওই মত। ছোরা চুরি যাওয়া সন্দেহজনক।'

—'সৌদামিনীদেবী মারাও পড়েছেন ছোরার আঘাতেই।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। বাইরের কোনও চোর এ ছোরা চুরি করেনি।'

পবিত্রবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'আপনারা কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করতে পারে কে? আর কেনই বা করবে? আমরা যে সকলেই তাঁর আশ্রিত। যে ডালে বসে সে ডাল কেউ কাটে? না জয়ন্তবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন—আমার মাথা ঘুরছে, আমার পা অবশ হয়ে আসছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমি চললুম—আমি চললুম!' মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত করুণভাবে দুইবার মাথা নাড়লে। সুন্দরবাবুর মুখও অত্যন্ত গম্ভীর।

মানিক বললে, 'এতদিন পরে পাওয়া গেল একটা নিরেট প্রমাণ। অপরাধী তাহলে এই বাড়ির ভিতরেই আছে। চলো জয়ন্ত, আমাদের ঘরে গিয়ে বসি।'

ঘরে ফিরে এসে তিনজনেই খানিকক্ষণ বসে রইল বোবার মতো।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন সুন্দরবাবু। বললেন, 'আমার কী বিশ্বাস জানো জয়ন্ত?'

—'বলুন।'

—'আসল হত্যাকারী বাড়ির লোক না হতেও পারে।'

—'এমন কথা কেন বলছেন?'

—'আসল হত্যাকারী হয়তো বাইরে থেকেই এসেছে, কিন্তু তাকে সাহায্য করেছে বাড়ির কোনও লোক।'

—'বুঝেছি। আপনি বোধ হয়, আসল হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন হীরেন্দ্রনারায়ণকেই?'

—'তাছাড়া আর কে? সে লোক ভালো নয়, হত্যাকাণ্ডের সাত দিন আগে টাকার জন্যে সে সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। সে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। আমার তো তার উপরেই সন্দেহ হয়। বাড়ির কোনও লোক যে-কারণেই হোক তাকে সাহায্য করেছে। রাত্রে গোপনে দরজা খুলে দিয়েছে। অস্ত্র পাওয়া যাবে কোন ঘরে হীরেন তা জানত। 'ছত্রপতির ছোরা'র দ্বারা কাজ হাসিল করে এখন সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান সঠিক হলে বলতে হবে যে, হীরেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। সে তখনও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সৌদামিনীদেবী তাকেই দান করেছেন সমস্ত সম্পত্তি!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়।'

সুন্দরবাবু উৎসাহিত হয়ে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তাহলে এখন আমি উঠলুম ভাই! দেখা যাক এই নতুন সূত্রটা ধরে কতদূর অগ্রসর হতে পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'আর আমরাও দেখি বাড়ির ভিতরে হীরেনের কোনও সহকারীকে আবিষ্কার করতে পারি কি না!'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ। সে বললে, 'বাবুজি, দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!'

—'কে দিদিমণি? মানসীদেবী?'

—'আজ্ঞে।'

—'তাঁকে আসতে বলো।'

ভৃত্যের প্রস্থান। অনতিবিলম্বে মানসীর প্রবেশ।

রূপসী বটে! চোখ-ভুরু-নাক যেন সুপটু শিল্পীর লিখন। রং যেন গোলাপি স্বপ্ন। দেহের গঠন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের আদর্শ। কে বলবে একে দরিদ্র, অনাথা, বংশগৌরবহীনা? ভাবভঙ্গির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে পরম আভিজাত্য! মহিমময়ী!

জয়ন্ত এতটা আশা করেনি। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।'

মানসী বললে, 'আমাকে এখানে আসতে বলেছেন?'

জয়ন্ত বাধো বাধো গলায় বললে, 'ঠিক আপনাকে এখানে আসতে বলিনি। আমরাই আপনার কাছে যেতে পারতুম। জানেন তো অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করবার জন্যে আমরা এখানে এসেছি! আপনার কাছ থেকে কেবল দু-চারটে কথা জানতে চাই।'

মানসী ম্লান হেসে বললে, 'আপনি না ডাকলেও আমাকে কিন্তু আজ আপনার কাছে আসতেই হত।'

জয়ন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কেন?'

—'সে কথা পরে বলব। আমি আগে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই।'

॥ ছয় ॥

রুমাল, সায়া, রক্ত

জয়ন্ত বললে, 'মানসীদেবী, হত্যার রাত্রের কথা আপনি যা জানেন বলুন।'

মানসী বললে, 'আমি যেটুকু জানি সুন্দরবাবুকে সব খুলে বলেছি। আপনি কি তা শোনেননি?'

'শুনেছি! কিন্তু পরের মুখে শোনা আর নিজের কানে শোনা এক কথা নয়।'

—'বেশ, শুনুন। সৌদামিনীদেবী অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও রাত নয়টার সময়ে ঘুমোতে যান। তাঁর পাশের ঘরে থাকে উমাতারা, আর তার পরের ঘরখানিতে থাকেন পবিত্রবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুরবালাদেবী। কিন্তু সেদিন প্রথম রাত্রে দু-খানা ঘরই খালি ছিল। এ পাড়ার কোনও বিয়েবাড়িতে থিয়েটার ছিল, পবিত্রবাবু আর উমাতারা তাই দেখতে গিয়েছিলেন আর সুরবালাদেবী গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে।

'মাঝে মাঝে আমাকে অনিদ্রা রোগে ধরে। সে-রাত্রেও কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করবার পর উঠে পড়লুম। ভাবলুম, ও-মহলের লাইব্রেরিতে গিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশুনো করে আসি। ঘুম না হলে আমি তাই করতুম—এটা ছিল আমার অনিদ্রা রোগের চিকিৎসার মতো। ঘর থেকে বেরিয়ে ও-মহলের দিকে অগ্রসর হতে হতে দেখি, সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন পবিত্রবাবু।

'জিজ্ঞাসা করলুম, 'থিয়েটার ভেঙে গেল?' তিনি বললেন, 'রাত একটার আগে ভাঙবে বলে তো মনে হয় না। আমার ভালো লাগল না, তাই চলে এলুম, উমাতারা শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তুমি এখনও ঘুমোওনি?' আমি বললুম, 'অনিদ্রাকে তাড়াবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।' তিনি আমার অভ্যাস জানতেন। একটু হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

'লাইব্রেরিতে ছিলুম ঘণ্টাখানেক। চিকিৎসা ব্যর্থ হল না, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ফিরলুম নিজের ঘরের দিকে। আসতে আসতে দূর থেকেই মনে হল, এ মহলের বারান্দা দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন একটা সাঁৎ করে সরে গেল। কিন্তু কাছে এসে কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারই চোখের ভ্রম।

'দ্বিজেনবাবুর ঘরের কাছ পর্যন্ত আসতেই ঘরের ভিতর থেকে তিনি বললেন, 'কে যায়?' আমি সাড়া দিলুম। তিনি বললেন, 'এত রাতে তুমি বাইরে!' বললুম, 'অনিদ্রা ব্যাধির ওষুধ খোঁজবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলুম।' তিনি হেসে উঠে বললেন, 'ওষুধ পেলে?' আমি বললুম, 'পেয়েছি। আমার ঘুম এসেছে।' তিনি বললেন, 'তাহলে তাড়াতাড়ি ঘরে যাও। আর পারো তো ঘুমকে বলে দিয়ো সে যেন আমার কাছেও আসে। কারণ আমারও তোমার দশা।' তারপর আমি ঘরে এসেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে রাত্রের আর কোনও কথাই আমি জানি না।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'সৌদামিনীদেবীর সঙ্গে আপনার কী রকম সম্পর্ক?'

—'সম্পর্ক একটা ছিল, তবে নামমাত্র। কিন্তু তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভবপর তিনি আমাকে ভালোবাসতেন। অবশ্য তার কারণও ছিল। আমার মতন একটি লোক না হলে তাঁর চলত না। আমার আগেও আরও কয়েকজনকে তিনি সঙ্গিনীরূপে থাকবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন

বটে, কিন্তু তারা কেউ তাঁকে দু-তিন মাসের বেশি সহ্য করতে পারেনি। আমি যে তা পেরেছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সহ্য করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না, আমি অনাথা। তবু তিনি যে একসময়ে আমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা থেকেই প্রমাণিত হয় মনে মনে তিনি অসাড় ছিলেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তাঁর দান থেকে আমি হয়েছি বঞ্চিত। তার কারণও আপনি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছেন।'

—'দেখুন মানসীদেবী, আমরা এমন প্রমাণ পেয়েছি যার উপরে নির্ভর করে বলা চলে যে, হত্যাকারী বা তার সহকারী আছে এই বাড়ির ভিতরেই। এ সম্বন্ধে আপনার কোনও মতামত আছে?'

মানসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। থেমে থেমে বললে, 'আমার মতামত? আমার কী মতামত থাকতে পারে? এ-সব আমার ধারণাতেও আসে না। এ বাড়িতে এমন ভয়ানক মানুষ কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু কী রকম লোক?'

মানসীর দুই ভুরু সঙ্কুচিত হল—কেঁপে উঠল তার ওষ্ঠাধর। অভিভূত কণ্ঠে সে বললে, 'আপনারা কি তাকেই সন্দেহ করেন?'

—'যদি বলি, করি?'

—'তাহলে মস্ত ভ্রম করবেন।'

—'কেন?'

—'দ্বিজেনবাবু হচ্ছেন দেবতা।'

—'হ্যাঁ, আপনার কাছে।'

—'না যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই-ই ওই কথা বলবে। প্রাণীহত্যার বিরোধী বলে তিনি আমিষ পর্যন্ত খেতে পারেন না। তিনি করবেন নরহত্যা! এমন কথা শুনলেও পাপ হয়। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

—'না। কিন্তু বললেন যে, আমি না ডাকলে আপনাকে আজ আমার কাছে আসতে হত। কেন?'

—'আজ এমন একটা ব্যাপার হয়েছে যার কোনও অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'ব্যাপারটা কী?'

—'আমার ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তার ভিতরে আটপৌরে কাপড়-চোপড় রাখি। আজ সকালে খানকয় কাপড়ের ভিতর থেকে এই রুমালখানা পেয়েছি।' মানসী একখানা রুমাল বার করে এগিয়ে ধরলে।

জয়ন্ত রুমালখানা নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়েই সোজা হয়ে উঠে বসল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'মানিক,- অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রুমাল!'

মানিক হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলে রুমালখানা। বললে, 'এর উপরে যে রক্তের দাগ আছে!'

—'হুঁ, কয়েকটা রক্তের ছোপ আর একটা আঙুলের ছাপ।'

মানসী চিন্তিতভাবে বললে, 'এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আমার জামাকাপড়ের আলমারিতে ওই রক্তমাখা রুমালখানা কোত্থেকে এল? ও রুমাল তো আমার নয়!'

—'রুমালের কোণে ওই ধোঁপার চিহ্ন?'

—'ও চিহ্ন আমাদেরই ধোপার।'

—'তাহলে এখানা বাড়ির কোনও লোকেরই সম্পত্তি। কিন্তু এর মালিক যে কে সেটা বিশেষ করে বোঝবার উপায়ই নেই। এ রকম সাধারণ রুমাল রাম-শ্যাম সবাই ব্যবহার করে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাম-শ্যামের রুমাল নিজে মানসীদেবীর আলমারির ভিতরে বেড়াতে আসেনি, কে ওখানা রাখতে পারে ওখানে?'

জয়ন্ত বললে, 'তার পরের প্রশ্ন কেনই বা ওখানে রাখবে?'

মানিক বললে, 'আরও একটা প্রশ্ন, রুমালখানা রক্তাক্ত কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, পরে এ সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলেও চলবে। আপাতত এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে মানসীদেবীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে এই রুমালখানাই আমাদের মামলার একটা প্রধান সূত্র হয়ে উঠবে না?'

মানসী সভয়ে বলে উঠল, 'আপনি কী বলছেন! আপনি কি বলতে চান সৌদামিনীদেবীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রুমালের কোনও সম্পর্ক আছে?'

—'থাকা অসম্ভব নয়।'

—'কেউ কি আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ওখানা আমার আলমারির ভিতরে রেখে গিয়েছে?'

—'তাও অসম্ভব নয়।'

—'তবে আমি কী করব?'

—'আপনি কিছুই করবেন না, একেবারে চুপ মেরে যান। রুমালখানা কখনও যে চোখেও দেখেছেন সে-কথা পর্যন্ত ভুলে যান।'

—'আর কারুকে ওর কথা বলব না?'

—'কারুকে না, কারুকে না। এমনকি দ্বিজেনবাবুকেও না।'

—'তাঁর কোনও বিপদ হবে না তো?'

—'মনে তো হয় না। আমি লক্ষ করে দেখেছি তিনি ব্যবহার করেন রঙিন রুমাল।'

—'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু; তিনি বরাবরই রঙিন রুমাল ব্যবহার করে থাকেন।'

—'তাহলে এইখানেই সাঙ্গ হোক রুমাল পর্ব। এইবারে মানসীদেবী, ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি, হত্যাকাণ্ডের পর আপনার ঘরে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কি না?'

—'না।'

—'মনে করে দেখুন, মনে করে দেখুন। ঘটনা যতই তুচ্ছ হোক, আমার কাজে লাগতে পারে।'

অল্পক্ষণ নীরবে ভাবতে ভাবতে মানসীর দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, 'আপনার কথায় আর-একটা ছোটো ব্যাপার মনে পড়ছে। হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালেবেলায় ওই জামা-কাপড়ের আলমারির ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে দেখেছিলুম তিন ফোঁটা রক্ত!'

—'তিন ফোঁটা রক্ত?'

—'হ্যাঁ, ঠিক তিন ফোঁটা।'

—'তারপর?'

—'কিন্তু সেজন্যে আমি বিস্মিত হইনি। আমার বিশ্বাস, কোনও আহত ইঁদুর কি বিড়ালের গা থেকেই সেই রক্তবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমি জল ঢেলে দাগগুলো তুলে ফেলেছিলুম। ওই তিন ফোঁটা রক্তের কথা নিশ্চয়ই আপনার কাজে লাগবে না জয়ন্তবাবু!'

—'নিশ্চয়ই লাগবে। তিন ফোঁটা কেন, মাত্র এক ফোঁটা রক্তই আমার কাছে মহামূল্যবান! আলমারির ভিতরে রক্তাক্ত রুমাল, আলমারির বাইরে তিন ফোঁটা রক্ত! এই দুই রক্তচিহ্নের মধ্যে কি যোগাযোগ নেই? থাকা উচিত, থাকা উচিত!'

মানসী অস্বস্তি-ভরা কণ্ঠে বললে, 'আপনার সব কথাই হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে!'

—'হোক। তা নিয়ে আপনি একটুও মাথা ঘামাবেন না মানসীদেবী! আপনি কেবল মাথা ঘামিয়ে দেখুন, আর কোনও তুচ্ছ ঘটনার কথা আমাকে বলতে পারেন কি না!'

—'উঁহু, আর কিছুই ঘটেনি।'

—'ভাবুন, ভাবুন, ভাবুন!'

—'না জয়ন্তবাবু। ...হ্যাঁ, একটা ব্যাপার...না, না, সেটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার!'

—'তবু আমি শুনতে চাই।'

—'আমার একটা সায়া খুঁজে পাচ্ছি না।'

—'সায়াটা কোথায় রেখেছিলেন?'

—'ঘরের আলনায়।'

—'কবে রেখেছিলেন?'

—'হত্যাকাণ্ডের দিনে। বৈকালে।'

—'কবে খুঁজেছিলেন?'

—'হত্যাকাণ্ডের পরের দিনেই।'

—'সকালে না বিকালে?'

—'সকালে।'

—'তাহলে হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকাল থেকে রাত্রের মধ্যেই সায়াটা আপনার ঘর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে?'

—'আপনি দেখিয়ে দিলেন বলেই তাইতো এখন মনে হচ্ছে! বাড়িতে যে ভীষণ ঘটনা ঘটেছে, সায়াটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম।'

—'আর কোনও তুচ্ছ ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ছে?'

মিনিট তিন ভেবেচিন্তে মানসী নিশ্চিন্তভাবে বললে, 'না, আর কিছুই ঘটেনি।'

—'বেশ, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। নমস্কার।'

মানসী চলে গেলে পর জয়ন্ত চুপ করে বসে বসে কী ভাবলে। তারপর বললে, 'মানসীদেবীর ঘরে যে সব ছোটো ছোটো তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে, স্থানকালপাত্র হিসাবে সেগুলো কতখানি বিস্ময়কর, ভালো করে ভেবে দ্যাখো মানিক। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ে বা তার কিছু আগে কি কিছু পরে মানসীর ঘর থেকে হারিয়েছে একটা সায়া, ঘরের আলমারির তলায় পাওয়া গিয়েছে রক্তের দাগ আর হয়তো সেই সময়েই আলমারির ভিতরেও ঢুকেছে একখানা রক্তাক্ত রুমাল। আপাতত এগুলো অর্থহীন বলে বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু অর্থের সন্ধানও যেন এখনই পাওয়া যায়। মানসীর অজ্ঞাতসারেই খুব সম্ভব হত্যাকাণ্ডের রাত্রেই তার ঘরের ভিতরে একজন বাইরে লোকের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রশ্ন—কে সে? শত্রু না মিত্র না হত্যাকারী? যেই-ই হোক, সে চুরি করেছে অসামান্য কিছু নয়—সামান্য একটা সায়া মাত্র। প্রশ্ন—কেন? স্ত্রীলোকের একটা সায়া তার কোন কাজে লাগতে পারে? অথবা সায়াটা বিশেষ করে মানসীর বলেই তার কাছে কি মূল্যবান? সায়াটা গেল কোথায়? অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ কোনও কার্যসাধনের জন্যে সায়াটা কি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে? মানসীর ঘরের ওই রক্তের দাগ। প্রশ্ন—কার সে রক্ত? সৌদামিনীদেবীর না যে ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে তার নিজের? যারই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে সে একটা কিছু করছিল। প্রশ্ন—কী করছিল? রক্তাক্ত রুমালখানা স্থাপন করছিল আলমারির ভিতরে? কেন, কেন, কেন? নিজের রক্তাক্ত রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে রাখলে তার কী উপকার বা মানসীর কী অপকার হবার সম্ভাবনা? পাগলা-গারদের বাসিন্দার মন বোঝবার চেষ্টার মতো এই শেষ প্রশ্নটার অর্থ অনুধাবন করবার চেষ্টাও হবে সমান দুশ্চেষ্টা!' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে হঠাৎ আবার চিৎকার করে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল—'হয়েছে, হয়েছে!'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'খেপে গেলে নাকি? কী হয়েছে হে?'

—'আলমারির ভিতরে সে হস্তচালনা করেছিল মানসীর কোনও অনিষ্টসাধনের জন্যেই!'

—'রক্তাক্ত রুমালখানা ওখানে রাখার কারণ কি তাই?'

—'নিশ্চয়ই নয়! তার রক্তাক্ত রুমাল তো মানসীর বিরুদ্ধে না লেগে তার নিজের বিরুদ্ধেই কাজে লাগবে! রুমালখানা আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল তার অজ্ঞাতসারেই।

এ ছাড়া ও রুমালের কোনও মানেই হয় না!'

—'কিন্তু জয়ন্ত, আলমারির মধ্যে মানসীর পক্ষে অনিষ্টকারক কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?'

—'কেন যে পাওয়া যায়নি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝব, বুঝব, শীঘ্র তাও বুঝব! মানিক হে, জল বেশ ফুটে উঠেছে, ভাত সিদ্ধ হতে আর বিলম্ব হবে না!'

॥ সাত ॥

দ্বিজেনের সৌভাগ্য

আসন্ন সন্ধ্যা। বাগানে আলো-আঁধারির খেলা। বড়ো বড়ো গাছের বুকের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের বেলাশেষের কলরব। আজকে চাঁদের ছুটির দিন। একটু পরেই অমাবস্যা পাতবে অন্ধকারের আসর।

গোলটেবিলের ধারে বসে পবিত্রবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খেলছে দাবাবোড়ে। মানিক হচ্ছে নির্বাক দর্শক। উপর-চাল বলে দেবার উপায় নেই, কারণ তাহলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে জয়ন্ত।

একবার, দুইবার, তিনবার জয়ন্ত করলে কিস্তি-মাত। বললে, 'আমি একাসনে বসে চব্বিশ ঘণ্টা দাবা খেলতে পারি। কিন্তু আপনার কি আর খেলবার শখ আছে?'

—'আপত্তি নেই।' বললেন পবিত্রবাবু।

আবার ঘুঁটি সাজানো হল। পবিত্রবাবু প্রথম চাল চালতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দ্বিজেনের প্রবেশ।

জয়ন্ত স্মিত মুখে বললে, 'আসুন দ্বিজেনবাবু। বসুন। দাবার ছকের উপরে আমাদের দুজনের যুদ্ধ দর্শন করুন। ...কিন্তু না, আপনার মুখের ভাব তো ক্রীড়াকৌতুক দেখবার মতো নয়। হয়েছে কী?'

দ্বিজেন বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

—'গোপনে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

—'পবিত্রবাবু, তাহলে আজ আর যুদ্ধ নয়, আপাতত সন্ধি! আপনি না হয় মানিকের সঙ্গে বাগানে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা গল্প করে আসুন।'

মানিক ও পবিত্রবাবুর প্রস্থান।

—'তারপর দ্বিজেনবাবু? এইবারে আপনি নির্ভয়ে কথার ঝুলি ঝাড়তে পারেন।'

—'আজ দুটি খবর শুনবেন জয়ন্তবাবু। একটি শুভ, আর একটি অশুভ।'

বাগানের দিকের বারান্দার উপরে ছিল তিনটে জানালা, একটা দরজা। একটিমাত্র জানালা খোলা ছিল। সেই জানালাটার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর থেকে একটা পাউডারের কৌটো তুলে নিয়ে বললে, 'একটু সবুর করুন দ্বিজেনবাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।' সে দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

মিনিট দেড়েক পরে ঘরে এসে আসন গ্রহণ করে জয়ন্ত বললে, 'আগে শুভ খবরটা কী শুনি।'

—'আমিই আবার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি।'

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, 'কেমন করে?'

—'জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছেন।'

—'হীরেন্দ্রনারায়ণ রায়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'হঠাৎ?'

—'হ্যাঁ, হার্ট ফেল করে।'

—'কোথায়?'

—'এলাহাবাদে।'

—'কিন্তু আইনত সম্পত্তির অধিকারী তিনি। কোনও উইল করে আপনাকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন?'

—'না, তিনি সম্পত্তির অধিকারীই হননি।'

—'কী রকম?'

—'পিসিমার নতুন উইল হবার আগেই তিনি মারা পড়েছেন। কলকাতা থেকে কোনও কাজে তিনি পশ্চিমে যাচ্ছিলেন। ট্রেন যখন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছয় সেই সময়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।'

—'এ খবর আপনি কবে পেয়েছেন?'

—'সবে আজকেই।'

—'এত দেরিতে খবর পেলেন কেন?'

—'তাঁর দেহ শনাক্ত করতে দেরি হয়। পুলিশ অনেক সন্ধান নেবার পর জানতে পারে, তিনি আমাদের আত্মীয়।'

—'বুঝলুম। সুসংবাদ বটে কিন্তু তবু আপনার মুখে আনন্দের লক্ষণ নেই কেন? জ্যাঠামশাইকে আপনি কি খুব ভালোবাসতেন?'

—'ভালোবাসার পথ তিনি রাখেননি। আমার কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিতের মতো। আমি পিসিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে আমাকে তিনি দারুণ ঘৃণা করতেন। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। কেবল আমি নই, এ বাড়ির সকলেই ছিল তাঁর

চক্ষুশূল। তিনি সম্পত্তির মালিক হলে এখানকার সকলকেই বিদায় নিতে হত। তাঁর মৃত্যুতে আমি আঘাত পাইনি। অবশ্য মৃত্যু মাত্রই দুঃখজনক, কিন্তু আত্মীয় বিয়োগে লোকে যেমন ব্যথা পায়, তাঁর মৃত্যুতে তেমন কোনও ব্যথা আমি অনুভব করিনি।'

—'তবে আপনার মুখ অমন বিরস কেন?'

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট করে নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে করুণ স্বরে বললে, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আমি বোধ হয় সম্পত্তি ভোগ করবার কোনও সুযোগই পাব না।'

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, 'সে কী!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হতভাগ্য।'

—'এ আত্মলাঞ্ছনার অর্থ কী?'

—'বলছি। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, হত্যাকারীর কোনও সন্ধান আপনি পেয়েছেন কি?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'উঃ, বড্ড গুমোট মনে হচ্ছে! দাঁড়ান, জানালার পর্দাটা খুলে দিয়ে আসি, ঘরের ভিতরে বাইরের বাতাস চলা-ফেরা করুক।'

পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ, কী বলছেন দ্বিজেনবাবু! খুনির সন্ধান আমরা পেয়েছি কি না? হ্যাঁ, আমরা জানি যে খুনি এই বাড়িরই লোক।'

—'অসম্ভব, খুনিকে আপনারা জানেন না!'

—'হঠাৎ অতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন দ্বিজেনবাবু? খুনির আরও কোনও কোনও কীর্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

—'কী রকম কীর্তি?'

—'আমরা জানি যে এখানকার হত্যাকাণ্ডের পরের দিন সকালে মানসীদেবীর ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ পাওয়া যায়।'

দ্বিজেন বিকৃত স্বরে বললে 'হতেই পারে না, হতেই পারে না।'

—'মানসীদেবী নিজেই এ কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন।'

—'মানসী মিথ্যা কথা বলেছে।'

—'কেন তিনি মিথ্যা কথা বলবেন?'

—'তা আমি জানি না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলেছে। বেশ, আপনারা আর কী জানেন, বা জানেন বলে মনে করেন?'

—'খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাও আমাদের অজানা নেই।'

দ্বিজেন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন অস্ত্র?'

—'ছত্রপতির ছোরা।'

—'এই নিন ছত্রপতির ছোরা!' দ্বিজেন একখানা কোষবদ্ধ ছোরা টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

॥ আট ॥

হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি

জয়ন্ত টেবিলের উপর থেকে ছোরাখানা তুলে নিলে এবং ভাবহীন মৌনমুখে পরীক্ষা করতে লাগল।

খাপ রৌপ্যখচিত চামড়ায় তৈরি। ছোরার হাতল হাতির দাঁতের, তার উপরে মূল্যবান পাথর-বসানো সোনার কাজ। ফলা নীল ইস্পাতের, সাত ইঞ্চি লম্বা। ফলার উপরে শুকনো রক্তের দাগ।

ছোরাখানা আবার কোষবদ্ধ করে টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে জয়ন্ত বেশ সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'ছোরাখানা কোথায় পেলেন?'

—'ঠাকুরদাদার লাইব্রেরি থেকে।'

—'এতদিন এ খানা কোথায় ছিল?'

—'আমার কাছে।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। ওই ছোরা দিয়ে আমি পিসিমাকে খুন করেছি।'

পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে জয়ন্ত নীরবে দ্বিজেনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল মর্মভেদী দৃষ্টিতে—যেন সে তার মনের সমস্ত গুপ্তকাহিনি বাইরে আকর্ষণ করে আনতে চায়! তারপর নীরস হাস্য করে বললে, 'কেন এ পাপ করলেন?'

দ্বিজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'করব না? কেন করব না? পিসিমা কি আমার মুখ তাকিয়েছিলেন? তিনি আমাকে পথের ভিখারি করতে চেয়েছিলেন বিনা অপরাধে! কেবল আমাকে নয়, মানসীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে আবার কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। কেন আমি হাত-পা গুটিয়ে এ-সব অত্যাচার সহ্য করব? কোনও মানুষই তা পারে না। পিসিমা বৃদ্ধা, বিধবা, সন্তানহীনা। পৃথিবীর পক্ষে একেবারে ব্যর্থ জীব। তাঁকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিলে পৃথিবীর কোনও অপকারই হবে না। আমাদের জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্যে তাঁকে হত্যা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অবশ্য যদি তখন জানতুম যে তার আগেই নতুন উইল হয়ে গেছে, তাহলে বোধ হয় অকারণে হত্যা করে আমার হাত করতুম না কলঙ্কিত। কিন্তু তখন আমি তা জানতুম না—আমি তা জানতুম না!'

জয়ন্ত অবিচলিতভাবে বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আপনার কথাগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হত্যা করেছি বটে, কিন্তু যুক্তিহীন হত্যা করিনি।'

—'এখন কী করবেন?'

—'আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব।'

—'তার কী ফল হবে জানেন?'

—'জানি। ফাঁসি।'

—'ওই কি আপনার কামনা?'

—'দোষ স্বীকারের পর কোনও খুনি জীবনের আশা করে?'

—'আপনার মৃত্যুর পর মানসীদেবীর কী অবস্থা হবে সেটাও ভেবে দেখেছেন বোধ হয়?'

অন্তরের মধ্যে যেন চরম আঘাত পেয়ে দ্বিজেন শিউরে উঠল। ভগ্ন স্বরে বললে, 'সে কথা ভাবলেও আমি পাগল হয়ে যাব।'

—'মানসীদেবী এ কথা শুনলে কী বলবেন?'

—'আত্মহত্যা করবে।'

—'তবে?'

—'দোহাই জয়ন্তবাবু, এখন আর মানসীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। আমি তাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই!'

—'ভোলা কি এতই সহজ?'

—'না, সহজ নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায় কী?'

—'কোনও উপায়ই কি নেই?'

—'কোনও উপায় নেই, কোনও উপায় নেই!...না, না, এক উপায় আছে বটে। কিন্তু, কিন্তু তা অসম্ভব!'

—'কী অসম্ভব দ্বিজেনবাবু?'

—'আপনি কি আমাকে মুক্তি দিতে রাজি আছেন?'

—'অপরাধ স্বীকারের পরেও আপনি আমার কাছ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছেন!'

—'নিজের জন্যে করছি না, মানসীর জন্যে করছি। আমার মরাবাঁচার উপরেই তার মরা-বাঁচা নির্ভর করছে জয়ন্তবাবু!'

—'সব বুঝি। কিন্তু কী করে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি?'

—'আপনি সরকারি গোয়েন্দা নন। আমি অনুভব করতে পারছি, আমার উপরে আপনার সহানুভূতি আছে।'

—'কিন্তু কী করে আপনাকে মুক্তি দেব তাই বলুন।'

—'আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না, আমি খুনি।'

—'তা জানে না বটে। কিন্তু পুলিশকে ওই কথা জানানোই হচ্ছে আমার কর্তব্য।'

—'পুলিশের শক্তিতে আমার আস্থা নেই। আপনি যদি মামলার ভার ত্যাগ করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাব।'

—'কিন্তু অক্ষম বলে আমার দুর্নাম হবে।'

—'যেটুকু দুর্নাম হবে তার বিনিময়ে আপনি কিছু লাভ করতেও পারেন।'

—'কী লাভ?'

—'অর্থ।'

—'তার মানে?'

—'জয়ন্তবাবু, ভেবে দেখুন। দু-দিন পরেই আমি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হব। আপনি যদি এই মামলাটা ছেড়ে দেন, তাহলে কোন দিক দিয়ে লাভবান হবেন, বুঝতে পারছেন?'

—'আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চান।'

—'ঘুষ নয় জয়ন্তবাবু, আমার কৃতজ্ঞতার দান।'

—'উত্তম। কত টাকা আপনি দিতে পারেন?'

—'আপনিই বলুন।'

—'পাঁচ হাজার টাকা?'

—'আরও বাড়িয়ে বলুন।'

—'দশ হাজার টাকা?'

—'তাও উল্লেখযোগ্য হল না।'

—'পনেরো হাজার টাকা?'

—'আমি আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি—যদিও আমার জীবনের দাম আরও ঢের বেশি হওয়া উচিত।'

—'টাকাটা কবে দেবেন?'

—'তারিখ না দিয়ে আজকেই আমি চেক লিখে দিচ্ছি। সম্পত্তি হাতে এলেই আপনার টাকা পাবেন।'

—'তাই সই। লিখুন চেক।'

দ্বিজেন হেঁট হয়ে চেক লিখতে বসল। জয়ন্ত হাসলে মুখ টেপা হাসি।

—'আপনি আমাকে বাঁচালেন জয়ন্তবাবু। চেকখানা গ্রহণ করুন। এতক্ষণ চোখে অন্ধকার দেখছিলুম।'

—'এইবারে চোখে আলো দেখতে পেয়েছেন শুনে সুখী হলুম। অতঃপর প্রথমেই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।'

—'আজ্ঞা করুন।'

—'ছত্রপতির ছোরাখানা আবার যথাস্থানে রেখে আসুন।'

—'এখনই রেখে আসছি। নমস্কার।'

—'নমস্কার।'

॥ নয় ॥

ঘুষখোর জয়ন্ত

দ্বিজেনের প্রস্থানের পর জয়ন্ত মিনিট-পাঁচেক চুপ করে বসে রইল। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, 'মানিক!'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, 'আসছি।'

অনতিবিলম্বে মানিকের সঙ্গে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, 'এই যে সুন্দরবাবু। কতক্ষণ?'

'বেশ খানিকক্ষণ। মানিকের মুখে শুনলুম দ্বিজেনের সঙ্গে তোমার নাকি গোপন পরামর্শ চলছিল?'

—'ঠিক পরামর্শ নয় সুন্দরবাবু, খুনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে গেল।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'খুনি! কে খুনি?'

—'দ্বিজেন।'

—'দ্বিজেন খুনি!'

—'তাই তো সে বলে গেল।'

—'আর তাকে তুমি ছেড়ে দিলে?'

—'তা দিলুম বই কি!'

—'দিলুম বললেই হল? রোসো, দেখছি তাকে!' সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত।

—'আরে মশাই, শ্রবণ করুন, 'শনৈঃ পন্থাঃ শনৈ কন্থাঃ শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্!' ধীরে দাদা, ধীরে!'

—'না, না, ধীরে-টিরে নয়, আমার এখন বেগে ধাবমান হওয়া উচিত দ্বিজেনের দিকে।'

—'আমি কারুকেই দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে দেব না।'

—'দেবে না কী রকম?'

—'সে আমাকে কী দিয়েছে দেখুন।'

—'চেক?'

—'হ্যাঁ, পঁচিশ হাজার টাকার চেক।'

—'হুম, ঘুষ!'

—'ঠিক তাই।'

—'হুম, হুম, হুম! মানিক, তোমার বন্ধুর কী অধঃপতন হয়েছে দ্যাখো।'

মানিকের মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ অভিযোগের ভাব।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'যা মন্দার বাজার পড়েছে, লোভ সামলাতে পারলুম না ভাই!'

মানিক প্রায়-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত তোমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

সুন্দরবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'পোড়ার মুখে হাসতে লজ্জা করছে না তোমার?'

—'আগে আমার সব কথা শুনুন। তারপর বিচার করুন আমার হাসা উচিত কি না!'

—'যা বলবার বলো। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার সব কথা শোনবার পরও দ্বিজেনকে আমি গ্রেপ্তার না করে ছাড়ব না।'

মানিক বললে, 'আমারও ওই মত।'

জয়ন্ত বললে, 'ছিঃ বন্ধু, তুমিও শত্রু-শিবিরে?'

—'আমি ঘুষখোরের বন্ধু নই।'

জয়ন্ত সশব্দে ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'বেশ, তাহলে আমার কথাই শোনো।' সে দ্বিজেনের সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করে গেল। কখনও সবিস্ময়ে, কখনও ক্রুদ্ধ ভাবে, কখনও ঘৃণাভরে সুন্দরবাবু শ্রবণ করলেন তার কথা।

জয়ন্ত বললে, 'এই তো ব্যাপার। এখন আমার কী করা উচিত?'

মানিক বললে, 'গলায় দড়ি দাও।'

—'সুন্দরবাবুর মত কী?'

—'তোমার কী করা উচিত, আমি কী জানি? তবে আমার যা করা উচিত তাই করতে চললুম।'

—'কোথায় চললেন মশাই?'

—'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে।'

—'যাবেন না, যাবেন না!'

—'আলবত যাব, আলবত যাব!'

—'দ্বিজেনকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না!'

—'কেন, তুমি ঘুষ খেয়েছ বলে?'

—'না, অন্য কারণে।'

—'কারণটা কী শুনি।'

—'দ্বিজেন হত্যাকারী নয়!'

জয়ন্তের মুখের পানে চেয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন সুন্দরবাবু। মানিকেরও সেই ভাব।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে গম্ভীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, দ্বিজেন হচ্ছে নিরপরাধ। কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।'

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'তবে কি এতক্ষণ তুমি মশকরা করছিলে? দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেনি?'

—'দ্বিজেন অপরাধ স্বীকার করেছে।'

—'পাগলের মতো তুমি কী বলছ জয়ন্ত!'

—'মানসীদেবীর আলমারির ভিতরে যে রক্তমাখা রুমালখানা পাওয়া গেছে সেখানা তো এখন আপনার কাছেই আছে?'

—'আছে।'

—'সেখানা সাধারণ সাদা রুমাল। দ্বিজেন ওরকম রুমাল ব্যবহার করে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে রুমালখানা খুনিরই সম্পত্তি। দ্বিজেন খুনি হলে মানসীকে বিপদে ফেলবার জন্যে রুমালখানা কখনওই তার আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ মানসীকে সে ভালোবাসে, তাকে বিবাহ করবার জন্যে সে সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হতে বসেছিল। মানসীকে সে বিপদে ফেলতে পারেই না। আর ওই রুমালখানা তার নিজের হলেও ওখানা সে আলমারির ভিতরে রেখে আসত না, কারণ তাহলে তার নিজেরই বিপদের সম্ভাবনা। যেচে বিপদে পড়বে বলে কেন সে নিজের রুমাল মানসীর আলমারির ভিতরে স্থাপন করবে?'

মানিক বললে, 'তোমার তো বিশ্বাস রুমালখানা তার মালিকের অজ্ঞাতসারেই আলমারির ভিতরে পড়ে গিয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু রুমালের মালিক হত্যাকাণ্ডের পরে মানসীর আলমারির ভিতরে হাত চালাতে গিয়েছিল কেন, অনুমান করতে পারেন সুন্দরবাবু?'

—'উহুঁ! না, না, আলমারির ভিতর থেকে হয় সে কিছু নিতে, নয় ওখানে কিছু রাখতে গিয়েছিল।'

—'মানসীর আলমারিতে হত্যাকারীর পক্ষে দরকারি কী থাকতে পারে? মানসীর একটা সায়া সেইদিনই হারিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল আলমারির বাইরে আলনার উপরে। আমার মনে হয় হত্যাকারী কিছু রাখতেই গিয়েছিল।'

—'সেটা কী হতে পারে?'

—'হয়তো ছত্রপতির ছোরা।'

—'আরে, ছোরাখানা তো আছে দ্বিজেনের কাছে!'

—'তা থাকতে পারে।'

—'আর সে নিজের মুখেই তো তোমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেও গিয়েছে!'

—'তা করতে পারে।'

—'তবু বলবে সে অপরাধী নয়?'

—'তবু বলব সে অপরাধী নয়। তার মুখ-চোখ, ভাবভঙ্গি, কথার ধরন-ধারণ সব

প্রকাশ করে দিচ্ছিল, সে অপরাধী নয়। এত অভিজ্ঞতার পরও কি আমার মানুষ চেনবার শক্তি হয়নি? দ্বিজেন মিছে কথা বলছিল।'

—'এমন বিপজ্জনক মিছে কথা কেউ কখনও বলে জয়ন্ত? এ তো আত্মহত্যার শামিল!'

—'দ্বিজেন কেন যে এমন আশ্চর্য মিছে কথা বলে গেল, তার কারণও আমি আন্দাজ করতে পারছি।'

—'কারণটা কী বলো না!'

—'এখনও বলবার সময় হয়নি।'

—'দ্বিজেন যদি নিরপরাধ হয়, তাহলে এই খুনের জন্যে দায়ী কে হতে পারে? হীরেন্দ্রনারায়ণ? কিন্তু সে তো এখন আমাদের নাগালের বাইরে!'

—'খুনি সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা করতে পারছি। কিন্তু ধারণা এখনও প্রকাশ করবার মতো স্পষ্ট হয়নি।'

—'তুমি কি মনে করো, দ্বিজেন তার পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার জন্যেই এমন নির্বোধের মতো মিছে কথা বলছে?'

—'ওসব কথা এখন থাক। আপাতত এক কাজ করতে হবে আপনাকে। এই বাড়ির প্রত্যেক লোকের ডানহাতের আঙুলের ছাপ তুলে নিতে হবে—এমনকি ঝি-চাকর-দারোয়ান সকলেরই।'

—'আজই?'

—'আজই। তারপর সেগুলো নিয়ে কী করতে হবে, আপনাকে বলা বাহুল্য। কিছু বক্তব্য থাকলে ফোনে জানাবেন। কাল সন্ধ্যার আগে আবার এখানে আপনার দেখা পেতে চাই। খুব সম্ভব সেই সময়েই হত্যাকারীকে আপনার গ্রাসে সমর্পণ করতে পারব।'

—'বলো কী হে, তুমি এতটা নিশ্চিত?'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। এইবারে আমার সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করবেন?'

—'আচমকা এ আবার কী খেয়াল?'

—'চলুন না। ঘুঘু দেখাতে পারব না বটে, কিন্তু ফাঁদ দেখাতে পারব।'

—'তোমার সবই হেঁয়ালি। চলো।'

বাইরে গিয়ে সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করে বললেন, 'বাবা, বাইরে তো দেখছি খালি অমাবস্যার অন্ধকার!'

—'এই যে, আমি অন্ধকারে আলোকপাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।' একটা জানালার কাছে এগিয়ে জয়ন্ত টর্চ টিপে নীচে ফেললে আলো।

—'দেখুন সুন্দরবাবু।'

—'জানালার তলায় সাদা মতন কী ছড়ানো রয়েছে হে?'

—'পাউডারের গুঁড়ো। গুঁড়োর মাঝখানে কী দেখছেন?'

—'আরে পায়ের দাগ না?'

—'হ্যাঁ, হত্যাকারী কিংবা তার সহকারীর পদচিহ্ন।'

—'হুম!' বলে সুন্দরবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিস্ফারিত চক্ষে পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মানিক বললে, 'ছোটো খালি পায়ের দাগ। দেখে মনে হয় স্ত্রীলোকের পা।'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিচার করব ছাঁচ তোলবার পর।'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'ঠিক এইখানেই যে কারুর আবির্ভাব হবে, তুমি কেমন করে জানলে জয়ন্ত?'

—'কোনও মূর্তি আগেও এখানে আড়ি পাততে এসেছেন। আন্দাজে ধরেছিলুম, আজও তিনি দয়া করে আসবেন। অন্য জানালা দুটো বন্ধ করে ওইটেই খালি খোলা রেখেছিলুম, যাতে ওইখানেই তাঁর উদয় হয়। তবে বেশিক্ষণ তাঁকে দাঁড়াতে দিইনি, পর্দা সরাতেই তিনি চম্পট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, আর তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

॥ দশ ॥

অভিনয়ের আয়োজন

পরের দিন সকালবেলায় জয়ন্ত চা পানের পর বাড়ির ভিতরদিকের বারান্দায় পায়চারি করছে, এমন সময়ে দুইজন বেয়ারার সঙ্গে পবিত্রবাবুর আবির্ভাব।

জয়ন্ত শুধোলে, 'কী পবিত্রবাবু, বেয়ারা নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

—'আর কোথায়, লাইব্রেরিতে! আজ যে লাইব্রেরি সাফ করবার দিন।'

—'আপনি তো খুবই কর্তব্যপরায়ণ দেখছি। সৌদামিনীদেবী স্বর্গে, পৃথিবীতে বসে এখনও আপনি তাঁর আদেশ পালন করছেন!'

—'হপ্তায় একদিন করে লাইব্রেরি সাফ করাতে হবে, এই ছিল তাঁর আদেশ। এখনও তাঁরই অন্ন খাচ্ছি, তাঁর আদেশ পালন করব না। কিন্তু এ বাড়িতে আমার অন্ন এইবারে বোধহয় উঠল। সৌদামিনীদেবীকে খুন করে কোন পাষণ্ড আমারও সর্বনাশ করলে!'

—'কেন পবিত্রবাবু?'

—'নতুন মনিব আমার মতো বুড়ো ঘোড়াকে আর কি কাজে বহাল রাখতে চাইবেন? সৌদামিনীদেবীর মৃত্যু, আমাদেরও সর্বনাশ! সবই নিয়তির খেলা! আসি মশাই!' অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পবিত্রবাবু অগ্রসর হলেন লাইব্রেরির দিকে।

পবিত্রবাবুর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, নতুন মনিব বলতে উনি কাকে বুঝেছেন? হীরেন্দ্রনারায়ণ না দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ?

লাইব্রেরি ঘরের ভিতর থেকে পবিত্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল—'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু!'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'কী পবিত্রবাবু?'

—'শিগগির একবার এদিকে আসুন!'

শীঘ্র যাবার কোনও চেষ্টাই করলে না জয়ন্ত। ব্যাপারটা আন্দাজ করে মনে মনে হেসে সে ধীরে ধীরে লাইব্রেরির ভিতর গিয়ে হাজির হল। যা ভেবেছে তাই! শো-কেসের পাশে পবিত্রবাবু থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'কী হল মশাই? আপনি সৌদামিনীদেবীর প্রেতাত্মা দেখেছেন নাকি?'

—'তা দেখলেও আমি এতটা অভিভূত হতাম না। কিন্তু যা তাঁকে প্রেতাত্মায় পরিণত করেছে, চোখের সামনে আমি তাই-ই দেখছি।'

—'মানে?'

—'ছত্রপতির ছোরা। হত্যার দিন যা অদৃশ্য হয়েছিল, হত্যার পরে আবার তা যথাস্থানে ফিরে এসেছে!'

—'কী করে জানলেন যে ওই ছোরা দিয়েই সৌদামিনীদেবীকে খুন করা হয়েছে?'

—'সেদিন তো আপনারাই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন!'

—'তা বটে। কিন্তু সে কেবল সন্দেহ। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলিনি।'

—'কিন্তু ঠিক ঘটনার দিনে ছোরাখানা চুরিই বা গেল কেন, আর চোরে আবার তা ফিরিয়েই বা দিলে কেন?'

—'এটা ভাববার কথা বটে।'

—'তবে কি হত্যাকারী এখনও এই বাড়ির ভিতরেই বাস করছে?'

—'থাকতেও পারে।'

—'বাপরে, বলেন কী মশাই?'

—'ছোরাখানা শো-কেসের ভিতর থেকে বার করুন দেখি!'

পবিত্রবাবু শিউরে উঠে বললেন, 'আমি মরে গেলেও পারব না!'

—'কেন?'

—'যদি ওর উপরে এখনও সৌদামিনীদেবীর রক্ত লেগে থাকে? ও ছোরা স্পর্শ করলেও মহাপাপ!'

—'তাহলে ও ছোরা ছুঁয়ে কাজ নেই। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুন। আমি বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।'

পবিত্রবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর জামা-কাপড় পরে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আমি একবার অ্যাটর্নি হরিদাস চৌধুরির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

যথা সময়ে হরিদাসবাবুর কাছে গিয়ে জয়ন্ত আত্মপরিচয় দিলে।

সাদর সম্ভাষণ করে হরিদাসবাবু শুধোলেন, 'আমি আপনার কী করতে পারি?'

—'সৌদামিনীদেবীর নতুন উইলখানা একবার দেখতে চাই।'

—'অনায়াসে দেখতে পারেন। কিন্তু জানেন তো সেখানা ব্যর্থ উইল? হীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মারা পড়েছেন?'

—'জানি।'

উইল এল। তার উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে জয়ন্ত বললে, 'একজন সাক্ষী তো দেখছি আমাদের পবিত্রবাবু। দ্বিতীয় সাক্ষীটি কে?'

হরিদাসবাবু বললেন, 'আমার কেরানি।'

—'সৌদামিনীদেবীর প্রথম উইলখানা এখনও আছে তো?'

—'আছে বটে, কিন্তু এতদিন ওর অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়।'

—'কেন?'

—'উইলখানা তাঁকে আর একবার দেখিয়ে আমাকে নষ্ট করে ফেলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই সেখানা এখনও বর্তমান আছে।'

—'সে উইলখানাও একবার দেখতে পাই কি?'

—'সেখানা আপনার কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

—'তবু একবার দেখতে দোষ কী?'

—'তবে দেখুন।'

পুরাতন উইলখানা আনানো হল। জয়ন্ত সেখানা পাঠ করে ফিরিয়ে দিলে।

হরিদাসবাবু হেসে বললেন, 'দেখছেন তো, ওখানা আপনার পক্ষে একেবারে অকেজো কাগজ?'

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর শামুকদানী বার করে দুই টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'না হরিদাসবাবু, উইলখানা দেখবার সুযোগ পেয়ে বড়োই উপকৃত হলুম!'

—'উপকৃত হলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, অত্যন্ত!'

—'কোন দিক দিয়ে যে উপকৃত হলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'সেটা এখনও বলবার সময় হয়নি, ক্ষমা করবেন। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখুন, প্রথম উইলখানা দেখতে পেলুম বলেই আমার এখানে আসা সার্থক হল। আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখালেন। ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ! নমস্কার!'

বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত দেখলে মানিকের সঙ্গে দাবা খেলবার জন্যে ছকের উপরে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন পবিত্রবাবু।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'পবিত্রবাবু, নতুন উইলের সময়ে আপনি যে সাক্ষী ছিলেন, এ কথা তো জানতুম না!'

পবিত্রবাবু বললেন, 'ও কথা তো এ বাড়ির সবাই জানে। এ বাড়িতে আমি ছাড়া উইলের সাক্ষী হবে কে? আমি হচ্ছি সৌদামিনীদেবীর বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী।'

—'বুঝলুম। কিন্তু, দ্বিজেনবাবুকে আপনি একরকম কোলে-পিঠে করেই মানুষ করেছেন। তাঁকে কি আপনি ভালোবাসেন না?'

—'বলেন কী, ভালোবাসি না আবার? নিজের ছেলের মতো ভালোবাসি!'

—'তাহলে সৌদামিনীদেবী যখন দ্বিজেনবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হন, তখন আপনি তাঁকে বাধা দেননি কেন?'

—'যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম মশাই, যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম। আপনি সৌদামিনীদেবীকে তো জানেন না! তিনি ছিলেন তৈলপক্ক বাঁশের মতো—এতটুকু নোয়ানো অসম্ভব। আমাকে দ্বিজেনের পক্ষ গ্রহণ করতে দেখেই তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যে-সব কথা বললেন, আর তারপর যা করলেন, সে-সব কথা আর প্রকাশ না করাই ভালো।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কর্তব্যপালন করেছেন শুনে সুখী হলুম। যাক। এখন আপনি একটি কার্যভার গ্রহণ করবেন?'

—'কেন পারব না? আপনার অনুরোধ তো আদেশ!'

—'আজ সন্ধ্যার আগে কোনও একটা বড়ো ঘরে বাড়ির সবাইকে এনে জড়ো করতে পারবেন?'

—'পারব। কিন্তু কেন বলুন দেখি?'

—'একটা অভিনয় হবে।'

—'কারা অভিনয় করবে?'

—'আমরা সকলেই।'

॥ এগারো ॥

অপূর্ব অভিনয়

একখানা হল ঘর। একদিকে পাশাপাশি উপবিষ্ট জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু ও কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী। আর-একদিকে দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন, পবিত্রবাবু, মানসী, সুরবালা, উমাতারা, সিন্ধুবালা, বিন্দুবালা এবং বাড়ির কয়েকজন ভৃত্য ও দারোয়ান।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত, তুমিই পালা শুরু করো।'

জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে বললে, 'দ্বিজেনবাবু অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?'

দ্বিজেন অগ্রসর হয়ে জয়ন্তের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ, ভাবভঙ্গি সঙ্কুচিত।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে?'

দ্বিজেন হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—'সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছে কে? আপনি?'

দ্বিজেনের মুখ নীরব, মাথা নত।

জয়ন্ত কঠোর কণ্ঠে বললে, 'এখন কি ও-কথা আপনি অস্বীকার করতে চান? কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি নিজেই আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন!'

দ্বিজেন মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কিছুই বক্তব্য নেই।'

ও-পাশ থেকে পবিত্রবাবু বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! দ্বিজেন কিছুতেই হত্যাকারী হতে পারে না।'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্তব্ধ হোন পবিত্রবাবু। আপনারা কেউ আমাকে বাধা দেবেন না। দ্বিজেনবাবু যে হত্যাকারী নন আমি তা জানি।'

দ্বিজেন ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালে। জয়ন্তের আসল উদ্দেশ্য যে কী, আন্দাজ করতে পারছে না সে।

জয়ন্ত বললে, 'আমি জানি দ্বিজেনবাবু হত্যাকারী নন। আমি জানি হত্যাকারী কে। দ্বিজেনবাবু আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন। নয় কি দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি আবার মুখ নামিয়ে ফেললে।

—'আর-একজনকে বাঁচাবার জন্যেই দ্বিজেনবাবু মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেনের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—'তিনি কে দ্বিজেনবাবু?'

দ্বিজেন প্রাণপণে কোনওরকমে বলে উঠল, 'দয়া করুন জয়ন্তবাবু, দয়া করুন!'

অট্টহাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'দয়া! বাঘ মারতে গিয়ে শিকারি করবে দয়া! অপরাধী ধরতে এসে গোয়েন্দা করবে দয়া! ...যাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চেয়েছিলেন, তিনি কে? এখনও আপনি বলবেন না? তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি। দ্বিজেনবাবু বেশ জানেন, সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করেছেন শ্রীমতী মানসীদেবী।'

দ্বিজেন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল। সকলের বিস্মিত দৃষ্টি মানসীর উপরে গিয়ে পড়ল বিদ্যুতের মতো। কিন্তু মানসীর মুখে নেই কোনও ভাবের রেখা। মূর্তির মতো স্থির তার দেহ।

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবুকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আপাতত ওঁর কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রত্যেক কার্যের সঙ্গে থাকে কারণের সম্পর্ক আর দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে হয় চার। দ্বিজেনবাবুরই কাছ থেকে তাঁর মন ধার নিয়ে আর মামলার অন্যান্য সূত্রগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে আমি যা পরিকল্পনা করেছি, সকলে এখন তাই-ই শ্রবণ করুন। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কিছু কিছু গরমিল থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম।

'দ্বিজেনবাবু মাঝরাত্রে ঘরে শুয়ে আছেন, চোখে ঘুম আসছে না। এমন সময়ে বাইরে শব্দ পেয়ে সাড়া নিয়ে জানলেন, মানসীদেবীও তখন পর্যন্ত জেগে আছেন।

'সেই রাত্রেই নিহত হলেন সৌদামিনীদেবী। সকলেরই দৃঢ় ধারণা, হত্যাকারী বাড়ির বাইরের লোক নয়। সে-সময়ে সকলেই সহজে অন্য লোককে সন্দেহ করে। গতকল্যকার রাত্রের কথা ভেবে দ্বিজেনবাবুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অত রাত্রেও কেন জেগে ছিলেন মানসীদেবী!

'সন্দেহের আরও একটা বিশেষ কারণও আছে। প্রথমত সৌদামিনীদেবী প্রথম উইলে মানসীদেবীর জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। নতুন উইলে মানসীদেবীকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানসীদেবীর সঙ্গে তিনি দ্বিজেনবাবুর বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ নারাজ আর তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার দরুন দ্বিজেনবাবুকে পথের ভিখারি করেছেন। সুতরাং সৌদামিনীদেবীর উপরে মানসীদেবীর বিজাতীয় ক্রোধ আর দারুণ আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক।

'মানসীদেবী যখন অন্যান্য সকলের সঙ্গে সৌদামিনীদেবীর মৃতদেহ নিয়ে অভিভূত হয়ে আছেন, নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে দ্বিজেনবাবু তখন চুপি চুপি মানসীদেবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন আর জামাকাপড়ের ভিতর থেকে আবিষ্কার করলেন রক্তমাখা ছত্রপতির ছোরা! আমার ধারণা, সেইসঙ্গে তিনি আরও কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তা নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে।

'এই অভাবিত আবিষ্কার করে দ্বিজেনবাবু যে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু মানসীদেবীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটুও কমল না, বরং পুলিশের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন। কেমন দ্বিজেনবাবু, আমার অনুমান বোধ হয় নিতান্ত ভ্রান্ত নয়?'

দ্বিজেন নিরুত্তর, তার অবস্থা জীবন্মৃতের মতো।

জয়ন্ত বললে, 'সঞ্জীবিত হোন দ্বিজেনবাবু, আশ্বস্ত হোন! আমি জানি, আপনি মিথ্যা ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমি আপনাকে অভয় দিয়ে বলতে পারি, মানসীদেবী হত্যা করেননি সৌদামিনীদেবীকে!'

ঘরের ভিতর শোনা গেল বহু কণ্ঠের বিস্ময়গুঞ্জন। মানসীর মূর্তি তেমনি নির্বাক, তেমনি

নিস্পন্দ—সমান অটল আনন্দে-নিরানন্দে! দ্বিজেন ফেললে আশ্বস্তির নিশ্বাস।

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে পবিত্রবাবু কি একবার এদিকে আসতে পারবেন?'

পবিত্রবাবু উঠে এলেন। দুই ভুরু তাঁর সঙ্কুচিত।

—'পবিত্রবাবু, আজ অ্যাটর্নিবাড়িতে গিয়ে জানলুম যে, প্রথম উইলে সৌদামিনীদেবী আপনার জন্যে বরাদ্দ রেখেছিলেন বিশ হাজার টাকা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নতুন উইলে আপনার ভাগে ছিল না একটিমাত্র পয়সাও? আপনি উইলের একজন সাক্ষী, এটা নিশ্চয়ই আপনি দেখেছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নতুন উইলে আপনার টাকা মারা গেল কেন, এটা প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। তাই আজ সকালে অ্যাটর্নিবাড়ি থেকে ফিরে এসেই কৌশলে আপনার কাছ থেকে গুপ্তকথাটা আদায় করে নিই। —আপনাকে বঞ্চিত করার কারণ বোধহয় আপনি করেছিলেন দ্বিজেনবাবুর পক্ষ সমর্থন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনার পক্ষে দ্বিজেনবাবুর পক্ষ সমর্থন বলতে বোঝায় আত্মপক্ষ সমর্থনও?'

—'অর্থ বুঝলুম না।'

—'নতুন উইলে সম্পত্তির মালিক হতেন হীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি আপনাকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সম্পত্তির মালিক করার অর্থ-ই হচ্ছে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়ানো।'

—'ব্যাপারটা প্রায় সেইরকমই দাঁড়ায় বটে।'

—'তাহলে একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে আর চাকরি খুইয়ে সৌদামিনীদেবীকে নিশ্চয়ই আপনি ধন্যবাদ দেননি?'

—'বলা বাহুল্য।'

—'তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে করেছিলেন সৌদামিনীদেবীর বক্ষে ছুরিকাঘাত?'

—'আপনি কী আজগুবি কথা বলছেন!'

—'আপনি এক ঢিলে মারতে চেয়েছিলেন দুই পাখি। সৌদামিনীদেবীকে হত্যা করে নিজে নিরাপদে থাকবার জন্যে সমস্ত সন্দেহ চালনা করতে চেয়েছিলেন এমন এক নিষ্পাপ নির্দোষ মহিলার দিকে, যার উপরে আপনি তুষ্ট ছিলেন না।'

—'কার উপরে আমি তুষ্ট ছিলুম না?'

—'মানসীদেবীর উপরে। এ কথা আমি দ্বিজেনবাবুর মুখেই শুনেছি।'

—'একেবারে বাজে কথা।'

—'প্রথমত আপনি ছত্রপতির ছোরাখানা মানসীদেবীর আলমারিতে রাখেন। কিন্তু তারপরই বোধ করি আপনার মনে হয়, প্রমাণটা আরও দৃঢ় করা উচিত। মানসীদেবীর আলনা থেকে

আপনি তাঁর সায়াটা নামিয়ে নেন—সেটাও রক্তলিপ্ত করতে চান। সৌদামিনী দেবীর ঘরে গিয়ে মৃতদেহের ক্ষত থেকে রক্ত সংগ্রহ করা চলত কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে লাইব্রেরি থেকে মানসীদেবী এসে পড়তে পারতেন। আর-একটু দেরি করলেই সত্যসত্যই আপনি সেইদিনই হাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতেন, কারণ মানসীদেবী তখন নিজের ঘরের দিকেই আসছিলেন, আর আসতে আসতে দূর থেকে আপনার পলায়মান মূর্তি দেখেও চিনতে পারেননি। খুব চটপট কাজ সারবার জন্যে আপনি ছত্রপতির ছোরা দিয়েই নিজের বাঁ-হাতের এক জায়গা অল্প-একটু কেটে রক্তপাত করে সায়াটাকেও করেন রক্তাক্ত। তারপর ছোরা আর সায়া আলমারির ভিতরে গুঁজে রেখে পালিয়ে আসেন।'

পবিত্রবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি দিব্যি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'দ্বিজেনবাবু, আলমারির ভিতরে আপনি ছোরার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা রক্তমাখা সায়া পেয়েছিলেন?'

দ্বিজেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'পেয়েছিলুম।'

—'সেটা কোথায় গেল?'

—'পুড়িয়ে ফেলেছি।'

—'আরও শুনুন পবিত্রবাবু। আপনি যে রোজ ডাক্তার ডি. এন. বসুর ডিসপেন্সারিতে আপনার বাঁ-হাতের ক্ষত 'ব্যান্ডেজ' করতে যান পুলিশ এ খবরও পেয়েছে। ছোরাখানা প্রাচীন। তাতে যে মরচে ধরছে তাও আমি দেখেছি। তাই আপনার সামান্য ক্ষত বিষিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। আপনি জামার বাঁ-আস্তিন গুটোন দেখি, তাহলে সকলেই ব্যান্ডেজ দেখতে পারে।'

পবিত্রবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমার হাতের ব্যান্ডেজ কি আমাকে হত্যাকারী বলে প্রমাণিত করবে?'

—'আপনি আমার ঘরের জানলায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করতেন। কৌশলে আমি আপনার পদচিহ্ন সংগ্রহ করেছি। তার ছাঁচও উঠেছে। একটু মেলালেই আপনি ধরা পড়ে যাবেন।'

পবিত্রবাবু এইবারে অধীর স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'আড়ি পেতে শোনা মানেই কি নরহত্যা করা? প্রমাণ দেখান, প্রমাণ দেখান! যত রাবিশ কথা।'

—'পবিত্রবাবু, তাহলে এইবারে আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে হল। ছোরা দিয়ে বাঁ-হাত কাটবার পর রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আপনি নিজের রুমালখানা ক্ষতের উপরে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তবু তিন ফোঁটা রক্ত পড়েছিল ঘরের মেঝের উপরে। সেই রক্তাক্ত রুমালের উপরে ছিল আপনার ডানহাতের একটা আঙুলের ছাপ। কিন্তু আলমারির ভিতরে ছোরা আর সায়াটা রাখবার সময়ে রুমালখানাও যে ক্ষতস্থান থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল, মনের

উত্তেজনায় আর তাড়াতাড়িতে আপনি তা একেবারেই টের পাননি। কাল পুলিশ এসে আপনাদের সকলকার ডানহাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, রুমালের উপরে আপনারই আঙুলের ছাপ। আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

পবিত্রবাবুর মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং ফুলে উঠল তাঁর কপালের দুই দিকের দুটো শির। তারপরই বিকট একটা চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুইবাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে দুই হাত দিয়ে শূন্য আঁচড়াতে আঁচড়াতে দড়াম করে পড়ে গেলেন কক্ষতলে! মহা হই চই করে সকলে কাছে ছুটে এল। পবিত্রবাবুর দেহ দুই-তিন বার নড়ে-চড়ে একেবারেই স্থির হয়ে গেল। তিনি সংবরণ করলেন ইহলীলা!

জয়ন্ত বললে, 'আর এখানে নয় মানিক, সরে পড়ি চলো। আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত।'

জয়ন্ত ও মানিক নিজেদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছে এমন সময়ে সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'জয়ন্ত, একেবারে ডবল ট্রাজেডি! পবিত্রবাবুর কীর্তি শুনে আর মৃত্যু দেখে তাঁর স্ত্রী সুরবালারও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

জয়ন্ত দুঃখিতভাবে বললে, 'গোয়েন্দার কর্তব্য কী নিষ্ঠুর! আমাদের জন্যেই এই কাণ্ড! মারা গিয়েছিলেন কেবল সৌদামিনীদেবী। আমরা এসে মরাকে তো বাঁচাতে পারলুমই না, উলটে মারলুম আরও দুজন লোককে!'

মানসীকে সঙ্গে করে ঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে দ্বিজেন হাস্যমুখে বললে, 'না জয়ন্তবাবু, গোয়েন্দার কর্তব্যে মাধুর্যও আছে। আমরা তো মরতেই বসেছিলুম, আপনার জন্যেই আমরা আবার লাভ করলুম নবজীবন। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।' মানসীর সঙ্গে দ্বিজেন যুক্ত করে জানু পেতে জয়ন্তের সামনে উপবেশন করলে।

দুজনকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জয়ন্ত প্রসন্ন মুখে বললে, 'প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনাদের যুক্তজীবনকে আনন্দময় করে তোলেন।' তারপর পকেট থেকে দ্বিজেনের দেওয়া চেকখানি বার করে সে আবার বললে, 'এই নিন আপনার চেক!'

দুই হাত জোড় করে দ্বিজেন বললে, 'ক্ষমা করবেন। ও চেক আপনারই।'

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে বললে, 'তাই নাকি! সুন্দরবাবু, ওষ্ঠাধরে একটা নতুন চুরোট ধারণ করুন তো! আচ্ছা এইবারে আপনার দেশলাইটা আমাকে দিন। দ্বিজেনবাবু, আগেকার শখের বাবুরা নাকি দশ টাকার নোট পুড়িয়ে সিগারেট ধরাতেন। আমরাও বড়ো ছোটো মনুষ্য নই। এই দেখুন, আপনার চেকে অগ্নিসংযোগ করলুম, আর এই ভাবেই সুন্দরবাবুর শ্রীমুখ ধূম্র উদগীরণ করছে!'

মানিক বললে, 'অতুলনীয় দৃশ্য কাব্য! বিশ হাজার টাকার অগ্নি সংস্কার! এ দৃশ্য দেবতাদেরও লোভনীয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম'!

রত্নপুরের যাত্রী

॥ প্রথম ॥
আগন্তুক

দুজনে চুপচাপ বসে আছে সামনাসামনি—যেন দুই নিস্পন্দ কাঠের মূর্তি। জয়ন্ত আর মানিকের কথা বলছি।

সুমুখে টেবিলের উপরে পাতা দাবা-বোড়ের ছক আর ঘুঁটি।

জীবনে উত্তেজক ঘটনার অভাব হলে মাঝে মাঝে তারা দাবা-বোড়ের ঘুঁটিগুলো ধরে নাড়াচাড়া করে। বদ্ধ ঘরের ভিতরে বসে তারা পছন্দ করে কেবল এই খেলাকেই।

তাদের কাছে ঘটনার উত্তেজনার মধ্যে গিয়ে পড়ার অর্থই হচ্ছে মস্তিষ্ক-চালনার সুযোগ লাভ করা। যখন সে-সুযোগের অভাব হত তখন তারা অবলম্বন করত দাবা-বোড়েদেরই। কারণ তাদের মত হচ্ছে, খেলার মধ্যে একমাত্র দাবা-বোড়ে খেলাই দেয় মস্তিষ্ক-চালনার অবকাশ। এবং দাবা-বোড়ে খেলা হচ্ছে যোদ্ধার খেলা। আর্য ও স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন শক্তিসাধনার মন্ত্র জপ করত, তখন বীর-সমাজে দাবা-বোড়ের সমাদর ছিল অত্যন্ত। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমরখন্দের দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং এবং ইউরোপ জেতা নেপোলিয়নও ছিলেন দাবা-বোড়ের ভক্ত।

সেদিন মানিক যখন সুকৌশলে একটি বোড়ের চালে জয়ন্তের মন্ত্রীকে করে ফেলেছে একেবারে কোণঠাসা, তখন হঠাৎ বাড়ির সদর দরজার কড়া শব্দ করে উঠল অত্যন্ত জোরে।

মানিক বিরক্তমুখে বললে, 'এমন অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল?'

জয়ন্ত বললে, 'যেই-ই আসুক, কিন্তু সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েই এসেছে! শুনছ না, লোকটা দু-হাতে দুটো কড়া ধরেই একসঙ্গে নাড়ছে, আর এত জোরে নাড়ছে যে মনে হচ্ছে তার দরজা খুলে দেবারও তর সইছে না। ওই শোনো, কড়া নাড়া বন্ধ হল—মধু বোধহয় দরজা খুলে দিলে!'

কয়েক সেকেন্ড পরেই মধু কোনও খবর দেবার আগেই বৈঠকখানার ভিতরে বেগে প্রবেশ করলে একটি লোক। তার বয়স হবে বছর-তিরিশ, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, মাথায় সে না-লম্বা না-খাটো, বড়ো বড়ো চুল, মুখে গোঁফ ও 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে লোকটিকে অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু তার মুখ-চোখের ভাব অতিশয় বিপন্নের মতন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে খুব দ্রুত।

জয়ন্ত একবার তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'নমস্কার হরিহরবাবু, কী খবর?'

আগন্তুক সবিস্ময়ে এক-পা পিছিয়ে পড়ে বললে, 'কী আশ্চর্য, আপনি কি আমাকে চেনেন?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তবে আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

—মন্ত্রবলে নয়, অতি সহজে। হাতের উল্কিতেই তো আপনার নাম লেখা রয়েছে।'

হরিহর নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও, তাই বলুন!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু হরিহরবাবু, আপনার এতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে খানা-ডোবায় ঝাঁপ খেতে কি আছে? অনায়াসেই হাত কি পা ভাঙতে পারতেন। যাক, বিপদের ফাঁড়াটা আজ ঘড়ির কাচের উপর দিয়েই চলে গিয়েছে দেখছি!'

আবার সচকিত হয়ে উঠল হরিহরের চোখ। সে বললে, 'এটাই বা আপনি জানতে পারলেন কেমন করে? আজ মশাই আমার মাথার ঠিক নেই! আমি বিষম এক মুশকিলে পড়েছি। আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আসব বলে 'সর্ট কাট' করবার জন্যে আমি একটা অন্ধকার সরু গলির ভিতরে ঢুকেছিলুম। সেই গলির একদিকে ছিল খোলা নর্দমা। হঠাৎ আমার একখানা পা পড়ে যায় তারই মধ্যে। কোনওরকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই আপনি হাজির ছিলেন না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না। তবে এটা বর্ষাকাল নয়, রাস্তায় কাদা নেই, অথচ দেখছি আপনার বাঁ-পায়ের ওপরে পাঁক আর ভিজে কাদার দাগ। আপনার হাতঘড়ির কাচখানাও ভাঙা আর কাপড়েরও নীচের দিকটা খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছে। এইসব দেখেই কতক কতক আন্দাজ করতে পেরেছি। এখন যাক ওসব কথা, ওই চেয়ারখানায় বসতে আজ্ঞা হোক।'

হরিহর চেয়ারের উপরে বসে পড়ে সম্ভ্রম-ভরা কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনার উপরে শ্রদ্ধা আমার আরও বেড়ে উঠল। আপনার চোখ আর মন যে এত তাড়াতাড়ি দেখতে আর বুঝতে পারে, আগে এটা জানতুম না।'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'আপনার মতিগতি-প্রকৃতি নিয়ে এখনই আমি আরও কিছু কিছু কথা বলতে পারি, কিন্তু আপাতত ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করবার সময় আপনার নেই। বেশ বুঝছি, আপনি বড়ো অধীর হয়েই আমার কাছে ছুটে এসেছেন। কিন্তু ব্যাপার কী বলুন দেখি?'

হরিহর কাতরমুখে বললে, 'গুরুতর ব্যাপার জয়ন্তবাবু, গুরুতর ব্যাপার! আমার বাড়িতে এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে, যার কোনও অর্থই আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাহলে একেবারে গোড়া থেকেই সব কথা আমাকে খুলে বলুন। কিছু বাদ দেবেন না—খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত আমি জানতে চাই।'

॥ দ্বিতীয় ॥

হরিহরের কাহিনি

'আমার বাবার নাম স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মজুমদার। আমার পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমে ছিলেন ধনী জমিদার। যতদূর জানি, তাঁদের অনেকেরই প্রচুর সম্পত্তির সঙ্গে ছিল এক-একটি বিচিত্র খেয়াল।

ধরুন আমার প্রপিতামহের কথা। তিনি সন্ন্যাসীও ছিলেন না, আর যাকে বলে বিষয়-নিস্পৃহ যোগী সাধক তাও ছিলেন না। তবু তিনি নিজের সমস্ত অবসর-কালটা ব্যয় করতেন বড়ো বড়ো তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আর শবসাধনা প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে।

তারপর ধরুন আমার পিতামহের কথা। বিলাসিতার কোলে লালিত-পালিত হয়েও সারা জীবন ধরেই তিনি দেশ-বিদেশের বড়ো বড়ো পালোয়ানদের মাইনে করে রেখে নিজেও করে এসেছেন ব্যায়াম ও কুস্তি প্রভৃতির চর্চা। অথচ নিজে প্রকাশ্যে কুস্তি লড়ে কখনও বাহাদুর বলে নাম কেনবার চেষ্টা করেননি।

আমার বাবা শখের সন্ন্যাস বা শখের পালোয়ানির ধার মাড়াননি বটে, কিন্তু তাঁরও একটি অদ্ভুত খেয়াল ছিল। তিনি করতেন পুরাতত্ত্বের চর্চা। তাও এদেশি পুরাতত্ত্ব নয়, তাঁকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল প্রাচীন মিশরের অতীত রহস্য। এবং সেই রহস্য-সাগরের তল খোঁজবার জন্যে তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন তা ভাবলেও রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়।

বলেছি তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, বরং ছিল প্রাচুর্যই। আমার বয়স যখন সতেরো-আঠারো বৎসর, বাবা সেই-সময়ে তাঁর ধ্যানের দেশকে স্বচক্ষে ভালো করে দেখবার জন্যে একেবারে মিশরে গিয়েই হাজির হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী দেখেছিলেন আর কী করেছিলেন তা আমি বলতে পারব না, কারণ প্রাচীন মিশরের কোনও কথা জানবার আগ্রহ কোনওদিনই আমার হয়নি। তবে এইটুকু আমি জানি, বাবা মিশরে গিয়ে বাস করেছিলেন সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল। তারপর তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে তিনি ফিরে আসেন আবার কলকাতায়। আসবার সময় তিনি যেসব জিনিস সঙ্গে করে এনেছিলেন তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বিভীষণ সব দেব-দেবীর মূর্তি, সুরক্ষিত কিন্তু বীভৎস ও হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মানুষের মৃতদেহ—এমনি আরও অনেক-কিছু। অধিকাংশ জিনিস দেখলেই আমার মন হয়ে উঠত বিদ্রোহী, তাই বাবার মৃত্যুর পরে সেগুলোকে আমি একটা ঘরের ভিতরে পুরে গুদামজাত করে রেখেছি। সেগুলোকে ফেলে দিতে পারলেই আমি হতুম বেশি খুশি, কিন্তু বাবার নিতান্ত আদরের জিনিস বলেই নিজের খুশিমতো কাজ করতে পারিনি।

বাবার একটি পুস্তকাগারও ছিল এবং তার অধিকাংশ পুস্তকই হচ্ছে মিশর-সম্পর্কীয়। বইগুলি আমি আবর্জনার মতন সরিয়ে ফেলিনি, কারণ আমার নিজেরও বই পড়ার নেশা আছে, তাই সেগুলিকে আমার নিজেরই পুস্তকাগারের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে সে-সব বইয়ের পাতা ওলটাই, এইমাত্র! মিশরের ভূতুড়ে দেব-দেবী, শুকনো মড়া ও শিল্পকলা প্রভৃতি কোনওদিনই আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি।

ব্যাধি আক্রমণ করেছিল বাবার হৃদ্‌যন্ত্রকে। মিশর থেকে ফিরে শেষ পর্যন্ত তিনি একরকম শয্যার উপরেই বাস করে গিয়েছিলেন। যখন কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকতেন, তখনও মিশর-সম্পর্কীয় পুস্তকাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতেন না। এইভাবে প্রায়-পঙ্গু অবস্থায় দীর্ঘ চার বৎসরকাল কাটিয়ে বাবার অবস্থা হয়ে উঠল একেবারে শোচনীয়। ডাক্তাররা তাঁকে জবাব দিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন, যে-কোনও দিন যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হবে।

তাই হল। গভীর রাত্রে একদিন বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ স্ত্রী আমার ঘুম ভাঙিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, বাবার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তিনি বারবার আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করছেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম তখন তিনি কথা কইবার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। তবু সেই অবস্থায়, তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে বললেন, 'হরু, আমার বিছানায় এই যে মিশরের ইতিহাসখানি রয়েছে এখানি তুমি পরম যত্নে খুব সাবধানে রেখে দিয়ো। এর মধ্যে আছে কুবের-ভাণ্ডারের চাবি—দেখো, এ-বই কখনও যেন হাতছাড়া কোরো না।'

এই হচ্ছে বাবার শেষ কথা। এর মিনিট-খানেক পরেই তিনি অন্তিম-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তারপর দুই বৎসর কেটে গিয়েছে। আজ আমি ঠিক দরিদ্র না হলেও নিজেকে ধনী বলেও মনে করতে পারি না। কারণ, অর্থাভাবে মাঝে মাঝে বড়োই কষ্ট পাই। প্রপিতামহের, পিতামহের ও পিতার বহুব্যয়সাধ্য খেয়াল চরিতার্থ করতে করতে শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে আমাদের কুললক্ষ্মী আজ হয়তো বাড়ির বাইরেই পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন।

যখন বড়োই অর্থকষ্টে পড়ি, তখন বাবার শেষ কথাগুলি স্মরণ করে প্রাচীন মিশরের সেই ইতিহাসখানি নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তার মধ্যে আছে নাকি কুবের-ভাণ্ডারের চাবি! আমার চক্ষু তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি।

ইতিহাসের গ্রন্থখানি হচ্ছে প্রকাণ্ড—তার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় এক হাজার। আমি বারবার তার প্রত্যেক পাতাখানি উলটে-পালটে দেখেছি, এমনকি বইখানি পাঠও করেছি বারংবার। কিন্তু সে হচ্ছে একখানি অতি সাধারণ ইতিহাস। কুবেরের ভাণ্ডারের সঙ্গে তার কোনও-রকম সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করবার কোনওই উপায় নেই। কেবল তার স্থানে স্থানে মুদ্রিত মানচিত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় হাতে-টানা লাল কালির রেখা। সম্ভবত এ রেখাগুলি টেনেছিলেন আমার বাবাই। কিন্তু রেখাগুলির ভিতর থেকেও আমি কোনও অর্থের সন্ধান পাইনি।

শেষটা স্থির করলুম, মৃত্যুকালে বাবার রুগ্ন মস্তিষ্ক বোধহয় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এবং তিনি আমার কাছে যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, তা ব্যাধির প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবু মনে কেমন খটকা লেগে রইল। অবহেলা না করে বইখানিকে তুলে রাখলুম আমার আলমারির ভিতরে।

এতক্ষণ ধরে আমি খালি গোড়ার কথাই বললুম। কিন্তু এইবারে যা বলব তাই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য। জয়ন্তবাবু, এখন থেকে আমার প্রত্যেক কথাই আপনি মন দিয়ে শুনলে, আমি অত্যন্ত বাধিত হব।

পরশুদিন বৈকালে আমার পাঠাগারে বসে আছি, হঠাৎ বেয়ারা এসে খবর দিলে, একজন বিদেশি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তাকে ডেকে আনতে বললুম।

যে-লোকটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে তার দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার বয়স হয়তো পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু তাকে দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এখনও লোকটির দেহে আছে অসাধারণ পাশবিক শক্তি। তার পরনে খুব দামি ইংরেজি পোশাক,

রংও সাহেবদেরই মতন সাদা, কেবল তার মাথার লাল 'ফেজ'-টুপিটা দেখলেই বোঝা যায় সে ইউরোপীয় নয়, ভারতের বাইরেকার কোনও দেশের মুসলমান।

আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে আগন্তুক একটু হেসে ইংরেজিতে বললে, 'আপনি বোধহয় আমার মতন মূর্তিকে এখানে দেখবার আশা করেননি? কিন্তু আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

বললুম, 'হরিহর মজুমদার।'

—'আপনি কি মিস্টার হরেকৃষ্ণ মজুমদারের কেউ হন?'

—'আমি তাঁর একমাত্র পুত্র।'

—'আপনি মিস্টার মজুমদারের পুত্র? বড়োই আনন্দিত হলুম, বড়োই আনন্দিত হলুম! আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মিস্টার মজুমদার হচ্ছেন আমার অতি প্রিয়, পুরাতন বন্ধু। অনুগ্রহ করে একবার কি তাঁকে জানাবেন যে, ফুয়াদ পাসা এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে?'

আমি বললুম, 'আমার বাবা আর ইহলোকে বর্তমান নেই।'

—'বর্তমান নেই! বলেন কী?' ফুয়াদ হতাশভাবে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'আজ দুই বৎসর হল বুকের অসুখে আমার বাবা মারা পড়েছেন।'

ফুয়াদ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ইজিপ্ট থেকে আমি এসেছি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে। কলকাতায় আমার আসবার কথা ছিল না। তবু যে এখানে এসেছি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মিস্টার মজুমদারের বন্ধুত্বের আকর্ষণ। কিন্তু এখন দেখছি আমার কলকাতায় আসাটা একেবারেই ব্যর্থ হল।'

ফুয়াদ বাবার পুরাতন বন্ধু শুনে তার দিকে আমার মন যে আকৃষ্ট হল সেটা আর বলাই বাহুল্য। তার সঙ্গে বাবার কথা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলুম এবং তার মুখ থেকে শুনলুম বাবার মিশর-অভিযানের নানা কাহিনি। অতীত মিশর সম্বন্ধে বাবার গভীর জ্ঞানের কথা নিয়েও আমার কাছে সে অনেক প্রশংসা করলে।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার চোখ আমার একটা আলমারির উপরে গিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর সে আমার দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বললে, 'ও-বইখানা দেখছি মিশরের ইতিহাস। ও-রকম বই পড়বার আগ্রহ আপনারও আছে নাকি?'

আমি বললুম, 'আমার নিজের বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। ও-বইখানা হচ্ছে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের।'

ফুয়াদ বললে, 'বইখানা আমি একবার দেখতে পারি কি?'

—'নিশ্চয়ই!' আমি উঠে দাঁড়িয়ে আলমারি খুলে বইখানা বার করে ফুয়াদের দিকে এগিয়ে দিলুম।

ফুয়াদ প্রায় পনেরো মিনিট ধরে বইখানার পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর মুখ তুলে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আমি আপনার পিতার মতন পুরাতত্ত্ববিদ নই বটে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস পড়তে বড়োই ভালোবাসি। এ-বইখানি এখন দুর্লভ, বাজারে সহজে কিনতে মেলে না। যখন বলছেন মিশর সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই, তখন

কি এই বইখানি অনুগ্রহ করে আমাকে দান করবেন? অবশ্য, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তাহলে অতিরিক্ত মূল্য দিয়েও আমি এখানি কিনতে রাজি আছি।'

আমি বললুম, 'মৃত্যুশয্যায় বাবা ওখানি নিজের হাতে আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। ওর প্রতি আমার বিশেষ একটু মমতা আছে। কাজেই ও-বইখানি পৈতৃক সম্পত্তির মতনই আমি নিজের কাছে রক্ষা করতে চাই।'

ফুয়াদ তবু ছাড়লে না, বললে, 'ও-কেতাবের যে দাম, আমি তার চেয়ে দশগুণ বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত। বলেন তো তারও চেয়ে বেশি দিতে পারি। আপনি কি আমার কথা রাখবেন না?'

আমি বললুম, 'আমাকে আর অনুরোধ করে লজ্জা দেবেন না! ও-বইখানি আমার পিতার শেষ-দান, একশো গন্ডা বেশি দাম দিলেও ওখানি বিক্রয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আশা করি আমার মন বুঝে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ফুয়াদ কোনও জবাব দিলে না। গম্ভীরভাবে বসে বইখানি নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আবার বইখানি কিনতে চেয়ে আমি আর আপনার 'সেন্টিমেন্টে' আঘাত দেব না। আজ তাহলে আসি। বিদায়।' বলেই সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিশরের এই ইতিহাসখানির উপরে ফুয়াদ পাসার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে আমার কৌতূহল আবার জেগে উঠল। বারবার মনে পড়তে লাগল মৃত্যুশয্যায় পিতৃদেবের সেই উক্তি—এই বইখানি অতি সাবধানে রক্ষা কোরো, এর মধ্যে আছে কুবের-ভাণ্ডারের চাবি!

ফুয়াদ কি সেই দুর্লভ চাবির সন্ধানে সুদূর মিশর থেকে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে? সে কি পুস্তকের গুপ্তকথা কোনও গতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছে? নইলে এই পুস্তকের জন্যে সে যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি হল কেন? পুস্তকখানি কি সত্যই দুর্লভ? জানতে হল।

টেবিলের উপরেই ছিল আমার 'টেলিফোন', তৎক্ষণাৎ কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজ-প্রকাশককে 'ফোনে' ডাকলুম। তাকে এই ইতিহাসের ও তার গ্রন্থকারের নাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, বাজারে এই বইখানি কি কিনতে পাওয়া যায়?

উত্তরে জানলুম, তার ঘরেই এই ইতিহাসের দশখানি কপি বিক্রয়ের জন্যে মজুত আছে।

তাহলে বইখানি দুষ্প্রাপ্য নয়! হয় ফুয়াদ এ খবর রাখে না, নয় সে মিথ্যা কথা বলেছে।

বইখানি ভালো করে আবার পরীক্ষা করবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠলুম। সে-রাত্রে আহারাদির পর শয়ন না করে বইখানিকে নিয়ে আবার নিযুক্ত হয়ে রইলুম। কিন্তু প্রায় শেষ-রাত পর্যন্ত অনেক মাথা খাটিয়ে এবং অনেক চেষ্টা করেও নতুন কোনও তথ্যই আবিষ্কার করতে পারলুম না। শেষটা শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে বইখানাকে টেবিলের উপরে ফেলে রেখেই শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

কাল রাতেও আর-একবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কী যে এই পুস্তকের গুপ্তকথা তা রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই। উলটে আমার ধারণা হল, এ কেতাবের মধ্যে কোনও গুপ্ত-রহস্যই নেই, হয়তো ফুয়াদের দেশে বইখানি পাওয়া যায় না, তাই এখানিকে লাভ করবার জন্যে তার মনে এমন লোভের উদয় হয়েছে।

মিশরের ইতিহাস নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।.......কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল আচম্বিতে। আমার ঘুম অত্যন্ত সজাগ, বাড়ির কোথাও একটু শব্দ হলেই তখনই আমি জেগে উঠি।

বিছানার উপরে উঠে বসে ভাবতে লাগলুম, কেন আমার ঘুম ভাঙল? ব্যাপার কী? বাড়িতে চোর-টোর আসেনি তো?

শয্যা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। তারপর মুখ নামিয়ে তাকালুম নীচের দিকে।

আমার উঠানের একপ্রান্তে ছিল পাঠাগার। নীচের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলুম, দীর্ঘ একটা আলোকরেখা উঠানের উপরে এসে পড়েছে! বুঝতে দেরি লাগল না যে, নিশ্চয়ই কেউ আমার পাঠাগারে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছে, আর এই আলোকরেখাটা আসছে পাঠাগারের খোলা দরজার ভিতর দিয়েই!

ঢং ঢং ঢং করে বাজল রাত তিনটে। এত রাত্রে আমার পাঠাগারের ভিতরে ঢুকল কে? চোর? পাঠাগারে চোর?

ঘরের কোণ থেকে মোটা একগাছা লাঠি টেনে নিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলুম। কিন্তু একতলায় নেমে সবিস্ময়ে দেখলুম, উঠানের উপর থেকে আলোক-রেখা অদৃশ্য হয়েছে, পাঠাগার অন্ধকার! চোরেরা তাহলে আমার সাড়া পেয়েছে?

উঠানের আলোর 'সুইচ' ছিল অন্য দিকে। পাছে অন্ধকারে কেউ আমাকে আক্রমণ করে, সেই ভয়ে লাঠিগাছা বাগিয়ে ধরে আমি আলোর 'সুইচে'র দিকে এগিয়ে গেলুম পরম সাবধানে। উঠানের আলো জ্বাললুম। কোনওদিকে কেউ নেই। কিন্তু তারপর তাড়াতাড়ি পাঠাগারের কাছে এসে দেখি, ঘরের দরজা খোলা। তাহলে নিশ্চয় এখানে কেউ এসেছিল! পাঠাগারে ঢুকে আবার আলো জ্বাললুম। ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম, কিন্তু এখানে চোরের আবির্ভাবের কোনও লক্ষণই নজরে পড়ল না। যেখানকার যা জিনিস সমস্তই ঠিক আছে। বুঝলুম, আমার সাড়া পেয়ে চোর সরে পড়েছে, তাড়াতাড়িতে কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। তারপর পাঠাগারের দরজার কুলুপটা পরীক্ষা করে দেখলুম। কুলুপ ভাঙা! তাহলে এই কুলুপ ভাঙার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে!

কিন্তু চোর কোন দিক দিয়ে এসেছে, আর কোন দিক দিয়েই বা পালিয়েছে? সদরের কাছে এসে দেখি, দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ করা রয়েছে!

চারিদিকে আরও খানিক মিথ্যা খোঁজাখুঁজি করে শেষটা হতভম্বের মতো আবার উপরে এসে উঠলুম। শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু হয়ে উঠল সচকিত! ওই টেবিলের উপর ছিল মিশরের সেই ইতিহাস। কিন্তু বইখানা এখন আর টেবিলের উপরে নেই!

বুকটা ধড়াস করে উঠল। প্রথমে ভাবলুম হয়তো তন্দ্রার ঘোরে ভুলে বইখানা আমি অন্য কোথাও রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। পাগলের মতন ঘরের এখানে-ওখানে-সেখানে এমন-কী যেসব জায়গায় আমার পক্ষে বইখানা রেখে দেওয়া অসম্ভব সেসব স্থানেও খুঁজতে বাকি রাখলুম না, কিন্তু কোথাও নেই মিশরের সেই ইতিহাস!

তবে কি আমি যখন উঠানের আলো জ্বালবার জন্যে অন্য দিকে গিয়েছিলুম, তখন সেই ফাঁকে অন্ধকারে চোর এসে উঠেছে বাড়ির উপরে? কিন্তু উপর থেকে আবার নীচে নামল কোন পথে? সে বাড়ির ছাদে উঠে লুকিয়ে নেই তো?

'টর্চ' ও লাঠি হাতে করে বেগে ছাদের উপরে গিয়ে উঠলুম। কিন্তু সেখানেও কেউ কোথাও নেই।

তারপর এদিকে-ওদিকে আলো ফেলে হঠাৎ একদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম, ছাদের উপর থেকে বাইরে নেমে গিয়েছে দীর্ঘ এক দড়ির সিঁড়ি!

চোর তাহলে এই পথ দিয়েই অদৃশ্য হয়েছে?

কিন্তু এ কী আশ্চর্য কাণ্ড! গৃহস্থের সঙ্গে চোরেদের সম্পর্ক চিরদিনই ঘনিষ্ঠ। এমন বাড়ি বোধহয় নেই যেখানে হয়নি চোরের আবির্ভাব। চোর আসে চুরি করতে আর সে চুরি করে এমন সব দ্রব্য যার বাজারদর আছে। আর আমার বাড়িতে এই চোর এসেছে কী চুরি করতে? একখানা সাধারণ কেতাব। এবং সে কেতাবও হচ্ছে যে-শ্রেণির, কোনও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া আর কেউ যা উলটে দেখতেও চাইবে না।

আবার বাবার সাবধান-বাণী স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম, এ কোনও সাধারণ চোরের কাজ নয়, এ-চোর আমার বাড়িতে এসেছে কেবলমাত্র ওই কেতাবখানিই হস্তগত করবার জন্যে। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল ফুয়াদ পাসার কথা। এ বইখানি সে যে-কোনও মূল্যে ক্রয় করতে প্রস্তুত ছিল, এখানি পাবার জন্যে তার লোভ ছিল অত্যধিক। তবে কি ফুয়াদই নিজে এসে কিংবা কোনও লোক লাগিয়ে বইখানিকে আমার বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলেছে? হায় হায়, তবে কি আমি হাতে পেয়েও হারিয়ে ফেললুম এই অজানা কুবের-ভাণ্ডারের চাবি?

ব্যাপারটা যতই তলিয়ে ভাবতে লাগলুম, আমার মনে এই বিশ্বাস ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল যে, ফুয়াদ ছাড়া আর কেহই এই চুরির জন্যে দায়ী নয়। আমি যে-গুপ্তকথা এত চেষ্টাতেও আবিষ্কার করতে পারিনি, ফুয়াদ হয়তো তার রহস্য সম্পূর্ণরূপেই জানে! কিন্তু সেই রহস্যের চাবি ছিল আমার কাছে, যার অভাবে এতদিন সে কিছুই করতে পারেনি। আমার জিম্মা থেকে চাবিটি গিয়েছে আজ তারই জিম্মায়!

এইসব ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। তবু আমার চিন্তাসাগরে কোনওই কূল-কিনারা পেলুম না।

জয়ন্তবাবু, তারপর আপনার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। বহু লোকের মুখেই অনেকদিন থেকে শুনে আসছি, অপরাধের ক্ষেত্রে আপনার শক্তি নাকি ঐন্দ্রজালিকের মতন। তাই পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে আপনার কাছেই এসে পড়েছি। এখন আমার ভার আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে—আপনি 'না' বললেও আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলে হরিহর।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'হরিহরবাবু, আপনার কাহিনি শুনলুম। ঘটনাটা রহস্যময় বটে—আর রহস্য আমি ভালোবাসি। কিন্তু এ চুরির মধ্যে কোনও রহস্যই নেই, যা-কিছু রহস্য আছে সেই প্রাচীন মিশরের ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে। এ চোরকে

বোধহয় আমি খুব শীঘ্রই ধরে দিতে পারব। কিন্তু সেইখানেই আপনি যদি এই নাটকের উপর যবনিকাপাত করতে চান, তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নই।'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন? আপনি যা বলেন আমি তাই করতে রাজি।'

—'আপনি মিশরে যেতে রাজি আছেন?'

—মিশরে!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিশরে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওই ইতিহাস-গ্রন্থের ভিতরে রহস্যের চাবিকাটি থাকলেও, আসল কুবের-ভাণ্ডার আছে মিশরের যে-কোনও স্থানে। আমি যদি বইখানি উদ্ধার করতে পারি, তবে চাবিটিকে খুঁজে বার করতে পারব বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেবল সেই চাবি নিয়েই আমি খুশি হতে পারব না, কোন দেশের কোন ভাণ্ডারের কোন কুলুপে লাগে সেই চাবিকাটি, সেটা না দেখে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। হয়তো আমাদের আজকেই যেতে হবে মিশরের দিকে। পারবেন আপনি আমাদের সঙ্গে যাত্রা করতে?'

হরিহর কিছুক্ষণ নীরব হয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'যদি কুবের-ভাণ্ডারের সন্ধান পাই, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি সাহারা মরুভূমিতেও যেতে রাজি আছি।'

—'আজকেই?'

—'আজকেই।'

জয়ন্ত কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'হয়েছে, হয়েছে! হরিহরবাবু, আপনি মানিকের সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করুন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বেন না। মানিক, 'ড্রয়ার' থেকে আমার মণিব্যাগটা বার করে দাও। তারপর মধুকে বলে এসো, সে যেন ড্রাইভারেকে আমার গাড়িখানা এখনই বার করতে বলে ততক্ষণে আমি জামা-কাপড়গুলো পরে নিই। আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।'

॥ তৃতীয় ॥
যাত্রা

ঘণ্টা দুই পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল—নিজের রুপোর নস্যদানি থেকে ঘন ঘন নস্য নিতে নিতে।

মানিক বুঝলে, শুভলক্ষণ। সে জানে, খুব খুশি না হলে জয়ন্ত নস্য নেয় না।

সে হাসিমুখে বললে, 'শিকারি, তোমার শিকার ধরতে পেরেছ নাকি?'

জয়ন্ত একখানা ইজিচেয়ারে বসে হেলে পড়ে সামনের দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে বললে, 'শিকার ধরিনি বন্ধু তবে শিকারের গন্ধ পেয়েছি বটে।'

মানিক বললে, 'একটু ব্যাখ্যা করে বললে বুঝতে পারি।'

জয়ন্ত দুই চোখ মুদে ফেলে বললে, 'হরিহরবাবু, আমি যা ভেবেছি তাই। এ বইখানি

এতদিন আপনার কাছেই পড়েছিল এর জন্যে কারুর কোনও মাথাব্যথাই হয়নি। কিন্তু আপনার বাড়িতে যেই মিশরবাসী ফুয়াদ পাসার আবির্ভাব, অমনি প্রাচীন মিশরের ইতিহাস গেল উড়ে। সুতরাং এ-চুরি যে ফুয়াদ কিংবা তার নিযুক্ত কোনও চরের কীর্তি সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাস্তি। চোর সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত হলুম, তখন আমি চোরের মনোভাবটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলুম। সে সুদূর মিশর থেকে নদী-সাগর পেরিয়ে বাংলার রাজধানী পর্যন্ত ছুটে এসেছে কেবলমাত্র এই বইখানির লোভে। সুতরাং ইষ্টসিদ্ধি করেই সে যে আবার স্বদেশের দিকে ধাবমান হবে, এটা খুব সহজ আর স্বাভাবিক কথা। আর সে যে আজকে প্রথম সুযোগেই কলকাতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে, এ বিষয়েও যুক্তির অভাব নেই। ফুয়াদ যে নির্বোধ নয় এটুকু আমাদের অনুমান করে নেওয়া উচিত। সে জানে যে চুরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি পুলিশে খবর দেবেন। সে হচ্ছে বিদেশি লোক, তার পক্ষে এই অজানা শহরে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি তার মতন বিদেশিকে খুব সহজেই আবিষ্কার করে ফেলবে। এমন ক্ষেত্রে লুপ্তরত্নোদ্ধার করে প্রথম সুযোগেই এই বিপজ্জনক নগরকে ত্যাগ করে সে আবার লম্বা দিতে চাইবে। এইটুকু হিসাব করেই এখনই আমি কোথায় গিয়েছিলুম জানেন? হাওড়া স্টেশনে! অন্য লোকের পালাবার জন্যে এখানে অন্যান্য পথ খোলা আছে বটে, কিন্তু ফুয়াদ হচ্ছে মিশরের বাসিন্দা। প্রথমেই সে পালাবার চেষ্টা করবে বোম্বাইয়ের দিকে, তারপর সেখানে থেকে উঠবে গিয়ে স্বদেশগামী জাহাজে। তাই আমি হাওড়া স্টেশনে যথাস্থানে গিয়ে খোঁজ নিলুম যে, বোম্বাইয়ের ট্রেনে ফুয়াদ পাসা নামে কোনও যাত্রী নিজের জন্যে 'বার্থ রিজার্ভ' করেছে কি না? আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি হরিহরবাবু, অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল আজই সন্ধ্যায় ফুয়াদ পাসা নামে জনৈক ব্যক্তি বোম্বে মেলের দ্বিতীয় শ্রেণির এক কামরায় উঠে বোম্বাইয়ের দিকে যাত্রা করবে।'

মানিক বললে, 'তুমি সফল হয়েছ শুনে সুখী হলুম, কিন্তু ফুয়াদ যদি কোনও 'বার্থ রিজার্ভ' না করতে?'

—'তাহলে হরিহরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার সময় আমরা যেতুম হাওড়া স্টেশনে। দেখতুম, ফুয়াদ বোম্বে মেলে আরোহণ করে কি না?'

—'এখন তুমি কী করতে চাও জয়ন্ত?'

—'আজ সন্ধ্যায় বোম্বাই যাত্রা করতে চাই। অন্য কামরায় আমিও তিনটে 'বার্থ রিজার্ভ' করে রেখেছি।'

—'তারপর?'

—'তারপর ফুয়াদের সঙ্গে আমরাও চাপব মিশরগামী জাহাজে।'

—'এইটুকু সময়ের মধ্যে আমরা প্রস্তুত হতে পারব?'

—'এইটুকু সময়? পলাশির ক্ষেত্রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জয় করতে ক্লাইভের কতটুকু সময় লেগেছিল? কতটুকু সময় লেগেছিল ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের জীবনব্যাপী স্বপ্ন ছুটে যেতে? যথেষ্ট সময় আছে মানিক, আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। জড়তা ত্যাগ করো, উঠে দাঁড়াও, প্রস্তুত হও। হরিহরবাবু, আপনিও বাড়ির দিকে দ্রুত পদচালনা করুন চটপট তৈরি হয়ে নিন!'

হরিহর দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু—'

—'আবার কিন্তু কীসের?'

—'আপনি বলছেন, আমরাও ফুয়াদের সহযাত্রী হব?'

—'হ্যাঁ।'

—কিন্তু ফুয়াদ আমাকে চেনে। আমাকে দেখলেই তার সন্দেহ হবে। আত্মরক্ষার জন্যে সে যদি চোরাইমাল নষ্ট করে ফেলে, তাহলে কী হবে জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললে, 'আপনার বুদ্ধি আছে দেখে সুখী হলুম। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমারও বুদ্ধির ভাঁড়ে মা ভবানী বর্তমান নেই? ওকথা আমিও ভেবে দেখেছি, আর আর একটা উপায়ও স্থির করেছি।'

—'কী উপায়?'

—'আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করবেন।'

—'ছদ্মবেশ!'

—'হুঁ। ফুয়াদ আপনাকে মাত্র এক দিন কিছুক্ষণের জন্যে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এটা তো জানেন, এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের মুখ একবারমাত্র দেখে ভালো করে মনে রাখতে পারে না? তার ওপরে আপনি পরবেন সাহেবি পোশাক আপনার চোখে থাকবে রঙিন চশমা, কামিয়ে ফেলবেন আপনার ওই গোঁফ আর 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি! তারপর ফুয়াদের সাধ্য কী যে আপনাকে আবার চিনতে পারবে! বুঝেছ মানিক, আমরাও আর বাঙালি থাকব না! আমি হব সীমান্তের পাঠান, আর তুমি হবে বোম্বাইবাসী কোনও ভদ্রলোক। হরিহরবাবু কী বলেন? এ বন্দোবস্ত কি মন্দ?'

হরিহর তবু যেন মনের ভিতর থেকে জোর পেলে না। হাসতে হাসতে বললে, 'বন্দোবস্ত মন্দ নয়, অনেকটা শোনাচ্ছে ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন। কিন্তু এইটেই আমার মাথায় আসছে না যে ফুয়াদের পিছনে পিছনে ছুটে আমরা কী করব? ট্রেনে কি জাহাজে উঠে, কিংবা মিশরে নেমে আমরা কি জোর করে তার কাছ থেকে বইখানা আবার কেড়ে নেব?'

জয়ন্ত বললে, 'আহা-হা-হা হরিহরবাবু, পালা শুরুর আগেই অতটা ভাবিত হচ্ছেন কেন? আপনি যখন আমাকে অবলম্বন করেছেন, তখন মস্তিষ্ক-চালনার ভারটা আমার উপরেই অর্পণ করুন না! মানিককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারি বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে। আমি বুনোহাঁসের পিছনে ধাবিত হব না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

হরিহর বললে, 'কী করে নিশ্চিন্ত হই জয়ন্তবাবু? আপনাদের চিন্তা নেই, কারণ আপনারা এইসব কাজেরই কাজি। কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে উঠছি নিজের কথা ভেবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে যদি কোনও গুরুতর বিপদে পড়ি?'

—'আমরা আপনাকে উদ্ধার করব। মাভৈঃ হরিহরবাবু, সাহসের অভাব হলেই বিপদের ভয় বাড়ে। আর বিপদ এলেই বেড়ে ওঠে আমার শক্তি আর আমার বুদ্ধি।'

হরিহর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ। কপালে যা আছে তাই হবে। দেখছি আপনাদের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।'

॥ চতুর্থ ॥

সামুদ্রিক নাট্যাভিনয়

নীলাকাশে উঠছে নীল সাগরের নীল সংগীত।

হ্যাঁ, এ সংগীতের রং নীল ছাড়া আর-কিছু হতে পারে না। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র—এই দুই অনন্ত বিস্ময় যে অসীম নীলজগতের চিত্রপট চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই যেন অপূর্ব এক নীলিমা দিয়ে গড়া। নীল, নীল, নীল! নীলিমার কী বিপুল উচ্ছ্বাস!

কোথায় পৃথিবীর গৈরিক মাটি, কোথায় অরণ্যের শ্যামল ছন্দ, কোথায় নগরের ধূলিধূসর! এই অসীম বিরাটের কোলে আশ্রয় নিয়ে এরই মধ্যে মনে হচ্ছে সেসব যেন জন্মান্তরের স্বপ্ন!

সমুদ্রের সংগীতে পাই আমাদের জীবনের সংগীত! মানুষের জীবন গড়া স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, দয়া, মায়া, ভক্তি দিয়ে। এদের প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে এক-একটি মৌন সংগীতের সুর। আর সেই সংগীতময় বিচিত্র জীবনেরই ছন্দ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মহাসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে। সমুদ্রের কাছে এলে মানুষের প্রাণ তাই বুঝি এমন অভিভূত হয়ে পড়ে।

সমুদ্রের চঞ্চল নীলপটে সাদা ফেনার আলপনা দিতে দিতে ছুটে চলেছে একখানি বেগবান জাহাজ। তার গর্ভবাসী মনুষ্য-কীটরা তাকে মনে করছে সুবিশাল এক অট্টালিকার মতন—ভেকরা যেমন কূপকে মনে করে বৃহৎ এক বিশ্ব! কিন্তু বাহির থেকে মহাসাগরের বিশাল গর্ভে দোলায়মান এই জাহাজখানিকে দেখাচ্ছে কতই তুচ্ছ, কতই ক্ষুদ্র! মানুষ ভিতর থেকে নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারে না, তার ক্ষুদ্রতা আবিষ্কার করে বাহিরের দৃষ্টি।

জাহাজ ছুটে চলেছে নীলনদধৌত মিশরভূমির দিকে এবং তার ভিতরে যে বিচিত্র নাটকের গুপ্ত অভিনয় চলছে, এইবারে আমরা তাই-ই দেখবার চেষ্টা করব।

এই জাহাজের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে ফুয়াদ পাসা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর। বলা বাহুল্য, ফুয়াদ ছাড়া বাকি তিনজনই ছদ্মবেশের সাহায্য গ্রহণ করেছে।

জয়ন্ত এখন সীমান্তের পাঠান এবং তার বৃহৎ দেহ পাঠানি-পোশাকে দেখতে হয়েছে রীতিমতো জমকালো। সে বুক ফুলিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে সিধে হয়ে হাঁটে এবং তার দুই চক্ষে প্রকাশ পায় এমন তীব্র গর্বিত ও বন্য ভাব যে, তাকে দেখলে লোকে পথ ছেড়ে দেয় সসম্ভ্রমে। সে যেন একাই একশো। কারুর সঙ্গে মেশে না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না—তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে না জাহাজের অন্যান্য আরোহীরাও।

মানিক সেজেছে বোম্বাইয়ের এক সওদাগর এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদও ভূমিকারই অনুরূপ। জাহাজের সবাই জানে, কোটিপতি হলেও সে খুবই মিশুক, সকলেরই সঙ্গে যেচে আলাপ করতে চায়। তার মুখ সর্বদাই হাসিখুশি মাখা এবং হাতও খুব দরাজ। এরই মধ্যে সে জাহাজের অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলেছে এবং প্রতি সন্ধ্যাতেই দু-চার জন লোককে নিমন্ত্রণ করে রীতিমতো পেট ভরিয়ে না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না।

হরিহর বেচারি সাদাসিধে মানুষ, অভিনয় করতে তার বিলক্ষণ বাধে। তবু জয়ন্ত পাখি-পড়ানোর মতন করে বারংবার তাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, সে কোনওরকমে তা পালন করে যায়, এইমাত্র। সে অত্যন্ত লাজুক বলে জয়ন্ত তাকে যাত্রীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে মানা করেছে, তবু কারুর কারুর সঙ্গে মৌখিক আলাপ হয়েছে এবং কেউ কেউ জিজ্ঞাসাও করেছে, তার সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য কী? সে সংক্ষেপে বলে, উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নেই, নতুন নতুন দেশ দেখা ছাড়া। তাকে বিশেষ কোনও ছদ্মবেশও গ্রহণ করতে হয়নি। কিন্তু ইংরেজি পোশাক পরে, চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে ও দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে তার চেহারা হয়েছে একেবারে অন্য-কোনও লোকের মতন।

পাছে ফুয়াদের মনে কোনও সন্দেহ জাগে, সেই ভয়ে জয়ন্ত আর-এক সাবধানতা অবলম্বন করেছে। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা জানে তারা কেউ কারুকে চেনে না। এবং তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা 'কেবিনে' বাসা বেঁধেছে।

অনেক চেষ্টা করে জয়ন্ত যে-কেবিনটি পেয়েছে, সেটি ছিল ঠিক ফুয়াদের কেবিনের গায়েই। দুজনের কেবিনের মাঝখানে কেবল একটি কাঠের পাতলা দেওয়াল। ফুয়াদ তার সঙ্গে দু-এক বার আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জয়ন্ত তাকে আমল দেয়নি। তার আকৃতি-প্রকৃতির কঠোরতা দেখে ফুয়াদও এখন আর তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে না।

কিন্তু প্রায়ই তিন ছদ্মবেশী একসঙ্গে এসে মিশত গভীর রাত্রে জাহাজের কোনও গোপন আনাচে-কানাচে। এ-সম্মিলনও বেশিক্ষণ স্থায়ী হত না। মিনিট চার-পাঁচ পরামর্শ করেই তারা যে যার কেবিনে সরে পড়ত।

এক রাত্রের কথা বলি। জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর ডেকের উপরে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে চেয়ারে বসেছিল। তাদের আশেপাশে পৃথিবীর আরও নানান জাতির লোকেরা বিশ্রাম ও বায়ু সেবন করতে করতে তারকাহীরক-খচিত আকাশের তলায় অস্পষ্ট সাগরের দিকে তাকিয়েছিল এবং শুনছিল তার গম্ভীর সজল কণ্ঠের আদিম সংগীত। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকের উপর থেকে একে একে কমতে লাগল যাত্রীর সংখ্যা। আরও খানিক পরে দেখা গেল উপরে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর ছাড়া আর কোনও লোকই নেই। জয়ন্ত আস্তে আস্তে শিস দিলে। এটা হল সংকেত। এতক্ষণ মানিক ও হরিহর নিজের নিজের চেয়ারে ঘুমের ভান করে নিশ্চষ্ট হয়ে পড়েছিল, শিস শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে গেল তাদের সমস্ত জড়তা। তারা উঠে এসে জয়ন্তর দুই পাশে আসন গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'হরিহরবাবু, ফুয়াদের হাতে আমি বোধহয় আজ মিশরের সেই ইতিহাসখানিই দেখতে পেয়েছি!'

হরিহর রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'অতি সহজে। আমাদের দুজনের কেবিনের মাঝখানে আছে একটিমাত্র কাঠের 'পার্টিশান'। ফুয়াদ যখন তার কেবিনে ছিল না তখন সেই 'পার্টিশানে'র কাঠের উপরে আমি এমন একটি ছোটো ছ্যাঁদা করেছি, যার ভিতর দিয়ে একটিমাত্র চক্ষুর সাহায্যে ফুয়াদের কেবিনের প্রায় সমস্তটাই দেখা যায়। পাছে রাতে আমার কেবিনের আলো সেই

ছিদ্রপথে ফুয়াদের কেবিনে ঢুকে তাকে সন্দিগ্ধ করে তোলে, সেই ভয়ে অন্য সময়ে আমি একটি মোমের ছিপি দিয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু ছিদ্রপথে আমার আঁখিপাখি যখন উড়ে যায় তার কামরায়, তখন আমার কামরার আলো থাকে নেবানো। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ফুয়াদ নিজেকে নিরাপদ মনে করে নিশ্চিন্ত হয়েই আছে।'

হরিহর বললে, 'আপনি বাহাদুর ব্যক্তি!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'অভিনন্দন পরে দেবেন, আগে সব শুনুন। আজ সন্ধ্যার সময় কী দেখেছি জানেন?'

—'কী, কী?'

—'সে তার সুটকেস খুলে বার করলে একখানা মোটা মস্ত বই। বইখানা লাল-রঙের চামড়ায় বাঁধানো।'

হরিহর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তাহলে আপনি ঠিকই দেখেছেন। মিশরের সেই ইতিহাসখানার মলাটও লাল-রঙের।'

জয়ন্ত বললে, 'তবে আর কোনও সন্দেহই নেই। ফুয়াদ বইখানা কোলের উপরে রেখে পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগল আর মাঝে মাঝে থেমে বইখানার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। কেতাবের সমস্ত পাতা ওলটানো যখন শেষ হল, তখন সে হতাশভাবে নিজের ভাষায় কী একটা অস্ফুট কথা উচ্চারণ করলে, তারপর উঠে বইখানা আবার সুটকেসের ভিতরে পুরে কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার ভাবগতিক দেখে মনে হল, আপনার মতন সে-ও এখনও রহস্যের চাবিকাটি খুঁজে পায়নি।'

হরিহর হেসে বললে, 'শুনে কতকটা তবু আশ্বস্ত হলুম।'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, আশ্বস্ত হবার কোনওই কারণ নেই। জয়ন্ত, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো?'

—'বলো।'

—'হরিহরবাবুর মুখের কথা শুনেই মনে হয়, তাঁর পিতা হয়তো সমস্ত বক্তব্য বলে যেতে পারেননি—মৃত্যু এসে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, কুবের-ভাণ্ডারের কোনও কোনও ইঙ্গিত ওই বইখানার ভিতরে থাকলেও তার চাবিকাটি আছে অন্য কোথাও। হয়তো ওই বইখানা পেলেও আমাদের কোনও কাজেই লাগবে না।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'তবু বইখানাকে আমি উদ্ধার করবই।'

—'কেমন করে?'

—'চুরি করব।'

—'ফুয়াদ তোমাকে চুরির সুযোগ দেবে কেন?'

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, 'নিজের সুযোগ আমি নিজেই সৃষ্টি করব। শোনো মানিক, শোনো বোম্বাইবাসী সওদাগর! তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

—'পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করতে পারি।'

—'শুনেছি এর মধ্যেই ফুয়াদের সঙ্গে তোমার অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছে।'

—'তা হয়েছে। ফুয়াদের আর যে-কোনও দোষ থাক, সে-ও খুব মিশুক লোক।'

—'ফুয়াদকে একদিন সন্ধ্যায় তুমি নিজের কেবিনে নিমন্ত্রণ করেছিলে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি আসছে-কাল সন্ধ্যাতেও ফুয়াদকে নিমন্ত্রণ করে 'ডিনার' খাওয়াতে পারবে?'

—'সেটা আর এমন শক্ত কথা কী? কিন্তু আমি ফুয়াদকে নিমন্ত্রণ করলে তোমার কী উপকার হবে শুনি?'

—'সেই ফাঁকে আমি ফুয়াদের কেবিনের ভিতর ভ্রমণ করতে যাব।'

—'ফুয়াদ এত বোকা নয় যে, নিজের কেবিনের দরজায় চাবি না লাগিয়ে 'ডিনার' খেতে আসবে।'

জয়ন্ত চাপা-হাসি হেসে বললে, 'বন্ধু হে, 'তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!' তুমি কি আমার গুণপনা জানো না? ইচ্ছা করলে আমি পালোয়ান হতে পারতুম, আবার একটি প্রথম-শ্রেণির চোরও হতে পারতুম! চুরিবিদ্যার সমস্ত পাঠই আমার মুখস্থ। আমি পকেট কাটতেও জানি, দেওয়াল বয়ে গৃহস্থের দুর্গমবাড়ির ভিতরে ঢুকতেও জানি, আবার যে-কোনও তালা বা সিন্দুক বা দেরাজ বন্ধ থাকলেও খোলবার কৌশল জানি! সমস্ত উপকরণই আমার সঙ্গেই আছে। চুরিবিদ্যার ভিতরের কথা না জানলে কেউ কখনও ভালো গোয়েন্দা হতে পারে না—বুঝেছ মূর্খ?'

—বুঝেছি। কথাটা আমার মনে ছিল না।'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'উত্তম! তাহলে! এই কথাই রইল। আজ তবে আসর ভঙ্গ করা হোক।'

হরিহর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কাল আমায় কিছু করতে হবে না তো?'

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'আপনি ? হ্যাঁ, কাল আপনি এক কাজ করতে পারেন।'

হরিহর ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা, আমি আবার কী করব?'

—'এইখানে ডেকচেয়ারে শুয়ে কাল আপনি নৈশ-বায়ু সেবন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বেন। কেমন, এটা পারবেন তো?'

হরিহর একগাল হেসে বললে, 'তা আমি খুব পারব। নিদ্রাদেবীর সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবীর বরে আমি একটানা চব্বিশ ঘণ্টাকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।'

—'কিছুই না খেয়েই?'

—'খিদে পেলে খাওয়ার স্বপ্ন দেখেই আমি আত্মারাম লাভ করতে পারি।'

—'তাহলে আপনি মহাত্মা ব্যক্তি। চলুন এখন।'

পরের দিন বোম্বাইয়ের সওদাগরবেশী মানিক নিজের কেবিনে যথাসময়ে একটি ছোটো-খাটো ভোজনসভার অনুষ্ঠান করলে।

সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন স্ত্রীর সঙ্গে একটি ফরাসি ভদ্রলোক, একজন পাঞ্জাবি মুসলমান এবং বলা বাহুল্য, ফুয়াদ পাসা।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে খানিকক্ষণ চলল তাস খেলা, তারপরে হল নানান দেশের গল্প, তারপরে ফরাসি ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং ফুয়াদ পাসা গাইলে নিজের নিজের ভাষায়

একটি করে গান। তারপর আরম্ভ হল পানাহার। আসর যখন ভাঙল রাত তখন এগারোটা।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে মানিক আস্তে আস্তে নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, কয়েকজন যাত্রী তখনও সেখানে বর্তমান। এবং এটাও লক্ষ করলে, এক জায়গায় হরিহরবাবু সত্য-সত্যই নাসিকা যন্ত্রের মন্ত্রধ্বনি দ্বারা নিদ্রাদেবীর সাধনায় একান্তভাবে নিযুক্ত আছেন। সে একধারে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

খানিকক্ষণ পরে একমাত্র হরিহরবাবু ছাড়া আর সব যাত্রী একে একে ডেকের উপর থেকে অদৃশ্য হল।

আরও মিনিট-দশেক গেল। আচম্বিতে নাসিকাযন্ত্র চালনা বন্ধ করে ফেলে হরিহর মাথা তুলে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলে। তারপর দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে একটা মস্ত হাই তুলে গাত্রোত্থান করে মানিকের কাছে এসে দাঁড়াল।

—মানিক বললে, 'ঘুম ভাঙল?'

—'আমি ঘুমোইনি।'

—'মানে?'

—'কীসের মানে জিজ্ঞাসা করছেন?'

—'না ঘুমোলেও মানুষের নাক ডাকে নাকি?'

—'ডাকে বই কি। অভিনয় করলেই ডাকে।'

—'অভিনয়?'

—'হ্যাঁ, অভিনয়। সঙ্গদোষে কী না হয়? আপনাদের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও একটু একটু অভিনয় করতে শিখেছি বই কি! আসলে আমি জেগে ছিলুম।'

—সাধু হরিহরবাবু, সাধু! অপানার পদোন্নতি দেখে আশান্বিত হলুম।'

—'বেশি আশা না করাই ভালো। যতই চেষ্টা করি, আমি জয়ন্তবাবুর মতন কোনওদিনই চুরিবিদ্যা অভ্যাস করতে পারব না! বাব্বাঃ! এতক্ষণ আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল! খালি মনে হচ্ছিল চুরি করতে গিয়ে জয়ন্তবাবু এই বুঝি ধরা পড়েন, এই বুঝি কে দেখে ফেলে!'

মানিক চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত কাজ হাসিল করতে পেরেছে কি? এখনও তো তার দেখা নেই।'

তারা আরও প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করলে। কিন্তু জয়ন্ত-পাঠান যে সেদিন ডেকের উপরে উঁকি মারবে, এমন কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

জয়ন্তের অদর্শনে মানিক একটু চিন্তিত হল। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কেবিনের দিকে অগ্রসর হল সন্দেহ-দোলায় দুলতে দুলতে।

পরের দিন সকালে মানিক কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে, ডেকের উপরে বেশ একটি গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি গোলমাল করছে ফুয়াদ পাসা! সে তার দীর্ঘ দুই বাহু আন্দোলন করতে করতে ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, 'মাঝ-সমুদ্রে চুরি যখন

হয়েছে, চোর তখন এই জাহাজেই আছে! সব কামরা খানাতল্লাশ করো—এ চোরকে না ধরে আমি ছাড়ব না।'

মনে মনে পুলকিত হয়ে, বাইরে বিস্মিত ভাব দেখিয়ে ফুয়াদের কাছে গিয়ে মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে স্যার, ব্যাপার কী?'

ফুয়াদ বললে, 'গুরুতর ব্যাপার! কাল রাতে আমার কেবিনে চোর ঢুকেছিল!'

—'কখন স্যার, কখন?'

—'কেমন করে বলব? আপনার ওখান থেকে ডিনার খেয়ে যখন ফিরে আসি তখন আমার কেবিনের দরজা যেমন বন্ধ করে গিয়েছিলুম, তেমনি বন্ধই ছিল। আজ সকালে উঠেও দরজা আমি ভিতর থেকেই খুলেছি। অথচ তার পরেই কেবিনের ভিতরে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আমার একটা সুটকেস একেবারে অদৃশ্য হয়েছে!'

মানিক হতভম্ভ ভাব দেখিয়ে বললে, 'ভারী আশ্চর্য চুরি তো!'

ফুয়াদ গর্জন করে বললে, 'যতই আশ্চর্য হোক, এ চোরকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না! সে তো আর পাখি নয়, যে মাঝ-সমুদ্রে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে! সে এই জাহাজেই আছে! এখনই আমি খানাতল্লাশের ব্যবস্থা করছি।' বলতে বলতে সে সশব্দে পা ফেলে জাহাজের কাপ্তেনের কাছে ছুটে গেল।

মানিক ফিরে অন্যদিকে খানিক অগ্রসর হয়ে দেখলে, ডেকের রেলিং ধরে হরিহর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ মড়ার মতন সাদা। মানিককে দেখেই সে কম্পিতস্বরে চুপি-চুপি বললে, 'কী হবে মানিকবাবু?'

মানিক মৃদুস্বরে ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ! হবে আবার কী?'

—'একেবারে ঢাকিসুদ্ধু ঢাক চুরি! বইসুদ্ধু সুটকেস? এখনই খানাতল্লাশ শুরু হবে, একটা বড়ো সুটকেস জয়ন্তবাবু কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? কোঁত করে গিলে ফেলতে পারবেন না তো?'

—'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না'—বিরক্তমুখে এই কথা বলেই মানিক সেখান থেকে চলে গেল।

হরিহর করুণভাবে নিজের মনেই বললে, 'জয়ন্তবাবু চুরিবিদ্যায় এমন ওস্তাদ জানলে আমি কি কখনও এদের সঙ্গে আসতুম? এইবারে তাঁর ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে তো? তিনি গ্রেপ্তার হলে তাঁর আসল পরিচয়ও প্রকাশ পাবে—সঙ্গে সঙ্গে আমিও হয়তো ধরা পড়ব! হায় হায়, কেন এদের সঙ্গে এলুম!'

সেই দিন গভীর রাত্রে।

জয়ন্ত ও মানিক ডেকের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। হরিহর ভয়ে সেদিন আর ডেকের উপরে মুখ বাড়ায়নি।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়, তুমি সুটকেসটা সরিয়ে ফেললে কেন?'

—'ফুয়াদকে ধোঁকা দেবার জন্যে। আমি তাকে জানতে দিতে চাই না যে এই চুরির

আসল কারণ মিশরের ইতিহাস। আমার ইচ্ছা সে মনে করুক, তার কেবিনে এসেছিল কোনও সাধারণ চোর, দামি জিনিসের লোভে নিয়ে গিয়েছে সুটকেসটা।'

—কিন্তু তোমার ঘরে যদি খানাতল্লাশ হয়?'

—'সুটকেস পাওয়া যাবে না।'

—'কেন?'

—'সমস্ত বামাল সমেত সুটকেসটা নিক্ষেপ করেছি ভারতসাগরের অতল গর্ভে।'

—'সে কী! মিশরের ইতিহাসখানাও—'

—'না। কেবল সেইখানাই আমার কাছে আছে। এখন শোনো মানিক! আপাতত ও-বইখানা আমি তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখতে চাই।'

—'কেন বলো দেখি?'

—'আমার বোধ হচ্ছে ফুয়াদ আমাকেই সন্দেহ করেছে।'

—'কীসে বুঝলে?'

—'সে আমার আড়ি পাতবার ছিদ্রপথটি আবিষ্কার করে ফেলেছে।'

—'কবে?'

—'আজই। দুপুরবেলায় চুপ করে শুয়ে উপর-পানে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমার মুখের উপরে কী-একটা ছোট জিনিস এসে পড়ল। ভালো করে চেয়ে দেখি, পার্টিশানের যেখানে আমার ছিদ্রপথটি ছিল, তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা সরু লোহার শলাকা! ব্যাপারটা তখনই বুঝলুম। সন্দিগ্ধ ফুয়াদ আজ ওই 'পার্টিশান'টা তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করতে করতে ছিদ্রটি দেখতে পেয়েছে। তারপর আরও ভালো করে দেখবার জন্যে ছ্যাঁদার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে একটি শলাকা আর অমনি খসে পড়েছে আমার মোমের ছিপি! ফুয়াদ যে তখন ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে আমার ঘরে দৃষ্টি সঞ্চালন করছিল, এটুকু আন্দাজ করা শক্ত হল না। আমি ঘুমের ভান করে চোখ মুদে স্থির হয়ে শুয়ে রইলুম।'

মানিক বললে, 'ঘটনা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে!'

—'উঠুক। তাই তো আমি চাই। কিন্তু এ অবস্থায় বইখানা আমার কাছে রাখা নিরাপদ হবে না। এই নাও, এখানা তুমিই রাখো। আর আমার বক্তব্য ভালো করে শোনো। পরশুদিন জাহাজ পৌঁছবে সুয়েজ নগরে। সেখান থেকে আমাদের ট্রেনে চেপে যেতে হবে কাইরোর দিকে। যে-হোটেলে আমরা উঠব তার ঠিকানা মনে আছে তো? বেশ! তাহলে এটুকুও মনে রেখো আমরা কেউ কারুর সহযাত্রী হব না, সকলে আলাদা আলাদা যাব, কিন্তু বাসা বাঁধব একই হোটেল। জাহাজে এই আমাদের শেষ দেখা। এখন চলো।'

॥ পঞ্চম ॥

জয়ন্তের কাহিনি

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস খুঁজতে গেলে সুদূর অতীতের গর্ভে গিয়ে বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যেতে হয়। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার শৈশব ছিল যে কোন আদিম যুগে, ঐতিহাসিকেরা এখনও তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন না। প্রায় ছ-হাজার বৎসরের ওপারেও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে ও সভ্যতায় তখনও মিশরের গৌরবের সীমা নেই।

আজ সেই মিশরের নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তার বাসিন্দারা আধুনিক পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এমনকি তাদের দু-চার জন বংশধরদের পর্যন্ত রেখে যায়নি ইহলোকে।

কিন্তু তারা পৃথিবীতে রেখে গিয়েছে নিজেদের হাতের যেসব বিচিত্র চিহ্ন, এই গর্বিত বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষরাও তা দর্শন করে বিস্মিত না হয়ে পারে না। এখনও বেঁচে আছে তাদের স্থাপত্য, তাদের ভাস্কর্য, এমনকি তাদের চিত্রকলাও। এইসবের ভিতর থেকেই আজও পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরের সভ্যতার, সমাজের, ধর্মের ও দৈনন্দিন জীবযাত্রার যা-কিছু তথ্য। তাদের সাহিত্যও বেঁচে আছে তাদের নশ্বর দেহগুলোও!

নশ্বর দেহ বেঁচে আছে—কথাটা শুনতে যেন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, প্রাচীন মিশরের বাসিন্দারা মানুষের মৃতদেহগুলোকে কোনও এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এমনভাবে অটুট অবস্থায় রক্ষা করত যে, হাজার হাজার বৎসর পরে আজও সেগুলো অবিকৃত হয়েই আছে। একালের প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন মিশরের নানা সমাধি-গৃহ ও প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে সেকালকার অসংখ্য রাজা-মহারাজা, আমির-ওমরাও ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে বহু সাধারণ গৃহস্থেরও সুরক্ষিত দেহ পুনরাবিষ্কার করে তখনকার অনেক অজানা কথা জানতে পেরেছেন।

প্রাচীন মিশরিদের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরে আত্মা আবার সমাধিগৃহে এসে মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ কবর দেওয়া মড়া আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে। জ্যান্ত হলেই মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয়, অতএব সমাধির ভিতরে রেখে দেওয়া হত নানান রকম খাবার। জীবন্তরা চায় সঙ্গী, অতএব বড়ো বড়ো রাজা-মহারাজা ও আমির-ওমরাওদের সঙ্গে কবরস্থ করা হত তাঁদের দাসদাসীদেরও। এমনকি সেইসব সজীব মৃতদেহ পৃথিবীতে বাস করবার সময় যেসব পোশাক-পরিচ্ছদ, বহুমূল্য অলংকার ও আসবাবপত্তর ব্যবহার করত, সেগুলিকেও 'মমি'র অর্থাৎ সুরক্ষিত শবের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হত। তার উপরে অনেক সমাধির ভিতরে রক্ষা করা হত কল্পনায় গড়া দাসদাসীর মূর্তি। তাদের বুকের উপরে লিখে দেওয়া হত এক-রকম মন্ত্র, যার প্রভাবে সেই মূর্তিগুলো নাকি জীবন্ত হয়ে সমাধিস্থ গৃহকর্তার আদেশ পালন করত ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও কইত।

প্রাচীন মিশরের এইসব বিশ্বাসকে আজ তোমরা অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে করতে পারো, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসই হোক আর যাই হোক, ওর জন্যে বর্তমান সভ্যতা বিশেষরূপে উপকৃত

হয়েছে। কারণ ওই সমাধিগৃহগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, মিশরের অতীতকালের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য।

মিশরের বড়ো, মাঝারি ও ছোটো অনেক 'পিরামিড' পাওয়া যায়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে এক-একজন নরপতির সমাধি। তা ছাড়া মিশরের আরও নানাস্থানে নানা পদ্ধতিতে অসংখ্য মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হয়েছে, এখানে সবিস্তারে সমস্ত বলবার জায়গাও নেই, দরকারও নেই।

এখন কাইরো হচ্ছে মিশরের রাজধানী, কিন্তু প্রাচীন মিশরের তুলনায় তাকে শিশু বললেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে, মুসলমান রাজত্বের সময়ে। বলা বাহুল্য এখন যারা কাইরোর পথে পথে ভ্রমণ করে, তাদের মধ্যে মিশরের আদিমবাসিন্দাদের বংশধর নেই একজনও। ইউরোপীয় প্রভাবে আসবার আগে কাইরোর মধ্যে ছিল প্রাচ্য-মধ্যযুগের যেটুকু স্বরূপ, ক্রমে ক্রমে তাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। জায়গায় জায়গায় কাইরোকে দেখলে সন্দেহ হয় সে বুঝি কোনও ইউরোপীয় নগরী! কিন্তু কাইরোকে সম্পূর্ণরূপে চোখে পড়বে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসি, ইতালীয়, রুশ ও আমেরিকান প্রভৃতির সঙ্গে চৈনিক, জাপানি, পারসি, তুর্কি ও ভারতবাসী এবং আরব থেকে শুরু করে আফ্রিকার সমস্ত জাতিকে। কাইরো যেন বিশ্ব-মানবের সম্মিলনক্ষেত্র! বিশেষ করে সেখানে এসে একসঙ্গে মিলেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

কাইরোয় দেখবার জিনিস আছে অনেক। তার বিশাল মসজিদগুলির সৌন্দর্য কিনেছে পৃথিবী বিখ্যাত নাম। তা ছাড়া এখানকার কোনও কোনও গির্জা, আরবীয় জাদুঘর, সুলতানিয়া পুস্তকালয় এবং কালিফদের সমাধিগৃহ প্রভৃতি দেখবার জন্যেও অনেক যাত্রীর আগমন হয়। এদের ভালো করে দেখবার বা এদের কথা ভালো করে বলবার সময় আমাদের নেই, সুতরাং আবার আমাদের গল্পের সূত্র ধরবার চেষ্টা করব।

প্রসিদ্ধ 'এসবেকিয়া'-উদ্যানের চারিধারে আছে বিদেশি লোকদের বসবাস এবং একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো-গুছানো বড়ো বড়ো সব হোটেল। এরই মধ্যে বিশেষ এক হোটেলে এসে উঠেছে আমাদের মানিক ও হরিহর।

হোটেলের একটি ঘরে বসে তারা জয়ন্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সেদিন গেল, তার পরদিনও কেটে গেল, তবু দেখা নেই জয়ন্তের।

মানিক রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠল। চিন্তিতভাবে বললে, 'হরিহরবাবু, জয়ন্ত কখনও কথার খেলাপ করে না। কালই তার এসে পড়বার কথা, কিন্তু আজও তার দেখা নেই। ব্যাপারটা ভালো বলে মনে হচ্ছে না।'

হরিহর এই সুদূর বিদেশে এসে পর্যন্ত মন-মরা হয়েছিল, মানিকের কথা শুনে আরও বেশি দমে গিয়ে বললে, 'দুর্গা শ্রীহরি! আমার ভয় করছে, এখনই আমার দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে!'

মানিক বললে, 'আপনার ভয় আর ইচ্ছাকে দমন করুন। জয়ন্তকে না পেলে আমি দেশে ফেরবার নাম মুখেও আনব না।'

হরিহর ক্ষীণ স্বরে বললে, 'বিপদে পড়লেও?'

মানিক দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, বিপদে পড়লেও। জয়ন্তের জন্যে আমাদের যে-কোনও বিপদকেও বরণ করতে হবে।'

হরিহরের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে ইজিচেয়ারে হেলে পড়ে দুই চোখ মুদে ফেললে। সে হচ্ছে সাদাসিধে গৃহকোণপ্রিয় একান্ত ভালোমানুষ, বিপদবরণ, অ্যাডভেঞ্চার, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ব্যাপারের কোনও ধারই ধারত না। কাজেই মানিকের কথা শুনে তার নাড়ি প্রায় ছাড়ি ছাড়ি করতে লাগল।

কিন্তু পরদিনেই পাওয়া গেল জয়ন্তের দেখা। তার মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা, চিবুকেও একটা কাটা দাগ।

মানিক উৎকণ্ঠা-ভরা স্বরে বললে, 'এ কী জয়, তুমি কি আহত হয়েছ? পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

জয়ন্ত ধপাস করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আগে এক পেয়ালা খুব-গরম চা, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর।'

মানিক তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চা আনবার হুকুম দিয়ে আবার ফিরে এল।

হরিহর ফ্যালফ্যাল চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বোবার মতো।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মানিক, একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে। আর এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে কে জানো?'

—'কে?'

—'গোড়া থেকেই শোনো। সুয়েজে তো নামলুম। স্থির করলুম একটা দিন সেখানকার কোনও হোটেলে কাটিয়ে তারপর ধরব ট্রেন। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে ড্রাইভারকে বললুম, সোজা কোনও ভালো হোটেলে নিয়ে চলো।'

'গাড়ি ছুটল। এ-পথ সে-পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা এমন এক নিরালা জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে পথের ধারে ছিল ছোটো একটি মাঠ, আর মাঠের পাশে ছিল একখানা মাত্র বাড়ি—কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর দেখা নেই।

'গাড়িখানা সেইখানে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?' ড্রাইভার বললে, 'গাড়ির কল কোথায় বিগড়ে গিয়েছে। একবার পরীক্ষা করতে হবে।'

'ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে আমার পিছন দিকে এল। পরমুহূর্তে আমার মাথার উপরে অনুভব করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেললুম সমস্ত চেতনা।

'জ্ঞান হবার পর দেখলুম, একটা ঘরের কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে আমি শুয়ে আছি, আর আমাকে ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। তাদের মধ্যে একজনকে দেখেই চিনলুম। সে হচ্ছে ফুয়াদ পাসা। সে বললে, 'এই যে, বাছার জ্ঞান হয়েছে দেখছি। কে তুই?'

—'জনৈক মানুষ।'

—'হুঁ, সেটা না বললেও চলবে। কিন্তু তোর আসল পরিচয় কী? তুই ছদ্মবেশ পরেছিস কেন?'

—'ছদ্মবেশ!'

—'আর ন্যাকামো করতে হবে না। তোর সমস্ত জিনিসপত্তর, কাগজপত্র আর জামা-

কাপড় আমরা উলটেপালটে দেখেছি। বেশ বুঝেছি যে তুই মুসলমান নোস, তুই হিন্দু। তোর এই ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কী?'

—'শখ। আমি বরাবর বাস করে আসছি পেশোয়ারে। পাঠানের পোশাক পরতে আমি ভালোবাসি।'

—'বেশ, তোর কথা না হয় সত্য বলেই ধরলুম। কিন্তু জাহাজে তুই আমার কেবিনে উঁকি মারবার জন্যে দেয়ালে ছ্যাঁদা করেছিলি কেন?'

—'ছ্যাঁদা! ছ্যাঁদা কী?'

—'ফের ন্যাকামো!' বলেই ফুয়াদ আমার মুখের উপরে তার হাতের বেতের ছড়ি দিয়ে সজোরে এক আঘাত করলে। তারপর আবার বললে, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল কে তুই? আমার কামরায় উঁকি মারবার জন্যে এত আগ্রহ তোর কেন?'

—'আমি ছ্যাঁদার কথা কিছুই জানি না। তোমার কামরায় উঁকিও মারিনি।'

'ভীষণ ক্রোধে ফুয়াদের মুখের ভাব হয়ে উঠল ভয়াবহ। তখন তাকে দেখাচ্ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের মতো—তার তখনকার চেহারা দেখলেই আমাদের হরিহরবাবু বোধহয় তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়তেন। রাগে ফুলতে ফুলতে ফুয়াদ চিৎকার করে বললে, 'এখনও যদি চালাকি করিস, তাহলে তোকে গলা টিপে কুকুরের মতো মেরে ফেলব! বল আমার সুটকেস কোথায় আছে?'

'আমি শান্তভাবেই বিস্ময়ের ভান করে বললুম, তোমার সুটকেস?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সুটকেস! আমার কেবিন থেকে তুই যা চুরি করেছিস।'

—'তোমার সুটকেস আমি যদি চুরি করতুম, তাহলে সেটা তো আমার সঙ্গেই থাকত!'

'দাঁতে দাঁত ঘষে ফুয়াদ বললে, 'না, সুটকেসটা তোর সঙ্গে নেই! নিশ্চয়ই তুই সেটা সরিয়ে ফেলেছিস! নিশ্চয়ই তোর কোনও সহকারী আছে!'

'মানিক, তুমি আমার গায়ের জোর জানো। ফুয়াদকে দেখলেই বিপুল ক্ষমতাশালী বলে মনে হয়, কিন্তু বাহির থেকে দেখে আমার শক্তির কথা কেউ ধারণায় আনতে পারে না। সাধারণত আমার শক্তি থাকে মাংসপেশির মধ্যে ঘুমন্ত। ফুয়াদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এতক্ষণ আমার সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাবার সুযোগ খুঁজছিলুম, কারণ সৌভাগ্যক্রমে শত্রুরা আমার হাত-পা বাঁধবার চেষ্টা করেনি। নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে তারা হয়তো ভেবেছিল, একলা আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না। তাদের এই ভ্রম সংশোধন করবার জন্যে হঠাৎ আমি আমার মুষ্টিযুদ্ধে দুরন্ত হাত বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে ফুয়াদের চিবুকের উপরে সজোরে মারলুম এক ঘুসি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকে দুই পা ছড়িয়ে ছুড়লুম দুই লাথি! তারপরেই তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুয়াদ আর তার দুই সঙ্গী ঘরের মেঝের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং বাকি লোকটা বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। তার হতভম্ব ভাবটা কাটবার আগেই আমার আর এক পদাঘাতে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে সে-ও ঠিকরে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই বেগে আমি ঘরের বাইরে ছুটে গেলুম এবং বাহির থেকেই দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলুম।

'রাস্তায় গিয়ে পড়তে দেরি লাগল না। সেখানে গিয়ে দেখি, চালকহীন ট্যাক্সিখানা তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে গাড়ির উপরে উঠে চালকের আসন দখল করে বসলুম, তারপর গাড়িখানাকে দিলুম ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে চালিয়ে।

'কোনওরকমে খুঁজে বার করলুম একটা হোটেল। তখনও আমার মাথা ও মুখ দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। হোটেলের অধ্যক্ষ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সংক্ষেপে আমি বুঝিয়ে দিলুম যে, গুন্ডাদের হাতে পড়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। হোটেলের কর্তা লোক ভালো। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে এনে আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করালে। তারপর একটা দিন বাধ্য হয়ে আমাকে সেই হোটেলেই বাস করতে হল। এই হচ্ছে আমার দুর্ঘটনার ইতিহাস।'

হরিহর সমস্ত শুনে চোখ পাকিয়ে বললে, 'ওরে বাবা! কী ভয়ংকর ব্যাপার!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'এই তো সবে কলির সন্ধে হরিহরবাবু! এই তো সবে ভয়ানক ব্যাপারের আরম্ভ!'

হরিহরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সচকিতকণ্ঠে সে বললে, 'এই সবে আরম্ভ? তাহলে এর পরেও এমন সব ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে নাকি?'

—'আছে বই কি! রক্তের ঢেউ বইতে পারে, আমাদের কারুর কারুর মুণ্ড উড়ে যেতে পারে, এমনকি—'

হরিহর বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আর আমি শুনতে চাই না মশাই, আমি এইখান থেকেই আবার কলকাতায় পালাতে চাই!'

—'কিন্তু এখন আমরা পালালেও শত্রুরা আর আমাদের পিছু ছাড়বে না।'

—'ইস! ছাড়বে না বই কি! না ছাড়বার কারণটা শুনি?'

—'কারণ মিশরের ইতিহাসখানা আমাদের কাছেই আছে।'

—'ছুড়ে ফেলে দিন মিশরের ইতিহাস! মিশরের ইতিহাস মিশরেই পড়ে থাকুক। মরে ভূত হয়ে আমি কুবের-ভাণ্ডারে গিয়ে ঢুকতে চাই না! চলুন, আমরা লম্বা দিই।'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হরিহরের কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বললে, 'কোনও ভয় নেই হরিহরবাবু, কোনও ভয় নেই। আপনার পায়ে যাতে কাঁটাটি না ফোটে আমি প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব।'

উত্তরে হরিহর কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল না যে সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয়েছে।

মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়ন্ত, সুয়েজে থাকতে থাকতে তুমি ফুয়াদের আর কোনও খোঁজ নাওনি?'

জয়ন্ত বললে, 'তা নিয়েছি বই কি। থানায় গিয়ে ট্যাক্সিখানা পুলিশের জিম্মায় রেখে আমি সব-কথা খুলে বলেছিলুম। পুলিশ আমাকে সঙ্গে করে আবার ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকে আমরা ফুয়াদ বা তার সঙ্গীদের সন্ধানই পাইনি। শুনলুম সে বাড়িখানা নাকি অনেকদিন ধরেই খালি পড়ে আছে। ফুয়াদকে পেলুম না বটে, তবে আমার মুখে ফুয়াদের চেহারার বর্ণনা শুনে পুলিশ বললে, কাইরোর এক পলাতক নামজাদা খুনি-ডাকাতের সঙ্গে তার চেহারার বর্ণনা নাকি হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

॥ ষষ্ঠ ॥

জয়ন্তের নস্যদানি

সেই রাত্রি। আকাশে ছিল চাঁদ, আর ছিল স্বপ্নময় জ্যোৎস্না, আর ছিল তারাদের দীপ্ত ইঙ্গিত।

শহরের কোলাহল ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশুতি রাতও যেন আলস্যে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গান গাইছে ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম। মাঝে মাঝে বাতাসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সে যেন বহন করে আনছে অদূরবর্তী মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস।

হরিহরের ঘুম আসছিল না, নানান দুশ্চিন্তার ধাক্কায় তার ঘুম গেছে পালিয়ে। সে অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় পড়ে পড়ে জয়ন্ত ও মানিকের নাসিকা-নিনাদ শ্রবণ করলে; আশ্চর্য হয়ে ওরা মনে মনে ভাবলে, এত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও কেমন করে ঘুমোতে পারে? তারপর খোলা হাওয়ায় নিজের মাথাটা একটু ঠান্ডা করে নেবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খুব-উঁচু হোটেলের জানলা। সেখান থেকে দেখলে মনে হয় সমস্ত কাইরো শহরটা যেন চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। চাঁদের চিকণ রুপোলি ধারায় ধোয়া সে যেন এক অপূর্ব দৃশ্যপট।

কলকাতার মতন এখানেও রয়েছে বাড়ির পর বাড়ির ভিড়—খানিক আলো খানিক কালো-মাখা। কিন্তু এখানে আছে আর-এক নতুনত্ব। এখানে যেদিকেই তাকানো যায় চোখে পড়ে গম্বুজের পর গম্বুজ ধরতে যেন চায় আকাশকে! তারও উপরে রয়েছে সুশ্রী সূক্ষ্মগঠন কত-যে মিনার তার আর সংখ্যা হয় না, তারা সবাই মিলে যেন বিপুল শূন্যের বক্ষ ভেদ করতে চায়!

হরিহর একমনে এই দৃশ্য দেখছে, হঠাৎ হল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ঘরের ভিতরকার অন্ধকারই যেন মূর্তিমান হয়ে দু-খানা কালো কালো বাহু বাড়িয়ে বজ্রমুষ্টিতে হরিহরের গলা টিপে ধরলে! দারুণ আতঙ্কে চোখ কপালে তুলে সে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেরি করলে না।

একটু একটু করে আবার তার জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে ভাবলে, সে একটা বিশ্রী স্বপ্নের পাল্লায় পড়েছিল। তারপরেই বুঝতে পারলে তার হাত-পা-মুখ বাঁধা। একটু নড়বার বা টুঁ শব্দ করবার উপায় নেই।

জয়ন্ত ও মানিকের নাসিকা তখনও নীরব হয়নি।

হরিহর একসঙ্গে বাঁধা পা দুটো কোনওরকমে তুলে ও নামিয়ে ঘরের মেঝের উপরে শব্দের সৃষ্টি করলে—সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁধা মুখ দিয়েও বেরুতে লাগল একটিমাত্র ধ্বনি—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ......

একে একে স্তব্ধ হল দুই নাসিকাই। তারপরেই জ্বলল বৈদ্যুতিক আলো।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'একী ব্যাপার হরিহরবাবু?'

—'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি হরিহরকে বন্ধনমুক্ত করলে। সে উঠে বসেই ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললে।

জয়ন্ত বললে, 'কে আপনার এ-দশা করলে?'

হরিহর প্রথমটা কথাই কয়না। তারপর বললে, 'আমি কিছু জানি না—জানতেও চাই না, আমি কেবল এই সর্বনেশে দেশ ছেড়ে পালাতে চাই!'

মানিকের মনে জাগল একটা সন্দেহ। সে তাড়াতাড়ি নিজের সুটকেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার ডালাটা টানতেই খুলে গেল, এবং সুটকেসের ভিতরে হাত চালিয়েই মানিক বলে উঠল 'সর্বনাশ!'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'মিশরের ইতিহাসখানা চুরি গেছে তো?'

—'হ্যাঁ জয়ন্ত!'

—'বাঁচা গেছে!'

—'তুমি কী বলছ হে?'

হরিহর বললে, 'জয়ন্তবাবু ঠিক কথাই বলছেন। আমিও বলি আপদ গেছে, বাঁচা গেছে!'

মানিক বললে, 'তাহলে আমরা এতদূরে ছুটে এলুম কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'কুবের-ভাণ্ডারের দরজা খুলব বলে।'

—'কিন্তু তার চাবি আছে তো মিশরের ওই ইতিহাসখানার মধ্যেই!'

—'না, আমার কাছে।'

—'তোমার কথার অর্থ?'

—'মিশরের ইতিহাস এখন অন্তঃসারশূন্য, তার আসল গুপ্তকথা এখন আমার দখলে। ফুয়াদ শাঁসহীন খোলা নিয়ে সরে পড়েছে।'

—'সত্যি কথা বলছ?'

—'এই দ্যাখো!'

—'ওটা তো তোমার রুপোর নস্যদানি!'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে নস্যদানিটা উপুড় করে সমস্ত নস্য ফেলে দিলে। তারপর তার ভিতর থেকে টেনে বার করলে একখানা কাগজ।

মানিক বললে, 'কী ওখানা?'

—'এই কাগজে লেখা আছে সংক্ষেপে কতগুলি মূল্যবান উপদেশ, আর আঁকা আছে একটি গিরিগুহার নকশা!'

—'সুয়েজে তুমি যখন ফুয়াদের হাতে পড়েছিলে, সে তখন ও-কাগজখানা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি?'

—'তার মাথায় ঘুরছিল তখন মিশরের ইতিহাসের কথা। সেই বইখানার সার পদার্থ যে তুচ্ছ একটা নস্যদানির নস্যির গুঁড়োর তলায় লুকোনো থাকবে, এটা সে আন্দাজ করবে কেমন করে? কিন্তু জাহাজেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম তার অভিপ্রায়, সেইজন্যেই বইখানা তোমার হাতে সমর্পণ করেছিলুম।'

হরিহর বললে, 'ওই কাগজখানা কোথায় ছিল জয়ন্তবাবু?'

—'মিশরের ইতিহাসের মধ্যে।'

হরিহর প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলিত করে বললে, 'অসম্ভব। হতেই পারে না। দুই বছর ধরে কতবার আমি ওই বইখানার পাতাগুলো আগাগোড়া উলটে গিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে একটুকরো ছেঁড়া কাগজও দেখতে পাইনি। না, না জয়ন্তবাবু, আপনি বড়োই বাজে কথা বলছেন!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মাথায় বুদ্ধি যাদের কম, দুনিয়ায় তারা বাজে ছাড়া কাজের কিছুই আবিষ্কার করতে পারে না। তাহলে শুনুন হরিহরবাবু, আপনার মুখের কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে বইখানার ছাপানো কোনও পাতার ভিতরই আসল রহস্যের সন্ধান নেই। কারণ যে-বই সর্বসাধারণের পাঠ্য, তার মধ্যে অতবড়ো একটা রহস্য কেমন করে লুকানো থাকবে? তাই বইখানা হাতে পেয়েই সর্বপ্রথমে আমি পরীক্ষা করলুম তার অমুদ্রিত অংশ—অর্থাৎ তার মলাট ও 'fly leaf' প্রভৃতি। আমার পরীক্ষা ব্যর্থ হল না। দেখলুম, বইখানার গোড়ার ও শেষের দু-খানা 'fly leaf'ই অতিরিক্ত মোটা। শেষের দিকের 'fly leaf' খানি খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একখানি রঙিন 'fly leaf'-এর উপর আর একখানি রঙিন 'fly leaf' গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে। টানতেই তা দু-খানা হয়ে খুলে গেল, আর তার ভিতর থেকে পেলুম আপনার বাবার হাতে লেখা এই কাগজখানি। এখানি বার করে নিয়ে দু-খানা 'fly leaf' আঠা দিয়ে আবার আমি আগের মতোই জুড়ে রাখলুম, তারপরে আমার উপর থেকে শনির দৃষ্টিকে সরাবার জন্যে বইখানি সমর্পণ করলুম মানিকের হাতে। এখন বুঝছেন তো, আমি অন্যায় সাবধানতা অবলম্বন করিনি? কেমন করে বলতে পারি না, ফুয়াদ আপানার পিতার গুপ্তকথা কতক কতক জানতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই সে সবটা জনাতে পারেনি, কারণ তাহলে বইখানি হাতে পেয়ে এই কাগজখানিকেও সে হস্তগত করতে পারত।'

হরিহর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জয়ন্তের মুখের পানে বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে যেন আপন মনেই বললে, 'সত্যিই আমি গাধা! এত চেষ্টা করেও আসল সত্যটা আমি ধরতে পারিনি! আমাকে গোরু বললেও ভুল হবে না। আমি বাঁদর, আমি হনুমান—'

জয়ন্ত বললে, 'থাক হরিহরবাবু, থাক! নিজেকে আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দা মনে করে এতটা আত্মলাঞ্ছনা করা ভালো নয়। খালি আপনি কেন, অতি-চালাক ফুয়াদও আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, তুমি দেখেছ তো, ওই বইখানার ম্যাপের উপরে লাল কালি দিয়ে রেখা টানা আছে? ছাপানো রেখা নয়, মানুষের হাতে টানা। ও-রেখার কোনওই অর্থ নেই?'

—'আছে বই কি! রেখা টেনেছিলেন বোধহয় হরিহরবাবুর পিতৃদেবই। ওই রেখার দ্বারা তিনি পথনির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।'

—'পথনির্দেশ? কোথাকার পথ?'

—'কুবের-ভাণ্ডার যে-গুহায় আছে, সেইখানে যাবার পথ। রেখা যেখানে শেষ হয়েছে,

ঠিক সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেই আমরা কুবের-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব।'

হরিহর চমকে উঠে বললে, 'তবেই তো! সে-বইখানা এখন ফুয়াদের হাতে। আমরা কেমন করে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হব? আমাদের আগেই তো ফুয়াদ সেইখানে গিয়ে হানা দেবে।'

—'হানা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। এই কাগজখানা সঙ্গে না থাকলে রত্ন-ভাণ্ডার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার শক্তি আর কারুরই হবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু সেই ম্যাপখানি সঙ্গে না থাকলে আমরা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছব কেমন করে?'

জয়ন্ত সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'মানিক, তুমি কি আমাকেও আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্তর্গত করতে চাও? না বন্ধু, না, ঘাটে নৌকো ডোবাব তেমন ছেলে আমি নই। সেই মানচিত্রের হুবহু প্রতিলিপি বইখানার মধ্যে পাওয়া এই কাগজেরই অন্য পৃষ্ঠায় তুলে রেখেছি। এরপরেও তোমাদের আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

মানিক বললে, 'জিজ্ঞাস্য নেই, বক্তব্য আছে। আমি উচ্চকণ্ঠে বলতে চাই—জয়, জয়ন্তের জয়!'

হরিহরও এতক্ষণ পরে একমুখ হেসে বললে, 'মানিকবাবুর সঙ্গে আমিও আমার কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—জয়, জয়ন্তবাবুর জয়!'

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'না মানিক, না হরিহরবাবু, এখনও জয়ধ্বনি করবার সময় হয়নি। এখনও আসল কর্তব্যই অসমাপ্ত। রত্নভাণ্ডারের রত্ন এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে কি না, সে-কথা জোর করে বলা যায় না।'

হরিহর আবার মুষড়ে পড়ে বললে, 'এই রে, তবেই সেরেছে! জয়ন্তবাবুর কথা শুনে আমার মন আবার স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যাচ্ছে।'

জয়ন্ত বললে, 'এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়বার দরকার নেই হরিহরবাবু! আপনার বাবার লেখা কাগজখানির ভিতর থেকে যেটুকু আভাস পেয়েছি, তাতেই বুঝেছি, আমরা কোনও সাধারণ গুপ্তধনের ভাণ্ডার লুঠ করতে যাচ্ছি না। মিশরের ইতিহাসে 'রামেসেস' নামধারী এগারো জন ক্ষমতাশালী নরপতির বিবরণ পাওয়া যায়। কুবের-ভাণ্ডার বলতে আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যাত্রা করব, ওদেরই মধ্যে কোনও-এক 'রামেসেসে'র সমাধিগৃহের সন্ধানে। মিশরের প্রাচীন রাজাদের সমাধিগৃহের মধ্যে বহু মূল্যবান জিনিস রেখে দেওয়া হত। এখানে গিয়েও আমরা দেখতে পাব নিশ্চয় সেই-রকমই সব জিনিস। প্রত্নতত্ত্ববিদরা কয়েকজন 'রামেসেসে'র আশ্চর্য সমাধিমন্দির আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু এ সমাধিটি এখনও তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। দেখা যাক, হরিহরবাবুর পিতৃদেবের প্রসাদে সেকালের 'রামেসেসে'র সম্পত্তি একালের আমাদের হাতে এসে পড়ে কি না।'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে কবে আমরা যাত্রা করব?'

জয়ন্ত বললে, 'শুভ কাজে দেরি করতে নেই। আমরা প্রস্তুত। রাত্রি প্রভাত হলেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনি কী বলেন?'

গুপ্তধনের এমনই মোহ যে, এরই মধ্যে হরিহর নিজের বিপদের কথা একেবারে ভুলে গেল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে ঘরময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগল রবারের বলের মতন।

তারপর জয়ন্তের কাছে এসে বললে, 'আমার মত জানতে চাইছেন? বলেন তো আমি এখুনি যেতে রাজি!'

—'বলেন কী? এই অন্ধকারে?'

যোদ্ধার মতন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে হরিহর বললে, 'আর অন্ধকার-টন্ধকার আমি মানি না—আমার চোখে এসেছে ধ্রুবতারার জ্যোতি! রেসের ঘোড়ার মতন আমার পা-দুটো এখন দৌড় মারবার জন্যে নিসপিস করছে!'

হরিহরের রকম-সকম দেখে মানিক হেসে ফেলে বললে, 'সাবধান! অতটা শশব্যস্ত হবেন না হরিহরবাবু! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন তো দৌড়তে চাইছেন, কিন্তু পথ আগলে যদি দাঁড়িয়ে থাকে ফুয়াদ-বাবাজি?'

ফুটো বেলুনের মতন হরিহরের দেহ গেল চুপসে। শিউরে উঠে সে বললে, 'যাত্রারম্ভেই অযাত্রার নাম করবেন না মানিকবাবু! ও-নামটা শুনলেই আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার ইচ্ছে হয়।'

॥ সপ্তম ॥

পাতালবাসী অন্ধকারের কোলে

মিশরিরা তাদের নীলাকাশকে বড়ো ভালোবাসে। মিশরের আকাশে নীলিমা যেমন গাঢ়, তেমনি উজ্জ্বল। সেখানকার আলোর ভিতর দিয়েও ঝরে পড়ছে যেন নীলিমার স্নেহ! আর তার মাটিকে স্নিগ্ধ করে বয়ে যাচ্ছে নীল নদ চারিধারে কলতান ছড়াতে ছড়াতে।

এই নীল নদের দুই তীরেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে প্রাচীন মিশরের অগাধ ঐশ্বর্যের স্মৃতি। নীল নদের পূর্ব-তটে চার শতাব্দী ধরে বিরাজ করত মিশরের বিখ্যাত রাজধানী 'থেবেস' শহর, আজ যা লুপ্ত হয়েছে ধরাপৃষ্ঠ থেকে। তার এক শত সিংহদ্বারের একটিকেও আর দেখা যায় না। এখন সেখানে দুটি পল্লিগ্রাম আছে—'কার্নাক' ও 'লুক্সর'। এখানে বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে বিরাজ করছে আমেনদেব ও তাঁর সঙ্গী দেবতাদের মন্দিরের পর মন্দির, তাদের প্রত্যেকটিই আজও আকর্ষণ করছে বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি।

কিন্তু নীল নদের পূর্ব-তটে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় কেবল মৃত্যুর রাজত্ব। অর্থাৎ এদিকটায় ছিল প্রাচীন মিশরের সমাধিক্ষেত্র। সাধারণত সমাধিক্ষেত্র বলতে আমরা যা বুঝি, এ তেমনধারা জায়গা নয়। অসংখ্য সমাধি এবং এক-একটি সমাধি আবার প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড আর তাদের ভিতরে-বাইরে বড়ো বড়ো শিল্পীদের অদ্ভুত সব হাতের ছাপ। প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ গৌরবের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে এইসব সমাধির ধ্বংসাবশেষ ও গুপ্তগৃহের ভিতর থেকেই।

এখানকার ধ্বংসাবশেষের উপরে সুদীর্ঘ ছায়াপাত করে দাঁড়িয়ে আছে তরুলতাহীন রুক্ষ শৈলশ্রেণি। এবং তারই মধ্যে আছে মৃতদের উপত্যকা। তাকে 'রাজাদের শহর'ও বলা হয়,

কারণ তার মধ্যে প্রাচীন মিশরের রাজা এবং রাজবংশীয়দের সমাধিস্থ করা হত। মিশরের জাদুঘরে গেলে মিশরি রাজাদের যেসব 'মমি' বা সুরক্ষিত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই ওই মৃতদের উপত্যকা থেকেই তুলে আনা হয়েছে।

'ফেলুক্কা' নামে মিশরি-নৌকায় চেপে জয়ন্ত, মানিক ও হরিহর এসে দাঁড়িয়েছে এই মৃতদের শহরে। সত্যই এ যেন এক আশ্চর্য স্মৃতির শ্মশান। মৃত্যুকে যারা আলিঙ্গন করেছে মানুষ এখানে চেষ্টা করেছে তাদেরও রক্ষা করতে,—পৃথিবীর আর কোথাও নেই এমন অদ্ভুত সমাধিক্ষেত্র। অভিভূত মনে তারা তিনজনে খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে বিচরণ করতে লাগল।

তারপর জয়ন্ত নিজের পকেট থেকে বার করলে সেই মানচিত্রখানি—যার উপরে কুবের-ভাণ্ডারের পথ নির্দেশ করা হয়েছে একবার মানচিত্রের উপরে ও আর-একবার এদিকে-ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ওই দ্যাখো মানিক, মিশররাজ 'প্রথম সেটি'র মন্দির। এখন আমাদের যেতে হবে এরই উত্তর-পূর্ব দিকে।'

তারা অগ্রসর হতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই সমতল ক্ষেত্রের কতকগুলি সমাধি পেরিয়ে তারা এসে দাঁড়াল একটি পাহাড়ের তলদেশে। তারপর তারা পাহাড়ের উপর দিকে উঠতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'হরিহরবাবুর বাবা কাগজে লিখে রেখেছেন দেখছি—'পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে পাওয়া যাবে একটি ভেঙে-পড়া ছোটো গুহামন্দিরের মতন জায়গা। গুহার ভিতরে অন্ধকার ভেদে করে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে এগুলেই একটি আট ফুট চওড়া গহ্বর। সেই গহ্বরের ভিতরে দিনের বেলাতেও নজর চলে না; তার গভীরতা হচ্ছে ষাট ফুট। দড়ি ঝুলিয়ে নির্ভয়ে কিন্তু অতি সাবধানে সেই গহ্বরের ভিতরে নেমে তলদেশে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। দেখা যাবে, পাতালের ভিতরে সেই গহ্বর তিনটি সংকীর্ণ পথে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ডান দিকের পথটি হচ্ছে সবচেয়ে সরু, তার ভিতরে দাঁড়িয়ে এগুনো যায় না, হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। প্রায় একশো ফুট পথ এইভাবে এগুলে পর আর-একটি বড়ো পথে পাওয়া যাবে একটি বিপজ্জনক কূপ। কূপটি চওড়ায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়, সুতরাং লাফ দিয়ে অনায়াসে পার হওয়া যায়। জানা না থাকলে গভীর অন্ধকারে এই কূপের ভিতরে পড়ে প্রাণ হারাবার আশঙ্কা আছে। কূপ পার হয়ে আরও পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে একটি দ্বারহীন ঘরের সামনে এসে পথটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ঘরটিই হচ্ছে কুবের-ভাণ্ডার।' মানিক, এই তো আমরা একটি ভেঙে-পড়া গুহামন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এর ভিতরটাও মিলিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। আমাদের সকলকেই 'টর্চ' জ্বালাতে হবে।'

গুহার ভিতরটা দুর্গম হয়ে আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ও রাবিসের দ্বারা। তারা তিনজনে পাথরগুলো টপকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল। 'টর্চে'র আলো ফেলে জয়ন্ত বললে, 'আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ওই দ্যাখো সেই গহ্বর।'

তিনজনে গর্তটার ধারে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিরেট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হরিহর শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, দড়ি ধরে এর মধ্যে নামা আমার কাজ নয়! দেখেই আমার বুক টিপটিপ করছে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু ওই অন্ধকার ছিল বলেই কুবের-ভাণ্ডার আজও খালি হয়ে যায়নি।

এই অন্ধকার কৌতূহলী লোকদের চোখ দিয়েছে অন্ধ করে, এর মধ্যে সাহস করে কেউ ঢুকতে পারেনি। কিন্তু আমরা ঠিকই ঢুকব।'

হরিহর প্রবল মস্তক-আন্দোলন করে বললে, 'অসম্ভব। আমি কিছুতেই পারব না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না হরিহরবাবু, আপনার কোমরে দড়ি বেঁধে আগে আমরাই আপনাকে নীচে নামিয়ে দেব।'

হরিহর সভয়ে বললে, 'তার মানে একলা আমাকেই এই পাতালের ভেতরে তলিয়ে যেতে হবে? এর মধ্যে আছে ভীষণ গোরস্থান, আর আছে হাজার হাজার বছরের পুরনো শুকনো মড়া। মিশরিদের বিশ্বাস ছিল তাদের মড়ারা কবরে গিয়ে আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে। কে বলতে পারে, তাদের বিশ্বাস সত্য নয়? আমি হচ্ছি একালের মানুষ, সেকালের জ্যান্ত মড়ার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ আমার নেই।'

মানিক বললে, 'আচ্ছা হরিহরবাবু, আপনি অতবেশি ভাববেন না। আগে আমিই গর্তের ভিতরে গিয়ে নামছি, তারপর জয়ন্ত আপনাকে দড়ির সাহায্যে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে।'

কিন্তু তবু হরিহরের সাহস জাগ্রত হল না। অনেক তর্কাতর্কির পরে জয়ন্ত ও মানিক তাকে কোনওরকমে রাজি করালে। একখানা প্রকাণ্ড পাথরের সঙ্গে দড়ির এক দিক ভালো করে বেঁধে জয়ন্ত সেটা গর্তের ভিতরে ঝুলিয়ে দিলে। মানিক অনায়াসেই দড়ি ধরে অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর হরিহরের পালা। জয়ন্ত তাকে একটি জীবন্ত মোটের মতো ঝুলিয়ে নামিয়ে দিলে গর্তের মধ্যে।

মানিক নীচ থেকে শুনতে পেলে, হরিহর নীচের দিকে আসছে ঘন ঘন আর্তনাদ করতে করতে। যথাস্থানে পৌঁছেই হরিহর অবশ হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। ক্ষীণ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমাতে আর আমি নেই মানিকবাবু! আমার দম বেরিয়ে গেছে, পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আমার গতর চূর্ণ হয়ে গেছে!'

মানিক বললে, 'আপনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর আপনার ভয় কী? এখন বসে বসে একটু জিরিয়ে নিন।'

—'কিন্তু আমি কীসের ওপরে বসে আছি? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে!' হরিহর টপ করে 'টর্চ'টা জ্বেলেই 'ওরে বাপ রে!' বলে চেঁচিয়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল।

মানিক আগেই যা দেখবার দেখে নিয়েছিল। গহ্বরের তলায় মাটির উপরে পড়ে রয়েছে নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল!

মানিক বললে, 'এসব কঙ্কাল আর আপনাকে আক্রমণ করবে না হরিহরবাবু! বোঝা যাচ্ছে, আমাদেরও আগে অনেক হতভাগ্য যুগে যুগে এই গহ্বরের ভিতরে দৈবগতিকে বা অর্থলোভে আত্মদান করেছে।'

হরিহরের মুখ দিয়ে 'রা' বেরুল না, সে শুধু ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। পাতালের সেই গর্ভ কী শীতল, কী স্তব্ধ! তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দগুলো যেন বহুদূর থেকে শোনা যায়! তাদের প্রত্যেকটি কথার উত্তর দিচ্ছে অন্ধকারের মধ্য থেকে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি।

এতক্ষণে জয়ন্ত নীচে নেমে এসে দড়ির শেষপ্রান্ত ত্যাগ করে বললে, 'মানিক, গুহার আরও ভিতরে যাবার রাস্তাটা তুমি দেখতে পেয়েছ কি?'

মানিক একদিকে 'টর্চে'র আলো নিক্ষেপ করে বললে, 'পেয়েছি। ওই যে!'

রাস্তা তো ভারী! একটা তিন ফুট উঁচু গর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। চওড়াতেও গর্তটা সাড়ে-তিন ফুটের বেশি হবে না।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, 'এসো, এইবারে আমাদের হামাগুড়ি দেবার পালা।'

মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকে ঠেলে সরাতে সরাতে আবার তারা অগ্রসর হল। গুহাতলের কঠিন পাষাণ মসৃণ ছিল না, তাদের হাঁটু ও হাত বারবার পাথরে ঘষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অজানাকে জানবার বিপুল উত্তেজনায় জয়ন্ত ও মানিক সে-সব আঘাত আমলেই আনলে না, কিন্তু হরিহরের মুখে ক্রমাগতই করুণ আর্তস্বর। একবার সে 'সাপ, সাপ!' বলে ভীষণ চেঁচিয়ে লাফ মারলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই গুহার পাথুরে ছাদে মাথা ঠুকে হাঁউমাউ করে আবার উবু হয়ে বসে পড়ল।

মানিক সচমকে ফিরে 'টর্চে'র আলোকে সত্য-সত্যই দেখলে, হিস হিস শব্দ করে কালো বিদ্যুতের মতন কী যেন একটা সাঁৎ করে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

হরিহর কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'সাপটা আমার পিঠের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি আর বাঁচব না।'

সামনের দিক থেকে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর এল, 'চলে এসো মানিক এই বিশ্রী গর্তটা শেষ হয়ে গিয়েছে।'

মানিক ও হরিহর তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা গিয়েই দেখলে, ছাদ আর তাদের মাথার কাছে নেই, পথের উপরে এখন সিধে হয়ে দাঁড়াবার ও হাত-পা ছড়াবার ফাঁক আছে।

মানিক আরামের নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আঃ বাঁচলুম!'

হরিহর বললে, 'বাঁচলুম না ছাই! আবার এই পথেই তো আমাদের ফিরতে হবে!'

সামনের দিক থেকে আবার জয়ন্তের কণ্ঠস্বর জাগল, 'সাবধান সাবধান! এখানে রয়েছে সেই পথ-জোড়া কূপটা! এ পথ খালি দুর্গম নয়, একটু অসাবধান হলেই এখানে ইহলোক ত্যাগ করবার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করা আছে! হরিহরবাবুর বাবা কূপের কথা লিখে রেখেছিলেন তাই রক্ষা, নইলে আমাকেও হয়তো অন্ধকারে এর মধ্যে ঝাঁপ খেতে হত!'

জয়ন্ত কূপের ধারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলে 'টর্চে'র আলোকশিখা। অনেক নীচে আলো পেয়ে কালো জল চকচক করে উঠল।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে কূপের অন্য পাড় আলোকরেখার মধ্যে এনে বললে, 'মানিক, লক্ষ্য স্থির রেখে লাফ মারো! হরিহরবাবু, আপনিও মানিককে অনুসরণ করুন।'

হরিহর শুকনো-গলায় বললে, 'আমার হাত-পা বিষম কাঁপছে! যদি ঝপাং করে জলে পড়ে যাই?'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে কী যে হবে, তা আপনিও জানেন আমরাও জানি। সুতরাং জলে না পড়ে ডাঙার উপরেই থাকবার চেষ্টা করুন।'

হরিহর মিনিট-দুয়েক একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সুদীর্ঘ একটা লম্ফ ত্যাগ

করে কূপের ওপারে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'জয় মা কালী! একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল!'

আবার তারা অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু আর তাদের বেশিদূর যেতে হল না। পথটা ক্রমেই সরু হয়ে এল এবং তারপরই হঠাৎ পরিণত হল একটা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া গুহায়।

তিন-তিনটে তীব্র 'টর্চের' আলোক-শেলাঘাতে গুহার অন্ধকার যেন যন্ত্রণায় ধড়ফড় করতে লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিন-জোড়া চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল বিপুল বিস্ময়ে!

তিন-দিকের দেওয়ালের সামনে কোন অতীতের ঐশ্বর্যের ও শিল্পকলার শত শত নিদর্শন! কোথাও রয়েছে বহুবর্ণবিচিত্র দারুময় মূর্তি, কোথাও কারুকার্যের অতি-সুদর্শন শবাধার, কোথাও বা রয়েছে ধাতু বা আন্য কিছু দিয়ে গড়া সিংহাসন, সাধারণ বসবার চেয়ার ও নানা আকারের টেবিল প্রভৃতি, কত-রকম মূল্যবান ভৃঙ্গার আর ভাণ্ড ও পাত্রাদি—তাদের সংখ্যা আর গুনে ওঠা যায় না।

এক-জায়গায় পাওয়া গেল মস্তবড়ো একটি পেটিকা, পরীক্ষা করতেই বোঝা গেল তার আগাগোড়াই কারুকাজ-করা পুরু সোনার পাত দিয়ে মোড়া।

জয়ন্ত বললে, 'ওই যে শবাধারটি দেখছ, খুব সম্ভব ওরই মধ্যে আছে মহারাজা রামেসেসের সুরক্ষিত মৃতদেহ, আর এই যেসব জিনিস দেখছ, এগুলি রাখা হয়েছে ওঁরই ব্যবহারের জন্যে।'

মানিক আর-একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'ওখানে ওই যে একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, ওটিকে দেখলেও তো কোনও রাজা-রাজড়ারই প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।'

মূর্তিটি প্রায় ছয় ফুট উঁচু। তার মাথায় মুকুট এবং হাতে রাজদণ্ড।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বললে, 'মানিক, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? না, না—সন্দেহ নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এটি হচ্ছে সোনা দিয়ে গড়া প্রতিমূর্তি!'

মানিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতবড়ো সোনার মূর্তির কথা কখনও সে শ্রবণ করেনি!

হরিহর হঠাৎ মহা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। জয়ন্ত ও মানিক ফিরে দেখলে সে তখন পেটিকার ডালাটি খুলে ফেলে তার ভিতর দিকে আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে! তারাও সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে যা দেখলে তাতে নিজেদের চোখকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলে না।

সমস্ত পেটিকার গর্ভ জুড়ে আছে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার এবং স্বর্ণময় নানারকম দ্রব্য।

ঠিক এই সময়ে সুতীব্র, বিকট ও ভয়াবহ এক আর্ত চিৎকারে গুহার ভিতরটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনেই বিষম চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল। প্রথমটা কেউ বুঝতে পারলে না, এ বীভৎস চিৎকারের জন্ম কোথায়?

জয়ন্ত বললে, 'নিবিয়ে ফ্যালো—'টর্চে'র আলো এখুনি নিবিয়ে ফ্যালো!'

তারপর আবার শোনা গেল সেই ভয়ানক চিৎকারের পর চিৎকার—কিন্তু এবার চিৎকারগুলো আসছে যেন আরও দূর থেকে! তারপর আর চিৎকার শোনা গেল না, গুহা আবার সমাধির মতোই স্তব্ধ।

হরিহর তখন ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে, তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। সে ফিসফিস করে বললে, 'এ হচ্ছে প্রাচীন মিশরের প্রেতাত্মার চিৎকার! তার গুহায় একেলে মানুষদের দেখে সে আর চুপ করে থাকতে পারছে না! হয়তো সে এখুনি আমাদের আক্রমণ করতে আসবে।'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ! মানিক, রিভলবার বার করো। এইখানে বসে পড়ো। খুব হুঁসিয়ার! যতক্ষণ না আমি বলি, কেউ কোনও কথা কোয়ো না।'

যেমন নীরব এখানকার অন্ধকার ঠিক তেমনি নীরব হয়েই তারাও নিশ্চল মূর্তির মতন বসে রইল। মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। তারপরেই শোনা গেল ধুপ ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ! একটা পায়ের নয়, কয়েকটা পায়ের শব্দ! সেই মৃত্যুর মতন নিঃসাড় গুহার ভিতরে নিশ্বাস ফেললেই তফাত থেকে শোনা যায়, পদধ্বনি সেখানে কেবল স্পষ্ট নয়, অপার্থিব বলেই মনে হতে লাগল।

পায়ের শব্দ ক্রমে কাছে—আরও কাছে এসে পড়ল, তারপর একেবারে থেমে গেল। তারপর অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো লক্ষ্য করে জয়ন্ত ও মানিক ছুড়লে রিভলভার! বদ্ধ আবহের মধ্যে রিভলভারের শব্দকে মনে হল যেন কামান-গর্জন! অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য! গুহায় আবার রন্ধ্রহীন অন্ধকার!

রিভলভারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে শোনা যেতে লাগল অতি-দ্রুত পায়ের আওয়াজ। যারা এসেছিল, এই ভয়াবহ অভ্যর্থনায় তারা এখন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! তাদের আরও-বেশি ভয় দেখাবার জন্যে জয়ন্ত ও মানিক কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ে এগিয়ে গেল এবং আবার কয়েকবার রিভলভার ছুড়তেও কসুর করলে না।

পরমুহূর্তেই সমস্ত গুহা যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল! কর্ণভেদী চিৎকারের পর চিৎকার—সেসব চিৎকার শুনলে যেন হিম হয়ে যায় বুকের রক্ত! তার বীভৎসতা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

জয়ন্ত অভিভূতকণ্ঠে বললে, 'মৃত্যুকূপ! হতভাগ্যরা সেই মৃত্যুকূপের ভিতরে তলিয়ে গেছে!'

মানিক শিউরে উঠে বললে, 'আমরা কি চেষ্টা করলে ওদের বাঁচাতে পারি না?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'ওদের বাঁচানো অসম্ভব! হয়তো কূপের ধারে গিয়েও ওদের আর দেখতে পাব না। দেখতে পেলেও আমরা কী সাহায্য করতে পারি? ওদের বাঁচাতে গেলে ওই গভীর কূপের ভিতরে খুব লম্বা একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিতে হয়। তেমন দড়ি আমাদের সঙ্গে কোথায়? আমাদের সম্বল মাত্র একগাছা দড়ি—আবার উঠে তা আর খুলে আনবার সময়ও নেই, উপায়ও নেই।'

হরিহর বললে, 'কিন্তু ওরা কারা?'

জয়ন্ত বললে, 'এদের মধ্যে একজন যে ফুয়াদ, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা আমি কতক কতক আন্দাজ করতে পারছি। ম্যাপের লাল কালির দাগ দেখে ফুয়াদ নিশ্চয়ই রাজাদের এই উপত্যকায় সন্ধান নিতে এসেছিল। তারপর হঠাৎ আমাদেরও এখানে দেখতে পেয়ে ফুয়াদ লুকিয়ে পড়ে—কিন্তু আমাদের গতিবিধির উপরে রাখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তারপর আমাদের পিছনে পিছনে ফুয়াদ আর তার সঙ্গীরাও দড়ি ধরে গর্তের ভিতরে নেমে আসে। কিন্তু এটা যে মৃত্যু-গহ্বর এতটা তারা অনুমান করতে পারেনি, আর এখানে ঢোকবার জন্যে আমাদের মতন আগে থাকতে প্রস্তুত হয়েও আসেনি। খুব সম্ভব, ওদের সঙ্গে একটার বেশি 'টর্চ' ছিল না আর পাছে আমরা দেখতে পাই সেই ভয়ে সে 'টর্চটা'ও সবসময় জ্বেলে রাখতে পারেনি। তাই আসবার পথেই ওদের দলের একজন লোক ওই কূপে ঝাঁপ খেতে বাধ্য হয়েছে। তারপর আমাদের রিভলভারের গুলিতে ওদের সেই একটি-মাত্র 'টর্চ'ও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। রিভলভারের গুলি এড়াবার জন্যে ওরা পালাবার চেষ্টা করেছে এই নিবিড় অন্ধকারে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকূপকে এড়াতে পারলে না। হয়তো এটা ভগবানেরই বিধান। ওরা না মরলে হয়তো ওদের হাতে মরতে হত আজ আমাদেরই। কিন্তু আমরা হচ্ছি 'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমি'র সন্তান, তাই 'মহারাজ রামেসেসে'র সমাধিগুহার মধ্যে আমাদের মৃতদেহগুলোর ঠাঁই হল না। হরিহরবাবু, এইবারে আপনি নির্ভয় হতে পারেন। ফুয়াদ পাসার পালা সাঙ্গ হল, সে আর আপনাকে তাড়া করতে আসবে না।'

হরিহর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না। ব্যাপার দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি! বাপ!'

॥ অষ্টম ॥

তুচ্ছ আলিবাবার গুহা

তারা সবাই আবার রত্নগুহার ভিতরে ফিরে গেল।

মনের উত্তেজনায় প্রথম দৃষ্টিতে তারা যা দেখতে পায়নি, এবারে সেসবও তাদের নজর এড়িয়ে গেল না।

গুহার দেওয়াল কালো পাথরের কর্কশ গা ঢেকে রয়েছে অপূর্ব সব ভিত্তিচিত্র! কত হাজার হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদের নিপুণ হাতে আঁকা সেইসব ছবি, কিন্তু আজও তাদের বর্ণবৈচিত্র মলিন বা অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

কোথাও গাছে বসে আছে কপোত-কপোতী, জলে সাঁতার কাটছে হাঁসের দল, নদীর ধারে পাপিরাস-তৃণপত্রের পাশে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছে বকজাতীয় আইবিস পাখি; কোথাও দেখানো হয়েছে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশুকে; কোথাও একটি মেয়ে বুনছে সুতো, একটি মেয়ে বাজাচ্ছে বীণা এবং একটি তরুণী ব্যস্ত ফোটা-ফুলের আঘ্রাণ নিতে; কোথাও কুমোর গড়ছে পাত্র, কোথাও পুরোহিতরা সারছে মন্দিরের কাজ, কোথাও রাজসভাসদরা চলেছে রাজসন্দর্শনে; কোথাও কুস্তিগিররা পরস্পরের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নিযুক্ত, কোথাও ধোপার দল কাপড় কাচছে বা শুকোচ্ছে বা পাট করছে, কোথাও রাখালরা গোরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে, কোথাও দড়া-বাজিকররা খেলা অভ্যাস করছে। কোথাও দেখা যায় শিকার ও শিকারিদের, কোথাও বসেছে নাচের আসর, কোথাও পটুয়ারা বসে বসে আঁকছে ছবি। এমনি দৃশ্যের পর দৃশ্য—সংসার, সমাজ, রাজসভা, শস্যখেত, খেলার মাঠ, যুদ্ধক্ষেত্র,

দেবতার মন্দির, প্রাসাদ, চাষার কুটির, হাটবাজার, নগর ও অরণ্য প্রভৃতি সত্যিকার জগতের যা-কিছু দ্রষ্টব্য নিয়ে আশ্চর্য এক চিত্রজগৎ!

মানিক উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললে, 'দ্যাখো জয়, চেয়ে দ্যাখো! গুহার দেওয়ালের উপরে বিরাজ করছে প্রাচীন মিশরের সমস্ত দৃশ্য।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ মানিক, সেকালের এদেশি শিল্পীরা সমাধিগৃহের ভিতরে সমসাময়িক যুগের ছোটো-বড়ো যা-কিছুকে এমনিভাবে ফুটিয়ে রাখত বলেই প্রাচীন মিশরের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম, শিল্প আর সাহিত্য আজ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে আছে। প্রাচীন মিশর আজ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়েও দৃশ্যমান হয়ে আছে শিল্পীদের দৌলতে! দুনিয়ার আর কোনও মৃত-সভ্যতা শিল্পীদের সাহায্যে নিজেকে এমনভাবে অমর করে যেতে পারেনি। অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি আর ভারত প্রভৃতি স্থানে গেলে চিত্র, ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে আর্যদের মহাভারতবর্ষের গৌবরময় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! প্রাচীন ভারতের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার কোনও ব্যবস্থাই আমাদের পূর্বপুরুষরা করে যেতে পারেনি। তাই আজ আমরা সন্দেহ প্রকাশ করলেও জোর করে বলতে পারি না যে, পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলোকপাত করেছিল আমাদের আর্য-ভারতবর্ষই! বেদ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হতে পারে, কিন্তু সভ্যতায় ভারত যে মিশরের অগ্রগামী এর কোনও প্রমাণ পাবার উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন মিশর মরেও বেঁচে আছে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের জীবনের ধারা আজও বর্তমান, অথচ তার অতীত-গৌরবের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে মৃত্যুর কবলে!'

হরিহর বললে, 'ও জয়ন্তবাবু, কলেজের প্রফেসরের মতন প্রাচীন মিশর আর ভারতবর্ষকে নিয়ে লেকচার তো দিচ্ছেন, কিন্তু ওসব মূল্যবান আলোচনা কি বাসায় ফিরে করলেই ভালো হয় না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'ঠিক বলেছেন হরিহরবাবু! কিন্তু আমিও যে বাঙালি জাতির একটি জ্যান্ত নমুনা, আমাদের যে স্থানোপযোগী কিছু করবার অভ্যাস নেই! আমরা ধর্মকর্ম করবার জন্যে জন্মাষ্টমী আর শিবরাত্রিতে ছুটে যাই থিয়েটারে নর্তকীর নূপুরধ্বনি শুনতে, বাঙালি মেয়ে-পুরুষের পোশাক খুঁজতে যাই সায়েবদের দোকানে আর মাসিক-সাহিত্যক্ষেত্রে বসে করি দৈনিকপত্রের সংবাদ নিয়ে আলোচনা! তাই আজ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে এসেও শোনাচ্ছি কিনা প্রাচীন সভ্যতার বক্তৃতা! ...তারপর হরিহরবাবু, আপনার কী আদেশ বলুন দেখি?'

অনেকটা টবের মতন দেখতে একটি সুন্দর কারুকার্যকরা পাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হরিহর বললে, 'এটা কী বলতে পারেন?'

জিনিসটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে জয়ন্ত বললে, 'দেখছি, এটা হচ্ছে শ্বেতস্ফটিক দিয়ে গড়া এক জলঘড়ি।'

—'জলঘড়ি?'

—'হ্যাঁ। পৃথিবীতে তখন এইরকম পাত্র দিয়েই এখনকার ঘড়ির অভাব পূরণ করা হত। ভিতরদিকে তাকালেই দেখতে পাবেন এর গায়ে খোদা আছে Graduated Scale বা ক্রমাঙ্কিত মাপনদণ্ড। এর তলায় আছে একটি ছোটো ছ্যাঁদা। এই পাত্রটি জলপূর্ণ করলে পর

ওই ছ্যাঁদা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বাইরে বেরুতে থাকে, তারপর মাপনদণ্ডের হিসাবে কতটা জল কমল দেখে অনায়াসেই সময় নিরূপণ করা যায়। সেদিকার পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো ঘড়ির কথা কেউ জানত না। বহু শতাব্দী পরে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার-দি-গ্রেটের আগেও এইরকম জলঘড়ির সাহায্যেই মানুষের কাজ চলত।'

বিস্ফারিত চক্ষে হরিহর বললে, 'বাবা! মিশরের এত কথাও আপনি জানেন!'

—'প্রাচীন মিশরের আরও অনেক কথাই আমি বলতে পারি। বিজ্ঞানের রাজ্যেও সে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল শুনবেন নাকি?'

একখানা বাহু অর্ধোত্থিত করে করাঙ্গুলি বিস্তৃত করে হরিহর বললে, 'রক্ষা করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কথায় কথায় বেলা বেড়ে যাচ্ছে, এখন কী করব তাই বলুন।'

—'আপনি কী করতে চান?'

—'এই গুপ্তধন এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো?'

—'আজকেই?'

—'তা নয়তো কী? কে আবার প্রাণ হাতে করে এই ভুতুড়ে-গুহায় ঢুকবে? আজই সব চুকিয়ে দিতে হবে।'

—'অসম্ভব!'

—'কেন?'

মানিক বললে, 'কেন যে অসম্ভব তাও বুঝতে পারছেন না হরিহরবাবু? আমাদের তিনজনের এমন সাধ্য নেই যে এক দিনে এতবড়ো ভাণ্ডারের এতরকম ঐশ্বর্য নিয়ে আমরা আজই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারব। কুলিমজুর ডাকাও সম্ভবপর নয়, এখনকার কথা বাইরের কারুকে জানানোও চলবে না, কেননা, গুপ্তধনের কাহিনি মিশরের রাজসরকারের কানে উঠলেই আমাদের বাড়া-ভাতে পড়বে ছাই!'

—'তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে চুপিচুপি, চোরের মতো!'

—'নিশ্চয়!'

—'তবেই তো!'

জয়ন্ত বললে, 'অতটা হতাশ হবেন না হরিহরবাবু! গুপ্তধন যখন পেয়েছি, ছাড়ব না! তবে কাকপক্ষীকে না জানিয়ে কেমন করে এই গুপ্তধন স্থানান্তরিত করা যায় সেটা পরামর্শ করে স্থির করতে হবে।'

—'তাহলে চটপট সেই পরামর্শটাই করে ফেলি আসুন না!'

—'এসব তাড়াতাড়ির কাজ নয় মশাই, তাড়াতাড়ির কাজ নয়! আবার নতুন করে উদ্যোগপর্ব আরম্ভ করতে হবে। আপাতত গুহা ছেড়ে বাসায় ফিরে যাই চলুন।'

—'বলেন কী, গুপ্তধন এখানে ফেলে?'

—'ভয় নেই হরিহরবাবু, আমরা ছাড়া গুপ্তধনের সন্ধান আর যারা পেয়েছে, তারা এখন কূপের তলদেশে চিরবিশ্রামশয্যায় শুয়ে আছে।'

—'কিন্তু আমরা চলে গেলেই ফুয়াদ পাসা যদি যক হয়ে গুপ্তধন আগলাতে আসে?'

—'বাজে বকবেন না, চলুন।'

—'না মশাই, আমার মন খুঁতখুঁত করছে। অন্তত—' বলেই হরিহর সেই সোনার পাত-দিয়েই মোড়া বৃহৎ পেটিকার দিকে এগিয়ে গেল।

মানিক বিস্মিতস্বরে বললে, 'আপনি কী করতে চান?

পেটিকার গর্ভে হস্তচালনা করে হরিহর বললে, 'হাতের লক্ষ্মী ছাড়তে নেই। আপাতত পকেট ভরে যত পারি ধনরত্ন নিয়ে যেতে চাই।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, 'এ কথা মন্দ নয়। এসো মানিক, আমরাও হরিহরবাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি।'

হরিহর হিরা, মানিক ও রত্নালংকারে পকেটের পর পকেট ভরতে ভরতে বললে, 'যা খুশি, যত খুশি তত নিন! কে জানে বাবা আর ফিরতে পারব কি না! যে যা নেবে, তার ভাগে তাই পড়বে! এ-গুপ্তধনে আমাদের তিনজনেরই সমান অধিকার!'

কারুর কোনও পকেটেই আর তিলধারণের ঠাঁই নেই—কিন্তু পেটিকার গর্ভ তখনও প্রায়-পরিপূর্ণ হয়েই রইল!

মানিক অভিভূতস্বরে বললে, 'আমরা এখন যা নিয়ে যাচ্ছি তাই দিয়েই হয়তো মস্ত একটি রাজ্য ক্রয় করা অসম্ভব নয়! এ গুহার কাছে আলিবাবার গুহাও তুচ্ছ!'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, এইবারে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরো।'

সকলে আবার অগ্রসর হল। সেই ভয়াবহ পথ, সেই মৃত্যুকূপ!

—'মানিক!'

—'বলো জয়ন্ত!'

—'আসবার সময়ে খেয়াল করা হয়নি—এই গুহাপথে একটা গন্ধ পাচ্ছ কি?'

—'পাচ্ছি। এ-রকম গন্ধ পেয়েছি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে!'

সকলে পথের শেষ-প্রান্তে সেই নরকঙ্কাল-বিছানো গহ্বরে গিয়ে দাঁড়াল।

সচমকে ও বিস্ময়ে জয়ন্ত বলে উঠল 'সর্বনাশ!'

মানিক এবং হরিহর স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, যা অবলম্বন করে তারা নীচে নেমে এসেছে, সেই রজ্জুগাছা আর ভিতরে ঝুলছে না!

তারা হতভম্ব ও আড়ষ্ট হয়ে মূর্তির মতন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেদের চোখগুলোকে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না!

॥ নবম ॥

বিস্ময় ও বিভীষিকা

অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনও কথা কইতে পারলে না। স্তব্ধ গহ্বরের মধ্যে ধ্বনির সৃষ্টি করতে লাগল কেবল তাদের উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাস!

তারপর সেই অসহ নীরবতা ভঙ্গ করে মানিক ডাকলে, 'জয়?'

—'হুঁ।'

—'ব্যাপার কী বলো দেখি?'

—'ভাবছি।'

হরিহর বললে, 'ভাববার আর কী আছে? যা হবার তা হয়েছে।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে, ফুয়াদ পাসা নীচেয় নেমে আমাদের জব্দ করবার জন্যে দড়িগাছা খুলে নিয়েছে।'

মানিক বিরক্তকণ্ঠে বললে, 'বাজে কথা বললেন না হরিহরবাবু!'

—'এটা কি বাজে কথা হল?'

—'আলবাত!'

—'কী-রকম?'

—'ফুয়াদের হাত কি ষাট ফুট লম্বা যে সে নীচেয় নেমে ষাট ফুট ওপরে বাঁধা দড়ি খুলে রাখবে?'

—'তাহলে ফুয়াদের কোনও চ্যালা উপর থেকে দড়ি তুলে নিয়েছে।'

—'কেন সে তা নেবে? সে তো জানে, গুহার ভিতরে কেবল আমরা নই, তাদেরও দলবল আছে!'

এতক্ষণ পরে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি চুপ করো। হরিহরবাবুর শেষ অনুমান অসঙ্গত নয়। হয়তো ফুয়াদ গহ্বরের মুখে পাহারা দেবার জন্যে তার কোনও সঙ্গীকে রেখে নীচেয় নেমেছিল। হয়তো গুহার ভিতর থেকে রিভলভারের শব্দ আর আর্ত চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে সে দড়ি টেনে তুলে নিয়েছে। হয়তো সে ভেবেছে তার বন্ধুরা বিপদে পড়েছে। হয়তো সে বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্যে আরও লোকজন আনতে গিয়েছে। হয়তো তারা এখনই সদলবলে আবার গুহার ভিতর নেমে আসবে।'

মানিক বললে, 'তুমি তো অনেকগুলো 'হয়তো'র কথা বলে ফেললে দেখছি। কিন্তু আমাদের এখন উপায় কী?'

—'উপায় ভগবান। আমি তো কোনও উপায়ই দেখছি না।'

মানিক দৃঢ়স্বরে বললে, 'বেশ, আসুক শত্রুরা! তারা আমাদের চেনে না! জীবনে অনেক বিপদে পড়েছি, অনেক বিপদ এড়িয়েছি! আজও আমরা নিরস্ত্র নই।'

হরিহর কাঁচুমাচু-মুখে বললে, 'মানিকবাবু, তবে কি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?'

—'তা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই!'

—'এই বন্দুক নিয়েই কি যুদ্ধ করতে হবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু আমি তো জীবনে কখনও বন্দুক ছুড়িনি!'

—'ছোড়েননি, আজ ছুড়বেন!'

—'অসম্ভব! আমি পারব না!'

মানিক এত বিপদেও হেসে ফেলে বললে, 'বেশ, তাহলে বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের হস্তে জীবন সমর্পণ করবেন!'

—'ও বাবা, জীবন সমর্পণ কী গো? তাও আমি পারব না! আমার এখনও মরতে ইচ্ছে নেই।'

—'তাহলে আপনি শত্রুদের কাছে জোড়হস্তে দয়া ভিক্ষা করবেন আর বন্দুক হস্তে যুদ্ধ করে মরব আমরা দুজনে।'

হরিহর সন্দেহপূর্ণকণ্ঠে বললে, 'দয়া ভিক্ষা? উঁহু, শত্রুরা আমাকে দয়া করবে বলে মনে হচ্ছে না তো!'

ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে কী-একটা জিনিস সশব্দে গহ্বরের ভিতরে এসে পড়ল।

টর্চের আলো ফেলে জয়ন্ত বললে, 'দড়ি! আমাদেরই সেই দড়ি! মানিক, শত্রুরা এসেছে! তারা এইবার নীচে নামবে!'

পিঠে-বাঁধা বন্দুকটাকে মুক্ত করে হাতে নিয়ে মানিক বললে, 'এই দড়ি ধরেই ওদের একে একে নীচে নামতে হবে তো? তাহলে জিতব আমরাই! ওরা এক-একজন করে নীচে নামবে, আর আমরা এক-একজন করে ওদের বধ করব। আমাদের বন্দুক ছুড়তেও হবে না, আমরা—'

মানিকের কথা শেষ না হতেই উপর থেকে মস্ত একখানা পাথর সশব্দে নীচেয় এসে পড়ল!

জয়ন্ত বললে, 'মানিক! হরিহরবাবু! সাবধান! শত্রুরা নির্বোধ নয়—তারা সন্দেহ করেছে আমরা এখানে হাজির আছি! আমাদের বধ করবার জন্যে তারা উপর থেকে পাথর ছুড়ছে, তারা—'

পরে পরে আরও দু-খানা প্রকাণ্ড পাথর গহ্বরের তলদেশে এসে পড়ল।

জয়ন্ত বললে, 'শিগগির! এমন একখানা পাথর যার মাথায় এসে পড়বে তারই অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে! শিগগির এদিকে এসো! হরিহরবাবু, আমার হাত ধরুন! মানিক! মাথা নীচু করে এসো—হ্যাঁ, এইদিকে!

তারা আবার সংকীর্ণ গুহাপথের ভিতরে এসে ঢুকল।

মানিক বললে, 'জয়, ওরাও তো আবার এই রত্নগুহার পথেই আসবে!'

জয়ন্ত বললে, 'না মানিক, এটা রত্নগুহার পথ নয়! হরিহরবাবুর বাবা তিনটি পথের উল্লেখ করেছেন, ভুলে যাচ্ছ কেন? রত্নগুহার পথ ডানদিকে সব-শেষে! এটি হচ্ছে, মাঝের পথ—দেখছ না, এ পথটা রত্নগুহার পথের মতন অতটা সংকীর্ণ নয়, এর ভিতরে হামাগুড়ি দিতে হয় না—যদিও মাথা নীচু করে চলতে হয়?'

—'কিন্তু এ পথ গেছে কোনখানে?'

—'যেখানেই যাক, এ পথ হয়তো রত্নগুহার পথের মতন বিপজ্জনক নয়! তোমরা কেউ টর্চের আলো নিবিও না, সাবধানে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসো!

তারা গুপ্তপথ ধরে যতটা-সম্ভব দ্রুতপদে অগ্রসর হতে লাগল। খানিক পরেই তারা এসে পড়ল এক প্রকাণ্ড গুহায়।

তিন-তিনটে টর্চ তিন-তিনটে আলোকরেখা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তারা গুহার নিবিড় অন্ধকার দূর করছে না, স্থানে স্থানে অন্ধকারকে করে দিচ্ছে কেবল খণ্ড খণ্ড!

খানিক তফাতে চোখ চালিয়ে জয়ন্ত হঠাৎ চমকে উঠল, চুপি চুপি বললে, 'দ্যাখো মানিক, দ্যাখো!'

মানিক ও হরিহর দুজনেই দেখলে।

অন্ধকারের ভিতরে জ্বলছে পরে পরে কতকগুলো অগ্নিশিখা!

—'মানিক, ওখানে রয়েছে আটটা আগুনের ভাঁটা! ওগুলো জ্বলছে আর নিবছে, জ্বলছে আর নিবছে! কী ওগুলো?'

একসঙ্গে তিনজনেই সেইদিকে টর্চের আলো ফেলেই চকিতে দেখে নিলে, চারটে সিংহ পাশাপাশি বসে সবিস্ময়ে তাদের নিরীক্ষণ করছে! দুটো সিংহ প্রকাণ্ড ও দুটো সিংহ ছোটো—সম্ভবত অপ্রাপ্তবয়স্ক!

টর্চের তীব্র আলোক তাদের মুখের উপরে গিয়ে পড়বামাত্র সিংহ চারটে ভীষণ গর্জন করে উঠে দাঁড়াল—তারপর শোনা গেল তাদের দ্রুতপদধ্বনি!

—'বন্দুক ধরো মানিক, বন্দুক ধরো!'

'আঁ!' বলে আর্তনাদ করে হরিহর ধপাস করে বসে পড়ল!

জয়ন্ত বললে, 'ভয় নেই হরিহরবাবু, ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন! টর্চের আলো চোখে পড়াতে সিংহরাই ভয় পেয়েছে! তারা গুহাপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল!'

মানিক বললে, 'আমরা সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছি—তাই এখানে চিড়িয়াখানার গন্ধ!'

হরিহর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মানুষ-শত্রুর ওপরে আবার চার-চারটে সিংহ! ওরে বাপ রে, এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না!'

জয়ন্ত বললে, 'কী আশ্চর্য, ইজিপ্টে সিংহ! সবাই তো জানে সিংহরা মধ্য-আফ্রিকার উপরে ওঠে না!'

মানিক বললে, 'বোধহয় এরা দৈবগতিকে এখানে এসে পড়েছে। খবরের কাগজে কিছুদিন আগে তুমি কি পড়োনি, কলকাতার অদূরে—অর্থাৎ হাওড়ায় একবার সুন্দরবননিবাসী রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার পাওয়া গিয়েছিল?'

—'হ্যাঁ, খবরটা আমিও পড়েছিলুম বটে।'

—'ইজিপ্টে যেমন সিংহের বাস নেই, হাওড়াতেও নেই তেমনি বাঘের বাসা।'

—'হয়তো তোমার অনুমানই সত্য।'

—'কিন্তু জয়ন্ত, আরও একটা আশ্চর্য কথা আছে।'

—'আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ। ভেবে দেখেছ কি, এই গুহার ভিতরে সিংহ এল কেমন করে? নিশ্চয় তরা ষাট ফুট উঁচু পাহাড়ের টং থেকে গর্তের ভিতরে লাফিয়ে পড়েনি?'

নিজের ঊরুদেশ সশব্দে একটা চপেটাঘাত করে জয়ন্ত বললে, 'ঠিক, ঠিক! এটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি! এখানে সিংহ এল কেমন করে? এ যে মস্ত প্রশ্ন! এর উত্তর তুমি পেয়েছ?'

—'পেয়েছি। এই গুহা থেকে বাইরে যাবার জন্যে নিশ্চয় আর-একটা পথ আছে।'

—'ঠিক! আর সে-পথ নিশ্চয় বিশেষ দুর্গম নয়, চতুষ্পদরা তা ব্যবহার করতে পারে!'

এক মুহূর্তে সমস্ত জড়তা ত্যাগ করে হরিহর একটি রীতিমতো বিস্ময়কর লম্ফ ত্যাগ করলে। চিৎকার করে বললে, 'আসুন, আসুন, আসুন! আমরা সেই পথের সন্ধান করি! আমরা যা পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট—চুলোয় যাক রামেসেসের গুপ্তধন! এখান থেকে আমি এখন সবেগে পলায়ন করতে চাই! ওরে বাপরে বাপ! 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর'! ওদিকে দলবদ্ধ দুরাত্মা, এদিকে ভোম্বলদাসের ভাগ্নে—সিংহ! তাই কি ছাই এক-আধটা! একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে সিংহ-চতুষ্টয়! এদিকে রাম, ওদিকে রাবণ—আমাদের অবস্থা হতভাগ্য মারীচের মতন—উঁহু, তারও চেয়ে খারাপ! এতদিন ধরে সযত্নে রক্ষাকরা পৈতৃক-প্রাণ, আমি তাকে এত সহজে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই!'

মানিক বললে, 'হরিহরবাবু, আপনি ভয়ংকর চ্যাঁচাচ্ছেন! পশুরাজরা বিরক্ত হয়ে এখনই ফিরে আসতে পারে!'

—'পারে নাকি? বাবা, তাহলে এই আমি গলা খাটো করলুম—পশুরাজদের আমি নিমন্ত্রণ করতে রাজি নই। কিন্তু দোহাই আপনাদের! বাইরে বেরুবার নতুন পথ যদি থাকে তাহলে এই অসম্ভব দুঃস্বপ্নের মুল্লুক থেকে পীঠটান দেওয়াই কি উচিত না?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উচিত! আসুন তবে দেখা যাক, কোন পথ দিয়ে এখানে সিংহপরিবারের আবির্ভাব হয়েছে।'

জয়ন্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গুহায় আবদ্ধ আবহের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠল ঘন ঘন বন্দুক ও রিভলভারের আওয়াজ, সিংহদের কণ্ঠে ক্রুদ্ধ মেঘগর্জনের মতন ভৈরব হুহুঙ্কারের পর হুহুঙ্কার আর মানুষদের কণ্ঠে মর্মভেদী চিৎকার ও ক্রন্দনধ্বনি। সে কী ভয়ংকর শব্দতরঙ্গ—গুহার নিরেট পাথরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন দুঃসহ যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপতে আর কাঁপতে আর কাঁপতে লাগল!

হরিহর দুই হাত দুই কান চেপে বসে পড়ে বারবার বলতে লাগল, 'হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।'

জয়ন্ত ও মানিক স্তম্ভিত ও নিশ্চল হয়ে রইল।

তারপরেই আচম্বিতে আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্বনি, পশু ও মানুষের গর্জন ও ক্রন্দন থেমে গেল একেবারে!

—'জয়ন্ত!'

—'হুঁ।'

—'এ কী কাণ্ড!'

—'যা হবার, যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে!'

—'সিংহরা আক্রমণ করেছে ফুয়াদের সঙ্গীদের?'

—'তা ছাড়া আর কী? যাক, এইবারে আমাদের নিজেদের গায়ের চামড়া অক্ষত রাখবার চেষ্টা করতে হবে।'

হঠাৎ গুহাপথের ভিতরে শোনা গেল অতি-দ্রুত পায়ের শব্দ!

জয়ন্ত বললে, 'বিপদ এইদিকেই আসছে। মানিক, বন্দুক নাও! হরিহরবাবু, উঠে দাঁড়ান, আমাদের সাহায্য করুন, দু-হাতে দুটো টর্চ নিয়ে ঠিক গুহাপথের মুখে আলো ফেলুন। পথ দিয়ে যে-মুহূর্তে কোনও মূর্তিমান-বিপদের আবির্ভাব হবে, আমরা গুলি করে মেরে ফেলব।'

পথ দিয়ে গুহার ভিতরে সবেগে এসে পড়ল একটা মূর্তি, ভালো করে কিছু দেখবার আগেই জয়ন্ত ও মানিক একসঙ্গে ছুড়লে বন্দুক এবং বিকট এক চিৎকার করে মূর্তিটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

মানিক বলে উঠল, 'এ তো সিংহ নয়, এ যে মানুষ!'

মূর্তিটা মাটির উপরে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

জয়ন্ত ছুটে তার কাছে গিয়েই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী! এ যে ফুয়াদ পাসা!'

মূর্তিটা মুখ তুলে জয়ন্তকে দেখে যন্ত্রণাবিকৃতস্বরে বললে, 'হ্যাঁ বাঙালিবাবু, আমি ফুয়াদ!'

—'তুমি তাহলে মরোনি?'

—'এখনও মরিনি বটে, কিন্তু আর আমার বাঁচবার আশা নেই!'

—'আমি জানতুম তুমি ঝাঁপ দিয়েছ কূপের জলে!'

—'না, কূপ গ্রাস করেছিল আমার সঙ্গীদের। কূপকে ফাঁকি দিয়ে আমি আবার বাইরের আলোতে পালিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু গুপ্তধনের লোভ সামলাতে না পেরে অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন নিয়ে ফের ফিরে এসেছি! এবারে তোমাদের মেরে গুপ্তধন নিশ্চয়ই দখল করতুম, কিন্তু হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রের মতন এসে পড়ল ওই অসম্ভব সিংহগুলো! আমার দলের সবাই পড়েছে তাদের খপ্পরে, কেবল আমি তাদের কোনওরকমে এড়িয়ে এখানে এসেছি বটে, কিন্তু তোমাদের বন্দুক এড়াতে পারলুম না।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা কিন্তু বন্দুক ছুড়েছিলুম সিংহবধ করবার জন্যে। নরহত্যা করা আমাদের পেশা নয়।'

ফুয়াদ কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে থেমে বললে, 'বুঝেছি। তোমাদের দোষ দিই না। হয়তো আজ আমি এমনিভাবেই মরব, দুনিয়ার মালিক খোদার এই বিধান!' তারপর হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বললে, 'গুপ্তধন, গুপ্তধন! এখনই যে-দেশে যাত্রা করব সেখানে গুপ্তধনের দরকার হয় না—এখানকার যা-কিছু সব আমি তোমাদেরই দান করলুম।'

মিনিট-কয় পরেই ফুয়াদ পাসার মৃত্যু হল।

হরিহর বললে, 'আর আপনারা দেরি করবেন না, আসুন দেখা যাক বেরুবার পথ আছে কোন দিকে। সিংহরা এদিকে আসতে পারে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না, সিংহরা সামনে পেয়েছে এখন বিপুল ভোজ, এদিকে আসবার জন্যে তাদের তাড়া নেই।'

—'তবু বলা তো যায় না। পথটা খুঁজে বার করলে ক্ষতি আছে কি?'

—'না, ক্ষতি নেই। এসো মানিক, হরিহরবাবু বড়োই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।'

হরিহর দুই ভুরু তুলে ও দুই চোখ পাকিয়ে বললে, 'বলেন কী মশাই, ব্যস্ত হব না? আজ যা দেখলুম আর যা শুনলুম, আমাতে কি আর আমি আছি বাবা?'

মানিক বললে, 'এখন যেন যাচ্ছি, আবার তো আমাদের এইখানেই ফিরে আসতে হবে?'

—'এই নাক মলচি, এই কান মলচি, গুপ্তধনের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার! চার-চারটে মানুষখেকো সিংহের গর্তে আবার আমি আসব? শর্মা সে ছেলে নয়, হুঁ!'

ফিরোজা-মুকুট রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছন্নছাড়া পথিক

জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে বললুম, "জয়ন্ত, পথ দিয়ে একটা পাগল যাচ্ছে। ওর আত্মীয়-স্বজন কি-রকম লোক জানি না, এমন মানুষকেও একলা পথে বেরুতে দেয়!"

জয়ন্ত উঠে এসে পিছন থেকে আমার কাঁধের উপরে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

বর্ষাকাল। উপর-উপরি কয়েকদিন ধরে প্রবল ধারাপাতের পর কাল থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনো মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে। হু-হু করে বইছে কন্‌কনে হাওয়া। রাজপথের উপরে পুরু কর্দমের প্রলেপ। দিনের বেলাতেই সাঁঝের ছায়ার ইঙ্গিত। যে কোন মুহূর্তে আবার বৃষ্টির পালা শুরু হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে রাজপথ জনশূন্য। দেখা যাচ্ছে কেবল পাগলের মত দেখতে একটিমাত্র মানুষকে।

লোকটির বয়স হবে বোধ হয় বছর পঞ্চাশ। হোমরা-চোমরা লম্বাচওড়া চেহারা, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনে জাগায় সম্ভ্রম। সাজপোষাকও জমকালো। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে তার চালচলন মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। সে বেগে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। থেকে থেকে দুই হাত ছুঁড়ছে এবং মুখভঙ্গি করছে।

আমি বললুম, "ব্যাপার কি বল দেখি? ও ঘন ঘন মুখ তুলে বাড়িগুলোর নম্বর দেখছে কেন?"

জয়ন্ত বললে, "আমার বিশ্বাস ও আমাদেরই বাড়ি খুঁজছে।"

—"আমাদের বাড়ি?"

—"হ্যাঁ। বোধ হয় ও কোন বিপদে পড়েছে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছে। ঐ দেখ, যা ভেবেছি তাই।"

মূর্তিটা আমাদের বাড়ির সামনে এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে খুব জোরে জোরে কড়ানাড়া দিতে লাগল।

আমাদের বেয়ারা মধু যখন তাকে উপরে নিয়ে এল, তখনও সে হাঁপাতে হাঁপাতে বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগল বটে, কিন্তু তার স্তম্ভিত চোখদুটির ভিতরে এমন মর্মভেদী যাতনা ও নিরাশার ভাব দেখলুম যে, আমরা আর হাসতে পারলুম না, মন ভরে উঠল সকরুণ সমবেদনায়।

খানিকক্ষণ সে কোন কথাই কইতে পারলে না, পাগলের মত দুই হাতে মাথার চুল ধরে টানাটানি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ দেওয়ালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এত জোরে মাথা ঠুকলে যে, আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলুম।

জয়ন্ত তাকে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে বসিয়ে, নিজেও তার পাশে আসন গ্রহণ করলে। তারপর শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললে, "আপনি আমাদের কাছে নিজের বিপদের কথা বলতে এসেছেন, তাই নয় কি? বেশ আগে একটু বিশ্রাম করুন, তারপর আমরা আপনার কথা শুনব।"

লোকটি প্রথমে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে বললে, "আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে পাগল বলে মনে করেছেন?"

জয়ন্ত বললে, "বিপদে পড়লে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আপনার বিপদটা কি, শুনতে পাই না?"

—"ভগবান জানেন আমার বিপদ কি ভয়ানক! বিনা মেঘে এমন বজ্রপাত কল্পনাতে আনা যায় না। আমার মানসম্ভ্রম সব যেতে বসেছে, তার উপরে সংসারেও দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত। ঘরে বাইরে আচম্‌কা দুর্ভাগ্যের আক্রমণে আমি যে সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাই নি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য! কেবল আমি নই মশাই, আমার দুর্ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে হবে আর একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তিকেও।"

জয়ন্ত বললে, "আপনার মনের কথা ধীরে-সুস্থে খুলে বলুন। দেখি, আপনার কোন উপায় করতে পারি কিনা!"

—"আমার নাম মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী। মহাজনী ব্যবসায়ে আমার কিছু নাম আছে।"

এ নাম দেশের কে না জানে? বিখ্যাত তাঁর ব্যাঙ্ক—দেশ-বিদেশে তার শাখা। তার চেয়ে বড় প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এদেশে আর নেই। মহিমবাবুর মত ধনকুবের এমন কি বিপদে পড়েছেন, যার জন্যে তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আমাদের কাছে ছুটে আসতে হয়েছে? আমাদের মন ভরে উঠল বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে।

এতক্ষণ পরে যথাসম্ভব প্রকৃতিস্থ হয়ে মহিমবাবু বললেন, "মশাই, আমার মামলা এখন পুলিসের হাতে গিয়েছে। পুলিস কি করবে না করবে জানি না, কিন্তু আপনার উপরে বিশ্বাস আমার অটল। পথের মাঝখানে আমার মোটরও আবার কল বিগড়ে বাদ সাধলে। তাই আমি পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি। এইবার শুনুন আমার বিপদের কথা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনী

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ব্যাঙ্ক কেবল টাকা জমা রাখে না, লেন-দেনের কারবারও চালায়। অনেক বড় বড় পরিবার আমাদের কাছে গহনা, মূল্যবান জিনিসপত্র বা জমি বন্ধক রাখেন, বিনিময়ে আমরাও টাকা ধার দিই।

কাল সকালে এমন এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, যাঁকে দেখে আমি অভাবিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। কেবল বাংলাদেশের নয়, গোটা ভারতবর্ষের লোক তাঁর নাম জানে। এমন কি য়ুরোপ-আমেরিকাতেও তাঁর নাম অপরিচিত নয়। তাঁর অন্য কোন পরিচয় আমি দিতে পারব না, কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, তিনি একজন মহামান্য মহারাজা।

আমার বাড়িতে তাঁর পদার্পণে আমি সম্মানিত হয়েছি—তাঁকে এই রকম কোন অভিনন্দন দিতে উদ্যত হলুম, কিন্তু তার আগেই তিনি একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলেন। বললেন, "মহিমবাবু, শুনেছি আপনারা টাকা ধার দেন?"

বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি ভালো সিকিউরিটি থাকে।"

—"আজকেই আমার ত্রিশ লক্ষ টাকার নিতান্ত দরকার। আমার কাছে অবশ্য এই টাকার পরিমাণ তুচ্ছ, আমি অনায়াসেই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এই টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু আমি কারুর কাছে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।"

—"কতদিনের জন্যে আপনি টাকা চান?"

—"এক হপ্তার জন্যে। এক সপ্তাহ পরে সমস্ত টাকা নিশ্চয়ই আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেব।"

—"কিন্তু আমি মহাজন। কিসের বিনিময়ে আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা দেব, সেটাও আমার জানা দরকার।"

—"নিশ্চয়ই, সেজন্যেও আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

মহারাজা সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি চৌকো মরক্কো কেশ। তিনি তার ডালা খুলে আমাকে দেখালেন।

ভিতরে নরম মখমলের বিছানায় বসানো আছে এক অপূর্ব ও বিচিত্র রত্নমুকুট। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি এবং তার উপরে আছে মস্ত মস্ত ফিকে-নীল চল্লিশখানা ফিরোজা। তার সোনার কাজও অসাধারণ। এই রত্নমুকুটের কথা আমিও শুনেছি, মহারাজের নামের মত তার খ্যাতিও ফেরে লোকের মুখে মুখে।

মহারাজা বললেন, "আমি যে টাকা চাই, তার চেয়ে মুকুটের দাম দুইগুণ বেশি। এইটেই আমি আপনার কাছে বন্ধক রাখতে চাই।"

মুকুট হাতে করে আমি বসে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

মহারাজা শুধোলেন, "এর মূল্য সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ আছে?"

—"বিন্দুমাত্র না। আমি ভাবছি—"

—"এমন অমূল্য জিনিস কেন আমি এখানে রেখে যেতে চাই? হ্যাঁ, আমিও রেখে যেতুম না, যদি এক সপ্তাহ পরে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি না থাকত। এখন আপনার মত কি?"

—"আমি রাজি।"

—"কিন্তু দেখবেন, একথা নিয়ে যেন বাজারে আলোচনা না হয়। খুব সাবধানে মুকুটটি রাখবেন। এটি আমার পৈতৃক সম্পত্তি। এই দুর্লভ জিনিস হারালে আমার রাজ্যে ঢিঢিকার পড়ে যাবে। এতে যে ফিরোজাগুলি আছে, তার মত আর একখানি পাথর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।"

সেইদিনই মহারাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু তারপরে পড়ে গেলুম দারুণ দুশ্চিন্তায়। বার বার মনে হতে লাগল, এত বড় ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে বড় ভালো কাজ করা হল না। এ লেন-দেনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না রাখাই উচিত ছিল। ফিরোজা-রত্নমুকুট যদি হারায়, তাহলে কেবল আমার সমস্ত সুনাম নষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে হবে আমার সর্বনাশও।

মুকুটটিকে আমার আপিসে রাখাও যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। ব্যাঙ্কে তো আজকাল আকচার চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, কেউ যদি সন্ধান পায়, আমার উপরেও শনির দৃষ্টি পড়তে কতক্ষণ? মুকুট সঙ্গে নিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এলুম এবং যতক্ষণ না আমার উপরের ঘরের আলমারির ভিতরে সেটি রেখে দিলুম, ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না।

জয়ন্তবাবু, এইবারে আগে আমার সংসারের কথা কিছু শুনুন।

আমার চাকর-বাকরেরা শোয় বাড়ির বাইরে। ভিতরে থাকে তিনজন দাসী, তারা পুরোনো লোক, সকল সন্দেহের অতীত। আর একটি নতুন দাসী এসেছে, নাম তার ননীবালা, বয়স অল্প। আজ মাসকয় কাজ করছে। কিন্তু তারও আচরণ ভালো।

আমার নিজের পরিবার বড় নয়। আমি বিপত্নীক। আমার একটিমাত্র ছেলে, নাম সুবিমল। বয়সে যুবক। তার জন্যেই আমার যত দুর্ভাবনা। সে হচ্ছে বিলাসী, চঞ্চলমতি, আমোদপ্রিয়, অমিতব্যয়ী। সে আমার কারবারের উপযোগী নয়, তার হাতে বেশি টাকা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তার স্বভাবের জন্যে

লোকে দায়ী করে আমাকেই। বলে, আমিই আদর দিয়ে দিয়ে তার মাথা খেয়েছি। হয়তো কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। একে সে আমার একমাত্র সন্তান, তার উপরে অল্পবয়সেই মাতৃহারা। তার মুখ ম্রিয়মাণ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

সুবিমলের বন্ধুরা সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিষ্কর্মা ছেলে। সেও তাদের মত আমোদপ্রমোদ করতে আর দুহাতে টাকা ওড়াতে চায়। তাদের এক ক্লাব আছে, সেখানে তাসের জুয়া চলে। ক্লাবে আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে সুবিমল যে কত টাকা নষ্ট করেছে তার কোন হিসাব নেই। আমি তাকে মোটা মাসোহারা দিই, তাতেও তার খরচ কুলোয় না। প্রতিমাসেই আমার কাছ থেকে সে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে।

মাঝে মাঝে তার সুবুদ্ধি হয়, ঐ সব বিপদ্‌জনক বন্ধুর সম্পর্ক ছাড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা তার সফল হয় না আর একজনের জন্যে। নাম তার কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ, আমরা কুমার বাহাদুর বলে ডাকি। সে রাজবংশের ছেলে, সুবিমলের চেয়ে বয়সে বড়। অনেক দেশে বেড়িয়েছে, অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছে, কথা কয় চমৎকার, দেখতেও পরমসুন্দর। সুবিমলের উপরে তার প্রবল প্রভাব, তার কথায় সে ওঠে বসে। কিন্তু তাঁর মতামত স্বাস্থ্যকর নয়, তার ভাবভঙ্গিও আমার ভালো লাগে না। সে আমার বাড়িতে যখন-তখন আসে। আমাদের অমলাও তাকে পছন্দ করে না। অমলার বয়স বেশি না হলেও লোকের চরিত্র বোঝে।

এইবারে অমলার পরিচয় দিই। সে আমার এক পরলোকগত বাল্যবন্ধুর মেয়ে, আমাদেরই স্বজাতি। তার বয়স যখন আট-নয় বৎসর, সেই সময়ে তার পিতা তাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় রেখে হঠাৎ মারা পড়েন। আমাকেই অমলার ভার গ্রহণ করতে হয়। সেই থেকেই এ বাড়িতে সে আমার নিজের মেয়ের মত লালিতপালিত হয়েছে। আমার এই অন্ধকার বাড়িকে সে আলো করে আছে সোনালী রোদের মত। একটি শান্ত, নম্র, স্নেহময়ী তরুণী, সে না থাকলে অচল হয়ে পড়ে আমার জীবন।

অমলা আমার সব কথা রাখে, কেবল একটি ছাড়া। সুবিমল দুই দুই বার তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, তাকে সে সত্যসত্যই ভালোবাসে। কিন্তু অমলা রাজি হয় নি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একমাত্র সেই-ই সুবিমলকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, একমাত্র অমলাই পারে জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। কিন্তু এখন আমার সকল আশা বিফল হয়েছে—আর তা হবার নয়, হবার নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবুর কাহিনীর জের

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সুবিমল ও অমলার সঙ্গে গল্প করছিলুম। তাদের ফিরোজা-মুকুটের কথা বললুম। পানের ডিবে দিয়ে যাবার জন্যে সেই সময়ে ননীবালা একবার ঘরের ভিতরে এসেছিল।

সুবিমল ও অমলা দুইজনেই মুকুটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু আমি রাজি হলুম না।

সুবিমল শুধোলে, "মুকুটটা তুমি কোথায় রেখেছ?"

—"আমার শোবার ঘরের আলমারিতে।"

—"ভগবান করুন আজ রাত্রে বাড়িতে যেন চোর না আসে।"

—"আলমারি চাবি-বন্ধ।"

—"যে কোন পুরনো চাবি দিয়ে ও-আলমারি খোলা যায়। ছেলেবেলায় আমি নিজেই খুলেছি।"

—"কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকব আমি।"

—"হ্যাঁ, ঘুমিয়ে।"

শয়ন করবার জন্যে উপরে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে এল সুবিমল। মুখ তার গম্ভীর। আমার শোবার ঘরে ঢুকে বললে, "বাবা, আমাকে দু হাজার টাকা দিতে পারবে?"

আমি বললুম, "অসম্ভব। তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছে।"

—"জানি বাবা, এজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু দু হাজার টাকা আমার নিতান্তই দরকার। টাকা না পেলে ক্লাবে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।"

—"তোমার পক্ষে সেটা হবে শাপে বর।"

—"কিন্তু সবাই বলবে আমি জুয়াচোর। সে অপমান আমি সইতে পারব না। যেমন করে পারি এ ঋণ আমাকে শোধ করতেই হবে।"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "এই মাসেই আরো দুই বার তুমি আমার কাছ থেকে উপরি টাকা আদায় করেছ। আমার কাছ থেকে আর একটা কানাকড়িরও প্রত্যাশা কোরো না।"

সে আর কিছু বললে না, মাথা হেঁট করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সে রাত্রে আমি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলুম। নীচেকার সব দরজা

ভালো করে বন্ধ কিনা দেখবার জন্যে আবার একতালায় নামলুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখি, অমলা ওদিককার একটা দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

সে বললে, "কাকাবাবু, আপনি কি আজ রাত্রে ননীবালাকে বাইরে যাবার ছুটি দিয়েছিলেন?"

বললুম, "না।"

—"এইমাত্র সে বাইরে থেকে ফিরে এল। এ সব ভালো কথা নয়।"

—"বেশ, কাল সকালে আমি নিজেই তাকে সাবধান করে দেব। বাড়ির সব দরজা বন্ধ আছে তো?"

—"হ্যাঁ কাকাবাবু।"

আমার ঘুম খুব গাঢ় হয় না। বিশেষত কাল রাত্রে আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল বলে ভালো করে ঘুম হয় নি। গভীর রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে আমি জেগে উঠলুম। কান পেতে শুনতে লাগলুম। মনে হল, বাড়ির কোথায় কে যেন একটা দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর সভয়ে শুনলুম, পাশের ঘরে কে যেন সন্তর্পণে পা ফেলে চলে বেড়াচ্ছে। এইখানে বলে রাখা উচিত, ঘুমোবার আগে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার অভ্যাস আমার ছিল না।

তখনি খাট থেকে নেমে পড়লুম। দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করে দেখলুম, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবিমল, তার গায়ে গেঞ্জী, পায়ে জুতো নেই, আর হাতে রয়েছে সেই ফিরোজা-মুকুট। সে মুকুটটা সজোরে মুচড়ে বা নুইয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এক লাফে পাশের ঘরে গিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "সুবিমল! চোর, দুরাত্মা!"

আমার চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠল, তার হাত থেকে খসে মুকুটটা মাটির উপরে পড়ে গেল সশব্দে। তাড়াতাড়ি আমি সেটাকে তুলে নিয়ে দেখলুম, তিন খণ্ড ফিরোজা অদৃশ্য—তার একটা প্রান্ত ভাঙা।

বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুবিমল। আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "বদমাইস, তুই এটা ভেঙে ফেলেছিস্! আমার মানসম্ভ্রম ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছিস্! কোথায় গেল আর তিনখানা পাথর?"

সে বললে, "চুরি গেছে।"

তাকে ধাক্কা মেরে বললুম, "চুরি করেছিস্ তুই!"

—"না।"

—"তুই কেবল চোর নোস্, মিথ্যাবাদীও! আমি স্বচক্ষে দেখলুম আরো পাথর চুরি করবার জন্যে তুই মুকুটটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিস্!"

সে বললে, "বাবা, তুমি আমাকে যথেষ্ট গালাগাল দিয়েছ। এর পরে এ বিষয় নিয়ে আমি আর কোন কথাই বলব না। কাল সকালেই আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নিজের পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব।"

—"হ্যাঁ, কাল সকালে তোকে এ বাড়ি থেকে যেতে হবে বটে, কিন্তু যেতে হবে পুলিসের সঙ্গে।"

এইবারে ক্রোধারক্ত মুখে সে বললে, "উত্তম। তবে তাই হোক।"

ইতিমধ্যে আমার চীৎকার শুনে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। সর্বপ্রথমে সেখানে ছুটে এল অমলা। সুবিমলের মুখ ও আমার হাতের মুকুট দেখে তার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না, একটা আর্তনাদ করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সকালে পুলিস এল। সুবিমল বললে, "বাবা, তাহলে তুমি আমাকেই চোর সাব্যস্ত করলে?

—"তা ছাড়া আর উপায় নেই। আমি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।"

—"তাহলে অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে একবার বাড়ির বাইরে যেতে দাও।"

—"বুঝেছি, তুমি সরে পড়তে চাও? তা হয় না। কেবল এক শর্তে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। পাথর তিন খানা যদি ফিরিয়ে দাও।"

সে বলতে বলতে চলে গেল, "তোমার ক্ষমা যে চায়, তাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমি ক্ষমাপ্রার্থী নই।"

সুবিমলকে আমি পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছি। পুলিস কিন্তু তার কাপড়-চোপড় খুঁজেও এবং সারা বাড়ি খানাতল্লাস করেও পাথর তিনখানা উদ্ধার করতে পারে নি। সুবিমলও স্বীকার করে নি কোন কথা, একেবারেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

এই আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ভগবান, আমি এখন কি করব? এক রাত্রেই আমি আমার সম্মান, আমার বন্ধকী রত্ন, আমার সন্তানকে হারালুম। আমি এখন কি করব?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমলা দেবী

জয়ন্ত খানিকক্ষণ বসে রইল স্তব্ধভাবে। তারপর শুধোলে, "মহিমবাবু, আপনার বাড়িতে কি বেশি লোকের আনাগোনা আছে?"

—"মাঝে মাঝে দু-একজন আত্মীয়-কুটুম্ব খবরাখবর নিতে আসেন। বাইরের লোকের মধ্যে নিয়মিত আনাগোনা করেন কুমার বাহাদুর।"

—"আপনি কি সামাজিকতা রক্ষার জন্যে নানা জায়গায় আসা-যাওয়া করেন?"

—"সুবিমল করে। আমি আর অমলা বাড়িতেই থাকি। সামাজিকতার জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নেই।"

—"এ রকম তরুণীর কথা কম শোনা যায়। আপনার কথা শুনে বোঝা যায়, মুকুটের ব্যাপারের জন্যে অমলা দেবী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার চেয়েও।"

—"সুবিমলবাবু যে অপরাধী সে বিষয়ে আপনাদের কোন সন্দেহ নেই?"

—"কি করে থাকবে? আমি যে নিজের চোখে দেখছি!"

—"যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, সে সম্বন্ধে পুলিসের মত কি?"

—"তাদের মতে সুবিমল ঘর থেকে বেরিয়ে দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।"

—"বাজে কথা। চোর কখনো পাড়া জাগিয়ে চুরি করে না। শব্দ হয়েছে অন্য কারণে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

—"কারণটা কি?"

—"আমি তা জানি না। মহিমবাবু, মামলাটা আপনি সহজ মনে করছেন, কিন্তু আমার মতে এটা হচ্ছে জটিল মামলা। আপনি অনুমান করেছেন, আপনার ছেলে নিজের ঘরের দরজা সশব্দে ভেজিয়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। তাহলে তিনি মুকুটটা কখন চুরি করলেন? আর এই অল্প সময়ের মধ্যে পাথর তিনখানা লুকিয়েই বা রাখলেন কোথায়? না মহিমবাবু, এই ঘটনার মধ্যে আছে অজানা কোন রহস্য।"

—"কি রহস্য?"

—"সেইটেই এখন আবিষ্কার করতে হবে। আপাতত আপনার ঠিকানা রেখে আপনি বাড়ি ফিরে যান। একটু পরেই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হব।"

★ ★ ★

বড় রাস্তা থেকে একটু তফাতে মহিমবাবুর মস্ত বাড়ি। সামনে খানিকটা খোলা জমি। ডানদিকে একটি ছোট কাঁচা রাস্তা। বাড়ির দুটো ফটক—একটি বড়, একটি ছোট। বড় ফটকটি বাড়ির সামনের দিকে এবং দ্বিতীয়টিকে বলা চলে খিড়কির ফটক, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে ব্যবহার করতে হয় কাঁচা রাস্তাটি।

বড় ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন স্বয়ং মহিমবাবু।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, তুমি খানিকক্ষণ মহিমবাবুর সঙ্গে আলাপ কর, আমি আগে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসি।"

মহিমবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন, কথাবার্তা বড় একটা হল না।

মিনিট কয়েক পরেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন একটি তরুণী। সুদর্শনা, সুগঠনা, কিন্তু তাঁর চোখের ভাব আর্ত, মুখ একেবারে পাণ্ডুর। দেহখানি দেখলেও বোধ হয়, দুঃখের ভার সইতে না পেরে এখনি তা ভেঙে পড়বে। আন্দাজে বুঝলুম, ইনিই হচ্ছেন অমলা দেবী।

অমলা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, একেবারে মহিমবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন, "কাকাবাবু, সুবিমলদাকে তুমি ছেড়ে দিতে বলেছ তো?"

মহিমবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না মা, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখলে চলবে না।"

—"না কাকাবাবু। আমি বলছি তিনি নির্দোষ।"

—"তাহলে অপরাধী কে?"

—"আমি জানি না। কিন্তু সুবিমলদা পুলিসের হাতে, এ কথা যে কল্পনা করা যায় না কাকাবাবু!"

—"সুবিমলকে তুমি ভালোবাসো, তাই আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। কেবল পুলিস নয়, আমি আর এক ভদ্রলোককেও মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিয়ে এসেছি।"

আমার দিকে ফিরে অমলা শুধোলেন, "এই ভদ্রলোক?"

—"না, ওঁর বন্ধু। আমি তাঁকে কাঁচা রাস্তার ভিতরে ঢুকতে দেখেছি।

ভুরু কুঁচকে অমলা বললেন, "কাঁচা রাস্তায়? সেখানে পাবার কি আছে?...... ঐ যে, আর এক ভদ্রলোক আসছেন। কাকাবাবু, উনিই কি তিনি?"

—"হ্যাঁ মা।"

জয়ন্ত ঘরে ঢুকে পাপোঁছের উপরে পা ঘষে জুতোর কাদা তুলে ফেলতে লাগল।

অমলা তার কাছে গিয়ে বললেন, "আমার সুবিমলদা নিশ্চয়ই এ কাজ করেন নি, কি বলেন?"

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "আপনার কথা সত্য হলে সুখী হব। আপনিই বুঝি অমলা দেবী? আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করব?"

—"নিশ্চয়ই!"

—"গেল রাত্রে আপনি কোন শব্দ শোনেন নি?"

—"কিছু না। কাকাবাবুর গলা শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম।'

—"কাল রাত্রে বাড়ির সব দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"আজ সকালেও কোন দরজা খোলা ছিল না?"

—"না।"

—"আপনাদের নতুন দাসী রাত্রে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ। কাকাবাবু আমাদের কাছে যখন মুকুটের কথা বলছিলেন, তখন সে ঘরের ভিতরে পানের ডিবে দিতে এসেছিল।

—"তাহলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে, ননীবালা মুকুটের খবর বাইরের আর কারুকে দিতে গিয়েছিল?"

মহিমবাবু অধীর স্বরে বলে উঠলেন, "এ সব প্রশ্নের মানে হয় না। আমি নিজে দেখেছি মুকুট ছিল সুবিমলের হাতে।"

—"একটু অপেক্ষা করুন মহিমবাবু। ও সব কথা পরে হবে। অমলা দেবী, আপনি ননীবালাকে খিড়কির ফটক দিয়ে ফিরে আসতে দেখেছেন?"

—"হ্যাঁ। ফটকের বাইরে ছায়ার মত একটা লোককেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।"

—"সে কে হতে পারে?"

—"এ পাড়ার মুদীর ছেলে। নাম কাঙালীচরণ। ননীবালাকে বিয়ে করতে চায়।"

—"সে বোধহয় ফটকের বাঁ পাশে দাঁড়িয়েছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"তার একটা পা কাঠের?"

অমলার মুখে ফুটে উঠল ভয় ও বিস্ময়। সে বললে, "কি আশ্চর্য, আপনি কি মায়াবী? এ কথা কেমন করে জানলেন?"

অমলাকে কোন উত্তর না দিয়ে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "মহিমবাবু, এইবারে আমি আপনার শোবার ঘরটা দেখতে চাই। না, না, আর একটা কথা। এই বৈঠকখানায় দেখছি তিনটে দরজা রয়েছে। যে দরজা দিয়ে আমি ঢুকলুম, ওটা দিয়ে বাইরের লোক এখানে আসে। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?"

—"বাড়ির ভিতর-মহলে।"

—"আর ঐ দরজাটা?"

—"ওটা দিয়ে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে খিড়কির ফটকের দিকে যাওয়া যায়।"

জয়ন্ত সেইদিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে আতশী কাঁচ বার করে দরজার চৌকাঠের তলাটা অল্পক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, "এইবার উপরে চলুন।"

মহিমবাবুর শয়নগৃহটি মাঝারি। একখানি খাট, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি আলমারি ও খানদুই চেয়ার ছাড়া সেখানে আর কোন আসবাব নেই।

জয়ন্ত বললে, "মুকুট আছে ঐ আলমারিতে?"

—"হ্যাঁ।"

মহিমবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে জয়ন্ত বললে, "খোলবার সময়ে কোন শব্দ হয় না। এইজন্যেই আপনার ঘুম ভাঙে নি।"

জয়ন্ত মরক্কো কেসের ভিতর থেকে মুকুটটি বার করে বিছানার উপরে স্থাপন করলে। সে এক অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য, তার দিকে তাকালেও চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। কেবল অপূর্ব ফিরোজাগুলিই দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে না, যে স্বর্ণকার এই মুকুটটি গড়েছে নিশ্চয়ই সে একজন উঁচুদরের শিল্পী।

জয়ন্ত বললে, "মহিমবাবু, মুকুটের এই প্রান্তটা একটুখানি ভেঙে গেছে। আপনি আরো একটু ভেঙে ফেলতে পারেন?"

আতঙ্কে শিউরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, "সর্বনাশ, বলেন কি মশাই? সে আমি প্রাণ থাকতেও পারব না।"

—"বেশ, আপনি না পারেন, আমি পারি কিনা দেখা যাক্" বলেই সে মুকুটটা তুলে নিয়ে দুই হাত দিয়ে তার আর একটা প্রান্ত ভাঙবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, "লোকে বলে আমি নাকি মহা বলবান ব্যক্তি। মুকুটের এই প্রান্তটা আমি একটু দুমড়োতে পেরেছি, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলে ভেঙে ফেলতেও পারি। কিন্তু কোন একজন সাধারণ মানুষের সে ক্ষমতা হবে না। আর এক কথা। মুকুটটা এইভাবে এখনি যদি ভেঙে ফেলা যায়, তাহলে ঠিক পিস্তল ছোঁড়ার মত একটা আওয়াজ হবে। মহিমবাবু, পাশের ঘরে আপনি সুবিমলবাবুকে মুকুট নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে দেখেছেন, অথচ এ-রকম কোন আওয়াজ শোনেন নি, এ বড় আশ্চর্য কথা!"

মহিমবাবু বললেন, "কি জানি মশাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"আপনারা এখানে বসুন। এখন আমি একলা আর একবার বাড়ির বাইরে যেতে চাই।" এই বলে জয়ন্ত প্রস্থান করলে।

এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বললে, "মহিমবাবু, এখানে যা যা দেখবার সব আমি দেখে নিয়েছি। এইবারে বাড়ি ফিরতে চাই।"

—"কিন্তু আমার রত্ন তিনখানা কোথায়?"

—"তা আমি বলতে পারব না।"

হাত কচলাতে কচলাতে মহিমবাবু বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, আমার ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগবে না।"

অমলা কাকুতি ভরা কণ্ঠে বললে, "আমার সুবিমলদাকে রক্ষা করুন।"

—"রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি নই। মহিমবাবু, আমি পেশাদার গোয়েন্দা নই, কাজ করি সখের খাতিরে। কিন্তু আমি পারিশ্রমিক নেব না বটে, তবে চোরাই পাথর তিনখানা ফিরে পেতে হলে আপনাকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে।"

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ! তাহলে সেগুলো ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে? বলুন, বলুন, আমাকে কত টাকা দিতে হবে?"

—"আন্দাজে তাও আজ বলতে পারছি না। কাল সকালে দশটার সময়ে দয়া করে একবার আমার বাড়িতে যাবেন। আশা করি সেই সময়ে আপনাকে আলোকিত করতে পারব। এস মাণিক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবঘুরে

বেশ বুঝলুম, জয়ন্ত একটা কিছু সাব্যস্ত করে ফেলেছে। আমি কিন্তু এখনো অন্ধের মত গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। বাড়িতে ফেরবার মুখে জয়ন্তকে বারকয়েক জাগ্রত করবার চেষ্টা করে দেখলুম, যদি সে পথ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সে শিলামূর্তির মত মৌন।

বাড়িতে এসে জয়ন্ত নিজের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে সে যখন আবার বেরিয়ে এল তখন একেবারে বদলে গেছে তার চেহারা। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, রুক্ষ; বাঁ গালে একটা আব; কানে গোঁজা একটা বিড়ি; গায়ে আধময়লা মেরজাই; পরনে রঙীন ছিটের লুঙ্গি; পায়ে বাটা কোম্পানির ছেঁড়া ও কাদামাখা রবারের জুতো। পয়লা নম্বরের ভবঘুরের মূর্তি! অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এই রকম লোকের মুখে কি রকম গান

মানায় বল তো? এ গানটা কি চলবে?" বলেই গুন্‌গুন্‌ করে প্রথম দুই লাইন গাইলে—

"ও আমার, কমলালেবু প্রাণ!
সিলেটেতে জন্ম তোমার,
বেলেঘাটায় স্থান।"

শুধোলুম, "এই বেশে কোথায় যাচ্ছ হে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"ভবঘুরেরা যেখানে যায়। রাস্তায়। মধু, ও মধুসূদন!" ডাক শুনে মধুর আবির্ভাব।

—"সারাদিনটাই হয়তো পথে পথে টো টো করে ঘুরে মরতে হবে, কিন্তু উদরদেশ তো ততক্ষণ শূন্য থাকতে রাজি হবে না। চটপট খান-কয় শসার আর চিকেন স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে কাগজে মুড়ে দিয়ে যাও।"

জয়ন্ত বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল বেলা পাঁচটার সময়ে —হাতে তার ঝুলছে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা একজোড়া পুরানো লপেটা জুতো। মুখ তার হাসিখুসি।

আমি তখন চা পান করতে বসেছি। জয়ন্তও আমার সঙ্গে যোগ দিলে। বললে, "আবার বেরিয়ে পড়বার জন্যে এখানে এসেছি। এক পেয়ালা চা খেয়েই উঠব।"

—"আবার যাবে কোথায়?"

—"বালীগঞ্জের এখানে সেখানে। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। ফিরতে রাত হতে পারে।"

—"খবর আশাপ্রদ তো?"

—"মন্দ নয়, মন্দ নয়। অভিযোগ করবার কিছুই নেই। দুপুরে মহিমবাবুদের পাড়াতেও গিয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকি নি। ভারি মনের মত মামলা হে, কাজ করে খুশি আছি। কিন্তু যাক্‌, এখন আমার গালগল্প করবার সময় নেই। এখনি আবার সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রবেশ করবার জন্যে বেশ পরিবর্তন করতে হবে।"

জয়ন্তের হাসিমুখ, নৃত্যশীল চোখ ও স্ফূর্তিভরা হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল, মামলাটার সুরাহা হতে আর দেরি নেই। সে স্নান করে জামাকাপড় বদলে আবার বেরিয়ে গেল ভদ্রবেশে। তারপর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তার কোন সাড়া পেলুম না, তখন আমি শয়ন করতে গেলুম। এমনি তার স্বভাব, কখনো কখনো সে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকে, সুতরাং তার জন্যে আমার কোনই দুর্ভাবনা হল না।

কত রাত্রে সে ফিরে এসেছে জানি না, কিন্তু সকালবেলায় চায়ের আসরে এসে দেখি, টেবিলের সামনে পেয়ালা হাতে করে বসে রয়েছে জয়ন্ত, একেবারে ফিটফাট, তাজা চেহারা।

জয়ন্ত বললে, "এইবারে খবরের কাগজ পড়ে শোনাও।"

কাগজ পড়তে পড়তে বাজল বেলা দশটা।

জয়ন্ত বললে, "মহিমবাবুর আসবার সময় হয়েছে।"

বললুম, "সদর দরজার সামনে একখানা মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল।"

অবিলম্বে মহিমবাবুর প্রবেশ। এক রাত্রেই তাঁর মূর্তির পরিবর্তন দেখে আমি চমকিত হলুম। তাঁর মাথার চুলে যেন আরও বেশি পাক ধরেছে; চোখ, গাল বসা বসা, দেহ একেবারে যেন ভেঙে পড়তে চায়। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলুম, অতি পরিশ্রান্তের মত তিনি ধপাস্ করে বসে পড়লেন।

থেমে থেমে ভগ্নস্বরে তিনি বললেন, "কি পাপ করেছি যে এত দায়ে ঠেকছি? দুদিন আগেও আমার সুখের সীমা ছিল না, আর আজ আমি দুনিয়ায় একা, আমার সম্মান পর্যন্ত নেই। এক দুর্ভাগ্যের পর আসছে আর এক দুর্ভাগ্য। জানেন জয়ন্তবাবু, অমলা আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে!"

—"চলে গিয়েছে?"

—"হ্যাঁ। আজ সকালে উঠে দেখি, ঘর তার খালি, বিছানাতেও সে শোয় নি। টেবিলের উপরে রয়েছে তার হাতে লেখা একখানা চিঠি। কাল রাত্রে তাকে বলেছিলুম, সে যদি আমার ছেলেকে বিবাহ করত, তাহলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। এ কথা রাগ করে বলি নি, মনের দুঃখে বলেছিলুম। হয়তো বলা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কথাটা তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে। কারণ চিঠিতে সে লিখেছে : 'পূজনীয় কাকাবাবু, আমার মনে হচ্ছে, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী, আপনাদের কথা শুনলে কারুকে আজ দুর্বহ দুর্ভাগ্যের ভার সামলাতে হত না। এর পরেও কোন্ মুখ নিয়ে আর আপনাদের আশ্রয়ে বাস করি? তাই চিরদিনের জন্যে আমি বিদায় গ্রহণ করলুম। আমার ভবিষ্যতের জন্যে ভাববেন না, কারণ সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর এক নিবেদন। আমার জন্যে খোঁজাখুঁজি করবেন না, কেন না সেটা হবে ব্যর্থ। কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমাকে একান্ত আপনারই বলে জানবেন। ইতি প্রণতা অমলা।" এ চিঠির অর্থ কি জয়ন্তবাবু? অমলা কি আত্মহত্যে করতে চায়?"

—"না, না মহিমবাবু, অমলাদেবী মোটেই আত্মহত্যা করবেন না। সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, আপনার বিপদের মেঘ এইবারে কেটে যাবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অসম্ভব কথা

জয়ন্তের কথা শুনেই মহিমবাবু চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "বিপদের মেঘ কেটে যাবে? আপনি নিশ্চয়ই সব জানতে পেরেছেন? কোথায় মুকুটের সেই ভাঙা অংশ?"

—"তার জন্যে আপনি কত টাকা ব্যয় করতে পারেন?"

—"আগে মান, তারপর টাকা! তার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারি।"

—"অতটা বেশি অগ্রসর হবার দরকার নেই মহিমবাবু। প্রত্যেকখানা পাথরের জন্য দশ হাজার টাকা দিলেই চলবে।"

—"দশ হাজার কেন, আমি বিশ হাজার করে টাকা দিতে প্রস্তুত।"

—"বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। আপনার কাছে কলম আর চেক বই আছে? বেশ, তিনখানা পাথরের জন্যে দিন ত্রিশ হাজার টাকা।"

হতভম্বের মত মহিমবাবু কথামত কাজ করলেন। জয়ন্ত দেরাজ খুলে বার করলে একখানা তিনকোণা সোনার উপরে বসানো তিনখানি ফিরোজা।

বিপুল উল্লাসে চীৎকার করে দুই হাতে জিনিসটাকে চেপে ধরে মহিমবাবু বলে উঠলেন, "হারানিধি আপনি খুঁজে পেয়েছেন! আমি বেঁচে গেলুম! আমি বেঁচে গেলুম!"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "আপনার আরো কিছু কর্তব্য আছে?"

—"আরো কিছু কর্তব্য? বুঝেছি, আপনি পুরস্কার চান।" পকেট থেকে চেক বই ও কলম বার করে মহিমবাবু বললেন, "বলুন কত হাজার টাকা চান? আপনি যা চান তাই দেব!"

—"এক টাকাও চাই না।"

—"তবে কি কর্তব্যের কথা বলছেন?"

—"আপনার কর্তব্য হচ্ছে, সুবিমলবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।"

—"আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব! কেন?"

—"সুবিমলবাবুর মত পুত্র যে কোন পিতার মুখোজ্জ্বল করতে পারে।"

—"আপনি কি বলছেন!"

—"ঠিক কথাই বলছি।"

—"তবে কি—তবে কি পাথর তিনখানা সে চুরি করে নি?"

—"না, তিনি নিরপরাধ।"

—"বলেন কি! এ বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?"

—"একেবারে নিশ্চিত।"

—"তাহালে এখনি আমি থানায় গিয়ে এ সুসংবাদটা তাকে দিয়ে আসছি।"

—"এ সংবাদ তাঁর জানতে বাকি নেই। কাল আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি যখন কিছুতেই আসল ব্যাপার ভাঙতে রাজি হলেন না, তখন আমি যা অনুমান করেছিলুম, সেটা তাঁকে খুলে বললুম। তারপর তাঁকে স্বীকার করতে হল যে, আমার অনুমানই সত্য।"

—"সবই যে অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে! ভগবানের দোহাই, সব কথা খুলে বলুন!"

—"হ্যাঁ, বলব বৈকি! পায়ে পায়ে কেমন করে আমি অগ্রসর হয়েছি, তাও আপনাকে বলব। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শুনুন। এই চুরির সঙ্গে অমলা দেবী আর কুমার বাহাদুরের যোগাযোগ আছে।"

—"অমন কথা মুখেও আনবেন না। আমার অমলা? অসম্ভব!"

—"দুঃখের বিষয়, অসম্ভবই হয়েছে সম্ভবপর। এই কুমার বাহাদুর হচ্ছে এক নিঃস্ব বড় ঘরের ছেলে, সর্বহারা জুয়াড়ী, তার না আছে হৃদয়, না আছে বিবেকবুদ্ধি। তার চরিত্র যে কতখানি জঘন্য, আপনি বা সুবিমলবাবু কেউই তা জানেন না। অমলা দেবী তো সংসারে অনভিজ্ঞ তরুণী, তিনি তার স্বরূপ বুঝবেন কেমন করে? তিনি তার সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন তার প্রত্যেকটি মিথ্যাকথা। সে নিশ্চয়ই তাঁকে বিবাহ করবে বলে অঙ্গীকার করেছিল। দুজনের মধ্যে দেখাশোনা হত প্রায় প্রত্যহই।"

মহিমবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "এ সব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারব না, পারব না, পারবা না!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়ন্তের কথা

শুনুন মহিমবাবু। আমি মামলাটাকে যে ভাবে খাড়া করেছি তার মধ্যে যে ভুলচুক কিছু নেই, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। খানিক খানিক অস্পষ্টতা থাকবেই। অমলা দেবীকে পেলে সে অস্পষ্টতা দূর করা যেত, কিন্তু তিনি এখন যবনিকার অন্তরালে।

ঘটনার দিন রাত্রে আপনি নীচেয় নেমে দেখেছিলেন, খিড়কির ফটকের

দিকে যাবার জন্যে বৈঠকখানায় যে দরজাটা আছে, অমলা সেটা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আসলে বাইরে সেখানে ছিল কুমার বাহাদুর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা কইছিলেন অমলা। তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিশ্চয়ই তাকে বলেছিলেন ফিরোজা-মুকুটের কথা। শুনেই কুমার বাহাদুরের মনে জাগ্রত হয় দুর্দান্ত লোভ। সে ঠিক কি প্রস্তাব করে, বলতে পারব না। খুব সম্ভব মুকুটটা সে খালি একবার দেখতে চেয়েছিল। অমলা যে আপনাকে ভালোবাসেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমটা নিশ্চয়ই তিনি এই বিপদ্‌জনক প্রস্তাবে রাজি হন নি। কিন্তু কুমার বাহাদুর শেষটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে, মুকুটটা কেবল একবার চোখে দেখলে কারুর কোন ক্ষতিই হবে না। সে মুকুটটা দেখবার জন্যে গভীর রাত্রে আবার সেখানে আসবে। জেদাজেদিতে পড়ে অমলাকে শেষটা সম্মতি দিতে হয়।

ঠিক সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব। অমলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দেন। আপনার কাছে ননীবালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সে অভিযোগ মিথ্যা নয়।

টাকার জন্যে আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করে সে রাত্রে সুবিমলবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে ক্লাবের দেনার জন্যেও তাঁর মনে ছিল দুশ্চিন্তা। তাঁর ঘুম হয় নি, মধ্য রাত্রেও জেগে ছিলেন। হঠাৎ ঘরের বাইরে শুনতে পান কার অস্পষ্ট পায়ের শব্দ। কৌতূহলী হয়ে উঠে দরজা একটু ফাঁক করে সবিস্ময়ে দেখতে পান, অমলা চোরের মত সন্তর্পণে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাত্রেও সেখানে আলো জ্বালা থাকে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে সুবিমলবাবু নিজের ঘরের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং একটু পরেই স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, আপনার ঘর থেকে অমলা আবার বেরিয়ে আসছেন—হাতে তাঁর ফিরোজা-মুকুট!

অমলা নীচেয় নেমে গেলেন, পিছনে পিছনে নামলেন আতঙ্কগ্রস্ত সুবিমল-বাবুও। বৈঠকখানার দরজার কাছে পর্দার আড়াল থেকে দেখা গেল, খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজাটা খুলে অমলা মুকুটটা সমর্পণ করলেন বাইরের কোন লোকের হাতে। সে মুকুটটা হস্তগত করেই সরে পড়ল। এর জন্যে অমলা প্রস্তুত ছিলেন না, ভয় পেয়ে উপরে পালিয়ে এলেন।

অমলাকে ভালোবাসেন সুবিমলবাবু। তাকে বিবাহ করতে চান। পাছে অমলার নামে কলঙ্ক রটে, সেই ভয়ে এতক্ষণ তিনি কোন গোলমাল করতে পারেন নি। কিন্তু এখন তাঁর হুঁশ হল, মুকুটটা যদি খোয়া যায়, তাহলে তাঁর পিতার কত বড় বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তখনি পাগলের মত ছুটে ওদিককার দরজা খুলে ফেলে

বাইরে গিয়ে পড়লেন। তারপর খিড়কির ফটক থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলেন।

চোর তখনও বেশি দূরে যেতে পারে নি। গ্যাসের আলোতে সুবিমলবাবু তাকে চিনতে পারলেন। তারপর মুকুট নিয়ে টানা-হ্যাচড়া আরম্ভ হল—একদিকে সুবিমলবাবু আর একদিকে কুমার বাহাদুর। টানাটানি করতে করতে সুবিমলবাবু প্রচণ্ড এক ঘুসি মারেন কুমার বাহাদুরকে—তার চোখের উপরটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। মুকুটটা অত্যন্ত কঠিন, একজনের সাধারণ শক্তি তাকে ভাঙতে পারে না, কিন্তু দুইজনের সম্মিলিত শক্তিতে হঠাৎ সেটা ভেঙে গেল।

মুকুটটা নিয়ে ফিরে এলেন সুবিমলবাবু। সে সময়ে তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, ওদিককার দরজাটা জোরে বন্ধ করে দেন আর সেই শব্দে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হয়। শোবার ঘরের কাছে এসে সুবিমলবাবু মুকুটটা দুমড়ে গেছে দেখে যখন আবার সেটা টেনে সোজা করবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই সময়ে হয় আপনার আবির্ভাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নের ইতিহাস

মহিমবাবু বিস্ফারিত নেত্রে বললে, "এও কি সম্ভব?"

জয়ন্ত বললে, "যখন তাঁর প্রাপ্য সাধুবাদ, তখন সুবিমলবাবুকে দিলেন আপনি গালাগালি আর চোর বদনাম। তাঁর রাগ আর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তার উপরে তিনি যাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সেই অমলাকে না জড়িয়ে তাঁর পক্ষে কোন কথা বলা ছিল অসম্ভব। এই জন্যেই তিনি করেছিলেন মৌনাবলম্বন। যেমন করে হোক অমলাকে তিনি কুৎসিত কলঙ্কর কালিমা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।"

মহিমবাবু বললেন, "ও, বুঝেছি। তার সব কথা ফাঁস হয়ে গেছে ভেবে মুকুট দেখেই অমলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কি নির্বোধ আমি! ধরা পড়বার পর সুবিমল পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল কেন, তাও বুঝতে পারছি। তিনখানা পাথর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সে চেয়েছিল সেগুলো খুঁজে আনতে। তখন তাকে অবিশ্বাস করে আমি কি অবিচারই করেছি!"

জয়ন্ত বলতে লাগল, "এত সহজে মামলাটার রহস্য ভেদ করতে পারলুম কেন জানেন? মেঘ আর বৃষ্টির জন্যে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায়

পাতা কাদার আস্তরণ। তারপর পরশু থেকে বৃষ্টি থেমেছে বটে কিন্তু কাল পর্যন্ত আকাশ ছিল মেঘে আচ্ছন্ন। রোদ ওঠে নি বলে রাস্তার কাদা শুকোয় নি। মানুষের পদচিহ্নগুলো আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তার উপরে লিখে রেখেছিল বিচিত্র ইতিহাস।

কাল সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি সর্বাগ্রে সেই ইতিহাস পাঠ করবার চেষ্টা করেছি। কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে বেশি লোকচলাচল নেই। বৃষ্টির ধারায় আগেকার সব পদচিহ্নই ধুয়েমুছে গিয়েছে। সুতরাং ঘটনার রাত্রে ওখানে কারা চলাফেরা করেছিল, সেটা জানতে কিছুই বেগ পেতে হল না।

প্রথমেই দেখলুম, খিড়কীর ফটকের সামনে রয়েছে ছোট ছোট খালি পায়ের দাগ, কোন বালক বা নারী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনেই পেলুম একখানা পা ও একটা গোল দাগ—কোন একঠেঙো লোক কাঠের পা পরে সেখানে এসেছিল। পরে জানা গেল, আপনাদের দাসী ননীবালা তার একঠেঙো হবু-বরের সঙ্গে সেইখানে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ করেছিল।

তারপর দেখলুম, কোন মানুষের দুই সার সৌখীন জুতোর দাগ বাহির থেকে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পেলুম আরো দুই সার খালি পায়ের চিহ্ন। দাগের গভীরতা ও ব্যবধান দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে কেউ খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে ছুটতে ছুটতেই। মনটা খুশি হয়ে উঠল, কারণ আগেই আপনার মুখে শুনেছিলুম যে, সুবিমলবাবুকে আপনি নগ্নপদে মুকুট নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছিলেন।

এক জায়গায় দেখলুম, কাদার উপরে বিষম ধস্তাধস্তির চিহ্ন—সেখানেও খালি পায়ের আর সৌখীন জুতোর দাগ। সেখানে যে রক্তপাত হয়েছে, তাও বোঝা গেল। তারপর জুতোর দাগ চলে গিয়েছে গলির বাইরের দিকে, আর খালি পা ফিরে এসেছে বাড়ির দিকে। ধরে নিলুম, সে বাড়িরই লোক।

আপনার মনে আছে, বৈঠকখানায় ঢুকে খিড়কির ফটকের দিকে যাবার দরজার তলাটা আমি পরীক্ষা করেছিলুম? একজন লোক যে কাদামাখা খালি পা নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে, সেখানে ছিল তার স্পষ্ট চিহ্ন।

তখন আসল ব্যাপারটা কতক কতক আন্দাজ করতে পারলুম। কোন সৌখীন জুতো পরা লোক মুকুট হস্তগত করে প্রস্থান করছিল। সুবিমলবাবু দেখতে পেয়ে তার অনুসরণ করেন, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে আসেন।

চোরকে নিশ্চয় বাড়ির কোন লোক সাহায্য করেছিল। বাড়ির ভিতরে ছিল কেবল দাসীরা আর অমলা। কিন্তু দাসীদের মুখ চেয়ে সুবিমলবাবু নিশ্চয়ই

অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবেন না। বাকি রইলেন কেবল অমলা। সুবিমলবাবু তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁর মানরক্ষার জন্যে তিনি সব করতে পারেন। অতএব, প্রথমে অসম্ভব মনে হলেও আমি সন্দেহ করলুম অমলাকেই। তার উপরে রাত্রে আপনি তাঁকে বৈঠকখানায় বাগানে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন এবং মুকুট দেখেই তিনি ভয়ে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

এখন সৌখীন জুতো পরা লোকটা কে হতে পারে? এ বাড়িতে কুমার বাহাদুর হামেশাই আনাগোনা করে। তার নাম আগেই শুনেছিলুম, সে হচ্ছে অত্যন্ত কুবিখ্যাত ব্যক্তি। ভবঘুরে সেজে তার চাকরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললুম। শুনলুম তার মনিব আগের রাতে আহত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। নিজের ছেঁড়া জুতো দেখিয়ে, আট আনা পয়সা দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কুমার বাহাদুরের একজোড়া পুরনো ফেলে-দেওয়া লপেটা কিনে আনলুম। তারপর আপনার বাড়ির পাশের কাঁচা রাস্তায় এসে সেই সৌখীন জুতোর দাগের সঙ্গে লপেটা জোড়া মিলিয়ে দেখলুম। অবিকল মিলে গেল। আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না।

তারপর পোশাক বদলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলুম। আমি জানি, এই কেলেঙ্কারি আপনি চাপা দিতে চান, তাই পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করলুম না।

সে প্রথমটা সবই উড়িয়ে দিতে চাইলে। তারপর আমি যখন তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ ছিল, একে একে সেগুলো উল্লেখ করলুম, সে মারমুখো হয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমিও বার করলুম আমার রিভলভার। তখন সে কতকটা শান্ত হল।

আমি বললুম, "পাথর তিনখানা ফিরিয়ে দাও। আমরা ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

সে বললে, "হায় হায়, আমি যে মোটে পাঁচ হাজার টাকায় তিনখানা পাথরই বেচে ফেলেছি!"

তারপর তার কাছ থেকে সেই চোরাই মালের কারবারীর ঠিকানা আদায় করলুম। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার রত্ন উদ্ধার করে এনেছি।

মহিমবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। আপনার ক্ষমতা যাদুকরের মত।"

—ঃ শেষ ঃ—

কাপালিকের কবলে

কাপালিকের কবলে

এক

সেদিন সকালবেলা।

প্রখ্যাত রহস্যসন্ধানী জয়ন্ত আর মানিক বসে বসে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিল। প্রতিদিনের খবরের কাগজ একান্তভাবে মন দিয়ে পাঠ করা জয়ন্তর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তাছাড়া তেমন কোনও প্রয়োজনীয় খবর দেখলে সে সেই অংশটুকু কেটে আটকে রেখে দেয় তার সংগ্রহের খাতায়।

দুজনে কাগজের বিভিন্ন পাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেলল। জয়ন্ত বললে—দূর সেই সব একেঘেয়ে খবর—কে ডাণ্ডা মেরে কার মাথা ফাটাল, কে ছোরা দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালাল। এ সব তো অতি সাধারণ কেস। কিন্তু তেমন জটিল বা জবরদস্ত কেস একটাও চোখে পড়ছে না।

এমন সময় বাইরের বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ শুনে জয়ন্ত বললে—মানিক, সুন্দরবাবু আসছেন। হরিকে বল, চা ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে।

মানিক উঠে গেল ভেতরে। একটু পরেই সুন্দরবাবুর প্রবেশ। ভারি কণ্ঠে বললেন—কি হে জয়ন্ত, শরীর ভাল তো?

জয়ন্ত হেসে বললে—আমার শরীর তো চট করে খারাপ হবার নয়, তা তো জানেন। তবিয়ত ঠিক রাখার জন্য সাধনা করতে হয়। যখন কাজ থাকে না, তখন দেহের তোয়াজ করি।

সুন্দরবাবু হেসে বললেন—সে তো জানি ভায়া। তা একটা বিশেষ কাজে তোমার কাছে আসতে হল।

জয়ন্ত জানে, পুলিস অফিসার সুন্দরবাবু বিশেষ কাজ ছাড়া তার কাছে আসেন না। তাই সে হেসে বলল—কাজ ছাড়া যে আপনি আসেন না তা তো জানি।

সুন্দরবাবু শুধু বললেন—হুম!

এমন সময় মানিকের সঙ্গে হরি প্রবেশ করল ঘরে প্রাতরাশ নিয়ে।

জয়ন্ত সেদিকে চেয়ে বলল—নিন সুন্দরবাবু শুরু করুন। আজকের প্রাতরাশ খুব সামান্য মাত্র। ডিমের পোচ, চিকেন স্যাণ্ডউইচ, ব্রেড বাটার, মাটন চপ আর কফি।

সুন্দরবাবুর চোখদুটি সেদিকে পড়েই আনন্দে একবার দপ করে জ্বলে উঠল। জয়ন্ত ও মানিক দুজনে যা খেল তিনি একাই তার দ্বিগুণের বেশি উদরসাৎ করলেন। গোটা ছয়েক পোচ, ছ'পিস ব্রেড বাটার, ছ'খানা স্যাণ্ডউইচ আর চারটি মাটন চপ খেয়ে পর পর দু'কাপ কফি পান করলেন সুন্দরবাবু। তারপর একটা ঢেঁকুর তুলে বললেন—হুম! এবারে আমার বক্তব্যটা শোনো জয়ন্ত!

জয়ন্ত আর মানিকের প্রাতরাশ ও কফি পান আগেই শেষ হয়েছিল। মানিক চিরদিনই সুন্দরবাবুর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতে অভ্যস্ত। তাই সে বললে—আপনার সব চিন্তাগুলো ওই খাবারের স্তূপে চাপা পড়ে যায়নি তো সুন্দরবাবু?

সুন্দরবাবু বললেন—থামো তো ডেপো ছোকরা। খাবার গেল পেটে আর চিন্তা আছে মগজে। খাবার কি করে চিন্তাকে চাপা দেবে শুনি?

—তা বটে, তা বটে। বলে মানিক হাসল একটু।

সুন্দরবাবু বললেন—ঘটনাটা হল, পলাশপুরের জমিদাররা তিনপুরুষ ধরে কলকাতায় বাস করেন। অবশ্য জমিদাররা এখন নেই, তবে জোতদারি দেশে আছে। আর কলকাতায় আছে ব্যবসা-বাণিজ্য। মোটামুটি তাই দিন ভালই কাটে। তাঁর একমাত্র পুত্র গত তিনদিন হল নিখোঁজ। তিনি আবার এক এম এল এ-র বন্ধু। ফলে মিনিস্ট্রি মহল থেকে চাপ এসে পড়েছে। আমাদের তো নাভিশ্বাস উঠেছে। কি যে করি, তার ঠিক নেই। চাকরি রাখা দায়। ওই ব্যাপারে যদি কোনও সাহায্য পাই, সেই আশায়—

—এ খবরটা তো কাগজে কাল পড়েছি।

—হ্যাঁ।

—তা ছেলেটার বয়স কত হবে?

—বয়স তার কত হবে? বর্তমান জমিদারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। তার তিন মেয়ের পর এক ছেলে। সবার ছোট একমাত্র ছেলে। তাই আদর খুব। বয়স ধরো বছর ছয় হবে।

—এটুকু ছেলে অদৃশ্য হল কি করে? আশ্চর্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

—এঁদের বিরাট দোতলা বাড়ি শোভাবাজার অঞ্চলে। তবে বাড়ির পিছন অর্থাৎ খিড়কির দিকেও একটা দরজা ছিল। ওই দরজা দিয়ে পিছনের গলিতে যাওয়া যায়। সামনে দারোয়ান থাকে। সে খোকাকে বের হতে দেখেনি—অথচ বেলা একটা থেকে তিনটের মধ্যে ছেলে উধাও।

জয়ন্ত বললে—ছেলে প্রধানত তিনটি কারণে উধাও হয় সুন্দরবাবু। প্রথম হল, তাদের ধরে চোখ কানা, হাত ভাঙা ইত্যাদি করে তারপর জিভ কেটে ভিক্ষে করানো হয়। এ দল পৃথক দল। এরা অনেক ছেলে এমনি পোষে। এক একটা ছেলে রোজ দশ-বার টাকা করে উপার্জন করে, অথচ তারা মাত্র দু'টাকা মতো খেতে পায়। এটা বলে ভিখিরি ব্যবসা। তাই অনেক বুদ্ধিমান লোক ছোট ছেলে ভিখিরিদের পয়সা দেয় না।

দ্বিতীয় কারণ হল, ছেলে চুরি করে মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবি করা। বিদেশে এটা বেশি হয়। এদেশে নয়। পৃথিবীর বিখ্যাত সেই লিণ্ডেনবার্গ হত্যারহস্যও সেই মুক্তিমূল্য আদায়ের জন্য শিশুচুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করেছিল।

শিশুচুরির তৃতীয় কারণ হল, শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে বিক্রি করা হয়। সাধারণত মেয়েদের ধরেই এভাবে বিদেশে বিক্রি করা হয়। অনেক পুরুষদেরও তা করা হয়—তবে তাদের ক্রেতা মেলে না, তাই এ সন্দেহ থেকে এ ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায়। যাই হোক, কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এই চুরি করেছে তা যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহলে সবার আগে অকুস্থলে যাওয়া কর্তব্য। তাই নয় কি?

—তা বটে। বললেন সুন্দরবাবু। তাহলে চলো আমরা সেখান থেকে ঘুরে আসি।

জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু কি এর আগে সেখানে গিয়েছিলেন নাকি?

সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—হুম! তা গিয়েছিলাম বটে। তবে কোনও সূত্র দেখতে পাইনি।

জয়ন্ত বললে—আমরাও যে সূত্র পাব তেমন কোনও কথা নেই। তবে চলুন দেখা যাক কতদূর কি হয়। মানিক, তুমি ভাই দীপাকে নিয়ে এসো।

সুন্দরবাবু বললেন—দীপা আবার কে? মেয়ে গোয়েন্দা নাকি?

জয়ন্ত হেসে বললেন—এক হিসেবে তা বলতে পারেন। দীপা হল একটি মেয়ে কুকুর। বিমলবাবুর বাঘার মতো এরও ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। তার উপরে নিয়মিত ট্রেনিং দিতে হচ্ছে একে। আশাকরি কোনও একদিন নিশ্চয় এ সফল হবে হয়তো বিরাট কোনও একটা তদন্তে।

সুন্দরবাবু বললেন—দেখা যাক চলো। আবার আমরা শোভাবাজারের দিকে যাত্রা করি।

ততক্ষণে মানিক দীপাকে নিয়ে এসেছিল। তারা বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলল শোভাবাজারের দিকে।

দুই

শোভাবাজারের রাজবাড়ি দোতলা হলেও আকারে তা বিরাট, দু'টি তলা মিশিয়ে প্রায় বাইশখানা ঘর।

বোঝা যায়, এককালে এঁরা বিরাট ধনী ছিলেন। বর্তমানে সেই অর্থের গৌরব না থাকলেও অবশ্য দারিদ্রের মধ্যে এরা এসে পড়েননি তা বোঝা যায়।

বর্তমানে যিনি স্টেটের মালিক সেই বীরেন্দ্রনারায়ণ এসে সুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন। জয়ন্ত বা মানিককে তিনি চেনেন না—যেহেতু তাদের গায়ে কোনরকম ইউনিফর্ম ছিল না।

সুন্দরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। পরিচয় পেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ সুখী হলেন।

যে ঘরে বসে কথা হচ্ছিল তার সামনে দেখা দিল বিরাট একটা চিত্র। চারধারে এই বংশের পূর্বপুরুষদের চিত্র—কিন্তু সামনে একটা বিরাট সন্ন্যাসীর চিত্র কেন? সন্ন্যাসীটি কে?

জয়ন্তের কথাটা মনে হল। সে বলল—বীরেনবাবু, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনাকে! আশাকরি সঠিক উত্তর দেবেন।

—নিশ্চয়ই। আমার ছেলে অদৃশ্য হবার পর থেকে আমার স্ত্রী প্রায় অজ্ঞান। যদি সত্বর তাকে খুঁজে বের করতে না পারেন, তবে তার জীবনও সংশয় হবে।

—বুঝেছি।

—তা এবার বলুন কি জানতে চান।

—আপনার ছেলে কবে অদৃশ্য হয়?

—পরশু দিন বেলা দু'টো নাগাদ।

—সে কোথায় ছিল?

—সে তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। আমার স্ত্রী নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রায় বেলা বারটা নাগাদ আমি তাকে দেখে অফিসে যাই। তারপর বাড়ির সামনে দিয়ে সে বের হয়নি। পিছনের দরজা—মানে খিড়কির দরজা খোলা দেখা যায়। তাতে মনে হয়, ওই পথ দিয়ে বের হয়েছিল। বেলা প্রায় একটা নাগাদ আমার স্ত্রীর দাসী তাকে ঘরে দেখেছিল। তারপরেই বেলা তিনটেতে এসে তাকে দেখতে পায়নি।

—ঠিক আছে। এবার বলুন তো—কাউকে সন্দেহ হয়?

—না সন্দেহ কাউকে হয় না। কারণ আমার বংশের মধ্যে আমিই একমাত্র সন্তান। আর আমার ছেলে নরেন্দ্র হল আমার একমাত্র পুত্রসন্তান। —তাই উত্তরাধিকার ব্যাপারে—

—আচ্ছা, আপনার ঘরে ওই বিরাট যে ছবিটি আছে ওটা কার ছবি? গলায় রুদ্রাক্ষ মালা—তেজস্বী পুরুষ—

—উনি আমাদের গুরুদেব। উনি তান্ত্রিক, বিরাট সন্ন্যাসী। তবে বর্তমানে জীবিত নেই। তাঁর প্রধান শিষ্য আছেন—আমার গুরু দাদা। তিনি থাকেন ও সাধনা করেন পলাশপুরের শ্মশানে। তিনিও তন্ত্রসাধনা করেন।

—আচ্ছা কেউ কি কখনও আপনাকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখে?

—কি রকম?

—যেমন, এত টাকা চাই—না হলে ক্ষতি হবে—

—না না। টাকা যে বর্তমানে আমাদের বিশেষ নেই, তা সকলে জানে। তাই এটা নিরর্থক প্রশ্ন জয়ন্তবাবু।

—আচ্ছা আপনার গুরুদেবের প্রধান শিষ্য কি এখানে কখনও এসেছেন?

—বলেন কি? আমার ছেলে নরেন্দ্র অদৃশ্য হবার মাত্র দু'দিন আগে তিনি আসেন। তিনি নরেন্দ্রকে একটি মূল্যবান মালা উপহার দেন। রুদ্রাক্ষ মালা। সেটা ড্রয়ারে আছে।

—সেখানা একবার দেখাবেন কি?

—নিশ্চয়ই।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তক্ষুণি উঠে গিয়ে মালাটা এনে জয়ন্তর হাতে দিলেন।

সুন্দরবাবু ঠাট্টা করে বললেন—জয়ন্ত, তুমি কি শেষে মালা জপ করতে শুরু করে দেবে নাকি?

জয়ন্ত বললে—না না, তা নয়,—দেখুন না।

জয়ন্ত মালাটা দীপার নাকের কাছে ধরল। দীপা দু-একবার সেটা শুঁকে শব্দ করল—গ র্ র্ র্...

জয়ন্ত বললে বীরেন্দ্রবাবুকে—আচ্ছা আপনাদের খিড়কির দরজাটা একবার দেখাতে পারেন?

—নিশ্চয়ই, আসুন আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত সদলে খিড়কির দরজাতে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা একমনে সেখানকার মাটি শুঁকতে লাগল।

জয়ন্ত বললে—বীরেনবাবু, এদিকে লোকজন তো বিশেষ আসে না। তাই না?

—ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু।

এদিকে দীপা মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছিল। তাকে বাধা দিল জয়ন্ত। চেন টেনে ধরল। দীপা জোরে জোরে চিৎকার করে উঠল—ভৌ ঔ ঔ...

তিন

জয়ন্ত ফিরে এল তার বাড়িতে। সঙ্গে সুন্দরবাবুও ছিলেন।

জয়ন্ত বললে—সুন্দরবাবু, কেসটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে আমার।

—কেন?

—কারণ হল, ছেলে চুরি সম্পর্কে যে তিনটি বিষয়ের কথা আমি আগে বলেছিলাম, তার সঙ্গে এটি মিলছে না মোটেই।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম। তাহলে ব্যাপারটা কি বল তো।

—দীপার মালা শোঁকা দেখে বুঝতে পারেননি?

—কিছুটা আন্দাজ করেছি ভায়া। মনে হয় ওই মালাটা যে দিয়েছে, তার গায়ের গন্ধ দীপা মালাতে পেয়েছে। আর ওই খিড়কির দরজাতে সেই গন্ধের রেশ পেয়েছে পায়ের ছাপে। তার মানে—

—মানে যে তান্ত্রিক গুরুভাই মালাটা দিয়েছিল, সেই সেদিন লুকিয়ে খিড়কিতে এসেছিল।

সুন্দরবাবু বললেন—হুম! তাহলে ওই তান্ত্রিক গুরুভাইটির ছেলেটি চুরি করা সম্ভব। কিন্তু তাতে তার লাভ কি?

—লাভ বিরাট। সেটা পার্থিব নয়—বলা যেতে পারে পরমপার্থিব লাভের একটা কুসংস্কার-পূর্ণ ধারণা।

—সেটা কি রকম?

—অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতি ভূত-প্রেত বা তাল-বেতাল সিদ্ধ হয় জানেন তো? এই সিদ্ধি তারা সত্যি লাভ করে বা করে না তা বলা কঠিন। তার সিদ্ধিলাভটা যে তপ দ্বারা অন্য কুপথে হয় তাও সঠিক বলা চলে না। তবু আজও সে কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতিরা নরবলি দেয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ছেলেকে বলি দেয় না তাই তারা অনেক সময়ই ভাল সুলক্ষণযুক্ত, নিখুঁত ছেলে পেলে তাদের চুরি করে।

সুন্দরবাবু বললেন—সর্বনাশ, তাহলে কি এতক্ষণে তাকে বলি দেওয়া হয়ে গেছে।

—আমার মনে হয়, না হয়নি।

—সেটা তুমি কি করে বলছ?

জয়ন্ত বললে—দেখুন সুন্দরবাবু, অনুমান বলে একটা কথা আছে জানেন তো। যদি গোয়েন্দার অনুমানশক্তি প্রখর না হয়, তবে সে সফলতা লাভ করতে পারে না। বুঝলেন?

—এটা আমি মানি। তা ব্যাপারটা কি বলো জয়ন্ত। কি করে তুমি বলছ যে নরেন্দ্র এখনও বেঁচে আছে?

—দেখুন এই সব কাপালিকরা সাধনা করে অমাবস্যায়। কারণ অমাবস্যাতে না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাছাড়া কতকগুলি বিশেষ অমাবস্যা আছে। যেমন এ মাসে হচ্ছে ভাদ্র মাসের অমাবস্যা। এটি বিশেষ ধরনের অমাবস্যা—কারণ এই ভাদ্র মাসের অমাবস্যা প্রেতসাধনা, বেতাল সাধনা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্ত। আর তাই ঠিক এই অমাবস্যার আগে চুরিটা হয়েছে। বলে জয়ন্ত একটু নস্যি নিয়ে মৃদু হাসল।

সুন্দরবাবু বললেন—তাহলে ভায়া তোমার মতে আগামী মঙ্গলবার মানে পরশু যে অমাবস্যা—

সুন্দরবাবু বাংলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

জয়ন্ত বললে—হ্যাঁ—ওই দিন সন্ধ্যার পর আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ওই দিন রাতে পলাশপুরের শ্মশানে হানা দিলেই আমরা সফল হব।

কিন্তু কোথায় যে এই সব পূজা, সাধনা প্রভৃতি করবে, তা জানা যাবে কি করে?

—অতি সহজে। দীপা তার পায়ের ও গায়ের গন্ধ চেনে। সে ঠিক খুঁজে বের করবে।

সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে বলে উঠলেন—ভেরি গুড—ভেরি গুড—ব্যাটাকে ঠিক বাগে পাওয়া গেছে। তবে সে কি এ কাজ প্রথম করছে না আগেও করেছে?

—তা আমি বলতে পারব না। এই সব তান্ত্রিকেরা যে শতাধিক নরবলি দেয় এমন ঘটনাও জানা গেছে।

—আমরা অভিযানের জন্য রেডি হতে পারি?

—নিশ্চয়! আর ওই সময়ের আগে পলাশপুরের ও. সি-কে একটা তার করে দিন বা ফোনে জানিয়ে দিন যে আমরা অভিযানে বের হব এবং সেখানে যাব। তবে বিস্তারিত কিছু জানাবেন না।

—ঠিক আছে।

সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চার

অমাবস্যার গভীর রাত। সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন থম থম করছে। আকাশে কালো মেঘ। চাঁদ নেই—তারাটা পর্যন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

এমনই ভয়াবহ রাতে পলাশপুরের শ্মশানটা যেন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এত রাতে লোকজন কেউ পথে বের হয় না। আর শ্মশানের দিকে তো ভয়ে কেউ আসেই না এমন রাতে। কারও বাড়িতে রাতে কেউ মারা গেছেন, পরদিন সকালে তাকে শ্মশানে আনা হয়। রাতে আসতে কেউ সাহস পায় না।

এমনই রাতে শ্মশানের কালী মন্দিরের থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন অংশে বসে সাধনা করছিল একজন কাপালিক।

তার গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। বয়স প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ। পরনে টকটকে লাল একটা কাপড়।

তার সামনে একটা ভয়াবহ মহাভৈরবের মূর্তি। মূর্তিটা পাঁচটি মড়ার খুলির উপর রাখা। তার সামনে আর একটা বড় মড়ার খুলির পাত্র থেকে কারণ পান করছে। চোখ দুটো তার টকটকে লাল।

তার পাশে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। বোধহয় শ্মশান থেকে মৃতদেহটা টেনে এনেছে। অন্য পাশে একটা পায়রা, একটা মুরগি, একটা কালো পাঁঠা বাঁধা। তার পাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে একটা ছেলে। তার দু'টি চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে 'মা মা' বলে কাঁদছে।

এত রাত্রে এই নির্জন শ্মশানে যে কেউ আসবে না, এ বিষয়ে কাপালিক নিশ্চিন্ত। তাই সে ওই শিশুর কান্না নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার সামনে একটা আগুন জ্বলছে। মাঝে মাঝে সে আগুনে ফল, বেলপাতা, ঘি প্রভৃতি আহুতি দিচ্ছে আর উচ্চস্বরে কি সব মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

অবশেষে এক সময় মন্ত্রপাঠ শেষ হল। কাপালিক উঠে গিয়ে পায়রাটা টেনে নিল। তার ডানার বাঁধন কেটে দিল সে। তারপর মন্ত্র পড়ে তার পাশে রাখা খাঁড়াটা দিয়ে এক কোপে

তার মাথাটা কেটে ফেলল। কাটা মাথাটা সে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর ওই পায়রার রক্ত কয়েক ফোঁটা সে ঢেলে দিল পাশের মড়াটার মুখে।

তারপর আরও কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়ে সে মুরগিটা টেনে নিল। ততক্ষণে আগুনে পায়রার মাথাটা পুড়ে গেছে। এবার ওই একই ভাবে এক কোপে মুরগিটাকে কেটে ফেলল। তার মাথাটাও সে ওই জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়ে সে কিছুটা মুরগির রক্ত ঢেলে দিল মড়াটার মুখে।

এই সব ভয়াবহ কাণ্ড দেখে বসে থাকা বালকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে তার বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করল। তবে বাঁধন খুলতে পারল না সে। তখন সে উচ্চকণ্ঠে 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু সে করুণ কান্নাতেও কাপালিকের হৃদয় এতটুকু গলল না। সে যথারীতি মুরগি বলির পর টেনে নিল পাঁঠাটা।

কিন্তু ঠিক এমনই সময়ে ঘটে গেল একটা অঘটন। এমন একটা ঘটনার জন্যে কাপালিক তৈরি ছিল না। সে চেয়ে দেখতে পেল তার সামনে টর্চ হাতে দু'জন লোক। তার পেছনে আরও চারজন লোক। সামনে একটা কুকুর মাটি শুঁকতে শুঁকতে আসছে।

কাপালিক চমকে উঠল।

লোকগুলির দু'জনের হাতে পিস্তল—দু'জনের হাতে বন্দুক। তারা হল জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ, জয়ন্ত, সুন্দরবাবু, মানিক, থানার ও. সি. আর একজন কনস্টেবল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ সবার পিছনে ছিল। তাই কাপালিক অন্ধকারে তাকে দেখতে পায়নি।

ও. সি. এগিয়ে গিয়ে বলল—মাথার উপরে হাত তোলো। নরবলি দিতে চেষ্টা করার অপরাধে তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম।

কাপালিক হুংকার দিয়ে উঠল—শয়তানের দল, আমার পবিত্র সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসেছিস?

বলে সে খাঁড়াটা হাতে তুলে নিল। নিয়েই হুংকার দিয়ে উঠল সে। এমন সময় জয়ন্ত এগিয়ে গেল। তার পিস্তলের একটা গুলি কাপালিকের পায়ে লাগতেই সে পড়ে গেল।

জয়ন্ত বললে—পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতে যেও না—মারা পড়বে।

এময় সময় এগিয়ে এলেন বীরেনবাবু। ততক্ষণে ও. সি. গিয়ে নরেন্দ্রের হাতে পায়ের বাঁধন কেটে দিয়েছিল। বীরেন্দ্রবাবু ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন। নরেন্দ্র কাঁদতে লাগল।

বীরেনবাবু বললেন কাপালিককে—ছি, ছি, তুমি কিনা আমার গুরুভাই হয়ে আমার ছেলেকে নরবলি দিতে গিয়েছিলে। আমাদের গুরুদেব এমন শিক্ষা কখনও দেননি। তিনি জপ, তপ, পূজার পথে যেতে বলেছেন। তুমি কি মনে কর খুব সহজেই সিদ্ধিলাভ করবে এই সব করে? তুমি নরাধম—পাষণ্ড।

কাপালিকের চোখ দুটো জ্বলছিল যেন। কিন্তু সে জানে যে সে নিরুপায়। এখন তার মুক্তি সম্ভব নয়। তাছাড়া সে হাতে নাতে ধরা পড়েছে। তার বিচার হবেই। আর বিচারে অন্তত সাত বছর ঘানি ঘুরাতে হবে।

ও. সি. জয়ন্তর দিকে চেয়ে বললে—আপনি এ কেসে হাত দিলেন বলেই এমন হাতে নাতে শয়তানকে ধরা সম্ভব হল। তা না হলে এই নিরীহ শিশুর যে কি দশা হত।

বীরেনবাবু বললেন—জয়ন্তবাবু, বলুন কি পুরস্কার আপনি চান? আমি যে কোনও পরিমাণ অর্থ—

জয়ন্ত হেসে বললে—অর্থ-টর্থ আমি চাইনে বীরেনবাবু। আমি যে আপনার ছেলেকে রক্ষা করতে পারলাম—তাই আমার আনন্দ।

কাপালিক বুঝল, জয়ন্তর জন্যেই ধরা পড়ে গেছে। সে তাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বললে—তোমার সর্বনাশ হবে।

জয়ন্ত তাচ্ছিল্যভাবে মৃদু হাসল—কোনও উত্তর দিলেন না।*

বজ্রভৈরবের মন্ত্র

বজ্রভৈরব এবং শিলালিপি

সন্ধ্যা উতরে গেছে।

সুন্দরবাবু টেবিলের ধারে বসে একখানা চিঠি লিখছিলেন, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে পিছন দিকে ফিরে তাকালেন।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, "কি বলেন সুন্দরবাবু, আমাকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছেন?"

সুন্দরবাবু তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মুখে তাঁর চরম বিস্ময়ের চিহ্ন। তিনি বললেন, "জয়ন্ত? তুমি? তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ। আমি তো জানতুম তুমি এখনও শ্যামদেশেই আছ।"

জয়ন্ত কোনও জবাব না দিয়ে আগে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা দিলে নিবিয়ে। তারপর রাস্তার দিকের জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। মিনিট চারেক সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার ফিরে এসে আলো জ্বেলে দিয়ে বললে, "যাক, চুয়াং-এর চরকে তাহলে ফাঁকি দিতে পেরেছি!"

সুন্দরবাবু অধিকতর বিস্ময়ে বললেন, "হুম! কেই বা চুয়াং আর কেই বা তার চর? ব্যাপার কি জয়ন্ত?"

জয়ন্ত ফিরে এসে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, "চুয়াং হচ্ছে এক চীনেম্যানের নাম। একাধারে যে হচ্ছে যাদুকর আর দস্যুদলের সর্দার। বিচিত্র তার ক্ষমতা, সারা পৃথিবী পড়ে আছে যেন তার নখদর্পণে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাঝে মাঝে গিয়ে রসাতল কাণ্ড বাধিয়ে সে কিনেছে ভয়াবহ নাম। চুপি চুপি আপনাদের কারুকে কোনও কথা না জানিয়ে তারই সন্ধানে আমি গিয়েছিলুম শ্যামদেশে—কারণ, আমি জানতুম সে শ্যামদেশেই আছে। হ্যাঁ, সে শ্যামদেশেই ছিল বটে, কিন্তু আপাতত তার আবির্ভাব হয়েছে কলকাতা শহরে। সেই খবর পেয়েই আমিও ফিরে এসেছি কলকাতায়। কিন্তু চুয়াংও আমার গতিবিধির সব খবরই রাখে। কলকাতায় পদার্পণ করেই আমি বুঝতে পারলুম চুয়াং-এর এক চর লেগেছে আমার পিছনে। হয়তো সর্দারের কাছ থেকে সে হুকুম পেয়েছিল আমাকে যে কোনও উপায়ে হত্যা করবার জন্যে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী যে বল জয়ন্ত, এটা তো আর আফ্রিকার বনজঙ্গল নয়, এ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতা। এখানে প্রকাশ্য রাজপথের উপরে মানুষ খুন করা বড় চারটিখানেক কথা নাকি?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "আপনি চুয়াংকে চেনেন না সুন্দরবাবু, তাই এই কথা বলছেন! চুয়াং ইংরেজ রাজত্বের সর্বপ্রধান নগর লণ্ডনেও গিয়ে একজন 'লর্ড', আর একজন 'স্যর' উপাধিধারী বিখ্যাত লোককে প্রায় সকলের চোখের সামনেই খুন করে এসেছে। তাঁদের তুলনায় আমি তো ক্ষুদ্র জীব মাত্র, চুয়াং আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই বা আনবে কেন?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি এ কি কথা শোনালে হে? এমন এক সাংঘাতিক অপরাধী সারা পৃথিবীর বুকে ছুটোছুটি আর খুনোখুনি করে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ তাকে ধরতে পারছে না!"

—"কেউ তাকে ধরতে পারছে না সুন্দরবাবু, কেউ তাকে ধরতে পারছে না! আজ এ দেশে, কাল ও দেশে সে বিদ্যুতের মতন দেখা দিয়েই আবার কোথায় অদৃশ্য হয়, আজ পর্যন্ত তার নাগাল পায়নি পৃথিবীর বড় বড় গোয়েন্দাও।

সেই চুয়াং এসেছে কলকাতায় এটা কি দুশ্চিন্তার কথা নয়?"

—"দুশ্চিন্তার কথা নয় আবার, ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনার কথা!

কিন্তু চুয়াং কেনই বা কলকাতায় এসেছে, আর কেনই বা তুমি তার পিছনে পিছনে এতটা দৌড়াদৌড়ি করছ?"

জয়ন্ত চেয়ারের উপরে ভাল করে বসে ধীরে ধীরে বললে, "তাহলে শুনুন। যদিও চুয়াং-এর জীবনচরিত হচ্ছে যে কোনও রোমাঞ্চকর উপন্যাসেরও চেয়ে চিত্তাকর্ষক, তবু সে সব কথা আজ আমি আপনার কাছে বর্ণনা করতে চাই না। আমি কেবল বলতে চাই চুয়াং-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনখানে। কয়মাস আগে, এই কলকাতা শহরেই রহস্যজনক উপায়ে উপরউপরি তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যু হয়েছিল, সে কথা বোধহয় আপনি ভোলেন নি?"

—"হুম, নিশ্চয়ই ভুলিনি! একদল প্রত্নতাত্ত্বিক ব্রহ্মদেশের কোন এক নিবিড় জঙ্গলে গিয়েছিলেন পুরাকালের কি একটা ভগ্নস্তূপ না মন্দির আবিষ্কার করতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা কি দেখেছিলেন আর কি পেয়েছিলেন, তা আমি অবশ্য জানি না, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তাঁদের উপর দিয়ে বয়ে যায় নানান দৈব-দুর্ঘটনার ঝড়। সে দুর্ঘটনাগুলো দৈবের না দুষ্ট মানুষের কীর্তি এখন পর্যন্ত তা প্রকাশ পায়নি। তারপর একে একে তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অদ্ভুত আর আকস্মিক মৃত্যু হল, সন্দেহজনক হলেও তারও কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তুমি তো সেই কথাই বলছ?"

—"হ্যাঁ। সেই প্রত্নতাত্ত্বিকদলের নেতা ছিলেন মনোমোহনবাবু। শেষটা ভয় পেয়ে এই মামলায় তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন।"

—"মানে? মামলাটা কিসের?"

—"মনোমোহনবাবু আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ব্রহ্মদেশে তাঁর সহযাত্রী ওই তিন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যুর মূলে আছে যাদুকর আর ডাকাত দলের সর্দার এই চুয়াং।"

—"তাঁর এমন সন্দেহের কারণ কি? সেই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিককে কেউ বা কারা যে খুন করেছে, পুলিস অনেক অনুসন্ধান করেও এমন কোনও প্রমাণ আবিষ্কার করতে পারেনি।"

—"কিন্তু সেই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের মৃত্যুর কারণ যে সন্দেহজনক, পুলিস একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।"

—"হ্যাঁ, আমিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য।"

—"এখানে বাধ্যতা আর অবাধ্যতার কথা তুলে কোনও লাভ নেই, কিন্তু মনোমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে চুয়াংই কোনও গুপ্ত উপায়ে তাঁর তিনজন বন্ধুকে ইহলোক থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পরলোকে।"

—"বেশ, তাও স্বীকার করতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে দেখাতে হবে, চুয়াং কোন বিশেষ কারণে ওই তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিককে হত্যা করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা হচ্ছেন অতি নিরীহ জীব। তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে জীবন্ত বর্তমান নয়, মৃত অতীতকে নিয়ে। চুয়াং-এর মতন একজন আধুনিক অপরাধী হঠাৎ মৃত অতীতের ভক্তদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল কেন?"

—"মনোমোহনবাবুর মুখ থেকে তারও কিছু কিছু আভাস পেয়েছি।"

—"আভাস! আভাস নিয়ে কখনও গোয়েন্দাগিরি চলে?"

—"ব্যাপারটা এতই জটিল যে, মনোমোহনবাবু আভাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি!"

—"কেন?"

—"আসল ব্যাপারটা মনোমোহনবাবু নিজেই এখনও ধরতে পারেননি—যদিও তাঁর মুখের কথা শুনে আমার মনে জেগে উঠেছে একটা সন্দেহ!"

—"সন্দেহটা কিসের?"

—"শুনুন। মনোমোহনবাবুর মুখে আমি শুনেছি, ব্রহ্মদেশের গভীর অরণ্যে গিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীনকালের এক অজানা ভগ্নস্তূপ। মনোমোহনবাবু হচ্ছেন নিজেও ধনী, তাঁর সঙ্গী বন্ধুরাও কেউ দরিদ্র ছিলেন না। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক কুলি। সেই কুলিদের সাহায্যে স্তূপের নিচেকার মাটি খুঁড়ে তাঁরা অনেকগুলি সেকালকার দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সংগ্রহের মধ্যে ছিল প্রাচীন যুগের নিত্যব্যবহার্য নানান দ্রব্য, কয়েকখানি শিলালিপি আর কয়েকটি ছোট-বড় প্রস্তরমূর্তি! এক জায়গায় একটি পাথরের ছোট সিন্দুকের ভিতরে ছিল একখানি শিলালিপি, আর সেকালকার বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উপাস্য বজ্রভৈরবের মূর্তি! মনোমোহনবাবু এখনও সেই শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি, কারণ সেই শিলালিপিখানি নাকি সেকালের প্রচলিত আর অপ্রচলিত নানা ভাষায় লেখা। তবে এইটুকু তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সেই শিলালিপির কথাগুলি হচ্ছে এমন কোনও উপাসনার মন্ত্র যা উচ্চারণ করলে মানুষ এই পৃথিবীতে হতে পারে সর্বশক্তিমান। বজ্রভৈরবের মূর্তিকে সামনে স্থাপন করে সেই মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ করতে হবে। আগেই বলেছি চুয়াং হচ্ছে যাদুকর। সে কেমন করে ওই মূর্তি আর শিলালিপির সন্ধান পেয়ে ওই দুটি দুর্লভ জিনিসকে হস্তগত করবার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। মনোমোহনবাবুরা যখন ব্রহ্মদেশের সেই জঙ্গল থেকে ফিরে আসছিলেন, তখনই চুয়াং-এর সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হয়েছিল। সেই সময়েই মনোমোহনবাবুর কাছে সে বলেছিল, ওই শিলালিপিখানি আর মূর্তিটি তার হাতে সমর্পণ করলে বিনিময়ে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে পারেন। কিন্তু মনোমোহনবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা কেউ দরিদ্র ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র সাধনা। কাজেই সেই প্রস্তাবে তাঁদের কেহই রাজি হননি। চুয়াং এতটা আশা করেনি, কাজেই সে বেশি লোক নিয়ে মনোমোহনবাবুদের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাব করতে যেতে পারেনি। মনোমোহনবাবুরা সেদিন ছিলেন রীতিমতো দলে ভারি। সুতরাং সেদিন চুয়াংকে বাধ্য হয়েই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিরে আসতে হয়। মনোমোহনবাবু বলেন, তাঁরা যখন জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছেন,

তখনও নাকি ক'খানা অজানা বোম্বেটে জাহাজ তাঁদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হয়নি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসেও তাঁরা নাকি নানান রকম বিপদের উপরে বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। তারপর একে একে মনোমোহনবাবুর সঙ্গী তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অজানা উপায়ে মৃত্যু হল—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকের ঘর থেকে চুরি গেল ব্রহ্মদেশ থেকে আনা সেই সব পুরাকীর্তির এক বা একাধিক নমুনা। কিন্তু সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি আছে মনোমোহনবাবুরই কাছে। চুয়াং তখনও সেটা জানত না, তাই সে প্রথমেই মনোমোহনবাবুকে আক্রমণ করেনি। ওদিকে তিন তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কলকাতার পুলিস অত্যন্ত জাগ্রত হয়ে উঠেছে দেখে চুয়াং এখান থেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সরে পড়েছিল শ্যামদেশে। ইতিমধ্যে মনোমোহনবাবু এসে আমার আশ্রয় নিলেন, আর তাঁর মুখে সব কথা শুনে মামলাটার নূতনত্ব দেখে উৎসাহিত হয়ে আমিও ছুটে গেলুম শ্যামদেশে, চুয়াং -এর খোঁজে। সেখানে গিয়ে চুয়াং সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছি। আর এও জেনেছি যে, মূর্তি আর শিলালিপি মনোমোহনবাবুর কাছে আছে জেনে চুয়াং আবার এসে হাজির হয়েছে কলকাতা শহরে। তিনজন প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাণ গিয়েছে, এইবার হচ্ছে মনোমোহনবাবুর পালা। এখন আমাদের কি করা উচিত সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "অদ্ভুত মামলা! আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না! তবে এইটুকু কেবল বুঝতে পারছি যে, অতঃপর মনোমোহনবাবুর উপরে পুলিসের কড়া পাহারা রাখা দরকার!"

জয়ন্ত বললে, "পুলিসের পাহারা বসিয়েও চুয়াংকে কোন দেশেই কেউ বাধা দিতে পারেনি। সে তার কর্তব্যপালন করতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে না। সে—"

ঠিক এই সময়ে সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে ঘরের ভিতরে এসে প্রবেশ করলে মানিক। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "জয়, মনোমোহনবাবু এখনই আমাদের ফোন করেছিলেন—"

জয়ন্ত বিদ্যুতাহতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কেন, কেন, কেন?"

—"মনোমোহনবাবুর বাড়ির সুমুখের রাস্তার উপর দিয়ে আজ সন্ধ্যার পর থেকে খালি নাকি চীনেম্যানের পর চীনেম্যান আনাগোনা করছে! ও পাড়ায় সারা বছরেও তিন চার জনের বেশি চীনেম্যান দেখা যায় না! তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছ কিনা?"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "শুনলেন তো সুন্দরবাবু? আর কোনও প্রশ্ন করবেন না, এখনই একদল সশস্ত্র সেপাই নিয়ে মনোমোহনবাবুর বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করুন! চলো মানিক, আমরা আর এখানে অপেক্ষা করতে পারি না! সুন্দরবাবুর দলবল আসুক আর না আসুক আমাদের এখনই গিয়ে হাজির হতে হবে ঘটনাস্থলে!" বলতে বলতে সে মানিকের হাত ধরে টেনে ঘরের ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচ্যাকার মতন এদিক ওদিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র বললেন, "হুম! অবাক কাণ্ড বাবা!"

"মোটেই নয়, মোটেই নয়"

মনোমোহনবাবুর বাড়িখানা দেখতে দস্তুরমতো অদ্ভুত। তাকে চওড়া স্তম্ভ বললেও ভুল হয় না। কিন্তু উচ্চতায় বাড়িখানা পাঁচতলা। প্রত্যেক তলায় মাত্র দু'খানি করে ঘর। বাড়ির ভিতর দিকে প্রতি ঘরের সামনে দালান এবং দুই দিকের দালানের মাঝখান দিয়ে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে সিঁড়ির সার। বাড়ির বাইরের দিকে বারান্দা নেই।

মনোমোহনবাবু চিরকুমার। প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, মুদ্রা এবং সেকেলে নানান জিনিস নিয়ে অল্প বয়স থেকেই এত বেশি ব্যস্ত হয়ে আছেন বলেই বোধ করি তিনি বিবাহের কথা ভাববার সময় পর্যন্ত পাননি। পাচক, বেয়ারা, দাসী ও দারোয়ানদের নিয়ে তিনি এই বাড়ির ভিতরে বসে যাপন করেন একান্ত শান্তিপূর্ণ জীবন।

বাড়ির কাছে গিয়ে জয়ন্ত ও মানিক এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু সন্দেহজনক কোনও চেহারা নজরে পড়ল না।

বাড়ির সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছিল এক শিখ দারোয়ান, জয়ন্তদের দেখেই সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ঠুকে জানালে যে, মনোমোহনবাবু একতলার বৈঠকখানাতেই বসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

বৈঠকখানার ভিতরে একালকার জিনিসের মধ্যে আছে কেবল একটি টেবিল, খানকয় চেয়ার ও একখানি কার্পেট, তা ছাড়া বাকি সমস্তরই সঙ্গে জড়িত আছে সুদূর অতীতের স্মৃতি। ঘরখানাকে দেখলে বৈঠকখানা বলে কোনও সন্দেহই হয় না, মনে হয় যেন কোনও মিউজিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করলুম!

ঘরের সর্বত্রই বিরাজ করছে রীতিমতো একটা লণ্ডভণ্ড ভাব—যেন দুটো পাগলা ষাঁড় সেখানে ঢুকে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সমস্ত জিনিসপত্তর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে! ঘরের দুই দিকের দেওয়াল জুড়ে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেবল মোটা মোটা বই ভরা আলমারির পর আলমারি।

তা ছাড়া সবখানেই বিষম বিশৃঙ্খলা—যেখানে যা থাকবার কথা নয় ঠিক সেই খানেই আছে সেই জিনিসটি! কার্পেটের অধিকাংশ জুড়ে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় মাঝারি এবং ভাঙা বা আভাঙা পুরাতন পাথরের মূর্তির পর মূর্তি! দেখলেই বোঝা যায় মনোমোহনবাবু মূর্তিগুলোকে ঘরের ভিতরে এনে যেখানে যেভাবে রেখে পরীক্ষা করেছিলেন তারা সেইখানে ঠিক সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে আজ পর্যন্ত এবং গৃহকর্তা এমন অবসর আর পাননি যে, তাদের যথাস্থানে সরিয়ে বা সাজিয়ে রাখেন!

টেবিলের উপরে, চেয়ারের উপরে, মেঝের উপরে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অসংখ্য পুঁথিপত্র, প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রলিপি, সেকেলে বেরঙা ধাতুর থালা, বাটি বা অন্যান্য পাত্র এবং ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো-টাকরা প্রভৃতি। তার উপরে যে দিকে চোখ ফেরানো যায় সেইদিকেই নজরে পড়ে খালি ধুলো ধুলো আর ধুলো! কোথাও কোথাও সেই ধুলো আবার এক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে।

টেবিলের সামনে একখানি মাত্র চেয়ারের উপরে পুঁথিপত্র বা অন্য কোনও জিনিসের বদলে বিরাজ করছে একটি মনুষ্য-মূর্তি তিনিই হচ্ছেন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহনবাবু।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। তাঁর মাথার মাঝখান জুড়ে আছে মস্ত একটি গোলাকার টাক, কিন্তু টাক যেখানে শেষ হয়েছে সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে কাঁচায় পাকায় মেশানো প্রায় দুই স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা লম্বা চুল এবং সেই চুলগুলোর এলোমেলো অবস্থা দেখে বুঝতে দেরি লাগে না যে, তাদের উপর দিয়ে কখনও যাতায়াত করবার স্পর্ধা রাখে না চিরুনি বা বুরুশ! মনোমোহনবাবুর মুখমণ্ডলের তলদেশটাও সমাচ্ছন্ন করে আছে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু ও গুম্ফ! ভদ্রলোক বোধহয় খালি চোখে ভাল করে দেখতে পান না, কারণ তাঁর নাকের উপরে রয়েছে দু'খানা বিষম পুরু কাচওয়ালা চশমা। সেই চশমার কাচের পিছনে এবং অত্যন্ত রোমশ দুই ভুরুর ছায়ায় দেখা যাচ্ছে কেমন যেন অন্যমনস্ক ও তন্দ্রাতুর, অথচ বুদ্ধির তীক্ষ্নতা মাখা দু'টি আশ্চর্য চক্ষু! মনোমোহনবাবুর পরনে একটি খাকি রংয়ের শার্ট ও সেটি বোতামবিহীন বলে তার তলা থেকে উঁকি মারছে বেশ একটি মলিন গেঞ্জি। তিনি যে আধময়লা কাপড়খানি পরেছেন সেখানি হাঁটুর নিচে পর্যন্ত এসে পায়ের দিকে আর এগুতে চেষ্টা করছে না। জয়ন্তের মুখেই আমরা শুনেছি মনোমোহনবাবু নাকি অতিশয় ধনবান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, তিনি যেন একজন আধপাগলা, স্বল্প মাহিনার ইস্কুলমাষ্টার ছাড়া আর কিছুই নন।

জয়ন্ত ও মানিককে ঘরের ভিতরে আসতে দেখেই মনোমোহনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দু'খানা চেয়ারের উপর থেকে কতকগুলো পুঁথিপত্র ঠেলে ঘরের মেঝেয় দুমদাম শব্দে ফেলে দিলেন। তারপর অত্যন্ত খুশিকণ্ঠে বললেন, "আসুন জয়ন্তবাবু, আসুন মানিকবাবু, আপনাদের দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল!"

জয়ন্ত ও মানিক এই অদ্ভুত ঘরের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিল, কাজেই তারা গিয়ে আসন গ্রহণ করলে বেশ সহজ ভাবেই।

জয়ন্ত বললে, "কি ব্যাপার মনোমোহনবাবু, হঠাৎ আপনি এতটা ভয় পেয়েছেন কেন?"

মনোমোহনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "বলেন কি মশাই, ভয় পাব না? যে পাড়ায় ন'মাসে ছ'মাসে মঙ্গোলীয় চেহারা দেখা যায় এক-আধজন, সেখানে কিনা আজ রাস্তার উপরে দেখছি দলে দলে চীনেম্যানের শোভাযাত্রা! জানেন তো, আমার তিন প্রত্নতাত্ত্বিক শিষ্য সতীশ, যতীশ আর মৃগাঙ্ক হঠাৎ মারা পড়েছে রহস্যজনক উপায়ে! আপনি নিজেই সন্দেহপ্রকাশ করে গিয়েছেন যে, সে বেচারিরা ইহলোক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে সেই ভয়ানক চীনেম্যান চুয়াং এর ষড়যন্ত্রেই! বর্মায় একদিন মাত্র চুয়াংকে চোখে দেখেছিলুম, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে সেই ভয়াবহ মূর্তিকে দেখে শিউরে আর চমকে না জেগে থাকতে পারি না! এই পাড়ায় হঠাৎ চীনে পল্টনের শোভাযাত্রা! বলেন কি মশাই, ভয় পাব না আবার !"

জয়ন্ত বললে, "আমরা যখন এসে পড়েছি তখন আপনার আর কোনও ভয়ের কারণই নেই।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "ভয়ের কারণ আছে কিনা জানিনা, তবে আপনাদের দেখে আমি কতকটা আশ্বস্ত হয়েছি বটে!"

—"কিন্তু আমরা এখানে এসে পথের উপরে একটা চীনেম্যানকেও আবিষ্কার করতে পারলুম না।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি। পাঁচতলার ঘরে জানলার ধারে আমি দূরবীন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, আমিও দেখেছি পথের উপর থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে চীনেম্যানদের শোভাযাত্রা! তাইতো আমি কতকটা ভরসা পেয়ে নেমে এসে বৈঠকখানায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু চীনেম্যানগুলো কেনই বা দৃশ্যমান হল আর কেনই বা হঠাৎ আবার অদৃশ্য হল তারও কারণ কিছু বুঝলুম না! এও যেন একটা মস্ত রহস্য বলেই মনে হচ্ছে!"

—"আচ্ছা মনোমোহনবাবু, আপনার দূরবীনের ভিতরে রাস্তায় চুয়াং-এর মতো কোনও চেহারা ধরা পড়েছে কি?"

—"বলেন কি মশাই, চুয়াং-এর দেখা পেলে এতক্ষণে আমি আপনাকে সেকথা জানাতুম না? মোটেই নয়, মোটেই নয়, চুয়াং-ফুয়াং কারুকেই আমি দেখিনি, দেখেছি কেবল দলে দলে অচেনা চীনেম্যান!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর সে খুব মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, "মনোমোহনবাবু, যতটা পারেন চুপিচুপি কথা কইবেন। শ্যামদেশে গিয়ে চুয়াং-এর যে ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর! চুয়াং যার উপরে দৃষ্টি দেয় তার ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন মানুষের কথা শুনতে পায়! কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপিখানা কি এই বাড়ির ভিতরেই আছে?"

মনোমোহনবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আপনার কথামতো সেই দু'টো বিপজ্জনক জিনিসকে আমি ব্যাঙ্কের 'সেফ ডিপোজিট ভল্ট'-এ রেখে এসেছি।"

এমন সময় বাইরের রাস্তায় শোনা গেল সুন্দরবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বর—"জয়ন্ত, ও জয়ন্ত! এইটেই কি মনোমোহনবাবুর বাড়ি? তুমি কি এখানে আছ?"—তারপরই সজোরে শোনা গেল কয়েকটা সদর্প এবং সবুট পায়ের খট খট আওয়াজ!

জয়ন্তের ইঙ্গিতে মানিক তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপদে বাইরে গিয়ে বললে, "চুপ সুন্দরবাবু, চুপ! অপরাধী গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, চেঁচিয়ে এখানে আকাশ ফাটাবেন না!"

সুন্দরবাবু ভড়কে গিয়ে বললেন, "হুম! বেশ, তাহলে আমি এই মুখ বন্ধ করলুম!"

—"আপনাদের সঙ্গে ছ'জন সেপাই এসেছে দেখছি। ওদের নিয়ে চটপট ভিতরে ঢুকে পড়ুন।...দারোয়ান, তুমি সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দাও। সেপাইদের নিয়ে তুমি এই দরজার ঠিক পিছনেই বসে থাকো। আসুন সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে মনোমোহনবাবুর পরিচয় করিয়ে দিই।"

বৈঠকখানায় ঢুকে চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, "হুম, হুম! এমন অসম্ভব ঘর তো জীবনে আমি কখনও দেখিনি! এ ঘরের ভিতরে কি ভূমিকম্প হয়েছে?"

মনোমোহনবাবু আবার উঠে দাঁড়িয়ে আর একখানা চেয়ারের উপর থেকে মাঝারি আকারের একটি বুদ্ধমূর্তিকে নামাতে নামাতে বললেন, "বলেন কি মশাই? এ ঘরের ভিতরে ভূমিকম্প হলে আমি কি আর বাঁচব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! এ ঘরে সঞ্চিত হয়ে আছে আমার সারা জীবনের সাধনার ধন! বসতে আজ্ঞা হোক মশাই, এই চেয়ারে বসতে আজ্ঞা হোক!"

সুন্দরবাবু যেন মনোমোহবাবুর কথা শুনতেই পেলেন না। মহা বিস্ময়ে ঘরের নানা দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে করতে বললেন, "ওরে বাবা, এ আবার কোথায় এসে পড়লুম?"

মানিক বললে, "আপনি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের কোনও বাড়িতে আসেননি, আপনি এসেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহনবাবুর বাড়িতে। ইনিই হচ্ছেন মনোমোহনবাবু!"

মনোমোহনবাবু সবিনয়ে সুন্দরবাবুকে নমস্কার করলেন। কিন্তু সুন্দরবাবু তাঁকে প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলেন, কারণ সেই মুহূর্তেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল মনোমোহনবাবুর পায়ের দিকে। দুই ভুরু কপালের দিকে ঠেলে তুলে তিনি বললেন, "আমি কি আজ উল্টো রাজার দেশে এসে পড়েছি? হ্যাঁ মশাই, আপনার দু'পায়ে দু'রংয়ের চটিজুতো কেন? এখানকার সব নিয়মই কি সৃষ্টিছাড়া? হুম!"

মনোমোহনবাবু হেঁট হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "বলেন কি মশাই? তাই তো, ঠিকই বলেছেন তো! আমার এক পায়ে দেখছি 'ব্রাউন' আর একপায়ে দেখছি কালো রংয়ের চটি! নাঃ, চাকর-বাকরদের নিয়ে আর পারা গেল না!"

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, "পায়ে জুতো পরেছেন আপনি নিজে, চাকর বেচারিদের দোষ কি বলুন? তারাই কি আপনার পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! জুতো পরি আমি নিজেই! কিন্তু আজ আমি জুতো পরেছি ঠিক একটি আস্ত গাধার মতো! নিকুচি করেছে দু'পায়ের দু'রকম জুতোর! চুলোয় যাক, চুলোয় যাক"—বলতে বলতে তিনি দুই হাতে দুই পায়ের জুতো সজোরে খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠলেন, "এই ভুতো! এই মোনা! হতভাগারা এতদিন ধরে আমার বাড়িতে চাকরি করছিস, তবু এতক্ষণেও দেখতে পাসনি যে, আমি দু'পায়ে পরেছি দু'রঙের জুতো? না, দশজনের সামনে তোরাই আমার মাথা হেঁট করবি দেখছি! শিগগির নিয়ে আয় এক রঙের একজোড়া চটি জুতো! দেরি করলে আর বাঁচবি নে, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব কিন্তু!"

ভুতোই হোক আর মোনাই হোক কে একজন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে মনোমোহনবাবুর দুই পায়ে পরিয়ে দিয়ে গেল একজোড়া বার্নিশ করা কালো জুতো!

মনোমোহনবাবু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললেন, "ওরে, তুই আজ আমার মান বাঁচালি! ভদ্রলোকদের সামনে আর একটু হলেই আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল আর কি! এই নে বখশিশ! যাঃ, বিদেয় হ এখান থেকে!" বলেই তিনি পকেট থেকে একখানা দুই টাকার নোট বার করে ভৃত্যের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যও গালভরা হাসি হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

মানিক বললে, "আপনার বাড়িতে আমাকে একটা চাকরি দেবেন মনোমোহনবাবু?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমার বাড়িতে আপনি চাকরি করবেন! বলেন কি মশাই?"

—"আমি বেশ বুঝতে পারছি মনোমোহনবাবু, আপনার বাড়ির চাকর-বাকররা মাস মাইনের উপরেও রোজই বোধহয় পাঁচ দশ টাকা বখশিশ পায়! এমন আশ্চর্য বাড়িতে চাকরি করাও সৌভাগ্য! আমাকে এখানে একটি চাকরি দেবেন মনোমোহনবাবু?"

মনোমোহনবাবু নিজের চেয়ারের উপরে ধপাস করে বসে পড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আপনি আমাকে পাগল ভেবে ঠাট্টা করছেন মানিকবাবু!

আপনাকে চাকরি দেবার স্পর্ধা কোনদিনই আমার হবে না। জয়ন্তবাবু, আপনি চুপ করে আছেন কেন? বোধহয় আমি ভারি ছেলেমানুষি করে ফেলেছি, নয়?"

জয়ন্ত বললে, " ও সব কথা এখন রাখুন মনোমোহনবাবু। মাথার উপরে ঝুলছে যখন মহা বিপদের খাঁড়া তখন বাজে কথায় সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। সুন্দরবাবু, আপনি কি খেয়ে-দেয়ে এখানে এসেছেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "খেয়ে-দেয়ে এখানে আসব মানে? আমি কি রাত বারটার আগে কোনওদিন খাই? আর খেয়ে-দেয়েই বা এখানে আসব কেন বলো দেখি?"

জয়ন্ত বললে, "কারণ হয়তো আজ সারারাতই আমাদের এখানে অত্যন্ত সচেতন হয়ে বাস করতে হবে।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "হুম! শূন্য উদরে বাইরে কোথাও রাত্রিবাস করবার অভ্যাস আমার একেবারেই নেই। এখানে যদি রাত্রিবাস করতে হয়, তাহলে বাড়িতে গিয়ে এখনই আমার খেয়ে আসা উচিত।"

মনোমোহনবাবু অতিশয় অপরাধীর মতন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বলেন কি মশাই? আমাকে রক্ষা করতে এসে আপনাদের কি উপোস করতে হবে? মোটেই নয়, মোটেই নয়। আমি এখনই আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ আপনারা আমার অতিথি।"

জয়ন্ত বললে," সে কথাই ভাল। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা এই ঘরেই বসে বিশ্রাম করব।"

কোহিনূরেরও চেয়ে দামী মুদ্রা

রাত প্রায় বারটার পরে খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সকলে আবার এসে বসল বৈঠকখানায়।

অতিরিক্ত আহার্য গ্রহণ করায় সুন্দরবাবুর অতি বৃহৎ ভুঁড়িটি আজ আবার স্ফীত এবং ভারি হয়ে উঠেছে অধিকতর—যেন সে 'ইউনিফর্মে'র বন্ধন ঠেলে বাইরে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছিল ক্রমাগত। ভুঁড়িকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার উপরে হাত বুলোতে বুলোতে সুন্দরবাবু কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বললেন, "এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু মনোমোহনবাবু!"

মনোমোহনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "বলেন কি মশাই, না জেনেশুনে আমি কি কোনও খারাপ কাজ করে ফেলেছি?"

—"না জেনেশুনে কেন, যে অপরাধ করেছেন জেনেশুনেই করেছেন!"

—"আমি জেনেশুনে অপরাধ করেছি? মোটেই নয়, মোটেই নয়।"

—"হুম, অতিথিদের প্রাণ বধ করবার জন্যে জোর করে এত বেশি খাবার খাইয়ে দেওয়া কি আপনার উচিত হয়েছে?"

—"রক্ষে পাই, এই কথা?" বলেই মনোমোহনবাবু হো হো রবে উচ্চহাস্য করতে লাগলেন।

—"আমি এখন কি করি বলুন দেখি? আমার যে এখনই লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়বার ইচ্ছে হচ্ছে! তা এমনি আপনার ঘরের দশা, একখানা পা রাখবার জায়গা নেই, এখানে লম্বা হয়ে শোবার চেষ্টা করা দুশ্চেষ্টা মাত্র!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আমরা এখানে লম্বা হয়ে শুতে আসিনি, সোজা হয়ে বসে রাত জেগে পাহারা দিতে এসেছি।"

—"কিসের পাহারা বাপু? শত্রু কোথায়? রাস্তায় জনকয় চীনেম্যান দেখলেই কি বুঝে নিতে হবে যে, আজ রাত্রে তারা দল বেঁধে এই বাড়িখানাকে আক্রমণ করবে? নিতান্তই আজ মনোমোহনবাবুর নুন খেয়ে ফেলেছি, তাই অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও এখানে হাজির আছি, নইলে অকারণে এখানে আমি রাত কাটাতে রাজি হতুম না। উঃ, কী ঘুমটাই পেয়েছে রে বাবা!" বলতে বলতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে সুন্দরবাবু মস্ত একটা হাই তুলে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, চুয়াং আর তার দলকে আপনি চেনেন না! পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই পুলিস চুয়াংকে জানে, কিন্তু তবু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ধরতে পারেনি। চুয়াং কাজ হাসিল করে প্রায় প্রকাশ্যেই, কিন্তু তাকে ধরতে গেলেই সে মিলিয়ে যায় হাওয়ার মতো। মনোমোহনবাবু যথাসময়ে আমাদের খবর দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। সে আজ এখানে নিজে আসবে কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসে, আর যদি আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি তাহলে নাম আর পদোন্নতি হবে আপনারই—কারণ বরাবরের মতো এবারেও আমি থাকব যবনিকার অন্তরালে। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে আমার শখ—আমার পেশা নয়। অতএব আর বাক্যব্যয় না করে আপনি দয়া করে ওই বড় চেয়ারখানার উপরে গিয়ে বসে পড়ুন। বসে বসে ঘুমোতে পারেন, ঘুমোন! দরকার হলেই যথাসময়ে আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

সুন্দরবাবু আর কিছু না বলে বড় চেয়ারখানাকে টেবিলের সামনে টেনে আনলেন। তারপর চেয়ারের উপরে বসে টেবিলের উপরে মাথা রাখতে গিয়ে তন্দ্রাতুর চক্ষে দেখলেন, সেখানে পাঁচ-সাত টুকরো বিবর্ণ ধাতুর গোল গোল চাকতি পড়ে রয়েছে। তিনি অবহেলা ভরে সেগুলোকে হাত দিয়ে ঠেলে টেবিলের উপর থেকে ফেলে দিতে গেলেন।

মনোমোহনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠে সবেগে টেবিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, "করেন কি, করেন কি মশাই? আপনি তো সর্বনেশে লোক দেখছি!"

—"কেন, হল কি?"

মনোমোহনবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হল কি? বলেন কি মশাই? এগুলি কি জানেন? প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা! সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের, সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বর্ণমুদ্রাও আছে এর মধ্যে! আজ এর এক একটির দাম লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি! এর প্রত্যেকটি হচ্ছে অমূল্য—এক একটি রাজ্যের বিনিময়েও এমন এক একটি স্বর্ণমুদ্রা আপনি কিনতে পারবেন না!"

সুন্দরবাবুর তন্দ্রা গেল ছুটে—তাঁর দুই চক্ষু হয়ে উঠল ছানাবড়ার মতো! কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে তিনি বললেন, "এই রাবিশগুলো হচ্ছে সোনার টাকা? হুম!"

জয়ন্ত বললে, "সোনার টাকা নয় সুন্দরবাবু, এর এক একটির দাম কোহিনূরেরও চেয়ে বেশি।"

—"হুম! মনোমোহনবাবু এমন সব অমূল্য জিনিসকে এই ভাবে অযত্নে এখানে ফেলে রেখেছেন?"

মনোমোহনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! এ ঘরের কোনও কিছুকেই আমি অযত্নে ফেলে রাখিনি! এ ঘরের মধ্যে যা কিছু দেখছেন, তার প্রত্যেকটিকেই

আমি আমার প্রাণেরও চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করি! অবশ্য এদের উপরে আজ ধুলো পড়েছে। বহু শতাব্দীর অবহেলায় এদের রং গেছে জ্বলে—কিন্তু তাতে কি হয়েছে মশাই? মানুষ খালি বাইরের রূপ দেখতে চায়, ভিতরের মূল্য বোঝে না, তাই পদে পদে সে করে অবিচার!"

সুন্দরবাবু লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন মনোমোহনবাবু, আপনার এই আশ্চর্য ঘরে এসে আমি প্রায় উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছি! এইবার বুঝতে পারছি, হয়তো এখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা হচ্ছে হীরার কণার মতো! এমন বাড়িতে ডাকাত এসে হানা দেবে না? হুম, দেবেই তো, দেবেই তো! ওগুলিকে আপনি দয়া করে সরিয়ে রাখুন মনোমোহনবাবু, আমি এইবার ওখানে মাথা রেখে একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করব। উরে বাবা, কী ঘুমই যে পেয়েছে! সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রেতাত্মা এখন যদি এসে বলেন—'তুমি ঘুমিও না, আমি তোমাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিচ্ছি,' তাহলেও আমি এক মিনিট জেগে থাকতে রাজি হব না। হুম, হুম, হুম!" বলতে বলতে তাঁর মাথা টেবিলের উপরে অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বললে, "ব্যস, আর কোনও কথা নয়! হয়তো আজ আমাদের খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হবে, তবু আমাদের সহ্য করতে হবে আজকের রাত্রি জাগরণের সমস্ত কষ্টই! উপায় নেই, উপায় নেই—চুয়াং হচ্ছে একটা বিভীষণ অপদেবতার মতো!"

সরীসৃপ

জাগ্রত হয়ে বসেছিল কেবল জয়ন্ত আর মানিক। প্রায় শেষ রাত্রির স্তব্ধতাকে তখন বিদীর্ণ করছিল সুন্দরবাবুর এবং মনোমোহনবাবুর উচ্চ নাসিকা গর্জন। তাঁদের কার নাসিকা যে বেশি হুঙ্কার দিতে পারে, সে কথা হিসাব করে বলা সহজ নয়!

জয়ন্তের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তার মনে হল, উপরতলা থেকে যেন কি রকম একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে! সে কান পেতে আরও ভাল করে শুনতে লাগল...তারপরেই হঠাৎ তার সমস্ত সন্দেহকে বিলুপ্ত করে দিয়ে উপরতলায় জেগে উঠল যেন কোনও একটা গুরুভার জিনিসের পতনশব্দ!

জয়ন্ত একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকলে, "মানিক, মানিক!"

মানিক বললে, "আমাকে ডাকতে হবে না—আমি প্রস্তুত!... সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু!"

—"হুম! কে ডাকে বাবা?"

—"জেগে উঠুন! সেপাইদের ডেকে নিয়ে শিগগির উপরতলায় চলুন!

—"কেন, হল কি?"

—"আপনার কথার জবাব দেবার আর সময় নেই! আমি আর জয়ন্ত উপরে চললুম! আপনিও এলে ভাল হয়!"

দোতলা ও তেতলায় কারুর সাড়া বা দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু চারতলায় উঠে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে, সিঁড়ির বাম পাশের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। অথচ মনোমোহনবাবুর

মুখে সে আগেই শুনেছিল যে, তিনি তাঁর বাড়ির সব ঘরের প্রত্যেক দরজাতেই আজ কুলুপ লাগিয়ে রেখেছেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আলো জ্বেলে চারিদিকে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "চেয়ে দেখো মানিক, কারা এখানে এসে আসবাবপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে গিয়েছে। ওই দেখো, একটা ট্রাঙ্ক ওখানে উল্টে পড়ে রয়েছে, খুব সম্ভব নিচে থেকে আমরা ওইটে পড়ে যাওয়ারই শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। এ ঘরে কেউ নেই, শিগগির পাঁচতলায় চলো!"

ইতিমধ্যে সুন্দরবাবু ও মনোমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরাও উপরে এসে হাজির হল। সকলে মিলে পাঁচতলায় গিয়ে দেখলে দু'দিকের দু'টো ঘরেরই দরজা খোলা এবং দু'টো ঘরেরই জিনিসপত্তর নিয়ে যে টানাটানি করা হয়েছে তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

জয়ন্ত দ্রুতপদে একবার পাঁচতলার উপরকার ছাদে উঠেও ঘুরে এসে বললে, "ছাদের উপরেও জনপ্রাণী নেই।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য, তবে তিন তিনটে ঘরের কুলুপ খুলে জিনিসপত্তর তচনচ করলে কে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "চোর এল আর পালালই বা কেমন করে?"

জয়ন্ত রাস্তার ধারের একটা জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "অত উঁচু জানলার লোহার গরাদে কেটে ঘরের ভিতরে চোর ঢুকেছে! এও কি সম্ভব?"

মনোমোহনবাবু বললেন, "বলেন কি মশাই, এ জানলাটা মাটি থেকে বোধহয় ষাট ফুটের কম উঁচু হবে না, আর বাইরে থেকে জানলার কাছে আসবার কোনও উপায়ই নেই! আমার বাড়ির বাইরেটা একেবারে ন্যাড়া—কোথাও বারান্দা পর্যন্ত নেই!"

জয়ন্তও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, "মনোমোহনবাবু, বাইরের রাস্তার দিকের দেওয়ালের গায়ে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত কোনও জলের পাইপ-টাইপ কিছু আছে কি?"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! সরীসৃপ ছাড়া আর কোনও জীব আমার বাড়ির দেওয়াল বেয়ে পাঁচতলার উপরে উঠতে পারবে না!"

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, "কি বললেন? সরীসৃপ!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাস্তা থেকে এত উঁচুতে দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে কেবল সরীসৃপরাই—অর্থাৎ টিকটিকি, গিরগিটি আর সাপটাপের মতন প্রাণী!"

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজের মনে মনেই বললে, "হুঁ, সরীসৃপ, সরীসৃপ!"

মনোমোহনবাবু বললেন, "শুনেছি চুয়াং নাকি একজন নামজাদা যাদুকর। হয়তো এ কথা মিথ্যা নয়। আমার বাড়িতে আজ যদি সে সত্যিই এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এসেছে ভোজবাজির সাহায্যে!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, একবার এখানে এসে দেখে যান।"

—"কী আর দেখব ভাই, আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি, হুম!" বলতে বলতে তিনি এগিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত জানলার বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "ঐ কার্ণিশটা দেখছেন কি? দেখুন, ওর দু'জায়গায় দু'টো দাগ বালির ভিতরে গভীরভাবে বসে গিয়েছে।"

—"তাইতো জয়ন্ত, তাইতো! মনে হচ্ছে যেন দু'গাছা মোটা দড়ির দাগ! দাগ দু'টো নতুন।"

—"হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে নিচে থেকে দড়ি বেয়ে কেউ বা কারা এই জানলা পর্যন্ত এসে উঠেছে। তারপর জানলার গরাদে কেটে প্রবেশ করেছে ঘরের ভিতরে।"

—"হুম! আগে নিশ্চয়ই এই জানলার গরাদেতে ওই দড়ি বাঁধতে হয়েছে। কিন্তু সেটা বাঁধলে কে? ডানা না থাকলে কেউ তো আর ষাট ফুট উপরে এসে জানলায় দড়ি বেঁধে যেতে পারে না!"

—"হ্যাঁ সুন্দরবাবু, সেইটেই হচ্ছে আসল সমস্যা। জানলায় দড়ি বাঁধলে কে? এক, সন্দেহ করতে পারি, মনোমোহনবাবুর বাড়ির ভিতরে কোনও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে। সেই-ই উপর থেকে দড়ি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহ সত্য হতে পারে না। কারণ, মনোমোহনবাবু নিজেই এ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে গিয়েছিলেন, আর আমরাও এসে দেখেছি দরজা বাইরে থেকে বন্ধই রয়েছে। ঘরের ভিতর দিকের একটা জানলার কাটা গরাদেও আমরা দেখেছি—তার মানে, চোর বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকে বাড়ির অন্দরের দিকে একটা জানলা কেটে তবেই ওদিকে গিয়ে পাঁচতলার আর চারতলার ঘরের কুলুপ খুলতে পেরেছে। বাড়ির ভিতরে কোনও বিশ্বাসঘাতক থাকলে চোর বা চোরদের এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হত না। সুতরাং আমাদের ধরে নিতেই হবে যে, বাইরের চোর অদ্ভুত কোনও উপায়ে এই জানলায় দড়ি সংলগ্ন করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেছে। কিন্তু দড়ি সংলগ্ন করলে কেমন করে? একতলা, দোতলা কিংবা না হয় তেতলার ছাদ পর্যন্ত ধরলুম, কোনও রকমে হুক লাগানো দড়ি উপরদিকে ছুড়ে বাড়ির জানলায় বা কোনও পাঁচিলে সংলগ্ন করা যায়। কিন্তু ষাট ফুট উঁচু জানলায় কোনও মানুষ কি হুক লাগানো দড়ি ছুড়ে সংলগ্ন করতে পারে? এটা হচ্ছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! আমিও আপনার মতনই হতভম্ব হয়ে গেছি সুন্দরবাবু! তবে কি জানেন, মনোমোহনবাবু নিজেই একটি সুন্দর ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

—"হুম! ইঙ্গিত আবার কি?"

—"সরীসৃপ!"

—"জয়ন্ত, তুমি দেখছি এইবারে আবার পাগলামি শুরু করলে। এই জানলার কাছ পর্যন্ত এসে কোনও মানুষ একগাছা দড়ি বেঁধেছে—তার সঙ্গে সরীসৃপের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

মানিকও বললে, "জয়, ওই 'সরীসৃপ' কথাটা নিয়ে তুমি এত বেশি মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো দেখি? এর মধ্যে কি রহস্য আছে?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কিছু না, কিছু না! আমি বলছিলুম কথার কথা মাত্র। তবে 'সরীসৃপ' শব্দটা আমার যে খুব ভাল লেগেছে এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য।"

মনোমোহনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, " মোটেই নয়, মোটেই নয়! সরীসৃপ শব্দ কি মশাই, সরীসৃপ জাতটাই হচ্ছে আমার চোখের বালি! তাদের দেখলেই আমার সারা গা কিলবিল করে ওঠে!"

জয়ন্ত বললে, "সরীসৃপ নিয়ে আপনারা আর মাথা ঘামাবার চেষ্টা করবেন না মনোমোহনবাবু! আপাতত আজকের ঘটনাটা তলিয়ে বুঝুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চুয়াং তার দলবল নিয়ে আজ আপনার বাড়ির ভিতরে এসেছিল কোনওরকম অদ্ভুত উপায়ে। আর সে যে কিসের সন্ধানে এসেছিল, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? সে এসেছিল সেই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপিখানা চুরি করতে। পাঁচতলা আর চারতলার ঘরের পর ঘরে ঢুকে সদলবলে সে খুঁজছিল সেই শিলালিপি আর বজ্রভৈরবকে। হয়তো সে আজ সমস্ত বাড়িখানাই খানাতল্লাস করত, কিন্তু আমরা এখানে হাজির ছিলুম বলেই আজ তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমরা তো প্রতিদিন আপনার সঙ্গে থাকতে পারব না! চুয়াং হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান, সে সব করতে পারে! এখন আপনার কি উচিত জানেন?"

মনোমোহনবাবু সভয়ে বললেন, "বলুন জয়ন্তবাবু! আমি তো আপনারই আশ্রয় নিয়েছি।"

—"যদি প্রাণে বাঁচতে চান, তাহলে কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।"

—"বলেন কি মশাই, আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"আমার কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, আপনি কিছুদিন আমার বাড়িতে গিয়ে বাস করুন। আপনিও বিবাহ করেননি, আমারও বাড়িতে বাসন-মাজা দাসী ছাড়া আর কোনও নারী নেই। সুতরাং আপনার কোনই অসুবিধা হবে না, বরং আমাদের কাছে আপনি সুরক্ষিতই হয়ে থাকবেন।"

মনোমোহনবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "আমি বিশ রকম ভাষা জানি বটে, কিন্তু এসব ব্যাপার বোঝবার মতন বিদ্যে আমার পেটে নেই। লেখাপড়া করি, আর পুরনো জিনিসপত্তর ঘাঁটি—এর বাইরে পড়ে আছে সারা পৃথিবীর অনেক কিছুই, কিন্তু তার কোনও খবরই আমি রাখি না। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই-ই পালন করব! বলেন কি মশাই, ব্যাপার দেখে আমার যে নাড়ি করছে ছাড়ি ছাড়ি!"

পরের দিন রাত্রিবেলায়

মানিক সারাদিন জয়ন্তের সঙ্গে কাটিয়ে রাত্রে নিজের বাড়িতেই ফিরে যেত। কিন্তু জয়ন্ত হঠাৎ তাকে অনুরোধ করলে, দিনকয় তার বাড়িতে এসে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করবার জন্যে।

মানিক বললে, "কেন বলো দেখি? এ আবার তোমার কি অদ্ভুত খেয়াল?"

জয়ন্ত একটু বিরক্ত ভাবে বললে, "খেয়াল নয় মানিক, খেয়াল নয়! আমি চাই তুমি কয়েকটি রাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকো। মনোমোহনবাবুও আমার সঙ্গেই থাকবেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে রাখতে চাই বিশেষ কোনও কারণে। আমার তিনতলার ঘরে আমরা তিনজনেই একসঙ্গে প্রতি রাত্রিতেই শয়ন করব। গোয়েন্দাগিরির কাজে মনোমোহনবাবু হচ্ছেন একটি 'হাইফেনে'র মতন—তাঁর থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান! অমন ভাবেভোলা প্রাণখোলা লোক আমাদের উপকারের চেয়ে অপকারই করতে পারেন বেশি। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি খানিকটা ধাতস্থ হতে পারব।"

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "তুমি কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করছ?"

জয়ন্ত বললে, "এখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না মানিক, হয়তো আমার সমস্ত অনুমানই ভুল হতে পারে। পরে আমি তোমাকে সমস্ত কথাই খুলে বলব। আপাতত খালি এইটুকুই শুনে রাখো যে, কয়েক রাত্রি আমরা—অর্থাৎ আমার সঙ্গে তুমি আর মনোমোহনবাবু—এক ঘরেই রাত্রিযাপন করব। তারপর কি হবে আর না হবে তা নিয়ে আমি এখনই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না।"

মানিক বললে, "তোমার কোন কথাতেই বা আমি নারাজ হয়েছি ভাই! বেশ, তুমি যা বলছ তাইই আমি করব।"

সেদিন রাত্রে জয়ন্তের তেতলার ঘরে প্রস্তুত হল তিনটি বিছানা।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে মনোমোহনবাবুও সেই ঘরে ঢুকে বললেন, "জয়ন্তবাবু, একটা কথা বলে রাখছি কিন্তু! লোকের মুখে শুনেছি, আমার নাকি ভয়ঙ্কর নাক ডাকে! আমি এও শুনেছি, আমার নাক ডাকা শুনলে আশপাশের লোকেরা নাকি ঘুমোতে পারে না! তাই আপনাদের সঙ্গে শুতে আমার বড়ই সঙ্কোচ হচ্ছে!"

মানিক দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠে মনোমোহনবাবুর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বললে, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! তুচ্ছ নাক ডাকা কি বলছেন মশাই? বাঘ ডাকলেও আমরা থোড়াই কেয়ার করি! আপনার নাক যত খুশি ডাকুক, তাতে আমাদের কি?"

মনোমোহনবাবু তন্দ্রাতুর চক্ষে তাঁর বিছানার উপর দেহভার স্থাপন করে বললেন, "বেশ, তাহলে আর কিছু ভয় বা লজ্জার কারণ আমার নেই, এই আমি 'দুর্গা' বলে শুয়ে পড়লুম।"

মানিককে কাছে ডেকে জয়ন্ত তার কানে কানে বললে, "ভাই, বালিশের তলায় একটা রিভলবার আর একটা টর্চ নিয়ে তুমি শুয়ো। আমিও তাই রেখেছি। আজ, কি কাল, কি পরশু—যে কোনও রাত্রে এই ঘরে যে কোনও অঘটন ঘটতে পারে।"

মানিকও চুপি চুপি বললে, "জয়, তোমার সঙ্গে যখন থাকি তখন আমিও নিতান্ত নির্বোধ নই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি!"

জয়ন্ত বললে, "চুপ! তুমি যে বুঝতে পারবে তা আমি জানি। এই ঘরে রাস্তার দিকে দু'টো জানলা আছে। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, ওই দু'টো জানলার যে কোনওটার ভিতর দিয়েই ভীষণ কোনও বিপদ আমাদের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। তোমাকে বলে রাখলুম কেবল এইটুকুই। শুয়ে পড়ো।"

সত্য! মনোমোহনবাবু ভুল বলেননি। তাঁর নাসিকার গর্জনের মধ্যে বিশেষত্ব আছে বটে! সেই নাসিকাধ্বনি সঙ্গীতশাস্ত্রের সপ্তস্বরকেই অধিকার করে পৃথিবীর সবাইকে যেন জোর ধমক দিতে চায়! একে সে রাত্রে ছিল অত্যন্ত গুমোট, ঘরের ভিতরে এতটুকু বাতাসেরও অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না; তার উপরে মনোমোহনবাবুর নাসিকার সেই ভয়াবহ উৎপাত!

মানিক সেদিন ঘুমোবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে সে খালি এপাশ আর ওপাশ করতে লাগল। জয়ন্তের শয্যার দিক থেকে কোনও শব্দই পাওয়া গেল না।

নিস্তব্ধ রাত্রি—কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খানিক দূর থেকে এ পাড়ার রাজার এক বড় ঘড়ি ঢং ঢং ঢং বেজে জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনটে।

হঠাৎ মানিক শুনলে, ঘরের একটা জানলার কাছে কি রকম যেন সন্দেহজনক শব্দ হচ্ছে। সে রাত্রির আকাশ ছিল নিশ্চন্দ্র। কিন্তু তবু জানলার দিকে তাকিয়ে মানিকের মনে হল, সেখানে যেন কোনও একটা জীবন্ত ছায়ার আবির্ভাব ঘটেছে!

হঠাৎ জয়ন্ত নিজের বিছানার উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল "মানিক, মানিক! রিভলবার নাও, জানলার ওপরে টর্চের আলো ফ্যালো! যাকে দেখবে, তাকেই গুলি করবে!"—সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তের টর্চের শিখা গিয়ে পড়ল জানলার উপরে।

মানিকও জ্বাললে টর্চ!

জানলার উপরে দেখা গেল একটা বৃহৎ ময়াল সাপকে—সে একটা জানলার গরাদের চারিদিক বেষ্টন করে ছিল!

একসঙ্গে জয়ন্ত ও মানিকের রিভলবার দু'টো তিন-চারবার গর্জনের পর গর্জন করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরী দুঃস্বপ্নের মতন সেই ময়াল সাপটা তার সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে তীব্র আলোকরেখার ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই শোনা গেল নিচে রাস্তার উপরে তার গুরুভার দেহ পতনের শব্দ!

হঠাৎ জয়ন্ত নিজের বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘরের সেই জানলার দিকে ছুটে গেল এবং তার রিভলবারের বাকি তিনটে গুলি রাস্তার দিকে প্রেরণ করে বললে, "মানিক, মানিক! ছোড়ো তোমারও রিভলবার! অন্ধকার রাস্তায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখো যদি হতভাগাদের একজনকেও গুলি করে জখম করা যায়, তাহলে আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে!"

মানিকও জানলার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে প্রেরণ করলে তার রিভলবারের বাকি গুলিগুলো।

রাস্তার উপর থেকে জেগে উঠল একটা বিশ্রী আর্তনাদ!

জয়ন্ত সানন্দে বলে উঠল "লেগেছে লেগেছে, একজনের গায়ে গুলি লেগেছে! এসো, আমরা আবার রিভলবারে গুলি ভরে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই! যদি একটা শয়তানকেও ধরতে পারি, বাকি সবাইকেই হাতকড়ি পরাতে বেশি দেরি লাগবে না!"

তখন মনোমোহনবাবু তাঁর নাসিকাগর্জন থামিয়ে বিছানার উপরে বসে আছেন স্তম্ভিতের মতন! জয়ন্ত এবং মানিক যখন ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, মনোমোহনবাবু তখন অভাবিত তৎপরতার সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে নিচে নেমে পড়ে বললেন, "বলেন কি মশাই! চারিদিকে শুনছি বন্দুকের গোলমাল, আর আপনারা কিনা আমাকে এইখানে একলা ফেলে লম্বা দিতে চান? মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমিও যাব আপনাদেরই সঙ্গে।"

'সরীসৃপ' শব্দের রহস্য

জয়ন্ত ও মানিক রাস্তায় বেরিয়েই শুনলে, একখানা মোটরের গর্জন হঠাৎ জেগে উঠে বেগে দূরে চলে গেল।

জয়ন্ত বললে, "হয়তো চুয়াংই তার দলবল নিয়ে সরে পড়ল, আজ আর ওর পাত্তা পাওয়া অসম্ভব! এইবার টর্চ জ্বেলে দেখা যেতে পারে, রাস্তার এখানে এত ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে কেন?"

জয়ন্ত ও মানিক দু'জনই টর্চ জ্বালালে একসঙ্গে। ত্রস্ত চক্ষে দেখলে, ঠিক তাদের বাড়ির নিচেই চারিদিকে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে একটা আট দশ হাত লম্বা ময়াল জাতীয় সর্প চক্রাকারে পাক খেতে খেতে এবং মাটির উপড়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ভীষণভাবে ছটফট ছটফট করছে!

জয়ন্ত বললে, "সাপটার মাথা গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওর দেহটা এখনও ছটফট করবে অনেক ঘণ্টা ধরে।"

মনোমোহনবাবু বিপুল বিস্ময়ে বললেন, "বলেন কি মশাই!"

মানিক বললে, "যে লোকটা জখম হয়েছিল সেও পালিয়েছে দেখছি। কিন্তু জয়ন্ত, আমার সন্দেহ হচ্ছে চুয়াংই সাপটাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।"

—"তোমার সন্দেহ মিথ্যে নয়।"

—"কেন, তা বুঝতে পেরেছ?"

মানিক মাথা নেড়ে জানালে, "না।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কেন আর সাপটাকে লেলিয়ে দিয়ে চুয়াং চেয়েছিল আমাদের ঘাড় মটকাতে।"

—"উঁহু!"

—"উঁহু কেন মশাই? ও সাপটা তবে আমরা যেখানে আছি সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল কেন?"

—"মানিক, তুমি কি এখনও সাপটার ল্যাজের দিকে লক্ষ্য করনি?"

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে সাপের লাঙ্গুলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললে, "তাইতো জয়ন্ত, তাইতো! সাপের ল্যাজের দিকে খানিকটা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে দেখছি যে!"

—"হ্যাঁ। এখন খানিকটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটু আগে দড়িগাছা ছিল অনেকটা লম্বা। চুয়াং পালাবার সময়ে বাকি দড়ি কেটে নিয়ে গিয়েছে—পাছে সাপের ল্যাজের মারাত্মক আঘাত খেতে হয় সেই ভয়ে সব দড়ি কাটতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু সে রেখে গিয়েছে আমাদের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।"

মনোমোহনবাবু বললেন, "পাছে সাপটা পালিয়ে যায় সেই ভয়েই বুঝি ওর ল্যাজে দড়ি বেঁধে রেখেছিল?"

—"তাও নয়।"

—"তবে?"

—"শুনুন তবে বলি। আমি যখন শ্যামদেশে ছিলুম তখনই শুনেছিলুম যে, চুয়াং নাকি জানোয়ারদের পোষ মানাতে ওস্তাদ—এক সময়ে তার নিজেরও একটি বৃহৎ সার্কাসের দল ছিল, আর এখনও চুয়াংয়ের আড্ডায় থাকে তার নিজের হাতে শিক্ষিত নানারকম জানোয়ার। মনোমোহনবাবু, সেদিন আপনাদের মতো আমিও কিছুতেই আন্দাজ করে উঠতে পারিনি যে,

আপনার ষাট ফুট উঁচু জানলায় চোরে কেমন করে দড়ি বাঁধলে? তারপর আপনি যখন কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ 'সরীসৃপ' শব্দটা উচ্চারণ করলেন, অমনি ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ জেগে উঠল! সাপরা সরীসৃপ জাতির অন্তর্গত। সার্কাসে আমি কয়েকবার পোষমানা শিক্ষিত সাপের আশ্চর্য খেলা দেখেছি। কেন জানিনা, হঠাৎ আমার মন বললে, 'আচ্ছা, সাপরা তো খাড়া দেয়ালের গা বেয়ে অনায়াসেই উপরে উঠতে পারে, চুয়াংও কোনও শিক্ষিত সাপের সাহায্য নেয়নি তো?' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যেই আমি মনোমোহনবাবুকে এখানে এসে কিছুদিন বাস করতে বলেছি। কারণ আমি নিশ্চিতরূপেই জানতুম যে, চুয়াং তাহলে মনে করবে, মনোমোহনবাবু তার ভয়ে বজ্রভৈরব আর শিলালিপি নিয়ে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একসঙ্গে নিজের কার্যোদ্ধার আর আমার মতন মহাশত্রুকে নিপাত করবার এমন সুযোগ সে যে কিছুতেই ত্যাগ করবে না, এটা অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। তাই আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম তার দ্বারা আক্রান্ত হবার জন্যে!"

মনোমোহনবাবু বললেন, "কি মুশকিল, আমি যে এখনও আসল কথাটাই ধরতে পারছিনা! চুয়াং আমার পাঁচতলার জানলায় দড়ি বেঁধেছিল কেমন করে?"

—"অত্যন্ত সহজ উপায়ে। নিজের হাতে শিক্ষিত সাপের ল্যাজের দিকে সে দড়ি বেঁধে দিত। খুব সম্ভব লাগামের টান অনুসারে ঘোড়া যেমন কোচম্যানের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, ল্যাজের দড়িতে চুয়াংয়ের হাতের টান বুঝে এই শিক্ষিত সাপটাও জানতে পারত, এইবারে কোথায় গিয়ে তাকে কোন কর্তব্যপালন করতে হবে! দড়িবাঁধা সাপটা নির্দিষ্ট জানলার কাছে গিয়ে এক জায়গায় গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে, অন্য একটা ফাঁক দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে নিচে নেমে চুয়াংয়ের কাছে ফিরে আসত। জানলায় সংলগ্ন হয়ে দড়ির দুই মুখ থাকত চোরেদের হাতে। তখন সাপকে বন্ধনমুক্ত করে দড়ি ধরে উপরে উঠতে কারুর কোনই কষ্ট হত না।"

সমস্ত শুনে বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে মনোমোহনবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্বের মতো!

মানিক চমৎকৃত কণ্ঠে বলেল, "জয়ন্ত , তোমার এই চুয়াং কেবল বিপজ্জনক অপরাধী নয়, সে হচ্ছে অত্যন্ত কৌশলী ব্যক্তি!"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, এ কথা আমিও মানি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোনও অপরাধীকে এমন অদ্ভুত উপায়ে পরের বাড়িতে হানা দিতে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। ...মানিক, যে লোকটা আমাদের গুলিতে জখম হয়েছিল তার খানিকটা রক্ত পথের উপরে পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওই রক্তের পাশেই সাদা মতন কি একটা রয়েছে না?"

মানিক কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, "এ তো দেখছি একখানা কাগজ।"

—"দেখি।"

মানিক কাগজখানা জয়ন্তের হাতে দিলে। টর্চের আলোকে কাগজখানা দেখে সে বললে, "হুঁ, চীনে পাড়ার একটা চীনে হোটেলের খাবারের বিল। এতে যে খাবারগুলোর নাম লেখা রয়েছে সবই হচ্ছে চীনে খাবার। তাহলে এই অনুমান করাই সঙ্গত, খাবারগুলো যে খেয়েছে জাতে সেও চীনেম্যান। এখন বুঝে নাও, আমাদের এই বাঙালিপাড়ার রাস্তায় চীনেম্যানের চীনে হোটেলের বিল পড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক কিনা!"

মানিক বললে, "খুব সম্ভব যে লোকটা আহত হয়েছে এ বিলখানা ছিল তারই পকেটে।"

—"তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।"

—" তারপর, এটাও আন্দাজ করা যেতে পারে, আজ এখানে যাদের আবির্ভাব হয়েছিল, এই চীনে হোটেল তারা হয়তো প্রায়ই যাতায়াত করে।"

—"সাধু! আমিও তোমার কথার তলায় ট্যাঁড়া সই দিচ্ছি। এই 'বিল' দেখেই বুঝতে পারছি হোটেলের পাওনা হয়েছিল বত্রিশ টাকা দু'আনা দু'পাই। একজন মাত্র লোকের পক্ষে এত টাকার খাবার উদরস্থ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বিলের তারিখ দেখে আমরা ধরে নিতে পারি, কোনও বিশেষ হোটেলে আজ একদল চীনেম্যান গিয়ে এই খাদ্যগুলো গলাধঃকরণ করেছে। মানিক, মানিক! আমাদের এর পরের কার্যক্ষেত্র হবে কোথায়, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ তো?"

—"পেরেছি বইকি জয়ন্ত!"

মনোমোহনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এ সব প্রত্নতত্ত্বের কথা নয় মনোমোহনবাবু, আপনি কিছু বোঝবার চেষ্টাও করবেন না।"

কলকাতায় চীনদেশের এক টুকরো

প্রথম রাত্রি।

কলকাতার চীনেপাড়ার একটি গলি।

গলি বটে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে জনতার স্রোত। জনতার মধ্যে চীনেম্যানের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে এমন সব চেহারাও চলাফেরা করছে, যারা জাতে চীনাও নয় এবং যাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে নিরীহ পথিকদের মনও বিশেষ আশ্বস্ত হয় না। গলির দুই দিকেই যেখা যাচ্ছে অনেক চীনে হোটেল বা খাবারের দোকান। কোনও কোনও দোকানে টেবিলের উপরে চীনা মিষ্টান্ন সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক বা একাধিক চৈনিক তরুণী, এক হাতে বুকের উপরে ছেলে বা মেয়েকে চেপে ধরে স্তন্যদান করতে করতে আর এক হাতে করছে তারা খরিদ্দারের খাবার সরবরাহ।

এই চীনেপাড়ায় একেবারে বিলাতি কায়দায় সাজানো উচ্চশ্রেণীর অতি আধুনিক হোটেল আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন হোটেলও আছে, যার সাজসজ্জা আধুনিক হলেও যেখানে গিয়ে চীনে খাবার ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেখানে গিয়ে চা চাইলে একটি চীনে মেয়ে তোমার সামনে একটি হাতলহীন বাটি রেখে যাবে। সেই বাটিতে আছে গরম জল আর সেই গরম জলের ভিতরে মেয়েটি ফেলে দেয় শিকড়ের মতন একটি জিনিস। তারপর সেই বাটির উপরে আর একটি হাতলহীন বাটি উপুড় করে দিয়ে মেয়েটি তোমার কামরা থেকে অদৃশ্য হবে।

মিনিটকয় পরে তোমার কর্তব্য হচ্ছে, সেই উপুড় করা বাটিটি নামিয়ে নিচেকার বাটি থেকে চায়ের আস্বাদ গ্রহণ করা। তুমি যদি এই শ্রেণীর হোটেলে নবাগত হও, আর চীনে চায়ের অভিজ্ঞতা তোমার যদি না থাকে, তাহলে উপুড় করা বাটির উপরে হাত দিয়েই তোমাকে আঁৎকে উঠতে হবে। কারণ তার হাতল নেই আর সে বাটিটা হচ্ছে আগুনের মতন গরম। তুমি যখন নাচার হয়ে ভাবছ অতঃপর কি করা উচিত, তখন বাইরে থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে তোমার দুরবস্থা দেখে হয়তো সেই চৈনিক তরুণীর মনে হবে করুণার সঞ্চার এবং হয়তো সে তোমার কামরায় পুনঃপ্রবেশ করে উপুড় করা চায়ের বাটিটা আবার নিজের হাতেই নামিয়ে দিয়ে যাবে। তুমি তখন দেখবে চায়ের গরম জলের ভিতরে শুকনো শিকড়ের বদলে রয়েছে একখানি বাটিজোড়া ছড়িয়ে পড়া সবুজ পাতা। তারপরে পান কর বাটির সেই গরম ও তরল পদার্থ এবং পান করলেই জানতে পারবে এখানে চা বলতে কি বোঝায় তুমি তার কিছুই জানো না। কারণ তোমার মনে হবে তুমি যা পান করছ তা হচ্ছে উত্তপ্ত নালতের জল!

এ সব হোটেলের আর একটি বিশেষত্বের কথা বলা হয়নি। বেশ সাজানো গুছানো হলেও এসব জায়গায় গিয়ে হয়তো পাওয়া যাবে না বিলাতি চেয়ারের মতন কোনও আসন। প্রায় পাখির দাঁড়ের মতন সংকীর্ণ ছোট ছোট বেঞ্চি, তোমাকে গিয়ে বসতে হবে সেই রকম কোনও আসনের উপরেই।

মাঝে মাঝে এই রকম সব হোটেলে কৌতূহলী হয়ে যারা খেতে যায়, জাতে তারা চীনা নয়। আমরা যেদিনের কথা বলছি সেদিন রাত্রেও এই রকম একটি হোটেলের এক কামরায় বসেছিল দু'জন সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ পাঞ্জাবি খরিদ্দার। মাথায় তাদের যেন নিশান ওড়ানো পাঞ্জাবি পাগড়ি, দুই গাল দিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ জুলপি এবং ঠোঁটের উপরে রয়েছে সূক্ষ্ম ছাঁটা গোঁফ।

তাদের কামরার সামনেই একটি সাধারণ হলঘর। এবং তারই ও ধারে রয়েছে আর একটি মাঝারি আকারের কামরা, তার দরজার পর্দা ছিল সরানো।

তারা চীনা হোটেলে বিশেষ ভাবে তৈরি কাঁকড়ার উপরে মাঝে মাঝে চামচ চালনা করছিল এবং মাঝে মাঝে অবাক হয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিপাত করছিল ওধারের ওই কামরার দিকে।

ও কামরার সবটা দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু ওখানে যে লোক আছে দশ-বারজন, উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে সেটা বোঝা যাচ্ছিল বেশ ভাল করেই।

দরজার দিকে মুখ করে সামনেই যে মানুষটি বসে আছে, না দেখলে তার মূর্তি কল্পনাই করা যায় না। তার উপবিষ্ট মূর্তি দেখেই আন্দাজ করা যায়, উঠে দাঁড়ালে হয়তো সে মাথায় আট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না। আর সেই অনুপাতে চওড়াতেও তার মূর্তি হচ্ছে একেবারেই অসাধারণ। তার চোখের ভাব বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ সে পরেছিল কালো কাচের চশমা। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন মানুষের ভিতরের প্রকৃতি আন্দাজ করবার দু'টি উপায় আছে, চোখ আর ঠোঁট। ও লোকটির চক্ষে কালো চশমা থাকলেও সে লুকিয়ে রাখতে পারেনি তার ওষ্ঠাধরকে। সে যখন কথা কইছে না তখন তার ওষ্ঠাধরের উপর থেকে ফুটে উঠছে যে ক্রূরতা, যে

নিষ্ঠুরতা আর যে কুৎসিত হিংসার ভাব, ভাষায় তা বোঝানো যায় না! আবার সে যখন কথা কইছে তখন তার ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিবর্ণ অথচ চকচকে দন্তের সারি তা দেখলেই মনে পড়ে সিংহ বা ব্যাঘ্রের মতন কোনও রক্তলোভী হিংস্র জন্তুকে। লোকটা পরে ছিল ইউরোপিয় পোশাক, কিন্তু সে পোশাকে তাকে মোটেই মানাচ্ছিল না।

পাঞ্জাবি দুই খরিদ্দারের মধ্যে যার মূর্তি বৃহত্তর, সে আগে উচ্চকণ্ঠে ভাজা চিংড়িমাছ আনবার হুকুম দিয়েই অত্যন্ত নিম্নস্বরে বাংলা ভাষায় বললে, "মানিক, ও পাশে সামনের ঘরের ঐ মূর্তিটিকে দেখলে তোমার কী মনে হয়?"

—"নরদেহধারী রাক্ষস!"

—"ও কে জানো?"

—"কি করে জানব? ওকে আমি আগেও কখনও দেখিনি আর পরেও দেখতে ইচ্ছা করি না! ও হচ্ছে একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন!"

—"ঠিক বলেছ। ওরই নাম হচ্ছে চুয়াং!"

মানিক চমকে উঠল। তারপর সাগ্রহে নিজেদের কামরার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল সেই আশ্চর্য মূর্তিটাকে। তারপর ফিরে বললে, "আরব্য উপন্যাসে আর রূপকথায় যে সব দৈত্য আর রাক্ষসের বর্ণনা পড়েছি, চুয়াংকে দেখলে যে তাদের কথাই স্মরণ হয়! জয়ন্ত, অসাধারণ বলবান বলে তোমার একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু চুয়াং-এর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করলে তোমাকেও হয়তো হার মানতে হবে!"

জয়ন্ত আর একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে চুয়াং-এর দেহ যতটা দেখা যায় দেখে নিলে। তারপর ঠোঁট টিপে একটুখানি হেসে বললে, "মানিক, ক্ষুদ্র মানুষের কাছে হাতিরা হার মানে কেন?"

—"আগ্নেয়াস্ত্রের গুণে!"

—"না মানিক, তা নয়। যখন আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি হয়নি, পৃথিবী যখন সভ্য হয়নি, সেই স্মরণাতীত আদিম যুগেও ক্ষুদ্র মানুষের কাছে এখনকার চেয়ে ঢের বেশি বৃহৎ সেকালকার সেই রোমশ 'ম্যামথ' হাতিদের বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শক্তি পরীক্ষার সময়ে কেবল প্রকাণ্ড দেহ থাকলেই চলে না, যে যোদ্ধা অধিকতর রণকৌশলী, অধিকতর সাহসী আর অধিকতর বুদ্ধিমান, জয় হয় তারই। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও আমি বিশ্বাস করি, চুয়াং আকারে আমার চেয়ে বড় হলেও দেহের শক্তিতে সে বোধহয় আমাকে হারাতে পারবে না।"

ঠিক এই সময়েই একটি নূতন চীনে 'বয়' ভাজা চিংড়ির ডিশ নিয়ে তাদের কামরার ভিতরে প্রবেশ করলে। একখানা ডিশ রাখলে সে মানিকের সামনে এবং দ্বিতীয় ডিশখানা রাখতে গিয়ে জয়ন্তের দিকে তাকিয়েই সে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার এই সচকিত ভাবটা স্থায়ী হল এক পলকের জন্যে। তার পরেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত সহজভাবেই ডিশখানা জয়ন্তের সমুখে স্থাপন করে বেরিয়ে গেল কামরার ভিতর থেকে।

জয়ন্ত সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে চুপিচুপি বললে, "মানিক, তুমি ওই লোকটার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেছ কি?"

—"করেছি।"

—"লোকটা আমার মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল কেন?"

—"হয়তো ও চুয়াং-এর দলের লোক। হয়তো ও তোমাকে চেনে আর ছদ্মবেশের ভিতর থেকেও তোমাকে চিনতে পেরে চমকে উঠেছে।"

—"ভাল কথা নয় মানিক, ভাল কথা নয়! দেখতে হল।" জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কামরার পর্দার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

একটু পরেই জয়ন্ত দেখলে, সেই লোকটা একখানা খাবারের ডিশ হাতে করে ও ধারে চুয়াংদের কামরার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তারপর খাবারের ডিশখানা চুয়াং-এর সামনে রেখে তার কানে কানে কি যেন বলতে লাগল।

চুয়াং-এর কোনই ভাবান্তর হল না। এমন কি সে একবারও জয়ন্তদের কামরার দিকে ফিরে তাকালে না। কেবল মৃদুস্বরে সেই 'বয়'টাকে কি দু'একটা কথা বললে, কামরার বাইরে থেকে কেউ তা শুনতে পেলে না। চীনে 'বয়'টা চুয়াং-এর সামনে থেকে বেশ সহজভাবেই একখানা খালি এঁটো ডিশ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই কামরার অন্য দিকে চলে গেল।

জয়ন্ত আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "কিছুই বুঝলুম না। যাক গে! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এসো আগে তার সদ্ব্যবহার করা যাক!"

দু'জনে নীরবে ছুরি ও কাঁটা তুলে নিয়ে সামনের ডিশ দু'খানাকে আক্রমণ করলে।

মিনিটখানেক পরেই আচম্বিতে এক অন্ধকারের ধাক্কায় তারা দু'জনেই উঠল চমকে! হোটেলের সমস্ত ঘরের উপর নেমে এল এক অন্ধকারের বন্যা—নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক আলোকের কল বিগড়ে গিয়েছে!

হোটেলের কামরায় কামরায় বসে আহার করছিল তখন বহু খরিদ্দার—তারা সকলেই একসঙ্গে উচ্চ চিৎকার করে উঠল। সর্বত্রই দ্রুত পদের ও চেয়ার প্রভৃতি উল্টে পড়ার শব্দ এবং বিষম গোলমাল!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললে, "মানিক এখানে আর একদণ্ডও নয়, শিগগির বাইরে বেরিয়ে চলো!"

জয়ন্ত এবং মানিক দ্রুতপদে কামরার বাইরে গিয়ে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দি হল অনেকগুলো বজ্রবাহুর বেষ্টনে! তারা আত্মরক্ষা করবার এতটুকু সুযোগ পেলে না। কারা তাদের ধরে সজোরে ও নিষ্ঠুর ভাবে টানতে টানতে সেই অন্ধকারেই কোন দিকে নিয়ে চলল!

খানিকক্ষণ পরেই আবার আলো জ্বলে উঠল, এবং জয়ন্ত ও মানিক দেখলে তারা হোটেলের ভিতরকার এমন একটা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বাইরের খরিদ্দারদের আনাগোনা নেই। ইতিমধ্যে অন্ধকারেই শত্রুরা তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছিল।

তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচ ছয় তফাতে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং চুয়াং—মূর্তিমান পাহাড়ের মতন! এবং তারই আশেপাশে মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে আরও দশ-বারজন অতি কুৎসিত ও দেখতে ভয়াবহ চীনেম্যান! তাদের মধ্যে জন চারেকের হাতে চকচক করছে এক একটা রিভলবার!

চুয়াং-এর দু'টো মঙ্গোলীয় কুতকুতে চক্ষু জ্বলছিল যেন অঙ্গার খণ্ডের মতো। কিন্তু তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন। ধীরে ধীরে সে ইংরেজিতে বললে, "বাবু, আমি তোমাকে চিনি।"

জয়ন্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত কণ্ঠেই বললে, "চুয়াং, তুমিও আমার অপরিচিত নও।"

—"জানি বাঙালিবাবু, জানি। কি করে সন্ধান পেয়ে আমাকে আবিষ্কার করবার জন্যে তুমি গিয়েছিলে শ্যামদেশে। কিন্তু আমি যখন আড়ালে থাকতে চাই, তখন সারা পৃথিবীর কোনও গোয়েন্দাই কি আমাকে আবিষ্কার করতে পারে?"

জয়ন্ত হা হা করে হেসে উঠে বললে, "পারে না? এই তো আজই আমরা তোমাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি!"

—"কিন্তু এ আবিষ্কারে ফল হল কি? আমাকে যে আবিষ্কার করবে তার ভাগ্যে মৃত্যু অনিবার্য! অবশ্য, স্বীকার করছি যে, আজ তোমাদের দেখেও আমি চিনতে পারিনি, আর তোমাদের এখানে দেখবার জন্যে আমি প্রস্তুতও ছিলুম না! কিন্তু এই হোটেলেই আমার এমন কোনও পুরাতন চর আছে, যার দৃষ্টি হচ্ছে ঈগল পাখির মতন তীক্ষ্ণ! তুমি এবারে প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিলে, আমার ওই চরই হুকুম পেয়ে সেদিন তোমার পিছনে পিছনে গিয়েছিল তোমাকে বধ করবার জন্যে। সেদিন তুমি তার চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলে বটে, কিন্তু সে ভোলেনি তোমার মুখ। ছদ্মবেশের ভিতর থেকেও আজ সে তোমার মুখ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তোমার সঙ্গের এই বাঙালিবাবুটি আবার কে?"

—"আমার বন্ধু।"

—"তোমার বন্ধু? তার মানে আমার শত্রু?"

—"আমার বন্ধু তো তোমার শত্রু হওয়াই উচিত। কিন্তু যাক গে ও সব বাজে কথা। এখন বলো দেখি, তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাও?"

চুয়াং-এর সুদীর্ঘ মূর্তি যেন আরও উঁচু হয়ে উঠল। সে গম্ভীরস্বরে বললে, "কি করতে চাই? কি করতে চাই? তোমাকে যে বধ করতে চাই এটা বলাই হচ্ছে বাহুল্য!"

—"বেশ তো, তোমার সেই ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পারো। আমরা প্রস্তুত। মরতে আমরা ভয় পাই না।"

—"হতে পারে। হয়তো সত্যিই তোমরা মরতে ভয় পাও না। কিন্তু তোমাদের আমি মুক্তি দিতে রাজি আছি একটিমাত্র শর্তে।"

—"শর্ত ? শয়তানের সঙ্গে মানুষের শর্ত! শয়তান যা পালন করবে না সেই শর্ত?"

চুয়াং তার সেই সম্পূর্ণ ভাবহীন মুখেই ধীরে ধীরে বললে, "বাঙালিবাবু, তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও আমাকে শয়তান বলে গালাগালি দিচ্ছ, কিন্তু তবু আজ আমি তোমার উপরে রাগ করব না। যখন কাজের কথা ওঠে তখন রাগ করা উচিত নয়। আমার শর্তটা কি শুনবে?"

—"শোনবার জন্যে আমার কোনই আগ্রহ নেই। তবে বলতে যখন চাচ্ছ, বলো।"

চুয়াং সামনের দিকে আরও দুই পদ এগিয়ে এল। তারপর বললে, "আমি চাই বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি! এই দু'টি জিনিস যদি তুমি আমার হাতে সমর্পণ করতে পার, তাহলে আমি তোমাদের বধ করব না, মুক্তি দেব!"

—সত্যি নাকি? ধন্যবাদ! কিন্তু কেমন করে তোমার এই অনুগ্রহ আমরা গ্রহণ করব বলো দেখি?"

—"তোমার এ কথার অর্থ?"

—"তুমি যে দু'টো জিনিসের নাম করলে তা যে আমার সম্পত্তি নয়, এটা তো তুমি ভাল করেই জানো?"

—জানি বাঙালিবাবু, জানি। ও দু'টি জিনিসের সব ইতিহাসই আমি জানি। এও জানি যে, মনোমোহনবাবু আমার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বজ্রভৈরবের মূর্তি আর শিলালিপি তোমার জিম্মাতেই রেখে দিয়েছেন। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমাকে 'বলে দাও তুমি ওই দু'টি জিনিসকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। আমার লোকেরা এখনই গিয়ে অনায়াসেই তা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে। আর ভগবান কনফিউসিয়াসের নামে শপথ করে বলছি, ওই দু'টি জিনিস যে মুহূর্তেই আমি হাতে পাব, তোমাদের মুক্তি দেব সেই মুহূর্তেই!

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "বাধিত হলুম। চুয়াং, কিন্তু তুমি দু'টো বড় কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রথমত, তুমি যে দু'টি জিনিসের নাম করলে তা আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়ত, ও দু'টি জিনিস আমার হাতে থাকলেও আমি তোমার হাতে সমর্পণ করতে পারতুম না, কারণ ও দু'টি জিনিসের মালিক হচ্ছেন অন্য লোক।"

—"বাজে কথায় আমাকে ভুলোবার চেষ্টা কোরো না বাঙালিবাবু। আমি এক কথার মানুষ, বাজে কথা বলবার সময় আমার নেই। স্পষ্ট করে বলো, বজ্রভৈরব আর শিলালিপি তুমি আমাকে দেবে কিনা?"

—"যা আমার কাছে নেই, যা আমার জিনিস নয়, তা আমি তোমাকে দেব কেমন করে? আর জেনে রাখো চুয়াং, দেবার শক্তি থাকলেও ও দু'টি জিনিস আমি তোমার হাতে দিতুম না।"

—"তাই নাকি? তাহলে তোমার মরবার সাধ হয়েছে?"

—"মরবার সাধ না হলেও মানুষকে মরতে হয় যে কোনওদিন। মানুষ এই পৃথিবীতে চিরদিন বাঁচতে আসেনি , আর আমিও যে চিরদিন বাঁচব না সে কথা জানি। এতএব তোমার যা খুশি করতে পারো। বারবার বলছি তো, আমি মরবার জন্যে প্রস্তুত। মানিক, তোমার কি মত?"

—"তুমিও যখন প্রস্তুত, আমিও তখন অপ্রস্তুত নই বন্ধু!"

—"তাহলে জেনে রাখো চুয়াং, এই হল আমাদের শেষ কথা!"

চুয়াং অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার ভাবহীন স্থির মুখের ভিতর থেকে দু'টো জ্বলন্ত ক্রূর চক্ষু বার কয়েক জয়ন্ত ও মানিকের মুখের দিকে চঞ্চল ভাবে আনাগোনা করলে। তারপর সে বললে, "বাঙালিবাবুরা, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তোমাদের এই সাহস দেখে আমি যে বিস্মিত হয়েছি এ কথা স্বীকার করছি। কিন্তু চুয়াংকে তোমরা চেনো না—চুয়াংকে তোমরা চেনো না! মুগ্ধ কি বিস্মিত হলে আমার কাজ চলে না! যখন তোমরা এতই অবুঝ, তোমাদের উপরে মৃত্যুদণ্ডই দিলুম! তোমাদের মতন শত্রু আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ালে ওই বজ্রভৈরব আর শিলালিপি আমি যখন খুশি হস্তগত করতে পারব।" বলেই সে চীনে ভাষায় তার সঙ্গীদের সম্বোধন করে কি এক আদেশ প্রদান করলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরেরা জয়ন্ত ও মানিকের উপরে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে দিতে তাদের ঘরের বাইরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল।

হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে আবির্ভূত হল আর একটি চীনেম্যানের মূর্তি। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—আর মুখ দেখলেই মনে হয় তার মধ্যে আছে যেন প্রভুত্বের স্পষ্ট ভাব।

সে এসেই চীনে ভাষায় কি বললে, জয়ন্ত ও মানিক তা বুঝতে পারলে না। কিন্তু তার কথা শুনেই চুয়াং বিদ্যুতের মতন ফিরে দাঁড়াল এবং সেও কি কথা বললে তার মাতৃভাষায়।

তারপর চীনা ভাষাতেই তাদের দু'জনের কি কথাবার্তা চলতে লাগল। চুয়াং স্থিরভাবে শান্ত স্বরেই কথা বলতে লাগল, কিন্তু আগন্তুকের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত এবং তার কণ্ঠস্বরও চিৎকারেরই সামিল।

মিনিট তিন-চার পরে সেই নূতন আগন্তুক হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে খুব চেঁচিয়ে যেন কাকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো অতি দ্রুত পদশব্দ! দরজার বাইরে ছিল একটা মাঝারি আকারের উঠোন। দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন চীনেম্যান এসে সেই উঠোনটাকে প্রায় পরিপূর্ণ করে তুললে। হাত দিয়ে সেই লোকগুলিকে দেখিয়ে আগন্তুক চুয়াং-এর দিকে ফিরে আবার কি বললে।

আগন্তুকের কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুয়াং দীপ্ত চক্ষে একবার জয়ন্তের মুখের দিকে তাকালে, তারপর নিজের লোকদের প্রতি দিলে কি আদেশ।

হঠাৎ জয়ন্ত ও মানিককে ছেড়ে দিয়ে চুয়াং-এর দল নীরবে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। আগন্তুককে চুয়াং কি বললে অবরুদ্ধ গর্জনের স্বরে। তারপর তারও সুবৃহৎ মূর্তি ঘরের ভিতর থেকে হল অদৃশ্য!

আগন্তুক এগিয়ে এসে আগে বন্ধনমুক্ত করলে জয়ন্ত ও মানিককে। তারপর ইংরেজিতে বললে, "আমি এই হোটেলের মালিক।"

জয়ন্ত কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, "আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন, আপনার এ উপকার আমরা চিরকাল মনে করে রাখব। কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। চুয়াং আমাদের ধরলেই বা কেন, আর আপনার কথায় ছেড়েই বা দিলে কেন?"

মালিক বললে, "বাবু, ব্যাপারটা সংক্ষেপেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। বছর আষ্টেক আগে চুয়াং-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয় সিঙ্গাপুরে। সেই আলাপ প্রায় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তারপর আমি কলকাতায় এসে এই হোটেল খুলি, চুয়াং-এর সঙ্গে আর দেখাশোনা হয়নি। মাসখানেক আগে এই কলকাতাতেই আবার চুয়াং-এর দেখা পেলুম। সে বললে এই শহরেই থাকবে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমার হোটেলে এসেই রাত্রের আহারটা সেরে যাবে। চুয়াং যে নিরাপদ লোক নয় লোকের মুখে আমি একথা শুনেছি। কিন্তু সাধারণ খরিদ্দারের মতন সে যদি এই হোটেলে আসে তাতে আমার আপত্তি হবার কোনই কারণ ছিল না। চুয়াং বন্ধুবান্ধব নিয়ে রোজই এখানে আসত, তারপর খাওয়া দাওয়া আর গল্পগুজব করে আবার চলে যেত যথাসময়ে। আমি চুয়াং-এর দলের লোক নই। সুতরাং সে যে কখনও আমার হোটেলকে তার কার্যক্ষেত্র করে তুলতে পারে, এ সন্দেহ কোনদিনই আমি করিনি। আজ তার কাণ্ড দেখে প্রথমটা আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। ইলেকট্রিকের প্রধান 'সুইচ' টিপে চারিদিক অন্ধকার করে সে যখন আপনাদের বন্দি করে হোটেলের ভিতরের ঘরে টেনে নিয়ে এল, তখন আমার হুঁশ হল। বুঝলুম আমার হোটেলে যদি এইরকম কাণ্ড-কারখানা চলে, তাহলে আমি যে খালি খরিদ্দারদের

হারাব তা নয়, সেই সঙ্গে আমার উপরে পড়বে পুলিসের দৃষ্টি। আমার জীবিকা অর্জনের পথ তো বন্ধ হবেই, তার উপর হয়তো আমাকে গুরুতর রাজদণ্ডও ভোগ করতে হবে। চুয়াং ভেবেছিল, আমি তার স্বজাতি আর বন্ধু বলে তাকে কোনই বাধা দেব না। কিন্তু বাবু, আমি চিরদিন সৎপথে থেকে নিজের জীবিকা নির্বাহ করছি, আমি কি কোনওদিন তার পাপপথের সঙ্গী হতে পারি? সেইজন্যেই আমি তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে আপনাদের উদ্ধার করতে ছুটে এলুম। চুয়াং-এর মুখেই শুনলুম আপনারা বাঙালি। কিন্তু আপনারা ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন কেন, আপনারা কি পুলিসের লোক? চুয়াং কি কোনও গুরুতর অপরাধ করেছে?"

হঠাৎ একেবারে বদলে গেল জয়ন্তের মুখের ভাব। সে তাড়াতাড়ি বললে, "আর একদিন এসে আপনার সব কথার জবাব দিয়ে যাব, আজ আর সময় নেই! আপনার এখানে টেলিফোন আছে তো?"

—"আছে বইকি।"

—"চলুন, চলুন শিগগির আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলুন!"

জয়ন্তের এই আকস্মিক ভাব পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে মানিক চলল তার বন্ধুর পিছনে পিছনে।

টেলিফোনের 'রিসিভারটা' তুলে নিয়ে জয়ন্ত ডাক দিলে সুন্দরবাবুকে। তারপর বললে, "হ্যালো! কে, সুন্দরবাবু? হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। যা বলি মন দিয়ে শুনুন। সার্জেন্ট আর পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি বা মোটরে করে শিগগির আমার বাড়ির কাছে যান! আরে মশাই, এখন কোনও 'হুম' বললে চলবে না! যা বলছি তাই করুন, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। যদি কেউ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক উপায়ে আমার বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করে, তবে তখনই গ্রেপ্তার করবেন তাকে বা তাদের। আর যদি দেখেন সেখানে কেউ নেই, তাহলে রাস্তার আনাচে কানাচে লুকিয়ে আমার বাড়ির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আমিও খুব শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব।" 'রিসিভার'টা রেখে দিয়ে সে মালিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার হোটেলের পিছন দিয়ে বাইরে যাবার রাস্তা আছে?"

—"আছে। কেন বলুন তো?"

—"হোটেলের সামনের দিকের রাস্তায় চুয়াং-এর দলবল নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আপাতত তাদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আমার নেই।"

—"তাহলে আমার সঙ্গে আসুন বাবু!"

—"এসো মানিক!"

—"ব্যাপার কি জয়ন্ত?"

—"মনে একটা বিশেষ সন্দেহের উদয় হয়েছে। সন্দেহটা কি এখন তা আর বলব না। চলো।"

বাংলার শার্লক হোমস

হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে জয়ন্ত ও মানিক গিয়ে পড়ল একটা সরু গলির ভিতরে।

জয়ন্ত বললে, "দৌড় দাও মানিক, দৌড় দাও! এখন প্রত্যেক মুহূর্তটি হচ্ছে অত্যন্ত দামী।"

গলি ধরে ছুটতে ছুটতে তারা বউবাজার স্ট্রিটের উপরে গিয়ে পড়ল। সমুখ দিয়েই একখানা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, মানিকের সঙ্গে তার উপরে উঠে পড়ে জয়ন্ত বললে, "ড্রাইভার, যত তাড়াতাড়ি পারো গাড়ি চালিয়ে যাও! বখশিস পাবে!"

চালক খুব দ্রুতবেগেই গাড়িখানা চালিয়ে দিলে।

মানিক তাকিয়ে দেখলে জয়ন্তের মুখের উপরে দুশ্চিন্তার ছাপ! কোনওদিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বসে সে নীরবে কি ভাবতে লাগল। মানিক বুঝলে, এখন জিজ্ঞাসা করলেও তার বন্ধুর কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যাবে না। কাজেই সেও করলে না আর কথা কইবার চেষ্টা। ... ...

...গাড়ি জয়ন্তের বাড়ির সামনে এসে থামল। চালকের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েই জয়ন্ত ও মানিক দেখলে, আশপাশের অলিগলি থেকে সুন্দরবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসছে একদল পুলিসের লোক।

সুন্দরবাবু কাছে এলে পর জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন?"

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কিছু না, কিছু না! এমন কি একখানা মেঘও চাঁদের মুখ ঢাকেনি; একটা প্যাঁচাও ডাকেনি, একটা বাদুড় পর্যন্ত ওড়েনি! খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার চেষ্টায় ছিলুম, অনর্থক কেন বাবা তুমি আমাকে এমন ঘোড়দৌড় করালে?"

জয়ন্ত যেন আশ্বস্ত হয়ে বললে, "তাহলে আমার সন্দেহ ভুল। বাঁচা গেল!"

—"তুমি কি সন্দেহ করেছিলে?"

—"সুন্দরবাবু, চুয়াং আজ আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর কেন যে আমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সেকথা পরে শুনবেন। তবে সন্দেহটা যে কি সেকথা এখন বলতে পারি। চুয়াং-এর বিশ্বাস, বজ্রভৈরব আর শিলালিপিকে রক্ষা করবার জন্যেই মনোমোহনবাবু আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম, আমরা বাড়ির বাইরে আছি জেনে চুয়াং আজ আমার বাড়ির উপরে আবার হানা দেবার সুযোগ ত্যাগ করবে না। কিন্তু এখন দেখছি চুয়াং-এর মাথায় সেরকম কোনও বুদ্ধির উদয় হয়নি। যাক, তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমি দুঃখিত নই। নিরীহ মনোমোহবাবুকে এখানে একলা পেলে চুয়াং যে কি করত, ভগবানই জানেন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! ওই তোমার একটা ভারি বদ অভ্যাস জয়ন্ত! তুমি যখন যে অপরাধীর পিছু নাও, সর্বদাই যেন তাকেই দেখ সর্বত্র! আরে বাবা, চুয়াং এখানে এসে করবে কি? এটা তো চীনে মুল্লুক নয়, ওই চ্যাং-চোং-চুং বুলির কারদানি এখানে চলবে না!"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার ওই বাজে মুখসাবাসি রাখুন! চুয়াং এর মধ্যেই কলকাতায় এসে যেসব কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়েছে, তা কি আপনি জানেন না? আজ সকলের চোখের সামনে একটা সাধারণ হোটেলের ভিতরে চুয়াং আমাদের ধরে খুন করবার জন্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল! তখন তো আপনাদের পুলিসের কোনই সাড়া পাইনি!"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বললেন, "এ্যাঁ! বল কি হে মানিক, বল কি! হ্যাঁ জয়ন্ত, এ আবার কি শুনছি?"

—"আসুন, বাড়ির ভিতরে গিয়ে সব কথা বলছি।" বলে জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগল।

মিনিটখানেক কড়া নাড়বার পরও কেউ দরজা খুলে দিলে না।

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, "মধু, মধু, অ মধু! আমি বাড়িতে নেই বলে রাত এগারটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছ? শিগগির নেমে এসে দরজা খুলে দাও। মধু, মধু!"

মানিকও চিৎকার করে বললে, "মধু, মধু! আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে বাবা, ত্রাহি হে মধুসূদন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! মধুর ঘুম দেখছি আমারও চেয়ে ভারি!"

সকলে মিলে "মধু", "মধু" বলে চেঁচিয়ে রীতিমতো একটা কোলাহল সৃষ্টি করবার পরেও বাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া গেল না কোনও সাড়াশব্দই! জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "এ তো ভাল কথা নয়! এত কম রাতে মধু তো কখনও এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে না! আবার আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার যতসব বাজে সন্দেহ! ঘুম যে কি চীজ, আমি তা জানি! আমার বাড়িতে বজ্রপাত হলেও হয়তো আমার ঘুম ভাঙবে না।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ির ভিতরে খালি মধুই নেই, একথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন সুন্দরবাবু! মনোমোহনবাবুও আছেন। তাঁরও কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন?"

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, "জয়, ব্যাপারটা আমিও ভাল বুঝছি না! আমরা সবাই মিলে যে রকম আকাশভেদী কোলাহল করছি তার চোটে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হত, কিন্তু বাড়ির ভিতরে থেকেও মধু বা মনোমোহনবাবু কারুরই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? দরজা ভাঙা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই নেই!"

জয়ন্ত বললে, "বেশ! তাহলে দরজাই ভাঙো!"

কয়েকজন মিলে একসঙ্গে দরজার উপরে উপরউপরি সজোরে পদাঘাত করবার পরই সশব্দে খিল ভেঙে দরজার পাল্লা দু'খানা খুলে গেল।

জয়ন্ত বললে, "এই তো কলকাতার বাড়ির দরজা! এই রকম সব দরজায় খিল দিয়ে আমরা ভাবি, আমাদের আর কোনও ভয়ের কারণ নেই!...মধু কি আজ আলোগুলোও জ্বালেনি? বাড়ির ভিতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার!" বলতে বলতে সে সর্বাগ্রে এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ বাধা পেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল।

মানিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "কি হল জয়? হোঁচট খেলে নাকি?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এখানে একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে! তার গায়েই পা লেগে আমি হোঁচট খেয়েছি!" বলেই সে দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে আলোর চাবি টিপে দিলে।

দেখা গেল, সেইখানে মাটির উপরে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে জয়ন্তের ভৃত্য মধুর দেহ!

বন্ধনমুক্ত হয়ে মধু জানালে, খানিকক্ষণ আগে বাইরে থেকে সদরের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বাবু এসেছেন মনে করে সে নেমে দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু দরজা খুলে দেখে, বাইরে জনকয় চীনেম্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে; দরজা খোলা পেয়েই তারা হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে তাকে আক্রমণ করে তার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে। তারপর তারা বাড়ির উপরে উঠে যায়।

জয়ন্ত অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মনোমোহনবাবু কোথায়?"

—"ওপরেই আছেন।"

—"দেখছেন সুন্দরবাবু, চুয়াং সময় নষ্ট করে না? চলুন উপরে!"

দোতলায় উঠে সুন্দরবাবু বললেন, "একবার এখানকার ঘরগুলো খানাতল্লাস করব নাকি?"

—"কোনও দরকার নেই, আগে তেতলায় মনোমোহনবাবুর কাছে চলুন। ভগবান জানেন তাঁর এখন কি অবস্থা হয়েছে!"

মনোমোহনবাবু চেয়ারের উপরে বসেছিলেন এবং চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ বাঁধা! তাঁর মুখেও কাপড়ের শক্ত বাঁধন!

বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেই মনোমোহনবাবু বললেন, "বলেন কি মশাই, একটা মূর্তি আর একখানা শিলালিপির জন্যে শেষটা কি প্রাণে মারা পড়ব? মোটেই নয়, মোটেই নয়! ও দু'টো আপদ আমি কালকেই মিউজিয়ামে দান করব! চুয়াং পারে তো সেখান থেকে তাদের চুরি করুক!"

জয়ন্ত বললে, "সে কথা পরে হবে, এখন আজকের ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?"

—"বলব কি আর মাথা মুণ্ডু ছাই! নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছিলুম মশাই, আচমকা যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলুম। আমি ভাল করে কিছু আন্দাজ করবার আগেই একদল চীনেম্যান আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে।"

—"চুয়াংও এসেছিল নাকি?"

"বলেন কি মশাই, আসেনি আবার? হাড়জ্বালানো হাসি হেসে সে আমাকে বললে, 'আমি কথার মানুষ নই, কাজের মানুষ। যদি বাঁচতে চাও, এখনই সেই মূর্তি আর লিপি আমার হাতে দাও।' আমি জানালুম মূর্তি আর লিপি আমার কাছে নেই। সে চোখ রাঙিয়ে বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় আমার নেই। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো! এগারটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। এই তিন মিনিটের মধ্যে সেই দু'টো জিনিসের সন্ধান যদি না পাই, তাহলে গুলি করে তোমাকে কুকুরের মতন মেরে ফেলব।' বলেই সে রিভালবার বার করলে।"

সুন্দরবাবু বললেন "হুম! তারপর—তারপর?"

—"তারপর আবার কি, রিভলবারের কাছ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে আমি যখন গুপ্তকথা ব্যক্ত করতে যাচ্ছি, হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কেমন অস্বাভাবিক স্বরে একটা হুলো বেড়াল তিনবার ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চুয়াং বিষম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আমার মুখ বাঁধতে বাঁধতে দলের লোকদের কি ইঙ্গিত করলে, আর অমনি ওরা সকলে বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে তেতলার ছাদের দিকে উঠে গেল। চুয়াংও সরে পড়তে দেরি করলে না।"

জয়ন্ত বললে, "চুয়াং-এর চর ছিল রাস্তায়। বেড়ালের ডাক ডেকে সে জানিয়ে দিলে, ঘটনাস্থলে পুলিস এসে হাজির হয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেটারা তেতলার ছাদে গিয়ে উঠেছে? চলো, আমরাও সেখানে যাই।"

জয়ন্ত বললে, "পাহারাওয়ালাদের নিয়ে আপনি ছাদে যান। আমি এখন বাজে সময় নষ্ট করতে পারব না!"

—"মানে?"

—"মানে, ছাদে গিয়ে দেখবেন চুয়াং তার দলবল নিয়ে এতক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।"

—"তুমি এতটা নিশ্চিন্ত কেন?"

—"যে লোক এত সহজে ধরা পড়ে সে কোনওদিন চুয়াংয়ের মতন পৃথিবীবিখ্যাত অপরাধী হতে পারে না।"

—"বেশ, দেখা যাক।"

সুন্দরবাবু সদলবলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জয়ন্ত বললে, "মনোমোহনবাবু, আপনি আজ প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। চুয়াং নিশ্চয়ই তার বাক্য রক্ষা করত।"

—"বাক্য রক্ষা?"

—"হ্যাঁ। তার হিংস্র প্রকৃতির অনেক কাহিনীই আমি শুনেছি। এগারটা বাজবার আগে আপনি যদি মুখ না খুলতেন, সে আপনাকে গুলি করে মারতে একটুও ইতস্তত করত না। ভাগ্যে যথাসময়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসেছিল, ভাগ্যে যথাসময়েই আমি সুন্দরবাবুকে এখানে প্রেরণ করতে পেরেছিলুম! এখানে আপানার কিছু হলে আমার আর অনুতাপের সীমা থাকত না।"

মনোমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "না মশাই আমি আর এর মধ্যে নেই! চুলোয় যাক মূর্তি আর লিপি, আপনি ও দু'টো বিপজ্জনক জিনিসকে চুয়াং-এর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

মানিক বললে, "এই যে আপনি বললেন মূর্তি আর লিপি মিউজিয়মে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন? আমার মতে ওই ব্যবস্থাই ভাল।"

—"মোটেই নয়, মোটেই নয়! এখন আমি ভেবে দেখছি, চুয়াং তাহলে আমার ওপরে আরও বেশি রেগে যাবে। আমার অপঘাতে মরবার বাসনা নেই। জয়ন্তবাবু, ও দু'টো জিনিস আপনি চুয়াংয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।"

মানিক হেসে বললে, "আমরা চুয়াংয়ের ঠিকানা জানলে সে কি আর এত লাফালাফি করতে পারত?"

জয়ন্ত সামনের টেবিলের উপরে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে, "মনোমোহনবাবু মাঝে মাঝে চমৎকার ইঙ্গিত দেন। ঠিক বলেছেন চুয়াংয়ের ঠিকানা—চুয়াংয়ের ঠিকানা!"

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "হঠাৎ এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন হে? তুমি কি চুয়াংয়ের ঠিকানা জানো?"

—"তোমার প্রশ্নের উত্তরে মনোমোহনবাবুর ভাষায় বলতে পারি—মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

—"তবে?"

জয়ন্ত আর মুখ খুললে না, একেবারে চুপ করে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

এমন সময়ে সুন্দরবাবুর পুনঃপ্রবেশ। ডানহাতে তাঁর কুণ্ডলীকৃত দড়ি। তিনি বললেন, "হুম, ছাদে কেউ নেই।"

মানিক বললে, "দড়িগাছা কোথায় পেলেন?"

সুন্দরবাবু মুরুব্বির মতন ভারিক্কে চালে বললেন, "দড়িগাছা ছাদ থেকে ঝুলে জয়ন্তের বাড়ির পিছনকার বাগানের জমির ওপরে গিয়ে পড়েছিল। সুতরাং চুয়াং যে তার দল নিয়ে এই দড়ি ধরে বাগানের পাঁচিল টপকেপালিয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছি!"

মানিক দুই চক্ষু ডাগর করে তুলে বললে, "উঃ কী অদ্ভুত আবিষ্কার।"

সুন্দরবাবু চটে গিয়ে বললেন, "বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না মানিক! এ আমার আবিষ্কার নয় তো কি? একটু আগে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কি বলতে পারতে, চুয়াং কেমন করে পালিয়ে গিয়েছে?"

মনোমোহনবাবু বললেন, "মোটেই না, মোটেই না!"

মানিক হাত জোড় করে বললে, "আহাহা, চটেন কেন সুন্দরবাবু? আমরা একবাক্যে স্বীকার করতে রাজি আছি যে, আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের শার্লক হোমস!"

—"আবার বিদ্রূপ? মানিক, আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো? দিই তোমার পিঠে দুম করে এক ঘুষি বসিয়ে!"

মানিক তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুর সামনে পিঠ পেতে দিয়ে বললে, "আহা, তাই দিন দাদা, তাই দিন! বাংলার শার্লক হোমসের হাতের কিল খাওয়াও হচ্ছে মস্ত বড় ভাগ্যের কথা!"

সুন্দরবাবু এইবারে ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, "না মানিক, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! তুমি হচ্ছ একটি আস্ত ভাঁড়!"

—"আমি ভাঁড় কি খুরি কি সরা তা জানি না সুন্দরবাবু, কেবল এইটুকুই জানি যে আমি আপনাকে বড্ড, বড্ড ভালবাসি!"

—"ক্ষান্ত দাও মানিক, ক্ষান্ত দাও! আজ আর তোমার ভালবাসার নতুন কোনও নজির দিও না! তাহলে আমার পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়ে উঠবে কিন্তু!"

জয়ন্ত এতক্ষণ অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। হঠাৎ সে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "অনেকটা সময় খরচ করে ফেলেছি, অনেকটা সময় বাজে খরচ করে ফেলেছি মানিক!"

—"তোমার কথার অর্থ কি জয়?"

—"আচ্ছা মানিক, চুয়াং আজ সন্ধ্যার পর থেকে দু' দু'বার হার মানতে বাধ্য হয়েছে, কেমন?"

—"হ্যাঁ।"

—"রাত এখন প্রায় একটা বাজে। আজ বোধহয় নতুন কোনও অভিযানে বেরুবার জন্যে চুয়াং-এর মনে আবার নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার হবে না, কি বল?"

—"তাই তো মনে হয়। কিন্তু চুয়াং যে চীজ, তার সম্বন্ধে জোর করে কিছুই বলা যায় না।"

—"ও কথা আমিও স্বীকার করি। তবে চুয়াং যখন এখানে পুলিসের দল দেখে গেছে, তখন এদিকে বোধহয় আজ আর তার পা বাড়াবার ভরসা হবে না।"

—"না হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

—"এখন আন্দাজ করো দেখি, এখান থেকে চুয়াং কোথায় যেতে পারে?"

—"নিশ্চয়ই নিজের আস্তানায়।"

—"আমারও তাই বিশ্বাস। মনোমোহনবাবু একটু আগে চুয়াং-এর ঠিকানার কথা বললেন বটে, কিন্তু তার আস্তানার ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? ভেবে দেখো মানিক, ভেবে দেখুন সুন্দরবাবু!"

মানিক মৌন হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, আপাতত এক্ষেত্রে আমরা করতে পারি ছাই আর ভস্ম! চুয়াং কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তা আবিষ্কার করা কি বড় চারটি খানেক কথা! কি বলো মানিক?"

মানিক উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, "জয়, জয়, আজকেই চুয়াং-এর ঠিকানা বলতে পারেন একটি ভদ্রলোক!"

—"কে বলো দেখি?"

—"মিঃ সুং!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মিঃ সুং আবার কে বাবা?"

—"একটি চীনে হোটেলের মালিক। তিনি চুয়াং-এর দলের লোক নন, কিন্তু তার পুরাতন বন্ধু। খুব সম্ভব, তিনি চুয়াং-এর ঠিকানা বলতে পারেন।"

জয়ন্ত নিজের রুপোর শামুকদানি থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "সাবাশ, ঠিক বলেছ মানিক! আমি এখনই টেলিফোনে মিঃ সুং-এর সঙ্গে কথা কইব।" বলেই জয়ন্ত টেবিলের কাছে গিয়ে টেলিফোনের 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে মিঃ সুং-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করলে। ওদিক থেকে সাড়া আসতে খানিক দেরি হল, অত রাত্রে সুং নিশ্চয়ই শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর 'রিসিভারে'র মধ্যে জাগল একটি কণ্ঠস্বর।

জয়ন্ত বললে, "হ্যালো! কে আপনি? মিঃ সুং? এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন। আমি কে? আমি হচ্ছি জয়ন্ত—আজকেই আপনার হোটেলে যাকে আপনি চুয়াং-এর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন! তাহলে বুঝতে পেরেছেন? ধন্যবাদ! হ্যাঁ, আপনার কাছে একটি বিশেষ দরকারি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি চুয়াং-এর ঠিকানা নিশ্চয়ই জানেন? জানেন না, কি মুশকিল! কি বললেন? চুয়াং-এর বাসা আপনি চেনেন? সে একদিন সেখানে আপনাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল? খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা! তাহলে দয়া করে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন কি? কি অনুরোধ? আমার এখানে পুলিস ফৌজ প্রস্তুত হয়েই আছে। সবাইকে নিয়ে আমি এখনই আবার আপনার কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছি। আজ রাত্রেই আপনাকে আমাদের সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করে একবার বাইরে বেরুতে হবে। কি বলছেন? কাল সকালে হলেই ভাল হয়? না মিঃ সুং, কাল সকাল হবে অত্যন্ত অসময়! চুয়াং হচ্ছে অতিশয় ধড়িবাজ, আজকের রাতটা মিছে নষ্ট করলে কাল সকালে আমরা তাকে আর খুঁজে পাব বলে মনে করি না! আমি তাকে নিশ্বাস ফেলবার বা ভাববার সময় দিতে প্রস্তুত নই! যেতে যদি হয়, আজ এখনই আমাদের চুয়াং-এর বাসায় যেতে হবে। মনে রাখবেন মিঃ সুং, আজ আপনার হোটেলে যে বিশ্রী কাণ্ডটা হয়ে গেছে তার পরেও আপনি যদি আমাদের এটুকু সাহায্যও না করেন, তাহলে পুলিসের কাছে আপনার হোটেলের সুনাম বোধহয় বাড়বে না। কি বললেন? আপনি রাজি? ধন্যবাদ মিঃ সুং, ধন্যবাদ! ততক্ষণে আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে পড়ছি।" টেলিফোনের 'রিসিভার'টা আবার রেখে দিয়ে সে ফিরে বললে, "সুন্দরবাবু! জাগ্রত হোন! এখনই আরও কিছু পুলিসের লোক আর খানকয় গাড়ি আনবার ব্যবস্থা করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বলো কি জয়ন্ত! এই রাত্রে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—এই রাত্রে, আজই। চুয়াং, নিশ্চয়ই আজ আমাদের দেখতে পাবে বলে আশা করছে না, সে এখন অপ্রস্তুত! কাল সকালে তার বাসায় গেলে দেখব পাখি হয়তো উড়ে গেছে! আমি তাকে হাঁপ ছাড়তে দিতে রাজি নই!"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু টিন্তু এর মধ্যে নেই সুন্দরবাবু! এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী। আমার ঘরে রয়েছে টেলিফোন যন্ত্র, আপনি ইচ্ছা করলে সারা কলকাতায় আপনার কণ্ঠস্বরকে এখনই ছড়িয়ে দিতে পারেন। বসুন টেলিফোনের কাছে এসে। তারপর কার সঙ্গে কি কথা কইতে হবে সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল করে জানেন!"

মনোমোহনবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন, "বলেন কি মশাই, এক ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আপনারা আবার এক নতুন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে চান?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "এই রকমই আমাদের জীবন! আর আপনিও যখন আমাদের দলে এসে ভিড়েছেন, তখন আপনাকেও আমরা এখানে ফেলে যাব না, সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।"

মনোমোহনবাবু প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলন করতে করতে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "মোটেই নয়, মোটেই নয়! বাপরে, আপনাদের সঙ্গে আমি কোথায় যাব? উঁহু, উঁহু! অসম্ভব!"

—"বেশ, তাহলে আপনি এখানেই থাকুন। কিন্তু মনে রাখবেন মনোমোহনবাবু, এই বিচিত্র অপরাধী চুয়াং-এর কথা কিছুই বলা যায় না। আমরা একটা 'চান্স' নিয়ে দেখছি বটে, কিন্তু কে বলতে পারে, চুয়াং এখানেই আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে নেই? হয়তো আমরা যেই বেরিয়ে যাব, তখনই এইখানে হবে আবার তার আবির্ভাব! সে ঠ্যালা আপনি সামলাতে পারবেন তো?"

মনোমোহনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "বলেন কি মশাই! চুয়াং আবার এখানে আসতে পারে? আর তার ঠ্যালা সামলাব একলা আমি? মোটেই নয়, মোটেই নয়? যমালয়ে যদি যেতেই হয় তাহলে আপনাদের সঙ্গে যাত্রা করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য!"

সুন্দরবাবু প্রায় হতাশ কণ্ঠে বললেন, "পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে! কোনই উপায় নেই মনোমোহনবাবু, আমাদের কোনই উপায় নেই! যাই, এখন টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসি, জয়ন্তের আজ্ঞা পালন করি! হুম!"

চুয়াংয়ের বাগানবাড়ি

খিদিরপুর পার হয়ে, গঙ্গার ধারে অনেকটা নির্জন স্থানে মাঝারি আকারের বাড়ি—তার চারিধারে প্রাচীর দেওয়া প্রশস্ত উদ্যান।

অবশ্য উদ্যান বলতে যা বোঝায় এ বাগানটি ঠিক তেমনধারা নয়। এর কতক কতক জায়গায় বিবিধ ফুলের চারা বসিয়ে উদ্যান রচনার অল্পবিস্তর চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিরাজ করছে রীতিমতো একটা বিশৃঙ্খল দৃশ্য। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পুরাতন গাছ এবং এখানে ওখানে ঝোপঝাপের সংখ্যাও অল্প নয়।

এই খানিক সাজানো ও খানিক অগোছানো উদ্যানের উপরে আজ জেগে আছে প্রতিপদের প্রায় পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক। সকলে লক্ষ্য করে দেখেন কিনা জানিনা, কিন্তু চাঁদের আলোর মায়ামন্ত্রে ছাঁটা কাটা ফুলবাগিচারও চেয়ে বিশৃঙ্খল জঙ্গলের ঝোপঝাপ এবং এলোমেলো গাছের দলকেই মনে হয় ঢের বেশি সুন্দর! চাঁদের আলোর নিজস্ব রূপের লেখায় হেলে পড়া ভাঙা কুঁড়েঘরও হয়ে ওঠে বিচিত্র সৌন্দর্যময়! সুতরাং এই যত্ন এবং অযত্নের চিহ্ন নিয়ে এই উদ্যানটিও ভাবুকের চক্ষে আজ ফুটিয়ে তুলতে পারে রূপকথার সুমধুর স্বপ্ন!

বাগানের সীমানার বাইরে একদিক দিয়ে চলে গিয়েছে একটি রাজপথ। তারও দু'ধারে দাঁড়িয়ে ফুলের আদর মাখা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে নানান গাছের সবুজ পাতারা মর্মর স্বরে গেয়ে উঠছিল চন্দ্রকিরণের রাগিণী!

বাগানের আর একদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলরবে মুখরা গঙ্গা, সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্নার আশীর্বাদ নিয়ে তাকেও দেখাচ্ছিল উজ্জ্বল দুধের ধারার মতো।

পথের ধারের যে গাছগুলোর কথা বলেছি তাদের উপরে পাতা ডালপালার আড়ালে গা ঢেকে বসেছিল দলে দলে মানুষ! তাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাগানের মাঝখানকার বাড়িখানার দিকে। সে সব চক্ষের মধ্যে ছিল না চন্দ্রালোকের কবিত্বের ছাপ—ছিল শুধু শিকারী জীবের বুভুক্ষু দৃষ্টি!

একটা বড় ডালের উপরে সুন্দরবাবুর সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে জয়ন্ত ও মানিক।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "গতিক সুবিধের নয় বোধহয়।"

মানিক বললে, "কেন?"

—"বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। এখান থেকেই জানলা দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে, লোকজনেরা ব্যস্ত ভাবে এ ঘরে ও ঘরে ছুটোছুটি করছে। এত রাত্রে ওদের এমন ব্যস্ততা কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "দেখো, দেখো! বাগানের ফটক দিয়ে পরে পরে ভিতরে ঢুকছে একখানা বাস আর দু'খানা মোটরগাড়ি!" জয়ন্ত বললে, "আবার বলছি সুন্দরবাবু, গতিক বড় সুবিধের নয়। ভাগ্যিস আমরা কাল সকালে আসিনি!"

—"হুম!"

—"কাল সকালে এলে দেখতুম, পাখির খাঁচা খালি পড়ে আছে!"

—"ঠিক বলেছ। চুয়াং রাস্কেল বোধ হয় আজ রাত্রেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার ফিকিরে আছে!"

—"চালাকিতে চুয়াংয়ের জুড়ি মেলা ভার। সে বেশ বুঝেছে মিঃ সুংয়ের কাছে তার আস্তানা যখন অপরিচিত নয়, আর তিনি যখন তার পাপকার্যে সাহায্য করেননি, তখন এ বাড়ির ভিতরে সে আর নিরাপদে বাস করতে পারবে না। অতএব পুলিসের আবির্ভাবের আগেই এখান থেকে সে অন্তর্হিত হতে চায়! অদ্ভুত তার তৎপরতা! এইজন্যেই এত কাল ধরে সে পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পেরেছে—কারণ পুলিসের ঘুম ভাঙতে দেরি লাগে।"

সুন্দরবাবু সগর্বে বললেন, "ও কথা তুমি বলতে পারো না। এবারে পুলিসের ঘুম ভেঙেছে যথা সময়ে। বাগানবাড়ির চারিদিক ঘিরে যে জাল পেতে রেখেছি তা ভেদ করে আজ চুয়াং কেমন করে পালায় দেখি!"

—"অতটা নিশ্চিন্ত হবেন না সুন্দরবাবু। চুয়াং হচ্ছে পারদের মতন পিচ্ছিল। ধরেও ধরা যায় না।"

মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "বাড়ির সব ঘরের আলো নিবে গেল! একাধিক মোটর 'স্টার্ট' করার শব্দ জাগল!"

মিনিট দেড়েক পরেই দেখা গেল, বাস এবং মোটরগাড়ি দু'খানা বাগানের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

জয়ন্ত গাছের উপর থেকে নামতে নামতে বললে, "সুন্দরবাবু, পুলিস বাঁশি বাজিয়ে আপনিও মানিককে নিয়ে চটপট নেমে আসুন!"

রাত্রির বক্ষ ভেদ করে বেজে উঠল পুলিস বাঁশির তীব্র ও তীক্ষ্ণ ধ্বনি! সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো করতে লাগল মনুষ্য বৃষ্টি!

গাড়ি তিনখানা হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিয়ে বেগে ফটক পার হয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফটকের সমুখে এসেই তাদের গতি বন্ধ করতে হল, কারণ সামনেই পালাবার পথ জুড়ে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিসের লোক!

প্রথম গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন লোক ইংরেজিতে বললে, "কে তোমরা?"

সুন্দরবাবু বললেন, "পুলিস!"

—"আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন?"

—"তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করি না। চুয়াং কোথায়?"

—"চুয়াং!"

—"একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে!"

—"কে চুয়াং?"

—"তোমাদের দলপতি।"

—"আমাদের কোন দলও নেই, দলপতিও নেই। চুয়াং বলে কারুকে আমরা চিনি না।"

—"বেশ, আমরা সব গাড়ি খুঁজে দেখতে চাই।"

—"কোন অধিকারে?"

সুন্দরবাবু গর্জন করে বললেন, "পাজি ডাকু কোথাকার! ফের তুই প্রশ্ন করছিস?... সেপাই, এই সেপাই! গাড়ি তিনখানাকে ঘিরে ফ্যালো! সব ব্যাটাকে গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বাইরে এনে দাঁড় করাও!"

আচম্বিতে গাড়ি তিনখানা আবার 'স্টার্ট' নিয়ে পুলিস বাহিনীর দিকে তীরবেগে এগিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গাড়ির ভিতর থেকে হু হু করে বেরিয়ে আসতে লাগল রিভলবারের গুলি! পরমুহূর্তে পুলিসের আগ্নেয় অস্ত্রগুলোও করতে লাগল বিকট চিৎকার!

জয়ন্ত কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে বললে, "মানিক, ও গাড়ি তিনখানার মধ্যে নিশ্চয়ই চুয়াং নেই—সে কখনওই এমন বোকার মতন নিজের জীবনকে বিপন্ন করবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই গাড়ি থামিয়ে ওরা পুলিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল। চলো, আমরা বাগানে যাই।"

জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে অগ্রসর হল। চাঁদের আলোয় চারিদিক করছে ধবধব। সেই আলোতে খানিকটা তফাতেই দেখা গেল, একটা ঝোপ সন্দেহজনক ভাবে দুলে দুলে উঠছে!

তারা দু'জনেই সেইদিকে ছুটল এবং তৎক্ষণাৎ ঝোপের অপর পার্শ্ব ভেদ করে আবির্ভূত হল একটা সুদীর্ঘ ও প্রকাণ্ড মূর্তি এবং আত্মপ্রকাশ করেই সে মহা বেগে একদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে!

ছুটতে ছুটতে জয়ন্ত বললে, "ছোটো মানিক, যত জোরে পারো ছোটো! যা ভেবেছি তাই! ওই দেখো চুয়াং!"

চুয়াং খানিক দূর অগ্রসর হয়েই সামনে পেলে একটা মেদিপাতার বেড়া। এক লাফে সেই বেড়া অতিক্রম করে সে অন্য পার্শ্বে গিয়ে পড়ল এবং তারপর তাকে আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত এবং মানিকও লাফ মেরে সেই মেদিপাতার বেড়ার ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে আর অগ্রসর হবার উপায় নেই। কারণ তাদের সমুখেই কয়েক হাত তফাতে রয়েছে সেই বাগানবাড়ির সুদীর্ঘ দেয়াল এবং দেয়ালের ঠিক তলা দিয়ে একটানা চলে গিয়েছে সারিসারি ফুলন্ত কেনা গাছ। ডান দিকেও বাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রয়েছে করোগেট দিয়ে গড়া খুব উঁচু একখানা লম্বা ঘর—সম্ভবত সেখানাকে একাধিক মোটরের 'গ্যারেজ'রূপে ব্যবহার করা হয়।

সামনেই দেয়ালের পাশে একটা হাত তিনেক উঁচু কেনাগাছ তখনও দুলছিল ঘনঘন। নিশ্চয় সেই গাছটা কোন মানুষের দেহের আঘাত পেয়েছে!

কিন্তু সেখানে মানুষ কোথায়? এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে কোনও মানুষেরই লুকিয়ে থাকবার উপায় নেই, অথচ এইমাত্র তারা স্বচক্ষে চুয়াংকে বেড়া পার হয়ে এইখানে অবতীর্ণ হতে দেখেছে।

সামনের দিকে বাড়ির উচ্চ দেয়াল, ডান দিকে 'গ্যারেজে'র দেয়াল এবং বাম দিকেও খানিকটা পরেই সেই মেদিপাতার বেড়া দিয়ে জমিটা রয়েছে ঘেরা। চুয়াং যদি ওইদিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করত তাহলে কিছুতেই জয়ন্ত ও মানিকের দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না। চুয়াং সামনের দিকে, বাম দিকে ও ডান দিকে যায়নি, অথচ আচম্বিতে অদৃশ্য হয়েছে ঠিক যেন কোনও যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই!

জয়ন্ত পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেল! মাটির উপরে টর্চের তীব্র আলোক শিখা ফেলে জমির উপরটা পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ বাড়ির দেয়ালের সামনেই এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বললে, "এই দেখো মানিক! ফুলগাছের নরম জমির উপরে চারখানা সুবৃহৎ পায়ের টাটকা দাগ! নিশ্চয়ই চুয়াং মিনিট খানেক আগেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর পর এ পাশে আর ও পাশে আর কোনও পায়ের দাগ নেই। দেখলে সন্দেহ হয়, পৃথিবী এইখানে ঠিক যেন তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে! এও কি সম্ভব? এমন আশ্চর্য ব্যাপার তো জীবনে কখনও দেখিনি! সত্যই কি চুয়াং মায়াবী?"

মানিক স্তম্ভিত হয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পেলে না।

জয়ন্তও নীরবে বেড়া দিয়ে ঘেরা সেই জমির সব জায়গায় আলো ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু চুয়াং-এর আর কোনও চিহ্নই সে আবিষ্কার করতে পারলে না।

ওদিকে নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙানো আগ্নেয় অস্ত্রের গর্জন থেমে গিয়েছে খানিক আগেই। এখন দেখা গেল সুন্দরবাবু, মনোমোহনবাবু এবং কয়েকজন পাহারাওয়ালা বেগে ছুটে আসছে জয়ন্তদের দিকেই।

সুন্দরবাবু কাছে এসেই বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "হুম, হুম! আমরা করছি তুমুল যুদ্ধ, আর তোমরা কিনা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছ বাগানের বায়ুসেবন? ছিঃ জয়ন্ত,ছিঃ মানিক, এতটা আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করিনি!"

সুন্দরবাবুর তিরস্কার আমলের মধ্যে না এনেই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের তুমুল যুদ্ধের কি পরিণাম হল মশাই?"

—"পরিণাম?" সে একরকম মন্দের ভালই!"

—"মন্দের ভাল কিরকম?"

—"হতভাগাদের একখানা মোটর আমাদের ফাঁকি দিয়ে লম্বা দিতে পেরেছে! কিন্তু সেই বাসের আর একখানা মোটরের সব লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। যাদের গ্রেপ্তার করেছি তাদের মধ্যে তোমার চুয়াং-এর মতন কোনও অতিকায় দানবকে দেখতে পেলুম না! নিশ্চয়ই যে মোটরখানা পালিয়ে গিয়েছে, চুয়াং ছিল তার মধ্যেই!"

—"ভুল সুন্দরবাবু, ভুল! চুয়াং গাড়ি ছেড়ে আবার এই বাগানের মধ্যেই নেমে পড়েছিল। আমরা তার পিছনে পিছনে ছুটেছিলুম বটে, কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি। ঠিক এইখানে এসে একরকম আমাদের চোখের সামনেই চুয়াং করেছে সশরীরে পাতালের মধ্যে প্রবেশ!"

—"তুমি কি বলছ হে জয়ন্ত? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

—"মাথা খারাপ হয়ে গেলে আমি এতটা বিস্মিত হতুম না! চোখের সামনে এই দেখলুম চুয়াংকে, তার পরমুহূর্তেই দেখলুম চুয়াং আর আমাদের চোখের সামনে নেই! এ এক আজগুবি ভেল্কি!"

মনোমোহনবাবু দুই চোখ পাকিয়ে বললেন, "বলেন কি মশাই? একটা রক্তমাংসে গড়া আস্ত মানুষ—বিশেষ চুয়াং-এর মতন অমন মস্তবড় মানুষ, আপনাদের মতন পাকা শিকারীর চোখের সুমুখ থেকে কখনও হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

মানিক কিঞ্চিৎ তপ্ত স্বরেই বললে, "আমার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু জয়ন্তের চোখকে ফাঁকি দেয় এমন জীব বোধহয় পৃথিবীতে জন্মায়নি। চুয়াং আজ যে ভোজবাজির খেলা দেখালে, দুনিয়ায় তার তুলনা নেই!"

মনোমোহনবাবু তখন বললেন, "হতে পারে মানিকবাবু, হয়তো আপনাদের কথাই ঠিক! এখন আমার মনে হচ্ছে ব্রহ্মদেশে গিয়ে শুনেছিলুম, চুয়াং নাকি এক অদ্বিতীয় যাদুকর! সাধারণ মানুষ কি কখনও যাদুকরকে এঁটে উঠতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "যাদুকরের নিকুচি করেছে! আমি বেশ বলতে পারি জয়ন্ত আর মানিক ভুল দেখেছে, চুয়াং লম্বা দিয়েছে সেই পলাতক মোটরে চড়েই!"

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, "হয়তো আপনার কথাই ঠিক! হয়তো আমি আর মানিক যা দেখেছি সবই হচ্ছে স্বপ্ন!"

—"হুম, ও সব কথা চুলোয় যাক! এখন আমাদের কী করা উচিত?"

জয়ন্ত অকারণেই হঠাৎ রীতিমতো চিৎকার করে বললে, "বাগানের বাইরে চলুন, তারপর আমাদের কর্তব্য স্থির করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

একটি ফুলন্ত কেনাগাছ

রাত্রি তখন প্রায় প্রভাতের কাছে এসে পড়েছে।

স্তব্ধ পৃথিবী। গাছে গাছে ঘুমিয়ে পড়েছে মর্মরধ্বনি পর্যন্ত। এমন কি ঝিল্লীরাও ডেকে ডেকে শ্রান্ত হয়ে অবলম্বন করেছে মৌনব্রত।

বিশ্বের সবাই নিদ্রিত, ঘুম নেই কেবল চাঁদের চোখে। আজকের প্রতিপদের চাঁদ জানে, প্রভাতের প্রথম আলো ফুটলেও পাবে না সে ঘুমোবার অবসর! তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে সূর্যালোকের তীব্রতার মধ্যে।

সেই মেদিপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা জমিটুকুর ভিতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নাও।

আচম্বিতে জাগরণ দেখা গেল কিন্তু একটি অসম্ভব জায়গায়।

একটি পুষ্পিত কেনাগাছ আস্তে আস্তে মাটির উপর থেকে খানিকটা উঠে একটু সরে গিয়ে আবার পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েই দুলতে লাগল। তারপরই দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য, যেখানে গাছ ছিল সেইখান থেকে আত্মপ্রকাশ করলে বিপুলবপু এক মনুষ্যমূর্তি!

সামনের ঘাস জমির উপরে দাঁড়িয়ে মূর্তি একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে হেঁট হয়ে আস্তে আস্তে একদিকে অগ্রসর হতে লাগল।

মেদিপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে হঠাৎ জেগে উঠল আর একটা মূর্তি! সে লম্ফ দিয়ে বেড়া পার হয়ে এল এবং বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল সেই বৃহৎ মূর্তিটার দিকে!

বৃহৎ মূর্তিটা তাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই দ্বিতীয় মূর্তিটা তার উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে করলে এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, "চুয়াং! এইবারে তোমাকে পেয়েছি! তুমি দেবে জয়ন্তকে ফাঁকি?"

জয়ন্ত যে বিষম ঘুষি মেরেছিল বিষম বলিষ্ঠ লোকও তা সামলাতে পারত না, কিন্তু চুয়াং একবার হেলে পড়েই আবার সিধা হয়ে দাঁড়াল এবং চকিতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে জয়ন্তকে গুলি করতে উদ্যত হল ! কিন্তু জয়ন্ত বিদ্যুতের মতন হেঁট হয়ে বাম হাত দিয়ে রিভলবারসুদ্ধ চুয়াং-এর হাতখানা উপর দিকে ঠেলে দিলে এবং পরমুহূর্তেই চুয়াং-এর রিভলবার করলে আকাশের দিকে গুলিবর্ষণ!

চুয়াং তখন তার বিপুল বামবাহু দিয়ে জয়ন্তের দেহকে উপর দিকে তুলে উল্টে ফেলবার চেষ্টা করল। কিন্তু জয়ন্ত তার ডান হাত দিয়ে চুয়াং-এর বাম হাতখানা নিচের দিকে টেনে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুই পদ দিয়ে বেষ্টন করলে শত্রুর দুই পদকে! দু'জনেই প্রাণপণে পরস্পরের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল প্রায় একস্থানে দাঁড়িয়েই এবং এই ভাবেই কেটে গেল মিনিট খানেক!

খুব কাছেই শোনা গেল অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ! রিভলবারের গর্জন শুনে প্রথমেই বেগে ছুটে আসছে মানিক, তারপরেই সুন্দরবাবু এবং তারও পরে আসছে কয়েকজন 'সার্জেন্ট' ও পাহারাওয়ালা। তারাও সকলে এসে চুয়াং-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তাকে মাটির উপরে ফেলে দিয়ে তার দুই হাতে পরিয়ে দিলে হাতকড়ি!

জয়ন্ত দু'চারবার নিজের গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "চুয়াং, তুমি খুব চালাক, স্বীকার করছি! আসল ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু তুমি যে এই মেদিপাতার বেড়ার মধ্যেই কোনওখানে লুকিয়ে আছো, এবিষয়ে আমার একটুও

সন্দেহ ছিল না। একটা নিরেট মানুষ কখনও হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না! তাই আমি সবাইকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বেড়ার ও পাশে ঘুপ্টি মেরে বসে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম তোমার পুনরাবির্ভাবের জন্যেই! আমার অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে!"

চুয়াং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে সগর্জনে বলে উঠল, "বাঙালি কুকুর, আজ দল বেঁধে তুই যদি আমাকে আক্রমণ না করতিস, তাহলে কে তোকে আমার হাত থেকে রক্ষা করত?"

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠেই বললে, "চুয়াং, তোমাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! তোমার হাতে ছিল রিভলবার, আমাকে রিভলবার ব্যবহার করবার কোনও সুযোগই তুমি দাওনি! তবু আমি শুধু হাতেই তোমার রিভলবারকে ব্যর্থ করেছি আর তোমাকেও রেখেছিলুম বন্দি করে।... সুন্দরবাবু, খুলে দিন এই শয়তানের হাতকড়ি! উঠে দাঁড়াক এ আমার সামনে! আমি আজ আমার নিজের গায়ের জোরেই একে ফের মাটির উপরে পেড়ে ফেলব!"

মানিক এগিয়ে এসে জয়ন্তের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "না, না, না! পাগলা কুকুর হেরে গিয়েও গর্জন করতে পারে, কিন্তু মানুষ কবে যেচে কুকুরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে যায়? যথেষ্ট হয়েছে, এদৃশ্যের উপরে এখন যবনিকা পড়ুক!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "বন্ধু, যবনিকা পড়তে একটু দেরি আছে। এখনও দেখা হয়নি চুয়াং কোন কৌশলে পাতালের ভিতরে প্রবেশ করেছিল!" বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সেইখানে, যেখান থেকে চুয়াং করেছিল আশ্চর্য ভাবে আত্মপ্রকাশ!

প্রথমেই দেখা গেল ফুলগাছের নরম জমির উপরে বসানো রয়েছে একটা বড় গোলাকার পাত্র। কাঠ দিয়ে সেটা তৈরি এবং তার গভীরতা হচ্ছে প্রায় দেড়হাত! সেই গভীরতার শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে মাটি দিয়ে এবং সেই মাটির ভিতরে শিকড় রোপণ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফুলন্ত কেনাগাছ!

তার পাশেই মাটির ভিতরে রয়েছে একটা গর্ত, যার মধ্যে নেমে জয়ন্ত সকলেরই চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তারপর সে গর্ত থেকে আবার উপরে উঠে এসে বললে, "চুয়াং, তোমাকে আমি অভিনন্দন দিতে রাজি আছি। ধন্য তুমি! লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এমন উপায় যে কেউ অবলম্বন করতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা সম্ভবপর নয়।...সুন্দরবাবু, এই চমৎকার লুকোবার জায়গাটি চুয়াং আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছিল। সারি সারি কেনাগাছ, তারই মধ্যে একটি স্থানের একটি কেনাগাছকে তুলে প্রথমে সে কেটেছিল এই গর্তটি। তারপর সেই গর্তের মাপে তৈরি করেছিল একটি কাঠের বড় পাত্র। তারপর সে এই পাত্রের মধ্যে মাটি ভরে আবার পুঁতে দিয়েছিল কেনার চারা। এই চারার পাত্রটিকে আবার আমি গর্তের মুখে বসিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন, এর মধ্যে কোথায় ফাঁকি আছে তা ধরতে পারেন কিনা!" বলতে বলতে সে গাছ ও মাটিসুদ্ধ সেই গোলাকার পাত্রটিকে আবার দুই হাতে তুলে গর্তের মুখে বসিয়ে দিলে। তখন সেখানে যে কোনও গর্ত বা কাঠের পাত্র আছে সেটা বোঝাবার আর কোনও উপায়ই রইল না!

মানিক বললে, "আশ্চর্য! এত সহজে পৃথিবীকে ঠকানো যায়?"

মনোমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বলেন কি মশাই? অসাধু কখনও সাধুকে ঠকাতে পারে? মোটেই নয়, মোটেই নয়! এই দেখুন না, চুয়াং কি আজ জয়ন্তবাবুকে ঠকাতে পারলে?"

সুন্দরবাবু কোনওরকম মতপ্রকাশ না করে কেবল তাঁর সেই বিখ্যাত শব্দটি উচ্চারণ করলেন, "হুম!"

প্রভাত রক্তমাখা

প্রথম

হাওয়া খাওয়ার মানে দুধের সর খাওয়া

প্রস্তাবটা আমাদের নয়।

ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু সারা বছর গাধার খাটুনি (বাপ রে, উপমাটা আমাদের নয়, তাঁর নিজেরই) খাটবার পর একমাস ছুটির এক হুকুমনামা হস্তগত করেছেন। তিনি এই দুর্লভ ছুটিটার সদ্ব্যবহার করতে চান। অতএব এসে প্রস্তাব বা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি কলকাতার বাইরে দৌড় মেরে একমাস ধরে হাওয়া খাবার চেষ্টা করি, তাহলে তোমরাও কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে?'

আমি বললুম, 'আমার আপত্তি নেই। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করুন ওর কী মত?'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর মতন পেশাদার গোয়েন্দা যখন বায়ু ভক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত, তখন আমার মতো শৌখীন গোয়েন্দাই বা অপ্রস্তুত হবে কেন?'

সুন্দরবাবু প্রীত হয়ে বললেন, 'হুম্! তাহলে প্রস্তুত হও। আগামী পরশ্বই আমরা যাত্রা করব।'

—'কিন্তু কোথায়? যেখানে-সেখানে নাকি?'

—'পাগল না মাথা খারাপ! পুরীতে।

—'তথাস্তু।'

পুরীর সমুদ্রের ধারে সুন্দরবাবুর এক বন্ধুর চমৎকার একখানি বাড়ি ছিল, আজ সাত দিন সেইখানেই বাসা বেঁধে লবণাক্ত বায়ু ভক্ষণ ও দিগন্তব্যাপ্ত সমুদ্র-নীলিমা দর্শন করছি।

ঘরমুখো হয়েও বাঙালি অকবি ও সুকবিরা হাতের কাছে তাণ্ডবমত্ত, মন্দ্রমুখর ও দিগন্তব্যাপ্ত সমুদ্রকে পেলেই উচ্ছ্বসিত প্রাণে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্য ও গদ্য লিখে ফেলেছেন। কাজেই আমি আর সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটব না। সেখানে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রাতেও তেমন কিছু নূতনত্ব ছিল না। সামান্য যেটুকু ছিল এখানে তার অল্পস্বল্প নমুনা দেওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যখন—রাত্রি এসে মিশতে চায় দিনের পারাবারে—জয়ন্ত তখনই সাজপোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত প্রাতঃকালীন ভ্রমণে। আমি তার স্বভাব জানতুম, কাজেই ডাকাডাকি করবার আগেই উঠে প্রস্তুত হয়ে থাকতুম।

কিন্তু ভারি ঝামেলা পোয়াতে হত সুন্দরবাবুকে নিয়ে। তাঁকে জাগ্রত করবার জন্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মতো অসাধারণ আয়োজন করতে হত। তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে উচ্চরবে যে অদ্ভুত তন্দ্রাবন্দনার মন্ত্রধ্বনি নির্গত হত অনর্গল, আমাদের তুচ্ছ ডাকাডাকি বা চেঁচামেচি তা কিছুমাত্র আমলে আনত না। ধাক্কা মারলে তিনি 'উঃ', 'আঃ' প্রভৃতি শব্দ

উচ্চারণ করে এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুতেন এবং তাঁর বিরক্ত নাসিকা তখন আরও জোরে করতে থাকত তর্জন-গর্জন।

অবশেষে তাঁর চ্যাটালো পৃষ্ঠদেশে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করলে তাঁর নাসিকার সঙ্গীতসাধনা বন্ধ হত বটে, কিন্তু তবু তিনি নিদ্রাদেবীর আঁচল ছাড়তে চাইতেন না। তখন বাধ্য হয়েই প্রয়োগ করতে হত অব্যর্থ ঘুমতাড়ানিয়া ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ এক বা একাধিক ঘটি কনকনে ঠাণ্ডা জল!

এক-একদিন তিনি মহাক্রুদ্ধ হয়ে উত্তপ্ত বাক্য-উদ্গার করতেন, 'বেরোও তোমরা—দূর হও, চুলোয় যাও! আমি বেড়াতে যাব না—রাত্রির এই অন্ধকারে উন্মত্ত ছাড়া কেউ হাওয়া খেতে যায়?'

আমি হয়তো বলতুম, 'রাত্রি নয়, দাদা—এটা হচ্ছে ঊষাকাল। এই সময়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাওয়া খাওয়ার মানে দুধ থেকে সরটুকু তুলে নিয়ে টুক করে খেয়ে ফেলা।'

জয়ন্তও বেশ গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে উঠত, 'চলো হে মানিক, আজ আমরা দুই বন্ধুতেই দুধের সরের সঙ্গে তুলনীয় প্রাতঃসমীরণ ভক্ষণ করি গে—দরকার নেই বেতো, গেঁতো, ঘুম-কাতুরে বুড়ো সুন্দরবাবুকে।'

কিন্তু তারপর আমরা দুই বন্ধু বাইরের দিকে পদচালনা করতে না করতেই সুন্দরবাবু শশব্যস্ত হয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেন, বলে উঠতেন, 'দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও! অতটা মেজাজ না দেখালেও চলবে! হুম্, নিজের হাতে যখন খাল কেটে কুমির এনেছি, তখন আর উপায় কী? মরি বাঁচি—তোমাদের সঙ্গে যেতেই হবে!'

তারপর বেড়াতে বেরুনো। সমুদ্র ধারে তখন আলো-আঁধারির ফিনফিনে পর্দা ছিঁড়ে চোখ চালালেই আবছা-আবছা খানিক দেখা যায় এবং অনেকটাই দেখা যায় না। সে এক অভাবিত, অদ্ভুত দৃশ্য। দিকচক্রবাল জুড়ে বিরাজ করছে যেন কোনো বিশ্বব্যাপী হিংস্র, ক্ষুধার্ত ও মহাকায় দানব,—সে যেন গোটা পৃথিবীটাই এক গ্রাসে উদরস্থ করতে চায় এবং কণ্ঠে তার শত শত বজ্রের গর্জনে বারংবার ফুটে ফুটে ওঠে কী এক অজানা নিষ্ঠুর বুভুক্ষার বীভৎস প্রলাপ! আতঙ্কে বুক কাঁপে, সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে ওঠে।

সর্বোপরি আর একটা ব্যাপার অনুভব করা যায়। এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগতে আর সব ছাড়িয়ে বেজে বেজে ওঠে যেন এক মহা অমঙ্গলের ভয়াবহ মৌন সঙ্গীত—অশ্রান্ত তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে সে যেন সর্বদাই কানে কানে বলতে চায়—সর্বনাশ করব, সর্বনাশ করব, আমি তোমার সর্বনাশ করব!

সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করেন, বলেন, 'তোমরা ভালো করে আলো ফোটবার আগে বেরিয়ে পড়ো কেন বলো দেখি? আমার একটুও ভালো লাগে না। গা ছমছম করে, মনও ভয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে।'

এমনই কাণ্ড প্রায় প্রত্যহই। আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়

রক্তাক্ত প্রভাত

তখন নীলসায়রের আলোর শতদল তার পাপড়িগুলি মেলিয়ে দিয়েছে, চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে।

সমুদ্রসৈকতের বালুকাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, দেখ মানিক, সমুদ্রতীরের বালুতটের দিকে ভালো করে তাকালে দেখতে পাবে শত শত পদচিহ্নের কত বিচিত্র কাহিনী! শিশু, বালক, যুবা, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষেরা পদচিহ্নে পদচিহ্নে তাদের, আত্মকাহিনী রচনা করে চোখের সামনে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছে। তাদের কেউ ছুটেছে, কেউ সাবধানে সন্তর্পণে পা ফেলেছে, কেউ লাফালাফি করেছে, কেউ আছাড় খেয়েছে, কেউ বা মনের আনন্দে বালির উপরে গড়াগড়ি দিয়েছে, আবার একাধিক ব্যক্তি করেছে পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ! এসব তো খুব সহজেই ধরা পড়ে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নবিশারদরা পায়ের ছাপ দেখে অনায়াসেই ব'লে দিতে পারেন কেউ রোগা না মোটা, তার আন্দাজি বয়স, সে কেন দৌড়েছে বা দাঁড়িয়েছে বা বসে পড়েছে—এমনই আরও অনেক কথা। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর আফ্রিকার বুনো আদিবাসীরা এ বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়েছে। নাগরিক সভ্য ও শিক্ষিত গোয়েন্দারা বহু চেষ্টা করেও তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। এখনও অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যপ্রদেশে তাই পলাতক অপরাধীদের সন্ধান ও গ্রেপ্তার করবার জন্যে নিয়মিত মাহিনা দিয়ে সরকার থেকে সেইসব পদচিহ্নবিশারদ আদিবাসীদের নিযুক্ত করা হয়।'

সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বললেন, 'গোয়েন্দার পেশা কিছুদিনের জন্যে ভুলব বলেই ছুটিতে পুরীর সমুদ্রতীরে ছুটে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু এখানে এসেও কি তোমরা গোয়েন্দা আর অপরাধীদের নিয়ে সেই পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে আমায় জ্বালিয়ে মারবে? এইজন্যেই তো বলে থাকে—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে! থো কর বাবা, ওসব কথা থো কর!'

আমি বললুম, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, ভয় নেই। বন্ধুবর জয়ন্ত আজ অন্তত পদচিহ্ন নিয়ে কোনো মৌলিক গবেষণা করতে পারবে না।'

—'কেন পারবে না?'

—'সমুদ্রতীরে কোনও পদচিহ্নই নেই। কাল রাত্রে অত যে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল—সে কথা ভুলে গেলেন নাকি? রাত তিনটে সাড়ে তিনটের আগে ঝড়-জল থামেনি। সমুদ্রতীরে সমস্ত পায়ের দাগ নিশ্চয়ই ধুয়ে-মুছে গেছে।'

—'বাঁচা গেল বাবা!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'মোটেই বাঁচলেন না সুন্দরবাবু! বালির উপরে ওই দেখুন পদচিহ্ন! মানিক, তুমিও দেখ।'

তখন ভোরের কাঁচা আলো চিরমুখর সফেন তরঙ্গভঙ্গের উপরে ঝলমল করছে।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি আমাদেরও আগে—অন্তত ভোর পাঁচটার সময়ও লোকে সমুদ্রতীরে বেড়াতে আসে! আর একজন নয়, আর-একজনেরও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে যে! প্রথম পদচিহ্নগুলো বালির উপরে গভীর ভাবে বসে গিয়েছে—নিশ্চয়ই কোনও হৃষ্টপুষ্ট ভারি ওজনের লোকের পায়ের ছাপ। লক্ষ্য করে দেখ, মানিক—দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্ন অপেক্ষাকৃত অগভীর। দেখে মনে হয় সে রোগা আর মাথায় খাটো। আরও সন্দেহ হয়, সে খুব আলতো ভাবে পা ফেলে সন্তর্পণে প্রথম ব্যক্তির পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কেন?'

পদচিহ্নগুলো ধরে তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়েই জয়ন্ত আবার বললে, 'প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ব্যক্তি এই পর্যন্ত এসেই আর এগুতে পারেনি, ধড়াস করে বালির উপরে আছাড় খেয়ে পড়েছে। এই দেখুন সুন্দরবাবু, বালির উপরে একটা মানুষের দেহের ছাপ। সে আর উঠে দাঁড়ায়নি, কারণ তার পদচিহ্ন আর চোখে পড়ে না—কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নগুলো বরাবর সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে বালির উপরে পড়েছে, একটা ভারি মোট বা দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। তাই তো, ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে!'

এতক্ষণ জয়ন্তের চক্ষু বালির উপরেই নিবদ্ধ ছিল। এইবারে সে সোজা হয়ে সমুদ্রের দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেই সচমকে বলে উঠল, 'দেখুন সুন্দরবাবু, দেখুন, দেখুন! মাণিক, দেখ—জলের কাছ-বরাবর একটা মানুষের দেহ পড়ে আছে না?'

সুন্দরবাবু সেদিকে না তাকিয়েই নির্বিকারের মতো বললেন, 'বোধহয় কেউ আরাম করে বালির বিছানায় শুয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'বাড়িতে নিজের বিছানাতেও অমন অস্বাভাবিক ভাবে হাত-পা দু-দিকে ছড়িয়ে কেউ শুয়ে থাকে না। তারপর দেখছেন, ওর মাথা দিয়ে এখনও হু-হু করে রাঙা রক্তের মতো কি যেন বেরিয়ে আসছে?'

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'হুম্! আমি কিছুই দেখব না—আমি কিছুই দেখতে চাই না। এ মামলা আমার ঘাড়ে চাপবে না—এ হচ্ছে দস্তুরমতো উড়িষ্যা। সত্যি ভাই জয়ন্ত, তুমি দয়া করে ফিরে চলো—উড়িয়া পুলিস তাদের মামলা নিয়ে যত খুশি মাথা ঘামিয়ে মরুক, আমরা এখানে এসেছি খালি ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে। তা ছাড়া আমি আর কিছুই করব না। তুমি মাথা খুঁড়লেও নয়!'

কিন্তু জয়ন্ত তো পেশাদার পুলিস নয়—তার মাথার টনক নড়েছে, জাগ্রত হয়েছে তার আগ্রহ ও কৌতূহল! সুন্দরবাবুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল ভূপতিত নরদেহের দিকে।

আমিও এগিয়ে গেলুম।

একটা মোটাসোটা লম্বাচওড়া দেহ পড়ে রয়েছে জলের ধারবরাবর বালির উপরে উপুড় হয়ে এবং তার মাথার পিছন দিকে একটা বৃহৎ ও ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন—মস্তকের অনেকখানি অংশ যেন উড়ে গিয়েছে এবং দরদর ধারে নির্গত হচ্ছে রক্তের ধারা। দেখলে বুক শিউরে ওঠে।

জয়ন্ত নিজের মনেই বলে উঠল, 'বালির উপরে সন্তর্পণে পা ফেলে আসছিল যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, চুপিচুপি এসে পিছন থেকে নিশ্চয় সে গুলি ছুড়েছে। তারপর প্রথম ব্যক্তির প্রাণহীন দেহ বালিতে আছড়ে পড়তে সেটাকে টানতে টানতে সে সমুদ্রে বিসর্জন দেবার জন্যে নিয়ে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ এইখানেই লাশ ফেলে গা-ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কেন?'

তারপর বালির উপর পদচিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে আবার জয়ন্ত বললে, 'রহস্যটা যেন বুঝতে পারছি। এখান থেকে ফিরতি পদচিহ্নগুলো হঠাৎ লাশটা ফেলে খানিকটা দৌড়ে গিয়েই আবার থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর হনহন করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আর দৌড়োয় নি। মানিক, পদচিহ্নগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে তুমিও সব বুঝতে পারবে। কিন্তু খুনি হঠাৎ লাশ ফেলে দৌড় মেরেছিল কেন? খুব সম্ভব অন্য কারুর সাড়া পেয়েছিল।'

আমি বললুম, 'জয়ন্ত, লাশের ভয়ানক ক্ষতচিহ্নটা তুমি ভালো করে দেখেছ কি?'

—'দেখেছি। অসাধারণ ক্ষতচিহ্ন আর তার মূলে আছে কোনও অসাধারণ অস্ত্র।'

সুন্দরবাবু রাগে ভারি গলায় বললেন, 'ভেবেছিলুম মুখ খুলব না, কিন্তু তোমাদের এই সব ছেলেমানুষি কথা শুনে মুখ না খুলে আর করি কি?'

—'আপনি মুখ খুলে কী বলতে চান?'

—'খুব কাছ থেকে কেউ ছররা-ভরা বন্দুক ছুড়লেও এমনই ভয়ঙ্কর ক্ষত হওয়া অসম্ভব নয়।'

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, 'সম্ভব-অসম্ভবের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন কোন সময়ে এই খুনটা হয়েছে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সে সময়ে সমুদ্রতীরে কারুর উপস্থিতি সম্ভবপর নয়। লাশের জামা-কাপড়ও শুকনো। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়—মৃত ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ধরুন, ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা, কেননা—লাশের ক্ষতস্থানের রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ খুন হয়েছে অল্প খানিকক্ষণ আগেই। ভোরবেলায় সমুদ্রের ধারে কিছু লোক চলাচল হতে পারেই। এ সময়ে একটা বন্দুক ঘাড়ে করে বাইরে বেরুবে, কোনও অপরাধীই এতটা নির্বোধ নয়।'

—'তাহলে তোমার মতে খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে?'

আমি বললুম, 'রিভলবার।'

জয়ন্ত বললে, 'হতে পারে।'

—'হতে পারে কেন? তুমিও তাহলে নিশ্চিন্ত নও?'

—'আমি নিশ্চিন্ত।'

—'মাথার অতখানি অংশ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে, এমন শক্তিশালী রিভলবার আমি দেখিনি।'

—'আমি দেখেছি।'

—'তুমি দেখেছ?'

—'357 ক্যালিবারের ম্যাগনাম রিভলবারের নাম আপনি শুনেছেন?'

—'উহুঁ।'

—'আমি এক সাহেবের কাছে দেখেছিলুম। তার চেয়ে শক্তিশালী রিভলবার পৃথিবীতে আর নেই। তার গুলি ছোটে ২৭০০ গজ পর্যন্ত। তার গুলি ইটের দেওয়ালও ভেদ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমন ভয়াবহ অস্ত্র এদেশি অপরাধীদের হাতে আসবে কেমন করে?'

—'হুম্, তোমার ম্যাগনাম রিভলবারের প্রতাপ শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে!'

আমি সুন্দরবাবুকে একটু ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'আক্কেল গুড়ুমের কথা কী ভাবছেন দাদা, একবার টাক-গুড়ুমের কথাটা ভাবুন দেখি!'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'টাক-গুড়ুম? টাক-গুড়ুম আবার কী দ্রব্য?'

—'টাক-গুড়ুম কী দ্রব্য জানেন না? মনে করুন সেই ম্যাগনাম রিভলবারের একটা গুলি মহাশয়ের মাথাজোড়া ওই টাকের উপরে যদি ছিটকে এসে পড়ে, তাহলে ওই বিরাট টাকের সামান্য একটি টুকরোও কি আর পারবে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে?'

বলেই আমি চট করে পাশের দিকে ঝাঁপ খেলুম, কারণ সুন্দরবাবু হঠাৎ সগর্জনে 'মানিক!' বলে চেঁচিয়ে এবং দুই হাতে দুই ঘুষি পাকিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

জয়ন্ত হাত তুলে বললে, 'শান্ত হোন সুন্দরবাবু, আমার অনুমান সত্য নাও হতে পারে।'

সুন্দরবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'চুলোয় যাক তোমার অনুমান। যখন-তখন ওই হনুমান মানিকের মুখনাড়া আর আমি সহ্য করব না, করতে পারব না। ওই পাজির-পা-ঝাড়া লক্ষ্মীছাড়াকে আমি খুন করে ফেলব!'

আমি বললুম, 'হা ভগবান, শেষটা কি গোয়েন্দারাজ সুন্দরবাবু আসামি ধরা পেশা ছেড়ে দিয়ে নিজেই খুনি আসামি হবার চেষ্টা করবেন?'

জয়ন্ত বললে, 'স্তব্ধ হও মানিক! অসময়ে রসিকতা ভালো লাগে না। এখানে এখনই একটা নৃশংস নরহত্যা হয়ে গেছে—চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে আসামির টাটকা পদচিহ্ন। অবহেলা বা বিলম্ব করলে শত শত লোকের অসংখ্য পদচিহ্নের চাপে সমস্ত প্রমাণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি দেখা যাক, আসামির পদচিহ্নগুলো কোন দিকে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে।'

তৃতীয়

নুলিয়াদের কাহিনী

বিস্তৃত বালুতটের তলার দিকে নীল সমুদ্রের ফেনিল লাফালাফি এবং উপর দিকে একটি সংকীর্ণ পথের রেখা।

সেই পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে পদচিহ্নগুলো। কিন্তু তার অনুসরণ করে চোখ তুলতেই দেখা গেল, পথের উপরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন প্রায়-নগ্ন জেলে—এদেশে যাদের বলে 'নুলিয়া'।

নুলিয়াদের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'তোমরা এখানে অমন ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে কেন?'

—'পুলিসের জন্যে!'

—'পুলিসের জন্যে?'

—'হ্যাঁ। এখানে খুন হয়েছে।'

—'পুলিসে কোনও খবর দিয়েছ তোমরা?'

—'খবর দেবার জন্যে আমাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিয়েই তবে আমরা অপেক্ষা করছি।'

—'লাশ দেখেছ?'

—'এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। ভয়ে আমরা লাশের কাছে যাইনি।'

—'কারুকে দেখেছ এখানে? মানে কোনও মানুষকে?'

—'হ্যাঁ হুজুর, একটি বাবুকে দেখেছি।'

—'মাথায় খাটো, রোগা?'

—'হ্যাঁ। ছোটো-খাটো, রোগা চেহারা।'

—'গায়ের রং?'

—'কালো।'

—'বয়স?'

—'বলতে পারি না। বাবুর মুখ ততটা বুড়োটে নয়, তবে মাথার চুল আর গোঁফ দেখলে মনে হয় বুড়ো।'

—'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা বুঝি?'

—'একেবারে পাকা।'

—'দাড়ি নেই?'

—'না, বাবুজি।'

—'পোশাক?'

—'কালো রঙের পাঞ্জাবি আর পা-জামা।'

—'আচ্ছা, এইবারে তোমরা লাশটা কী ভাবে এসে দেখলে সেকথা বলো।'

—'আমরা পাঁচজনে খুব ভোরে রোজ যেমন বেরুই আজকেও তেমনি কাজে বেরিয়েছিলুম। তখনও চারিদিক ভালো করে ফরসা হয়নি, খানিক তফাতে নজর চলে না। আমরা ক-জন গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছিলুম। হঠাৎ যেন মনে হল, একটু দূরে কে একজন ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরই দেখি, সে তাড়াতাড়ি হন হন করে পা চালিয়ে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'একটু থামো। একটা কথা জানতে চাই!'

—'কী কথা?'

—'বন্দুকের শব্দ শুনেছ কেউ?'

—'না শুনিনি তো!'

—'ভালো করে ভেবে দেখো।'

—'উঁহুঁ, কিছুই শুনিনি।'

—'লোকটির হাতে বন্দুক-টন্দুক কিছু দেখেছিলে?'

—'না।'

—'কিন্তু বন্দুকের শব্দ নিশ্চয়ই হয়েছিল।'

—'তাহলে দূর থেকে আমরা শুনতে পাইনি। হুজুর, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সুমুদ্দুর এখানে গুড়ুম গুড়ুম করে সর্বদাই যে-রকম কামান দাগছে, তাতে কোনও বন্দুকের শব্দ তার ভেতর শোনা যাবে না!'

—'তা বটে। আচ্ছা, তারপর কী হল, বলো।'

—'এক ভদ্রলোক যেন ভয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—বাপরে, একটা লোক এখানে খুন হয়েছে।

'খুন! কোথায় খুন হয়েছে—কে খুন হয়েছে?

'কে খুন হয়েছে জানি না, কিন্তু তার লাশ ওইখানে পড়ে রয়েছে। উঃ, সে কি দৃশ্য!

'আমরা ভালো করে দেখলুম, একটা মানুষের দেহ বালির উপরে পড়ে রয়েছে বটে।

'ভদ্রলোক তখন বললেন—তোমাদের মধ্যে চারজন এইখানে পুলিস না আসা পর্যন্ত লাশ আগলে দাঁড়িয়ে থাকো—নইলে বিপদে পড়বে। আর একজন ছুটে গিয়ে থানায় খবর দাও।

'আমি বললুম, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, থানায় গিয়ে খবরটা আপনিই দিন না!

'বাবু আঁৎকে উঠে বললেন—ও বাবা, যা দেখেছি তাইতেই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেছে, তার ওপরে আবার ওই নিয়ে থানায় ছুটোছুটি আমার সহ্য হবে না—দেখছ না, আমি বুড়োসুড়ো মানুষ! এই বলে আঙুল তুলে দেখালেন নিজের মুখের পাকা গোঁফ আর মাথার পাকা চুল। তারপরই—আমাদের আর কিছু বলবার ফাঁক না দিয়েই তাড়াতাড়ি—প্রায় একরকম দৌড়েই ওইদিকে কোথায় যেন চলে গেলেন।'

জয়ন্ত বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে বালুতটের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখছি বাবুটি পথের ওপরে ওঠেনি, বালির ওপর দিয়েই হেঁটে গিয়েছে।'

—'হ্যাঁ হুজুর। বোধহয় তাঁর সামনের দিকে পথ জুড়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম, তাই।'

—'আচ্ছা, লক্ষ্য করে দেখেছ কি বাবুটির জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল কিনা?'

—'একে অল্প আলো, তায় বাবুটির জামা-পায়জামা কালো রঙের। রক্তের দাগ থাকলেও সহজে ধরা যায় না। তবে আপনি বললেন বলে খন মনে হচ্ছে, বাবুর জামার হাতা আর তলার দিক ভেজা-ভেজা ছিল।'

আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'খুনি কী-রকম চালাক লোক, বুঝেছ? সে কালো রঙের পোশাক পরে এসেছিল। তার ফলে একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয়েছে। প্রথম, আবছা আলো বা প্রায় অন্ধকারে কারুর চক্ষু সহজে তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না। দ্বিতীয়, কালো জামায় রক্ত লাগলেও হঠাৎ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। জামা ভিজে হলেও হতে পারে—সমুদ্রের তীর, জলে ভিজে গেছে। সতর্ক হয়েও কিন্তু তবু সে কিছু কিছু বোকামি করে ফেলেছে।'

—'কী রকম?'

—'সব বলবার সময় নেই। একটা বোকামি হচ্ছে, এখানে এসে উপরের রাস্তায় না উঠে, বালির উপরে পায়ের দাগ এঁকে সে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, তার গন্তব্যস্থল কোন দিকে। এস, আমরা সেই বোকামির সুযোগ গ্রহণ করি।'

আচম্বিতে সুন্দরবাবু আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!'

—'তার মানে?'

—'আর আমাদের পরের চরকায় তেল দিতে হবে না!'

পায়ের দাগ থেকে চোখ তুলে এবার জয়ন্তও শুধোলে, 'আপনার এতটা বিকট আনন্দের কারণ কী সুন্দরবাবু?'

—'তারা এসে পড়েছে।'

—'তারা? কারা?'

—'উড়িয়া পুলিসবাহিনী।'

—'তাতে হয়েছে কী? আমরা তো তাদের কাজে বাধা দিচ্ছি না। এসো মানিক, আমরা নিজেদের কাজ করি।'

—'যেয়ো না জয়ন্ত, যেয়ো না! আমার সঙ্গে এতদিন ঘর করেও দেখছি পুলিসকে তোমরা আজও ভালো করে চেনোনি। এসব হাঙ্গামা একটু আগেই চুকিয়ে দিয়ে পালাতে যখন পারোনি, পুলিস এখন আর তোমাদের অকুস্থল থেকে এক পা নড়তে দেবে না!'

তখন সমুদ্রতীরে বায়ুভক্ষক ও স্নানার্থীর দল বেড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। সুন্দরবাবুর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে জয়ন্ত ও আমি চেষ্টা করলুম তাদের দলে মিশে যেতে।

পথের উপর দিয়ে আসছিল আট-দশজন পুলিসের লোক। পিছনে পিছনে ভয়ে ভয়ে দু-জন নুলিয়া।

জয়ন্তের সঙ্গে আমি কয়েক পা এগুতে না এগুতেই ইনস্পেক্টারের পোশাক পরা এক ব্যক্তি চড়া গলায় কড়া স্বরে হুকুম দিলে, 'কোথা যাও? দাঁড়াও!'

অগত্যা আমাদের গতি রুদ্ধ হল। সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তাঁর মুখ বেশ প্রফুল্ল।

চতুর্থ

তুড়ির তালে ভৈরবী রাগিণী

ইনস্পেক্টার কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'কে তোমরা?'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি ইনস্পেক্টারের দিকে এগিয়ে চাপা গলায় কী সব বলতে লাগলেন। বোধহয় নিজের ও আমাদের পরিচয় দিলেন—কারণ সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেক্টারের মৌখিক ভাবের বড়ো একটা পরিবর্তন হল।

তিনি দুহাত তুলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে, বিনীত ভাবে মোলায়েম স্বরে বললেন, 'এ মামলায় আপনাদের মতো লোকের সাহায্য পাব,—এ আমার সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য! তারপর? আপনারা কী কোনও বিশেষ সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন এই হত্যাকাণ্ডের?'

জয়ন্ত অল্প কথায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করলে।

—'যা বললেন তা তো ভয়ানক কথা! দাঁড়ান, আগে স্বচক্ষে লাশটা দেখি।'

জয়ন্ত বললে, 'তারও আগে একটা কাজ করলে ভালো হয়। ক্রমেই ভিড় জমতে শুরু হয়েছে, পায়ের দাগগুলো রক্ষা করতে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'ঠিক বলেছেন। দাঁড়ান, আগে সেই ব্যবস্থাই করি।'

ফিরে এসে ইনস্পেক্টার বললেন, 'এইবারে চলুন, লাশটাকে পরীক্ষা করা যাক। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনারা কেউ লাশটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেননি তো?'

সুন্দরবাবু উত্তপ্ত স্বরে বললেন, 'মশাই, ভেবেছেন কি? আমরা কলকাতা পুলিসের লোক কি নিরেট বোকা? আমরা কি জানি না, এ হচ্ছে আপনাদের মামলা, লাশ ছোঁবার অধিকার আমাদের নেই?'

ইনস্পেক্টার লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, ভুলে গিয়েছিলুম।'

তারপর লাশের ক্ষতস্থান দেখেই তাঁর চক্ষু স্থির! প্রায় এক মিনিট কাল বোবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফারিত চক্ষে তিনি বললেন, 'ভয়ানক, ভয়ানক! কেউ কি ভদ্রলোকের মাথা লক্ষ্য করে কামান ছুড়েছিল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম 'সট-গান'—অর্থাৎ ছররাভরা বন্দুক।'

—'তাও অসম্ভব নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'উঁহুঁ! রিভলবার।'

—'বলেন কি মশাই? এমন রিভলবার আছে নাকি—মানুষের মাথাটা প্রায় যা উড়িয়ে দিতে পারে?'

—'আছে। ৩৫৭ ক্যালিবারের ম্যাগনাম রিভলবার। পৃথিবীতে ওর চেয়ে শক্তিশালী রিভলবার আর নেই। গুলি ছোটে ২৭০০ গজ পর্যন্ত। ইটের দেওয়ালও ভেদ করতে পারে।'

—'বাবা। ও রকম রিভলবার আমি কখনও চোখেও দেখিনি।'

এতক্ষণ পরে লাশটাকে উল্টে দেওয়া হল। সুন্দরবাবু তার মুখ দেখেই সচমকে বলে উঠলেন, 'এ কি! ইনি যে আমার চেনা লোক!'

ইনস্পেক্টার ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, 'আপনি এঁকে চেনেন? কে ইনি?'

—'মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। পাকিস্তানের জমিদার, এখন কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা। আমাদের মতন এখানে হাওয়া খেতে এসেছেন।'

—'তাহলে ঠিকানাটা বলুন, আমাদের খবর দিতে হবে। এঁর সংসারে কে কে আছেন?'

—'কেউ নেই। বিবাহ করেননি। ভাই-বোন কেউ নেই। একমাত্র ভগ্নি পরলোকে। ভগ্নির এক ছেলে আছে, কিন্তু সে কোথায় কেউ তা জানে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'সেই-ই মহেন্দ্রবাবুর অবর্তমানে সম্পত্তি লাভ করবে বটে, কিন্তু মাতাল, বখাটে আর জুয়াড়ি বলে অনেকদিন আগেই মহেন্দ্রবাবু তাকে বিদায় করে দিয়েছেন!'

—'তাকে আপনি দেখেছেন?'

—'না।'

—'তার নাম শুনেছেন?'

—'হ্যাঁ। মোহিতলাল।'

—'তার বয়স কত হবে বলতে পারেন?'

—'শুনেছি ত্রিশ-পঁইত্রিশ।'

—'তাহলে প্রায় যুবক?'

—'তা ছাড়া আর কি? বুঝেছি ভায়া, তুমি তার বয়স জানতে চাইছ কেন? সে বুড়ো হলে তুমি তার উপরে সন্দেহ করতে পারতে! কিন্তু সে বুড়ো নয়, তাকে সন্দেহ করবার কোনও উপায়ই নেই তোমার।'

—'নেই নাকি?'

—'না। আমার মতে অর্থলোভে কেউ এই খুন করেছে। মহেন্দ্রবাবুর হাতের আঙুলে দুটো আংটি ছিল,—একটা হিরার, আর একটা পান্নার। ওঁর হাতে ছিল সোনার দামী কবজি-ঘড়ি, পাঞ্জাবির বুকে ছিল মুক্তা-বসানো সোনার বোতাম। সে সমস্তই লোপাট হয়েছে দেখছি। মানিব্যাগটা বালির উপরে পড়ে আছে বটে, কিন্তু ভিতরে একটা আধলাও নেই। এসব গিয়ে ঢুকেছে হত্যাকারীর পকেটে।'

ইনস্পেক্টারও বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে অর্থলোভেই কেউ এই দুষ্কর্মটি করে এখান থেকে চটপট পিঠটান দিয়েছে।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সকলের মতেই আমার মত। এই খুনের কারণ অর্থলোভ। এখন কী করা উচিত?'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এখন খুনিকে অন্বেষণ করতে হবে আর কি!'

—'সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোন দিকে যাত্রা করবেন?'

—'আপাতত মহেন্দ্রবাবুর বাসার দিকে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মতে, সর্বপ্রথমেই অপরাধীর পায়ের ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।'

—'আহা, সে তো রাখবই। আপনি না বললেও রাখব—ও তো রুটিন-বাঁধা কাজ।'

—'দেখুন, সমুদ্রের বালির উপরে যারা খুন বা রাহাজানি করে, তারা হচ্ছে একান্ত নির্বোধ। বালির পট তাদের সমস্ত গতিবিধির নিখুঁত নক্সা তুলে রাখে। হয়তো অপরাধী এ বোকামি করত না! সময় থাকলে সমস্ত পদচিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়ে যেত। হঠাৎ ঘটনাস্থলে নুলিয়াদের আবির্ভাবে সে চটপট চম্পট দিতে বাধ্য হয়েছে। তার পদচিহ্ন এখান থেকে বাঁদিকে গিয়েছে। আসুন, আগে আমরা সেই চিহ্ন অনুসরণ করে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাই—কারণ পরে এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

—'ঠিক কথা। এ জায়গা হচ্ছে স্বাস্থ্যার্থী ও স্নানার্থীদের তীর্থক্ষেত্র। হাজার হাজার লোক এখানে আনাগোনা করে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সমুদ্রতিরে জনাকীর্ণ হয়ে যাবে। তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব।'

তখনও প্রথম উষার ঘোর ঘোর ভাবটা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ফিনফিনে চাদরের মতো। দূরের দিকে তাকাতে গেলেই দৃষ্টি যেন হোঁচট খেতে চায়। অনতিদূরেও ভালো করে নজর চলে না।

বালুকাতটের উপরেই আমাদের চেয়ে খানিক তফাতে একটা লোক পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিসের গতিবিধিই লক্ষ্য করছিল এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

একটা নুলিয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'হুজুর, দেখুন!'

ইনস্পেক্টার সুধোলে, 'কী দেখব?'

—'ওই ভদ্দরলোককে।'

—'হ্যাঁ, দেখছি। কে ও?'

—'যে ভদ্দরলোক আমাদের থানায় খবর দিতে বলে গেলেন, তাঁর পরণে ওই-রকম জামা আর পা-জামা ছিল।'

ইনস্পেক্টার আচম্বিতে জাগ্রত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দৃষ্টিচালনা করলেন। তারপর দেখতে দেখতেই বললেন, 'ওর জামা আর পা-জামা রঙিন বটে, কিন্তু কালো কি অন্য কোনো গাঢ় রং, এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'লোকটা মাথায় গান্ধী-টুপির মতন একটা সাদা টুপি পরে আছে। কিন্তু টুপির তলায় আছে পাকা কি কাঁচা চুল—তাও আন্দাজ করবার জো নেই। গোঁফ তো এত দূর থেকে দেখবার উপায়ই নেই। কিন্তু হাবভাব দেখে লোকটাকে সন্দেহজনক বলেই বোধ হচ্ছে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কোনও মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিসের চোখে সকলেই সন্দেহজনক।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক কথা। ডাক দিন তবে লোকটাকে, আসতে বলুন এগিয়ে।'

ইনস্পেক্টার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব ভারিক্কি করে তুলে হাঁক দিলেন, 'এইও! কে তুমি? কী দেখছ? এদিকে এসো!'

লোকটা তটস্থ হয়ে উঠল সেই ডাকে। তারপর শুনতে পায়নি—এইরকম অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে সুড় সুড় করে অন্যদিকে চলে যেতে লাগল।

ইনস্পেক্টার ব্যস্ত ভাবে বললেন, 'আরে আরে, আবার সরে পড়তে চায় যে! এই সেপাই! জলদি! আসামি ভাগতা হায়! পাকড়ো, পাকড়ো!'

দু-জন পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ দৌড় মেরে লোকটাকে ধরতে গেল।

কিন্তু সে মোটেই ধরা দিতে রাজি নয়। সেও দৌড় মারলে তৎক্ষণাৎ।

পাহারাওয়ালাদেরও গতি দ্রুত হয়ে উঠল অধিকতর। পলাতকও পদচালনা করলে প্রাণপণে। তারপর ধাবমান লোকগুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে সূর্যকরহীন উষাকালের ক্ষীণ আলোর আমেজমাখা ছায়ালোকের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু উত্তেজিতভাবে ইনস্পেক্টারকে বার বার বলতে লাগলেন, 'সন্দেহজনক! খুবই সন্দেহজনক! ও ব্যাটা খুনে না হয়ে যায় না!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সন্দেহজনক তো বটেই। নইলে ওভাবে পালাবে কেন?'

জয়ন্ত নির্লিপ্তের মতন শিস দিয়ে ধরলে ভৈরবী রাগিণী এবং আমি দিতে লাগলুম তার তালে তালে তুড়ি।

সুন্দরবাবুর বিশ্বাস হল জয়ন্ত ও আমি তাঁকে ব্যঙ্গ করছি। অভিমানে ফুলতে ফুলতে তিনি বললেন, 'এই ডামাডোল, এখন কি শিস আর তুড়ি দেবার সময়?'

কিন্তু সুন্দরবাবুর এই গুরুতর অভিযোগ জয়ন্ত ও আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করবার পথ পেলে না। সুর-সাধনায় আমরা তখন মেতে উঠেছি।

ইনস্পেক্টার হঠাৎ আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে—আসামিকে নিয়ে ওই ওরা ফিরে আসছে!'

দেখা গেল দুই পাহারাওয়ালা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে জনৈক আসতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে। দেখতে দেখতে তারা কাছে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু আসামির গান্ধীটুপির তলায় দেখা যাচ্ছে কুচকুচে কালো চুল।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'আর এর ঠোঁটের উপরে গোঁফের নামমাত্র চিহ্নও নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর এর জামা বা পা-জামার রংও কালো নয়। সবুজ!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ধেৎ, কিচ্ছু মিলছে না।'

বন্দী ততক্ষণে আমাদের সামনে এসে হাজির।

জয়ন্তের শিস এবং আমার তুড়ি থামল। ইনস্পেক্টার বললেন, 'কে তুমি? ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে?'

—'আজ্ঞে, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসে পুলিস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম।'

—'পালাচ্ছিলে কেন?'

—'খামোকা পুলিস ধরতে এলে ভয়ে কে না পালায়?'

নুলিয়ারা এসে একসঙ্গে মতপ্রকাশ করলে, বন্দীকে এর আগে তারা চোখেও দেখেনি।

বালির উপরকার পদচিহ্নের সঙ্গে বন্দীর পদচিহ্নও মিলল না। না মাপে, না ছাপের বিশেষত্বে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্।'

ইনস্পেক্টার মাথা চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, 'তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। এইবারে আসুন, পদচিহ্নের অনুসরণ করা যাক।'

আমি বললুম, 'সুন্দরবাবুর হয়ে আমিই বলছি জয়ন্ত,—তথাস্তু।'

পঞ্চম

মাথার চুল কাঁচা নয়

পদচিহ্নের সারি ধরে সকলে অগ্রসর হলাম। এখানে একটা নরহত্যা হয়েছে, এর মধ্যেই সে কথা কেমন করে দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখবার জন্যে জনসাধারণের—বিশেষত অশিক্ষিত লোকের মনে একটা বিকৃত ও অভব্য কৌতূহল জাগ্রত হয়, তাই চারিদিক থেকে শত শত লোক ব্যগ্রভাবে কাতারে কাতারে ছুটে আসছে।

তাদের এড়িয়ে সবাই যেখানে এসে থামলুম, পদচিহ্নের সারি শেষ হয়েছে সেইখানেই। তারপর আসামি পথের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কোনও পদচিহ্নের সাহায্য পাবার উপায় নেই।

পথের ঠিক ওপাশে একখানা বাড়ি, তার উপরে সাইনবোর্ডে লেখা—পুরুষোত্তম পান্থনিবাস।

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এখন আমরা কী করব? দিগ্বিদিকে পদচালনা?'

ইনস্পেক্টারের ঠাট্টার সুরটা আমলে না এনে জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বললে, 'এখানে দুটো সম্ভাবনা থাকতে পারে।'

—'যথা—?'

—'এক, অপরাধী রাস্তায় উঠে বাঁদিকে—অর্থাৎ 'স্বর্গদ্বারে'র দিকে অগ্রসর হয়েছে।'

—'আর?'

—'আর একটা সম্ভাবনা আছে। এতখানি পথ বালির উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে সে হঠাৎ এইখানেই রাস্তায় উঠল কেন?'

—'এর উত্তর দিতে পারে অপরাধীই।'

—'কিন্তু কিছুটা আমরাও অন্তত অনুমান করতে পারি। হয়তো সে সামনের ওই 'পুরুষোত্তম পান্থনিবাসে' এসে উঠেছে। হয়তো তার বাসা ওইখানেই।'

—'খুব সহজেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

—'হ্যাঁ, খুব সহজেই। আসুন, আমরা পান্থনিবাসে প্রবেশ করি।'

পাছে পুলিস দেখে পান্থনিবাসের লোকেরা প্রথমেই ভড়কে যায়, সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম জয়ন্ত আর আমি। তারপর জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে ডাক দিলে—'পান্থনিবাসের মালিক কোথায়?'

একজন ভুঁড়িওয়ালা আধাবয়সী লোক উঠানের প্রান্তে উবু হয়ে বসে দাঁতের উপরে দাঁতনকাঠি ঘর্ষণ করছিল। থুতু ফেলে মুখ তুলে সে সুধোলে, 'মালিক হচ্ছি আমি। মশাইদের কী দরকার?'

—'বাইরে আসুন, বলছি।'

হোটেলের নূতন অতিথি ভেবে সে হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং পর মুহূর্তে দলবদ্ধ পুলিস দেখে তার মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে গেল, সচমকে বললে, 'ব্যাপার কী? পুলিস কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার কোনও ভয় নেই। যা জিজ্ঞাসা করি, সঠিক জবাব দিন।'

—'কী জানতে চান, বলুন।'

—'সকালে আপনার ঘুম কখন ভেঙেছে?'

—'ভোর পাঁচটার অনেক আগেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। আমি হোটেলের মালিক, আমার অনেক কাজ।'

—'বেশ। পাঁচটার আগেই যদি কেউ আপনার এই পান্থনিবাস থেকে আজ বাইরে বেড়াতে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন?'

—'নিশ্চয়! পাঁচটার আগে আজ বেড়াতে গিয়েছিলেন কেবল একজন।'

—'তাঁর নাম?'

—'আনন্দবাবু।'

—'তিনি কি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা?'

—'না মশাই, স্থায়ী বাসিন্দা এখানে কেউ নেই। আনন্দবাবু তিনদিন আগে এসেছেন—ঘরভাড়া নিয়েছেন মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।'

—'তিনি কি বুড়োমানুষ?'

—'তাঁর মুখ তেমন বুড়িয়ে না গেলেও মাথার চুল আর গোঁফ বেশ পাকা। যখন-তখন গোঁফ আর মাথার চুল দেখিয়ে তিনি নিজেই যখন নিজেকে বুড়ো-হাবড়া বললেন, তখন আমরাও তাঁকে বুড়ো বলতে পারি নিশ্চয়।'

—'তাই নাকি, তাই নাকি? তা মালিক-মশাই, আনন্দবাবু লোকটি কি রোগাসোগা আর মাথায় ছোটখাটো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'গায়ের রং কালো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক মিলে যাচ্ছে।'

—'আজ তিনি কালো পাঞ্জাবি আর পাজামা পরেছিলেন?'

—'কী আশ্চর্য, সবই যদি জানেন তো আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

—'তিনি কি বেড়িয়ে ফিরে এসেছেন?'

—'এই একটু আগে এসেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।'

—'তাঁর ঘর কোন দিকে?'

—'এই যে, বাইরে থেকেই দেখা যায়। দোতলার ওই কোণের ঘরখানা।'

—'চুপি চুপি আমাদের ওপরে নিয়ে চলুন। আমরা তাঁকে ডাকব না, আপনি ডাকবেন।'

জয়ন্ত ও উৎকল পুলিসের লোকজনদের সঙ্গে আমিও যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পান্থনিবাসের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

কিন্তু সুন্দরবাবু সেইখানেই গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি জানতুম তিনি আসবেন না, তবু মুখ টিপে হেসে বললুম, 'আরে আপনি হচ্ছেন নৈবেদ্যের উপরে চুড়ো-সন্দেশের মতন, আপনি আসবেন না দাদা?'

—'মানিক, তোমার পোড়ার মুখে হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়! পরের ধান্দা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? যাব না, যাব না, আমি যাব না!'

আমি আর কিছু বললুম না। তবে এটুকু বুঝে নিলুম, সুন্দরবাবুর মগজে তখন গজ গজ করছে ম্যাগনাম রিভলবারের দেওয়ালভেদী প্রচণ্ড গুলি!

সবাই একসঙ্গে টিপে টিপে পা ফেলে দোতলার বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। তারপর একটা বন্ধদ্বার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজার একপাশে আমি আর জয়ন্ত, আর একপাশে উৎকল পুলিসের চারজন লোক, মাঝখানে পান্থনিবাসের মালিক।

জয়ন্তের ইঙ্গিতে ইনস্পেক্টার রিভলবার বার করে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বিস্ফারিত চক্ষে এই সব অভাবিত আয়োজন দেখে মালিক ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন, 'আনন্দবাবু!'

সাড়া নেই।

মালিক আবার ডাকলেন, 'অ আনন্দবাবু! আমি পান্থনিবাসের কর্তা কথা বলছি।'

উত্তরে একটি টুঁ শব্দও শোনা গেল না।

জয়ন্ত সন্দিগ্ধভাবে তখন এগিয়ে ঠেলা মারতেই দরজাটা খুলে গেল।

মালিক ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে বিস্মিত স্বরে বললে, 'আরে, ঘরের ভেতরে তো জনপ্রাণী নেই! আনন্দবাবুকে তো আমি এ-বাড়ির বাইরে যেতে দেখিনি!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কেউ বাইরে যাবে কী করে? সদর দরজা তো আগলে ছিলুম আমরা।'

মালিক বললেন, 'বাড়ির পিছনে যে খিড়কির দরজা একটা আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, তবেই হয়েছে! আর কিছু বলতে হবে না। আপনি যখন বাইরে গিয়ে কথা কইছিলেন, সেই অবসরে আনন্দ টেনে চম্পট দিয়েছে।'

ইনস্পেক্টার হতাশভাবে বললেন, 'অপরাধীকে হাতের কাছে পেয়েও হারালুম। কপাল দেখছি নিতান্ত খারাপ! যাক গে, কী আর করা যাবে, তবে একবার ঘরের ভিতরে ঢুকে খানাতল্লাস করা দরকার।'

মালিক বললেন, 'কী খানাতল্লাস করবেন? আনন্দবাবু সঙ্গে এনেছিলেন তো একটা ছোটো সুটকেশ—তার জন্যে মুটেরও দরকার হয় না। আনন্দবাবু যখন নেই, সুটকেশটা কি আর আছে?'

মালিক ভুল বলেননি, ঘরের ভিতরে কিছুই পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে, 'ভয় নেই ইনস্পেক্টার মশাই, হাল ছাড়বেন না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা খুব বেশি অগ্রসর হয়েছি। অপরাধের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তদন্ত সুরু করেছি বলেই এই হোটেল পর্যন্ত আসা সম্ভবপর হয়েছে। এখানে আমাদের হাত এড়ালেও অপরাধী যে এখনও পুরীধামেই অবস্থান করছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু এই পুরী তার কাছে এখন শত্রুপুরী হয়ে উঠেছে। প্রথম সুযোগেই সে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয় ত্যাগ করবে—সেটাও নিশ্চয় করে ধরে নিতে পারেন।'

ইনস্পেক্টার জোর-গলায় বললেন, 'কিন্তু কোথায় সে পালাবে? কোথা দিয়ে পালাবে? পুরী হচ্ছে রেলপথের শেষ স্টেশন। আমার লোকজনরা এখনই স্টেশনে গিয়ে ঘাঁটি আগলে শিকারী বাঘের মতন ওত পেতে বসে থাকবে।'

—'সকলে তার চেহারার বর্ণনা জানে তো?'

—'আমি বলে দেব। মাথায় খাটো। রোগা। রং কালো। গোঁফ আর মাথার চুল পাকা—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা না হতেও পারে।'

মালিক বললেন, 'না মশাই, পাকাই বটে।'

—'পাকা হতেও পারে, না হতেও পারে।'

—'আপনি যদি বলেন আনন্দবাবু পাকা পরচুল ধারণ করেছিলেন তাহলে আমি আপত্তি করব। দিনের বেলায় পরচুল পরে কেউ আমার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে এ আমি মানতে পারব না।'

—'না, অপরাধী পরচুল ধারণ করেনি।'

আমি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ কী?'

—'যথাসময়ে শুনতে পাবে। এখন নিচের দিকে চল। আগে সুন্দরবাবুকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, আজ আর ম্যাগনাম রিভলবার গর্জন করবে না। তারপর একবার বাড়ির খিড়কির দিকেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

ষষ্ঠ

গুড়ুকখোরের নল

আমরা সকলে খিড়কির দিকে অগ্রসর হলুম—সুন্দরবাবু আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না—যেন আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত তিনি বেবাক ভুলে গিয়েছেন!

আমি ঠাট্টা করবার ফাঁক পেলে ছেড়ে কথা কই না, সুন্দরবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বলি, ও মশাই!'

—'হুম!'

—'আপনি কি প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছেন?'

—'উঁহুম!'

—'দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা ওদিকে যাচ্ছি?'

—'তোমরা চুলোয় গেলেও আমার মাথাব্যথা হবার কারণ নেই।'

—'কিন্তু আমরা চলে গেলে যদি ম্যাগনাম রিভলবার এখানে এসে আবির্ভূত হয়?'

একটু চমকে উঠে তিনি বললেন, 'এলেও আমাকে দেখতে পাবে না।'

—'কেন? আপনি কি অদৃশ্য মানুষ?'

—'আমি আর এখানে সঙের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নই। আমার পা টনটন করছে। এই আমি প্রস্থান করলুম—মরগে তোমরা ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়িয়ে।'

তখন পুরীর সাগর-কোলাহলের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়েছে জনতাসাগরের প্রচণ্ড কোলাহল। 'জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!' ধ্বনি শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। তীর্থযাত্রীরা নেমেছে সাগরস্নানে এবং অনেকেরই দুর্দশার সীমা নেই—বিশেষত স্ত্রীলোকদের। বিষম বেগে ভীমনাদী, ফেনায়িত, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা বারে বারে তেড়ে আসছে এবং অনেক স্নানার্থীকে তুচ্ছ নগণ্য পদার্থের মতন উল্টেপাল্টে আছাড় মারছে বালুকাতটের উপরে। সূর্যকিরণ তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে পরিপূর্ণ গৌরবে।

পান্থনিবাসের পিছনদিকে একটা সরু গলি।

জয়ন্ত সুধোলে, 'এ গলির দুটো মুখ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

—'গলির উত্তরে আছে আর একটা এর চেয়ে চওড়া গলি আর দক্ষিণে আছে পুরীর প্রধান রাজপথ 'বড়ো ডাণ্ডি'। দুটো রাস্তারই একদিকে আছে জগন্নাথদেবের মন্দির, আর একদিকে সমুদ্র।'

—'আসামি পুলিসের ভয়ে নিশ্চয়ই সমুদ্রের দিকে আসবে না। তার গতি জগন্নাথের মন্দিরেরই দিকে।'

—'কিন্তু কোথায়?'

—'এখানে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও পাণ্ডার বাড়ি যখন খুশি আশ্রয় নিতে পারে—তীর্থক্ষেত্রের ওই এক মস্ত সুবিধা।'

মানিক বললে, 'বেশ খানিকটা দূর থেকে একটা লোক একটা বাড়ির পাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে বলে মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত দেখে বললে, 'হুঁ। ওই যাঃ—মুখখানা সাঁত করে সরে গেল!'

ইনস্পেক্টার বললে, 'অত্যন্ত সন্দেহজনক। একবার দেখে আসি।'

—'পুলিসের হাতে ধরা দেবার জন্যে আসামি কোনোদিন অপেক্ষা করে না। আর ব্যাপারটা সন্দেহজনক না হওয়াই সম্ভব! পাড়ায় পুলিস দেখলে সাধারণ লোকের মনে একসঙ্গে ভয় আর কৌতূহল জেগে ওঠে। তারা দূর থেকে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পারে না।'

—'তবু ওদিকটা একচক্কর ঘুরে এলে ক্ষতি কি?'

—'যান। আমরা ততক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য সাগরের গর্জন-গীতা-পাঠ শ্রবণ করি।'

ইনস্পেক্টার হন হন করে এগিয়ে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার এদিক, একবার ওদিক, তারপর নানাদিকে তাকালে, তারপর আবার হন হন করে ফিরে হতাশ ভাবে বললে, 'বেটা চম্পট দিয়েছে।'

—'সুতরাং?'

—'আপনারা বাসায় ফিরে যান, আমার সঙ্গে থেকে মিথ্যে কষ্ট পাবেন কেন?'

—'আপনি কি করবেন?'

—'মামলা আমার, ভাবনাও আমার। আমি একবার শ্রীমন্দিরের আশপাশটা টহল দিয়ে দেখে আসতে চাই।'

—'উত্তম প্রস্তাব।'

—'কখন চা-টা না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি, এখন জঠরানলকে কিঞ্চিৎ তুষ্ট না করলে আর চলে না। আগে উদরচিন্তা, তারপর আর যা কিছু।'

—'আপনিও দেখছি আমাদের সুন্দরবাবুর দলে। তা পাশেই তো পান্থনিবাস—ভাবনা কি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে আবার সমুদ্রের দিকে গেল। কিন্তু সুন্দরবাবুকে আর দেখতে পাওয়া গেল না, বোধহয় তাঁরও জঠরানল প্রদীপ্ত হয়েছে। আমি কৌতূহলী হয়ে ইনস্পেক্টারের পিছনে পিছনে চললুম।

পান্থনিবাসের মালিক আবার ইনস্পেক্টারকে দেখে মৌখিক আনন্দের ভাবাভিনয় করে শুধোলে, 'এই যে, আসুন, আসুন! আনন্দবাবুর পাত্তা পেলেন?'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ও কথা রাখুন। দু-চারখানা পুরি কি লুচি, দু-চারখানা ভাজাভুজি আর এক পেয়ালা চা হবে কি? আমি বিনামূল্যে খেতে চাই না।'

মালিক তাড়াতাড়ি জিহ্বাদংশন করে বললে, 'দামের কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, আপনার কাছ থেকে দাম নেবে কে? উঠে এসে ভালো করে বসুন। (চিৎকার করে) ওরে কে আছিস, পুলিসের বড়োবাবুর ক্ষিদে পেয়েছে, চটপট লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা, এক প্লেট হালুয়া আর চা নিয়ে আয়!'

উদরের দাবি মিটিয়ে ইনস্পেক্টার আবার সদলবলে ধাবিত হল মন্দিরের দিকে। ওদিককার অপেক্ষাকৃত বড়ো রাস্তাতেও ছিল একাধিক ছোটো বড়ো হোটেল, যেতে যেতে সে সব জায়গাতেও সন্ধান নিতে ভুললে না। তারপর ঘিঞ্জি গলিঘুঁজি ছেড়ে সকলে এসে পড়লুম জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে।

সেখানেও নানা শ্রেণীর দোকানের পর দোকান এবং ভক্তদের ও ভিখারিদের জনতা। এক একটি যাত্রীদলের সঙ্গে আছে এক-একজন পাণ্ডা—তাদের অধিকাংশেরই মাথা কামানো এবং পেট মোটা। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রে তারা অপরিহার্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আপদেরও মতন। কিন্তু কেবল হিন্দুদের নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও প্রধান প্রধান তীর্থে এই শ্রেণীর জীবের অভাব নেই।

এখানটা হচ্ছে শ্রীক্ষেত্রের সর্বপ্রধান স্থান। দিকে দিকে কর্মব্যস্ততা। দোকানের পর দোকান, ছোটো বড়ো, নানা শ্রেণীর। খাবার, বাসন, মণিহারী, জামা-কাপড়, ফলমূল প্রভৃতি তাবৎ জিনিসপত্র এখানে বিক্রী হয়—দোকানে দোকানে স্ত্রী-পুরুষ খরিদ্দারের আনাগোনা। পাণ্ডা, যাত্রী, ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভিখারি প্রভৃতি সে জায়গাটা সর্বদাই মুখরিত করে রাখে।

মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে রাজপথের উপরেই রেলিং দিয়ে ঘেরা কণারক থেকে আনীত অপূর্বসুন্দর বরুণ-স্তম্ভ। সেইখানে দাঁড়িয়ে ইনস্পেক্টার প্রত্যেক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,— আজ সকালে তার বাসায় কোনো নতুন যাত্রী এসেছে কিনা?

কয়েকজন জানালে, 'হ্যাঁ, এসেছে।'

অমনি ইনস্পেক্টারের আগ্রহ-বহ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সাগ্রহে প্রশ্নের পর প্রশ্ন হয়, কিন্তু উত্তর মোটেই সন্তোষজনক হয় না।

অবস্থা যখন হাল ছাড়ি-ছাড়ি, তখন একজন পাণ্ডা বললে, 'ঘণ্টাদেড়েক আগে আমার বাসায় একজন নতুন যাত্রী এসেছে।'

—'কেবল একজন?'

—'হ্যাঁ।'

—'বয়স কত?'

—'বলা শক্ত।'

—'কেন?'

—'তার মুখ দেখলে বয়স বেশি বলে মনে হয় না, কিন্তু তার মাথার চুল পাকা। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

—'সঙ্গে মালপত্তর কি আছে?'

—'খালি একটা ছোটো হাতব্যাগ।'

ইনস্পেক্টার বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাণ্ডার হাত চেপে ধরে বললে, 'এখনই চলো তোমার বাসায়।'

পাণ্ডা বললে, 'সে কি হুজুর, যাত্রীদের নিয়ে আমি এখন মন্দিরে—'

বাধা দিয়ে ইনস্পেক্টার মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'রাখো তোমার যাত্রী! খুনীকে বাসায় আশ্রয় দিয়েছ, তোমারও শাস্তি হতে পারে তা জানো?'

পাণ্ডা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'খুনি?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুনি! তার সেই হাতব্যাগে আছে গুলিভরা রিভলবার আর রক্তমাখা জামা-কাপড়।'

—'ওরে বাবা!'

—'শীগগির চলো। কোথায় তোমার বাসা?'

—'মন্দিরের পাশেই।'

—'উত্তম। চলো।'

মন্দিরের চারিদিকেই পথ। পাণ্ডা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হল দক্ষিণদিকের পথে। অল্প এগিয়েই আরও ডাইনে ছোট্ট একটা গলি। বাইরের জনতা ও গোলমালের সঙ্গে গলির নির্জনতা ও নীরবতা যেন খাপ খাচ্ছিল না। পুলিস দলের জুতোগুলোর দুপদাপ শব্দে সে স্তব্ধতা ভেঙে গেল।

বাঁ দিকের একখানা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পাণ্ডা বললে, 'এই আমার বাড়ি।'

দোতলা বাড়ি। বড়ো নয়। উপরে একটা দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। তারপরই তারস্বরে চিৎকার শোনা গেল—'ও মশাই, ও মশাই! এ কিরকম গুণ্ডামি?'

ইনস্পেক্টার দুইজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে এবং বাকি সবাইকে দরজায় পাহারায় মোতায়েন রেখে বেগে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে। ডানপাশেই সিঁড়ি। তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলে, 'চ্যাচায় কে? কি হয়েছে?'

একটা আধবুড়ো লোক খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা মুখ নেড়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'গুণ্ডামি! ভয়ানক গুণ্ডামি!'

—'ব্যাপারটা কি?'

—'পাশের ঘরের লোকটা আচমকা আমার ঘরে ঢুকে গড়গড়ার কাঠের নলটা খুলে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।'

—'তার মাথার চুল পাকা?'

—'হ্যাঁ, পাকা। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলুম—এ কি মগের মুলুক?'

—'তাহলে আরও খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকুন—বেশি চেঁচাবেন না! পাণ্ডা ঠাকুর, আপনার নতুন যাত্রী কোন ঘর ভাড়া নিয়েছে?'

পাণ্ডা কিছু বলবার আগেই আধবুড়ো লোকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই ঘর! হায় হায়, আমার এতকালের শখের গড়গড়ার নল মশাই, তেলে-ধোঁয়ায় পাকা কাঠের নল!'

ইনস্পেক্টার ধমক দিয়ে বললে, 'আরে গেল, খালি বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করে!' তারপরে ফিরে বন্ধ দরজায় করাঘাত করতে করতে বললে, 'ওহে বাপধন, ঘরের ভেতরে আর ঘাপটি মেরে থাকতে হবে না! ভালো চাও তো সুড়সুড় করে বাইরে এসো!'

সুড়সুড় করে কেউ বাইরে এল না, ইনস্পেক্টার তখন ফিরে বললে, 'এই সেপাই, আমার পায়ে বাতের ব্যথা। তোমরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফ্যালো তো! রোসো রোসো,

একটু সবুর কর—আমি তৈরি হয়ে নি! আসামি বেটার কাছে নাকি দেয়ালভেদী কি এক ভয়ানক অস্ত্র আছে!' এই বলে সে কোমরের খাপ থেকে নিজের রিভলবার বার করে ফেললে এবং ঘরের ভিতরে বুলেট বৃষ্টি করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দস্তুরমতো রুখে দাঁড়াল।

দড়াম, দড়াম, দড়াম! দুই সেপাইয়ের ডবল লাঠির চোটে মট করে দরজার কাঠের খিল ভেঙে গেল, ভিতরে কারুকে দেখা গেল না।

দুই সেপাইয়ের দ্বারা অগ্রভাগ রক্ষা করে ইনস্পেক্টার অতি সন্তর্পণে রিভলবার বাগিয়ে ধরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

ঘরে নেই জনপ্রাণী।

ইনস্পেক্টার গর্জন করে হাঁক দিলে, 'পাণ্ডা, এই পাণ্ডা! তুমি আবার সময় বুঝে কোথায় সরে পড়লে?'

অতঃপর রিভলবারের গুলিবৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে বুঝে গড়গড়ার নলহারা লোকটি এবং পাণ্ডা দুজনেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একতলায় পালিয়ে গিয়েছিল, এখন ইনস্পেক্টারের গর্জন শুনে তাড়াতাড়ি উপরে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বললে, 'এই যে আমি হুজুর, এই যে আমি!'

ইনস্পেক্টার রাগত কণ্ঠে বললে, 'এ কি রকম ঘর তোমার? ঘরে মানুষ ঢোকে, অথচ তাকে চোখে দেখা যায় না?'

পাণ্ডা অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে ফিক করে হেসে ফেলে বললে, 'সে নেই? ও, বুঝেছি!'

ইনস্পেক্টার আরও খাপ্পা হয়ে বললে, 'হাসছ যে বড়ো?'

—'আজ্ঞে, ব্যাপারটা বোঝা গেছে!'

—'বোঝা গেছে? কিচ্ছু বোঝা যায়নি। আসামি কোথায় গেল?'

—'লম্বা দিয়েছে হুজুর, লম্বা দিয়েছে।'

—'লম্বা দিলেই হল? দরজা বন্ধ, তবু লম্বা দিলে কেমন করে?'

—'আজ্ঞে, ওইদিকের জানলার একটা গরাদে যে ভাঙা!'

—'গরাদে ভাঙা!'

—'আজ্ঞে!'

—'এতক্ষণ বলনি কেন?'

—'হুজুর, দোতলার উপর থেকে কেউ লাফ মেরে পালাতে পারে, এটা কেমন করে বুঝব?'

—'চোপরাও, কেন বুঝবে না? একি যে সে আসামি? খুনি আসামি, মরিয়া আসামি!'

—'এমন সর্বনেশে আসামি ভালোয় ভালোয় বিদায় হয়েছে বলে আমি কিন্তু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি হুজুর!'

—'ইডিয়ট, আজ আমি তোমাকেই গ্রেপ্তার করব!'

—'কেন হুজুর, আমি তো খুন করিনি।'

—'কিন্তু তুমি খুনে আসামি পালাবে বলে পথ খোলা রেখেছিলে।'

সেই আধবুড়ো লোকটা এগিয়ে এসে বললে, 'আসামি তো লম্বা দিয়েছে, তবে আমার গড়্গড়ার নলের কি হবে হুজুর?'

প্রচণ্ড ক্রোধে ইনস্পেক্টারের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'সেপাই, এর পিঠে বেশ কষে দু-চার ঘা বসিয়ে দাও তো!'

লোকটা বেগে ঘরের বাইরে পালিয়ে গেল।

কোনরকমে ক্রোধ দমন করে ইনস্পেক্টার সেই গরাদেভাঙা জানলাটার দিকে এগিয়ে গেল এবং বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখলে, খানিকটা ফর্দা জায়গা আর তার একপ্রান্তে একটা ইঁদারা।

জিজ্ঞাসা করলে, 'ইঁদারাটা কাদের?'

পাণ্ডা জবাব দিলে, 'গলির সকলেই ঐ ইঁদারার জল ব্যবহার করে।'

—'তাহলে বারোয়ারী ইঁদারা?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'গলিটা কি কানাগলি?'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

—'কেউ যদি এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ে, তাহলে গলির বাইরে যেতে গেলে তাকে তোমার বাড়ির সদর দরজার সামনে দিয়েই যেতে হবে?'

—'তা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

ইনস্পেক্টার কতকটা আশান্বিত হয়ে বললে, 'চলো চলো, নিচে চলো।'

সদরে ছিল অন্যান্য সেপাইরা।

ইনস্পেক্টার শুধোলে, 'গলির ভিতর থেকে কেউ বাইরে গিয়েছে?'

জনৈক সেপাই জানালে, কোনও কোনও লোক যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কারুকে যেতে দেয়নি।

ইনস্পেক্টার দ্রুতপদে আগে ইঁদারার ধারে গিয়ে হাজির হল, তারপর ভিতরে উঁকি মেরে দেখলে, অনেক নিচে কালো জল টল টল করছে। কোনও মানুষ সেখানে আশ্রয় নেয়নি। তবু সে কয়েক মিনিট সেখান থেকে নড়ল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জলের দিকে। তারপর নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললে, 'এতক্ষণ কোনও মানুষ জলে ডুবে থাকতে পারে না।'

পাণ্ডা বললে, 'হুজুর, খুনে-ব্যাটা কোনও বাড়ির ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে আছে।'

—'লুকিয়ে থাকলেই পার পাবে নাকি? এই তো একরত্তি কানাগলি, বাড়ি আছে মোটে খান-কয়। আমি সহজে ছাড়ব নাকি, সব বাড়িতে খানাতল্লাস করব। সেপাই, তোমরা প্রত্যেক বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ—আসামিকে দেখতে পেলে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনবে। কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান, ম্যাগনাম রিভলবারের কথা ভুলো না—যদিও আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অত্যুক্তি করেছেন।'

আমি এতক্ষণ নির্বাক দর্শকের মতন এই সব ট্র্যাজিডি-কমেডির 'দৃশ্য উপভোগ করছিলুম আর ভাবছিলুম, হত্যাকারী এত জিনিস থাকতে তুচ্ছ একটা গড়গড়ার কাঠের নল কেড়ে নিয়ে সরে পড়ল কেন? এইখানে কেমন একটা খটকা আছে।'

সেপাইরা সব বাড়ি খানাতল্লাস করেও আসামি আনন্দের পাত্তা পেলে না।

ইনস্পেক্টার শ্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'হায়রে অদৃষ্ট, এত ধুমধামের পরেও আমার ভাগ্যে পর্বত একটা মূষিক পর্যন্ত প্রসব করলে না!'

আমি তার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারলুম না—আমার মনের ভিতরে এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছে গড়গড়ার কাঠের নলের কাহিনী। এই সব ব্যাপারের মধ্যে একটা একহাত লম্বা গড়গড়ার নলের কি সার্থকতা থাকতে পারে? কিন্তু সার্থকতা আছে একটা নিশ্চয়ই। হয়তো জয়ন্ত থাকলে বললে পারত।

ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফিরে এলুম।

ইনস্পেক্টারকে বললুম, 'একবার জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দিয়ে যান।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'ভগ্নদূতের মতন নিজের পরাজয়ের কহিনী বলতে আমার ভালো লাগছে না। তবে বলছেন যখন, চলুন।'

আমাদের দেখে জয়ন্ত বললে, 'এস বিজয়ী বীরের দল ঃ বন্দী কোথায়?'

ইনস্পেক্টার বললে, 'বন্দী? হট্টমন্দিরে।'

—'অর্থাৎ?'

—'আনন্দকে ধরতে গিয়ে আমরা নিরানন্দ নিয়ে ফিরে আসছি।'

—'সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়।'

—'আপনি হাজির থাকলেও সুবিধা করে উঠতে পারতেন না।'

—'সে কথা পরে বিবেচ্য। আগে সব কথা বলতে আজ্ঞা হয়।'

ইনস্পেক্টার একে একে সব ঘটনা বর্ণনা করে গেল। জয়ন্ত ভাবহীন মুখে সমস্ত শ্রবণ করে গম্ভীর স্বরে বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, কি আর বলব, আমি সঙ্গে থাকলে আনন্দকে বোধহয় বন্দী করতে পারতুম।'

ইনস্পেক্টার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'মশাই, যা তা বাজে বকবেন না! কেন, আপনাদের মানিকবাবু তো সঙ্গে ছিলেন, উনিও তো সব দেখেছেন!'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমিও কি ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা গোপন সত্যের ইঙ্গিত পাওনি।'

আমি বললুম, 'গোপন সত্যের ইঙ্গিত? হয়তো পেয়েছি—কিন্তু তা ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়।'

ইনস্পেক্টার বললে, 'ইঙ্গিত আবার কি? ওসব হেঁয়ালি-ফেয়ালি বুঝি না মশাই, সোজা ভাষায় কথা বলুন।'

—'বলছি। আগে মানিকের কথা শুনি।'

আমি বললুম, 'ধরা পড়লে যাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে, প্রাণ নিয়ে পালাবার সময়েও সে তুচ্ছ একটা গড়গড়ার নল চুরি করতে যাবে কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর কি?'

—'উত্তরটা এখনও খুঁজে পাইনি।'

—'উত্তরটা খুঁজে পেলেই আনন্দকে পাকড়াও করতে পারতে।'

ইনস্পেক্টার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললে, 'খালি খালি হেঁয়ালি! আরে মশাই, সমুদ্রের ধারে হল হত্যাকাণ্ড, আর একটা পাণ্ডার বাড়িতে গেল নগণ্য গড়গড়ার কাঠের নল চুরি। এর মধ্যে আবার কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে সোজা কথায় সেইটেই বুঝিয়ে দিন।'

—'আনন্দ সেই ইঁদারার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল, আপনি দেখতে পাননি।'

—'কোনও মন্ত্রশক্তিতে আনন্দ কি নিজেকে অদৃশ্য করে রেখেছিল?'

—'না।'

—'তবে? আমি পাঁচমিনিট ধরে ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, তবু তাকে দেখতে পাইনি কেন? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডুবুরিও জলের তলায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ডুবে থাকতে পারে না।'

—'পারে না তা জানি।'

—'জেনে-শুনেও বাজে কথা বলছেন?'

—'না। ইঁদারার জলের তলায় ডুব মেরে আনন্দ যে কাঠের নলে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল সেটা আমি এইখানে বসেই অনুমান করতে পারছি।'

—'সে কি!'

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, 'গড়গড়ার কাঠের নল নিয়ে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল, এতক্ষণ পরে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল।'

জয়ন্ত বললে 'ইনস্পেক্টার মশাই! সেকালের ডাকাতরা পুষ্করিণীর জলের তলায় ডুব মেরে তুচ্ছ একগাছা খড়ের ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ ডুবে থেকে লোকের চোখকে ফাঁকি দিত, এ কথা কি আপনি শোনেননি?'

ইনস্পেক্টার অপরাধীর মতন কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'শুনেছি।'

—'আনন্দ সেই প্রাচীন পদ্ধতিটাকেই নতুন করে কাজে লাগিয়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ইনস্পেক্টার বললে, 'বড়োই কসুর হয়ে গেছে দেখছি। এখন উপায়?'

—'দেখি কতদূর কি করতে পারি।' —এই বলে আবার বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেসব কিছুই প্রকাশ করলে না বা আমাদের কারুর দিকে ফিরেও তাকালে না।

সপ্তম

আজই এসপার কি ওসপার

ঘণ্টাদুয়েক পরে বাসায় ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'এখানকার প্রধান পাণ্ডা আমার পরিচিত। তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বলে এলুম, আনন্দ অন্য পাণ্ডার আশ্রয়ে রয়েছে

কিনা সেই খবরটা খোঁজ নিয়ে আমাকে যেন আজই সে জানায়। আর অন্য কোনও পথ দিয়ে গাড়ি চড়ে পুরীর বাইরে যাচ্ছে কিনা, সে খোঁজটাও লোকজন লাগিয়ে তাকে রাখতে বলে এসেছি।'

সুন্দরবাবু বেজায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হুম্! পরের মামলা নিয়ে কেন তুমি এ-সব বাড়াবাড়ি করছ? এর জন্যে বাহাদুরি পাবে কে সেটা ভেবে দেখছ কি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'বাহাদুরি অর্জন করবে উৎকল পুলিস। জানি দাদা, জানি। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আমি হচ্ছি শখের গোয়েন্দা। শখ মিটলেই আমি খুশি। কত তাড়াতাড়ি একটা জটিল খুনের মামলার জট খুলতে পারি, সেইটেই আমি পরীক্ষা করতে চাই। সে ব্যাপারের সফলতাই আমার পুরস্কার।'

সুন্দরবাবু ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, 'আ মরি মরি! তোমার শখের আধিক্যতা দেখে আর বাঁচি না!'

আজ হঠাৎ জয়ন্তের মুখ খুলে গেল, সে স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'এই যে আমি আপনাকে প্রায়ই সাহায্য করি। এ কি আমার নিজের যশের জন্যে?'

সুন্দরবাবু একেবারে স্তব্ধ।

—'আসল কথা কি জানেন দাদা? আমি নিজের, অন্যের বা আপনার যশের জন্যে একটুও মাথা ঘামাই না। আমি হচ্ছি অপরাধবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী মাত্র—সুযোগ হলেই যতটা পারি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ভালোবাসি।'

সুন্দরবাবু হাঁ—না কিছুই বলবার ভাষা খুঁজে পেলেন না, খুব মৃদুস্বরে যেন বললেন, 'হুম্!'

সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরেই শুকনো মুখে ইনস্পেক্টার এসে হাজির। জানা গেল, কলকাতার এবং অন্যান্য জায়গায় যাবার নানা ট্রেন পুরী স্টেশন ছেড়ে যাত্রা করেছে বটে, কিন্তু আনন্দের মতন দেখতে এমন কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে সে গাড়িগুলোর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়নি।

জয়ন্ত বললে, 'মুষড়ে পড়বেন না মশাই। এখনই পুরোপুরি হতাশ হবার মতন অবস্থা হয়নি।'

তেমনই মুখভার করেই ইনস্পেক্টার বললেন, 'দেখছি, এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে পাণ্ডাদের বাসায় এখন গিয়ে খবর নিতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'সে খবর সন্ধ্যার আগেই পেয়েছি।'

—'পেয়েছেন? কী খবর?'

জয়ন্ত বললে, 'আনন্দ কোনও পাণ্ডার বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়নি।'

ইনস্পেক্টার এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, এবার ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন। বললেন, 'তাহলে আর কোন আশায় বুক বাঁধি বলুন?'

—'আমি আরও খবরের প্রত্যাশায় আছি। সিঁড়ির উপরে ভারি পায়ের শব্দ শুনছি

না? হ্যাঁ, তাই তো! ওই যে বড়ো পাণ্ডাঠাকুর আসছেন—মুখ ওঁর হাসি-হাসি। নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য নতুন খবর এনেছেন!'

জয়ন্ত উঠে তাড়াতাড়ি পাণ্ডার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে দুজনে চুপি চুপি কথা কইতে লাগল।

ঘরের ভিতরে একলা ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, একখানা মোটরে চারজন বন্দুকধারী সেপাই নিয়ে আপনি কতক্ষণের মধ্যে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, আনন্দের মতন দেখতে একটা লোক একখানা গোরুর গাড়িতে চেপে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই কোণারকের দিকে যাত্রা করেছে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সে খবর আমরা জানি। আড়াই ঘণ্টা আগে পেয়েছি।'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কি ইনস্পেক্টার মশাই,—খবরটা এতক্ষণ আমাদের বলেননি কেন?'

ইনস্পেক্টার উত্তর করলেন, 'আমাদের তদন্তের সঙ্গে খবরটার কোনও সম্পর্ক নেই বলে। এ জায়গা ছেড়ে যে লোক তাড়াতাড়ি পালাতে চায়, তার পক্ষে এত ট্যাক্সি থাকতে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে ঢিমে-তেতালায় রওনা হওয়াটা কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয় বলে!'

—'যেটা স্বাভাবিক নয় বলে ভাবছেন, একটু চিন্তা করে দেখলে সেটাই আবার আপনার অস্বাভাবিক নয় বলে মনে হবে। স্কন্ধে খুনের অপরাধ নিয়ে কেউ যদি চুপিচুপি পুরী ত্যাগ করতে চায় তাহলে ট্রেন ও ট্যাক্সির চেয়ে বুদ্ধিমান হলে গোরুর গাড়ির সাহায্যই সে নেবে। ঠিকই অনুমান করবে যে আপনাদের নজর ট্রেন ও ট্যাক্সির উপর যতটা প্রখর হয়ে পড়বে—গোরুর গাড়ির উপর কখনই অতটা পড়বে না।'

জয়ন্তের কথায় ইনস্পেক্টার অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি এখনই গাড়ি ও সেপাইয়ের ব্যবস্থা করছি।'

—'হ্যাঁ, তাই করুন। কোণারকের দিকে যখন গেছে তখন মনে হয় মোটরে গেলে আমরা নেয়া-খেয়া নদীর কাছ-বরাবর তার নাগাল ধরতে পারব।'

—'কিন্তু সে যদি আনন্দ না হয়?'

জয়ন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তাহলে ব্যর্থ হয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে। তবে এ খবরটা—এ সম্ভাবনাটা অবহেলা করা উচিত নয়।'

ইনস্পেক্টার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হতে পারব।'

—'আর একটা জবর খবর আছে। প্রস্তুত হতে যাবার আগে জেনে যান।'

—'কী, কী?'

—'একটা সোনা-রূপোর দোকানে আনন্দের মতন দেখতে কোনও লোক এই পান্নার আংটিটা বাঁধা রেখে আজ একশো টাকা ধার করেছে।'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ শুধু শ্রোতার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। জয়ন্তের কথা শুনে

এইবার সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আংটিটা দেখেই বলে উঠলেন, 'আর কোনও সন্দেহ নেই। জীবিত অবস্থায় মহেন্দ্রবাবুর হাতে আমি এই আংটিটাই দেখেছি।'

জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, যান, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হোন। আমার মনে হচ্ছে হয়তো আজই আপনার তদন্তের এসপার কি ওসপার হয়ে যাবে!'

অষ্টম

খালি হাতে হরিণ শিকার

পুরীর নোংরা শহরতলির ধূম-ধুলোর ধূসরিমা ছাড়িয়ে পুলিসের বড়ো জিপ-গাড়িখানা যখন বাইরে গিয়ে পড়ল, তখন নির্মেঘ নীলাকাশে প্রতিপদের প্রায়-পূর্ণ চাঁদ, বাতাসের কণ্ঠে অবিশ্রাম সঙ্গীত, দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যেন এক অনাহত উদারতা, ধূ-ধূ-ধূ-ধূ মরুভূমির মতন নিরালায় নিষুপ্ত চাঁদের আলো এবং বহুদূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে চিরজাগ্রত সাগরের অস্পষ্ট বাণী।

পুলিসের চোখ আর মন হয়তো প্রকৃতির মধুর রস থেকে বঞ্চিত, তাই তারা সাধারণ কথা নিয়েই মশগুল হয়ে রইল, আমি আর জয়ন্ত কিন্তু এই জ্যোৎস্নায় ধোয়া, অস্ফুট সাগরকল্লোলের পাড় দিয়ে বোনা নিস্তব্ধতা চোখ আর মন দিয়ে উপভোগ করতে লাগলুম।

এই চিরন্তন স্বাভাবিকতার অন্তঃপুরে বেসুরো ধ্বনি সৃষ্টি করছিল কেবল পুলিসের জিপ-গাড়িখানা। কেমন একটা রূঢ় ধাক্কায় মন যেন চমকে চমকে উঠতে থাকে।

মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো পাহাড়ের মতন বালিয়াড়ি অর্থাৎ বালির স্তূপ। তারই মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় হরিণরা বিচরণ করছে দলে দলে। ঝিমিয়ে-পড়া সুন্দরবাবুকে চাঙ্গা করবার জন্যে জয়ন্ত বলে উঠল, 'অ দাদা, আপনি তো মরুভূমি দেখেননি, একবার ভালো করে চোখ চেয়ে দেখুন—এই হচ্ছে মরুভূমি বা তার ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।'

সুন্দরবাবু মরুবালুকারও চেয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আমি মরুভূমি দেখতে চাই না, কালকেই কলকাতায় লম্বা দিতে চাই।'

—'কেন দাদা, কেন?'

—'এই কি অবসর যাপন, না বায়ুসেবন? না জোর করে খুনখারাপির মধ্যে আকর্ষণ এবং আমার মুণ্ডচ্ছেদন?'

আমি বললুম, 'সে কি দাদা, কার এত স্পর্ধা যে আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করবে? আমি দৃঢ়কণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, নিজের মুণ্ড কাঁধের উপরে যথাস্থানে নিয়ে যথাসময়েই আপনি পরমানন্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন—কেননা প্রথমত আপনার ওই সটাক মুণ্ডটি হচ্ছে অকাট্য। দ্বিতীয়ত আমাদের পূজনীয়া বউদিদিঠাকুরাণী নিত্য মা কালীর উদ্দেশে জোড়া পাঁঠা মানত করেন ওই অদ্বিতীয় টেকো মুণ্ডটিকে অখণ্ডনীয় রাখবার জন্যে!'

—'মানিক, তুমি বিলক্ষণ জানো, তোমার কথা আমার এখন একটুও ভালো লাগছে না? অতএব নীরব হও।'

খালি মানিক নয়, আর সকলেও একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। দুইদিকে দূরবিস্তৃত বালুকাশয্যার মাঝখানে একটি ঘুমন্ত ছোটো পথের রেখা, গাড়ি ছুটতে লাগল তারই উপর দিয়ে।

আচম্বিতে ইনস্পেক্টার বলে উঠলেন, 'দূরে পথের উপরেই একখানা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না?'

জয়ন্তও গোরুর গাড়িটা লক্ষ্য করেছে। সে গম্ভীরভাবে বললে, 'হুঁ।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সবাই হুঁসিয়ার!'

ধবধবে জ্যোৎস্নায় বেশ দেখা যাচ্ছিল, একখানা ছই-দিয়ে-ঢাকা গোরুর গাড়ি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের উপরে। গাড়ির ওপাশে আরও দেখা যাচ্ছিল চন্দ্রকিরণের রূপালী পালিশ মেখে নেয়া-খেয়া নদীর জল রত্নধারার মতন চকমক চকমক করছে।

জয়ন্ত বললে, 'এই খোলা জায়গায়, এই স্তব্ধ রাতে আমাদের মোটরের শব্দ নদীর ধার থেকে নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছে। ওখানা যদি আনন্দের গাড়ি হয়, তবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কেন?'

আমি বললুম, 'আনন্দ কি শেষটা মরিয়া হয়ে এইখানে দাঁড়িয়েই আমাদের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধ করতে চায়?'

সুন্দরবাবু একটু নড়েচড়ে বসে খালি বললেন, 'হুম্!'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'ব্যাপারটা একটু অন্যরকম আন্দাজ করা যাচ্ছে। সাধারণত নেয়া-খেয়া নদীতে অল্প জল থাকে—তখন গোরুর গাড়ি আরোহী নিয়েই অনায়াসে নদী পার হয়ে যায়। কিন্তু কাল গিয়েছে তুমুল ঝড়-বৃষ্টির রাত্রি, ফলে অগভীর শীর্ণ নদী আজ এখনও ফুলে-ফেঁপে রয়েছে, পার হতে গেলে গোরুর গাড়ি জলের তলায় ডুবে যাবে—তাই তার গতি হয়েছে রুদ্ধ!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আনন্দ বেটা রিভলবার বাগিয়ে ছইয়ের কোনও ছ্যাঁদা দিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে না তো?'

জয়ন্ত বললে, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। ইনস্পেক্টার মশাই, আমাদের জিপ এখন গোরুর গাড়ির যথেষ্ট কাছে এসে পড়েছে, আর এগিয়ে কাজ নেই—গোঁয়ার্তুমিকে সাহস বলে ভাবলে মস্ত ভুল করা হবে।'

জিপ দাঁড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাকলে, 'গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!'

গোরুর গাড়ি থেকে সাড়া পাওয়া গেল—'হুজুর!'

—'ভাড়া যাবে?'

—'না, হুজুর। সওয়ারী আছে।'

—'কোথায়?'

—'তিনি হরিণ শিকারে গিয়েছেন।'

—'গাড়িতে কেউ নেই?'

—'না, হুজুর!'

—'আমরা পুলিস। তুমি এখানে এসো।'

গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে জোড়হাতে ভয়ে ভয়ে জিপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'পুলিস কেন হুজুর? আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করিনি!'

—'না, তুমি কোনও অন্যায় করনি, তোমার তাই কোনও ভয়ও নেই। এখন বলো দেখি, তোমার সওয়ারীকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

—'কোণারকের মন্দিরে।'

—'তারপর?'

—'কিন্তু নদীতে এত জল যে পার হবার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে অন্য কোনও উপায় দেখতে হবে।'

—'তোমার সওয়ারী কি বাঙালি?'

—'হ্যাঁ, হুজুর।'

—'তাঁকে দেখতে কেমন?'

—'রং কালো, রোগা, বেঁটে, বয়স বেশি নয়।'

—'গোঁফ আর মাথার চুল পাকা?'

—'না, হুজুর। ঠিক উল্টো। কালো কুচকুচে!'

—'হঠাৎ তিনি হরিণ শিকারে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কি বন্দুক ছিল?'

—'না হুজুর, কী দিয়ে শিকার করবেন, কে জানে! তিনি বললেন, চুপ করে হাত গুটিয়ে সকাল পর্যন্ত বসে না থেকে একটা হরিণ-টরিণ মেরে আনা যাক। এই বলে একটা ছোটো ব্যাগ নিয়ে নেমে গেলেন।'

—'গাড়িতে তাঁর আর কোনও মালপত্তর আছে?'

—'না, হুজুর!'

—'কতক্ষণ আগে তিনি গিয়েছেন?'

—'মিনিট কুড়ির বেশির হবে না।'

—'কোনদিকে তিনি গিয়েছেন?'

—'ওইদিকে যাচ্ছিলেন। তারপর ওই বালিয়াড়ির আড়াল পড়ে গেল, তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না।'

নবম

সুন্দরবাবু ভীরু নন

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ইনস্পেক্টারের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'একটু তফাতে আসুন। জরুরি পরামর্শের দরকার।' তারপর আমাকেও ইসারা করলে।

আমি সঙ্গে যেতে যেতে বললুম, 'তুমি সুন্দরবাবুকে ডাকলে না? তিনি ভীষণ অভিমান করবেন কিন্তু।'

—'অভিমান করবেন না হে, বরং খুশিই হবেন। তা ছাড়া তাঁর ভাবভঙ্গি যে-রকম গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে, ডাকতে গেলেই মুখঝামটা খেতে হবে—আর সব সময়ে সেটা আমার বরদাস্ত নাও হতে পারে। আজকের অ্যাডভেঞ্চার থেকে সুন্দরবাবুকে বাদ দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করা হবে।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'কেন মশাই, উনি ভয় পেয়েছেন নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'ভয়? মোটেই নয়, মোটেই নয়! সুন্দরবাবু ভীরু নন, আমি স্বচক্ষে বার বার ওঁকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। তবে সময়ে সময়ে তিনি অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে ওঠেন বটে। অর বর্তমান ক্ষেত্রে উনি একটু বেশি ক্ষেপে রয়েছেন, পরের ঝঞ্ঝাট নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে আমরা ওঁর ছুটির আরাম মাটি করে দিচ্ছি বলে।'

—'আপনি কী পরামর্শের কথা বলছিলেন?'

—'হ্যাঁ। শুনুন।'

তারপর জয়ন্তের সঙ্গে ইনস্পেক্টারের যে পরামর্শ হল এখানে তাঁদের কথাবার্তায় প্রকাশ না করে পরের ঘটনাবলীর দ্বারাই প্রকাশ হওয়া ভালো।

আমি সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে বললুম, 'দাদা, এবারে আমি ফাজলামি করছি না, গম্ভীর ভাবেই কথা বলছি। এখনই অশান্তিকর কাণ্ড-কারখানা ঘটতে পারে, আপনাকে আর তার ভেতরে অকারণে টেনে নিয়ে যেতে চাই না, আপনি বরং নিশ্চিন্তে গাড়িতে বসেই বিশ্রাম করুন।'

উত্তরে 'হাঁ' কি 'না'—কোনও জবাবই পাওয়া গেল না সুন্দরবাবুর কাছ থেকে।

ওদিকে পরামর্শমত ইনস্পেক্টার হুকুম দিলেন—'এই সেপাইরা, এগিয়ে চলো!'

আগে ইনস্পেক্টার, তারপর চারজন বন্দুকধারী পুলিস এবং সকলকার পিছনে যতটা সম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে গুটিসুটি মেরে এগোচ্ছিলাম জয়ন্ত আর আমি। নিচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হঠাৎ জয়ন্ত বললে, 'এখানেও পদচিহ্নের উপাখ্যান লেখা রয়েছে। দেখো মানিক, দেখো। একজোড়া পদচিহ্ন বালির উপর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে ওই বালিয়াড়ির দিকে। সুতরাং কোন দিকে যাব তা নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

তারপর ধীরে ধীরে ওই ভাবে অগ্রসর হয়ে চললুম আমরা মরুবালুকার উপর দিয়ে। আমাদের লক্ষ্য দূরের ওই বালিয়াড়ি।

অখণ্ড স্তব্ধতাকে যেন জাগাবার চেষ্টা করছে অশ্রান্ত ঝিল্লীঝঙ্কার। চাঁদ যেন আকাশে উঠে অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছে আমাদের এই নৈশ অভিযান। বাতাস যেন হাঁপাতে

হাঁপাতে হু-হু করে ছুটে আসছে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তাই দেখবার জন্যে।

আনন্দের পাত্তা নেই। সে কি এখান থেকে আরাও অনেকদূর এগিয়ে অন্য কোনও দিকে চলে গিয়েছে? না, ওই বালিয়াড়ির পিছনে কোথাও ঘাপটি মেরে শিকারী বাঘের মতন আমাদের কার্যকলাপ সমস্ত লক্ষ্য করছে?

হাতে হয়তো তার উদ্যত রয়েছে ম্যাগনাম রিভলবার!

জয়ন্তের বিশ্বাস—সে বেশিদূর যায়নি। আমারও তাই। ইনস্পেক্টার চুপচাপ।

সুদূর থেকে সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষও শুনছি, আবার অদূর থেকে নেয়া-খেয়া নদীর মৃদু মৃদু কলতানও কানে আসছে। একসঙ্গে যেন চলছে ধ্রুপদ ও ঠুংরি গানের সাধনা।

দেখতে দেখতে একেবারে বালিয়াড়ির কাছে এসে পড়লুম।

জয়ন্ত ফিসফিস করে বললে, 'মানিক, টুক করে বালিয়াড়ির ছায়ায় সরে এসো। এখানে ছোটো ছোটো চার-পাঁচটা বালির ঢিপি রয়েছে। লুকিয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না।'

একে চাঁদের কিরণকে বাধা দিয়ে মস্তবড়ো ছায়ার অস্পষ্টতা রচনা করেছে প্রকাণ্ড সেই বালিয়াড়ি, তার উপরে ছোটো ছোটো বালির ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়ে আমরা দুজন একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেলুম। লুকোবার আগে জয়ন্ত সেপাইদের কাছ থেকে একটা বন্দুক ও গোটাকয়েক কার্তুজ চেয়ে নিয়েছিল।

ইনস্পেক্টার হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উচ্চস্বরে চিৎকার করে সঙ্গের সেপাইদের বললেন, 'ধ্যেৎ, আসামি চুলোয় যাক! ব্যাটা কোনদিকে কতদূরে ভেগেছে কে জানে? আমরা তো আর সারারাত ছুটোছুটি করে মরতে পারি না! তার চেয়ে আজ ফিরে চলো, কাল আবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে!'

সেপাইরা সবাই একসঙ্গে আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে প্রত্যাগমন করতে লাগল। আর তাদের পিছু পিছু যেতে লাগলেন ইনস্পেক্টার।

বালিয়াড়ির ছায়ায় ঢিবির আড়ালে রয়ে গেলুম শুধু জয়ন্ত ও আমি।

বেশ খানিকক্ষণ কাটল। তারপর শোনা গেল পুলিসের জিপ-গাড়িখানার দ্রুতধাবনধ্বনি। আমাদের চোখের সামনেই গাড়িখানা ক্রমশ একটি কৃষ্ণবিন্দুতে পরিণত হয়ে তারপর চন্দ্রিকাধৌত রূপোলী রাত্রির মধ্যে হারিয়ে গেল কোথায়!

জয়ন্ত সেইরকম ফিস ফিস করে বললে, 'আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে এইবারে শ্রীমান আনন্দ আমাদের সামনে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দবর্ধন করবে!'

তার মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালিয়াড়ির অন্তরাল থেকে আবির্ভূত হল যেন এক অবাস্তব ছায়ামূর্তি।

সেইখানেই দাঁড়িয়ে সে এদিকে ওদিকে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল, তারপর

কোনোদিকেই জনপ্রাণীর দেখা বা সাড়া না পেয়ে যেন খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আবার পথের দিকে অগ্রসর হল—দ্রুতপদে নয়, ধীরে ধীরে।

প্রায় জয়ন্তের গা ঘেঁষেই সে এগিয়ে গেল—দূরের নদীপথ তার দৃষ্টিকে এমন একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে পার্শ্ববর্তী বিপদের অস্তিত্ব সে আবিষ্কার করতে পারলে না।

কিন্তু সে দু-চার পদের বেশি অগ্রসর হবার সময় পেলে না,—জয়ন্ত আচমকা বিদ্যুতের মতন উঠে দাঁড়িয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহবিক্রমে। সে কিছু বোঝবার আগেই প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাতে তাকে একেবারে পেড়ে ফেললে বালুকাশয্যার উপরে।

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই জয়ন্ত তার কণ্ঠদেশ দুই হাতে চেপে ধরে তাকে একটানে সশরীরে শূন্যে তুলে ধরে বারংবার প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লাগল। অসাধারণ দীর্ঘদেহের অধিকারী জয়ন্তের দুই বলিষ্ঠ বাহুতে লম্বমান খর্বদেহী ও রোগা-টিকটিকি আনন্দকে দেখাচ্ছিল যেন মার্জারের কবলগত নেংটি ইঁদুরের মতন!

জয়ন্ত ঝাঁকানি দিতে দিতে গর্জন করে বললে, 'রাসকেল, এই শিশুর মতন দুর্বল দেহ নিয়ে তুই মানুষ খুন আর রাহাজানি করতে চাস?'

কাতর স্বরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আনন্দ বললে, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—নইলে এখুনই আমি মরে যাব!'

—'না, আমি তোকে মারব না—তুই মরবি ফাঁসিকাঠে ঝুলে! মানিক, এর দুটো হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও তো! তারপর এর পরনের কাপড় আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে পা দুটোও শক্ত করে বেঁধে ফ্যালো!'

হাত-পা বাঁধা আসামি বালির উপরে চিৎপাত হয়ে বললে, 'আপনারা আমার ওপরে এ রকম অত্যাচার করছেন কেন কিছুই বুঝতে পারছি না?'

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে জয়ন্ত হেঁট হয়ে তার হাত থেকে ছিটকেপড়া দুটো জিনিস ভূমিতল থেকে তুলে নিলে।

একটা হচ্ছে ছোটো একটি সুটকেস এবং আর একটা হচ্ছে বৃহৎ এক রিভলবার।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, এই দেখ বিখ্যাত ম্যাগনাম রিভলবার—আসামি এই সাংঘাতিক অস্ত্র দিয়েই মহেন্দ্রবাবুকে খুন করেছিল।'

রিভলবারটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। আকারে বড়ো ও নলচেটা একটু বেশি মোটা, চোখে দেখে ওপর থেকে এর চেয়ে বেশি কোনও বিশেষত্ব এবং ভীষণত্ব আবিষ্কার করতে পারলুম না।

জয়ন্ত বললে, 'ওহে বাপু আনন্দ, এই রিভলভার দিয়ে তুমি আরও কতগুলো মানুষকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ?'

আনন্দ বললে, 'আমি কারুকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিইনি।'

—'বেশ, সেটা কাল বোঝা যাবে—আজ রাত হয়ে গিয়েছে। দেখছ মানিক, আমার প্ল্যান বা পরিকল্পনা সফল হয়েছে—এই নেংটি ইঁদুরটাকে ধরতে গিয়ে আর রক্তপাত

করতে হল না! ওদিকে উৎকল পুলিস আর সুন্দরবাবু আমাদের শুভাশুভের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন—তুমি তিনবার বন্দুক ছুড়ে সঙ্কেতধ্বনি কর। এখনই সবাই আবার আত্মপ্রকাশ করবেন।'

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—একবার, দুবার, তিনবার। গুড়ুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম আওয়াজে রাতের আকাশ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

তারপরই দূরে একটা আওয়াজ শোনা গেল—জিপ গাড়ির বেগে ছুটে আসার শব্দ! গাড়িখানা চোখের আড়ালে গিয়ে এতক্ষণ এই সঙ্কেতধ্বনির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলাবাহুল্য, এসবই জয়ন্তের নির্দেশ। পরে পরে যা ঘটবে, আগে থাকতেই সে আন্দাজ করে রেখেছিল। কিছুমাত্র রক্তপাত হল না—ম্যাগনাম রিভলবার তার মারাত্মক ধমক দেবার সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল এবং অপরাধী পরলে পুলিসের গড়া লৌহবলয়।

দশম

পদচিহ্নের উপাখ্যান

পরদিনের সকালবেলা।

'পুরুষোত্তম পান্থনিবাসে'র মালিক থানার ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের কোণে মেঝের উপরে উপবিষ্ট হাতকড়াপরা আসামির উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'এই লোকটিকে দেখতে অনেকটা আনন্দবাবুর মতন বটে, কিন্তু আনন্দবাবুর গোঁফ আর মাথার চুল ছিল পাকা।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আসামির গোঁফ আর চুল পাকা হলেই একে হুবহু আনন্দের মতন দেখতে হবে?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত এগিয়ে একটান মেরে আসামীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'ওহে বাপু, একবার পাশের ঘরে চলো তো!'

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আসামি পাশের ঘরে গেল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

কিছুক্ষণ পরে তারা আবার যখন ফিরে এল তখন আসামির গোঁফ ও মাথার চুল রীতিমতো পাকা। বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে পান্থনিবাসের কর্তা বললেন, 'এ কি ব্যাপার?'

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপার কিছুই নয়—জিঙ্ক-অক্সাইড অয়েণ্টমেণ্টের মহিমা!'

ইনস্পেক্টার শুধোলেন, 'তাহলে আপনি গোড়া থেকেই এই সন্দেহ করেছিলেন?'

—'হ্যাঁ মশাই, প্রায় তাই। আপনাদেরও সন্দেহ করা উচিত ছিল। নুলিয়াদের কাছে, পান্থনিবাসের লোকজনদের কাছে আসামি অকারণেই গায়ে পড়ে বারবার হাত দিয়ে নিজের গোঁফ আর চুল দেখিয়ে আপনাকে বুড়ো বলে জাহির করবার চেষ্টায় ছিল। অথচ সবাই বলে তার মুখখানা বুড়োর মতন দেখতে নয়। এই সব শুনেই আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়।'

ইনস্পেক্টার একটা সুটকেস খুলে বললে, 'আনন্দের এই সুটকেসের ভেতরে অন্যান্য বাজে খুচরো জিনিসের সঙ্গে এই কালো রঙের পাঞ্জাবি আর পাজামা পাওয়া গিয়েছে।'

জয়ন্ত সে দুটো পরীক্ষা করে বললে, 'দেখছি পাঞ্জাবি আর পাজামা জলে কাচা হয়েছে।'

আসামি অস্ফুট স্বরে বললে, 'জামা-কাপড় ময়লা হলেই কাচতে হয়।'

—'কী-রকম জলে কেচেছ? ঠাণ্ডা, না গরম?'

—'গরম জলে।'

হা হা করে হেসে উঠল জয়ন্ত। বললে, 'ওরে নির্বোধ, তুই কি জানিস না যে গরম জলে রক্তের ছোপ ভালো করে নিশ্চিহ্ন হয় না? এখন বল, তোর জামায় আর পাজামায় এসব অস্পষ্ট দাগ কিসের? রক্তের?'

আনন্দ জোরগলায় প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'ওসব রক্তের দাগ নয়।'

—'উত্তম। পুলিসের পরীক্ষাগারে এ দুটো জিনিস পাঠিয়ে দিলেই অচিরে জানা যাবে, এ মানুষের রক্তের দাগ কিনা—আর তা কোন টাইপের রক্ত, মহেন্দ্রবাবুর রক্তের টাইপের সঙ্গে মিল আছে কিনা!'

আনন্দ আর কথা বলল না—ঘাড় হেঁট ক'রে চুপচাপ ব'সে পড়ল মেঝেতে।

জয়ন্ত বললে, 'ইনস্পেক্টার মশাই, আর একটা কথা, সমুদ্রতীরের পদচিহ্নের ছাঁচের সঙ্গে আনন্দের জুতো মিলিয়ে দেখেছেন কি?'

ইনস্পেক্টার বললে, 'দেখেছি। হুবহু মিলে গেছে।'

জয়ন্ত আনন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বৎস আনন্দ, একটি চলতি গানের ভাষায় এইবারে তোমায় প্রশ্ন করা যেতে পারে—কোনটি তোমার আসল নাম সুধাই তোমারে! আনন্দ না মোহিতলাল?'

আসামি চমকে বলে উঠল, 'আমার নাম আনন্দগোপাল মিত্র।'

জয়ন্ত এবার গম্ভীরমুখে বললে, 'উহু! তোমার নাম মোহিতলাল, তুমি হচ্ছো নিহত মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে একদা বিতাড়িত ভাগিনেয়। আমার বিশ্বাস, তোমাকে সনাক্ত করবার লোকের অভাব হবে না।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'সুন্দরবাবু কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'তিনি গোঁসা করে বাসায় ফিরে গেছেন। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, পরের মামলার ঝামেলা পোয়াবার আগ্রহ তাঁর নেই। তিনি স্রেফ বেড়াতে আর হাওয়া খেতে এসেছেন এখানে।'

ইনস্পেক্টার তারপর জয়ন্তর কাছে এগিয়ে এসে গদগদ হয়ে বললেন, 'মশাই, আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা! এত তাড়াতাড়ি মামলার কিনারা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অবাক কাণ্ড!'

জয়ন্ত বললে, 'কিছু না, কিছু না! অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নিযুক্ত হওয়ার অনেক সুবিধা! তারপর প্রথমেই আমাদের পথনির্দেশ করেছে বালুকাবিতানে লেখা পদচিহ্নের উপাখ্যান। এসো মানিক, এখনও আমাদের প্রভাতী বায়ু সেবনের যথেষ্ট সময় আছে। নমস্কার মশাই, নমস্কার!'

ভেনাস-ছোরার রহস্য

বৈঠকখানা। দুজনে চা পান করছিলেন। কমিশনার ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ধরণীধর রায়চৌধুরী। ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে আসছে বসন্তকালের বৈকালী রোদ।

হঠাৎ দ্বারপথে দুই মূর্তিকে দেখে সুন্দরবাবু উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হুম, জয়ন্ত আর মানিক যে! বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ!

মানিক বললে, অসময়ে মানে! চায়ের সময়ই তো ঠিক সময়। পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আচম্বিতে দ্বারপথ দিয়ে আপনার তৈলমার্জিত সমুজ্জ্বল টাক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আর অমনি আমাদের পদচালনা হল অবরুদ্ধ। তারপর—

পাছে সে ফস করে কোনও বে-তাল কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক, আর ব্যাখানা করে বলতে হবে না! এগিয়ে এসো, বসে পড়ো। (ভৃত্যের উদ্দেশে সচিৎকারে)—ওরে, আর দু পেয়ালা চা! (গলা নামিয়ে) জয়ন্ত, সুবিখ্যাত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ধরণীধর রায়চৌধুরীর সঙ্গে বোধহয় তোমাদের আলাপ-পরিচয় নেই! ইনিই তিনি। ধরণীবাবু, এরা হচ্ছে জয়ন্ত আর মানিক। আমার মুখে এদের নাম শুনেছেন বোধহয়।

ধরণী আগে দুই বন্ধুর আপাদমস্তকের উপরে চোরধরা দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর ভারিক্কি চালে বললেন, শুনেছি গোয়েন্দাগিরি নাকি এঁদের খেয়াল বা শখ!

জয়ন্ত জোড়হাতে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিলাসও বলতে পারেন। আপনার মতো নামজাদা পেশাদারের কাছে আমরা হচ্ছি—পর্বতের তুলনায় নুড়ির মতো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ!

ধরণী কিঞ্চিৎ খুশি হয়ে বললেন, দেখছি, আপনি কথার ম্যাজিকেও কম নন। বসুন, চা খান। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখা উচিত, আজ আমি এখানে সুন্দরবাবুর সঙ্গে একান্তে কিছু পরামর্শ করতে এসেছি।

—একান্তে! অর্থাৎ গোপনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানিক বললে, তাহলে সুন্দরবাবু, আজ এখানে আমরা চা না খেলেও পৃথিবী উল্টে যাবে না। তোমার কী মত জয়ন্ত?

—হ্যাঁ, আমাদের গাত্রোত্থান করাই উচিত।

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, আরে, আরে, তাও কি হয়! চা খেতে আর তোমাদের কতক্ষণ লাগবে! সেটুকু সময়ের মধ্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

মানিক মাথা নেড়ে বললে, না মশাই, ঘড়ি ধরে চা খাওয়া আমাদের ধাতস্থ হয় না। চা খাওয়ার মানে কি এক নিঃশ্বাসে চা গলাধঃকরণ করা। ধীরে-সুস্থে কিছু গালগল্প হবে না, দুটো ফষ্টিনষ্টি করবার ফুরসত পাওয়া যাবে না, তর্কাতর্কির চোটে চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ উঠবে না, তবে আর হল কী দাদা! না জেনে কোথায় এসে পড়েছি রে বাবা!

কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, না ভাই, তোমরা চা না খেয়ে চলে গেলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। বোসো। ওই দ্যাখো চা এসে পড়েছে।

ধরণীধর বিরক্তমুখে নির্বাক। সুন্দরবাবুর নির্বন্ধ এড়াতে না পেরে অগত্যা জয়ন্ত ও মানিক হাত বাড়িয়ে চায়ের পাত্র গ্রহণ করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, ব্যাপার কী জানো ভায়া! একটা অদ্ভুত মামলা হাতে নিয়ে আমরা মস্ত সমস্যায় পড়ে গিয়েছি।

—অদ্ভুত মামলা!

—রীতিমতো। আসামিকে আবিষ্কার করেছি, অকাট্য সব প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করতে পারছি না।

জয়ন্ত বললে, মামলাটার কিছু আঁচ পেলে আপনাদের সঙ্গে আমরাও না হয় মাথা ঘামাবার চেষ্টা করতুম।

দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট কণ্ঠে ধরণী বলে উঠলেন, কে মশাইদের মাথা ঘামাতে বলছে? পেশাদার পুলিশ শখের গোয়েন্দার সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে। আমরা যেখানে হাবুডুবু খাই, আপনারা সেখানে তলিয়ে যাবেন।

জয়ন্ত বললে, অবশ্য, অবশ্য!

মানিক মাথা নেড়ে বললে, উঁহু!

ধরণী কুপিত কণ্ঠে বললেন, উঁহু মানে?

—জয়ন্ত সাঁতার জানে, তলিয়ে না যেতেও পারে!

কবজি-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে ধরণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তাহলে আপনারা সমস্যা-সাগরে সাঁতার কাটুন, আপাতত আমার আর সময় নেই, অফিসে জরুরি কাজ আছে। সুন্দরবাবু, আধঘণ্টা পরেই যেন আপনার দেখা পাই।

—যে আজ্ঞে।

জয়ন্ত বললে, ভদ্রলোক রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেলেন।

হো হো করে হেসে উঠে সুন্দরবাবু বললেন, হুম! ধরণীবাবু শখের গোয়েন্দার নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। তাঁর মতে, পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজরাই শখের গোয়েন্দা বলে আত্মপরিচয় দেয়।

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, এখন আপনার অদ্ভুত মামলার কথা বলুন।

সুন্দরবাবু বললেন, ফলাও করে বলবার সময় নেই, ছুটি পেয়েছি আধঘণ্টা মাত্র। সংক্ষেপে বলব। সদানন্দবাবু মস্ত ধনী—মোটা ব্যাঙ্কের খাতা আর স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তার স্ত্রী স্বর্গে, পুত্রসন্তান নেই, মন্দ্রা তাঁর একমাত্র কন্যা। সে একাধারে রূপবতী আর গুণবতী—সসম্মানে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

হাতে অঢেল টাকা থাকলে অনেকের অনেক রকম শখ বা নেশা বা খেয়াল হয়। সদানন্দবাবুর শখ ছিল দেশভ্রমণ। তিনি ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কোথাও টহল দিতে বাকি রাখেননি। তারপর যান ইউরোপে। তারপর আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে তিনি এক নতুন বন্ধু লাভ করেন—যামিনীকান্ত। তাঁর সঙ্গে সে-ও দেশে ফিরে আসে আর প্রতিদিনই দুজনে মিলে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা তাস-দাবা-পাশা খেলা চলে। ধনী না হলেও বাপের দৌলতে তাকেও চাকরি করে খেতে হয় না।

সদানন্দবাবুর বয়স ষাট আর যামিনীর পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিল। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁদের বন্ধুত্বের ভিত এমন পাকা হয়ে উঠেছিল যে, যামিনীকে না পেলে সদানন্দবাবুর অবসর-মুহূর্তগুলো অচল হয়ে পড়ত চাকা-ভাঙা গাড়ির মতোই।

সদানন্দবাবুর প্রকৃতির উপরে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট পরিমাণেই। নিজের একমাত্র সন্তান মন্দ্রাকেও তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন সেইভাবেই। সে এম এ পাস দেবার পরেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমেরিকায় গিয়ে তিনি এক বৎসর কাল কাটিয়ে আসেন। তিনি জানতেন, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হবে মন্দ্রা। সুতরাং দুনিয়াদারির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলে তার চলবে না।

সুপটু শিল্পীর হাতে গড়া আলমারিতে সাজিয়ে রাখা মোমের পুতুলের মতো সুন্দরী নয় মন্দ্রা,—তার আশ্চর্য সৌন্দর্য যেন গতিচঞ্চল দেহের ভিতর থেকে উপচে পড়তে চায় প্রাণের প্রাচুর্যে আর জীবনের উচ্ছ্বাসে। তাকে দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়। যামিনীও মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। খালি মুগ্ধ নয়, তাকে পাবার জন্যে সে হয়ে উঠেছিল লুব্ধ। বারবার এড়িয়ে এসেছে যে উদ্বাহবন্ধন, চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে সে এখন ধরা দিতে চায় সেই কঠিন বাঁধনেই।

যামিনীর বয়স পঁয়তাল্লিশ বটে, কিন্তু অন্তরে বাহিরে সে বয়োধর্মকে নিকটবর্তী হতে দেয়নি। তার হাবভাব চালচলন ও কথাবার্তা সব তরুণের মতো, এমনকি চেহারা দেখলেও তার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের বেশি বলে সন্দেহ হয় না। তার এই তারুণ্যই আকৃষ্ট করেছিল সদানন্দবাবুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত মন্দ্রাকেও। অন্তত মন্দ্রা যে যামিনীকে পছন্দ করত এটুকু জানা গিয়েছে এবং তারই ফলে আশান্বিত ও উৎসাহিত হয়ে যামিনী সদানন্দবাবুর কাছে তার জামাতা হবার বাসনা প্রকাশ করে!

আগেই বলেছি, সদানন্দবাবুর মন ছিল অতি আধুনিক। স্ত্রী-স্বাধীনতায় তাঁর ছিল প্রবল প্রত্যয়। নিজে কোনও মত জাহির করার আগে তিনি কন্যার মত জানতে চাইলেন। অতি-আধুনিকা কেতাদুরস্ত মন্দ্রা কিন্তু নিতান্ত সেকেলে বঙ্গবালার মতোই বললে, তোমার মতই আমার মত।

এ-বিবাহে সদানন্দবাবুর মত হল না প্রথমত দুটি কারণে। প্রথমত পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান একুশ বৎসর। দ্বিতীয়ত, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গে তিনি জামাতার সম্পর্ক স্থাপন করতে একান্ত নারাজ।

এই মতের অমিলে কিন্তু মনের অমিল হল না, বজায় রইল বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই। ব্যাপারটা যামিনী গ্রহণ করলে পয়লা নম্বরের দার্শনিকের মতো খুব সহজভাবেই। সদানন্দবাবু বাজারে মন্দ্রার যোগ্য পাত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাত্র আবিষ্কার করবার আগেই ইহলোক থেকে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

গেল হপ্তার আঠারো তারিখে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তিনি মারা পড়েছেন আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে।

অস্ত্র একখানা ছোরা। অদ্ভুত ছোরা! ধরণীবাবুর মুখে শুনলাম, এ রকম ছোরা এখনও বাজারে আসেনি। ছোরার একদিকে খুব ধারালো ফলা আর একদিকে গ্রিসের সৌন্দর্যের দেবী

ভেনাসের নগ্নমূর্তি। এই মূর্তিটাই হচ্ছে ছোরার হাতল। যা জার্মানির 'ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর ছোরা নামে খ্যাত। আমেরিকার বাজারেও এর চাহিদা যথেষ্ট। শিকারিরাই এই ছোরা ব্যবহার করে। সদানন্দবাবুর বুকের উপরে ছোরাখানা বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

হত্যাকাল হচ্ছে রাত্রি সাড়ে নয়টা। ঘটনাস্থল হচ্ছে সদানন্দবাবুর শয়নগৃহ। কেবল খুন নয়, সদানন্দবাবুর আলমারির ভিতর থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া আর পনেরো হাজার টাকার জড়োয়া গহনাও অদৃশ্য হয়েছে।

বাবার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে মন্দ্রা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে স্পষ্ট দেখতে পায়, সদানন্দবাবুর শয়নগৃহ থেকে বেরিয়ে যামিনী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। মন্দ্রা বারবার 'যামিনীবাবু' বলে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া পায়নি।

একতলায় নিজের ঘর থেকে সদানন্দবাবুর ম্যানেজার হরিবাবুও স্বচক্ষে যামিনীকে বেগে রাস্তার দিকে ছুটে যেতে দেখেছেন।

মন্দ্রার মুখ থেকে আরও জানা গেছে, 'ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর ওই ছোরাখানার অধিকারী হচ্ছে যামিনীই, আমেরিকায় মন্দ্রার সামনেই সে ছোরাখানা কিনেছিল।

সব শুনে আমাদের দৃঢ় ধারণা হল, খুনি যামিনী ছাড়া আর কেউ নয়। পাছে চম্পট দেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললুম। কিন্তু তারপরেই আমাদের চিত্তবিভ্রম হবার উপক্রম! হুম! এ কী উদ্ভট মামলা!

হা হা করে হেসে উঠে যামিনী ধরণীকে বললে, খুলে দিন মশাই, খুলে দিন—আমার নরম হাতে এই শক্ত লোহার বেড়ি সহ্য হবে না! আপনারাও হবেন অপদস্থ আর বিপদগ্রস্ত!

ধরণী চোখ রাঙিয়ে বললেন, চোপরাও ছুঁচো, শুয়োর! খুন করে আবার লম্বা লম্বা বুলি কপচানো হচ্ছে! ঘুসি মেরে মুখ ভেঙে দেব জানিস!

—আমি খুন করেছি! প্রমাণ?

—মন্দ্রা দেবী আর তাঁর ম্যানেজারবাবু স্বচক্ষে তোকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

—ওরা ভুল দেখেছে।

—ওই ভেনাস-ছোরাখানা কার?

—আমার বলেই তো মনে হচ্ছে। আমেরিকায় কিনেছিলুম। কিন্তু ওখানা আজ ছমাস আগে আমার ঘর থেকে চুরি গিয়েছে। খবর নিয়ে দেখবেন যথাসময়ে থানায় ডায়েরি লেখানো হয়েছে।

—বটে! কিন্তু জানিস কি এই ছোরার হাতলের উপরে আছে খুনির আঙুলের স্পষ্ট ছাপ? ঘটনাস্থলেও পাওয়া গিয়েছে তার রক্তাক্ত হাতের ছাপ! এক জায়গায় নয়, তিন জায়গায়।

—হাতের ছাপের নিকুচি করেছে! ফালতু হাতের ছাপ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না!

—এই হাতের আর আঙুলের ছাপই প্রমাণ করবে খুন করেছিস তুই। পৃথিবীতে দুজন মানুষের হাতের ছাপ একরকম হয় না।

—বহুত আচ্ছা, দেখা যাবে। আপাতত আমার 'অ্যালিবাই' নিয়ে মাথা ঘামান দেখি।

—কী অ্যালিবাই?

—খুন হয়েছে আঠারো তারিখে। কিন্তু সতেরো থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন আমি কলকাতাতেই হাজির ছিলুম না।

—কোথায় ছিলি?

—বর্ধমানে। আমার বিশেষ বন্ধু বিজয়গোপালের বাড়িতে।

—কে বিজয়গোপাল?

—তাকে আপনি খুব চেনেন,—সে হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির একমাত্র ভগ্নীপতি।

ধরণীবাবুর চোখ উঠল চমকে। একটু থতমত খেয়ে তিনি শুধোলেন, বিজয়বাবুর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

—বললুম তো, বিজয় আমার বিশেষ বন্ধু। তার একমাত্র পুত্রের বিবাহে সে আমাকে সাহায্য করতে ডেকেছিল। গোটা তিন দিন আমাকে কলকাতায় ফিরতে দেয়নি। বিজয়ের কাছে খবর নিলেই জানতে পারবেন। আপনাদের ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছেও খবর পেতে পারেন—কারণ তিনিও ওই তিন দিন ছুটি নিয়ে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন।

ধরণীবাবু আর আমি দুজনেই রীতিমতো মুষড়ে পড়লুম, যদিও মুখে কিছু ভাঙলুম না।

পরে খবরাখবর নিয়ে জানা গেল, যামিনীর কথা মিথ্যা নয়—এ যে ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে লোহা-বাঁধানো 'অ্যালিবাই', এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার উপায় নেই।

ঘটনাস্থলে পাওয়া আঙুল ও হাতের ছাপের সঙ্গেও যামিনীর আঙুল ও হাতের ছাপ একটুও মিলল না।

আমরা যামিনীর চোখা চোখা টিটকারি শুনতে শুনতে প্রায় অধোবদনে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

জয়ন্ত, মানিক, তোমরা এমন সৃষ্টিছাড়া মামলার কথা কখনও শুনেছ?

জয়ন্ত জবাব দিলে না, দুই চক্ষু মুদে কী ভাবতে লাগল!

মানিক বললে, হুঁ, প্রথম দৃষ্টিতে সবদিক দিয়েই সন্দেহ ধাবমান হয় বটে যামিনীরই দিকে। প্রায় প্রতিদিন যারা তাকে দেখে এমন দুইজন স্বচক্ষে দেখলে পলায়মান যামিনীকে, তার কেনা ভেনাস-ছোরা পাওয়া গেল হত ব্যক্তির বক্ষে বিদ্ধ অবস্থায়; তার উপরে জামাতারূপে তাকে গ্রহণ করতে নারাজ হওয়ার দরুন সদানন্দবাবু নিশ্চয়ই তার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি ঠিক জানেন, মন্দ্রা মনে মনে যামিনীকে পছন্দ করত?

—লোকের মুখে তাই তো শুনেছি।

—তাহলে তো সহজেই যামিনীর বিশ্বাস হতে পারে, সদানন্দবাবুকে মাঝখান থেকে সরিয়ে দিলেই মন্দ্রা আর তার বিপুল সম্পত্তি নিশ্চয়ই সে অধিকার করতে পারবে।

—এ সব আমরাও ভেবে দেখেছি। কিন্তু খালি ভেবে-চিন্তে কী হবে ভায়া! পুলিশের চাই প্রমাণের মতো প্রমাণ।

—আর একটা কথা। আপনাদের জামাই-আদর থেকে ছাড়ান পাবার পর যামিনী কি আবার মন্দ্রার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেনি?

—করেনি আবার, খুব চেষ্টা করেছে! তাকে যে ভুল দেখা আর বোঝা হয়েছে, সেটা সবিস্তারে জানিয়ে যামিনী প্রথমে মন্দ্রাকে একখানা পত্র লেখে। কিন্তু মন্দ্রার তরফ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে সে সশরীরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মন্দ্রা দেখা না করে লোকমুখে বলে পাঠায়—নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। পিতৃহন্তার সঙ্গে আমি দেখা করব না। যামিনীকে তাই হাল ছাড়তে হয়েছে।

আচম্বিতে জয়ন্ত চোখ চেয়ে বললে, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র! এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ষড়যন্ত্র আছে।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, কেমন করে বুঝলে?

জয়ন্ত বললে, আমার বোঝাবুঝির মূল্য কতটুকু! ধরণীবাবু বলবেন, কড়াক্রান্তিও নয়!

সুন্দরবাবু হেসে বললেন, কিন্তু আমি তো ধরণীবাবু নই।

জয়ন্ত বললে, তাহলে আপনাকে আমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে পারি?

—তুমি অগুন্তি প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করে ফেললেও আমি একটুও বিরক্ত হব না।

—আমার সর্বপ্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যামিনীর দেশ কোথায়?

—মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। কিন্তু আজ বিশ বৎসর আগে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে যামিনী দেশের সঙ্গে যা-কিছু সম্পর্ক তুলে দিয়ে চলে আসে, তারপর নানাস্থানী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জিয়াগঞ্জের কোনও লোকই তার কথা বিশেষ কিছুই জানে না। ভাসা-ভাসা কেবল শোনা যায়, কামিনীকান্ত নামে যামিনীর আর এক ছোটোভাই ছিল, সে নাকি ক্রিমিন্যাল। ওয়ারেন্টে ধরা পড়বার ভয়ে আজ পনেরো বৎসর ধরে কোথায় কোন দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে, যামিনীও তার খোঁজখবর পায় না। সে বলে, তার ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।

—আমার পরের প্রশ্ন হচ্ছে : সদানন্দবাবুর সঙ্গে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যামিনী কোথায় বাসা বেঁধেছিল?

আপার সারকুলার রোডের একখানা ছোটো বাড়িতে। আর এক পুরোনো বন্ধু শ্যামাকান্তের সঙ্গে সেই বাড়িতেই বাস করত যামিনী।

—বন্ধুটিকে দেখেছেন?

—দৈবগতিকে দেখেছি। মাস পাঁচেক আগে ও-পাড়ার একটা বড়ো চুরির মামলায় পুলিশের পক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে আসে। মুখময় দাড়ি-গোঁফের ঝোপঝাড়, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলেপড়া এলোমেলো চুলের জঙ্গল, চোখে মোটা কাচের কালো চশমা—দস্তুরমতো বন্য চেহারা। পরনে গেরুয়া কাপড়-জামা, বিবাহ করেনি। সংসারের ধরাবাঁধার ধার ধারে না—ধর্মালোচনায় আর তীর্থভ্রমণেই তার দিন কাটে—হুম, দুনিয়ায় কতরকম জীবই যে আছে! আমরা যেদিন বোকা বনবার জন্যে যামিনীকে গ্রেপ্তার করতে যাই, সেদিনও সে বাড়িতে ছিল না, শুনলুম তীর্থভ্রমণে গিয়েছে।

হঠাৎ গাত্রোত্থান করে জয়ন্ত বললে, ভো সুন্দরবাবু! আমাদের পানে তাকিয়ে এইবার বলুন—জাগো এবং ভাগো!

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হুম! তোমার কথার অর্থ?

—আরে মশাই, আপনি ছুটি পেয়েছিলেন মাত্র আধঘণ্টা কাল। এতক্ষণে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। চলো মানিক, আমরা পালাই—নইলে সুন্দরবাবুর কর্তব্যপালনে ত্রুটি হবে। আবার যথাসময়ে দেখা করব। নমস্কার!

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এক হপ্তা পরে। টেবিলের দুই প্রান্তে বিমর্ষের মতো উপবিষ্ট ধরণীধর ও সুন্দরবাবু। মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় এক-একটা চুমুক দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেউ যেন চায়ের স্বাদ পাচ্ছিলেন না।

এমন সময়ে দ্বারপথে আবার জয়ন্ত-মানিকের আবির্ভাব।

ধরণী চোখ তুলে একবার তাদের দেখলেন, তারপরেই বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

সুন্দরবাবু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, সেদিন তোমরা অমন অসভ্যের মতো চলে গিয়েছিলে বলে আমি দুঃখিত হয়েছি।

মানিক বললে, দুঃখিত! কেন দুঃখিত হয়েছেন? আমরা কি মামলাটার আনুপূর্বিক বিবরণ অতিশয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিনি?

—হুম শুনেছ বটে! কিন্তু পরমুহূর্তেই হ্যাঁ কি না কিছুই না বলে বেগে স্থানত্যাগ করনি?

ধরণীর মুখের পানে একবার সকৌতুকে অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে মানিক বললে, তা ছাড়া আর কী করবার উপায় ছিল সুন্দরবাবু? শ্রদ্ধেয় ধরণীবাবু কি আমাদের স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেননি যে, পেশাদার পুলিশ শখের-গোয়েন্দার সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে?

ধরণী বললেন, হ্যাঁ, তখনও বলে দিয়েছি, আবার এখনও তাই বলছি—আমার এক কথা!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—ভদ্রলোকের এক কথা। তা আমরা তো মশায়ের কাছে গায়ে পড়ে সাহায্য করবার জন্যে আসিনি, আমরা এসেছি আমাদের প্রিয়বন্ধু সুন্দরবাবুকে একটা খবর দিতে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী খবর?

এইবার জয়ন্ত বললে, আমরা গতকল্য জিয়াগঞ্জ থেকে ফিরেছি।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললে, তোমরাও জিয়াগঞ্জে গিয়েছিলে? কেন হে? সেখানে তো যামিনীকে কেউ চোখেও দেখেনি।

জয়ন্ত বললে, আরও ভালো করে খুঁজলে আপনারাও দুই-তিনজন এমন বৃদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান পেতেন, যারা যামিনী আর কামিনীকে জন্মাতে দেখেছে?

ধরণী তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন,—আরও ভালো করে খোঁজবার কোনওই দরকার ছিল না—আমাদের যেটুকু জানবার তা জেনেছি। যত সব বাজে কথা! পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে যারা জিয়াগঞ্জে যামিনীকে জন্মাতে দেখেছে সেইসব বুড়োর বুকনি শুনে কলকাতায় বসে কোনও খুনের মামলার ফয়সালা করা যায় না।

—বলতে বাধ্য হলুম আপনার ধারণা ভুল! বুড়োদের মুখে কী খবর পেয়েছি জানেন? যামিনী আর কামিনী যমজ ভাই। তাদের চেহারার মিল এতটা বেশি যে, দুজনকে একই

পোশাক পরালে কে যামিনী আর কে কামিনী কেউ ধরতে পারত না। সুন্দরবাবু, এ তথ্যটুকু আপনার কোনও কাজে লাগবে কি?

সুন্দরবাবু প্রথমটা গম্ভীর বদনে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর সহসা লম্ফত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মূল্যবান তথ্য, মূল্যবান তথ্য! খুন করলে কামিনী, লোহার বালা পরলে যামিনী! বুঝতে পেরেছি!

—না সুন্দরবাবু, এখনও বোধহয় ব্যাপারটা আপনি তলিয়ে বুঝতে পারেননি। যা কিছু ঘটেছে, তাবৎ ব্যাপারের মূলে আছে একমাত্র যামিনীরই মস্তিষ্ক। কামিনী করেছে তারই আদেশ পালন। যামিনী জানত, স্বাভাবিকভাবে পুলিশের সন্দেহ তারই উপরে পড়বে। তাই পুলিশকে সে রীতিমতো নাকাল করতে চেয়েছিল। উপরন্তু প্রায় তারই মতো দেখতে কামিনীকে তার দরকার হয়েছিল, সদানন্দবাবুর বাড়িতে অবাধে প্রবেশ করবার সুবিধা হবে বলে।

—কিন্তু কোথায় সেই কামিনী?

—তা আমি জানি না। তবে এ ক্ষেত্রেও একটা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি। ধর্মপরায়ণ, তীর্থপর্যটক শ্যামাকান্তকে আবিষ্কার করুন। তার মাথাটা দীর্ঘ কেশপাশ থেকে মুক্ত করুন, তার চোখের উপর থেকে চশমার কালো কাচের আবরণ সরিয়ে ফেলুন, তার মুখ থেকে লম্বা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিন, তার গা থেকে গেরুয়া কাপড়-জামা কেড়ে নিন, হয়তো স্বচক্ষে দেখতে পাবেন যামিনীকান্তের যমজ ভাই কামিনীকান্তকে। হয়তো এ হচ্ছে আমার ভ্রান্ত ধারণা, কিন্তু এখনই আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, কিন্তু শ্যামাকান্তও যে খাঁচার বাইরে কোথায় উড্ডীয়মান হয়েছে, কে তার সন্ধান দেবে?

ধরণী গোঁ-ভরে নীরবে সব কথা শুনছিলেন, এতক্ষণ পরে মুখ খুলে বললেন, সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমাদের যে-সব সুযোগ-সুবিধা আছে, শখের গোয়েন্দাদের তা নেই। আমি ডাকঘরের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করতে পারি যে, যামিনীর বাড়ির সমস্ত চিঠিপত্র যেন বিলি করবার আগে আমাদের কাছে পাঠানো হয়। জয়ন্তবাবুর সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে আজ বা কাল না হোক, দুই কি চার কি ছয় মাসের মধ্যে কোনও-না কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমাদের কী মত জয়ন্ত?

—আমাদের আর কোনও মতামত নেই। এখন তবে আসি। চলো মানিক।

তিন মাস পরের ঘটনা।

জয়ন্তর প্রভাতী চায়ের আসর। সুন্দরবাবুর প্রবেশ—পিছনে পিছনে ধরণীবাবু।

কেউ কিছু বলবার আগেই সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত আজ তোমাদের চায়ের আসরে ধরণীবাবু অনাহুত অতিথি হতে চান।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য—পরম সৌভাগ্য! আসুন, বসুন,—ওরে মধু, জলদি চা নিয়ে আয়—টোস্ট আর এগপোচ আনতেও ভুলিস না যেন।

ধরণীবাবু বললেন, আজ চা পান হচ্ছে গৌণ ব্যাপার, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের অনেক কটু কথা শুনিয়েছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মশাই, কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ আপনার ক্ষমা প্রার্থনার কথা মনে হল কেন?

—সঠিক আপনার অনুমান! যামিনী শ্যামাকান্ত ওরফে কামিনীকে চিঠি লিখেছিল বোম্বাই শহরে। সে গ্রেপ্তার হয়েছে। ছোরার আঙুলের ছাপ মিলে গেছে অবিকল। যামিনীর সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল—ছদ্মবেশের ভিতর থেকে লোকের চোখে যা ধরা পড়ত না। যামিনীও এখন হাজতে। আপনি গোয়েন্দা বটে, কিন্তু অসাধারণ আর অতুলনীয়! ধন্য, ধন্য!

অনুবিসের অভিশাপ

কিম্ভুত না অদ্ভুত?
কিংবা এ আসল ভূত?

এটা প্রায়ই দেখা যায়।

হয়তো বহুকাল রামের পাত্তা নেই। আমিও তাকে ভুলেছিলুম। আচমকা একদিন অকারণেই তার কথা স্মরণ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে রামের দেখা পেলুম পথেঘাটে বা অন্য কোথাও।

আজকের ব্যাপারটাও অনেকটা ওই রকম!

প্রভাতি চায়ের আসর তেমন জমেনি, কারণ সুন্দরবাবুর অনুপস্থিতি। আন্দাজ করা গেল, সুন্দরবাবু যখন চা ও তৎসহ রসনারোচক খাদ্যসামগ্রীর লোভ ছেড়েছেন তখন জড়িয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই কোনও জটিল মামলার জালে।

চায়ের পালা চুকিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলুম। দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটা অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ। ঘটনাটা ভৌতিক। পুরানো বাড়িতে নতুন ভূতের ওস্তাদি! অর্থাৎ উত্তর কলিকাতার একখানা দেড়শো বছরের বুড়ো বাড়িতে হঠাৎ ভূতের ভেলকি খেলা শুরু হয়েছে।

বাড়িখানা মস্ত বড়ো। তার ঘরে ঘরে বাসা বেঁধেছে পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা বিভিন্ন উদ্বাস্তু পরিবার। ভূতের হামলা চলছে তাদেরই উপরে।

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে কি অনুমান করতে হবে যে, এই ভূতও বাস্তুহারা? কোথাও কোনও রোজা তার আড্ডা ভেঙেছে, আর সে-ও সোজা এসে মাথা গুঁজেছে উদ্বাস্তুদের বাসাবাড়িতে?'

—'না জয়, ঠাট্টা নয়। ভূতের পাল্লায় পড়ে এক ব্যক্তি নাকি মারা যেতে যেতে কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছে।'

—'পুলিশ খবর পেয়েছে?'

—'নিশ্চয়! কিন্তু পুলিশ কিছুই করতে পারছেন না। কে যে আততায়ী, কেউ জানে না। পুলিশ সদলবলে ঘটনাস্থল ঘিরে বসে আছে, অথচ কোথা থেকে যে রাশি রাশি ইট-পাটকেল বৃষ্টি হচ্ছে কেউ তার হদিস পাচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'পুলিশ যদি বিদেহ ভূতকে না খুঁজে দেহী মানুষকে খুঁজত, তাহলে হয়তো তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত।'

—'তোমার এমন বিশ্বাসের কারণ?'

—'দেড়শো বছরের পুরানো বাড়িতে কেউ কখনও ভূতের গন্ধ পায়নি, সেখানে ভূত আজ হঠাৎ হানা দিতে আসবে কেন?'

আমি উত্তর দেবার আগেই ভিতরে আচম্বিতে মুখে হুম-হাম ও পায়ে দুম-দাম শব্দ সৃষ্টি করে ইন্‌স্পেকটার সুন্দরবাবুর প্রবেশ এবং তাঁর পিছনে পিছনে আর এক অচেনা ভদ্রলোক।

আমি বললুম, 'কী সুন্দরবাবু, আজ চায়ে চুমুক দিতে আসেননি, হঠাৎ এই আশ্চর্য বিরাগের কারণ কী?'

—'হুম! চায়েই চুমুক দেব বটে! যে ভৌতিক মামলার প্যাঁচে পড়েছি চিত্ত একেবারে চড়কগাছ আর কী!'

আমি বললুম, 'ভৌতিক মামলা? খবরের কাগজে আজ যার কথা বেরিয়েছে?'

জয়ন্ত বললে, 'উদ্বাস্তুদের উপরে বাস্তুহারা ভূতের অত্যাচার?'

—'না হে, না! এ মামলার সঙ্গে বাস্তুহারা ভূত কি বস্তুতান্ত্রিক মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই।'

—'তবে কি আর-একটা আনকোরা ভৌতিক মামলা? কী আশ্চর্য! আজকাল কি লোকে ভূত ধরবার জন্যে রোজার বদলে পুলিশ ডাকে?'

—'যেখানে খুনোখুনি হয় বা হবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে লোকে পুলিশ না ডেকে কী আর করবে বলো? খুনি ভূত না মানুষ সেটা তদন্ত না করলে তো চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না!'

—'খুন-টুন হয়েছে নাকি?'

—'কিছুকাল আগে একটা খুন হয়েছে আর খুনিও ধরা পড়েনি বটে, তবে আমার এলাকায় নয়, কাজেই তা নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু সম্প্রতি আমারই এলাকায় রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তোড়জোড় চলছে—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু তার সঙ্গে ভূতের সম্পর্কটা কী?'

—'খুনটা যিনি করতে চান তিনি নাকি সেকালে দেবতা বলে পূজা পেয়েছেন কিন্তু একালের ভাষায় তিনি দেবতা নন, উপদেবতা।'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলুম, 'বলেন কী দাদা, সেকেলে দেবতা একেলে পৃথিবীতে উপদেবতার ভূমিকায় দেখা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন?'

—'ঠিক তাই। তুমি শুনলে আরও অবাক হবে যে, এই উপদেবতাটির সাকিন হচ্ছে প্রাচীন মিশর।'

শুনেই তো আমি একেবারে 'ফ্ল্যাট'!

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার এই উপদেবতার উপকথা শুনে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত হবে বলে সন্দেহ হচ্ছে না। অতঃ কিম?'

—'তারপর? এই দেবতা বা উপদেবতার নাম হচ্ছে অনুবিস।'

আমি বললুম, 'অনুবিসের কথা আমি কেতাবে পড়েছি। প্রাচীন মিশরিদের মতে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেবতা ওসিরিসের পুত্র, মানুষ মারা গেলে পরে তিনি তার অভিভাবক হন।

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু প্রাচীন মিশরিরা তো তাদের সভ্যতা, ধর্ম আর কুসংস্কার নিয়ে মহাকালের মহাসাগরতটে জলের লিখনের মতো কবে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ধরলুম তাদের দেবতা ও উপদেবতাদের মৃত্যু নেই। কিন্তু অনন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ না করে আজকে এই সর্বনেশে অ্যাটমবোমার যুগে তারা কি আবার জেগে উঠে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে সাহস করবে?'

সুন্দরবাবু একটু অধীর ভাবে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, গোড়াতেই কথাসরিৎসাগরে সন্তরণ দিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ঘটনাটা ভাসা ভাসা শুনেই চমকে গিয়েছি। এ মামলা গ্রহণযোগ্য কি না মনে সন্দেহ হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে এই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি, এঁর প্রমুখাৎ আসল ঘটনা শ্রবণ করো। এঁর নাম যতীন্দ্রনাথ সেন, ইনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।'

তখন আগন্তুকের দিকে ভালো করে ফিরে তাকালুম।

মাথায় খানিক সাদা খানিক কালো অযত্নবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ, সৌম্য মুখ, দাড়ি গোঁফ বোধ করি তিন-চার দিন কামানো হয়নি, মোটা কাচের চওড়া ফ্রেমের চশমার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে চিন্তান্বিত দৃষ্টি, সাদাসিধে আধময়লা জামাকাপড়ে প্রসাধন-পারিপাট্যের কোনও চিহ্নই নেই, পায়ে বার্নিশ না করা পাদুকা। শ্যামবর্ণ, মাঝারি আকার। হাতে একগাছা যষ্টি, তার স্থূলতা দেখলেই বোঝা যায় তাকে ধারণ করা হয়েছে শোভার্থে নয়, আত্মরক্ষার্থে।

জয়ন্ত বললে, 'যতীনবাবু, নমস্কার। আপনার নাম আমি শুনেছি, আপনি অবিখ্যাত ব্যক্তি নন। বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ের পুরাতত্ত্ব নিয়ে পত্রিকায় আপনার সুলিখিত আলোচনা আমি পড়েছি। কিন্তু আপনার মতো নিরীহ প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে অমন একগাছা বেমানান বাঘমারা লাঠি কেন?'

এতক্ষণ পরে মুখ খুলে যতীনবাবু বললেন, 'ভয়ে মশাই, ভয়ে।'

—'ভয়ে! কার ভয়ে?'

—'অনুবিসের।'

—'তাহলে অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'করি। বিশ্বাস আগে করতুম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি।'

—'কেন বাধ্য হয়েছেন?'

—'অনুবিস যে জাগ্রত দেবতা, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।'

—'যতীনবাবু, আপনার কথা শুনলে লোকে হাসবে।'

—'আমার সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসতে পারবেন না।'

—'উত্তম, বলুন আপনার সব কথা! এমনকি আপনার বিষয়সম্পত্তি আর পরিবারবর্গের কথাও শুনতে চাই।'

যাদুকরের মন্ত্র কয়—
শুকনো মড়া জ্যান্ত হয়!

যতীনবাবু বলতে লাগলেন :

'অল্পবিস্তর বিষয়আশয় আর ব্যাংকের খাতার মহিমায় আমার জীবন কাটে সুখে-স্বচ্ছন্দে। লোকের মতে, আমি ধনী! আর পরিবারবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমি বিবাহ করিনি, পরিবারবর্গ বলতে আমার সংসারে আপাতত আর কেউ নেই।

দুই বিধবা সহোদরা ছিল, তারাও এখন পরলোকে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে পুত্র। তারাই এতদিন আমার সঙ্গে বাস করত। একজনের নাম মুরলীধর, আর একজনের সনৎকুমার। কিন্তু সনৎ মারা পড়েছে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় আর মুরলীধর থেকেও নেই, চরিত্র দোষের জন্যে তাকে আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। তাকে আমি নিজের মনের মতো শিক্ষা দিয়ে মানুষ করবার চেষ্টায় ছিলুম। প্রত্নতত্ত্বের কাজে সে ছিল আমার সহকারী। কিন্তু দিনে দিনে তার মতিগতির অধোগতি দেখে তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়েছি। আজ চার বৎসর তার মুখ দেখিনি। সে-ও একরকম নিরুদ্দেশ হয়েই আছে—তবে কারুর কারুর মুখে ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছি, ভবঘুরের জীবন যাপন করতে করতে সে এখন নাকি আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশে গিয়ে পড়েছে।

কাজেই সংসারে আমি এখন একলা। কিন্তু সেজন্যে আমার দুঃখ বা অভিযোগ নেই। আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকদের একক জীবনই সুবিধাজনক। এই প্রত্নতত্ত্বের দুর্জয় নেশায় মেতে শিলালিপি, তাম্রলিপি বা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খোঁজবার জন্যে আমাকে দেশবিদেশে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। কখনও গিয়েছি উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পা বা অন্য কোথাও—অধুনালুপ্ত প্রাচীন সভ্যতার নষ্টোদ্ধার করতে; কখনও গিয়েছি আফগানিস্তানে—পুরাতন বৌদ্ধকীর্তিকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে

পুনরাবিষ্কার করবার জন্যে; কখনও গিয়েছি আদি সভ্যতার অন্যতম লীলাক্ষেত্র মিশরের নীল নদের তীরে। এ হচ্ছে প্রায় যাযাবর জীবন, সংসারধর্ম পালনের পক্ষে উপযোগী নয় আদৌ।

আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত ওই নীল নদের তীরেই—যেখানে আকাশছোঁয়া পিরামিডের সমাধিস্মৃতিজড়িত স্বপ্ন-কুজ্‌ঝটির দিকে চির-অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে আছে নারসিংহী স্ফিংক্‌স-এর বিরাট শিলামূর্তি।

মিশরের 'মমি' বা মশলার দ্বারা সুরক্ষিত মানুষের মৃতদেহের কথা আজ আর কারুর কাছেই অবিদিত নেই। প্রাচীন মিশরিদের মতে, এক চরম বিচারের দিনে বিচারকর্তা দেবতার সামনে এই মৃতদেহগুলিকে আবার মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবন্ত করে তোলা হবে।

আধুনিক মানুষেরা মিশরের নানাস্থানে কবর খুঁড়ে অসংখ্য মমি আবিষ্কার করেছে। মমি আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ববিদরা অসংখ্য মমি ক্রয় করেছেন, কলকাতার যাদুঘরেও একটি নারী-মূর্তির প্রায়-নষ্ট মমি আছে।

মেমফিস নামক জায়গায় গিয়ে দেখি এক বহুদূরবিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটি চার হাজার বৎসরের মমি কেনবার লোভ সামলাতে পারলুম না। খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর আগে একাদশ রাজবংশের চতুর্থ মেনতুহোতেপ যখন মিশরের অধিপতি, তখন তাঁর রাজসভায় ছিলেন তানুতামেন নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এটি হচ্ছে তাঁরই সুরক্ষিত মৃতদেহ।

শোনা যায়, মমিকে কবরস্থ করবার আগে পুরোহিতরা এমন জাদুমন্ত্র পড়ে দিতেন, কখনও মন্দীভূত হত না যার প্রভাব। ফলে কোনও অবিশ্বাসী ব্যক্তি মমিকে ঠাঁইনাড়া করলে সমূহ বিপদে পড়ত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হাওয়ার্ড কার্টার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা রাজা তুতানখামেনের মমি স্থানান্তরিত করেছিলেন। মন্ত্রগুণে সেই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নাকি মারা পড়েছিলেন অভাবিত ও আকস্মিক দুর্ঘটনায়। পুরোহিত কিংবা দেবতার অভিশাপ গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল এসব হচ্ছে বাজে কুসংস্কার, বিশ্বাসের অযোগ্য একজন মিশরি ভদ্রলোক আমাকেও মমি কিনতে মানা করে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, এই মৃতদেহ মিশরের বাইরে নিয়ে গেলে আমাকেও মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা আমি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। মমিটিকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আমি নিজের সংগ্রহশালায় রক্ষা করেছি।

দেশে ফেরবার পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি। কিন্তু তারপরেই মিশরের রাজধানী কাইরো থেকে আমার কাছে আসে ইংরেজি ভাষায় টাইপরাইটারে লেখা একখানা বেনামি চিঠি। তাতে এই বলে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয় যে, আমি যদি এক মাসের মধ্যে তানুতামেনের মমিকে পুনরায় মিশরে পাঠিয়ে না দি, তবে আমাকে বিষম বিপদের আবর্তে পড়তে হবে। পত্রের তলায় প্রেরকের নামের পরিবর্তে শুধু লেখা ছিল—'শুভার্থী বন্ধু'।

কিন্তু তথাকথিত শুভার্থী বন্ধুর উপদেশ মানতে পারিনি। প্রচুর মূল্য দিয়ে মমিটি কিনেছিলুম, কোনও ধাপ্পাবাজের উড়োচিঠিতে ভয় পেয়ে হারাতে রাজি হলুম না। দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস। তারপরেই ঘটল প্রথম দুর্ঘটনা।

মুরলীধরকে ত্যাগ করবার পর থেকেই আমার দ্বিতীয় ভগ্নীর পুত্র সনৎকুমার আমার বাড়িতেই বাস করত। সে ছিল অত্যন্ত সৎস্বভাব, বিনয়ী ও অধ্যয়নশীল। আমার সেবায় ছিল তার পরম আনন্দ। তাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েছে। সনৎকুমার অপঘাতে মারা পড়েছে এবং তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে রহস্যাবৃত।'

এই পর্যন্ত শুনে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আপনার ভাগনের মৃত্যুকে রহস্যাবৃত বলছেন কেন?'

—'কারণ তার সঙ্গে অপার্থিব ব্যাপারের সম্পর্ক আছে।'

—'অপার্থিব ব্যাপার বলতে আপনি কী বোঝেন জানি না। কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

মিত্রাক্ষর নয়, চিত্রাক্ষর, মৃত্যুদূতের লেখা নিজ-স্বাক্ষর!

জয়ন্ত বললে, 'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সনৎবাবু কতদিন আগে মারা পড়েছেন?'

—'ঠিক এক মাস আগে রাত্রিকালে।'

—'পুলিশের মতেও কি এটা হত্যাকাণ্ড?'

—'নিশ্চয়! এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হতে পারে না। কেউ বিষাক্ত তির ছুড়ে তাকে হত্যা করেছে। বক্ষে তিরবিদ্ধ অবস্থায় সনতের মৃতদেহ পাওয়া যায়।'

—'এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চাই।'

—'সনতের মৃতদেহ পড়ে ছিল ঘরের মেঝের উপরে। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল।'

—'জানালা?'

—'খোলা ছিল।'

—'ঘরে আলো জ্বলছিল বোধ হয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সব বুঝতে পারছি। কেউ বাহির থেকে তির ছুড়ে সনৎবাবুকে হত্যা করেছে।'

—'পুলিশও তাই বলে।'

—'পুলিশ কারুকে সন্দেহ করেছে?'

—'কার উপরে সন্দেহ করবে? সনৎ ছিল অজাতশত্রু। এর মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি কেবল আমি। বোধ করি হত্যাকারীর উদ্দেশ্যও ছিল তাই।'

—'এইবার আসল প্রশ্নে আসা যাক। যতীনবাবু আপনার মতে সনৎবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে অপার্থিব রহস্যের সম্পর্ক আছে। এমন বিশ্বাসের কারণ কী?'

—'প্রথমত, সনতের বুকে যে তিরগাছা বিদ্ধ ছিল, তা আধুনিক নয়। হাজার হাজার বৎসর আগে প্রাচীন মিশরিরা সেইরকম তির ব্যবহার করত। সেরকম অনেক তির প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও পাওয়া যায়।'

—'তারপর?'

—'দ্বিতীয়ত, তিরের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল একখানা কাগজ। কিন্তু সেখানা সাধারণ কাগজ নয়।'

—'তবে?'

—'সেকেলে বাঙালিরা লিখবার জন্যে ব্যবহার করত তালপাতা। মিশরে আজও 'প্যাপাইরাস' নামে একরকম জলজ তৃণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরিরা সেই তৃণ থেকে কাগজ তৈরি করে লেখবার জন্যে ব্যবহার করত।'

—'এ কথা আমরাও জানি।'

—'তিরের সঙ্গে সংলগ্ন কাগজখানা ছিল সেই রকম আর তার উপরে লেখা ছিল দুটি শব্দ।'

—'প্রাচীন মিশরিরা লিখত তো চিত্রাক্ষরে, যাকে 'হায়ারগ্লিফিক্‌স' বলা হয়।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে হচ্ছে একরকম সাংকেতিক ভাষা, বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারে না।'

—'আপনি পড়তে পারেন তো?'

—'নিশ্চয়!'

—'সেই কাগজে কী লেখা ছিল?'

—'অনুবিসের অভিশাপ।'

—'অর্থাৎ তানুতামেনের মমি চুরি বা ঠাঁইনাড়া করেছেন বলে অনুবিসের অভিশাপে আপনার ভাগিনেয় নিহত হয়েছেন?'

—'ওছাড়া আর কী অর্থ হবে বলুন?'

—'কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা কি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে নয়? দোষ করলেন আপনি, শাস্তি পেলে অন্য লোক!'

—'তারপর শুনুন। সনতের মৃত্যুর হপ্তাখানেক পরে আবার এক উড়োচিঠি আসে—সেইরকম টাইপরাইটারে লেখা। লেখক সেই 'শুভার্থী বন্ধু'।'

—'এবারের চিঠির খামের উপরেও কি মিশরের ডাকঘরের ছাপ ছিল?'

—'না, কোনও ছাপ থাকবার কথা নয়। কারণ এবারের চিঠিখানা কেউ স্বহস্তে আমার বাড়ির ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।'

—'বটে, বটে! বড়োই চিত্তাকর্ষক কথা!'

—'এবারের চিঠিতে লেখা ছিল—এখনও সাবধান হোন। তানুতামেনের মমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন। নইলে এবারে আপনার নিজের পালা। অনুবিসের সম্পত্তি আপনি হরণ করেছেন, অনুবিস আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আর সাত দিন মাত্র সময় দেওয়া হল।'

—'আপনার অভিপ্রায় কী? মমিটাকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দেবেন?'

—'প্রাণ থাকতে নয়। ওই মমির সঙ্গে চিত্রাক্ষরে লেখা একখানা দলিল পেয়েছি। তাতে বহু দুর্লভ তথ্য আছে, পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে যা অমূল্য। তবে নিরাপদ হবার জন্যে বসতবাড়ি ছেড়ে আমি নিজের বাগানবাড়িতে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে এসেও আবার পেয়েছি বিপদের সাড়া।'

—'তাই নাকি? কিন্তু আপনার নতুন বিপদের কথা শোনবার আগে আর একটা কথা জানতে চাই। প্রাচীন মিশরি তির আর চিত্রাক্ষরে অনুবিসের নাম দেখেই কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, এইসব ঘটনার সঙ্গে আছে অলৌকিকের সম্পর্ক?'

যতীনবাবু জোরে মাথানাড়া দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। অলৌকিককে আমি যে দেখেছি!'

—'কাকে দেখেছেন?'

—'অনুবিসকে।'

—'স্বচক্ষে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বচক্ষে। সে হচ্ছে ভয়াবহ মূর্তি!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'প্রাচীন মিশরের কথা আজ পরিণত হয়েছে সুদুর অতীতের স্বপ্ন

কাহিনিতে। আর আপনি কিনা বলতে চান, সেই বিস্মৃত পৌরাণিক যুগের ভূতুড়ে দেবতা অনুবিসকে স্বচক্ষে দেখেছেন এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায়!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই বলতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আপনি একটা বিটকেল স্বপ্ন দেখেছেন!'

আমি বললুম, 'সব কথা না শুনে কোনও মত প্রকাশ না করাই উচিত। যতীনবাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি।'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক। যতীনবাবু, আপনার আশ্চর্য দর্শনের কথা শেষ করুন।'

কী ভীষণ! কার মুখ?
নরদেহে জম্বুক!

যতীনবাবু আবার শুরু করলেন তাঁর কাহিনি:

'গতকল্যকার কথা বলছি।

আমার বাগানবাড়ি একতলা। চারিদিকে যোলো বিঘা জমির উপরে আছে ফল-ফুলের গাছ, লতাপাতার ঝাড়, আলবাঁধা ছোটো ছোটো খোলা জমি এবং পুকুর। বাগানে পাঁচিল নেই বটে, কিন্তু মেদী ও তারের বেড়া দিয়ে সব দিকে ঘেরা। চারখানি ঘরের একখানিতে আমি শয়ন করি। বাগানের পিছনে মালির এবং ফটকের পাশে দারোয়ানের ঘর।

প্রথম রাতটা ছিল গুমট, রাত বারোটার পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা পড়ে, কনকনে বাতাস বইতে থাকে। শীত শীত করায় ঘুম ভেঙে যায়, মাথার কাছেকার জানালাটা বন্ধ করে দেবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি।

জানালার কাছে গিয়ে বুঝি তখনও থামেনি ঝুরঝুরে ইলশেগুঁড়ুনি। এত হালকা যে শব্দ শোনা না গেলেও হাওয়ায় উড়ে এসে গায়ে লাগে। আচম্বিতে নিঝুম অন্ধকারের বুক চিরে ও আমার চোখে চমক লাগিয়ে ঝলকে উঠল এক তীব্র ও সুদীর্ঘ বিদ্যুৎ শিখা এবং তারপরেই আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়ে গমগম করে কানে বাজতে লাগল যন্ত্রের গম্ভীর গর্জন।

কিন্তু সেই গর্জমান বজ্রধ্বনি শুনতে শুনতেই আর একটা কল্পনাতীত দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠল আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত।

জানালা থেকে অল্প তফাতেই হাসনুহানার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত দীপ্তচক্ষু মূর্তি!

মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতোই তুরন্ত প্রশ্ন খেলে গেল—কে ও, কে ও, কে ও?

তারপর কান থেকে বজ্রধ্বনির প্রতিধ্বনি মিলোতে না মিলোতেই বিছানা থেকে খপ করে ইলেকট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বেলে ফেলে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নিকষ-কালো মনুষ্য-দেহের উপরে বিরাজমান প্রকাণ্ড এক শৃগালের মুখ আর সেই আশ্চর্য শেয়াল মুখেই দপ দপ করে জ্বলছিল দু-দুটো নীলাভ আগুন-চোখ! অত্যুক্তি নয়, চোখ দুটো সত্যসত্যই অগ্নিময়! কিন্তু টর্চের আলো জ্বলতেই নিবে গেল সেই চোখের আগুন! আমি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম।

ধরা পড়েই সেই ভয়ংকর অমানুষিক মূর্তিটা বিকট এক হুংকার দিয়ে অদৃশ্য হল ঝোপের আড়ালে।

আমার চিৎকারে লোকজন ছুটে এল। তারপর শুনতে পেলুম কার ধাবমান মোটরের শব্দ। বেয়ারা ও দারোয়ানরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাগানে বাইরের কারুকে দেখতে পেলে না।

তারপর বাকি রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে ভোর হতেই থানায় এসে হাজির হয়েছি।'

সব শুনে জয়ন্ত চুপ করে কী ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বলো তো জয়ন্তভায়া, এমন উদ্ভট মামলা নিয়ে পুলিশ কী করতে পারে? হুম, শেয়ালমুখো আগুনচোখো মানুষখেকো ভূত! কেন বাপু, ভূত কি অন্য কোনও রকম ভদ্রমূর্তি ধারণ করতে পারলে না? দেহ মানুষের, মুখ শেয়ালের, চোখ আগুনের! ধ্যেৎ যা নয় তাই!'

যতীনবাবু বললেন, 'মশাই, প্রাচীন মিশরের দেবতা অনুবিসের মুখ ছিল শৃগালের!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেবতার এমন যাচ্ছেতাই জানোয়ারি বুদ্ধি হয়, আমি একথা বিশ্বাসই করি না! শেয়ালমুখো দেবতাকে কেউ আবার পুজো করে নাকি? কক্ষনো না—হুম!'

যতীনবাবু বললেন, 'সেকালের মিশরের এমন সব দেবতাও পুজো পেতেন যাঁদের মুখ ছিল কারুর ভেড়া, কারুর গোরু, কারুর সিংহ, কারুর বক বা বাজপাখির মতো।'

—'আরে ছি ছি, এ যে দেবতাদের অপমান!'

—'তাহলে আমাদের—অর্থাৎ হিন্দুদেরও তো দোষী বলতে হয়। গণেশের হাতির মতো মুখের কথা ভুলে যাবেন না। তারও উপরে আছেন নৃসিংহাবতার! আবার পুরানো মন্দিরে বিষ্ণুর নরবরাহ মূর্তিও দেখা যায়।'

আমি বললুম, 'ওসব বাজে কথা যেতে দিন। হ্যাঁ যতীনবাবু, ওই শেয়ালমুখো বিদেশি দেবতাকে দেখতে গিয়ে ভয়ে আপনার চোখের ভ্রম হয়নি তো?'

—'ভ্রম? অসম্ভব! প্রাচীন চিত্রে আর ভাস্কর্যে আমি অনুবিসের যেরকম আঁটসাট ছোটো জামা আর বিশেষ ধরনে তৈরি হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝোলানো খাটো কাপড় দেখেছি, আমার বাগানের শেয়ালমুখো মূর্তিটার পরনেও ঠিক সেই রকম পোশাকই ছিল। মুখ, দেহ, সাজপোশাক সব হুবহু মিলে গেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার কথা মানলে বলতে হয় ওই অনুবিস হচ্ছে মড়াদের রক্ষক—অর্থাৎ গোরস্থানের দেবতা। এমন বিচ্ছিরি ভূতুড়ে দেবতাকে ঘাঁটিয়ে লাভ কী মশাই, তানুতামেনের শুকনো মড়াটা মানে মানে ফিরিয়ে দিলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়—আপনারও প্রাণরক্ষা হয়, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!'

যতীনবাবুর মুখে ফুটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি বললেন, 'ফিরিয়ে দেব? বলেন কী? তাহলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গোঁ আপনি জানেন না—গোঁ বজায় রাখবার জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।'

সুন্দরবাবু বিরক্তমুখে বললেন, 'অর্থাৎ আমাদের জ্বালিয়ে আর খাটিয়ে মারবেন? না মশাই, পুলিশ ভূত-ধরার বেসাতি করে না, আপনি ভালো রোজার তল্লাশ করুন। কী বলো জয়ন্ত?'

সুন্দরবাবুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'যতীনবাবু, মমিটা প্রত্যার্পণ করবার জন্যে আপনাকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সাত দিনের কয় দিন আর বাকি আছে?'

—'বাকি নেই। গতকাল ঠিক সাত দিনের মাথায় অনুবিসের দেখা পেয়েছি।'

—'তাহলে পত্রলেখকের কথায় বিশ্বাস করলে বলতে হয়, এখন যে-কোনও মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কাল রাত্রে সেই শেয়ালমুখো মূর্তিটাকে আপনি বাগানে হাসনুহানার ঝোপের কাছে দেখেছিলেন?'

—'হুঁ।'

—'মূর্তিটা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা চলন্ত মোটরের শব্দ শুনেছিলেন?'

—'শুনেছিলুম।'

—'শব্দটা আসছিল বাগানের কোন দিক থেকে?'

—'পিছন দিক থেকে।'

—'সেদিকে মোটর চলবার উপযোগী রাস্তা আছে?'

—'একটা সরু কাঁচা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু দিনেও সেদিকে-গাড়িতে চড়ে বা পায়ে হেঁটে কারুকে বড়ো একটা যাতায়াত করতে দেখিনি। আর রাত্রে তো নয়ই। সেদিকে আছে কেবল পোড়ো জঙ্গুলে জমি।'

—'যতীনবাবু মূর্তিটার দেখা পাবার আগেই তো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ এক পশলা।'

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, গা তুলুন। আমরা যতীনবাবুর বাগানবাড়িতে যাত্রা করব।'

—'কেন হে, তুমি কি এই আজগুবি মামলাটার ভার নিতে চাও?'

—'তা চাই বই কি!'

—'কিন্তু মনে রেখো, শেষটা এ ভার দুর্বহ আর দুঃসহ হতে পারে!'

—'হলেও সে ভার নামাবার শক্তি আমার আছে। উঠুন।'

অনুবিসের বিষের রীষে জ্বললে, শেষে বাঁচবে কীসে?

কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়—মাত্র মাইল বারো পথ। তারপরেই যতীনবাবুর বাগানবাড়ি।

বেশ সাজানো বাগান, বাড়িখানি বাংলো ধরনের, ছোটো হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একেবারে শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'যতীনবাবু, কোন জানালা থেকে আপনি সেই মূর্তিটা দেখেছিলেন?'

যতীনবাবু অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলেন।

জয়ন্ত জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিচালনা করে বললে, 'কালকের এক পশলা বৃষ্টি গাছপালার ময়লা ধুয়ে দিয়েছে। সোনালি রোদের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওই হাসনুহানা ঝোপটার শ্যামলতা সুন্দর দেখাচ্ছে। যতীনবাবু, ওইখানেই কি সেই বিভীষিকার আবির্ভাব হয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'উত্তম। চলুন ওইখানে।'

সুন্দরবাবু অধীর ভাবে বললেন, 'ভায়া, তুমি কি এখনও ওই ঝোপের মধ্যে কোনও অসম্ভব নরশৃগালকে আবিষ্কার করতে চাও?'

জয়ন্ত অগ্রসর হতে হতে বললে, 'দেখা যাক। অন্তত ওখানে একটা কিছু দেখতে পাব বলেই আশা করছি।'

—'বোধ হয় অশ্বডিম্ব?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। আমি কিন্তু সুন্দরবাবুর মেজাজকে গরম করবার এমন সুযোগ ছাড়তে পারলুম না। হেসে বললুম, 'ওখানে অশ্বডিম্ব পাওয়া গেলে আমি তার ওমলেট বানিয়ে আপনার জঠরাগ্নি নেবাবার চেষ্টা করব।'

সুন্দরবাবু রেগে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্থানে-অস্থানে তোমার ফাজলামি ভালো লাগে না মানিক!'

—'কিন্তু ওমলেট? ওমলেট আপনার ভালো লাগে তো? বিশেষ অশ্বডিম্বের ওমলেট। মস্ত বড়ো।'

সুন্দরবাবু নিরুত্তর ক্রোধারক্ত মুখে গট গট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে হাসনুহানার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এখানে ঘাসজমির ওপরে দেখবার কিছুই নেই।'

—'সেটা আমি এখানে না এলেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতুম।'

জয়ন্ত ঝোপের ওপাশে গিয়ে বললে, 'ঝোপের নীচে আদুড় কাঁচা মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

'দেখব আবার কী ছাই?'

—'ছাইভস্ম নয়, দেখবেন কারুর একখানা বাঁ পায়ের ছাপ।'

—'পায়ের ছাপ?'

—'হ্যাঁ। কাল রাতে এখানে যে মূর্তিমান হয়েছিল, যতীনবাবুর চিৎকার শুনে সে তাড়াতাড়ি সরে এসেছিল ঝোপের এইখানে। পায়ের ছাপটা তারই অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে।'

—'হুম!' বিস্মিত সুন্দরবাবুর মুখ দিয়ে আর কোনও শব্দ নির্গত হল না।

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তির আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল শুনেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম যে, আগন্তুক বাগানের কোথাও না কোথাও তার আগমনের চিহ্ন রেখে যাবে। তাই তো তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসেছি! আমি আরও কিছু দেখবার আশা করি।'

—'আরও কী?'

—'সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত এই ছাপটাই পর্যবেক্ষণ করুন। এটা হচ্ছে একপাটি রবারের জুতোর ছাপ। সাত নম্বরের জুতো। ছাপের নকশা দেখেই বলে দেওয়া যায়, বাটা কোম্পানির জুতো। যতীনবাবু, বাটা কোম্পানির রবারের জুতো পরে, আপনার বাড়িতে এমন কেউ আছে?'

—'কেউ না।'

—'সুন্দরবাবু, ছাপটার ছাঁচ তোলবার ব্যবস্থা করবেন, এটা হচ্ছে মূল্যবান সূত্র। পরে কাজে লাগবে। যতীনবাবু, রাত্রে মোটরের আওয়াজ শুনেছিলেন কোন দিকে?'

—'বাগানের ওই পিছন দিকের রাস্তায়।'

—'চলুন, ওইদিকে পা চালাই।'

বাগানের পশ্চাদ্‌ভাগ। কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা। তার ওপাশে পোড়ো জমি, এঁদো পুকুর, আগাছা আর কাঁটাঝোপ, বাঁশঝাড়, অযত্নবর্ধিত তাল, নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের ভিড়।

বাগানবাড়ির ঠিক পিছনে পথের কাদায় মোটরগাড়ির চাকার দীর্ঘ একটানা রেখা।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, 'ফায়ারস্টোন টায়ারের ছাপ। এরও ছাঁচ তুলে রাখতে হবে। মোটরখানা যে এইখানে বাগানের বেড়ার ধারে এসে থেমেছিল তাও বোঝা যাচ্ছে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি এই ব্যাপারটাই দেখবার আশা করেছিলুম। অতঃপর অনুমান করা যেতে পারে, এইখানে গাড়ি থামিয়ে চালক নিজে কিংবা তার কোনও সঙ্গী কাল রাতে বেড়া টপকে বাগানের ভিতরে করেছিল অনধিকার প্রবেশ। যতীনবাবু, আপাতত আপনার প্রতি আমার এই নির্দেশ। আজ আপনি বাড়ির বাইরে আর মুখ দেখাবেন না। আমি চললুম, সন্ধ্যার সময়ে আবার আসব। তারপর যা করতে হবে, তখনই শুনবেন। সুন্দরবাবু, এখানকার কাজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব। কিছু গোপন পরামর্শ আছে। এখন নমস্কার।'

* * *

সন্ধ্যার মুখেই জয়ন্তের সঙ্গে আমি আবার বাগানবাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম।

যতীনবাবু একটা ঘরের বাইরের দিককার সব জানালা বন্ধ করে ভয়ে জবুথবু হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের আবির্ভাবে মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের দেখে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এতক্ষণ একা বসে বসে দিকে দিকে শুনছিলুম যেন অমঙ্গলের ভয়াবহ পদধ্বনি—যেন হাজার হাজার বৎসরের ওপার থেকে মিশরের মৃত্যুস্তব্ধ প্রাচীন সমাধিভূমি ছেড়ে অন্ধকারের কোনও ভয়ংকর বাসিন্দা কত সাগর নদী মরু পর্বত ডিঙিয়ে ধেয়ে আসছে আমারই উদ্দেশে!'

আমি সহাস্যে বললুম, 'আপনি যে কবির ভাষায় কথা কইছেন! লোকে ভয়ে কি কবি হয়?'

যতীনবাবু বললেন, 'ভয়ে কেউ কবি হয় কি না জানি না, কিন্তু আধমরা যে হয় তার প্রমাণ আমি।'

জয়ন্ত বললে, 'অতএব ভয় পাবেন না। আমার হাতে এটা কী দেখছেন?'

—'ওটা তো একটা ব্যাগ। ওর ভেতরে কী আছে?'

—'মাথামুণ্ডু একটা কিছু আছেই।'

—'মাথামুণ্ডু?'

—'ঠিক তাই। এখন বিনাবাক্যব্যয়ে চলুন আপনার শয়নগৃহে।'

শয়নগৃহ। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, 'এইবারে এইখানে একটা ছোটো টেবিল আর একখানা সোফা এনে রাখুন।'

কথামতো কাজ হল।

—'এইবারে চাই দু-চারটে ছোটো বালিশ আর একটা তাকিয়া, একটা জামা আর কিছু ন্যাকড়া।'

বিস্মিত যতীনবাবু ফরমাশ মতো জিনিস সরবরাহ করলেন।

অতঃপর জয়ন্ত ব্যাগের ভিতর থেকে বার করলে মোম-দিয়ে-গড়া একটা নরমুণ্ড—হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয় আসল মানুষের মাথা!

সচকিত কণ্ঠে যতীন শুধোলেন, 'ও কী ব্যাপার জয়ন্তবাবু, ও কী ব্যাপার!'

রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে নিরুত্তর মুখে জয়ন্ত প্রথমে সোফার উপরে তাকিয়া রেখে তার উপরে জামা পরালে, তারপর ন্যাকড়াগুলো গুঁজে দিলে এখানে ওখানে এবং তাকিয়ার ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করলে সেই কৃত্রিম নরমুণ্ডটা। তারপর ঘরের বাইরে বাগানে গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হতভম্ব যতীনবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কথা ফুটল। আমাকে শুধোলেন, 'আপনার বন্ধু কী করতে চান বলুন দেখি?'

আমি বললুম, 'এখনই শুনতে পাবেন, ধৈর্য ধরুন।'

—'কিন্তু ওই নকল নরমুণ্ডটা—'

—'ওটা এসেছে থিয়েটারের সাজঘর থেকে। মঞ্চের উপরে সময়ে সময়ে কাটা নরমুণ্ড দেখানো দরকার হয় কিনা!'

তবু যতীনবাবুর মুখ দেখে মনে হল না, অন্ধকারের মধ্যে তিনি একফোঁটা আলো দেখতে পেয়েছেন!

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এসে বললে, 'বাগান থেকে কী দেখলুম জানেন যতীনবাবু? টেবিলের দিকে মুখ করে সোফার উপরে বসে আছেন ঠিক যেন আপনি!'

—'আমি?'

—'তা ছাড়া আবার কে? বালিশ তাকিয়া প্রভৃতি সোফার পিছন দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল না। দেখতে পেলুম কেবল আপনার মাথাটা। এটা আপনার শোবার ঘর। এখানে রাত্রে আপনি ছাড়া আবার কে থাকবে?'

—'কিন্তু ঠিকে ভুল হল যে মশাই! ওই বিতিকিচ্ছি মুণ্ডটা কেউ আমার বলে সন্দেহ করবে না।'

—'মশাই গো, ভুলে যাচ্ছেন একে রাত্রিকাল, তায় বাগানের দর্শক থাকবে দূরে। তার উপরে অধিকতর সাবধানতার জন্যে ঘরে আজ স্বল্পশক্তির একটিমাত্র 'ইলেকট্রিক বালব' জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হবে। কৃত্রিম মুখটাকেও সুমুখ থেকে দেখা যাবে না। ওর মাথার পিছনে আছে ঠিক আপনারই মতো কাঁচাপাকা লম্বা চুল। সুতরাং দর্শকের চোখের ভুল হওয়া অনিবার্য। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেও একবার বাগানে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসুন না!'

যতীনবাবু চোখ কপালে তুলে শিউরে উঠে বললেন, 'বাপ রে, বলেন কী? সন্ধে উৎরে গিয়েছে, এই অন্ধকারে আমি যাব বাগানে? সে তো হবে আত্মহত্যারই সামিল! না মশাই, আমি না দেখেই আপনার কথাতেই বিশ্বাস করছি। কিন্তু আপনার অভিপ্রায়টা তো আমার বোধগম্য হচ্ছে না! এত তোড়জোড় কীসের?'

—'আজ রাত্রে বাগানে আবার যদি অনুবিসের অশুভ আগমন হয়, তবে নাগালের ভিতরে আপনার জলজ্যান্ত মাথাটা পেয়ে সে জানালাপথে নিশ্চয়ই বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করতে বিলম্ব করবে না। সাত দিন কেটে গেছে। কাল তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আজ হবে।'

—'ওরে বাবা, আমি তখন কোথায় থাকব?'

—'আপনাকে অন্য কোনও ঘরে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে।'

—'একলা?'

—'তা নয়তো কী!'

—'আর আপনারা?'

—'আমরা এখনই বিদায় হব।'

—'আর আমি এখানে বলির পাঁঠার মতো কেঁপে মরব? কিংবা আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ফস করে বন্ধ হয়ে যাবে? খাসা ব্যবস্থা! কেন, এখানে আজ কি পুলিশ মোতায়েন রাখা যায় না?'

—'না, অনুবিস পুলিশকে ভালোবাসে না। তবে আবার আমরা আসব বই কি!'

—'কিন্তু, আমি পটল তোলবার পরে বোধ হয়?'

—'ভয় নেই মশাই, ভয় নেই!'

—'ভরসাও নেই।'

বুঝিয়াছি তুমি বাপু, শৃগাল-ধূর্ত,
অপরূপ রূপে মর্তে হয়েছ মূর্ত!

যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে রাত্রির আত্মা। কৃষ্ণা নিশীথিনীর উষ্ণ নিশ্বাসবায়ু যেন বনে বনে মুহুর্মুহু জাগিয়ে তুলছে দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত আকুতি। পথিকহীন পল্লিপথ মনে আনে ভয়ের শিহরন, কোথাও নেই মানুষের সাড়া—অন্ধ বসুন্ধরা এখন যেন পরিণত হয়েছে অমানুষের বিচরণ ক্ষেত্রে! কোনও কালভৈরবের পদার্পণের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে আছে।

যতীনবাবুর বাগানবাড়িও অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কেবল একটি ঘর ছাড়া। সেখানে জানালা-পথে অনুজ্জ্বল আলোকে দেখা যায়, একটি আসনে আসীন মনুষ্যমূর্তি বাইরের দিকে পিছন ফিরে টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ে যেন একমনে কোনও পুস্তক পাঠ করছে।

আচম্বিতে নিশীথের নীরবতাকে ঘর্ঘর শব্দে যেন করাত দিয়ে কাটতে কাটতে বাগানবাড়ির নিকটস্থ হয়ে একখানা মোটরগাড়ি হঠাৎ আবার স্তব্ধ হয়ে পড়ল।

বাগানের একটা ঝোপ একটু দুলে উঠল, যেন কোনও আসন্ন সম্ভাবনার ইঙ্গিত! কোনও গাছের পত্রান্তরালে জাগল একাধিক পক্ষীর কাতর চিৎকার, যেন তারা পেয়েছে অভাবিত, অপার্থিব অমঙ্গলের সন্ধান! একটা পথচারী কুকুরও হঠাৎ ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে ক্রমে দূরে পালিয়ে গেল! চারিদিকেই কী এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রের আভাস!

পুকুর-পাড় দিয়ে অন্ধকারের চেয়েও কালো কী একটা ভয়াল অপচ্ছায়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ির আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত নিঃশব্দে। তার উপর দিকে আঁধারে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো রোমাঞ্চকর অগ্নিময় বীভৎস চক্ষু! নীলাভ দীপ্তি!

আলো-জ্বালা ঘরের কাছ-বরাবর গিয়ে দীপ্ত চক্ষু ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পরে কী একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঘরের ভিতরকার উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্তির মুণ্ডটা ঠিকরে পড়ল নীচের দিকে!

পরমুহূর্তে তোলপাড় করে উঠল হাসনুহানার ঝোপ এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগল একটা হিংস্র পাশবিক গর্জন, তারপরেই বিষম কোস্তাকুস্তি ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মাটির উপরে একটা ভারী দেহপতনের শব্দ!

জয়ন্তের কণ্ঠে শোনা গেল, 'মানিক, মানিক! তুমি চটপট এর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দাও! সঙ্গে দড়ি এনেছি, হতভাগার পাদুটোও বেঁধে ফ্যালো!'

তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকারে নজর চলে না, কিন্তু দেখা যেতে লাগল দুটো জ্বলজ্বলে আগুনচোখ!

মানুষের নাগপাশে বাঁধা পড়ল কি কোনও অমানুষিক শয়তান? তাও কি সম্ভব?

আচমকা বাগানের পিছন দিক থেকে ভেসে এল দুই-দুইবার রিভলভারের শব্দ এবং বহু কণ্ঠের হই হই রই রই! মহা ধুন্ধুমার! তারপরেই এক তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি!

জয়ন্ত সানন্দে বললে, 'সুন্দরবাবুর সংকেত শুনেই বুঝছি আরও কেউ বা কারা ধরা পড়ল! আমাদের ফন্দি সফল!'

এদিকে হট্টগোল শুনে লণ্ঠনধারী বেয়ারা ও যষ্টিধারী দারোয়ানদের সঙ্গে বন্দুকধারী যতীনবাবুও হন্তদন্ত হয়ে বাগানে ছুটে এসে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, 'কী হল, কী হল? এত হট্টগোল কেন?'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'হানাদাররা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ওই দেখুন একজনকে!'

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, মাটির উপরে লম্বমান হয়ে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে একটা অদ্ভুত

বিজাতীয় পোশাক-পরা কৃষ্ণকায় মূর্তি—মুখ তার শৃগালের মতো, কিন্তু সেই শৃগালমুখের উপর থেকে নিবে গেছে তখন দপদপে নীলাভ দীপ্তি!

যতীনবাবু আঁতকে উঠে দুই পা পিছিয়ে বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

জয়ন্ত বললে, 'সর্বনাশ নয় মশাই, সর্বরক্ষা! এই দেখুন!' সে একটানে মূর্তির কাঁধের উপর থেকে উপড়ে আনলে মুখ নয়, মুখোশ! শৃগালমুখের মুখোশ!

চমৎকৃত যতীনবাবু বলে উঠলেন, 'এ আবার কী?'

—'ছলনা!'

—'কে এই লোকটা?'

—'চিনতে পারছেন না?'

—'একে জীবনে কখনও দেখিনি!'

এমন সময়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন সবেগে ও সদলবলে সুন্দরবাবু। এসেই বলে উঠলেন, 'এক ব্যাটাকে বাগানের ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে আর এক ব্যাটা মোটরে গুম হয়ে বসেছিল। আমরা ধরতে যেতেই ব্যাটা আবার রিভলভার ছুড়তে শুরু করেছিল! সেপাই, ওটাকে টেনে নিয়ে আয় তো এখানে! হুম, আমাকে টিপ করে গুলি ছোড়া? পাজি, ছুঁচো, উল্লুক!'

হাতকড়ি-বদ্ধ অবস্থায় যাকে টেনে-হিঁচড়ে কনস্টেবলরা সামনে এনে হাজির করলে, তাকে দেখেই যতীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে একেবারে থ!

—'কী যতীনবাবু, একে চেনেন নাকি?'

—'এ যে আমার দেশত্যাগী ভাগনে মুরলীধর!'

বেরুল জয়ন্তের রৌপ্যময় শামুক-নস্যদানি। খুশি মুখে নাকে নস্য গুঁজতে গুঁজতে সে বললে, 'যা যা আন্দাজ করেছিলুম হুবহু মিলে যাচ্ছে। যতীনবাবু, শয়নগৃহে গিয়ে দেখে আসুন, মুরলীধর প্রেরিত দূতের বাণাঘাতে আপনার নকল মুণ্ডটা এখন মেঝের উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছে! চেয়ে দেখুন, এখানেও পড়ে রয়েছে ওর হস্তচ্যুত ধনুকখানা!'

যতীনবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—'কিন্তু বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। শুনুন তবে সব কথা।'

নয় তো কিছুই অমানুষিক—
পাহাড় প্রসব করে মূষিক!

জয়ন্ত বললে :

'এই মামলাটাকে গোড়াতেই প্যাঁচালো বলে মনে ধোঁকা লাগে বটে, কিন্তু অল্প মাথা ঘামালেই ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে আসে।

প্রথম থেকেই ভূতের কথা আমি একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ভূত বিষাক্ত তির ছুড়ে নরহত্যা করছে, ভৌতিক ইতিহাসেও সে কথা লেখে না। বিষের সাহায্য নেয় কেবল মানুষ খুনি। ভূতের কোনও বন্ধু বা সেক্রেটারি 'টাইপ-রাইটারে' পত্র লিখে কারুকে শাসাচ্ছে, এটাও হাস্যকর ব্যাপার। প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক প্রেতমূর্তি বা ছায়ামূর্তি পায়ের শব্দ ঢাকবার জন্য বাটা কোম্পানির পরম আধুনিক

রবারের জুতো পরে এবং তাড়া খেলে মোটরে চড়ে টেনে লম্বা দেয়, ভূতুড়ে যুক্তিতেও এসব মানা চলে না।

কিন্তু বিনা কারণে হত্যা বা নরহত্যার চেষ্টা হয় না। ভূতঘটিত ব্যাপারগুলো যদি অস্বীকার করি, তবে সনৎকুমারকে হত্যা আর যতীনবাবুকে মারাত্মক আক্রমণ করার মূলে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

নিজের মনের ভিতর থেকেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলুম। যতীনবাবু ধনী ও নিঃসন্তান, তাঁর সম্পত্তির লোভেই কেউ এইসব কুকার্য করছে। যতীনবাবু ও সনৎকুমারের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হতে পারে কে? নিশ্চয়ই যতীনবাবুর অন্যতম ভাগিনেয় ও সনৎকুমারের মাসতুতো ভাই মুরলীধর।

তার পরিচয় দিয়েছেন যতীনবাবু স্বয়ং। সে এমন কুচরিত্র ও অমানুষ যে মাতুল তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয়েছেন। সে নিখোঁজ এবং ভবঘুরে।

পরিত্যক্ত হবার আগে সে ছিল মাতুলের প্রিয়পাত্র। যতীনবাবুর কাছে থেকেই সে যে প্রত্নতত্ত্বের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, এই তথ্যটা আমার যথেষ্ট কাজে লেগেছে।

আর একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, ভাসা ভাসা খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মুরলীধর নাকি আফ্রিকায় প্রবাসী হয়েছে।

আমি আন্দাজ করলুম, আফ্রিকায় থাকতে থাকতেই সে মাতুলের মমি কেনার কথা জানতে পারে এবং তারপরেই সে শয়তানি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ওই সুযোগটা গ্রহণ করে। মমি স্থানান্তরিত করলে মারাত্মক অভিশাপগ্রস্ত হতে হয়, এই চলতি কুসংস্কারটাও সে কাজে লাগাতে ছাড়েনি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাবিশারদ মাতুল যে প্রাণভয়েও মমিকে হাতছাড়া করতে রাজি হবেন না, এটা জেনেই সে আটঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুবিসের ছদ্মবেশে অন্য যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে, সে হচ্ছে তারই আজ্ঞাবহ এবং পাপকর্মের সঙ্গী।

খুনির স্বরূপ যদি কেউ ধরে ফেলে, তাই অনুবিসের ছদ্মবেশ আর রূপকথার প্রয়োজন হয়েছে। ওর মধ্যে পুলিশকেও বিপথে চালাবার গোপন অভিসন্ধি আছে।

আর অগ্নিময় চক্ষুর রহস্য? ওটা হচ্ছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল—অর্থাৎ ফসফরাস ঘটিত চালাকি, সহজেই সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধানো যায়! সাদা ফসফরাস অন্ধকারে জ্বলে।

আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।'

যতীনবাবুর মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটল না, কেবল কাতরভাবে একটা অব্যক্ত শব্দ করে তিনি অবসন্নের মতো বসে পড়লেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কথায় কথায় লোকে বলে—'যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'! হায় রে, সেই কথাই দেখছি সত্য হয়ে দাঁড়াল!'

জয়ন্ত বললে, 'কথার কথা ছেড়ে দিন সুন্দরবাবু, এমন ভাগনে হাজারে একটাও হয় না। আসল কথা কী জানেন? সুজনের স্বজন সর্বজন, কিন্তু দুর্জন কারুকে স্বজন বলে মানে না!'

হত্যা এবং তারপর

হত্যা এবং তারপর

॥ প্রথম ॥

পাঁচ লক্ষ টাকা

তাদের সাধ ছিল গোটা পৃথিবীটার বুকের উপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে আসে।

আমরা জয়ন্ত আর মানিকের কথা বলছি। তারা বেরিয়েছিল পৃথিবী-ভ্রমণে। সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপ বেড়িয়ে, গিয়েছিল তারা রহস্য-ভীষণ আফ্রিকায়। সেখানে বৎসর-খানেক কাটিয়ে তারা দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশ দেখে ইংল্যান্ডে গিয়ে উপস্থিত হল।

চমৎকার লাগছিল। নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা আচার-ব্যবহার! কখনো অকূল নীলসাগরের তরঙ্গ-দোলায়, কখনো বিজন গহন বনের ভিতরে চির-সন্ধ্যা-অন্ধকারে, কখনো রৌদ্রতপ্ত রুদ্র মরু-জগতের নির্জল ও নিস্তব্ধ হাহাকারের মধ্যে, কখনো তুষার-ঝটিকায় বিচিত্র বরফেমোড়া তুঙ্গ গিরি-শিখরে মেঘরাজ্যের কাছে! কখনো জাভার বড়ো-বুদ্ধের মন্দির-চাতালে, কখনো মিশরের পিরামিডের চূড়ায়, কখনো গ্রিসের পার্থেননের প্রাচীন মর্মর-স্বপ্নের সামনে এবং কখনো বা চিরন্তন নগর রোমের অতীত কীর্তির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে!

কতবার নাগরিক সভ্যতার সদর-মহল ছেড়ে তারা প্রবেশ করেছে অজ্ঞাত অসভ্যতার অন্তঃপুরে! যেখানে বোর্নিও সুমাত্রার স্তব্ধ অরণ্যে প্রভুর মতো বৃক্ষ-রাজ্যে বাস করে ওরাং-ওটানরা; যেখানে আফ্রিকার বন-প্রান্তরে জেব্রা ও জিরাফের পিছনে পিছনে মৃত্যু-বিদ্যুতের মতন ছুটে যায় লাঙ্গুল দুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহের দল; যেখানে জলে ভাসে কুমির ও হিপো এবং স্থলে বেবুন ও উটপাখিদের রঙ্গভূমির চারিপাশে ভূমিকম্প জাগে হাতি ও গন্ডারদের পায়ের তালে; যেখানে গাছের ডালে ঝোলে অজগর এবং পাহাড়ের নীচে-উপরে শোনা যায় গরিলার গর্জন!

ছবির পর ছবি বদলে যায়—দৃশ্যের পর দৃশ্য—ধ্বনির পর ধ্বনি! এ-সবের কাছে কোথায় লাগে সিনেমার সবাক চিত্র! জয়ন্ত ও মানিকের বার বার মনে হয়েছে, এতদিন পরে ধন্য তাদের জীবন, সার্থক তাদের জন্ম, সফল তাদের বাসনা!

কিন্তু এ-যাত্রায় তাদের পৃথিবী-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল না। ইংল্যান্ডে পা দিয়েই

তারা শুনলে, ইউরোপের দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ-দামামার ধ্বনি! এবং তারপর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বিলাতের সারা আকাশ ছেয়ে দেখা দিলে পঙ্গপালের মতো জার্মানির উড়োজাহাজরা। জল-স্থল-শূন্য—সর্বত্রই মৃত্যুর হুঙ্কার ও মানুষের আর্তনাদ!

জয়ন্ত ও মানিক বুদ্ধিমান। সব পথ বন্ধ হবার আগেই তারা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল আবার স্বদেশে।

দুই বৎসর পর দেশে এসে তারা দুই দিন বিশ্রাম করলে। তৃতীয় দিনে দুই বন্ধু বেড়াতে বেরুল।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, দু-বছর পরে এখানে এসে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কলকাতার উপরেও আছে খানিকটা নূতনত্বের পালিশ!'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু এ পালিশের চকচকানি দীর্ঘস্থায়ী নয় বলেই তো নতুনের এত আদর।'

মানিক বললে, 'পুরাতনেরও আদর কি কম? মানুষ তো একটানা নূতনত্বের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসে না! তারই ভিতরে থেকে থেকে সে ফিরে চায় আবার অতি-পরিচিত বন্ধুর মতো পুরাতনকে!'

—'ঠিক বলেছ। পুরাতনের পর নূতন, আবার নূতনের পর পুরাতন। মানুষ এ-দুটির কোনোটিকেই ত্যাগ করতে পারে না। তাই তো হঠাৎ সুন্দরবাবুর পুরাতন মুখ দেখে আমার মনে জাগছে খুশির ইঙ্গিত!'

—'সুন্দরবাবু? কোথায়?'

—'ওই যে!'

মানিক ফিরে দেখলে, ওধারে ফুটপাথের উপর দিয়ে জন-পাঁচেক পুলিশের লোকের সঙ্গে হন হন করে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবাবুর বিপুল বপু।

এইবারে সুন্দরবাবুও তাদের দেখতে পেয়ে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে সবিস্ময়ে বেরিয়ে পড়ল সেই বিখ্যাত শব্দটি—'হুম্!'

সুন্দরবাবুকে যারা চেনে তারা জানে যে, অতিরিক্ত ক্রোধে বা বিস্ময়ে বা দুঃখে বা আনন্দে তিনি এক-একরকম সুরে 'হুম্' শব্দটি উচ্চারণ করে ভাবাভিব্যক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দেন। তাঁকে যারা চেনে না তারা জানতেই পারবে না যে, একটিমাত্র 'হুম্' শব্দ কতরকম ভাব প্রকাশ করতে পারে!

সুন্দরবাবু ও-ফুটপাথ থেকে ছুটে আসবার উপক্রম করছেন দেখে, জয়ন্ত ও মানিক তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

—'আরে জয়ন্ত, আরে মানিক,—হুম্! সাত সাগর লঙ্ঘন করে আবার তোমরা কলকাতায় এসেছ কবে হে?'

—'পরশু।'

—'তোমরা তো বলে গিয়েছিলে পাঁচ-ছয় বছরের আগে কলকাতায় ফিরবে না!'

—'তাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু হিটলার যে আমাদের তাড়িয়ে দিলে! নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধে মরতে রাজি আছি, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে জার্মান বোমা খেয়ে হাত-পা খোঁড়া করে বেঁচে মরে থাকতে চায় কে?'

হ্যাঁচ্চো শব্দে হেঁচে ফেলে সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ ভাই! এই দ্যাখো হাঁচি পড়ল!...তারপর? কোন কোন দেশ বেড়িয়ে এলে?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'এক নিশ্বাসে কি সাতকাণ্ড রামায়ণের কথা বলা যায়? বরং সন্ধের মুখে আমার বাড়িতে যাবেন। নিমন্ত্রণ রইল।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আ আমার পোড়াকপাল, আমার আবার নিমন্ত্রণ! আমি যে ঢেঁকি, ধান ভানতেই জন্মেছি, স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হবে!'

—'ব্যাপার কী, নতুন কোনো শক্ত 'কেস' হাতে পেয়েছেন নাকি?'

—'কেসটা খুব শক্ত বলে বোধ হচ্ছে না, তবে আগেকার চেয়ে একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে বটে! শুনবে? আচ্ছা চলতে চলতে বলি শোনো।'

সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হতে হতে জয়ন্ত এই কথাগুলি শ্রবণ করলে:

—'রামচন্দ্র বসুর বাড়ি হচ্ছে দশ নম্বর ধরণি সেন স্ট্রিটে। তিনতলা বাড়ি—রামবাবুর নিজের বাড়ি। তিনি অবিবাহিত, বয়স পঞ্চাশের ওপারে। ধনী। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছে এক ভাইপো, সে দেশে থেকে জমিদারি তদ্বির করে।

'রামবাবু বাড়ির তেতলায় একলা থাকতেন। বাড়ির দোতলার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছে ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস নামে একটি লোক। সে-ও একলা মাস-তিনেক হল কলকাতায় নতুন এসেছে।

'একতলায় দুটি গরিব বাঙালি পরিবার বাস করে। তারা পুরানো ভাড়াটে।

'আজ দু-দিন আগে রামবাবুর শয়নগৃহে রামবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। লাশ দেখলেই বোঝা যায়, বিষ পানের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থির করলুম, আত্মহত্যা।

'কিন্তু তদন্তের ফলে আত্মহত্যার কোনোই কারণ পাওয়া গেল না। রামবাবুর অর্থের অভাব বা অন্য কোনোরকম দুঃখ-দুর্ভাবনাও ছিল না। মৃত্যুর দিন তিনি থিয়েটার দেখে রাত সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

'কেউ যে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, এমন প্রমাণও পেলুম না। প্রথমত, সকলেরই মুখে শুনলুম তিনি অজাতশত্রু, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘর থেকে কিছুই চুরি যায়নি। লোহার সিন্দুকের চাবি তাঁর পকেটেই ছিল। সিন্দুকের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে ছয় শত টাকার নোট আর কিছু সোনার গহনা। চুরি করবে বলে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বিষ খাওয়ায়নি। চোর কখনো এতগুলো টাকা আর গহনা ফেলে যেত না!

'লাশ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়েছিলুম। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ, রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের বিষে। অথচ তাঁর গায়ের কোথাও সর্পদংশনের দাগ নেই! তাঁর ডান পায়ে তিনটে ছোটো ছোটো টাটকা ক্ষতচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে সেগুলো হচ্ছে বিড়ালের মতো কোনো ছোটো জানোয়ারের নখ দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ!

'দ্যাখো তো ভাই জয়ন্ত, এ আবার কী ফ্যাসাদ! সর্পদংশনের দাগ নেই, অথচ রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের কামড়ে! আর কলকাতা শহরে পাকা বাড়ির তেতলায় গোখরো সাপ! অপরংবা কিং ভবিষ্যতি! তাই চলেছি আবার তদন্তে।

'হুম্! এই যে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি! এইখানে রামবাবুর বাড়ি। জয়ন্ত, মানিক, তোমাদেরও তো চড়ুকে পিঠ, যদি আগ্রহ থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

দেশে ফিরেই আবার এ-রকম অপ্রীতিকর মামলা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে জয়ন্ত ও মানিকের কোনোই আগ্রহ হল না। তারা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রামবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবক। তার মাথার চুল এলোমেলো, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই গালে অশ্রুর চিহ্ন—সারা মুখখানি যেন বিষাদে আচ্ছন্ন।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'তুমি আবার কে বাপু?'

—'আমি রামবাবুর ভাইপো।'

—'নাম কী?'

—'অজিতকুমার বসু।' তারপর একটু থেমেই সে বললে, 'শুনছি, কাকাবাবুর লোহার সিন্দুকে নাকি মোটে ছ-শো টাকা পাওয়া গিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

অজিত পকেট থেকে একখানা পত্র বার করে বললে, 'কাকাবাবু যে রাত্রে মারা যান সেইদিনই এই চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন। আর এই চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় এসেছি।'

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবু বার বার 'হুম্' শব্দ উচ্চারণ করছেন শুনে জয়ন্তও কৌতূহলী হয়ে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

চিঠিখানা এই:

'স্নেহের অজিত,

যুদ্ধ বেধেছে বলে অনেকেই ভয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বন্ধুদের পরামর্শে আমাকেও তাই করতে হল। আমার সমস্ত টাকা—অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ আমি আজ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট আমার ঘরের লোহার সিন্দুকে বেশি দিন রাখা নিরাপদ হবে না। এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই—কারণ তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। অতএব পত্র পেয়েই কলকাতায় চলে এসো। ইতি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামচন্দ্র বসু'

চিঠি-পড়া শেষ করে সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'হুম্।'

জয়ন্ত বললে, 'অজিতবাবু, আপনার বিশ্বাস ওই লোহার সিন্দুকেই রামবাবু পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট রেখেছিলেন?'

—'কাকাবাবুর একটিমাত্র লোহার সিন্দুকই আছে।'

'সুন্দরবাবু, আপনি কী বলেন?'

—'এ আবার কী হল ভাই জয়ন্ত! ভেবেছিলুম মামলাটা খুব হালকা, কিনারা করতে দেরি লাগবে না! কিন্তু কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে ক্রমেই যে সাপের পর সাপ বেরুচ্ছে!'

মানিক বললে, 'যে সে সাপ নয় সুন্দরবাবু, একেবারে জাত-গোখরো!'

—'হুম্, বিষম রহস্য! সাপে কামড়ায়নি, অথচ সাপের বিষে মৃত্যু! লোহার সিন্দুক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অদৃশ্য! মানে, এ মামলাটা হচ্ছে খুনের মামলা!'

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, 'লাশের পায়ে বিড়ালের মতন ছোটো জানোয়ার নখ দিয়ে আঁচড়েছে! এরই বা মানে কী?'

॥ দ্বিতীয় ॥

কুকুর ও বিড়াল

রামবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি কি এ মামলায় আমার সাহায্য চান?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সে কথা আর বলতে! আমার মাথার সঙ্গে তোমার মাথা মিললে আমরা দুজনে দিগ্বিজয় করতে পারি।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আপাতত বোধ হয় দিগ্বিজয় করবার দরকার হবে না। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি যখন প্রথম এ ঘরে ঢোকেন, তখন জানালাগুলো কি খোলা ছিল?

—'না, একটা জানলাও খোলা ছিল না। দরজাটাও ছিল ভিতর থেকে বন্ধ।'

—'তাহলে সাপটা ঘরের ভিতরে ঢুকল কেমন করে?'

মানিক বললে, 'হয়তো ঘরের কোনো কোনো জানলা খোলা ছিল, রামবাবু ঘরে ঢুকে নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

—'তাহলে গোখরো সাপটা পালাল কোন পথ দিয়ে?'

—'হয়তো ওই নর্দমা দিয়ে ঢুকে সে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'মানিক, তোমার এ অনুমানটাও সত্য হতে পারে। কিন্তু রামবাবুর দেহের কোথাও সর্পদংশনের চিহ্ন নেই কেন? গোখরো সাপের বিষ পান করলেও কারুর মৃত্যু হয় না, জানো তো? ও বিষ রক্তের সঙ্গে না মিশলে মারাত্মক হয় না।'

মানিক হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে শুরু করলে।

একতলায় যারা ভাড়া থাকত তারা তখন উপরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের একজনকে ডেকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘটনার দিন রামবাবু সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়িতে ফিরেছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সেদিন এখানে কোনো সন্দেহজক ঘটনা ঘটেছিল?'

—'আজ্ঞে না।'

—'কোনো শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন?'

—'আপনি জিজ্ঞাসা করছেন বলে এখন একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। সে-

রাত্রে রামবাবু হঠাৎ এত জোরে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলুম।'

—'অত জোরে তিনি কখনো দরজা বন্ধ করেন না?'

—'না। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির মানুষ।'

—'বেশ। এটা একটা ভালো সূত্র বলে মনে হচ্ছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মতে এটা উল্লেখযোগ্য সূত্রই নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন নয়?'

—'এর দ্বারা কী প্রমাণিত হচ্ছে?'

—'প্রমাণিত হচ্ছে যে, হঠাৎ কোনো কারণে ভয় পেয়ে রামবাবু তাড়াতাড়ি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

—'হুম্। হতেও পারে, না হতেও পারে।'

জয়ন্ত আবার লোকটির দিকে ফিরে বললে, 'রামবাবুর পায়ে বিড়ালের আঁচড়ানোর দাগ পাওয়া গিয়েছে। তিনি কি বিড়াল পুষতেন?'

—'না মশাই। বিড়ালকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।'

—'এ বাড়িতে আর কেউ বিড়াল পোষে?'

—'কেউ না। তবে একটা বিষম খেঁকি হুলোবিড়াল খাবারের লোভে প্রায়ই এখানে হানা দেয় বটে।' লোকটি একবার থেমে আবার বললে, 'ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলাতে দোতলায় সেই বিড়ালটার আর্তনাদও শুনেছিলুম।'

—'দোতলায় থাকেন ভৈরববাবু?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বিড়ালটা আর্তনাদ করছিল কেন?'

—'তা আমি জানি না।'

—'রামবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন?'

—'না।'

—'ভৈরববাবু?'

—'তিনিও সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

—'তারপর ফিরে এসেছিলেন তো?'

—'হ্যাঁ, প্রায় শেষ-রাতে।'

—'শেষ-রাতে! কেন?'

—'কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল।'

—'আচ্ছা, এইবারে ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি, সে-রাত্রে আর কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না?'

—'আপনাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ছে না।'

—'তবু ভেবে দেখুন। যে-কোনো ঘটনা আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

—'কিন্তু এ অতি বাজে ঘটনা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন দুটোর কম হবে না। ঘুম ভাঙতেই শুনি, বাড়ির পাশের খানার ভিতর থেকে একটা বিড়াল আর একটা কুকুরের তুমুল ঝগড়ার শব্দ আসছে। খানিক পরেই সব চুপচাপ।'

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'আপনার আর কিছু মনে পড়ে?'

—'আজ্ঞে না।'

উপস্থিত আরও তিনজন লোকের মুখ থেকে নূতন কোনো তথ্যই জানা গেল না।

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল আর একটি নূতন মানুষ।

তারপর বয়স হবে বছর পঁয়ত্রিশ। শ্যামবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। দোহারা দীর্ঘ চেহারা—দেখলেই তাকে বেশ বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। জামাকাপড়ে শৌখিনতার চিহ্ন। লোকটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার হাসিখুশিমাখা প্রশান্ত মুখ এবং অতিবিনীত অমায়িক ভাবভঙ্গি।

সেখানে এসেই লোকটি বললে, 'আমার নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার চেহারায় ভৈরবত্ব কিছুই নেই। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল সুশান্ত।'

ভৈরব চোখে-মুখে হাসির উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বললে, 'ও-রকম কথা আরও কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এখন আর পিতার ভ্রম সংশোধন করবার উপায় নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ির দোতলায় আপনি থাকেন?'

ভৈরব যুক্তহস্তে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'শুনছি কলকাতায় আপনি নতুন এসেছেন?'

'আজ্ঞে, ঠিক নতুন নই, মাস-তিনেক এসেছি। ছেলেবেলাতেও কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।'

—'আপনি কী করেন?'

—'আজ্ঞে স্যার, এইবারেই আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন। কারণ, আমি কিছুই করি না।'

—'কিছুই করেন না!'

—'কিছু না স্যার, কিছু না। খালি ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে। কখনো ভারতের ভিতরে, কখনো ভারতের বাইরে। এক দেশে বেশিদিন থাকলেই আমার অসুখ হয়। কলকাতাতেও আর আমার মন টিকছে না। স্থির করেছি, শীঘ্রই পিঠটান দেব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! খাসা আছেন দেখছি! আমিও তো মাঝে মাঝে মনে করি, দুনিয়ার দিকে দিকে পথে পথে ছোটাই আমার পদযুগলকে—কিন্তু পারি না কেবল পাথেয়ের অভাবে।'

—'পাথেয় স্যার? ওইখানেই ভগবান আমাকে দয়া করেছেন। বাবা পরলোকে, কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ লোহার সিন্দুকের চাবিটি রেখে গিয়েছেন ইহলোকেই। আমার ভাইবোন কেউ নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মশাই, আপনার সৌভাগ্যে আমার হিংসা হচ্ছে।'

বিনয়ে ভেঙে পড়ে ভৈরব হাসতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'ভৈরববাবু, ঘটনার দিন সন্ধেবেলায় আপনার দোতলায় একটা বিড়াল আর্তনাদ করেছিল কেন?'

ভৈরব হাসতে হাসতেই বললে, 'বড়োই চোট্টা বিড়াল স্যার, বড়োই চোট্টা বিড়াল! রোজ চুপিচুপি আমার খাবার খেয়ে চম্পট দেয়। তাই সেদিন তাকে ধরতে পেরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ করেছিলেন মশাই, আমার বাসাতেও ওইরকম একটা মহাচোর ধুম্সো বিড়াল আসে। আজ পর্যন্ত কত বড়ো বড়ো চোর ধরলুম, কিন্তু সে বেটাকে কিছুতেই আর গ্রেপ্তার করতে পারলুম না!'

জয়ন্ত বললে, 'সন্ধের পর আপনি কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন?'

ভৈরব বললে, 'হ্যাঁ স্যার, এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ছিল। ফিরেছি রাত সাড়ে তিনটেয়।'

—'অত রাত হল কেন?'

—'বন্ধুর বাড়ি আগড়পাড়ায়। কাজকর্ম চুকতেই রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারপর ট্যাক্সি চড়ে এসেছি কলকাতায়।'

—'এখানে এসে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ করেছিলেন?'

—'কিছু না স্যার, কিছু না! সব চুপচাপ। কোথাও একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত ছিল না!'

—'আচ্ছা, আপাতত আমার আর কিছু জানবার নেই। সুন্দরবাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।'

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, 'হুম্! প্রশ্ন করব না ছাই করব! এতক্ষণ প্রশ্ন করে তুমি কী জানতে পারলে? জানা গেল খালি তো এই: একটা বিড়াল একজন মানুষকে আঁচড়ে দিয়েছে। একটা চোর-বিড়াল ধরা পড়ে চোরের মার খেয়েছে। এ-সব জেনে আমাদের লাভ? খুনের মামলার সঙ্গে বিড়ালের ইতিহাসের সম্পর্ক কী?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'যা বলেছেন! এ মামলায় বিড়ালের উপদ্রব বড়ো বেশি। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!'

—'সন্দেহ? কীসের সন্দেহ?'

—'সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো একটা বিড়াল এসেই শেষটা আমাদের আসল পথ বাতলে দেবে!'

—'পথ বাতলে দেবে? কেমন করে? ম্যাও ম্যাও রবে চেঁচিয়ে?'

হা হা করে হেসে উঠে ভৈরব বললে, 'স্যার, আপনি বেশ মজার কথা বলেন!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'মশাই, মজার কথায় আসামি গ্রেপ্তার হয় না! চলো জয়ন্ত, থানায় যাই। কী যে ছাই রিপোর্ট লিখব, তাই এখন ভাবছি!'

মানিক বললে, 'কিছু ভাববেন না সুন্দরবাবু, কিছু ভাববেন না! রিপোর্টে লিখুন, তিন বিড়ালের কাহিনি।'

—'যাও যাও মানিক, বাজে বোকো না—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ো না!'

সকলে নেমে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এইটেই বুঝি খানা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এর ভিতর থেকেই বিড়াল-কুকুরের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

খানাটা হাত-আড়াই চওড়া। লম্বায় অনেকখানি। অন্য প্রান্তটা আধা-অন্ধকারে অস্পষ্ট। তলদেশে আধহাত চওড়া একটি খোলা ড্রেন। এখানে-ওখানে দুর্গন্ধময় জঙ্গল ছড়ানো।

জয়ন্ত খানার ভিতরে প্রবেশ করলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, ও কী হে?'

জয়ন্ত অগ্রসর হতে হতে বললে, 'খানার ভিতরটা একবার বেড়িয়ে আসি।'

—'ওই মেথরের পথ কি বেড়াবার ঠাঁই?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

ভৈরব বললে, 'স্যার, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটির হাবভাব যেন কেমন কেমন!'

—'হ্যাঁ, জয়ন্তের মাথায় একটু ছিট আছে। নইলে ওর আর সব ভালো।'

—'খানার ভিতরে গিয়ে উনি কী দেখতে চান?'

—'ভগবান জানেন।'

মিনিট কয় পরে জয়ন্ত একটা মৃত বিড়ালকে ও একটা মৃত কুকুরকে লাঙ্গুল ধরে টানতে টানতে খানার বাইরে নিয়ে এল।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন, বিপুল বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না।

মানিক বললে, 'জয়, আজ কি তুমি ধাঙড়ের কর্তব্য পালন করতে চাও?'

জয়ন্ত উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'উঁহু, এই মরা কুকুর আর বিড়ালকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই।'

—'কী আশ্চর্য, কেন?'

—'আমার বিশ্বাস, এরা মারা পড়েছে বিষের চোটে।'

—'বেশ তো, তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

—'আমি জানতে চাই, সেটা কী-রকম বিষ। হয়তো একই গোখরো সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে রামবাবুর, আর এই বিড়াল-কুকুরের।'

॥ তৃতীয় ॥

জয়ন্তের গল্প

পরদিন হন্তদন্তের মতন সুন্দরবাবু এসে হাজির জয়ন্তের বাড়িতে! জয়ন্ত ও মানিক বসে বসে কথাবার্তা কইছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি ভৈরবের ঘর খানাতল্লাশ করবার জন্যে পরোয়ানা আনতে বলেছ কেন?'

—'আমি নিজের একটা সন্দেহ দূর করতে চাই!'

—'সন্দেহ আবার কীসের?'

জয়ন্ত সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমি সেই কুকুর আর বিড়ালের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি।'

—'করে কী লাভ হল?'

—'জানতে পারলুম যে সেই বিড়াল আর কুকুরের মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের বিষে।'

—'হুম্! কী আশ্চর্য!'

—'আরও আশ্চর্য এই যে, তাদের কাউকেই সাপে কামড়ায়নি।'

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, 'অ্যাঁঃ! তাহলে তারাও রামবাবুর মতো সাপের কামড় না খেয়েও সাপের বিষে মারা পড়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ কী রহস্য!'

—'বিড়ালের থাবাগুলোও আমি পরীক্ষা করেছি।'

—'থাবা?'

—'হ্যাঁ, থাবা। তার থাবাগুলোর প্রত্যেক নখেই মাখানো ছিল গোখরো সাপের বিষ।'

—'এ আবার কী ব্যাপার বাবা?'

—'কোনো লোক বিড়ালটাকে ধরে তার নখে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে।'

—'মানে?'

—'একটা মানেও আবিষ্কার করেছি।'

—'শুনি, শুনি।'

—'এই বিড়ালটাই হচ্ছে রামবাবুর হত্যাকারী।'

—'ধেৎ!'

—'এই নিয়ে আমি একটা গল্পও রচনা করেছি। শুনবেন?'

—'আরে না, না! আমার এখন বাজে গল্প শোনবার সময় নেই।'

—'তবু শুনুন।'

সুন্দরবাবু নাচারের মতন মুখভঙ্গি করলেন।

জয়ন্ত বললে, 'মনে আছে, রামবাবুর বাড়ির একতলার ভাড়াটিয়া কী কী বলেছে? প্রথমত, রামবাবু থিয়েটার থেকে ফিরে খুব জোরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় ভৈরবের অধিকৃত দোতলায় একটা বিষম খেঁকিবিড়ালের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাত প্রায় দুটোর সময়ে বাড়ির পাশে খানায় একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করেছিল। চতুর্থত, রামবাবুর মৃতদেহের পায়ে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারটাই তুচ্ছ। কিন্তু এরই উপরে দাঁড় করিয়েছি আমার গল্পের কাঠামো।'

—'যত সব বাজে কথা!'

—'আচ্ছা, এখন আমার গল্প শুনুন। ভৈরব হচ্ছে একটি ঝানু লোক। সে কোনোগতিকে টের পেয়েছিল, রামবাবুর লোহার সিন্দুকে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা! এই টাকার উপরে তার লোভ হয়। তাই সে এক অদ্ভুত উপায়ে রামবাবুকে হত্যা করবার সংকল্প করে। ঘটনার দিন বৈকালে সে একটা প্রায় বন্য বিড়ালকে বন্দি করে। তার কাছে আগে থাকতেই গোখরো সাপের বিষ সংগ্রহ করা ছিল। সেই বিষ সে জোর করে বন্দি বিড়ালটার চার থাবার নখে মাখিয়ে দেয়। এই কারণেই দোতলায় বিড়ালের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তেতলায় ঘর বন্ধ করে রামবাবু থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে যান। ভৈরব লুকিয়ে বিড়ালটাকে নিয়ে তেতলায় ওঠে। খড়খড়ির পাখির ফাঁকে হাত গলিয়ে জানলা খোলে। বিড়ালটাকে ঘরের ভিতরে পুরে দিয়ে আবার জানালা বন্ধ করে। তারপর 'নিমন্ত্রণ বাড়ি যাচ্ছি' বলে বাড়ি থেকে সরে পড়ে—সকলের সন্দেহের বাইরে থাকবে বলে। তারপর থিয়েটার দেখে রামবাবু ফিরে আসেন। নিজের ঘরের দরজা খোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ খোলা পেয়ে ভীত আর ক্রুদ্ধ বিড়ালটা ছুটে আসে, আর তাঁর পায়ে আঁচড়ে দিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়। রামবাবু ভয় পেয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দেন। তার খানিকক্ষণ পরে বিড়ালের বিষাক্ত নখের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রামবাবুর মৃত্যু হয়। তারপর শেষ রাতে ঘটনাস্থলে ভৈরবের আবির্ভাব। রামবাবু নিশ্চয়ই ঘরের দরজায় খিল দেননি। ভৈরব ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। মৃতের পকেট থেকে চাবি নিয়ে লোহার সিন্দুক খোলে।'

সুন্দরবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, 'হুম্! এমন খুনের কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু ভৈরবের অপরাধ তুমি প্রমাণ করবে কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'হয়তো তার ঘর খানাতল্লাশ করলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। হয়তো সে ভেবেছে পুলিশ এই আশ্চর্য খুনের রহস্য বুঝতে পারবে না, তাই এখনও সাবধান হয়নি।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না জয়ন্ত, এখনও সব রহস্য পরিষ্কার হল না। ওই একই গোখরো সাপের বিষে কুকুর আর বিড়ালেরও মৃত্যু হল কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'এ-কথাও আমি ভেবে দেখেছি। ভুলবেন না, ঘটনার রাত্রে বাড়ির পাশের খানায় কুকুর আর বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কুকুরটা নিশ্চয়ই বিড়ালটাকে তাড়া করে তার পিছনে পিছনে খানায় গিয়ে ঢোকে। সেখানে তাদের ভিতরে মারামারি হয়। বিড়ালের নখের বিষে কুকুর মারা পড়ে।'

—'আর বিড়ালটা?'

—'সে-ও নাকে-মুখে কুকুরের কামড় খেয়েছিল। তারপর ক্ষতস্থানে যখন নিজের থাবা বুলোচ্ছিল, তখন নখের বিষ গিয়ে মিশেছিল তারও রক্তে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু আদালতে এ-সব কথা প্রমাণ করা সহজ হবে না। এ-সব যেন ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন শোনাচ্ছে!'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আদালতের কথা পরে হবে। আপাতত এখানে বসে সময় নষ্ট না করে ঘটনাস্থলে যাত্রা করাই উচিত।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক! তাই চলো।'

কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে শোনা গেল, ভৈরব গত রাত্রেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।

জয়ন্ত বললে, 'সে বোধহয় আর ফিরবেও না। ভৈরব আমাদের সন্দেহ করেছে। আমি যে বিড়ালের মৃতদেহ আবিষ্কার করব এতটা সে ভাবতে পারেনি।'

॥ চতুর্থ ॥

'স্যারং' ও 'প্যারাং' প্রভৃতি

সুন্দরবাবু বললেন, 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না জয়ন্ত! ভৈরব কেমন করে আন্দাজ করলে যে আমরা তাকে সন্দেহ করেছি?'

জয়ন্ত বললে, 'খুব সহজেই। তার চোখের সামনেই আমরা যে মরা বিড়ালটাকে

আবিষ্কার করেছি! যে লোক এমন অদ্ভুত উপায়ে নরহত্যা করতে পারে সে তো নির্বোধ নয় সুন্দরবাবু!'

—'হুম্, তাহলে তোমার বিশ্বাস ভৈরব আর ফিরবে না?'

—'হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই। তার পক্ষে এখন ফিরে আসা মানে আত্মহত্যা করা! তাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই।'

—'কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব?'

—'সে কথা একটু পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত তার ঘর খানাতল্লাশ করা দরকার, চলুন।'

দোতলায় ছিল তিনখানা কামরা ও একখানা রান্নাঘর। তার মধ্যে একটি ঘর বাহির থেকে তালাবন্ধ। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সেখানা হচ্ছে ভৈরবের শোবার ঘর। তালা ভেঙে ঘরের দরজা খুলে ফেলা হল।

সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ভৈরব দেখছি আসবাবপত্তর কিছুই নিয়ে যায়নি। হয়তো সে ফিরে আসবে।'

জয়ন্ত বললে, 'আসবাব রেখে গেছে সে আমাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। যাতে আমরা ভাবি সে পালায়নি। ভৈরবের সঙ্গে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা, তার কাছে এই আসবাবগুলো তো তুচ্ছ!'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত, আনলায় কী ঝুলছে, দেখছ?'

—'হুঁ, 'স্যারং'!'

—'আরে, টেবিলের উপরে যে একখানা 'ক্রিশ' রয়েছে!'

—'আর এই দ্যাখো, একখানা 'প্যারাং'!'

—'এদিকে রয়েছে 'রাত্যানে'র তৈরি একটা 'বাস্কেট', ঘরের কোণেও দেখছি 'রাত্যানে'র লাঠি!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, 'স্যারাং, ক্রিশ, প্যারাং, রাত্যান! এ-সব কী কথা বাবা?'

জয়ন্ত বললে, 'স্যারং মানে হচ্ছে একরকম কাপড়। প্যারাং একরকম বড়ো ছুরি! ক্রিশও আর একরকম ছুরির নাম। রাত্যান একজাতের গাছ, তা দিয়ে দড়ি, লাঠি আর ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।'

—'ও-সব কোন দেশের কথা?'

—'মালয় উপদ্বীপের। সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও ওই জিনিসগুলির চলন আছে।'

—'থাক গে, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই।'

টেবিলের 'ড্রয়ার' টেনে খান-কয়েক খাম বার করে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'খামগুলোর উপরেও দেখছি সুমাত্রার ডাকঘরের ছাপ। বোধ হচ্ছে ভৈরব ও অঞ্চলে অনেকদিন বাস করেছিল। এখনও তার বন্ধুরা সেখান থেকে তাকে চিঠিপত্র লেখে।—বটে, বটে, বটে!' জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, তার মুখে চিন্তার ছায়া।

সুন্দরবাবু এটা-ওটা-সেটা নাড়তে নাড়তে বললেন; 'যত সব বাজে জিনিস। এখানে ভৈরবের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই নেই। চলো জয়ন্ত, আর মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কী?'

জয়ন্ত হঠাৎ বললে, 'রামবাবুর ঘরে টেলিফোন দেখেছিলুম না?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কেন?'

জয়ন্ত কোনো উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার বন্ধুর মতলব কী বলো তো? ও কখন যে কী বলে আর কী করে, কিচ্ছু বোঝা যায় না! হুম্!'

মানিক সহাস্যে বললে, 'অতএব জয়ন্তকে বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিন। কী জানি, যদি শেষটা আপনার মূল্যবান মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমি কি তোমার ঠাট্টার পাত্র?'

খানিক পরেই জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, 'টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলুম, আজ বেলা সাড়ে-বারোটার সময় ডায়মন্ড হারবার থেকে একখানা জাহাজ ছাড়বে—রেঙ্গুন হয়ে সে যাবে সিঙ্গাপুরের দিকে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাতে তোমারই বা কী, আর আমারই বা কী?'

—'ইচ্ছা করলে এখনও আপনি সেই জাহাজখানা ধরতে পারেন।'

—'কেন শুনি?'

—'ভৈরব হয়তো সেই জাহাজে আছে।'

—'হয়তো?'

—'হ্যাঁ, এটা আমার আন্দাজ।'

—'আন্দাজের একটা কারণ আছে তো?'

—'ভৈরবের কথা মনে আছে? সে ভবঘুরে। ভারতের বাইরেও তার গতিবিধি

আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভৈরব মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে বহুকাল বাস করেছে। এই ঘরে তার ব্যবহার করা জিনিসগুলো এ-বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। এখনও ও-অঞ্চল থেকে তার নামে চিঠিপত্র আসে। আমার মনে হয়, যে উপায়েই হোক অর্থাভাব দূর করবার জন্যেই সে কলকাতায় এসেছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে নরহত্যা করেছে। এখন জানতে পেরেছে যে, আমরা তার গুপ্তকথা ধরে ফেলেছি। এমন অবস্থায় ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিতে হলে প্রথম সুযোগেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তার পক্ষে কোন দেশে যাওয়া স্বাভাবিক? নিশ্চয় মালয় বা সুমাত্রার দিকে! সে এখান থেকে অদৃশ্য হবার পর এই প্রথম জাহাজ যাচ্ছে ওই অঞ্চলে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমার আন্দাজটা সত্য হলেও হতে পারে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো না কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার অন্য কাজ আছে।'

—'তোমার আবার কাজ কী?'

—'দেশে এসে পর্যন্ত বাঁশি বাজাইনি। আজ বাঁশি বাজাব। চলো মানিক!' জয়ন্ত ও মানিক চলে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, 'এমন পাগল কি দুনিয়ার দুটি আছে?'

সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছে, হঠাৎ টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো!—'

—'কে, জয়ন্ত?'

—'হ্যাঁ।—'

'আমি সুন্দরবাবু,—কেল্লা ফতে! বাহাদুর ভায়া! তোমার আন্দাজই সত্য। ভৈরবকে গ্রেপ্তার করেছি!'

—'সাধু, সাধু!'

—'কিন্তু বেটা ভারী বেগ দিয়েছে। দেখা হলে সব বলব। পাঁচ লক্ষ টাকার নোট সে গঙ্গায় ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তবে সে আর একটা কী জিনিস জলে ফেলে দিয়েছে। সেটাকে দেখতে ছোটো শিশির মতো।'

জয়ন্ত বললে, 'তার ভিতরে কী ছিল, আমি বলতে পারি।'

—'বলো দেখি?'

—'গোখরো সাপের বিষ।'

—'হুম্, হুম্, হুম্!'

হত্যা হাহাকারে

কলকাতা হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে। এক-একজন মানুষ যে পাগল হয়ে যায়, এ-কথা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু একটা গোটা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে শুনলে তোমাদের মনে খটকা লাগতে পারে নিশ্চয়ই।

তবু কথাটা সত্য। ওই শোনো। হাজার হাজার কণ্ঠে আকাশ-কাঁপানো ওই বিকট চিৎকার শোনো। 'জয়-হিন্দ!' 'বন্দে মাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!'

ওই দ্যাখো। নিকটে, সুদূরে বাড়ির পর বাড়ি জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে সমুজ্জ্বল রক্তের মতো রাঙা-টকটকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা এবং অতিকায় কৃষ্ণ অজগরের মতো ধূম্রকুণ্ডলী সারে সারে উপরে উঠে যাচ্ছে, যেন ছোবল মারবে বিপুল শূন্যের বুকে।

শুনতে পাচ্ছ না সুতীব্র আর্তধ্বনি? শুনতে পাচ্ছ না, ঘন ঘন বন্দুক ও বোমার ভয়াল গর্জন এবং পলাতকদের অতি দ্রুত পদশব্দ?

হ্যাঁ, কলকাতা শহর হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়েছে এবং অরণ্যাচারী ব্যাঘ্রে ও সিংহের নৃশংস আত্মা এসে আজ দখল করেছে নগরবাসী মানুষদের বক্ষ।

অধিকতর ভয়াবহ রাত্রি নেমে এল শহরের ভিতরে, দিকে দিকে বুলিয়ে দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা। পথে পথে গ্যাস-পোস্টগুলোর আলোক-চক্ষু আজ অন্ধ, বাস ও ট্যাক্সির চলাচল বন্ধ, একেবারে বোবা ফেরিওয়ালাদের কণ্ঠ দোকানদাররা ঝাঁপ তুলে দিয়ে পলায়ন করেছে, সাধারণ পথিকরা আত্মগোপন করেছে আপন আপন ঘরবাড়ির অন্তরালে এবং প্রত্যেক বাড়ির সদর-দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। কিন্তু তবু মৌন হল না কলকাতার মুখর পাগলামি, রাত্রির অন্ধকারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চতুর্দিকে থেকে জেগে উঠছে তার প্রচণ্ড ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি! রাজপথ যেখানে জনশূন্য সেখানেও সেইসব বন্য চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বন্ধ-দ্বার বাড়িগুলোর ছাদের থেকে মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত চিৎকার করছে হাজার হাজার শঙ্খও।

'জয় হিন্দ!' 'বন্দেমাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!'

মানিক বললে, জয়ন্ত আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা গয়া।

জয়ন্ত বললে, সে কথা আর বলতে! কিন্তু হিন্দুরা কি নির্বোধ!

—কেন?

—তারা 'বন্দেমাতরম' বলে চিৎকার করছে। কিন্তু 'বন্দেমাতরম' কি নরহত্যার, ভ্রাতৃহত্যার মন্ত্র?

—মুসলমানদের সম্বন্ধেও তুমি ওই প্রশ্ন করতে পারো। 'আল্লা হো আকবর' বলতে কি বোঝায় হিন্দুর মুণ্ডচ্ছেদ করা?

—ঠিক বলেছ মানিক। আজ একসঙ্গে হিন্দু আর মুসলমানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—হুঁ। আর সারা রাত জেগে এইসব চিৎকার শুনতে শুনতে সকালে আমাদেরও মাথা হয়তো ঠিক থাকবে না।

—তাহলে দুই কানে তুলো গোঁজবার চেষ্টা করব।

—না, ঠাট্টা নয় জয়ন্ত। এসো, জানালাগুলো বন্ধ করে শুয়ে পড়া যাক। তারপর সকালে উঠে দেখা যাবে পথ-ঘাটের অবস্থা কী রকম!

জয়ন্ত ও মানিক সকালবেলায় যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক গণ্ডগোল বোধ করি শান্ত হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু-চারজন এখনও 'জয় হিন্দ' প্রভৃতি বলবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরগুলো যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবে তরুণ সূর্যের সোনালি হাসির ভিতরেও চারিদিকে বিরাজ করছে কেমন একটা থমথমে অপার্থিব ভাব।

আগে প্রতিদিনই যারা নরহত্যা করবার ব্রত নিয়ে জনবহুল পথে পথে দিকবিদিক জ্ঞানহারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়াত, সেই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির দল এখনও সাহস সঞ্চয় করে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। যে দু-একখানা মোটর দেখা যাচ্ছে, তা হয় 'ডাক্তার'-মার্কার আশ্রয় নিয়েছে, নয় বহন করছে পুলিশের লালপাগড়িওলাদের।

জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো জনতা। সেখানে সবাই কথা কইছে উত্তেজিতভাবে এবং অনেকেরই হাতে রয়েছে ছোরা, ভোজালি, লোহার ডান্ডা, পাইপ বা শিক এবং এমন সব পলকা লাঠি বা বাঁখারি—একটা বিড়াল মারতে গেলেও যা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ দলে দলে লোক উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

মানিক একটা ছুটন্ত লোকের হাত ধরে ফেলে শুধোলে, আরে মশাই, ব্যাপার কী?

—জানি না মশাই, জানি না।

—তবে এত ছুটছেন কেন?

—সবাই ছুটছে বলেই ছুটছি। ইচ্ছা করলে আপনিও ছুটতে পারেন।

—না, আমার সে ইচ্ছা নেই। আপনিই ছুটুন। যত জোরে পারেন ছুটুন—প্রাণপণে ছুটুন!

মানিক হাত ছেড়ে দিলে। লোকটি আবার ছুটতে শুরু করলে।

জয়ন্ত হাসলে, মানিকও হাসলে বটে, কিন্তু তাদের সে হাসির মধ্যে নেই কিছুমাত্র কৌতুকের আবেগ। রাজপথ হয়ে উঠেছে আজ ভীষণ বিভীষিকা। তার দিকে তাকালেও শিউরে ওঠে অন্তরাত্মা।

রাজপথ হয়েছে আজ অসংখ্য মানুষের অন্তিমশয্যা। মৃতদেহ, মৃতদেহ আর মৃতদেহ। কোথাও একজন কি দুজন এবং কোথাও বা চার-পাঁচজন মানুষের মৃতদেহ। কোথাও বা রাশি রাশি মৃতদেহের উপরে মৃতদেহ পড়ে গঠন করতে বীভৎস স্তূপের পর স্তূপ। প্রত্যেকের নিশ্চেষ্ট দেহের ভঙ্গি একান্ত অস্বাভাবিক, প্রত্যেক দেহই রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। দেহহীন মুণ্ডু এবং মুণ্ডুহীন দেহের অভাব নেই। কাটা পা আর হাতও পড়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। সর্বত্র রক্তের ছড়াছড়ি—রক্তধারায় পথ হয়েছে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত! সে সব ভয়ানক দৃশ্য অসহনীয়। যেটুকু বললুম তাই যথেষ্ট, আরও বেশি বর্ণনা করে লাভ নেই। মানুষের প্রতি মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, কলকাতার রাজপথে পাওয়া যায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ!

হঠাৎ মানিক সচকিত কণ্ঠে বলে উঠল, জয়ন্ত দাঁড়াও।

—কী হয়েছে মানিক?

—এখানে একটি দেহ পড়ে রয়েছে। বরেনবাবুর মৃতদেহ! ইনি আমার পরিচিত। বন্ধু বললেও চলে।

—কে বরেনবাবু?

—বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী। আমার কাছে তুমিও এর নাম শুনেছ।

—বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী! আনন্দপুরের জমিদার!

—হ্যাঁ।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

একটি পরমসুন্দর মানুষের সুগঠিত দেহ। মুখ-চোখ সুশ্রী, বর্ণ গৌর। দেখলেই বোঝা যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। দেহের ভঙ্গি স্বাভাবিক। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভদ্রলোক যেন ঘুমিয়ে আছেন নিশ্চিত আরামে। কিন্তু তাঁর বুকের উপরে রয়েছে একটা কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন!

জয়ন্ত দেহের পাশে বসে পড়ল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে ক্ষতচিহ্নটা। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, মানিক, আমার বিশ্বাস, এই ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মারা পড়েননি। এ হচ্ছে সাধারণ হত্যাকাণ্ড! কেউ একে অন্য জায়গায় খুন করে পুলিশকে ঠকাবার জন্যে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে।

দুই

মড়ার উপরে খড়্গাঘাত

বরেনবাবুর মৃতদেহ নিয়ে আরও ভালো করে পরীক্ষায় নিযুক্ত হল জয়ন্ত। হঠাৎ পিছন থেকে উৎসাহিতকণ্ঠে শোনা গেল, আরে হুম! মানিক নাকি! ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর। ফিরে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, এত সকালে সুন্দরবাবু রাস্তায় যে! প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি!

সুন্দরবাবু এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, হুঁ, প্রাতর্ভ্রমণেই বেরিয়েছি বটে! পুলিশের চাকরি নিয়ে আমরা কি আর মনুষ্য-পদবাচ্য আছি। আমরা শকুনি হে, শকুনি! যেখানে মড়া, সেইখানেই আমরা। রাজপথ হয়েছে আজ মড়াদের বিছানা, আমরা কি এখানে না এসে থাকতে পারি? আরে কে ও, জয়ন্ত যে! তোমার সামনে একটা মড়া। বাপ, তুমি তো আর পুলিশে চাকরি করো না, তবে শখ করে মড়া ঘাঁটতে বেরিয়েছ কেন?

জয়ন্ত জবাব দিলে না, মুখও তুললে না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, এই মৃতদেহটি আমার এক বন্ধুর। ইনি আনন্দপুরের জমিদার, নাম বরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী।

—শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু উপায় কী আর আছে ভাই! দেশে সাংঘাতিক ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বেঁধেছে, তোমার আমার কত বন্ধুকেই যে আত্মদান করতে হবে তা কে জানে!

মানিক বললে, না সুন্দরবাবু, জয়ন্ত বলছে, বরেন্দ্রবাবু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মারা পড়েননি।

—বটে, বটে! জয়ন্ত এমন কথা বলছে!

—তার মতে কেউ এঁকে অন্য জায়গায় খুন করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে।

—খুনির এতটা পরিশ্রম করবার কারণ কী?

—খুনি পুলিশকে ঠকাতে চায়। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলে চালিয়ে দিতে পারলে পুলিশ জোর-তদন্ত না করতেও পারে।

—লাশের গায়ে কি খুনির মনের কথা লেখা আছে?

—আমি জানি না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করুন।

—কী হে জয়ন্ত, তুমি মিশরের মমির মতো চুপ মেরে আছ কেন? মানিকের কথা কি সত্য?

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হ্যাঁ।

—এই ভদ্রলোক এখানে মারা পড়েননি?

—না।

—কেমন করে জানলে?

জয়ন্ত বললে, প্রথমত ইনি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা পড়েননি, খুব সহজেই সে সন্দেহ হয়। ইনি হিন্দু আর এটা হচ্ছে একেবারে হিন্দুপাড়া। এখানে হঠাৎ কোনও মুসলমান এসে এঁকে হত্যা করতে পারে না! অন্য কোথাও খুন করে মুসলমানরা যে হিন্দু পাড়ায় এসে লাশ ফেলে যেতে সাহস করবে, তাও মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাস্তায় কেউ যদি মারা যায়, তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।

—এ কথা মানি।

—তারপর শুনুন। আমি মৃতদেহ ভালো করে পরীক্ষা করেছি। বাঁ দিকের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পাঁজরার মাঝখানে কেউ ছোরা দিয়ে আঘাত করেছে। ছোরা প্রবেশ করেছে 'স্টার্নাম' বা বুকাস্থির খুব কাছেই। ওই রকম আঘাতে মৃত্যু হয় প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু সে আঘাতে বরেন্দ্রবাবু মারা পড়েননি।

—তবে? মৃতদেহে তো আর কোনও আঘাতেরই চিহ্ন দেখছি না!

—আগে আমার সব কথা শুনুন। অস্ত্রে কেবল বাঁ পাশের ফুসফুসই জখম হয়নি, দেহের দুটো প্রধান ধমনীও—'পালমনারি', আর 'এওর্টা'—আংশিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ তাই-ই।

—এটা তো আত্মহত্যার মামলাও হতে পারে?

—পারে। মৃত্যু হয় যেখানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আত্মঘাতীর অস্ত্র সেখানে হয় ক্ষতস্থানে, নয়তো হাতের মুঠোর মধ্যে, নয়তো দেহের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কোনও অস্ত্রই দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এটা আত্মহত্যার মামলা হতে পারে না।

—মৃত্যু হয়েছে রাস্তায়। যদি কোনও পথিক ছোরাখানা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে?

প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত। আদালতে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন উঠবার সুযোগ নেই। কারণ বলছি। ক্ষতস্থানটা দেখুন। জীবন্ত চামড়া হয় সঙ্কুচিত। মৃতদেহের ত্বক সঙ্কুচিত হয় না, তাই ক্ষতস্থানের ফাঁকও বড়ো হতে পারে না। এই দেহটার ক্ষতস্থানের মুখ কী রকম সংকীর্ণ, দেখছেন তো? এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত, এই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর হত্যাকারী মৃতদেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করেছে?

—ঠিক তাই। আরও প্রমাণের অভাব নেই। জীবন্ত দেহের ক্ষতস্থান রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, জামাকাপড়ও হয় রক্তে আরক্ত। কিন্তু এই ক্ষতটা দেখুন, এর উপরে রক্ত জমাট হয়ে নেই, জামা-কাপড়েও রক্তের দাগ নেই বললেও চলে।

—তোমার আর কিছু বলবার আছে?

—আগেই বলেছি, খুনির অস্ত্র দেহের দুটি প্রধান ধমনী দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। জীবন্ত অবস্থায় এই নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে প্রবাহমান রক্তধারায়। মৃত্যুর পর এই ধমনী দুটো প্রায় রক্তশূন্য হয়ে যায়। সুতরাং বরেনবাবু বেঁচে থাকতে যদি কেউ তাঁর বুকে অস্ত্রাঘাত করত, তাহলে যে কোটরের ভিতর ওই দুটো ধমনী আছে, তা রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখছি রক্ত আছে যৎসামান্য—নগণ্য বললেও চলে।

সুন্দরবাবু তাঁর বিখ্যাত টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, হুম! খুনি মড়ার ওপরে করেছে খড়্গাঘাত?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু কেন?

—লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য। বরেনবাবুর শব-ব্যবচ্ছেদ করলেই খুব সম্ভব জানা যাবে যে, আগে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে। খুনি তারপর মড়ার ওপরে ছোরা মেরে লাশটাকে রাস্তায় বহন করে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে বীভৎস সমারোহে—শহরের পথে পথে মৃতদেহের ছড়াছড়ি, পুলিশ বিশেষভাবে কোনও মৃতদেহ নিয়ে তদন্ত করবে না, লাশগুলোকে গাদায় ফেলে শ্মশানে বা গোরস্থানে পাঠিয়ে দেবে, এ ক্ষেত্রেও হয়তো এর বেশি আর কিছুই হবে না। সুন্দরবাবু এই খুনি বা খুনিরা অত্যন্ত সুচতুর, তাই—

জয়ন্তের কথা শেষ হতে না হতেই খানিক তফাতে উঠল বিষম গণ্ডগোল! দলে দলে লোক চারদিকে প্রাণপণে ছুটোছুটি করে পালাতে লাগল পাগলের মতো। আবার আর একদল লোক লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করতে করতে বেগে ধাবমান হল একদিকে।

সুন্দরবাবু তাঁর রিভলভার বের করে বললেন, এসো জয়ন্ত, এসো মানিক, ব্যাপারটা কী দেখা যাক! এই সেপাইরা, তোমরাও এসো।

কিন্তু খানিক দূর অগ্রসর হয়েই দেখা গেল, ব্যাপারটা কিছুই নয়, দুটো ষাঁড় লড়াই করছে, তাই দেখে কয়েকজন ছুটে নিরাপদ ব্যবধানে সরে আসবার চেষ্টা করছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপথের বিপুল জনতা অকারণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই মিথ্যা বিভীষিকা।

জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু আবার ফিরে এলেন যথাস্থানে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, একী! বরেনবাবুর মৃতদেহ কোথায়?

জয়ন্ত তিক্ত হেসে বললে, তোমার প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা।

—খুনিরা এইখানেই হাজির ছিল, তাদের ভুল হয়েছে দেখে প্রথম সুযোগেই লাশ সরিয়ে ফেলেছে।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, দু-মিনিট পিছু ফিরতে না ফিরতেই সদর রাস্তা থেকে লাশ লোপাট। এমন আজব ব্যাপার আমি তো আর কখনও দেখিনি বাবা।

মানিক বললে, আমরা যখন বরেনবাবুর মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম, তখন সেখানে বেশ একটি ছোটোখাটো জটলা সৃষ্টি হয়েছিল। লাশ যারা সরিয়েছে তারা সেই জটলার ভিতরেই ছিল বলে সন্দেহ হচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, সন্দেহ নয় মানিক, এইটেই হয়েছে সত্য। আচ্ছা, তুমি কি সেই ভিড়টা লক্ষ করেছিলে?

—না। বরেনবাবুর মৃতদেহ দেখে আমি এতটা অভিভূত হয়েছিলুম যে অন্য দিকে লক্ষ করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

—আমি লক্ষ করেছিলুম। ভিড়ের ভিতরে ছিল তিনজন কালো চশমা পরা লোক।

সুন্দরবাবু বললেন, আরে হুম! কালো চশমা পরা লোক দেখলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কথার কোনওই মানে হয় না। এই তো আমি এখন কালো চশমা পরে আছি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও আমি হচ্ছি সন্দেহজনক ব্যক্তি।

মানিক ভুরু নামিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি ঠিক ওই কথাই বলতে চাই।

—মানে!

—পুলিশের লোক বললেই বুঝতে হবে পয়লা নম্বরের সন্দেহজনক ব্যক্তি।

সুন্দরবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, চোপরও মানিক, চোপরও! খামোকা টিপ্পনি কেটে চটাবার চেষ্টা কোরো না। বাজে ফাজলামি ভালো নয়, পারো তো কাজের কথা বলো।

জয়ন্ত বললে, আমার সন্দেহের কারণ বলি শুনুন। প্রথমত, কোনও ছোটো ভিড়ে একখানা কালো চশমাই যথেষ্ট। কিন্তু একসঙ্গে তিনখানা কালো চশমা কি অল্পবিস্তর অসাধারণ নয়? দ্বিতীয়ত, ওই তিনজন কালো চশমা পরা লোকের সাজ ছিল একরকম—খাকি শার্ট, হাফ-প্যান্ট আর বুট জুতো, দেখলেই মনে হয় যেন তারা ফৌজের সেপাই। এটাও আমি লক্ষ করেছিলুম যে তাদের একজন হচ্ছে অতিরিক্ত রোগা। তার মাথার চুল বেশ লম্বা, প্রায় কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছিল।

মানিক চমৎকৃতভাবে বললে, মৃতদেহ পরীক্ষা করতে করতেও তুমি এত ব্যাপার লক্ষ করেছিলে?

—নিশ্চয়ই! তুমি কি জানো না মানিক, সত্যিকার গোয়েন্দাদের থাকে সেইরকম চক্ষু—ইংরেজিতে যা 'ক্যামেরা-আই' নামে বিখ্যাত। এ-রকম চোখে পড়ে যে কোনও দৃশ্য, তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

সুন্দরবাবু বিরক্তিভরে ভ্রূ-সঙ্কোচ করে বললেন, ওসব চোখ-টোখের কথা এখন থো করো বাপু! আমার কথা হচ্ছে, এই অদ্ভুত লাশ-চুরির অর্থটা কী?

জয়ন্ত বললে—অর্থ খুবই স্পষ্ট। অপরাধীরা ভেবেছিল এই ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক খুনের মামলা বলে চালিয়ে দেবে। শেষপর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায় তা দেখবার জন্যে তারা এখানে অপেক্ষা করছিল। তারা দেখল, আমি তাদের অতি চালাকি ধরে ফেলেছি। সুতরাং লাশ যে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠানো হবে আর পুলিশ যে শব-ব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্ট পেয়ে মামলার ভার গ্রহণ করবে, এটা বুঝতেও তাদের বিলম্ব হয়নি।

—শব-ব্যবচ্ছেদাগারের রিপোর্টে কী থাকত?

—ঠিক কী থাকত তা আমি বলতে পারি না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেত, বরেন্দ্রবাবুকে আগে বিষ খাইয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে হত্যা করে পরে তাঁর মৃতদেহের উপরে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে।

মানিক বললে, কিন্তু একটা গোটা মৃতদেহ হজম করা তো সহজ নয়।

জয়ন্ত বললে, এই দাঙ্গার বাজারে সবই সহজ। কিন্তু আপাতত ও-সব কথা থাক। এখন দেখা যাক কী উপায়ে লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে সেটাই জানতে পারা যায় কি না!

তখন সেখানে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল যাঁড়ের লড়াইয়ের জন্যে রাজপথে যখন মিথ্যা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একখানা জিপগাড়ি এসে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। খবরটা যে দিলে, সেই রাস্তার ধারে তার একখানা পানের দোকান আছে।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কী রকম লোক হে বাপু? ও-সব দেখেও চুপ করে রইলে?

দোকানদার বললে, কেমন করে বুঝব হুজুর? আমি ভেবেছিলুম তারা সেপাই।

—তাদের পরনে সেপাইয়ের পোশাক ছিল?

—হ্যাঁ হুজুর।

—তারা কজন ছিল?

—তিনজন।

জয়ন্ত শুধোলে, তাদের চোখে কি কালো চশমা ছিল?

—হ্যাঁ হুজুর।

—একটা লোক কি খুব ঢ্যাঙা আর খুব রোগা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর তার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।

জয়ন্ত ও মানিক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, তুমি জিপগাড়িখানার নম্বর দেখেছ? দেখনি? তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গাধা!

—আজ্ঞে, আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।

—পারো না, তাহলে যে-সে গাধা নও, একটি আস্ত মুখ্যু গাধা!

লোকটি হাতজোড় করে বললে, আজ্ঞে হুজুর যা বলেন।

জয়ন্ত বললে, জিপগাড়িখানা কোন দিকে গিয়েছে সেটা বলতে পারবে তো?

—আজ্ঞে, সামনের ওই রাস্তা ধরে।

—মানিক, ওটা তো গঙ্গায় যাবার রাস্তা।

—হ্যাঁ।

—তা হলে আমার বিশ্বাস লাশটা তারা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবে। শিগগির।

—কোথায়?

—গঙ্গার ধারে।

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, তুমি কি মনে করো আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তারা এখনও গঙ্গার ধারে বসে আছে?

—বসে থাক না থাক, ওদিকে একবার যেতে দোষটা কী?

মানিক অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, জয়ন্ত, জয়ন্ত! গঙ্গার দিক থেকে একখানা জিপগাড়ি খুব বেগে এই দিকেই আসছে না?

—হুঁ! আরে আরে, গাড়ির ভিতরে বসে আছে যে আমাদের সেই কালো চশমা পরা বন্ধু লোকেরাই। বাহবা! কী বাহবা!

তিন

অগ্নিশিখার নাচ

সুন্দরবাবু চারজন পাহারাওয়ালা নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেল জয়ন্ত ও মানিক।

জিপগাড়িখানা কোনওরকম ইতস্তত না করেই ছুটে আসতে লাগল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যেও কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। নির্ভয়ে তারা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, পথ-জোড়া এই জনতা যেন তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি!

গাড়ি খুব কাছে এসে পড়তেই, সুন্দরবাবু দুই বাহু শূন্যে তুলে হুকুমের স্বরে বললেন, গাড়ি থামাও!

কোনওরকম জানান না দিয়েই গাড়ির গতি বেড়ে গেল আচম্বিতে! পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনকে হার মানিয়ে গাড়িখানা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ভোঁ-দৌড় মারলে যে সুন্দরবাবু প্রাণ বাঁচাবার জন্য পিছনদিকে মস্ত এক লম্ফ ত্যাগ করে নিজের বিপুল ভুঁড়ির ভারে টাল খেয়ে দড়াম করে হলেন প্রপাতধরণীতলে। জয়ন্ত, মানিক ও অন্যান্য লোকেরাও কোনওগতিকে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল এ যাত্রা!

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রিভলভার বার করে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল এবং সেই উল্কাগতিতে ধাবমান জিপগাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে বার কয়েক গুলি ছুড়ল।

কিন্তু জিপখানা এক মুহূর্তের মধ্যেই রিভলভারের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে এবং পর মুহূর্তেই মোড় ফিরে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

মানিক বললে, আমি কিন্তু গাড়িটার নম্বর দেখে নিয়েছি।

জয়ন্ত বললে, নম্বর হয়তো কোনও কাজেই লাগবে না! খুব সম্ভব ওরা আসল নম্বর ব্যবহার করেনি।

সুন্দরবাবু তখন উঠে পথের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে আছেন। কাতর মুখে তিনি মাথার দিকটায় হাত বুলিয়ে হাতখানা চোখের সামনে ধরে করুণ স্বরে বললেন, ভেবেছিলাম মাথাটা ফেটে গিয়েছে, এখন দেখছি ফাটেওনি, রক্তও পড়ছে না! হুম!

মানিক বললে, সুন্দরবাবু আপনার পক্ষে মাথার চেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আপনার স্ফীতোদরটি। মাথা ফাটলেও আপনি পটল তুলবেন না। ভুঁড়ি ফেঁসে গেলে একেবারেই সর্বনাশ! দেখুন দেখুন, সর্বাগ্রে ভুঁড়িটা পরীক্ষা করে দেখুন।

চেষ্টা করে রাগ সামলে সুন্দরবাবু বললেন, থামো হে ফাজিল, থামো! আমার ভুঁড়ির ভাবনা ভেবে তোমাকে আর মস্তক ব্যথিত করতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাও!

মানিক বললে, চরকা! আমার চরকা নেই। আমি গান্ধীজিকে মানি বটে, কিন্তু তাঁর চরকা মানি না।

—হুম তা মানবে কেন? তোমরা আজকালকার ছেলেরা তো কমিউনিস্ট।

—কমিউনিস্ট কাদের বলে সুন্দরবাবু? আমাদের নেতাদের বক্তৃতা শুনলে সন্দেহ হয়, আগেকার টেররিস্টরাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট। এ কথা কি সত্য?

—যাও ছোকরা যাও! মরছি নিজের গায়ের ব্যথায়, এখন উনি এলেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, মানিক বাজে কথা ছাড়ো! আমার কথার জবাব দাও। তুমি বরেনবাবুর বাড়ি চেনো?

—নিশ্চয় চিনি, তিনি যে আমার বন্ধু। চন্দ্রকান্ত রোডে জায়গা কিনে তিনি নতুন একখানা বাড়ি তৈরি করছিলেন। বাড়িখানার কেবল একতলাই বাসযোগ্য হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে মালপত্র দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে দোতলা আর তেতলা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বরেনবাবু আপাতত একতলাতেই বাস করতেন।

—তাঁর পরিবারবর্গ আছেন?

—আছেন বইকি! কিন্তু অসম্পূর্ণ বাড়িতে স্থানাভাব বলে তাঁরা এখন দেশে আছেন।

—তাহলে কলকাতার এই বাড়িতে বরেনবাবু একলাই থাকতেন।

—না, ঠিক একলা নয়। ঠিকে ঝি আর পাচক কাজকর্ম সেরে চলে যেত, বাড়িতে সর্বদাই থাকত নিধিরাম। সে বরেনবাবুর পুরোনো বেয়ারা। খুব বিশ্বাসী।

—বরেনবাবু কি বেশ বড়ো জমিদার?

—খুব বড়ো নয়, খুব ছোটোও নয়, মাঝারি।

—তাঁর আয় কত জানো?

—ঠিক জানি না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, তাঁর মাসিক আয় বোধহয় হাজার ছয় টাকার কম ছিল না।

জয়ন্ত মিনিটখানেক একেবারে চুপ। তারপর বললে, আচ্ছা, বরেনবাবুর সম্বন্ধে বাকি কথা পরে জানলেও চলবে। আপাতত আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আমাকে বরেনবাবুর বাড়িতে নিয়ে চলো। সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে আসবেন নাকি?

সুন্দরবাবু নাচারভাবে বললেন, আছাড় খেয়ে বেদম হয়ে পড়েছি। এটা আমার মামলা নয়, যাবার খুব ইচ্ছা নেই। তবে তুমি যখন বলছ—

সকলে পা চালিয়ে দিলে। সেখান থেকে চন্দ্রকান্ত রোড বেশি দূর নয়—বরেনবাবুর নবনির্মিত অসম্পূর্ণ বাড়ি। একতলার কোনও কাজ বাকি নেই—এমনকি শার্সি-খড়খড়িতে রং পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। দ্বিতলে ইট-চুন-সুরকির কাজ শেষ হয়েছে বটে, রঙের মিস্ত্রি এখনও সেখানে হস্তার্পণ করেনি, কিন্তু ত্রিতলের অধিকাংশ কাজই অসমাপ্ত। বাড়ির সুমুখে নীচে থেকে দ্বিতল পর্যন্ত দাঁড় করানো রয়েছে বাঁশের ভারা।

সমস্তটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে জয়ন্ত বললে, দেখছি বাড়িখানা এখনও অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ওই ভারা বেয়ে বাইরের যে কোনও লোক বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারে। এমন বাড়িতে বাস করা উচিত নয়।

সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মানিক হাঁকলে, নিধিরাম! অ-নিধিরাম!

একজন মাঝবয়সি লোক বাইরে এসে দাঁড়াল। রং প্রায় কালো, হৃষ্ট-পুষ্ট গড়ন, খালি গা, খালি পা। কিন্তু তার মুখের ভাব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মানিককে দেখেই সে ব্যগ্রভাবে বললে, মানিকবাবু এসেছেন! আপনি বলতে পারেন, আমাদের বাবু কোথায় আছেন?

মানিক বললে, ব্যস্ত হয়ো না নিধিরাম, সব কথা পরে বলছি। আগে তুমি সব কথা বলো দেখি।

নিধিরাম প্রথমে পাহারাওলাদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর বললে, কাল রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবু তাঁর ঘরের ভিতরে শুতে যান, আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর আজ ভোরে উঠে এসে দেখি, বাবুর ঘরের দরজা খোলা, বাবুও ঘরের ভিতরে নেই। বাবু তো বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, আজ এত সকালে তাঁর ঘুম ভেঙেছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সদর দরজাটাও খোলা দেখে বুঝলুম নিশ্চয়ই তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মানিকবাবু, এখন বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, এখনও বাবু বাড়িতে ফিরে আসেননি। আপনি কি বাবুর খবর জানেন? আপনার সঙ্গে পুলিশ কেন? বাবু কি কোনও বিপদে পড়েছেন?

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে বললে, সে সব কথা পরে হবে নিধিরাম। এখন বাবুর শোবার ঘরে আমাদের নিয়ে চলো দেখি।

নিধিরাম রাস্তার ধারে একখানা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, বাড়ির উপরটা তো এখনও তৈরি হয়নি, বাবু তাই ওই বৈঠকখানাতেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দেন।

—বেশ, তাহলে ওই ঘরখানাই আমরা দেখতে চাই!

নিধিরামের পিছনে পিছনে সকলে সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে।

বেশ বড়োসড়ো ঘর। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। দিকে দিকে টেবিল, চেয়ার, সোফা কৌচ। দুটো কেতাবের আলমারি। দুদিকের দেয়ালের গায়ে দু-খানা ফ্রেমে বাঁধানো বড়ো আয়না। ঘরের এক কোণে একখানা ক্যাম্পখাট পাতা।

জয়ন্ত শুধোলে, তোমার বাবু কি ওই খাটেই শুতেন?

নিধিরাম বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেই দিকে।

অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে ঘরের ভিতরে দুম করে একটা অদ্ভুত শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা গেল অভাবিত অগ্নিশিখার আরক্ত নৃত্য।

চার

গ্যাসোলিন

প্রথমেই দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত। তার পিছনে নিধিরাম, তার পিছনে একসঙ্গে সুন্দরবাবু ও মানিক।

বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত তার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা প্রায় একসঙ্গেই তাদের তিনজনকে মারলে এমন প্রচণ্ড ধাক্কা যে ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে ঠিকরে তারা হুড়মুড় করে একেবারে বাইরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

পড়তে পড়তেই মানিকের সচকিত দৃষ্টি দেখলে, তার পাশে শূন্যপথে এসে হাজির হল জয়ন্তর দেহও।

মাটিতে পড়েই জয়ন্ত ও মানিক আবার দাঁড়িয়ে উঠল চোখের নিমেষে।

বরেনবাবুর বৈঠকখানার ভিতরটা তখন পরিণত হয়েছে একটা বিশাল চুল্লিতে। হু-হু রাঙা আগুন এবং কালো কুচকুচে ধোঁয়া ঘরের ভিতরটা একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং দরজা জানালার ভিতর দিয়েও বাইরে বেরিয়ে আসছে ক্রুদ্ধ লকলকে অগ্নিশিখার পর অগ্নিশিখা, ধোঁয়াকুণ্ডলীর পর ধোঁয়াকুণ্ডলী। চারিদিকে এমনি ভীষণ উত্তাপ যে, সেই ভয়াবহ অগ্নিগৃহের বাইরে থেকেও সকলের দেহ যেন পুড়ে ঝলসে যাবার মতো।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, সুন্দরবাবু, শিগগির বাড়িরে বাইরে বেরিয়ে চলুন।

তখনও সুন্দরবাবু ভূতলশায়ী, দুই-একবার ওঠার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে যন্ত্রণাবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, কোমর ভেঙে গিয়েছে—আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে! আমি আর উঠতে পারছি না যে!

জয়ন্ত ও মানিক তখন সুন্দরবাবুকে চ্যাংদোলা করে বাড়ির বাইরে নিয়ে এল। নিধিরাম এর মধ্যেই পালিয়ে রাস্তায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, মানিক, দৌড়ে গিয়ে 'ফায়ার ব্রিগেড'কে ফোন করে দাও।

দেখতে দেখতে রাস্তায় জমে উঠল প্রকাণ্ড জনতা। এমন হই-হই শুরু হয়ে গেল যে কান পাতা দায়। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি। সকলের ইচ্ছা আরও কাছে আসে, কিন্তু আগুনের আরও কাছে আসা অসম্ভব।

ফোন করে এসে মানিক হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ভাই জয়ন্ত, ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—প্রথমে আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। তবে অগ্নিকাণ্ডের এক মুহূর্ত আগেই আমার সজাগ চোখ দেখেছিল একটা দৃশ্য আর আমার সজাগ কান শুনেছিল একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমিও সাবধান হতে পেরেছিলুম নইলে এতক্ষণে আমরা কেউই প্রাণে বাঁচতুম না।

—আমি কিছুই দেখতে পাইনি। তবে একটা শব্দ শুনেছিলুম বটে।

—তুমি কিছুই দেখতে পাওনি, না মানিক? এতেই বোঝা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও তুমি এখনও পুরোপুরি গোয়েন্দা হতে পারোনি। আদর্শ গোয়েন্দার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সর্বদিকে পঞ্চেন্দ্রিয়কে সতর্ক বা জাগ্রত রাখা। আমি কী দেখেছিলুম জানো?

—বলো।

—অতর্কিতে একটা মূর্তি, দরজার সামনে আবির্ভূত হল—সেই কালো চশমা আর খাকি পোশাক পরা মূর্তি। পরমুহূর্তে, সে একটা কাচের জাগ সজোরে ঘরের ভিতরে নিক্ষেপ করলে—জাগটার মুখের কাছটা জ্বলন্ত।

—জ্বলন্ত কাচের জাগ?

—হ্যাঁ। আচ্ছা মানিক, তুমি কোনও গন্ধ পাওনি?

—গন্ধ পাবার সময় দিলে কই? যে হাড়ভাঙা ধাক্কা মেরেছিলে।

—ধাক্কা না মারলে তোমরা যে বাঁচতে না ভাই!

—কিন্তু গন্ধের কথা কী বলছ?

—আমি একটা গন্ধ পেয়েছি। গ্যাসোলিনের গন্ধ।

মানিক কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ি এসে পড়ল। বরেনবাবুর বাড়ি তখন জ্বলছে দাউ-দাউ-দাউ। শত শত অগ্নিশিখা তখন রক্তসর্পের মতো সোঁ সোঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে, যেন আকাশকে ছোবল মারবার জন্যে।

জয়ন্ত ডাকলে, সুন্দরবাবু।

—হুম!

—এখন আপনার অবস্থা কেমন?

—প্রায় মারাত্মক! কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু শরীরে আর পদার্থ নেই। একটিমাত্র দিনে দুই দুইবার প্রচণ্ড আছাড় খাওয়া। এই বয়সে হজম করতে পারব কেন ভায়া?

—এ বাড়ির ভিতর থেকে কোনওরকম সূত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই—অগ্নিদেব সমস্তই নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বেন না। ফায়ার-ব্রিগেডের কাজের অসুবিধা হবে, আমরা খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়ালেই ভালো হয়।

ভিড় ঠেলে তারা অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, কাচের জ্বলন্ত জাগ, গ্যাসোলিন, এ-সব কী বলছ জয়ন্ত, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমরা সাংঘাতিক শত্রুর পাল্লায় পড়েছি, তারা পদে পদে আমাদের অনুসরণ করছে! আসল ঘটনাস্থলে আমাদের আবির্ভাব দেখেই তারা কেবল ওই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়নি, আমাদেরও পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে।

—কিন্তু কাচের জাগ আর গ্যাসোলিনের গুপ্ত কথাটা কী?

—মনে করুন, আপনি একটা কাচের জাগের ভিতরটা গ্যাসোলিন ভরতি করলেন। তারপর খালি ন্যাকড়া দিয়ে জাগের মুখটা বন্ধ করলেন। ন্যাকড়ার কতক অংশ পলতের মতো বাইরে বের করে তাতেও ঢেলে দিলেন কিছুটা গ্যাসোলিন। তখন কাচের জাগটা পরিণত হল মারাত্মক বোমায়।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, বোমায়!

—ঠিক আছে!

—তারপর?

—এ বোমা যে ব্যবহার করবে তাকেও রীতিমতো হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। পলতেয় অগ্নিসংযোগ করবার পর সময় পাওয়া যাবে মাত্র দুই সেকেন্ড। তার মধ্যে জাগটা নিক্ষেপ করতে না পারলে নিক্ষেপকারীর বিপদের সম্ভাবনা।

—হুম! এমন বিটকেল বোমার কথা তো জীবনে কখনও শুনিনি!

—শোনা উচিত ছিল। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইতালির সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়ে এইরকম বোমাই ব্যবহার করত। আমি ভাবছি, আমাদের মারবার জন্যে যে লোকটা জাগ ছুড়েছে, তার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না।

ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে জয়ন্তের কথা শুনছিলেন।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, মশাই ঠিক অনুমান করেছেন। একটু আগে একজন কালো চশমা আর খাকি পোশাক পরা লোক পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে পথের উপরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়, তার সমস্ত পোশাকে আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা কয়জন মিলে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু সে বাঁচবে বলে মনে হয় না। লোকটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেইখান থেকে এই ভাঙা চশমা আর একখানা চশমার খাপ কুড়িয়ে পেয়েছি!

ক্ষিপ্রহস্তে জিনিস দুটো গ্রহণ করে জয়ন্ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, তাকে কোন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জানেন?

—জানি—মেয়ো।

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন। আর এক মিনিট দেরি নয়, এখনই মেয়ো হাসপাতালে ছুটতে হবে।

সুন্দরবাবু বললেন, বাপরে বাপ! আজ আমার সব দম বেরিয়ে যাবে দেখছি। ঘটনার পর ঘটনা—এ যে ঘটনার মহাবন্যা।

পাঁচ

রামবাবুর লেন

গঙ্গার ধারে মেয়ো হাসপাতাল। প্রবেশপথ স্ট্র্যান্ড রোডের উপর।

জয়ন্ত হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করল সদলবলে। সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল নতুন বিস্ময়!

আগুনে পোড়া কোনও লোককে নিয়ে সেদিন কেউ হাসপাতালে আসেনি।

বোকার মতন মাথা চুলকাতে লাগল জয়ন্ত। কোনও হদিশ খুঁজে না পেয়ে আর সকলেও অবাক।

প্রথমেই মুখ খুলল মানিকের। সে বললে, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? অপরাধীর সঙ্গীরাও ছিল জনতার ভিতরে! তারাই আগুনে-পোড়া লোকটাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে বলে গাড়িতে উঠে চম্পট দিয়েছে। নইলে একটা মরো-মরো মানুষ এমনভাবে উবে যেতে পারে না।

জয়ন্ত বললে, আমারও মনে হচ্ছে, মানিকের অনুমান সত্য, সুন্দরবাবু, যারা বরেনবাবুকে খুন করেছে, তারা সাধারণ অপরাধী নয়। এমন করে বার বার আমাদের চোখে ধুলো দেবার শক্তি যার-তার হয় না। এ মামলাটার কিনারা করতে হলে আমাদের অনেক কাঠখড়ই পোড়াতে হবে দেখছি।

সুন্দরবাবু বললেন, কাঠই বলো আর খড়ই বলো, আজকে আমি আর কোনও কিছুই পোড়াতে রাজি নই বাবা! আমার গোটা দেহটাই পাকা ফোড়ার মতন টনটন করছে, এই আমি সবেগে ধাবমান হলুম নিজের বাসার দিকে। এখন সামনে চিনের প্রাচীর থাকলেও আমার গতিরোধ করতে পারবে না।

জয়ন্ত বললে, একটু দাঁড়ান সুন্দরবাবু, একটা কথা।

—এখনও কথা! সকাল থেকে এত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা কয়েও তোমার আশ মিটল না, আরও একটা কথা আছে? কী কথা বলো?

—কলকাতায় শ্মশান আছে তিনটে—কাশী মিত্রের ঘাট, নিমতলা আর কেওড়াতলা।

—এটা তোমার আবিষ্কার নয়, এ-কথা সবাই জানে।

—শুনেছেন তো, যে লোকটা আজ আগুনে পুড়েছে তার বাঁচবার সম্ভাবনা কম। যদি সে মারা পড়ে তার দেহ যে কোনও একটা শ্মশানে নিয়ে যেতে পারে। ওই তিনটে শ্মশানে পাহারার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

—হুম দেখা যাবে। আর কোনও কথা নেই তো? আর কোনও কথাই আমি শুনব না কিন্তু!

—না সুন্দরবাবু, আপাতত আমার কথাটি ফুরল।

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির পথ ধরলে।

সেইদিনেই বৈকালের পর। জয়ন্তের বাড়ির একটি ঘর।

চায়ের পেয়ালা খালি করে জয়ন্ত বললে, মানিক, এবারের মামলাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—কেন?

—কারণ প্রথমত, ঘটনাস্থল থেকে কোনও সূত্রই আবিষ্কার করার সুযোগ আমরা পাইনি। দ্বিতীয়ত, কোন উদ্দেশ্যে বরেনবাবুকে খুন করা হয়েছে? তুমি কি তাঁর কোনও শত্রুর কথা জানো?

—না।

—উদ্দেশ্যহীন হত্যা করে কেবল পাগল।

—কিন্তু আজ আমরা যাদের পাল্লায় পড়েছিলুম, তারা যে পাগল নয়, সে পরিচয় পেয়েছি পদে পদে।

—না, পাগল নয়! তারা অতি সুচতুর ব্যক্তি! কিন্তু কেন তারা বরেনবাবুকে খুন করল?

—আমি কেমন করে বলব?

—তুমি বরেনবাবুর পরিবারবর্গের কথা বলছিলে। তাঁদের কথা আরও ভালো করে বলো।

—বরেনবাবুর দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার তিনি বিবাহ করেন, তাঁর কোনও স্ত্রীরই সন্তান হয়নি।

—মানিক, বরেনবাবুর মাসিক আয় ছিল ছয় হাজার?

—হ্যাঁ।

—অর্থাৎ বাৎসরিক বাহাত্তর হাজার টাকা। বড়ো সামান্য টাকা নয়। এর চেয়ে ঢের কম টাকার জন্যে পৃথিবীতে অনেক নরহত্যা আর রক্তপাত হয়েছে।

মানিক সচমকে বললে, তুমি কি মনে করো, সম্পত্তির লোভেই কেউ বরেনবাবুকে খুন করেছে?

—আপাতত আমি কিছুই মনে করছি না। গোড়া থেকেই অন্ধের মতো যে কোনও একটা সন্দেহের পেছনে ছুটোছুটি করা আমার স্বভাব নয়। এখন আমার মন হচ্ছে নতুন খাতার মতো,

যার উপরে সন্দেহজনক একটি লাইনও লেখা হয়নি। যাক সেকথা। বলো দেখি মানিক, বরেনবাবুর অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?

—খুব সম্ভব তাঁর ছোটোভাই!

—বরেনবাবুর আর কোনও আত্মীয় নেই?

—আছেন। দুই বোন! একজন সধবা, একজন বিধবা। তাঁরা দুজনেই থাকেন শ্বশুরবাড়িতে।

—বরেনবাবু ছোটোভাইয়ের নাম কী?

—নরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বরেনবাবুর পৈতৃক সম্পত্তির বাকি অর্ধাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও পেয়েছিলেন।

—নরেনবাবুর বয়স কত?

—ত্রিশের বেশি হবে না।

—স্বভাব চরিত্র?

—যতদূর জানি, আর সব দিক দিয়ে ভালোই। অত্যন্ত সরল, সজ্জন, নম্র, বিনয়ী, পরোপকারী। কিন্তু—

—থামলে কেন? কিন্তু কী?

—ভীষণ তাঁর ঘোড়দৌড়ের নেশা। অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি খুইয়েছেন ঘোড়ার পিছনেই। আগে তাঁর নিজেরও রেসের ঘোড়া ছিল!

—আমি নরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

—তিনি এখন দেশে আছেন।

দাদার মৃত্যুর খবর পেলে নিশ্চয় তিনি কলকাতায় আসবেন?

—হ্যাঁ। তাঁদের দু ভায়ের ভিতর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতেন।

—আজ থাক এ প্রসঙ্গ। এখন অন্য একটা দরকারি কথা শোনো।

—বলো।

—যে লোকটা কাচের জ্বলন্ত জাগ ছুড়েছিল, তার ভাঙা চশমা আর চশমার খাপখানা আমার হস্তগত হয়েছে, জানো তো? চশমার খাপের ভিতরে একটুকরো চিঠি পেয়েছি। এই নাও, তুমিও পড়ে দ্যাখো।

কাগজের ভাঁজ খুলে মানিক পড়লে :

'বিজয়' আজ রাত ১০টার সময়ে ১০ নম্বর রামবাবু লেনে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না।

মানিক শুধোলে, রামবাবু লেন কোথায়?

—বেহালায়। চিঠির তারিখ দেখেছ? বিজয়ের আজই রামবাবু লেনে যাবার কথা।

—চিঠি যে লিখেছে তার নাম নেই?

—নামটা আমাদেরই আজ আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ বিজয় এখন কুপোকাত, সুতরাং তার বদলে আমরা দুজনে আজ সন্ধ্যার পরেই রামবাবুর লেনে যাত্রা করব। কেমন, রাজি?

—নিশ্চয়। কিন্তু হুঁশিয়ার! সঙ্গে রিভলভার নিতে ভুলো না যেন।

ছয়

দশ নম্বর বাড়ি

সন্ধ্যা এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষের একটি রাত। প্রথম দিকে খানিকটা ভাঙা চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু তারপরেই পৃথিবী ছেয়ে গেল অন্ধকারে। জয়ন্ত কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করলে রামবাবু লেনের দশ নম্বরকে।

খুব সম্ভব সেটা কোনও বাগানবাড়ি। চারিদিকে প্রাচীর, ফটকের রেলিংয়ের ভিতর দিয়ে ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, গাছপালার মাঝখানে একখানা বড়ো একতলা বাড়ি। কিন্তু ফটকে বাহির থেকে তালা দেওয়া। বাড়ির কোনও দরজা জানালার ফাঁক দিয়েও চোখে পড়ে না এতটুকু আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, দেখে মনে হচ্ছে বাড়িখানা খালি। এখনও তো দশটা বাজতে অনেক দেরি, আপাতত আমাদের কী করা উচিত, মানিক?

—হয় পাঁচিল টপকে ভিতরে যাওয়া, নয়, রাস্তার ওপাশে গাছে চড়ে উপর থেকে চারিদিকে নজর রাখা।

—উত্তম। আমরা শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করব। এসো ভায়া, খানিকক্ষণ শাখামৃগের ভূমিকায় অভিনয় করা যাক। খানিকক্ষণ কাটল, দ্রুতবেগে অস্ত যাবার চেষ্টা করছে আজকের অনতি-উজ্জ্বল চাঁদ।

জয়ন্ত বললে, বাঁদরগুলো আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে না বটে, কিন্তু মশার দল কেমন সানন্দে ব্যান্ড বাজিয়ে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে দ্যাখো।

মানিক নিজের উপরে ঘন ঘন চপেটাঘাত করে মশকদের অভ্যর্থনার উত্তর দিতে দিতে বললে, এ-সময়ে সুন্দরবাবুর অভাব অনুভব করছি। এখানে তিনি এখন থাকলে এইসব অনাহুত মশকের উদ্দেশ্যে যে-সব চোখা চোখা বচন ঝাড়তেন, কোনও অভিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যেত না।

আরও কিছুক্ষণ গেল। নীচের রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজন যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের কেউ সেই দশ নম্বরের বাগানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বেজে গেল রাত দশটা, চাঁদ গেল অস্ত। পৃথিবীর নাট্যশালায় নিরন্ধ্র অন্ধকারের প্রবেশ।

জয়ন্ত বললে, অন্ধকার আজ আমাদের চোখ অন্ধ করতে পারবে না। বাগানবাড়ির ফটকের পাশেই একটা সরকারি আলো রয়েছে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে কারুর পক্ষেই ফটকের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে না।

মানিক বললে, কিন্তু কেউ কি আজ ওই ফটক খুলতে আসবে? আমার মনে হয় বিজয়ের দুর্ঘটনার জন্যে আজ ওদের আড্ডা আর বসবে না।

—তা অসম্ভব নয়। তবু আরও কিছুক্ষণ পাহারা দেওয়া যাক।

রাত এগারোটা বাজল।

মানিক বললে, ভাই জয়ন্ত, আর নয়। খামোকা মশাদের রক্ত-তৃষ্ণা নিবারণ করে লাভ নেই। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হওয়া যাক।

—তথাস্তু, কিন্তু বাগানের ভিতরটায় একবার চোখ না বুলিয়ে এ স্থান আমি ত্যাগ করব না। গাছ থেকে নামতে নামতে বললে জয়ন্ত।

রাস্তায় আর পথিকদের পদশব্দ নেই। বোবা ও অন্ধ রাতে কালো চাদরে গা-ঢাকা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করছে খালি প্যাঁচার দল। বাদুড়ের ডানা-নাড়াও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

জয়ন্ত ও মানিক হাজির হল প্রাচীরের ওপারে, বাগানের ভিতরে।

অন্ধকারে ছায়ার মতন খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে জয়ন্ত বলল, এত বড়ো বাগান, এত বড়ো বাড়ি এমন খালি পড়ে থাকা স্বাভাবিক নয়। মালির ঘর পর্যন্ত বাহির থেকে তালা বন্ধ। এ যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। এসো মানিক, একবার বাড়ির ভিতরটা পরীক্ষা করা যাক।

দালান পার হয়েই সামনে যে দরজাটা পাওয়া গেল তা কুলুপ আঁটা ছিল না। জয়ন্ত ও মানিক ভিতরে প্রবেশ করে টর্চের আলোতে দেখলে, সেটা হচ্ছে হলঘরের মতো। বেশ সাজানো-গুছানো। বড়ো বড়ো আরশি, মার্বেলের টেবিল, সোফা কৌচ, শ্বেতপাথরের মূর্তি, একদিকে ঢালা বিছানা পাতা, তার উপরে তাকিয়ার ভিড়।

জয়ন্ত বললে, এ ঘর ব্যবহার করা হয়, দরজা পর্যন্ত খোলা অথচ বাড়িতে মানুষ নেই। সন্দেহজনক! রিভলভার বার করো মানিক, রিভলভার বার করো। বাড়ির অন্য ঘরগুলো সাবধানে দেখতে হবে। টর্চের আলো নিভিয়ে তারা অগ্রসর হল বাইরের দিকে।

আচম্বিতে সেই অন্ধকারে কোথা থেকে কেমন করে অনেকগুলো মূর্তি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়ন্ত ও মানিকের উপরে! এত হঠাৎ এই অভাবিত ঘটনাটা ঘটল যে, তারা বাধা দেবার বা একখানা হাত তোলবার সময়টুকু পর্যন্ত পেল না।

তারপর শোনা গেল এক অর্ধ-কর্কশ এবং অর্ধ-কোমল আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। যেন একজন মানুষের গলা দিয়ে একসঙ্গেই কথা কইছে দুইজন মানুষ।

—বেঁধে ফ্যাল, ওদের দুজনেরই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফ্যাল।

কে বললে—বড্ড অন্ধকার যে! আলো জ্বালব নাকি?

না, না, খবরদার। আমাদের শ্রীমুখগুলো দর্শনের সৌভাগ্য ওদের দিতে রাজি নই আমি।

—একটু পরেই তো ওদের প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবে। এখন আর ওদের ভয় করবার দরকার কী?

ভয়! আমি কি ভয় পাবার ছেলে? ভয় নয় রে ভয় নয়, এ হচ্ছে সাবধানতা। জানিস তো, সাবধানের মার নেই!

জয়ন্ত ও মানিকের হাতে পড়ল কঠিন বাঁধন। কারা তাদের টর্চ আর রিভলভার কেড়ে নিলে।

সেই উদ্ভট কণ্ঠস্বর বললে, শোনো মহা-গোয়েন্দা জয়ন্ত। ঘরের ভিতরে আমরা আছি দশজন লোক, আর আমাদের চারজনের হাতে আছে গুলিভরা রিভলভার। তোমরা যদি চেঁচাবার চেষ্টা করো, তাহলে সেই চিৎকারই হবে তোমাদের এ-জীবনের সর্বশেষ চিৎকার। অতএব বোবা হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকো।

সাত

'দূরাগতশব্দানুকরণবিদ্যা'

অর্ধ-কর্কশ ও অর্ধ-কোমল কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করলে, জয়ন্ত, তুমি আমাদের বন্দি করতে চাও?

জয়ন্ত বললে, তুমি হুকুম দিয়েছ আমাদের বোবা হয়ে থাকতে। তবে আবার প্রশ্ন করছ কেন?

—আচ্ছা, নতুন হুকুম দিচ্ছি, তুমি আস্তে আস্তে কথা কইতে পারো।

—কী অনুগ্রহ!

—ব্যঙ্গ রাখো। বলো, তুমি এসেছিলে আমাদের বন্দি করতে?

—তুমি যে কোন মহাপুরুষ তা না জেনে কেমন করে বলি তোমাকে আমি বন্দি করতে চাই কি না?

—আত্মপরিচয় দেবার ইচ্ছা আমার নেই।

—তাহলে তোমার প্রশ্নও হয়ে রইল উত্তরহীন।

—তবে কি তুমি এখানে এসেছিলে কেবলমাত্র নির্মল বায়ু ভক্ষণ করতে?

—তাও না।

—তবে?

—সত্য কথা বলব?

—হ্যাঁ। আমি নিজে প্রায়ই সত্য কথা বলি না, কিন্তু আমি সত্য কথা শুনতে ভালোবাসি।

—তোমার কথাগুলো রবি ঠাকুরের কবিতার মতো নয়।

—মানে?

—তুমি ভারী স্পষ্ট ভাষায় কথা কইছ।

—হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট কথা বলতে চাই, আর শুনতে চাই।

—সাধু, সাধু!

—আবার ব্যঙ্গ? বলো কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

—তোমার প্রশ্ন যে আর একটা নতুন হুকুমের মতন শোনাচ্ছে?

—হ্যাঁ, তাই। কেন এখানে এসেছিলে?

—যদি না বলি?

—বধ করব!

—যদি বলি?

—তাহলেও তোমরা বাঁচবে না।

—হরেদরে সেই হাঁটু জল।

—হাঁটু জল নয় বাবা, গভীর জল!

—বুঝলাম না।

—তোমাদের হাত পা বেঁধে, থলেয় পুরে এই বাগানের পুকুরের গভীর জলে নিক্ষেপ করব।

—খাসা! মৃত্যুটা রোমান্টিক হবে বলে মনে হচ্ছে।

—শোনো মহা-গোয়েন্দা জয়ন্ত!

—কী হুকুম জনাব?

—তোমরা এখানে কেন এসেছিলে আমার মুখেই শুনবে?

—জনাব হাত গুণতে জানেন?

—ওরে হাঁদারাম, আমি হাত গুণতে জানি না। আমি জানি দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

—অপূর্ব আবিষ্কার!

—আবিষ্কার নয়রে, সহজ সত্য।

—সত্য কোনওদিনই সহজ নয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সত্য সহজে হলে খ্রিস্টদেবকে ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হত না।

—তুমি খালি মহা-গোয়েন্দা নও, মহা-দার্শনিকও।

—দার্শনিক—অর্থাৎ ভালো করে 'দর্শন' করাই হচ্ছে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য।

—তাহলে শোনো। আজ সকালে তোমার চর্মচক্ষু যা দর্শন করেছিল তা ঠিক নয়!

—কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

—তুমি একখানা চিঠি পড়ে এখানে এসেছ তো?

—হ্যাঁ।

—সেই চিঠিতে বিজয় নামে কোনও ব্যক্তিকে এই বাগানবাড়িতে আসতে বলা হয়েছিল?

—হুঁ।

—সেই চিঠিখানা লিখেছিলুম আমিই!

—তারপর?

—কিন্তু বিজয় নামধারী কোনও ব্যক্তিকেই আমি চিনি না।

—বটে!

—ওই চিঠির 'বিজয়' হচ্ছে কাল্পনিক ব্যক্তি।

—এতখানি কল্পনাশক্তি প্রয়োগের কাবণ কী?

—আমি তোমাকে ভুলিয়ে এখানে আনতে চেয়েছিলুম।

—ভুলিয়ে?

—হ্যাঁ। চিঠিসুদ্ধ চশমার খাপখানা আমরা ইচ্ছে করেই সেখানে ফেলে রেখে এসেছিলুম। কারণ আমি জানতুম, চিঠিখানা তোমাদের হস্তগত হবেই।

—তোমার কথা শুনে কবি মাইকেলের ভাষায় বলতে সাধ হচ্ছে—'তব বাক্যে ইচ্ছা মরিবারে'। আমাকে এখন গাধা বললেও রাগ করব না।

—ফাঁদে পা দিয়েছ। এখন আর আত্মলাঞ্ছনা করে লাভ নেই।

—আমার মতন গাড়লের বেঁচে থাকা উচিত নয়।

—তা তুমি বাঁচবে না। তুমিও না, তোমার বন্ধুও না।

—কিন্তু তোমার এ আদেশ আমি শিরোধার্য করতে রাজি নই।

—দেখা যাবে। এইসঙ্গে ভুঁদো সুন্দর গোয়েন্দাকেও যমালয়ের পথে পাঠাতে পারলে সুখী হতুম। তার উপরে আমার অনেক দিনের রাগ।

—যাক, তোমার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। সুন্দরবাবুর উপর তোমার অনেক দিনের রাগ! তাহলে তুমি একজন পুরোনো পাপী, তোমার নাম জানা আর অসম্ভব হবে না।

—মূর্খ! নাম জানবার সময় পাবে না! তুমি যে কালকের সূর্যোদয় পর্যন্ত দেখতে পাবে না।

—তোমার এ ধারণা ভ্রান্ত।

দু-রকম গলায় শোনা গেল একজনের অট্টহাস্য। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বললে, আমার ধারণা ভ্রান্ত! মরবার ভয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে?

—মরব না আমি, মরবে তুমি।

—আমায় কে মারবে?

—সুন্দরবাবু।

—কোথায় সে?

—এইখানে এই বাগানে।

—আমি কি প্রলাপ শুনছি?

—মোটেই নয়। ওই শোনো সুন্দরবাবুর গলা। তিনি সদলবলে তোমাদের গ্রেপ্তার করতে আসছেন।

—কই, আমি কারুর গলা শুনছি না।

জয়ন্ত চিৎকার করে ডাকলে, সুন্দরবাবু সুন্দরবাবু।

দূর থেকে সাড়া এল, যাচ্ছি ভায়া, কোনও ভয় নেই।

—সুন্দরবাবু শিগগির আসুন!

আরো কাছ থেকে সাড়া এল—এই যে আমরা এসে পড়েছি।

পর মুহূর্তে দ্রুত পদশব্দ তুলে ঘরের লোকগুলো বাইরে পলায়ন করলে দারুণ আতঙ্কে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, সুন্দরবাবুকে তুমি কখন খবর দিলে?

অন্ধকারে মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, কোথায় সুন্দরবাবু! তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি ভেনলোটিকুইজম' জানি? এদেশি ভাষায় তার একটি গাল ভরা নাম আছে—'দূরাগতশব্দনুকরণ বিদ্যা'! দেখেছ তো ভায়া, যথাসময়ে সব বিদ্যাই কাজে লাগে!

আট

সুন্দরবাবু নিদ্রাচর নন

জয়ন্তদের চায়ের আসর। তরল পানীয়ের সঙ্গে নিরেট খাবারেরও অভাব নেই—স্যান্ডউইচ, নিমকি, ডিম, কেক। জয়ন্ত ও মানিক চায়ের সঙ্গে দুই টুকরো টোস্ট পেলেই তৃপ্ত হত, কিন্তু এই প্রভাতী চায়ের বৈঠকটিতে প্রত্যহই অলঙ্কৃত করেন সুন্দরবাবু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। ভূরিভোজন ছাড়া তাঁর অসাধারণ উদরদেশটি পুলকিত হতে চাইত না কোনওদিন।

যথাসময়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ। এসেই তিনি বলে উঠলেন, হুম! চা-টা শুরু হয়ে গেছে দেখছি। যা কাজের ভিড়। ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা অসম্ভব।

মানিক বললে, সাধু সুন্দরবাবু, সাধু! কাল রাতে আমাদের জন্যে অত খাটুনি খেটেও আজ সকালেই আবার কাজের ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন! ধন্য আপনার কর্তব্যনিষ্ঠা।

সুন্দরবাবু দস্তুরমতো ভয় করতেন মানিকের মুখরতাকে। মনে মনে সে কী নতুন দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে বুঝতে না পেরে তিনি বললেন, কাল রাতে আমি আবার তোমাদের জন্যে কখন খেটে মরেছি? তুমি কি সকালের কথা বলছ? হ্যাঁ, কাল সকালে আমি দু-দুবার রাম-আছাড় খেয়েছি বটে। গায়ের ব্যথা এখনও মরেনি।

মানিক বললে, না না, আমি কালকের রাতের কথাই বলছি।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, মানিক কী বলতে চায় জয়ন্ত? কাল রাতে আমি তো শয্যাশায়ী ছিলুম। গায়ের ব্যথা কমাবার জন্যে স্ত্রীকে বার বার ওষুধ মালিশ করে দিতে হয়েছিল।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ সুন্দরবাবু, কাল রাত্রে আমরা প্রাণে বেঁচেছি কেবল আপনার জন্যেই। তা সে কথা পরে হলেও চলবে, আগে আপনি চা খান, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—হোক গে চা ঠান্ডা! তোমাদের আজব কথা শুনে এদিকে যে আমার মাথা গরম হয়ে উঠেছে! কাল রাত্রে আমি তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই করিনি।

মানিক গদগদকণ্ঠে বললে, আহা, আমাদের সুন্দরবাবু কী বিনয়ী!

—বিনয়ের নিকুচি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, কাল সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে একবারও নামিনি।

—সুন্দরবাবু, ভয়ে ভয়ে একটা কথা বলব?

—কথা আবার কী?

—আপনি 'সোমনাবুলিস্ট' নন তো?

—মানে?

—আপনার নিদ্রাভ্রমণের ব্যাধি নেই তো?

—ও ব্যাধি শত্রুর হোক। তোমার হলেও দুঃখিত হব না।

—আমি কি আপনার শত্রু?

—মাঝে মাঝে আমার সেই সন্দেহই হয়।

—আচ্ছা সুন্দরবাবু, আপনি কি বলতে চান কাল রাতে বেহালার এক বাগানবাড়িতে আপনারা পাহারা দিতে যাননি?

—অসম্ভব! মিথ্যা কথা!

—সেই বাগানে এক দল লোকের হাতে আমরা হয়েছিলুম বন্দি। আপনিই আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন।

—আরব্য উপন্যাসের যে-কোনও গল্প এর চেয়ে সত্য। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মানিক!

—জয়ন্ত আমার সাক্ষী।

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, রাগ করবেন না সুন্দরবাবু, আসুন, এই চেয়ারে এসে

বসুন। এই নিন স্যান্ডউইচ, এই নিন নিমকি, ডিম, কেক। এইবারে খেতে খেতে চুপ করে আমার কথা শুনুন। মানিক একেবারে অমূলক কথা বলছে না।

সুন্দরবাবু খাবারের থালার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু আবার হাতখানা টেনে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, তোমারও মতে মানিক সত্য কথাই বলছে? তাহলে এই রইল তোমার চায়ের পেয়ালা, এই রইল স্যান্ডউইচ আর যত কিছু ঘোড়ার ডিম। হুম! এই পাগল-গারদ ছেড়ে আমি এখন থানায় পলায়ন করতে চাই।

—আরে শুনুন মশাই, শুনুন। আপনি ঘটনাস্থলে সশরীরে হাজির থেকে আমাদের বাঁচাননি বটে, কিন্তু আমরা প্রাণে বেঁচেছি আপনারই নামের জোরে।

—বটে! তাই নাকি! সুন্দরবাবু আবার বাহুবিস্তার করলেন, তারপর একখানা গোটা স্যান্ডউইচ বদনবিবরে নিক্ষেপ করে বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমাদের কাহিনি শুনতে আমি নারাজ নই, বলো।

জয়ন্তের কাহিনী শুনতে শুনতে সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। তারপর তিনি আহার্য গ্রহণ করতেও ভুলে গেলেন, মুখব্যাদন করে অবাক হয়ে কেবল গল্পই শুনতে লাগলেন। তারপর জয়ন্তের গল্প ফুরুল এবং শুরু হল সুন্দরবাবুর হো-হো হাসির ঘটা। দুই হাতে ভুঁড়ি চেপে ধরেও তিনি মিনিট-তিনেকের আগে দমন করতে পারলেন না সেই সর্বনেশে হাসির বিষম ধাক্কা।

অনেক কষ্টে আত্মস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত আমি স্বীকার করছি তুমি একটি জিনিয়াস। একেই বলে শূন্যহাতে কড়ি খেলা। তোমার প্রত্যুৎপন্নমতি হচ্ছে বিস্ময়কর। কিন্তু বড়োই দুর্ভাগ্যের বিষয় ভায়া, অপরাধীদের পালের গোদাকে একবারও তুমি দেখতে পেলে না।

—সে জন্যে দায়ী অন্ধকার।

—লোকটার গলার আওয়াজ আধা-কর্কশ আধা-কোমল?

—হ্যাঁ। শুনলে মনে হয়, একজন মানুষ যেন দুজনের গলায় কথা কইছে। এ-রকম কণ্ঠস্বর আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। আপনি শুনেছেন?

—কই, মনে পড়ছে না তো!

—ভালো করে মনে করে দেখুন। সে আপনাকে চেনে। আপনার উপরে তার ভারী আক্রোশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে হচ্ছে পুরাতন পাপী, কখনও না কখনও আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর আপনার কাছ থেকে জামাই-আদর সে পায়নি!

সুন্দরবাবু স্মৃতি-সাগরে নিজের মনকে ডুবিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর মন স্মৃতি-সাগর আলোড়িত করেও নতুন কোনও তথ্যসংগ্রহ করতে পারলে না।

জয়ন্ত বললে, বেশ, তাহলে আর এক কাজ করবেন। সেই বাগানবাড়িখানার আশেপাশে পুলিশের গুপ্তচর মোতায়েন রাখবেন।

—বেশ, পাহারার ব্যবস্থা করব।

হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। জয়ন্ত ফোন ধরে বললে, হ্যালো!

মিনিট খানেক পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়াল-আলনা থেকে জামাটা টেনে নিয়ে বলল, সুন্দরবাবু উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত। নিমতলার শ্মশানে এইমাত্র একটা আগুনে-পোড়া মৃতদেহ এসেছে। চলো মানিক, জলদি।

নয়

কালো, রোগা, ঢ্যাঙা

নিমতলার শ্মশান। সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক মোটর থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু আবার ব্যর্থতা। একটা পুড়ে-মরা মানুষের লাশ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেই মৃতদেহটা নিয়ে যারা এখানে এসেছিল, তাদের কোনওই পাত্তা পাওয়া গেল না।

পুলিশের যে জমাদারকে শ্মশানের উপর নজর রাখবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার দিকে ফিরে সুন্দরবাবু বললেন, তুমি কি সাক্ষীগোপালের মতো হাঁ করে তাকিয়ে বসে গঙ্গের ঢেউ গুনছিলে?

জমাদার বললে, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর। লাশ তো আমিই আটকেছিলুম।

—যারা লাশ এনেছিল তাদের আটকালে না কেন?

—তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে। আমি বললুম, ওতেও চলবে না। থানার বড়োবাবু এসে যদি হুকুম দেন, তবেই তোমরা লাশ পোড়াতে পারবে। তাদের একজন বললে, বেশ, লাশ এখানেই রইল, আমরা লরিতে বসে তোমাদের বাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।

—লরি?

—হ্যাঁ হুজুর। মড়াটা এনেছিল তারা একখানা লরির উপরে চাপিয়ে!

—তারপর?

—তারা আবার লরির উপরে গিয়ে উঠল। তারপর লরিখানা হুশ করে ছুটে চোখের আড়ালে চলে গেল।

—আর তুমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

—তা ছাড়া আর কী করব হুজুর? মানুষ তো লরির সঙ্গে ছুটতে পারে না।

—লরিতে কজন লোক ছিল?

—চারজন।

—তাদের আবার দেখলে চিনতে পারবে?

—সবাইকে ভালো করে দেখবার সময় পাইনি। তবে যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা কইছিল, তার চেহারা আমার মনে আছে।

—সে কী-রকম দেখতে?

—খুব কালো, খুব রোগা, আর খুব ঢ্যাঙা, চোখে কালো চশমা।

—হুম! জয়ন্ত শুনছ?

—শুনছি। কিন্তু শুনে কী হবে, তাকে তো ধরতে পারলুম না!

—তারপর জমাদার, তুমি ডাক্তারের সার্টিফিকেটের কথা কী বলছিলে না?

—হ্যাঁ হুজুর, এই নিন সেই সার্টিফিকেট।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর সময় নষ্ট করবেন না।

—আমি হলপ করে বলতে পারি, ও-খানা হচ্ছে জাল সার্টিফিকেট। তার চেয়ে লাশটা দেখবেন চলুন যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

শ্মশানের আঙিনার উপরে ছিল মৃতদেহটা। মড়াটাকে পাহারা দিচ্ছিল একজন জীবন্ত লালপাগড়ি। খাটের উপর থেকে নতুন কাপড়ের আবরণ সরিয়ে দেখা গেল একটা ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ মানুষের বিকৃত দেহ।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন এই লাশটাকে নিয়ে কী করা যায় জয়ন্ত?

—মর্গে পাঠিয়ে দিন। এর ফটো তুলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন, দেখুন যদি কেউ শনাক্ত করতে পারে!

—তুমি নতুন কোনও সূত্র-টুত্র আবিষ্কার করতে পারলে?

—উঁহু।

—এখন কী করতে চাও?

—সূত্র আবিষ্কারের জন্য অন্য কোথাও যাত্রা করতে চাই।

—সে কোথায়?

—বরেনবাবুর বাড়িতে।

—সেখানকার সব সূত্র তো অগ্নিদেব গ্রাস করেছেন।

—আমি জানতে চাই, বরেনবাবুর ছোটোভাই কলকাতায় এসেছে কি না!

—নরেন্দ্রসুন্দর রায়চৌধুরী?

—হ্যাঁ।

—বেশ, চলো।

সকলে মোটরে গিয়ে উঠল। খানিক পরেই গাড়ি বরেনবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও সেখানে আগুন জ্বলছিল না বটে, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ বাড়িখানার চারদিকেই বিরাজমান ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখার কালো দংশনচিহ্ন।

সদর-দরজার চৌকাঠের উপরে ম্রিয়মান মুখে উবুড় হয়ে বসেছিল বরেনবাবুর প্রিয় ভৃত্য।

মানিক শুধোলে, কী হে, তোমাদের ছোটোবাবু খবর পেয়ে দেশ থেকে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসেছেন।

—আর কে এসেছেন?

—আর কেউ না। খবর শুনে গিন্নী-মা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তিনি আসতে পারেননি।

—আমরা নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—তিনি তো এখানে নেই।

—তবে কোথায় আছেন?

—বাবুর ছোটোবোনের বাড়িতে।

—অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানিক ফিরে বললে, জয়ন্ত, অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ি আমি চিনি। সেখানে বার-দুয়েক নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

—উত্তম। তুমিই আমাদের পথপ্রদর্শক হও! আমাদের কোথায় যেতে হবে?

—বারাণসী ঘাট স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু গজ গজ করে বললেন, আমরা যেন স্রোতের শ্যাওলা, ক্রমাগতই ভেসে বেড়াচ্ছি। শেষপর্যন্ত ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকব বাবা, তা ভগবানও জানেন কি না সন্দেহ!

মানিক বললে, দুনিয়ার মালিক ভগবানের হাতে অনেক কাজ। আমরা কোথায় ঠেকব কি ঠেকব না, তা নিয়ে ভগবানের ভাববার সময় নেই।

গাড়ি প্রবেশ করল বারাণসী ঘাট স্ট্রিটের ভিতরে।

মানিক বললে, ওই বাড়িখানা, ওই যে সামনে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ির ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির উপরে চড়ে বসল। ট্যাক্সিখানা সচল হয়ে জয়ন্তদের গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আচম্বিতে জয়ন্তও নিজের গাড়ির মোড় ফিরিয়ে নিলে।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, ও কী, কোথা যাও?

জয়ন্ত বললে, ওই ট্যাক্সির পিছনে।

—কেন হে?

—দেখতে পেলে না, সেই খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা!

দশ

ঘুঘুর চাতুরী

মোটরের মোড় ফিরিয়েই জয়ন্ত দেখল, ট্যাক্সিখানা হঠাৎ ডান দিকের একটা রাস্তা ধরে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তও সেই রাস্তা ধরলে।

ট্যাক্সির গতি তখন হয়ে উঠেছে দ্রুততর। জয়ন্তদের মোটরেরও গতি বেড়ে উঠল। দু-খানা গাড়ির সেই মারাত্মক দৌড় দেখে সচকিত পথিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, হা-রে-রে কালো চশমা, আজ তোকে খাপে না পুরে ছাড়ব না। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার বধিব আমি তোমার পরান। হুম হুম হুম! আরও, আরও জোরে জয়ন্ত, আরও জোরে।

মানিক বললে, আরও জোরে নয়। আরও জোরে গাড়ি ছোটালে ঘুঘুবধের আগেই পথের পথিক বধ হবে।

জয়ন্ত বললে, ঠিক বলেছে মানিক। খুনি ধরতে গিয়ে আমরাও মানুষ খুন করব নাকি? তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো, ট্যাক্সিখানা রিভলভারের নাগালের বাইরে যায়নি! তুমি গুলি ছুড়ে ওর টায়ার ফুটো করে দাও, পারবে?

মানিক রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপলে, একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয় গুলি বিদ্ধ করলে একখানা টায়ারকে। দুম করে জাগল এক আর্তনাদ। ট্যাক্সির দৌড় বন্ধ। তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্তদের মোটর।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সির হুডের তলায় মাথা চালিয়ে হতভম্ব সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আরে, এ যে ভানুমতীর খেল! কোথায় সেই বেটা কালো চশমা?

জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, আপনার ঘুঘু এবারেও ফাঁকি দিয়েছে ফাঁদকে।

—কিন্তু কেমন করে?

—ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন।

—এই উল্লুক, ড্রাইভার!

—হুজুর!

—আর হুজুর বলে আদিখ্যেতা করতে হবে না। সোজা জবাব দে। তোর বাবু বেটা গেল কোথায়?

—ও রাস্তা থেকে মোড় ফিরতেই বাবু আমার দিকে তিনখানা দশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ে বললেন, ভাড়া আর বকশিশ। জোরসে গাড়ি চালাও, থেমো না।

—আর তুমিও অমনি তার হুকুমে ভোঁ দৌড় মারলে?

—দু-তিন টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা পেলে কে না কথা শোনে হুজুর! কিন্তু আমার লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়েছে, আপনারা আমার টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছেন।

—বেশ করেছি, খুব করেছি। এখনও তো মাথা ফাটাইনি, এই তোর ভাগ্যি!

—আমার মাথা ফাটাবেন কেন হুজুর?

—ডাঙায় এসে তুই নৌকা ডুবিয়ে দিলি বলে।

—আমি? আমি কিছুই জানি না হুজুর, ও বাবুকে এর আগে কখনও চোখেও দেখিনি!

—বেশ, থানায় গিয়ে ও কথা বলিস।

—আমি কেন থানায় যাব?

সুন্দরবাবু জবাব দিলেন না। তখন গাড়ি ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অনেক কৌতূহলী লোক। একজন পাহারাওয়ালাও ছিল। সুন্দরবাবু তারই হাতে সঁপে দিলেন ট্যাক্সিওয়ালাকে।

সুন্দরবাবু বললে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো, খুনি আমাদের জয়ন্তের চেয়েও চালাক।

—খুনি, জয়ন্তের চেয়েও চালাক কি না জানি না, কিন্তু আপনার চেয়ে যে চালাক, সে বিষয়ে আর একটুও সন্দেহ নেই!

—যা মুখে আসে বলো বাবা, বলো। তোমার কাছে আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ছাড়া তো আর কিছুই নই।

—যা বললুম সত্য।

—প্রমাণ দাও।

—যা স্বপ্রকাশ, তার জন্যে প্রমাণের দরকার নেই।

—মানে?

—দুপুর রৌদ্রেও আকাশে সূর্য আছে কি না জানবার জন্যে কেউ প্রমাণের খোঁজ করে না।

সুন্দরবাবু ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললেন, আরে রেখে দাও তোমার বাগাড়ম্বর। আমি খুনির মতো চালাক না হতে পারি, কিন্তু তোমার মতো নিরেট গর্দভ নই।

জয়ন্ত নিজের মনে কী চিন্তা করছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে, মানিক, তোমার কি বিশ্বাস, আমরা নতুন কোনও সূত্র পাইনি?

—তাই তো আমার ধারণা।

—তোমার ধারণা ভ্রান্ত।

—কেন?

—বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বলো দেখি, অন্নপূর্ণাদেবী বরেনবাবুর কোন বোন?

—সধবা ছোটোবোন।

—তাঁর সন্তান আছে?

—না।

—তুমি বলেছিলে বরেনবাবুর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই নরেনবাবুই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

—হ্যাঁ।

—নরেনবাবুর সন্তানাদি কী?

—তিনি বিবাহই করেননি।

—জুয়া খেলে তিনি সম্পত্তির অধিকাংশই উড়িয়ে দিয়েছেন তাই তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে এখন তাঁর টাকার টানাটানি।

—খুব সম্ভব তাই।

—এখনও তাঁর জুয়ার নেশা আছে?

—থাকতে পারে, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন?

—মানিক, একটু মাথা ঘামাও। ভালো করে ভেবে দ্যাখো, নরেনবাবু যে বাড়িতে এসে উঠেছেন, সেখান থেকে ওই কালো চশমাপরা রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বেরিয়ে এল কেন! ও যে খুনিদের দলের লোক, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই বাড়ির সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক? ও লোকটা অন্নপূর্ণাদেবীর স্বামী নয় তো?

—নিশ্চয়ই নয়! অন্নপূর্ণাদেবীর স্বামীকে আমি চিনি।

—তবে কি লোকটা নরেনবাবুর বন্ধু?

—আমি জানি না।

—কিন্তু জানতে হবে মানিক, জানতেই হবে। সর্বাগ্রে ওইটাই জানা দরকার। আজ একটা বড়ো সূত্র পেলুম। চলো, নরেনবাবুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আসি। বন্ধু, মানুষ চেনা বড়ো কঠিন।

এগারো

যা করেন মা কালী

পথে আসতে আসতে সুন্দরবাবু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন—ঠিক, ঠিক, ঠিক।

মানিক, সচমকে বললে, কী ব্যাপার? সুন্দরবাবুর মগজের ভিতরে ঝড় উঠল নাকি?

—ঝড় নয় মূর্খ, ঝড় নয়।

—তবে?

—আমি চিন্তা করছিলুম!

—চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে নাকি?

—চিৎকার করে কেউ চিন্তা করে না বটে, কিন্তু চিন্তা করার পর লোকে অনায়াসেই চিৎকার করতে পারে।

—বেশ চিন্তামণি-মশাই আপনার মূল্যবান চিন্তাটা কী শুনি?

—এ না হয়েই যায় না।

—কী না হয়ে যায় না?

—ওই নরেনবাবু—

—হ্যাঁ, বলুন!

—ওই নরেনবাবুটির উপরে আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে!

—কেন?

—জয়ন্ত ঠিক আন্দাজ করেছে, নরেনবাবু লোকটি বড়ো সহজ মানুষ নয়। খুনিদের দলের সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতায়—

বাধা দিয়ে মানিক বললে, থামুন! আপনার চিন্তার দৌড় বুঝতে পেরেছি। আপনার চিন্তাকে অত বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে দেবেন না, হোঁচট খেয়ে শেষটা সে খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।

—বাক্যবাণ ছোড়বার জন্যে তুমিও অত বেশি জিভ নেড়ো না বাপু, জিভখানা শেষে খসে পড়তে পারে।

দুজনেরই মুখ বন্ধ হল। গাড়ি আবার এসে থামল অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ির দরজায়।

বেয়ারা মানিককে চিনত। সকলকে বৈঠকখানায় বসিয়ে নরেনবাবুকে খবর দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতরে নরেনবাবুর প্রবেশ।

সুন্দর চেহারা। একহারা, কিন্তু মানানসই দেহ, টকটকে রং, চোখ-নাক ঠোঁট যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সূক্ষ্ম একটি গোঁফের রেখা। মুখখানি যেন সরলতার প্রতীক! কিন্তু তার ভাবভঙ্গি আজ বিষাদের দ্বারা আচ্ছন্ন।

সকলের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নরেন বললে, এই যে মানিকবাবু নমস্কার। এঁরা কারা?

জয়ন্ত ও সুন্দরবাবুর পরিচয় দিলে মানিক। নরেনের দুই ভুরু সঙ্কুচিত হল। সে বললে, আমার মন আজ ভালো নয়, বেশিক্ষণ কথা কইতে পারব না, এজন্যে অপরাধ নেবেন না।

জয়ন্ত এতক্ষণ দেওয়ালের একখানা বড়ো আয়নার ভিতরে প্রতিবিম্বিত নরেনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। সে ফিরে বললে, আজ আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না। আপনার কাছে এসেছি কেবল একটি কথা জানবার জন্যে।

—কী কথা বলুন!

—আজ এই বাড়িতে একটি লোক এসেছিল, তারই পরিচয় জানতে চাই।

—আমি কলকাতায় এসেছি শুনে আজ সকাল থেকেই তো এখানে অনেক লোক আনাগোনা করছেন। আপনি কার কথা জানতে চান?

—প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এখানে একটি লোক এসেছিল।

—ঘণ্টাখানেক আগে জন-তিনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

—আমি যার কথা বলছি সে একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে এসেছিল। সে খুব কালো, খুব রোগা আর ঢ্যাঙা! তার চোখে কালো চশমা।

—ও, বুঝেছি। কিন্তু তাকে আমি চিনি না।

—চেনেন না!

—না। সে কেবল একখানা চিঠি দিতে এসেছিল।

—চিঠি? কার চিঠি?

—তাও বলতে পারব না।

—কেন?

পত্রলেখক পত্রে নিজের নাম-সই করেনি। কিন্তু পত্রখানা রহস্যময়।

—চিঠিখানা একবার দেখতে পারি।

নরেন ইতস্তত করে বললে, পত্রলেখক চিঠির কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছে।

এইবার সুন্দরবাবু কথোপকথনে অংশগ্রহণ করলেন। বললেন, মশাই আপনার দাদার হত্যাকারীকে আপনি শাস্তি দিতে চান?

—নিশ্চয়!

—বরেনবাবুর হত্যাকারীকে আবিষ্কার না করে আমরা ছাড়ব না। এই চিঠিখানার ভিতরে হয়তো কোনও সূত্র থাকতে পারে। সুতরাং—

—বেশ, চিঠিখানা দেখুন তাহলে। কিন্তু এর ভিতরে হত্যাকারীর নামধাম কিছুই নেই। নরেন পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে সমর্পণ করলে জয়ন্তের হাতে।

চিঠিখানা খুলে দুই-তিন পঙ্‌ক্তি পাঠ করেই জয়ন্তের দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। নিজের পকেটের ভিতরে হাত চালিয়ে সেই কাগজখানা সে বার করলে, বরেনবাবুর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে যেখানা পাওয়া গিয়েছিল চশমার খাপের মধ্যে। দুখানা কাগজের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখে জয়ন্ত মৃদু হাস্য করলে, যেন আপনমনেই। তারপরে সে উচ্চস্বরে পত্রখানা পাঠ করলে।

নরেনবাবু, আপনার দাদার হত্যাকারীর নাম শুনতে চান? তাহলে আজ রাত্রি সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বরাহনগরের ৬০ নম্বর রতন রায় রোডে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। একাই আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারতুম, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বেরুলেই আমার বিপদের সম্ভাবনা, কারণ হত্যাকারী আমারও গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছে, সাবধান, পত্রের মর্ম কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না। ইতি।

চিঠিখানা নরেনবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, তা হলে রাত্রে আপনি পত্রলেখকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন?

—তাই তো স্থির করেছি।

—বেশ করেছেন। আপনার যাওয়াই উচিত। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এসো মানিক, আসুন সুন্দরবাবু। পথে এসে গাড়িতে উঠে মোটর চালিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

—কী রকম?

—আজকের চিঠি আর সেই চশমার খাপের চিঠি একই লোকের লেখা। তার ওপরে পত্রবাহকও খুনিদের দলের লোক।

—আচ্ছা, নরেনবাবুকে তারা কোন উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে?

—উদ্দেশ্য হয়তো ভালো নয়। কিন্তু আমরা ঘটনাস্থলের আশেপাশে লুকিয়ে থাকব। আপনি একদল সশস্ত্র পাহারাওয়ালা নিয়ে আসবেন। তারপর যা করেন মা কালী!

বারো

রাত সাড়ে নয়টা

বরাহনগর। কুড়ি নম্বর রতন রায় রোড। একখানা পুরোনো দোতলা বাড়ি। তার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো গাছ। জমির উপরে গাছগুলোর আশেপাশে ঝোপঝাড়। এক সময়ে এখানে বোধহয় বাগানের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ফুলগাছদের তাড়িয়ে এখন তাদের স্থান দখল করেছে বেশ একটি ছোটোখাটো জঙ্গল।

বাড়ির দোতলার একখানা ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে পড়েছে আলোর রেখা। বাড়িতে ঢোকবার পথ আর বড়ো রাস্তার সংযোগস্থলে হ্যারিকেন-লণ্ঠন হাতে করে দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল মূর্তি। রাত বোধহয় তখন নয়টা বাজে।

এতক্ষণ ঝিঁঝিদের একঘেয়ে গান ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না, হঠাৎ স্তব্ধতাকে যেন ধাক্কা মেরে খানিক দূরে বেজে উঠল একটা মোটরের ভেঁপু। লণ্ঠন হাতে নিশ্চল মূর্তিটা চমকে উঠল। তারপরই শোনা গেল একখানা চলন্ত গাড়ির শব্দ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একখানা ট্যাক্সি। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে একজন লোক।

গাড়িখানা বাড়ির কাছে এসে থামল। তার আরোহী লণ্ঠনধারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে, মশাই, বলতে পারেন, এ বাড়িখানার নম্বর কত?

—কুড়ি।

—বটে, এই বাড়িখানাই তো আমি খুঁজছি।

—আপনি কি নরেনবাবু?

—হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন?

—আপনার জন্যেই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার জন্যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়োবাবু আপনাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—কে বড়োবাবু?

—আমাদের কর্তা। আসুন গাড়ি নিয়ে ভিতরে আসুন, বলেই লোকটা গাড়ির পা-দানির উপরে উঠে দাঁড়াল।

চালক লোকটার নির্দেশমতো গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকে সেই পুরোনো বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটা নেমে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে, আসুন নরেনবাবু।

নরেন একটু ইতস্তত করে গাড়ি থেকে নেমে বললে, ড্রাইভার।

—হুজুর!

—গাড়ি নিয়ে তুমি অপেক্ষা করো। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

—যে আজ্ঞে।

লোকটার সঙ্গে নরেন বাড়ির ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাক্সি-চালক একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। তারপর গাড়িখানাকে পিছু হাটিয়ে পথের এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে, যেখানে দু-পাশেই আছে দুটো বড়ো ঝোপ।

মিনিট পাঁচেক যায়। দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে একটা কোকিলের কুহু-স্বর। কাছে ঝিঁঝিদের গলার উপরে গলা তোলবার চেষ্টা করেছে একটা কোলাব্যাং। মাঝে মাঝে হঠাৎ-জাগা বাতাসে সবুজ পাতাদের শিহরণ গান। তা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

লণ্ঠন হাতে করে একটা লোক আসছে। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে চালককে ডেকে বললে, তোমার মিটারে কত ভাড়া উঠেছে?

—কেন?

—নরেনবাবুর ফিরতে দেরি হবে। হয়তো আজ রাত্রে তিনি ফিরতে নাও পারেন। ভাড়া নিয়ে তিনি তোমাকে চলে যেতে বললেন।

—বেশ, ভাড়া দিন, পাঁচ টাকা।

লোকটা লণ্ঠন তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মিটারে কত ভাড়া উঠেছে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চালকের প্রচণ্ড একটা ঘুসি গিয়ে পড়ল ঠিক তার চিবুকের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে টু-শব্দ পর্যন্ত করবার সময় না পেয়ে লোকটা হল ধরাশায়ী। একেবারে অজ্ঞান।

চালক মৃদুকণ্ঠে ডাকল, মানিক!

পাশের ঝোপ থেকে সাড়া এল, উঁ!

—বেরিয়ে এসো। সুন্দরবাবু!

—হুম!

—আপনিও বেরিয়ে আসুন।

—এই যে ভায়া!

—আগে ওই লোকটার হাত-পা মুখ বেঁধে ফেলুন। ওর এখনও জ্ঞান আছে।

লোকটাকে বন্দি করতে বেশিক্ষণ লাগল না।

চালক-বেশী জয়ন্ত বললে, এখানকার সব প্রস্তুত?

—হ্যাঁ।

আচম্বিতে বাড়ির ভিতরে উঠল জেগে প্রচণ্ড হট্টগোল! একাধিক ব্যক্তির ক্রুদ্ধ চিৎকার। তারপর উপর-উপরি দুইবার রিভলভারের গর্জন! আর্তনাদ! পরমুহূর্তে দোতলার ঘরের আলোটা গেল নিভে।

জয়ন্ত বললে, আর দেরি নয় সুন্দরবাবু। ডাকুন আপনার লোকজনদের।

পকেট থেকে বাঁশি বার করে সুন্দরবাবু খুব জোরে দিলেন তিনবার ফুঁ।

জয়ন্ত দ্রুতপদে বাড়ির দিকে ছুটে গেল—পিছনে পিছনে মানিক।

তেরো

অদ্ভুত রহস্য

দুজনেই দৌড়ে বাড়ির সদর-দরজার কাছে হাজির হল। দুজনেরই হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, মানিক, আমি এখানেই থাকি। চরের মুখে শুনেছি, বাড়ির পিছন দিকেও একটা খিড়কির দরজা আছে। তুমি সেইখানে গিয়ে পাহারা দাও।

—তারপর?

—যদি কেউ বাড়ির বাইরে যাবার চেষ্টা করে গুলি করবে—অর্থাৎ প্রাণে মারবে না, কেবল রিভলভার ছুড়ে ভয় দেখাবে।

—বেশ।

—সুন্দরবাবু এখুনি লোকজন নিয়ে এসে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলবেন। আমাদের বেশিক্ষণ পাহারা দিতে হবে না।

মানিক ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ গুড়ুম শব্দে একটা বন্দুক গর্জন করে উঠল। গাছে গাছে কাক ও অন্যান্য পাখিদের ভীত চিৎকার জেগে উঠল।

জয়ন্ত আপন মনেই বললে, বন্দুক ছুড়লে কে? শব্দটা এল যেন বাড়ির উপর থেকে। মানিকের কোনও বিপদ হল না তো?

ধুপ ধুপ করে ভারী ভারী পা ফেলে সুন্দরবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে কেবল তিনবার বললেন, হুম, হুম, হুম!

—ব্যাপার কী?

—কী কাণ্ড, বাপ!

—কাণ্ড আবার কী?

—মাথার ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে এক্ষুনি প্রাণপক্ষী বহির্গত হয়ে যেত।

—বুঝিয়ে বলুন।

—কোথা থেকে কোন ব্যাটা ত্যাঁদোড় আমার মাথা টিপ করে বন্দুক ছুড়েছিল।

—গুলি লাগেনি তো?

—লাগেনি মানে! নিশ্চয় লেগেছে, আলবত লেগেছে।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, তবু আপনি মাটির উপরে লম্বমান হননি।

—কেন লম্ববান হইনি দেখতে পাচ্ছ না? ইতিমধ্যে মাথায় আমি স্টিল হেলমেট পরে নিয়েছি যে। উঃ! আমার কী সর্বনাশই যে হত!

—ও আলোচনা এখন থাক। আপাতত যে বন্দুক ছুড়েছে তাকে ধরতে হবে তো।

—নিশ্চয়ই।

এমন সময় মানিক এসে বললে, আমার আর খিড়কিতে থাকবার দরকার নেই জয়ন্ত। দ্বাররক্ষা করবার জন্যে পাহারাওয়ালারা এসে পড়েছে।

—খিড়কি দিয়ে কেউ বেরুবার চেষ্টা করেনি?

—জনপ্রাণী না।

সুন্দরবাবু পরম আহ্লাদে বললেন, ব্যাটারা তাহলে বাড়ির ভিতরে আছে, এবারে আর আমাদের কলা দেখাতে পারবে না। চলো জয়ন্ত, আমার আর তর সইছে না।

—আপনার মাথায় হেলমেট আছে, আপনিই পথ দেখান। কেউ যদি গুলি ছোড়ে, হেলমেট দিয়ে ঠেকাবেন।

কিন্তু কেউ আর বন্দুক ছুড়ল না, বাড়ির ভিতরটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। একতলার সব ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটা মিশকালো বিড়াল ছাড়া আর কারুর দেখা পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত বললে, এইবার দোতলা। বন্দুকের শব্দটা এসেছিল দোতলা থেকেই।

সুন্দরবাবু হলেন পশ্চাৎপদ। পাহারাওয়ালাদের ডেকে বললেন, তোমরা আগে আগে যাও। যাকে দেখবে তাকে গ্রেপ্তার করবে। ভয় নেই, আমি তোমাদের পিছনেই আছি।

দোতলায় চারখানা ঘর। সব ঘরই খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু একখানা ঘরের রক্তপ্লাবিত মেঝের উপর পড়ে রয়েছে একটা রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, আপনারা বাড়ির ছাদটা একবার খুঁজে আসুন। আমি এই ঘরেই আছি।

ছাদও শূন্য! হতভম্ব সুন্দরবাবু হেলমেট খুলে টাক চুলকোতে চুলকোতে নেমে এসে দেখলেন জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা রিভলভার।

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাটারা মায়াবী! হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, এই রিভলভারটাই আমি নরেনবাবুকে দিয়েছিলুম। কিন্তু অস্ত্রটা এখানে ফেলে নরেনবাবু গেলেন কোথায়?

—হুম, সেই বন্দুকধারীই বা কোথায়?

মানিক বললে, ঘরের মেঝেয় এত রক্ত কার? নরেনবাবুর নয় তো!

জয়ন্ত বললে, সম্ভবত নয়। আমরা রিভলভার ছোড়বার শব্দ শুনেছি দুইবার। এই রিভলভারেও ছয়টা ঘরের ভিতর দুটো গুলি নেই। আমার বিশ্বাস আত্মরক্ষার জন্যে নরেনবাবুই গুলি ছুড়ে শত্রুদের কাউকে হত বা আহত করেছেন।

মানিক বললে, কিন্তু নরেনবাবুই বা কোথায়, আর তাঁর হত কি আহত শত্রুর দেহটাই বা কোথায়! এই বাড়ির ভিতর থেকে সুন্দরবাবুর টাক ফাটাবার জন্যে যে লোকটা বন্দুক ছুড়েছিল সে-ও তো তার বন্দুক নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে!

—মানিক, মেঝের রক্তের উপর কতকগুলো পদচিহ্ন রয়েছে দ্যাখো। আমি পরীক্ষা করে ছয়জন লোকের পদচিহ্ন পেয়েছি। একজনের পা খুব বড়ো, বোধহয় মাথাতেও সে ঢ্যাঙা।

—কী আশ্চর্য! বাড়ির কোনও দরজা দিয়েই কোনও লোক বাইরে বেরুতে পারেনি, কিন্তু এতগুলো মানুষ কি শূন্যপথে পাখির মতো উড়ে পালিয়েছে?

—মানিক, এ ঘরের দরজা দিয়েও কেউ বাইরে যায়নি।

—কেমন করে জানলে?

—তাহলে রক্তাক্ত দেহটা থেকে নির্গত রক্তের ধারা ঘরের বাইরেও দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বাইরের কোথাও এক ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই।

সুন্দরবাবু মহাবিস্ময়ে দুই ভুরু কপালে তুলে বললেন, তাও তো বটে, তাও তো বটে! ঘরের ভিতরে অনেকগুলো লোক ছিল, কিন্তু তারা ঘরের ভিতরেও নেই আর ঘরের বাইরেও যায়নি। অবাক করলে বাবা!

মানিক বললে, প্রায় আসবাবহীন ঘর। চারিদিকে ইটের দেওয়াল! টিকটিকিও এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। এ কী সমস্যা!

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, এই সমস্যার সমাধান না করে আমি এখান থেকে নড়ব না।

চোদ্দো

ভৌতিক রহস্য

সুন্দরবাবু ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখে নিলেন সন্দিগ্ধ চোখে। তারপর হেলমেটটা আবার মাথায় পরে ফেললেন।

মানিক বললে, ও কী মশাই, ওটা আবার মস্তকে ধারণ করলেন কেন?—এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ তো নেই।

এখানে নেই, কিন্তু এখনই তারা দেখা দিতেও পারে। যে সব শত্রু ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় না, অথচ ঘরের ভিতরেও থাকে না, তাদের বিশ্বাস নেই। তারা মায়াবী, তারা সব করতে পারে।

মানিক নিজের রিভলভারের পিছন দিকটা দিয়ে ঘরের চারদিকের দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, কী দেখছ মানিক?

—দেখছি দেওয়ালের কোনও জায়গা ফাঁপা কি না! কিন্তু না, এ নিরেট দেওয়াল, এর কোথাও গুপ্তদ্বার নেই।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু—বলতে বলতে থেমে পড়ে সে পশ্চিম দিকের একটা জানালার কাছে ছুটে গেল।

মানিক বললে, কী হল জয়ন্ত?

—এ দিকের জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়।

—সেটা আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কথা কইতে কইতে তুমি হঠাৎ ছুটে গেলে কেন?

—একটা শব্দ শুনছ না।

কান পেতে মানিক বললে, শুনছি। একখানা মোটরবোটের শব্দ।

—হ্যাঁ, গঙ্গার উপর দিয়ে একখানা মোটরবোট যাচ্ছে।

—মোটরবোটের শব্দটা আগে ছিল না, এইমাত্র জাগল। নিশ্চয় বোটখানা ছাড়া হয়েছে কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে। এত রাত্রে বোটে চড়ে গঙ্গার হাওয়া খাবার শখ হল কোন মহাপুরুষদের সেই কথাই ভাবছি।

—সন্দেহজনক বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, জনকয় সেপাইকে গঙ্গার ধারে পাঠাব নাকি?

—এখন আর পাঠিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে বোটখানা অনেক দূরে চলে গিয়েছে, আর নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

—তুমি কি বলতে চাও যে—

বাধা দিয়ে জয়ন্ত বলল, আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি আপনাকে একটা ব্যাপার দেখাতে চাই।

—কী?

একটা লন্ঠন উঁচু করে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, যে দেওয়ালে জানালাটা গাঁথা আছে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরবাবু বিপুল বিস্ময়ে বললেন, ওরে বাবা এত মোটা দেওয়াল তো আমি জীবনে কখনও দেখিনি!

—ঘরের অন্য তিনদিকের দেওয়াল দেখুন! কোনও দেওয়াল তত চওড়া নয়।

—তাই তো হে!

—সেইটেই বিবেচ্য।

—হুম, এ যেন চিনের প্রাচীরের নমুনা।

—এইবার মেঝের রক্তের দিকে তাকান। কী দেখছেন?

—একটু অত্যুক্তি করলে বলা যায়, মেঝের উপর দিয়ে বইছে রক্তের ঢেউ।

—আর কিছু দেখছেন?

—রক্তের মাঝে মাঝে অনেকগুলো পায়ের দাগ।

—আরও কিছু।

—উঁহু!

—মানিক, তুমি কী বলো!

—পশ্চিম দিকে রয়েছে একটা দেওয়াল আলমারি। একটা লম্বা রক্তের রেখা ওই আলমারির তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। যেন কোনও আহত রক্তাক্ত লোক ওই আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—সে আহত না হয়ে মৃত হতেও পারে। হয়তো কারা তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ওই পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

—কিন্তু কেন? দেহটাকে আলমারির ভিতরে রেখে দেবে বলে?

—হতেও পারে, না হতেও পারে। আলমারিটা খুলে দ্যাখো না!

—কিন্তু আলমারিটা তো বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

—ভারী তো পুঁচকে তালা। ভেঙে ফ্যালো।

তালা ভাঙতে দেরি লাগল না। একটা বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত হলেন সুন্দরবাবু।

কিন্তু আলমারির দরজা খুলে পাওয়া গেল কেবল চারটে তাক। সেগুলোর উপরে রয়েছে কয়েকটি আজে-বাজে জিনিস।

জয়ন্ত বললে, আর একটা জিনিস লক্ষ করুন সুন্দরবাবু।

—ভায়া, বার বার লক্ষ করতে করতে আমি ক্রমেই লক্ষহারা হয়ে পড়ছি যে।

—আলমারির ফ্রেমের উপরে রয়েছে একটা পিতলের মোটা হাতল।

—তাতে কী হয়েছে?

—ওইরকম জায়গায় অমনধারা হাতল থাকার কোনও মানে হয় না।

—হুম!

—হাতলটা ধরে জোরসে মারুন টান!

—মারলুম হেঁইয়ো। আরে, এ কী!

হড় হড় করে গোটা আলমারিটাই দরজার পাল্লার মতো দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে। জয়ন্ত ছাড়া আর সকলেরই দৃষ্টি বিস্মিত এবং চমকিত। জয়ন্ত সহজ কণ্ঠেই বললে, এসো মানিক, আলমারির ওপাশে কী আছে এইবারে দেখা যাক।

আলমারির ওপাশে আছে দুটো দেওয়ালের মাঝখানে হাত-দেড়েক চওড়া আর অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে পাশাপাশি দুজন মানুষ দাঁড়াতে পারে না! নীচে গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে নেমে গিয়েছে একসার ছোটো ছোটো সিঁড়ি।

জয়ন্ত অগ্রসর হল। এক হাতে টর্চ এবং আর এক হাতে রিভলভার নিয়ে সেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, আমার বিশ্বাস শত্রুদের কেউ আর এ মুল্লুকে নেই। আপনারাও নির্ভয়ে আমার পিছনে আসুন।

মোট ত্রিশটা ধাপ। তারপর সিঁড়ির শেষ।

এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলে জমাট অন্ধকার বিদীর্ণ করে জয়ন্ত বললে, বাড়িখানা আছে আমাদের মাথার উপরে, এখন আমরা পাতালের গর্ভে। এখানটা দেখছি ছোটোখাটো ঘরের মতো, আর—

জয়ন্তর কথা ফুরুবার আগেই সেই অন্ধকূপের মধ্যে বিকট একটা ভৌতিক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—হু-উ-উ-উ!

মস্ত একটা লম্ফ ত্যাগ করে আবার সিঁড়ির উপর গিয়ে পড়ে সুন্দরবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, এ কী রে বাবা, এ কী আওয়াজ! পালিয়ে এসো জয়ন্ত, পালিয়ে এসো মানিক!

পনেরো

পাতালপুরে

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল, সেই দিকে জয়ন্ত ফিরে দাঁড়াল চোখের পলক পড়বার আগেই।

টর্চের আলোতে দেখা গেল এক কোণে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-মূর্তি। তার মুখে বন্ধন, তার পায়ে বন্ধন।

মানিক দুই পা এগিয়ে হেঁট হয়ে মূর্তিটাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, নরেনবাবু না?

নরেন নিঃসহায়ের মতো ঘাড় নেড়ে কেবল বলতে পারলে, হুঁ-উ-উ-উ!

জয়ন্ত ও মানিক তৎক্ষণাৎ তার বন্ধন খুলে দিলে।

সিঁড়ির ওপর থেকে আবার নীচে নামতে নামতে সুন্দরবাবু হাঁফ ছেড়ে বললে, নরেনবাবু, এইভাবে আমাদের ভয় দেখানো উচিত হয়নি। 'হুঁ-উ-উ-উ-উ' কী রে বাবা!

নরেন শ্রান্ত স্বরে বললেন, কী করব বলুন, ও ছাড়া আর কোনও শব্দ উচ্চারণ করবার উপায় আমার ছিল না।

জয়ন্ত বললে, ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।

—পারব। বাড়ির উপরকার ঘরে ওঠবার পর একজন খুব রোগা আর ঢ্যাঙা লোক আমার সঙ্গে অল্পক্ষণ বাজে কথা কইলে। তারপরই অতর্কিতে পিছন থেকে আমাকে আক্রমণ করলে কয়েকজন লোক। কোনওরকমে একবার তাদের হাত ছাড়িয়ে আমি উপর-উপরি দুইবার রিভলভার ছুড়লুম। একটা লোক জখম হয়ে মাটির উপর পড়ে গেল বটে, কিন্তু বাকি লোকগুলো আবার আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁধে ফেললে আমার হাত পা মুখ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে কী করত জানি না; কিন্তু হঠাৎ, বাইরে আপনাদের বাঁশি বেজে উঠল। রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বললে, পালাও, পুলিশ এসেছে! তখন আমায় আর সেই আহত লোকটার দেহ মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে তারা দেওয়ালের একটা গুপ্তদ্বার খুলে সিঁড়ি দিয়ে এইখানে নেমে এল। আসবার সময়ে সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা বোধহয় আপনাদের লক্ষ্য করে একবার বন্দুকও ছুড়েছিল।

জয়ন্ত শুধোলে, নরেনবাবু, সে লোকটার গলার আওয়াজ কেমন?

—স্বাভাবিক।

—আধা-নরম আধা-কর্কশ নয়?

—না।

—মানিক, তাহলে বোধ হচ্ছে বেহালার বাগানবাড়িতে যে আমাদের সঙ্গে কর্তৃত্বের স্বরে কথা বলেছিল, সে আর এই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা একই ব্যক্তি নয়। আচ্ছা নরেনবাবু, আপনাকে এখানে ফেলে রেখে লোকগুলি কোন দিকে গিয়েছে বলতে পারেন।

—হ্যাঁ। তারা ওই দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। নরেন অঙ্গুলি নির্দেশ করলে। দেওয়ালের গায়ে রয়েছে ছোটো একটা দরজা, তার কপাট বন্ধ ছিল না।

জয়ন্ত দরজার ও-পাশটা টর্চের সাহায্যে আলোকিত করে বললে, এই যে একটা সুড়ঙ্গ।

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, বাব্বাঃ! এরা দেখছি জাত শয়তান! আয়োজনের কিছুই বাকি রাখেনি। কেবল স্থলপথে জলপথেই ওদের চলাচল নয় হে জয়ন্ত, ওরা হয়তো এরোপ্লেনে উঠেও আমাদের ফাঁকি দিতে পারে।

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, আমার মনে হয়, এদের একজন বিচক্ষণ দলপতি আছে। সাধারণত সে নিজে থাকে আড়ালে আড়ালে, নিরাপদ ব্যবধানে, আর তার হুকুম তামিল করে দলের অন্য সবাই। ওই রোগা আর ঢ্যাঙা লোকটা বোধহয় তার ডান হাতের মতো।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার মনে হয়, এই অদৃশ্য দলপতি কোনওদিনই দৃশ্যমান হবে না। ধরা পড়বে বড়ো জোর তার চেলা-চামুণ্ডারা।

—দলপতিকে চোখে না দেখলেও খুব সম্ভব আমরা তারই অর্ধ-কোমল আর অর্ধ-কর্কশ

কণ্ঠস্বর শুনেছি। সেই স্বর আমি কোনওদিনই ভুলব না, কারণ সযত্নে তার রেকর্ড রেখেছি আমার স্মৃতির গ্রামাফোনে। তার স্বর আবার শুনলেই তাকে চিনতে পারব। আর এটাও জেনেছি, আপনার উপরে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। নিশ্চয় সে পুরাতন পাপী, কখনও-না-কখনও আপনার পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, আর বোধহয় আপনি জামাই-আদর করেননি তাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, তোমার ওই অর্ধ-কোমল অর্ধ-কর্কশ কণ্ঠের অধিকারীকে আমি তো স্মৃতির-সাগর মন্থন করেও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

—আপাতত থাক ও-কথা। নরেনবাবু আপনি দুজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আবার উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন। ততক্ষণে আমরা সুড়ঙ্গটার ভিতরে দৃষ্টি সঞ্চালন করে আসি।

সুড়ঙ্গটাও সঙ্কীর্ণ, তার ভিতরে পাশাপাশি চলতে পারে না দুজন মানুষ। বেশ খানিকটা এগিয়ে যেখানে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে, সেখানেও রয়েছে আর একটা ছোটো দরজা, টানতেই খুলে গেল তার কপাট।

বাহির থেকে দরজার উপরে ঝুলছে এত লতাপাতা যে সহজে তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না। তারপর প্রায় কাঠা-চারেক জমি জুড়ে বিরাজ করছে কাঁটা-ঝোপের পর কাঁটা-ঝোপ আর আগাছার নিবিড় জঙ্গল।

জয়ন্ত স্তব্ধ মুখে সেই দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে আঘাটাতেও গঙ্গার জলবাহু ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোর হিরের টুকরো।

খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে বললে, মানিক পুলিশের সাড়া পেয়ে ওরা তাড়াতাড়িতে নরেনবাবুকে নিয়ে পালাতে পারেনি। আমরা যে গুপ্তপথের সন্ধান পাব, সেটা ওরা আন্দাজ করতে পারবে না। নরেনবাবুর একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই দু-এক দিনের মধ্যে লুকিয়ে আবার সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করবে।

—তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়।

—সে সুযোগ আমরা ছাড়ব না। তারা আসবে রাতের অন্ধকারেই। আমরা কাল থেকে এইখানে রাত জেগে গঙ্গার গান শুনব। এবারে সুড়ঙ্গে ঢুকলে আর তারা বেরুতে পারবে না। আর নরেনবাবুকে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। তাঁকে যে আমরা উদ্ধার করেছি সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।

—মন্দ ফন্দি নয়। এখন চলো, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

ষোলো

বিজনবিহারী রায়

তারপর কেটে যায় এক, দুই, তিন দিন। জয়ন্ত সদলবলে রাত জাগে বরাহনগরের গঙ্গার ধারে। কেবল তারা নয়, সে মুল্লুকের মশারাও সানন্দে ঐকতান বাজিয়ে রাত জাগে তাদের সঙ্গে। সুন্দরবাবুর অভিযোগের অন্ত নেই।

তিন দিন পরে জয়ন্তও হাল ছেড়ে দিল। সে বুঝল, নরেনবাবুর জন্যে অপরাধীরা আর সুড়ঙ্গের মধ্যে পদার্পণ করবে না।

সুন্দরবাবু বললেন, আমি তো গোড়া থেকেই বলে আসছি ওরা আমাদের চেয়ে চালাক। এত সহজে ফাঁদে পা দেবার বান্দা ওরা নয়।

জয়ন্ত বললে, আমার মত আলাদা। ওদের আসল উদ্দেশ্য এইবার বুঝতে পেরেছি।

—মানে?

—ওদের ইচ্ছা, নরেনবাবু অন্ধকূপে বন্দি হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর করতলগত হোন! ওরা নরেনবাবুকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ওরা ভাবছে ওদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কাজেই অকারণে সুড়ঙ্গর ভিতরে এসে ওরা আর পুলিশের নজরে পড়তে রাজি নয়।

—কিন্তু নরেনবাবুকে যমালয়ে পাঠাবার জন্যে ওদের এতটা আগ্রহ কেন?

—এখনও এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে যে কারণে বরেনবাবু মারা পড়েছেন, সেই কারণেই ওরা নরেনবাবুকে বধ করতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই।

—এ আবার তোমার কী রকম হেঁয়ালি! এদিকে বলছ তুমি সঠিক উত্তর জানো না, আবার বলছ ওরা একই কারণে বরেনবাবুকে বধ করবার পরে নরেনবাবুকে বধ করতে চায়!

—সুন্দরবাবু, আপাতত এর বেশি আর কিচ্ছু বলতে পারব না। তবে এই মামলাটা হাতে নিয়েই মনে সন্দেহ জেগেছিল, অবশেষে সেই সন্দেহই বোধ করি সত্যে পরিণত হবে। আপনি আজ সন্ধ্যার সময় বাড়িতে একবার আসবেন?

—আসব। কিন্তু কেন বলো দেখি?

—আমাদের বরানগর অভিযান তো ব্যর্থ হল আজ আর একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করব।

সেদিনের সন্ধ্যা।

জয়ন্ত বৈঠকখানায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং মানিক ধরেছে তবলা।

সুন্দরবাবুর প্রবেশ। দুই বন্ধুর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন। অধীরভাবে একবার হুম শব্দ উচ্চারণ। কিন্তু জয়ন্ত ও মানিক তাঁর দিকে ফিরেও তাকালে না। সমান তালে বাজাতে লাগল বাঁশি আর তবলা।

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, বললেন, কী হে জয়ন্ত, বাঁশির প্যানপ্যানানি শোনবার জন্যেই আজ আমাকে এখানে আসতে বলেছ?

উত্তর নেই। বাঁশি আর তবলা বোবা হল না।

আরও মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে সুন্দরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসেছিলুম একটা জরুরি খবর দিতে। তা তোমরা যখন শুনবে না আমি আর কী করব বলো। চললাম।

মানিকের তবলায় পড়ল তেহাই, জয়ন্তের বাঁশি হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত বললে, আপনি জানেন তো সুন্দরবাবু, মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাবার জন্যে আমার প্রাণ আনচান করে।

মানিক বললে, আর তবলা বাজাবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করে।

—হুম! ও দুটো যন্ত্রই আমাকে দেয় যম-যন্ত্রণা।

জয়ন্ত বললে, তবে সেতার শুনবেন?

মানিক বললে, কিংবা—

বাধা দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, রক্ষা করো! আবার সেতারের প্রিং প্রিং! ও-সব আমি বুঝিও না, ভালোও লাগে না।

মানিক বললে, তবে আপনার কী ভালো লাগে সুন্দরবাবু? আমাদের মধু যদি এখন চা আর ফাউলির স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে?

সুন্দরবাবু একগাল হেসে বললেন, তাহলে মধুকে আমি একাধিক ধন্যবাদ দেব।

—বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে।

—তবে আমিও আবার বসলুম।

জয়ন্ত বললে, একটা নতুন সূত্রের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারিনি।

সুন্দরবাবু বললেন, আমারও বক্তব্য আছে। আগে তোমার কথা শুনি।

—বেহালায় গিয়েছিলুম। আশেপাশের লোকের কাছে খবর নিয়ে জানলুম দশ নম্বর রামবাবু লেনের সেই বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন বিজনবিহারী রায়। কিন্তু তিনি আর কলকাতায় বাস করেন না।

—বটে! তাহলে আমার খবর শুনবে? আমি তোমার চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়েছি।

—সুসংবাদ!

—নিমতলায় সেই আগুনে-পোড়া মৃতদেহটার ছবি কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পুরস্কার ঘোষণা করে। আজ একজন লোক তাকে শনাক্ত করে গিয়েছে।

—কে শনাক্ত করেছে?

—তার নাম হরিয়া। সে বেহালার ওই বাগানবাড়িতে আগে মালির কাজ করত। হরিয়া বলে, আগুনে পুড়ে যে লোকটা মরেছে সে হচ্ছে বাগানবাড়ির মালিক বিজনবিহারী রায়ের মোটরচালক।

—তাহলে আপনি বিজনবাবুরও ঠিকানা পেয়েছেন?

—উঁহু। হরিয়া বলে বিজনবাবু কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে!

—কিন্তু কে বিজনবিহারী রায়?

—তাও জেনেছি ভায়া, তাও জেনেছি! সেই জন্যেই তো বলছি, আমি তোমার চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়েছি।

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, সব কথা খুলে বলুন।

—বেহালার বাগানবাড়িতে তুমি একজনের আধা-কোমল আধা-কর্কশ গলায় আওয়াজ শুনেছিলে না?

—হ্যাঁ।

—বিজনবিহারীও ওই রকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী।

—কেমন করে জানলেন?

—শোনো। হরিয়া মালির মুখে বিজনবিহারী রায়ের নাম শুনেই সজাগ হয়ে উঠেছে আমার ঘুমন্ত স্মৃতি। তুমি বলেছিলে সেই আধা-কোমল আর আধা-কর্কশ কণ্ঠের অধিকারীর নাকি আমার উপরে রাগ আছে। সেই যদি বিজন হয় তাহলে আমার উপরে তার রাগ থাকবারই কথা। কারণ

বছর পাঁচেক আগে তাকে একটা খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছিলুম। মামলা অনেকদিন ধরে চলেছিল তাকেও হাজতে আবদ্ধ থাকতে হয়। শেষটা যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায় বটে, কিন্তু আসলে বিজনই যে হত্যাকারী এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জয়ন্ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বরেনবাবুর হত্যাকাণ্ডেও সেই বিজনের হাত আছে।

—কিন্তু বিজন এখন কোথায় জানেন না তো?

—তার ঠিকানা জানি না বটে, তবে মাসখানেক আগেও সে কলকাতায় ছিল বলেই শুনেছি।

—কার মুখে শুনেছেন?

—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এক ইনস্পেকটারের মুখে। বিজনকে তিনি মোটরে চড়ে পথ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললে, সুন্দরবাবু, আপনি মূল্যবান সংবাদ এনেছেন। আর আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হবে না। বিজন যখন কলকাতাতেই আত্মগোপন করে আছে, তখন তাকে আবিষ্কার করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না! তারপরেই বোঝা যাবে বর্তমান মামলার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কতখানি!

সতেরো

ভাগ্যে

চা এবং খাবার এল—সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডল। তাঁর জীবনের সেই সময়টাই সবচেয়ে উপভোগ্য, যখন তাঁর ডান হাতখানি খাবারের থালার দিকে বার বার আনাগোনা করবার সুযোগ পায়।

খেতে খেতে সুন্দরবাবু বললেন, দ্যাখো জয়ন্ত বিজন কলকাতা ত্যাগ করলেই ভালো। কলকাতা হচ্ছে জনসমুদ্রের মতো, আর বিজন হচ্ছে তার মধ্যে এক ঘটি জলের মতো। ঘটির জল সমুদ্রে মিশে গেলে কেউ কি তাকে আবিষ্কার করতে পারে হে? বরং কলকাতার বাইরে গেলেই সে সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই দ্যাখো না, বিজন আর আমি দুজনেই কলকাতায় আছি, অথচ আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তার চুলের টিকি পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

জয়ন্ত বললে, খোঁজেননি, তাই তার দেখা পাননি। খুঁজলে ভগবানের দেখা পেতে দেরি লাগে বটে, কিন্তু শয়তান ধরা দেয় খুব সহজেই।

মানিক বললে, কিন্তু জয়ন্ত, বিজন যে বরেনবাবুর হত্যাকারী আর সেই যে নরেনবাবুকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণই আমরা পাইনি। আমরা বড়োজোর তার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনেছি, কিন্তু আদালতে সেটা ঠিক প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে কি?

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, হুম! মানিক প্রায়ই বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে না, কিন্তু তার আজকের কথার দাম লাখ টাকা।

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, আমি কেমন করে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলব সুন্দরবাবু!

ষোলো আনা বুদ্ধিই যে আপনার মগজের ভিতরে বন্দি হয়ে আছে। বলছেন, আমার কথার দাম লাখ টাকা। এমন করে আমায় আর লজ্জা দেবেন না দাদা। আপনার কাছে আমি! শাখামৃগের কাছে নেংটি-ইঁদুর।

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, শাখামৃগ মানে কী জয়ন্ত?

—শুনলে কি খুশি হবেন?

—কেন হব না?

—মানেটা ভালো নয়।

—তবু আমি শুনব। শাখামৃগ মানে কী?

—কপি।

—কী কপি, ফুলকপি?

—ফুলকপিও নয়, বাঁধাকপিও নয়—শুধু কপি। অর্থাৎ বানর।

সুন্দরবাবু একটিমাত্র বাক্যও উচ্চারণ না করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর মানিকের ভাবহীন মুখের দিকে প্রজ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হন হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, সুন্দরবাবুকে তাড়ালে মানিক।

—উনি তাড়া খেয়ে চলেও যান, আবার তাড়াতাড়ি ফিরেও আসেন।

—যাক ও-কথা! এখন বাড়ির ভিতর থেকে একবার নরেনবাবুকে ডেকে আনো দেখি। তার সঙ্গে দুটো কথা কইব।

মানিক চলে গেল এবং মিনিট-তিনেক পরে নরেনবাবুকে নিয়ে ফিরে এল।

নরেন বললে, আর অজ্ঞাতবাস ভালো লাগছে না জয়ন্তবাবু।

—বসুন। আর আপনাকে অজ্ঞাতবাস করতেও হবে না। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছি, আমাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

—শুনে বাঁচলুম!

—আচ্ছা নরেনবাবু, আপনার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?

—আমি।

—বরেনবাবু উইল করে গেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার সন্তান আছে?

—না।

—স্ত্রী?

—বিবাহ করিনি, কখনও করবও না।

—আপনার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে কে?

—আমার ভাগ্নে।

—শুনেছি আপনার ভগ্নী বন্ধ্যা।

—সে আমার ছোটোবোন! আমার বিধবা দিদির ছেলে আছে।

—কয় ছেলে?

—একটি মাত্র।

—বটে? তার বয়স কত?

—সে প্রায় আমারই সমবয়সি।

—তিনি কী করেন?

—জানি না।

—সে কী!

—আশ্চর্য হচ্ছেন! আশ্চর্য হবার কথাই বটে। আসল কথা কী জানেন জয়ন্তবাবু, দিদির সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব আছে বটে, কিন্তু আমার ভাগ্নের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন?

—সে মানুষ নয়, একেবারেই লক্ষ্মীছাড়া! তার কথা স্মরণ করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

—দুঃখের কথা!

—লোক ঠকানো তার ব্যবসা, একবার খুনের মামলাতেও পড়েছিল।

জয়ন্ত চমকে উঠল। একটু চুপ করে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর নাম কী?

—বিজনবিহারী রায়।

জয়ন্ত ও মানিকের মধ্যে হল দৃষ্টি বিনিময়। জয়ন্ত বললে, বিজনবাবুর কণ্ঠস্বর কি অর্ধ-কোমল অর্ধ-কর্কশ?

—আর একদিনও তার সম্বন্ধে আপনি এই প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যাঁ বিজনের গলার আওয়াজ ওই রকমই বটে। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে?

—আমি শুনেছি।

—কোথায়?

—পরে বলব। বিজনবাবুর চেহারা কেমন?

—লোকে বলে নাকি অনেকটা আমার মতনই দেখতে।

—তার ঠিকানা কী?

—তাও জানি না। সে আমার দিদির সঙ্গে থাকে না। তবে এত দোষের মধ্যেও তার একটা মস্ত গুণ আছে। সে অত্যন্ত মাতৃভক্ত। রোজ সকালে একবার করে আমার দিদির সঙ্গে দেখা করে যায়।

—আপনার দিদির ঠিকানা কী?

—পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট।

—কাল সকালে সেখানে গেলে বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি?

—হওয়াই তো উচিত। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কী দরকার?

জয়ন্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, তার সঙ্গে দেখা হবার পর বলব। কিন্তু সাবধান নরেনবাবু, আমি যে কাল বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব, এ-কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।

আঠারো

টেলিফোনের কীর্তি

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। নরেনবাবুর দিদির বাড়ি।

তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি কলকাতা। শেষ রাতের আঁধারের সঙ্গে উষার আলোর যুঝাযুঝি চলছে তখনও। শহরের ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু তার মুখরতা এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

যথাসম্ভব আত্মগোপনের জন্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে জয়ন্ত বললে, মানিক, মাতৃভক্ত হত্যাকারীর জন্যে বোধকরি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! তা হোক, একটু আগে আগে আসাই ভালো।

পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিট। তার দরজায় এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি, আরোহী নীচে নেমে ভাড়া দিলে। ট্যাক্সি চলে গেল।

জয়ন্ত বললে, ওই কি বিজনবিহারী? লোকটাকে দেখতে অনেকটা নরেনবাবুর মতোই বটে—এমনকি গায়ের রং পর্যন্ত। দেখলে, বাড়িতে ঢোকবার আগে বিজন চারিদিকে কী-রকম সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে গেল!

মানিক বললে, আমাদের দেখতে পায়নি তো?

—আশা করি পায়নি।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে তারা দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। দরজার কড়া নাড়তেই একজন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই?

—বিজনবাবুকে।

—তিনি তো এই সবে এলেন।

—তাঁকে গিয়ে বলো দুজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

বেয়ারার প্রস্থান।

বেয়ারা ফিরে এসে বললে, আপনারা বাইরের ঘরে বসুন। বাবু আসছেন।

বেয়ারা বৈঠকখানার দরজা খুলে দিলে ঘরের ভিতরে ঢুকল জয়ন্ত ও মানিক। পরমুহূর্তেই দরজা বন্ধ হওয়ার ও বাহির থেকে শিকল-তোলার শব্দ হল।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, এই! দরজা খুলে দাও। কারুর সাড়া নেই।

মানিক বললে, যা ভেবেছি! বিজন হয় সন্দেহ করছে, নয় রাস্তায় আমাদের দেখে চিনে ফেলেছে। আমরা বন্দি।

জয়ন্ত বললে, ভারী বোকা বানালে তো! দেখছি ঘর থেকে বেরুবার আর কোনও পথ নেই। সে দরজা নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। লাথি ও ধাক্কা মারতে লাগল দরজার উপরে।

মানিক বললে, বৃথা চেষ্টা করছ কেন? তোমার গায়ে যত জোরই থাক, ঘরের ভিতর থেকে এই মজবুত দরজা কিছুতেই ভাঙতে পারবে না, অন্য উপায় দ্যাখো।

—কী উপায় আছে আর? ঘরটা যদি রাস্তার ধারেও হত চেঁচিয়ে পথের লোক ডাকতে পারতুম।

ঘরের বাইরে জাগ্রত হল হা-হা-হা-হা অট্টহাস্য। তারপরেই সেই পরিচিত অর্ধ-কোমল অর্ধ-কর্কশ কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, কী হে শার্লক হোমস আর ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ। গোয়েন্দাগিরি ভারী সোজা, নয়।

জয়ন্ত বললে, দরজা খুলে দাও বিজন। আমাদের বন্দি করে তুমি কিছুই সুবিধে করতে পারবে না। পুলিশ তোমার নাম জানতে পেরেছে।

—পুলিশকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।—তোদের কী হাল হয় দেখ—সেদিন বড়ো ফাঁকি দিয়েছিলি। এই সঙ্গে ভুঁদো সুন্দর-গোয়েন্দাটাকে পেলেই সোনায় সোহাগা হত। যত-সব নেড়াবুনে, সব-হল কীর্তনে! সবাই মহা ডিটেকটিভ!

মানিক চুপিচুপি বলল, জয়ন্ত মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছি।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, কী রকম?

—ওই দ্যাখো টেবিলের উপরে টেলিফোন। এবার সত্য-সত্যই সুন্দরবাবু এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন।

জয়ন্ত এক লাফে টেবিলের সামনে গিয়ে পড়ল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে সুন্দরবাবুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে। বললে, সুন্দরবাবু আমরা আবার বিজনের হাতে বন্দি হয়েছি। সদলবলে শীঘ্র পাঁচ নম্বর চন্দ্র বসু স্ট্রিটে এসে আমাদের উদ্ধার আর বিজনকে গ্রেপ্তার করুন।

বিজন বোধহয় কান পেতে ছিল, হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, হায় রে, আবার আমার ভুল হয়ে গেল! ঘরে যে টেলিফোন আছে, সেটা আমার মনে ছিল না।

এবারে ঘরের ভিতর থেকে একসঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠল জয়ন্ত ও মানিক। ঘরের বাইরে আর কেউ হাসবার চেষ্টা করলে না।

মিনিট দশেকের মধ্যে ঘটনাস্থলে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব! জয়ন্ত মানিকের উদ্ধারলাভ। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বিজনের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু আপশোশ করে বললেন, কী ঘ্যাঁচড়া মাছ রে বাবা! যতবার জাল ফেলি ততবার ছিঁড়ে পালিয়ে যায়।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু আমার হাতের সব তাস এখনও ফুরোয়নি।

—ফুরোয়নি নাকি?

—না। বরানগরের বাড়িতে বিজনের দলের যে লোকটা ধরা পড়েছিল সে এখন কোথায়?

—হাজতে।

—তাকে আজকেই ছেড়ে দিন।

—কী বলছ?

—ঠিকই বলছি। চুনোপুঁটিকে ছেড়ে দিলে যদি রুই-কাতলা ধরা পড়ে আপত্তি কী!

—তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না।

—মানে খুব সহজ! হাজতে সে একলা আছে?

—হ্যাঁ।

—আরও ভালো। প্রহরী যদি হাজতঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে সরে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই সে চম্পট দেবে।

—সেও সন্দেহ করবে না যে, তাকে আমরা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিচ্ছি।

—তারপর?

—তারপর তার পিছনে চর মোতায়েন রাখুন। সে কোথায় যায় দেখুন।

—তুমি কী ভাবছ, সে সোজা বিজনের কাছে গিয়েই হাজির হবে!

—নিশ্চয়ই বিজনের কোনও গুপ্ত আস্তানা আছে। তার পক্ষে কলকাতা যখন বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সেইখানেই গিয়ে সে গা-ঢাকা দেয়। বিজন এখন বেশ কিছুদিন বাইরে মুখ দেখাতে সাহস করবে বলে মনে হচ্ছে না। দলের লোকজন নিয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। আমাদের বন্দি নিশ্চয়ই তার গুপ্ত আস্তানার খবর রাখে। তার পক্ষে সেইখানে যাওয়াই স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ জয়ন্ত, তোমার অনুমান সঙ্গত।

—তাহলে এ উপায় অবলম্বন করুন।

—তথাস্তু।

উনিশ

অপচয়ে ঠ্যাং

পরদিন প্রভাতেই জয়ন্তের ঘরের টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল টুং টুং টুং।

রিসিভার ধরেই জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবুর প্রফুল্ল কণ্ঠে সম্বোধন—ভো ভো জয়ন্ত!

—গলা শুনেই বুঝেছি খবর শুভ।

—অত্যন্ত এবং আশাতীত। পরে পরে ব্যাপারগুলো ঘটেছে।

—বিজনের অনুচরের হাজত থেকে পলায়ন। আমাদের চরের তার পিছন অনুসরণ। হাওড়ায় গিয়ে বিজনের অনুচরের ট্রেনে আরোহণ। পরে তার হরিহরপুরে অবতরণ। তারপর গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে একখানা বাড়িতে তার গমন।

—আপনার চর নিশ্চয়ই বিজনের দর্শন পায়নি?

—বিজনকে সে চেনে না। তবে শুনলুম, সে বাড়িতে লোক আছে আট-দশ জন।

—হরিহরপুর এখান থেকে কতদূর!

—পঁয়ত্রিশ মাইল।

—তিনখানা সেপাই ভর্তি বড়ো জিপ-গাড়ি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে যাচ্ছি। গাড়িতে তোমার আর মানিকের জন্যেও একটু জায়গা থাকবে। এর মধ্যে প্রস্তুত হতে পারবে তো?

—আমি কোনও সময়েই অপ্রস্তুত নই।

—সোনার ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।

হরিহরপুর ছোটো গ্রাম। কিন্তু তার প্রান্তে আছে প্রকাণ্ড একটা প্রান্তর এবং প্রান্তরের প্রান্ত গিয়ে মিশেছে দিকচক্রবাল রেখায়।

প্রান্তরের মাঝখানে চারিদিকে কড়াইশুঁটি-ক্ষেত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রাচীরে ঘেরা নিঃসঙ্গ বাড়ি। তার পিছন দিকে গুটি-আষ্টেক নারিকেলগাছ করেছে নিরালা একটি কুঞ্জ রচনা, তা ছাড়া আর কোনও গাছপালা নেই তার আশে-পাশে।

তীক্ষ্ণ চক্ষে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করে জয়ন্ত বলল, সুন্দরবাবু বিজয় আস্তানা নির্বাচন করেছে চমৎকার। পুলিশ যে কোনও দিক দিয়েই অগ্রসর হোক, লুকিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। সে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই, দিনের আলোয় আমরা যদি ওদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করি, শেষপর্যন্ত ওরা ধরা পড়লেও আমাদের লোকক্ষয় অনিবার্য, কারণ ওরা বাধা দেবেই, আর ওদের সঙ্গেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে, ওদের বাড়িটাও প্রায় কেল্লার মতো। রাত্রির অন্ধকারের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত।

সন্ধ্যার ছায়ায় পৃথিবী হয়ে উঠল অস্পষ্ট। তারপর এল রাত্রি। চারিদিকে চাঁদের আলোর নীরব খেলা। ইতিমধ্যে একবার গলা সাধা হয়ে গেল শৃগাল-সভ্যদের।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—চারিদিক থেকে অগ্রসর হল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, নিঃশব্দে—প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। বাড়ির প্রাচীরের কাছে এসেও পাওয়া গেল না কারুর সাড়াশব্দ। বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দেখা গেল বাহির থেকে তালা বন্ধ।

কয়েকজন লোক প্রাচীর লঙ্ঘন করে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরে তারা ফিরে বললে, বাড়ির ভিতর কেউ নেই।

মানিক বললে, যা সন্দেহ করেছিলুম, তাই। আমাদের মতো ওরাও নিয়েছে রাত্রির সুযোগ। সবাই লম্বা দিয়েছে! আমাদের হল লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং।

জয়ন্ত হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, এত সহজে হতাশ হয়ো না মানিক। ওরা টের পেয়েছে আমাদের অস্তিত্ব। কিন্তু পালিয়ে ওরা যাবে কোথায়? বড়ো জোর স্টেশনের দিকে। তিন ঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে একখানা মাত্র স্লো প্যাসেঞ্জার আসবে সন্ধ্যার পর, সাড়ে আটটার সময়ে। এখন ঘড়িতে আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। স্টেশনে মোটরে চড়ে পৌঁছতে আমাদের সাত-আট মিনিটের বেশি দেরি লাগবে না। এসব লোকাল ট্রেন প্রায়ই দেরি করে স্টেশনে আসে। হয়তো এখনও আমরা গিয়ে ট্রেন ধরতে পারব।

বায়ুবেগে ছুটল তিনখানা জিপগাড়ি। কিন্তু তারা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেই দেখল, একখানা ট্রেন ধূম উদগার করে দৌড় মারলে সশব্দে। তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেন এসেছিল আজ প্রায় যথাসময়েই।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, দৌড়ে স্টেশনে যান! পরের স্টেশনে খবর দিন, ট্রেন ওখানে গেলেই যেন আটকে রাখা হয়। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটবে আমাদের গাড়ি তিনখানা। খুব সম্ভব পরের স্টেশনে আগে গিয়ে পৌঁছব আমরাই।

সুন্দরবাবু স্টেশনে ছুটলেন। এবং কাজ সেরে ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠলেন। আকাশের গায়ে চলন্ত ট্রেনের ধোঁয়ার রেখা লক্ষ করে পুলিশের গাড়িগুলো হল ঝড়ের বেগে ধাবমান। তারপর চলল ট্রেনের সঙ্গে মোটরের দৌড়পাল্লা। খানিক পরে মোটরই এগিয়ে গেল ট্রেনকে পিছনে ফেলে।

ধু ধু মাঠের মধ্যে আচম্বিতে ট্রেনের গতি হয়ে গেল স্তব্ধ।

মানিক বললে, ব্যাপার কী!

জয়ন্ত বললে, বিজনের নতুন কীর্তি! অ্যালার্মের শিকল টেনে গাড়ি থামিয়ে ওরা এইখান থেকেই লম্বা দিতে চায়। ওরা বুঝে নিয়েছে পরের স্টেশন ওদের পক্ষে নিরাপদ হবে না। সুন্দরবাবু সবাইকে নিয়ে টপ করে নেমে পড়ুন। ওই দেখুন, অপরাধীরাও ট্রেন থেকে নেমে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ওই সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা, আর ওই লোকটা বোধহয় বিজন। ওরা দূরের ওই জঙ্গলটা লক্ষ্য করে ছুটছে। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছবার আগেই ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে, নইলে ওরা পূর্বেকার মতো আমাদের কলা দেখাতে পারে।

এবারে গাড়ির সঙ্গে গাড়ির নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের দৌড় প্রতিযোগিতা।

হঠাৎ রোগা-ঢ্যাঙা লোকটা এবং বিজন দৌড় থামিয়ে ফিরে দাঁড়াল—

তাদের দুজনেরই হাতে বন্দুক।

জয়ন্ত বললে, হুঁশিয়ার!

ওরা বন্দুক ছুড়ছে। মানিক অস্ফুট আর্তনাদ করে মাঠের উপরে পড়ে গেল। তার ডান পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি।

সুন্দরবাবু সক্রোধে বললেন, কী! আবার গুলি ছোড়া হচ্ছে! তবে দেখ মজাটা! এই সেপাই, চালাও গুলি—চালাও গুলি!

পুলিশের এক ডজন বন্দুক সগর্জনে অগ্নি ও ধূম উদগীরণ করতে লাগল বারংবার! মাঠের মধ্যে এই অকল্পিত খণ্ডযুদ্ধ দেখে চারিদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল কাতারে কাতারে লোকজন।

জয়ন্ত বললে, বিজন, আত্মসমর্পণ করো।

একটা মরা গাছের কাটা গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বন্দুকে কার্তুজ ভরতে লাগল বিজন। সে কোনও জবাব দিল না।

জয়ন্ত বলল, বিজন শুনছ!

বিজন বলল, হ্যাঁ শুনছি। তোমাদের কথার উত্তর হচ্ছে, এই—সে বন্দুক তুলে জয়ন্তের দিকে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

পাশেই ছিল একটা মস্ত উইঢিপি। জয়ন্ত এক লাফে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হা-হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, কী হে বীরপুঙ্গ, লুকোলি কেন?

জয়ন্ত শান্ত স্বরেই বললে, বিজনবিহারী তুমিও তো লুকোতে কসুর করোনি। আর কেন যাদু, লীলাখেলা বন্ধ করো! এগিয়ে এসো, দুই হাতে লোহার বালা পরো। আমরা তোমাকে গুলি করে মারতে চাই না, ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে চাই।

বিজন বন্দুকের নল ফেরালে সুন্দরবাবুর দিকে।

সুন্দরবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে করলেন প্রকাণ্ড একটা লম্ফত্যাগ। তিনি একেবারে সেপাইদের দলের ভিতর গিয়ে পড়লেন। তারপর দারুণ ক্রোধে চিৎকার করে বললেন, কী আবার আমাকে বধ করবার চেষ্টা! মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো ছোটোলোকটাকে, এক্ষুনি গুলি করে মেরে ফ্যালো।

জয়ন্ত বললে, বিজন, বন্দুক ছাড়ো।

—প্রাণ থাকতে নয়।

—তাহলে প্রাণ তোমার যাবেই। দলে আমরা ভারী।

—হোক। যতক্ষণ বাঁচব, যুদ্ধ করব।

—তবে মরো।

সেপাইরা গুলিবৃষ্টি বন্ধ করেছিল। তারা আবার বন্দুক ছুড়তে লাগল এবং গর্জন করতে লাগল বিজনের বন্দুকও।

কিন্তু যুদ্ধ বেশিক্ষণ চলল না। অধিকাংশ অপরাধীই একে একে ভূতলশায়ী হল—কেউ নিহত, কেউ আহত।

সগর্বে মাথা তুলে এবং বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেবল বিজনবিহারী। গুলিহীন বন্দুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাতে নিলে সে রিভলভার। মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব।

জয়ন্ত বললে, আবার বলছি, এখনও আত্মসমর্পণ করো বিজন!

দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করে কর্কশ-কোমল কণ্ঠে বিজন বললে, পুঁচকে গোয়েন্দা আমি আত্মসমর্পণ করব! আমি করব জীবন সমর্পণ। চোখের পলক না পড়তেই রিভলভারের নলটা নিজের কপালের পাশে রেখে সে ঘোড়া টিপে দিলে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন—সঙ্গে সঙ্গে বিজনবিহারীর পতন।

জয়ন্ত বললে, ওকে বাধা দিতে পারলুম না। তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে যে মাতুল হত্যা করে, তার মরা উচিত ছিল ফাঁসিকাঠেই দোল খেয়ে। যাক মানিক, তোমার কি বেশি লেগেছে ভাই?

—না জয়ন্ত। কিন্তু যা বলেছিলাম। আমার হল অপচয়ে ঠ্যাং!

সুন্দরবাবু সহানুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে দুঃখিতভাবে বললেন, হুম!

হত্যাকারী-হত্যাকাহিনী

এক

নতুন মামলা

সবে ফুটিফুটি করছে ভোরের আলো। কলকাতার গড়ের মাঠ।

গাছে-গাছে বিহঙ্গদের ঐকতান। এখানে ওখানে অশ্বচালনা করছে ইংরেজ ঘোড়সওয়াররা। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে আরও অনেকে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের পরিচিত তিনটি মানুষকে—শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর মানিক ও পুলিসকর্মচারি সুন্দরবাবু।

শরৎ ঋতুর জন্যে আসর ছেড়ে দেবার আগে শেষ-বর্ষা যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করে গিয়েছে গতকল্য রাত্রে। সারা শহরটা ঘণ্টাকয়েক ধরে স্নান করেছে এমন ঘন বৃষ্টিধারায় যে, পথের আর মাঠের অনেক জায়গাতেই এখনও থইথই করছে ঘোলাটে জল। রাত দুটোর পরে বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু গড়ের মাঠ এখনও প্রাতর্ভ্রমণের উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

তবু প্রভাতী ভ্রমণে যারা অভ্যস্ত, এ সময়টার তারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। জয়ন্ত ও মানিক হচ্ছে এই জাতীয় জীব। কেবল সূর্যোদয়ের আগে নয়, সূর্যাস্তের পরেও এক বার করে মুক্ত আকাশ-বাতাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তারা যেন আত্মস্থ হ'তে পারে না।

এ বাতিক কোনোদিনই ছিল না সুন্দরবাবুর। কিন্তু ইদানীং তাঁর উদরদেশের বিপুলতা এতটা বেড়ে উঠেছে যে, চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম—অর্থাৎ অন্তত মাইল দুয়েক পদব্রজে ভ্রমণ করতে। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আজ-কাল তাঁকে হতে হয়েছে জয়ন্তদের ভ্রমণসঙ্গী।

ভুঁড়ির দ্বারা ভারাক্রান্ত সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ পদচালনা করবার পর শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'মানিক, পথের আর মাঠের অবস্থা দেখছ তো?'

—'দেখছি।'

—'আজ আমি কিছুতেই বেড়াতে আসতুম না।'

—'তবে এলেন কেন?'

—'তোমাদের উৎপাতে দায়ে পড়ে। ভোর না হতেই, কাক-চিল না ডাকতেই বাসায় ঢুকে তুমি গাধার মতো যে ডাকাডাকি শুরু করলে! বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত চমকে জেগে উঠল। তোমার গর্দভকণ্ঠকে রুদ্ধ করবার জন্যেই আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।'

মানিক মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'আমাকে গাধা বলে আপনি যদি খুশি হন, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু বাইরে এসে কি দেখছেন না, আজকের দিনটির বিশেষত্ব?'

—'হুম্! বিশেষত্বের মধ্যে তো দেখছি কেবল জল, কাদা আর পিছল পথ!'

—'আর কিছুই দেখছেন না?'

—'উঁহুম্!'

—'তাহলে আপনার চোখের দোষ হয়েছে!'

—'চোখের কিছু দোষ হয়নি। তাহলে আমি চশমা পরতুম।'

মানিক এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দেখছেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতভম্বের মতো বললেন, 'কিছুই দেখছি না তো!'

—'ভালো করে চেয়ে দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে স্বর্গ নেমে এসেছে মাটির কোলে।'

—'মানে?'

—'স্বর্গ বললে আমরা কোন দিকে তাকাই? আকাশের দিকে। দেখুন, মাঠের যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেইখানে নেমে এসেছে টুকরো আকাশের সুন্দর নীলিমা। একটু পরেই দেখতে পাবেন ওখানে সাঁতার কাটছে কচি রোদের কাঁচা সোনালী। আবার সন্ধ্যার পরে হয়তো ওখানে ফুটে উঠবে নতুন চাঁদের রূপোলী জ্যোৎস্নাও!'

সুন্দরবাবু দুই ভুরু তুলে বললেন, 'উঃ, ভয়ঙ্কর কাব্যি!'

জয়ন্ত এতক্ষণ নির্বাক মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'সুন্দরবাবু!'

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'কি জয়ন্ত?'

আঙুল দিয়ে এক দিক দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ওই গাছটার তলায় কি পড়ে আছে দেখছেন?'

—'একটা মানুষ শুয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। না, না, ওটা যে রক্তাক্ত দেহ!'

—'হুঁ। খুব সম্ভব ওটা মৃতদেহ! গড়ের মাঠে এমনধারা দৃশ্য নতুন নয়। এগিয়ে চলুন, ব্যাপারটা কি দেখা যাক।'

সুন্দরবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ব্যাপার আর কি, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। মানিক এতক্ষণ আমাকে গড়ের মাঠে মাটির উপরে স্বর্গে দেখাবার চেষ্টা করছিল। এখন সামলাও বাবা স্বর্গের ঠেলা, স্বর্গের বদলে ঘাড়ে হয়তো চাপল একটা নতুন খুনের মামলা!'

মানিক বললে, 'সত্যি সুন্দরবাবু, আপনার সঙ্গে আমিও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। এমন বৃষ্টিস্নাত অম্লান প্রভাত, মনে মনে করছিলুম কাব্যালোচনা, চোখের সামনে দেখছিলুম মাটির ফ্রেমে বাঁধানো জলের পটে নীলিমার ছবি, হঠাৎ কিনা রক্তাক্ত মৃত্যু এসে এক মুহূর্তে বিলুপ্ত করে দিলে সমস্ত সৌন্দর্য! নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে!'

সকলে তখন গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষের নিশ্চেষ্ট দেহ। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সেটা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তার মুখের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়—কপালের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের সমস্ত অংশটা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল চাপবাঁধা রক্তের মধ্যে খানিকটা ছিন্ন-ভিন্ন মাংস! বীভৎস দৃশ্য!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, আত্মহত্যার নয়, হত্যার মামলা!'

জয়ন্ত বললে, 'কেউ ছররা ভরা সট-গান ছুড়ে এই বেচারার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে। আর বন্দুকটা ছোড়া হয়েছে কাছ থেকেই, নইলে মুখটা অমন ভাবে উড়ে যেত না।' সে বসে পড়ে মৃতদেহের উপরে হাত রেখে আবার বললে, 'দেহটা এখনও একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। খুব সম্ভব এর মৃত্যু হয়েছে ঘণ্টা-কয়েক আগেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'চারিদিকে কত রক্ত দেখেছ?'

—'তার মানে একে হত্যা করা হয়েছে এইখানেই। ঘটনাটা ঘটেছে বৃষ্টি থামবার পরে কোনও এক সময়ে। নইলে কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতে মৃতদেহের সমস্ত রক্ত ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রাত দুটোর আগে বৃষ্টি থামেনি। আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি সকাল সাড়ে পাঁচটার পরে। হত্যাকারী কাজ সেরেছে এরই মধ্যে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এটা হচ্ছে যুবকের লাশ। জুতো আর পরনের কাপড় দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রবংশের যুবক। কিন্তু ওর গায়ে রয়েছে কেবল একটা গেঞ্জি। গভীর রাতে কেবল গেঞ্জি পরে ভদ্রবংশের কোনও যুবক কি গড়ের মাঠে বেড়াতে আসে?'

—'হত ব্যক্তিকে বোধহয় কোনও গাড়িতে করে এখানে আনা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর হয়তো তার উপরকার জামাটা অপরাধী খুলে নিয়ে গিয়েছে।'

—'কেন?'

—'সহজে যাতে সনাক্ত করা না যায়।'

মানিক হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে তার উপরে চোখ বুলিয়ে বললে, 'কিন্তু খুব সম্ভব হত্যাকারী দেখতে পায়নি যে, এই খামখানা মৃত ব্যক্তির জামার পকেট থেকে এখানে পড়ে গিয়েছে।'

—'খামের উপরে কারুর নাম আর ঠিকানা আছে?'

—'হ্যাঁ। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট। কলিকাতা।'

জয়ন্ত বললে, 'এটা একটা বড়ো সূত্র। ওটা হয় হত ব্যক্তির, নয় হত্যাকারীর নাম আর ঠিকানা। খামের ভিতরে কোনও চিঠি আছে?'

'আছে। এই যে!' চিঠিখানা পড়ে মানিক বললে, 'বাজে চিঠি। শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোড থেকে এক চন্দ্রনাথ রায় মণিমোহনকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করেছে।'

'বাজে চিঠি নয়, ওটাও কাজে লাগবে। সুন্দরবাবু, আপনার পায়ের কাছে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে না?'

সুন্দরবাবু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! কিন্তু ব্যাগের ভিতরে খালি ঢু-ঢু!'

জয়ন্ত আশেপাশে জমি পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'দেখছি এখানে বৃষ্টিভেজা মাটির উপরে তিন জন লোকের আলাদা আলাদা পায়ের ছাপ আছে। ধরলুম তিন জনের এক জন হচ্ছে নিহত মণিমোহন। তাহলে আর দুজন কে? নিশ্চয়ই হত্যাকারী! সুন্দরবাবু, পদচিহ্নগুলোর প্লাস্টারের ছাপ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু খুশি মুখে বললেন, 'প্রথমেই যখন এতগুলো সূত্র পাওয়া গেল, মামলাটার কিনারা করতে বেশি বেগ পেতে হবে না বোধহয়।'

জয়ন্ত বললে, 'আরও একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই। হত ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের চিনত, তাদের বিশ্বাস করত, নইলে রাত দুটোর পর গড়ের মাঠে এমন নির্জন জায়গায় তাদের সঙ্গে বিনা বাধায় আসতে রাজি হত না! আপাতত এই পর্যন্ত। সূর্য উঠেছে, চারিদিকে লোকের ভীড়, চলো মানিক, স্থানান্তরে প্রস্থান করি!'

দুই
হেঁয়ালির মামলা

মণিমোহন বসু। দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিট।

সুন্দরবাবু যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুন্দরবাবুর ধরাচূড়াপরা চেহারা দেখেই চমকে উঠল তাঁর দুই চক্ষু।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'এ বাড়িতে মণিমোহন বসু বলে কেউ থাকে?'

—'থাকে। মণি আমার ছেলে।'

—'আপনার নাম কি?'

—'মহেন্দ্রমোহন বসু।'

—'মণিবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

—'মণি কাল থেকে বাড়িতে ফেরেনি। তার জন্যে আমরা বড়ো ভাবছি। সে তো না বলে বাইরে কখনও রাত কাটায় না!'

—'বটে! আপনার ছেলের বয়স কত?'

—'আটাশ।'

—'গায়ের রং?'

—'উজ্জ্বল শ্যাম।'

—'একহারা, কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বাইরে যাবার সময়ে সে কি রকম পোষাক পরেছিল?'

—'সিল্কের পাঞ্জাবি। সরু কালাপেড়ে মিলের ধুতি। পায়ে ব্রাউন রঙের জুতো।'

—'আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

—'কোথায়?'

—'মর্গে।'

মহেন্দ্রের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সবিস্ময়ে বললেন, 'মর্গে!'

—'আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু না বলেও আর উপায় নেই। আজ আমরা একটা লাশ পেয়েছি। সেটা আপনার ছেলের দেহও হতে পারে।'

মহেন্দ্র টলে পড়ে যাচ্ছিল, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দুইহাতে তাকে ধরে ফেললেন। তারপর বললেন, 'স্থির হোন মহেন্দ্রবাবু! আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের অনুমান হয়তো সত্য নয়।'

শবাধারে গিয়ে সন্দেহ কিন্তু সত্য বলেই প্রমাণিত হল। যদিও শবের মুখ চেনবার উপায় নেই, তবু দেহটা পরীক্ষা করেই মহেন্দ্র সক্রন্দনে বলে উঠল, 'এ আমারই মণিমোহন!'

খানিক পরে শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে যখন কতকটা সামলে নিলে, সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছেলে কি কাজ করত?'

—'মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করত, কিন্তু আপাতত বেকার হয়ে বসেছিল।'

—'দেখুন মহেন্দ্রবাবু, আমাদের ধারণা, মণিমোহন যাদের হাতে মারা পড়েছে, সে তাদের চিনত। সে কি রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, আপনি কি তা জানতেন?'

—'যতদূর জানি, আমার ছেলের অসৎ সংসর্গ ছিল না। সে নিজেও ছিল শান্ত-শিষ্ট, অতি ভদ্র, মেলামেশাও করত সেই রকম সব লোকের সঙ্গে।'

—'তার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আপনি চেনেন?'

—'চিনি। কিন্তু তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল একজনের সঙ্গে। তার নাম নন্দলাল মিত্র।'

—'ঠিকানা?'

—'পাঁচ নম্বর রায় রোড।'

—'তার সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে পারেন?'

—'নন্দ বড়ো ভালো ছেলে। মণিরই সমবয়সী। কে, সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার।'

—'হুম্। মণিমোহনের আর কোনও বন্ধুর কথা বলতে পারেন?'

—'বিশেষ কিছু খবর রাখি না। নন্দের মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে আর কারুকে জানি না। তবে হালে—'

—'বলুন, থামলেন কেন?'

—'হালে মণির সঙ্গে একটি লোকের আলাপ হয়েছে বটে। লোকটিকে আমার ভালো লাগত না।'

—'ভালো লাগত না! কেন?'

—'প্রকৃতির কথা জানি না, তবে আকৃতি ছিল তার বিরুদ্ধে। অত্যন্ত কাঠখোট্টা চেহারা!'

—'তার নাম?'

—'চন্দ্রনাথ রায়।'

নাম শুনেই সুন্দরবাবু জাগ্রত হয়ে উঠলেন অধিকতর। ঘটনাস্থলে যে পত্র পাওয়া গিয়েছে, তারও লেখকের নাম চন্দ্রনাথ রায়। তিনি বললেন, 'চন্দ্রনাথ কি শালিখার পঁচিশ নম্বর সুন্দর সেন রোডে থাকে?'

—'ঠিক ঠিকানা জানি না, তবে সে শালিখাতেই থাকে বটে।'

—'তার চেহারাটা বর্ণনা করুন।'

—'রং কালো। আর এক পোঁচ বেশি কালো হলেই সে আফ্রিকার কাফ্রিদের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত। মাথায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। রীতিমতো বলবান দোহারা দেহ। খ্যাঁদা নাক, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, দৃষ্টি তীক্ষ্ন। গোঁফ-দাড়ি কামানো। সর্বদাই কোট-প্যান্ট পরে আর হাতে থাকে একগাছা মোটা বাঘমারা লাঠি। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আধখানা নেই।'

—'হুম্! যে বর্ণনা পেলুম, ভিড়ের ভিতর থেকেও চন্দ্রনাথকে চিনে নিতে দেরি লাগবে না। আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, কেবল চেহারার জন্যেই কি আপনার চন্দ্রনাথকে ভালো লাগত না?'

—'না। তার গলার আওয়াজ যেমন কর্কশ কথাবার্তাও তেমনই রুক্ষ। তার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকেই মণির প্রকৃতিও যেন একটু একটু বদলে গিয়েছিল।'

—'কি রকম?'

—'তার হাবভাব-ব্যবহার কিঞ্চিৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছিল।'

—'তার মানে?'

—'সে যেন সর্বদাই কি চিন্তা করত। বাড়ির কারুর সঙ্গে বেশি কথা কইত না, আমাকেও যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত। আমরা ভাবতুম বেকার বসে আছে বলেই সে এমন মনমরা হয়ে আছে।'

—'তাও অসম্ভব নয় তো!'

—'খুব সম্ভব তাই। কিন্তু মণির আরও একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছিলুম।'

—'বলুন।'

—'মণি আগে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ফিরে আসত। কিন্তু ইদানিং বাড়ি ফিরতে তার রাত দশ-এগারোটা হয়ে যেত।'

—'কত দিন থেকে এটা লক্ষ্য করেছেন?'

—'চন্দ্রনাথের সঙ্গে মণির আলাপ হওয়ার পর থেকেই।'

—'চন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়েছে কত দিন?'

—'সে প্রথমে আমার বাড়িতে আসে মাস পাঁচেক আগে।'

—'মহেন্দ্রবাবু, মৃতদেহের মুখ নেই বললেই হয়। ও দেহ যে আপনারই পুত্রের, সেটা ঠিক চিনতে পেরেছেন তো?'

মহেন্দ্র ভগ্ন স্বরে বললে, 'কোনও সন্দেহ নেই—কোনও সন্দেহ নেই! আমি বাপ, নিজের ছেলের দেহ চিনতে পারব না! সেই রং, সেই গড়ন, আঙুলে পলার আংটি,

পায়ে সেই জুতো! পরনের কাপড়েও আমাদের ধোপার মার্কা! বেশ বুঝেছি মশাই, আমারই কপাল পুড়েছে!' বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

সুন্দরবাবু মমতাভরা গলায় বললেন, 'নিয়তি বড়ো নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই মহেন্দ্রবাবু! আপাতত আমার আর কোনও জিজ্ঞাস্য নেই, আপনি বাড়ি যেতে পারেন।'

মহেন্দ্রের প্রস্থান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবুর চিন্তা ঃ হুম্! শালখের চন্দ্রনাথ! রঙে কাফ্রি, নামে চন্দ্র—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! আকৃতি-প্রকৃতি নাকি সন্দেহজনক! এইবারে তোমার দিকেই আমি পদচালনা করব!

কিন্তু সুন্দরবাবুকে বেশি দূর পদচালনা করতে হল না। শবাগারের বাইরে আসতেই তিনি দেখলেন, একখানা মোটর এসে সেইখানে দাঁড়ালো এবং গাড়ির ভিতর থেকে নেমে পড়ল একটি যুবক। তার মুখের ভাব উদ্বিগ্ন।

সে বললে, 'আপনিই তো সুন্দরবাবু?'

—'হুম্।'

—'আমি আপনার কাছেই এসেছি।'

—'কেন?'

—'আমার ছোটো ভাই নন্দলাল কাল সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। থানায় সেই খবর দিতে গিয়ে শুনলুম, আপনারা না কি একটি মৃতদেহ পেয়েছেন। আমি কি দেহটা একবার দেখতে পাই না?'

সুন্দরবাবু শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'সেটা দেখে কি হবে?'

—'দেহটা যদি নন্দের হয়?'

—'অসম্ভব! তা সনাক্ত হয়ে গিয়েছে।'

—'কে সনাক্ত করেছে?'

—'যার লাশ, তার বাপ নিজে।'

—'ভগবান করুন, ও দেহ যেন অন্যেরই হয়! তবু দয়া করে আমাকে কি একটি বার দেখবার সুযোগ দেবেন না?'

—'আরে বাবা, খুনের মামলা—যা আমার চোখের বালি! আমার মগজে এখন বোঁ-বোঁ করে চরকি ঘুরছে, এসব বাজে ব্যাপার ভালো লাগছে না, আমি চললুম।' বিরক্ত মুখে সুন্দরবাবু প্রস্থানোদ্যত হলেন।

যুবক হাত জোড় করে বিনীতভরে বললে, 'দয়া করুন, একটি বার দেখতে দিন!'

সুন্দরবাবু নাচার ভাবে বললেন, 'আপনি তো ভারি ছিনে জোঁক দেখছি! বেশ চলুন, নয়ন সার্থক করুন!'

মৃতদেহের উপরে অর্ধ মিনিট কাল চক্ষু বুলিয়েই যুবক চিৎকার করে কেঁদে উঠল!

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আরে গেল, খামোকা কান্নাকাটি কেন?'

—'এই তো আমার ভাই নন্দলালের দেহ! যা ভেবেছি তাই, আমাদেরই সর্বনাশ হয়েছে?'

—'আরে, আপনি পাগল না কি!'

—'আমি পাগল নই মশাই, পাগল নই! বিশ্বাস না হয় ওর কাপড় তুলে দেখুন, জানুর উপরে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ আছে!'

অবিশ্বাস ভয়ে সুন্দরবাবু এগিয়ে গেলেন। কাপড় সরানো হল। জানুর উপরে সত্য সত্যই রয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের চিহ্ন!

ধাঁ করে তাঁর মাথায় জাগল একটা নূতন সন্দেহ! আগ্রহের সঙ্গে তিনি শুধোলেন, 'আপনার ভাইয়ের নাম নন্দলাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নন্দলাল মিত্র?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বাড়ি পাঁচ নম্বর রায় রোডে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তার এক বিশেষ বন্ধুর নাম মণিমোহন বসু?'

—'হ্যাঁ।'

সুন্দরবাবু টুপি খুলে নিজের টাক চুলকোতে চুলকোতে হতভম্বের মতো বললেন, 'এ কি কাণ্ড রে বাবা! এটা খুনের মামলা, না হেঁয়ালির মামলা?'

তিন

চন্দ্রনাথ রায়

প্রভাতী চায়ের আসরের জন্যে দুজনে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে হন্তদন্তের মতো সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

জয়ন্ত শুধোলে, 'এ কি সুন্দরবাবু, হাঁপাচ্ছেন কেন?'

—'দৌড়ে দৌড়ে আসছি যে!'

—'দৌড়ে দৌড়ে?'

—'প্রায়! পাছে চা-পানের মাহেন্দ্রক্ষণটি উৎরে না যায়, সেই ভয়ে সবেগে পদচালনা করেছিলুম। গেল তিন দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ভয় হল আসর থেকে বুঝি নাম কাটা যায়!'

—'তাহলে গেল তিন দিন বাড়িতে বসে চা-পান করেছেন?'

—'পাগল! আমার বাড়ির চা ছুঁই না। সে যেন নালতের মতন, আর দোকানের চা-ও খাই না, সে যেন ঘোলাটে গঙ্গাজল। আজ তিন দিন আমার চা খাওয়াই হয়নি।'

—'ব্যাপার কি?'

—'গড়ের মাঠের সেই হত্যাকাণ্ডের ঠেলা। হন্তদন্তের মতো খালি তদন্ত আর

তদন্ত আর তদন্ত করতে হয়েছে। সূত্রও পেয়েছি ঢের, কিন্তু সব সূত্র জোট পাকিয়ে গিয়েছে।'

—'আচ্ছা, আগে চেয়ারাসীন হোন। উদরদেশের চায়ের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করুন। তার পর সব কথা শুনব।'

সুন্দরবাবু আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আজ চায়ের সঙ্গে নতুন কোনও বিশেষত্ব আছে না কি?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমেরিকান ব্রেকফাস্ট বিস্কুট, টোম্যাটো-ওমলেট আর কলাইসুটির কচুরি।'

—'ব্যাস, ব্যাস, ব্যাস! ওইতেই আমি খুশি হতে পারব, সত্যি বলতে কি ভায়া, বাড়ির চা আরও ভালো লাগে না কেন জানো? তোমাদের বউদিদিটি দ্রৌপদী নন, নূতন-পুরাতন যে কোনও রন্ধনে তিনি একেবারে মূর্তিমতী নিরাশা! হুম্, কথায় বলে চা-টা! চায়ের সঙ্গে কিছু-কিছু 'টা' না থাকলে চা কখনও সুপেয় হয়?

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আমাদের বউদিদি দ্রৌপদী হলে আপনি কি তাঁকে সহ্য করতে পারতেন?'

—'মানে?'

—'দ্রৌপদীর ছিল পাঁচ জন স্বামী।'

—'ধ্যেৎ, খালি কথার ছল ধরা! আচ্ছা জয়ন্ত, টোম্যাটো-ওমলেট পদার্থটা কি?'

—'ওমলেটের ভিতরে মাখনে ভাজা কুচি কুচি পেঁয়াজ আর টোম্যাটো পুর। খুব সহজ রান্না।'

—'কিন্তু খেতে মজা তো? নাম শুনেই জিভে জল আসছে! কোথায় হে শ্রীমধুসূদন, শীঘ্র দেখা দাও।'

ট্রে হাতে মধু-ভৃত্যের প্রবেশ। চা-পর্ব শেষ হবার আগে সুন্দরবাবু আর বাক্যালাপ করবার চেষ্টা করলেন না।

জয়ন্ত বললে, 'অতঃপর?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমরা মর্গের ব্যাপারটা তো আগেই শুনেছ? বেশ, তারপর থেকেই আরম্ভ করি। শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম। কিন্তু তার বাসা খালি, বাহির থেকে তালাবন্ধ। খবর নিয়ে জানলুম, হত্যাকাণ্ডের দিন বৈকালে একখানা কালো রঙের বুইক সিডান গাড়িতে চড়ে সে চলে গিয়েছে।'

—'গাড়িখানা তার নিজের।'

—'হ্যাঁ। গাড়ি চালাত নিজেই।'

—'বাসায় কি সে একলা থাকত?'

—'হ্যাঁ। অর্থাৎ চাকর-বামুন-দারোয়ান নিয়ে একলা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও অদৃশ্য হয়েছে। এইটেই সন্দেহজনক।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে বললে, 'অসাধারণ মামলা বটে!

মহেন্দ্রবাবু লাশ দেখে বলছেন সেটা তাঁর পুত্র মণিমোহনের মৃতদেহ। আর এক জন বলছে, সে দেহটা হচ্ছে তার দাদা নন্দলালের। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথামতো লাশের জানুর কাপড় তুলে দেখা গিয়েছে দুই ইঞ্চি লম্বা কালো জড়ুলের দাগ। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাই ঠিক। কারণ লাশের মুখ নেই, মহেন্দ্রবাবুর ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনলুম মণিমোহনের আর নন্দলালের দেহের রং, উচ্চতা আর গড়ন-পিটন না কি প্রায় একই রকম।'

—'এখানে প্রশ্ন ওঠে অনেকগুলো। ধরলুম হত ব্যক্তি হচ্ছে নন্দলাল। তাহলে হত্যাকারী কে? মণিমোহন? কিন্তু মহেন্দ্রের মুখে প্রকাশ, নন্দ ছিল তার সব চেয়ে বড়ো বন্ধু। সে অমন বন্ধুকে হত্যা করবে কেন? ঘটনাস্থলে আর এক ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেইই বা কে? শালিখার চন্দ্রনাথ? সে এখানে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছে? নিশ্চয়ই মহাত্মার ভূমিকায় নয়, কারণ সেও গা-ঢাকা দিয়েছে। হ্যাঁ, ভালো কথা। যে তিন জন লোকের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে, তার প্লাষ্টারের ছাঁচ তোলা হয়েছে?'

—'হয়েছে।'

—'তারপর?'

—'একজোড়া ছাপের সঙ্গে হত ব্যক্তির—অর্থাৎ নন্দের জুতো অবিকল খাপ খেয়ে গিয়েছে। মণিমোহনের বাসা থেকে তার জুতোও সংগ্রহ করেছি। তার জুতোও মিলে গিয়েছে আর এক জোড়া ছাপের সঙ্গে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে পাইনি, তাই ছাপের সঙ্গে তার জুতোও মেলানো হয়নি।'

—'কিন্তু আপনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। পদচিহ্নের ছাপ বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করছে দুটো সত্য। প্রথমতঃ, ঘটনাস্থলে মণিমোহনের উপস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ, হত ব্যক্তি নন্দ ছাড়া আর কেউ নয়। মামলাটা অনেকখানি হালকা হয়ে এল না কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু মামলাটার আর কোনও কোনও দিক আরও ভারি হয়ে উঠেছে।'

—'কি রকম?'

—'বলেছি তো, নন্দ ছিল কে. সরকারের বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার! সেখানে এক নতুন কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

—'বুঝেছি। চুরি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেমন করে বুঝলে?'

জয়ন্ত রূপোর ডিবে বার করে এক টিপ নস্য গ্রহণ করলে। মানিক কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালে। সে জানে, এই নস্যগ্রহণটা হচ্ছে তার বন্ধুর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ।

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কেমন করে বুঝলে তুমি?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'এটা আমার আন্দাজ মাত্র।'

—'বা রে, এমন যুক্তিহীন আন্দাজের কোনও কারণ নেই?'

—'কারণ আছে বইকি! আমার আন্দাজ মোটেই যুক্তিহীন নয়। লোকে অকারণে

নরহত্যা করে না। কিন্তু গোড়া থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমি কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নন্দ মারা পড়েছে ওই টাকার জন্যেই। যদিও হত ব্যক্তি বিখ্যাত এক জুয়েলারি ফার্মের কেসিয়ার শুনে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি মারছিল। এখন জানা গেল, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। সুন্দরবাবু, আন্দাজে আমি আরও একটা কথা বলতে পারি।'

—'পারো না কি? বলে ফ্যালো।'

—'কে. সরকারের ফার্ম থেকে মোটা রকম চুরি হয়ে গিয়েছে, আর চুরির জন্যে দায়ি ওই হত নন্দলাল।'

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে তালে তালে তিন বার তালি দিয়ে বললেন, 'ঠিক! ঠিক! ঠিক! বা রে আন্দাজ। বা রে জয়ন্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি।'

—'কে. সরকার নিজে থানায় অভিযোগ করতে এসেছিলেন।'

—'কিসের অভিযোগ?'

—'চুরি বলেই ধরে নাও। চুরিটা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের দিনেই। কে. সরকারের বসত-বাড়ি আর দোকান এক জায়গায় নয়। তাঁর দোকান বন্ধ হত সন্ধ্যার মুখে। সেদিন দোকান বন্ধ হবার আগেই জরুরি কাজের জন্যে তাঁকে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিল। কথা ছিল, দোকানের ক্যাস নিয়ে দোকান বন্ধ করে নন্দ তাঁর বড়িতে জমা দিয়ে আসবে। কিন্তু নন্দ সেদিন ক্যাস নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।'

—'টাকার পরিমাণ কত?'

—'তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ।'

—'নন্দের সম্বন্ধে কে. সরকারের ধারণা কি?'

—'অত্যন্ত উচ্চ। বললেন, নন্দ অতিশয় বিশ্বাসী আর সৎচরিত্র, তার দ্বারা কোনোরকম অসৎ কাজ হওয়া অসম্ভব।'

—'ঠিক। আমারও ওই বিশ্বাস।'

—'জয়ন্ত, আরও একটা এমন ব্যাপার জানা গিয়েছে, যা তুমিও কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না।'

—'পদে পদে আন্দাজে ঢিল ছোড়ার অভ্যাস আমার নেই।'

—'লাশের পরনে যে গেঞ্জি আর কাপড় ছিল, তা নন্দের নয়, মণিমোহনের।'

—'শুনে বিস্মিত হলুম না। নন্দের পরনে কোট বা অন্য কোনও রকম জামাও ছিল, অপরাধীরা তা খুলে নিয়ে গিয়েছে, প্রথম দিনেই আন্দাজে এ কথাটা আপনাকে বলেছিলুম। সুন্দরবাবু, দোকান থেকে নন্দ সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিল?'

—'হ্যাঁ, তার বাসা দোকান থেকে কে, সরকারের বাড়িতে যাবার পথেই পড়ে। বাসায় এসে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে আবার সে বেরিয়ে যায়—'

'হ্যাঁ; মালিকের বাড়িতে টাকাগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে। তার পরের ঘটনাগুলোও আমি কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি।'

—'হুম্, আবার আন্দাজ!'

—'নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মণিমোহনের সঙ্গে দেখা। আমার বিশ্বাস, সে ছিল শালিখার চন্দ্রনাথের কালো রঙের বুইক সিডানগাড়িতে, আর গাড়ি চালাচ্ছিল চন্দ্রনাথ নিজেই। মণিমোহনের আহ্বানে নন্দ গাড়িতে এসে ওঠে। নন্দের কাছে কত টাকা আছে প্রকাশ পায়। তার পরের ব্যাপারগুলো ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। নন্দ গাড়িতে ওঠে সন্ধ্যার সময়ে, কিন্তু মারা পড়ে অন্তত রাত দুটোর পরে। মাঝের কয়েক ঘণ্টার হিসাব হত্যাকারী ধরা না পড়লে জানা যাবে না। নন্দকে হত্যা করে চন্দ্রনাথ আর মণিমোহন—আমার বিশ্বাস, আসল হত্যাকারী হচ্ছে চন্দ্রনাথই, মণিমোহন বোধহয় স্বহস্তে বন্ধুহত্যা করেনি। তারপর মৃতদেহের জামা-কাপড় খুলে পরিয়ে দেওয়া হল মণিমোহনের জামা-কাপড়। লাশের মুখ নিশ্চিহ্ন, তার দৈর্ঘ্য, রং আর গড়ন-পিটন প্রায় মণিমোহনের মতোই তার পরনেও রইল মণিমোহনের জামা-কাপড়। সুতরাং সেটা মণিমোহনের দেহ বলেই সনাক্ত হওয়া স্বাভাবিক। সকলে বুঝবে, কোনও অজানা ব্যক্তি অজানা কারণে মণিমোহনকে হত্যা করেছে। ওদিকে পুলিস ভাবত নন্দ জুলেয়ারি ফার্মের টাকা চুরি করে পলাতক হয়েছে। অপরাধীরা খুব মাথা খেলিয়ে প্ল্যান তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ করে দিলে তুচ্ছ একটা জড়ুল আর কতকগুলো পায়ের দাগ। সুন্দরবাবু, এইবারে আপনার মামলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তো?'

সুন্দরবাবু বললেন 'তা তো গেল দেখছি। কিন্তু—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু আমার আর একটা আন্দাজ এই। কাজ হাঁসিলের পর চন্দ্রনাথ হয়তো মণিমোহনকেও হত্যা করেছে।'

—'হুম্, আন্দাজেই তুমি কেল্লা ফতে করবে দেখছি। এখন চন্দ্রনাথকে হস্তগত করবার উপায়টাও আন্দাজে বাৎলে দিতে পারো?'

এমন সময়ে মধু ঘরে ঢুকে বললে, 'শালখে থেকে একটি বাবু দেখা করতে এসেছেন।'

জয়ন্ত সচমকে বললে, 'শালখে থেকে? নাম বলেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ রায়।'

সুন্দরবাবু বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হুম্!'

চার

অভিনেতা চন্দ্রনাথ

সত্য সত্যই কল্পনাতীত। পলাতক আসামি চন্দ্রনাথ নিজেই দেখা করতে এসেছে তাদের সঙ্গে! মামলাটার গোড়াতেই কোনও গলদ নেই তো? অবাক হয়ে ভাবতে লাগল জয়ন্ত ও মানিক।

সুন্দরবাবু খুসিভরা গলায় বললেন, 'আমাদের ভাগ্য ভালো। শিকার নিজেই জালে পড়তে চায়।'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এখন চন্দ্রনাথকে নিয়ে কি করবেন?'

—'আগে করব গোটাকয় প্রশ্ন। তারপর তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার জুতো মিলিয়ে দেখব।'

জয়ন্ত বললে, 'মধু, বাবুকে এখানে নিয়ে এসো।'

মধুর প্রস্থান। অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে চন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু লক্ষ্য করে দেখলেন মণিমোহনের পিতার বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মিলে যায় অবিকল। প্রায় ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ। নাক খ্যাঁদা কুৎকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। পরনে প্যান্ট-কোট, হাতে বেজায় মোটা লাঠি। বাঁ হাতে আধখানা কাটা কড়ে আঙুল।

দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে ও সপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকেই চন্দ্রনাথ বললে, 'আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

—'আমার সঙ্গে? কিন্তু এখানে কেন? এটা কি আমার ডেরা?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়! কে না জানে বাঘ থাকে বনে আর পুলিশ থাকে থানায়? আমি থানাতেও ধরনা দিতে গিয়েছিলুম। সেখানে থেকেই পেয়েছি এখানকার ঠিকানা।'

লোকটার প্রগলভতা দেখে সুন্দরবাবুর মনে হল ক্রোধের সঞ্চার। কিন্তু সে ভাব দমন করে তিনি শুধোলেন, 'আপনার নাম চন্দ্রনাথ রায়?'

—'তাই তো আমি জানি, লোকেও আমাকে ওই বলেই ডাকে বটে।'

তার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ বাড়িয়ে তুললে সুন্দরবাবু ক্রোধের মাত্রা। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় তিনি বললেন, 'মশায়ের পিতৃদেব কি অন্ধ ছিলেন?'

—'উঁহু।'

—'তবে মশাইকে কি স্বচক্ষে দেখে তিনি আপনার নাম রাখেননি?'

চন্দ্রনাথ নীরস কণ্ঠে হেসে উঠল—হা হা হা হা হা হা। বললে, 'ঠিক কথা। আমার গায়ের রংটা চাঁদের মতো নয় বটে! হ্যাঁ, বাবার যে ভ্রম হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু কি করব বলুন, পিতা হচ্ছেন দেবতা-স্থানীয়, পুত্র হয়ে তাঁর ভ্রম আর শোধরাবার চেষ্টা করিনি।'

—'বেশ, তাহলে বাপের সুপুত্রের মতন ওই চেয়ারখানার উপরে একটু বসুন দেখি, আমি গোটা কয় প্রশ্ন করতে চাই।'

চেয়ারখানা হড় হড় করে সুন্দরবাবুর খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসে পড়ল। তারপর মোটা লাঠিগাছা পদযুগলের মাঝখানে রেখে তার উপরে দুই হস্ত স্থাপন করে বললে, 'আপনার প্রশ্নগুলো শ্রবণ করবার জন্যে আমার দুই কর্ণ অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।'

এ কি রকম ট্যাটা অপরাধী, পুলিস দেখে দূরে সরে দাঁড়ানো দূরের কথা, পুলিসের

গা ঘেঁষে বসতে ভয় পায় না! ভালো কথা নয় তো, যা দিন কাল পড়েছে, সাবধানের মার নেই। সুন্দরবাবু নিজেই তফাতে সরে গিয়ে দখল করলেন অন্য একখানা চেয়ার।

চন্দ্রনাথ হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে আপনার দেখা করবার শখ হল কেন?'

—'শুনলুম, সেদিন আমার বাড়িতে আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন।'

—'বেড়াতে নয়, অপনাকে খুঁজতে।'

—'বেশ তাই। কিন্তু কেন?'

—'নন্দলাল মিত্র খুন হয়েছে জানেন?'

—'কে নন্দলাল?'

—'একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে! মণিমোহন-বসুর বিশেষ বন্ধু নন্দলালকে চেনেন না নাকি?'

—'না, আমি কেবল মণিমোহনকেই জানি।'

—'বটে। গেল পঁচিশে তারিখে মণিমোহনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

—'না।'

—'ওই তারিখে আপনি কোথায় ছিলেন?'

—'সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলুম। তার পর হঠাৎ এক আত্মীয়ের মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশে চলে যেতে হয়।'

—'চাকর-বামুন-দারোয়ান সবাইকে নিয়ে?'

—'নিশ্চয়! একলা মানুষ, আমাকে দেখবে কে?'

—'আপনার দেশ কোথায়?'

—'এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ভজনপুর গ্রামে।'

—'আপনার সট-গান আছে?'

—'আছে। অন্য রকম বন্দুকও আছে।'

—'মণিমোহন আপনার বন্ধু।'

—'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু?'

—'তাকে আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন, পঁচিশে তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল?'

—'না।'

—'ওই তারিখের পর তার সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?'

—'না।'

—'সে এখন কোথায় আছে?'

—'জানি না।'

—'তার আর কোথায় আসা-যাওয়া আছে?'

—'ভগবান জানেন।'

—'ঘটনাস্থলে তিন জন লোকের পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। মণিমোহনের আর নন্দলালের! কিন্তু তৃতীয় পদচিহ্নের অধিকারী কে, তা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'শুনে দুঃখিত হলুম।'

—'আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি চুলোয় গেলেও আমি দুঃখিত হব না। হুম্! আমি এখন ভাবছি, কে এই তৃতীয় ব্যক্তি?'

—'বলতে পারব না, আমি গণৎকার নই।'

—'আরে গেল, এ প্রশ্ন কি আপনাকে করছি? আমি কথা কইছি নিজেব সঙ্গেই। নিজের মনের ভিতরেই আমি উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করছি।'

—'চেষ্টা করুন। আপনার আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

—'আপাতত নেই।'

—'তাহলে আমি গাত্রোত্থান করতে পারি?'

—'নিশ্চয়ই! এইবারে আপনাকে গাত্রোত্থান করতে হবেই।'

—'তবে এই গাত্রোত্থান করলুম।'

সুন্দরবাবুও আসন ত্যাগ করে বললেন, 'এইবারে আপনাকে আমার সঙ্গে যাত্রা করতে হবে।'

—'কোথায়?'

—'থানায়।'

চন্দ্রনাথ সভয়ে বলে উঠল, 'থানায়? কেন?'

—'যথাসময়েই সেটা জানতে পারবেন।'

—'আপনার সব কথারই জবাব তো দিলুম। আবার আমাকে থানায় টেনে নিয়ে যাবার কারণটা কি?'

—'কারণ? জলখাবার খাওয়াবার জন্যে নয়। ধরুন অকারণেই।'

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ যেন হারিয়ে ফেললে নিজের সমস্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততা। কাতর কণ্ঠে বললে, 'অকারণে আমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কি সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু নিজের বাহু বিস্তার করে সবলে ধারণ করলেন চন্দ্রনাথের দক্ষিণ বাহু। তারপর বললেন, 'হুম্! এখন সুড় সুড় করে আমার সঙ্গে চলুন তো! পরে ভাবা যাবে লাভ-লোকসানের কথা। আসি জয়ন্ত, আসি মানিক। খানিক পরেই ফোনে তোমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করব। আসুন, অমাবস্যার দৃশ্যমান চন্দ্র!'

চন্দ্রনাথ কলের পুতুলের মতো চলে গেল সুন্দরবাবুর সঙ্গে।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মানিক, এইবারে আমরা মতামত বিনিময় করি এসো। চন্দ্রনাথ লোকটাকে তোমার কেমন লাগল?'

—'ভালো লাগল না।'

—'ঠিক। একেবারে পয়লা নম্বরের অপরাধীর চেহারা। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?'

—'কি?

—'চন্দ্রনাথ যতক্ষণ এখানে ছিল, একবারও সোজাসুজি তোমার আর আমার দিকে তাকায়নি! অথচ সে ছিল আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কারণ মাঝে মাঝে ওই বড়ো আয়নাখানার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল আমাদের।'

—'কিন্তু সে এখানে এসেছিল কেন?'

—'অভিনয় করতে।'

—'অভিনয় করতে?'

—'হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণিত করতে।'

—'কিন্তু এ ভয়ও তো তার থাকা স্বাভাবিক যে, ঘটনাস্থলে পাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির পদচিহ্নের সঙ্গে তার নিজের পদচিহ্নও মিলে যেতে পারে?'

—'তা পারে। এইখানেই আমার কেমন খটকা লাগছে। এমন সম্ভাবনার কথা যে তারও মাথায় জাগেনি, তাকে তো এতটা নির্বোধ বলে মনে হল না। সুন্দরবাবু তো ওই জন্যেই তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেলেন।'

—'আর থানায় যাবার নামেই সে ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো হয়ে পড়ল, লক্ষ্য করেছ তো?'

—'তা আবার করিনি? কিন্তু তা হচ্ছে অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়! আসলে সে একটুও ভয় পায়নি।'

—'কেমন করে জানলে?'

—'এখানে আসবার আগে সে নিজেই তো সুন্দরবাবুর খোঁজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। সুতরাং থানায় যাবার নামে তার ভয় পাবার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। সে ভয় পায়নি, ভয়ের অভিনয় করছিল।'

—'কেন?'

—'বোধহয়, সুন্দরবাবুকে সে একেবারে অপদস্থ করতে চায়। আমার মনে হয়, সে ভালো করেই জানে যে, থানায় গিয়ে সুন্দরবাবু তার পদচিহ্ন পরীক্ষা করবেন।'

—'বল কি হে?'

—'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে জানো? ঘটনাস্থলের পদচিহ্নের সঙ্গে মিলবে না তার পদচিহ্ন। পুলিস বনবে বোকা। সে হবে সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত। নিশ্চয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে আজ সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। নইলে তার এই অভাবিত আবির্ভাবের কোনও অর্থই হয় না। যাক গে ওসব কথা। সুন্দরবাবু তো এখনও ফোন করলেন না দেখছি। আপাতত আমরা কি করি বলো তো? দুএক চাল দাবা-বোড়ে খেলবে না কি?'

—'আপত্তি নেই।'

চলল খেলা। চল্লিশ মিনিট পরে প্রথম চাল খেলা শেষ হল। আর এক চালের জন্যে তারা ঘুঁটি সাজাচ্ছে, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনযন্ত্র।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো।'

—'আমি সুন্দরবাবু।'

—'খবর কি?'

—'হুম্, সব গুলিয়ে গেল!'

—'তা তো যাবেই।'

—'মানে?'

—'মানে, চন্দ্রনাথের পদচিহ্ন পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়নি।'

—'কেমন করে জানলে?'

—'খুব সহজে। দুইয়ে দুইয়ে যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হল!'

—'ধেৎ, হেঁয়ালি ভালো লাগে না। দস্তুরমতো অপ্রস্তুত হয়েছি।'

—'ব্যাপারখানা কি?'

—'ঘটনাস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির যে জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে, চন্দ্রনাথের জুতোর ছাপের চেয়ে তা বড়ো। চন্দুরে রাসকেলটা আমার মুখের উপরে কলা দেখিয়ে হাড়-জ্বালানে হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।'

—'এটুকু তো তিন-চার মিনিটের ব্যাপার। আমাকে ফোন করতে আপনার এত দেরি হল কেন?'

—'হঠাৎ আরও দুটো খবর পেলুম। দ্বিতীয় খবরটা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।'

'—যথা—'

—'আমার সহকারী সুনীলকে নন্দলালদের পাড়ায় তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলুম। সে এসে জানালে, ও-পাড়ার এক মণিহারী দোকানের মালিক হত্যাকাণ্ডের দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিল, নন্দ পথ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে একখানা মোটর গাড়ি তার কাছে এসে থামে। গাড়ির ভিতর থেকে মণিমোহন মুখ বাড়িয়ে নন্দকে ডাকে। নন্দ গাড়িতে ওঠে গাড়িখানা চলে যায়।'

—'সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজের সঙ্গে অনেকটা মিলছে না?'

—'তা মিলছে।'

—'তারপর?'

—'গাড়ির ভিতরে দুইজন লোক ছিল, মণিমোহন আর চালক। দোকানি কিন্তু চালকের দিকে নজর দেয়নি, তাকে সনাক্ত করতে পারবে না।'

—'কালো রঙের বুইক সিডান-গাড়ি?'

—'দোকানি বলে, কালো রঙের সিডান গাড়ি বটে, কিন্তু বুইক কি ফোর্ড কি অস্টিন, তা বোঝবার মতো জ্ঞান তার নেই।'

—'গাড়ির নম্বর?'

—'দোকানি দেখেনি।'

—'সুন্দরবাবু, এ খবরে এইটুকু জানা গেল, আমার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়। এর উপর নির্ভর করে আমরা চন্দ্রনাথের কিছুই করতে পারব না, কিন্তু ধাবমান হতে পারব মণিমোহনের পিছনে।'

—'তারও একটা উপায় হয়েছে।'

—'কি রকম?'

—'দ্বিতীয় খবরটা শুনলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এক চর এসে খবর দিলে; খিদিরপুর ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে একখানা বাগানবাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সে মণিমোহনকে প্রবেশ করতে দেখেছে।'

—'কবে?'

—'আজই ভোরবেলায়।'

—'কি করতে চান?'

—'বাড়িখানাকে চারিদিক থেকে পাহারা দেবার জন্যে জন কয় লোক পাঠিয়েছি। আমিও সদলবলে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। তোমরাও আসছ তো?'

—'সে কথা আবার বলতে!'

পাঁচ

ভদ্রেশ্বর ভদ্র

খিদিরপুর। গঙ্গার ধার। বেলা প্রায় বারোটা, কিন্তু সূর্যকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু-এক পশলা বৃষ্টি।

সদলবলে সুন্দরবাবু একখানা বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক।

পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাগানের মাঝখানে একখানা সেকেলে বাড়ি। সেকেলে বাড়ি বটে, কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের গুণে এখনও অব্যবহার্য হয়ে পড়েনি। বাগানের অংশটা নামেই বাগান, কোথাও ফুলগাছের কোনও চিহ্নও নেই। মধুলোভী মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে উড়ে আসে বটে, কিন্তু হতাশ হয়ে আবার উড়ে পালায়। সেখানে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা গুড়িওয়ালা বুড়ো বুড়ো গাছ—আম কাঁটাল জাম জামরুল তাল ও নারিকেল প্রভৃতি। আর আছে অগুন্তি কলাগাছের ভিড়। আর আছে শাকসব্জির ছোটো বড়ো ক্ষেত।

মাণিক বললে, 'বাগানের মালিক যে শৌখীন নন, ফুলগাছের অভাবই তা প্রমাণিত করছে। কিন্তু তিনি যে আমাদের সুন্দরবাবুর মতোই উদর-পরায়ণ তাতে আর একটুকুও সন্দেহ নেই।'

সুন্দরবাবুর দুই চক্ষে ফুটল বিস্ফোরণের লক্ষণ। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'একটুও সন্দেহ না থাকার কারণ?'

'এখানে ফুলগাছ নেই, খালি ফলগাছ। এখানে শাক-সব্জির ক্ষেতে সুগন্ধ না থাকতে পারে, রন্ধনশালার মাল-মশলা আছে যথেষ্ট। আপনি কি রন্ধনশালাকে দুনিয়ার সব-চেয়ে ভালো জায়গা বলে মনে করেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ওই যে জগন্নাথ আসছে! আমি এখন ওর সঙ্গেই কথা কইতে চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'জগন্নাথ কে?'

—'আমাদের চর। সেই-ই তো মণিমোহনকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।'

জগন্নাথ কাছে এসে নমস্কার করে বললে, 'বড়োবাবু, মণিমোহন এখনও ওই বাড়ির ভিতরেই আছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখো জগন্নাথ, আজ সকালেই এক বেটা চন্দুরে আমাকে যে ঠকানটা ঠকিয়ে গিয়েছে তা আর বলবার নয়। এক দিনে আমি দু-দুবার ঠকতে চাই না। তুমি মণিমোহকে ঠিক দেখেছ তো?'

—'আজ্ঞে, মণিমোহনকে আগে আমি অনেক বার দেখেছি, তার চেহারা কি ভুলতে পারি? তবে আগে তাকে কোনোদিন কোট পরতে দেখিনি, আজ সে কোট পরে আছে।'

—'হুম্, পুলিসের চোখে ধোঁকা দেবার চেষ্টা আর কি? আরে বাবা, এত সহজে কি পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যায়?'

মানিক বললে, 'বিশেষ আমাদের সুন্দরবাবুকে!'

সে কথা সুন্দরবাবু গায়ে মাখলেন না।

হঠাৎ জগন্নাথ চমকে চাপা-গলায় বলে উঠল, 'বড়োবাবু—বড়োবাবু! ওই দেখুন মণিমোহনকে! আমাদের দিকেই আসছে!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সবাই গাছ কি ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দাও! এত সহজে কেল্লা ফতে! বরাত ভালো!'

মণিমোহন নতমুখে অসঙ্কোচে এগিয়ে এল, কোনও সন্দেহ করতে পারলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একহারা কিন্তু বলিষ্ঠ দেহ। মুখশ্রীও মন্দ নয়।

হঠাৎ চারিদিক থেকে পুলিশের দল তাকে ঘিরে ফেললে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবুজি এখন ভিজে বেড়ালের মতো আমাদের সঙ্গে সুড়সুড় করে আসবে কি?'

—'কোথায়?'

—'আমাদের পোশাক দেখে বুঝতে পারছ না, আমরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই?'

—'আপনারা তো পুলিস!'

—'আর তুমি তো মণিমোহন বসু?'

—'আজ্ঞে না, ও-নাম আমি জীবনে শুনিনি।'

জগন্নাথ এগিয়ে এসে বললে, না, 'তুমিই মণিমোহন। তোমাকে আমি খুব চিনি।'

—'আমার নাম ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

—'হুম্, আবার নাম ভাঁড়ানো হয়েছে? কিন্তু ও-প্যাঁচটা খুবই পুরোনো, ধোপে ট্যাকে না। ভদ্রেশ্বর ভদ্র! কোনও আধুনিক ভদ্রলোকই ও-রকম নাম ধারণ করতে পারে না। যাক, ও কথা। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও দেখি। এ বাগানবাড়ির মালিক নিশ্চয়ই তুমি নও?'

—'না। আমি ভাড়াটে। বাগানবাড়ির মালিক হচ্ছেন চন্দ্রনাথবাবু।'

—'কে?'

—'বাবু চন্দ্রনাথ রায়। তিনি শালখেয় থাকেন।'

সুন্দরবাবু একটি ছোটোখাটো লাফ মেরে বললেন, 'শুনছ জয়ন্ত? এখানে আবার সেই অলক্ষুণে চন্দুরে! বাপু ভদ্রেশ্বর, তাহলে তুমি মণিমোহন ছাড়া আর কেউ নও!'

—'আমি ভদ্রেশ্বর ভদ্র।'

—'বেশ, তোমার ভদ্রতার দৌড় কত বুঝতে দেরি লাগবে না। এ বাড়িখানা তুমি ভাড়া নিয়েছ কেন?'

—'আমার মিছরির কারখানা আছে। আর আছে আমার এক বন্ধুর মোটরের গ্যারাজ। সেখানে মোটর মেরামত হয়। আমি তারও অংশীদার।'

—'তাই না কি মণিমোহন? তুমি এখন একজন বিজনেসম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করতে চাও?'

মণিমোহন হাসতে লাগল।

সুন্দরবাবু খেপে গিয়ে বললেন, 'কে তোমাকে অমন করে হাসতে শিখিয়ে দিলে? আজ সকালে চন্দুরেটাও ঠিক ওই রকম হাড়-জ্বালানে হাসি হেসে আমাকে ঠাট্টা করেছে। আর তুমি হাসবেই বা কেন? পুলিস কি হাস্যকর জীব?'

মণিমোহন বললে, 'ভদ্রেশ্বরের ঘাড়ে মণিমোহন নাম চাপিয়ে দিলে ভদ্রেশ্বরের হাসি পাবে না কেন?'

—'তুমিই যে মণিমোহন, সেটা থানায় গিয়েই আমি প্রমাণ করে দেব। এই বাড়িতে আরো কত লোক আছে?'

মণিমোহন বললে, 'আজ রবিবার, কারখানা বন্ধ। বাড়ির ভিতরে ঝি-চাকর রাঁধুনী ছাড়া আর কেউ নেই।'

সুন্দরবাবু তাঁর সহকারী ইনস্পেক্টারকে ডেকে বললেন, 'তুমি লোকজন নিয়ে খানাতল্লাসি কর। বাড়ির ভিতর থেকে কারুকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। আর জগন্নাথ!'

—'আজ্ঞে!'

—'তুমি দশ নম্বর বলাই শীল স্ট্রিটে মণিমোহনের বাড়িতে যাও। মণির বাবা মহেন্দ্রবাবুকে গিয়ে বলবে, তাঁর ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে সঙ্গে করে থানায় ফিরে যাবে। চলো মণিমোহন, তুমি কতবড়ো ঘুঘু এইবারে সেই পরীক্ষাই হবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক!'

মণিমোহন বললে, 'বেশ মজা তো! কোন অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন তাও আমি জানতে পারব না?'

—'সব জেনে-শুনে ন্যাকা সেজো না মণিমোহন! গেল পঁচিশে তারিখে রাত্রিবেলায় গড়ের মাঠে তুমি আর একজন লোকের সঙ্গে নন্দলাল মিত্রকে খুন করেছ। ঘটনাস্থলে তোমাদের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।'

মণিমোহন আবার হাসতে লাগল।

—'ফের হাসছ?'

—'পুলিসের মুখে রূপকথা শুনলে কার না হাসি পায়?'

—'রূপকথা মানে?'

—'কে এই নন্দলাল? ডি. এল. রায়ের হাসির কবিতার সেই বিখ্যাত নন্দলাল নয় তো? কিন্তু কে তাকে খুন করলে? তার কথা পড়ে আমরাই তো হেসে খুন হতুম!'

—'আবার রসিকতার চেষ্টা হচ্ছে? সেপাই, এই রসিক ব্যক্তিকে আমার গাড়িতে টেনে নিয়ে যাও তো!'

মণিমোহন বললে, 'টেনে নিয়ে যেতে হবে না। আমি জড় পদার্থ নই, সচল পদযুগলের সাহায্যে নিজেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি।'

—'তাই চলো তবে। এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যাব না। আমরা এখানকার খানাতল্লাসে যোগ দিতে চাই।'

সুন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ আবার কি শখ?'

—'শখ নয়, খেয়াল। মণিমোহন বাবু, আপনার এখানে ফোন আছে?'

—'আছে। কিন্তু কেন?'

—'হয়তো ব্যবহার করবার দরকার হবে।'

মণিমোহনের মুখের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা দুর্ভাবনার ভাব। সে সহজ স্বরেই বললে, 'বেশ, ব্যবহার করবেন—তবে কি না, যথামূল্যে।'

—'যথামূল্য কেন, দ্বিগুণ মূল্য দিতে রাজি আছি। অগ্রিম।'

—'পরে পেলেও চলবে। আপাতত আমি সুন্দরবাবুর দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। আসুন সুন্দরবাবু, অকারণে বিলম্ব করছেন কেন?'

সুন্দরবাবুর মাথা কেমন গুলিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। জয়ন্ত কেন এখানে থাকতে চায়—কাকে সে ফোন করতে চায়? আর মণিমোহনটা কি পাঁড়ঘুঘু রে বাবা, খুনের আসামি হয়েও থানায় যাবার জন্যে পুলিসকেই তাড়া লাগাচ্ছে!

এই সব ভাবতে ভাবতে সুন্দরবাবু প্রস্থান করলেন।

পরের দৃশ্য থানায়। চেয়ারাসীন সুন্দরবাবু। দুই জন পাহারাওয়ালার মাঝখানে দণ্ডায়মান মণিমোহন।

মণিমোহন বললে, 'পরীক্ষা শুরু করতে আজ্ঞা হোক।'

—'হুম্‌, ভারি ব্যস্ত যে! তোমার বাবার জন্যেও একটু অপেক্ষা করতে পারছ না?'

—'আমার বাবা!'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই তোমার বাবা এখানে আসবেন।'

—'মশাই কি ভূত নামাতেও জানেন?'

—'তার মানে?'

—'আমার বাবা স্বর্গে। সেখানে থেকে কেমন করে তাঁকে এখানে আনবেন?'

—'একটু সবুর করলেই দেখতে পাবে। না, না তার আগেও আর একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে।'

—'করুন মশাই, করুন। একটা থেকে একশোটা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তার বেশি পরীক্ষা আমি দিতে পারব না।'

মনে মনে উত্তপ্তও হয়ে সুন্দরবাবু মুখে কিছু বললেন না। একটা কাগজের মোড়ক খুলে একজোড়া জুতা বার করে শুধোলেন, 'এই জুতোজোড়া চিনতে পারো?'

—'উঁহু। আমার জুতো-চেনা ব্যবসা নয়। আমি মিছরির ব্যাপারী।'

—'ঘটনাস্থলে তোমার জুতোর ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তোমায় বাড়ি থেকেই এই জুতো এনেছি—এ জুতো তোমারই। একবার জুতোজোড়া পায়ে পরো দেখি!'

মণিমোহন জুতোর ভিতরে পা গলাবার চেষ্টা করে বললে, 'এ জুতো ছোটো। এর মধ্যে পা ঢোকানো অসম্ভব।'

সুন্দরবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাওয়ালা দুজন মণিমোহনের পায়ে জোর করে জুতো পরাবার চেষ্টা করলে। তাদের চেষ্টাও সফল হল না।

সুন্দরবাবুর দুই ভুরু সঙ্কুচিত। মণিমোহনের কৌতুকহাস্য।

ঠিক সেই সময়ে জগন্নাথের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মণিমোহনের পিতা মহেন্দ্রবাবু।

অকূলে যেন কূল পেয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'মহেন্দ্রবাবু, একে চেনেন?'

মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবুর চোখ উঠল চমকে। আরও দুই পা এগিয়ে তার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে তিনি বললেন, 'না, এঁকে আমি চিনি না!'

—'এ কি মণিমোহন নয়?'

—'এঁকে প্রায় মণিমোহনের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি আমার পুত্র নন।'

সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি যেন চুপসে গেল ছ্যাঁদা বেলুনের মতন। এবং ঠিক সেই সঙ্গেই বেজে উঠল টেলিফোনযন্ত্র। বিরক্তিভরে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যালো।'

রিসিভারের ভিতর দিয়ে জয়ন্তের কণ্ঠ ভেসে এল—'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন!'

সুন্দরবাবুর চুপসেযাওয়া ভুঁড়ি আবার ফুলে উঠল। একসঙ্গে রিসিভার ও চেয়ার ত্যাগ করে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সেপাই! আসামিকে লকআপে নিয়ে যাও! এ বেটাও এক ঝাঁকের আর একটা ঘুঘু। খুব হুঁসিয়ার!'

ছয়

শালখের চন্দুরে

মানিক শুধোলে, 'জয়ন্ত, এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন? আমরাও তো সুন্দরবাবুর সঙ্গেই যেতে পারতুম!'

—'যেতে তো পারতুমই, কিন্তু যাওয়া আর হল কই?'

—'তুমি কি নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছ?'

—'কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।'

—'তবে?'

—'মানে একটা সন্দেহ জাগছে।'

—'কি সন্দেহ?'

—'মণিমোহন স্বেচ্ছায় ধরা দিলে কেন?'

—'স্বেচ্ছায়?'

—'নিশ্চয়! সে খুনের মামলার পলাতক আসামি। এ বাড়িতে টেলিফোন আছে। তার বন্ধু চন্দ্রনাথ পুলিসের কার্যকলাপের কথা নিশ্চয় তাকে জানিয়েছে। এ সময়ে তার কতটা সাবধান হয়ে থাকবার কথা। তুমি কি বিশ্বাস করো, দিনেরবেলায় বাগানের ভিতরে সদলবলে পুলিসের আবির্ভাব হল, আর অতি-জাগ্রত খুনের আসামি মণিমোহন তা জানতে পারেনি? অম্লান বদনে ভেড়ার মতন সুড় সুড় করে এসে সে আত্মসমর্পণ করলে! কেবলই কি আত্মসমর্পণ? তাড়াতাড়ি থানায় যাবার জন্যে তার বিপুল আগ্রহও লক্ষ্য করলে তো?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও?'

—'এসব অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার দৃঢ় ধারণা, মণিমোহনের ইচ্ছা ছিল, তাকে গ্রেপ্তার করেই আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।'

—'এমন অদ্ভুত ইচ্ছা তার হবে কেন?'

—'সে জানে, পুলিশ গ্রেপ্তার করেও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'

—'ধেৎ, তাও কি সম্ভব! চন্দ্রনাথের কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই শুনেছে, পুলিসের কাছে তার পায়ের জুতোর ছাপ আছে।'

—'খুব সম্ভব, তার জুতোর সঙ্গে সে ছাপ মিলবে না।'

—'কি যে বলছ জয়ন্ত!'

—'খুব সম্ভব সে মণিমোহন নয়, অন্য কেউ।'

—'তুমি পাগল হয়ে গেলে না কি? পুলিসের চর জগন্নাথ আগে থাকতেই মণিমোহনকে চেনে। সে নিজে তাকে সনাক্ত করেছে।'

—'সে মণিমোহন হলে কিছুতেই যেচে ধরা দিত না। যে খুনের আসামি পুলিসের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, সে কখনও হাসতে হাসতে যেচে ধরা দেয়? অসম্ভব মানিক, অসম্ভব!'

—'কিন্তু জগন্নাথ তাকে সনাক্ত করেছে!'

—'সে মণিমোহন নয় বটে, কিন্তু হয়তো প্রায় মণিমোহনেরই মতন দেখতে।'

মাণিক বিস্ময়ে হতবাক।

জয়ন্ত বললে, 'এ ছাড়া এমন ব্যাপারের আর কোনও অর্থই হয় না।' এই বাড়ির ভিতর নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে। তাই জাল মণিমোহন আমাদের বিপথে চালনা করে এই বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়।'

—'কিন্তু সুন্দরবাবু বিপথগামী হলেও এখনও আমরা যথাস্থানেই বর্তমান আছি।'

—'হ্যাঁ মানিক। রহস্যভেদের ভারগ্রহণ করব আমরাই।'

—'কেমন করে?'

—'তা জানি না। ঐ যে সাব-ইনস্পেক্টার পরেশ আমাদের দিকেই আসছেন। ওঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খানাতল্লাসির ফল সন্তোষজনক হয়নি।...কি পরেশবাবু, কতখানি অগ্রসর হলেন?'

পরেশ হতাশ ভাবে বললে, 'অগ্রসর কি মশাই, এখন আমাদেরও সুন্দরবাবুর পশ্চাদগামী হতে হবে।'

—'খানাতল্লাস করে সন্দেহজনক কিছুই পেলেন না বুঝি?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'তাই থানায় ফিরে যেতে চান?'

—'তা ছাড়া আর কি! এখানে বসে আর অশ্বডিম্বে তা দিয়ে কি হবে? এর চেয়ে বাড়িতে ফিরে ভেরেণ্ডা ভাজা ভালো।'

—'বাড়ির লোকজনদের পরীক্ষা করেছেন?'

—'করেছি। লোকজন তো ভারি! দুটো বেহারি চাকর, একটা উড়িয়া বামুন, একটা বুড়ি, আর একটা ছুঁড়ি ঝি। ছুঁড়িটা দেশ থেকে নতুন এসেছে, এত লজ্জা যে কথা কইতে কি মুখের ঘোমটা খুলতেও নারাজ।'

—'আপনার লোকজনরা কোথায়?'

—'তাদের গাড়িতে গিয়ে বসতে বলে আমি আপনাদের ডাকতে এসেছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ সক্রোধে গর্জন করে বলে উঠল, 'পরেশবাবু!'

মানিক চমকে উঠল। জয়ন্ত তো সহজে এমন বিচলিত হয় না! পরেশও হতভম্ব!

—'পরেশবাবু আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। —এস মানিক, শীগগির!' মানিকের হাত ধরে টেনে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল এবং যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে পরেশকে বলে গেল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ির চারিদিকে আবার পাহারা বসান!'

পরেশ মাথা চুলকোতে চুলকোতে নিজের মনেই বললে, 'বড়োবাবু বলেন জয়ন্তবাবুর মাথায় ছিট আছে। কথাটা মিথ্যা নয়। শখের গোয়েন্দা হয়ে কিনা আসল পুলিসকে ধমক দেয়! কি আর করব, বড়োবাবুই ওঁকে মাথায় তুলেছেন!'

জয়ন্ত ও মানিক বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে দালান ও উঠান এবং দালানের কোণে দ্বিতলে ওঠবার সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তারা দোতলার দালানের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দালানের এক পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ জটলা করছিল। তাদের দেখেই তারা একেবারে চুপ মেরে গেল। একটি অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টেনে দিয়ে জড়সড়ো হয়ে রইল।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ন্ত বললে, 'তোমরা কেউ একবার এদিকে এগিয়ে এসো তো!'

একটা বুড়ি এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

জয়ন্ত শুধোলে, 'তুমি কে?'

—'আমি এ বাড়ির পুরনো ঝি।'

—'তোমার নাম কি?'

—'ভালোর মা।'

—'আর ওই মেয়েটি?'

—'উটি আমাদের নতুন ঝি। দিন তিনেক হল দেশ থেকে এসেছে।'

—'হ্যাঁগা বাছা নতুন ঝি, তোমার নামটি কি?'

সে ফিসফিস করে কি বললে শোনা গেল না।

ভালোর মা বললে, 'ওর বড়ো নজ্জা বাবু! ওর নাম হরিদাসী।'

—'আচ্ছা ভালোর মা, তোমাদের টেলিফোন আছে কোন ঘরে?'

ভালোর মা দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলিনির্দেশে। সিঁড়ির ডানপাশে টেলিফোনের ঘর।

—'দেখো ভালোর মা, তোমরা সবাই এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি টেলিফোনের কাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।'

জয়ন্তের সঙ্গে মানিক টেলিফোনের ঘরে গেল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, জয়ন্ত ফোনে সুন্দরবাবুকে এই কথাই জানিয়ে দিলে যে—'জাগ্রত হোন সুন্দরবাবু! আসল মণিমোহনকে দেখতে চান তো বায়ুবেগে আবার বাগানবাড়িতে ছুটে আসুন!'

মানিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'কোথায় আছে আসল মণিমোহন?'

—'এই বাড়িতেই।'

—'তাকে তুমি দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, তুমিও দেখবে এসো।'

দুজনে আবার দালানে গিয়ে উপস্থিত। ভালোর মা প্রভৃতি তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'ভালোর মা, তোমাদের সকলকেই আমি এইখানেই হাজির থাকতে বললুম না?'

—'আমরা তো হাজির আছি বাবু!'

—'কিন্তু হরিদাসী কোথায়?'

—'সেও আছে।'

—'কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

—'সে বাসন মাজতে গিয়েছে।'

—'কোথায়? কলতলায়?'

—'না, খিড়কির পুকুরে।'

—'তোমাদের আবার খিড়কির পুকুর আছে বুঝি? কিন্তু কোন দিক দিয়ে সে গেল? ফোন করতে করতে আমি সিঁড়ির উপরে চোখ রেখেছিলুম, ওখান দিয়ে কেউ যায়নি।'

—'আমাদের অন্দরমহলে আর একটা সিঁড়ি আছে।'

জয়ন্তের মুখে ফুটে উঠল দারুণ হতাশা, কিন্তু সহজ স্বরেই সে বললে, 'আমাকে খিড়কির পুকুরে নিয়ে চলো।'

ছোটো একটা পুকুর। নোংরা জল। ভাঙা ঘাট। চার পাড়েই আগাছার ভিড়। কিন্তু সেখানেও হরিদাসীর পাত্তা মিলল না।

জয়ন্ত কঠিন স্বরে বললে, 'এর পর তুমি কি বলতে চাও ভালোর মা?'

ভালোর মা ভয়ে ভয়ে বললে, 'কি জানি বাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, 'দেখছ মানিক, নিরেট পরেশটা বাড়ির চারিদিকে এখনও পাহারা বসায়নি? সেইই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল! তার উপরে নির্ভর করেই আমি হরিদাসীকে ছেড়ে ফোন করতে গিয়েছিলুম।'

—'কিন্তু হরিদাসী কে?'

—'সে কথার জবাব একটু পরে দেব। আপাতত ভালোর মাকে তোমার জিম্মায় রেখে আমি একটু উদ্যানভ্রমণ করে আসি।' জয়ন্ত চলে গেল দ্রুতপদে।

অনতিবিলম্বে ব্যস্ত ভাবে এসেই সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'মানিক, তুমি একা কেন?'

—'জয়ন্ত উদ্যানভ্রমণে গিয়েছে।'

—'এই কি উদ্যানভ্রমণের সময়? কোথায় তোমাদের আসল মণিমোহন?'

—'ওই যে জয়ন্ত আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

—'জয়ন্ত, মণিমোহন কোথায়?'

একখানা শাড়ি আর একটা সেমিজ মাটির উপর নিক্ষেপ করে জয়ন্ত বললে, 'জামা-কাপড় আমাদের উপহার দিয়ে মণিমোহন এখান থেকে প্রস্থান করেছে।'

—'আরে হুম্! এ তো দেখছি স্ত্রীলোকের জামা-কাপড়।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু। মণিমোহন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেই বাড়ির ভিতরে লুকিয়েছিল। তারপর নারীর খোলস ত্যাগ করে বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে লম্বা দিয়েছে। এর জন্যে দায়ি হচ্ছেন আপনাদের পরেশবাবু। তিনি সেপাইদের সরিয়ে নিয়ে না গেলে এ বিপত্তি ঘটত না।'

রাগে ফুলতে ফুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'বটে, বটে? আচ্ছা, তার সঙ্গে পরে বোঝা-পড়া করব। কিন্তু তুমি মণিমোহনকে চিনতে পারলে কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'মণিমোহন এখানে দাসী হরিদাসী সেজেছিল। সে নাকি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সবে কলকাতায় এসেছে, এখনও লজ্জা ভাঙেনি, বাইরের লোক দেখলেই ঘোমটা টেনে দিলে, আমিও কিন্তু তার আগেই চট করে হরিদাসীর মুখ দেখে নিলুম। সে মুখ হরিদাসীর মুখ নয়, সে মুখ দেখতে প্রায় ভদ্রেশ্বর ভদ্রের মতন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মহেন্দ্রবাবু বলেছেন, ভদ্রেশ্বরের মুখ নাকি প্রায় তাঁর ছেলে মণিমোহনেরই মতন দেখতে। এই জন্যেই জগন্নাথ তাকে মণিমোহন বলে ভ্রম করে আমাদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে মেরেছে।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, জগন্নাথের ভ্রমের কথা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। হরিদাসীর পুরুষত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ পেলুম তার পা লক্ষ্য করে। জানেন তো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃত পা দেখলে খুব সহজেই ধরা যায় কে নারী, আর কে নর? তার উপরে হরিদাসীর আঙুলে আর গোড়ালিতে ছিল বড়ো বড়ো কড়া। পাড়াগেঁয়ে গরিবের মেয়ে জুতো পরে না, পায়ে কড়া পড়বে কেন? সে কথা কয় ফিসফিস করে, এও সন্দেহজনক। লজ্জার ছুতো বাজে, সে নিজের পুরুষকণ্ঠ চাপা দিতে চায়। সুন্দরবাবু, আপনার সহকারী পরেশবাবু নিশ্চয় খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি, নইলে এতগুলো প্রমাণ তাঁর নজর এড়িয়ে যায়?'

সুন্দরবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সবই আমার অদৃষ্ট ভাই! জাল ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাচ্ছে বারবার! তার উপরে দেখ না, মন বলছে, শালখের ঐ চন্দুরে ব্যাটাই হচ্ছে এই দলের মোড়ল, অথচ তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও যোগাড় করতে পারছি না!'

জয়ন্ত মুখ টিপে একটু হেসে বললে, 'বিলাতি প্রবাদে বলে, 'শয়তানের কথা ভাবলেই শয়তানের উদয় হয়'! ওই দেখুন, কে আসছে।'

সুন্দরবাবু ফিরে বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন, হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে, হেলতে হেলতে, দুলতে দুলতে এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে শালিখার চন্দ্রনাথ রায়!

সাত

দু-দুজন বেপরোয়া লোক

আগতপ্রায় চন্দ্রনাথের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্!'

চট করে কি ভেবে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুন্দরবাবু, হুম্ বলে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। শীগগির বাড়ির ভিতরে যান।'

—'কেন বলো দেখি? চন্দুরের ভয়ে?'

—'ভয়ে নয়, আপনাকে থানায় একটা ফোন করতে হবে।'

—'কি জন্যে?'

—'সেপাইদের জিম্মায় ভদ্রেশ্বরকে একবার এখানে নিয়ে আসুন। আমি তাকে গুটি-কয় প্রশ্ন করব।'

—'উত্তম।'

—'দাঁড়ান। আর একটা কথা। সেই সঙ্গে মণিমোহনের জুতোর ছাঁচও পাঠিয়ে দিতে বলবেন।'

—'এখানে! কেন হে?'

—'সে কথা বলবার সময় নেই। ওই চন্দ্রনাথ এসে পড়েছে।'

সুন্দরবাবুর প্রস্থান। চন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে শুধোলে, 'সুন্দরবাবু সরে পড়লেন কেন? আমার চন্দ্রবদন দেখতে রাজি নন?'

মানিক হেসে উঠে বললে, 'মশাই কি নিজের বদনকে চন্দ্রবদন বলে সন্দেহ করেন?'

চন্দ্রনাথ আরও জোরে হেসে উঠে বললে, 'না মশাই, তা করি না। পিতার ভ্রমে নামেই আমি চন্দ্রনাথ। আর সত্যি কথা বলতে কি, চন্দ্রবদনের মালিক হলে আমি সুখী হতুম না।'

—'দুঃখিত হতেন?'

—'ঠিক তাই। পূর্ণচন্দ্রের বদন আকাশেই মানায়। ও-রকম অখণ্ডমণ্ডলাকার বদন কোনও মানুষকেই সুখী করতে পারে না। যাক সে কথা। এখন আপনারা কে বলুন দেখি? মাণিকজোড়ের মতন সর্বদাই সুন্দরবাবুর আশেপাশে বিরাজ করেন?'

—'ঠিক ধরেছেন। আমার নাম মানিকই বটে, আর জয়ন্তও আমার জোড়াই বটে।'

—'নাম তো শুনলুম, এখন পরিচয়টাও দিতে আজ্ঞা হয়।'

—'ওই সুন্দরবাবু আসছেন। আমাদের পরিচয় ওঁর মুখেই শুনতে পাবেন।'

কিন্তু সুন্দরবাবুর কাছ থেকে জয়ন্ত ও মানিকের পরিচয় জানবার জন্যে চন্দ্রনাথ কোনও আগ্রহই প্রকাশ করলে না। হাত জোড় করে নমস্কার করে যেন ব্যঙ্গের স্বরেই বললে, 'আসুন সুন্দরবাবু!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিনমস্কার করে সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'হুম্, এই আমি এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

—'কি আশ্চর্য প্রশ্ন!'

—'আশ্চর্য প্রশ্ন?'

—'কেবল আশ্চর্য নয়, যুক্তিহীন প্রশ্ন।'

—'মানে?'

—'আমি এখানে আসব না তো, আসবে কে? আপনি বোধহয় জানেন না, এ বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি?'

—'খুব জানি বাবা, খুব জানি! আর জানি বলেই তো আজ আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

—'গ্রেপ্তার করবেন? আমি এই বাড়ির মালিক বলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

—'না, না, না! বাড়ির মালিক হওয়াও অপরাধ না কি?'

—'যে বাড়ির ভিতরে খুনি আসামি আশ্রয় পায়, তার মালিক হওয়া অপরাধ বই কি!'

—'কে খুনি আসামি?'

—'আপনার সাঙাত মণিমোহন।'

—'তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কি?'

—'সে এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়েছিল।

—'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আর এ কথা সত্য হলেও আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

—'পারি না নাকি?'

—'না। আমি এই বাড়ির মালিক বটে, কিন্তু এখানা ভাড়া দিয়েছি ভদ্রেশ্বরবাবুকে। আজ তাঁর কাছে আমি ভাড়ার টাকা আদায় করতে এসেছি। ভদ্রেশ্বরবাবুর বাড়ির ভিতরে কে থাকে, আর না থাকে, তার কোনও খবরই আমি রাখি না। কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন? চুপ করে রইলেন কেন, বলুন! কোন আইন অনুসারে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করবেন সুন্দরবাবু? এখনো বোবা হয়ে রইলেন? হা হা হা হা হা! গ্রেপ্তার করবেন! গ্রেপ্তার করলেই হল!'

সুন্দরবাবুর হতাশ ভাব। অসহায়ের মতন তিনি তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত বললে, 'না চন্দ্রবাবু, আপনাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারে না। সুন্দরবাবু বলছিলেন কথার কথা মাত্র। ও-কথায় আপনি কান দেবেন না। ওই দেখুন, আর একখানা জিপ গাড়ি বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কে নামছে? ভদ্রেশ্বরবাবু না?'

সুন্দরবাবুর মুখ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে তিনি বললেন, 'ভদ্রেশ্বর বেটাও আসছে ঠিক চন্দুরের মতন বুক ফুলিয়ে বেপরোয়া ভাবে। এমন দু-দুজন বেপরোয়া লোককে সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি বাবা?'

কাছে এসে এক গাল হেসে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আরে সুন্দরবাবু মশাই, এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে বাসায় ফিরতে দেবেন, আমি তা ভাবতেই পারিনি। তারপর? আপাতত এদিককার খবর টবর সব ভালো তো?'

সুন্দরবাবু গুম ... গিয়ে বললেন, 'মোটেই ভালো নয়—অন্তত তোমার পক্ষে।'

ভদ্রেশ্বর চক্ষু বিস্ফারিত করে যেন সভয়েই বললে, 'অ্যাঁ, বলেন কি! খবর আমার বিপক্ষে?'

—'হুম্ তাই। খবর তোমার বিপক্ষেই বটে।'

—'হায়, হায়! কেন এমনটা হল?'

—'তুমি খুনি আসামি মণিমোহনকে এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলে।'

—'বটে, বটে, বটে! মণিমোহন নামধেয় সেই কাল্পনিক ব্যক্তিটি এখনও আপনার ঘাড় ছেড়ে নামতে রাজি হয়নি? একটু আগে আমিই ছিলুম মণিমোহন। এখন স্থির করেছেন, মণিমোহন এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে আছে!'

—'না, এখন সে এই বাড়ির ভিতরে নেই। সে লম্বা দিয়েছে।'

—'আপনার চোখে ধুলো দিয়ে?'

—'এ জন্যেও তুমি দায়ি! মণিমোহনের সঙ্গে তোমার চেহারার খানিকটা মিল আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তুমি যদি আমাকে ভুলিয়ে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যেতে, তাহলে মণিমোহন কখনোই পালাতে পারত না।'

—'যত দোষ, নন্দ ঘোষ। মশাই, আমার আর রূপকথা শোনবার বয়স নেই। পথ দেখুন কিংবা পথ ছাড়ুন। আমাকে বাড়ির ভিতরে যেতে দিন।'

—'বাড়ির ভিতরে যাবে মানে? মামার বাড়ির আবদার না কি? তোমাকে আমাদের সঙ্গে আবার থানায় যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'কতবার বলব? খুনি আসামিকে তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে।'

—'কোথায় সে? প্রমাণ দেখান।'

—'সে এখানে হরিদাসী নাম দিয়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল।'

ভদ্রেশ্বর আগে হা হা করে খুব খানিকটা হেসে নিলে। তারপর বললে, 'বাহবা কি বাহবা! মণিমোহন আগে ছিল শ্রীমান ভদ্রেশ্বর, কিন্তু এখন সে হয়েছে শ্রীমতী হরিদাসী? চমৎকার। মশাই গাঁজা-টাজা খান না তো?'

—'চোপরাও বদমাইস!'

—'মোটেই চুপ করব না। হরিদাসীকে আগে এখানে নিয়ে আসুন।'

—'পুলিস দেখে সে পালিয়ে গিয়েছে কেন?'

—'পালিয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ, হরিদাসী নয়, মণিমোহন? এটা কোন দেশের যুক্তি? হরিদাসী পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে, নতুন সহরে এসেছে, পুলিস দেখে সে তো ভয়ে পালিয়ে যাবেই।'

সুন্দরবাবুর অবস্থা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। জয়ন্তকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে নিম্ন স্বরে বললেন, 'ভায়া, যেমন ঐ চন্দুরেটা, তেমনি এই ভদ্রেশ্বর—দু বেটাই মাছের মতন পিছল, ধরলেও হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। তোমার কথাতেই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, এখন তুমিই ওর মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করো।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তাই করছি। আমি আর একবার বাড়ির ভিতরে যাব। ততক্ষণে আপনি মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ গাড়ি থেকে আনিয়ে রাখুন। এসো মানিক!'

দোতলার দালানে দাস-দাসীরা তখনও দাঁড়িয়েছিল।

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ ভালোর মা, হরিদাসী কি রাতে তোমার সঙ্গেই শুত?'

ভালোর মা বললে, 'না বাবু, সে শুত একলা অন্য ঘরে।'

—'বেশ, সে ঘরখানা একবার আমরা দেখতে চাই।'

ভালোর মা তাদের ভিতরমহলে নিয়ে গিয়ে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে মানিক বললে, 'জয়ন্ত, কি উদ্দেশ্যে তুমি এ ঘরখানা দেখতে চাও?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, কায়ার পিছনে ছায়ার মতন কেবল আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কোনোই লাভ নেই। যা স্বচক্ষে দেখছ আর স্বকর্ণে শুনছ, তা নিয়ে তোমারও স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহার করা উচিত। এ ঘরে যে একবার আমাদের আসতেই হবে, আমি তা আগে থাকতেই জানতুম। আর সেই জন্যেই থানা থেকে মণিমোহনের পদচিহ্নের ছাঁচ এখানে আনিয়ে রেখেছি।'

মানিক বললে, 'তুমি কি এই ঘরের মেঝেতে মণিমোহনের নূতন পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে চাও?'

—'সে চেষ্টা বোধহয় সফল হবে না।'

—'তবে?'

—'হরিদাসী যে পুরুষ, এটা আমার সন্দেহ মাত্র। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পুরুষ হলেও সে সত্য সত্যই মণিমোহন কি না? এই ঘরে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনা আছে।'

—'যুক্তিটা মাথায় ঢুকছে না।'

—'নিরেটদের মাথায় পেরেকও ঢোকে না। সুন্দরবাবুর সঙ্গগুণে তুমিও একটি নিরেট হয়ে উঠছ। নির্বোধ, হরিদাসী যদি ছদ্মবেশী পুরুষ হয় তাহলে এই ঘরে নিশ্চয়ই তার পুরুষ বেশ ধারণের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে সেগুলো যে সে নিয়ে যেতে পারেনি, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। টেবিলের উপরে রয়েছে রূপোর সিগারেটকেস আর দেশলাই। আনলায় দুখানা শাড়ি, একটা সেমিজ আর একটা ব্লাউজ ঝুলছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে দুখানা ধুতি আর দুটো পাঞ্জাবিও। মানিক, মানিক, হরিদাসী পুরুষই বটে!'

মানিক বললে, 'কিন্তু সে মণিমোহন কি না?'

সিগারেটকেসটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে মানিকের সামনে ধরে জয়ন্ত বললে, 'দেখো। এর উপরে ইংরেজিতে খোদা রয়েছে 'এম'। ওটা মণিমোহনের নামের আদ্য-অক্ষর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে কি না?'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এটা একটা বড়ো প্রমাণ।'

এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি ও এটা-ওটা-সেটা নিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে জয়ন্ত বললে, 'তবু আমি যা খুঁজছি তা পাচ্ছি না।' তারপর হেঁট হয়ে পড়ে খাটের তলায় দৃষ্টিচালনা করে জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, 'পেয়েছি মানিক, পেয়েছি। যা খুঁজছি তা পেয়েছি!'

—'কি?'

—'খাটের তলায় রয়েছে এক জোড়া জুতো। ব্যাস, আপাতত আমাদের খোঁজাখুঁজি শেষ। মাণিক, জুতোজোড়া খাটের তলা থেকে টেনে নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো।'

বাগানে নেমে এসে তারা দেখলে, ভদ্রেশ্বর তখনও সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে এবং চন্দ্রনাথ আপন মনে পায়চারি করছে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবেই।

সুন্দরবাবু অধীর স্বরে বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই ঠোঁটকাটা ভদ্রেশ্বরের লেকচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর মুখ বন্ধ করবার কোনও উপায় পেয়েছ কি?'

মৃদু হাস্য করে জয়ন্ত বললে, 'বোধহয় পেয়েছি। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচ কোথায়?'

—'এই যে ভাই, এই যে।'

খিল খিল করে হেসে উঠে ভদ্রেশ্বর বললে, 'আবার ওই ছাঁচের সঙ্গে আমার জুতো মেলানো হবে না কি?'

জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়। মণিমোহনের জুতোর ছাঁচের সঙ্গে আমি এই জুতোজোড়া মিলিয়ে দেখব।'

ভদ্রেশ্বর সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ও কার জুতো?'

ছাঁচের সঙ্গে জুতো মেলাতে মেলাতে জয়ন্ত বললে, 'বাঃ, অবিকল মিলে যাচ্ছে! হ্যাঁ এ হচ্ছে মণিমোহনের জুতো, পাওয়া গিয়েছে হরিদাসীর ঘরে।'

সুন্দরবাবু সহর্ষে এবং সদম্ভে বলে উঠলেন, 'হুম্! হুম্! বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—'

চন্দ্রনাথ সহসা বললে, 'ভদ্রেশ্বরবাবু, এখন আমি চললুম। ভাড়ার টাকার জন্যে পরে আর একদিন এসে দেখা করব।' সে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে গেল, চন্দুরেটা পালায় যে!'

জয়ন্ত বললে, 'ওকে যেতে দিন সুন্দরবাবু! চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে পারি, এমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'আপনারা আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মণিমোহনের জুতো আবিষ্কারের পরেও?'

—'ও জুতো নিশ্চয়ই হরিদাসীর ঘরে ছিল না। এ সব হচ্ছে পুলিসের কারসাজি।'

ভদ্রেশ্বরকে সজোরে একটা ধাক্কা মেরে সুন্দরবাবু বললেন, 'পাজি, ছুঁচো, এখনও বকবকানি! চুপটি মেরে থানায় চলো, তোর যা বলবার আদালতে গিয়ে বলবি!'

আচম্বিতে গুড়ুম করে একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দুই হাতে নিজের বুক চেপে ধরে মাটির উপরে বসে পড়ল।

আট

পকেট-বুকের মহিমা

সুন্দরবাবু প্রথমটা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে

ব্যস্তভাবে জয়ন্তের দিকে ছুটে গেলেন। মানিক তার আগেই জয়ন্তের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, তোমার কোথায় লাগল?'

জয়ন্ত টপ করে উঠে পড়ে একটুখানি হেসে বললে, 'বুকে।'

—'অ্যাঁ, বলো কি? বুকে গুলি লেগেছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ!'

—'কান্নার চেয়ে হাসিই আমি পছন্দ করি।'

—'না, ঠাট্টা রাখো। দেখি কোথায় লেগেছে।'

—'এই যে, বাঁ দিকের বুক-পকেটের উপরে।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে সভয়ে বলে উঠলেন, 'ও বাবা, ও যে একেবারে মোক্ষম আঘাত! গুলি পকেট ছ্যাঁদা করে ভিতরে চলে গিয়েছে।'

মানিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, কি করে তুমি এখনও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ? চলো, আমরা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

—'না মানে?'

—'না মানে, না। হাসপাতালে যাব না।'

—'সে কি হে?'

—'বন্ধু, শিকারীর লক্ষ্য অব্যর্থ বটে, কিন্তু সে লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি।'

সুন্দরবাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, 'হুম্, এ আবার কি রকম কথা?'

জয়ন্ত বুক-পকেট থেকে একখানা হৃষ্টপুষ্ট পকেট-বই বার করে বললে, 'দেখুন।'

—'কি দেখব?'

—'আততায়ীর বুলেট জামার পকেট ভেদ করে পকেট-বইয়ের মলাট আর অনেকগুলো পাতা ফুঁড়ে আর বেশি এগুতে পারেনি। আমি অক্ষত, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

মানিক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।'

—'হ্যাঁ ভাই। কিন্তু কেবল আমাকে নয়, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ভগবান এই উপায়ে বহু সৈনিকেরই প্রাণরক্ষা করেছেন।'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চমৎকৃতের মতন নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেন নিজের মতন মনেই বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, আশ্চর্য ব্যাপার!'

মানিক চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'কিন্তু বন্দুক ছুড়লে কে?'

দুইজন পাহারাওয়ালার মাঝখানে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ভদ্রেশ্বর। সে মুখ টিপে হেসে বললে, 'বন্দুকটা যে আমি ছুড়িনি অন্তত এ সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই?'

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই, চোপ। বন্দুক তুই না ছুড়ে থাকিস, তোর সাঙাত ছুড়েছে।'

—'আমার সাঙাত?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই পাজি ছুঁচো উল্লুক মণিমোহন ব্যাটা!'

—'সুন্দরবাবু, আপনাদের ওই মণিমোহন পাজি কিনা জানি না, কিন্তু সে একসঙ্গেই ছুঁচো আর উল্লুক হতে পারে না। ওরা হচ্ছে দুজাতের দুরকম জীব।'

—'চোপরাও, চোপরাও! তাহলে ছুঁচো হচ্ছিস তুই, আর উল্লুক হচ্ছে মণিমোহন।'

—'মহাশয়, আর একবার ভ্রম সংশোধন করবার আজ্ঞা হোক।'

—'ভ্রম সংশোধন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মণিমোহন উল্লুক কি না জানি না, কিন্তু আমি যে ছুঁচো নই, এ বিষয়ে আপনারা সকলে একমত হতে বাধ্য। আমি মানুষ।'

—'হুম্, হুম্! তোর মতন বক্কেশ্বর জীবনে আমি আর দেখিনি। তুই যদি ফের বক বক করিস তাহলে তোর দুই গালে মারব দুই থাবড়া!'

অতি বিনীত ভাবে মাথা কাত করে ভদ্রেশ্বর বললে, 'দয়াময়, এই আমি গাল পেতে দিলুম। থাবড়া মারবেন তো অনুগ্রহ করে ঝটিতি এগিয়ে আসুন!'

সুন্দরবাবু হার মেনে ভদ্রেশ্বরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগলেন।

ভদ্রেশ্বর তবু নাছোড়বান্দা। টিটকারি দিয়ে বললে, 'বেশি ফুলবেন না মহাশয়, আপনার দোদুল্যমান ভুঁড়ির অসুখ হতে পারে।'

সুন্দরবাবু আর পারলেন না, গর্জন করে বলে উঠলেন, 'সেপাই, সেপাই! ভদ্দুরেটাকে টানতে টানতে বাগানের বাইরে নিয়ে যাও! একেবারে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলো গে!'

ভদ্রেশ্বর বললে, 'টানাটানি হানাহানির দরকার নেই বাবা! সেপাইগণ, অগ্রসর হও! আমি পোষমানা ভেড়ার মতন তোমাদের সঙ্গে কুইকমার্চ করব।'

ভদ্রেশ্বর বিদায় হলে পর জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু তাহলে আপনার বিশ্বাস, মণিমোহনই আমার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেছে?'

—'সে নয় তো আর কে এ কাজ করতে পারে? ব্যাটা নিশ্চয়ই আড়ালে-আবডালে কোথায় লুকিয়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, সে যদি আবার গুলি ছোড়ে?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ফটকের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলুম। গুলিটা এসেছে ওই দিকের কোনো ঝোপঝাপ থেকেই।'

—'তাই না কি, তাই না কি? তাহলে তো এখনই ওদিকটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হয়!'

—'হ্যাঁ, তাই দেখুন। বাগানের বাইরে পুলিশের কড়া পাহারা আছে, আততায়ী নিশ্চয়ই এখনও বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু একেবারে থ! দূরে দেখা গেল, মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে ফটকের দিকে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রনাথ!

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'চন্দ্রনাথ এখনও বাগানের ভিতরে কি করছে?'

সুন্দরবাবু চিৎকার করে নিজের সহকারীকে ডেকে বললেন, 'পরেশ, পরেশ! লোক-জন নিয়ে দৌড়ে যাও, চন্দুরেকে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসো!'

অনতিবিলম্বে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথের পুনরাগমন। তার চেহারায় ভয়-সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্র নেই, ভাবভঙ্গি অতীব সপ্রতিভ।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে শুধোলেন, 'আপনি এতক্ষণ এখানে কি করছিলেন?'

—'হাওয়া খাচ্ছিলুম না নিশ্চয়ই!'

—'স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিন। আপনি এতক্ষণ এখানে কি করছিলেন?'

—'হঠাৎ শ্রবণ করলুম বন্দুকের শব্দ। পরমুহূর্তে দর্শন করলুম আপনার বন্ধুর পতন। তাই শুনে আর দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কি তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। সেটাও কি বে-আইনি?'

সুন্দরবাবু বুলেটবিদ্ধ পকেট-বইখানা চন্দ্রনাথের সামনে ধরে বললেন, 'দেখুন।'

—'দেখছি।'

—'এই পকেট-বই আজ জয়ন্তকে বাঁচিয়েছে।'

—'বুঝছি।'

—'এইবার আমরা আপনার জামা-কাপড় খুঁজে দেখব!'

—'কেন?'

—'দেখব, জামা-কাপড়ের মধ্যে আপনি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন কি না?'

—'কি রকম আগ্নেয়াস্ত্র? রাইফেল?'

—'জামা-কাপড়ের ভিতরে রাইফেল লুকিয়ে রাখা চলে না।'

—'তবে কি খুঁজতে চান? রিভলবার?'

—'ধরুন তাই।'

—'কিন্তু যে বুলেট দেখালেন, ওটা তো রাইফেলের বুলেট। কোনও ছোটো আকারের রাইফেলের বুলেট।'

—'তবু খুঁজে দেখব।'

—'দেখুন।'

খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ। বিপজ্জনক কিছুই পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'পরেশ, লোকজন নিয়ে ফটকের ওই দিকে যাও। ঝোপঝাপ খুঁজে রিভলবার-টিভলবার কিছু পাও কি না, দেখ।'

সদলবলে পরেশের প্রস্থান।

চন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'পাওয়া গেছে রাইফেলের বুলেট, আপনি খুঁজছেন রিভলবার!'

—'রাইফেলও পেতে পারি।'

—'আপনাদের অন্বেষণ সফল হলে খুসি হব।'

—'আপনার হাতে অমন মোটা লাঠি কেন?'

—'আমার শখ।'

—'ও-রকম শখ ভালো নয়। ভবিষ্যতে রোগা লাঠি নিয়ে আমার সামনে আসবেন।

—'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

খানিক পরে পরেশ ফিরে এসে জানালে, কোথাও কোনও রকম আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান মিলল না।

চন্দ্রনাথ সকৌতুকে বললে, 'তাহলে সুন্দরবাবু অতঃপর আমি সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করতে পারি?'

—'হুম্!'

—'নমস্কার।'

সুন্দরবাবু প্রতিনমস্কার করলেন না। চন্দ্রনাথ চলে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভাই জয়ন্ত, এই চন্দুরে আর ওই ভদ্দুরেটা দেখছি আমাকে সাত ঘাটের জল না খাইয়ে ছাড়বে না।'

জয়ন্ত বললে, 'খাওয়ায় যদি, খেতে হবে। আপাতত কি করবেন?'

—'আরও ভালো করে থানাতল্লাস। দেখি, মণিমোহন কোথাও ঘুপটি মেরে আছে কি না।'

—'আমি আর মানিক এইবারে প্রস্থান করতে চাই।'

* * * *

পরদিন প্রভাতে বেজে উঠল জয়ন্তের টেলিফোনঘণ্টা।

রিসিভার নিয়ে জয়ন্ত বললো, 'হ্যালো!'

—'আমি সুন্দরবাবু।'

—'আপনার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত কেন?'

—'আবার খুন! আবার চুরি—যে-সে চুরি নয়, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না উধাও! আবার পদচিহ্ন!'

—'পদচিহ্ন?'

—'হ্যাঁ, মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পদচিহ্ন—যাকে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি শীঘ্র এসো।'

—'আপনি কোথায়?'

—'ঘটনাস্থলে।'

—'ঠিকানা?'

—'সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট!'

নয়

অপরিচিতের সুপরিচিত পদচিহ্ন

সাতাশ নম্বর সতীশ বসু স্ট্রিট। নূতন ঘটনাস্থল। একখানা রেলিংঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ি। ফটক পার হলেই সামনে পাওয়া যায় খানিকটা খোলা জমি। সেইখানে কয়েকজন পুলিসকর্মচারি ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে চেয়ার পেতে বসেছিলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব।

সুন্দরবাবু বললেন, 'এসো ভায়া, এসো। আগে গোড়ার কথা শুনবে, না একেবারেই বাড়ির ভিতরে যাবে?'

জয়ন্ত বললে, 'আগে গৌরচন্দ্রিকাটা হয়ে যাওয়াই ভালো।'

—'হুম্ উত্তম! এই বাড়ির মালিকের নাম রামময় মণ্ডল। লোহার ব্যাপারী। ধনী ব্যক্তি। স্ট্যান্ড রোডে গদি। সংসার খুব বড় নয়—স্ত্রী, দুই মেয়ে, এক ছেলে ও এক ভাই। বহু দিন রোগ ভোগের পর স্ত্রীর দেহ ভেঙে যাওয়াতে ডাক্তাররা বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থা দেন। কাজের চাপের জন্যে রামবাবু নিজে কলকাতা ছাড়তে পারেননি, ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিমুলতলায়। হঠাৎ পরশু রাত্রে সেখান থেকে তাঁর ভাইয়ের কাছে এক টেলিগ্রাম আসে : 'বউদি মৃত্যুশয্যায়। অবিলম্বে চলে এসো।' কিন্তু টেলিগ্রাম পাবার পর ট্রেন ছিল না বলে রামবাবু পরশু রাত্রে শিমুলতলায় যেতে পারেননি। তিনি গতকল্য সকালের ট্রেনে কলকাতা ত্যাগ করেছেন, বাড়িখানা পুরাতন ও অতিবিশ্বস্ত কর্মচারি দ্বিজদাসের জিম্মায় রেখে।'

বাধা দিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'দ্বিজদাস ছাড়া বাড়ির ভিতরে আর কেউ ছিল না?'

—'ছিল। তিন জন বেয়ারা আর দুই জন দ্বারবান। বাড়িখানার দু'টো মহল—সদর আর অন্দর। বেয়ারা আর দ্বারবানদের ঘর সদরের একতলায়। দ্বিজদাস ছিল অন্দরে দোতলার একখানা ঘরে—রামবাবুর শয়নগৃহের ঠিক পাশেই। আজ সকালে দেখা যায়, দোতলার বারান্দার উপরে পড়ে আছে দ্বিজদাসের মৃতদেহ, কে তার বুকের উপরে ছোরার আঘাত করেছে। রামবাবুর ঘরের দরজার কুলুপ ভাঙা, ঘরের ভিতরকার লোহার সিন্দুক থেকে অদৃশ্য হয়েছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না।'

—'অত টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়ির ভিতরে রাখা হয়েছিল কেন?'

—'টাকাটা রামবাবুর হাতে এসেছিল পরশু বৈকালেই। রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রামবাবু দুশ্চিন্তায় পাগলের মতন হয়ে যান। কাল সকালে উঠেই তাঁকে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ছুটতে হয়েছিল বলে তিনি টাকার কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি।'

—'অপরাধীরা কি দলে ভারি ছিল?'

—'জানি না। তবে পদচিহ্ন পেয়েছি দুই জনের। ফোনেই তো বলেছি, দুই পদচিহ্নই আমাদের পরিচিত। এক চিহ্নের মালিক মণিমোহন, অন্য চিহ্নের মালিক আজও অজ্ঞাতবাস করছে।'

—'তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে?'

—'খিড়কির দরজা দিয়ে!'

—'ওখানকার দরজা কি বন্ধ ছিল না?'

—'ছিল বলেই তো শুনেছি।'

—'তবে?'

জয়ন্তের কাছে এসে সুন্দরবাবু তার কানে কানে বললেন, 'বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই

অপরাধীদের সহকারী আছে। হয়তো কোনও দ্বারবান বা বেয়ারা। সে খোঁজ পরে নেওয়া যাবে। আপাতত তাদের সবাইকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।'

—'আপনার গৌরচন্দ্রিকা শেষ হল?'

—'আর একটু বাকি আছে। কিন্তু যে সে একটু নয়, দস্তুরমতো গুরুতর একটু।'

—'অর্থাৎ?'

—'মিনিট পঁচিশ আগে আজ শিমুলতলা থেকে দ্বিজদাসের নামে রামবাবুর এই জরুরি টেলিগ্রামখানা এসেছে। পড়ে দেখো।'

টেলিগ্রামখানা নিয়ে জয়ন্ত পাঠ করলে : স্ত্রীর পীড়ার সংবাদ মিথ্যা। তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত। অবিলম্বেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।'

জয়ন্ত মৌন মুখে ভাবছে, সুন্দরবাবু বললেন, 'রামবাবুকে কলকাতা থেকে যথাসময়ে সরাবার জন্যে কেউ তাঁকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল। কে সে? নিশ্চয়ই অপরাধীদের কেউ!'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে। দেখছি অপরাধীরা রীতিমতো আট-ঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'এইবারে বাড়ির ভিতরে চলো।'

প্রথমেই তারা গিয়ে ঢুকল রামময়বাবুর শয়নগৃহে। যার ভিতর থেকে টাকা ও গহনা চুরি গিয়েছে সেটা লোহার সিন্দুক নয়, স্টিলের আলমারি।

আলমারিটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীরা কাজ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে এনেছিল একটা পোর্টেবল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, আগুনের শিখায় ইস্পাত গলিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলা হয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একেবারে ঝানু অপরাধী। এত কাণ্ডকারখানার মধ্যেও কোথাও আধখানা আঙুলের ছাপ পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মানিক একটু বিস্মিত স্বরে বললে, 'অথচ আপনি বলছেন, তারা তাদের পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে?'

—'ছাপ বলে ছাপ? স্পষ্ট স্পষ্ট ছাপ।'

জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'বড়োই সন্দেহজনক, বড়োই সন্দেহজনক!'

—'সন্দেহজনক? কেন?'

—'কেন তা জানি না। এখন বাইরে চলুন।'

বারান্দায় পড়েছিল রক্তাক্ত কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মূর্তি। হতভাগ্য দ্বিজদাসের মৃতদেহ। কাপড় সরিয়ে দেহটার উপরে দৃষ্টিপাত করে জয়ন্ত বললে, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে ছোরার এক আঘাতেই ভদ্রলোক মারা পড়েছেন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বিয়োগান্ত দৃশ্যের কতকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। খুব সম্ভব অপরাধীরা যখন রামবাবুর ঘরের দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল, সেই সময়ে দ্বিজদাসের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ব্যাপার কি জানবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত হন।'

জয়ন্ত দুই পা এগিয়ে বললে, 'এই পদচিহ্নগুলোর কথাই বলছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

ছয়জোড়া পদচিহ্ন...তার মধ্যে তিনজোড়া খুব স্পষ্ট। দুইজন লোকের কর্দমাক্ত জুতার ছাপ। চিহ্নগুলো আরম্ভ হয়েছে বারান্দায় একটা নর্দমার কাছ থেকে।

হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, গতকল্য রাত্রে এ অঞ্চলে কি বৃষ্টি পড়েছিল?'

—'নিশ্চয়ই নয়।'

—'আজ সকালের কাগজে আমিও আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখেছি। কাল কলকাতার কোথাও একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি।'

—'হয়নি তো হয়নি। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

—'মাথা থাকলেই মাথায় ব্যথা হওয়া সম্ভব।'

—'তার মানে তুমি বলতে চাও, আমার মাথা থেকেও নেই?'

—'আমি ওসব কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি এই কথাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগুন না থাকলে যেমন ধোঁয়া দেখা যায় না, তেমনি জল না পড়লে মানুষের জুতোও কর্দমাক্ত হয় না।'

চমৎকৃতভাবে সুন্দরবাবু কেবলমাত্র উচ্চারণ করলেন—'হুম্!'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ির কোনও বেয়ারাকে ডাকুন।'

একজন বেয়ারা হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, 'নর্দমার কাছে দেখছি একটা মগ আর একটা খালি বালতি রয়েছে।'

বেয়ারা বললে, 'আজ্ঞে, ব্যবহার করবার জন্যে ওখানে সব সময়েই জলভরা বালতি থাকে।'

—'কাল রাত্রেও ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! কাল সন্ধের সময়ে আমি নিজের হাতে ওখানে জলভরা বালতি রেখে গিয়েছি।'

—'কিন্তু বালতিতে এখন জল নেই।'

—'তাহলে কাল রাতে কারুর জলের দরকার হয়েছিল।'

—'আচ্ছা, তুমি যাও। সুন্দরবাবু!'

—'কি ভাই?'

—'নর্দমার কাছটা পরীক্ষা করে দেখুন। ওখানে রয়েছে পাৎলা কাদার প্রলেপ।'

—'এথেকে কি বুঝব?'

—'এই পদচিহ্নগুলো হচ্ছে প্রদর্শনীর জন্যে।'

—'প্রদর্শনী?'

—'হ্যাঁ! অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়।'

—'কারণ?'

—'কারণ বোঝবার চেষ্টা করুন আপনি। এসো মানিক, এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই।'

জয়ন্ত ও মানিকের একসঙ্গে প্রস্থান। সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

পরের দিন সকালবেলায় মানিক এসে দেখলে, কি যেন ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত তার পুস্তকাগারের মেঝের উপরে পদচারণ করছে।

মানিক বললে, 'তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করছ, কিন্তু মনে করতে পারছ না।'

—'ঠিক তাই। একখানা বইয়ের নাম কিছুতেই স্মরণে আসছে না।'

—'কি রকম বই?'

—'সেইটেই তো প্রশ্ন। বইখানা কিনে পড়েছিলুম অনেক দিন আগে। আর একটা বিশেষ ঘটনার কথাও মনে আছে। কিন্তু বইখানার নাম মনে আনতে পারছি না বলে বুঝতে পারছি না, ঘটনাটা কাল্পনিক কিংবা সত্যকাহিনী।'

—'ঘটনাটা কাল্পনিক হলে কিছু ক্ষতি আছে?'

—'আছে বইকি, খুব আছে! সেটা কাল্পনিক ঘটনা হলে আমার অনুমানও অমূলক বলে প্রমাণিত হবে।'

—'অনুমানটা কি শুনতে পাই না?'

—'ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত বুলেটটা এসেছিল কিরকম আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর থেকে, সেইটেই আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।'

মানিক অত্যন্ত বিস্মিত হল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। জয়ন্ত বইয়ের আলমারিগুলোর ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে করতে বারংবার এদিকে-ওদিকে আনাগোনা করতে লাগল। মানিক একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে সেদিনের খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। এই ভাবে কেটে গেল প্রায় বিশ মিনিট।

হঠাৎ জয়ন্ত সানন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

—'কি পেয়েছ হে?'

—'সেই বইখানা।'

—'কি বই?'

—'জোসেফ গোল্লোম্ব সাহেবের 'মাস্টার ম্যান হান্টারস,'—অর্থাৎ ওস্তাদ মনুষ্য-শিকারী। বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে।'

—'ওখানা কি উপন্যাস?'

—'মোটেই নয়! ওর আগাগোড়াই আছে কেবল সত্য ঘটনার পর সত্য ঘটনা। দস্তুরমতো অপরাধ-বিজ্ঞানের বই, 'কাল্পনিক কথা একটাও নেই।'

—'তাহলে তোমার অনুমান ভুল নয়?'

—'খুব সম্ভব তাই।'

—'কি রকম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তোমাকে গুলি করা হয়েছিল?

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা।

—'হ্যালো! ......আ-রে, কাজ সকালেও ফোনে সুন্দরবাবু! ব্যাপার কি? এখনই আমাকে আপনার কাছে ছুটতে হবে? কেন? কাল রাত্রেও আবার একটা নূতন নরহত্যা হয়েছে? অ্যাঁ, কে খুন হয়েছে বললেন? এবারে স্বয়ং মণিমোহন? এবারের ঘটনাস্থলেও সেই অপরিচিত ব্যক্তির পরিচিত পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা এখনই যাচ্ছি।'

'রিসিভারটা, রেখে দিয়ে জয়ন্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গম্ভীর মুখে। তার পর ধীরে ধীরে বললে, মানিক, সব শুনলে তো! ঘটনার স্রোত যে এমনি কোনও দিকেই ছুটবে, আমি তা কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। যবনিকা পড়তে আর বেশি দেরি নেই! নাও, এখন ওঠো।'

দশ

সুপরিচিত অপরিচিত

তখন মর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল মণিমোহনের দেহ। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে সুন্দরবাবু সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে লক্ষ্য করলে, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে মণিমোহনের আকৃতিগত সাদৃশ্য। একরকম দীর্ঘতা, একরকম গঠন এবং প্রায় একরকম মুখ-চোখ-নাক। কেবল ভদ্রেশ্বরের জোড়া ভুরু, মণিমোহনের ভুরু জোড়া নয়। এবং ভদ্রেশ্বরের চেয়ে মণিমোহনের রং একটু বেশি ফরসা। এবং মণিমোহনের চেয়ে ভদ্রেশ্বরের কপাল বেশি প্রশস্ত। কিন্তু এই অল্প-স্বল্প পার্থক্য চেষ্টা করলে খুব সহজেই ঢেকে ফেলা যায়।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি মণিমোহন মারা পড়েছে ছোরার আঘাতে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বুকের উপরে মোক্ষম আঘাত! ডাক্তারের মতে, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে, মণিমোহন হয়তো ছটফট করবারও সময় পায়নি।'

—'কোন সময়ে এর মৃত্যু হয়েছে, ডাক্তার সে সম্বন্ধে কোনও মতপ্রকাশ করেছেন কি?'

—'ডাক্তারি হিসাবে প্রকাশ, মণিমোহনের মৃত্যু হয়েছে অন্তত গতকল্যকার সন্ধ্যার আগে।'

—'মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কখন?'

—'আজ ভোরবেলায়।'

—'আপনার মুখে শুনলুম, বালির কাছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে একটা সরু গলির ভিতরে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে। সে কি রকম গলি? সেখান দিয়ে কি লোক-চলাচল হয় না?'

—'এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

—'কাল সন্ধ্যার আগে খুন হয়েছে, অথচ লাশ পাওয়া গেছে আজ সকালে! জায়গাটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নির্জন?'

—'না, জায়গাটা মোটেই নির্জন নয়। স্থানীয় লোকরা বলে, কাল রাত দুপুরেও গলির ভিতরে লাশ-টাশ কিছুই ছিল না।'

—'তাহলে মণিমোহন মারা পড়েছে অন্য কোনও জায়গায়? হত্যার অনেক পরে, গভীর রাতে তার দেহটা ওই গলির ভিতরে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

—'জয়ন্ত, আগে আমিও ওই সন্দেহ করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম খুনটা হয়েছে ওই গলিতেই। কন্তু তারপর ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু—কিন্তু—' বলতে বলতে সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

—'থামলেন কেন? ভাবছেন কি?'

—'হুম্! আমি ভাই একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছি!'

—'কেন?

—'সন্ধ্যার আগেই যদি মণিমোহনের মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে রাত বারোটার পরেও তার মৃতদেহ থেকে কি রক্তের ধারা বইতে পারে?'

—'আপনার কথার অর্থ কি?'

—'মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেখানকার মাটি ভিজে গিয়েছে রক্তের ধারায়।'

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বলল, 'না, অতক্ষণ পরে মৃতদেহ থেকে রক্ত বেরুতে পারে না।'

—'তবে? ডাক্তার কি ভুল রিপোর্ট দিয়েছেন?

—'উঁহু, সম্ভবতঃ ডাক্তার ভুল করেননি। সুন্দরবাবু, আমি আর একটা ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছি।'

—'কি আন্দাজ?'

—'ফোনে আমাকে বললেন না ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছে সেই নিরুদ্দেশ অপরিচিত ব্যক্তির সুপরিচিত পদচিহ্ন?'

—'হ্যাঁ। সেই পদচিহ্নগুলো—'

—'পাওয়া গিয়েছে রক্তমাখা মাটির উপরে? কেমন, এই তো?'

চরম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, কেমন করে জানলে তুমি?'

—'বললুম তো আন্দাজে।'

—'এ কি রকম আন্দাজ বাবা? এ যে মন্ত্রশক্তিকেও হার মানায়!'

—'আমার আন্দাজ প্রায়ই সত্য হয়ে দাঁড়ায়, কারণ যুক্তি থেকেই তার উৎপত্তি।'

—'ধন্য ভায়া। দাদা হয়েও তোমার পায়ে গড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন কি করবে? ঘটনাস্থলটা একবার দেখে আসবে না কি?'

—'না সুন্দরবাবু, প্রয়োজন নেই। আমি মনে মনে মামলাটা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, কেবল একটু তদন্ত বাকি আছে। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা, শুভস্য শীঘ্রম।'

—'আমাকে কি করতে বলো?'
—'জনকয়েক লোক নিয়ে এখনই আমার সঙ্গে চলুন।'
—'কোথায় হে?'
—'এখনই দেখতে পাবেন।'

* * * *

জয়ন্তের নির্দেশে পুলিশের জিপ গাড়ি এসে থামল শালিখার চন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ির সামনে।

সবিস্ময়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'জয়ন্ত তুমি কি চন্দুরের কাছেই এসেছ!'

—'হ্যাঁ।'
—'তুমি কি ওর বিরুদ্ধে নতুন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'
—'কোনও প্রমাণই পাইনি।'
—'তবে?'
—'আমি চন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করতে চাই।'
—'আর আমরা কি করব?'
—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করবেন।'

এমন সময়ে বোধহয় গাড়ি থামার শব্দ শুনেই চন্দ্রনাথ স্বয়ং বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দোতলার বারান্দায়। তারপর উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললে, 'আরে, আবার আমার দ্বারে সুন্দরবাবুর দল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। নেমে আসুন।'

মিনিট দুই পরে চন্দ্রনাথ নিচেয় নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। হাতে তার সেই মোটা লাঠিগাছা।

জয়ন্ত বললে, 'মশাই কি বাড়িতেও ওই বাঘমারা লাঠিছাড়া হয়ে থাকেন না?'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোমরে হঠাৎ লাম্বেগোর ব্যথা হয়েছে। লাঠি ছেড়ে চলতে কষ্ট হয়। সুন্দরবাবু, কি একটা খবরের কথা বলছিলেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা কইতে হবে না কি? আপনি কি আমাদের ধুলো-পায়েই বিদায় করতে চান?'

চন্দ্রনাথ নাচারের মতো বললে, 'বেশ, তবে বাড়ির ভিতরেই আসুন।'

সকলে বৈঠকখানায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলে পর চন্দ্রনাথ বললে, 'আপনারা এমন কি জরুরি খবর দেবার জন্যে এত দূর ছুটে এসেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার বন্ধু মণিমোহনকে মনে আছে তো?'

—'কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। জানি না সে কোথায় অজ্ঞাতবাস করছে।'

—'আমরা এত দিন পরে তাকে খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় নয়।'

—'কি বলছেন!'

—'হ্যাঁ, গতকল্য কে তাকে খুন করেছে। আমরা তার মৃতদেহ পেয়েছি।'

—'শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। অপরাধীর কোনও সন্ধান পেয়েছেন?'

—'না। মণিমোহনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এমন কোনও লোককে আপনি জানেন?'

—'তার কোনও শত্রু বা বন্ধুকেই আমি চিনি না, কারণ তার সঙ্গে বেশি দিন আমার আলাপ হয়নি।'

জয়ন্ত এইবার মুখ খুললে। বললে, 'আপনার বাড়িতে কয়খানা ঘর আছে চন্দ্রবাবু?'

—'দশখানা।'

—'ঘরগুলো একবার দেখাবেন?'

—'আপনার কৌতূহল একটু অদ্ভুত নয় কি?'

—'কেন, দেখাতে কোনও আপত্তি আছে?'

—'কিছু না। আসুন।'

একে একে সব ঘর দেখিয়ে চন্দ্রনাথ সর্বশেষে দোতলায় একখানা ঘরে ঢুকে বললে, 'এই আমার শোবার ঘর।'

জয়ন্ত একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর এক দিকে চেয়ে বললে, 'ওখানে রয়েছে পরে পরে সাত জোড়া জুতো। সব জুতোই আপনার?'

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্রনাথ বললে, 'হ্যাঁ। আমার কিঞ্চিৎ পাদুকাবিলাস আছে।'

জয়ন্ত জুতোগুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ল। একে একে সব জুতো হাতে করে তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে বললে, 'বাঃ, বেশ জুতোগুলি। চন্দ্রবাবুর পছন্দ আছে বটে!'

চন্দ্রনাথ ভাবহীন মুখে গম্ভীর স্বরে বললে, 'মশায়ের আর কিছু জ্ঞাতব্য বা দ্রষ্টব্য বা বক্তব্য আছে?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'নিচেয় ফিরে যাই চলুন।'

সকলে আবার বৈঠকখানায়।

সুন্দরবাবুর এক সহকারী কর্মচারী একটা লোককে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে। বললে, 'স্যার, এই লোকটা বাড়ির বাইরে যাচ্ছিল, আমরা যেতে দিইনি।'

লোকটা বললে, 'আমি এই বাড়ির চাকর। বাজারে যাচ্ছি।'

সহকারী বললে, 'কিন্তু ও বাজারে যাচ্ছে রেশন ব্যাগের ভিতরে এক জোড়া জুতো নিয়ে!'

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, 'জুতো! দেখি, দেখি!'

চন্দ্রনাথ বললে, 'কোথাকার একটা উটকো লোক আজ ভোরে রেশন ব্যাগ সুদ্ধ ওই জুতো জোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিল। তাই চাকরকে আমি বলেছিলুম সে যেন বাজারে যাবার সময়ে জুতোজোড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।'

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে এক ানা আতশী কাচের সাহায্যে জুতোজোড়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'সুন্দরবাবু, গাড়িতে ওঠবার সময় আপনাকে কি আনতে বলেছিলুম, মনে আছে?'

—'সেই অপরিচিত ব্যক্তির পদচিহ্নের ছাঁচ তো? এনেছি।'

—'তার সঙ্গে এই জুতো জোড়া মিলিয়ে দেখুন।'

গাড়ি থেকে ছাঁচ আনানো এবং জুতোর সঙ্গে মেলানো হল। অবিকল মিলে গেল—একচুল এদিক-ওদিক হল না।

সুন্দরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হত্যাকারীর জুতো!'

জয়ন্ত বললে, 'সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। জুতোর তলার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন জায়গায় জায়গায় শুকনো রক্তের দাগ। তার মানে হচ্ছে কাল মণিমোহনকে বধ করবার পরেও এই জুতোজোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। এই জুতো সংগ্রহ করবার জন্যেই আমার এখানে আগমন।'

চন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললে, 'কি বললেন? আপনি জানতেন যে ওই জতো আছে আমার এইখানেই?'

—'ঠিক জানতুম বলতে পারি না, তবে এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলুম বটে।'

চন্দ্রনাথ খাপ্পা হয়ে বলে উঠল, 'এতক্ষণ আমার ধারণা ছিল কোনও উটকো লোক জুতোজোড়া আমার বৈঠকখানায় ফেলে রেখে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, এ হচ্ছে পুলিশের কারসাজি! কিন্তু আপনাদের সমস্ত কূট-কৌশলই ব্যর্থ হবে। দেখুন ওই জুতোর সঙ্গে আমার পা মিলিয়ে! আমি বলছি, এ জুতো আমার নয়।'

—'জয়ন্ত সহাস্যে বললে, জানি ও-জুতোর মাপ আপনার পায়ের চেয়ে বড়ো। কিন্তু আমি কেবল জুতোর আসল গুপ্তকথাই জানি না, বোধ হচ্ছে আপনার ওই লাঠির গুপ্তকথাও আমার কাছে অবিদিত নেই। সুন্দরবাবু, আপনি এখন অনায়াসেই চন্দ্রনাথকে থানায় ধরে নিয়ে ে ত পারেন।'

আচম্বিতে চন্দ্রনাথের মুখ হয়ে উঠল বীভৎস এক দানবের মতন! সঙ্গে সঙ্গে ফস করে সে লাঠিগাছা দুই হাতে কোমর-বরাবর উঁচু করে তুলে ধরলে—

এবং তৎক্ষণাৎ একটা রিভলবার গর্জন করে উঠল ও পরমুহূর্তে লাঠিগাছা তার হাত থেকে খসে মেঝের উপরে পড়ে গেল সশব্দে। চন্দ্রনাথের ডান হাতের কবজির উপরে ফুটে উঠল রক্তের রেখা!

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'রিভলবার ছুড়লে কে, রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, 'সে কথা পরে শুনবেন সুন্দরবাবু! এখন চট করে লাঠিগাছা তুলে নিন দেখি! কিন্তু খুব সাবধান, বোধহয় ওটা লাঠি নয়—কোনও সাংঘাতিক ভয়াবহ অস্ত্র!'

এগারো

পদচিহ্ন রহস্য

চন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত লাঠিগাছটা মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'কিন্তু রিভলবার ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'রিভলবার ছুড়েছি আমি সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'হতেই পারে না! যখন রিভলবারের আওয়াজ হয় তখন তোমার ডান হাত ছিল জামার পকেটের ভিতরে।'

—'ঠিক দেখেছেন। এখনও আমার ডান হাত জামার পকেটের ভিতরেই আছে।'

—'তবে?'

—'পকেটের ভিতর থেকেই আমি রিভলবার ছুড়েছিলুম।'

—'সে কি হে?'

—'এই দেখুন, আমার পকেট ছেঁদা করে রিভলবারের গুলিটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।'

—'হুম্!'

—'চন্দ্রনাথকে আমি বিশ্বাস করিনি, আর আমার সব চেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল ওর ওই মোটা লাঠিগাছার উপরে। আমি জানতুম, সে যদি হঠাৎ কোনও চালাকি খেলে বসে, তাহলে পকেট থেকে আর রিভলবার বার করবার সময় পাব না। তাই পকেটের ভিতরেই রিভলবার ধরে আমি আগে থাকতে তৈরি হয়ে ছিলুম।'

—'ধন্যি ছেলে যা হোক!'

—'না সুন্দরবাবু, ব্যাপারটায় নূতনত্ব নেই কিছু। চোখের পলক পড়বার আগেই কাজ সারবার জন্যে মার্কিন গুণ্ডাদের মধ্যে এই নিয়মই প্রচলিত আছে। এখন ও কথা থাক। লাঠিগাছটা আমার হাতে দিয়ে আগে চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করুন।'

সুন্দরবাবুর হুকুমে তখনই পাহারাওয়ালারা এসে চন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়াল।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চন্দ্রনাথ বললে, 'বটে, বটে! আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পেয়েছ তোমরা?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চন্দ্রনাথের লাঠিগাছা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর সকলের দিকে পিছন করে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিগাছা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে ধরলে। তার পরেই ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল।

সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'বন্দুক ছুড়লে কে, বন্দুক ছুড়লে কে?'

জয়ন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি।'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'মানে? বন্দুকটাও তোমার পকেটের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছ না কি?'

তখনও ধূমায়মান লাঠিগাছা দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, 'না। আমি ছুড়েছি এই লাঠি-বন্দুকটা।'

—'লাঠি আবার বন্দুকে পরিণত হতে পারে না কি? 'গুপ্তি'র কথা শুনেছি বটে, লাঠির ভিতরে লুকানো থাকে ছোটো তরোয়াল। কিন্তু লাঠি-বন্দুক আবার কি চীজ বাবা?'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আমার হাতে যা দেখছেন, তা লাঠির ছদ্মবেশে বন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দেখুন লাঠির রূপোবাঁধানো মুণ্ডি। তার তলায় এই যে দেখছেন সোনার ব্যান্ড বা বন্ধনী, আঙুল দিয়ে এটা একটু সরানো যায়। কিন্তু সরাবার সঙ্গে সঙ্গেই লাঠির ভিতরে যে ট্রিগার বা টিপকল আছে, সেটা পড়ে যাবে আর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বে বুলেটটা। কি হে চন্দ্রনাথ, তাই নয় কি?'

চন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ মুখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনও উত্তর দিলে না।

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'এমন আজব বন্দুকের কথা কখনও তো শুনিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'না শোনবারই কথা! এ দেশে এরকম বন্দুক থাকতে পারে আমিও আগে তা জানতুম না।'

—'তবে তুমি লাঠির গুপ্তকথা আবিষ্কার করলে কেমন করে?

—'বলছি শুনুন। এই মোটা লাঠিগাছা দেখলেই অসাধারণ বলে মনে হয় না কি? এরকম লাঠি নিয়ে কোনও শৌখীন বাবুই হাওয়া খেতে বেরোয় না। লাঠির ওই অসাধারণতা প্রথম দিনেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আমি তখন ওটাকে ভেবেছিলুম সাধারণ গুপ্তি জাতীয় কোনও অস্ত্র। তারপর আমার প্রথম সন্দেহ জাগ্রত হয় ভদ্রেশ্বরের বাগানে গিয়ে।'

—'কেন, সেখানে তো আমরাও ছিলুম, আমরা তো চন্দ্রনাথের লাঠিকে তখন সন্দেহজনক বলে মনে করতে পারিনি।'

—'গুটিকয় কথা ভেবে দেখুন। ভদ্রেশ্বরের বাগানে আমাদের কোনোই বন্দুকধারী শত্রু ছিল না। মণিমোহন পলাতক, ভদ্রেশ্বর বন্দী, যেদিক থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে দাঁড়িয়েছিল কেবল চন্দ্রনাথ! কিন্তু তার হাতে ছিল, মাত্র এই লাঠিগাছা। বাগান তল্লাস করেও অন্য কোনও লোক বা বন্দুক খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বন্দুক ছুড়লে কে? একমাত্র উত্তর হতে পারে, চন্দ্রনাথ। কিন্তু তার কাছেও ওই লাঠি ছাড়া আর কোনও অস্ত্রই ছিল না। গুলি তো আকাশ থেকে খসে পড়েনি, তাই সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি চন্দ্রনাথের ওই লাঠির ভিতরেই কোনও রহস্য নিহিত আছে? বাড়িতে ফিরে এসে এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অনেক দিন আগে কি একখানা ইংরেজি কেতাবে অদ্ভুত একটা লাঠির কথা পাঠ করেছিলুম। কিন্তু বইখানার নামটা প্রথম মনে পড়েনি। তারপর আমার লাইব্রেরির আলমারিগুলোর ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ যখন বইখানা চোখে পড়ে গেল, তখন মানিকও সেখানে হাজির ছিল। কি হে মানিক, বইখানার নাম তুমি এরই মধ্যে ভুলে যাওনি তো?'

মানিক বললে, 'নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি! বইখানা হচ্ছে জোসেফ গোল্লাম্ব সাহেবের 'মাস্টার ম্যান হান্টার্স'।'

—'ঠিক। ওখানা উপন্যাস নয়, সত্য ঘটনায় পরিপূর্ণ অপরাধবিজ্ঞানের বই। তারই

পাতা ওলটাতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্যারিসের 'অপরাধ যাদুঘরে'র বর্ণনার মধ্যে খুঁজে পেলুম চন্দ্রনাথের এই লাঠির জুড়ি।'

সুন্দরবাবু আগ্রহভরে বললেন, 'কি রকম, কি রকম?'

—'সম্পূর্ণ ঘটনার কথা পরে আপনি বিস্তৃত ভাবে বইখানা পাঠ করলেই জানতে পারবেন, আপাতত আমি সংক্ষেপেই তার কথা বলব। ফ্রান্সে একবার একটা গার্ডেন-পার্টিতে জনৈক ব্যক্তি কোনও অজানা আততায়ীর দ্বারা নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হয়। তখনই ঘটনাস্থলে পুলিস আসে আর সারা বাগান আর প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জামা-কাপড় তল্লাস করে, কিন্তু বন্দুক বা কোনও রকম আগ্নেয়াস্ত্রই খুঁজে পায় না। অন্য কোনও সূত্র না পেয়ে গোয়েন্দারা খোঁজ নিতে লাগল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কারুর বিশেষ শত্রুতা আছে কি না? ফলে এক ব্যক্তির উপরে পুলিসের সন্দেহ হয়। তারপর তার বাড়ি খানাতল্লাস করে আবিষ্কৃত হয় এমন একগাছা লাঠি, যা অবিকল চন্দ্রনাথের এই লাঠি গাছারই মতন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও, চন্দ্রনাথ মাথা খাটিয়ে ওই রকম সর্বনেশে লাঠি তৈরি করেছে?'

—'সে নিজে হয়তো তৈরি করেনি, হয়তো ইউরোপ থেকেই অস্ত্রটা আমদানি করেছে।'

—'তাহলে চন্দ্রনাথকে বড়ো জোর তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে বলে আমরা চালান দিতে পারি। কিন্তু আমাদের আসল মামলা তো এখনও রয়ে গেল যে তিমিরে সেই তিমিরেই!'

রূপোর নস্যদানী বার করে নস্য নিতে নিতে জয়ন্ত বললে, 'মোটেই নয়! চন্দ্রনাথের বাড়িতে আজ যে জুতো জোড়া খুঁজে পেয়েছি, আসল মামলার কিনারা হবে তার সাহায্যেই।'

—'সে কি হে, ও জুতোর মাপ যে চন্দ্রনাথের পায়ের মাপের চেয়ে বড়ো!'

—'হ্যাঁ, কিন্তু কোনও ঘটনাস্থলে যাবার সময়ে চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ওই জুতোর ভিতরে কাগজের নুটি বা প্যাড গুঁজে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কোনও রকমে জুতোজোড়া ব্যবহার করত।'

—'কেন?'

—'পুলিসকে ভোলাবার জন্যে।'

—'কেমন করে এটা জানতে পেরেছ?'

—'রামময়বাবুর বাড়িতে যে চুরি আর হত্যাকাণ্ড হয়, সেদিন বৃষ্টি হয়নি তবু ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছিল মণিমোহনের আর এই জুতো জোড়ার কাদামাখা ছাপ। তার পর দেখা গেল, নর্দমার কাছে গিয়ে বালতির জল ঢেলে ধুলোমাখা জুতো ভিজিয়ে কারা ইচ্ছা করেই সেই পদচিহ্নগুলো সৃষ্টি করেছে। মনে আছে সুন্দরবাবু, তখনই আপনাকে আমি বলেছিলুম, অপরাধীরা এই পদচিহ্নগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়?'

—'হুম্!'

—'তারপর যেখানে মণিমোহন খুন হয় সেখানেও এই জুতো জোড়ার ছাপ পাওয়া যায় রক্তমাখা মাটির উপরে, অথচ সেখানে রক্ত থাকবার কথা নয়, কারণ লাশটাকে হত্যাকাণ্ডের অনেক পরে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। আসলে সে রক্তও আমদানি করা। সেখানেও হত্যাকারী এই জুতো জোড়ার ছাপ দেখিয়ে আমাদের ভোলাতে চেয়েছিল। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

—'খানিক খানিক, সবটা নয়।'

—'গোড়া থেকে ভেবে দেখুন। চন্দ্রনাথের কুকর্মের সহকারী হল মণিমোহন। প্রথমেই কে, সরকারের জুয়েলারি ফার্মে চুরি। তারপর নন্দলালকে হত্যা করে তাকে মণিমোহন বলে চালাবার চেষ্টা। সেখানেও নন্দলালের, মণিমোহনের আর অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতো জোড়ার ছাপ পাওয়া যায়। তারপর ধরা পড়ে, মণিমোহন খুন হয়নি, মারা পড়েছে নন্দলালই। পুলিসের সন্দেহ যায় মণিমোহন আর এক অজ্ঞাত ব্যক্তির দিকে। চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যই ছিল তাই।

'তারপর রামময়বাবুর বাড়িতে খুন, পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ত্রিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না চুরি। সেখানেও পাওয়া গেল মণিমোহনের আর সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জুতোর ছাপ। তারপর ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু খুব সম্ভব চোরাই টাকা-গয়নার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মণিমোহনের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঝগড়া হয়, যার ফলে মণিমোহনের অকাল-মৃত্যু। লাশ অন্যত্র পাঠিয়ে সেখানে আবার পুলিসের অজ্ঞাত সেই ব্যক্তির জুতোর ছাপ রেখে আসা হল। ফলে চন্দ্রনাথ ভেবেছিল সে নিজে থাকবে নিরাপদে, আর পুলিস খুঁজে মরবে এমন কোনও ব্যক্তিকে পৃথিবীতে যার অস্তিত্বই নেই।'

চন্দ্রনাথ ঝাঁজালো গলায় বললে, 'ও জুতো যে আমার, সেটা প্রমাণ করবে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'সে ভার পুলিসের হাতে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারো। এই জুতো জোড়া পাওয়া গিয়েছে তোমার বাড়িতে। পুলিস দেখেই জুতো জোড়া তুমি সরিয়ে ফেলতে গিয়েছিলে। তার উপরে এমন আরও অনেক সারকামসট্যানসিয়াল এভিডেন্স বা অবস্থা-ঘটিত প্রমাণও আছে, তোমাকে ফাঁসিকাঠে দোলাবার পক্ষে যা হবে যথেষ্ট।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল! যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর! হুম্, জয়ন্তের মতো রোজা না হলে চন্দুরের মতো ভূতকে শায়েস্তা করতে পারে কে?'

জগৎশেঠের রত্নকুঠি

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ঘটনার রহস্য

দোতলার বৈঠকখানা। আসনে আসীন দুই বন্ধু—ভাব যাদের গলায় গলায়। জয়ন্ত ও মানিকের কথা বলছি। চলছিল আলোচনা। সরকারি পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের বিখ্যাত কর্মচারী সুন্দরবাবু সম্প্রতি 'পেনশন' নিয়েছেন, তাই নিয়েই আলোচনা।

মানিক মত প্রকাশ করলে, 'জয়ন্ত, এইবার আমাদের গোয়েন্দাগিরির শখ বোধহয় শিকেয় উঠল।'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'আমাদের বেশির ভাগ মামলা আসত সুন্দরবাবুর মারফতেই। তিনি নিলেন অবকাশ, এখন আমাদের সে শখ কে মেটাবে?'

—'মেটাবে আমাদের খ্যাতি। তুমি কি ভেবেছ এতদিন ধরে আমরা কি কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালুম? মোটেই নয়, মোটেই নয়! শৌখিন হলেও দেশ আর দশের কাছে আমরা এখন অপরিচিত নই। পুলিশে সুন্দরবাবু না থাকলেও আমাদের অলস হয়ে বসে থাকতে হবে বলে মনে করি না। ওই শোনো! সিঁড়িতে কোনো বৃহৎ মূর্তির পদশব্দ! বোধহয় নাম করতেই সশরীরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব আসন্ন!'

ঠিক তাই! বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকেই সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করে বসে পড়লেন এবং এই অনুচিত অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে চেয়ারখানা সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল!

মানিক সহাস্যে বললে, 'ভো সুন্দরবাবু! আপনার নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি নিজে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজি প্রবাদটার সত্যতা প্রমাণিত করলেন!'

মানিকের রসনাকে সুন্দরবাবু বরাবরই ভয় করে আসছেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, 'হুম! কী প্রবাদ?'

'জানেন না? 'Talk of the devil and he will appear!' অর্থাৎ কিনা, দৈত্য-দানবের কথা তুললেই তার উদয় হয়!'

সুন্দরবাবু রেগে চোখ কটমট করে বললেন, 'শুনলে তো জয়ন্ত, শুনলে তো? তোমার নচ্ছার দুর্মুখ বন্ধুর কথা শুনলে তো? আমি ডেভিল?'

মানিক বললে, 'আহাহা, খামোকা খেপে যান কেন সুন্দরবাবু? 'ডেভিল'

বলতে কেবল ভূত, অসুর, শয়তান বোঝায় না, পাজি, নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককেও ডেভিল বলে।'

সুন্দরবাবু রুদ্ধরোষে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে তোমার মতে আমি ওর মধ্যে কোনটি?'

মানিক সুন্দরবাবুর নাগালের বাইরে সরে বসে বললে, 'আবার নতুন কৌঁসুলি বা ব্যারিস্টারকেও ডেভিল নামে ডাকা হয়। এক রকম খাবারেরও নাম ডেভিল, তাও তো আপনার জানা আছে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমাকে আর শেখাতে হবে না, ডেভিল আমি অনেক খেয়েছি, মাংসের পুর দেওয়া ডিমের কথা কে না জানে!'

মানিক বললে, 'উঁহু, সে ডেভিল নয়, এ হচ্ছে আর এক রকম খাবার, বোধহয় আপনি কখনও খাননি—আমাদের মধু রাঁধতে জানে।'

বরাবরের মতো আজও নতুন খাবারের নামে সুন্দরবাবুর ঘনীভূত ক্রোধ দ্রবীভূত হবার উপক্রম করলে। কারণ জয়ন্তদের খানসামা মধু যা রাঁধতে পারে, তিনিও যে তা ভোজন করতে পারেন, সে কথাটা ভোজনবিলাসী সুন্দরবাবুর অজানা ছিল না। বেশ-একটু নরম হয়ে তিনি বললেন, 'খাবারটা কী শুনি?'

—'খুব মশলা দেওয়া ভাজা মাংস বলতেও ডেভিল বোঝায়। খাসা খাবার। আস্বাদ নেবার ইচ্ছা আছে নাকি? মধুকে ডাকব?'

এরপর আর ক্রোধ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নয়। সুন্দরবাবু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'আহা, তা মন্দ কী?'

মানিক কত সহজে সুন্দরবাবুকে চটাতে ও পটাতে পারে তাই দেখে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এমন সময়ে মধুর প্রবেশ।

সুন্দরবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'এই যে মধু! ঠিক সময়েই এসেছ হে—স্বাগত, স্বাগত!'

এমন অভাবিত অভ্যর্থনার কারণ বুঝতে না পেরে মধু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের দিকে তাকালে।

জয়ন্ত বললে, 'মধু, তোমাকে দেখে সুন্দরবাবু বলছেন—স্বাগত, অর্থাৎ তোমার আগমন শুভ হোক। কেন, তা শুনতে চাও?'

মধু বললে, 'তা শুনব না কেন? কিন্তু তার আগে বলে রাখি, একটি ছোকরাবাবু আপনার সঙ্গে জরুরি দরকারে দেখা করতে এসেছেন।'

—'ছোকরাবাবু? জরুরি দরকারে? কোথায়?'

—'নীচেয়। মস্ত একখানা মোটরগাড়ি করে এসেছেন। বড়োলোকের ছেলে—জামায় মুক্তোর বোতাম, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে সোনার আংটি।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'শ্রীমধুসূদন, একনজরেই এতটা লক্ষ করে ফেলেছ? আমাদের সহবাসে তুমিও একটি ক্ষুদ্র গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ দেখছি। যাও, বাবুটিকে উপরে পাঠিয়ে দাও।'

মধুর প্রস্থান। মানিকের মুখের পানে সুন্দরবাবুর হতাশভাবে দৃষ্টিপাত।

মানিক আশ্বাস দিয়ে বললে, 'মাভৈঃ! মধু তো বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করছে না, যথাসময়েই আমাদের আরজি পেশ করব।'

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একটি সুবেশী সুশ্রী যুবক, তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না, চোখের সপ্রতিভ দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, জনতার ভিতরেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই যুক্তকরে নমস্কার করে সে বললে, 'আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

জয়ন্ত বললে, 'আমিই জয়ন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার পরিচয় জানবার সুযোগ আমার হয়নি।'

যুবক বললে, 'আপনি চন্দ্রনাথ অ্যান্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন?'

—'শুনেছি বই কি! বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান।'

—'কেবল চা নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আরও অনেক কিছু নিয়ে কারবার করে। চন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার নাম। বর্তমানে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। আমার নাম বীরেন্দ্রকুমার বাগচি।'

—'বসুন বীরেনবাবু। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?'

—'গোলকধাঁধায় পড়ে।'

—'কী রকম?'

—'আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যার মধ্যে অর্থ বা অনর্থ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এর সঙ্গে আছে কোনো বিচিত্র রহস্যের সম্পর্ক!'

জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, আপনি আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। বোঝা যাচ্ছে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন তা খুন বা ডাকাতি বা চুরি-চামারি নয়, কারণ ওদের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ দুইই থাকে। কিন্তু রহস্যের সম্পর্কটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, 'আমিও পারছি না। তাই তো বললুম আমি

গোলকধাঁধায় পড়েছি। শোনা আছে ধাঁধার জবাব দেওয়া আপনার পেশা—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'ভুল বীরেনবাবু, ভুল! ধাঁধার জবাব দেওয়া আমার পেশা নয়, আমার নেশা—অর্থাৎ আমার শখ!'

—'বেশ, তাই! ভ্রম-সংশোধনের জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে আমার কথা শুনবেন কি?'

—'নিশ্চয়ই! দয়া না করেও শুনব। বলুন আপনার কাহিনি।'

বীরেন চেয়ারের উপরে নড়েচড়ে ভালো করে বসে তার কাহিনি শুরু করলে:

'কারবারের জন্যে আমাকে কলকাতাতেই বাস করতে হয় বটে, কিন্তু আমার পৈতৃক বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা আছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে। নবাবি আমলে তৈরি সেকেলে মস্তবড়ো বাড়ি, এখন সংস্কার অভাবে সদরমহল ছাড়া প্রায় সবটাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কালেভদ্রে আমাদের কারুর দেশে যাবার শখ হলে কেবল সদরমহলটাই ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকটায় মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রিদের হাত পড়ে। অন্য সময়ে সদরমহলও তালাবন্ধ থাকে। বাড়িখানা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের জিম্মায় আছে—সম্পর্কে তিনিও আমাদের কুটুম্ব।

দিনদশেক আগে যদুনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, মাসতিনেকের জন্যে তিনি আমাদের দেশের বাড়ি ভাড়া নিতে চান।

আমি রাজি হলুম না। কিন্তু যদুবাবু অতিশয় জেদাজেদি করতে লাগলেন। বললেন তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে তিন মাসের দেড় হাজার টাকার অগ্রিম ভাড়া আমার হাতে জমা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, পাড়াগাঁয়ে একখানা সেকেলে বাড়ির জন্যে তিনি এত টাকা ভাড়া দিতে চান কেন?

তখন তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের জমিদার। চিকিৎসার জন্যে রুগ্ণ মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মাকে নিয়ে যেতে মফস্সলের গঙ্গার ধারে কোনো জায়গায়।

আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বটে, কিন্তু যুক্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। কলকাতার আরও কাছে গঙ্গার ধারে তো কত ভালো ভালো বাড়ি রয়েছে। যাক, এসব নিয়ে আমি আর বেশি মাথা ঘামালুম না। এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলুম। যদুবাবু আমাকে দেড় হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আর এক ব্যাপার! একখানা বেনামা চিঠি পেলুম। তাতে জানানো হয়েছে: প্রতাপ চৌধুরিকে যেন মুর্শিদাবাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া না হয়, সে সাংঘাতিক লোক।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তো যদুনাথ বসু, কিন্তু কে প্রতাপ চৌধুরি? আর এই বেনামা চিঠিই বা কে লিখলে? কেন লিখলে? আমি যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, এ কথাই বা সে কেমন করে জানতে পারলে?

তিন দিন পরে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! যেদিন চেক পেয়েছিলুম তার পরদিন থেকেই দুর্গাপূজার জন্যে ব্যাংক বন্ধ ছিল, চেক ভাঙাতে পারিনি। ব্যাংক খুললে পর জানতে পারলুম আমাকে একখানা ভুয়ো চেক দেওয়া হয়েছে, যদুনাথ বসুর নামে ব্যাংকে এক পয়সাও জমা নেই!

এভাবে ঠকে রেগে আগুন হয়ে আমি দেশে রওনা হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলুম আমাদের বসতবাড়িতে জনপ্রাণী নেই। শুনলুম কয়েকজন গুন্ডার মতো লোক সেখানে দু-দিন ধরে খুব হইহল্লা করে আবার কখন সরে পড়েছে কেউ তা জানে না।

বাড়ির একটা তালাবন্ধ ঘরে ঠাকুরদার আমলের কতকগুলো আসবাবপত্তর একালে অব্যবহার্য বলে গুদামজাত করা ছিল। সেই সঙ্গে একটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারির ভিতরে ছিল একগাদা সেকেলে কেতাব ও কাগজপত্র। কারা তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে কেতাব ও কাগজপত্রগুলো বার করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে! নিশ্চয় যদুদেরই কীর্তি!

ঠাকুরদার হাতে লেখা একখানা ছেঁড়া খাতাও পেয়েছি। তাতেও সব অদ্ভুত কথা লেখা! বোধহয় ঠাকুরদার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস ছিল! খালি গল্প নয় পদ্যও!'

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

নরকঙ্কাল ও ভীষণ গর্জন

বীরেন চুপ করলে। জয়ন্তও স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভারী গোলমেলে ব্যাপার তো! খামোকা যদু নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব, অকারণে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে তিন মাসের জন্যে একখানা পাড়াগাঁয়ে সেকেলে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ভুয়ো চেক ঘাড়ে

চাপানো, তারপর দু-দিন সেই বাড়িতে কাটিয়েই ফুড়ুৎ করে হঠাৎ পলায়ন, এ সবই যেন মহা পাগলামির কাণ্ড! বীরেনবাবু, আপনি কোনো আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমার মন কেমন খুঁত খুঁত করছে! সন্দেহ হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন, তোমার সন্দেহের কারণ কী?'

—'যদুর দল তালা ভেঙে বাড়ির বন্ধ ঘরে ঢুকেছিল কেন? আলমারি থেকে কেতাবগুলো টেনে বার করেছিল কেন? নিশ্চয় তারা কিছু খুঁজছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও মানিকের কথায় সায় দি। যদু আলমারির ভিতরে হস্তচালনা করেছিল একটা কিছু খোঁজবার জন্যেই। কেবল আলমারি কেন, খুব সম্ভব সে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও খোঁজাখুঁজি করতে ছাড়েনি।'

বীরেন বললে, 'কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যা দেখে চোরের লোভ হতে পারে। আলমারির বইগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তার মধ্যে ছিল বটতলায় ছাপা কতকগুলো সেকেলে বই— আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা প্রভৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আর ওই শ্রেণির অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আর তাড়া তাড়া বাজে কাগজপত্র। ব্যাস, আর কিছুই নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'ওই সঙ্গে আপনার ঠাকুরদার নিজের হাতে লেখা একখানা খাতাও ছিল বললেন না?'

—'হ্যাঁ, ছিল। ছেলেবেলায় সেকেলে জড়ানো হাতের লেখা পড়বার আগ্রহ হয়নি, সম্প্রতি পড়ে দেখেছি। খাপছাড়া খোশগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি। খাতাখানা আগে ছেঁড়া ছিল না, এখন দেখছি মাঝখান থেকে একখানা কাগজ কে ছিঁড়ে নিয়েছে।'

—'কী করে বুঝলেন?'

—'পত্রাঙ্ক দেখে।'

জয়ন্ত বললে, 'সন্দেহজনক, সন্দেহজনক! বীরেনবাবু, খাতাখানা একবার দেখতে পেলে ভালো হত।'

নিজের হাতব্যাগের মধ্যে হস্তচালনা করে বীরেন বললে, 'অনায়াসেই দেখতে পারেন। যদি কাজে লাগে এই ভেবে সে খানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি'—এই বলে এক্সারসাইজ বুকের আকারে বাঁধানো একখানা পাতলা খাতা বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত খাতাখানা খুলে আগাগোড়া পাতা উলটে প্রথমে ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে গেল। টানা টানা জড়ানো লেখা, কিছু কষ্ট করে পড়তে হয়। সে বললে, 'দ্যাখো মানিক, ৪০ পত্রাঙ্কে খাতা শেষ। বিষয়বস্তু দেখছি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকার মতো একটুখানি অংশ। তার পরের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'আভাস'। তৃতীয় অংশে কী ছিল জানবার উপায় নেই, ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। পঞ্চম অংশে 'উপসংহার'—একটি পুঁচকে পদ্য বা ছড়া। এখন আগে ভূমিকাটুকু শোনো।'

জয়ন্ত পড়তে লাগল:

'যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, তার নাম এখানে বলব না, লেখায় প্রকাশ করলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। আমার সঙ্গী কৈলাস চৌধুরি এখন পরলোকে বটে, কিন্তু তার কুচরিত্র পুত্র ইহলোকে বিদ্যমান থেকে কেমন করে কিছু আভাস পেয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে, এমনকি আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়ছে না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, সমস্ত গুপ্তকথা জানবে কেবল আমার পুত্র। যদি সে কখনও অভাবে পড়ে, এই গুপ্তকথা তার কাজে লাগবে, তার দুশ্চিন্তা দূর করবে। অন্তিমকাল উপস্থিত হলে সমস্ত গুপ্তকথাই তার কাছে ব্যক্ত করব। যদি সে সময় না পাই, তাহলেও আমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। আমার পুত্র বুদ্ধিমান, তার জন্যেই তোলা রইল এই খাতাখানা। এই বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলেই সমস্ত রহস্য সে সমাধান করতে পারবে।'

পড়া থামিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?'

—'আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ছায়া ছায়া মনে পড়ে মাত্র।'

—'আপনার বাবার মুখে আপনি এই খাতাখানার কথা শোনেননি?'

বীরেন সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'বাবা? আমার বাবা পড়বেন গল্পের পাণ্ডুলিপি? মশাই, বাবাকে আমি জীবনে কোনো ছাপানো নভেলের পাতাই ওলটাতে দেখিনি! নিজের কারবারের বাইরে আর কোনো কথাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না।'

জয়ন্ত আবার কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে কী ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদা মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুশয্যায় আপনার বাবাকে এই খাতা সম্বন্ধে কোনো কথা বলে যাননি?'

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, 'কিছু না, কিছু না। মশাই, ওই খাতার ভিতরে ঠাকুরদার নিজের কোনো কথাই নেই, ওর সবটাই হচ্ছে ডাহা গালগল্প। আর মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা কোনো কথা বলে যাবেন কী, মরবার সময়ে তিনি কোনো কথা বলবার অবসরই পাননি।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে হচ্ছে, ঠাকুরদা তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বুকের অসুখে মারা পড়েছিলেন। খেলার আসর থেকে তুলে তাঁর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।'

জয়ন্ত নিজের রুপোর শামুকদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে খুশি গলায় বললে, 'খানিকটা আবছা কাটল বলে মনে হচ্ছে। হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যু, কোনো কথা বলাই সম্ভব হয়নি—বটে, বটে, বটে!'

বীরেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'আপনি কী বলতে চান জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'আপাতত আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় হয়নি। এখন খাতার দ্বিতীয় অংশে কী 'আভাস' পাওয়া যায় দেখা যাক।' সে আবার পাঠ শুরু করলে:

'বাল্যকালে আমার জীবনে ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে দহরম-মহরম ছিল কৈলাস চৌধুরির সঙ্গে। সে ছিল আমার নিত্যসঙ্গী—খেলাধুলায় ও আহারে-বিহারে আমরা সর্বদাই মানিকজোড়ের মতো একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কৈলাসের সঙ্গে একবার তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলুম। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল তফাতে। সেখানে আমরা হাটে-বাটে-মাঠে ছুটোছুটি করে, মার্বেল-ডাংগুলি খেলে ও গঙ্গার এপারে-ওপারে সাঁতার কেটে তিন দিন কাটিয়ে দিলুম মহা আনন্দে। তারপরেই ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছিল। এ দেশে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তখন নতুন শুরু হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে খেলা দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ এক বিপত্তি! মাঠের একদিকে গঙ্গাতীরে ছিল একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো বাগানবাড়ি। এবং তার পিছনে ছিল একটা জলশূন্য পুরানো ইঁদারা। ফুটবলটা ঝুপ করে গিয়ে পড়ল একেবারে সেই ইঁদারার ভিতরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। ইঁদারার ভিতরে নজর চলে না। ছেলের দল খানিক হইচই করে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি বললুম, 'কৈলাস, বলের জন্যে ওরা কাল সকালে নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে আমরাই আজ কুয়োয় নেমে বলটাকে তুলে আনব।'

কৈলাস শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, এই অন্ধকারে? পাগল নাকি?'

চিরকালই সবাই আমাকে ডানপিটে ও বেপরোয়া বলে জানে। আমি কিন্তু একটুও দমলুম না, বললুম, 'বেশ তোকে কুয়োয় নামতে হবে না, তুই খালি খানিকটা মোটা দড়ি আর একটা দেশলাই জোগাড় করে আন দেখি! তুই কেবল উপরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কুয়োর ভিতরে নামব একলা আমিই। ফাঁকতালে একটা আস্ত ফুটবল লাভ, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে!'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এল দড়ি ও দেশলাই। ভরসন্ধ্যাবেলায় দড়ি বেয়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পায়ের তলায় কী কতকগুলো খড়মড় খড়মড় করে উঠল। দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি জ্বেলে কেবল এইটুকু দেখলুম, ইঁদারার গায়ে গাঁথা রয়েছে একজোড়া হাতলওয়ালা লোহার দরজা। তারপর কাঠি নিবে গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বেলে নীচের দিকে তাকিয়েই সচমকে দেখি কতকগুলো মাংসহীন নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে আমার পায়ের তলায়। তারপর আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম যেন কোনো অপার্থিব বিভীষণের মারাত্মক ফোঁসফোঁসানি!

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল পরমুহূর্তেই সেই ভয়াবহ বিষাক্ত হিস হিস শব্দ যেন আমার চোখের সামনেই মূর্তিমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে! কর্পূরের মতো উবে গেল আমার সমস্ত সাহস, দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে প্রাণপণে দড়ি ধরে কোনোরকমে উপরে এসে উঠলুম।

সব শুনে কৈলাস চোখ কপালে তুলে বললে, 'চুলোয় যাক ফুটবল! ওখানে আছে গুপ্তধন আর যকের পাহারা! গুপ্তধনের লোভে ওখানে গিয়ে যকের হাতে যারা মারা পড়েছে, তুই দেখেছিস তাদেরই কঙ্কাল!'

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

জগৎশেঠের গুপ্তধন

জয়ন্ত বললে, 'খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।'

আবার পড়া শুরু হল:

'সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তাঁরই উপযোগী উপাধি হচ্ছে 'জগৎশেঠ'। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ শাহ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ওই উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হলেও বাঙালি ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হিরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতি কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হিরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নতুন রাজধানী স্থাপন করে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নতুন রাজধানীতে এলেন। নবাব-দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে নবাবি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ তাঁকে 'শেঠ' উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয়, স্বাধীন বাংলা দেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি দিল্লিতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তিনিও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি বলে সুপরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রিঃ) পর সুজাউদ্দিন নবাব হয়ে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হচ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে হল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মতো তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন,—এটুকু তাঁর খেয়াল এল না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হচ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আলিবর্দি খাঁয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দির সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর দুই পৌত্র—মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশির ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলা দেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসিরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যাবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দির মৃত্যু ও ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ করে জগৎশেঠ আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

জগৎশেঠরা আবার পূর্বগৌরবের পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরও বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত করে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নতুন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠরা সুখী হতে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দি করে ফেললেন (১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নতুন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড়োছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ করেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বাংলার ভুয়ো নবাবির সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁকজমক

ম্লান হয়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য করে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়—তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

তাঁর আদেশে একটি গুপ্তকুঠি নির্মিত হল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠির কাহিনি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি কমে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরও দুইজন জগৎশেঠের নাম শোনা যায়—হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মতো দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনি শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই—আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোনো ব্যক্তি।'

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! সব তো শোনা হল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন—তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক!' বলে সে পড়তে লাগল:

> বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্থি'
> গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।
> কিন্তু আমি ঠিক জানি তাই,
> গুপ্তপথে রপ্ত সবাই!
> সর্বজনের সামনে লুকোয় সহ[illegible] পথের পন্থী।

বিন্দু বারি সিন্ধু হলে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ যে বাবা দস্তুরমতো হেঁয়ালি!'

বীরেন বললে, 'প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মতো!'

মানিক বললে, 'খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কী মনে করো, বীরেনবাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোনো সম্পর্ক আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।'

মধু একখানা খাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবু, একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।'

—'অদ্ভুত লোক?'

—'হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!'

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কোথায় সে?'

—'বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন করে চলে গেল!'

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, 'সাবধান, সাবধান,—সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরিকে সাবধান।'

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

কে প্রতাপ চৌধুরি?

মানিক বললে, 'কী আশ্চর্য! কে এই সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরি? বার বার তার কথা তুলে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরও একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অদ্ভুত লোকটা? পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!'

বীরেন বললে, 'আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বেনামা চিঠি লিখে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'এই গেরুয়াবস্ত্রধারী রহস্যময় লোকটা কে তা জানি না, কিন্তু প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারি।'

বীরেন বললে, 'পারেন নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হয়তো মিথ্যা নয়। আপনার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবুর লেখা পড়ে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন ইঁদারায় নেমেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৈলাস চৌধুরি। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, কৈলাস চৌধুরির কুচরিত্র পুত্র গুপ্তরহস্যের আভাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। খুব সম্ভব তারই নাম প্রতাপ চৌধুরি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু গুপ্তরহস্যটা কী?'

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, 'জগৎশেঠের রত্নকুঠি।'

—'আরে ধেৎ, তুমিও কি ওই রূপকথাটা বিশ্বাস করো?'

—'করি। জগৎশেঠ কুশলচাঁদের গুপ্তধনের কথা আমিও ঐতিহাসিক কাহিনিতে পাঠ করেছি।'

—'ইতিহাস আর কাহিনি এক কথা নয়।'

—'তা নয়। কিন্তু সেকালের ধনীদের মধ্যে গুপ্তধন রাখার প্রথাটা খুবই চলিত ছিল। আর বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা পড়লে এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে, তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তা নইলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, লেখার মর্মোদ্ভেদ করতে পারলে তাঁর পুত্রের অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে।'

মানিক বললে, 'ধরলুম কৈলাস চৌধুরির ছেলেরই নাম হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরি। হয়তো সত্য-সত্যই তার চরিত্র হচ্ছে সাক্ষাৎ-শয়তানের মতো ভয়াবহ। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন? এ মামলাটা নিয়ে এখনও আমরা তদন্তে নিযুক্ত হইনি। সে আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারবে কেমন করে?'

জয়ন্ত শুধোলে, 'বীরেনবাবু, আপনি যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে চান, এ কথা কি আর কারুর কাছে প্রকাশ করেছেন?'

বীরেন সবেগে মাথা নেড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই নয়! আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না যে, আমি আপনাদের কাছে এসে ধরনা দেব!'

—'তাহলে অন্য কোনো পক্ষের লোক আপনার পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে। আপনি যে আমাদের কাছে এসেছেন, এর মধ্যেই সে খবর তারা পেয়ে গেছে। জানেন তো, অপরাধীদের কাছে আমরা অপরিচিত নই?'

বীরেন বললে, 'এ কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কারা তারা?'

—'হয়তো তথাকথিত যদুনাথ বসুর দল। হয়তো যদুনাথ হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরিরই ছদ্মনাম!'

মানিক বললে, 'যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির কথা বলতে পারি না, তবে এমন আর একজন লোকও বীরেনবাবুর প্রত্যেক গতিবিধির খবর রাখে, যে প্রতাপ চৌধুরির বন্ধু নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি বেনামা পত্রলেখকের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তোমার মতে সায় দি। আমরা এখনও কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি, কিন্তু ব্যাপারটা যে গোড়াতেই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোরালো হয়ে উঠল! আপাতত আমাদের এই প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বীরেনবাবু, আপনি প্রতাপ চৌধুরিকে চেনেন?'

—'না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, খুনখারাবিতে সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। একবার কোথায় কী অপরাধ করে সে পনেরো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত! মানিক! এই সেই 'সোনার আনারস' মামলার প্রতাপ চৌধুরি নয় তো? আমরাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম, পনেরো বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়ে এক বছরের মধ্যেই জেল থেকে সে পালিয়ে যায় আর সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার দলের আর-একজন লোককেও।'

মানিক বললে, 'তারও নাম মানিকচাঁদ। সে-ও এক মারাত্মক অপরাধী, আমাদের প্রায় মৃত্যুপথে পৌঁছে দিয়েছিল, সুন্দরবাবুর জন্যে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ, সব মনে পড়ছে! প্রতাপ চৌধুরি সেই সময়েই আমাকে বলেছিল, কোনো কারাগারই তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।'

মানিক বললে, 'ও বাবা, সে যে এক মহা ধড়িবাজ ব্যক্তি! সেবারে তার হাত থেকে আমরা বাঘরাজাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। গ্রেপ্তার হবার পর সে আমাদের বলে গিয়েছিল—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে।' এখন সে

জেলের বাইরে এসেছে। এইবারে আবার কি তার দেখা পাব?'

জয়ন্ত বললে, 'সে আবার দেখা দেবে কি দেবে না জানি না। কিন্তু সে যদি এই প্রতাপ চৌধুরি হয়, আর আমরা যদি বীরেনবাবুর মামলার ভার গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

সুন্দরবাবু মস্তক আন্দোলন করে বললেন 'হুম! সে বুঝি সহজ কথা? গেলবারেই দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরিটা মেঘনাদের মতো আড়ালে থেকে এমন কায়দায় যুদ্ধচালনা করে যে, কেউ তাকে ধরতে-ছুঁতে পারে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু তার যুদ্ধচালনায় কৌশলটা আমরা জেনে নিয়েছি, সুতরাং এবারে আর বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।'

আচম্বিতে সকলকে চমকে দিয়ে রাস্তার ধারের জানলার গরাদের উপরে ঠকাং করে কী-একটা এসে পড়ে ছটকে গেল অন্য দিকে এবং পরমুহূর্তে জেগে উঠল কামানগর্জনের মতো একটা কানফাটানো ভীষণ শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে বাড়িঘর কাঁপতে লাগল! হু হু করে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত দৃশ্য! সম্মিলিত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! জনতার উচ্চ কোলাহল! এ যেন পরম শান্তির মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

হোটেলখানায় সন্ন্যাসী

এই অভাবিত ও আকস্মিক উৎপাত স্তম্ভিত করে দিলে সকলের দেহ এবং মন। জানালা দিয়ে হু হু করে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল বারুদের গন্ধমাখা রাশিকৃত ধোঁয়া, সকলে ফ্যালফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

বাইরের থেকে সামনে ভেসে আসছে আর্তনাদ, হট্টগোল, বহু লোকের দ্রুত পদশব্দ।

কে চিৎকার করে বললে, 'শিগগির ফোন করে দাও! অ্যাম্বিউল্যান্সের ব্যবস্থা করো!'

সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিলে জয়ন্ত। দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পথের দিকে করলে দৃষ্টিপাত। এদিকে-ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বোমা! আমাদের জানালা লক্ষ্য করে কেউ বোমা ছুড়েছে!'

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'হুম! হুম! হুম!'

—'কিন্তু আমাদের জোর কপাল। বোমাটা ঘরের ভিতরেও আসেনি, জানালার গরাদের গায়ে ধাক্কা লেগেও তার বিস্ফোরণ হয়নি, পথের উপরে আছড়ে পড়বার পর সেটা ফেটে গিয়েছে!'

মানিক বললে, 'এই বন্ধ ঘরের ভিতরে বোমা ফাটলে আমরা কেউ আর বাঁচতুম না!'

—'তা হয়তো বাঁচতুম না। কিন্তু তা হয়নি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।'

সুন্দরবাবু রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করলেন না, তাদের অবস্থাটা দেখে আসা দরকার। চলুন, নীচেয় নেমে তদারক করে আসি।'

রাজপথের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্ত আর রক্ত! এখানে-ওখানে বইছে যেন রক্তের রাঙা লহর! তারই মধ্যে ছটফট করছে তিনটে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। আর একটা দেহ একেবারে আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ। সে বীভৎস দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না—বীরেন শিউরে উঠে 'উঃ' বলে হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে বসে পড়ল।

রাজপথের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'দ্যাখো জয়ন্ত, দ্যাখো! বোমা ফেটে পথের উপরে কত বড়ো একটা গর্ত হয়েছে—ওরে বাস রে বাস!'

মানিক বললে, 'অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা!'

জয়ন্ত বলে, 'কিন্তু ছুড়লে কে, সেইটেই এখন জানা দরকার।'

পথে লোকে লোকারণ্য, ছুটোছুটি, ভীত চিৎকার! কেউ স্থির হয়ে কারুর কথা শুনছে না, নানাজনে নানাপ্রকার মত জাহির করছে!

ওধারের ফুটপাতে ছিল একখানা চায়ের দোকান, জয়ন্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, 'হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা আমি দেখেছি! একখানা ছুটন্ত মোটর থেকে একটা লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার বাড়ির দোতলার জানালার দিকে বলের মতো একটা জিনিস ছুড়ে মারলে—'

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'কীরকম মোটর? ট্যাক্সি?'

—'না, লাল রঙের প্রাইভেট মোটর।'

—'সিডান বডি?'

—'না, খোলা গাড়ি।'

—'নম্বর?'

—'আরে মশাই, নম্বর দেখবার সময় কি পেয়েছি? তারপরেই ভীষণ শব্দ আর বিষম হুলুস্থুল—আঁতকে উঠে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলুম।'

—'তুমি তো ভারী বোকা লোক হে! কেন তুমি আঁতকে উঠলে, কেন তুমি নম্বরটা টপ করে দেখে নিলে না?'

—'মশাই গো, এখানে থাকলে আপনিও তখন আমারই মতন বোকামি করতেন!'

—'কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয়, আমি সে পাত্রই নই!'

জয়ন্ত বললে, 'যাক গে ও-কথা। তারপর কী হল বলো।'

—'তারপর মুখ ফিরিয়ে সেই লাল মোটরখানা আর দেখতে পেলুম না। গাড়িখানা একবারও থামেনি, তিরের মতো ছুটে মিলিয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু গজগজ করে বললেন, 'যাবেই তো, মিলিয়ে যাবেই তো! তুমি নম্বর দেখবে বলে সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না!'

চায়ের দোকানের মালিক হঠাৎ সচমকে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন!'

—'দেখব? কী দেখব?'

—'সেইরকম একখানা লাল মোটর আবার এইদিকে ছুটে আসছে!'

—'হুম, বলো কী?'

—'না, না, গাড়িখানা খানিকটা এসেই আবার মোড় ফিরে পাঁই পাঁই করে সরে পড়ল!'

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!'

মানিক বললে, 'মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবেন কেন সুন্দরবাবু? কোথাও ট্যাক্সি নেই, লাল মোটরের পিছু ধরা অসম্ভব!'

বীরেন বললে, 'হ্যাঁ, লাল মোটরখানা আড়ালে চলে গেছে—আর ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ফাঁকি দিলে যে, ফাঁকি দিলে! হায় হায় হায় হায়!'

জয়ন্ত বললে, 'দূর থেকে কারুকে চিনতে পারলুম না বটে, তবে এটুকু আমার চোখ এড়ায়নি যে, গাড়ির ভিতরে ছিল তিনজন আরোহী আর তাদের একজনের দেহে ছিল সাহেবি পোশাক।'

—'কিন্তু জয়ন্ত, ওখানা বোধহয় অপরাধীদের গাড়ি নয়। তাহলে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত না।'

—'গাড়িখানা সন্দেহজনক। নইলে এইদিকে আসতে আসতে হঠাৎ অন্য পথ ধরে এত তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কেন?'

মানিক বললে, 'আমার বোধ হয় অপরাধীরা দেখতে এসেছিল তাদের বোমা লক্ষ্যভেদ করেছে কি না!'

—'আমারও সেই বিশ্বাস। তারপর ঘটনাস্থলে আমাদের বহাল তবিয়তে বর্তমান দেখে চটপট চম্পট দিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী দুঃসাহসী অপরাধী!'

—'এই মামলার সঙ্গে ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু তার দুঃসাহসের প্রমাণ আগেও কি আপনি পাননি সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'পেয়েছি বই কি, পেয়েছি বই কি! ওই দ্যাখো, পুলিশ এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিউল্যান্সের গাড়িও!'

জয়ন্ত বললে, 'আসুন, আমরা চুপি চুপি সরে পড়ি।'

—'কিন্তু সরে পড়বে কোথায়? বোমা ছুড়েছে তোমার বাড়ির উপরে, পুলিশ তোমাকে খুঁজবেই।'

—'সে সব পরের কথা। এখন আর-একটা দৃশ্য দেখুন।'

—'দৃশ্য? আবার কী দৃশ্য?'

—'চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। একটু দূরে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের পাড়ায় হোটেলবাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি! পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ। এই লোকটাই কি খানিক আগে মধুর হাতে বেনামা চিঠি সমর্পণ করে গেছে?'

—'হুম!'

—'আচ্ছা, আমি খবরাখবর নিয়ে আসি, আপনারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।' এই বলে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

উদরপরায়ণ সন্ন্যাসীপ্রবর

মানিক ও বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার জয়ন্তের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে নিজের গুরুভার কলেবর স্থাপন করলেন সশব্দে।

এবং তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, 'ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! মনটা বড়োই উত্তেজিত হয়েছে বাবা, এক পেয়ালা চা না পেলে তো শান্ত হবে না!'

কিন্তু চায়ের পেয়ালা আসবার আগেই সেখানে হল পুলিশের আবির্ভাব। স্থানীয় থানার ইনস্পেকটার তদন্তে এসে সুন্দরবাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন, কিন্তু আসল রহস্যের কোনোই পাত্তা পেলেন না, তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল কেউ বা কারা ভ্রমক্রমে এই বাড়ির উপরে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

পুলিশ প্রস্থান করলে পর মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে চা আসবে তো?'

—'নিশ্চয়! সেইসঙ্গে কিছু 'ইত্যাদি' থাকলেও আপত্তি করব না।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার রসনেন্দ্রিয় কি সর্বদাই 'ইত্যাদি'র জন্যে তৈরি হয়ে থাকে?'

—'সর্বদাই ভাই, সর্বদাই! জীবদেহের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে উদরপূজা। অতএব আসুক চায়ের সঙ্গে ইত্যাদি। ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! এত মিষ্টি করে ডাকছি, তবু সাড়া পাই না কেন বাপধন?'

সুন্দরবাবু চা এবং 'ইত্যাদি' নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ততক্ষণে জয়ন্ত কী করছে দেখে আসা যাক।

জয়ন্ত হোটেলের কাছে আসতে-আসতেই দেখতে পেলে, ছাদের উপর থেকে জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, কেন? তাকেই দেখে নাকি? সে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলে।

ভাতের হোটেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত খরিদ্দারের ভিড়।

মালিক জয়ন্তের পরিচিত। সে উদগ্রীব হয়ে হোটেলবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ন্তকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই, ওখানে অত দুমদাম, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি কেন?'

খুব সংক্ষেপে হোটেলওয়ালার কৌতূহল চরিতার্থ করে জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার এখানে আজ কোনো স্বামীজি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে?'

—'হয়েছে বই কি! তাঁর নাম বোধহয় ভোজনানন্দ স্বামী!'

—'আপনার এমন অনুমানের কারণ?'

—'একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক। মাছ-মাংস কিছুই বাদ যায় না। নিরামিষে অত্যন্ত অরুচি। জনকয় এমন স্বামীজিকে পেলে আমাকে আর হোটেল চালাবার জন্যে ভাবতে হয় না।'

—'স্বামীজি কি আপনার পুরনো খরিদ্দার?'

—'উঁহু, আজ এই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো পেলুম।'

—'তিনি এখনও হোটেলে আছেন তো?'

—'আছেন বই কি!'

—'আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

—'বেশ তো, সোজা উপরে উঠে যান। বিবিধ উপচারে উদরসেবা করে তিনি এখন দেহকে একটু হালকা করবার জন্যে ছাদের উপরে পায়চারি করছেন।'

কিন্তু ছাদের উপরে স্বামীজির জটা বা টিকির খোঁজ পাওয়া গেল না। হোটেলের কোনো ঘরেও নয়। বাড়ির খিড়কির দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন খোলা রয়েছে। স্বামীজির অন্তর্ধানের রহস্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত আবার সদরের দিকে ফিরে এল হতাশভাবে।

হোটেলওয়ালা তখনও সেখানে মোতায়েন ছিল। 'স্বামীজির সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়নি?' মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলে।

—'না। কেমন করে জানলেন আপনি?'

—'আপনি উপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীজিকে খিড়কির দিক থেকে হনহন করে এদিকে আসতে দেখলুম। আমি তাঁকে আপনার কথা জানালুম। তিনি বললেন, 'আমার এখন বড়ো ত্বাড়া, কারুর সঙ্গে মুলাকাত করবার ফুরসত নেই।' তারপর হন্তদন্তের মতো এগিয়ে ওই গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।'

জয়ন্ত বুঝলে, এখন আর স্বামীজির পশ্চাদ্ধাবন করা মায়ামৃগের পিছনে ছোটার মতোই ব্যর্থ হবে। সে বাড়িমুখো হল এই ভাবতে ভাবতে: স্বামীজি আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছেন কেন? তিনি বেনামা চিঠি বিলি করে গুম হয়ে যান। নাগাল ধরতে গেলে পিঠটান দেন। যেন আমাদের ভয় করেন!

স্বামীজির মাছ-মাংস সবই চলে। একাই খতম করেন তিনজনের খোরাক। যেখানে-সেখানে যার-তার হাতের রান্না খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। স্বামীজি সংযম বা বাছবিচারের ধার ধারেন না। তবে কি তিনি নকল স্বামীজি? তাঁর জটাজুট আর গৈরিক সাজ কি বাজে ভড়ং? তিনি কি ছদ্মবেশী?

বাড়িতে পৌঁছতেই মানিক শুধোলে, 'কী হল জয়ন্ত? সন্ন্যাসী কী বললেন?'

—'কিছুই বললেন না। অর্থাৎ কিছু বলবার আগেই আড়ালে গা ঢাকা দিলেন!'

—'বটে, বটে? এই সন্ন্যাসীপ্রবর দেখছি রহস্যের অবতার! অতঃপর?'

—'অতঃপর তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আজকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করব।'

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'হুম! এর মানেটা কী?'

—'মানে একটা আছে বই কি! কিঞ্চিৎ তদন্তের দরকার।'

—'কীসের তদন্ত?'

—'গুপ্তধনের।'

বীরেন বললে, 'আপনি তাহলে আমার ঠাকুরদার গল্প সত্য বলে মনে করেন?'

—'করি! দেখছেন তো, আপনি এখানে এসেছেন বলে এর মধ্যেই আমাদের উপরে হামলা শুরু হয়েছে! কোনো লোক বা দল চায় না যে, আমরা আপনাকে সাহায্য করি। তাদের এই আপত্তির মূলে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে।'

—'কিন্তু সেজন্যে মুর্শিদাবাদে যাবার প্রয়োজন কী?'

—'জগৎশেঠরা মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন।'

—'সুতরাং তাঁদের রত্নকুঠি আছে মুর্শিদাবাদেই, এই হল আপনার যুক্তি?'

—'ঠিক তাই।'

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, 'জগৎশেঠের বিরাট প্রাসাদ মুর্শিদাবাদেই ছিল বটে, কিন্তু এখন গঙ্গা তাকে গ্রাস করেছে। সেখানে আজ গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ডুবুরি সাজা ছাড়া উপায় নেই। আপনি কি এ খবর রাখেন না?'

—'রাখি বই কি!'

—'তবে? এইজন্যেই তো আমি ঠাকুরদার কাহিনিটা বাজে গল্প বলেই ধরে নিয়েছি।'

—'ভুল করেছেন।'

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার যুক্তিটা শুনি?'

—'যথাসময়ে বলব। এখন তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করুন।'

—'কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন বাপু?'

—'মনে রাখবেন, বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা খাতার কিছু অংশ যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির হাতে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই হয়তো রত্নকুঠির ঠিকানা আছে। দেরি করলে আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে অষ্টরম্ভা।'

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

বিপদের সংকেত

মুর্শিদাবাদ। নগরপ্রান্তে শীতকালের মরা গঙ্গা। যেন কোনো অগভীর বড়ো খাল, কারণ জলে স্রোত নেই বললেও চলে। এখানে-ওখানে হেঁটে পার হওয়া যায়।

নৌকোর চালে বসে জয়ন্ত বলছিল, 'পলাশির যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদের রূপ ছিল ভিন্নরকম। তখনকার ইংরেজদের চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারি, সে মুর্শিদাবাদ আকারে আর সৌন্দর্যে বিলাতের লন্ডন শহরের চেয়ে বৃহৎ আর উন্নত ছিল!'

মানিক বললে, 'আজকের মুর্শিদাবাদকে দেখে তো মনে হচ্ছে, কলকাতার শহরতলিও এর উপরে টেক্কা মারতে পারে।'

—'এ হচ্ছে আজ স্মৃতির শ্মশান। দিকে দিকে ছড়ানো আছে ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ আর পড়ো পড়ো, বেরঙা, শ্রীহীন অট্টালিকা।'

বীরেন বললে, 'মরা গঙ্গার ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওই নামমাত্র সার আধুনিক নবাবদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে লোক তাই দেখবার জন্যে ওখানে গিয়ে ভিড় করে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার কিন্তু ওদিকে ফিরে তাকাতেও লজ্জা করে। যারা একদিন গড়েছিল কবির স্বপ্ন তাজমহল আর আগ্রা-দিল্লির অপরূপ দুর্গপ্রাসাদ, তাদেরই রুচিহীন, ভাগ্যতাড়িত বংশধররা আজ গড়ে তুলেছে ইংরেজদের অনুকরণে মস্তবড়ো এক বিজাতীয় প্রাসাদ—নকলের মহিমায় খাস্তা হয়ে গিয়েছে আসলেরও স্বরূপ! এ হচ্ছে দাস-মনোভাবের অসহনীয় পরিচয়!'

বীরেন বললে, 'গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদে জীবন্ত নবাবদের শৌখিন আস্তানা, আর ওপার আছে তাঁদের মৃতদেহের অন্তিম ধরণীশয্যা। একদিন নবাবির জাঁকে যাঁদের জরির জুতো পরা পা মাটিতে ছুঁতে চাইত না, আজ তাঁদের দেহাবশেষ জীর্ণ কবরের তলায় মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে। আলিবর্দির সমৃদ্ধ সমাধির ছায়ায় দীনতাপূর্ণ কবরের ভিতরে শায়িত আছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বিপথচালিত সিরাজদ্দৌলার নশ্বর দেহের অশ্রুকরুণ স্মৃতি!'

স্রোতহীন গঙ্গাজলের উপর দিয়ে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় টেনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকো। অগভীর পরিষ্কার গঙ্গাজল, স্পষ্ট দেখা যায় তলা পর্যন্ত—সর্বত্র বিকীর্ণ রয়েছে স্পঞ্জের মতো শৈবালপুঞ্জ।

বীরেন বললে, 'ওপারে ওইখানে ছিল সিরাজদৌল্লার প্রমোদপ্রাসাদ! একদিন ওখানে দুলত কক্ষে কক্ষে রঙিন আলোকমালা, নাচ, গান আর বাজনায় সংগীতময় হয়ে উঠত চাঁদের আলো। কিন্তু আজ সেখানে দিনের বেলাতেও শোনা যায় না মানুষের কণ্ঠরব, কেবল সন্ধ্যান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটানা বেজে চলে ঝিল্লিদের বিজনতার গান আর থেকে থেকে কেঁদে ওঠে শিবাদের অশিব নাদ!'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'আর সেই প্রমোদভবন?'

—'সিরাজদৌল্লার অপঘাত-মৃত্যুর পর তাঁর প্রমোদভবনও গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।'

সবাই স্তব্ধ। নৌকো এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। জলে ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মানিক জিজ্ঞাসা করে, 'গঙ্গাতীরের কাছে জলের কাছে জেগে রয়েছে কতকগুলো বড়ো বড়ো ইটের স্তূপ। দেখলে মনে হয়, যেন একসময়ে ওখানে ছিল কোনো অট্টালিকা।'

বীরেন বললে, 'তাই বটে। যাঁর কাছে হাত পেতে নবাবের রাজত্ব আর ইংরেজদের ব্যবসায় চলত, একদিন ওইখানেই ছিল ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠের ঐশ্বর্যগর্বিত বৃহৎ প্রাসাদ! আজও তার দু-এক টুকরো ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অল্প দিনে তাও তলিয়ে যাবে কীর্তিনাশা গঙ্গার গর্ভে।'

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠে বললে, 'যাবেই তো। যাওয়াই উচিত। শেঠদের স্মৃতিও আমার মনকে পীড়িত করে। রাজপুতানার শুকনো মরুপ্রান্ত থেকে বিদেশি মাড়োয়ারি এসেছিল সুজলা সুফলা বাংলা দেশের অর্থ লুণ্ঠন করতে। তারা লক্ষ্মীলাভ করেছিল বটে, কিন্তু বাংলার প্রতি ছিল না তাদের এতটুকু প্রাণের টান, তাই তারা বংশানুক্রমে প্রথমে রাজার, তারপর দেশের বিরুদ্ধে বার বার চক্রান্ত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অবশেষে আরও কোনো কোনো দুরাত্মার সঙ্গে মিলে জগৎশেঠরাই ষড়যন্ত্র করে বাংলা দেশকে লুটিয়ে দেয় ফিরিঙ্গিরাজের বুটজুতোর তলায়। সেই মহাপাপের ফলেই তো এই দেশদ্রোহী বংশের উপরে পড়েছে বিশ্বদেবের অমোঘ অভিশাপ, ইতিহাসে আছে কেবল তাদের চরম অপযশ, নিয়তি কেড়ে নিয়েছে তাদের ঐশ্বর্যের শেষ স্মৃতিটুকুও, লাভ করেছে সলিল সমাধি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেননি। সুদূর মুঙ্গেরে তাদের দুই ভাইয়ের জীবন্ত দেহ গ্রাস করেও তাঁর ক্ষুধা মেটেনি, মুর্শিদাবাদে এসে বিশ্বাসঘাতকের স্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত নিজের জঠরের জলাবর্তে টেনে না নিয়ে তিনি ছাড়েননি।'

জলের উপরে জেগে থাকা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের একপাশে চুপ করে ছবিতে আঁকার মতো একটা নিশ্চল বক—যেন বিভোর হয়ে আছে অতীত গৌরবের স্বপ্নে।

বীরেন বললে, 'জয়ন্তবাবু, আজ ওই জলের তলায় কোথায় খুঁজে পাবেন জগৎশেঠের রত্নকুঠি?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আমরা তো জলের তলায় খুঁজব না!'

—'তবে কোথায়? ডাঙায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডাঙায় শেঠদের প্রাসাদের কোনো চিহ্নই নেই!'

—'তবু খুঁজে দেখব।'

—'কী আশ্চর্য, আপনার বক্তব্য কী?'

সুন্দরবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ!'

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, খাতায় জগৎশেঠদের ইতিহাসে কী লেখা আছে? জগৎশেঠ কুশলচাঁদ নিজের সম্পত্তির কতক অংশ লুকিয়ে রাখবার জন্যে গুপ্তকুঠি নির্মাণ করেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কুশলচাঁদ নিশ্চয় নির্বোধ ছিলেন না। নিজেদের জনাকীর্ণ, বিখ্যাত প্রাসাদের ভিতরে গুপ্তকুঠি নির্মাণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল প্রাসাদ থেকে দূরে অন্য কোথাও গুপ্তকুঠি নির্মাণ করা। রাজধানীর বাইরেও যে ধনকুবের জগৎশেঠদের ভূ-সম্পত্তি ছিল, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। বীরেনবাবুর ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু গঙ্গাতীরের এক পোড়ো বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তার পিছনে আছে এক সেকেলে নির্জন ইঁদারা—তার গায়ে গাঁথা লোহার দরজা। আমি আন্দাজ করি, ওই বাগানবাড়ির অধিকারী ছিলেন জগৎশেঠ কুশলচাঁদ। সেকালের রাজা-রাজড়া আর ধনপতিরা প্রায়ই পুষ্করিণী বা ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন রক্ষা করতেন, 'সোনার আনারস' মামলাতেও আমরা এই শ্রেণির এক ইঁদারার সন্ধান পেয়েছিলুম, আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। কুশলচাঁদও নিশ্চয় সেকালের সেই রীতি বজায় রেখেছিলেন। ইঁদারার গুপ্তকুঠির মধ্যে রক্ষা করেছিলেন নিজের অতুল সম্পত্তির কতক অংশ। গুপ্তধন রক্ষা করবার পর সেকালের ধনিকরা আর এক নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলতেন। যাদের সাহায্যে তাঁরা ধনরত্ন পুঁতে রাখতেন, গুপ্তধনের নিরাপত্তার জন্যে তাদের হত্যা করা হত। কুশলচাঁদও তাই করেছিলেন, আর চন্দ্রনাথবাবু ইঁদারায় নেমে দেখেছিলেন সেই নিহত হতভাগ্যদেরই মাংসহীন কঙ্কাল। ইঁদারা

নির্মাতা আর ধনবাহকদের হত্যা করবার পর কুশলচাঁদ ইঁদারা জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তারপরে কালক্রমে কুশলচাঁদের মৃত্যু, জগৎশেঠদের পতন, তাঁদের প্রাসাদের পাতালপ্রবেশ, বেওয়ারিশ বাগানবাড়ির শোচনীয় দুর্দশা—ঘরদোর যায় ভেঙেচুরে, বাগান পরিণত হয় কাঁটাজঙ্গলে আর ইঁদারা হয়ে যায় জলশূন্য। মানুষ আর সে অঞ্চল মাড়ায় না। অনেককাল পরে চন্দ্রনাথবাবু ফুটবল কুড়োতে ইঁদারায় নেমে অস্থানে লোহার দরজা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠদের গুপ্তধনের কাহিনি জানতেন। তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। তারপর আবার গোপনে ইঁদারায় ফিরে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পান আর তা হস্তগত করেন। বোধহয় সেই সম্পত্তিরই খানিক অংশ নিয়ে তাঁর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। অবশিষ্ট সম্পত্তি অসময়ের ভয়ে আবার লুকিয়ে রাখেন। আমরা তারই আশায় এখানে এসেছি। তাঁর লেখা খাতার সবটা পেলে হয়তো আমাদের কাজের যথেষ্ট সুরাহা হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিপক্ষ দলের হস্তগত হয়েছে। তবু আমরা একবার বাগানখানা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।'

সুন্দরবাবু কৌতুকহাস্য করে বললে, 'ভায়া হে, তুমি যে দেখছি বেশ একটি মনগড়া গল্প ফেঁদে বসে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অজানা বাগানবাড়ির ঠিকানা কোথায় পাবে?'

—'চন্দ্রনাথবাবু লিখেছেন, জিয়াগঞ্জের দশ-বারো মাইল তফাতে আছে সেই বাগানবাড়ি।'

—'হুম, তাহলেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল নাকি?'

—'আরে মশাই, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করুন। ভুলবেন না, জায়গাটা আছে গঙ্গার ধারে। মুর্শিদাবাদের পরেই জিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আমরা হাঁটাপথে গঙ্গাতীর ধরে দশ-বারো মাইল অগ্রসর হব। তারপর খুঁজে সহজেই আবিষ্কার করতে পারব এমন একখানা বেওয়ারিশ, ভাঙাচোরা, পোড়ো, সেকেলে বাগানবাড়ি—যার পিছনে আছে জলশূন্য ইঁদারা আর তার পরে একটা মাঠ। গঙ্গাতীরে দশ-বারো মাইলের ভিতরে ঠিক এইরকম পরিস্থিতির মাঝখানে পরিত্যক্ত প্রাচীন বাগানবাড়ি বোধকরি আর নেই।'

মানিক বললে, 'আমি তোমার মত সমর্থন করি।'

সুন্দরবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত যেভাবে কায়দা করে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাতে আমাদেরও সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কী বলেন বীরেনবাবু?'

বীরেন বললে, 'আমি আর কী বলব মশাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে

আমার মাথা খোলে না। তবে আমার মন্ত্র হচ্ছে—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সাধু, সাধু। একালের ছোকরারা সবাই যদি ওই মন্ত্র মানত! তাহলে জয়ন্ত, কোথায় নেমে আমরা হাঁটাপথ ধরব?'

—'জিয়াগঞ্জের ঘাটে।'

মানিক খুঁতখুঁত গলায় বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, অনেকক্ষণ থেকে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করছি।'

—'কী ব্যাপার?'

—'একটানা উটকো পানসি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।'

—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার অন্য সব জানালা বন্ধ, কেবল একটা খোলা জানালায় একজন লোক যেন আমাদেরই পানে তাকিয়ে আছে।'

—'পানসিখানা একবারও আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়নি। আমরা যখন জগৎশেঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে নৌকো থামিয়েছিলুম, ওই পানসিখানাও থেমে পড়েছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ওর যাত্রা শুরু!'

মাঝি হাঁকলে, 'বাবুজি, এই তো জিয়াগঞ্জের ঘাট!'

জয়ন্ত বললে, 'এসো আমরা এইখানে নেমে পড়ে ওই পানসিখানার ওপরে নজর রাখি।'

নৌকো ঘাটে লাগল। সবাই একে একে নেমে পড়ে একখানা বাড়ির আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

অজানা পানসিখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল! আধ মিনিট থেমে দাঁড়াল, তারপর আবার ঘাট ছাড়িয়ে তরতর করে সোজা চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাব্বা, বাঁচলুম, ফাঁড়া কেটে গেল। ভেবেছিলুম, যণ্ডামার্কা বেটারা আবার বোমা কি বন্দুক ছুড়বে, মনে মনে আমি জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম।'

তাঁর গা টিপে দিয়ে মানিক বললে, 'এখনই অপ্রস্তুত হবেন না মশাই!'

—'হুম, মিছে ভয় দেখাও কেন?'

—'আবার ওই দেখুন।'

—'কী আবার দেখব?'

—'আবার একখানা নৌকো আসছে।'

—'এলেই বা! নদী দিয়ে নৌকো যাবে না?'

—'নৌকোর জানালার কাছে কে বসে আছে দেখছেন তো?'

সুন্দরবাবু দেখলেন, চমকে উঠলেন, তাঁর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত!

নৌকোর জানালার কাছে যে বসে আছে তার মাথার জটার ঘটা, মুখে গোঁফ-দাঁড়ির জঙ্গল, গায়ের গেরুয়া কাপড়েরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে!

জয়ন্ত বললে, 'সেই সন্ন্যাসী।'

এ নৌকোখানাও জিয়াগঞ্জের ঘাট ছাড়িয়ে অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী যেন হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন।'

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

ষড়যন্ত্রের গন্ধ

গঙ্গার ধারে সে জায়গাটাকে বাগানও বলা যায় না, বাড়ি বলাও চলে না। তার স্থানে স্থানে সীমানার বেষ্টনীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে, এই মাত্র। বাগানের বদলে আছে গোটা কয়েক পুরাতন অফলা ফলগাছের সঙ্গে অশ্বত্থ-বটের দঙ্গল ও যত্রতত্র বিকীর্ণ ঝোপঝাপ আগাছার জঙ্গল। এবং বাড়ির বদলে আছে ভেঙে পড়া ছাদ আর ধসে যাওয়া বনিয়াদ আর কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটা টুটা-ফাটা দেওয়াল। দরজা-জানালা একেবারেই অদৃশ্য। তবে একসময়ে এখানে যে কোনো শৌখিন ধনিকের সাধের ডেরা ছিল, তার সামান্য প্রমাণ এখনও বর্তমান আছে এক-একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে বিমলিন পঙ্খের কারুকার্যে। লোকের মুখে শোনা যায়, আগে এখানে ছিল বাগানবাড়ি এবং তার পিছনকার মস্তবড়ো মাঠটা আজও বাগানবাড়ির মাঠ নামে পরিচিত। সেই সূত্রেই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া সহজে সম্ভবপর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'এই হচ্ছে সেই ইঁদারাটা। বাঙালিরা যে কুয়া বা পাতকুয়া তৈরি করে তা হচ্ছে ইঁদারারই ছোটো আকার। সাধারণত ইঁদারা তৈরি করে অবাঙালিরা আর মনে রাখতে হবে জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে।'

সুন্দরবাবু ইঁদারার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, 'ওরে বাবা, এর তলাটা

যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না! তলায় কী আছে কে জানে!'

জয়ন্ত বললে, 'সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি এনেছি, তলায় কী আছে এখনই দেখতে পাব।'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'না ভেবেচিন্তে যখন ডানপিটেদের সঙ্গে এসেছি, তখন পাতাল কত দূর না দেখেই বা উপায় কী? কিন্তু বাপু, আমার অসামান্য বপুখানি নিয়ে ওই যৎসামান্য দড়ির সিঁড়ি ধরে দোদুল্যমান হলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সেটা খেয়ালে আছে কি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইল। সুন্দরবাবু সেদিক থেকে কোনো সান্ত্বনা না পেয়ে বললেন, 'তার উপরে জানোই তো, আমার আবার একটুখানি—ওর নাম কী—ইয়ে আছে!'

মানিক সুন্দরবাবুকে জানত, মুখ টিপে হাসতে লাগল।

বীরেন কিছুই বুঝতে না পেরে শুধোলে, 'ইয়ে আছে? সে আবার কী?'

—'ওই যে গো, যাকে তোমরা বলো ভূতপ্রেত!'

—'ভূতপ্রেত?'

—'হ্যাঁ। আমি যে ওঁদের অস্তিত্ব মানি!' বলেই সুন্দরবাবু যুক্তকরে ললাটদেশ স্পর্শ করলেন।

—'ভূতপ্রেতের সঙ্গে আজ ব্যাপারের সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না? পাজি কুশলচাঁদটা নাকি অনেকগুলো লোককে খুন করেছিল আর তাদের কঙ্কালগুলো নাকি ইঁদারার ভেতরেই পড়ে আছে। হুম! তাদের প্রেতাত্মারাও যে ওইখানে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? অভিশপ্ত শেঠদের গুপ্তধনও আজ হয়েছে যকের ধন, প্রাণটি হাতে করে ওই ইঁদারার ভেতরে নামতে হবে।'

মানিক বললে, 'বেশ তো, প্রাণটি হাতে করেই ইঁদারায় নামবেন, ভূতপ্রেতরা দাবি করলেও তাদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করবেন না।'

সুন্দরবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, 'মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি আবার মশকরা করে জ্বালার উপরে জ্বালা দিয়ো না মানিক! আমি সার কথাই বলছি। চন্দ্রনাথবাবু কি ইঁদারায় নেমে অপার্থিব কণ্ঠের ফোঁসফোঁসানি শোনেননি?'

জয়ন্ত বললে, 'তার মধ্যে অপার্থিব কোনো কিছু নেই।'

—'নেই? তবে ফোঁসফোঁসানিটা কীসের শুনি?'

—'নিশ্চয় সাপ-টাপ। এঁদো কুয়োয় সাপ বাসা বাঁধে।'

—'এটা তোমার অনুমান মাত্র।'

জয়ন্ত দড়ির সিঁড়ির উপরে পা রেখে অধীর স্বরে বললে, 'বাজে কথায় সময় বয়ে যায়! বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরি নয়! মানিক, পাতালে আছে রাতের অন্ধকার, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও, আর একটা লণ্ঠন তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও।'

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, বিপদসাগরে গোঁয়ারের মতো চোখ বুজে ঝাঁপ দিয়ো না! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কারা যেন আড়ালে-আবডালে গা ঢাকা দিয়ে আছে!'

—'শত্রুরা কেমন করে জানবে, আমরা বাগানবাড়ির ঠিকানা আবিষ্কার করেছি?'

—'কিন্তু বুদ্ধিমানের মতে, শত্রুদের অবহেলা করা উচিত নয়।'

জয়ন্ত ইঁদারার মুখ থেকে সরে এসে বললে, 'মানিক, সুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, ওঁর পাকা চুলের সম্মান রক্ষা না করলে অন্যায় হবে। আবিষ্কারের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলুম।'

মানিক বললে, 'না ভুলিনি, এ ব্যাপারে আসল কথাই হচ্ছে গুপ্তধনের কথা।'

—'ঠিক তাই কি? আমার মতে, এখনও 'দিল্লি বহুদূর'! যাত্রাপথে বিস্তর বাধা! গুপ্তধন আমাদের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু যাতে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে একদল শত্রু কি আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে না?'

—'কিন্তু সেই শত্রুরা এখন কোথায়?'

—'জলপথে তারা যে আমাদের অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

—'কিন্তু হঠাৎ স্থলপথ অবলম্বন করে আমরা তাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি।'

—'পেরেছি কি? এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।'

—'হাঁটা পথে এতখানি এগিয়ে এলুম, কোনো শত্রুর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।'

—'তা পাইনি। কিন্তু 'সোনার আনারস' মামলায় আমরা যখন বাঘরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম, তখন সারা পথের কোথাও কি প্রতাপ চৌধুরির অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল? আগেই তোমাদের কাছে আমি প্রতাপ চৌধুরির পরিচিত যুদ্ধকৌশলের কথা উল্লেখ করেছি। এ যদি সেই প্রতাপ চৌধুরি হয়, তবে এবারেও সে নিজের নির্বাচিত স্থান ছাড়া যেখানে-সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি কিন্তু পথ চলতে চলতে হাওয়ায় হাওয়ায় পেয়েছিলুম কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ!'

মানিক হেসে বললে, 'পুলিশের চাকরি ছাড়বার পর দেখছি সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি প্রখরতর হয়ে উঠেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম ঠাট্টা করতে চাও, ঠাট্টা করো! কিন্তু সংস্কৃত বচনে কি আছে জানো তো? 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।' অর্থাৎ বিপদের সময়ে বুড়োদের কথা গ্রাহ্য করা উচিত।'

মানিক বিস্ময়ের ভান করে বললে, 'ও হরি, কালে কালে হল কী? হ্যাঁ জয়ন্ত, তুমি কি আর কখনও সুন্দরবাবুকে সংস্কৃত বুলি ঝাড়তে শুনেছ?'

—'তা শুনিনি বটে, তবে আপাতত ওঁর পরামর্শে আমাদের কান পাতা উচিত।'

—'তুমি কী বলতে চাও?'

—'শত্রুরা সজাগ।'

—'সজাগ, কিন্তু তারা অবস্থান করছে কোথায়?'

—'ধরে নাও আশেপাশে। সামনে নয়, অন্তরালে। তারা আছে যে কোনো সুযোগের অপেক্ষায়।'

—'আমরাও কি ঘুমিয়ে আছি?'

—'তা নেই, কিন্তু এখনও আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনেই এমন সব কাণ্ড হচ্ছে, যার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'যথা?'

—'ধরো আজকের ঘটনাই। গঙ্গায় আমাদের পিছু নিয়েছিল যেন শত্রুদেরই পানসি। কিন্তু তার পিছনে পিছনে নৌকোয় চেপে যে সন্ন্যাসী আসছিল, সে কে? সে কাদের অনুসরণ করছিল—আমাদের না শত্রুদের? কেন অনুসরণ করছিল, তার স্বার্থ কী? সেই-ই কি বেনামা পত্রলেখক? কেন সে আমাদের সাবধান করে দিতে চায়, সে কি আমাদের বন্ধু? এমন অচিন বন্ধু কি বিস্ময়কর নয়?'

মানিক ফাঁপরে পড়ে বললে, 'প্রশ্নে প্রশ্নে তুমি যে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিলে হে!'

—'না ভাই না! এ সব প্রশ্ন আমি কেবল তোমাকেই করছি না, নিজেকেও করছি নিজে নিজেই। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আছে?'

—'উঁহু!'

—'অতএব সুন্দরবাবু হাওয়ায় হাওয়ায় যে ষড়যন্ত্রের কথা তুলেছেন, সেটা তাৎপর্যমূলক বলে মানতে হবে বই কি!'

—'উত্তম, সুন্দরবাবু নাকে শোঁকা ষড়যন্ত্রের গন্ধকে স্বীকার করিনি বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। জয়ন্তও যদি সুন্দরবাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাহলে একসঙ্গে দুইজনের প্রতিযোগিতা করবার সাধ্য আমার নেই।'

সুন্দরবাবু অভিমানের স্বরে বললেন, 'মানিক, এখনও তুমি ঠাট্টার সুরে কথা কইছ! কিন্তু ভাই, আমি কি ন্যায্য কথাই বলিনি?'

মানিক এইবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, সুন্দরবাবু, সব শুনে আমি এখন আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। কিন্তু অতঃপর আমাদের কর্তব্য কী?'

জয়ন্ত বললে, 'কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আমাদের সকলের একসঙ্গে ইঁদারায় নামা চলবে না।'

—'তবে?'

—'অন্তত একজনকে এখানে পাহারায় মোতায়েন থাকতে হবে।'

—'থাকবে কে?'

—'সুন্দরবাবু।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললে, 'হুম! আমি? একলা?'

—'দোকলা পাবেন কাকে? মানিক কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজি হবে না। আর আমিও তাকে ছাড়ব না, সে আমার ডান হাতের মতো। আর বীরেনবাবু এ সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, ওঁর এখানে থাকা-না-থাকা সমান কথা।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না, না, বীরেনবাবুকে আমিও চাই না। যদি কোনো বিপদ ঘটে, ওঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার পক্ষেও এখানে একলা থাকাটা কি সমীচীন হবে?'

—'কেন হবে না? আপনি বহুযুদ্ধজয়ী সৈনিক। আপনার একহাতে রইল রিভলভার, আর এক হাতে সংকেত-বাঁশি। বিপদ দেখলে দুটোই ব্যবহার করবেন। আমরাও তো হাতের কাছেই রইলুম—বাঁশি শুনেছি কি ছুটে এসেছি! এসো মানিক, আসুন বীরেনবাবু!'

জয়ন্ত সর্বাগ্রে ইঁদারার ভিতরে গিয়ে নামল।

সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'জয় বিপদভঞ্জন মধুসূদন!'

॥ নবম অধ্যায় ॥

রসাতলের কারাগার

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ইঁদারার মতো ব্যবস্থা। বেড় রীতিমতো বড়ো, সার সার সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত। তারপরেই অবারিত শূন্যতা। এবং অল্পে অল্পে ঘনায়মান অন্ধকার।

মাঝে মাঝে টর্চের চাবি টিপলে দেখা যায় মানুষের অভাবিত ও বিরক্তিকর আবির্ভাবে ইঁদারার গায়ে দিকে দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মাকড়সা, বিছে ও কাঁকড়াবিছে দলে দলে। আরও কত জাতের অজানা জীবের চোখে ফোটে বিদ্যুতের ঝলক। মন চমকে দেয় তক্ষকদের প্রতিবাদ। সর্বাঙ্গ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দে।

জয়ন্ত বলে, 'শুনছ মানিক?'

—'শুনছি।'

—'চন্দ্রনাথবাবুর অপার্থিব গর্জন!'

বীরেন ভয়ে কুঁচকে বলে, 'ও মশাই, কামড়াবে না তো?'

—'সেটা ওদের খুশি! আর আমাদের বরাত!'

মানিক বলে, 'নামছি তো নামছিই। বাবা, ইঁদারাটা কত গভীর?'

—'অন্ধকার যেন নিরেট হয়ে উঠেছে। আর বেশি নামতে হবে না।'

তারপর আলো ফেলে দেখা গেল, রাশি রাশি অস্থি ছড়িয়ে পড়ে ইঁদারার তলদেশটা ভয়াবহ শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

জ্বলল দুটো লণ্ঠনের আলো। গুনে দেখা গেল নয়টা অস্থিসার নরমুণ্ড, সেগুলো কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেই সব ওষ্ঠাধরের আবরণমুক্ত বিকট দন্তবিকাশ দেখলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে আর প্রাণ মূর্ছিত হয়ে পড়তে চায় সেই সব দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটরের বীভৎসতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'লোভী ধনীর মারাত্মক খেয়ালের খোরাক হবার জন্যে নয়-নয় জন হতভাগ্যের জীবনলীলা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে ফুরিয়ে গিয়েছে—তাদের অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে মেশানো ছিল জীবনের যত অতৃপ্ত বাসনা। সুন্দরবাবুর মত মানলে আমিও বলতুম, তাদের অশান্ত আত্মারা আজও ওই অস্থিস্তূপগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি, আজও তারা এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগারে বন্দি হয়ে পুনর্বার দেহধারণের জন্যে তপস্যা করছে।'

হঠাৎ বীরেন সভয়ে চিৎকার করে উঠল।

—'কী হল বীরেনবাবু?'

বীরেন কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ওখানে কী?'

—'ওর কোটরের মধ্যে চোখ জ্বলজ্বল করছে!'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলে, সত্যিই তাই—জ্বলন্ত চক্ষুকোটর! জ্বলছে, একটু একটু নড়ছে! কিন্তু সে ভয় পেলে না, হাতের টর্চের সাহায্যে নরমুণ্ডটাকে ঠেলে দিলে—কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ত্রস্ত টিকটিকি!

শুকনো হাসি হেসে মানিক বললে, 'সত্যি ভাই জয়ন্ত, আমারও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল! এমনি করেই লোকে ভূত দেখে!'

এখন তারা সত্য-সত্যই এসে দাঁড়িয়েছে নিরবচ্ছিন্ন তমসাবৃত পাতালপ্রদেশে। তাদের চারিপাশ ঘিরে থমথম করছে নিঃসাড় মৃত্যুর মতো বুকচাপা এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এবং মানুষের কল্পনাতীত সেই নিদ্রায়মান ও প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরগুলোও শোনাচ্ছিল কর্ণপটহভেদী দামামানির্ঘোষের মতো।

জয়ন্ত ও মানিক লন্ঠন দুটো মাথার উপরে উঁচু করে তুলে ধরলে ভালো করে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

প্রথমেই চোখে পড়ল গর্ভগৃহের লৌহকপাট; এত ছোটো যে দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে মাথা নামিয়ে হেঁট না হলে চলবে না।

জয়ন্ত সচকিতকণ্ঠে বললে, 'এ কী! দরজার পাল্লা দু-খানা যে খোলা!'

মানিক বললে, 'এ বোধহয় চন্দ্রনাথবাবুর কীর্তি! গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দে আকুল হয়ে তিনি যাবার সময়ে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

জয়ন্ত আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। তবু মুখে বললে, 'তাই হবে। তবে আজ যখন ইঁদারার জল শুকিয়ে গিয়েছে, দরজা খোলা থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

তারপর সে খুব মন দিয়ে দরজার কাছটা দেখতে দেখতে বললে, 'দ্যাখো মানিক, ইঁদারার এখানটা পাথর দিয়ে শক্ত করে গড়া। আর ওস্তাদ কারিগররা পাথরের গায়ে এমন নিপুণ হাতে লোহার কপাট বসিয়েছে যে একফোঁটা জলও ভিতরে ঢুকতে পারবে না।'

মানিক বলল, 'দরজা গড়তে নিশ্চয় খুব ভালো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কত কাল জলের তলায় ডুবে ছিল, তবু মরচে ধরেনি।'

উদগ্র আগ্রহে ও দুঃসহ কৌতূহলে বীরেনের তখন আর তর সইছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি!'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আরে মশাই, দাঁড়ান! লণ্ঠনের সঙ্গে সকলে টর্চ ব্যবহার করুন। কে জানে ভিতরে কী বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!'

তাড়াতাড়ি পিছোতে পিছোতে বীরেন বলল, 'বিপদ? কী বিপদ?'

—'এই পাতালপুরীতে বহুকাল পরে দরজা খোলা পেয়ে এর ভেতরে শখের বাসা বাঁধতে পারে কেউটে, কি গোখরো, কি ময়াল সাপ! কেউ বিষ ছড়ায়, কেউ পিষে মারে!'

আরও পিছিয়ে গেল বীরেন। শোনা গেল, তার অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিপৎকালে প্রথমেই যা মনে আসে সেই 'বাবা' শব্দটি।

তিন-তিনটে সঞ্চরমান আলোকশিখায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল একখানা মাঝারি আকারের পাথুরে ঘরের এদিক এবং ওদিক। কিন্তু ভয়াল ময়াল বা কোনোজাতীয় বিষধর সরীসৃপ আত্মপ্রকাশ করলে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভিতরে পদার্পণ করে জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, 'কিন্তু কোথায় আছে গুপ্তধন? এ যে একেবারে খালি ঘর!'

বীরেন বললে, 'এখানে এসেও মাটি কোপাতে হবে নাকি?'

চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি সঞ্চালন করে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'মাটি? কোথায় মাটি? এখানে সব পাথর! আমাদেরও পাথুরে কপাল!'

মানিক বললে, 'আমরা নির্বোধ! গাছে কাঁঠাল আছে ভেবেই গোঁফে তেল মাখিয়েছি, কিন্তু তার আগেই কাঁঠাল হয়েছে বুদ্ধিমানের হস্তগত!'

বীরেন হতাশভাবে বললে, 'এ তাহলে প্রতাপ চৌধুরির কাজ!'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে মানতে হবে যে প্রতাপ চৌধুরি হচ্ছে অত্যন্ত ত্বরিতকর্মা।'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা সম্পূর্ণ খাতা আমরা পড়বার সুযোগ পাইনি, তার খানিকটা অংশ হস্তগত হয়েছে প্রতাপ চৌধুরির আর সেই অংশটাই হচ্ছে হয়তো আসল অংশ। সেটুকু ছিঁড়ে নিয়ে প্রতাপ বাকি কাগজগুলো তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে!'

জয়ন্ত চিন্তান্বিত মুখে বললে, 'কিন্তু—কিন্তু এক জায়গায় তবু খটকা থেকে যাচ্ছে!'

—'কোন জায়গায়?'

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে পাতালপুরীর সেই কক্ষটা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সকলে সবিস্ময়ে সচকিত চক্ষে দেখলে, ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল লৌহকপাট!

জয়ন্ত বেগে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কপাট খুলল না, একটু নড়লও না। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'মানিক, মানিক, রসাতলের কারাগারে আমরা বন্দি হলুম!'

॥ দশম অধ্যায় ॥

অঘটন সংঘটন রহস্য

খানিকক্ষণ কারুর মুখ দিয়েই হল না বাক্য-নিঃসরণ।

সেই ভূগর্ভগৃহের স্তব্ধতা এমন নিবিড় যে, হাতঘড়ির ক্ষীণ টিকটিক শব্দকেও মনে হয় উচ্চরোল!

জয়ন্ত শুধোলে, 'ঘড়িতে ক-টা বেজেছে?'

মানিক দেখে বললে, 'সাড়ে পাঁচটা।'

—'হুঁ। বাইরের পৃথিবী এখন সন্ধ্যার ছায়াছবির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর ফুটবে কালো রাত। তারপর আবার আসবে রঙিন প্রভাত। তারপর আবার হবে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়। কিন্তু আমরা আবার তা দেখতে পাব না। কী বলো মানিক?'

—'লণ্ঠন দুটোর তেল কাল সকালেই বোধহয় ফুরিয়ে যাবে। টর্চের আলো দেবার শক্তিও বেশিক্ষণ নয়। তারপর আমরা দেখব খালি অন্ধ-করা অন্ধকার। যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ।'

—'কিন্তু সে কতক্ষণ মানিক? আমাদের সঙ্গে না আছে জল, না আছে খাবার।'

বীরেন একেবারে বোবা।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এক চক্কর ঘুরে এসে বললে, 'কিন্তু দরজা বন্ধ করতে পারে কে?'

মানিক বললে, 'এক পারেন সুন্দরবাবু। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কৌতুক তিনি করবেন বলে বিশ্বাস হয় না।'

—'আর পারে প্রতাপ চৌধুরি।'

—'কিন্তু ইঁদারার মুখে পাহারায় আছেন সুন্দরবাবু।'

—'হয়তো তিনিও বন্দি। কিংবা নিহত। প্রতাপ চৌধুরির নরহত্যায় আপত্তি নেই।'

—'আমরা কিন্তু উপর থেকে রিভলভারের বা সংকেত-বাঁশির আওয়াজ

শুনতে পাইনি। হয়তো উপর থেকে কোনো আওয়াজই এত নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।'

—'কিংবা সুন্দরবাবু রিভলভার কি বাঁশি ব্যবহার করবার সময় পাননি।'

—'অমনি একটা কিছু হয়েছেই। কিন্তু ফল একই। আমাদের মরতে হবে।'

বীরেন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'এইভাবে মরব বলেই কি জন্মেছিলুম? অন্ধকারে, অনাহারে, দিনে দিনে, তিলে তিলে?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রতাপ চৌধুরি আরও দু-বার আমাদের যমালয়ে পাঠাবার জন্যে বন্দি করেছিল। দু-বারই আমাদের রক্ষা করেছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি।'

—'কিন্তু, এবারে তার পুনরাভিনয়ের কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না।'

—'মানিক, চিরদিনই আমি নিয়তিবাদী। আজও নিয়তির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনোই উপায় নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মানিক বললে, 'তাই বটে।'

আবার কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতা। আবার কানে জাগে হাতঘড়ির টিক-টিক-টিক-টিক।

জয়ন্ত বললে, 'একটু আগেই যা বলেছিলুম। প্রতাপ চৌধুরির যুদ্ধকৌশলের কথা। তার পদ্ধতি কিছুমাত্র বদলায়নি। সে নিজে দেখা দেয় না। কিন্তু শত্রুদের বন্দি করে। সেরা শিল্পীদের পদ্ধতি বদলায় না। অপরাধের আর্টে প্রতাপ চৌধুরিকে সেরা শিল্পী বলে মানতেই হবে।'

বীরেন ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এই কি অপরাধের আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময়?'

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, 'তা ছাড়া আর কী করবেন ভাই?'

—'আর কিছুই করবার নেই?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'ভালো করে দেখেছেন?'

—'কী?'

—'দরজাটা সত্যিই বন্ধ কি না?'

—'আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

—'কী জানি, যদি—'

—'বেশ, আপনিও একবার টেনে দেখুন না!'

—'তা একবার দেখলে ক্ষতি কী?'

—'কোনো ক্ষতি নেই। কিছু না করার চেয়ে একটা কিছু করা ভালো। যান আপনিও দরজা ধরে টানাটানি করে আসুন। খানিকটা সময় তবু কাটবে।'

বীরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলের মতো—তার মুখে নেই কোনোরকম উৎসাহের ভাব। জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বীরেন আংটা ধরে খুব জোরে এক টান মারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় ঝনঝন করে বন্ধ দরজার পাল্লা আবার খুলে গেল!'

শব্দ শুনে চমকে জয়ন্ত ও মানিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারলে না, ভাবলে তারা জেগে-জেগেই দেখছে কোনো অসম্ভব স্বপ্ন!

না এ ভোজবাজি—বীরেন জাদুর খেলা জানে?

বীরেনও হতভম্ব—তার মুখ দিয়ে হল না বাক্যস্ফূর্তি!

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মতো বললে, 'হ্যাঁ মানিক, আমি ভুল দেখছি না তো? সত্যিই কি দরজাটা খুলে গেছে?'

দুই হাতে দুই চোখ কচলে আর-একবার ভালো করে দেখে মানিক বললে, 'দরজা তো খোলাই রয়েছে দেখছি!'

—'কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ!'

বীরেন বললে, 'না, বন্ধ ছিল না! আমি একবার টানতেই খুলে গেল!'

—'আর আমি একবার-দু-বার নয়, প্রাণপণে টেনে দেখেছি বার বার!'

মানিক বললে, 'তাহলে একটু আগে তুমি যা বলেছিলে—এ হচ্ছে সে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির লীলা!'

—'না মানিক, কেউ বাইরে থেকে দরজাটা আবার খুলে দিয়েছে!'

—'কে খুলে দেবে? সুন্দরবাবু? কিন্তু সুন্দরবাবু কি আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করবেন?'

—'আমার বিশ্বাস হয় না। দ্যাখো তো, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না।'

মানিক বাইরে ছুটে গেল এবং তারপর চেঁচিয়ে বললে, 'এখানে কেউ নেই। কেবল একটা কৌতূহলী তক্ষক খবরদারি করবার জন্যে ইঁদারার গা বয়ে নেমে এসেছিল, আমাকে দেখে আবার উপর দিকে চম্পট দিলে!'

জয়ন্ত বেকুবের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'মানিক, সত্য-সত্যই একটা কোনো অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী আমি বুঝতে পারছি না!'

—'হয়তো সুন্দরবাবু এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। উপরে চলো।'

—'তাই চলো। রত্নকুঠি তো রত্নহীন, এখানে আর থেকেই বা লাভ কী?'

পাতালের অন্ধকার উদর ছেড়ে তারা এসে উঠল পৃথিবীর উপরে রাতের অন্ধকারের কোলে। সর্বাঙ্গে নিবিড় কালিমা মেখে জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছগুলো কী যেন নৈশ রহস্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করছে মর্মরভাষায়। থেকে থেকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কূলে কূলে লিখে চলেছে অদূরবর্তিনী গঙ্গা তার মুখর তরঙ্গকাহিনি।

জয়ন্ত ডাকলে, 'সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! অন্ধকারে কোথায় গা ঢেকে পাহারা দিচ্ছেন?'

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েননি তো?'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা সম্ভব নয়। আমার মন আবার বলছে, একটা কোনো অঘটন ঘটেছেই!'

—'কী অঘটন?'

—'খোলা দরজা আপনি বন্ধ হয়, বন্ধ দরজা আপনি খুলে যায়, সুন্দরবাবু পাহারা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকেন, এ সবই তো অঘটন! মানিক, তুমি একদিকে যাও, বীরেনবাবু, আপনি আর একদিকে যান, আর আমি যাই এই দিকে। দেখা যাক সুন্দরবাবুকে খুঁজে পাই কি না!'

মাঠের ও নদীর মধ্যবর্তী এই জঙ্গুলে জায়গাটায় রাত-আঁধারে লোকজন পদার্পণ করে না। জমি এবড়ো-খেবড়ো এবং খানা-ডোবায় দুর্গম। সহজে সুন্দরবাবুর পাত্তা পাওয়া যাবে বলে কেউ মনে ভাবেনি। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে একটুখানি অগ্রসর হয়েই সফল হল খোঁজাখুঁজি।

একটা ঝোপ দুলছে ঘনঘন। যেন কোনো জন্তু তার মধ্যে ঢুকে ছটফট করছে। সেই দিকে আকৃষ্ট হল মানিকের দৃষ্টি।

ঝোপের খানিকটা এক হাতে সরিয়ে আর এক হাতে তার মধ্যে আলো ফেলে মানিক সচমকে দেখলে, সেখানে ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু একসঙ্গে রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুড়ছেন আর ছুড়ছেন! কেবল পা নয়, তাঁর বাহুযুগলও দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা এবং মুখ ও চোখের উপরে রয়েছে কাপড়ের বন্ধনী!

সুন্দরবাবুকে তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত করতে করতে মানিক ফুকরে উঠল, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবুকে পেয়েছি!'

সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি ফুলতে ও চুপসে যেতে লাগল স্যাঁকরার হাপরের মতো। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে হাঁপিয়ে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই চিরপ্রিয় শব্দ—'হুম!'

এতক্ষণে সুন্দরবাবু বাকশক্তি পেয়েছেন বুঝে জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার এ দশা করলে কে?'

—'চোখে দেখিনি, তবে পরে কানে শুনে আন্দাজ করেছি।'

—'কিছুই বুঝলুম না।'

—'এখন বেশি বুঝিয়ে বলবার শক্তি নেই। তবে আসল কথাগুলো শর্টে বলতে পারি। তোমরা ইঁদারায় নেমে গেলে। আমি ঠায় বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম। কোথাও কারুর সাড়া পর্যন্ত নেই, অথচ আচমকা পশ্চাদভাগ থেকে আমার কানের ঠিক পিছন কে এসে বেমক্কা মুষ্টিপ্রহার করলে—মুষ্টিযোদ্ধারা যাকে বলে 'র‍্যাবিট পাঞ্চ'। এরকম ঘুসি মানুষকে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান করে দেয়—আমিও একেবারে বেহুঁশ! জ্ঞান হলে পর দেখি আমার এই অবস্থা! আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, আমি চলচ্ছক্তিহীন! কেবল কান খোলা ছিল বলে শুনতে পাচ্ছিলুম। শুনলুম অনেকগুলো পায়ের শব্দ। শুনলুম, কে বললে—'বড়োবাবু, লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি।' তারপর বোধহয় বড়োবাবুই বললে—'দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলে রেখে দে!' আমাকেও কারা হিড়হিড় করে টেনে এই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর বোধকরি সেই বড়োবাবুই বললে—'চল এইবারে! আর কোনো খলিফা আমাদের পিছনে জ্বালাতে আসবে না, আমরা নিশ্চিন্ত!' তারপর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নিঝুম।' সুন্দরবাবু থামলেন। আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—'তারপর আর কিছু বলবার নেই?'

—'নেই মানে? আলবত আছে! তারপরেই তো আসল বলবার কথা। কিন্তু একটু রও ভাই! আর একটু না হাঁপিয়ে জুত করে বলতে পারছি না—আমাতে কি আর আমি আছি দাদা?'

মিনিটখানেক আরও খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে ও আরও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললে, 'হ্যাঁ, তারপর কী হল শোনো। খানিকক্ষণ ঝিঁঝিপোকাগুলোর একটানা গান ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর আশপাশের ঝিঁঝিপোকাগুলো আচমকা গান বন্ধ করে দিলে। আবার একজন মানুষের পায়ের শব্দ আমার পাশেই এসে থামল। আমি তো 'নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু'র উপরেও আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলুম—এই রে, সেরেছে! এবারে বুঝি আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি করতে এল! তারপরেই শুনি—না, সে সব নয়, এ আবার নতুন ব্যাপার, যাকে বলে কল্পনাতীত! কে একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—'সুন্দরবাবু, ভালো করে শুনে রাখুন! আমি

আবার দড়ির সিঁড়িটা ইঁদারার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছি আর লোহার কবাটও খুলে দিয়েছি। আপনার কোনো ভয় নেই, জয়ন্তবাবুরা এখনই এসে আপনাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁদের বলবেন, প্রতাপ চৌধুরি তার দলবল নিয়ে বীরেনবাবুদের সাবেক বাড়ির দিকে গিয়েছে।' তারপর আবার পায়ের শব্দ, আবার সব চুপচাপ, আবার শুরু হল ঝঞ্ঝাটে ঝিঁঝিদের ঝাঁজরা গলায় ঝিমিঝিমি চিৎকার! সেই একঘেয়ে ঝিঁঝিঝিঁঝি আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঝিন ঝিন আর মাথাটাও ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি আন্দাজ করতে পারলুম, দুরাত্মারা তোমাদের বন্দি করে দড়ির সিঁড়ি উপরে তুলে নিয়েছিল। তার কতক্ষণ পরে শুনলুম, তোমাদের ডাকাডাকি! আমি তো ব্রাদার, পড়ে গেলুম মহা ফাঁপরে।—কী করে তোমাদের জানাই যে আমার পক্ষে এখন সাড়া বা দেখা দেওয়া দুইই অসম্ভব! কিন্তু হাজার হোক আমি হচ্ছি গিয়ে প্রাচীন সৈনিক, ঝাঁ করে বুদ্ধি খুলে গেল! বুঝে ফেললুম, আমি চলতে না পারলেও বাঁধা পা দুটো ছুড়ে ছুড়ে অনায়াসেই ঝোপ নেড়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি! তারপর আর কী—হুম!'

সুন্দরবাবুর শেষ কথাগুলো জয়ন্ত যেন শুনছিল না, সে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

মানিক বললে, 'জয়ন্ত, সব শেষে যে লোকটা সুন্দরবাবুর কাছে এসেছিল, সে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী! কে সে জয়ন্ত, তাকে আমরা চিনি না, সে কিন্তু আমাদের সকলকেই চেনে, আর তার দৌলতেই আজ আমরা রসাতলের কারাগার থেকে ছাড়ান পেয়েছি!'

জয়ন্ত হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, 'আবার তার অনুগ্রহেই আজ প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে ধরা পড়তে পারে!'

মানিক বললে, 'বুঝেছি তোমার মনের কথা! তুমি এখনই বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে ধাওয়া করতে চাও?'

—'নিশ্চয়ই! এ সুযোগ কে ছাড়ে?'

—'কিন্তু দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণ কি তারা থাকবে?'

—'আর দ্বিতীয় মুশকিল?'

—'দলে তারা ভারী।'

—'মাভৈঃ! উঠুন সুন্দরবাবু! স্থানীয় পুলিশের থানার দিকে দ্রুত পদচালনা করুন। আপনি সম্প্রতি অবসর নিলেও বাংলা দেশের পুলিশ বিভাগে সুপরিচিত

ব্যক্তি। খবর দিন, বিখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী আর ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতাপকে ধরবার জন্যে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই মস্ত সুখবরটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পুলিশের তৎপরতা তিনগুণ বেড়ে উঠবে। একদল বন্দুকধারী সেপাই চাই! যেমন করে হোক, সকলকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দু-তিন খানা মোটরগাড়িও দরকার!'

মানিক বললে, 'এ সব আয়োজন করতে করতেও রাত পুইয়ে যেতে পারে।'

—'যাক। প্রতাপ চৌধুরি আজ বীরেনবাবুর বাড়িতেই রাত কাটাবে বলে মনে হয়। তাদের বিশ্বাস আমরা এখনও বন্দি, তারা নিরাপদ।'

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

প্রতাপ চৌধুরির শাগরেদ

সে হচ্ছে রাত্রি ও দিবসের মিলনলগ্ন। আকাশ নিবিয়ে দিচ্ছিল তারার বাতি, বিদায়ী আঁধার আসর ছেড়ে সরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং উদয়াচলে চলছিল তখন দীপ্তোজ্জ্বল রঙের খেলার মোহনীয় আয়োজন! বাতাসে নূতন দিনের ঠান্ডা ছোঁয়া এবং বিহঙ্গরা রচনা করেছিল আলোকোৎসবের বন্দনাসংগীত। চিরদিনই আসে এই অন্ধকারের পরে এই আলোর পালা, কিন্তু কখনও একঘেয়ে মনে হয় না এর তাজা মাধুর্যটুকু।

কিন্তু মাধুর্যের মাঝখানেও, এই সৌন্দর্যের কাব্যলোকেও মানুষ করে ছন্দভঙ্গ। সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে আজ বীরেনবাবুর বসতবাড়ির চারিপার্শ্বে। সেখানে কোনো রক্তাক্ত নাট্যাভিনয়ের মহলা চলছে।

পাছে অপরাধীরা সাড়া পায়, সেই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে খানিক তফাতে মোটর থামিয়ে পুলিশের লোকরা চুপিচুপি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই তখনও শয্যার আশ্রয় ছাড়েনি। মাত্র কয়েকজন বয়স্ক লোক সবে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং গৃহস্থদের কয়েকজন বউ-ঝি কলসি কাঁখে নিয়ে চলেছে এ-বাড়ির ও-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ সকলে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলে, পুলিশবাহিনী এসে বাগচি-বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেললে। গ্রামের পুরুষরা বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েদের আর জলকে যাওয়া হল না, শূন্য কলস নিয়ে ভীত-চকিত চক্ষে যে যার বাড়ির দিকে ফিরে চলল দ্রুতচরণে।

বাগচিদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বাড়িখানা ছিল একটা ফর্দা জায়গার মাঝখানে। সেকেলে তিনমহলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে আগে ছিল যে বাগান, তা এখন পরিণত হয়েছে ছোটোখাটো একটি মাঠে। বাড়ির সীমানা নির্দেশের জন্যে বেড়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ফটকের বাধা নেই, গ্রামের লোকজনরাও অনায়াসে সীমানার ভিতরে এসে মস্ত পুকুরটার জল ব্যবহার করে।

সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেনকে নিয়ে জয়ন্ত আত্মগোপন করে পিছন দিকে অবস্থান করতে লাগল, থানার দারোগাবাবু কতক লোক নিয়ে বাড়ির সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বাকি লোকদের মোতায়েন রাখলেন চারিদিকে পাহারা দেবার জন্যে।

নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও বাড়ির যতটা কাছে যাওয়া যায় ততটা কাছে গিয়ে দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'বাড়ির ভেতরে কে আছে? বাইরে বেরিয়ে এসো।'

এতক্ষণ দোতলার একটা জানালায় জেগে ছিল একখানা মুখ। দূর থেকে সে লক্ষ করছিল পুলিশের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দারোগাবাবুর নির্দেশবাণী শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখখানা আর দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট কাটল। সদর দরজাও খুলল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও এল না কোনো সাড়াশব্দ।

দারোগাবাবু আবার হাঁকলেন, 'দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।'

তখনও কেউ সাড়া দিলে না।

মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে দারোগাবাবু চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, 'ভাঙো তবে দরজা। যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলবে।'

বাড়ির ভিতর থেকে কে বললে, 'দরজা ভাঙতে হবে না। আমরা বাধা দেব না, আত্মসমর্পণ করব।'

—'উত্তম! বেরিয়ে এসো একে একে।'

দরজা খুলে গেল। পরে পরে নয়জন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল—প্রত্যেককে দেখলেই দুর্দান্ত ও দুশমন বলে চিনতে দেরি হয় না। প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেওয়া হল লোহার হাতকড়া। তখন প্রত্যেকেরই জামাকাপড়ের ভিতর থেকে বেরুল কোনো-না-কোনো মারাত্মক অস্ত্র।

কুখ্যাত প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে এমন শান্তশিষ্টের মতো ধরা দিল দেখে জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এসে

বন্দিদের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল, 'কোথায় প্রতাপ চৌধুরি? তোমার কেউ প্রতাপ চৌধুরি নও!'

বন্দিদের একজন হেসে বললে, 'আমরা কেন প্রতাপ চৌধুরি হতে যাব? বাপ-মা আমাদের অন্য নাম রেখেছে!'

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'চোপরাও বদমাশ! আবার রসিকতা হচ্ছে? বল কোথায় প্রতাপ চৌধুরি?'

—'জানি না। প্রতাপ চৌধুরি বলে কারুকে আমরা চিনি না।'

জয়ন্ত বললে, 'দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে কিছু লোক দিন, বাড়ির ভিতরটা খুঁজে দেখব।'

তন্ন তন্ন করে তল্লাশের পরেও প্রতাপ চৌধুরিকে পাওয়া গেল না।

দেখা গেল, খিড়কির দরজাটা খোলা। সন্দেহজনক! খিড়কি খোলা কেন? ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে সেখানটা গাছপালায় আচ্ছন্ন। অল্প দূরেই পুকুরের একটা ঘাট।

জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, প্রথম ভোরের আধা-অন্ধকারে কেউ যদি এই ছায়াঢাকা পথ দিয়ে পুকুরঘাটে যায়, তাহলে সহজে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

মানিক জিজ্ঞাসু চোখে বললে, 'কী বলতে চাও তুমি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হল। এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একজন আধবুড়ো পাহারাওয়ালা খানিক দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

তার কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'একটু আগে কোনো লোককে দেখেছ?'

—'কোন লোক? পুরুষমানুষ? না।'

—'তবে কি এখানে কোনো স্ত্রীলোক ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁয়ের কোনো স্ত্রীলোক। মেটে কলসিতে জল নিতে এসেছিল—এখানে আসতে আসতে এমন অনেক মেয়েকেই তো দেখলুম!'

—'তারপর?'

—'তারপর পুলিশ দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পালিয়ে গেল!'

—'ঘোমটায় মুখ ঢেকে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কোন দিকে গেল?'

বাড়ির পিছন দিকের একটা পায়ে চলা পথ দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ওইদিকে।'

—'কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?'

—'সে কী বাবু? আমরা এই বাড়ির ভিতরকার দুশমনদের ধরতে এসেছি, গাঁয়ের ভদ্দরলোকের মেয়ে ধরব কেন? সে তো বাড়ির ভেতরেও ছিল না।'

—'ঠিক দেখেছ?'

—'ঠিক দেখেছি। মেয়েমানুষটি কাঁকালে কলসি নিয়ে নীচে থেকে উঠেছিল পুকুরের ঘাটের উপরে।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'বীরেনবাবু, এই পায়ে-চলা পথটা কি গাঁয়ের দিকে গিয়েছে?'

বীরেন বললে, 'না, গঙ্গার দিকে। ওই বাঁশঝাড়টার পরেই কলাবাগান, তার পরেই গঙ্গা—বাড়ির দোতলা থেকে দেখা যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর পরিতাপ করে লাভ নেই। আমাদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হল!'

সুন্দরবাবু চমকিত মুখে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও সেই স্ত্রীলোকটা—'

—'স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রতাপ চৌধুরি নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, এখন আর তাকে ধরবার উপায় নেই, তবু ওদিকটা একবার ঘুরে আসি চলুন!'

সবাই দ্রুত পদচালনা করলে, তারপর আচম্বিতে দেখলে এক কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য!

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

গুপ্ত নয়, ব্যক্ত ধন

বাঁশঝাড় আর কলাবাগানের মাঝখানে, পায়ে-চলা পথের পাশে খানিকটা জঙ্গুলে জমি। সেইখানে ভয়াবহ বীভৎসতায় সোনালি সকালের আনন্দকে বিযাক্ত করে তুলে মাটির উপরে পড়ে আছে রক্তধারার মধ্যে দুটো রক্তাক্ত নরদেহ—একটা মৃত ও আড়ষ্ট এবং আর একটা মৃতবৎ হলেও তখনও জীবিত। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মতো।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত। তারপর সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে মৌন ভঙ্গ করলে জয়ন্ত। মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে, 'দ্যাখো মানিক, পুরুষের দেহে নারীর শাড়ি! ওকে চিনতে পারছ?'

সুন্দরবাবু চমৎকৃত মুখে বলে উঠলেন, 'আরে হুম! ওই তো ফেরারি প্রতাপ চৌধুরি! ওর বুকে বেঁধা একখানা ছোরা, ওকে মারলে কে?'

—'আমি!'

যে বললে তার মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র। চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'প্রতাপ চৌধুরিকে আমিই বধ করেছি। আমাকে চিনতে পারেন জয়ন্তবাবু?'

—'না। কে আপনি?'

—'ছদ্মবেশ না থাকলে চিনতে পারতেন। আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। তাই যাবার আগে পরিচয়টা দিয়ে যাই। আমার নাম মানিকচাঁদ।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি তো ছিলে প্রতাপ চৌধুরির প্রধান শাগরেদ, তারই সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছিলে!'

শ্বাস টানতে টানতে কষ্টের সঙ্গে মানিকচাঁদ বললে, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, অসৎ পথে আর থাকব না, সৎ হব। প্রতাপ চৌধুরিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। সে হল আমার উপরে খড়্গহস্ত। আমি তার সমস্ত গুপ্তকথা জানতুম, সে আমাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্যে বারবার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমি পালালুম, ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। এমন হাঘরে যাযাবর-জীবন প্রাণ আমার অতিষ্ঠ করে তুললে। শেষটা তাকে পুলিশের হাতে আবার ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ হতে চাইলুম। তার অভিসন্ধি আমি জানতুম, নিজে আড়ালে থেকে তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলুম। আপনাদের কাছে তার খবর সরবরাহ করতুম। নিজের পরিচয় দিতে পারতুম না, কারণ আমিও ফেরারি আসামি।'

তার কথা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে বন্ধ হবার মতো হল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে মানিকচাঁদ কোনোরকমে আবার বললে, 'আজ সে পালাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দি। সে রিভলভার ছোড়ে, তখন নিজে চরম আঘাত পেয়েও তার বুকে ছোরা বসিয়ে আমি প্রতিশোধ নি।'

তার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝে বীরেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, 'জগৎশেঠের রত্নকুঠির কথা আপনি কিছু জানেন?'

কিন্তু মানিকচাঁদ নির্বাক। তার দুই চক্ষু মুদে এল।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ভগবান মানিকচাঁদকে সৎপথের পথিক হবার সুযোগ দিলেন না বলে আমি দুঃখিত। আর বীরেনবাবু, আপনি ভাববেন না। এইবারে জগৎশেঠের রত্নকুঠি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। চলুন।'

বাড়িতে আবার ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, যে ঘর থেকে প্রতাপ চৌধুরি আপনার ঠাকুরদার গল্পের খাতার খানিকটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা এখন সেই ঘরে গিয়েই বসতে চাই।'

বীরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'কী হবে আর সেই গুদামঘরে গিয়ে? আমার মন ভেঙে পড়েছে, আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগছে না।'

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বীরেনবাবু, আমারও ওই মত। গুপ্তধন তো হয়ে দাঁড়াল অলীক দিল্লি কা লাড্ডু, আর মুখের কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়িয়ে লাভ কী? প্রচুর কাদা ঘাঁটা হয়েছে, আমি এখন হস্ত-পদ বিস্তৃত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। হুম, চাই ঘুম!'

মানিক বললে, 'আহা, যা বলেছেন! আমি এখনই একদৌড়ে বাজার গিয়ে আপনার নাসিকার জন্যে এক শিশি সর্ষপ তৈল কিনে আনব কি?'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে মানিকের পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিপ্রহার করতে উদ্যত হলেন, সতর্ক মানিক একলাফে গিয়ে পড়ল হাত কয়েক তফাতে!

কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ছাড়লে না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে বীরেনকে উদ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে হাজির হতে হল। তারপর অবহেলাভরে বললে, 'এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আপনার বক্তব্য কী?'

জয়ন্ত প্রথমে মুখে কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

এটা গুদামঘরই বটে, নানান রকম একালে অব্যবহার্য জিনিস বাড়ির এই ঘরখানায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে—গুরুভার ও মস্তবড়ো লোহার সিন্দুক, আগাগোড়া কাঠের আলমারি, ডেস্ক, ভারী ভারী বাসনকোসন এবং গৃহস্থালির ও গৃহসজ্জার কড়িখচিত দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। শেযোক্ত জিনিসপত্রগুলিতে প্রাচীন বাংলা দেশের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। রকমারি কড়ির নামও ভিন্ন ভিন্ন—যেমন বিদন্তা, সিংহী, মৃগী ও হংসী প্রভৃতি। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দোলনার

মতো ঝুলছে একটি কড়ির আলনা। এ শ্রেণির জিনিস অধিকাংশ একেলে বাঙালি চোখেও দেখেনি।

একদিকে স্তূপীকৃত বা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন পুস্তক।

জয়ন্ত শুধোলে, 'এই বইগুলোই বুঝি প্রতাপ চৌধুরিরা আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল?'

বীরেন বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বইগুলো যেভাবে ফেলে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো দুই-তিন খানা বই তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল—মুখে তার চিন্তার লক্ষণ।

বীরেন অধীর স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কী আলোচনা করবেন বলেছিলেন না?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। বীরেনবাবু, আপনি বোধহয় মনে করেন যে, জগৎশেঠের গুপ্তধন হস্তগত করে প্রতাপ চৌধুরি শূন্যহস্তেই সদ্য সদ্য স্বর্গে বা নরকে যাত্রা করেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করি।'

—'উঁহু, আমি তা মনে করি না।'

—'কেন করেন না?'

—'প্রমাণ দেখে।'

—'কী প্রমাণ?'

—'প্রথমত, গুপ্তধনের সন্ধানেই প্রথমে সে এই বাড়িতে এসেছিল। এখান থেকে সে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কাহিনি সংগ্রহ করে। সেই পাঁচ অংশে বিভক্ত লেখা কাহিনির তৃতীয় অংশ সে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়, আমরা তা দেখতে পাইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সেই তৃতীয় অংশেই চন্দ্রনাথবাবু বর্ণনা করেছিলেন, শেঠেদের বাগানবাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ইঁদারায় নেমে কেমন করে তিনি গুপ্তধন দর্শন করেছিলেন। প্রতাপ চৌধুরিও তা পাঠ করে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে দেখে যে, ইঁদারার মধ্যে গর্ভগৃহ আছে বটে, কিন্তু গুপ্তধন নেই।'

—'এটা আপনার যুক্তিহীন ধারণা।'

—'না, যুক্তিহীন নয়। প্রতাপ সেখানে গিয়ে গুপ্তধন পেলে পর আর আপনাকে আর আমাদের নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাতে আসত না, সানন্দে যাত্রা করত অজ্ঞাতবাসে।'

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক! জয়ন্তের এ কথা জজে মানে!'

জয়ন্ত বললে, 'তারপর দেখুন, সে কাল রাত্রে আবার এখানে এসেছিল। আজ যখন আমি প্রতাপের খোঁজে এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরছিলুম তখন দেখলুম যে, সে আর তার দলের লোকরা বাড়ির নানা ঘরে ঢুকে দেয়াল আর মেঝে খুঁড়েছে, লোহার সিন্দুক আর আলমারি প্রভৃতি ভেঙে তচনচ করে ফেলেছে। কেন তারা আবার এসেছিল? নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে নয়! কী তারা খুঁজছিল? নিশ্চয়ই গুপ্তধন!'

বীরেন বললে, 'আপনার মতকে আর অযৌক্তিক বলতে পারি না বটে, কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তধন?'

—'গুপ্তধন হস্তগত করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। কারবার পত্তন করবার সময়ে তার বেশ একটা মোটা অংশ খাটিয়ে বাকি অংশ তিনি লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।'

—'কোথায়?'

—'বীরেনবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন কে?'

—'আমার বাবা।'

—'আপনার ঠাকুরদাও কি সেখানে বাস করতেন?'

—'না।'

—'তিনি থাকতেন কোথায়?'

—'ব্যবসা-সূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন এই বাড়িতেই।'

—'তাহলে গুপ্তধনের বাকি অংশও আছে এই বাড়িতেই।'

—'আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায়? প্রতাপ খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছে কি?'

—'অন্ধের মতো খুঁজলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

বীরেন এইবারে কিঞ্চিৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললে, 'তাহলে চক্ষুষ্মানের মতো খোঁজবার পদ্ধতি আপনিই দেখিয়ে দিন।'

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'তাই দেখাব বলেই তো আমার এখানে আগমন'

—'উত্তম। আমরা অপেক্ষা করছি।'

পকেট থেকে চন্দ্রনাথ লিখিত অসম্পূর্ণ কাহিনি সংবলিত খাতাখানা বার করে জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদার রচনার পঞ্চমাংশে অর্থাৎ উপসংহারে কী আছে, ভোলেননি তো?'

—'আছে একটা অর্থহীন পদ্য বা ছড়া। কিন্তু মূল কাহিনির সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই।'

—'কে বললে সম্পর্ক নেই? কে বলে তা অর্থহীন? আপনি যা ভেবেছেন, প্রতাপ চৌধুরিও তাই ভেবেছিল, সেইজন্যেই আঁধার ভেদ করে ফুটে ওঠেনি আলোর রেখা। আমিও প্রথমে সেই পদ্যটিকে অগ্রাহ্য করেছিলুম, কিন্তু তার পরে মনে মনে তাকে নিয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে রীতিমতো অর্থের সন্ধান পেয়েছি!'

—'অর্থ না অনর্থ?'

—'না, অনর্থের মধ্যেই সত্য অর্থ। অর্থাৎ সেই পদ্যটিই ব্যক্ত করে দিয়েছে গুপ্তকে। অতঃপর আমি সে পদ্যের নির্দেশ মেনেই গুপ্তধন অন্বেষণ করব।'

সকলে অবাক হয়ে জয়ন্তের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল বিস্মিতনেত্রে। অনুরূপ ক্ষেত্রে অনান্য অন্বেষকরা যা করে জয়ন্ত সে সব কিছুই করল না—অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক বা বাক্স প্রভৃতি হাঁটকেও দেখলে না কিংবা ঘরের ছাদ, দেওয়াল কি মেঝে ঠুকেও দেখলে না কোনো জায়গা ফাঁপা বা নিরেট।

সে প্রথমে বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত পুস্তকগুলোর প্রত্যেকখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হস্তচালনা করে গেল। তারপর বাসনকোসনগুলোও নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপর কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কড়ির আলনার দিকে উচ্চমুখে, স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী হে, আলনা দেখে একেবারে থ হয়ে গেলে যে!'

—'হ্যাঁ, কড়ির কারুকার্য-করা সুন্দর আলনা, একালে আর দেখা যায় না। দণ্ডটা অন্তত চার হাত লম্বা আর এক বিঘত মোটা। দণ্ডের সমস্তটা পুরু লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া আর উপরে বসানো অজস্র কড়ি। হংসী কড়ি, কারণ রং সাদা। সুন্দরবাবু, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেও কলকাতায় আর মফস্‌সলে বাজারে কড়ি ফেলে জিনিস কেনা যেত, জানেন কি?'

—'না। ওই কি তোমার গুপ্তধন?'

—'উঁহু, ও হচ্ছে এখন বাজারে অচল ব্যক্ত ধন, সবাই দেখেও দেখতে চায় না। কিন্তু আলনাটা একবার নীচে নামালে হয় না?'

—'ধ্যেৎ, কেন?'

—'আরও ভালো করে সেকেলে কারিগরের কারিগুরি দেখব।'

—'তোমার যত সব ছেলেমানুষি বায়না!'

কিন্তু জয়ন্ত যা ধরে, আর ছাড়ে না। কাজেই দড়ি ছিঁড়ে আলনাটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হল।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ে দুই হাতে দণ্ডটাকে নাড়াচাড়া করে বললে, 'এটা খুব ভারী, নিরেট বলে মনে হয়। সেকালের লোকরা ভারী ভারী আসবার বানিয়ে ধনগর্ব প্রকাশ করত আর একালের আমরা হচ্ছি সূক্ষ্মতার ভক্ত। কড়িখচিত লাল আবরণীর তলায় কাঠ আছে বলেই মনে হয়। বীরেনবাবু, একখানা করাত বা ধারালো কাটারি এনে দিতে পারেন?'

—'কী আশ্চর্য, কী করবেন?'

—'আনলেই দেখতে পাবেন।'

করাত ও কাটারি দুইই পাওয়া গেল। জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে কড়ির আলনার একটা প্রান্ত কেটে ফেলে বললে, 'এটা দেখছি বিশেষভাবে তৈরি ফাঁপা জিনিস। তবুও এত ভারী কেন?'

সে ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে তা হচ্ছে এমন চমকপ্রদ, অভাবিত জিনিস যে, সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেন বিস্ময়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হয়ে স্তম্ভিতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল মৌন শিলামূর্তির মতো! তার মধ্যে ছিল হীরক, নীলকান্তমণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য রত্নরাজি! আরও কয়েকবার হস্তচালনার ফলে কক্ষতলে ছড়িয়ে পড়ল আরও কয়েক মুঠো মণিমুক্তা! হয়ে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর খানিকটা খণ্ড খণ্ড হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে পড়ে সৌন্দর্যস্নান করছে প্রভাতি সূর্যকিরণে! শুক্ল, হরিৎ, নীল, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের যে কী অপরূপ সমুজ্জ্বল পুলকোচ্ছ্বাস!

জয়ন্ত পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল, 'বাইরে যা এনেছি তাইই যথেষ্টরও বেশি! ভিতরে রইল আরও কত লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য, আমার কল্পনায় তা আসে না! এখন আপনাদের কিছু বলবার আছে?'

সুন্দরবাবু কেবল বললেন, 'হুম!'

মানিক বললে, 'জয়ন্তের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, আজ এখানে এমনি কোনো অপূর্ব আর আশ্চর্য ব্যাপারই দেখতে পাব!'

বীরেন অভিভূত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু, আপনি ঐন্দ্রজালিক! না না, আপনি তারও চেয়ে বিস্ময়কর!'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'অত্যুক্তি করবেন না বীরেনবাবু! আমি কেবল সহজবুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, আপনি যা পারেন না।'

বীরেন বললে, 'এখনও বুঝতে পারছি না, আমার গলদ হয়েছে কোনখানে?'

—'কেন আপনি খাতার পদ্যটিকে অর্থহীন শব্দসমষ্টি বলে মনে করেছিলেন?'

বীরেন বললে, 'তার অর্থ আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'অর্থ তো স্বতঃস্ফূর্ত! তার কতক অংশ আবার শুনুন:

'কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই!
গুপ্ত পথে রপ্ত সবাই,
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী!'

তারপর স্পষ্ট কথা:

'মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সে-ই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!'

টীকা করব? চন্দ্রনাথবাবু বলছেন, গুপ্ত পথে চলতে সবাই অভ্যস্ত। যা গুপ্ত, তাকে আবিষ্কার করতে গেলে সকলেই আগে গোপনীয় স্থানই অন্বেষণ করে। যা চোখের সামনাসামনি থাকে, তাকে অবহেলা করা হয়। এইজন্যে যার সহজ বুদ্ধি আছে, সে সকলেরই চোখের সামনে অনায়াসে অবস্থান করেও কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তারই অন্বেষণা সফল ও তারই ভাগ্যে মণিমাণিক্য লাভ হয়, যার মানসনেত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় কেবল প্রকাণ্ড লৌহসিন্দুকেই! বীরেনবাবু, এই পদ্যই হয়েছে আমার চাবিকাঠি, আর তারই সাহায্যে খুলেছি আমি রহস্য-সিন্দুক! সুতরাং—'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সুতরাং—

জয়ন্তের কথা ফুরাল
বীরেনের ব্যথা জুড়াল!

হুম, আমিও বাবা পদ্য-টদ্য রচনা করতে পারি,—দেখছ তো!'

পদ্মরাগ বুদ্ধ

কলকাতায় ভিনিসের একরাত্রি

জয়ন্ত ও মানিক সেদিন ডিনার খেতে গিয়েছিল—পার্ক স্ট্রিটে এক হালফ্যাশনি বন্ধুর বাড়িতে।

জয়ন্ত ও মানিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক স্ট্রিটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগসাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগসাহেবের বাজারের দক্ষিণ দিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ি ধরে দাঁড়ি কামান, হাঁচেন—কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ন্ত ও মানিক যে এই শ্রেণির বন্ধুর খুব অনুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়বার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ।

শখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্যরূপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু কিছু অংশ মানিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ত্রণ করে এখন বাড়িতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য বলে মনে করে।

হয়তো সেইজন্যেই পার্ক স্ট্রিট আজ বাগবাজারকে করেছে 'ডিনার' খাবার নিমন্ত্রণ!

বাগবাজারকে চমকে দেবার জন্যে পার্ক স্ট্রিট কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি করেনি।

সেসব দেখে জয়ন্ত ও মানিক কোনও রকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না বলে গৃহকর্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে 'মেনু'তে খাদ্যের ফরাসি নামগুলো তাদের কাছে বড়ো বাড়াবাড়ি বলে মনে হল।

জয়ন্ত বললে, 'ওহে, এই ফরাসি নামগুলোর ভেতরে গোরু আর শুয়োরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?'

গৃহকর্তা এতক্ষণে জো পেয়ে অট্টহাস্য করে বললেন, 'কেন হে, গোরু আর শুয়োর সম্বন্ধে এখনও তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?'

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, 'তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে বসে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও-দুটি খাবার আমরা পছন্দ করি না।'

খানা শেষ হলে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে 'কিউবিস্ট' চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও 'কিউবিস্ট' কারিগরদের দ্বারা গড়া, এমনকি ঘরের মেঝের 'মোজেকে'র উপরেও 'কিউবিজমে'র প্রভাব।

গৃহকর্তা বললেন, 'জয়ন্ত, এ ঘরটির ডেকোরেশান তোমার কেমন লাগছে?'

—'বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ি সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন আদর্শের দিকে লক্ষ রাখে, তাহলে আমি বেশি খুশি হই।'

—'কিন্তু আমি চাই 'আপ টু ডেট' হতে। 'কিউবিজম' হচ্ছে হালফ্যাশনের ঢেউ।'

—'না, 'কিউবিজমে'র বয়েস হল ত্রিশ-পঁইত্রিশ বৎসর! এখনকার আর্টে হালফ্যাশন এনেছেন 'হাইপার রিয়ালিস্ট' শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?'

—'না।'

—'তাহলে পার্ক স্ট্রিটে বাস করেও তুমি 'আপ টু ডেট' হতে পারোনি. তুমি জানো, যিনি 'কিউবিজম' আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন 'কিউবিজম' ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন?'

—'না।'

—'তাহলে হে বন্ধু, তুমি পার্ক স্ট্রিটের কালো কলঙ্ক!'

বন্ধু মনে মনে রেগে ঠোঁট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙালি সাহেবের মতন তিনিও লোক দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটিনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ডিনারের পর কফির পালা।

কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই 'কিউবিস্ট'দের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

তখনই তাড়াতাড়ি দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনও ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়ন্তর চোর-ডাকাত ধরার কাহিনি শুনে গৃহকর্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে বাগবাজার—মস্ত লম্বা দৌড়! ওঠো মানিক!'

গৃহকর্তা বললেন, 'কিন্তু এখনও বৃষ্টি পড়ছে যে!'

—'পড়ুক। চলো মানিক!'

গাড়ি-বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গি তখন একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে।

সেই জলরাজ্যে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক স্তম্ভগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তনেত্রে যেন সেই নির্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে মোটর যখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে প্রবেশ করল পথের জলও তখন বেড়ে উঠল।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, শহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মানিক বললে, 'বর্ষায় কলকাতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোনও তফাতই থাকে না।'

জয়ন্ত বললে, 'কেবল 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' আর 'গন্ডোলা' নৌকোর অভাব।'

—'গন্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষাকালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে খেয়াঘাট বসিয়ে নৌকো রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু'র কথা বলছ? বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরি করা যায় না?'

কিন্তু জয়ন্ত কোনও জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, 'হুজুর, গাড়ি আর চলবে না!'

জয়ন্ত বললে, 'গাড়ি তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্তব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য! এসো মানিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই!'

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখনও অনেক দূরে।

দুজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল,—পথের জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতোই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইঁদুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মানিক ঘৃণায় নাক টিপে ধরে বললে 'বাড়িতে গিয়ে জলে 'পার্মাঙ্গেনেট অফ পটাস' গুলে গা না ধুলে আর রক্ষা নেই! জয়, পার্ক স্ট্রিটের ডিনার বুঝি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার ট্যাকসো যত বাড়ছে, তার রাস্তার জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্যি বেড়ে উঠছে! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে!'

দুজনে বিরক্ত মনে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যন্ত হাজির ছিল না। লাল পাগড়ি পর্যন্ত অদৃশ্য!

বৃষ্টি তখনও থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনও বন্ধ জানলায় জানলায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, 'হুঁ, এই তো চোরের শুভমুহূর্ত! মানিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিকটিকি দেখতে চাও?'

মানিক বিস্মিত নেত্রে জয়ন্তর মুখের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, 'আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,—ওই বাড়িখানার তিনতলার দিকে তাকাও!'

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ি। একটা মনুষ্য-মূর্তি দেয়াল বেয়ে উপরে উঠছে!

মানিক বললে, 'চোর! কিন্তু কেমন করে লোকটা উপরে উঠছে?'

'ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধরে।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'এসো, দেখা যাক চোরটাকে ধরতে পারা যায় কি না?'

জয়ন্ত বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানি গলায় কে শুধোলে, 'কোন হ্যায় রে?'

—'বাইরে এসে দ্যাখো না বাবা, চ্যাঁচাও কেন? বাড়িতে চোর ঢুকেছে!'

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শিস দিলে!

জয়ন্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, 'মানিক, এ চোর একলা আসেনি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শিস দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান করে দিলে।'

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'দরোয়ানজি, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধরে তিনতলার বারান্দায় গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শিগগির আমাদের নিয়ে ওপরে চলো!'

দারোয়ান তখনই কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে ঠুকে যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহলে মিথ্যাই তার নাম হাতি সিং!

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতলার বারান্দায়! তিনতলায় দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, 'হুজুর, হুজুর!'

কেউ সাড়া দিলে না।

কিন্তু জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কান শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বাম দিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহের এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল—দরজার কবাট সশব্দে খুলে গেল!

ঘরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার!

প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতি সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মতো তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হল,—কার হাত থেকে কী একটা জিনিস যেন মাটির উপরে পড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতি সিং কুপোকাত!

জয়ন্তও একলাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই!

বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধরে আশ্চর্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, 'হাতি সিং, তুমি উঠেছ?'

হিন্দি ভাষায় সাড়া এল, 'উঠেছি বাবুজি! বড়োই জোয়ান চোর, ধরে রাখতে পারলুম না!'

—'সে তোমার দোষ নয়। আলোর 'সুইচ' কোথায়?'

হাতি সিং আলো জ্বালল।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে পড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়ন্ত ও মানিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

প্রথমেই জয়ন্তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙুলের রাঙা ছাপ! চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতি সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপটা দিতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কতকটা সামলে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেনবাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চলে যাচ্ছিলুম!'

মানিক বললে, 'আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল হপ্তায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমলচন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্রনাথ বসুকে কে হত্যা করে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে আপনিই হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক—'

—'অমলচন্দ্র সেন।'

জয়ন্ত অবাক হয়ে অমলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অমলবাবুর বিখ্যাত নাম সে-ও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন?

পুরানো পোকায় কাটা পুথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও—

তার চিন্তায় বাধা পড়ল।

অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ও কী, ওই বুদ্ধমূর্তিটা ওখানে পড়ে কেন? ওটা ভাঙলই বা কী করে?'

জয়ন্ত চেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকে দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি পড়ে রয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, 'এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতি সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ওই মূর্তিটাই চোরের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল! শব্দটা আমি তখনই শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারিনি।'

অমলবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'এত জিনিস থাকতে চোর ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়ে পালাচ্ছিল? চোর ওই—বুদ্ধমূর্তি—নিয়ে—'

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবার থেমে গেলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল।

সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, 'আপনারা আমার প্রাণ রক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হল না তো?'

জয়ন্ত বললে, 'জানবার মতো পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের শখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।'

—'আপনাদের কথা আমিও বোধ হয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক-অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?'

—'অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিশ বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু।'

—'পুলিশ যা বলে বলুক, কিন্তু আসল বাহাদুরি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন কেমন করে?'

জয়ন্ত সব খুলে বললে।

অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাৎ এই দুর্যোগ, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ, যথা সময়ে আপনার বাড়ির সামনে আমাদের আবির্ভাব—এ-সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

অমলবাবু বললেন, 'দেখুন, ওই বুদ্ধমূর্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়িতে ছিল। ওই মূর্তিটি আমরা চার মাস আগে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।'

—'কাম্বোডিয়ায়? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির 'ওস্কারধাম' আছে?'

—'হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য মন্দির থেকে আরও তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরও অনেক কীর্তি লুকানো আছে। সেই খোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্তিটি পাই। এই মূর্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।'

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তিটি এতদিন সুরেনবাবু কাছে ছিল,—তারপর?'

অমলবাবু বললেন, 'গেল হপ্তায় একদিন ওই মূর্তিটি আমার পরীক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরও অনেক মূর্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোনও জিনিস বা মূর্তি নিয়ে যায়নি। পুলিশ এই হত্যার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও খুঁজে পায়নি। জয়ন্তবাবু, হত্যাকারী কীসের খোঁজে সুরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন?'

—'আপনার আর কিছু বলবার আছে?'

—'আছে। আমার কোনও শত্রু নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে—আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ওই বুদ্ধমূর্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে মূর্তি এতদিন সুরেনবাবুর ঘরে ছিল!'

মানিক বললে, 'আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন করে সেখানে ওই বুদ্ধমূর্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।'

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিল।

মূর্তিটি চুনপাথরে গড়া ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একহাতের বেশি হবে না।

সোনার চাকতির নকশা

জয়ন্ত বুদ্ধমূর্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোনও রকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ ধরনের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিমূর্তি এশিয়ার সর্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আলতো ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে বললে, 'হত্যাকারী এই মূর্তিই চুরি করতে এসেছিল? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কী?'

মানিক বললে, 'হয়তো বিশেষ কোনও কারণে ওই মূর্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সঙ্কুচিত নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'এর উত্তরে দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত, বুদ্ধের প্রতি একটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোডিয়ার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্তি, তার জন্যে কলকাতার কোনও বৌদ্ধের এতটা নাড়ির টান

হবে কেন? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ পুরোনো বুদ্ধমূর্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্য তো কোনও বৌদ্ধের মাথা ব্যথা হয় না। না মানিক, এ ব্যাপারের মধ্যে অন্য রহস্য আছে।'

মানিক বললে, 'দেশে লক্ষ লক্ষ কালীর প্রতিমা আছে, তাদের জন্যে ভক্তরা তেমন পাগল হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, কোনও কোনও কালীর মূর্তি নাকি জাগ্রত, তাদের জন্যে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা দিতে প্রস্তুত। কে বলতে পারে, এই বুদ্ধমূর্তিরও তেমন কোনও খ্যাতি আছে কি না?'

জয়ন্ত বললে, 'থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন করে?'

এতক্ষণ অমলবাবু চুপ করে খুব মন দিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মূর্তিটি কেমন করে আমরা পেয়েছিলুম, সে গল্পটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়তো তাহলেই আপনাদের কোনও কোনও প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।'

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললে, 'বলুন। আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি।'

অমলবাবু আর কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলতে লাগলেন—

'বহুদিন থেকেই আমি কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের (ইংরেজিতে Angkor Thom) কথা শুনে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন সুরেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রস্তাব করলুম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আমরা তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। শুনেছি, ওঙ্করধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরও অনেক হিন্দুকীর্তি আছে, যা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

যথা সময়ে যাত্রা করলুম।

তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কী করে ওঙ্কারধামের আকাশছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা ছাড়ানো ধ্বংসস্তূপের পরিত্যক্ত বিজন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সেসব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

গৌরবময় অতীতের এই মূর্তিমান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একদিন আমি আর সুরেনবাবু সবিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম পাশের ডাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্তনাদ করছে।

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্মি ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছটফট ও আর্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সুরেনবাবু চিকিৎসাশাস্ত্র জানতেন, তাঁর সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল।

চিকিৎসার গুণে দু-দিন পরে সন্ন্যাসীর অসুখ কিছু কমল। তাঁর মুখে শুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন।

কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃশ্য, অনেক অজানা বিস্ময়ও তিনি দেখে এসেছেন।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, হপ্তাখানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আর কোনও আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।'

গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মতো বললেন, 'সুরেনবাবু, আমার কাছে সরে এসো।'

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন 'আদেশ করুন।'

সন্ন্যাসী খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, 'সুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে যেতে চাই।'

সুরেনবাবু বললেন, 'পুরস্কারের লোভে আমরা আপনার সেবা করিনি।'

—'সে কথা আমি জানি। সেই জন্যেই তোমাদের পুরস্কার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পুরস্কার তোমাদের দেব তা বড়ো সাধারণ পুরস্কার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যে কোনও সম্রাটও লালায়িত হতে পারে। তবে এ পুরস্কার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।'

সুরেনবাবু বললেন, 'কী কাজ?'

—'তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন আর চ্যান রয়েছে। ওদের কালকেই বিদায় করে দিয়ো।'

সুরেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'কেন?'

—'ওরা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।'

আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান হচ্ছে তাদের সর্দার। ইন হচ্ছে আমাদের পথ-প্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইবে, তার কোনও হদিস খুঁজে পেলুম না।

সন্ন্যাসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতির মূর্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোনও দিকে যেয়ো না। দু-দিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—'

এই পর্যন্ত বলবার পরেই সন্ন্যাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচকি উঠতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্ন্যাসী বললেন, 'তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারদিকে পাথরে বাঁধানো একটি পুষ্করিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিম মুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চার কোণে আর চারটি ছোটো ভাঙা মন্দিরও আছে!'

সন্ন্যাসীর হাঁপ ও হেঁচকি আরও বেড়ে উঠল।

কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, 'তারপর—তারপর?'

কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, 'বড়ো মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদি আছে। তার উপরে আছে ছোটো একটি বুদ্ধমূর্তি। তোমরা সেই মূর্তিকে তুলে নিয়ে—'

সন্ন্যাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তারপর আমরা কী করব?'

কিন্তু সেকথা সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, 'পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ বুদ্ধ'—

তারপরেই তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব।

আমরা সন্ন্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলুম।

চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম—আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। এখানেই হপ্তাদুয়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেখে বাকি লোক নিয়ে তারা চলে যেতে পারে।

আমাদের হঠাৎ মত পরিবর্তনে তারা বিস্মিত হল বটে, কিন্তু কোনও রকম সন্দেহ করতে পেরেছে বলে মনে হল না।

সেই দিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কী দেখব আর কী লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু কী একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতূহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

সেই প্রান্তর, পুষ্করিণী আর চারটি ছোটো মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—সমস্তই পাওয়া গেল।

বড়ো মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদির উপরে একটি বুদ্ধমূর্তি বেদির সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা গাঁথুনি থেকে মূর্তিটিকে খুলে নিলুম।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোনও পুরস্কারই সেখানে ছিল না—যদিও আমাদের মতো প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিসই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছরের পুরানো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় সুরেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কীসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য সম্পদ আর কী থাকতে পারে?'

জয়ন্তবাবু, চোর আজ যে বুদ্ধমূর্তিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ওইটিকেই আমরা সেই বড়ো মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও-মূর্তি নিয়ে চোরের কী লাভ হত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'অমলবাবু, আপনি বলছেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে 'পদ্মরাগ বুদ্ধ'? কিন্তু 'পদ্মরাগ বুদ্ধ' নামে কোনও বুদ্ধমূর্তির কথা তো আমি কখনও শুনিনি।'

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমিও শুনিনি।'

মানিক বললে, কিন্তু পদ্মরাগ মণি বলে মহামূল্যবান মণি আছে!'

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর

যে-কোনও সম্রাট লালায়িত হতে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চুনপাথরের গড়া এক বুদ্ধমূর্তি, আর একখানা শিলালিপি,—রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বুদ্ধমূর্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্য রহস্য!'

সে বুদ্ধমূর্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উলটে ধরে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'দ্যাখো মানিক, এর তলার দিকটা!'

মানিক দেখলে, মূর্তির তলায় খানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, 'এখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল। এখন ভরাট করে দেওয়া হয়েছে!'.

জয়ন্ত হঠাৎ মূর্তিটা উঁচুতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অমলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন, 'কী করলেন, কী করলেন! ওর পিছনে যে ব্রাহ্মি লিপি ছিল।'

জয়ন্ত সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুকরোর ভিতর থেকে একটা জিনিস নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিসটা তামার একটা কৌটোর মতো—অনেকটা বিলাতি 'সেভিংস্টিকে'র কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘৎ হবে!

জয়ন্ত বললে, 'মূর্তির ভিতরটা খুদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্যাঁদা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।'

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চুপ করে থেকে বললেন, 'ও কৌটোর ভিতরে কী আছে?'

—'সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল!'

সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাকতি!

অমলবাবু বললেন, 'ও আবার কী?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চাকতিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললে, 'এতে কী-একটা নকশা খোদা রয়েছে।'

—'নকশা?'

'হ্যাঁ'—বলেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেনসিল ও 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' বার করলে। বাঁ হাতে চাকতির উপরে 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেনসিল ধরে সে তখনই তাড়াতাড়ি আর-একখানা বড়ো নকশা তৈরি করে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নকশাখানা অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ যে প্রান্তরের সেই মন্দিরের নকশা! এই মন্দিরেই আমরা ওই বুদ্ধমূর্তি পেয়েছি।'

জয়ন্ত খুব খুশি মুখে পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার করে দুবার নস্য নিয়ে বললে, 'তাহলে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো করে আপনি একবার নকশাখানা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা বলে যেতে পারেননি, আমরা এইবারে সেই গুপ্ত কথাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ বুদ্ধ! পদ্মরাগ বুদ্ধ। রহস্যময় নাম।'

অমলবাবু নকশার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর

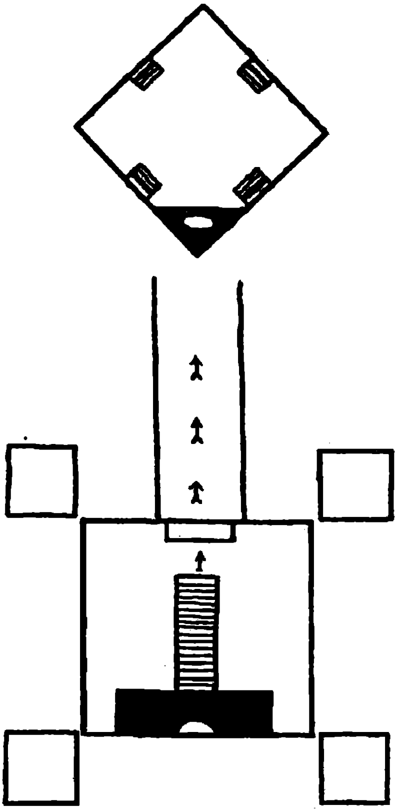

সোনার চাকতির নকশা

বললেন, 'দেখুন জয়ন্তবাবু, এ খানা যে সেই মন্দিরের নকশা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চারঘাটওয়ালা পুকুর, তার কোনাকুনি রাস্তা, চারিদিকে চারটি ছোটো আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমনকি কালো পাথরের লম্বাটে বেদিটি পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় অমিলও রয়েছে।'

জয়ন্ত নকশার উপরে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কী কী মিলছে না, আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।'

—'মন্দিরের ভিতরে, বেদির সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কী আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ওরকম কিছুই আমাদের চোখে পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'পুকুরের পশ্চিম কোণে তিন কোনা ওই কালো অংশটাই বা কী? মন্দিরের বেদির মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ওইখানেই আমরা বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, বুঝতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

—'আর কোনও অমিল দেখতে পাচ্ছেন?'

—'না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তির চিহ্ন রয়েছে কেন?'

জয়ন্ত নকশার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে! কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ করে লাভ নেই, কারণ সেসব সন্দেহ অমূলক হতেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ বুদ্ধের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।'

অমলবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওঙ্কারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি আছে, তা নাকি দুর্লভ মণিমাণিক্য কেটে একসঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ বলেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!'

মানিক বললে, 'ভেবে দ্যাখো জয়ন্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বুদ্ধমূর্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

জয়ন্ত বললে, 'সন্ন্যাসীও এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে-কোনও সম্রাট লালায়িত হতে পারেন!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!'

—'পদ্মরাগ বুদ্ধ! সে মূর্তি কত বড়ো? কতগুলো পদ্মরাগ মণি দিয়ে সে মূর্তি গড়া হয়েছে? মানিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!'

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবু লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!'

—'কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা চুনপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইনি!'

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চুনপাথরে গড়া মূর্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নকশা আঁকা চাকতি! বুদ্ধমূর্তির মধ্যে এমন দুটো জিনিস লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যন্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোনও সুদুর্লভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্যেই এমন একটি সাধারণ মূর্তির লোভে কেউ নরহত্যা করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কীসের এই চাবি? চাবিটা যেরকম বড়ো, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড়ো কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আমার মতে, এই চাকতির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নকশা আছে। কিন্তু নকশার ওই সিঁড়ির রহস্যটাই বা কী? ওরকম কোনও সিঁড়ি আপনি দেখতে পাননি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাল্পনিক নয়—নকশার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাল্পনিক হতে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।'

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না, ওর অস্তিত্ব নেই!'

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?'

—'কেমন করে?'

—'ওঙ্কারধামে গিয়ে।'

—'ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছোটার মতো। ওই অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুকুরের কোণে আর-এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন যাদুমন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?'

—'বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে!'

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, 'অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি বলে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা বলে মনে করেন?'

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, 'না, না অমলবাবু, আপনাকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন প্রত্নতত্ত্বের কথা। ও-বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশি সুবিধা করে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোনার চাকতির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধদেবের মূর্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধরে রয়েছে, তবু এমন দুটো অদ্ভুত জিনিস আপনারা আবিষ্কার করতে পারেননি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি। এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাখা পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাইনি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এসো মানিক!'

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে, তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বললে, 'এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কী মনে হয়?'

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'কী আবার মনে হবে? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ!'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'আর কিছু মনে হয় না?'

অমলবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়ো!...কিন্তু জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাবার কী আছে? আসামি যখন পলাতক, তখন ওই দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!'

কিন্তু সেকথা বোধ হয় জয়ন্তের কানে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্যদানি বার করে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, 'পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেই দিন থেকেই যেসব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান!'

একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, 'অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি? মাথায় সে খুব ঢ্যাঙা, মাপলে সাত ফুটও হতে পারে। তার দেহ রীতিমতো হৃষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অসুরে মতন জোর। সে ডান পাশে একটু বেশি হেলে পড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

প্রথমে অমলবাবু হতভম্বের মতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে-চোখে

গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আপনি চ্যানকে চিনলেন কেমন করে!'

জয়ন্ত দুই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, 'চ্যান?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ চ্যান। ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইনকে আমরা বিদায় করে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনই অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না!'

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে খুশিমুখে বললে, 'না চ্যানকে আমি চিনি না! তাহলে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢ্যাঙা, জোয়ান আর মোটাসোটা?'

—'হ্যাঁ! আর তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল নেই!'

—'উত্তম! মানিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে ফোন করে সব কথা জানিয়ো। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেন্ট বার করা হয়। কারণ খুব সম্ভব সুরেনবাবুকে সেই-ই খুন করেছে। আর আজকে চ্যানই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ওই পদচিহ্ন!'

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান কি কলকাতায় আছে?'

—'পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!'

—'পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?'

'থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বুদ্ধি। পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো করে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশি সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়ো! সাধারণত ছোটো চেহারার পায়ের দাগ এত বড়ো হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ করে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশি তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কীরকম স্পষ্ট দেখেছেন? হালকা দেহ বহন করে যেসব পা, তাদের ছাপ আরও কম স্পষ্ট হত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডান পাশটা বেশি চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডান পাশে বেশি হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের কড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আপনার অতবড়ো পালোয়ান দারোয়ানকে কুপোকাত করে সরে পড়েছে! দেখছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লোকে যা করতে পারে না।'

অমলবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, 'কিন্তু চ্যান এসেছিল আমাকে খুন করতে! কোথায় কাম্বোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কী আশ্চর্য!'

—'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! ওঙ্কারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান আর ইন সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে চ্যান আর ইন পদ্মরাগ বুদ্ধের সন্ধানে আছে। পদ্মরাগ বুদ্ধকে লাভ করতে হলে যে চুনপাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তিটিকে দরকার চ্যান কোনও গতিকে সেটাও টের পেয়েছে। ওই মূর্তি এখন আপনার দখলে তাই শত্রুর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!'

অমলবাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো পদ্মরাগ বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?'

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কে বলে আপনি পদ্মরাগ বুদ্ধ চান না? এক হপ্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওঙ্কারধামে যাত্রা করব!'

'—বলেন কী মশাই? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব? পদ্মরাগ বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটি টাকাও হয়, তাহলেও ওর মধ্যে আমি নেই। আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ওই চাবি আর চাকতি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ বুদ্ধ পেলে সে মূর্তি নিয়ে আপনারা যা-খুশি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।'

মানিক বললে, 'আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাতত এইটেই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশি লোক হয়েও চ্যান কী করে অমলবাবুর বাড়ির অন্ধি-সন্ধির সব খবর রেখেছে? সে কেমন করে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্তি আছে, আর গৃহকর্তা নিদ্রিত? বুঝে দ্যাখো জয়, চ্যান অন্ধকারেই ঘরে ঢুকে মূর্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের পিঠ চাপড়ে খুশি কণ্ঠে বললে, 'শাবাশ মানিক, শাবাশ! তুমি খুব বড়ো প্রশ্ন তুলেছ, একথা তো আমার মাথাতে ঢোকেনি? চ্যান এত হাঁড়ির খবর রাখলে কী করে?'

অমলবাবু বললেন, 'আপনার কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই পাড়ায় চার-পাঁচজন বর্মি লোক প্রায় আনাগোনা করে! দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা!'

জয়ন্ত বললে, 'তাই নাকি? তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ির উপরে পাহরা দেয়! কিন্তু তারা ঘরের ভিতরকার খোঁজ রাখলে কেমন করে? আচ্ছা অমলবাবু, পথের ওপাশে ওই মস্ত বাড়িখানায় কে থাকে বলতে পারেন?'

—'ওটা মেসবাড়ির মতো। ওখানে দেশবিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ বাঙালি নয়।'

—'তাহলে ও-বাড়ির তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা খুবই সহজ দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্তেই ওখানে বসে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে কি না?'

অমলবাবু চমকে উঠলেন, ম্লান মুখে বললেন, 'বলেন কী? আমি কি তবে শিয়রে শমন নিয়ে বাস করছি?'

জয়ন্ত বললে, 'আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক। আমরা দুজনে আপনাকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতিনমস্কার করে ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কী হয়, দেখা যাক।'

কথামতো কাজ হল। জয়ন্ত ও মানিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজ।

জয়ন্ত বললে, 'যা ভেবেছি তাই। আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করি বাঁশির সঙ্কেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, 'সবাই হুঁশিয়ার হও, শত্রুরা এখুনি রাস্তায় বেরুবে!' ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও-বাড়ি থেকে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এসো! আর-একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক।'

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়াল।

তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনও ঝিমঝিম করে ঝরছিল, রাস্তা

দিয়ে তখনও হাঁটু-ভোর জলের ধারা কলকল করে ছুটছিল এবং শেষ রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দা ছিঁড়ে তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝকমক করে জ্বলে উঠছিল।

সেই মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ির তিনতলার বারান্দা থেকে একটা মূর্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো করে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে? চ্যান, না আর কেউ?

একটি মাত্র ঢিল ও দুইটি পাখি

অমলবাবু সভয়ে বলে উঠলেন, 'কী ভয়ানক! দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন! সত্যিই তো, ও-বাড়ির বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দুর্যোগে রাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে ও-লোকটা কী দেখছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এতক্ষণ ও-লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে বসে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কি না! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হবে!'

—'সর্বনাশ! তাহলে আপনারা কী করবেন?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমাদের শত্রুদের গায়ে কত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা খ্যাপা ষাঁড়কে ধরে মাটির উপর কাত করেছিলুম, মানিক সে সাক্ষ্য দিতে পারে! কুস্তি-বক্সিং আমরা দুজনেই জানি। সুতরাং পথে বেরুতে আমাদের কোনও ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি সৃষ্টি না করে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

অমলবাবু বললেন, 'আপত্তি? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান আবার আসে?'

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ওই সামনের বাড়িটায় বেড়াতে যাব।'

—'বলেন কী, ওই বাঘের বাসায়?'

—'কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেসবাড়ি। তা যদি হয়, তাহলে ওখানে আরও অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোনও চেনা লোককে খুঁজতে যাব! দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কী লাভ হবে?'

—'প্রথম লাভ হবে এই যে চ্যান ওখানে আছে কি না সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যানকে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান ওখানে থাকলে কাল সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।'

—'কী অপরাধে, আর কী প্রমাণে?'

—'চ্যানই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোনও প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান যে এই বাড়িতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার

চেষ্টা করেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দায় ওই পদচিহ্নগুলো। ওই প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেক কালের জন্যে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শত্রুকে সরাতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হতে পারব।'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? সন্ন্যাসীর কথা মানলে বলতে হয়, ইনও আমাদের মস্ত শত্রু। সে কোথায় আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'তারও চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবাবু, অতঃপর আপনি ইনের রূপ বর্ণনা করুন!'

অমলবাবু বললেন, 'চ্যান যেমন অসাধারণ ঢ্যাঙা, ইন তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চার ফুটের বেশি তো হবেই না, বরং কম হওয়া সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ যাদুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হলেও ইন অত্যন্ত চটপটে আর চুলবুলে। সে ছোটে ক্রিকেট-বলের মতো আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মতো। চ্যানের লম্বা চওড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইনকে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয়! আবার চ্যান ও ইনকে একসঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি বৈচিত্রের কথা!'

জয়ন্ত বললে, 'চমৎকার! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইনকে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে?'

মানিক বললে 'নিশ্চয়ই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন!'

—'ফোটোগ্রাফ নয় মানিক, এ হচ্ছে 'এক্সপ্রেসানিস্ট' চিত্রকরের আঁকা ছবি; এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে এঁকে কিছু দেখালে না, কিন্তু মূল ভাবটি হুবহু প্রকাশ করলে। তুমি যদি ইনের সত্যিকার একখানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহলেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! কিন্তু যাক সে কথা। ভোরের পাখি ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোক দেখবার চেষ্টা করা দরকার!'

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুম্ভ শূন্য হয়ে গেল—এখন আর এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গলে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনও জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এসময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্দ্রা ছুটে যায়। আজ এখনও তার ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়নি। যার নিতান্ত দায়, সেই-ই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনও বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আর্তনাদ প্রায় স্তব্ধ, মোটররা এখনও মানুষমৃগয়ার লোভে উৎসাহিত হয়নি।

জয়ন্ত ও মানিক যখন রাস্তার ওপাশের মস্ত বাড়িখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোনও কচকচিই জাগেনি।

একটা বুড়ো হিন্দুস্থানি দারোয়ান সদর দরজার চৌকাঠে বসে দাঁতনকাঠি চর্বণ করছিল। জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'দরোয়ানজি, এ বাড়িতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?'

দারোয়ান একটু বিস্মিত ভাবে জানালে যে এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালি বাবু'দের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়ন্ত বললে, 'সে কথা আমিও বুঝি দারোয়ানজি! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব

না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিনা!'

দারোয়ান জানালে, তিনতলায় চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।

'তিনতলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটে আছে?'

শোনা গেল, তিনতলায় রাস্তার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছয়জন বর্মি লোক আছে। ভিতরের দিকে আছে একঘর মাদ্রাজি। বর্মিদের ঘরের পাশেই দুখানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল।

কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ির—বিশেষত যেখানে অবাঙালির বাস—সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয়, থুতু পানের পিক ও অন্যান্য নানা নক্কারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ করে এবং যতটা সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মানিক এই ভাবেই দোতলায় গিয়ে উঠল।

দোতলায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে ডাস্টবিনের চেয়েও নোংরা একতলার উঠান দেখা যায়।

অধিকাংশ ঘরের দরজা-জানলাই সারারাত্রব্যাপী বৃষ্টির জন্যে এখনও বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তর্জন-গর্জন বাইরে বেগে ছুটে আসছে।

তারা তিনতলায় উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চারজন লোকের দ্রুত পদধ্বনি!

কিন্তু তিনতলায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বারান্দার ধারের প্রত্যেক ঘরের দরজা জানলা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা ঘুরে এল—তবু কারুর দেখা বা সাড়া নেই, এমনকি এখানে কারুর নাক পর্যন্ত ডাকছে না!

মানিক মৃদুস্বরে বললে, 'কিন্তু উপরে এখনই যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আর গেলই বা কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান ও ইন কোম্পানির লোক, আমাদের সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে! মানিক এখন একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে!'

একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো রয়েছে।

দারোয়ানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে সুমুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, এখান থেকে অমলবাবুর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!'

বারান্দার যেখান থেকে কাল রাত্রের সেই মূর্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়ন্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আস্তে আস্তে একটা জানলা বন্ধ করার আওয়াজ হল।

মানিক চুপি চুপি বললে, 'বারান্দার ধারের একটা ঘরের জানলা খোলা ছিল আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ করে দিলে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করছে। হয়তো আমাদের মতলব ধরে ফেলেছে!'

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জানলা ও একটা দরজা রয়েছে। দুই-ই বন্ধ।

দরজার কড়া ধরে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোনও সাড়া নেই।

জয়ন্ত বললে, 'এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চলো, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।'

দুজনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল।

আর-একবার এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মানিক, তারপর জয়ন্ত।

হঠাৎ হুড়মুড় করে বিষম একটা শব্দ হল—মানিক চমকে পিছনে তাকাতে না তাকাতে জয়ন্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্তেই ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে মানিক সিঁড়ির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মানিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যন্ত্রণায় সে যেন অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুমদুম শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে!

তারপরেই চারিদিকে ব্যস্ত পদধ্বনি, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি! সে বুঝলে, জয়ন্ত হঠাৎ পা-হড়কে সিঁড়ির উপর পড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে মানিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দোতলায় নেমে সে দেখলে, সেখানে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি ও মাড়োয়ারির ভিড়!

জয়ন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্ধ-মূর্ছিতের মতন বসে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মানিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, 'জয়, জয়, তোমার কি বড্ড বেশি লেগেছে?'

অভিভূতের মতো জয়ন্ত খালি বললে, 'হুঁ।'

মিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হল, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কাকে খুঁজতে লাগল।

মানিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেও চ্যান বা ইনকে ভোলেনি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুল্লুকের কোনও নমুনাই দেখা গেল না।

মানিক বললে, 'জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনব কি?'

জয়ন্ত কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ন্ত ও মানিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুষ্ক স্বরে বললে, 'মানিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোনও বর্মি লোককে দ্যাখোনি?'

—'না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিনিট দুয়েক দেরি হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কি না জানি না।'

—'নিশ্চয় এসেছিল!'

—'কী করে জানলে?'

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, 'মানিক, আমি পা পিছলে পড়ে যাইনি!'

—'তবে?'

—'আমাদের সুচতুর বন্ধু এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করেছে!'

—'জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত খুব শুকনো হাসি হেসে বললে, 'মানিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মারলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলুম।'

মানিক সচকিত কণ্ঠে বললে, 'বলো কী জয়! কে ধাক্কা মারলে? তাকে দেখেছ?'

—'না, দেখবার সময় পাইনি। তবে তার গায়ে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। তারপর আমি যখন দোতলার বারান্দায় পড়ে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অছিলায় অজানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড়ো চাবিটা আর নকশা আঁকা সোনার চাকতি নিয়ে দিব্যি সরে পড়েছে।'

—'সর্বনাশ! এখন উপায়?'

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবুর বাড়িতে ফোন আছে। তুমি এখনই গিয়ে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে একদল কনস্টেবল নিয়ে এখানে আসতে বলো। এই বাড়িখানা তল্লাশ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দি।'

গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু যখন মানিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তখন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কণ্ঠে সে বললে, 'এত দেরি হল কেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু তাঁর মাথাজোড়া ঘর্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন, 'হুম! দেরি হবে না? শুনলুম বাড়ি খানাতল্লাশ করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হল যে! কিন্তু ব্যাপার কী জয়ন্ত? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছ?'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস! অন্তত যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।'

—'হুম। মানিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্যসাগর আবিষ্কার করেছ! পদ্মরাগ বুদ্ধ, নকশা আঁকা সোনার চাকতি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন ওসব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন ওই বাড়ির ভিতর যাই।'

—'কিন্তু অপরাধী কি এখনও ওখানে আছে?'

—'বর্মিদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ির ভেতর থেকে কোনও বর্মি-লোক বাইরে বেরোয়নি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।'

—'বেশ, তবে চলো।'

এত পাহারাওয়ালা দেখে দারোয়ানের দুই চক্ষু বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু পুলিশসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'এই পাঁড়ে!'

দারোয়ান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, 'আমি পাঁড়ে নয় হুজুর, আমি হনুমান চোবে!'

—'তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জাম্বুবান পাঁড়েই হও, সেকথা আমি জানতে চাই না! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চলো!'—তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হুকুম দিলেন, 'এই সেপাইরা! আমার সঙ্গে জন-ছয়েক লোক এসো, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,—কেউ যেন এই বাড়ির বাইরে যেতে না পারে!'

জয়ন্ত ও মানিক সবাইকে নিয়ে তেতলায় গিয়ে উঠল।

বর্মিদের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল।

সুন্দরবাবু পাল্লার উপরে এক লাথি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, চারজন বর্মি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, 'এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কী করতে এসেছিস?'

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, 'আমরা এখানে ব্যাবসা করতে এসেছি।'

—'হুম! মানুষ মারবার ব্যাবসা? ওহে জয়ন্ত, এ ব্যাটাদের কোনটাকে তুমি চাও?'

বর্মিদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের আপাদমস্তক লক্ষ করে বললে, 'তোমরা ক-জন এখানে থাকো?'

তারা জবাব দেবার আগেই দারোয়ান হনুমান চোবে বললে, 'হুজুর! এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্মি থাকে।

জয়ন্ত বললে, 'এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর দুজন কোথায়?'

একজন বর্মি বললে, 'আধঘণ্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

জয়ন্ত চুপিচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, 'লোকটা মিছে কথা কইল। আমি হলপ করে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোনও বর্মি বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।'

—'হুম, মিছে কথা না? তাহলে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! চলো, ভেতরের ঘরটা খুঁজে দেখি!'

কিন্তু অন্য ঘুরে ঢুকেও বাকি দুজনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, 'এই জাম্বুমান পাঁড়ে!'

দারোয়ান হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আমার নাম হনুমান চোবে!'

—'ও একই কথা। সকাল থেকে তুমি দেউড়িতে আছ?'

—'হাঁ হুজুর!'

—'দুজন বর্মিকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ?'

—'না হুজুর!'

—'তাহলে তারা কি হুস করে আকাশে উড়ে গেল?'

—'বড়োই তাজ্জবের কথা হুজুর! আরও দুজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন ভয়ানক ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!'

মানিক জয়ন্তের কানে কানে বললে, 'চ্যান আর ইন-এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!'

জয়ন্ত কেবল বললে, 'হুঁ।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, এখন আমাদের কী করা উচিত?'

জয়ন্ত বললে, 'সেই চাকতি আর চাবির খোঁজ। যদিও ও-দুটো জিনিস খুব সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘরদুটো খুঁজে দেখা যাক।'

খানাতল্লাশ শুরু হল।

দুটো ঘরের সমস্ত ওলট-পালট করে এমনকি বিছানার বালিশ পর্যন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখা হল, কিন্তু চাবি আর চাকতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, 'সে মগদুটো তাহলে বাড়ির অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জাম্বুমান—'

—'হুজুর, হনুমান—'

—'না আমি তোমাকে জাম্বুমান বলেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ওই ঘরে কে থাকে?'

—'একজন মাদ্রাজি সদাগর।'

—'আচ্ছা, আগে ওই ঘরখানাই দেখা যাক। এসো জয়ন্ত! এই সেপাই, হুঁশিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন সরে না পড়ে!'

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ন্ত শুধোলে, 'হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজি থাকে তার নাম জানো?'

—'জানি হুজুর! গোপীনাথ নায়ডু।'

সুন্দরবাবু হাঁকলেন, 'গোপীনাথ! গোপীনাথ!'

কোনও সাড়া নেই।

দারোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'গোপীনাথবাবু তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনও দরজা বন্ধ কেন।'

সুন্দরবাবু আবার পদযুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচ বার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম করে দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল!

হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে 'হুম' বলে চিৎকার করে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মানিক বললে, 'কী হল সুন্দরবাবু, কী হল?'

সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'হুম!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিত হয়ে চারিদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা-চওড়া মাদ্রাজি,—তার বুকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মস্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে!

দারোয়ান বিহ্বল স্বরে ডাকলে, 'গোপীনাথবাবু!—গোপীনাথবাবু!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'গোপীনাথবাবু এ জীবনে আর কথা কইবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'গোপীনাথকে এখনই কেউ খুন করেছে! সাবধান, খুনি ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!'

জয়ন্ত ঘরের চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'জানলার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনি পালিয়েছে!'

একটা খোলা জানলার দুটো লোহার গরাদ দুমড়ে ফাঁক হয়ে রয়েছে!

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপ! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদ তারের মতন দুমড়ে ফাঁক করে পালানো যায়?'

মানিক বললে, 'এ চ্যান ছাড়া আর কেউ নয়! কিন্তু চ্যান এই গোপীনাথ বেচারাকে খুন করলে কেন?'

সুন্দরবাবু এদিকে ওদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'দ্যাখো মানিক, ঘরের সমস্ত জিনিস লন্ডভন্ড! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উলটেপালটে কিছু খুঁজেছিল!'

ঘরের সর্বত্রই রাশি রাশি চটিজুতা, কাঠের পুতুল, 'ল্যাকারে'র কৌটো প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে!

মানিক বললে, 'দেখছি, সমস্ত জিনিসই বর্মায় তৈরি! গোপীনাথ কি বর্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যাবসা করত?'

দারোয়ান বললে, 'হাঁ বাবুজি!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আবার দেখছি একটা নতুন মামলা ঘাড়ে চাপল। যাই, উপরঅলাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি গে!'

সুন্দরবাবু বাইরে গেলেন। মানিক বললে, 'জয়, তুমি বোবা হয়ে কী ভাবছ বলো দেখি?'

জয়ন্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা চেয়ারের উপরে বসেছিল। মুখ তুলে বললে, 'মানিক, আমি মনে মনে আঁক কষছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।'

—'অর্থাৎ?'

—'মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্যি হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোনও অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যাবসা ছিল ব্রহ্মদেশ থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধরে নেওয়া যাক, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্মায় গিয়েছে আর বর্মি ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই ঘরে বসে দেখলে যে একদল বর্মি লোক সামনের ওই ঘর দুখানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্মিদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোনও কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ির দিকে নজর রাখে, আর বর্মি ভাষায় কী পরামর্শ করে। গোপীনাথও তখন কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেললে! তখন সে-ও তাদের উপরে—আর অমলবাবুর বাড়ির উপরে পাহারা দিতে লাগল। কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান আর ইন কোম্পানি আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদের চেয়েও সাহসী, এমন সুযোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাকতি আর চাবির অধিকারী হল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের বারান্দা

থেকে চ্যান আর ইন কোম্পানির কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মানিক, আমি কি অঙ্ক কষতে ভুল করেছি বলে মনে করো?'

ইতিমধ্যে কখন সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, 'না, জয়ন্ত! তুমি তো অঙ্ক কষছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হুম, ওই তো হচ্ছে শখের গোয়েন্দাদের বদ স্বভাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেল্লা ফতে করে সরে পড়ে!'

সে-কথায় কান না দিয়ে মানিক বললে, 'তাহলে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন করে চ্যান আর ইন এই ঘর খানাতল্লাশ করে চাবি আর চাকতি নিয়ে ওই জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?'

জয়ন্ত কিছু বললে না, সামনের দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ করে মানিক দেখলে, সামনের দেওয়ালের গায়ে একখানা বড়ো 'ব্রমাইড এনলার্জমেন্ট' ছবি টাঙানো রয়েছে! ছবিখানা মৃত গোপীনাথের, কিন্তু উলটো করে টাঙানো রয়েছে।

মানিক বললে, 'চ্যান আর ইন দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানাটানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উলটো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'তারা যদি ওই ছবিখানা নামাত তাহলে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হত না বোধ হয়! দ্যাখো না, ঘরের যেসব জিনিস তারা ঘেঁটেছে, কোনওটাই গুছিয়ে রেখে যায়নি।'

—'তবে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন উলটো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!'

জয়ন্ত বললে, 'এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হল কি উলটো হল সেটা দেখবার সময় আর পায়নি।'

—'কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কী?'

—'ছবিখানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!'—এই বলে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখানা উলটে দেখলে, ছবির পিছনে পিজবোর্ডের এক জায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়ন্ত পিজবোর্ড ফাঁক করে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাকতি!

মানিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুশিকণ্ঠে বললে, 'চাবি আর চাকতি চুরি করে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিস দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনিরা খানাতল্লাশিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জানলাপথে চ্যান আর ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একেবারেই পৃথিবী জয় করেননি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই পৃথিবী জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যার কল্পনাশক্তি নেই, দুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন দুকথা শুনিয়ে দাও ভায়া, শুনিয়ে দাও। এই জাম্বুমান পাঁড়ে—'

—'হুজুর, হনুমান চোবে—'

—'ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধ হয় বড়োসাহেব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চলে যাও।'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই! কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা বলে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাসখানেক ছুটি নিন।'

—'কেন?'

—'আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য শুরু হবে একেবারে কাম্বোডিয়ার জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসস্তূপে। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম।'

ওঙ্কারধামের যাত্রী

ধান-খেতের পর ধান-খেত, তারপর আবার ধান-খেত! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ!

যতদূর চোখ চলে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ, কলাগাছ আর বাঁশবনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী! কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়াঘাটে নৌকায় চড়ে পার হতে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোটো ছোটো গ্রাম।

সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে বসে আনামি স্ত্রীলোকেরা চিংড়িমাছ, কমলালেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রি করছে।

ধুলোর স্তূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর।

একখানা গাড়িতে আছে জয়ন্ত ও মানিক, পরের গাড়িতে অমলবাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়িতে দরকারি জিনিসপত্র এবং চাকরবাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, 'এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ! পাশাপাশি একটানা এত বেশি ধানের খেত কেউ কি কখনও চোখে দেখেছে? হুম!'

অমলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এদেশ এমনি উর্বর বলেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে নতুন এক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, নতুন এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন।'

—'হুম, ওসব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না।'

—'না সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর অবিশ্বাসের কথাই তুলতে পারবেন না...

সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি।

এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসিদের অধিকারে এসেছে।

আজ ফরাসিরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে নিবিড় বন কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্যন্ত

এটা ছিল বাঘ আর হাতির নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

সতেরো শতাব্দীতে পর্তুগিজ মিশনারিরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে সেই বিস্ময়কর কাহিনি প্রচার করেন।

মিশরের পিরামিডের মতন বড়ো আশ্চর্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গল্প শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না।

পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল...

বড়ো বড়ো বটগাছ, বাঁশবন, নারিকেলগাছ ও নানা জাতীয় লতাগুল্ম এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে ঢেকে রইল যে, বাইরের কোনও কৌতূহলী চক্ষু আর তাদের কোনও খোঁজই পেলে না...

দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ!

ফরাসিরা প্রথমে ব্যাবসা সূত্রে ইন্দো-চিনে পদার্পণ করলে।

লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরণ্যের অন্ধকারে যেখানে সূর্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভুত রাজধানী, মাইলের পর মাইল ব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ! কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেইসব প্রবাদ শুনলেন।

অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে, ওখানে আগে কোনও বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতার পিছনে কোনও চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে লুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চিনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুথিপত্রেও কাম্বোজের এক আশ্চর্য সভ্যতার কাহিনি পাওয়া যায়!

Mouhot একজন ফরাসি ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতূহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হাতির মুল্লুকে প্রবেশ করলেন।

বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় বসে, হাতিরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে পড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ।

ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হল!

বোবা পাথরের উপরে বিস্ময়ের শব্দ-রেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনি বহন করে Mouhot আবার আধুনিক সভ্যজগতে ফিরে এলেন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে...

সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হত। তারা আবার নতুন দেশে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ করে নতুন রাজ্য স্থাপন করত।

এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোনও কোনও রাজ্য এখনও টিকে আছে।

সম্ভবত এই ভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে এখনও সেটা স্থির হয়নি।

তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের হাতে গড়া নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয়নি, এমন কথা বলা যায়।

এই সভ্যতার আশ্রয়ে যে এক সময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মতো প্রমাণেরও অভাব নেই।

ওঙ্কারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড়ো নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশ লক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদের মেঘছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস করে আজও বেঁচে আছে—যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরিদের পিরামিড!

ওঙ্কারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়ো, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য!

মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিগ্বিজয়ী হিন্দু—আমাদেরই পূর্বপুরুষ!

সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিত হতে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে একথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—মনে করবেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মর্তে অবতীর্ণ দেবতা!'

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মতো কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, 'হুম!'

প্রথম গাড়িতে তখন মানিক বলছিল, 'জয়, কলকাতার অলিগলিতে চ্যান আর ইন হয়তো এখনও আমাদের খুঁজে মরছে!'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ঠকে মরে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারিনি।'

—'কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান আর ইন ছিল না, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ছিল না।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, 'হতে পারে। না হতেও পারে।'

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়ন্ত সচমকে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা—অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

জয়ন্তদের তিনখানা গাড়ি ঠিক পরে পরেই ছুটেছে।

কিন্তু আরও খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরও দুখানা নূতন মোটরগাড়ি! রাস্তার উপরে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে গাড়ি দুখানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এত বেগে ওরা কারা গাড়ি চালায়! ক্রমাগত হর্নের পর হর্ন দিয়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে সরে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কীসের?'

পিছনের গাড়ি থেকে ব্যস্ত-স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো! নইলে এখনই অ্যাকসিডেন্ট হবে!'

জয়ন্ত নিজেদের ড্রাইভারকে বললে, 'গাড়ি নিয়ে একপাশে সরে যাও। গাড়ি একেবারে থামিয়ে ফ্যালো।'

ড্রাইভার তার কথামতো কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ি দুখানাও পথের একপাশে গিয়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপর নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোমরবন্ধে সংলগ্ন রিভলভারের উপর হাত রেখে পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধুলোর মেঘে ঢাকা দুখানা গাড়ি তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব কাছে এসে পড়েছে!

মহাকালের অভিশাপ

জয়ন্তের পাশে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, 'জয়, তুমি কি মনে করো, ও গাড়ি দুখানার মধ্যে আমাদের শত্রু আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'শত্রু মিত্র জানি না, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।'

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ করে ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র গতিতে সাঁৎ করে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় গাড়িখানা! গাড়ি তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোনও মানুষের মুখই আবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, 'মেল-ট্রেনের স্পিডও এদের কাছে বোধ হয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে?'

পথের ধুলোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'যেখানেই যাক, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নাগাল ধরবে মানে? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি ছোটাতে হয়! হুম, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ি যদি একবার হোঁচট খায়, তাহলে ওঙ্কারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হতে হবে!'

জয়ন্ত রুপোর নস্যদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, 'ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প পড়েননি? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোশকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ির স্পিড না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধুলোর ওপরে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ও হো হো হো, বুঝেছি! ওই দাগ ধরে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো?'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কী?'

জয়ন্ত বললে, 'দরকার একটু আছে বই কি! এমন মারাত্মক স্পিড নিয়ে যারা আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন!'

অমলবাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, ওই গাড়ি দুখানার মধ্যে চ্যান আর ইন আছে?'

—'চ্যানকেও চিনি না, ইনকেও চিনি না, এখন উঠুন গাড়িতে!' —এই বলে জয়ন্ত নিজের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ি তিনখানা আবার অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ববর্তী গাড়িগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

মানিক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আচ্ছা জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না করে এগিয়ে গেল কেন? আর শত্রুরা সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কী করে? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না!'

জয়ন্ত বললে, 'চ্যান আর ইন হয়তো এখনও এখানে এসে পৌঁছোতে পারেনি, কিন্তু মানিক, তুমি ভুলে যেয়ো না যে এটা হচ্ছে বিংশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!'

—'জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোনও টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে?'

—'হতেও পারে, না হতেও পারে! হয়তো ওরা হুকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে! ওঙ্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগলে থাকবার জন্যে।'

গাড়ি ছুটছে! দু-ধারে সেই সবুজ খেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।

মানিক বললে, 'দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।'

ড্রাইভার বললে, 'হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম রিপ। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছোব।'

সিয়েম রিপ গ্রাম থেকে উত্তর দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সামনে জেগে উঠল, বিরাট ওঙ্কারধামের বিপুল দেবালয়!

চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুদীর্ঘ বনস্পতিরা ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়ার অনেক নীচে পড়ে রয়েছে।

দূর থেকে ওঙ্কারধামকে দেখে মনে হল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন রূপে সাজাহান বাদশার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়! এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

এ যেন আলাদিনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কোনও অসম্ভব মায়ামন্দির, যে-কোনও মুহূর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

ওঙ্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্তী সেই গাড়ি দুখানার চাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্বপ্রথমেই ডাকবাংলোয় ঢুকে একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুম, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!'

জয়ন্ত বললে, 'আপাতত আমাকে ও-দুটি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!'

মানিক বললে, 'কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে বলেই মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোনও চিহ্নই নেই।'

'হ্যাঁ, ঝড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে—' মৃদুস্বরে এই কথা বলেই জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'এই ওঙ্কারধাম আমার পুরোনো বন্ধুর মতো। মানিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ করে আসতে চাই।'

মানিক বললে, 'এই অদ্ভুত মন্দির আমারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

অগ্রসর হতে হতে অমলবাবু অর্ধনিমীলিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে কাহিনি বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে এই—

অস্তলোক থেকে পূর্ব আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই!

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পৃষ্ঠে! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চড়ে! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে বসে! চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, সওদাগর ও ধনী দীন প্রজার দল যথাযোগ্য যানবাহনে বা পদব্রজে! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারির দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে মাখানো শুকনো ভস্মের মতো সাদা ধুলোয় ভরা উঁচু নিচু পথ মাড়িয়ে;—তাদের কোনও সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে পড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বলছে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে!

কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোসকা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে জাগছে পাগলিনদীর ক্রুদ্ধ ঢেউ, দুরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের জ্বালাময় কণ্টকপ্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত! কত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনন্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুর বাহিনীর পিছনে পিছনে!...

কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জন নিস্তব্ধ নির্দয় পথ জুড়ে পড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল,—জীবনের যাত্রাপথে যেসব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না, তাদেরই শেষ চিহ্ন!

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত সন্তান!

হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ করে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী, মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনও কোনও বিধর্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয়নি। খুব সম্ভব তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদ্রাজ বলে জানি।

ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষায় লিপি খুদে গেছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মূর্তিও তাদের মৌন ভাষায় আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে—যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ।

এইখানে গহন বন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে! ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কোণারকের মতো এখানে আমরা কোনও প্রাচীন শিল্পকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওঙ্কারধামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতা দানব মানব ও পশুর মূর্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে।

এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারেনি!

...মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবন্তদের কলকোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে—দেবদাসীরা পায়ের নূপুর খুলে যেন এই সবে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পুজো সেরে এই সবে যেন চোখের অন্তরালবর্তী হয়েছেন, ধূপধুনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড়ো শহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না।

নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারতশিল্পী যখন এই শহরকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন, তখন ইউরোপের যে-কোনও নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হত!

এথেন্স, রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওঙ্কারধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মতো প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ করে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল? কোথায় গেল সেই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা?

আজকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চলে গিয়েছে যে-কোনও মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরধিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মানিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনও দুলছে হালকা মেঘে।

ওঙ্কারধামের পদ্ম ফোটা খালের ঝিলমিলে জলে, বট আর নারিকেল কুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশি করে জমে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া!

বিভিন্ন দল বেঁধে ছোটো ছোটো মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসছে দূরের মন্দিরগর্ভ ভেদ করে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গম্ভীর মন্ত্রছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে উঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠরব, না বহুযুগের ওপারে বসে ওঙ্কারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে?

মানিক হঠাৎ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সুমুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য ও বিচিত্র এক নগর তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজি কেতাবে

এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোনও আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারেনি।

খুব উঁচু সেই নগর তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড়ো বড়ো হাতি আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন বৃহৎ শিবের মুখ মানিক জীবনে কোনও দিন দেখেনি!

ওঙ্কারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে 'প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগন্তুককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মুখদুখানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং তোরণের ভিতর দিক থেকে যে মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিষ্কার করা যায়!

প্রলয়কর্তা শিবকে নগররক্ষী রূপে নির্বাচন করে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিত কার্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বুক ভেসে যেত তখন শোণিত প্রবাহে!

প্রলয়-দেবতার প্রীতির জন্যে লক্ষ লক্ষ শত্রুর প্রাণবলি দিয়ে অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে আত্মদান করে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতির শ্মশানে শেষ পর্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চির-একাকী প্রলয়-দেবতাই!

অমলবাবু তোরণের উপর দিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে নমস্কার করে বললেন, 'হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্তা নও, সৃষ্টি করাও তোমার কাজ! অবোধ প্রাণী আমরা, লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি বলে আমাদের অপরাধ নিয়ো না প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!'

মানিক হেসে বললে, 'এই পাথরে গড়া জড়দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে ওঙ্কারধাম আজ শ্মশান হয়ে যেত না!'

অমলবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মানিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনই সর্বনাশ হবে।'

মানিক বললে, 'সর্বনাশ যদি হয়, তাহলে ওই পাথরের দেবতার জন্যে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ভুলেই হবে!'

মানিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন সন্ধ্যার কালিমাখা স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে আচম্বিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মানিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মানিক ত্রস্ত স্বরে বললে, 'শব্দগুলো এল বাংলোর দিক থেকে!' বলেই সে বেগে ডাকবাংলোর দিকে ছুটে চলল—তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, সুন্দরবাবু খুব ব্যস্ত ভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মানিক তাড়াতাড়ি শুধোলে, 'এখানে বন্দুক ছুড়লে কে? আর্তনাদ করলে কে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমিও তোমাদের ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই?'

—'জয়ন্ত কোথায়?'

—'সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!'

মানিক চিৎকার করে ডাকলে, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ওইদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু আপনি ওইদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখছি!'

তিনজনে তিন দিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনও মানুষের চোখ অন্ধ করবার মতো অন্ধকার সৃষ্টি করেনি—শেষ পাখির দল তখনও বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছে না, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরুপল্লবের দীর্ঘশ্বাস!

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'মানিক! অমলবাবু! এইদিকে এইদিকে!'

মানিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপি!

'কী সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?'

'হুম, এ কী কাণ্ড। জয়ন্তের টুপি এখানে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে এত রক্ত কেন?'

মানিক উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল। আড়ষ্ট চোখে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, 'এ কার রক্ত?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?'

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললেন, 'মহাকালের অভিশাপ! মানিক তোমার নাস্তিকতার ফল দ্যাখো!'

পাথরের সিনেমা*

আরও অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়ন্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দারোয়ান হাতি সিং ও দলের অন্যান্য চাকর-বাকররাও এসে পড়েছে।

সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হতে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লণ্ঠনের প্রখর আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেঙিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'হায় হায়, মগের মুল্লুকে এসে জয়ন্ত শেষটা প্রাণ হারাল!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনই ফিরে আসবে!'

---

*ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসে যা বলা হয়েছে তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। ইতি লেখক।

অমলবাবু বললেন, 'আমার তা মনে হয় না। দু-দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আর ওখানে জয়ন্তের টুপিটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?'

মানিক বললে, 'দেখা যাক, জয়ন্তের পদ্ধতিতেই কোনও রহস্য আবিষ্কার করা যায় কি না!'

যেখানে টুপিটা পড়ে ছিল সেইখানে গিয়ে সে আগে টুপিটা তুলে নিলে।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপির দুদিকে দুটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপির ভিতরেও রক্তের দাগ! সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মানিক নিরাশ কণ্ঠে বললে, 'আর কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে শত্রুর গুলি।'

অমলবাবু বললেন, 'তাহলে গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?'

—'জয়ন্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে বলে মনে হয় না।'

অমলবাবু বললেন, 'দশজন সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাৎ আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না বলে নির্বোধ আর গোঁয়ার বলাই উচিত। জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই এ-শ্রেণির লোক নন।'

—'সে কথা সত্যি। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত।'

—'এখানে জয়ন্তবাবুও নেই, শত্রুরাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?'

—'অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধরেও শত্রুরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাকতিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে দুটো জিনিস চুরি যাবে না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখানে রয়েছে জয়ন্তের রক্তমাখা টুপি, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত দূরেও মাটির উপরে রক্তের ঢেউ বইছে! আমার কী ভয় হচ্ছে জানো মানিক?'

—'কী ভয় হচ্ছে?'

—'আমরা দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধরো, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শত্রুর প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে পড়ে যায় আর তার টুপিটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ওইদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম। সে যখন ওইখানে গিয়ে পৌঁছেছে তখন শত্রুদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করুন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত বেশি রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিশে কাজ করে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মানিক, খুব সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!'

গভীর দুঃখে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখ দুটি ছলছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুলকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবুর দেহ কোথায় গেল?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্যে শত্রুরা জয়ন্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।'

ওঙ্কারধামের মন্দির-চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি দিয়ে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানারকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস।

মানিক খানিকক্ষণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে থেকে হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠল, 'প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আমারও ওই কথা! এখন আর পদ্মরাগ বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়ন্তের হত্যাকারীদের!'

অমলবাবু বললেন, 'কিন্তু কোথায় তারা?'

মানিক বললে, 'অমলবাবু, যে ভাঙা মন্দিরের ভিতর থেকে আপনি বুদ্ধমূর্তিটা এনেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো?'

—'নিশ্চয়ই আছে!'

—তাহলে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে এখনই চলুন সেইদিকে!'

—'তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হবে না?'

—'অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায়নি, কিন্তু চাকতির নকশা তো পেয়েছে! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ওইদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।'

—'কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান আর ইনকে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।'

—'এটা আপনার ভুল বিশ্বাস। পদ্মরাগ বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত—জানত না কেবল পদ্মরাগ বুদ্ধের ঠিকানা। নকশা পেয়ে তারা এখন সদলবলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। চলো, চলো,—আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শত্রুরা ততই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনই যাত্রা করতে হবে!'

সবাই যখন শত্রুদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে!

ডাকবাংলোর ছাদে একটা প্যাঁচা বসেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝটপট ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম—পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই প্যাঁচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!'

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তকে যখন হারিয়েছি, তুচ্ছ প্যাঁচার ডাকে আমাদের আর কী অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?'

—'যা বলেছ মানিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মতো! কপালে এও ছিল—হুম!'

এবারে আর ঝাপসা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেখে ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়া অন্ধকারে গড়া পঞ্চস্তম্ভের মতো মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কী অবাস্তবই দেখাচ্ছে!

অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওঙ্কারধাম। তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে চলন্ত ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণছায়ার সৃষ্টি করে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্শা-তরবারি হাতে করে দলে দলে হাজার হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের

ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ বলেই মনে হয়!

দূর-গ্রামে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওঙ্কারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল!

অমলবাবু যেন আপন মনেই বললেন, 'রাজা ইন্দ্রবর্মণের পুত্র যশোবর্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্যও ছিল অসাধারণ! তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ্র সংহার করেছিলেন!

তাঁর কীর্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র এগারো বৎসরের ভিতরেই এখানকার বিরাট নগর গড়ে সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব বলেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্মণ যে বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অমানুষিক বললেও চলে।

ওঙ্কারধামের বয়স তখন পুরো এক বৎসরও হয়নি। ভারত রাহু সম্বুদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ একরাত্রে সসৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

প্রসাদের বাহিরে যেসব প্রহরী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীরা সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল পঙ্গপালের মতো দলে দলে। ভিতরের প্রহরীরা প্রাণভয়ে কে কোথায় সরে পড়ল তার কোনও সন্ধানই মিলল না!

বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্মণের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল দুইজন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্রোহীরা দলে খুব ভারী ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিনজনের বেশি লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না।

মহারাজ যশোবর্মণ বিপুল বপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মতো অসিচালনা করতে লাগলেন—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মতো মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে।

যশোবর্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে ঢুকতে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত রাহু তখন মহাবিক্রমে যশোবর্মণকে আক্রমণ করলেন—দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারত রাহুর মৃতদেহের উপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে, শূন্যে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!'

হাতি সিং ও আর চারজন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে সরে সরে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সে আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তরমূর্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধরে পাশাপাশি বসে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোনও কোনও দানব শতাব্দী ধরে প্রকাণ্ড শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন শ্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে পড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, 'আগে এমনি পাঁচশো চল্লিশটি দানব এখানকার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কারধামের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়ে তা দুগুণ বেশি উঁচু! আর তার অন্য চারটি শিখরও বড়ো কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়শো ফুট করে! আর চারিদিক ঘিরে ওই যে খাল চলে গেছে, তাও চওড়ায় দুশো ত্রিশ ফুট!'

সর্পমূর্তি চোখে পড়ে চতুর্দিকেই।

এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজা কুম্ভ বিবাহ করেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি পড়েছে সেখানেই জন্মলাভ করেছে অসংখ্য হাতির মূর্তি।

এখানেও তাই। সর্বত্রই এত হাতি যে দেখলে অবাক হতে হয় এবং অধিকাংশ মূর্তিই জীবন্ত হাতির মতোই মস্ত বড়ো! এমন বৃহৎ সব মূর্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানত না—তাদের ধৈর্যের পরমায়ু ছিল অক্ষয়!

যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধরে মূর্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না! এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলেমাটির মতো! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুঁয়ে-দুমড়ে অতি সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামতো যে-কোনও আকার ধারণ করতে বাধ্য হত! এ বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ম্লান হয়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পাথরের খোদা ছবিই বা কত!

সেই ছবির পর ছবির সারি মাপলে নিশ্চয়ই এক মাইলের কম হবে না! কোথাও মত্ত হস্তীরা ধেয়ে চলেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ করছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিসের বিকিকিনি চলছে, বাজিকররা হরেক রকম খেল দেখাচ্ছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কী এক খেলায় নিযুক্ত হয়ে আছেন!

রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরানি-দুয়োরানি, সখীর দল, বাঁদি ও তীর্থযাত্রী—কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচকাওয়াজ শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘর-সংসার,—শিল্পীর বাটালি কোনও কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি!

মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতাব্দী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখমাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র।

প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত-পূর্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হয়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরাভিনয় করছিল, বর্তমানের ক্ষুদ্র মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে আচম্বিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত!

যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তির আর ছুটবে না! মায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হতে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের যেসব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনও মাটিতে পড়বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে তাদের আর কোনও দিন দেখা হবে না, রাজসভার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্রের তলায় মহারাজ বসেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট, সবাই চির-বোবা!

আরও কত যুগ আসবে, আবার চলে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির লুপ্ত সভ্যতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনও এমনি স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়েই এখানে বিরাজ করবে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!'

অমলবাবু বললেন,—'সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জানত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি খুদে রাখতেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত।'

মানিকও এই শিলাময় নূতন জগতে এসে বিস্মিত হয়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নূতন স্বদেশে এসে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারে কে? কিন্তু সে বিস্ময় তাকে বেশিক্ষণ অভিভূত করে রাখতে পারেনি। তার মাথায় ঘুরছে কেবল জয়ন্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা হা করে উঠছে!

অমলবাবুর কোনও উক্তিই ভালো করে তার কানে ঢুকছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকের শিল্পকাজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে হনহন করে এগিয়ে চলল,—লণ্ঠনের আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে পড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধ-ফোটা আলোতে চারিদিক থমথম করছে।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত মস্ত পাথরের হাতির পর হাতি সার গেঁথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাৎ তার হুঁশ হল, এর পরে কোন দিকে যেতে হবে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গেলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মানিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তন্দ্রাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিমাময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রিদানবীর ফিসফিস কানাকানি! জীবন্ত জগতের আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধতা আচম্বিতে, আর যেন চুপ করে থাকতে না পেরে, পাগল হয়ে গর্জন করে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

চমকে উঠে মানিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো!

পিছনে অনেক লোকের গোলমাল!

আবার দুবার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে সুন্দরবাবুর চিৎকার শোনা গেল—'মানিক! মানিক!'

মানিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোনও কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল!

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দুখানা বড়ো বড়ো চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শত্রুকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মানিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মানিক তা জানে না, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুইপাশে বসে আছেন এবং হাতি সিং বসে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না।

কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু বলে উঠলেন, 'না, না, আপনি আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শত্রুদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?'

তখন মানিকের সব স্মরণ হল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টনটন করছে এটাও অনুভব করতে পারলে।

সে বললে, 'সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি?'

—'হুম, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা টিকটিকির ল্যাজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। পেয়েছি কি অমলবাবু?'

—'না।'

মানিক বললে, 'আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্ন দেখার ফল?'

—'কই দেখি! তাই তো হে মানিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধরেছিল? কেন ধরেছিল? সে ব্যাটা গেল কোথায়?'

অমলবাবু বললেন, 'ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না।'

—'আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল?'

—'অনেকগুলো লোক। আক্রমণ করেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে

আসেনি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হল! মিনিটখানেক পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচজন লোকের আবির্ভাব, আবার আমাদের বন্দুক ছোড়া—আবার তাদের অন্তর্ধান!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মনে হল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না, কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!'

মানিক ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতর দিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কী যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, 'নাঃ, ঠিক আছে!'

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলেন, 'কী ঠিক আছে, মানিক?'

'সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা সেলাই করে দিয়েছি। শত্রুরা কোনও গতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল।'

অমলবাবু বললেন, 'তার মানে?'

—'মানে খুব সহজ। আমি বোকার মতো এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে পড়েছিলুম। তখন একজন কি দুজন শত্রু অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনস্ক রাখার জন্যে বাকি শত্রুরা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছিল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান করে ফেলেও তারা ওই চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?'

—'এর একমাত্র কারণ হতে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।'

—'খুব সম্ভব তাই।'

এমন সময়ে হাতি সিং জমির উপর থেকে কী একটা ছোটো চকচকে জিনিস তুলে নিয়ে মানিককে বললে, 'বাবুজি, আপনি উঠে বসতেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে পড়ে গেল!'

সেই জিনিসটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল। সেটা আর কিছু নয়, সেই নকশা আঁকা সোনার চাকতি!

কী অদ্ভুত রহস্য!

চাকতি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা করে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাকতিখানাকে হস্তগত করেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্যে এত খোঁজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিসটাই মানিকের বুকের উপরে অযাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন করে?

তাড়াতাড়ি চাকতিখানা নিয়ে লণ্ঠনের আলোতে ভালো করে পরীক্ষা করে মানিক হতবুদ্ধির মতো বললে, 'এ যে সেই চাকতি, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!'

খানিকক্ষণ সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'হয়তো মানিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাকতিখানা তার অজান্তেই পড়ে গিয়েছে!'

মানিক বললে, 'আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড়ো আশ্চর্য?'

আচম্বিতে সুন্দরবাবু কী দেখে চমকে উঠলেন!

তাড়াতাড়ি একটা লন্ঠন তুলে ধরে জমির দিকে দৃষ্টিপাত করে বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'হুম! এ আবার কী?'

মানিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত পড়ে রয়েছে,—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড়ো ছোরা বা ছোটো তরবারির মতো অস্ত্র এবং মানুষের হাতের সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মানিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'মানিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায়নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কী?'

মানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধরে আঙুলটা দেখে বললে, 'আঙুলটা কীরকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো! এ আঙুল যারই হোক, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়!'

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'শত্রুদের দলে চ্যান আছে কি না জানি না, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যানকেই আমার মনে পড়ে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ধরে নেওয়া যাক, চ্যান সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কোনও রকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধরে নেওয়া যাক, চ্যানই গলা টিপে মানিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল বলি দিলে কে? মানিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি লড়াই করেছিলে?'

মানিক বললে, 'লড়াই করব কী, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাইনি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ওই ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ওরকম দু-ধারে ধার দেওয়া ছোরা কখনও আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শত্রুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে থাকে, তবে সে-ও পালিয়ে গেল কেন? তাকে তো আমরা বন্ধু বলে পরম সমাদর করতুম! আর এই অজানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোত্থেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খসে পড়ে না!'

অমলবাবু বললেন, 'এক হতে পারে, পদ্মরাগ বুদ্ধের লোভে ওই সোনার চাকতিখানার জন্যে শত্রুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেছিল!'

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা! শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মানিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা হতে পারে না! হুম, এসব হচ্ছে ডাহা ভূতুড়ে কাণ্ড। এ জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মতো! এখানকার আনাচে কানাচে ভূতের আড্ডা আছে!'

মানিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, 'এ যদি ভূতুড়ে কাণ্ড হয় আমি তাহলে বলব, জয়ন্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!'

সুন্দরবাবু তখনই টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালোবাসি কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাসার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না! ওঠো মানিক, উঠুন অমলবাবু!'

মানিক গাত্রোত্থান করে বললে, 'হ্যাঁ, এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না করেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শত্রুরাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ করছে! তারা যে সাহস করে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক। ...আরে গেল, এই হাতি সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন? যদি ফস করে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন করে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো!'

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল।

রাত পোয়াল, উষার সিঁথায় দিবস-বধূ সিঁদুর-লেখা লিখলে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত দুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা করে গহন বনের ঠান্ডা বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্যচিতার রক্ত-শিখা জ্বলে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ কুঠুরির দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মতো নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা।

মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার করে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগডালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কী বলে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধ করি আশ্চর্য হয়ে ভাবে—'এরা আবার কোন দেশি বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে রাখে কী কতকগুলো সাদা সাদা জিনিস, দু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন দেশি বানর?'

মাঝে মাঝে বাঁশবন দুলে দুলে ওঠে, মড়মড় করে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতির দল ওখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপ-ঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চলে যায়—একটা চাপা গর্জনও শোন যায়, বনের মধ্যে অশান্তিকর অনাহুত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু দূরে সরে গেল!

মাঝে মাঝে মানুষের ঘৃণ্য পায়ের শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোখরো সাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁস করে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে এবং পর মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো অদৃশ্য হয়।...এবং সর্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিত্বের ধ্বনি!

কে যেন নিরালায় কানাকানি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিসফিস করে কথা বলছে; কে যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে।

গভীর দূর বিস্তৃত নানা শব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ!

কোনও অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বনবাসী কোনও জীবই মানুষকে বন্ধু বলে মনে করে না। কল্পনায় নির্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে।

পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চমকে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে!

সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাত্মা বলে সন্দেহ হয়। সূর্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁকড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে?—অরণ্যের মতো ভয়ঙ্কর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কানে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকাময় আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর-একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির পরে এল স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাত।

অমলবাবু বললেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধ্যার আগেই ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌঁছোতে পারব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু শত্রুদের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সশস্ত্র আর সাবধান বলেই তারা এখনও সামনে আসছে না।...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি। কে যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ করে কেটে নিতুম!'

মানিক বললে, 'তার নাক নিয়ে আপনি কী করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাঁদা, তবু তার নাক টিকলো হলেও আপনার অভাব তো দূর হত না?'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! আমার নাক খ্যাঁদা? কে বললে তোমাকে? আমার নাক খ্যাঁদা নয়!'

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল!

কেবল মাঠে নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট নদী এবং তার তীরে তীরে চরে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখি!

সুন্দরবাবু খুশি গলায় বলে উঠলেন, 'বনমুরগি! এসো মানিক, দেখা যাক ভগবান আজ আমাদের বনমুরগির মাংস খাওয়াতে পারেন কি না!'

মানিক মাথা নেড়ে বললে, 'না সুন্দরবাবু! জয়ন্ত মুরগির মাংস খেতে ভালোবাসত! সে যখন নেই, আমার মুখে ওমাংস আজ আর রুচবে না!'

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুরগিগুলো তখনই উড়ে পালাল! সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্ত খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মানিক বললে, 'দেখুন সুন্দরবাবু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!'

—'হুম! সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি?'

—'আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনই আমরা দেখতে পারি, শত্রুরা আমাদের পিছু পিছু আসছে কি না? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি!'

—'কী করে শুনি?'

—'এই মাঠটা দেখছেন তো? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন! আমরা এখনই ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর না এগিয়ে ঝোপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'খাসা মতলব এঁটেছ ভায়া! শত্রুরা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহলে তাদেরও এই মাঠ পার হতে হবে। এখানে লুকোবার জায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম গুড়ুম রবে গর্জন করে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি?'

—'ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!'

—'ওসব শত্রুকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চলো, এখন তোমার কথা মতোই কাজ করা যাক!'

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য করে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মানিক বললে, 'এখানে বেশির ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক! একটু পরেই হয়তো চ্যান আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!'

সকলে একে একে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হল।

সবজে মাঠ ধু ধু করছে।

ওদিককার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্যলীলার দর্শক রূপে সূর্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল।

গানের পাখিরাও নীরব হয়ে ছিল না।

হানা দেবালয়ের জীবন্ত পাথর

মানিকের অনুমানও ব্যর্থ হয়নি, তার ফন্দিও ব্যর্থ হল না!

মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হতে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোটো ছোটো!

সুন্দরবাবু দূরবিনটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হুম, ব্যাটাদের দলে দশজন লোক আছে। ওরা হনহন করে এই দিকেই আসছে। হুঁহুঁ বাবা, ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ তো দ্যাখোনি! চলে আয়—চলে আয়, চই চই চই! ওরে বাপ রে। কী লম্বা! কী জোয়ান! যেন ঘটোৎকচের বাচ্ছা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়গুড়ে বেঁটেরাম সর্দার, পায়ে হেঁটে চলেছে, না ফুটবলের মতো মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?'

—'কই, দেখি দেখি' বলে সাগ্রহে অমলবাবু দূরবিনটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় এক রকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই বলে উঠলেন, 'ওই তো চ্যান! ওই তো ইন! সাত ঘাটের জল ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে ও পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়ন্তবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস, আমাকেও বধ করতে এসেছিলি! অ্যাঁঃ! চ্যানের বাঁ হাতে যে ব্যান্ডেজ বাঁধা! তাহলে পরশু রাতে মানিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতি সিং, বন্দুক ছোড়ো! বন্দুক ছোড়ো! হতভাগাদের পাগলা কুকুরের মতো মেরে ফ্যালো!'

প্রভুর হুকুম পালন করবার জন্যে হাতি সিং তখনই বন্দুক তুললে, কিন্তু মানিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'বন্দুক নামাও হাতি সিং, আমি যখন বলব তখন ছুড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়োই উত্তেজিত হয়েছেন, শান্ত হোন! ওদের আরও কাছে আসতে দিন!'

অমলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'উত্তেজিত হব না—বলেন কী? যমদূতদের দেখলে কি শান্ত হয়ে থাকা যায়?'

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুণে বললেন, 'অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি। অত চ্যাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?'

তখন অমলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মাপ করুন, আর আমি কথা কইব না!'

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

তারা সবাই হয় বর্মি, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের অসম্ভব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মানিক বললে, 'আসুন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়ের দিকে গুলি করে ওদের অকর্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই—কী বলেন সুন্দরবাবু?'

—'বেশ, তাই সই।'

এইবারে শত্রুরা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করেনি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক!'

মানিক বললে, 'এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জন করতে পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি!'

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদ্গার করলে,—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্বপ্রথমে ধরাশায়ী হল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্তনাদ করে যে দিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হল।

এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মতো মাঠের নানাদিকে ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনও রকমে উঠে ভোঁ-দৌড় মারলে!

কিন্তু দৌড়োতে পারছিল না কেবল ইন, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কোনও রকমে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল!

তার দুর্দশা দেখে চ্যান আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতোই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়োতে আরম্ভ করলে!

অমলবাবু চ্যানকে টিপ করে বন্দুক ছুড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরও দু-একবার গুলিবৃষ্টির পর মানিক বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে, টোটা নষ্ট করে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে, আবার বনবাদাড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে বলে মনে হয় না।'

সুন্দরবাবু মানিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাটারা যত বড়ো গুলিখোরই হোক, আবার গুলি খাবার জন্যে ওরা শীঘ্র ব্যস্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না—জয় মানিকের বুদ্ধির জয়!'

পথ চলতে চলতে মানিক জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা অমলবাবু, এই পদ্মরাগ বুদ্ধের কোনও ইতিহাস জানেন?'

অমলবাবু বললেন, 'ঠিক পদ্মরাগ বুদ্ধের ইতিহাস জানি না বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মতো এক মরকত বুদ্ধের কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।*

মরকত বুদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে।

কেউ বলেন, এখন এই মূর্তি জাপানে আছে। কেউ বলেন, ফর্মোজা দ্বীপে আছে; কেউ বলেন, জাভায় আছে।

ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যাঙ্গক শহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্তি আছে, সেইটিই হচ্ছে প্রবাদপ্রসিদ্ধ মরকত বুদ্ধ।

কেবল মরকত বুদ্ধ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল।

ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইসরা বাস করত বর্তমান শ্যামদেশে। এখনও যারা ওখানে বাস করে তারা ওই থেইসদেরই বংশধর। বারংবার পরাজয়ের পর থেইসরা অবশেষে বিশেষ আয়োজন করে ওঙ্কারধামকে হঠাৎ আক্রমণ করে।

একটা বড়ো যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদূত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, 'তোমার খবর মিথ্যা হলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হলেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছ!'

ভগ্নদূতের প্রাণদণ্ড হল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেল না। পুরোহিতেরা নগর রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত বুদ্ধ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিগ্রহ আর রাশি রাশি হিরে-মণি-মুক্তা তখনই সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, বিজয়ী থেইসরা সেসব গুপ্তধন খুঁজে পায়নি।

ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারেনি। আমাদের এই পদ্মরাগ বুদ্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কি না, কে তা বলতে পারে?'

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্যালোক তখন অরণ্যের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় চতুর্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জন ও নিস্তব্ধ যে, রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে!

আরও মাইলখানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওই সেই সপ্ত-তালগাছ!'

---

*'And in Yasodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it.'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সপ্ত-তালগাছ আবার কী?'

—'ওই হচ্ছে আমাদের পথের শেষ নিশানা। পাশাপাশি ওই যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর—অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!'

কিন্তু পথের শেষে এসে মানিকের মনে জয়ন্তের শোক আরও বেশি করে জেগে উঠল। জয়ন্তের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ বুদ্ধের জন্যে তার আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। জয়ন্ত নেই, তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে!

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ বুদ্ধকে সমর্পণ করে সে সর্বাগ্রে চ্যান আর ইনকে গ্রেপ্তার করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না!

তারা সপ্ত-তালের তলায় এসে দাঁড়াল।

তারপর একটা বাঁশবনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ।

সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো একটি প্রকাণ্ড চত্বর! এবং চত্বরের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক কোণ দিয়ে যে রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চলে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কতক অংশ! মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, 'এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হুম, বার করো তো মানিক, তোমার সেই সোনার চাকতিখানা!'

মানিক পকেট থেকে চাকতি বার করে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, 'আপনিই তাহলে নকশার পাঠোদ্ধার করে আমাদের বাহবা লাভ করুন!'

সুন্দরবাবু অবহেলা ভরে বললেন, 'পুলিশে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালি জলের মতো পড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নকশা মাত্র! হুম! নকশায় এই তো রয়েছে পুকুরটা, চারিদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন কোনা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!'

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'ও কী সুন্দরবাবু, এরই মধ্যে মাথা চুলকোচ্ছেন কেন?'

—'মাথা চুলকোচ্ছি কি সাধে? এ নকশাখানা কেউ ঠাট্টা করে আঁকেনি তো?'

—'বোধ হয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতর চলুন! সেখানে গেলে হয়তো কোনও হদিস পাওয়া যাবে!'

—'ঠিক বলেছ। তাই চলো।'

দিনের আলো তখন নিবুনিবু হবার সময় হয়েছে।

পাখিরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে শুরু করেছে। সূর্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনও ভাঙেনি।

মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে।

দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ মন্দিরটা অন্তত একশো ফুটের কম উঁচু ছিল না।

মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্যে আর ছোটো বড়ো মূর্তিতে ভরা।

কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দয়তায়। বড়ো মন্দিরের চারপাশে যে চারিটি ছোটো মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে

যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্বংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যুস্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হাহা করে, চোখে বিষণ্ণতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করল।

মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আঁধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে সহজে দূরের জিনিস স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে বলে উপরপানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দিরগর্ভ খুব প্রশস্ত, তার মধ্যে বড়ো বড়ো অনেকগুলো হলঘরের ঠাঁই হতে পারে।

ভিতরের চারিকোণে চারিটি মানুষের চেয়েও ডবল বড়ো 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি। একটি মূর্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদযুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও খোদিত ভাস্কর্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো করে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্তিশূন্য বেদি রয়েছে কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমলবাবু বললেন, 'ওরই উপরে আমরা সেই ছোট্ট বুদ্ধমূর্তিটি পেয়েছিলুম।'

মানিক একটু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'অতটুকু একটি মূর্তির জন্যে এত বড়ো একটা মন্দিরের এত বড়ো কালো পাথরের বেদি গড়া হয়েছিল! সে মূর্তি কখনও এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হতে পারে না!'

অমলবাবু বললেন, 'আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্তিগুলিই যখন এমন প্রকাণ্ড! আমার বিশ্বাস, বেদির উপর থেকে প্রধান মূর্তিটিকে হয়তো কোনও কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। পরে পূজার বেদিতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোনও ভক্ত এই মূর্তিটিকে স্থাপন করেছিল!'

—'খুব সম্ভব, তাই।'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ নির্বাক ও হতভম্বের মতো নকশার সঙ্গে বেদিটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, 'কী সুন্দরবাবু নকশা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারিনি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এ হচ্ছে একখানা বাজে নকশা! কোনও ধাপ্পাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদাগঙ্গারাম, একটুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ বুদ্ধ! সোনার পাথরবাটি! যা নয় তাই!'

মানিক চাকতিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

সেই মহা নির্জনতার স্বদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তব্ধতা যেন ঘনায়মান ও হিংস্র অন্ধকারের মূর্তি ধরে সকলের প্রাণ-মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল!

উপর দিকে হঠাৎ ঝটপট ঝটপট শব্দ হল—নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনাল যেন বন্দুকের আওয়াজের মতো!

চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভয়ে ঊর্ধ্বমুখে দেখলেন, ভাঙা

মন্দিরের ফাঁকে তখনও উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলন্ত দাগ কেটে কী কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, 'বাদুড়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না, অন্ধকারের কালো বাচ্ছা!'

মানিক নিজের মনেই বললে, 'নকশায় বেদির গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়িফিঁড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল, জয়ন্তবেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই চলো মানিক।'

—'পালাব, কেন?'

—'এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে! হুম, আমার বুক অকারণে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে না। এটা নিশ্চয়ই হানা মন্দির!'

মানিক হেসে উঠল—তার হাস্যধ্বনি মন্দিরের অন্ধকার ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনাল ঠিক অন্ধকারের হাসির মতো!

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি হেসো না মানিক। এমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তুমি কখনও অনুভব করেছ? এক মাইল দূরে একটা আলপিন পড়লেও যেন শোনা যায়! এ স্তব্ধতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়! এ স্তব্ধতা যেন ওজনে ভারী—বুকে জাঁতাকলের মতো চেপে বসে! এ যেন স্তব্ধতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে!'

মানিক কোনও কথায় কান না পেতে মন্দিরের বেদির উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, 'অমলবাবু, এ বেদির গায়ে কখনও যে কোনও সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না! অথচ নকশায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে! এর মানে কী?'

—'আমার বোধ হয় এ নকশাখানা অন্য কোনও জায়গার!'

—'অসম্ভব! নকশার সঙ্গে এখানকার বাকি সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে! এই সিঁড়ির হয়তো কোনও গুপ্ত অর্থ আছে।'

—'থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। সুতরাং আমাদের পক্ষে ও-গুপ্তঅর্থ থাকা না থাকা দুই-ই সমান।'

হঠাৎ সুন্দরবাবু আঁতকে বলে উঠলেন, 'মানিক, মানিক! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাসছে!'

মানিক বললে, 'কই?'

—'হাসি আবার থেমে গেল!'

—'ও আপনার মনের ভুল। আমি কোনও হাসি শুনিনি।'

—'অমলবাবু, আপনিও শোনেননি?'

—'না। কে আবার হাসবে, এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।'

—'হুম, শুনিনি বললেই হল? আমি স্পষ্ট শুনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পারলে না!'

—'তাহলে আপনার পিছনে ওই যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন!'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকালেন।

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া মেঘে প্রকাণ্ড 'অবলোকিতেশ্বর' দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তর-চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি যেন সুন্দরবাবুর মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধহাস্যে বিকশিত!

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্বিতে বুদ্ধমূর্তি জ্যান্ত হয়ে টলমলিয়ে নড়ে উঠল।

'হুম, বাপ!' বলে সুন্দরবাবু সুদীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মানিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন!

অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'বুদ্ধদেব নড়ে উঠেছেন মানিক! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!'

মানিক বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে দেখলে, মূর্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে! সে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, 'আপনারা দুজনেই পাগল হলেন নাকি?'

সুন্দরবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'পাগল এখনও হইনি মানিক, কিন্তু পাগল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই! পাথরের মূর্তি হাসে, পাথরের মূর্তি নড়ে, এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে?'

মানিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্তির গায়ে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন, আমি মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোনও প্রাণ নেই!'

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে সবলে মানিকের হাত চেপে ধরলে!

আকস্মিক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে মানিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'সুন্দরবাবু! অমলবাবু।'

নূতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মানিককে অমন ভাবে আর্তনাদ করে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনই বুঝে নিলেন যে, ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে কোনও ঘটনা ঘটেছে! মানিককে সাহায্য করবেন কী, তিনি নিজেই প্রায় মূর্ছিত হয়ে সেইখানে বসে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্যন্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ!

মানিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না!

যে-হাতখানা এমন বজ্রমুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হাত!

মানিক তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার করে ফেললে!

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, 'মানিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?'

বিষম বিস্ময়ে মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জয়ন্ত!'

—'হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই—আপাতত যমালয়ের ফেরতা মানুষ।'

বলতে বলতে বুদ্ধমূর্তির পিছন থেকে সশরীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুখে জয়ন্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। এ যে জয়ন্তের প্রেতাত্মা সে সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনওই

সন্দেহ রইল না! তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ মুখে দুই হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!

মানিক বিস্ময়ে আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'জয়! জয়! তুমি! তুমি বেঁচে আছ!'

—'এক ভালো গণৎকার হাত দেখে বলেছিল, আমার পরমায়ু আশি বৎসর। অসময়ে মরিনি বলে বিস্মিত হচ্ছ কেন ভাই!'

—'কিন্তু তোমার সেই গুলিতে ছ্যাঁদা টুপি, জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্ধান,—এসবের অর্থ কী!'

—'মানিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি যে বাড়ল না, এ বড়ো দুর্ভাগ্যের কথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছ্যাঁদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো! যেখানে আমার টুপিটা পড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহলে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুকেছি! আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাইনি!'

—'তবে!'

—'আমি যখন বাংলোর দিকে ফিরছিলুম, তখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাদের বন্দুকের একটা গুলি আমার টুপি ভেদ করে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য মাটিতে আছড়ে পড়ে চির পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাৎ মৃত্যুর ভান করলুম। তারপর দশ-এগারোজন লোক আমার কাছে ছুটে এল! আমার জামা হাতড়ে সেলাই করা পকেট কেটে সোনার চাকতিখানা বার করে নিলে। এমন সময় তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।'

—'কেন?'

—'আমি জানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শত্রুরা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায়নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেই। সুতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ সুবিধা হত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন দিক থেকে!'

—'এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!'

—'হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান যখন তোমার গলা টিপে ধরে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার করে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষতেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ হাতের একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোনার চাকতিখানা আমি আবার কেড়ে নি। চ্যান বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোনার চাকতি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপর রেখে আমিও অদৃশ্য হই! আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ না কেউ সেখানা দেখতে পাবেই!'

—'কিন্তু জয়ন্ত, তমি কি অনাহারে আছ?'

—'মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়!......হ্যাঁ, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শত্রুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে?'

—'প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।'

—'বাহবা, চমৎকার! মানিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'হুম, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?'

—'মোটেই ভয় দেখাইনি। আপনার ছেলেমানুষি ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে খেপে গেলেন!'

—'খামোকা খেপিনি। পাথরের বুদ্ধ জ্যান্ত হলে কে না—'

—'মূর্তিটাই নড়বড়ে। কতকালের পুরোনো ভাঙা মূর্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনি একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না!'

—'না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!'

—'সে কী, এখনই পালাবেন কোথায়? এখনও যে পদ্মরাগ বুদ্ধ লাভ হয়নি!'

—'হ্যাঁঃ! সে লাভের আশায় গয়া! সে নকশার কোনও মানে হয় না! এখন 'লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং' করেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!'

—'সুন্দরবাবু, নকশার মানে আমি বুঝেছি বলেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি!'

অমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'নকশার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে শুনলুম যে, নকশার সিঁড়ি আছে অথচ বেদির গা বয়ে কোনও সিঁড়ি আপনি দেখেননি, তখনই তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম! এখন দেখা যাক, আমার আন্দাজ ঠিক কি না!......(উচ্চস্বরে) ওহে হাতি সিং! তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এসো! বড়ো অন্ধকার, আগে আলোগুলো জ্বালো!'

হাতি সিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালা হল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনও উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেনি!

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, 'আঃ, আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই অন্ধকার! হুম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!'

জয়ন্ত বললে, 'বেদিটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মানিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহলে বেদিটা বুঝতে তোমার কোনওই কষ্ট হত না!...হাতি সিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদিটা ভেঙে ফেলতে বলো!'

হাতি সিং-এর অনুচরেরা তখনই বেদি ধ্বংসে প্রবৃত্ত হল—অন্য সকলে বিপুল কৌতূহলে আগ্রহদীপ্ত চক্ষে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'পাথরের বেদি যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে!'

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং—কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিস্তব্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গমগম করে উঠল!

শব্দের চোটে সেই নড়বড়ে বুদ্ধমূর্তি আবার কাঁপতে শুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে!

বেদিটা গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে।

এক-একখানা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায় বেদির তলা ফাঁকা, কিন্তু অন্ধকার ভরা গর্ত ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠছে!

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাস, আর পাথর সরাতে হবে না! হাতি সিং, একটা লণ্ঠন উঁচু করে তুলে ধরো তো!'

হাতি সিং ভাঙা বেদির গর্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে!

উঁকি মেরে দেখা গেল, গর্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'এখন বুঝতে পারছ তো মানিক, যে রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোনার চাকতির নকশা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নকশা যদি বাজে হত, তাহলে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন করে বুদ্ধমূর্তির মধ্যে রক্ষা করা হত না! পদ্মরাগ বুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চলো!'

অমলবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, আশ্চর্য আপনার বুদ্ধি!'

জয়ন্ত বললে, 'বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য!'

সুন্দরবাবু খুঁত খুঁত করতে করতে বললেন, 'তাই তো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! ওই পাতালের ভিতর ঢুকলে আবার বেরুতে পারব তো? ওখানে কোন ভয়ঙ্কর ওঁত পেতে আছে, তা কে জানে!'

মানিক বললে, 'তাহলে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'একলা? বাপরে, তাও কি হয়! 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!' আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব—যা থাকে কপালে! হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। সবগুলোই জ্বেলে ফ্যালো। পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।'

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লণ্ঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপানশ্রেণি দিয়ে নামতে লাগল।

পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হল।

তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।

পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে।

গুহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চিৎকারে আর্তনাদ করে পায়ে পায়ে দূরে সরে যেতে লাগল, সভয়ে!

সেখানকার বহুকালব্যাপী নিদ্রিত স্তব্ধতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট খট শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল!

সুন্দরবাবু সঙ্কুচিত সন্দেহে গুহাপথের বদ্ধ হাওয়া সশব্দে শুঁকতে শুঁকতে বললেন, 'হুম! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে গন্ধ পাই, এখানেও আমি যেন সেই রকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি।'

অমলবাবু বললেন, 'এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আপনি বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ পাচ্ছেন!'

—'উঁহু, এ বাষ্প-টাষ্পর গন্ধ নয়!'

মানিক বললে, 'তাহলে এটা বোধ হয় ভূতের পায়ের দুর্গন্ধ!'

সুন্দরবাবু চটে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মানিক, ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! হুম! এখানে যে ভূত নেই তা কী করে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি মনোরম স্থান! আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায় থাকবে?'

মানিক আবার টিপ্পনি কাটলে, 'কেন, আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওখানে নিত্য নতুন ভূতের জন্ম হয়!'

জয়ন্ত সর্বাগ্রে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'সাবধান! আর কেউ এগিয়ো না!'

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায় পায় পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না!

মানিক বললে, 'কী ব্যাপার, জয়?'

—'কীরকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!'

মানিক কান পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ!

—'ও কীসের শব্দ, জয়?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে!...না, যাচ্ছে নয়, টানতে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে মুছতে কাতর ভাবে মনে মনে বললেন, 'হা ভগবান! এই ডানপিটে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কী ভুলই করেছি! আর কি দেশে ফিরতে পারব? হুম!'

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

এতকালের বদ্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ কী অভাবিত ব্যাপার?

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, 'মানিক, ব্যাপার বড়ো সুবিধের নয়, বন্দুক তৈরি রাখো!'

সুড়ঙ্গপথের ভিতরে তার চুপিচুপি কথাই শোনাল চিৎকারের মতো!

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরি রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন কুম্ভকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধরে ঘুমিয়ে ছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ করে দিলুম আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে! বন্দুক ছুড়ে করবে কী? বন্দুকের গুলিও তো হজমি গুলির মতো কপকপ করে গিলে ফেলবে!'

জয়ন্ত ও মানিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তা টানার মতো শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুমদুম করে খুব ভারী ভারী জিনিস আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়ন্ত এসব শব্দের কোনও হদিস খুঁজে পেলে না! এ যেন কার আস্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হত বলে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্যি? যে আসছে সে কি যক?'

জয়ন্ত বললে, 'পদ্মরাগ বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোনও বৌদ্ধ পুরোহিত সে মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্যি কি না জানি না,—সত্যি না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্যি হলেও এখানে যক কেউ রাখেনি।'

—'তবে ও কে আসছে?'

—'ভগবান জানেন!'

এইবার ভীষণ একটা গর্জন শোনা গেল!

বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনাল যে, সেটা কীসের গর্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'হুম! ক্রমাগত চমকে চমকে আজ মারা পড়ব নাকি? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চললুম আমি উপরে! এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে বসে ভয় পাওয়া ভালো, বনের বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো!'

তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎখণ্ডের মতো দুটো জ্বলন্ত চক্ষু!

সে বিচিত্র চোখ দুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিবছে না!

জয়ন্ত বললে, 'আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয়! মানিক, আজ আমাদের ফিরতেই হবে—এখনও সময় আছে! সকলে মিলে পরামর্শ করে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে! চলো, আমরা বাইরে যাই!'

—'কিন্তু ওসব কীসের শব্দ, ও কার গর্জন, ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না!'

—'বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয়! শিগগির উপরে চলো!'

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙা বেদির গায়ে হেলান দিয়ে মড়ার মতো হলদে মুখে সুন্দরবাবু চুপ করে বসে আছেন।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ আপনারই জয়জয়কার। পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক।'

সুন্দরবাবুর তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপদপে চোখ নিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে! চলো, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে!'

অমলবাবু বললেন, 'তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত আবার বন্ধ করে দিলে কি হয় না?'

—'না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয়! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ! ওই আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে ঠিকরে পড়বে!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, 'জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত। পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!'

জয়ন্ত বললে, 'ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্যি হয়! ও-পাপ বিদেয় হলে তো সব লাঠা চুকে যায়!'

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ করে আবার একটা বুকের রক্ত ঠান্ডা করা গভীর গর্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায়!

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, 'সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোটো বনের দিকে!'

রাত তখন বেশি নয়, কিন্তু এরই মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিদুটী মন্ত্রে চতুর্দিকের নির্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর বনের আর্তধ্বনি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোটো মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, 'মানিক, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সঙ্গে বিষাক্ত বাষ্পের বোমা এনেছিলুম!'

—'কেন বলো দেখি?'

—'কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুড়ে দেখব কোনও ফল হয় কি না।'

—'যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোনও জীব না হয়?'

—'মানে?'

—'ওটা কোনও ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব?'

—'মানিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও?'

—'ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোনও জীব বাঁচতে পারে?'

—'না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোনও স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনো না মানিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।'

বোধ হয় তখন শেষ রাত।

আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপরে সকলে বসেছিল অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমনকি মানিকের মত হচ্ছে, তাঁর নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে-গাছের সব পাখি ও বানর তো দূরের কথা, এমনকি ভূত-পেতনিরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দুবার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চমকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ করে ডাল থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁশিয়ার ব্যক্তি বলে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ করে আর-একটা ডাল ধরে ফেলে শূন্যে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম ভেদ করে নানা কণ্ঠের চিৎকার ও আর্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল!

কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চিৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

—'জয়! জয়!'

—'কী মানিক?'

—'শুনেছ?'

—'হুঁ!'

—'আমাদের এখন কী করা উচিত?'

—'চুপ করে এইখানে বসে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।'

—'কিন্তু ও কীসের গোলমাল?'

—'কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কোয়ো না। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।'

নীচের ডাল থেকে করুণস্বর শোনা গেল, 'হুম! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধরে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশিক্ষণ ঝুলতেও পারব না!'

অমলবাবুর সঙ্গে মানিক কোনও রকমে ডাল বয়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হল!

মানিক বললে, 'বৈজ্ঞানিকের মতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেননি সুন্দরবাবু!'

ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?'

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'ফের কথা কয়!'

দূরের কোনও গোলমাল আর শোনা যায় না!

শব্দগুলো যেন স্তব্ধতাসাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইষ্টকের মতো পড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল! এখন শুধু কালো রাত করছে থমথম, মুখর ঝিল্লি করছে ঝিমঝিম, বনের গাছ করছে মরমর! এবং ম্লান খণ্ডচাঁদ নিবুনিবু চোখে করছে উষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা!......

গাছে গাছে পাখির দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে—জাগো লতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলি-প্রজাপতি! পূর্বের শোভাযাত্রায় দিবারানির সোনার মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কী শান্তিময়! সকালের নতুন বাতাস কী মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনও যে কালো কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আগে স্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেটলি! কী জানি বাবা, যে জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না! ওহে, 'এয়ার-টাইট' টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না? হুম, ক্ষমা-ঘৃণা করে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুড়ে মেরো!'

জয়ন্ত বললে, 'ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো ব্রেকফাস্ট মানুষের সাহস আর শক্তিকে দুগুণ করে তোলে! মানিক, নিয়ে এসো রসগোল্লা-সন্দেশের টিন!'

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্তভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশি ভাব! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মতো মনের মানুষ দুর্লভ!'

প্রাতরাশ শেষ করে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' বলে চেঁচিয়ে নিলেন!

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কানদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চ্যাঁচালেও তিনি শুনতে পাবেন!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই! ঠাট্টা শুরু হল তো? আচ্ছা মানিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বলো দেখি?'

মানিক মুচকে হেসে বললে, 'আপনাকে বেশি ভালোবাসি কিনা!'

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশিটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরও সুন্দর করে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব আগে এগিয়ে চলেছে!

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হলদে।

আশেপাশে ঘুরে ফিরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব ছোটো জাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলবে গঙ্গাফড়িং হাই-জাম্পের নানান কায়দা দেখাচ্ছে!

মাঠ পার হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল।

বাঁশিতে বাজছিল তখন কোনও গানের অন্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার সুর বোবা হয়ে গেল একেবারে!

মানিক দূর থেকেই লক্ষ করলে, জয়ন্ত বাঁশিটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে! দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল!

সুন্দরবাবু বুঝলেন, আবার কোনও অঘটন ঘটেছে! একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরাও ছুটে এসো!'—বলেই তিনি দৌড়োতে লাগলেন!

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, 'হে ভগবান, আবার কী হল? আর যে পারি না!'

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিক মতো বর্ণনা করা অসম্ভব!

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ! এত বড়ো অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব রকম মোটা!

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে!

অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্দি হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃতদেহ!......তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের উপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে পড়ে একটা ভাঙা বন্দুক!

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত!

কোথাও পড়ে আছে চাপ চাপ রক্ত, কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা! রক্তের ফিনকি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে!

এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনও দেখেননি,—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মতো তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন!

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'তাহলে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্তনাদ শুনেছিলুম?'

মানিক বললে, 'তা ছাড়া আর কী!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু কে এরা?'

জয়ন্ত বললে, 'বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটেনি, পদ্মরাগ বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কী করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে ঢুকেছিল!'

অমলবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি চ্যান আর ইনকে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে চ্যান। অন্য লোকটাকে চিনি না।'

জয়ন্ত বললে, 'সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।...সাপ কখনও গর্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্তে সে আশ্রয় নেয়। কোনও জন্তু উপর থেকে গর্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখে সুড়ঙ্গেই বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোনও কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান আর ইন কোম্পানির রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায়নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ করে দুবার বন্দুক ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল। ......অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর-শত্রুকে বধ করে আমাদের পথ সাফ করে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যান্ড ইন কোম্পানিকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দি পদ্মরাগ বুদ্ধদেবকেও! তিনি সত্যিই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হলে তিনি বোধ করি খুশি হবেন!'

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা করে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হুম! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!'

বলেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃতদেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল!

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেননি, তিনি ভয়ানক ভড়কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়ামবীরের মতো আশ্চর্য এক ডিগবাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মতো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবা রে, অজগরটা এখনও জ্যান্ত আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে সরে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখনও ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধরে তাঁকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন বলে উঠলেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হতে চাই না!'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!'

—'শান্ত হব? জ্যান্ত অজগরের সামনে শান্ত হব?'

—'ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নড়ে চড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনও ওই কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোনও জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!'

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিস্ফারিত করে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বটে, বটে, বটে? তাহলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগবাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ!'

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা বেদির সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, 'এখন দূরে যাক সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ বুদ্ধের প্রতিমা! হাতি সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই, রাতও নেই, আছে শুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার!'

হাতি সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বালল, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ!

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কানে কানে মানিক বললে, 'আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহলে আপনি কী করবেন?'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাকে আর নতুন ভয় দেখিয়ো না মানিক!'

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোনও শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল!

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হল!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম! হুম, পদ্মরাগ বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব বুদ্ধ! ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা!'

মানিক বললে, 'তাহলে অকারণে এত কষ্ট করে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?'

অমলবাবু বললেন, 'এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক! ওঙ্কারধামের ভাস্কর্যে সর্বত্রই তাই নাগমূর্তির ছড়াছড়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমির পোষা হয়, বাংলা দেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল!'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু! আপনার যুক্তি মনে লাগছে না! যে অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে তাকে কখনও কবর দিয়ে জ্যান্ত মারবার ব্যবস্থা করত না! ...আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে! হাতি সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বলো! ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল! দেখা যাক দেওয়ালের ওপাশে কী আছে?'

বলেই সে রুপোর শামুকের নস্যদানি বার করে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মানিক জানত, জয়ন্ত খুশি হলে নস্য না নিয়ে পারে না!

কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, 'জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখনও হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়হুড় করে জল ঢুকতে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?'

জয়ন্ত বললে, 'সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।......ভাঙো দেওয়াল!'

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগল কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা! শক্ত দেওয়াল! সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হল।

কিন্তু জল-টল কিছুই ভিতরে ঢুকল না।

জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কী অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে বলে উঠল, 'চালাও, কুড়ুল! সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়! সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয়নি!'

মানিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মতো কী হাতে ঠেকছে! বোধ হয় দরজা!'

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, 'অ্যাঁ? বলো কী! দরজা? আলিবাবার চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক!'

ঠকাং! ঠকাং! ঠকাং! চলল সমানে কুড়ুলের পর কুড়ুল! খসে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর! এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে নেচে ওঠে সকলের প্রাণ!......

দরজা বটে! খুব বড়ো দরজা নয়, ছোটো দরজা! তিন ফুটের বেশি উঁচু নয়, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুত! আগাগোড়া লোহার কিল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরোনো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, 'কুলুপের ভিতরে বেশ করে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও-কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তেল তো ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?'

মানিক বললে, 'আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা এ কুলুপে লাগবে?'

জয়ন্ত বললে, 'কুলুপটা ভালো করে তেলে ভিজুক! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরি করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে একগাল হেসে বললেন, 'রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে! এ ভুঁড়ি কখনও পরিপূর্ণ হয় না! বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ করে দেখতে পারো—হুম!'

মানিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, 'এইবার পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, পদ্মরাগ মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কী, এইবারেই তা জানতে পারব! অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো পদ্মরাগ মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না! পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ মণি বেশি মূল্যবান!'

চায়ের পিয়ালা যখন খালি হল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুল, তখন মানিক সগর্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে!

সমস্ত গুহা চিৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ করে জয়ন্ত বললে, 'জয় পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়!'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোটো একটি ঘর।

তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হল, তার হিসাব কেউ জানে না!

ঘরে আর কোনও আসবার নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোনও ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক!

জয়ন্ত ঘরের চারিদিক তাকিয়ে বললে, 'মানিক, দ্যাখো! পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেঁতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?'

—'পারছি, জয়! এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।'

—'এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নকশায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদির তলায় সিঁড়ির সার আছে, নকশা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত! সাধারণ লোকে নকশা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ! কারণ অসাধারণ লোক নকশার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হত, কিন্তু আমরা ফিরে যাইনি। অতএব অনায়াসেই গর্ব করতে পারি! এখন তোলো ওই সিন্দুকের ডালা!'

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল!...

সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা!

তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জ্বলজ্বলে পাথরে তৈরি একটি অতিআশ্চর্য ও অতুলনীয় বুদ্ধমূর্তি সেখানে কারুকার্যে বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে!

মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতের কম হবে না!

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, 'মূর্তির সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা! এ মণিময় মূর্তি না হয়ে যায় না! না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা! মানিক, মানিক! এ কি সত্যি, না অসম্ভব স্বপ্ন?'

মানিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! পদ্মরাগ মণি কেটে এত বড়ো মূর্তি তৈরি করা হয়েছে? পদ্মরাগ মণি এত বড়ো হয়!'

মানিক বললে, 'না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায়ই নেই!'

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্তিটিকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপর বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মতো ঘোররক্তবর্ণ সেই মহামানবমূর্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল!

সেই জ্যোতির্ময় মূর্তির সামনে দুই হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধর্মং শরণং গচ্ছামি! সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!'

নিতান্ত হালকা মামলা

ফুরিয়ে গিয়েছে প্রাতরাশের পালা। সাঙ্গ হয়েছে সংবাদপত্র পাঠ। জয়ন্তের ইচ্ছা বাঁশি সাধে। মানিকের সাধ দুই-এক চাল দাবা খেলে। এমন সময়ে কালীবাবুর প্রবেশ। দু-জনেরই সাধে পড়ল বাদ।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি। দক্ষিণবঙ্গের একজন বড়ো জমিদার। কিন্তু একরকম স্থায়ীভাবেই শিকড় গেড়েছেন কলকাতায়। জয়ন্তদের পাড়ার লোক এবং প্রায় বন্ধুও বটে। বয়স ষাটের কম হবে না। মাথার চুল কার্পাস তুলোর মতো ধবধবে। কিন্তু গায়ের টকটকে রঙের জেল্লা এখনও ময়লা হয়নি এবং লম্বা-চওড়া দেহখানিও বেশ শক্তসামর্থ। একাধিক জ্যোতিষী রজত মুদ্রার বিনিময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্তত পঁচাশি বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যে-কোনও যমদূতকে কদলী প্রদর্শন করতে পারবেন এবং সেইজন্যে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়পক্ষের পক্ষপাতী হয়েও কালীবাবু দিব্য সপ্রতিভ মুখে নিষ্করুণ পৃথিবীর বক্রদৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

পরমায়ুর বাকি এখনও সিকি শতাব্দী—সে তো বহুকালের ব্যাপার। বয়সে বিয়ে করেছি তো হয়েছে কী? দীর্ঘজীবীকে আবার বুড়ো বলে খোঁটা দেওয়া কেন বাপু? কালীবাবুর মনের ভাবখানা হচ্ছে এইরকম। জ্যোতিষীদের কথায় তাঁর অটল নির্ভরতা।

মানিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'আরে কালীবাবু যে! ভোরবেলা তো আপনার কাছে অবেলা! এমন অসময়ে বউদির রঙিন আঁচল ছেড়ে আমাদের মতো চিরকুমারদের খাস্তা আস্তানায় কেন?'

কিন্তু জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অসুস্থ।'

কালীবাবুর প্রফুল্ল মুখে অসুস্থতার ছাপ কেউ দেখে না। জয়ন্তের বিস্ময়ের কারণ আছে।

কালীবাবু অবসাদগ্রস্তের মতো একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, 'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আমি অসুস্থ। কিন্তু দেহের নয় মনের অসুখ।'

সরকার সব জমিদারি হস্তগত করবেন বলে আজকাল কোনও জমিদারেরই মন সুস্থ নয়। কালীবাবু কি তাই—

জয়ন্তের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কালীবাবু হঠাৎ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, শুনেছি আপনারা শখের গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসেন। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন!'

জয়ন্ত অল্পক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আপনাকে আমরা কোন দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি কিছু চুরি গিয়েছে?'

কালীবাবু বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'চুরি? না, আমার কিছুই চুরি যায়নি। চুরি গেলে আমি এতটা চিন্তিত হতুম না, আর সরকারি পুলিশ থাকতে আপনাদের বিরক্ত করতেও আসতুম না।'

—'তবে?'

—'এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন। এখানা কাল বৈকালে পেয়েছি।' কালীবাবু নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কালীবাবুর ডান হাতের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, 'আপনার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর উপরে পট্টি বাঁধা কেন?'

—'একটা ঘরের দুই দরজার মাঝখানে পড়ে কাল বড়োই চোট লেগেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আজ আর আঙুল দুটো নাড়তে পারছি না। কিন্তু ওকথা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখুন।'

খামের দিকে তাকিয়েই জয়ন্তের চোখ একটু চমকে উঠল। তার উপরে হাতের লেখা নেই, ছাপা বই থেকে কতকগুলো অক্ষর কেটে নিয়ে পরে পরে বসিয়ে কালীবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছে। সাধারণ সরকারি খাম, আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ছাপ মারা।

খামের ভিতরের কাগজও চিঠির কাগজ নয়, সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা কেটে নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কথাগুলোও মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর কেটে নিয়ে বসানো।

কথাগুলো এই

২০।৮।৫৪

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি
সমীপেষু

মহাশয়,

আমার স্ত্রী মাধবী বিধবা নয়। আমিই তার বৈধ স্বামী এবং বলা বাহুল্য আজও বহাল তবিয়তে সশরীরে বিদ্যমান। স্বামী বর্তমান থাকতে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পারে না, অথচ শুনছি আমার স্ত্রীকে আপনি আবার 'বিবাহ' করেছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব। ইতি—

নিবেদক
শ্রীমহীতোষ সেন।

পত্রখানা পাঠ করে জয়ন্ত নীরবে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কালীবাবু বললেন, 'আমার বিবাহের ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অজানা নেই?'

না, জয়ন্তের তা অজানা নেই! ব্যাপারটা হচ্ছে এই

নিঃসন্তান অবস্থায় কালীবাবুর প্রথম সহধর্মিণী পরলোকে গমন করেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। বিপুল বিত্তের মালিক হয়েও সন্তানের অভাবে কালীবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর তারাপ্রসন্ন নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, কিন্তু তার নাম তিনি মুখেও আনেন না। সে হচ্ছে মদ্যপ, জুয়াড়ি ও অকর্মণ্য; নিজের সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে খোলামকুচির মতো এবং কালীবাবুও তাকে আর নিজের বাড়িতে ঠাঁই পর্যন্ত দিতে রাজি নন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিধবা মাধবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তখন মাধবীর বয়স কুড়ি বৎসর এবং কালীবাবু পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং বর-কন্যার এই মিলন যে রাজযোটক বলে গণ্য হয়নি, সে কথা বলা বাহুল্য। ভার্যার সার্থকতা পুত্রের জন্যেই, অনেকের কাছে শাস্ত্রবাক্য আউড়ে কালীবাবু তা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের জন্যেই যে তিনি পুনর্বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, এটা একেবারে পূর্ণ সত্য না হতেও পারে। কেবল যুবতী নয়, মাধবী ছিল পরমা সুন্দরী।

এই অসম মিলন মাধবী কীভাবে গ্রহণ করেছিল, বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীরই মতো মুখে কোনও প্রতিবাদ করেনি, কারণ প্রতিবাদ করবার যোগ্যতা তার ছিল না। শৈশব থেকেই সে বাপ-মা হারা, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে অনাদরে মানুষ; তার উপরে প্রথম যৌবনেই স্বামী

হারিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনাথ আশ্রমে; অতএব এখানে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতেই পারে না, বরং বলা যায় যে, এই দ্বিতীয় বিবাহটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে বরের মতো, কারণ কালীবাবু যুবক না হলেও ধনকুবের।

তার বৈধব্যের পিছনেও আছে একটুখানি ইতিহাস। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মহীতোষ সেনের সঙ্গে যখন তার বিবাহ হয়, তখনও সে হয়নি উদ্ভিন্নযৌবনা। বিবাহের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফৌজে চাকরি নিয়ে মহীতোষ মিশরে চলে যায়। তারপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে সরকারি খবর আসে যে, কোনও একটা যুদ্ধের পর থেকে মহীতোষ সেন 'মিসিং', অর্থাৎ নিখোঁজ। তারপর একে একে কয়েক বৎসর কেটে যায়, কিন্তু তার আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ধরে নেয় যে, মহীতোষ আর ইহলোকে বর্তমান নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে মৃত্যু, এইটেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিখোঁজ মহীতোষের আত্মা যে এখন প্রেতলোকে বাস করছে না, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে লিখিত তার পত্রে সেই সত্যটাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়ের কথা, কিন্তু অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে অগুন্তিবার দেখা গিয়েছে এমন ব্যাপার।

দুই

জয়ন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা রীতিমতো নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

কালীবাবু বললেন, 'এখন আমি কী করব?'

মানিক বললে, 'কী করা উচিত, তার কিছুই কি আপনি স্থির করতে পারেননি?'

কালীবাবু বললেন, 'আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি আর সেইজন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চাই।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'কিন্তু কীরকম সাহায্য?'

—'এই পত্রখানা দেখে আপনার কী মনে হয়?'

—'আর পাঁচজনের যা মনে হতে পারে তাই। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। প্রথমত, পত্রলেখক নিজের হস্তাক্ষর গোপন করতে চায়। দ্বিতীয়ত, লেফাফা সরকারি, কাগজেও কোনও বিশিষ্টতা নেই; এর 'ওয়াটার মার্কে' পাওয়া যায় বটে Howard Smith, Bellfast Bond, Made in Canada. কিন্তু এও হচ্ছে খুব সাধারণ—'

কালীবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ওই মার্কা মারা ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার করি।'

জয়ন্ত ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললে, 'তাই নাকি? আপনিও ওই একই কাগজ ব্যবহার করেন?' তারপর অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বললে, 'তাহলেই বুঝুন, এরকম কাগজ আপনি ব্যবহার করেন, আমি ব্যবহার করতে পারি, আবার আরও অনেকেও ব্যবহার করতে পারেন। তাই বলছিলুম, কাগজেও কোনও বিশিষ্টতা নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা যেতে পারে। পত্রলেখক নিজের ঠিকানা দেয়নি। সে নিজের হাতের লেখাও কারুকে দেখাতে চায় না। এ লুকোচুরির কারণ কী?'

কালীবাবু বললেন, 'অথচ সে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় না, কারণ সে নাকি শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে! সুতরাং কোনও রকম লুকোচুরিই এখানে যুক্তিহীন বলে মনে হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মনে মনে মাথা ঘামাচ্ছি। চিঠিখানা লিখেছে নিশ্চয়ই কোনও মতলববাজ লোক। আমার সন্দেহ হয়, লোকটার মনে বিশেষ কোনও মন্দ অভিসন্ধি আছে, কিন্তু সেটা যে কী, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

মানিক বললে, 'চিঠিখানার ধরন-ধারণ অনেকটা উড়োচিঠির মতো। উড়োচিঠি প্রায়ই ভিত্তিহীন হয়।'

কালীবাবু বললেন, 'কিংবা কেউ হয়তো আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার ফিকিরে আছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তাও অসম্ভব নয়।'

—'কিন্তু এ সবই তো আন্দাজি কথা। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা নিশ্চিত নির্দেশ পাবার আশায়।'

—'কালীবাবু, এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। মনে হচ্ছে, একটা পথও যেন খুঁজে পেয়েছি। আমরা কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময়ে হয়তো কোনও কোনও কথা বলতে পারব।'

তিন

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কালীবাবুর বাড়ির দিকে পদচালনা করলে জয়ন্ত ও মানিক।

মানিক শুধোলে, 'কাল দুপুরে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে? আমি এসে ফিরে গিয়েছি।'

—'গিয়েছিলুম সৌরীনের কাছে, কলেজের সৌরীন মিত্রের কথা তোমার মনে আছে?'

—'সৌরীন মিত্র? এক সৌরীন মিত্র তো আমাদের সঙ্গে 'ফোর্থ ইয়ার' পর্যন্ত পড়েছিল। তুমি কি তার কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, সেই-ই। আমি জানতুম, সৌরীনের এক ভাই বারীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পল্টনে যোগ দিয়ে উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল আমার দরকার।'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তার সঙ্গে তোমার কী দরকার থাকতে পারে?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। আমি খালি জানতে গিয়েছিলুম, ফৌজে মহীতোষ সেন নামধারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কি না?'

মানিক বলে উঠল, 'ওহো, বুঝেছি।......তারপর কী জানতে পারলে?'

—'জানলুম, মহীতোষ সেন নিখোঁজ হলেও যুদ্ধে মারা পড়েনি।'

—'তারপর?'

—'ব্যাপারটা আর একটু ফলাও করে বলছি শোনো। মহীতোষের কথা তুলতেই বারীন উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—ব্ল্যাকগার্ড। সে ভারতের বাইরে বাঙালির নাম ডোবাতে চেয়েছিল। আমি বললুম—কেন? বারীন বললে—লড়াই শুরু হতেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এটা জানা যায়নি, তাই তার নাম বেরিয়েছিল নিখোঁজদের তালিকায়। তারপর সব কথা প্রকাশ পায়, তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলে, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধরা পড়লে 'ডিজার্টার' বলে সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই তার কঠিন শাস্তি হত। বুঝেছ মানিক! এতদিন পরে সেই বীরপুরুষই দুষ্টগ্রহের মতো আবির্ভূত হয়েছেন বেচারা কালীবাবুর ভাগ্যগগনে!'

—'হুঁ। ব্যাপারটা দেখছি বড়োই ঘোরালো হয়ে উঠল।'

—'সৈনিকবেশে বারীন আর অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে তোলা মহীতোষের একখানা ফটোও আমি সংগ্রহ করেছি। ভবিষ্যতে সেখানা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

—'বিশেষ কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। ভারত আজ স্বাধীন, আর মহীতোষ ছিল ইংরেজ আমলের সেপাই। 'ডিজার্টার' বলে এখন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইবে কি?'

—'বোধহয়, না। আর সেইজন্যেই তো এতদিন পরে এই কাপুরুষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে।'

—'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েও সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা লুকোতে চায় কেন?'

—'ঠিক বলেছ। এর মধ্যে যেন কোনও শয়তানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন একথা চাপা দাও, এই আমরা কালীবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।'

চার

জয়ন্ত ও মানিক সচমকে দেখলে, কালীবাবুর দরজার সামনে ছোটো এক জনতা। তার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় একাধিক লাল-পাগড়িকেও।

মানিক সবিস্ময়ে বললে, 'এখানে আবার পুলিশ হাঙ্গামা কেন?'

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইনস্পেকটার ভূপেন চক্রবর্তী। মেদদোষাক্রান্ত, কিন্তু দশাসই চেহারা। ভারিক্কে চালচলন, উপরিতন কর্মচারী ছাড়া দুনিয়ার আর সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কৃপালু নেত্রে। জয়ন্ত ও মানিক তাঁকে চিনত, কারণ কোনও কোনও মামলায় তাদের পুরাতন বন্ধু ও পরামর্শপ্রার্থী ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা পাওয়া গিয়েছে কয়েকবার।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, আরে, এ কী ব্যাপার? মড়া পড়তে না পড়তেই শকুনির টনক নড়ে?'

জয়ন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, মশায়ের উপমাটার অর্থ বুঝলুম না।'

—'অর্থটা কি এতই দুর্বোধ্য? হা হা হা হা! কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখুন মশাই, সুন্দরবাবুর মতো আমিও আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই—নিজের মামলার ভার আমি নিজেই বহন করতে পারি। আর তা ছাড়া এটা একটা মামলার মতো মামলাই নয়, এ হচ্ছে নিতান্ত হালকা মামলা, যে কোনও শিশুও এর তদ্বির করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনি কীসব বাজে বকছেন? আমরা কোনও মামলার ভার নেবার জন্যে এখানে আসিনি। কালীবাবু ডেকেছেন তাই আমরা এসেছি। আমরা তাঁর বন্ধু।'

—'কালীবাবু আপনাদের ডেকেছেন? কিন্তু তিনি এখন কোথায়?'

—'কেন, তিনি কি বাড়িতে নেই?'

—'বাড়িতেও নেই, পৃথিবীতেও নেই।'

—'মানে?'

—'কাল রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে জয়ন্ত ও মানিক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মন একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না এবং তাদের মুখের উপরেও ফুটে উঠল সেই মনের কথা।

ভূপেনের শিক্ষিত দৃষ্টি সে কথাটা বুঝতে ভুল করলে না। ওষ্ঠাধর টিপে মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'যা ভাবছেন, তা নয়। কালীবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।'

ততক্ষণে জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে। কালীবাবুর অভাবনীয় অপঘাতের সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকের মতো তারও মন প্রথমটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই জাগ্রত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণধার নিশ্চিত গোয়েন্দা-বুদ্ধি—যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যে যা থাকে সর্বদাই অবিচল ও অবিভ্রান্ত। সে বেশ সহজভাবেই বললে, 'মৃতদেহ কি এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

—'না, উপরওয়ালাদের আদেশের অপেক্ষা করছি।'

—'বলেছি, কালীবাবু ছিলেন আমাদের বন্ধু। শেষবারের জন্যে একবার তাঁকে দেখতে পাব কি?'

আবার ঠোঁট টিপে একটু হেসে ভূপেনবাবু বললেন, 'এসব জায়গায় বাইরের বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। তবে আপনি পরিচিত ব্যক্তি, অতএব আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানেও যেন শখের গোয়েন্দাগিরি করে আপনি আমার উপরে টেক্কা মারবার চেষ্টা না করেন, কারণ আমি সুন্দরবাবু নই। আমি বলছি এটা আত্মহত্যার মামলা, সব দেখে-শুনে আপনাকেও আমার কথা মানতে হবে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, তাই সই।'

ভূপেনের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে কালীবাবুর একাধারে বসবার ও পড়বার ঘর। আকারে বড়োই বলতে হবে। তিনদিকের দেওয়াল আড়াল করে সারি সারি বইভরা আলমারি। যেদিকে দেওয়াল-ঢাকা আলমারি নেই সেইদিকে তিনটি জানলা ও ঘরে ঢোকবার জন্যে একটি মাত্র দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড়ো টেবিল ও তার তিনদিকে চারখানা ও একদিকে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে লেখবার 'প্যাড' দোয়াতদান, কলমদান, কাগজ-চাপা, খানকয় বই ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

ঘরের এক কোণে একটা টাইপরাইটারের ছোটো টেবিলের উপরে টাইপ করার যন্ত্র। জয়ন্ত জানত, সেটা হচ্ছে কালীবাবুর বাংলা টাইপরাইটার, তিনি নিজে ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন।

বড়ো টেবিলের একপাশে কিছু তফাতে একখানা ইজিচেয়ার এবং তারই উপরে দেখা যাচ্ছে অর্ধশয়ান অবস্থায় হতভাগ্য কালীবাবুর মৃতদেহ। তাঁর মাথাটি বাঁ কাঁধের উপরে লুটিয়ে পড়েছে এবং ডান রগের একটা গভীর, ভীতিকর ও রক্তাক্ত ক্ষত। মুখ ও বুকের কতক অংশের উপরেও চেয়ারের একদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং মেঝের উপরেও রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। ইজিচেয়ারের চ্যাটালো হাতলের উপরে পড়ে আছে তাঁর ডান বাহুখানা এবং সেই হাতের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার—ট্রিগারের উপরে তখনও সংযুক্ত রয়েছে মৃতের তর্জনীটি।

কালীবাবুর চোখ দুটি খোলা এবং তাদের মধ্যে তখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে বিস্ময়ের মতো একটা ভাব—জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ করবার জন্যে যুক্তিহীন মৃত যে এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে যেন তিনি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জয়ন্তের মনে হল এ চোখ যেন আত্মঘাতীর চোখ নয়।

কিন্তু ভূপেনের তা মনে হয়নি। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, 'দেখছেন ক্ষতের চারিদিকে পোড়া দাগ? তার মানে কালীবাবু, রিভলভারের নলচেটা একেবারে নিজের রগের উপরে রেখে টিপকল টিপে দিয়েছিলেন।'

মুখে খালি 'হুঁ' বলে জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে খরচোখে কালীবাবুর হাতটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, 'পরশু দিন কালীবাবুর অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর উপরে বিষম চোট লেগেছিল, এখনও তার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। কাল দেখেছিলুম আঙুল দুটোর উপরে পটি বাঁধা রয়েছে—'

ঘরের দরজার কাছ থেকে নতুন গলার আওয়াজ এল—'রিভলভারের ঘোড়া টেপবার আগে কালীবাবু নিশ্চয়ই সেটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ওই দেখুন, ঘরের কোণে ব্যান্ডেজটা এখনও পড়ে রয়েছে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূর্তি। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী বিশেষত্ববর্জিত হলেও দেখতে মন্দ লাগে না। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো লম্বা চুল, জোড়া ভুরু, ওষ্ঠের উপরে চার্লি চ্যাপলিন-গোঁফ। ডান গালে একটা বড়ো আঁচিল সহজেই চোখে পড়ে। জামাকাপড় বাবুয়ানার পরিচয় দেয়। দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসু চোখে ভূপেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ভূপেন বললেন, 'ইনি হচ্ছেন মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাসা এই বাড়িতেই। কাল রাত এগারোটার সময়ে রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে এসে উনিই প্রথমে জানতে পারেন, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন।'

মতিলালের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূপেনের জবানীতে জয়ন্ত তার পরিচয় শ্রবণ করলে। তারপর তার নমস্কারের উত্তরে প্রতি নমস্কার করে সে ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে তুলে নিলে পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজটা।

ব্যান্ডেজের খানিকটা অংশ রক্তের ছোপে আরক্ত।

জয়ন্তের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ফিরে মানিকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ভূপেনবাবু, আত্মহত্যার কোনও কারণ আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন?'

যেন কেল্লা ফতে করেছেন এমনই ভাব দেখিয়ে ভূপেন বললেন, 'পেরেছি বই কি। এই চিঠিখানা দেখুন, একখানা ছিল বড়ো টেবিলটার উপরে। এই একখানা চিঠিই আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।'

সেই চিঠি—ছাপার অক্ষর কেটে নিয়ে যা লেখা হয়েছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা যেন দেখেও দেখলে না। বললে, 'আর কোনও সূত্র পেয়েছেন?'

—'পেয়েছি বই কি, সবচেয়ে বড়ো সূত্র। এদিকে আসুন।' ভূপেনের মুখে মহা গাম্ভীর্যের ভাব।

পাঁচ

ভূপেন কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বাংলা টাইপরাইটারে টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন।'

তখনও টাইপরাইটারের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একখানা 'টাইপ' করা কাগজ। জয়ন্ত মুখ নামিয়ে পাঠ করলে

'সধবাকে আমি বিধবা ভেবে বিবাহ করেছি—মাধবীর শাস্ত্রসম্মত স্বামী আবার ফিরে আসছে। এরপর সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। এই লজ্জা ও অপমানের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্য আজ আমি এই পত্র লিখেই আত্মহত্যা করব এবং এর জন্যে আর কেহ দায়ী হবে না। ইতি—

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি'

জয়ন্ত টাইপরাইটার যন্ত্রটা ধরে নাড়াচাড়া করে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে রুপোর শামুকের মতো দেখতে নস্যদানটা বার করে একটিপ নস্য গ্রহণ করলে।

গোড়া থেকেই মানিক এই অভাবিত আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারেনি। উড়োচিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কালীবাবুর নিজেরই সন্দেহ ছিল এবং সেইজন্যেই তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরসন না করেই তিনি যে আত্মহত্যা করবেন, তাঁর প্রকৃতি এতটা দুর্বল ছিল না। বিশেষ কালীবাবু ছিলেন যেন জীবনজোয়ারের মূর্তিমান উচ্ছ্বাস; নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আনন্দ আশ মিটিয়ে উপভোগ করবার জন্য তাঁর চিত্তে ছিল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এত সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে আত্মহত্যা করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তার বিশ্বাস, জয়ন্তও এই কথা জানে এবং মানে।

জয়ন্ত হঠাৎ এখন নস্য নিলে কেন? বহু মামলায় মানিক বারংবার লক্ষ করেছে, সপক্ষে কোনও মূল্যবান সূত্র পেলেই জয়ন্ত খুশি হয়ে নস্য না নিয়ে পারে না। ওই টাইপরাইটারটা নেড়েচেড়ে সে এমন কী আনন্দজনক সূত্র আবিষ্কার করলে? কিন্তু জয়ন্তের মুখ দেখে এ প্রশ্নের কোনও উত্তরই পাওয়া যায় না। তার মুখ একেবারেই কালীঘাটের পটে আঁকা মূর্তির মতো ভাবহীন।

মুরুব্বির মতো মস্তক সঞ্চালন করতে করতে ভূপেন বললেন, 'কী জয়ন্তবাবু, এখন কী ভাবছেন? যা বললুম, তাই তো? কালীবাবু নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন—এটা হচ্ছে নিতান্ত হালকা মামলা।'

রুপোর নস্যদানটা পকেটস্থ করে জয়ন্ত বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।'

ভূপেন বললেন, 'তাহলে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা খামোকা আর মেজাজ খারাপ করি কেন? বাইরে চলুন।'

—'তাই চলুন। বাইরে গিয়ে মতিবাবুর কাছ থেকে আমি দু-একটা কথা জানবার চেষ্টা করব। আশা করি ওর আপত্তি হবে না?'

মতিলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললে, 'বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কীসের? তবে আমাকে বেশিক্ষণ ধরে না রাখলেই বাধিত হব, কারণ এই দুর্ঘটনার পরে আমার ঘাড়ে পড়েছে অনেক অপ্রীতিকর কাজের ভার।'

ছয়

—'মতিবাবু, আপনি কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছেন কতদিন?'

—'তিন বৎসর।'

—'কালীবাবু নিজের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার উপরে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। কেবল সাংসারিক নয়, সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন।'

—'কালীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্নবাবুকে আপনি চেনেন কি?'

—'নিশ্চয়ই চিনি! এই কালকেই তো তিনি এখানে এসে বিষম হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।'

—'সে আবার কী?'

—'কালীবাবুর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল। আমি সেখানে হাজির না থাকলে খুড়োকে তিনি নিশ্চয় মেরেই বসতেন।'

—'কেন?'

—'কালীবাবুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা তারাপ্রসন্নবাবুরই। কিন্তু কালীবাবু সম্প্রতি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী মাধবীদেবীকে।'

—'সমস্ত সম্পত্তি?'

—'এক রকম তাই বটে। তারাপ্রসন্নবাবু পাবেন কিছু কিছু মাসোহারা মাত্র। অবশ্য মাধবীদেবী ভোগ করবেন কেবল জীবনস্বত্ব—তাঁর অবর্তমানে তারাপ্রসন্নবাবুরই বংশধররা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন। কিন্তু উইলের এই শর্ত তারাপ্রসন্নবাবুর মনঃপূত হয়নি, আর তাই নিয়েই ঝগড়া।'

—'উইল কবে হয়েছিল?'

—'গেল হপ্তায়, অর্থাৎ আজ থেকে ছয় দিন আগে।'

এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে একজন দাসী মতিলালের সামনে এসে বললে, 'মা-ঠাকরুন আপনাকে ডাকছেন।'

মতিলাল বললে, 'শুনলেন তো, আমার তলব পড়েছে? কর্তা-গিন্নি দু-জনেরই আমাকে না হলে চলে না। বেশি বিশ্বস্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, বেশি খাটুনি খেটে মরা।'

—'মা-ঠাকরুন কে?'

—'মাধবীদেবী।'

—'বেশ, আপনি আসুন, আমার আর কিছু জানবার নেই। ...না, না, আমার আর একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। কালীবাবুর বাড়িতে বাংলা টাইপরাইটার আছে কয়টি?'

—'একটা।'

—'ব্যাস, আমার কথা ফুরল।'

মতিলালের হন্তদন্তের মতো প্রস্থান।

ভূপেন বললেন, 'জয়ন্তবাবু, বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মিছে আর ফ্যাকড়া বাড়াচ্ছেন কেন? নিজের হাতে যে মরে, তাকে আর কোনও সাহায্যই করা যায় না।'

জয়ন্ত রসহীন কণ্ঠে হাস্য করে বললে, 'আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। এটা নিতান্তই একটা হালকা মামলা। তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?'

—'বলুন।'

—'আত্মহত্যার আগে কালীবাবু যে কথাগুলি 'টাইপ' করে গিয়েছিলেন, ওই টাইপরাইটারেই সে কথাগুলি আর একখানা কাগজে 'টাইপ' করিয়ে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

—'এ আবার আপনার কী খেয়াল?'

—'যথাসময়েই সব কথা বলব। বৈকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

সাত

বৈকাল। জয়ন্ত ও মানিক থানার ভিতরে প্রবেশ করল।

তাদের দেখেই ভূপেন টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, 'আরে জয়ন্তবাবু আপনি এ আবার কী গোল বাধালেন?'

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপার কী'?

—'বড়োই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'কী বুঝতে পারছেন না?'

—'যে টাইপরাইটারের সঙ্গে কালীবাবুর অন্তিম স্বীকার-উক্তি সংলগ্ন ছিল, তার মধ্যে 'রিবন' বা কালির ফিতে নেই।'

—'আমি তা জানি।'

—'কেবল তাই নয়। তারপর নতুন রিবন আনিয়ে কালীবাবুর সেই স্বীকার-উক্তির 'কপি' করে দেখা গেল, সেটা 'টাইপ' করা হয়েছে অন্য কোনও 'মেশিনে', কারণ আসল আর নকলের 'টাইপে'র ছাঁদ একরকম নয়।'

—'ব্যাপারটা যে এই রকম দাঁড়াবে, আমি আগেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলুম। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।'

ভূপেন প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন, 'কে বলে মামলাটা হালকা? মামলাটা এর মধ্যেই দস্তুরমতো ভারী হয়ে উঠেছে!'

জয়ন্ত বেশ সহজভাবেই বললে, 'হালকা কি ভারী জানি না মশাই, তবে এটা যে খুনের মামলা, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

ভূপেন উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আপনি যে আরও বেশি ভারী—অর্থাৎ গুরুতর কথা বলছেন! আত্মহত্যাকেও আপনি খুন বলে চালাতে চান নাকি?'

—'ভূপেনবাবু, আমার মতো আপনিও তো স্বকর্ণে শুনেছেন কালীবাবুর একটার বেশি টাইপরাইটার ছিল না? আর স্বচক্ষেই তো দেখেছেন, তাইতেই আটকানো ছিল তাঁর স্বীকার-উক্তি? অথচ সেই টাইপরাইটারে কালির ফিতে ছিল না! আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে, আত্মহত্যার পূর্ব-মুহূর্তে নিজস্ব টাইপরাইটার থাকতেও কালীবাবু বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও ছুটে গিয়ে অন্য যন্ত্রে তাঁর স্বীকার উক্তি 'টাইপ' করে এনেছিলেন? এটা একেবারেই অসম্ভব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত আছে।'

'দ্বিতীয় ব্যক্তি?'

—'হ্যাঁ, হত্যাকারী।'

ভূপেনের লম্ফত্যাগ ও আসনত্যাগ। সে চমকিত কণ্ঠে বললে, 'কী বলছেন আপনি!'

জয়ন্ত নিজের মনেই বললে, 'ঘরের মেঝে থেকে কালীবাবুর আঙুলের ব্যান্ডেজ তুলে নিয়ে প্রথমেই আমার চোখ খুলে যায়। কালীবাবুর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী ছিল ওই ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা। সে অবস্থায় কেউ রিভলভারের ঘোড়া টিপতে পারে না। অবশ্য কালীবাবু নিজেই পট্টি খুলে ঘোড়া টিপতে পারতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পট্টির উপরে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগত না এবং তিনি তা করেনওনি। তিনি যখন গুলিবিদ্ধ হন, তাঁর আঙুলের উপরে তখন পট্টি বাঁধা ছিল আর সেই জন্যেই পট্টির উপরে ছিল রক্তের ছোপ। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারীই যে পট্টিটা সরিয়ে ফেলেছিল, এতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।'

নির্বাক ভূপেন মুখব্যাদান করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরম বিস্ময়ে।

জয়ন্ত বললে, 'এই মামলায় দুটো সবচেয়ে প্রমাণ হচ্ছে রক্তাক্ত পট্টি আর 'রিবন'-হীন টাইপরাইটার। এই দুটো প্রমাণেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাড়াতাড়িতে সে লক্ষ করতে পারেনি যে, পট্টির উপরে রক্তের ছোপ আছে। অন্য কোনও টাইপরাইটারে আগে থাকতেই সে স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' করে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কালীবাবুর মেশিনে সেখানা আটকাবার সময়ে কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মধ্যে নেই কালির ফিতে।'

ভূপেন চমৎকৃত, তখনও তার মুখে নেই রা।

জয়ন্ত বললে, 'এখন প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হতে পারে? ভূপেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করে দেখেছেন, যে পত্রখানা কালীবাবুর তথাকথিত আত্মহত্যার হেতু, তার 'ট্রেডমার্ক'? খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কালীবাবু নিজেও ওই একই 'ট্রেডমার্ক' মারা কাগজ ব্যবহার করেন। এই দেখে সন্দেহ হয়, পত্রপ্রেরক তাঁর বাড়িতে আনাগোনা করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এ সন্দেহের বিশেষ মূল্য নেই, কারণ এরকম কাগজ বাজারে সুলভ, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত যে-কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব অন্য উপায়ে আমাদের হত্যাকারীর সন্ধান করতে হবে। ভূপেনবাবু, আপনি আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন কি?'

ভূপেন ক্ষীণস্বরে শুধোলেন, 'কী?'

'ইজিচেয়ার আর তার উপরকার মৃতদেহের অবস্থান?'

—'হ্যাঁ। চেয়ার আর দেহ দুই-ই ছিল ঘরে ঢোকবার দরজার মুখোমুখি।'

—'ঘরে দরজা ছিল একটিমাত্র। তাহলে?'

—'কেউ যদি ঘরে ঢুকে থাকে, তবে তাকে কালীবাবুর সুমুখ দিয়েই ঢুকতে হয়েছিল।'

—'কেউ যদি কেন ভূপেনবাবু, কেউ নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।'

—'আপনি কি বলতে চান, খুনি যখন ঘরে ঢোকে, কালীবাবু তাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

—'তাই তো বলতে চাই।'

—'অথচ কালীবাবু তাকে বাধা দেননি?'

—'না, কারণ সে ছিল তার পরিচিত। হ্যাঁ, অতি পরিচিত তাই সন্দেহের অতীত। কারণ খুনি যে ঘরে ঢুকেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি ছোড়েনি, সে প্রমাণও আছে। কালীবাবুর ডান রগের উপরে রিভলভারের নলচে লাগিয়ে গুলি ছোড়া হয়েছিল, আমরা সকলেই তা জানি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, খুনি যখন ঘরে ঢুকে কালীবাবুর খুব কাছে ডান পাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও তিনি তাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি, কেন না সে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এখন আন্দাজ করতে পারেন, কে এই ব্যক্তি?'

ভূপেন কতকটা তাড়ীভূতের মতো হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁর দেহে মুখে ও চোখে জাগ্রত হল জীবনচাঞ্চল্য। উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, আলবাৎ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি!'

—'কে সে?'

—'কালীবাবুর ভাইপো তারাপ্রসন্ন। আমি এখনই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।'

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললে, 'হ্যাঁ, সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে কালীবাবুর উপরে সে বিষম খাপ্পা হয়ে আছে বটে। এমন অবস্থায় অনেক খুনখারাপি হতে দেখা গিয়েছে। আপনার অনুমান অসঙ্গত নয়।'

—'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করি কেন? বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।'

—'তিষ্ঠ ক্ষণকাল। আর একটু সবুর করলে ক্ষতি হবে না। আমার হাতে আরও কিছু কিছু প্রমাণ আছে।'

আট

ভূপেন বললে, 'যা বলবার বলে ফেলুন মশাই, আমার আর তর সইছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তারাপ্রসন্নের উপরে সন্দেহ হবারই কথা। ওবাড়িতে তার আনাগোনা ছিল।

সে জুয়াড়ি, মদ্যপ, লম্পট, বেকার—তার মতো লোক সম্পত্তি হারিয়ে যে চণ্ডালে রাগের বশবর্তী হয়ে নরহত্যা করবে, এটা কিছুই অসম্ভব নয়।'

ভূপেন বললে, 'হায় হায়, গোড়া থেকেই তার উপরে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাহলে এতক্ষণ তার হাতে আমি লোহার বালা পরিয়ে দিতে পারতুম!'

—'এইবারে আর একটা কথা ভেবে দেখুন ভূপেনবাবু। ঘটনার রাত্রের কথা স্মরণ করুন। ঘড়িতে এগারোটা বেজেছে। দরজার দিকে মুখ করে কালীবাবু ইজিচেয়ারের উপরে বসে আছেন। এমন সময়ে যে তারাপ্রসন্ন খানিক আগে মারমুখো হয়ে তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে গেছে সে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। আপনি যদি কালীবাবু হতেন, এ অবস্থায় পড়লে কী করতেন?'

—'উঠে তারাপ্রসন্নকে তেড়ে মারতে যেতুম, নয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, নয়তো—'

—'থাক, ওতেই চলবে। কিন্তু কালীবাবু ওসব কিছুই করেননি। তিনি নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারের উপরেই বসে রইলেন, আর তারাপ্রসন্ন নির্বিবাদে সুমুখ দিয়ে সোজা তাঁর ডান পাশে এসে তাঁকে গুলি করে সরে পড়ল! এটা কি সম্ভবপর?'

—'উঁহু!'

—'তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাপ্রসন্ন হত্যাকারী নয়।'

ভূপেন দস্তুরমতো মুষড়ে পড়ে বললেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এই টেনে তোলেন আকাশে, এই ঠেলে ফেলেন পাতালে!'

জয়ন্ত অবিচলিত ভাবে বললে, 'আপনি মহীতোষ সেনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

—'ভুলিনি, কারুকেই ভুলিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কী সম্পর্ক?'

—'চিঠিতে সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা গোপন করেছে। কালীবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতেন।'

—'ওরকম গোপনতার মানে হয় না। কালীবাবু বেঁচে থাকলে সে যে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, এটাও ভুলবেন না যেন।'

—'হ্যাঁ, পরে সত্যই দেখা করতে সে এসেছিল হত্যার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সে চিঠিখানা লিখেছিল অন্য উদ্দেশ্যে।'

—'কী উদ্দেশ্য?'

—'ওই চিঠির সঙ্গে কালীবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হবে, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন। দৈবগতিকে তদন্তে কেউ আসল ব্যাপার সন্দেহ করলেও, সে থাকবে নিরাপদে। কারণ, পত্রে তার হাতের লেখা বা ঠিকানা নেই।'

ভূপেন হতাশভাবে বললে, 'এ যে বিশ বাঁও জলের নীচে পড়লুম রে বাবা! যাকে জানি না, চিনি না, তাকে ধরব কেমন করে?'

ভূপেনের হাতে একখানা ফটো গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে এই দেখুন মহীতোষকে। ডান দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার আসামি। চিনতে পারেন?'

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'মোটেই না।'

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'এর মধ্যে মহীতোষের মূর্তি 'এনলার্জ' করে দেখানো হয়েছে। ছোটো ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়িগোঁফ কামানো ছিল, কেবল আমি শখ করে তার নাকের তলায় ছোট্ট একজোড়া গোঁফ এঁকে দিয়েছি। এখন

বলুন তো মশায়, ওই গোঁফ, ওই জোড়া ভুরু, আর ডান গালের ওই আঁচিল আপনি এর আগে আর কোনও মুখে দেখেছেন কি না?'

ভূপেন দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে তুলে বললে, 'আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি!'

—'তাহলে এবারে চিনতে পেরেছেন? উত্তম! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনি এবং মহীতোষ সেন। নাম ভাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। তবে মাধবীদেবী যে তাঁর পূর্ব স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হত অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু ছয় দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবনস্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিয়ে এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাতত বিদায়মাগে শখের গোয়েন্দারা।'

জয়ন্তর দুই হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন বললেন, 'স্বীকার করি, আপনি হচ্ছেন অতুলনীয়।'

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'কিছু না, কিছু না। সত্যিই এটা নিতান্ত হালকা মামলা, নইলে এত সহজে কিনারা হত না। তবে ব্যান্ডেজ আর টাইপরাইটার নিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চলে এসো মানিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।'

একখানা উলটে-পড়া চেয়ার

সদাশিব মুখোপাধ্যায়। যখন জয়ন্ত ও মানিককে গোয়েন্দা বলে কেউ জানত না, তিনি তখন থেকেই তাদের বন্ধু।

জমিদার মানুষ। বাস করেন শিবপুরের গঙ্গার ধারে, মস্ত এক বাড়িতে। জয়ন্ত ও মানিক আজ তাঁর কাছে এসেছে সান্ধ্য ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

তখনও সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি। সদাশিববাবুর সাজানো-গুছানো লম্বা-চওড়া বৈঠকখানায় বসে জয়ন্ত ও মানিক গল্প করছে সকলের সঙ্গে। সকলে মানে, সদাশিববাবু ও তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধু। তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন ভূরিভোজনের লোভে নয়, জয়ন্তের নাম শুনেই। জয়ন্তের মুখে তার কোনও কোনও মামলার কথা শুনবেন, এই তাঁদের আগ্রহ।

কিন্তু জয়ন্তের আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে না নিজের মুখে নিজের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে।

ভদ্রলোকেরা তবু নাছোড়বান্দা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলী হচ্ছেন আবার তিনকড়িবাবু, তিনি সদাশিববাবুর বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। আগে কোনও সরকারি অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এখন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বয়সে ষাট পার হয়েছেন। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

অবশেষে অনুরোধ উপরোধের ঠেলায় পড়ে জয়ন্ত বলতে বাধ্য হল: আচ্ছা, তাহলে এমন কোনও কোনও মামলার কথা বলতে পারি, আমি যেগুলো হাতে নিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।

তিনকড়িবাবু বললেন, না, না, তাও কি হয়! আমরা আপনাদের সফলতার ইতিহাসই শুনতে চাই। ব্যর্থ মামলা তো অসমাপ্ত গল্প!

জয়ন্ত শেষটা নাচার হয়ে বললে, মানিক, আমাকে রক্ষা করো ভাই! আমি নিজের গুণকীর্তন করতে পারব না কিছুতেই। তুমিই না-হয় ওঁদের দু-একটা মামলার কথা শোনাও।

তাই হল। জয়ন্তের কাহিনি নিয়ে মানিক ঘণ্টা দুই সকলকে মাতিয়ে রাখলে।

তারপর সদাশিববাবু ঘোষণা করলেন, আর নয়, এইবারে খাবার সময় হয়েছে।

আসর ভাঙল।

কিন্তু খেতে বসতে না বসতেই আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের চিৎকার, গঙ্গার হাহাকার! বিদ্যুতের পর বিদ্যুতের অগ্নিবাণের আঘাতে কালো আকাশ যেন খানখান হয়ে গেল। তারপর ঝড় কাবু না হতে হতেই শুরু হল বৃষ্টির পালা। আর সে কি যে সে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে মাটির বুক হয়ে গেল জলে জলে জলময়!

সদাশিব বললেন, জয়ন্ত, মানিক! আজ আর বাড়ি যাবার নাম মুখে এনো না। বাড়িতে ফোন করে দাও, আজ এখানেই তোমরা রাত্রিবাস করবে।

জয়ন্ত বললে, তথাস্তু।

॥ দুই ॥

সকালে সদাশিব বললেন, যাবার আগে চা পান করে যাও।

মানিক বললে, সাধু প্রস্তাব।

অনতিবিলম্বে চায়ের সঙ্গে এল আরও কিছু কিছু। এবং চায়ের পেয়ালায় দু-একটা চুমুক দিতে না দিতেই হন্তদন্তের মতো ছুটে এসে তিনকড়িবাবু বললেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে।

সদাশিব বললেন, ব্যাপার কী তিনকড়িবাবু?

—চোরে আমার বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, থানায় খবর পাঠিয়েছেন?

—পাঠিয়েছি। পুলিশ এখনও আসেনি। কিন্তু পুলিশ আসবার আগে আপনাকে আমি চাই।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, আমাকে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিশের চেয়ে আপনার উপরেই আমার বেশি বিশ্বাস।

—আমাকে মাপ করবেন। এ সব সাধারণ চুরির মামলা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। পুলিশ অনায়াসেই এ রকম মামলার কিনারা করতে পারবে।

তিনকড়ি করুণ স্বরে বললেন, সদাশিববাবু, আমার মতন লোকের কাছে এ চুরি সাধারণ চুরি নয়। ওই বিশ হাজার টাকার দাম আমার কাছে কত, আপনি তা জানেন। আপনি দয়া করে আমার জন্যে জয়ন্তবাবুকে একটু অনুরোধ করেন—

সদাশিব বললেন, বেশ, তা করছি। জয়ন্ত, আমারও ইচ্ছা—

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, আর বলতে হবে না, তোমার ইচ্ছা কী বুঝেছি। কিন্তু নিমন্ত্রণ খেতে এসে চুরির মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বড়ো জোর তিনকড়িবাবুর মুখে চুরির বিবরণ শুনে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে আসতে পারি। তার বেশি আর কিছু আমি পারব না।

তিনকড়ি আশান্বিত হয়ে বললে, আমার পক্ষে তাই হবে যথেষ্ট।

॥ তিন ॥

জয়ন্ত শুধোলে, আপনার টাকাগুলো কোথায় ছিল?

—একতলায়, আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির ভিতরে।

—বলেন কী, অত টাকা রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের আলমারির ভিতরে!

—দোতলার ঘরে আমার লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু বছর চারেক আগে একবার চোর এসে সিন্দুক থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল, তাই তার ভিতরে আর দামি কিছু রাখতে ভরসা হয় না।

—টাকাগুলো ব্যাংকে জমা রাখেননি কেন?

—তাই তো রেখেছিলুম জয়ন্তবাবু। কিন্তু গেল বছরে ভিতরে ভিতরে খবর পাই, আমার ব্যাংক লাল বাতি জ্বালবার আয়োজন করছে। তাড়াতাড়ি টাকা তুলে আনলুম আর তারই দিন ছয়েক পরে ব্যাংক দরজা বন্ধ করলে, অনেক হতভাগ্যের সর্বনাশ হল। ব্যাপার দেখে আমি এমন নার্ভাস হয়ে গেলুম যে, টাকাগুলো আর কোনও ব্যাংকেই জমা রাখতে পারলুম না।

—আপনার বাড়িতেই যে অত টাকা আছে, এ খবর আর কেউ জানত?

—আমি তো জনপ্রাণীর কাছে ও টাকার কথা বলিনি।

—কিন্তু ব্যাংক থেকে যে আপনি টাকা তুলে এনেছেন এটা তো অনেকেই জানে?

—তা জানে বটে।

—আর নতুন কোনও ব্যাংকে আপনি টাকা জমা রাখেননি, এ খবরটাও তো কেউ কেউ রাখতে পারে?

—তাও পারে বটে। কিন্তু চোর কেমন করে জানবে যে এত জায়গা থাকতে আমি বইয়ের আলমারির ভিতরেই অত টাকা লুকিয়ে রেখেছি?

—তিনকড়িবাবু, এ চোর হচ্ছে সন্ধানী। সে কেমন করে আপনার পড়বার ঘরে ঢুকেছে?

—সেটা খালি আমার পড়বার ঘর নয়, আমার বৈঠকখানাও। তার দক্ষিণ দিকে হাত-আষ্টেক চওড়া আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটুখানি জমি আছে, তার পরেই সরকারি রাস্তা। চোর সেই বেড়া টপকে এসেছে। প্রথমে খড়খড়ির পাখি তুলে ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে জানলা খুলেছে। তারপর কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্র বা বাটালি দিয়ে একটা গরাদের গোড়ার দিককার কাঠ খানিকটা কেটে ফেলে গরাদটাও সরিয়ে ফেলেছে। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু এখনও আমি এই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি যে টাকা সে আবিষ্কার করলে কেমন করে?

—কেন?

—টাকাগুলো আমি সাধারণ ভাবে রাখিনি। দপ্তরিকে ফরমাজ দিয়ে আমি ঠিক কেতাবের মতো দেখতে একটি বাক্স তৈরি করিয়ে ছিলুম আর তারই ভিতরে রেখেছিলুম বিশ খানা হাজার টাকার নোট। আলমারির বাইরে থেকে দেখলে বাক্সটাকে সোনার জলে নাম লেখা একখানা সাধারণ বই ছাড়া আর কিছুই মনে করবার উপায় ছিল না।

—পড়বার ঘরই আপনার বৈঠকখানা? সেখানে তাস-দাবা-পাশার আসরও বসত?

—তা বসত বই কি, রোজ নয়—শনি-রবিবারে আর ছুটির দিনে।

—সে আসরে নিয়মিত ভাবে অনেকেই আসতেন?

—আমার বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয় জয়ন্তবাবু। নিয়মিত ভাবে আমাদের বৈঠকে যে ছয়-সাত জন লোক আসেন, চুরির খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই আমার বাড়িতে ছুটে এসেছেন, আপনি সেখানে গেলেই তাঁদের দেখতে পাবেন।

—বেশ, তবে তাই হোক। পুলিশের আগেই আমি ঘটনাস্থলে হাজির হতে চাই।

॥ চার ॥

একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। সামনে অপেক্ষা করছে জনকয়েক কৌতূহলী লোক, জয়ন্ত ও মানিক তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে গতকল্য সন্ধ্যায় দেখেছিল সদাশিববাবুর বাড়িতেও।

তিনকড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে তাঁর পাঠগৃহের দরজার তালা খুলে ফেললেন।

জয়ন্ত গলা তুলে সকলকে শুনিয়ে বলল, তিনকড়িবাবু, বাইরে এঁদের এইখানেই অপেক্ষা করতে বলুন। আগে আমরা ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখি, তারপর অন্য কথা।

মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একখানা গালিচা-বিছানো তক্তাপোষ। একদিকে একটি ছোটো টেবিল ও দু খানা চেয়ার। আর একদিকে দুটি বই-ভরা আলমারি এবং আর একদিকেও পুস্তক-পূর্ণ সেলফ। একটি আলমারির সামনে মেঝের উপরে উলটে পড়ে রয়েছে একখানা চেয়ার। ঘরের এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানেও ছড়ানো রয়েছে নানা আকারের কেতাব ও মাসিকপত্র প্রভৃতি। দেখলেই বোঝা যায় যে তিনকড়িবাবু হচ্ছেন দস্তুরমতো গ্রন্থকীট।

জয়ন্ত মিনিট দুয়েক ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তিনকড়িবাবু টাকা চুরি গিয়েছে কোন আলমারির ভিতর থেকে?

তিনকড়ি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন।

—ওর সামনে একখানা চেয়ার উলটে রয়েছে কেন?

—জানি না। তবে ওটা হচ্ছে চোরেরই কীর্তি। কারণ কাল রাত্রে আমি যখন এ ঘর থেকে দরজা বন্ধ করে যাই, চেয়ারখানা তখন চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল।

—আপনি কাল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান চেয়ারখানা তখন কোথায় ছিল?

—ওদিককার টেবিলের সামনে।

—তা হলে চোরই চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে এনেছে।

—তা ছাড়া আর কী?

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর ছোট্ট ডিপে বার করে নস্য নিতে নিতে (এটা হচ্ছে তার আনন্দের লক্ষণ—নিশ্চয়ই সে কোনও উল্লেখযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করেছে) বললে, বটে বটে, বটে! আপনার সেই জাল কেতাবে পুরে আসল নোটগুলো আলমারির কোন তাকে রেখেছিলেন?

তিনকড়ি থতমত খেয়ে বললেন, জাল কেতাব?

—হ্যাঁ জাল কেতাব। অর্থাৎ যা কেতাবের মতো দেখতে, কিন্তু কেতাব নয়।

—ও বুঝেছি। সেই কেতাব-বাক্সটা ছিল আলমারির সব-উপর তাকে।

—যা ভেবেছি তাই, বলতে বলতে জয়ন্ত আলমারির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলমারিটা পরীক্ষা করতে করতে আবার বললে, আলমারির কলে যে চাবিটা লাগানো রয়েছে সেটা কি আপনার?

তিনকড়ি বললেন, আজ্ঞে না। ওটা নিশ্চয়ই চোরের সম্পত্তি।

—তাহলে এ চোর পেশাদার চোর নয়।

—কী করে বুঝলেন?

—পেশাদার চোরের কাছে প্রায়ই চাবির গোছা থাকে, এ রকম একটিমাত্র চাবি থাকে না। এখানে চোর এসেছিল একটিমাত্র চাবি নিয়ে। তার মানে সে জানত, এই একটিমাত্র চাবি দিয়েই সে কেল্লা ফতে করতে পারবে। যদি বলেন সে এতটা নিশ্চিত হয়েছিল কেন? তবে তার উত্তর হচ্ছে, সে আগে থাকতেই যে-কোনও সুযোগে এই আলমারির কলে একটা মোমের বা অন্য কিছুর ছাঁচ তুলে নিয়ে বিশেষ একটি চাবি গড়ে তবে এখানে এসেছিল। চুরি তার ব্যাবসা নয়, এ চাবি পরে তার কোনও কাজে লাগবে না, তাই চাবিটাকে সে এখানে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছে। ...তিনকড়িবাবু, দেখছি ওই জানালাটার একটা গরাদ নেই। চোর কি ঐ খান দিয়েই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর জানালাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

মাটির উপরে কিছুক্ষণ হুমড়ি খেয়ে বসে কী পর্যবেক্ষণ করলে। তারপর উঠে বললে, মানিক, কাল রাত্রে কখন বৃষ্টি থেমেছিল তুমি তা জানো তো?

মানিক বললে, হ্যাঁ আমি তখনও জেগেছিলুম। বৃষ্টি থেমেছিল রাত দুটোর সময়ে।

—তাহলে এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছে রাত দুটোর পরে।

সদাশিব শুধোলেন, এ কথা কেমন করে জানলেন?

জয়ন্ত বললে, খুব সহজেই। ভিজে মাটির উপরে রয়েছে কয়েকটা স্পষ্ট পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই চোরের পদচিহ্ন। কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতের ভিতরে চোর এখানে এলে সব পায়ের দাগ ধুয়ে মুছে যেত। হ্যাঁ, পায়ের দাগেও বেশ বিশেষত্ব আছে।

তিনকড়ি সাগ্রহে বললেন, কী বিশেষত্ব?

—'যথাসময়ে প্রকাশ্য' বলতে বলতে জয়ন্ত আবার জানালার ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। তারপর নিম্নস্বরে আবার বললে, তিনকড়িবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি কি আলমারির ভিতর থেকে কেতাবখানা মাঝে মাঝে বার করতেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করতুম। দেখতুম নোটগুলো যথাস্থানে আছে কি না।

—তখন নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে আপনি একলা থাকতেন?

—সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।

জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত নিজের মনে কী ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর শুধোলে, রাস্তার ওপারে ওই যে লাল রঙের বাড়ি রয়েছে, ওখানা কার বাড়ি?

—যদুবাবুর। আমার এক বিশেষ বন্ধু।

—তার পাশের ওই হলদে বাড়িখানা?

—মাধববাবুর। তিনিও আমার বিশেষ বন্ধু।

—আচ্ছা, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি, একটি ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক বারবার দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছেন, উনি কে?

তিনকড়ি বললেন, আমিও দেখেছি। ওঁরই নাম যদুবাবু।

যদুবাবুও জয়ন্তের প্রশ্ন শুনতে পেলেন। দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, জয়ন্তবাবু, ক্ষমা করবেন। আমি আমার কৌতূহল সংবরণ করতে পারছিলুম না। কে না জানে, আপনি হচ্ছেন এক আশ্চর্য যাদুকর গোয়েন্দা। আজ এখানে এসে আবার কি যাদু সৃষ্টি করেন তাই দেখবার জন্যে আমার আগ্রহের আর সীমা নেই।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে কোনও যাদু সৃষ্টি করবার দরকার নেই। আমার যা জানবার তা জেনেছি। এখন আপনারা সকলেই ঘরের ভিতরে আসতে পারেন।

—তাই নাকি? তাই নাকি? বলতে বলতে ও হাসতে হাসতে সর্বপ্রথমেই ঘরের ভিতরে পদার্পণ করলেন যদুবাবু। ছোট্টখাট্ট বললেই তাঁর চেহারা বর্ণনা করা যায় না, ভগবানের দয়ায় তিনি বামন হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন—কারণ তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ফুটের চেয়ে বেশি নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুসারেই মানানসই—যদিও তাঁর দেহখানি ছোটোর ভিতরেই দিব্য নাদুস-নুদুস।

যদুবাবুর পর দেখা দিলেন মাধববাবু, দস্তুরমতো দশাসই চেহারা—উচ্চতাতেও ছয় ফুটের কম হবে না। এলেন আরও জনচারেক ভদ্রলোক।

তিনকড়ি একে একে সকলের সঙ্গে জয়ন্তের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার তাস-দাবা খেলার সাথি হচ্ছেন এঁরাই।

জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না, কেবল একবার করে চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলে।

মাধববাবু বললেন, বলেন কী জয়ন্তবাবু, ব্যাপারটা এখনই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব স্পষ্ট।

—কিন্তু আমরা তো স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—এখানে কাল রাতে চুরি হয়ে গিয়েছে।

—তাই তো শুনছি।

—চোর ওই গরাদ খুলে এই ঘরে ঢুকেছে।

—তাই তো দেখছি।

—তাহলে ব্যাপারটা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না?

—উঁহু! চোর কে?

—সেটা পুলিশ এসে আবিষ্কার করবে। আমি এখানে চোর ধরতে আসিনি, আপনাদের মতো মজা দেখতে এসেছি।

যদুবাবু আপত্তি করে বললেন, আমরা এখানে মজা দেখতে আসিনি, বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছি।

মাধববাবু বললেন, আমরা ভেবেছিলুম, আপনি যখন এসেছেন, চোর ধরা পড়তে দেরি লাগবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, পুলিশ যদি চোরকে ধরতে পারে তাহলে দেখবেন, চোর আপনার মতো মাথায় ছ'ফুট উঁচু নয়।

মাধববাবু সবিস্ময়ে বললেন, বলেন কী? কেমন করে জানলেন?

—সে কথা বলবার সময় হবে না। ওই পুলিশ এসে পড়েছে!

॥ পাঁচ ॥

ইনস্পেকটার হরিহরবাবু একজন সহকারীকে নিয়ে গট গট করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। বয়সে প্রৌঢ়, মোটাসোটা দেহ, মুখে উদ্ধত ভাব।

রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, ঘরে এত ভিড় কেন? বাড়ির কর্তা কে?

তিনকড়ি এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে আমি।

—আপনারই টাকা চুরি গিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁরা কে?

—এঁরা আমার বন্ধু। আর উনি হচ্ছেন বিখ্যাত শৌখিন গোয়েন্দা জয়ন্তবাবু।

কৌতূহলী চোখে হরিহর একবার জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। তারপর বললেন, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে মাঝে মাঝে আপনি কোনও কোনও মামলায় সাহায্য করেন।

জয়ন্ত বিনীত ভাবে বললে, আজ্ঞে, ঠিক সাহায্য করি বলতে পারি না, তবে সাহায্য করবার চেষ্টা করি বটে।

মুখ টিপে হেসে হরিহর বললেন, এখানেও কি সেই চেষ্টা করতে এসেছেন?

—আজ্ঞে না, মশায়ের চেহারা দেখেই বুঝেছি, আপনার কাছে আমার চেষ্টা নগণ্য।

—ঠিক। সুন্দরবাবুর সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার মত হচ্ছে, শখের গোয়েন্দার কাছে পেশাদার গোয়েন্দার শেখবার কিছুই নেই।

জয়ন্ত বললে, আপনার মত অভ্রান্ত। আমিও ওই মত মানি।

হরিহর বললেন, এইবার মামলার বৃত্তান্তটা আমি শুনতে চাই।

তিনকড়ি আবার সব কথা বলে গেলেন একে একে।

হরিহর সব শুনে বললেন, যে লোক এই বাজারে বিশ হাজার টাকা রাখে বৈঠকখানার কেতাবের আলমারিতে, তাকেই আমি অপরাধী বলে মনে করি। এ হচ্ছে চোরকে নিমন্ত্রণ করা আর খামকা পুলিশের কাজ বাড়ানো।

তিনকড়ি চুপ করে রইলেন কাঁচুমাচু মুখে।

জয়ন্ত বললে, টাকা ছিল ওই আলমারির ভিতরে।

হরিহর বললেন, টাকা যখন লোপাট হয়েছে, তখন আলমারিটা হাতড়ে আর কোনও লাভ হবে না।

—ওই যে চেয়ারখানা আলমারির সামনে উলটে পড়ে রয়েছে, ওখানা ছিল ওই টেবিলের সামনে।

—বসবার জন্যে চোর ওখানা টেনে এনেছিল আর কী!

—হতেও পারে, না হতেও পারে।

—না হতেও পারে কেন?

—চোর চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়তে চায়। সে চেয়ার পেতে বসে বিশ্রাম করে না। আর করলেও সে টেবিলের সামনেই গিয়ে বসতে পারত, চেয়ারখানা এত দূরে টেনে আনত না। বিশ্রাম করবার জন্যে এখানে ঢালা বিছানাও রয়েছে, তবে চেয়ার নিয়ে টানাটানি কেন?

হরিহর ঠাট্টার সুরে বললেন, কেন? তার জবাব আপনিই দিন না!

—আপনি না পারলে পরে আমাকেই জবাব দিতে হবে বই কি!

হরিহর মুখ ভার করে বললেন, আপনার জবাব শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তিনকড়িবাবু, আলমারির কলে একটা চাবি লাগানো রয়েছে দেখছি।

—ও চাবি আমার নয়।

—চোরের?

—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চাবিটা নতুন।

—আলমারিটা খোলবার জন্যে চোর হয়তো এই চাবিটা গড়িয়েছিল।

—তাহলে সে আগে এখানে এসে লুকিয়ে কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছে!

—তাই তো জয়ন্তবাবু বললেন, এ কোনও সন্ধানী চোরের কাজ।

—জয়ন্তবাবু না বললেও এটুকু আমি বুঝতে পারতুম। তিনকড়িবাবু, আপনার বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছে?

—আমার স্ত্রী। আমার ছেলে নেই, কেবল একটি বিবাহিত মেয়ে আছে। সে শ্বশুরবাড়িতে। এখানে একজন রাত-দিনের চাকর আছে। বামুন আর ঝি ঠিকে।

হরিহর ফিরে নিজের সহকারীকে বললেন, সুশীল, বামুন আর চাকরকে সেপাইদের হেপাজতে রেখে এসো।

তিনকড়ি বললেন, আপনি কি তাদের সন্দেহ করছেন? তারা যে খুব বিশ্বাসী।

হরিহর ধমক দিয়ে বললেন, আরে রাখুন মশাই! জানেন তো সব! এরকম বেশির ভাগ চুরির জন্যেই দায়ী গৃহস্থের বামুন-চাকররা। যাও সুশীল।

জয়ন্ত বললে, চোর ওই গরাদ খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে।

হরিহর উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। খোলা গরাদটা হাতে করে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন, এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

—না। কিন্তু জানালার বাইরে কর্দমাক্ত জমির উপরে চোরের পায়ের ছাপ আছে।

—বটে, বটে! সেগুলো তো দেখতে হয়!

—গরাদ-খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে ছাপগুলো আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

প্রবল মস্তকান্দোলন করে হরিহর বললেন, মোটেই নয়, মোটেই নয়। ওইটুকু ফাঁক দিয়ে কিছুতেই আমার গতর গলবে না। আমার দেহ গলবার জন্যে দরকার একটা গোটা দরজার ফাঁক। তিনকড়িবাবু, ওই জমিতে যাবার অন্য পথ আছে তো?

আছে। আসুন। এই বলে তিনকড়ি অগ্রবর্তী হলেন।

যদুবাবু চুপিচুপি বললেন, জয়ন্তবাবু, একটা আরজি জানাতে পারি?

জয়ন্ত বললে, নিশ্চয় পারেন।

—আমি গোয়েন্দার গল্প পড়তে ভারী ভালোবাসি। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করেন তা কখনও দেখিনি। শুনেছি, পায়ের ছাপ দেখে গোয়েন্দারা অনেক কথাই বলতে পারেন। আপনাদের কাজ দেখবার জন্যে আমার বড়ো আগ্রহ হচ্ছে।

—বেশ তো, আসুন না।

মাধববাবু বললেন, আমাদেরও আগ্রহ কম নয়। আমরাও যেতে পারি কি?

জয়ন্ত বললে, আপনারা সবাই আসুন।

॥ ছয় ॥

ছোটো একফালি জমি—লম্বায় পঁচিশ হাত, চওড়ায় আট হাত। দক্ষিণ দিকে বাঁশের বেড়া, তারপর রাজপথ।

হরিহরের আগেই জয়ন্ত সেই জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল—তার পিছনে পিছনে যদুবাবু এবং আর সবাই।

জমির সব জায়গাই তখনও ভিজে রয়েছে। জয়ন্ত বললে, যদুবাবু, আমার পাশে পাশে আসুন। মাটির উপরে সাবধানে পা ফেলুন, চোরের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে ফেললে হরিহরবাবু মহা খাপ্পা হয়ে উঠবেন।

তারা তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার গরাদে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, মাটির উপরে ওই দেখুন চোরের পায়ের ছাপ। বেশ বোঝা যায়, সে বাঁশের বেড়া টপকে যেদিক থেকে এসেছে, আবার চলে গিয়েছে সেই দিকেই।

যদুবাবু বললেন, চোরটা কী বোকা! এতবড়ো একটা সূত্র পিছনে রেখে গিয়েছে।

জয়ন্ত হেসে বললে, চোরটা হচ্ছে কাঁচা, নইলে সে সাবধান হত।

এমন সময়ে তিনকড়ি প্রভৃতিকে নিয়ে হরিহর এসে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পায়ের ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনকড়ি বললেন, জুতো-পরা পায়ের ছাপ। হরিহরবাবু, আমার বামুন আর চাকর জুতো পরে না।

হরিহর বললেন, হয়তো বাইরের চোরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। রুলের গুঁতো খেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝলেন?

—যা বোঝবার তা বুঝেছি। আপনাকে বলব কেন?

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, বেশ আপনি কী বুঝেছেন জানতে চাই না। কিন্তু আমি যা বুঝেছি, বলব কি?

হরিহর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, বলতে ইচ্ছা করেন, বলতে পারেন। আমার শোনবার আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত বললে, প্রত্যেক পায়ের দাগের মাঝখানকার ব্যবধানটা লক্ষ করুন। এটা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, ঢ্যাঙা লোক পা ফেলে বেশি তফাতে তফাতে আর খাটো লোক পা ফেলে কম তফাতে তফাতে। এখানে পায়ের দাগের ব্যবধান দেখে কী মনে হয়?

হরিহর মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এগুলো নিশ্চয় কোনও ছোটো ছেলে—অর্থাৎ বালকের পায়ের ছাপ!

—ধরলুম তাই। এইবারে তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার দৃশ্যের কথা ভেবে দেখুন। তাঁর নোটগুলো ছিল আলমারির উপর তাকে। মাথায় ছোটো চোরের হাত উঁচুতে পৌঁছয়নি। তাই সে টেবিলের সামনে থেকে চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নোটগুলো হস্তগত করে। তারপর তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে তার গায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারখানা উলটে পড়ে যায়। এ ব্যাপারটা গোড়াতেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। এদিকে আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। কিন্তু অধীনের কথা আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতে রাজি হননি।

অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হরিহর।

তিনকড়ি বললেন, বালক চোর? কী আশ্চর্য।

যদুবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, একটা পুঁচকে ছোকরা বিশ হাজার টাকা হাতিয়ে লম্বা দিয়েছে! আজব কাণ্ড!

মাধববাবু বললেন, কালে কালে হল কী?

॥ সাত ॥

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, এই জুতো পরা পায়ের ছাপের আর-একটা বিশেষত্ব লক্ষ করুন। চোর যে জুতো পরে এখানে এসেছিল, তার ডান পাটির তলায় বাঁ-দিকের উপর কোণের চামড়ার খানিকটা চাকলা উঠে গিয়েছে। এই দেখুন, প্রত্যেক ডান পায়ের ছাপেই তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

হরিহরের মুখের উপর থেকে মুরুব্বিয়ানার ভাব মিলিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, তাই তো বটে, তাই তো বটে! তাকে পেলে তার বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে আর কোনও কষ্ট হবে না। তারপরেই একটু থেমে, মুষড়ে পড়ে তিনি আবার বললেন, কিন্তু তাকে আর পাব কি?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, চোর নিজেই আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে।

হরিহর সচমকে শুধোলেন, কী বললেন?

—চোরের খোঁজ আমি পেয়েছি।

—কোথায়, কোথায়?

—এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। এই পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝছেন?

—এও তো চোরেরই পায়ের ছাপ।

—কোনও তফাত নেই তো?

ভালো করে দেখে সন্দিগ্ধ স্বরে হরিহর বললেন, মনে হচ্ছে এ ছাপ যেন টাটকা।

জয়ন্ত বললে, ঠিক তাই। এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এইমাত্র। নির্বোধ চোর খেয়ালে আনেনি, কাল রাতের বিষম বৃষ্টির জন্যে মাটি এখনও ভিজে আছে।....আরে, আরে যদুবাবু, খরগোশের মতো দৌড়ে কোথা যান? মানিক, হুঁশিয়ার!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, যদুবাবুর বামনাবতারের মতো অতিখর্ব দেহখানি দৌড় মেরেছে তীব্র বেগে বাঁশের বেড়ার দিকে। কিন্তু বেড়া টপকাবার আগেই মানিক তাঁকে ছুটে গিয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললে।

তিনকড়ি বিস্মিত স্বরে বললেন, যদু, তুমি কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

জয়ন্ত বললে, পুলিশের ভয়ে। এখনই ওঁর বাড়ি খানাতল্লাশ করলে আপনার বিশ হাজার টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

তিনকড়ি এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফ্যালফ্যাল করে যদুবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

জয়ন্ত বললে, যখন চেয়ারের রহস্য আন্দাজ করলুম, পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলুম, আর স্বচক্ষে যদুবাবুর বালকের মতো খাটো মূর্তিখানি দর্শন করলুম, তখনই জেগে উঠেছিল আমার সন্দেহ। ওঁর আর তিনকড়িবাবুর সামনাসামনি বাড়ি। তিনকড়িবাবু যে বাড়িতে বিশ হাজার টাকা এনে রেখেছেন, ওঁর পক্ষে একথা জানা খুবই স্বাভাবিক। ওঁর বন্ধু যখন মাঝে মাঝে আলমারির ভিতর থেকে নোটগুলো বার করতেন, তখন সে দৃশ্য তিনি যে নিজের বাড়ি থেকেই দেখতে পেতেন, এইটুকুও অনুমান করা যায় খুবই সহজেই। বৈঠকখানায় ছিল তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া। আলমারির কলের ছাঁচ তোলবার অবসর পেতে পারেন উনিই। সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য। তবে এ কথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণির নির্বোধের মতো আজ যেচে ভিজে মাটি মাড়িয়ে উনি যদি আমার ফাঁদে পা না দিতেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি ওঁকে হরিহরবাবুর কবলে আত্মসমর্পণ করতে হত না।

হ্যাঁ, ভালো কথা। যদুবাবুর ডানপাটির জুতোর তলাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে ভালো হয়।

পরীক্ষার ফল হল সন্তোষজনক। জুতোর তলায় যথাস্থানে ছিঁড়ে গিয়েছে খানিকটা চামড়া।

জয়ন্ত বললে, মানিক, এখন শেষকৃত্যের ভার পুলিশের হাতে সমর্পণ করে চলো আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি। কিন্তু যাবার আগে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। হরিহরবাবু, শখের গোয়েন্দারা কি একেবারেই ঘৃণ্য জীব?

হরিহর অনুতপ্ত স্বরে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমার চোখ ফুটল।

আমার গোয়েন্দাগিরি

রবিবারে রবিবারে প্রশান্তবাবুর বৈঠকখানায় বসত একটি তাস-দাবা-পাশার আসর। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়ার পর সভ্যরা একে একে সেখানে গিয়ে দেখা দিতেন। তারপর খেলা চলত প্রায় বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতুম আমিও। তাস বা পাশার দিকে মোটেই ঘেঁসতুম না, কিন্তু দাবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। ওখানে জন-তিনেক পাকা দাবা খেলোয়াড় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আমি করতুম শক্তি পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য, খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত। বাজারে মাছের দর ও বক্তৃতা মঞ্চে চড়ে জহরলাল নেহরুর লম্পঝম্প, গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা ও বিলাতি পার্লামেন্টে চার্চিলের বাক্যবন্দুকনিনাদ, বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেতা শিশির ভাদুড়ি ও পণ্ডিচারি আশ্রমের ঋষি অরবিন্দ—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনও কিছুই বাদ থাকত না আমাদের উত্তপ্ত আলোচনার বাইরে।

সেদিন তখনও খেলা শুরু হয়নি, এমন সময়ে পুলিশ কোর্টের একটা মামলার কথা উঠল। সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটে নরহত্যা হয়েছিল এবং ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু কেসটা হাতে নিয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে আসামিকে আদালতে হাজির করেছেন।

একজন শুধোলেন, মানিকবাবু, এ মামলাতেও আপনাদের হাত আছে তো?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললুম, তার মানে?

—লোকে তো বলে, সুন্দরবাবুর সব মামলার পিছনে থাকেন আপনি আর আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবু।

—লোকের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। অবশ্য কোনও কোনও মামলায় সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন বটে। পরে সেসব ক্ষেত্রে জয়ন্তই হয় আসল পরামর্শদাতা, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে হাজির থাকি মাত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে জিজ্ঞাসা শুনলুম, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে সঙ্গে এতদিন থেকে গোয়েন্দাগিরিতেও আপনার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তো?

ফিরে দেখি নরেন্দ্রবাবু—সুবিখ্যাত ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন। বিলাত ফেরত। যেমন তাঁর হাতযশ, তেমনি তাঁর পশার। তাঁর আয়ের পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। পাশের বাড়িতেই থাকেন। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়বার জন্যে এই আসরে উঁকিঝুঁকি মারতে আসেন।

নরেনবাবু আবার শুধোলেন, জয়ন্তবাবুর পার্শ্বচর হয়ে গোয়েন্দাগিরিতে আপনারও কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি জন্মেছে তো?

আমি হেসে বললুম, হ্যাঁ নরেনবাবু, জয়ন্তের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সাধারণ লোকের চেয়ে আমি কিছু বেশি জ্ঞান অর্জন করেছি বই কি।

নরেনবাবু একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, তাহলে ছোট্ট একটি মামলার কথা শুনবেন?

আমি বললুম, আমার বন্ধু জয়ন্তের মতে গোয়েন্দাগিরিতে ছোটো বা বড়ো মামলা বলে কোনও কথা নেই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হচ্ছে, মামলাটা চিত্তাকর্ষক কি না? এই দেখুন না, পুলিশকোর্টের যে মামলা নিয়ে আজ গোয়েন্দাগিরির কথা উঠেছে, একদিক দিয়ে সেটা বড়ো যে-সে মামলা নয়। একসঙ্গে তিন-তিনটে খুন! কিন্তু অপরাধী ঘটনাক্ষেত্রে এত সূত্র রেখে গিয়েছিল যে ধরা পড়েছে অতি সহজে। আসলে একেই বলে ছোটো মামলা। কারণ এটা চিত্তাকর্ষক নয়, এর মধ্যে মস্তিষ্কের খেলাও নেই। আবার এমন সব মামলাও আছে, যেখানে অপরাধ হয়তো তুচ্ছ, অথচ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার মতো সূত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এমন সব মামলাতে সফল হলেই গোয়েন্দার প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

নরেনবাবু বললেন, আমি যদি ওই রকম কোনও মামলারই ভার আপনার হাতে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি?

বললুম, আমার আপত্তি নেই। মনে মনে ভাবলুম, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না, জয়ন্তের কোনও সাহায্য না নিয়েই নিজের বুদ্ধির জোরে মামলাটার কিনারা করতে পারি কি না!

ঘরের অন্যান্য লোকেরা প্রশ্ন করতে লাগলেন, কীসের মামলা ডাক্তারবাবু? খুনের না চুরির, না আর কিছুর?

নরেনবাবু বললেন, এখন আমি কোনও কথাই ভাঙব না, আসুন মানিকবাবু, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন।

॥ দুই ॥

নরেনবাবুর বাড়ি। একখানা মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে দেওয়াল ঘেঁসে একখানা গদি মোড়া বড়ো চেয়ার, তার সামনে একটি টেবিল। টেবিলের উপরে দোয়াতদানে লাল ও কালো কালির দোয়াত। কলমদানে দুটি কলম। ব্লটিংয়ের প্যাড—তার উপরে খানিকটা অংশ লাল কালি মাখা। একটি টেলিফোন যন্ত্র। টেবিলের তিন পাশে খানকয়েক কাঠের চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একখানা অ্যালম্যানাক ছাড়া আর কোনও ছবি নেই। মেঝে মার্বেল পাথরের। কোনওরকম বাহুল্য বর্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

এইসব লক্ষ করছি, নরেনবাবু বললেন, এই ঘরে বসে প্রত্যহ সকালে আর সন্ধ্যায়

আমি রোগীদের সঙ্গে দেখা করি। পরশু সন্ধ্যায় এইখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

—কী রকম ঘটনা?

—মোহনতোষবাবুর এক বন্ধুর নাম বিনোদবাবু। বিনোদলাল চ্যাটার্জি। ভদ্রলোক কন্যাদায়ে পড়েছিলেন। মোহনতোষবাবুর বিশেষ অনুরোধ তাঁকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলুন।

—মোহনতোষবাবু কে?

—তিনি আমার প্রতিবেশীও বটে, রোগীও বটে। কিন্তু তাঁর একটা বড়ো পরিচয় আছে। আপনি কি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত অভিনেতা মোহনতোষ চৌধুরির নাম শোনেননি?

—কারুর কারুর মুখে শুনেছি বটে।

—তাঁর কথাই বলছি।

—তারপর?

—পরশু সন্ধ্যার সময়ে আমি এই ঘরে বসে আছি, এমন সময়ে বিনোদবাবু এসে তাঁর ঋণ পরিশোধ করে গেলেন। পাঁচখানি হাজার টাকার নোট।* ঠিক তারই মিনিট পাঁচেক পরে ফোনে একটা অত্যন্ত জরুরি ডাক এল। বসন্তপুরের মহারাজা বাহাদুর ব্লাডপ্রেসারের দরুন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, আমাকে সেই মুহূর্তেই যেতে হবে। তখনই যাত্রা করলুম। তাড়াতাড়িতে যাবার সময়ে নোট পাঁচখানা ব্লটিংয়ের প্যাডের তলায় ঢুকিয়ে রেখে গেলুম। রাজবাড়ি থেকে যখন ফিরে এলুম রাত তখন সাড়ে ন-টা। এসে এই ঘরে ঢুকে দেখি, প্যাডের উপর লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে রয়েছে আর প্যাডের তলা থেকে অদৃশ্য হয়েছে হাজার টাকার নোট পাঁচখানা।

আমি বললুম, নিশ্চয় প্যাডের তলা থেকে যখন নোটগুলি টেনে নিচ্ছিল, সেই সময়ে দৈবগতিকে তার হাত লেগে লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে গিয়েছিল।

—খুব সম্ভব তাই।

—কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়?

—বিশেষ কারুর উপর নয়।

—পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

—না।

—কেন?

—কেলেঙ্কারির ভয়ে। আমি বেশ জানি পুলিশ এসে আমার বাড়ির লোকদেরই

---

*তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট অপ্রচলিত হয়নি।

টানাটানি করবে। আমার পক্ষে সেটা অসহনীয়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ির কোনও লোকের দ্বারা এ কাজ হয়নি—হতে পারে না। অন্দরমহলে থাকেন আমার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, আমার দুই বালিকা কন্যা আর শিশুপুত্র। তাদের কারুরই এ ঘরে আসবার কথা নয়। বাড়ির প্রত্যেক দাসদাসী পুরাতন আর বিশ্বস্ত। নোটগুলো যখন প্যাডের তলায় রাখি, তখন তাদের কেউ যে এ অঞ্চলে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। সুতরাং তাদের কেউ প্যাড তুলে দেখতে যাবে কেন?

—বাইরের কোনও জায়গা থেকে কেউ কি আপনার কার্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রাখতে পারে না?

—মানিকবাবু, পরশু দিন সন্ধ্যার আগেই এই দুর্দান্ত শীতেও হঠাৎ বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে কি? দেখুন, এই ঘরের উত্তর দিকে আছে চারটে জানলা আর পূর্ব দিকে আছে দুটো জানলা আর দুটো দরজা। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক একেবারে বন্ধ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তরের জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে এই দরজা দেখা যায় বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে উত্তর দিকের সব জানলাই বন্ধ ছিল। খোলা ছিল খালি পূর্ব দিকের জানলা-দরজা। ওদিকে আছে আমার বাড়ির উঠান, তারপর বারো ফুট উঁচু পাঁচিল, তারপর মোহনতোষবাবুর বাড়ি। আমার বাড়ির উঠানে আলো জ্বলছিল, আমি সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পাইনি। বৃষ্টি আর শীতের জন্যে মোহনতোষবাবুর বাড়ির জানলাগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল, নইলে ও বাড়ির ঘরের আলোগুলো আমার চোখে পড়ত। সেদিন আমি কী করছি না করছি, কেউ তা দেখতে পায়নি।

—আপনি রাজবাড়িতে গেলে পর সেদিন অন্য কোনও রোগীর বাড়ি থেকে আর কেউ কি আপনাকে ডাকতে আসেনি?

—এসেছিল বই কি! হরিচরণের মুখে শুনেছি, পাঁচজন এসেছিল।

—হরিচরণ কে?

—সে বালক বয়স থেকেই এ বাড়িতে কাজ করে, এমন বিশ্বাসী আর সৎলোক আমি জীবনে আর দেখিনি। আমার সমস্ত আলমারি দেরাজ বাক্সের চাবি থাকে তার হাতে, আমার সমস্ত টাকা সেই-ই ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে, তাকে না হলে আমার চলে না। আমার অবর্তমানে সেই-ই বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়।

—হরিচরণ কী বলে?

—সেদিন পাঁচজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন লোক আমি নেই শুনেই চলে যায়, একজন লোক ঠিকানা রেখে আমাকে কল দিয়ে যায়, কেবল একজন লোক বলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। হরিচরণ তখন তাকে এই ঘরে এনে বসিয়ে নিজের অন্য কাজে চলে যায়। কিন্তু মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে লোকটিকে

সে আর দেখতে পায়নি। তবে এ জন্যে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। কারণ এখানে কোনও মূল্যবান জিনিসই থাকে না, আর বাইরের লোকের আনাগোনার জন্যে এ ঘরটা সর্বদাই খোলা পড়ে থাকে। হরিচরণের বিশ্বাস, আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে লোকটি আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিল।

—সে নাম-ধাম কিছু রেখে যায়নি?

—না।

—তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন?

—পেয়েছি। তার দোহারা চেহারা, শ্যাম বর্ণ, দেহ দীর্ঘ। শীতের জন্যে সে মাথা থেকে প্রায় সমস্ত দেহটাই ঢেকে আলোয়ান জড়িয়ে রেখেছিল, দেখা যাচ্ছিল কেবল তার মুখখানা। তার চোখে ছিল কালো চশমা, মুখে ছিল কাঁচা-পাকা গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না।

—লোকটির চেহারার বর্ণনা কিছু অসাধারণ। আপনার কি তারই উপর সন্দেহ হয়?

—মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, কোনও একজন বাইরের লোক আমার ঘরে এসে হঠাৎ টেবিলের প্যাডখানা তুলে দেখতে যাবে কেন? এ-রকম কৌতূহল অস্বাভাবিক নয় কি?

আমি নিরুত্তর হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম। জয়ন্ত বলে, কোনও নূতন মামলা হাতে পেলে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। কিন্তু খানিকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর আমার সন্দেহ ঘনিভূত হয়ে উঠল, দুইজন লোকের উপরে। কে ওই আলোয়ান মুড়ি দেওয়া কালো চশমাপরা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা রহস্যময় আগন্তুক? নরেনবাবুর প্রস্থানের পরেই ঘটনা ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব এবং কেমন করেই বা জানতে পারলে, প্যাডের তলায় আছে পাঁচ হাজার টাকার নোট? তার মূর্তি, তার প্রবেশ ও প্রস্থান, তার কার্যকলাপ সমস্তই এমন অদ্ভুত যে যুক্তি প্রয়োগ করেও কিছু ধরবার বা বোঝবার উপায় নাই।

শেষটা আমি সাব্যস্ত করলুম, এতটা যুক্তিহীনতা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ওই মূর্তির কোনও অস্তিত্বই নেই, ও কাল্পনিক মূর্তি, ঘটনাক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা হয়েছে, অন্য কোনও ব্যক্তির স্বার্থের অনুরোধে।

সেই ব্যক্তি কে? নিশ্চয়ই হরিচরণ! তার সাধুতা আর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নরেনবাবুর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সার্টিফিকেট মূল্যহীন, সাধুতার আবরণে সর্বদাই নিজেদের ঢেকে রাখে বলেই অসাধুরা আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারে। আবার মানুষের মন এমন আশ্চর্য বস্তু যে, সত্যিকার সাধুও সময়ে সময়ে হঠাৎ অসাধু হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, হরিচরণ, ওই হরিচরণ! কালো চশমাপরা মূর্তিটার সৃষ্টি হয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্কের

মধ্যে। নিজে নিরাপদ হবে বলে হরিচরণই ওই রহস্যময় কাল্পনিক মূর্তিটাকে টেনে এনেছে ঘটনাক্ষেত্রে। অতএব—

অতএব হরিচরণকে ডেকে এনে খানিক নাড়াচাড়া করলেই পাওয়া যাবে মামলার মূল সূত্র।

॥ তিন ॥

ঠিক এই সময়েই ঘরের বাইরে ডাক শুনলুম—মানিক, অ মানিক! তুমি এখানে আছ নাকি?

এ জয়ন্তের কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, উঠানের রোয়াকের উপরে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

—ব্যাপার কী! তুমি কোত্থেকে

—তোমার রবিবাসরীয় আড্ডায় গিয়েছিলুম তোমাকে অন্বেষণ করতে কিন্তু সেখানে গিয়ে খবর পেলুম তোমার আজকের আসর এইখানে।

নরেনবাবুর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় করিয়ে দিলুম। তিনি তাকে সাদরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, ডাক্তারবাবু, আপনি হঠাৎ আমার মানিক অপহরণ করেছেন কেন?

—আজ্ঞে, মানিকবাবুর হাতে আমি একটা মামলার ভার অর্পণ করেছি।

—বটে, বটে, বটে! মানিকও তাহলে আজকাল স্বাধীনভাবে গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়! বেশ, বেশ উন্নতিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

আমি একটু লজ্জিত ভাবে বললুম, না ভাই জয়ন্ত, আমি তোমার উপযুক্ত শিষ্য হতে পেরেছি কি না, সেইটেই আমি আজ পরীক্ষা করতে এসেছি।

—দেখছেন ডাক্তারবাবু, বন্ধুবর মানিকের বিনয়েরও অভাব নেই। এ হচ্ছে আসল গুণীর লক্ষণ! তারপর মানিক, মামলাটার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ তো?

—মনে হচ্ছে পেরেছি। মামলাটার কথা তুমি শুনতে চাও?

—আপত্তি নেই।

তারপর দুই চক্ষু মুদে জয়ন্ত আমার মুখে মামলাটার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করলে। সেই কালো চশমাধারী মূর্তি ও হরিচরণ সম্বন্ধে আমার মতামতও তাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখতে ভুললুম না।

জয়ন্ত চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়ে, তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব

চেয়ারের উপর বসে পড়ল। তারপর পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলকনেত্রে। তারপর মুখ নামিয়ে টেবিলের প্যাডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে বসে রইল প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে। তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন; কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম, তার মন এখন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু, ঘটনার দিন যখন আপনি বাইরে যান, তখন এই টেবিলের প্যাডের উপরে আর কোনও কাগজপত্র ছিল?

—না।

—তোমার বিশ্বাস ভুল।

—কী করে জানলে?

—ওই দ্যাখো প্যাডের পরে ছড়ানো লাল কালির মাঝখানে রয়েছে একটা চতুষ্কোণ (কিন্তু সমচতুষ্কোণ নয়) সাদা জায়গা। এ জায়গায় কালি লাগেনি কেন?

—ওখানে বোধহয় কোনও কাগজপত্র ছিল। কালির ধারা তার উপর দিয়েই বয়ে গেছে।

—এতক্ষণে তোমার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ খুলেছে দেখে সুখী হলুম।

নরেনবাবু বলে উঠলেন, না মশাই, সেদিন ওই প্যাডের উপরে নিশ্চয়ই কোনও কাগজপত্র ছিল না।

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলল, আপনিও ঠিক কথাই বলেছেন ডাক্তারবাবু। তবু এই সাদা অংশটার সৃষ্টি হল কেন, শুনুন। চোর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রথম প্যাডের তলা থেকে নোটগুলো বার করে নেয়। তারপর সেগুলো প্যাডের উপরেই রেখে গুনে দেখে। ঠিক সেই সময়েই তার গায়ের আলোয়ান বা অন্য কিছু লেগে লাল কালির দোয়াতটা হঠাৎ উলটে যায়।

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, তা হলে লাল কালি পড়েছিল সেই নোটগুলোর উপর?

জয়ন্ত আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু, নোটগুলোর নম্বর নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই?

—না মশাই, নম্বর টুকে নেবার সময় পাইনি। তবে বিনোদবাবুর কাছে খবর নিলে নম্বরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজকে এখনই খবর দিন। নম্বরগুলো পেলেই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন আমি বিদায় নিলুম, হয় কাল সন্ধ্যার সময়ে নয় দুই-এক দিন পরেই আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব—এটা চিত্তাকর্ষক হলেও সহজ মামলা। চলো মানিক। নমস্কার ডাক্তারবাবু!

রাস্তায় এসে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলুম, কে চোর সে-বিষয়ে তুমি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ।

জয়ন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, আমি এইটুকুই আন্দাজ করতে পেরেছি যে তুমি হচ্ছ একটি গাড়ল, একটি গর্দভ, একটি ইগ্নোমেরাস।

আমি একেবারে দমে গেলুম।

॥ চার ॥

সোমবারের সন্ধ্যা। জয়ন্তের পিছনে গুটি গুটি যাত্রা করলুম নরেনবাবুর বাড়ির দিকে। দেখছি কাল বৈকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এবং আজ সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি ছোটোখাটো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাকে দেয়নি। আজও তার মুখ এমন গম্ভীর যে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা হল না।

নরেনবাবু বসেছিলেন আমাদেরই অপেক্ষায়। সাগ্রহে শুধোলেন, কিছু খবরাখবর পেলেন নাকি!

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্ত বললে, এই নিন।

খামের ভিতর থেকে বেরুল পাঁচখানা নোট—প্রত্যেকখানা হাজার টাকার!

জয়ন্ত বললে, দেখছেন ডাক্তারবাবু! সব নোটের উপরেই কিছু না কিছু লাল কালির দাগ আছে। একখানা নোটে একদিকের প্রায় সবটাই লাল কালিমাখা—একখানা ছিল সব উপরে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে নরেনবাবু প্রায় আধ মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, নোটগুলোর উপরে লাল কালির দাগ এতটা ফিকে কেন?

—চোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

—কিন্তু চোর কে?

জয়ন্ত বললে, ক্ষমা করবেন, চোরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তার নাম প্রকাশ করব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, সে আপনার বাড়ির লোক নয়। ভবিষ্যতে সৎ পথে থাকার জন্যে আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, কারণ এটা হচ্ছে তার প্রথম অপরাধ। আজ আমরা আসি, নমস্কার!

॥ পাঁচ ॥

বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই জয়ন্ত আমার কাছেও কি তুমি চোরের নাম প্রকাশ করবে না।

জয়ন্ত হেসে বললে, নিশ্চয়ই করব। চোরের নাম মোহনতোষ চৌধুরি।

সবিস্ময়ে বললুম, তাকে তুমি কেমন করে সন্দেহ করলে?

—কেবল পূর্ব দিকের দরজা-জানলা দিয়েই সেদিন নরেনবাবুর ঘরের ভিতরটা দেখবার সুযোগ ছিল। আর নরেনবাবুর চেয়ারে বসে পূর্ব দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম কেবল মোহনতোষের বাড়ির দোতলার ঘর। এই হল আমার প্রথম সন্দেহ। তারপর সেই কালো চশমাপরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটার কথা ভাবতে লাগলুম। সে শীতের ওজরে আবার মাথা থেকে প্রায় সর্বাঙ্গে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এসেছিল। কালো চশমা, সর্বাঙ্গে আবরণ—এ সব যেন আত্মগোপনের চেষ্টা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও সন্দেহজনক। লোকটা হয়তো ছদ্মবেশের সাহায্য নিয়েছিল। কেন? পাছে হরিচরণ তাকে চিনে ফেলে, সে নিশ্চয়ই পরিচিত ব্যক্তি। তার আকস্মিক প্রস্থানও অল্প সন্দেহজনক নয়। আগেই শুনেছি, মোহনতোষ একজন অভিনেতা, তার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ আছে। এই হল আমার দ্বিতীয় সন্দেহ। তার বন্ধু বিনোদ যে ঘটনার দিনেই সন্ধ্যাবেলায় নরেনবাবুর টাকা শোধ দিতে যাবে, এটাও নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছিল। আমার তৃতীয় সন্দেহ। তারপর আমি এখানে-ওখানে ঘুরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে এই মোহনতোষ বিবাহ করেনি, বাড়িতে একাই থাকে। বাড়ির একতলা সে ভাড়া দিয়েছে। তার আরও একখানা ভাড়া বাড়ি আছে। এইসব থেকে তার মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা। ওই আয়ে তার মতো একক লোকের দিন অনায়াসে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার চলত না। কারণ সে ছিল বিষম জুয়াড়ি। বাজারে তার কয়েক হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে ছাড়েনি। এই ঋণ কতক শোধ করতে না পারলে শীঘ্রই তাকে আদালতে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানিক, সব কথা আর সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আজ আমি মোহনতোষের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এই তার প্রথম অপরাধ। আমাকে দেখেই ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর আমি তখন কীভাবে সে কার্য সিদ্ধি করেছে তার একটা প্রায় সঠিক বর্ণনা দিলুম আর জানালুম যে নোটের নম্বর আমরা পেয়েছি, এখন এই কালিমাখা নোটগুলো ভাঙাতে গেলেই বিপদ অনিবার্য, তখন সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

তার নিজের মুখেই শুনলুম, কোনওরকম চুরি করবার ইচ্ছাই তার ছিল না, জীবনে কখনও চুরি-চামারি করেওনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে তার অত্যন্ত মাথা ধরেছিল, ঘরের আলো নিবিয়ে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেই সে দেখতে পায় তার বন্ধু বিনোদ এসে নোটগুলো দিয়ে গেল নরেনবাবুকে আর তিনিও হঠাৎ, ফোনে ডাক পেয়ে সেগুলো প্যাডের তলায় গুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গজিয়ে উঠল সস্তায় কিস্তি মাত করবার দুর্বুদ্ধি। কিন্তু মানিক, তার প্রথম অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি।

—আর সেই সঙ্গে তুমি ব্যর্থ করে দিলে আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি। দুঃখিত ভাবে আমি বললুম।

নেতাজির ছয় মূর্তি

॥ এক ॥

অসাধারণ পাগলামি

চায়ের পালা শেষ।

জয়ন্ত বললে, মানিক অতঃপর কিংকর্তব্য। এক চাল দাবা-বোড়ে খেলবে নাকি?

—রাজি! মানিক উঠে দাবা-বোড়ের ছক আনতে গেল।

—সুন্দরবাবু কী করবেন? খেলা দেখবেন, না থানায় ফিরবেন?

—ওই ইজিচেয়ারে আরাম করে পা ছাড়িয়ে শুয়ে আমি একটা গোটা চুরুটকে ভস্মে পরিণত করব।

—হাতে বুঝি নতুন মামলা নেই?

—বিশেষ কিছু নাই।

—তবু শুনি না। ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে বললে জয়ন্ত।

—এ একটা নিতান্ত বাজে মামলা ভাই, ল্যাজা কি মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এ মামলায় গোয়েন্দা না ডেকে ডাক্তার ডাকাই উচিত।

—অর্থাৎ?

—পাগলামি আর কী? কিন্তু অদ্ভুত রকম পাগলামি। সুভাষচন্দ্র বসুকে সারা দেশ ভক্তি করে তো? কিন্তু দেশে এমন লোকও আছে, যে নেতাজির প্রতিমূর্তি দেখলেই খেপে গিয়ে আছড়ে চুরমার করে দেয়।

—ধেৎ, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত একটা বোড়ের চাল দিলে।

—হ্যাঁ, পাগলামি সারাবার জন্যে ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু কেউ যদি নেতাজির উপরে নিজের আক্রোশ মেটাবার জন্যে পরের বাড়িতে ঢুকে নেতাজির প্রতিমূর্তি চুরি করে, তাহলে পুলিশ না ডেকে উপায় থাকে না।

জয়ন্ত খেলা ভুলে সিধে হয়ে বসে বললে, মূর্তি ভাঙবার জন্যে মূর্তি চুরি? ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে! বলুন তো খুলে!

—চিৎপুর রোডে 'শিল্পশালা' বলে এক দোকান আছে, তার মালিক হচ্ছেন অনিল বসু। ওখানে বিক্রি হয় নানারকম ছবি আর মূর্তি। দোকানের এক কর্মচারী সামনের দিক ছেড়ে পেছন দিকে গিয়ে কোনও কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ একটা লোক দোকানে ঢুকে কাউন্টারের উপর থেকে নেতাজির প্রতিমূর্তি তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর এত তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে যায় যে কেউ তাকে ধরতে পারেনি। এ হচ্ছে চার দিন আগেকার কথা। দোকানের মালিক বিটের পাহারাওয়ালার কাছে অভিযোগ

করেছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! প্লাস্টারে গড়া মূর্তি, দাম দশ টাকা মাত্র—তুচ্ছ ব্যাপার!

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা। এটা কিঞ্চিৎ গুরুতর, অদ্ভুত বটে। ঘটেছে কাল রাত্রে।

ডাক্তার চক্রবর্তীর নাম শুনেছ তো? তাঁর বাসভবন হচ্ছে সিমলায়, আর ডাক্তারখানা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তিনি নেতাজির গোঁড়া ভক্ত। ওই শিল্পকলা থেকেই তিনি নেতাজির দুটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলেন। তার একটিকে রেখেছিলেন বসত বাড়িতে আর একটিকে ডাক্তার খানায়। কাল রাত্রে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে নেতাজির মূর্তি ছাড়া আর কিছুই চুরি করেনি। বাড়ির বাইরেকার বাগানে গিয়ে মূর্তিটা দেওয়ালে আছড়ে ভেঙে সে লম্বা দিয়েছে।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, আজব কাণ্ড। তিনটে মূর্তিই কি এক ছাঁচ থেকে গড়া?

—হ্যাঁ। তারপর শোনো। আজ সকালে চারুবাবু ডাক্তারখানায় ঢুকে দেখেন, সেখানেও কাল রাত্রে কে এসে নেতাজির মূর্তি নিয়ে ভেঙেছে আর মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তার ভাঙা টুকরোগুলো! এই তো ব্যাপার, জয়ন্ত! এ কীরকম মামলা ভায়া?

—কেবল অদ্ভুত নয়, সৃষ্টিছাড়া বলাও চলে। কিন্তু লোকটা যদি পাগল হয়, তাহলে তার পাগলামির ভিতর বেশ একটি পদ্ধতি আছে দেখছি।

—পদ্ধতি?

—হ্যাঁ! চারুবাবুর বাড়ি থেকে মূর্তিটা সে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল পাছে মূর্তি ভাঙার শব্দে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে! ডাক্তারখানায় অন্য লোকের ভয় নেই, তাই মূর্তিটা ভাঙা হয়েছে ঘরের ভিতরেই। ঘটনাগুলো আপাতত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু জানেন তো সুন্দরবাবু গোয়েন্দার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুই। আমি একবার ঘটনাস্থলে একগাছা ভাঙা লাঠি পেয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলুম। যাক সে কথা। এই পাগল আবার যদি কোনও কাণ্ড করে আমাকে জানাবেন। এখন আপনি খান চুরুট, আমরা খেলি দাবা-বোড়ে।

॥ দুই ॥

হারাধনবাবুর দগ্ধাদৃষ্ট

নতুন ঘটনা ঘটতে দেরি লাগল না।

পরদিন প্রভাত। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শুনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবু বলেছেন: শিগগির এসো। পনেরো নম্বর পঞ্চানন পাল স্ট্রিটে।

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে মানিকের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, চটপট চুমুক দিয়ে চা শেষ করো। সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ এসেছে।

—ব্যাপারটি কী?

—ঠিক বোঝা গেল না। খুব সম্ভব সেই মূর্তি ধ্বংসকারী উন্মত্তের নতুন কীর্তি।

পঞ্চানন পাল স্ট্রিটের পনেরো নম্বর হচ্ছে একখানা সাধারণ বাড়ি, দরজার সামনে রাস্তার উপরে কৌতূহলী জনতা।

জয়ন্ত বললে, এত ভিড় কেন? নিশ্চয় যা তা ব্যাপার নয়। ওই যে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরবাবুর। কী মশাই খবর কী?

সুন্দরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন বাড়ির ভিতরে এসো।

বৈঠকখানায় বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত।

সুন্দরবাবু বললেন, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত রিপোর্টার হারাধনবাবু। তোমাদের পরিচয় আর দিতে হবে না, ইনি তোমাদের চেনেন।

—জরুরি তলব করেছেন কেন?

—হুম, আবার সেই নেতাজির মূর্তির মামলা।

—আবার নতুন কোনও মূর্তিভঙ্গ হয়েছে?

—আবার মূর্তিভঙ্গের উপর হত্যাকাণ্ড! হারাধনবাবু ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

বিরসবদনে হারাধনবাবু বললেন, এ যেন প্রকৃতির নির্দয় পরিহাস। পরের খবর সংগ্রহ করতে করতে সারাজীবন কাটিয়ে দিলুম, আর আমার নিজের বাড়ির এত বড়ো খবরটা নিয়ে কাগজে পাঠাতে পারছি না, আমার মাথা এমন ভয়ানক গুলিয়ে গিয়েছে। বাইরের রিপোর্টারের মতন আমি যদি এখানে আসতুম, প্রত্যেক কাগজের জন্য অন্তত দু-কলম করে খবর পাঠাতে পারতুম। তা তো হলই না, উলটে এর ওর তার কাছে বারবার বলে খবর ক্রমেই বাসি করে ফেলছি। তবে আপনার কথা আলাদা জয়ন্তবাবু। আপনি যদি সব শুনে এই অদ্ভুত রহস্যের কোনও হদিস দিতে পারেন তবে আমার মস্ত লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত চুপ করে শুনলে, কিছু বললে না।

হারাধনবাবু বললেন, মাস চারেক আগে শ্যামবাজারের লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে আমি নেতাজির একটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলাম। মনে হচ্ছে সেই মূর্তির জন্যেই এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা। বাড়ির সব উপরকার ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়, কালও করছিলুম।

গভীর রাতে বাড়ির একতলায় একটা যেন শব্দ হল। খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিন্তু আর কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলুম, শব্দটা এসেছে বাড়ির বাহিরে থেকেই। মিনিট-পাঁচেক কাটল। তারপর বিষম এক আর্তনাদ। জয়ন্তবাবু অমন ভয়াবহ আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তার স্মৃতি জীবনে আর কোনওদিন ভুলতে পারব না, ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দু-এক মিনিট চুপ করে বসে রইলুম তারপর একগাছা লাঠি নিয়ে নীচে নেমে

এলুম। বৈঠকখানায়—অর্থাৎ এই ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের উপর থেকে, অদৃশ্য হয়েছে নেতাজির প্রতিমূর্তিটা! সব ফেলে এই কম দামি জিনিসটা নিয়ে গিয়ে চোরের কী লাভ হবে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় নজর পড়ল, বৈঠকখানা থেকে রাস্তার দিকে যাবার দরজাটা রয়েছে খোলা। এই পথ দিয়েই চোর পালিয়েছে বুঝে আমিও অগ্রসর হলুম। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, হঠাৎ একটা দেহের উপর ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম কোনও গতিকে। দেহটার অস্বাভাবিক স্পর্শ পেয়েই বুঝলুম, সে হচ্ছে মৃতদেহ!

দৌড়ে বাড়িতে এসে একটা লণ্ঠন নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি যেন রক্ত-নদীর ভিতর ভাসছে একটা মানুষের মৃতদেহ, গলার উপরে তার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। চিত হয়ে সে পড়ে আছে, হাঁটুদুটো গুটানো, মুখটা বিশ্রী ভাবে হাঁ করা! মশাই, এবার থেকে রোজ সে বোধ হয় স্বপ্নে আমাকে দেখা দেবে। পুলিশ, পুলিশ! বলে বারকয়েক চিৎকার করে আমি তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম। তারপর কী হয়েছিল জানি না, কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান আসায় দেখলুম আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এক পাহারাওয়ালা।

সব শুনে জয়ন্ত বললে, কিন্তু মৃতদেহটা কার?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। লাশটা শবাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে। এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। লোকটা বেশ ঢ্যাঙা-ঢোঙা, গায়ের রং রোদে-পোড়া, দেখতে রীতিমতো জোয়ান, বয়স ত্রিশের বেশি নয়। পরনে তার গরিবের কাপড়, কিন্তু তাকে শ্রমিক বলে মনে হয় না। তার পাশে রক্তের ভিতরে পড়েছিল একখানা চাকু ছুরি—সেখানা তার নিজের না হত্যাকারীর তা জানবার উপায় নেই। তার জামার পকেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে সস্তায় তোলা একখানা ফোটোগ্রাফ। এই দ্যাখো।

কর্কটের মতন একটা মূর্তির ছবি, চেহারা দেখলে কার্তিক বলে ভ্রম হয় না। মুখ যেন বেবুনের মতো। পুরু পুরু ভুরু।

ফটোখানা ভালো করে পরীক্ষা করে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে নেতাজি মূর্তির খবর কী?

—তোমার আসবার একটু আগে সে খবর পেয়েছি। এখান থেকে খানিক তফাতে মনোমোহন রোডে একখানা খালি বাড়ির সামনেকার বাগানে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমিও আসবে নাকি?

—নিশ্চয়! হারাধনবাবু কি তাঁর সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ দেখতে চান? হারাধনবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, সময় নেই মশাই, সময় নেই। এই হত্যাকাণ্ডের খবর এতক্ষণে নিশ্চয় অন্য অন্য রিপোর্টারদের হাতে গিয়ে পড়েছে, অথচ আমার বাড়িতে খুন, আর আমি কিছু লিখতে পারলুম না। হায়রে, এমনি আমার দগ্ধাদৃষ্ট।

॥ তিন ॥

হিরালাল

যে-মহামানুষকে নিয়ে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিস্ময়কর আন্দোলনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকার ভাই বলে মেনে নিয়েছিল এবং যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে বাধা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁরই খণ্ড-বিখণ্ড প্রতিমূর্তির স্বাভাবিক পরিণাম দেখে জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর সে ভগ্নমূর্তির এক-একটা টুকরো একে একে কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল।

তার মুখ দেখেই মানিক বুঝতে পারল যে এতক্ষণ পরে জয়ন্ত একটা না একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

জয়ন্ত বললে, স্পষ্ট গন্ধ পেতে এখনও দেরি আছে কিন্তু তবু—তবু—তবু—হ্যাঁ, একটু আলোর আভাস পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে যেন। অদ্ভুত অপরাধীটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত, তার কাছে এই যৎসামান্য পুতুলের মূল্য যে-কোনও মানুষের প্রাণের চেয়েও বেশি! অথচ পুতুলটা হস্তগত করেই সে ভেঙে ফেলে!

—পাগলের পাগলামি আর কাকে বলে?

—না, তা নয় সুন্দরবাবু। একটা মস্ত কথা ভেবে দেখুন। মূর্তিটা সে হারাধনবাবুর বাড়ির ভিতরেও ভাঙেনি, বাইরেও ভাঙেনি, ভেঙেছে এত দূরে এসে—অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিটা হাতে পেলে ভেঙে ফেলা।

—যে লোকটা খুন হয়েছে, সে হঠাৎ এসে পড়াতেই হয়তো মূর্তিটাকে ঘটনাস্থলে ভেঙে ফেলা সম্ভবপর হয়নি।

—হতে পারে। কিন্তু বাগানের ভিতরে এই বাড়ির অবস্থানের দিকে আপনি ভালো করে লক্ষ করেছেন কি?

সুন্দরবাবু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আরে লক্ষ করে আবার করব কী? এটা হল খালি বাড়ি, আসামি তাই বুঝেছিল যে, কেউ তার কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে না।

—আপনি হয়তো দেখেননি, কিন্তু আমি দেখেছি যে হারাধনবাবুর বাড়ি থেকে এখানে আসবার আগেই পাওয়া যায় আর একখানা খালি বাড়ি! আসামি সেখানেই মূর্তিটা ভাঙেনি কেন? সে কেবল মূর্তি চুরি করেনি, একটা নরহত্যাও করেছে, যত দূর মূর্তিটা বহন করে নিয়ে আসবে তার পক্ষে ততই বেশি বিপদের সম্ভাবনা। তবু কেন সে গ্রহণ করেনি মূর্তি ভাঙবার প্রথম সুযোগ?

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

মাথার উপরকার আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, আগেকার খালি বাড়িতে আলো ছিল না, কিন্তু এখানে আলো আছে। আসামি অন্ধের মতো মূর্তি ভাঙতে রাজি নয়, মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলো ভালো করে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

—এথেকে কী বুঝব?

—আপাতত কিছুই বোঝবার দরকার নেই। পরে হয়তো এটা একটা বড়ো সূত্র বলে গণ্য হবে। যাক। এখন আপনি কী করতে চান সুন্দরবাবু?

—আমি। আমি আগে দেখব মৃতদেহটা কেউ শনাক্ত করতে পারে কি না। সে কে আর তার বন্ধুবান্ধবই বা কারা, এটা জানতে পারলে মামলাটার কিনারা করা কিছুই কঠিন হবে না। তাই নয় কি?

—খুব সম্ভব তাই। আমি কিন্তু অন্যভাবে মামলাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই।

—কী রকম?

—আপাতত আমার মত আপনার ঘাড়ে চাপাতে আমি রাজি নই। আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করি আসুন। খানিকটা অগ্রসর হবার পর আবার দুজনে মিলে পরামর্শ করা যাবে, কী বলেন?

—বহুৎ আচ্ছা।

মৃতের পকেট থেকে যে-ফটোখানা পাওয়া গেছে সেখানা আমায় দিতে পারেন?

—এই নাও, কিন্তু ছবিখানা কালকেই ফিরিয়ে দিয়ো।

—উত্তম! এখন বিদায় হলুম!

খানিক দূরে এসে জয়ন্ত ডাকলে, মানিক!

—উঃ।

—হারাধনবাবু নেতাজির মূর্তিটি কিনেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে। চলো, সেখানে যাই।

শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গিয়ে শোনা গেল, দোকানের মালিক অনুপস্থিত। বৈকালের আগে ফিরবেন না।

জয়ন্ত বললে, আপাতত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আমাদের ঠাঁই হল না। অতঃপর হাঁড়ির অন্য ভাত টিপে দেখতে হবে। চলো মানিক চিৎপুর রোডের শিল্পশালায়।

শিল্পশালার মালিক অনিলবাবু জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে বললেন, হ্যাঁ মশাই। ওই কাউন্টারের উপরেই ছিল নেতাজির মূর্তিটা। যদি কোনও বদমাইশ যখন খুশি যেখানে-সেখানে ঢুকে যা ইচ্ছে তাই করে লম্বা দিতে পারে, তাহলে মিথ্যে আমরা ট্যাক্সো দিয়ে মরি কেন?

—ডাক্তার চারু চক্রবর্তীও তো আপনার কাছ থেকে নেতাজির আর-দুটো মূর্তি কিনেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেখানেও তো শুনছি এই কাণ্ড হয়েছে। এ সব আর কিছু নয়, কমিউনিস্টদের কীর্তি।

—আপনার এখানে নেতাজির আর-কোনও মূর্তি আছে?

—না মশাই আর নাই।

—ওই মূর্তি তিনটি আপনি কোথা থেকে কিনেছিলেন?

—বড়োবাজারে আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স থেকে। ওঁদের অনেক দিনের মস্তবড়ো কারবার।

—এই ফটোখানা কার বলতে পারেন?

—উঁহু। না, না, চিনেছি? হিরালাল!

—হিরালাল কে?

—পাথরের কারিগর। অল্পস্বল্প মূর্তি গড়তে আর ছবির ফ্রেম গিলটি করতে পারে। গেল হপ্তাতেও সে এখানে কাজ করে গেছে। তার ঠিকানা আমি জানি না। সে চলে যাবার ঠিক দু-দিন পরেই আমার দোকানের নেতাজির মূর্তিটা ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়।

শিল্পশালার বাইরে এসে মানিক বললে, তুমি কোন তালে আছ কিছুই বুঝছি না জয়ন্ত। এইবারে কোন দিকে যাত্রা?

—বড়োবাজারে। আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স কারখানায়।

বড়োবাজারে—অন্ধকার ও দুর্গন্ধের মুল্লুক। সংকীর্ণ অলিগলির অশ্রান্ত জনস্রোত ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিক যথাস্থানে এসে হাজির হল। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে একটা দ্বারপথ দিয়ে তারা দেখতে পেলে, উঠানে বসে কারিগরদের কেউ পাথর কাটছে, কেউ ছাঁচ থেকে মূর্তি গড়ছে।

ম্যানেজার মাড়োয়ারি। জয়ন্তের জিজ্ঞাসার জবাবে পুরাতন খাতা খুলে দেখে বললেন, আমরা নেতাজির অনেক মূর্তি গড়েছি। বছরখানেক আগে একই ছাঁচ থেকে নেতাজির যে মূর্তি গড়া হয় তার মধ্যে তিনটে গিয়েছে 'শিল্পশালা'য় আর বাকি তিনটি পাঠানো হয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'। পরে ওই ছাঁচ থেকে আরও অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি পাঠানো হয়েছে কলকাতার বাইরে।

—মূর্তিগুলি কেমন করে তৈরি করা হয়।

—মুখের দুই ধার থেকে নেওয়া দুটো ছাঁচ। তারপর ছাঁচ দুটো একসঙ্গে যুক্ত করে মূর্তি গড়া হয়। ভিতরটা থাকে ফাঁপা। ভিজে প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে গুদামজাত করা হয় মূর্তিগুলো।

জয়ন্ত ফটোখানা বার করে বললে, একে চেনেন কি?

ম্যানেজারের মুখে-চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের চিহ্ন। উত্তপ্ত ভাবে তিনি বললেন, সেই বদমাইশ হিরালাল। ওকে আবার চিনি না, খুব চিনি! ওরই জন্যে আমাদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। হিরালাল জয়পুরের লোক। সে আর এক জয়পুরিয়াকে ছোরা মেরে এসে ভালোমানুষের মতো কারখানায় বসে কাজ করছিল, তারপর পুলিশ আমাদের কারখানায় ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর আমাদেরও ছুটোছুটি করে মরতে হয় থানায় আর আদালতে। ওরকম বাঁদরমুখো মানুষকে কাজ দিয়ে আমরাই অন্যায় করেছিলুম। কিন্তু মশাই, সে খুব পাকা কারিগর।

—বিচারে তার শাস্তি হয়?

হ্যাঁ। যাকে ছোরা মেরেছিল সে মরেনি বলে হিরালাল সে যাত্রা বেঁচে যায়। মাত্র এক বছর জেল খেটে এখন সে বোধ হয় মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সে আর এমুখো হবার ভরসা করবে না। তার এক সম্পর্কীয় ভাই এখানে কাজ করে, তারও সঙ্গে কথা কইবেন নাকি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, না না, তাকে ডাকবার দরকার নেই। অনুগ্রহ করে তাকে আমাদের কোনও কথাই জানাবেন না।

—ব্যাপারটা কি গোপনীয়?

—হ্যাঁ, অত্যন্ত। তারপর আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। পাকা খাতা দেখে আপনি তো বললেন যে নেতাজির ওই ছয়টি মূর্তি গেল বছরের ৩রা জুন তারিখে এখান থেকে বাইরে গিয়েছে। আচ্ছা, হিরালাল গ্রেপ্তার হয় কোন তারিখে বলতে পারেন?

—ঠিক তারিখ মনে নেই। তবে সে কোন তারিখে শেষ মাইনে নিয়েছে খাতা দেখে তা বলতে পারি।

—বেশ, তাহলেই আমার চলবে।

খাতার পাতা উলটে ম্যানেজার বললেন, হিরালাল শেষ মাইনে নিয়েছে গেল বছরের ১০ই মে তারিখে। সে প্রায় ওই সময়েই গ্রেপ্তার হয়।

—ধন্যবাদ। আর আপনাকে জ্বালাতন করব না। এসো মানিক।

বৈকালবেলায় জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হল শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। মস্ত-বড়ো দোকান—অনেকগুলো বিভাগ। তারা একেবারে ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

তাদের পরিচয় পেয়ে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ মশাই, হারাধনবাবুর বাড়ির খবর আমরা পেয়েছি। তিনি আমাদের পুরানো খরিদ্দার। নেতাজির মূর্তিটি আমাদের এখান থেকেই কিনেছিলেন বটে।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনাদের এখানে আরও দুটি নেতাজির মূর্তি আছে?

—না মশাই নেই। বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কিনেছেন তাঁরাও আমাদের চেনা খরিদ্দার। খাতায় তাঁদের নাম আর ঠিকানা আছে।

—তাই আমি চাই।

—খাতা দেখে ম্যানেজার বললেন, একজনের নাম প্রফেসার সুরেশচন্দ্র বসু, ঠিকানা-

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন, কলকাতা। আর-একজন শ্যামাপ্রসাদ সেন। ঠিকানা—সাত নম্বর চন্দ্রকান্ত রোড, শ্রীরামপুর।

—আপনাদের কর্মচারীরা ইচ্ছা করলেই এ খাতার উপরে চোখ বুলোতে পারে তো?

—তা পারবে না কেন! এ খাতা তো গোপনীয় নয়।

—ফটোর এই লোকটাকে কখনও দেখেছেন?

—জীবনে নয়! অমন বাঁদুরে চেহারা একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব!

—হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার এখানে জয়পুরের কোনও লোক কাজ করে?

—করে বইকি! একজন নয়, তিনজন।

—আচ্ছা মশাই, নমস্কার।

॥ চার ॥

খুশি মুখ আরও খুশি

সান্ধ্য চায়ের বৈঠক।

মানিক বললে, তোমার মুখ যে আজ ভারী খুশি খুশি দেখাচ্ছে জয়ন্ত।

—বুঝতে পেরেছ?

—তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পারব না? তোমার মুখ যে আমার কাছে দশবার-পড়া কেতাবের মতো পুরানো।

—উপমায় তুমি দেখছি কালিদাস।

—খুশি হবার কারণটা কী বলো দেখি?

—সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে। আমি এখন সুন্দরবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। না না আর অপেক্ষা করতে হবে না। সিঁড়ির উপরে যে ওই তাঁর পায়ের শব্দ।

মানিক চেঁচিয়ে বললে, ইংরেজিতে প্রবাদ আছে যে স্মরণ করলেই শয়তান দেখা যায়। তুমি সুন্দরবাবুকে স্মরণ করেছ, সুতরাং—

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি মানিক। আমাকে কার সঙ্গে তুলনা করছ?

—তুলনা নয়, আমি একটা প্রবাদের কথা বলছিলুম।

—চুলোয় যাক তোমার প্রবাদ। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবার সময় আমার নেই। হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তোমার খবর কী?

—ভালো। নেতাজির মূর্তি নিয়ে আজ যথেষ্ট গবেষণা করা গিয়েছে।

—নেতাজির মূর্তির পিছনে এখনও তুমি লেগে আছ? বেশ, বেশ—যার যা পদ্ধতি, আমি আপত্তি করব না। আমি কিন্তু এবারে তোমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি।

—অ্যাঁ, তাই নাকি?

—যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে শনাক্ত করতে পেরেছি।

—বলেন কী!

—খুনের কারণও আবিষ্কার করে ফেলেছি!

—সাধু সাধু!

—অবনীবাবুকে জানো তো? ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের, যত মেড়ুয়াবাদীর নাম-ধাম-চেহারা তাঁর নখদর্পণে। লাশটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেছেন। যার লাশ তার নাম হচ্ছে রাধাকিষণ, দেশ জয়পুরে। লোকটা নাকি পয়লা নম্বরের গুন্ডা, একটা মস্ত দলের সর্দার। অথচ সে হচ্ছে ভদ্র বংশের ছেলে। দেশে সুমিত্রা নামে তার এক ভগ্নী আছে, সে-ও একবার একটা চুরির মামলায় জড়িয়ে পড়ে কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তাহলেই ব্যাপারখানা কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বুঝেই দ্যাখো। আমার কী আন্দাজ জানো? যে তাকে খুন করেছে সেও তার দলের লোক। যে-কোনও কারণে রাধাকিষণ তাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ঘটনার রাতে হঠাৎ তাকে হারাধনবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে তার অপেক্ষায় পথের উপরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে বেরিয়ে এলে তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাধাকিষণ নিজেই পটল তুলতে বাধ্য হয়। কী বলো জয়ন্ত, আমার আন্দাজ কি ভুল?

জয়ন্ত হাততালি দিয়ে বলে উঠল, খাসা সুন্দরবাবু! কিন্তু একফোঁটা চোনা রয়ে গেল নাকি?

—কেন?

—খুনি নেতাজির মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে কেন?

—আরে রেখে দাও নেতাজির মূর্তি। ও কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারবে না। তুচ্ছ পুতুল চুরি, বড়োজোর ছয় মাস জেল। কিন্তু আসলে এটা খুনের মামলা আর সেইটাই হচ্ছে কর্তব্য।

—এরপর আপনার কী কর্তব্য হবে?

—খুব সোজা। অবনীবাবুকে নিয়ে যাব বড়োবাজারের বস্তিতে, খুব সম্ভব ফটোর লোকটাকে তাহলে আজকেই গ্রেপ্তার করতে পারব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?

—উঁহু। আমার বিশ্বাস আরও সহজে আসামির দেখা পেতে পারি। অবশ্য আমি জোর করে কিছুই বলতে চাই না। আপনি যদি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসেন, আর দৈব যদি সহায় হয়, তাহলে হত্যাকারী নিজেই আপনার হাতের মুঠোর ভিতরে এসে পড়বে।

—কোথায় যেতে হবে শুনি? বড়োবাজারে?

—না, চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেনে। আমি অঙ্গীকার করছি সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজ ভুল হলে কাল আমি আপনার সঙ্গে বড়োবাজারের বস্তিতে ভ্রমণ করতে যাব। কী বলেন, রাজি?

—হুম।

মানিক সকৌতুকে বলল, হুম? এখানে 'হুম' মানে কী দাদা? হুঁ!

—তাই ধরে নাও।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে গিয়ে একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কী লিখে সেখানা খামের ভিতর পুরলে। তারপর খামের উপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে চেঁচিয়ে ডাকল, মধু! ওরে অ-মধু! শ্রীমধুসূদন! পুরাতন ভৃত্য মধু এসে হাজির। —আজ্ঞে বাবু।

—যাও তো বাপু, এই চিঠিখানা নিয়ে। তুমি তো পড়তে জানো। খামের উপরে ঠিকানা লেখা আছে, পারো তো দৌড়ে যাও—বড্ড জরুরি চিঠি!

মধুর প্রস্থান। জয়ন্তের গাত্রোত্থান। সে বললে, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিন। রাত সাড়ে দশটার সময়ে আবার এখানে পদার্পণ করলেই চলবে। আমরা সাড়ে এগারোটার ভিতরে যাত্রা করব।

সুন্দরবাবু প্রস্থান। জয়ন্ত বললে, মানিক, আমাকে এখন পাশের ঘরে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটতে হবে। আজ রাত্রে বোধ হয় অনিদ্রারই ব্যবস্থা। তুমি ইচ্ছা করলে অল্পবিস্তর বিশ্রাম করতে পারো।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত বেরিয়ে এল ধূলি-ধূসরিত হস্তে।

সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়েছিল মানিক। বললে, কী বন্ধু তোমার খুশি মুখ যে আরও খুশি হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে!

দুই ভুরু নাচিয়ে জয়ন্ত বললে, আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি।

॥ পাঁচ ॥

হিরালালও কুপোকাত

রাত সাড়ে এগারোটা। সদর দরজায় অপেক্ষা করছিল জয়ন্তর মোটর। সুন্দরবাবুও মানিকের সঙ্গে সে মোটরে গিয়ে উঠল।

—সুন্দরবাবু যে সশস্ত্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মানিক, তুমিও রিভলভার এনেছ তো? জয়ন্ত বললে।

—সে কথা আবার বলতে? মানিকের উত্তর।

গাড়ি ছুটল। এ-রাস্তা ও-রাস্তা মাড়িয়ে গাড়ি যখন একটা চৌমাথায় হাজির হল, কলকাতা শহর তখন যেন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

জয়ন্ত চালককে ডেকে বললে, গুট্টা সিং, গাড়ি থামাও। এখানেই তুমি আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। আমাদের এখন শ্রীচরণই ভরসা। নামো মানিক, নামুন সুন্দরবাবু!...আরে

মশাই আপনার নাসাযন্ত্র যে সংগীত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। বলি ঘুমোলেন নাকি?

সুন্দরবাবু ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে প্রকাণ্ড একটি হাই তুলে বললেন, ঘুমোইনি হে, ঘুমোইনি। এই বিষম গরমে শীতল সমীরণ সেবন করে কিঞ্চিৎ তন্দ্রাতুর হয়েছিলুম আর কী? আমি এখন সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। কী বলবে বলো—হুম।

—এইবার গাড়ি থেকে অবতরণ করবার সময় এসেছে।

—এসেছে নাকি? এই আমি নেমে পড়লুম।

—গাড়ি নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সঙ্গত নয়। এইবার পদব্রজে মিনিট পাঁচেক অগ্রসর হতে হবে।

হুম—যো হুকুম। আমি প্রাচীন সৈনিক, যা বলো তাতেই রাজি। এই আমি সবেগে পদচালনা করলুম।

পথে আর লোক চলাচল নেই বললেই চলে। গোটা কয়েক কুকুর শহরের মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে এবং রাস্তার এখানে ওখানে দুই-তিন বা ততোধিক ষাঁড় গা এলিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে করছে রোমন্থন।

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন। রেলিং ঘেরা জমির ভিতর একখানা মাঝারি আকারের বাড়ি তার গায়ে কোথাও নেই আলোর রেখা। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্টের আলোয় সুন্দরবাবু নামটা পাঠ করলেন—প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

জয়ন্ত বললে, রাত্রেও এ বাড়ির ফটক বন্ধ হয় না দেখছি। চলুন সুন্দরবাবু, বাগানে ওই হাস্নুহানার ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকি। নয়তো অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের মশকদংশন সহ্য করতে হবে। হয়তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব! উপায় কী, যে পূজার যে মন্ত্র।

কিন্তু জয়ন্তের আশঙ্কা সফল হল না। আধ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কোথা থেকে আচমকা দেখা দিল একটা ছোট্ট কালো মূর্তি, তিরের মতন বাগানের ভিতর ছুটে এসেই সে বাড়ির ছায়ার ভিতরে কোথায় হারিয়ে গেল। ঠিক যেন একটা বানর। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। তারপর একটা শব্দ—কে যেন একটা জানালা খুলছে ধীরে ধীরে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

জয়ন্ত বললে, এসো মানিক, আমরা জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোর বাইরে বেরুলেই গ্রেপ্তার করব।

কিন্তু তারা দুই-এক পা এগুবার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে আবার হল সেই মূর্তিটার আবির্ভাব। তার হাতের তলায় রয়েছে সাদা মতন কী একটা জিনিস। সে চারদিকটা একবার চটপট দেখে নিলে। এখনকার নীরবতার ও নির্জনতায় বোধ হয় আশ্বস্ত হল। হাতের জিনিসটা মাটির উপরে নামিয়ে রাখলে। তারপর জেগে উঠল ফটাফট শব্দ।

জয়ন্ত সঙ্গীদের নিয়ে বেগে ছুটে এল তার দিকে। লোকটা তখন হেঁট হয়ে এমন একাগ্র মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে যে কিছু বুঝতে পারলে না। তার পিঠের উপরে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত। এবং সে কোনও বাধা দেবার আগেই মানিকের সাহায্যে সুন্দরবাবু হাতকড়া দিয়ে তার দুই হাত করলেন বন্দী। তাকে চিত করে ফেলতেই দেখা গেল তার হাড়কুৎসিত বেবুনের মুখখানা অবিকল সেই ফটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি।

জয়ন্ত মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—সেখানে ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে আছে নেতাজির আর একটি মূর্তির ভাঙা টুকরো। সে একে একে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় বাড়ির ভিতরে জ্বলে উঠলো আলো এবং দরজা খুলে বেরিয়ে বাগানের উপর এসে দাঁড়াল আর এক মূর্তি।

জয়ন্ত মুখ তুলে শুধোলে, আপনিই বোধ হয় প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু? আপনার পত্র আমি যথাসময়েই পেয়েছি আর কাজ করেছি, আপনার উপদেশ মতোই। যাক বদমাইশটা ধরা পড়েছে দেখে খুশি হলুম। আসুন, একটু চা-টা খেয়ে যান।

সুন্দরবাবু বললেন, এই কি চা খাবার সময় মশাই? এই পরমসুন্দর মানুষটিকে লক-আপে পুরতে না পারলে আমি ঘুমোবারও সময় পাব না। দেখি সোনার চাঁদ, তোমার পকেটে কী সম্পত্তি আছে!

বন্দি কোনও কথা কইলে না। কিন্তু সুন্দরবাবু তার দিকে হাত বাড়াতেই সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খাঁক করে তাঁর হাতে কামড়ে দিতে এল।

সুন্দরবাবু চট করে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, ওরে বাবা হয়েছিল আর কী? তুই বেটা মানুষের ছদ্মবেশে বুনো জন্তু নাকি? হুম, এর মুণ্ডুটা দুই হাতে আচ্ছা করে চেপে ধরো তো মানিক! সাবধান যেন কামড়ে না দেয়? এর পকেটগুলো হাতড়ে না দেখলে চলবে না।

আসামির পকেট হাতড়ে পাওয়া কেবল তিন টাকা দশ পয়সা আর একখানা ছোরা।

জয়ন্ত ছোরাখানা আলত পরীক্ষা করে বললে, হুঁ এর হাতলে এখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে দেখছি। নিশ্চয়ই গুণ্ডা রাধাকিষণের রক্ত।

সুন্দরবাবু বললেন, ওহে রূপবান পুরুষ, কোন নাম ধরে তোমাকে সম্বোধন করব বাপু?

বন্দি নিরুত্তর।

—নাম বললে না? জীতা রহো বেটা! কিন্তু তুমি তো জানো না ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অবনীবাবুর কাছে গেছে তোমার নাম-ধাম আর যাবতীয় গুণাবলী কিছুই আর ধামাচাপা থাকবে না।

জয়ন্ত বললে, রাত বাড়ছে সুন্দরবাবু।

—হ্যাঁ, আমরাও এইবার গা তুলব। কিন্তু ভাই জয়ন্ত, তুমি যে কেমন করে জানতে পারলে এই খুনেটা আজ আসবে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—আপাতত বুঝে কাজ নেই, কারণ আমার কাছেও এখনও সব রহস্য পরিষ্কার হয়নি। এ লোকটা নেতাজির মূর্তি ভাঙে কেন?

—আরে থো করো ও কথা! এটা হচ্ছে খুনের মামলা, খুনি গ্রেপ্তার হয়েছে, এখনও তুমি নেতাজির মূর্তি নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করছ কেন?

—না, সুন্দরবাবু, এটা খুনের মামলা নয়, এটা হচ্ছে নেতাজির মূর্তির মামলা। আমার ধারণা খুনোখুনির কারণই হচ্ছে নেতাজির মূর্তি, সে-কারণ আবিষ্কার করতে না পারলে আদালতে আপনার খুনের মামলা ফেঁসে যাবে।

—অত বাক্যব্যয় কেন, কারণটা ব্যক্তই করো না বাপু!

—কারণ অনুমান করেছি বটে, কিন্তু সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করবার উপায় আমার হাতে নেই। তবে আসছে পরশুদিন বৈকালে আপনি যদি আমার বাড়িতে শুভাগমন করেন, তাহলে মেঘ সরিয়ে আপনাকে সূর্যালোক দেখাবার আশা করলেও করতে পারি।

॥ ছয় ॥

মমতাজ বেগমের কালো মুক্তা

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সুন্দরবাবু দেখা দিলেন জয়ন্তের বৈঠকখানায়।

জয়ন্ত বললে, খবর শুভ তো?

সুন্দরবাবু গর্বিত ভাবে বললেন, তোমার আগেই আমি সূর্যালোক দেখতে পেরেছি জয়ন্ত।

—আপনি ভাগ্যবান।

—না, ঠাট্টা নয়। অবনীবাবু খোঁজখবর নিয়ে এর মধ্যেই আসামির সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছেন। তার নাম হিরালাল, বাড়ি জয়পুরে। আগে তার স্বভাব ভালোই ছিল, সৎপথে থেকে মূর্তি গড়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। তারপর কুসংসর্গে মিশে সে গোল্লায় যায়। দু-বার জেল খাটে—একবার চুরি করে, আর একবার ছোরা মেরে। নেতাজির মূর্তিগুলো কেন যে ভাঙল এখনও তা জানা যায়নি; কারণ হিরালাল ও সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে নারাজ। কিন্তু আমরা সন্ধান নিয়ে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, মূর্তিগুলো তার নিজের হাতেই গড়া; সুন্দরবাবু নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বোধ হয় মন দিয়ে তার কথা শুনছিল না, থেকে থেকে সে যেন কান পেতে কী শোনে, মাঝে মাঝে উঠে জানলার ধারে যায় তারপর আবার আসনে এসে বসে পড়ে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, তোমার আজ কী হয়েছে জয়ন্ত? তুমি এমন অন্যমনস্ক কেন?

—বোধ হয় আমার হিসেবে ভুল হয়েছে। এখন আপনার কাছে কেমন করে মুখ রক্ষা করব জানি না।

—এ আবার কী কথা?

—আজ এখানে আসবার জন্যে গেল কাল একজনকে টেলিগ্রাম করেছিলুম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উতরে গেল, তিনি এলেন না।

—কে তিনি?

—শ্যামাপ্রসাদ সেন, থাকেন শ্রীরামপুরে।

—তাঁকে কী দরকার?

—খুনি কেন যে নেতাজির মূর্তিগুলো ভাঙত, হয়তো এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছেই।

—প্রশ্নের উৎপত্তি কলকাতায়, আর উত্তর আসবে শ্রীরামপুরে থেকে, অবাক!

জয়ন্ত সচমকে বললে, মানিক দরজার একখানা গাড়ি এসে থামল না? একবার দেখে এসো তো।

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর ডান হাতে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা জিনিস।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি শ্রীরামপুরের শ্যামাপ্রসাদবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে পারিনি বলে মাপ করবেন। আজকাল ট্রেনের ধরন-ধারণ জানেন তো?

—বসুন। নেতাজির মূর্তিটি এনেছেন তো?

—হ্যাঁ, এই যে আমার হাতে।

—উত্তম। তাহলে কাজের কথা হোক।

—জয়ন্তবাবু, আপনি কি সত্য-সত্যই মূর্তিটি তিনশো টাকা দিয়ে কিনতে চান?

—নিশ্চয়ই।

—কেমন করে জানলেন ওই মূর্তিটি আমার কাছে আছে?

—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ম্যানেজার আমাকে বলেছেন।

—তাহলে একথাও শুনেছেন তো মূর্তিটি আমি কিনেছি কত টাকা দিয়ে?

—না।

—মশাই, আমি মস্ত ধনী নয় বটে, কিন্তু ঠক-জুয়াচোরও নই। আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, মূর্তিটির দাম দশ টাকা মাত্র।

—শ্যামাপ্রসাদবাবু, আপনার সততা দেখে খুশিও হচ্ছি, বিস্ময়ে হতবাকও হচ্ছি। মূর্তিটির আসল দাম যাই হোক, আমি তিনশো টাকা দিয়েই ওটি আপনার কাছ থেকে কিনতে চাই।

শ্যামাপ্রসাদ কাগজের মোড়ক খুলে মূর্তিটি টেবিলের উপরে রাখলেন।

পকেট থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট বার করে জয়ন্ত বললে, শ্যামাপ্রসাদবাবু, টেবিলের উপরে কাগজ কলম আছে। এই দুইজন সাক্ষীর সামনে আপনি অনুগ্রহ করে লিখে দিন যে তিনশো টাকার বিনিময়ে মূর্তিটি আমার কাছে বিক্রয় করলেন, ওর উপরে ভবিষ্যতে আপনার কোনও দাবিদাওয়াই রহিল না।

জয়ন্তর কথামতো কাজ করে তিন শত টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, হুম, জয়ন্তর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, জেনে-শুনেও ঠকলে, আরে ছ্যাঃ।

জয়ন্ত মুখ টিপে, একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। একখানা নূতন টেবিলক্লথ বিছিয়ে নেতাজির মূর্তিটা তার মাঝখানে স্থাপন করে বললে, সুন্দরবাবু এইবার আমি একটি অপকর্ম করব—মহা অপকর্ম!

—দশ টাকার মাল তিনশো টাকায় কিনেই তো অপকর্ম করেছ। তারও উপরে আবার কী অপকর্ম আছে?

একটা হাতুড়ি নিয়ে জয়ন্ত বললে, আজ আমিও বরেণ্য নেতাজির ওই প্রতিমূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব!

—তুমি যে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছ, সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মানিক, তোমার বন্ধুটিকে সামলাও, সে যেন আমার মাথায় হাতুড়ির এক ঘা না দেয়।

জয়ন্ত মূর্তির উপরে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করলে এবং মূর্তিটি সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

জয়ন্ত সাগ্রহে টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে পড়ল এবং একটা ভাঙা টুকরো তুলে সানন্দে বলে উঠল, দেখুন সুন্দরবাবু! দ্যাখো মানিক! আমার হাতে রয়েছে মমতাজ বেগমের বিখ্যাত কালো মুক্তা!

॥ সাত ॥

এক ঢিলে দুই পাখি......

জয়ন্ত বলতে লাগল—মমতাজ বেগমকে সম্রাট সাজাহান যে মহামূল্যবান কালো মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, তার খ্যাতি পৃথিবীর দেশে দেশে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় এই মুক্তাটি কোথায় হারিয়ে যায় কেউ তা জানে না। অনেক কাল পরে মুক্তাটি কেমন করে মধ্য ভারতের প্রতাপপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। তারপর সেদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমে মুক্তার মালিক হতেন প্রতাপপুরের মহারাজারাই।

তারপর বর্তমান মহারানির শয়নগৃহ থেকে আবার মুক্তাটি হয় অদৃশ্য। তাই নিয়ে চারিদিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সুন্দরবাবুর সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুলিশ সে-মামলার কিনারা করতে পারেনি। মহারানির এক পরিচারিকা ছিল, সে জয়পুরের মেয়ে, নাম সুমিত্রা। তারই উপরে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুন্দরবাবু চমকে উঠলেন যে বড়ো? আপনার মুখেই তো শুনেছি, হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে নিহত রাধাকিষণের এক ভগ্নী আছে নাম সুমিত্রা আর সে জয়পুরের মেয়ে।

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। এই দুই সুমিত্রা একই যে ব্যক্তি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

পুরাতন খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে আমি আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি! কাকে ছোরা মেরে হিরালাল যেদিন ধরা পড়ে, প্রতাপপুরের মহারানির শয়নগৃহ থেকে কালো মুক্তাটি অদৃশ্য হয় ঠিক তারই চারদিন আগে। কল্পনায় ঘটনাগুলো পর পর এই ভাবে সাজানো যেতে পারে!

সুমিত্রা মুক্তাটি চুরি করে ভাই রাধাকিষণের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিল। হিরালাল হচ্ছে রাধাকিষণের দুষ্কর্মের সহকারী। সে হয় মুক্তাটি তার বন্ধুর কাছে থেকে চুরি করলে, কিংবা নিজে পুলিশের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য রাধাকিষণরাই তার কাছে মুক্তাটি জিম্মা রাখল। তারপর হঠাৎ একজন লোককে ছোরা মেরে হিরালাল আগরওয়ালার কারখানায় পালিয়ে এল। তারপর সে যখন বসে বসে প্লাস্টারের মূর্তি গড়ছে সেই সময় সেখানে পুলিশের আবির্ভাব। সে বুঝলে পুলিশ তার কাপড় জামা তল্লাশি করবে। তার সামনে ছিল সবে-গড়া ভিজে প্লাস্টারের মূর্তি। সে তাড়াতাড়ি একটা মূর্তির মাথায় ছাঁদা করে মুক্তাটি ভিতরে নিক্ষেপ করে ছিদ্রটি আবার বন্ধ করে দিলে—দক্ষ কারিগরের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। তারপর সে এক বৎসর জেল খাটতে গেল। ইতিমধ্যে নেতাজির ছয়টি মূর্তি কারখানার বাইরে এখানে-ওখানে চলে গেল। তাদের কোনটির মধ্যে যে মুক্তা আছে বাহিরে থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারে না। মূর্তি নাড়লেও মুক্তার অস্তিত্ব জানা যাবে না, কারণ কাঁচা প্লাস্টার শুকিয়ে গিয়ে মুক্তাটিকে কামড়ে ধরেছে। মূর্তি ভাঙা ছাড়া মুক্তা আবিষ্কারের আর কোনও উপায় রইল না।

তারপর হিরালালের মেয়াদ ফুরুল। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে দস্তুরমতো মাথা খাটিয়ে ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারলে, কোন কোন মূর্তি কোন কোন ঠিকানায় গিয়েছে। তারপর আরম্ভ হল নেতাজির মূর্তির উপরে আক্রমণ। চতুর্থ মূর্তি চুরি করতে গিয়ে হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে হিরালালের সঙ্গে দেখা হয় রাধাকিষণের। হিরালাল জেল থেকে বেরিয়েছে শুনে রাধাকিষণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের ফল হল রাধাকিষণের পক্ষে মারাত্মক।

সুন্দরবাবু বললেন, হিরালাল যদি তার দুষ্কর্মের সহকারীই হয় তবে রাধাকিষণ তার ফটো নিয়ে বেড়াত কেন?

—খুব সম্ভব তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হিরালালের খোঁজ নেবার সময়ে এই ফটো তার কাজে লাগত। যাক সে কথা। আমি বেশ আন্দাজ করলুম, খুনের পরে হিরালাল আরও তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে; কারণ পুলিশ তাকে খুঁজছে, এখন যথাসম্ভব শীঘ্র তার কলকাতা থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।

হিরালাল যে মূর্তির ভিতরে কালো মুক্তা লুকিয়ে রেখেছে তখনও পর্যন্তও সন্দেহ আমার হয়নি। কিন্তু খালি বাড়ির সামনে ঠিক আলোর নীচে হিরালাল মূর্তিটা ভেঙেছিল বলে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল যে, ফাঁপা মূর্তিগুলোর মধ্যে এমন কোনও মূল্যবান জিনিস আছে, যার লোভে চোর এইসব কাণ্ড করে।

সন্ধান নিয়ে জানলুম, ছয়টার মধ্যে শেষ দুটো মূর্তি আছে যথাক্রমে প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু আর শ্যামাপ্রসাদ সেনের কাছে। একজন থাকে শহরেই, আর একজন শ্রীরামপুরে। আন্দাজ করলুম শহরের মূর্তিটাকে চুরি না করে কলকাতার বাইরে যাওয়া হিরালালের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি, তারপর সুরেশবাবুর বাড়িতে স্বচক্ষে দেখলুম হিরালাল কী যেন খুঁজছে মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্যে। কিন্তু তখন পুরনো খবরের কাগজের ফাইল থেকে বিখ্যাত কালো মুক্তোর ইতিহাস আমি উদ্ধার করেছি আর রাধাকিষণের সঙ্গে এই মুক্তোর চুরির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সন্দেহও আমার মনে ঠাঁই পেয়েছে। এও জেনেছি যে রাধাকিষণ আর হিরালাল পরস্পরের পরিচিত আর একই দেশের লোক। মনে খটকা লাগল হিরালাল কি ফাঁপা মূর্তির ভিতর খুঁজছে কালো মুক্তাকেই?

কিন্তু এখনও পর্যন্ত হিরালালের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। আমার মন বললে তাহলে মুক্তা আছে ওই শেষ—বা ষষ্ঠ মূর্তির মধ্যেই। সুন্দরবাবু কপাল ঠুকে আপনার সামনেই তিনশো টাকা দিয়ে আমি ওই ষষ্ঠ মূর্তিটাকে কিনে ফেললুম দেখলেন তো?

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, ধন্যি ভায়া ধন্যি! একটি মাত্র ইষ্টক খণ্ড দিয়ে আজ একজোড়া পক্ষী বধ করেছ! একসঙ্গে দু-দুটো মামলার কিনারা করে ফেললে হে—ওদিকে মুক্তা চুরির আর এদিকে মূর্তি চুরির মামলা। হুম, হুম।

মানিক বললে, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবন হচ্ছে বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিমূর্তিও বড়ো কম অ্যাডভেঞ্চারের সৃষ্টি করলে না—নেতাজির সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসাধারণতার সম্পর্ক! 'জয় হিন্দ।'

কাচের কফিন

খুনের না মানুষ চুরির মামলা

—বোলো না, বোলো না, আজ আমাকে চা খেতে বোলো না! ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন সুন্দরবাবু।

মানিক সবিস্ময়ে শুধোলে, এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।

—না আজ কিছুতেই আমি চা খাব না।

—একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ?

—হুম!

জয়ন্ত বললে, বেশ, চা না খান, খাবার খাবেন তো?

—কী খাবার?

—টিকিয়া খাবার।

—ও তাই নাকি।

—তারপর আছে ভেন্ডালু।

—হংস মাংস?

—হ্যাঁ, বনবাসী হংস।

সুন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন।

—খাবেন তো?

সুন্দরবাবু ত্যাগ করলেন একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর মাথা নেড়ে করুণ স্বরে বললেন, উহুম! আজ আ- -ক হংস-মাংস ধ্বংস করতে বোলো না।

মানিক বললে, হালে আর পানি পাচ্ছি না। হংস-মাংসেও অরুচি! সুন্দরবাবু এইবারে বোধ হয় পরমহংস হয়ে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করবেন।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়।

—তবে গেরস্তের ছেলে হয়েও এ-খাব না ও-খাব না বলছেন কেন?

—আজ আমার উদর দেশের বড়োই দুরবস্থা।

—অমন হৃষ্টপুষ্ট উদর, তবুও—

—আমার উদরাময় হয়েছে।

—তাই বলুন। তবে ওষুধ খান। আমি হোমিওপ্যাথি জানি! এক ডোজ মার্কসল ওষুধ দেব নাকি?

—থো করো তোমার হোমাপাথির কথা। আমি খাবার কি ওষুধ খেতে আসিনি। আমি এসেছি জরুরি কাজে।

—অসুস্থ দেহ, তবু কাজ থেকে ছুটি নেননি? কী টনটনে কর্তব্যজ্ঞান।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। স্বর্গবাসী ঢেঁকি ধান ভাঙে। পুলিশের আবার ছুটি কী হে?

জয়ন্ত শুধোলে, নতুন মামলা বুঝি?

—তা ছাড়া আর কী?

—কীসের মামলা?

—বলা শক্ত। খুনের মামলা কি মানুষ চুরির মামলা, ঠিক ধরতে পারছি না।

একটু একটু করে জাগ্রত হচ্ছিল জয়ন্তের আগ্রহ। সে সামনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, সুন্দরবাবু ওই চেয়ারে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন।

আসন গ্রহণ করে সুন্দরবাবু বললেন, এটাকে আজব মামলা বলাও চলে। রহস্যময় হলেও অনেকটা অর্থহীন। নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছেন তিনজন। একজন নারী আর দুজন পুরুষ। ওদের মধ্যে একজন পুরুষ হচ্ছেন আসামি। কিন্তু তিনজনেই অদৃশ্য হয়েছে।

—অদৃশ্য হবার কারণ?

—শোনো! বছর দেড়েক আগে সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে অভিযোগ করেন, তাঁর পিতামহী সুশীলাসুন্দর দেবীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। সুশীলা দেবী বিধবা। তিনি তাঁর স্বামীর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুন ডাক্তার মনোহর মিত্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুশীলা দেবী হঠাৎ একদিন একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে মনোহর মিত্রের সঙ্গে বাড়ির বাইরে চলে যান, তারপর ফিরে আসেননি। খোঁজাখুঁজির পর প্রকাশ পায়, অদৃশ্য হবার দু-দিন আগে সুশীলা দেবী ব্যাংক থেকে নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তুলে আনিয়েছিলেন। সে টাকাও উধাও হয়েছে।

—ডাক্তার মনোহর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের খ্যাতি আমি শুনেছি। পদার্থশাস্ত্রে তাঁর নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

—তিনিই ইনি। মনোহরবাবুকে তুমি কখনও চোখে দেখেছ?

—না।

—আমিও দেখিনি, তবে তাঁর চেহারার হুবহু বর্ণনা পেয়েছি।

—কী রকম?

—মনোহরবাবুর দীর্ঘতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি হবে না, কিন্তু তাঁর দেহ রীতিমতো চওড়া। তাঁর মাথায় আছে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়া সাদা ধবধবে চুল, মুখেও লম্বা পাকা দাড়ি। তাঁর বয়সও ষাটের কম নয়। কিন্তু শরীর এখনও যুবকের মতো সবল। রোজ সকালে সূর্য ওঠবার আগে পদব্রজে অন্তত চার মাইল ভ্রমণ করে আসেন। তাঁর চোখ সর্বদাই ঢাকা থাকে কালো চশমায়। টিকলো নাক। শ্যামবর্ণ। সাদা পাঞ্জাবি, থান কাপড় আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। বর্মা চুরোটের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁর মুখ সর্বক্ষণই গম্ভীর। ডান কপালের উপরে একটা এক ইঞ্চি লম্বা পুরানো কাটা দাগ আছে। হাতে থাকে একগাছা রুপাবাঁধানো মোটা মলাক্কা বেতের লাঠি।

জয়ন্ত বললে, আরে মশাই, এ বর্ণনার কাছে যে আলোকচিত্রও হার মানে। এর পর

বিপুল জনতার ভিতর থেকেও মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে পারব।

সুন্দরবাবু দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু দেড় বৎসর চেষ্টা করেও তাঁর টিকিও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

—কেন?

—তিনিও অদৃশ্য হয়েছেন!

—তাঁর বাড়ি কোথায়?

—বালিগঞ্জে নিজের বাড়ি। সেখানে গিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ি একেবারে খালি।

—মনোহরবাবুর পরিবারবর্গ?

—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। তিনি বিবাহই করেননি।

—অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন?

—কারুর পাত্তা পাইনি। পাড়ার লোকের মুখে শুনলাম মনোহরবাবু জনচারেক পুরাতন আর বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে ওই বাড়িতে বাস করতেন বটে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে আপনি বললেন, সুশীলা দেবী ট্যাক্সিতে চড়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কি নিজের মোটর নেই?

—আছে বই কি! একখানা নয়, তিনখানা।

—তাহলে মেনে নিতে হয়, সুশীলা দেবীর নিজেরও ইচ্ছা ছিল, তিনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানতে না পারে।

—হয় তোমার অনুমান সত্য, নয় তিনি ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন মনোহরবাবুর পরামর্শেই!

—আপনি ট্যাক্সিখানার সন্ধান নিয়েছেন?

—নিয়েছি বই কি! ট্যাক্সি চালককে খুঁজে বের করেছি। সে আরোহীদের হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আর কিছুই সে জানে না।

—তা হলে মনোহরবাবুর সঙ্গে সুশীলা দেবী বোধ হয় কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে—কোথায়?

—হুম, আমিও মনে মনে এই প্রশ্ন বার বার করেছি। কোথায়, কোথায়, কোথায়? কিন্তু প্রতিধ্বনি বার বার উত্তর দিয়েছে—কোথায়, কোথায়, কোথায়?

—খালি ওই প্রশ্ন নয় সুন্দরবাবু, আরও সব প্রশ্ন আছে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পনেরো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা দেবী রুগ্ন দেহে এমন লুকিয়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন কেন? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? মনোহরবাবু বিখ্যাত পদার্থবিদ হলেও মানুষ হিসাবে কি সাধু ব্যক্তি নন?

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কথা এখনও ফুরোয়নি। সবটা শুনলে প্রশ্ন সাগরে তোমাকে তলিয়ে যেতে হবে।

—আমার আগ্রহ যে জ্বলন্ত হয়ে উঠল। বলুন, সুন্দরবাবু বলুন।

॥ দুই ॥

মানুষ না দেখে প্রতিকৃতি আঁকা

সুন্দরবাবু বললেন, যে-মাসে সুশীলা দেবী অন্তর্হিতা হন, সেই মাসেই আর একটা মানুষ নিরুদ্দেশ হওয়ার মামলা আমার হাতে আসে। দুটো মামলাই কতকটা একরকম। গোবিন্দলাল রায় একজন বড়ো জমিদার। বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি বিপত্নীক হলেও সংসার তাঁর বৃহৎ। পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীও আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন গোপনে ব্যাংক থেকে নগদ বারো লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে তিনিও গিয়েছেন অজ্ঞাতবাসে। তবে গোবিন্দবাবু যাবার সময়ে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—আমি বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা আমরা জন্য চিন্তিত হয়ো না।' তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজখবর নেই। তিন মাসের মধ্যেও বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে একখানা পত্র পর্যন্ত না পেয়ে তাঁর পুত্ররা আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি গোবিন্দবাবুর নাগাল ধরতে পারিনি।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনি কি মনে করেন, আগেকার মামলার সঙ্গে এ মামলাটারও কোনও সম্পর্ক আছে!

—অল্পবিস্তর মিল কি নেই জয়ন্ত? একজন অতি বৃদ্ধা নারী আর একজন অতি বৃদ্ধ পুরুষ, দুজনেই গোপনে অজ্ঞাতবাসে গমন করেছেন, আর দুজনেই যাবার ঠিক আগেই ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন, দুজনেই আত্মগোপন করবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের কোনও প্রমাণই দেননি।

—কিন্তু গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কি মনোহরবাবুর পরিচয় ছিল?

—গোবিন্দবাবুর বাড়ির কোনও লোকই মনোহরবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি।

—তাহলে আপনি কী বলতে চান?

—মাসখানেক আগে গোবিন্দবাবুর বড়ো ছেলে আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে বলে গিয়েছেন—একখানা বইয়ের ভিতর থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিখানা পড়বার পর বাবা নিশ্চয়ই ওই বইয়ের ভিতর গুঁজে রেখেছিলেন।— জয়ন্ত এই নাও, চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো।

জয়ন্ত খামের ভিতর থেকে পত্র বার করে নিয়ে পাঠ করলে—

প্রিয় গোবিন্দবাবু,

এতদিন পরে আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত হয়েছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলুম। বেশ, আগস্ট মাসের চার তারিখে পাঁচটার সময়ে আমার লোক হাওড়া স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে সঙ্গে করে আনতে হবে অন্তত নগদ বারো লক্ষ টাকা। যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন

আমরা এইখানে বাস করব। আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। আপনার কোনও আশঙ্কা নেই। পত্রের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

ইতি—
ভবদীয়
শ্রীমনোহর মিত্র

সুন্দরবাবু বললেন, পড়লে?

জয়ন্ত উত্তর দিলে, হুম, চিঠির কাগজে কোনও ঠিকানা নেই? কিন্তু খামের উপরে ডাকঘরের নাম রয়েছে, সুলতানপুর।

—সুলতানপুর হচ্ছে একটি ছোটোখাটো শহর! সেখানে আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু ডাক্তার মনোহর মিত্রের নাম পর্যন্ত কেউ সেখানে শোনেনি।

—সুলতানপুর ডাকঘর থেকে কোন কোন গ্রামের চিঠি বিলি হয় সে খোঁজ নিয়েছিলেন তো?

—তা আবার নিইনি? শুধু খোঁজ নেওয়া কী হে সব জায়গাতেই নিজে গিয়ে ঢুঁ মারতেও ছাড়িনি। কিন্তু লাভ হয়েছে প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? মনোহর নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ও অঞ্চলের কোথাও বাস করেছিল। তারপর সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হাতে পেয়ে হত্যা করে তাঁদের টাকাগুলো হাতিয়ে আবার সরে পড়েছে কোনও অজানা দেশে!

জয়ন্ত সেন নিজের মনেই বললে, চিঠি পড়ে জানা গেল, মনোহরবাবুর কোনও প্রস্তাবে গোবিন্দবাবু প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু পরে রাজি হয়েছিলেন। খুব সম্ভব সেই প্রস্তাবটাই কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন বারো লক্ষ টাকা।

—হুম, কে বলতে পারে সুশীলা দেবীর কাছেও মনোহর ঠিক এই রকম প্রস্তাব করেনি?

—কিন্তু কী এই প্রস্তাব, যার জন্যে লোকে এমন লক্ষ টাকা খরচ করতে রাজি হয়?

—কেবলই কি টাকা খরচ করতে রাজি হয়, ধাপ্পায় ভুলে সংসার-পুত্র-কন্যা-আত্মীয় ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না।

—সুন্দরবাবু, প্রস্তাবটা যে অতিশয় অসাধারণ সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, মনোহরের প্রস্তাব নিয়ে বেশি মস্তিষ্কচালনা করে কোনোই লাভ নেই।

—লাভ আছে বই কি! প্রস্তাবটা কী জানতে পারলে আমাদের আর অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় না।

—কিন্তু যখন তা আর জানবার উপায় নেই তখন আমাদের অন্ধকারেই ঢিল ছুড়তে হবে বই কি!

—অন্ধকারে বহু ঢিল তো ছুড়েছেন, একটা ঢিলও লক্ষে গিয়ে লাগল কি!

—তুমি আমাকে আর কী করতে বলো?

—আপনি তো সর্বাগ্রে মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে চান?

—নিশ্চয়ই!

—তাহলে আমাদের সঙ্গে আর একবার সুলতানপুর চলুন।

—সেটা হবে ডাহা পণ্ডশ্রম। কারণ সে-অঞ্চলের কোনও পাথরই আমি ওলটাতে বাকি রাখিনি।

—না, একখানা পাথর ওলটাতে আপনি ভুলে গিয়েছেন।

—কোনখানা শুনি?

—যথাসময়ে প্রকাশ পাবে।

সুন্দরবাবু একটু নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বেশ তাই সই।

—মানিক সব শুনলে।

—এখানে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—ফরমাজ করো।

—তোমার ছবি আঁকার হাত খুব পাকা!

—তুমি ছাড়া আর কেউ ওকথা বলে না!

—এখন আমায় কী করতে হবে তাই বলো।

—মনোহরবাবুর আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি আগে তুমি সুন্দরবাবুর কাছ থেকে ভালো করে আর-একবার শুনে নাও। তারপর এমন একটি মনুষ্য মূর্তি আঁকো, যার মধ্যে থাকবে ওই বিশেষত্বগুলি।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, ও-রকম ছবি এঁকে কী লাভ হবে?

—ওই ছবির সাহায্যে হয়তো আসামিকে শনাক্ত করা যাবে।

—জয়ন্ত কী যে বকে তার ঠিক নেই। মনোহরকে আমিও দেখিনি, মানিকও দেখেনি। আমি খেয়েছি পরের মুখে ঝাল! সাত সকালে আমল খাস্তা! মানিক শিব গড়তে বানর গড়ে বসবে। ছবি দেখে মনোহরকে চেনাই যাবে না।

—ফলেন পরিচিয়তে সুন্দরবাবু, ফলেন পরিচিয়তে! অর্থাৎ ফলের দ্বারা চেনা যায় বৃক্ষকে। আসল তাৎপর্য হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা মানুষকে না চিনলেও তার ব্যবহারের দ্বারা তাকে চেনা যায় অনায়াসেই। বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এরকম এক একটি প্রবাদ বাক্য রচিত হয় বুঝলেন মশাই।

তবু সুন্দরবাবুর মন মানল না, তিনি বললেন, তুমি কেবল নিজের মনগড়া কথাই বলছ, একটা প্রমাণও তো দিতে পারলে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, একটা কেন, অনেক প্রমাণই দিতে পারি।

—তাই নাকি? এ দেশের কোনও গোয়েন্দা যে এমন বর্ণনা শুনে প্রতিকৃতি এঁকে অপরাধী গ্রেপ্তার করেছে আমি তো কখনও তা শুনিনি।

—এদেশের কথা শিকেয় তুলে রাখুন সুন্দরবাবু এদেশের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গোয়েন্দারা অনেক বারই এমনি বর্ণনা শুনে আঁকা প্রতিকৃতির সাহায্যে আসল অপরাধীকে বন্দি করতে পেরেছে।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, বটে, বটে? আমি তো জানতুম না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি অনেক কিছুই আগে জানতেন না। এখনও জানেন না, আবার না জানালে ভবিষ্যতেও জানতে পারতেন না। তবু জানতে গেলেও এত বেশি তর্ক করেন কেন বলুন দেখি?

সুন্দরবাবু দীপ্ত নেত্রে কেবল বললেন, হুম!

জয়ন্ত বললে, জানাজানি নিয়ে হানাহানি ছেড়ে দাও মানিক। এখন বর্ণনা শুনে মনোহরের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করো। কালই আমরা সুলতানপুরে যাত্রা করব।

॥ তিন ॥

সিদ্ধেশ্বরবাবুর চিঠি

সুলতানপুর ছোটো শহর হলেও তিনটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে এখানে লোকজনের সংখ্যা বড়ো অল্প নয়।

শহরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখা যায় সুলতানপুরের বাইরের চারি দিকে প্রকৃতি যেন নিজে ভাণ্ডার উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

মানিক বললে, জয়ন্ত, এমনি সব জায়গাতেই জন্মলাভ করে কবির কল্পনা!

জয়ন্ত বলল, কিন্তু আমরা কবি নই।

সুন্দরবাবু বললে, আমরা ঠিক তার উলটো। আমরা এখানে কাল্পনিক মিথ্যার সঙ্গে মিতালি করতে আসিনি, আমরা এসেছি বাস্তব সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ফাঁক পেলে মানিক ছাড়ে না। বললে, সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? সে কী সুন্দরবাবু সত্য কি আপনার শত্রু?

সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডলে ঘনিয়ে উঠেছিল অন্ধকার, কিন্তু জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বললে, না মানিক, সুন্দরবাবু বোধ করি বলতে চান, উনি এসেছেন সত্যের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সুন্দরবাবুর মুখ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, জয়ন্ত ঠিক ধরেছে। আমি তো ওই কথাই বলতে চাই।

—পোস্ট অফিস। যাবে নাকি?

—পরে বিবেচনা করব। কলকাতার বিখ্যাত চৌধুরি ব্যাংকের একটা শাখা এখানে আছে না?

—হ্যাঁ। সেটি এখানকার প্রধান ব্যাংক।

—একবার সেই ব্যাংকে যেতে চাই।

—কেন বলো দেখি?

—সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন।

চৌধুরি ব্যাংক। দোতলায় উঠে দেখা গেল, একটি বিলাতি পোশাক পরা যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রবল বাতাসে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

তাকে দেখেই মানিক বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, একী করুণা!

—আরে মানিক নাকি? এখানে যে?

—এই ব্যাংকের ম্যানেজারকে একটু দরকার।

—আমিই এখানকার ম্যানেজার।

—সে কী হে, কবে থেকে?

—বছর তিনেক তুমি তো আমাদের পাড়া আর মাড়াও না, জানবে কেমন করে? এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

—ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু—ডাকসাইটে পুলিশ কর্মচারী। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু জয়ন্ত, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয় তুমি অনেকবার শুনেছ। আর জয়ন্ত এটি হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু করুণা ভট্টাচার্য, আমার মামার বাড়ির পাশেই এদের বাড়ি।

করুণা বললে, আপনাদের মতো মহাবিখ্যাতরা এই ধারধারা গোবিন্দপুরে কেন? আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আগে আমার ঘরে এসে বসুন।

পাশেই ম্যানেজারের ঘর। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর নিজেও টেবিলের সামনে গিয়ে বসে করুণা বললে এইবার আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আদেশ করুন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, আদেশ-ফাদেশ কিছুই নয়। প্রথমেই একটি বিনীত নিবেদন আছে। বলতে পারেন, সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী বাঙালি এমন কে আছেন যিনি আপনাদের মক্কেল।

করুণা বললে, বিচিত্র প্রশ্ন। সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকায় কিছু কিছু বাঙালি আছেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক।

—সেই একজন কি খুব ধনী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে ধনকুবের বলাও চলে হয়তো।

—তিনি কি আপনাদের মক্কেল?

—আমাদের একজন প্রধান মক্কেল।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—এখান থেকে তিন মাইল দূরে আছে বেগমপুরা নামে একটি জায়গা। সেখান থেকেও মাইল দুয়েক তফাতে দস্তুরমতো গহন বনের ভিতরে তাঁর বাংলোর ধরনে তৈরি মস্ত বাড়ি।

—অতবড়ো ধনী এমন নির্জন জায়গায় থাকেন কেন?

—শুনতে পাই তিনি ভারী খেয়ালি লোক।

—তাঁর নাম কি ডাক্তার মনোহর মিত্র?

—আজ্ঞে না, তাঁর নাম সিদ্ধেশ্বর সেন।

জয়ন্ত চুপ করে রইল গম্ভীর মুখে।

সুন্দরবাবু মুরব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গাল ভরা হাসি হেসে বললেন, তুমি আমায় টেক্কা মারবে বলে এখানে এসেছ। কিন্তু দেখছ তো ভায়া, আমি কোনও পাথর ওলটাতেই বাকি রাখিনি।

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে পকেট থেকে মানিকের আঁকা সেই ছবিখানা বার করে ধীরে ধীরে বললে, করুণাবাবু, এই ছবির মানুষটিকে কোনও দিন কি আপনি স্বচক্ষে দর্শন করেছেন?

করুণা ছবির উপর ঝুঁকে পড়ল। এবং তারপরেই বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, এই ছবির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখ ঠিক ঠিক মিলছে না বটে, তবে এ খানা যে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতিকৃতি সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত অপাঙ্গে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ফেললেন সুন্দরবাবু।

॥ চার ॥

কাচের কফিন

—করুণাবাবু, আপনাদের এই সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথা আরও কিছু বলতে পারেন? জিজ্ঞাসা করলে জয়ন্ত।

—একে আপনি মানিকের প্রাণের বন্ধু; তার উপরে আপনার মতো লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পাওয়াও পরম সৌভাগ্য, আপনি কী জানতে চান বলুন?

—সিদ্ধেশ্বরবাবু কবে কত দফায় আপনাদের ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছেন?

করুণা স্তব্ধ হয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, দেখুন এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয়, কারণ সিদ্ধেশ্বরবাবু হচ্ছেন আমাদের একজন প্রধান মক্কেল। কিন্তু আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, বিশেষত সুন্দরবাবু হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। এক্ষেত্রে আমরা আদেশ পালন করতে বাধ্য। আপাতত আমার স্মৃতি থেকেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। দরকার হলে পরে খাতাপত্র দেখে সঠিক তাঁর টাকার পরিমাণ আপনাকে জানাতে পারি। শুনুন, সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর বাংলো-বাড়ি তৈরি হবার পর এ অঞ্চলে প্রথম আসেন প্রায় দুই বছর আগে। সেই সময় আমাদের ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে

পনেরো লক্ষ টাকা জমা দেন। তৃতীয় বারে সেও বোধহয় দেড় বছরের কাছাকাছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছ থেকে আবার আমরা বারো লক্ষ টাকা পাই। অর্থাৎ মোট তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

জয়ন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললে, শুনছেন? দ্বিতীয় আর তৃতীয় বারে সিদ্ধেশ্বরবাবু এখানে জমা দিয়েছেন যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা? সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুও কি যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়নি?

সুন্দরবাবুও মৃদুস্বরে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, কিন্তু প্রথম দফায় ছয় লক্ষ টাকা কোথা থেকে এল।

—জোর করে কিছু বলতে চাই না। খুব সম্ভব ওটা হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর নিজের টাকা।

করুণা বললে, আপনারা আর কিছু জানতে চান?

—সিদ্ধেশ্বরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—বিশেষ কিছুই জানি না!

মানিক শুধালে, আচ্ছা করুণা, বছর দেড়েক আগে কোনও প্রাচীন মহিলা কি সিদ্ধেশ্বরবাবুর অতিথি হয়েছিলেন?

করুণা একটু ভেবে বললে, দ্যাখো মানিক, বছর দেড়েক আগেকার কথা আমি ঠিকঠাক জানি না। তবে একথা শুনেছি বটে, বছর দেড়েক আগে সিদ্ধেশ্বরবাবু একটি অতি বৃদ্ধাকে নিয়ে সুলতানপুর স্টেশনে এসে নেমেছিলেন।

—তারই কিছুদিন পরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও ওখানে এসেছিলেন।

এও আমার শোনা কথা মানিক। শুনেছি, সে ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে। কিন্তু—

—থামলে কেন, কিন্তু কী?

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে করুণা বললে, ভাই মানিক সিদ্ধেশ্বরবাবুর সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষাই শুনতে পাই। কিন্তু শোনা কথা পরের কাছে প্রকাশ করতে ভয় হয়।

করুণার পৃষ্ঠদেশে একটি সাদর চপেটাঘাত করে মানিক অভিযোগ ভরা কণ্ঠে বললে, করুণা আমিও কিন্তু তোমার পর। কোনও ভয় নেই, তোমার শোনা কথাই প্রকাশ করো।

করুণা বললে, শুনেছি সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাংলোয় একটি বৃদ্ধা নারী আর একটি বৃদ্ধ পুরুষ প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁদের প্রস্থান করতে দেখেনি! কেবল তাই নয় তাঁরা যে এখনও ওই বাংলোর ভিতরে আছেন, এমন কোনও প্রমাণও নেই।

—এ যে অসম্ভব কথা?

করুণা প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠেই বললে, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই বলছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওই রহস্যময় বাংলো সম্বন্ধে আরও যেসব কানাকানি শুনতে পাই তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

—লোকে বলে, ও বাংলো হচ্ছে ভূতুড়ে।

—কেন?

—ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে—

—কাচের কফিন!

—হ্যাঁ! ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারীর মৃতদেহ।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে প্রায় গর্জন করে বললে, হুম! হুম!

ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতরে ঢুকল একজন ভৃত্য। সে বললে, সিদ্ধেশ্বরবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সচমকে সকলে করলে দৃষ্টি বিনিময়।

করুণা বললে, বেশ তাঁকে নিয়ে এসো।

মিনিট-দুয়েক পরেই ঘরের দরজার কাছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। মানিকের আঁকা ছবির বারো-আনাই মিলে যায় তাঁর চেহারার সঙ্গে। ব্যস্তভাবে সকলের মুখের উপরে একবার বিদ্যুৎবেগে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, করুণাবাবু, আপনার ঘরে আজ অনেক অতিথি দেখছি। আমি জানতুম না, মাপ করবেন, আর-একদিন আসব! বলতে বলতে সিদ্ধেশ্বরের অন্তর্ধান।

সুন্দরবাবু তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়িকে রীতিমতো কাহিল করে তড়াক করে এক সুদীর্ঘ লম্ফ মেরে সচিৎকারে বললেন, পাকড়াও, পাকড়াও মনোহর মিত্তির লম্বা দিচ্ছেন? ওকে গ্রেপ্তার করো। ওকে গুলি করে মারো।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর কাঁধ চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে বললে, শান্ত হোন সুন্দরবাবুর শান্ত হোন! লম্ফঝম্প আর চিৎকার করে ভাঁড়ামি করবেন না। আসুন, দেখা যাক মনোহরবাবু এর পরে কী করেন!

তারপর ব্যাংকের বারান্দায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তায় মনোহরবাবু তাঁর মোটরবাইক চালিয়ে দিয়েছেন সবেগে।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন আমরা কী করব? নীচে নেমে গিয়ে মোটরে চড়ে মনোহরের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি বটে, কিন্তু ততক্ষণে আসামি আমাদের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

করুণার দিকে ফিরে জয়ন্ত বলল, আপনি তো মনোহরবাবুর বাংলোয় যাবার রাস্তা জানেন?

—জানি।

—তাহলে কালবিলম্ব না করে আমাদের সঙ্গে আসুন। মনোহরবাবু তো বাংলোখানা তার কফিন দুটো কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। আগে দেখা যাক তাঁর বিরুদ্ধে

কী কী প্রমাণ আছে, তারপর, তাঁকে পুনরাবিষ্কার করতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

সকলে পুলিশজিপের উপর চড়ে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল কয়েকজন সামরিক পুলিশ।

খানিকক্ষণ পরেই পিছনে পড়ে রইল সুলতানপুর এবং সামনে এগিয়ে এল ভূ-স্বর্গের বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেগমপুরাও পিছনে গিয়ে পড়ল। সামনে এবার দুরারোহ পর্বতমালার তলায় মাথা তুলে দাঁড়ানো দুর্গম অরণ্য এবং তারই বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হয়েছে সর্পিল গতিতে একটি নাতিবৃহৎ পথ। সেই জনহীন পথে নীরবতা তন্দ্রাভঙ্গ করে ছুটে চলল জিপ।

মানিক বললে, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, মনোহর মানুষ নয়, সে অমানুষ! নিজের যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার খালি খালি এই কথাই মনে হচ্ছে, জয়ন্ত কেমন করে সন্দেহ করলে যে সুলতানপুর চৌধুরি ব্যাংকের সঙ্গে মনোহরের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, আন্দাজ সুন্দরবাবু, আন্দাজ। আমার বিশেষ অটুট কোনও যুক্তি নেই, আন্দাজেই ছুড়েছি অন্ধকারে ঢিল।

—হুম, আন্দাজটা কি শুনতে পারি না?

—গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, মনোহরবাবু বাসা বেঁধেছেন সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যেই। এতে ধরে নিলুম, যথাক্রমে পনেরো লক্ষ আর বারো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা আর গোবিন্দবাবু তাঁরই কাছে গিয়ে হয়েছেন নিরুদ্দেশ। সাতাশ লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিশ্চয়ই তিনি নির্বোধের মতো বাড়ির ভিতরে রেখে দেবেন না। বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয়, ওদিকে ব্যাংকে রাখলে টাকা সুদে বাড়ে। তারপর ও-টাকার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। মনোহরবাবুর চিঠির একটা জায়গা স্মরণ করুন। গোবিন্দবাবুকে তিনি লিখেছিলেন—যতদিন-না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন আমরা এখানেই বাস করব। কিন্তু মানুষের খাওয়া-পরার জন্যে দরকার হয় টাকার। টাকা আগাছার মতন আপনা-আপনি মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে না। নিজের ভরণপোষণের জন্য মনোহরবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন। সুতরাং কোনও না কোনও দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে যে ব্যাংকের সম্পর্ক আছে, এটা আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। অবশ্য আন্দাজ মাত্র।

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললে, বা রে আন্দাজ! বলিহারি।

করুণা বললে, ওই সিদ্ধেশ্বর—অর্থাৎ মনোহরবাবুর বাংলো দেখা যাচ্ছে।

সুন্দরবাবুর বললেন, হুঁ মনোহরহীন মনোহরের বাংলোর ভিতরে আছে হয়তো এয়ার-টাইট কাচের কফিনের মধ্যে দুটো বুড়ো-বুড়ির কতদিনের বাসি শুকনো মড়া! বাবা, এ কী রকম বাংলো। চারদিকে জনজঙ্গল আর ঝোপঝাড়, উপর থেকে মাথার উপরে ঝাঁপ খাবে বলে হুমড়ি খেয়ে আছে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়। এ যেন হানাবাড়ি। গা ছম ছম করে ওঠে! মনোহরটা বোধ হয় এখানে বসে শবসাধনা করত। সে মন্ত্র পড়ে দিলে মড়াদুটো জ্যান্ত হয়ে

উঠত। এত কাঠখড় পুড়িয়ে তান্ত্রিক খুনিটাকে ধরতে পারলুম না, আমার এ আফসোস রাখবার ঠাঁই নেই। কপাল!

গাড়ি ফণি-মনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানা সুদীর্ঘ একতলা বাড়ির সামনেকার খোলা জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

ষোড়শী ললিতা দেবী

সারি সারি ঘর। সামনে টানা চওড়া দালান। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর কান্নার সুর, তা ছাড়া আর কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এ যেন এক অপরিসীম বিজনতার রাজ্য। স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে সত্যসত্যই।

স্বভাবত উচ্চকণ্ঠ সুন্দরবাবুও সেখানে চেঁচিয়ে কথা কইতে পারলেন না—সেখানে চিৎকার করাও কী যেন নিয়মবিরুদ্ধ। চুপিচুপি বললেন, মনোহরের লোকজনরাও কি আমাদের গাড়ির সাড়া পেয়ে চম্পট দিয়েছে?

—অসম্ভব নয়! দেখা যাক, এই বলে জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে দালানে গিয়ে উঠল, তার পিছনে পিছনে চলল আর সকলে। নিজের পায়ের শব্দে তারা নিজেরাই উঠতে লাগল চমকে।

দালানের উপর দাঁড়িয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখলে জয়ন্ত! তারপর সামনের একটা ঘরের দিকে সোজা এগিয়ে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়,—এদিকে আসুন—আপনার বাঁ দিকের শেষ ঘর।

সচকিত প্রাণের নকলে ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ দেখতে পাননি—বাঁ-দিকের শেষ ঘরের পর্দা দেওয়া দরজার দুই পাশে দাঁড় করানো রয়েছে দুটো সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নরকঙ্কাল।

আঁতকে উঠে অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বললেন, আর নয়, এইবেলা সরে পড়ি এসো! মড়ার হাড় এখানে কথা কয়?

সেই কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, ভয় নেই! ও দুটো হচ্ছে রক্তমাংসহীন কঙ্কাল মাত্র! নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে আসুন।

আকস্মিক কণ্ঠস্বর শুনে জয়ন্ত কেবল বিস্মিত হয়েছিল!

ঘরের ভিতর থেকে কে বললে, পর্দা ঠেলে প্রবেশ করুন।

দুই হাতে দুই দিকে পর্দা সরিয়ে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই একখানা ইজিচেয়ারের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় স্বয়ং ডাক্তার মনোহর মিত্র।

এ দৃশ্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হতভম্ব হয়ে গেল জয়ন্ত পর্যন্ত!

মনোহরের গম্ভীর মুখের ওষ্ঠাধরের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল যেন একটুখানি হাসির ঝিলিক! তিনি বললেন আমি পালাইনি দেখে অবাক হচ্ছেন? অবাক না হলেও চলবে। আপনারা শুভাগমন করবেন জেনেই আমি এখানে আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, এখানে আসনের অভাব হবে না।

পিছন থেকে সুন্দরবাবু বলে উঠলে, হুম! ছদ্মনামের আড়ালে যে লোক তেত্রিশ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে, তার বাড়িতে আসনের অভাব হবে না, আমি তা জানি!

মনোহরের একটুও ভাবান্তর হল না! খুব সহজ, স্থিরকণ্ঠে তিনি বললেন, নানা কারণে সময়ে আত্মগোপন করবার দরকার হয় অনেকেরই—এমন কি আপনাদেরও!

—আমরা মাঝে মাঝে আত্মগোপন অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করি অসাধুদের শাস্তি দেবার জন্য! কিন্তু তুমি?

কালো চশমার আড়ালে মনোহরের দুই-চক্ষু ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠিন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, আমি মহাশয়ের চেয়ে বয়সেও বড়ো, বিদ্যা-বুদ্ধি মান সম্ভ্রমেও বোধহয় ছোটো নই। আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করে ভদ্রতার অপমান না করলেই বাধিত হব। আপনারা অসাধুদের দণ্ড দেবার জন্যে ছদ্মবেশ ধারণ করেন, কেমন? তাহলে জানবেন, আমিও ছদ্মনাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে।

সুন্দরবাবু টিটকিরি দিয়ে বলে উঠলেন, ও হো-হো-হো! মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অভিনব যিশুখ্রিস্ট। তাই তিনি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করে কাচের কফিনে পুরে রেখে দিয়েছেন। তাই তিনি ওই দুই হতভাগ্যের কাছ থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা অপহরণ করে ধরা পড়বার ভয়ে ছদ্মনামের আশ্রয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। এর পর কী করা উচিত বলুন দেখি? আপনাকে সাধুবাদ দেব, না হাতকড়া আনবার হুকুম দেব?

এতটুকুও বিচলিত না হয়ে স্থির কণ্ঠে মনোহর বললেন, লোকে আমাকে অপবাদ দেয়—আমি নাকি হাসতে জানি না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আজ আমার প্রাণপণ অট্টহাস্য করবার ইচ্ছে হচ্ছে। আমি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করেছি? কোন প্রত্যক্ষদর্শী আপনার কানে এই অপূর্ব খবরটি দিয়ে গিয়েছে?

—দেখুন ধাপ্পা দিয়ে আপনি আমাকে গুলোবার চেষ্টা করবেন না। বলতে পারেন সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু আজ কোথায়?

—তাঁরা এই বাড়িতেই আছেন।

—হ্যাঁ, কাচের কফিনের ভিতর।

—বারবার কাচের কফিন বলে চিৎকার করবেন না। আমার বাড়িতে কফিন বলে কোনও জিনিসই নেই।

—বটে, বটে—হুম এখানে কাচের কফিন আছে, কি না আছে, সেটা খানাতল্লাশ করলেই জানতে পারা যাবে।

এতক্ষণ পরে মনোহর হঠাৎ সিধে হয়ে উঠে বসে বললেন, কাচের কফিনের কথা ছেড়ে দিন। আপনি আগে জীবন্ত অবস্থায় কাকে দেখতে চান? সুশীলা দেবীকে, না গোবিন্দবাবুকে?

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বাধো বাধো গলায় বললেন, কোথায় সুশীলা দেবী? আগে তাঁকেই দেখতে চাই।

উত্তম। বলেই মনোহর গলা চড়িয়ে ডাকলেন সুশীলা! সুশীলা।

বাড়ির ভিতর থেকে গানের মতন একটি আওয়াজ শোনা গেল।

—আজ্ঞে? কী বলছেন?

—তুমি একবার এই ঘরে এসো তো মা।

ঘরের ভিতরকার একটি দরজার পর্দা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করল যে আশ্চর্য রূপবতী ও মহিমাময়ী মূর্তি, তাকে দেখবার জন্যে কেহই প্রস্তুত ছিল না। এ মূর্তি যে মাটির পৃথিবীর, স্বচক্ষে দেখেও কেউ তা বিশ্বাস করতে পারল না।

বিপুল বিস্ময়ে জয়ন্ত বলে উঠল, ইনিই কি সুশীলা দেবী?

মনোহর বললেন, হ্যাঁ? কিন্তু এখন থেকে ইনি নতুন নামে আত্মপরিচয় দেবেন।

—নতুন নাম?

—হ্যাঁ, ললিতা দেবী।

॥ ছয় ॥

মাতৃভাষার দৌড়

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, হুম। ইনি ললিতা দেবী বা পলিতা দেবী হতে পারেন, কিন্তু ইনি সুশীলা দেবী নন!

—কেন বলুন দেখি?

—সুশীলা দেবীর বয়স পঁচাত্তর বৎসর।

—ঠিক। এখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর হলেও তিনি আর বৃদ্ধা নন।

—পাগলের মতন কী আবোল-তাবোল বকছেন।

—সুশীলা দেবী নবযৌবন লাভ করেছেন।

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না মনোহরবাবু।

—কেন প্রাচীনরা কি আবার নবীনা হতে পারে না?

—অসম্ভব! জরার পর মৃত্যু, জরার পর যৌবন নেই।

—বিজ্ঞানের মহিমায় সবই সম্ভবপর হয়। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি বিজ্ঞান একদিন মানুষকে অমর করবে।

—আপনার ওই নির্বোধের স্বর্গে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। হয় কাজের কথা বলুন, নয়—

—নয়?

—নয় থানায় চলুন।

—বেশ, তবে কাজের কথাই শুনুন। মনোহর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন মা সুশীলা।

—বাবা!

সেকি মানুষের কণ্ঠস্বর, না বীণার ঝঙ্কার।

—তুমি এখন বাড়ির ভিতরে যাও। এই ভদ্রলোকদের জন্য একটু চা-টা পাঠিয়ে দাও।

সুন্দরবাবু ব্যস্তভাবে সভয়ে বলে উঠলেন, না, না এখানে আমরা চা-টা খেতে আসিনি!

—ভয় নেই, আপনাদের চায়ে কেউ বিষ মিশিয়ে দেবে না।

—বিষ থাক আর না থাক এখানে চা আর টা কিছুই খাওয়া চলতে পারে না।

—আপনাদের সকলেরই কি এক মত?

জয়ন্ত বললে, আমার অন্য মত। আমি চা-টা সব খাব। কী বলো মানিক?

—আমিও তোমার দলে।

—করুণাবাবু কী বলেন। পরমাসুন্দরী সুশীলা—ওঁকে কি ললিতা দেবী বলে ডাকব মনোহরবাবু?

—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আবার বাজল সেই অমৃতায়মান কণ্ঠস্বরের মোহনীয় বীণাবেণু! বাবার কাছে আমি সুশীলা! কিন্তু আপনারা তো বৃদ্ধা সুশীলাকে দেখেননি আপনারা আমাকে ললিতা বলেই ডাকুন।

জয়ন্ত বললে, বেশ! করুণাবাবু, এই পরমাসুন্দরী ললিতা দেবী যদি তাঁর সুন্দর হাত দিয়ে সুন্দর চা তৈরি করে দেন, তাহলে সুন্দরবাবুর মতো আপনি তা পান করবেন না?

—করব না, বলেন কী? আমি তো নির্বোধ নই।

—সুন্দরবাবু, আপনি কি এখনও মত বদলাবেন না? মনে রাখবেন চায়ের সঙ্গে আবার টা।

সুন্দরবাবু জুলজুল করে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—কী আর করি বলো! তোমরা সবাই যখন রাজি তখন আমারও আর একযাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? আমিও রাজি।

ললিতা দেবীর গোলাপ-পেলব ওষ্ঠাধরে ফুটল যে মিষ্টি হাসিটুকু তাও যেন নীরব সংগীতের মতো সুন্দর। একটি নমস্কার করে পাশের ঘরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন জীবন্ত স্বপ্নপ্রতিমার মতো।

মনোহর গম্ভীর স্বরে বললেন, শুনুন মশাই। জরার কারণ কী মানুষ যে জানে না, এ কথা সত্য নয়। বরং এই কথাই সত্য যে জরার কারণ তার কাছে অজ্ঞাত নয়, এইটুকুই জানে না সে।

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, বাবা এ যে হেঁয়ালি।

—এ সব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আপনাদের যে কেমন করে বোঝাব বুঝতে পারছি না। Radioactive বস্তু কাকে বলে জানেন?

জয়ন্ত বললে, জানি। আমাকেও মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হয়, যদিও তা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

সুন্দরবাবু বললেন, বিজ্ঞানে আমি একেবারে মা! বাংলায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—ইংরেজি তো পদে আছে, বাংলায় শুনলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

—তাও কখনও হয়? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

—আমাদের মাতৃভাষার অভিধানে Radioactive-এর অর্থ এই ভাবে বোঝানো হয়েছে; আংশুবিকিরণ দ্বারা বিদ্যুৎমাপক প্রভৃতির উপর ক্রিয়াকরণক্ষম; (রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, পলনিয়াম প্রভৃতি সম্পর্কে অপারদর্শকপদার্থ ভেদকারক ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়াজনক এবং অদৃশ্য কিরণবিকরণক্ষম।) কী বুঝলেন বলুন।

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাপার বুঝব কী, আরও গুলিয়ে গেল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! এইজন্যেই কি কবি গান বেঁধেছেন—'আ মরি বাংলা ভাষা?'

—বাংলা ভাষার দোষ নেই সুন্দরবাবু, তবে বাংলা ভাষায় এখনও ভালো করে বিজ্ঞানকে পরিপাক করবার চেষ্টা হয়নি কারণ দেশ এতদিন স্বাধীন ছিল না, যাক ও-কথা। যতটা সংক্ষেপে পারি কিছু কিছু বোঝাবার চেষ্টা করি। অনেক পরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, সারাজীবন ধরে আমাদের দেহের ভিতরে যে Radioactive বস্তু জমে ওঠে, অর্থাৎ যাকে বলে ক্রমিক radium জরার কারণ হচ্ছে তাই। সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর উপরে প্রতিদিনই radium নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা তা খাচ্ছি, আমরা তা পান করছি, নিশ্বাস দিয়ে বাতাস থেকে তা আকর্ষণ করছি। তারই ফলে প্রত্যেক জীব আর তরুলতাও ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত হয়। জরাব্যাধি নিবারণ করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললেন, বলেন কী মশাই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। Calcium থেকে দেহের হাড় তৈরি হয়। রসায়ন শাস্ত্রের দিক থেকে radium কাজ করে calcium-এরই মতো। গঠন কার্যে যেখানে calcium-এর পরমাণু দরকার হয়, সেখানে radium পরমাণু ব্যবহার করলে দেহের রক্তস্রোত তা না জেনেই গ্রহণ করে। Radium বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের ভিতর থেকে ওই radium পরমাণুগুলিকে বিতাড়িত করা।

জয়ন্ত বললে, সেটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয়?

—প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় মোটেই তা নয়। জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাড়ের ভিতর থেকে বিপজ্জনক radium পরমাণুগুলিকে বাইরে বার করে দেওয়া অসম্ভব নয় মোটেই। প্রথমে রোগীকে এমন 'ভিনিগার' ও অ্যাসিড জাতীয় পথ্য দিতে হবে, যাতে করে তার দেহের হাড়গুলো calcium থেকে মুক্ত হয়। এক হপ্তার পর রোগীকে আমি আবার এক হপ্তা ধরে স্বাভাবিক পথ্য দিই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখি যে খাদ্যের ভিতরে যে খাঁটি calcium থাকে, তার মধ্যে কিছুমাত্র Radio activity বর্তমান নেই। প্রথমে যে ভিনিগার ও অন্যান্য অ্যাসিডের পথ্য দেওয়া হয়, দেহের ক্ষতিসাধন করবার ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত কম। ওই পথ্যের পরমাণু গ্রহণ

শক্তি বা valence আছে। তাই ওই পথ্যের আকর্ষণে আসল calcium-এর সঙ্গে দেহের ভিতর উড়ে এসে জুড়ে বসা radiumও ক্রমে ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক পথ্যের পর দিই আবার অ্যাসিড জাতীয় পথ্য। তারপর আবার স্বাভাবিক পথ্য। এইভাবে চিকিৎসা চলে মাসের পর মাস।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, এই চিকিৎসার ফলেই জরাগ্রস্ত রোগী ফিরে পায় তার নবযৌবন?

—প্রায় তাই বললেও চলে। তবে উপসর্গ যে দেখা না যায় তা বলা চলে না। যেমন ওই কাচের কফিন ব্যাপারটা। সুন্দরবাবু কাচের কফিনের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যে কী পদার্থ আপনারা কেউ তা জানেন না, দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

॥ সাত ॥

মানুষ-গুটিপোকা

মনোহরের সঙ্গে সকলে এসে উপস্থিত হল প্রকাণ্ড একখানা হলঘরে। তার অধিকাংশ জুড়ে বিরাজ করছে নানানরকম যন্ত্রপাতি। যাঁরা কোনও কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেছেন, তাঁদের কাছে ওসব যন্ত্রের কয়েকটি পরিচিত বলে মনে হবে।

কোথাও একাধিক bunsen-এর অত্যন্ত তপ্ত উত্তাপসঞ্চালক প্রদীপবিশেষ। উপরে টগবগ করে ফুটছে still বা অধোযন্ত্রগুলো, কোথাও সারি সারি কিলক থেকে ঝুলছে condenser বা সংহতিযন্ত্র যা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে দেখা যায় না।

সুন্দরবাবু আবার হুম শব্দটি উচ্চারণ করে বললেন, মনোহরবাবু এতক্ষণ কানে যা শুনলুম তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। এখন চোখে দেখছি তাও ভালো করে বুঝতে পারছি না। আপনি বোধ হয় আবার লেকচার শুরু করবেন? কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয় সহজ প্রশ্নের জবাব দেবেন?

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তো কলকাতায় বসেই করতে পারতেন? মিথ্যে এত লুকোচুরি কেন!

—কলকাতার কৌতূহলী জনতা যদি ঘুণাক্ষরেও আমার পরীক্ষার ব্যাপার টের পেত, তাহলে আমার বাড়িটি পরিণত হত সরকারি বাগানে আর সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতে আসত রাম-শ্যাম যদু-মধু সকলেই। তারপরেও আমি কি আর নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চালাবার অবসর পেতুম?

—সে-কথা ঠিক। কিন্তু সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনার সঙ্গে অমন চোরের মতন পালিয়ে এসেছেন কেন?

—তারও প্রথম কারণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। দ্বিতীয় কারণ গুরুতর।

—গুরুতর মানে?

—সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু নতুন দেহ লাভ করবার পর ইহজীবনে আর নিজের নিজের বাড়িতে ফিরবেন না বোধ হয়।

—সে কী মশাই?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই সুশীলা আজ ললিতা নাম ধারণ করেছেন।

—কিন্তু কেন, কেন, কেন?

—নতুন দেহ অতি প্রাচীনা সুশীলাকে কেউ কি চিনতে পারত?

—তা পারতই না—হুম!

—সুশীলার কথা কেউ বিশ্বাস করত?

—তা তো করতই না—ঠিক!

—তাকে নিয়ে আরও নানারকম গণ্ডগোল—এমনকি মামলা-মোকদ্দমা হবারও সম্ভাবনা ছিল না কি?

—তা তো ছিলই হ্যাঁ?

—আরও কত দিক দিয়ে সুশীলার জীবন হয়ে উঠত ভয়াবহ। সেইজন্যে স্থির করেছিল, আমার পরীক্ষা সফল হল নতুন দেহে নতুন নামে নতুন ভাবে জীবন যাপন করবে! গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও ওই কথা।

—সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু অত টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কেন? আর সে-সব টাকা আপনার নামেই বা জমা আছে কেন?

—নতুন দেশে নতুন নামে নতুন নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হলে প্রথমেই দরকার টাকা। সে টাকা আসবে কোথা থেকে? নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যেই সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু উচিত মতো টাকা সঙ্গে করে এখানে এসেছেন। ওঁদের টাকা আমার ছদ্মনামে জমা রেখেছি কেন? আমি জানতুম পুলিশ ওঁদের খোঁজ করবে। ওঁদের নামে টাকা জমা রাখলে পুলিশ নিশ্চয় সন্ধান পেত। আর কোনও প্রশ্ন আছে?

—আর একটি প্রশ্ন। যদিও ললিতা দেবীই সুশীলা দেবী কি না সে খটকা আমার মন থেকে এখনও দূর হয়নি তবে ওটা আপাতত ধামাচাপাই থাক! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গোবিন্দবাবু কোথায়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মনোহর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, জয়ন্তবাবু যে উপসর্গের কথা বলছিলুম, এইবার সেটা দেখবেন আসুন।

মনোহর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একখানা খাটের পাশে। সেখানে শয্যার উপরে যে শায়িত মূর্তিটি ছিল তাকে দেখেই সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে।

একটি তরুণ, অপূর্ব সুন্দর মূর্তি—বালক বললেও চলে। সুগঠিত শুভ্র নগ্ন দেহ—যেন গ্রীক-ভাস্করের হাতে গড়া! কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সর্বাঙ্গ তার কাচ দিয়ে মোড়া এবং সেই কাচ তা কেউ গলিয়ে এমন ভাবে মূর্তির উপরে ঠেলে দিয়েছে যে সারা

দেহের সঙ্গে তা অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

মনোহর বললেন, সুন্দরবাবু এই আপনার কাচের কফিন।

—হুম, কিন্তু কাচের কফিনের ভিতর ওটা কী রয়েছে? রঙিন মোমের পুতুল? না মৃতদেহ?

—আরও কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

—না, ওটা মোমের পুতুল নয়, মৃতদেহও নয়। ও যে জীবন্ত ওর সর্বাঙ্গে যে জীবনের রং জীবনের আভাস এমনকি দুই মুদিত চোখের পাতাও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

মনোহর বললেন ও এখনও ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ওর ঘুম ভাঙতে আর বেশি দেরি নেই।

জয়ন্ত শুধোলে, আসল ব্যাপারটা কী মনোহরবাবু?

—আমি নিজেই জানি না। ওই কাচের আবরণী আমার সৃষ্ট নয়। পর্যাক্রমে calcium পথ্য দিয়ে, আবার তা বন্ধ করে বেশ কিছুকাল চিকিৎসা চালাবার পর রোগী হঠাৎ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর তার সর্বাঙ্গব্যাপী দেখা দেয় ওই কাচের আবরণ। কিছুকাল পরে রোগীর ঘুম ভাঙে, কাচের আবরণ ফেটে যায়, তারপর উঠে বসে তার জাগ্রত মূর্তি! এর অর্থ আমিও জানি না।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, বাবা এ যে মানুষ গুটিপোকা!

মানিক শুধোলে, ও মূর্তিটি কার?

—গোবিন্দবাবুর।

—তাঁর বয়স তো সত্তর বৎসর?

সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

সুশীলার প্রবেশ। সেই সুমধুর কণ্ঠে সে বললে, বাবা ও ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

মনোহর এতক্ষণ পরে একটু হেসে বললেন, চলুন! এই বিজন বনে আপনারা খাবারের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব পাবেন না।

সুশীলা বললে, বাড়িতে যা ছিল তাই দিতে পেরেছি। স্যান্ডউইচ শিককাবাব, রুটি মাখন, চা আর মিষ্টান্ন।

মানিক বললে, ললিতা দেবী, চায়ের বৈঠক যে ভূরিভোজনের আসরে পরিণত হল। এই বিজন বনে শিককাবাব বানালেন কী দিয়ে? বাঘের মাংস দিয়ে নয় বোধ হয়।

—খেলেই বুঝতে পারবেন।

—আসুন সুন্দরবাবু।

—ভায়া আজ যা দেখলুম, আর শুনলুম, আমার পিলে অত্যন্ত চমকে গিয়েছে। খাওয়ার চিন্তা মোটেই জাগছে না!

—আপনার পিলে নির্বোধ নয়। একখানা স্যান্ডউইচ উদরসাৎ করলেই সে আবার অত্যন্ত শা্ন্ত হয়ে পড়বে! আপনার ধাত জানতে আমার বাকি নেই? চলুন, মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আসি।

একরত্তি মাটি

প্রাতরাশের পর মানিক উচ্চস্বরে খবরের কাগজ পাঠ করতে লাগল এবং জয়ন্ত একমনে শুনতে লাগল খবরগুলো।

ভৃত্য মধুর প্রবেশ—সঙ্গে তার এক পাহারাওয়ালা।

জয়ন্ত শুধোলে, 'ব্যাপার কী?'

পাহারাওয়ালার মুখে শোনা গেল, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু এই পাড়ায় তদন্তে এসেছেন, জয়ন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।

জয়ন্ত বললে, 'চল মানিক, নিশ্চয় কোনো নতুন মামলা। কাগজের একঘেয়ে খবর শোনার চেয়ে নতুন মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভালো।'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, তাতে আমাদেরও সময় কাটে, আর সুন্দরবাবুরও হাতযশ বাড়ে।'

গঙ্গার ধার। রেল লাইনের সামনেই একখানা মাঝারি আকারের তিনতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন পাহারাওয়ালা।

বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে আছেন সুন্দরবাবু। একগাল হেসে বললেন, 'এসো জয়ন্ত, এসো মানিক।'

জয়ন্ত বলাল, 'আবার কোনো নতুন মামলার হামলা সামলাতে এসেছেন বুঝি?'

—'হুম! তা ছাড়া আর কী? সেইজন্যেই তো আজকে তোমাদের চায়ের আসরে যাওয়া হল না।'

মানিক বললে, 'না গিয়ে ভালো করেননি। মধু আজ চমৎকার খাবার বানিয়েছিল।'

—'কী খাবার?'

—'চকোলেট স্যান্ডউইচ।'

সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন বিরসবদনে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'মামলাটা কীসের?'

—'কাল এই বাড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে হত্যার চেষ্টা।'

—'তাহলে সামান্য মামলা নয় দেখছি। গোড়া থেকে সব খুলে বলুন।'

॥ ২ ॥

সুন্দরবাবু যা বললেন তা মোটামুটি এই

অনন্তচন্দ্র পাইন হচ্ছেন বিখ্যাত লৌহব্যবসায়ী, তাঁর দোকান কলকাতার লোহাপটিতে। এবং তাঁর বসতবাড়ি গঙ্গার ধারে। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

তাঁর পিতার দুই বিবাহ। তিনি প্রথম পক্ষের পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের নাম নবীনমাধব, বয়স ছাব্বিশ বছর। তাঁর পিতা পরলোকে। তাঁর বিমাতা ইহলোকেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু বাস করেন পিত্রালয়ে; কারণ অনন্তবাবুর সঙ্গে তাঁর বনিবনাও নেই। তবে, সপত্নীপুত্র তাঁকে মাসোহারা থেকে বঞ্চিত করেননি।

অনন্তবাবুর সম্পত্তি স্বোপার্জিত এবং তাঁর অবর্তমানে সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে নবীনমাধবই। বিমাতার সঙ্গে না বনলেও অনন্তবাবু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইটিকে ভালোবাসেন যার-পর-নাই এবং তাকে এনে রেখেছেন নিজের কাছেই।

অনন্তবাবুর ম্যানেজারের নাম সুবোধকুমার বসু, লোহার কারবারে তিনিই তাঁর দক্ষিণ হস্তের মতো। দশ বছরের বিশ্বাসী লোক, প্রভুর অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

ঘটনার দিন কার্যসূত্রে অনন্তবাবুকে যেতে হয়েছিল আসানসোলে। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে দোকান বন্ধ করে সুবোধ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে অনন্তবাবুর বাড়ি আসে এবং টাকাগুলি রাখে দোতলার ঘরের লোহার সিন্দুকে। তারপর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সিন্দুকের দরজার চাবি নবীনমাধবের হাতে সমর্পণ করে নিজের বাসায় চলে যায়। সে বাস করে গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়িতে।

নবীনও সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ভোরের বেলায়। রাত্রিবেলায় বাড়িতে ছিল একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য। আরও-একজন দারোয়ান ও একজন ভৃত্য অনন্তবাবুর সঙ্গেই আসানসোলে গিয়েছিল। পাচক ও দাস-দাসী ঠিকা, রাত্রে ছিল না।

সকালে নবীন বাড়ি ফিরে আসবার আগেই ভৃত্য রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে বাইরে এসে দেখে, উঠোনের উপর পড়ে আছে দারোয়ানের অচৈতন্য দেহ, তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। মাটির উপরে রক্তের ধারা আর একগাছা রুপো-বাঁধানো মোটা রক্তাক্ত লাঠি।

তার চিৎকারে যখন লোকজন জড়ো হয়েছে সেই সময়েই নবীন বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর দেখা যায়, অনন্তবাবুর ঘরের দরজা খোলা। লোহার সিন্দুকের দরজাও খোলা, পঁচিশ হাজার টাকা অদৃশ্য। নবীন তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ তদন্তে এই কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছে

দরজার ও লোহার সিন্দুকের চাবি কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন একবারও কাছছাড়া করেনি। অথচ দরজার তালা ও সিন্দুকটা যে চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

রাত্রে সে কোথায় ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে নবীন বলে, এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা আদায় করা যায়নি।

দারোয়ানের দেহের কাছে যে মোটা লাঠিগাছা পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকারী যে স্বয়ং নবীন, সেটাও প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য রঘু বলে, রাত্রে সে কোনো শব্দ শোনেনি। দারোয়ান তাকে সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধি খেতে সে অভ্যস্ত নয়, ঘুমিয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।

অপরাধী যে কেমন করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল, এ সমস্যার কোনোই সমাধান হয়নি। সদর দরজা রঘু নিজের হাতে বন্ধ করেছিল। বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবার দ্বিতীয় কোনো উপায়ই নেই।

দারোয়ানই কি কড়া-নাড়া শুনে অপরাধীকে দরজা খুলে দিয়ে পরে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে? এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কারণ, দারোয়ান এখনও অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

॥ ৩ ॥

সমস্ত শুনে জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না। বাড়ির বাহিরে গিয়ে খানিকক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে এসে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। বাহির থেকে এ-বাড়ির ভিতরে আসবার কোনো উপায়ই নেই।'

—'তাহলে অপরাধী বাড়ির ভিতরে এল কেমন করে?'

—'এই সদর দরজা দিয়ে।'

—'দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।'

জয়ন্ত জবাব দিলে না। নীচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর মাটির উপর থেকে কী একটা তুলে নিয়ে চোখের কাছে রেখে পরীক্ষা করলে। তারপর পকেটের ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে জিনিসটা মুড়ে রাখলে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'কী ওটা?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'একরত্তি মাটি।' সে নতমুখে এদিকে-ওদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে অগ্রসর হল। উঠোনের উপরে আবার বসে পড়ল। আবার কী তুলে নিয়ে মোড়কের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আবার কী পেলে হে?'

—'আবার একরত্তি মাটি।'

—'খালি খালি মাটি কুড়িয়ে ছেলেখেলা কেন! কাজের কথা বলো।'

—'দোতলায় চলুন। যে-ঘর থেকে টাকা চুরি গিয়েছে সেইখানে।'

কিন্তু সেখানে নতুন কিছুই আবিষ্কৃত হল না।

জয়ন্ত বললে, 'এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে নবীনের রক্তাক্ত লাঠিগাছা।'

'হুম, আরও দুটো বড়ো সূত্র আছে। প্রথম, নবীনের কাছে ছিল দরজার আর সিন্ধুকের চাবি। দ্বিতীয়, কাল কোথায় রাত্রিবাস করেছিল, সে-কথা সে বলতে নারাজ কেন?'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু, ওরও চেয়ে বড়ো সূত্র হচ্ছে ওই লাঠিগাছা।'

—'হ্যাঁ, ওই সূত্র ধরে আমি নবীনকে গ্রেপ্তার করতে পারি।'

—'আপাতত সে চেষ্টা করবেন না।'

—'যদি সে পালায়?'

—'আমি নবীনের মুখ দেখেছি। বুদ্ধিমানের মুখ। বোকার মতন এখন পালিয়ে গিয়ে সে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।'

—'ওই নবীন আর সুবোধ এইদিকে আসছে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি?'

নবীন ও তার পিছনে পিছনে সুবোধ এসে দাঁড়াল জয়ন্তের সামনে। নবীনের মুখশ্রী, দেহের গঠন ও গায়ের রং চমৎকার। চোখের চাহনি শিশুর মতন সরল।

কিন্তু কারুর মুখ দেখে পুলিশ ভোলে না। কারণ এমন অপরাধীর সংখ্যাও অল্প নয়, যাদের মতন দেববাঞ্ছিত চেহারা পেলে মুনি-ঋষিরাও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন।

সুবোধের চেহারাও নিরীহ্ গোছের। শ্যামবর্ণ, দোহারা দেহ, মাথায় মাঝারি, মুখ হাসি হাসি। চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানুষটিকে মন্দ বলে মনে হয় না।

জয়ন্ত বললে, 'আসুন নবীনবাবু। বলতে পারেন, দারোয়ানের দেহের পাশে আপনার লাঠিগাছা পাওয়া গেছে কেন?'

শুষ্ক কণ্ঠে নবীন বললে, 'কেমন করে বলব মশাই, আমার নিজের মনেও বার বার জাগছে ওই প্রশ্নই। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।'

সুবোধের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, 'শুনলুম আপনার বাড়ি ঘুসুড়িতে। আপনি কি রোজ সেখান থেকে আনাগোনা করেন, না কলকাতাতেও কোনো বাসা রেখেছেন?'

সুবোধ বললে, 'গঙ্গার এপারে কলকাতা, ওপারে ঘুসুড়ি। দূর তো বেশি নয়, তাই ঘুসুড়ি থেকেই আনাগোনা করি।'

—'অনন্তবাবু আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন?'

সুবোধ ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু কালকের ঘটনার পরও তিনি আর কি আমাকে বিশ্বাস করবেন?'

নবীন বললে, 'আমিও কেমন করে দাদার কাছে মুখ দেখাব জানি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনাদের বেয়ারা রঘুকে একবার এখানে আসতে বলুন।'

রঘু এলে পর সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের সদর দরজা থেকে উঠোন পর্যন্ত রোজ ধোয়া-মোছা, ঝাঁট দেওয়া হয়?'

রঘু হাতজোড় করে বললে, 'হ্যাঁ হুজুর, দু-বেলাই। কর্তাবাবু কোথাও একতিল ধুলো দেখলে রেগে আগুন হয়ে ওঠেন।'

ঘরের জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এত কাছে গঙ্গা, তোমরা নিশ্চয় রোজ গঙ্গাস্নান করো?'

—'না হুজুর, গঙ্গায় স্নান করতে যাই কালেভদ্রে।'

—'কাল সকালে কি বৈকালে তোমাদের কেউ গঙ্গাস্নানে যায়নি?'

—'না হুজুর।'

—'সুন্দরবাবু, আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এসো মানিক।'

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবুও নীচে নেমে শুধোলেন, 'কী হে ভায়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, গঙ্গাস্নান করার সঙ্গে টাকা চুরির সম্পর্কটা কোন খানে?'

—'এখন বুঝবেন না।'

—'নতুন কোনো সূত্র পেয়েছ বুঝি?'

—'পেয়েছি। সবচেয়ে বড়ো সূত্র।'

—'সূত্রটা কী?'

—'একরত্তি মাটি।'

জয়ন্তের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, তুমি একটি আস্ত বাতুল!'

পথ দিয়ে যেতে যেতে মানিক বললে, 'আমিও একরত্তি মাটির মানে বুঝলুম না। তুমি এখন কী করবে?'

—'তথ্যানুসন্ধান। আমার বিশ্বাস, এটা জটিল মামলা নয়। চোর ধরা পড়তে বেশি বিলম্ব হবে না।'

—'কারুকে তুমি সন্দেহ করেছ?'

—'কারুকে না, কারুকে না। অর্থাৎ সকলকেই। নবীন, সুবোধ থেকে শুরু করে এ বাড়ির পাচক, দারোয়ান, বেয়ারা, দাসী সকলকেই। অথবা চোর হচ্ছে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি, কিন্তু তাহলেও বাড়ির কেউ-না-কেউ যে তাকে কোনো-না-কোনো সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আর, কোন দিক থেকে সে এসেছে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি।'

—'কী দেখে বুঝলে?'

—'একরত্তি মাটি।'

—'জয়ন্ত, তোমার নাগাল পাওয়া ভার!'

॥ ৪ ॥

এক, দুই, তিন দিন কেটে গেল। জয়ন্ত মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে; কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতি চায়ের আসর। সুন্দরবাবুও যথারীতি উপস্থিত।

টেলিফোনের ঘণ্টী বেজে উঠল। জয়ন্ত রিসিভার ধরে বললে, 'হ্যালো! হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। নমস্কার। কী বললেন? যাকে খোঁজা হচ্ছে তাকে পেয়েছেন? অতিশয় সুসংবাদ। তার নাম কী? রামলাল? বেশ বেশ। তাকে আজ দুপুরেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'কীসের সুসংবাদ জয়ন্ত?'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ বৈকালে অনন্তবাবুর বাড়ির সকলেই যেন এক জায়গায় হাজির থাকে, এমনকি পাচক পর্যন্ত।'

কৌতূহলে প্রদীপ্ত মুখে সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন জয়ন্ত, কেন?'

—'সকলের সঙ্গে আমি রামলাল নামে এক ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

—'কে রামলাল?'

—'ব্যাস, এখন আর কোনো প্রশ্ন নয়।' এই বলে জয়ন্ত একেবারে বোবা হয়ে গেল।

বৈকাল। অনন্তবাবুর বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় হাজির। টেবিলের সামনের চেয়ারখানা দখল করেছেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব। তাদের পিছনে আর-একজন লোক। তার খালি পা, কোমরে বাঁধা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি। জাতে বোধহয় সে বিহারি।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, এই লোকটির নাম রামলাল।'

—'হুম!'

—'নবীনবাবু, ঘটনার দিন আপনি কোথায় রাত্রিবাস করেছেন বলবেন না?'

নবীন কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন!'

—'বেশ, আপনাকে তা আর বলতে হবে না, কারণ আমি আপনার গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি।'

নবীনের মুখ হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন।

জয়ন্ত বললে, 'রামলাল, সেই রাত্রে এই নবীনবাবু কি তোমার নৌকো ভাড়া করেছিলেন?'

রামলাল বললে, 'না হুজুর।'

—'তবে?'

রামলাল অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে সুবোধকে।

জয়ন্ত বললে, 'সুবোধবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি রামলালের নৌকো ভাড়া করেছিলেন কেন?'

সুবোধের চেহারা তখন আর নিরীহের মতো দেখাচ্ছিল না। সে গর্জন করে বলে উঠল, 'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!'

—'কিন্তু রামলাল আপনাকে শনাক্ত করছে।'

—'ও ভুল দেখেছে।'

—'বেশ, আদালতে গিয়ে এই কথাই বলবেন। সকলে এখন আমার কথা শুনুন।'

॥ ৫ ॥

জয়ন্ত বলতে লাগল

'সুন্দরবাবু, আগেই আপনাকে বলেছিলুম, এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে, নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠিগাছা।

নবীনবাবু যদি ওই লাঠি দিয়ে দারোয়ানকে আঘাত করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বিরুদ্ধে অত বড়ো প্রমাণটা একান্ত নির্বোধের মতো ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যেতেন না।

এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছিল একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত। নবীনবাবুর দিকে পুলিশের সন্দেহ আকৃষ্ট করে অপরাধী নিরাপদে বাস করতে চেয়েছে যবনিকার অন্তরালে। নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠি পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। ঘরের দরজার আর সিন্দুকের চাবিও ছিল তাঁর কাছে। পুলিশ সহজেই ভ্রমে পড়তে পারত।

তার উপরে নবীনবাবু নিজেই ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিলেন। তিনি কিছুতেই বলতে রাজি নন, ঘটনার দিন রাত্রে ছিলেন কোথায়? সে গুপ্ত কথা আমি জানতে পেরেছি তাঁর মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে। তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। অনন্তবাবু তাঁর বিমাতাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করলে নবীনবাবু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন, এই ছিল অনন্তবাবুর কঠিন নির্দেশ। নবীনবাবু রক্তের টানে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ

গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভয়ে সে কথা স্বীকার করতে পারছিলেন না।

নবীনবাবুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি আর-একটা সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ঘটনাস্থলে বাড়ির সদর দরজার কাছে আর উঠোনের উপরে পেয়েছিলুম দুই টুকরো মাটি। পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলুম, তা গঙ্গামাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। রঘু বেয়ারা বললে, ঘটনার দিন বাড়ির কেউ গঙ্গাস্নানে যায়নি। সে দুই বেলা বাড়ির উঠোন প্রভৃতি ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে, তবু ওখানে দুই টুকরো গঙ্গামাটি এল কী করে? তুচ্ছ মাটির টুকরো কিন্তু অসামান্য হয়ে উঠল সূত্র হিসেবে।

করলুম কল্পনাশক্তির প্রয়োগ। মন বললে, অপরাধী এসেছে নৌকোয় চড়ে জলপথে। নদীতে তখন ভাটা ছিল, তাকে নামতে হল ভিজে মাটির উপরে। তার জুতোর তলায় লেগে রইল এঁটেল মাটি। সেই মাটি কিছু ঝরে পড়েছে ঘটনাস্থলে।

গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়িতে বাস করে সুবোধ। সে কেমন লোক? ঘুসুড়ির পুলিশ সন্ধান নিয়ে সে খবর আমাকে জানিয়েছে। সুবোধ হচ্ছে বিষম জুয়াড়ি। ঋণে সে ডুবে আছে। তার নৈতিক চরিত্রও ভালো নয়। হাতে পঁচিশ হাজার টাকা, অনন্তবাবু অনুপস্থিত; এ সুযোগ হয়তো সে ছাড়তে পারেনি। তার পক্ষে সিন্দুকের আর দরজার তালার দ্বিতীয় চাবি তৈরি করে নেওয়াও কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যদি নৌকো ভাড়া করে ঘুসুড়ি থেকে এসে থাকে, তবে নৌকোর মাঝিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ওইখানেই। তাই পাওয়া গেল। ঘুসুড়ির পুলিশই খুঁজে বার করেছে মাঝি রামলালকে।

কিন্তু সুবোধ বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে? আমার অনুমান, রঘু বেয়ারাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সেই সুবোধকে সদর দরজা খুলে দিয়েছে। সে কাজ সেরে যখন সরে পড়ছে, সেই সময়েই দারোয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। তার পরের কথা আপনারাই অনুসন্ধান করুন।—সুন্দরবাবু, একরত্তি মাটি কি ফ্যালনা?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উঁহুম, উঁহুম!'

একপাটি জুতো

একটা তদন্ত সেরে বাড়িমুখো হয়েছে জয়ন্ত ও মানিক। সঙ্গে একজন সেপাই ও একজন দারোগা। রাস্তা দিয়ে তারা গল্প করতে করতে আসছে, হঠাৎ একখানা বাড়ির দোতলা থেকে ডাক এল—'ও জয়ন্ত, ও মানিক!'

তারা মুখ তুলে দেখে, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরাতন বন্ধু নবীনচন্দ্র। সে জমিদার। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জমিদারিতে শিকার করতে যায়।

জয়ন্ত বলল, 'কী খবর নবীন?'

নবীন বলল, 'তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বোসো। আমি যাচ্ছি!'

বৈঠকখানায় ঢুকেই জয়ন্তের হুঁশিয়ার চোখ দেখলে দুটো ব্যাপার। দেওয়ালের বড়ো ঘড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে মেঝের উপরে। এবং পূর্ব দিকের জানলায় একটা গরাদে নেই, সেটাকেও কে খুলে মেঝের উপর ফেলে রেখেছে! জানলার কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, জানলার তলাকার কাঠের ফ্রেমে বাটালি বা কোনো অস্ত্র চালিয়ে কেউ স্থানচ্যুত করেছে গরাদেটাকে।

সে ফিরে বললে, 'মানিক, এই ঘরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নবীন বোধ হয় সেই জন্যেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।'

—'ঠিক আন্দাজ করেছ জয়ন্ত! সেই জন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি বটে।' বলতে বলতে নবীন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

আসন গ্রহণ করলে সকলে। বেয়ারাকে চা, টোস্ট ও এগ-পোচ আনবার হুকুম দিয়ে নবীন বললে, 'কাল রাতে এই ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে। গুরুতর চুরি নয়, তোমার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই মনে হবে। চুরি গিয়েছে আমার একটি রেডিয়ো-যন্ত্র!'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমার ঘরে রেডিয়ো যন্ত্র!'

নবীন হেসে বললে, 'হ্যাঁ মানিক! তোমরা সকলেই জানো, রেডিয়োর একটানা একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি আমার ধাতে সহ্য হয় না, তাই এতদিন এ বাড়িতে রেডিওর ছিল না কোনো ঠাঁই। কিন্তু বড়োমেয়েটা রেডিয়োর জন্যে এমন বিষম আবদার ধরেছে যে, কাল বৈকালে নগদ আটশত পঞ্চাশ টাকা মূল্য দিয়ে একটা বেতার-যন্ত্র না কিনে এনে আর পারা গেল না। যন্ত্রটা ওই টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু চোর তাকে এখানে রাত্রিবাসও করতে দেয়নি।'

জয়ন্ত বললে, 'চোর এসেছে ওই গরাদেটা খুলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'পূর্ব দিকের ওই সরু গলিটা কী?'

—'মেথর আসবার পথ। চোর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ওই গলিতে দাঁড়িয়ে ফ্রেম কেটে গরাদে খোলবার সুযোগ পেয়েছিল।'

—'ঘড়িটা মেঝের উপর নামানো কেন?'

—'ওটাও চোরের কীর্তি। তার ইচ্ছা ছিল ঘড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরের ভিতরে সন্দেহজনক শব্দ শুনে বেয়ারা এসে পড়ায় সে পালিয়ে

যেতে বাধ্য হয়েছে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে যে নিজের একপাটি জুতোও নিয়ে যেতে পারেনি।'

এইবারে জয়ন্ত কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, 'জুতো? কোথায় এই জুতো?'

—'ওই যে, জানলার তলাতেই পড়ে রয়েছে।'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিলে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'নবীন, এ হচ্ছে এমন কোনো লোকের জুতো, যার ডান পদতল বিকৃত, জুতোর বেডৌল গড়ন দেখেই তা ধরা যায়। বাটার কারখানায় তৈরি সস্তা দামের ছয় নম্বরের রবারের জুতো। এর ভিতরে সাদা সাদা কী রয়েছে দেখছ?'

—'বোধ হয় গুঁড়ো চুন।'

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালে, না।

বেয়ারা চা প্রভৃতি নিয়ে এল এমন সময়ে।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বেতার-যন্ত্রটা কাল রাতে এই টেবিলের উপরে ছিল তো? বেশ, আমি এইখানে বসেই চা পান করব।'

জয়ন্ত নীরবে চা ও খাবার খেতে খেতে উত্তর দিকে জানলাগুলো দিয়ে বারংবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

পানাহার শেষ করে জয়ন্ত বললে, 'নবীন, তোমার বাড়িতে বেতারের গণ্ডগোল কেউ কোনো দিন শোনেনি; এ বাড়িতে ওই উপসর্গ আছে, বাইরের লোক এমন সন্দেহ করতে পারবে না। অথচ যেদিন তুমি রেডিয়ো-যন্ত্র কিনেছ, ঠিক সেই দিনই তা চুরি হয়ে গেল। সুতরাং বেশ বোঝা যায়, এ হচ্ছে পাড়ার কোনো সন্ধানী চোরের কাণ্ড। যন্ত্রটা সে বৈকালেই রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিল।'

নবীন বললে, 'কিন্তু সে যে কে, বুঝতে পারব কেমন করে?'

—'এখান থেকে রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি দু-খানা বাড়ি। ও বাড়ি দু-খানা কাদের?'

—'লাল বাড়িখানায় থাকেন হাইকোর্টের এক উকিল। পাশের হলদে বাড়িখানা ভাড়াটে। একখানা কি দু-খানা ঘর নিয়ে ওখানে বাস করে ছয়-সাতটি পরিবার। আমাদের সরকারবাবুও থাকেন ওই বাড়ির দোতলায়।'

—'বটে, বটে! একবার তাঁকে এখানে আসতে বলবে?'

অবিলম্বে সরকারবাবুর প্রবেশ। জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার নাম?'

—'শ্রীবিনয়কুমার প্রামাণিক।'

—'সামনের ওই বাড়িতে আপনি কতদিন বাস করছেন?'

—'প্রায় তিন বৎসর।'

—'ওখানকার আর সব ভাড়াটেকে আপনি চেনেন কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই।'

—'দোতলায় আপনার সঙ্গে থাকেন কারা?'

—'পরিবার নিয়ে আর তিনটি ভদ্রলোক।'

—'তাঁদের পেশা?'

—'দুজন কেরানি, একজন স্কুলমাস্টার।'

—'নীচেয় কারা থাকেন?'

—'সবাই পূর্ব্ববঙ্গের লোক।'

—'তাঁরা কী কাজ করেন?'

—'বেশির ভাগ লোকই কাটা কাপড়ের ব্যাবসা করে। একজন কেবল শাঁখারিদের দোকানের কারিগর।'

—'নাম জানেন?'

—'হ্যাঁ। দুলাল।'

—'বিনয়বাবু, একটা কাজ করুন। দয়া করে দুলালকে একবার এখানে ডেকে আনুন। তাকে বলবেন, নবীনবাবুর স্ত্রী দু-ডজন খুব ভালো শাঁখা কিনতে চান, তিনিই তাকে ডেকেছেন।'

—'যে আজ্ঞে।'

সরকারের প্রস্থান। নবীন সবিস্ময়ে বললে, 'তোমার এ কী অদ্ভুত খেয়াল, জয়ন্ত? দু-ড়জন কী, আমার স্ত্রী একগাছাও শাঁখা কিনতে চান না।'

—'তোমার স্ত্রী আজ আলবত দু-ডজন শাঁখা কিনতে চান। তুমি জানো না।'

—'আমি জানি না, তুমি জানো?'

—'নিশ্চয়!'

—'জয়ন্ত, তুমি একটি পাগল।'

—'নবীন, তুমি একটি সুবৃহৎ হাঁদারাম।'

—'মানে?'

—'মানে এখনই বুঝতে পারবে।'

—'দেখা যাক। কিন্তু দু-ডজন শাঁখার দাম দিতে হবে তোমাকেই।'

ঘরের বাইরে পদশব্দ। সরকারবাবুর পিছনে একটি মূর্তির আবির্ভাব। বয়স হবে না উনিশ-বিশের বেশি। সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গি, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। পরনে আধ-ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি। খালি পা।

জয়ন্ত শুধোলে, 'তোমার নাম দুলাল?'

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জয়ন্ত লক্ষ করলে, ডান পায়ের পাতা এমন ভাবে বিকৃত যে, সোজা ভাবে মাটিতে পা ফেলে সে দাঁড়াতে পারে না। তার দুই পায়েরই নীচের দিকে লেগে রয়েছে সাদা সাদা কীসের গুঁড়ো!

জয়ন্ত বললে, 'দুলাল, আমার কাছে এসো।'

দুলাল প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল।

ফস করে সেই রবারের জুতোর পাটি বার করে জয়ন্ত শান্ত স্বরে বললে, 'দুলাল, কাল রাতে তোমার একপাটি জুতো এই ঘরে ফেলে রেখে গিয়েছিলে। ফিরিয়ে নাও তোমার জুতো।'

প্রথমটা চমকে উঠে, তারপরে সবেগে মাথা নেড়ে দুলাল বলে উঠল, 'ও জুতো আমার নয়।'

—'এ জুতো তোমারই। পায়ে পরে দ্যাখো—তোমার দুমড়ানো পায়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাবে।'

দুলাল চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ধরা-পড়া চোরের মতো।

জয়ন্ত বল্লে, 'নবীন, এই একপাটি জুতোর মধ্যেই আছে চোরের স্বাক্ষর। জুতোর ভিতরে যে সাদা গুঁড়োগুলোকে তুমি চুনের গুঁড়ো বলে ভ্রম করেছিলে, আসলে তা হচ্ছে শাঁখের গুঁড়ো। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। শাঁখারিরা ঠিক দুই পায়ের উপরে শাঁখ রেখে যখন করাত চালায়, তখন তাদের দুই পায়ের উপরেই ছড়িয়ে পড়ে শঙ্খচূর্ণ। দুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—শাঁখের পাউডার মেখে ওর পদযুগল এখনও শ্বেতবর্ণ হয়ে রয়েছে। ওর দুই পদ জুতোর মধ্যে প্রবেশ করলে তার ভিতরেও লেগে থাকবে শাঁখের গুঁড়ো। বেডৌল জুতোর পাটি পরীক্ষা করে খুব সহজেই ধরে ফেলেছিলুম যে, এর মালিক হচ্ছে এমন কোনো শাঁখারি, যার দক্ষিণ পদতল বিকৃত। তবু যদি দুলাল এখনও অপরাধ স্বীকার না করে, তুমি এই দারোগাবাবুটির সাহায্য নিতে পারো। এসো মানিক, আমাদের এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

খানিকটা তামার তার

মানিক চেঁচিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজ শ্রোতা হচ্ছে জয়ন্ত। সে চোখ বুজে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার মুখে বিরক্তির লক্ষণ। কোন খবরে নূতনত্ব নেই। খুনীরা খুন করছে সেই পুরাতন উপায়ে। চোররাও চুরি করবার নূতন পথ আবিষ্কার করতে পারছে না। সাধু এবং অসাধু সব মানুষই হচ্ছে একই বাঁধা পথের পথিক।

মানিক একটা নূতন খবর পড়ছে :

' অদ্ভূত দৈব দুর্ঘটনা! '

গত সপ্তাহে শালিখার একটা বাড়িতে অজিতকুমার বসু নামক জনৈক যুবক বজ্রাঘাতে মারা পড়িয়াছিল, এই সংবাদ আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করিয়াছি। গত পরশ্য রাতে আবার সেই বাড়িতেই অজিতকুমারের দ্বিতীয় ভ্রাতা অসীমকুমারের মৃত্যু হইয়াছে ঐ বজ্রাঘাতের ফলেই। ইংরেজী প্রবাদে বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না। কিন্তু উপর-উপরি দুইবারই একই পরিবারে একই দুর্ভাগ্যের এমন আশ্চর্য আবির্ভাবের কাহিনী আমরা আর কখনই শ্রবণ করি নাই।'

জয়ন্ত চোখ মেলে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, ' থামো মানিক। আপাতত আর কোনও খবর পড়ে শোনাতে হবে না।'

মানিক হেসে বললে, ' বুঝেছি।'

' কি বুঝেছ ?'

' এই খবরটার ভিতরে তুমি চিন্তার খোরাক পেয়েছ।'

' তা পেয়েছি বৈকি। আমার পাপী মন একরকম অসম্ভব দৈব দুর্ঘটনাকে সহজে স্বীকার করতে রাজী নয়। ভগবানের হাতের আড়ালে আমি দেখছি মানুষের হাত।'

মানিক জবাব না দিয়ে কাগজখানা সামনের টেবিলের উপর রেখে দিলে।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, ' টেলিফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দাও তো। '

' কাকে ফোন করবে?'

' আমাদের বন্ধু গিরীন্দ্র চৌধুরীকে।'

' ইন্সপেকটর গিরীন্দ্র চৌধুরী?'

' হ্যাঁ। তার কার্যক্ষেত্র তো ঐ অঞ্চলেই ; হয়ত সে আমাদের অন্ধকার মনকে কিঞ্চিত্ আলোকিত করতে পারবে।'

যথাসময়ে ফোনের মধ্যে জাগ্রত হল গিরীন্দ্র চৌধুরীর কন্ঠস্বর।

' গিরীন্দ্র, আমি জয়ন্ত।'

' একই বাড়ীতে বজ্রাঘাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু। ঘটনা কি তোমারই এলাকায় ঘটেছে ?'

' ও হো হো, বুঝেছি। মনসা পেয়েছে ধুনোর গন্ধ! তা, ঠিক আন্দাজ করেছ ভাই ? ঘটনাস্থলে আমাকেও হাজির হতে হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। '

' মানে ?'

' মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে সন্দেহ! কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ বা পোষণ করবার উপায় নেই।'

' কেন?'

' লোক-দুটো সত্য-সত্যই বজ্র বা বিদ্যুতের আক্রমণে মারা পড়েছে। '

' তবে আবার সন্দেহ কিসের ?'

' না, ঠিক সন্দেহও নয়। তবে মাঝে মাঝে পাচ্ছি যেন বিপরীত ইঙ্গিত। একবার বেড়াতে বেড়াতে আমার এখানে আসবে নাকি?'

' নারাজ নই।'

জয়ন্ত ও মানিককে দেখে গিরীন্দ্র বললে, ' প্রথমেই তোমরা কি এক-এক পেয়ালা কফি পান করতে চাও। জান তো, আমি চায়ের ভক্ত নই।'

জয়ন্ত বললো ' কফি বা চা কিছুই চাই না। আমরা আজ গল্প শুনতে এসেছি। '

' তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করি।'

' হ্যাঁ, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে।'

' শোন। আজ এক বছর হল, অমরনাথ বসু মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বড় জমিদার, যথেষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। অজিতকুমার, অসীমকুমার আর অমলকুমার হচ্ছে তাঁর তিন ছেলে। ছোট অমল নাবালক, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। অমরবাবুর একটি মাত্র মেয়ে সুষমা, তার বিবাহ হয়েছে, স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সুষমার শ্বশুরবাড়ি বিদেশে কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়িতেই বাস করে। এই হচ্ছে গত আর বর্তমান পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

' প্রথমে অজিত যখন বজ্রাঘাতে মারা পড়ে, ঘটনাটা আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করেনি। ডাক্তার বললে মৃত্যুর কারণ বিদ্যুতের আঘাত।

কিন্তু গেল পরশু অসীমও ঐ ভাবে মারা পড়তে আমরা রীতিমত চমকে গিয়েছি; এবারেও ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর কারণ শুনলুম বটে, কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে একই পরিবারের উপর বজ্রের এমন পক্ষপাতিত্ব বিস্ময়কর। অবশ্য দুটি ঘটনার রাত্রেই মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশ থেকে বজ্রের হুঙ্কার আমরা সকলেই শুনেছি।'

' তবে তুমি সন্দিগ্ধ হয়েছ কেন?'

' দু-দিনই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটো মৃতদেহ ছাড়া বজ্রাঘাতের আর কোনও চিহ্নই দেখতে পাইনি।'

' এ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেছ ?'

' করেছি। দু-দিনই লাস পাওয়া গিয়েছে পূর্বদিকের জানালার নীচে মেঝের উপর। এও লক্ষ্য করেছি মৃত্যুর রাত্রে অজিত আর অসীম যে বিছানায় ঘুমিয়েছিল, খাটের শয্যার উপরে সে প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু দুর্যোগময় রাত্রে তারা শয্যা ত্যাগ করে জানালার ধারে এসেছিল কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি।'

' তাহলে তোমরা কোন মামলা খাড়া করতে পারনি।'

' উঁহু ! মামলা দাঁড়াবে কিসের উপরে। প্রমাণ কই। সন্দেহ তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না!'

' আমাকে একবার ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পার?'

' অনায়াসে। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পাঁচ-ছয় মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি কি দেখবে?'

' যা দেখবার তাই।'

গিরীন্দ্র হেসে উঠে বললে, ' কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি সেখানে গিয়ে আমরা যা দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছুই তুমি দেখতে পাবে না? এটা মামলাই নয়, আশ্চর্যভাবে দৈব দুর্ঘটনায় দুটো লোক মরেছে এইমাত্র।'

' আশা করি তোমার কথাই সত্য হবে। এখন চল।

অমরবাবুর বাড়িখানি মাঝারি। তার পূর্বদিকে ট্রাম লাইনের পাতা রাস্তা, পশ্চিম দিকে খিড়কির পুকুর ও বাগান এবং দক্ষিণদিকে প্রতিবেশীদের বাড়ির সারি।

গিরীন্দ্রের সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক রাস্তার দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

গিরীন্দ্র সব দেখাতে দেখাতে বললে, ' বারান্দার কোণে এই যে তিনখানা ঘর দেখছ এর প্রথমখানা হচ্ছে অজিতের ঘর। দ্বিতীয়খানা অসীমের আর তৃতীয়খানা অমলের। প্রথম ঘরের এই জানালার তলায় অজিতের আর দ্বিতীয় ঘরের ঐ জানালার তলায় পাওয়া গেছে অসীমের মৃতদেহ। এ দুটো ঘর এখন খালি পড়ে আছে।'

জয়ন্ত দু'খানা ঘরে ঢুকেই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

প্রত্যেক জানালা, এমনকি দেওয়ালের লোহার গরাদে পর্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করলে। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর তারা তৃতীয় ঘরের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাহির থেকেই দেখা গেল, ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপরে বসে রয়েছে দুটি লোক। একজনের বয়স হবে আঠারো ঊনিশ আর এক জনের চল্লিশের কাছাকাছি।

জয়ন্তের দিকে ফিরে গিরীন্দ্র চুপি চুপি বললে, ' অমল আর তার ভগ্নিপতি সুরেনবাবু। '

তারপর ঘরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, ' কী হয়েছে সুরেনবাবু, অমলের মুখের ভাব অমনধারা কেন।'

অমলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে সুরেন বললে, ' বাড়িতে আবার পুলিশ দেখে অমল ভয় পেয়েছে। তাই আমি একে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

' বেশ করেছেন। আমরা বাঘ নই, তেড়ে গিয়ে অমলকে কামড়ে দেব না। আজ একেবারে শেষ তদন্ত করতে এসেছি, আর আসব না। '

সুরেন বললে, ' আর তদন্ত! এ হচ্ছে ভগবানের মার, পুলিশ তদন্তের ধার ধারে না !'

সেদিক থেকে ফিরে আসতে আসতে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, ' অমল কি এখনো এই ঘরেই থাকে?'

' হ্যাঁ।'

' একলা?'

' হ্যাঁ।'

' সুরেনবাবুর ঘর কোথায়?'

' বাড়ির পশ্চিম দিকে।'

বারান্দার রেলিঙের উপরে হাত রেখে ট্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে কী ভাবছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই।

মানিক বললে, 'কী হে, ধ্যান সাগরে তলিয়ে গেলে নাকি?'

' আমি তলাবার চেষ্টা করছি না মানিক, আমি ভাসবার চেষ্টা করছি। '

গিরীন্দ্র ঠাট্টার সুরে বললে, ' কী আবিষ্কার করলে শুনি?'

' শুনবেন? এই বাড়িতে চোর আসতে পারে সহজেই। '

' তাই নাকি?'

' নিচের ঐ গ্যাস-পোস্টটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর উপরে উঠলেই এই বারান্দার নাগাল পাওয়া যায়।'

' উঃ, অভাবিত আবিষ্কার!'

' আর একটা আবিষ্কার করেছি রাস্তার ওধারকার ঐ বাড়িখানার গায়ে ভাড়া-পত্র টাঙানো রয়েছে। ঐ বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

' তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী?'

' মনে করছি বাড়িখানা আমিই ভাড়া নেব। জায়গাটি আমার বেশ লাগছে। কিছুদিন এখানে বাস করব।'

' মানে ?'

' মানে কিছুই নেই। এ হচ্ছে আমার খেয়াল। আর খেয়াল হচ্ছে অর্থহীন। অতঃপর আমরা প্রস্থান করতে পারি।'

জয়ন্ত ঠাট্টা করেনি, আজ কদিন হল সত্যসত্যই শালিখার সেই বাড়িখানায় উঠে এসেছে। মানিকের কৌতুহলের সীমা নেই। সে বিলক্ষণ জানে, জয়ন্তর খেয়াল হয় না অকারণে। ঐ দুই মৃত্যুর ভিতর থেকে সে কোন সূত্র আবিষ্কার করেছে নিশ্চয়ই। নইলে ঘটনাস্থলের সামনা-সামনি থাকবার জন্য তার এতখানি আগ্রহ কেন?

জয়ন্তের মনের ভিতর প্রবেশ করবার জন্যে গিরীন্দ্রও কম ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সে রোজই আসে আর একই প্রশ্ন করে, ' কেন তুমি এ বাড়িখানা ভাড়া নিলে। এখানে থাকলে তোমার

কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

জয়ন্ত বোবা। শুধু মুখ টিপে হাসে আর নস্য নেয়।

হপ্তা-দুই কেটে গেল। দুপুরবেলায় জয়ন্ত বাইরে বেরিয়েছিল একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে ফিরে এল সন্ধ্যার সময়ে।

মানিক বললে, ' ব্যাগটি নূতন দেখছি , ভিতরে কি আছে?'

ব্যাগটা সযত্নে আলমারির ভিতর পুরে রহস্যময় হাসি হেসে জয়ন্ত বললে,

'যথাসময়েই বুঝতে পারবে।'

মানিক রাগ করে বললে, ' এত লুকোচুরি কেন?'

' প্রথম পরিচ্ছেদেই পরিশিষ্টের কথা বলে দিলে উপন্যাস পড়তে কারুর ভাল লাগে না। গোয়েন্দা-কাহিনীর আর্ট প্রকাশ পায় লুকোচুরির ভিতর দিয়ে।'

রাত এগারোটা বেজে গেল। এই সময়ে নৈশ আহার শেষ করে জয়ন্ত শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আজ সে খেয়ে দেয়ে রাস্তার ধারের জানালার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

মানিক সুধোলে, ' ঘুমোতে যাবে না ?'

' না।'

' কেন হে?'

' আমি দেখতে চাই আজ গভীর রাত্রে চাঁদের মুখে কালি ঢেলে গোটা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় কি না। তারপর হয়ত জাগবে হু-হু ঝোড়ো বাতাস, হয়ত ঝরবে ঝরো-ঝরো বাদলধারা, হয়ত বাজবে ডিমি ডিমি বজ্র ডমরু। '

' হঠাত্ উদ্ভট কবিত্বের কারণ কী?'

' কবি হতে চায় না কে বল।'

' আকাশে তো দেখি প্রতিপদের চাঁদের প্রতাপ। কেমন করে আজ ঝড়বৃষ্টি নামবে। '

' গণৎকার জানিয়ে দিলে।'

' সে আবার কে?'

' আবহবিদ্যা নিয়ে যাদের কারবার। জান তো আবহবিদ্যা জাহির করবার জন্য সরকারি অফিস আছে। আজ আমি সেখানে গিয়েছিলাম। খবর পেলুম, আজ শেষ রাতের দিকে

রীতিমত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।'

' তুমি ক্রমেই অন্যায় রকমের দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। আর তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করব না। আমি এখন ঘুমোতে যাই।'

' তথাস্তু।'

অনেক রাতে কিসের শব্দে হঠাত্ মানিকের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভিতর হু হু করে জোর হাওয়া। ঘরের দরজাটা খোলা। জানালার সামনে চেয়ারের উপর জয়ন্ত নেই। তার বিছানাও শূণ্য।

বজ্রের হুঙ্কারে চমকে মানিক বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে চাঁদের আলোর বদলে সেখানে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্ধকারকে। বৃষ্টি নামার শব্দও শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে মানিকের চোখে পড়ল আর এক দৃশ্য। অমরবাবুর বাড়ির সামনে গ্যাস-পোস্টের উপরে একটা মূর্তি। পরমুহূর্তে মূর্তিটি ঝাঁপ খেল মাটির উপরে। গ্যাসের আলোকে চিনতে বিলম্ব হল না। জয়ন্ত।

মানিক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে, জয়ন্ত আবার এসে দাঁড়ালো ঘরের ভিতরে। তার হাসি-হাসি মুখ।

' এসব কী জয়ন্ত, তুমি চোরের মত অমরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে?'

' গিয়েছিলাম।'

' তোমার পায়ে রবারের জুতো, হাতে রবারের দস্তানা!'

' হাঁ, এ হচ্ছে ভালকানাইজড় রবার।'

' আশ্চর্য!'

' এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য যদি হতে চাও তাহলে ছুটে যাও টেলিফোনের কাছে।'

' তারপর?'

' গিরীন্দ্রকে ফোন কর। বল, এখনি সদলবলে ছুটে আসতে।'

' সেকি, এই রাতে! এই ঝড়-জলে ?'

' হাঁ, হাঁ, হাঁ! বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন কোরো না। গিরীন্দ্রকে বল এখনি সদলবলে অমরবাবুর বাড়িতে না গেলে এ মামলার কিনারা হবে না। ততক্ষণে আমি একটু বিশ্রাম করে নি।'

অল্পক্ষণ পরেই একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে গিরীন্দ্র এসে হাজির হলেন হন্তদন্তের মত।

সে কোনও প্রশ্ন করার আগেই জয়ন্ত বললে, ' এখন কোনও কথা নয় । এখনই আমাদের যেতে হবে অমরবাবুর বাড়ির ভিতরে । '

দ্বারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে এই অসময়ে পুলিশ দেখে অবাক হয়ে গেল। জয়ন্ত সকলকে নিয়ে উঠে গেল একেবারে উপরে। রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে সে টর্চের আলো ফেললে। সেখানে পড়ে আছে একটা নিশ্চেষ্ট মূর্তি।

গিরীন্দ্র সভয়ে বললে, ' বাবা! আবার বজ্রাঘাতে মৃত্যু নাকি?'

জয়ন্ত বললে, ' আরো এগিয়ে দেখ।'

গিরীন্দ্র কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ভাল করে দেখে মহা বিস্ময়ে বলে উঠল, ' একি, সুরেনবাবু! এঁর হাত পা মুখ বাঁধলে কে !'

জয়ন্ত বললে, ' আমি।'

' কেন?'

' সুরেন হচ্ছে খুনী।'

' খুনী! সুরেনবাবু আবার কাকে খুন করেছেন ?'

' অজিত আর অসীমকে । '

এমন সময় বারান্দার তৃতীয় ঘরের একটা জানালা খুলে গেল। ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল অমলের ভীত মুখ ।

জয়ন্ত বললে, ' সুরেন আজ আবার বধ করতে চেয়েছিল ঐ বেচারা অমলকে।'

গিরীন্দ্র বললে, ' কিন্তু অজিত আর অসীমের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে! বজ্র তো সুরেনবাবুর হাতে ধরা নয় । '

' অসীম আর অজিত বজ্রাঘাতে মারা যায়নি। তাদের মৃত্যু হয়েছে মানুষের হাতে বন্দী বিদ্যুত্-প্রবাহের দ্বারা।'

' প্রমাণ।'

' ঐ জানালার দিকে তাকিয়ে দেখ?'

জানালার ছয়টা গরাদের গায়ে জড়ানো রয়েছে খানিকটা তামার তার।

গিরীন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ' আমি বুঝতে পারছি না।'

' বিদ্যুত্-প্রবাহ সবচেয়ে বেশি জোরে চলে রুপোর ভিতর দিয়ে । তারপর তামার স্থান ।

তারপর সোনা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।'

' বুঝলুম । কিন্তু এই তামার তারের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে কেমন করে?'

' সামনেই ট্রামের লাইন। মাথার উপরকার যে মোটা তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে, জানালার এই তামার তারের অন্য প্রান্তে এখনো ঝুলছে তার সঙ্গে লগ্ন হয়ে । মাঝখান থেকে তার কেটে দিয়েছি আমি নইলে এতক্ষণে আমাকেও কেউ জীবিত অবস্থায় দেখতে পেতে না।'

' কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! কিন্তু - '

' এখনো তোমার মনে ' কিন্তু ' আছে। তাহলে আরো একটু পরিষ্কার করে বলছি শোন।' জয়ন্ত বলতে লাগল, ' সুরেন হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর অতি চালাক শয়তান । মাথা খাটিয়ে নরহত্যার বেশ একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করেছিল। কাজ করত এমন একটি রাতে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র যেদিন তাকে সাহায্য করবে। কী করে সে মনের মত রাত্রি নির্বাচন করত ; এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে! আমি মনে করি, আমার মতন সেও কোন সরকারি আবহ-বিদ্যাবিদদের কাছে আনাগোনা করত।

' এরূপ অবস্থায় মানুষের পক্ষে কী করা স্বাভাবিক, এ নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করেছিল। এই বর্ষাকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা, শয়নগৃহের জানালার পাশেই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রে যদি হঠাত্ বৃষ্টি আসে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বৃষ্টির ছাট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিদ্রাজড়িত চক্ষে তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে খোলা জানালাগুলো দুমদাম শব্দে বন্ধ করে দিই ।

' আমাদের এই অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে সুরেন পাতত চমৎকার ফাঁদ। খানিকটা তামার তার সে এমনভাবে জানালার গরাদগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে রাখত যে জানালা বন্ধ করতে গেলেই সেই তার স্পর্শ করা ছাড়া উপায় নেই। তামার তারের অপর প্রান্ত সে নিক্ষেপ করত বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত ট্রামের তারের উপরে । জলে জানালার তার আরও জীবন্ত হয়ে উঠত, তখন তাকে ছুঁলেই মৃত্যু অনিবার্য ।

' তারপর যথাসময়ে সুরেন আবার এসে নিজের অপকীর্তির গুপ্ত চিহ্নগুলি বিলুপ্ত করে দিত। আমার বিশ্বাস বিপজ্জনক মৃত্যুকে এমন ভাবে খেলা করার সময়ে আমার মত সুরেনও ব্যবহার করত ভালকানাইজড় রবারের জুতো ও দস্তানা। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তিতাকে আক্রমণ করতে পারত না।

’ সুরেন এটাও হয়ত অনুমান করেছিল যে, একই বাড়িতে একেকভাবে উপর-উপরি তিন জন লোকের মৃত্যু হলে পুলিশের সন্দেহের সীমা থাকবে না। কিন্তু এটাও তার অজানা ছিলনা যে, আসল রহস্য আবিষ্কার করতে না পারলে যে কোনও সন্দেহই পঙ্গু হয়ে থাকবে কারণ সন্দেহ ও প্রমাণ এক কথা নয়। কিন্তু সুরেন অতি চালাক কিনা, তার চক্রান্ত বুঝবার মতন লোকও যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, এটা সে ধারণায় আনতে পারেনি। এ হচ্ছে অতি চালাকের দুর্বলতা ।

’ একই বাড়িতে উপর-উপরি দুই ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু, অথচ ঘরে বজ্রাঘাতের চিহ্ন নেই এবং মৃত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় ঠিক জানালার ধারেই! এইসব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেই আমি পেয়েছিলুম এর মধ্যে হত্যাকারীর হাতের সন্ধান! টারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে জীবন্ত তারের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আমার মনে ফুটে উঠল সন্দেহের ভীষণ ইঙ্গিত।

’ তারপর হত্যার উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে বিলম্ব হল না। অমরবাবুর তিন পুত্রের অবর্তমান সম্পত্তির মালিক হবেন তাঁর কন্যা এবং সুরেন হচ্ছে সেই কন্যার স্বামী ?

’ ঘটনাস্থলের উপর পাহারা দেবার জন্যই আমি সামনের বাড়ী থানা ভাড়া নিয়েছিলুম। আবহ-বিদ্যাবিদ বললেন, আজ গভীর রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা । আমিও অবিজাগ্রত হয়ে উঠলুম বারান্দার উপরে চোরের মতন সুরেনের আবির্ভাব দেখে। চুপি চুপি গ্যাসপোস্টের সাহায্যে বারান্দায় উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলুম। তারপর সুরেনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতা যেই শেষ হল, আমিও অমনি বাঘের মতন তার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়লুম- আমি চেয়েছিলুম তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে। সে ট্যু শব্দটি করবার আগেই আমি তাকে বন্দী করে ফেললুম এবং তখনই কেটে দিলুম বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত মৃত্যু-ফাঁদের তার।’

অলৌকিক

॥ এক ॥

ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবারের দিকে বরাবরই তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আজ বৈকালী চায়ের আসরে পদার্পণ করেই বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত, ও-বেলা কী বলেছিলে, মনে আছে তো?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'মনে না থাকে, মনে করিয়ে দিন।'

—'নতুন খাবার খাওয়াবে বলেছিলে।'

—'ও, এই কথা? খাবার তো প্রস্তুত।'

—'খাবারের নাম শুনতে পাই না?'

—'মাছের প্যাটি আর অ্যাসপ্যারাগাস ওমলেট।'

—'রেঁধেছে কে?'

—'আমাদের মধু।'

—'মধু একটি জিনিয়াস। আনতে বলো, আনতে বলো।'

চা-পর্ব শেষ হল যথাসময়ে। অনেকগুলো প্যাটি আর ওমলেট উড়িয়ে সুন্দরবাবুর আনন্দ আর ধরে না।

পরিতৃপ্ত ভুঁড়ির উপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, 'মনের মতো পানাহারের মতো সুখ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কী বলো মানিক?'

মানিক বললে, 'কিন্তু অত সুখের ভিতরেও কি একটি ট্রাজেডি নেই?'

—'কী রকম?'

—'খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়?'

—'তা যা বলেছ!'

—'আবার অনেক সময় খাবার ফুরোবারও আগে পেটই ভরে যায়।'

—'হ্যাঁ ভায়া, ওটা আবার খাবার ফুরনোরও চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। খাবার আছে, পেট কিন্তু গ্রহণ করতে নারাজ। অসহনীয় দুঃখ।'

ঠিক এমনি সময়ে একটি লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

তাকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠল, 'আরে, আরে, হরেন যে! বোসো ভাই বোসো। সুন্দরবাবু, হরেন হচ্ছে আমার আর মানিকের বাল্যবন্ধু।'

মানিক বললে, 'হরেন, ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু, বিখ্যাত গোয়েন্দা আর প্রখ্যাত ঔদরিক।'

—'হুম, ঔদরিক মানে কী মানিক?' শুধোলেন সুন্দরবাবু।

—ঔদরিক, অর্থাৎ উদরপরায়ণ।'

—'অর্থাৎ পেটুক। বেশ ভাই, বেশ, যা খুশি বলো, তোমার কথায় রাগ করে আজকের এমন খাওয়ার আনন্দটা মাটি করব না।'

জয়ন্ত বললে, 'তারপর হরেন, তুমি কি এখন কলকাতাতেই আছ?'

—'না, কাল এসেছি। আজই দেশে ফিরব। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা খবর দিয়ে যেতে চাই।'

—'কীরকম খবর?'

—'যেরকম খবর তোমরা ভালোবাসো।'

—'কোনো অসাধারণ ঘটনা?'

—'তাই।'

—'তাহলে আমরাও শুনতে প্রস্তুত। সম্প্রতি অসাধারণ ঘটনার অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হয়ে আছি। ঝাড়ো তোমার খবরের ঝুলি।'

॥ দুই ॥

হরেন বললে, 'সুন্দরবাবু, জয়ন্ত আর মানিক আমাদের দেশে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আগে তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ হচ্ছে একটি ছোটো শহর, কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। সেখানে পনেরো-ষোলো হাজার লোকের বাস। অনেক ডেলিপ্যাসেঞ্জার কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বড়ো অফিসারও আছেন। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এই পথটা বেশির ভাগ লোকই পায়ে হেঁটে পার হয়, যাদের সঙ্গতি আছে তারা ছ্যাকড়াগাড়ি কি সাইকেল-রিকশার সাহায্য নেয়।

'মাসখানেক আগে—অর্থাৎ গেল-মাসের প্রথম দিনে সুরথবাবু আর অবিনাশবাবু সাইকেল-রিকশায় চড়ে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা দুইজনেই বড়ো অফিসার, একজন মাহিনা পান হাজার টাকা, আর-একজন আটশত টাকা। সেই দিনই তাঁরা মাহিনা পেয়েছিলেন। স্টেশন থেকে মাইলখানেক পথ এগিয়ে এসে একটা জঙ্গলের কাছে তাঁরা দেখতে পেলেন আজব এক মূর্তি। তখন রাত হয়েছে, আকাশে ছিল সামান্য একটু চাঁদের আলো, স্পষ্ট করে কিছুই চোখে পড়ে না। তবু বোঝা গেল, মূর্তিটা অসম্ভব ঢ্যাঙা, মাথায় অন্তত নয় ফুটের কম উঁচু হবে না। প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল সেটা কোনো নারীর মূর্তি, কারণ

তার দেহের নীচের দিকে ছিল ঘাঘরার মতো কাপড়। কিন্তু তার কাছে গিয়েই বোঝা গেল সে নারী নয়, পুরুষ। তার ভীষণ কালো মুখখানা সম্পূর্ণ অমানুষিক। তার হাতে ছিল লাঠির বদলে লম্বা একগাছা বাঁশ। পথের ঠিক মাঝখানে একেবারে নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

'রিকশাখানা কাছে গিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বিষম চিৎকার করে ধমকে বলে উঠল, 'এই উল্লুক, গাড়ি থামা!' তারপরেই সে রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপে দিলে। গুড়ুম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রিকশার চালক গাড়ি ফেলে পলায়ন করলে। সুরথবাবু আর অবিনাশবাবুও গাড়ি থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই মূর্তিটা তাঁদের দিকে রিভলভার তুলে কর্কশ স্বরে বললে, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, সঙ্গে যা আছে সব রিকশার উপরে রেখে এখান থেকে সরে পড়ো।'

'তাঁরা প্রাণে বাঁচতেই চাইলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গের সমস্ত টাকা, হাতঘড়ি, আংটি এমনকি ফাউনটেন পেনটি পর্যন্ত সেইখানে ফেলে রেখে তাঁরা তাড়াতাড়ি চম্পট দিলেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে রিকশার পাশে কুড়িয়ে পায় কেবল সেই লম্বা বাঁশটাকে।

'প্রথম ঘটনার সাত দিন পরে ঘটে দ্বিতীয় ঘটনা। মৃণালবাবু আমাদেরই দেশের লোক। মেয়ের বিয়ের জন্যে তিনি কলকাতায় গয়না গড়াতে দিয়েছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ হাজার টাকার গয়না নিয়ে পদব্রজেই আসছিলেন। তিনিও একটা জঙ্গলের পাশে সেই সুদীর্ঘ ভয়াবহ মূর্তিটাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেদিন কতকটা স্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু জঙ্গলের ছায়া ঘেঁসে মূর্তিটা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, ভালো করে কিছুই দেখবার জো ছিল না। সেদিনও মূর্তিটা রিভলভার ছুড়ে ভয় দেখিয়ে মৃণালবাবুর গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। সেবারেও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায় কেবল একগাছা লম্বা, মোটা বাঁশ।

'এইবারে তৃতীয় ঘটনা। শশীপদ আমার প্রতিবেশী। কলকাতার বড়োবাজারে আর কাপড়ের দোকান। ফি-শনিবারে সে দেশে আসে—গেল শনিবারেও আসছিল। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল, কিন্তু চাঁদ ওঠেনি। স্টেশন থেকে শহরে আসতে আসতে পথের একটা মোড় ফিরেই শশীপদ সভয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব ঢ্যাঙা বীভৎস মূর্তিটাকে। মানে, ভালো করে সে কিছুই দেখতে পায়নি, কেবল এইটুকুই বুঝেছিল যে, মূর্তিটা সহজ মানুষের চেয়ে প্রায় দুইগুণ উঁচু। সেদিনও সে রিভলভার ছুড়ে শশীপদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা হস্তগত করে।

শশীপদ দৌড়ে একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেইখানে বসেই শুনতে পায় খটাখট খটাখট খটাখট করে কীসের শব্দ! ক্রমেই দূরে গিয়ে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। শশীপদ ভয়ে সারা রাত বসেছিল জঙ্গলের ভিতরেই। সকালে বাইরে এসে পথের উপরে দেখতে পায় একগাছা বাঁশ।

'জয়ন্ত, এই তো ব্যাপার! পরে পরে তিন-তিনটে অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় আমাদের শহর রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর দলে খুব ভারী না হলে পথিকরা স্টেশন থেকে ও-পথ দিয়ে শহরে আসতে চায় না। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও রহস্য ভেদ করতে পারছে না। অনেকেই মূর্তিটাকে অলৌকিক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন তোমার মত কী?'

॥ তিন ॥

জয়ন্ত স্তব্ধ বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ঘটনাগুলোর মধ্যে কী কী লক্ষ করবার বিষয় আছে, তা দ্যাখো। বাংলা দেশে নয় ফুট উঁচু মানুষ থাকলে এতদিনে সে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অপরাধী নয় ফুট উঁচু নয়। সে দেহের নীচের দিকটা ঘাঘরায় বা ঘেরাটোপে ঢেকে রাখে। কেন? তার মুখ অমানুষিক বলে মনে হয়। কেন? সে একটা লম্বা বাঁশ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার বাঁশটাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায়। কেন? সে প্রত্যেক বারেই চেষ্টা করে, তার চেহারা কেউ যেন স্পষ্ট করে দেখতে না পায়। কেন? শশীপদ শুনেছে, খটাখট খটাখট করে একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। কীসের শব্দ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?'

—'কিছু কিছু পারছি বই কি! হরেন, ওই তিনটে ঘটনায় যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছে, তাঁরা কি শহরের বিভিন্ন পল্লির লোক?'

—'না, তাঁরা সকলেই প্রায় এক পাড়াতেই বাস করেন।'

—'তবে তোমাদের পাড়ায় বা পাড়ার কাছাকাছি কোথাও বাস করে এই অপরাধী!'

—'কেমন করে জানলে?'

—'নইলে ঠিক কোন দিনে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি প্রচুর টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে, অপরাধী নিশ্চয়ই সে খবর রাখতে পারত না।'

—'না জয়ন্ত, আমাদের পাড়ায় কেন, আমাদের শহরেও নয় ফুট উঁচু লোক নেই।'

—'আমিও ও-কথা জানি।'

—'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'আপাতত বেশি কিছু বুঝেও কাজ নেই। আমাকে আরো কিঞ্চিৎ চিন্তা করবার সময় দাও। তুমি আজই দেশে ফিরে যাচ্ছ তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'পরশু দিনই আমার কাছ থেকে একখানা জরুরি চিঠি পাবে। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ্ পরে তুমি কলকাতায় এসে আমাদের তোমার দেশে নিয়ে যাবে।'

হরেন চলে গেল। জয়ন্ত যেন নিজের মনেই গুনগুন করে বললে, 'খটাখট খটাখট খটাখট শব্দ। মূল্যবান সূত্র।'

॥ চার ॥

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় হরেন এসে হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, 'চিঠিতে যা যা বলেছি ঠিক সেইমতো কাজ করেছ তো?'

—'অবিকল।'

—'মানিক, সুন্দরবাবুকে ফোন করে জানাও, আজ সাড়ে-পাঁচটার ট্রেনে আমরা যাত্রা করব।'

প্রায় সাড়ে-সাতটার সময়ে তারা হরেনদের দেশে এসে নামল।

আকাশ সেদিন নিশ্চন্দ্র। স্টেশন থেকে শহরে যাবার রাস্তায় সরকারি তেলের আলোগুলো অনেক তফাতে তফাতে থেকে মিট মিট করে জ্বলে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকেই আরও ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করছিল। নির্জন পথ। আশপাশের ঝোপঝাপের বাসিন্দা কেবল মুখর ঝিল্লির দল। দুইখানা সাইকেল-রিকশায় চড়ে তারা যাচ্ছিল। প্রথম গাড়িতে বসেছিল হরেন ও মানিক। দ্বিতীয় গাড়িতে জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কী যে বুঝেছ তা তুমিই জানো, আমি তো ছাই এ ব্যাপারটার ল্যাজা-মুড়ো কিছুই ধরতে পারিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘটনাগুলো আমিও শুনেছি, আপনিও শুনেছেন। তারপর প্রধান-প্রধান সূত্রের দিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে ছাড়িনি। মাথা খাটালে আপনি অনেকখানিই আন্দাজ করতে পারতেন।'

—'মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করেছি ভায়া, কিন্তু খানিকটা ধোঁয়া (তাও গাঁজার ধোঁয়া) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।'

—'মুটেরাও মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে কতটুকু? সুন্দরবাবু, আমি আপনাকে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে বলছি না, মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে বলছি।'

—'একটা শক্ত রকম গালাগালি দিলে বটে, কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস, আজকেই তুমি এই মামলাটার কিনারা করতে পারবে?'

—'হয়তো পারব, কারণ অপরাধীরা প্রায়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বিপদে পড়ে। হয়তো পারব না, কারণ কোনো কোনো অপরাধী নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু হুঁশিয়ার! পথের মাঝখানে আবছায়া গোছের কী একটা দেখা যাচ্ছে না?'

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে! মুক্ত আকাশের স্বাভাবিক আলো দেখিয়ে দিলে, অন্ধকারের মধ্যে একটা অচঞ্চল ও নিশ্চল সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি! বাতাসে নড়ে নড়ে উঠছে কেবল তার পরনের ঝলঝলে জামাকাপড়গুলো।

আচম্বিতে একটা অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র চিৎকার চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে জেগে উঠল—'এই! থামাও গাড়ি, থামাও গাড়ি!' সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের শব্দ!

কিন্তু তার আগেই অতি-সতর্ক জয়ন্ত ছুটন্ত গাড়ি থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছে এবং গর্জন করে উঠেছে তারও হাতের রিভলভার!

গুলি গিয়ে বিদ্ধ করলে মূর্তির ডান হাতখানা, তার রিভলভারটা খসে পড়ল মাটির উপরে সশব্দে! কেবল রিভলভার নয়, আর-একটাও কি মাটিতে পড়ার শব্দ হল—বোধ হয় বংশদণ্ড! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাবার উপক্রম করলে, কিন্তু পারলে না, এক সেকেন্ড টলটলায়মান হয়েই হুড়মুড় করে লম্বমান হল একেবারে পথের উপরে।

দপদপিয়ে জ্বলে উঠল চার-চারটে টর্চের বিদ্যুৎ-বহ্নি!

জয়ন্ত ক্ষিপ্র হস্তে ভূপতিত মূর্তিটার গা থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান মেরে খুলে দিলে। দেখা গেল, তার দুই পদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে দুইখানা সুদীর্ঘ যষ্টি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'stilt' এবং বাংলায় যাকে বলে 'রনপা'।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি এর মুখে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড মুখোশ—কাফ্রির মুখোশ। এখন মুখোশের তলায় আছে কার শ্রীমুখ, 'সেটাও দেখা যেতে পারে।'

আর এক টানে খসে পড়ল মুখোশও।

হরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দেখছি আমাদের পাড়ার বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে রামধন মুখুজ্জে! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুপথে যায়, কুসঙ্গীদের দলে মেশে, নেশাখোর হয়, জুয়া খেলে, পাড়ার লোকেদের উপরে অত্যাচার করে—এর জন্যে সবাই ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু এর পেটে পেটে যে এমন শয়তানি, এতটা তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!'

॥ পাঁচ ॥

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রধান প্রধান সূত্রের কথা আগেই বলেছি, এখন সব কথা আবার নতুন করে বলবার দরকার নেই। কেবল দু-তিনটে ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে। গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অপরাধী হরেনেরই পাড়ার লোক। সে পাড়ায়—এমনকি, সে শহরেও নয় ফুট উঁচু কোনো লোকই নেই। সুতরাং ধরে নিলুম সে উঁচু হয়েছিল কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। অপরাধের সময়ে সে আবছায়ায় অবস্থান করে—পাছে কেউ তার কৃত্রিম উপায়টা আবিষ্কার করে ফেলে, তাইতেই আমার ধারণা হল দৃঢ়মূল। এখন সেই কৃত্রিম উপায়টা কী হতে পারে? শশীপদ শুনেছিল, খটাখট খটাখট করে কী একটা শব্দ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই ধাঁ করে আমার মাথায় আসে রনপার কথা। রনপার উপরে আরোহণ করলে মানুষ কেবল উঁচু হয়ে ওঠে না, খুব দ্রুত বেগে চলাচলও করতে পারে। সেকালে বাংলা দেশের ডাকাতরা এই রনপায় চড়ে এক এক রাতেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হয়ে যেতে পারত। পদক্ষেপের সময়ে রনপা যখন মাটির উপরে পড়ে, তখন খটাখট করে শব্দ হয়। কিন্তু রনপায় উঠে কেউ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টাল সামলাবার জন্যে চলাফেরা করতে হয়। অপরাধী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে একগাছা বাঁশের সাহায্য গ্রহণ করত। কার্যসিদ্ধির পর বাঁশটাকে সে ঘটনাস্থলেই পরিত্যাগ করে যেত, কারণ রনপায় চড়ে ছোটবার সময়ে এতবড়ো একটা বাঁশ হয়ে ওঠে উপসর্গের মতো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এসব তো বুঝলুম, কিন্তু আসামি এমন বোকার মতো আমাদের হাতে ধরা দিলে কেন, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, ওটা আমার কল্পনাশক্তির মহিমা! আগেই বলেছি তো, অপরাধীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে। অপরাধী সর্বদাই খবর রাখত, পাড়ার কোন ব্যক্তি কবে কী করবে বা কী করবে

না। আমার নির্দেশ অনুসারে হরেন রটিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় ব্যাংকের পর ব্যাংক ফেল হচ্ছে, সে ব্যাংকে আর নিজের টাকা রাখবে না। অমুক তারিখে কলকাতায় গিয়ে সব টাকা তুলে নিয়ে আসবে। অপরাধী এ টোপ না গিলে পারেনি।'

সুন্দরবাবু বললে, একেই বলে ফাঁকতালে কিস্তি মাত!'

জয়ন্তের অ্যাডভেঞ্চার

বন-সাই-রহস্য
কামরার মামলা
ডবল মামলার হামলা
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
রিভলভার
পলাতক চায়ের পেয়ালা
ব্রহ্মরাজের পদ্মরাগ
জয়ন্তের প্রথম মামলা

‘বন্‌-সাই-রহস্য
তথাকথিত
চুম্বক এবং লৌহ

বরাবরই জানি, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। আগেও দেখেছি, আবার তারই অন্যতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল সেদিনে।

আগরপাড়ায় গিয়েছিলুম আশীর্বাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আমি আর জয়ন্ত। মনে ছিল আসন্ন মিলনোৎসবের বিমল-আনন্দ। তার মধ্যে করুণ বিয়োগান্ত দৃশ্যের কল্পনাই অসম্ভব।

আকাশ-বাতাসও ছিল প্রসন্ন। কিন্তু ভবিষ্য সূচনা দেবার জন্যেই রাত এগারোটার পরেই আকাশ-বাতাস আচম্বিতে প্রসন্নতা ভুলে করলে বিদ্রোহ-ঘোষণা। দেখা গেল আঁধার আকাশ-সায়রে বিদ্যুতের ছিনিমিনি-খেলা এবং ঝটিতি শোনা গেল ক্রুদ্ধ ঝটিকার ঝন্‌-ঝন্‌ ঝনৎকার। তারপর ভেসে গেল পৃথিবীর বুক ঝমাঝম্‌ বৃষ্টির ঝর-ঝর ঝরনায়।

কিন্তু আমরা এর মধ্যেও বিশেষ কোন ট্রাজেডির ইঙ্গিত পেলুম না। বৈশাখে তো জল-ঝড় হচ্ছে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার!

প্রকৃতির ক্ষ্যাপামি থামল না রাত একটার আগে। গ্রামের অলিগলিতে দেখা দিলে অস্থায়ী নদী কলকল শব্দে। তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের মোটরযান যে নৌযানের কর্তব্যপালন করতে রাজি হবে না, এটুকু অনুমান করা কঠিন নয়।

কিন্তু সেজন্যেও আমাদের মাথাব্যথা ছিল না কিছুমাত্র। এসেছি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে, বাকি রাতটুকুর জন্যে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেল অনায়াসেই।

পরদিনের তরুণ প্রভাত। ঝলোমলো সোনালী সূর্য-করে, অমলিন আকাশের নীলিমায়, গন্ধবহ বাতাসের গুঞ্জনে, সুরেলা পাখিদের কূজনে কোথাও নেই গত রাত্রের দুর্বিষহ দুর্যোগের আভাস। পথও আর নদীর মত দুস্তর নয়, জল নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে।

আমি একমনে মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলুম। পাশের আসনে জয়ন্ত। অদূরেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

হঠাৎ জয়ন্ত বলে উঠল, “গাড়ি থামাও মাণিক!”

গাড়ি থামিয়ে শুধোলুম, “ব্যাপার কি?”

এদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, “পথের পাশে মাঠের ঐ গাছতলায় একটা সন্দেহজনক কি দেখা যাচ্ছে।”

—"সন্দেহজনক?"

—"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, একটা মানুষ জামাকাপড় পরেই ওখানকার ভিজে জমির উপরে শুয়ে বা ঘুমিয়ে আছে। স্বাভাবিক নয়।"

—"কি করতে চাও?"

—"তদারক।"

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ফিরে চেঁচিয়ে বললে, "মাণিক, দেখে যাও।" তার গলার আওয়াজ সচকিত।

আমিও কৌতূহলী হয়ে যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

গাছতলার ভিজে ঘাসজমির উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জনৈক ব্যক্তি। কিন্তু তাকে ঘুমন্ত লোক বলে সন্দেহ করবার উপায় নেই, কারণ তার জামার বুকপকেটের কাছটা রক্তরাঙা। মৃতদেহ।

লোকটির চেহারা সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত। বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। সুগঠিত দেহ, সুগৌর বর্ণ, সুশ্রী চোখ-নাক। জামা-কাপড়-জুতায় সৌখিনতার চিহ্ন। পাঞ্জাবীর উপরে মুক্তার বোতাম। বুকে সংলগ্ন বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলির উপরে একটি অঙ্গুরী থেকে সূর্যকিরণে জ্বল্-জ্বল্ করছে একখণ্ড হীরক।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ল। মৃতদেহের ডান হাতখানা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার বদ্ধ-মুষ্টির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কি-একটা জিনিস—যেন কোন গাছের ডালের এক টুকরো।

পকেট থেকে আতসী কাঁচখানা বার করে মৃতের বদ্ধমুষ্টির উপরে ধরে জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মাণিক, আমি এইখানেই থাকি। গাড়ি নিয়ে থানায় গিয়ে তুমি খবর দিয়ে এস। ব্যাপারটা 'ইন্টারেষ্টিং' বলে মনে হচ্ছে। বোধ করি অভাবিত ভাবেই আমাদের কোন খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

মোটরের দিকে এগুতে এগুতে মনে মনে ভাবতে লাগলুম, চুম্বক লোহাকে না টেনে ছাড়ে না। খুনের মামলা সর্বদাই জয়ন্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়!

'বন্-সাই' কী চীজ?

সদলবলে যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হল থানার ইনস্পেক্টর। নাম সুজন সেন। আর কোন মামলায় তার সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয় নি। অপরিচিত।

পুলিসে কিছুকাল কাজ করবার পর থেকেই লোকের ভুঁড়ি বাড়তে শুরু করে কেন, তার গুপ্তকথা আমার জানা নেই। সুজনেরও বপুখানি রীতিমত মেদপুষ্ট। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। মস্ত মুখমণ্ডলে ছোট্ট দুটো কুৎকুতে চোখ। পুরু ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে একজোড়া জাঁদরেল গোঁফ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গায়ের রং এমন যে, অমাবস্যার রাতে সে দুই হাত দূর থেকেও অদৃশ্য মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে।

জয়ন্ত অপেক্ষা করছিল মৃতদেহের পাশেই। তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সুজন উদ্ধতভাবে বাজখাঁই গলায় শুধোলে, "কে আপনি? এখানে কেন?"

জয়ন্ত বিনীতভাবে বললে, "আজ্ঞে, আমিই লাসটাকে প্রথমে দেখতে পেয়েছি।"

—"আপনার নাম কি?"

জয়ন্ত পরিচয় দিলে।

নিজের দুই ভুরু কপালের উপরদিকে যথাসম্ভব তুলে সুজন বললে, "ওহো, মাঝে মাঝে আপনার নাম আমার কানে আসে বটে! শুনি আপনি নাকি অ্যামেচার ডিটেকটিভ—অর্থাৎ সখের গোয়েন্দা?"

—"আজ্ঞে, এখনো আমি 'ডিটেকটিভ উপাধিলাভের যোগ্য হই নি। নিজেকে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বলেই মনে করি।"

সুজনবাবু হঠাৎ অতিশয় গম্ভীর হয়ে বললেন, "যাক্‌গে ও-সব ছেঁড়া ছেঁড়া ছেঁদো কথা, এখন আমি নিজের কাজ শুরু করি। হ্যাঁ মশাই, আপনি লাস-টাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি তো?"

—"আজ্ঞে না।"

—"উত্তম। আনাড়ীরা ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভালো ভালো সূত্র নষ্ট হয়ে যায়।"

সুজন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে মৃতদেহের চারিদিকটা একবার পরিক্রমণ করলে। তারপর লাসের পাশে বসে পড়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর মৃতের জামা-কাপড় হাতড়াতে লাগল, কিন্তু একখানা চেকবই আর একটা ফাউন্টেন পেন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

সুজন বললে, "অনেক কথাই জানা যাচ্ছে। এটা যে খুনের মামলা তাতে আর সন্দেহ নেই। মৃত্যুর কারণ রিভলভারের গুলি। লাসের বুকে আর হাতে রয়েছে মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি আর সোনার হাত-ঘড়ি, সুতরাং অর্থলোভে কেউ একে খুন করে নি। হত ব্যক্তি ধনী। যখন চেকবই পেয়েছি, লোকটিকে সনাক্ত করাও কঠিন হবে না।"

জয়ন্ত বললে, "আরো একটা কথাও বোঝা যাচ্ছে। ভদ্রলোককে এখানে খুন করা হয় নি।"

মুখ টিপে একটু হেসে সুজন বললে, "তাই নাকি?"

—"মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোথাও এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই।"

আবার ফিক্ করে হেসে সুজন বললে, "কালকের বিষম বৃষ্টির পরও মাটির উপরে রক্তের দাগ থাকে নাকি?"

—"কিন্তু জামার উপরে রক্তের দাগ অস্পষ্ট হয় নি কেন? আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, অমন তুমুল দুর্যোগেও লাসের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা জামা-কাপড়ের ভাঁজ ভেঙে যায় নি।"

জয়ন্তের যুক্তি শুনে সুজন মনে মনে কি ভাবলে জানি না, কিন্তু মুখে অবহেলাভরে বললে, "সখের গোয়েন্দার সৌখিন মতামত নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। আপাতত এখানকার তদন্ত শেষ করলুম। আগে লাস সনাক্ত করি, তারপর অন্য কথা।"

এতক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে সুজনের নজর গেল। মুঠো খুলে খণ্ডিত গাছের ডালের অংশটা বার করে নিয়ে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "কি দেখছেন?"

—"গাছের ডালের টুকরো।"

—"কি গাছ?"

—"কোন ছোট জাতের গাছ।"

—"মৃত ব্যক্তির হাতে ওটা এল কেমন করে?"

—"খুব সম্ভব অন্তিমকালে মৃত ব্যক্তির হাতে ছিল কোন একটা ছোট গাছ।"

—"ঠিক বলেছেন!"

—"মারাত্মক চোট খেয়ে মৃত ব্যক্তি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে, সেই সময়ে গাছের একটা ডাল ভেঙে তার মুঠোর ভিতরে থেকে যায়।"

"এও ন্যায্য অনুমান। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, ও-রকম কোন গাছের চিহ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। ঐ ভাঙা ডালটায় কিছু কিছু পাতাও আছে। বলতে পারেন, ওটা কি গাছের ডাল?"

—"হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেবদারুর। কিন্তু তা অসম্ভব।"

—"কেন?"

—"দেবদারুর আকার হয় বিশাল। তার ডাল আর পাতাও এত ছোট হতে

পারে না। চারা অবস্থায় দেবদারুও ছোট থাকে বটে, কিন্তু এটা কোন চারা গাছের ডাল নয়।''

—''ঠিক। এটা চারা গাছের ডাল নয়। এ হচ্ছে 'বন্-সাই্'!''

—''কি, কি বললেন?''

—''বন্-সাই!''

—''সে আবার কি চীজ বাবা?''

—''আপাতত আমার এর বেশি আর কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'বন্-সাই'য়ের মধ্যেই আছে এই মামলার প্রধান সূত্র! চল মাণিক, বেলা ৰাড়ছে, আমাদের প্রাতরাশের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়!''

পাগলের দিকে লোকে যে ভাবে চেয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই সুজন ফ্যাল্‌ফেলিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

পুলিসের অতিথি

পূর্বোক্ত ঘটনার একদিন পরে।

জয়ন্তের হাতে রুপোয় গড়া শামুকের নস্যদানী। আমার হাতে খবরের কাগজ। আমি কাগজ পড়ছি, জয়ন্ত চোখ মুদে শুনছে। সামনের টেবিলে খাদ্যপানীয়শূন্য চায়ের পেয়ালা, কেটলি ও পিরিচ প্রভৃতি। এইমাত্র আমাদের প্রাতরাশ জঠরস্থ হয়েছে।

আমি পড়তে লাগলুম :

আগরপাড়ার হত্যাকাণ্ড

আগরপাড়ার মাঠে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, গতকল্য আমরা সে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে এখন কয়েকটি নতুন তথ্য জানা গিয়াছে।

নিহত ব্যক্তির নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি জমিদার এবং কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপরিচিত।

ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা সত্যেন্দ্রবাবু বিশেষ কোন লোকের সঙ্গে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আর বাড়িতে ফিরেন নাই। পরদিন প্রভাতে আগরপাড়ার এক মাঠে তাঁহার রক্তাক্ত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়।

রাত্রে তিনি আগরপাড়ায় গিয়াছিলেন কেন, পুলিস তাহার কারণ ধরিতে পারে নাই। সেখানে তাঁহার পরিচিত কোন লোকই বাস করে না।

হত্যাকারী সত্যেন্দ্রবাবুর মূল্যবান মুক্তার বোতাম, হীরার আংটি ও সোনার হাতঘড়িতে হস্তক্ষেপ করে নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী, দানশীল ও জনপ্রিয়। তাঁর চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ক, নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করিতেন না। তবু এমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পড়িলেন কেন তাহারও কারণ কেহ অনুমান করিতে পারিতেছে না।

এই বিয়োগান্ত ঘটনার উপরে রহিয়াছে একটা ঘনীভূত রহস্যের আবরণ। উদ্দেশ্যহীন নরহত্যা কেউ করে না, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? প্রতিহিংসা? কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু ছিলেন অজাতশত্রু।

মামলার ভারগ্রহণ করিয়াছেন সুযোগ্য পুলিস কর্মচারী শ্রীসুজন সেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি এমন একটি বিশেষ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ফলে অবিলম্বেই রহস্যভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জয়ন্ত চোখ খুলে বললে, "বাহাদুর সুজনবাবু, বাহাদুর! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এর মধ্যেই রহস্যভেদ হবার সম্ভাবনা!"

আমি বললুম, "তুমি কি সেটা অসম্ভব বলে মনে কর?"

—"হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভবপর হওয়াও কঠিন।"

—"কেন?"

—"পুলিস ভুল পথে চলেছে।"

—"কি করে জানলে?"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টটা দেখ। সত্যেনবাবু রাত্রে আগরপাড়ায় গিয়েছিলেন কেন, পুলিস এখনো তার কারণ ধরতে পারে নি।"

—"কিন্তু সে কারণের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সত্যেনবাবু স্বেচ্ছায় আগরপাড়ায় যান নি।"

—"তুমি কি মনে কর, সত্যেনবাবুকে জোর করে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?"

—"না।"

—"তবে?"

জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই দোতালার সিঁড়ির উপরে শোনা গেল উদ্দাম পায়ের দুদ্দাড় শব্দ এবং তারপরেই হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল একটি যুবক। তার মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্ত। আমরা তার দিকে তাকিয়ে রইলুম সবিস্ময়ে।

যুবক অবসন্নের মত একখানা চেয়ার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ভালো করে তার মুখের পানে তাকিয়ে আমি আর একটা ব্যাপার

আবিষ্কার করলুম। গতপূর্ব দিনের সকাল বেলায় আগরপাড়ার মাঠে যে সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে যুবকের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে আশ্চর্য-রকম।

জয়ন্ত সুধোলে, "কে আপনি? কি চান?"

যুবক সকাতরে বলে উঠল, "আমাকে রক্ষা করুন!"

—"পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে চায়!"

—"কেন?"

—"পুলিস আমাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে। আমি সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর ছোট ভাই। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

—"বটে? কিন্তু কেমন করে জানলেন, পুলিস আপনাকে সন্দেহ করে?"

—"তাদের ভাবভঙ্গি দেখে আর প্রশ্ন শুনে। আমার উপরে ঢালাও হুকুম হয়েছে, আমি যেন বাড়ির বাইরে পা না বাড়াই। এমন কি আমাদের বাড়ির দরজায় পাহারাওয়ালা মোতায়েন হয়েছে। আমি খিড়কীর দরজা দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

—"বোকামি করেছেন। এতে পুলিসের সন্দেহ আরও বাড়বে।"

—"উপায় কি? আমি নির্দোষ, কিন্তু পুলিস আমায় বিশ্বাস করে না। শুনেছি, এই মামলার সঙ্গে আপনার নাম জড়িত আছে! তাই—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া বললে, "আপনি আমায় চেনেন?"

—"নিশ্চয়ই চিনি! আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত ব্যক্তি, আপনার কাছে যারা অপরিচিত, তারাও আপনাকে চেনে। চিনি বলেই বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আপনার হাতেই আমি আমার ভার অর্পণ করতে চাই।"

—"আপনার ভার বহন করবার শক্তি আমার হবে কিনা জানি না। কারণ আপনি যদি সত্যসত্যই অপরাধী হন, তবে—"

দ্বিজেন বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "আমি অপরাধী? যাঁকে দেবতার মত দেখি, সেই বড় ভাইকে আমি খুন করব? বলেন কি মশাই?" সে উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললে, "শান্ত হোন দ্বিজেনবাবু, আমি আপনাকে অপরাধী বলছি না। কিন্তু আপনার কোন কথাই আমি জানি না। এই চেয়ারের উপরে স্থির হয়ে বসুন। এখন বলুন দেখি, ঘটনার দিন বৈকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন?"

—"বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর লাইট-হাউসে

যাই। সিনেমা দেখে রাত ন'টার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসি। রাত দশটা পর্যন্ত রেডিয়োর গান শুনি। সাড়ে দশটার সময়ে আহারাদি শেষ করে ঘুমোতে যাই, রাত তখন এগারোটা।"

—"তাহলে আপনার অবর্তমানেই সত্যেনবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তা জানেন?"

—"তা জানি না, তবে কেন গিয়েছিলেন সেটা বৌদিদির মুখে শুনেছি।"

—"কি শুনেছেন?"

—"দাদা নাকি কি-একটা দুর্লভ 'কিউরিও' কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আগরপাড়ায় নয়, কলকাতাতেই। দাদার বেজায় সখ ছিল 'কিউরিও' কেনার। সখটা প্রায় বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে হরেক-রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখা যাবে আমাদের বাড়ির যেখানে সেখানে। সে-সবের কোনটা সুন্দর, কোনটা বিচিত্র, কোনটা আবার একেবারেই উদ্ভট। এমন সব জিনিসও দাদা চড়া দাম দিয়ে কিনতেন, সাধারণ লোকের কাছে যেগুলো জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।"

—"এইবারে আপনাদের সংসারের কথা কিছু বলুন।"

—"জমিদার হিসাবে আমাদের নামডাক আছে। নিজেদের ধনী বললে অত্যুক্তি করা হবে না। পিতার অবর্তমানে দাদা আর আমিই জমিদারির মালিক। দেড় বৎসর হল, দাদা বিবাহ করেছেন। বৌদিদিও ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, বিবাহের পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাঁরও পিতৃবিয়োগ হয়। আমি এখনো অবিবাহিত।"

—"সত্যেনবাবু পরলোকে, এখন জমিদারির স্বত্বাধিকারী কে?"

—"আমি। দাদা নিঃসন্তান।"

—"পুলিসের সন্দেহের কারণ অনুমান করছি। আচ্ছা দ্বিজেনবাবু, আপনি জানেন কি, মৃত সত্যেনবাবুর হাতের মুঠোয় গাছের একটা অংশ পাওয়া গিয়েছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনস্পেক্টর সুজনবাবু সেটা আমাকে দেখিয়েছেন।"

—"সে-রকম কোন গাছ আপনাদের বাড়িতে আছে?"

—"আজ্ঞে না।"

—"ঠিক জানেন?"

—"হ্যাঁ, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"আপনার বৌদিদির নাম কি?"

—"শ্রীমতী লতিকা দেবী।"

—"তিনি কি অবগুণ্ঠনবতী কুলললনা, অন্তঃপুরের বাইরে পদার্পণ করেন না?"

—"না মশাই, তিনি একেবারে আধুনিকা। এম-এ পাস করেছেন—ঘরে-বাইরে তাঁর অবাধ গতি।"

—"তাহলে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ হবেন না?"

—"নিশ্চয়ই হবেন না। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

—"বেশ তো, এখুনি চলুন না! যদিও তিনি এখন অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন, তবু—"

দ্বিজেনের কথা শেষ হবার আগেই ভৃত্য মধু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বললে, "পুলিসের সুজনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!"

দ্বিজেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে তার গৌরবর্ণ মুখ হয়ে গেল মড়ার মত হল্‌দে। প্রায়বদ্ধকণ্ঠে সে বললে, "পুলিস এসেছে পিছনে পিছনে! আমার কি হবে জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত ডান হাত তুলে আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ!"

ধুপ-ধাপ্ পদশব্দ তুলে সুজন ঘরের ভিতরে ঢুকে দ্বিজেনের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে উষ্ণ স্বরে বললে, "পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া এত সোজা নয়, আমাদের চর আপনার পিছনে লেগে আছে ছায়ার মত!"

দ্বিজেন সকাতরে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না মশাই! আমি পালাবার জন্যে এখানে আসি নি।"

—"তবে কি করতে এসেছেন? ভেরেণ্ডা ভাজতে?"

জয়ন্ত বললে, "উঁহু, তাও নয়! উনি এসেছেন সলাপরামর্শ করতে!"

এইবারে জয়ন্ত ও আমাকে দেখতে পেয়ে সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "একি, আপনারাও এখানে?"

জয়ন্ত হাতজোড় করে হাসতে হাসতে বললে, "অতি বিনয়ের ভাষায় বলতে হয়, এটাই হচ্ছে অধীনের গোলামখানা!"

—"তাই নাকি, তাই নাকি? আমি এ কথা জানতুম না। কিন্তু খুনের মামলার আসামীর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি?"

—"আসামী! কে আসামী?"

নিজেকে শুধরে নিয়ে সুজন বললে, "না, না, এখনো ঠিক আসামী বলতে পারি না, তবে আসামী হতে আর বেশি দেরি নেই।"

—"কাকে লক্ষ্য করে এ কথা বলছেন? দ্বিজেনবাবু?"

—"তা ছাড়া আবার কে?"

—"ওঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ?"

—"মশাই, আইনে 'সার্কাম্স্ট্যান্শিয়াল্ এভিডেন্স' বা অবস্থাঘটিত প্রমাণ বলে একটা ব্যাপার আছে জানেন তো? যেমন বিনা আগুনে ধোঁয়ার জন্ম হয় না, তেমনি বিনা উদ্দেশ্যে খুন হওয়াও অসম্ভব। সত্যেনবাবুর কোন শত্রুর কথা শোনা যায় না। মূল্যবান দ্রব্যের লোভেও কেউ তাঁকে খুন করে নি। সুতরাং বাইরের হত্যাকারীর কথা এখানে ধর্তব্য নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে, সত্যেনবাবুর মৃত্যুর ফলে সব চেয়ে লাভবান হবে কোন্ ব্যক্তি?"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এ যুক্তি জজে মানে। সত্যেনবাবুর মৃত্যু হলে দ্বিজেনবাবু একলাই সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন বটে। ঠিক কথা, ঠিক কথা, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!"

সুজন উৎসাহিত হয়ে বললে, "তারপর দেখুন, দ্বিজেনবাবুর 'অ্যালিবাই' সন্তোষজনক নয়। সত্যেনবাবু তাঁর মৃত্যুর দিনে সন্ধ্যার সময়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তখন উনি নাকি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষী কে? ওঁর মুখের কথা তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না?"

—"তাও কখনো হয়? তবে কিনা সিনেমা দেখে উনি রাত ন'টার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।"

—"এলেই বা! সত্যেনবাবুও তো মারা পড়েছেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যেই!"

—"কি করে জানলেন?"

—"ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গিয়েছে।"

—"অতএব?"

—"অতএব দ্বিজেনবাবুকে আমাদের অতিথি হতে হবে। ভেবেছিলুম আপাতত ওঁকে বাড়ির মধ্যেই নজরবন্দী করে রাখব, কিন্তু উনি যখন তাতে রাজি নন, হটরহটর করে হাটে-মাঠে ছুটোছুটি করতে চান, তখন তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

দ্বিজেন সভয়ে বলে উঠল, "আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন!"

জয়ন্ত বললে, "না দ্বিজেনবাবু, এটা ঠিক গ্রেপ্তার নয়। তবে আপাতত দু-চারদিন আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পুলিসের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।"

—"হা ভগবান! তাহলে আপনিও আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না?"

—"পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

হো হো করে হাসতে হাসতে সুজন বললে, "চেষ্টা করে শেষটা কিছু ফল হবে কি জয়ন্তবাবু? ডিটেকটিভ নভেলের সখের গোয়েন্দারা পদে পদে সরকারি পুলিসের উপরে টেক্কা মারে বটে, কিন্তু আমরা হচ্ছি বাস্তব জগতের মানুষ।

পেশাদারের কাছে সৌখিনের খাতির নেই—বলে রাখলুম এক কথা, বুঝলেন মশায়?"

—"যা বলেছেন, লাখ টাকার এক কথা! তাহলে দ্বিজেনবাবু, দুর্গা বলে আপনি এখন সুজনবাবুর সঙ্গে যাত্রা করুন। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার দাদার নামে 'ফোন' আছে নিশ্চয়ই?"

—"আছে।"

দ্বিজেনকে নিয়ে সুজন প্রস্থান করল। জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল মৌনমুখে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "মাণিক, সত্যেনবাবুর বাড়িতে ফোন করে লতিকা দেবীকে আজকের ব্যাপারটা জানিয়ে দাও। আর এটাও বলে রেখ, বৈকালে আমরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। বিশেষ দরকার।"

সুজনের মুরুব্বিয়ানার বাড়াবাড়িটা জয়ন্ত গায়ে মাখল না বটে, কিন্তু আমার গা যেন জ্বলতে লাগল। তবে কথাতেই আছে অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি। এও বারবার দেখেছি যে, জয়ন্তের কাছে চাল মারতে গিয়ে অনেক চালিয়াতকেই শেষ পর্যন্ত ল্যাজে-গোবরে হতে হয়েছে, সুজনেরও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না!

লতিকা দেবী

বৈকালে যথাসময়ে আমরা মৃত সত্যেনবাবুর বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম।

স্বহস্তে মোটর চালিয়ে যথাস্থানে গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?"

আমি শুধোলুম, "কি?"

—"একখানা কালো রঙের সিডান গাড়ি সারা পথ আমাদের পিছু পিছু এসেছে। ঐ দেখ, গাড়িখানা এখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটছে।"

—"হয়তো এইটেই ওর গন্তব্য পথ।"

—"হয়তো তাই। চল, নেমে পড়ি।"

প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। ফটকে পাহারারত দ্বারবান। লতিকা দেবীর কাছে আমাদের আগমন সংবাদ পাঠালুম। অনতিবিলম্বে ভৃত্য এসে আমাদের একখানা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

লম্বা-চওড়া হল-ঘর। বোধ করি বৈঠকখানা। সাজসজ্জা কেবল মালিকের

রুচি পরিচায়ক নয়, রীতিমত অসাধারণ। বাঙালী ধনীদের অন্যান্য বৈঠকখানার সঙ্গে এর পার্থক্য যেখানে চোখে পড়ে সেইখানেই।

চার দেওয়াল চিত্রে চিত্রে চিত্রময়। প্রত্যেক ছবি হাতে আঁকা, এঁকেছেন নামজাদা চিত্রকররা। যেখানে সেখানে রয়েছে প্রাচীন ভাস্করদের হাতে গড়া পাথরের, পিতলের ও ব্রোঞ্জের দুর্মূল্য মূর্তি। মাঝে মাঝে 'সো-কেসে'র মধ্যে সাজানো আছে চৈনিক, জাপানী, মিশরীয়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নানাশ্রেণীর শিল্পসম্ভার। বসবার আসনগুলিও বিশেষ ফরমাস দিয়ে নতুন পরিকল্পনায় প্রস্তুত। মেঝের উপরে বিছানো মহামূল্যবান পারস্যদেশীয় কার্পেট। প্রতিটি আসবাব—এমন কি ছাইদানগুলো পর্যন্ত শিল্পীসুলভ মনের পরিচয় দেয়।

জয়ন্ত একটি 'সো-কেসে'র সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন চীনদেশে নির্মিত পোর্সিলেনের বাসন পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে ধীরপদে এসে দাঁড়ালেন বিষাদের প্রতিমূর্তির মত এক মহিলা। মুখে তাঁর নিরাশা ও যাতনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু তিনি পরমা সুন্দরী। দেখলেই বোঝা যায় কেবল সৌন্দর্য নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বও আছে।

জয়ন্ত নমস্কার করে মৃদুস্বরে বললে, "আপনিই বোধ হয় লতিকা দেবী?"

প্রতি-নমস্কার করে মহিলা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার আসন গ্রহণ করুন।" তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, কিন্তু ভারাক্রান্ত।

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর জয়ন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, "এই দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা উচিত নয়। কিন্তু আপনার দেবর দ্বিজেনবাবু এই মামলায় আমাদের নিযুক্ত করেছেন। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন না বলেই মনে করি। তাই নিরুপায় হয়েই এই দুঃসময়েও আমাদের আসতে হয়েছে, এজন্যে ক্ষমা করবেন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে লতিকা দেবী বললেন, "ভগবান আমাকে দুর্ভাগ্যের আঘাত সহ্য করবার শক্তি দিয়েছেন। যা হবার তা হয়েছে, এখন আবার আমার দেবরও বিপন্ন—দুনিয়ায় আজ আমার আত্মীয় বলতে উনি ছাড়া আর কেউ নেই। ওঁকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করবার আর আমার স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্যে আপনাদের আমি যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

—"পুলিস আপনার দেবরকে কেন সন্দেহ করে জানেন তো?"

ক্রুদ্ধস্বরে লতিকা দেবী বললেন, "অন্যায় সন্দেহ, অসম্ভব সন্দেহ! আমার দেবর আমার স্বামীকে পূজা করতেন।"

—"আমারও বিশ্বাস, পুলিসের সন্দেহ অমূলক। আমিও তাঁর মুক্তি চাই।"

লতিকা দেবীর দুই চক্ষে ফুটল আগুনের ফিনিক। তপ্ত স্বরে তিনি বললেন, "আপনার কর্তব্য কি এই পর্যন্তই? যে পাষণ্ড আমার দেবতুল্য স্বামীকে হত্যা করেছে, তার শাস্তিবিধানের জন্যে কি আপনি কোন চেষ্টাই করবেন না?"

—"লতিকা দেবী, এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ আগে আমি অপরাধীকেই আবিষ্কার করতে চাই। তাহলেই পুলিস দ্বিজেনবাবুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।"

—"আমার কাছ থেকে আপনি কি জানতে চান, বলুন।"

—"আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, সত্যেনবাবুর কোন শত্রুর কথা আপনি জানেন?"

—"না।"

—"অর্থলোভেও কেউ সত্যেনবাবুকে খুন করে নি। তবে এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি? আপনার স্বামীর উপরে কারুর কোন আক্রোশ ছিল না? ভালো করে ভেবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে লতিকা দ্বিধাভরে বললেন, "দেখুন, আপনি বললেন বলে একটা কথা আমার মনে পড়ছে। কিন্তু কথাটা এতই তুচ্ছ যে উল্লেখযোগ্যই নয়। পুলিসেরও কাছে কথাটা উল্লেখ করা দরকার ভাবি নি।"

—"তবু আপনি বলুন! অনেক সময়ে নগণ্য কথাই অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে।"

—"কিন্তু ব্যাপারটা দেড় বৎসর আগেকার। আমার স্বর্গীয় বাবা দুরারোগ্য রোগে দীর্ঘকাল শয্যাগত ছিলেন। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, চিকিৎসার কোনই ত্রুটি হয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররাও তাঁর আশা ছেড়ে দিলেন। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। জীবনের আর কোন আশা নেই জেনে আমার বিবাহের জন্যে বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার জন্যে নির্বাচিত হল এক বনিয়াদী বংশের পাত্র। তাঁর অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না বটে, কিন্তু সেজন্যে বাবার আপত্তি হল না, কারণ আমি ছিলুম তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। বিবাহের দিন ধার্য হল। তারপর কানাঘুষায় শোনা গেল, পাত্রের নৈতিক চরিত্র ভালো নয়, তিনি মদ্যপ আর জুয়াড়ি। সম্বন্ধ ভেঙে গেল।"

—"তারপর সত্যেনবাবুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আর বিবাহ হয়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বিবাহের কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে। আমার স্বামী একখানা উড়ো চিঠি পান। তাতে শাসানো হয়েছিল, আমাকে বিবাহ করলে তাঁকে হত্যা করা হবে। উড়ো চিঠিখানা নগণ্য ভেবে তিনি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তারপর এই বেনামী চিঠিখানার কথা আমরা একরকম ভুলেই যাই।"

—"যাঁর সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে যায়, তাঁর নাম আপনার মনে আছে?"

—"রতিকান্ত মজুমদার।"

—"ঠিকানা?"

—"এইটুকু মনে আছে তিনি কলকাতার বাসিন্দা হলেও বর্দ্ধমানের লোক।"

—"তাঁকে দেখেছেন?"

—"না। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার কারণ নেই। কারণ তিনি যদি উড়ো চিঠির লেখক হতেন, তাহলে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন না।"

—"মন যাদের রুগ্ন, প্যাঁচালো, একরোখা আর প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাদের কোন কথাই জোর করে বলা যায় না। বৈরনির্যাতনের প্রবৃত্তি তারা দীর্ঘকাল পোষণ করে রাখতে পারে। অবশ্য রতিকান্তবাবুকে আমি এই শ্রেণীর লোক বলে মনে করবার কোন কারণ দেখছি না। উড়ো চিঠির লেখক কে, তারও প্রমাণ নেই আর সেখানা নিতান্ত তুচ্ছ হওয়াও সম্ভব। বিবাহের ব্যাপারে প্রায়ই এমনি বাজে উড়ো চিঠির আবির্ভাব হয়। তবু কথাটা মনে রাখবার মত।"

—"আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

—"ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে আপনার স্বামী কোথায় গিয়েছিলেন?"

—"জানি না। তবে কেন গিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর মুখেই শুনেছি।"

—"কেন?"

—"কি-একটা জাপানি 'কিউরিও' কিনতে।"

—"জাপানি 'কিউরিও'?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসটা কি, আমার কাছে তিনি ভাঙেন নি। তবে বলে গিয়েছিলেন, আমাকে সেটা দেখিয়ে অবাক করে দেবেন। আমাদের এই বৈঠকখানাটি আপনারা দেখছেন। কেবল এখানেই নয়, আমাদের বাড়ির ঘরে ঘরে এমনি সব 'কিউরিও' ছড়ানো আছে। এই সখের জন্যে তাঁর অজস্র টাকা খরচ হয়েছে। কোথাও যদি তিনি মনের মত 'কিউরিও'র সন্ধান পেতেন, তবে তা না পাওয়া পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারতেন না। ঐ জাপানি জিনিসটির সন্ধান দিয়েছিলেন একটি ভদ্রলোক।"

—"তাঁর নাম জানেন?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস। তিনি নিজে একখানা বেবি-ট্যাক্সি করে আমাদের বাড়িতে এসে আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"লোকটিকে দেখেছেন?"

—"আজ্ঞে না, তিনি ট্যাক্সির বাইরে আসেন নি।"

—"ট্যাক্সির নম্বর?"

—"সন্ধ্যার সময়ে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিখানা দেখেছিলুম। নম্বর দেখবার কথা মনে হয় নি। পুলিসও নম্বরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলতে পারি নি।"

জয়ন্ত আপসোস্ করে বললে, "নম্বর দেখেন নি, ভুল করেছেন—বড়ই ভুল করেছেন!"

—"সন্ধ্যাবেলায় দূর থেকে নম্বর হয়তো ভালো করে দেখতেও পেতুম না।"

—"ট্যাক্সির রং?"

—"খানিক সাদা, খানিক কালো।"

—"ভালো করে ভেবে দেখুন, তার আর কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করেন নি?"

—"বিশেষত্ব—বিশেষত্ব, হ্যাঁ, একটা বিশেষত্বের কথা স্মরণ হচ্ছে।"

জয়ন্ত সাগ্রহে বললে, "কি?"

—"ট্যাক্সির পিছনের আলোর তলায় দেখেছিলুম, সাদা নম্বর-প্লেটের উপরদিকের ডান কোণের খানিকটা ভাঙা, বোধ হয় কোন দুর্ঘনার ফল।"

—"পুলিসকেও এ কথা জানিয়েছেন?"

—"না, আগে আমার এ কথা মনে পড়ে নি।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে রুপোর নস্যদানী থেকে একটিপ নস্য নিয়ে বললে, "ধন্যবাদ লতিকা দেবী! এতেই হয়তো কাজ চলবে। আমার আর কিছু জানবার নেই—নমস্কার! এস মাণিক!"

মেঘনাদের অস্ত্রত্যাগ

জয়ন্ত 'হুইল' ধরলে, পাশে গিয়ে বসলুম আমি।

জিজ্ঞাসা করলুম, "লতিকা দেবীর বর্ণনা শুনে তুমি কি ট্যাক্সি-চালককে সন্ধান করতে পারবে?"

মোটর চালাতে চালাতে জয়ন্ত বললে, "পারাই তো উচিত—অবশ্য ট্যাক্সি-চালক ইতিমধ্যে যদি নম্বর-প্লেট পাল্টে না ফেলে থাকে। এ ব্যাপারে আমি কোন পুলিস-বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করব। এ কাজ পুলিসই তাড়াতাড়ি হাসিল করতে পারবে।"

—"ধর ট্যাক্সি-চালক সত্যেনবাবুকে যে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। তাহলেও তুমি কি সেই বাড়ির কোন লোককে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে পারবে?"

—"উঁহু! কেউ যদি বলে বসে, সত্যেনবাবু সেখানে কিছুক্ষণ থেকেই আবার একলা চলে এসেছিলেন, তাহলে তা মিথ্যাকথা বলে প্রমাণ করা চলবে না।"

—"তবে?"

—"তবে বাড়িটার সন্ধান পেলে আমরা আর এক পা এগুতে পারব।"

—"অর্থাৎ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্?"

—"হ্যাঁ। তারপর আমার হাতে আছে এক ব্রহ্মাস্ত্র। বাড়িখানার খোঁজ পেলে হয়তো সেই চরম অস্ত্র প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

—"কী সেই ব্রহ্মাস্ত্র?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে আচম্‌কা বিদুৎ-বেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খুব কাছেই যেন কান ফাটিয়ে ও চারিদিক্ কাঁপিয়ে গড়াম্ করে তোপের ভৈরব গর্জন শোনা গেল!

চট করে গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বাইরে লাফিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও!

রাজপথের উপরে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া! হৈ হৈ চীৎকার! জনতার ছুটোছুটি! হুলুস্থূল কাণ্ড! একখানা বাড়ির দেওয়ালে দেখা গেল গভীর ফাটল! কে কোথা থেকে বোমা ছুঁড়েছে! আশ্চর্য এই, কেউ আহত বা নিহত হয় নি!

জয়ন্ত বললে, "ঐ সরু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক আমাদের দিকে কি একটা ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে দেখেই আমি প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলুম। সেইজন্যেই এ-যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে গিয়েছি!"

আমি সেই গলিটার দিকে ছোটবার উপক্রম করতেই জয়ন্ত আমার হাত চেপে ধরে বললে, "আর বৃথা চেষ্টা! এতক্ষণে সে পগার পার হয়েছে! ঐ পুলিস আসছে! এখন এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে চলবে না—আমাদের হাতে অনেক কাজ!"

আবার মোটরে উঠে বসলুম।

তখনও আমার মনের অবস্থা হতভম্বের মত। বললুম, "এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!"

জয়ন্ত হুইল ধরে বললে, "না ভাই মাণিক, আগেই হয়েছিল মেঘোদয়! বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখনি দেখেছিলুম একখানা সন্দেহজনক উটকো মোটর আমাদের পিছু ধরেছে, তখনি আমার ভয় হয়েছিল যে আজ হয়তো কোন একটা অঘটন ঘটবে! ভাগ্যিস্ সতর্ক ছিলুম, নইলে এতক্ষণে আমাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেত!"

আমি বললুম, "তুমি কি মনে কর, ঐ বোমাটা আমাদের টিপ্ করেই ছোঁড়া হয়েছিল?"

—"এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এই মামলার সঙ্গে জড়িত কোন লোক বা কোন দল আমাদের চেনে। খালি চেনে না, আমাদের ভয়ও করে। তারাই আমাদের অস্তিত্ব লোপ করতে চায়। আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব বলছিলুম না? কিন্তু আমার আগে তারাই প্রয়োগ করেছিল ব্রহ্মাস্ত্র!"

—"কিন্তু তারা কারা?"

—"এখনো পর্যন্ত তুমি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে! অপরাধী অস্ত্রত্যাগ করছে আড়াল থেকে মেঘনাদের মত। কিন্তু যেমন করেই হোক্ তাদের টেনে আনতে হবে সামনাসামনি। বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার!"

—"তবে আমরা দুটো নতুন নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি।"

—"হ্যাঁ, রতিকান্ত মজুমদার আর প্রাণধন বিশ্বাস।"

—"কিন্তু এদের কারুকে অপরাধী বলে প্রমাণ করা কঠিন।"

—"কেবল কঠিন নয়, এখনো পর্যন্ত, অসম্ভব। তবে আমার মন কি বলে জানো? এই দুইজনের মধ্যে কোন-না-কোন দিক দিয়ে একটা কিছু যোগাযোগ আছেই। কিন্তু এখন চুলোয় যাক্ মনের কথা! খেয়ালী মন তো অনেক কথাই বলে, কিন্তু সে-সব কাজে লাগে কৈ? আপাতত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ইনস্পেক্টর বন্ধু সুন্দরবাবুকে ফোন-যোগে স্মরণ করতে হবে। ট্যাক্সি-চালককে আবিষ্কারের ভার নিক্ষেপ করব তাঁরই উপরে।"

যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ

খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি একটা জরুরি কাজ সেরে ফেলা গেল। এবং তার পরের ঘটনাগুলোও ঘটতে লাগল আশাতীত, অভাবিত রূপে দ্রুততালে।

পরদিন সকালে বেলা দশটার ভিতরেই সুন্দরবাবুর নির্দেশ অনুসারে জনৈক পাহারাওয়ালা সেই বেবি-ট্যাক্সির চালককে আমাদের কাছে এনে হাজির করলে।

সে দস্তুরমত ভড়কে গিয়েছে। হাতজোড় করে বললে, "আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন হুজুর? আমি তো কোনই অপরাধ করি নি!"

—"সেটা বোঝা যাবে তুমি যদি সত্যকথা বল।"

—"মিথ্যা বলব কেন হুজুর?"

—"উত্তম। তুমি প্রাণধন বিশ্বাসকে চেনো?"

—"ও নাম কখনো শুনি নি।"

—"গত তেইশ তারিখে বৈকাল সাড়ে ছয়টার কিছু আগে বা পরে কে তোমার গাড়ি ভাড়া করে বালিগঞ্জে গিয়েছিল?"

—"এক অচেনা বাবু।"

—"তারপর?"

—"বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নিয়ে যাই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। খাল পার হয়ে অল্প দূরে গিয়ে দুই বাবুই নেমে একখানা-বাড়ির ভিতর যান। আমি ভাড়া নিয়ে চলে আসি।"

—"সেই বাড়িখানা আবার চিনতে পারবে?"

—"কেন পারব না?"

—"যে বাবু তোমার গাড়ি ভাড়া করেছিল, তাকে সনাক্ত করতে পারবে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!"

—"আচ্ছা, আপাতত তুমি পুলিসের হেফাজতেই থাকো।"

ট্যাক্সি-চালককে নিয়ে পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, এইবারে কাজের পালা তোমার। সুজনবাবুকে তোমার সাহায্যে একখানা পত্রাঘাত করব। আশা করি তারপর তিনি সদলবলে এখানে আসতে বিলম্ব করবেন না।"

* * * *

হ্যাঁ, সুজন এলো অনতিবিলম্বেই। 'পুলিস-ভ্যানে' সদলবলে। তখন বৈকাল।

সুজন প্রথমেই বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আবার কি নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন? আমি তো এদিকে আরো কিছু অগ্রসর হয়েছি!"

—"কি রকম?"

—"সত্যেনবাবুর দেহের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভারের গুলি। খানাতল্লাস করে দ্বিজেনের ঘরেও পেয়েছি একটা ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার।"

—"দ্বিজেনবাবুর লাইসেন্স আছে তো?"

—"তা আছে।"

—"কিন্তু ঐ রিভলভারই যে হত্যাকাণ্ডের সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ কি?"

—"তাও প্রমাণিত হবে বৈকি! আমি তো কেতাবী সখের গোয়েন্দা নই, গোড়া না বেঁধে কাজ করি না। যাক্ ও কথা। এইবারে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন।"

—"যে ট্যাক্সি করে সত্যেনবাবু ঘটনার দিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তার চালকের দেখা পেয়েছি।"

—"তাই নাকি, তাই নাকি?"

—"মৃত্যুর আগে সত্যেনবাবু যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

—"বলেন কি, বলেন কি?"

—"প্রাণধন বিশ্বাসের নামও আপনি শুনেছেন নিশ্চয়?"

—"আলবৎ শুনেছি! সেই ব্যাটাই তো ভাঁওতা দিয়ে সত্যেনবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই দ্বিজেনের চর।"

—"ট্যাক্সি-চালক ঐ বাড়িতে গিয়ে তাকেও সনাক্ত করতে পারবে।"

—"তাহলে তো কেল্লা মার দিয়া! চলুন, চলুন—আর দেরি নয়!"

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। একখানা বাগানঘেরা মাঝারি আকারের বাড়ির সুমুখে এসে সেই ট্যাক্সি-চালকের নির্দেশে আমরা নেমে পড়লুম।

জনৈক ভৃত্য আমাদের আগমন-সংবাদ নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। একটি লোক বেরিয়ে এল। যুবক—বয়স সাতাশ-আটাশের বেশি নয়। সাজপোশাক ফিটফাট।

পুলিস দেখে তার চোখ চমকে উঠল—কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। ভাবহীন মুখে সহজ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কাকে চান?"

সুজন মাতব্বরি চালে এগিয়ে গিয়ে বললে, "প্রাণধন বিশ্বাসকে।"

—"আপনারা বাড়ি ভুল করেছেন।"

—"মানে?"

—"প্রাণধন বিশ্বাস বলে কেউ এ বাড়িতে থাকে না।"

ট্যাক্সি-চালকের দিকে ফিরে সুজন বললে, "এই ড্রাইভার!"

—"হুজুর!"

—"এই বাবুকে চেনো?"

—"হ্যাঁ হুজুর! গেল তেইশ তারিখে এই বাবু আমার ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন।"

—"সন্ধ্যার একটু আগে?"

—"হ্যাঁ হুজুর। বালিগঞ্জ থেকে আর এক বাবুকে তুলে নিই। তারপর দুই বাবুই এই বাড়িতে এসে নামেন, আমিও ভাড়া নিয়ে চলে যাই।"

লোকটি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়েই বললে,—"হ্যাঁ, ঠিক কথা!"

একেবারে কবুল জবাব পেয়ে সুজন প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর বললে, "বটে, বটে? কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবুটি ছিলেন কে?"

—"তাঁর নাম সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।"

—"তিনি কেন এখানে এসেছিলেন?"

—"একটি জাপানি গাছ কিনতে।"

—"জাপানি গাছ?"

—"হ্যাঁ, দুর্লভ জাপানি গাছ।"

—"তারপর?"

—"দরে বনিবনাও হল না, তিনি আবার ফিরে গেলেন।"

সুজন এবারে বেগোছে পড়ে আর কোন প্রশ্ন না করে জয়ন্তের দিকে তাকালে অসহায়ের মত।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আমি এই ওজরই শুনব বলে মনে করেছিলুম। হ্যাঁ মশাই, আপনি তো প্রাণধন নন, কিন্তু আপনার নামটি কি শুনতে পাই না?"

—"শ্রীরতিকান্ত মজুমদার।"

আমি চমকে উঠলুম।

জয়ন্ত বললে, "পরমহংসদেব বলতেন—যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনিও কি তাই? প্রাণধন, রতিকান্ত—দুইয়ে এক?"

রতিকান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "আপনার কথার অর্থ কি?"

—"অর্থটা অনর্থজনক—অর্থাৎ বিপদ্‌জনক, শুনলে আপনার রাগ হবে। তবে প্রথমেই রাগারাগি করে লাভ নেই। থাক্ ও কথা কিন্তু মশাই, আপনার দুর্লভ জাপানি গাছটি কি পদার্থ? একটিবার দেখে কি চক্ষু সার্থক করতে পারি না?"

রতিকান্ত বললে, "আপত্তি নেই। আমার সঙ্গে আসুন।"

রতিকান্তের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও সুজনের সঙ্গে আমিও বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। একেবারে বৈঠকখানায়।

সেকেলে ধাঁচে সাজানো বৈঠকখানা। দেওয়ালে টাঙানো চটা-ওঠা সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পুরানো বিলাতী 'ওলিয়োগ্রাফ' বা মুদ্রিত তৈল-চিত্র; এদিকে ওদিকে বহু-ব্যবহৃত বিমলিন সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার; মেঝের উপরে রং-জ্বলে-যাওয়া কার্পেট। মনে হয় ঘরখানা একসময়ে সুদিন দেখেছিল।

ঘরের এককোণে চীনে মাটির টবের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত গাছ। দেখতে ঠিক দেবদারু গাছের মত। তবে দেবদারু হচ্ছে মহামহীরুহ; অর্থাৎ অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কিন্তু এটি আকারে অতি ক্ষুদ্র—উচ্চতায় হয়তো এক ফুটের বেশি হবে না। একে বামন দেবদারু গাছ বলা চলে। তবে বামন হয় কুগঠন ও বিকলাঙ্গ, এর আকার কিন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক। যেমন 'সো-কেসে' সাজিয়ে রাখা হয় বিরাট তাজমহলের একরত্তি 'মডেল', একেও তেমনি মস্ত দেবদারুর

ছোট্ট 'মডেল' বলেই মনে হয়। 'মডেল' মনে হলেও এ হচ্ছে জীবন্ত গাছ! গুড়ি, ডালপালা ও পাতা সবই সজীব ও স্বাভাবিক।

সেই অদ্ভুত গাছের কাছে গিয়ে রতিকান্ত বললে, "ঐ দেখুন।"

জয়ন্ত বললে, "বন্-সাই, বন্-সাই!"

সুজন বিস্মিত স্বরে বললে, "বন্-সাই? সেদিনও শুনেছিলুম, আজও আপনার মুখে আবার শুনছি ঐ বেয়াড়া কথাটা। বন্-সাই কি মশাই? মাথামুণ্ডু নেই, যা তা একটা বললেই হল?"

জয়ন্ত একটু হেসে বললে, "বন্-সাই হচ্ছে জাপানি কথা। বন্-সাই বলতে বোঝায় টবে পালন করা বামন গাছ। শিল্পী বিশেষ কৌশলে এমন ভাবে গাছের বাড় বন্ধ করে দেয়, যার ফলে মস্ত মস্ত বনস্পতিকেও দেখতে হয় শিশুদের ক্রীড়নকের মত ছোট ছোট। ঠিক্‌ভাবে পালন করতে পারলে এই সব বামন গাছ পাঁচ-সাতশো বা হাজার বৎসরও বেঁচে থাকে। বামনে পরিণত করা যায় নানাশ্রেণীর বৃক্ষকেই—এমন কি বাঁশঝাড়-কে-বাঁশঝাড় পর্যন্ত। এ হচ্ছে জাপানের একটি নিজস্ব প্রাচীন আর্ট। সেখানকার ধনী আর সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে জনসাধারণেরও মধ্যে এই শ্রেণীর গাছের চাহিদা আছে অত্যন্ত। এখন কেবল জাপানে নয়, য়ুরোপ-আমেরিকাতেও জাপানি বামন গাছকে গৃহসজ্জার একটি প্রধান ভূষণের মত ব্যবহার করা হয়। যে বামন গাছের বয়স যত বেশি, তার দামও হয় তত চড়া।"

সুজন বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে গাছটা দেখতে দেখতে বললে, "এর খানিকটা ভাঙা দেখছি যে!"

জয়ন্ত বললে, "ঘটনাস্থলে মৃতদেহের হাতের মুঠোয় গাছের যে ভাঙা অংশটা পাওয়া গেছে, সেটা সঙ্গে করে এনেছেন কি?"

—"চিঠিতে আনতে বলেছেন, আনব না?"

সচমকে সুজন বললে, "কি বলতে চান আপনি? তবে কি—তবে কি—"

সেই ভাঙা ডালটা যথাস্থানে যুক্ত করেই নিশ্চিন্ত ভাবে বোঝা গেল, সেটা এই বামনগাছেরই অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়!

সুজন দুই চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "তাহলে সত্যেনবাবুকে হত্যা করা হয়েছে এই ঘরেই?"

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়েই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল রতিকান্তের উপরে এবং দুই হাত সুদ্ধ তার দেহটাকে নিজের দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, মাণিক, এ হঠাৎ পকেটের মধ্যে ডানহাত চালিয়ে দিয়েছে কেন দেখ তো!"

তার পকেটের ভিতর থেকে টেনে বার করলুম একটা রিভলভার!

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! রতিকান্ত মরিয়া হয়ে আমাদেরও বধ করতে চেয়েছিল! সুজনবাবু, চট্ করে এই সর্বনেশে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিন!"

সুজন তৎক্ষণাৎ কথামত কাজ করে বললে, "বাপ রে বাপ, এতটা আমি তো ভাবতে পারি নি!"

জয়ন্ত বললে, "এই রতিকান্তই নাম ভাঁড়িয়ে সত্যেনবাবুকে এখানে ভুলিয়ে এনে হত্যা করেছে!"

—"আর দ্বিজেন?"

—"নির্দোষ। সুজনবাবু, আপনি যদি আরো একটু তলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তবে লতিকা দেবীর মুখ থেকেই রতিকান্তের অস্তিত্ব জানতে পারতেন। মরণোন্মুখ ধনী পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী লতিকা দেবী, সে ছিল তাঁর পাণিপ্রার্থী, বিবাহের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লতিকা দেবী তার কবল থেকে ফস্কে গিয়ে পড়েন সত্যেনবাবুর হাতে, আর সেইজন্যে বেচারা সত্যেনবাবু হন রতিকান্তের দুচক্ষের বিষ, তার প্রাণে জ্বলে মারাত্মক হিংসার আগুন। দেড় বছর ধরে ওত পেতে সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। তারপর চরম সুযোগ পায় হতভাগ্য সত্যেনবাবুর 'কিউরিও' সংগ্রহের বাতিকের জন্যে। তিনি যখন বামন গাছটার উপরে হাত রেখে সেটা মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, খুব সম্ভব সেই সময়েই সে তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু গাছের এক টুকরো যে ভেঙে তাঁর হাতের মুঠোর ভিতরে থেকে যায়, এতটা লক্ষ্য করে নি। তারপর পুলিসকে ভোলাবার জন্যে গভীর রাতে মৃতদেহ দূরে ফেলে দিয়ে আসে। আমি কিন্তু ভুলি নি, মৃতের হাতে সেই গাছের টুকরো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে এমন কোন ঘরের মধ্যে, যেখানে সাজানো আছে একটা জাপানি বামন গাছ। এমন গাছ মাঠে-জঙ্গলে নয়, থাকে সাধারণত সৌখিন বাবুদের বৈঠকখানাতেই। এই জাপানি 'কিউরিও'র জন্যেই হয়েছে হত্যা, আবার এই জাপানি 'কিউরিও'ই ধরিয়ে দিলে হত্যাকারীকে! আপাতত আমার কথা ফুরুলো, এইবারে আমরা বিদায় নিতে পারি সুজনবাবু? কিন্তু দয়া করেই স্মরণ রাখবেন, সখের গোয়েন্দামাত্রই 'হবুচন্দ্র' খেতাব লাভের যোগ্য নয়!"

সুজন নতমুখে জোড়হাতে বললে, "মনে রাখব। মাপ করবেন।"

কামরার মামলা

ক

রাজা সাহেবের আমন্ত্রণে গিয়েছিলুম দেশীয় রাজ্য সেরাইকেলায়। সেখানকার

চৈত্র-পরবে বিখ্যাত 'ছউ' নাচ দেখবার জন্যে। জয়ন্ত এবং আমি—অর্থাৎ মাণিক।

সত্যসত্যই সে নৃত্যোৎসব দেখবার মত। সংস্কৃতে নৃত্যকে দেওয়া হয়েছে একরকম সঙ্গীতের মর্যাদা—কেননা তাকে বলা হয়েছে 'দৃশ্যসঙ্গীত', অর্থাৎ যে গান চোখে দেখা হয়। সেরাইকেলার নাচ দেখে এ নামের সার্থকতা বুঝতে পারলুম।

সেরাইকেলা থেকে বনজঙ্গল এবং এ-পাহাড় সে-পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে একটি পথ সর্পিল গতিতে এসে পৌঁচেছে সিনি জংশন স্টেশনে। সেখান থেকে ধরলুম কলকাতার ট্রেন। তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। চাঁদের আলোয় মাখানো ছিল মধুযামিনীর স্বপ্ন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুখানা আসন 'রিজার্ভ' করাই ছিল। উপরকার 'বাঙ্কে' একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। লোকটার গায়ের রং আমাদের চেয়ে কালো হলে কি হয়, আমাদের পোশাক দেখে বোধ করি তার কোট-পেন্টালুনের আভিজাত্যে আঘাত লাগল, কারণ আমরা কামরায় পদার্পণ করতেই সে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

নীচেকার আসনের একটা কোণ অধিকার করে বসেছিলেন একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক। ঠোঁটের উপরে তাঁর চার্লি চ্যাপলিন গোঁফ। সাজ-পোশাক দেখলে তাঁকে ফিরিঙ্গি বলে মনে হয়। তাঁর পাশেই উপবিষ্ট একটা কালো-মিশমিশে রোমশ কুকুর, তিনি আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

কুকুরটার দিকে আমি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি দেখে লোকটির মুখে ফুটল ঈষৎ হাসির রেখা।

আমি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওটা কোন্ জাতের কুকুর?"

—"চীনদেশের চৌ-চৌ কুকুর, ভারতে বড় একটা দেখা যায় না।"

তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে বুঝলুম, তিনি ফিরিঙ্গি নন।

গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হন্তদন্তের মত কামরায় এসে উঠলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপরে। আকারে মাঝারি, মাথায় অযত্নবিন্যস্ত কাঁচা-পাকা চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, পরনে ধুতি আর পিরান, একহাতে একটি ছোট ব্যাগ ও আর এক হাতে একখানা মোটা কেতাব। চেহারা ও হাবভাব অতিশয় গম্ভীর।

ভদ্রলোক এসেই কুকুরের মালিকের পাশে গিয়ে বসে পড়লেন এবং তারপর অন্য কোনদিকে না তাকিয়েই হাতের বইখানার খানকয় পাতা উল্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তার দিকেই। লোকটি নিশ্চয়ই গ্রন্থকীট।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জয়ন্ত জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

খ

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সমারোহের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে, দিকে দিকে ফুটে উঠছে কবিত্বের ছবি। জয়ন্তের চোখ আর মন সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইল।

আমি ততক্ষণে কুকুরের মালিকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছি। তাঁর নাম ইন্দুলাল সিংহ। জাতে বিহারী এবং বিহারের আরো অনেকের মত তিনিও পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারেন। কলকাতার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। কার্যসূত্রে আদ্রায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ধরেছেন কলকাতার ট্রেন।

তিনিও ছউ নাচ দেখেছেন শুনে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে খানিক্ষণ আলোচনা হল। আমার মত ইন্দুবাবুরও ছউ নাচ খুব ভালো লেগেছে।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে থামল টাটানগর স্টেশনে। উপরের 'বাঙ্ক' ছেড়ে নেমে পড়ে ফিরিঙ্গিটা কামরা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে কোন মোটঘাট নেই। বোধহয় সে রেলেই কাজ করে।

ইন্দুবাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "বাইরে যেন কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না?"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, একবার দেখে আসি।" সে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

গ্রন্থকীট মহাশয় নিজের কেতাব নিয়েই মেতে রইলেন, দুনিয়ার সব গোলমাল যেন তাঁর কাছে একেবারেই তুচ্ছ! বইখানার চক্‌চকে মলাটের উপরে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—'ওয়ার্কস্ অফ উইলিয়ম সেক্সপিয়র।'

গ

একটা দুর্ঘটনার সাড়া পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল সেই পুরাতন প্রশ্ন : জয়ন্ত কি চুম্বকের মত অপরাধীকে আকর্ষণ করে?

জয়ন্ত পেশাদার পুলিস নয়, সখের গোয়েন্দা মাত্র। তবু প্রায়ই দেখেছি, তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধ বা অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন অপরাধীর সন্ধানে আমরা এদিকে আসি নি। হালকা মনে এসেছিলুম

বেড়াতে আর নাচ দেখতে। কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল এক নিষ্ঠুর অপরাধের রক্তাক্ত নমুনা।

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর আমিও জানলা-পথে মাথা গলিয়ে দেখলুম, স্টেশনে এক বৃহৎ জনতা শশব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করছে, প্রত্যেক লোকের মুখের ভাব রীতিমত ত্রস্ত! জনতার মধ্যে রয়েছে রেলপুলিসেরও অনেক লোক।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি মশাই?"

লোকটা দ্রুতপদে চলে যেতে যেতে বললে, "খুন হয়েছে, খুন!"

কথাটা গ্রন্থকীট মহাশয়েরও কানে গেল। তিনি চম্‌কে উঠে বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "কে খুন করলে কাকে?"

ইন্দুবাবু চৌ-চৌয়ের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "ও প্রশ্নের জবাব দেবার লোক এখানে নেই।"

ভদ্রলোক বইখানা আবার মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

খানিক পরে জয়ন্ত আবার ফিরে এল। তার মুখে যা শুনলুম তা হচ্ছে এই :

মারা পড়েছেন বুল্‌চন্দানি নামে এক সিন্ধী ভদ্রলোক। তিনি কলকাতার নামজাদা রত্ন-ব্যবসায়ী। ব্যবসা-সূত্রে চক্রধরপুরে এসে ফিরে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। তাঁর অনুচর ছিল তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। সে টাটানগরে এসে প্রথম শ্রেণীর কামরায় আবিষ্কার করেছে মনিবের মৃতদেহ। রক্তে কামরা ভেসে যাচ্ছে এবং বুল্‌চন্দানির বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানা ছোরা। কামরায় আর কেউ নেই।

অনুচর বলে, তার মনিবের সঙ্গে ছিল কয়েকখানা হীরা, মনিব্যাগ ও হাতঘড়ি। হীরা আর ঘড়ি অদৃশ্য। মনিব্যাগটা পড়ে আছে, কিন্তু তার ভিতরটা শূন্য।

জনৈক যাত্রী দেখেছে, ট্রেন যখন ধীরে ধীরে সিনি স্টেশনে প্রবেশ করছিল, তখন কোন লোক একটা কামরা থেকে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠেছিল এই গাড়িরই অন্য একটা কামরায়। রেল-পুলিসের লোক এখন প্রত্যেক কামরায় সেই লোকটাকে সন্ধান করছে।

ঘ

মিনিট তিন পরেই আমাদের কামরারও সামনে এসে দাঁড়াল জনকয়েক পুলিসের লোক।

একজন ইন্‌স্পেক্টার ভিতরে ঢুকে বললে, "আপনাদের টিকিট দেখি।"

আমরা টিকিট দেখালুম। টিকিট দেখে ইন্‌স্পেক্টারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে হুকুম দিলে কামরার ভিতরে খানাতল্লাসী চালাবার জন্যে।

পুলিসের লোকজনরা প্রথমে আমাদের মালপত্তর এবং তারপর প্রত্যেকের জামাকাপড় হাতড়ে দেখতে লাগল।

তারপর আচম্বিতে আমাদের চমকিত দৃষ্টির সামনে সেই গ্রন্থকীটের পকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা রক্তমাখা রুমালে জড়ানো একটা হাতঘড়ি!

ইন্‌স্পেক্টার কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার পকেটে এ ঘড়ি কেন?"

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টার বললে, "ন্যাকামি রাখুন। জবাব দিন। এ ঘড়ি আপনার পকেটে এল কেমন করে?"

ভদ্রলোক হতভম্বের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে ক্ষীণস্বরে বললেন, "জানি না তো!"

—"বটে, জানেন না? আপনার রুমালে রক্ত কেন?"

—"ও রুমাল আমার নয়।"

—"চমৎকার সাফাই! আপনার নাম কি?"

—"গৌরীচরণ ঘোষাল।"

—"কোথায় থাকেন?"

—"খড়্গপুরে।"

—"কি করেন?"

—"স্কুলমাস্টারি।"

—"এখানে কেন?"

—"সেরাইকেলায় আমার জামাই-বাড়ি। মেয়ের অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলুম।"

—"তারপর যাবার সময়ে রোজগার করে ফিরে যাচ্ছেন? এখন হীরেগুলো কোথায় লুকিয়ে ফেলেছেন বলুন দেখি?"

—"মশাই, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!"

—"চোপরাও বদমাইস! পুলিসের কাছে এ-সব ধড়িবাজি খাটবে না! এই সেপাই, আসামীর হাতে হাতকড়ি দিয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে চল।"

ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে গৌরীবাবু কেঁদে ফেললেন। কিন্তু পুলিসের কাছে চোখের জল ব্যর্থ। তাঁকে পাহারাওয়ালাদেরই সঙ্গে যেতে হল।

৬

আরো বেশ খানিকক্ষণ পরে ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প্রথম কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। তারপর ইন্দুবাবু বললেন, "এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার! লোকটির বাইরের পরিচয় নিরীহ স্কুলমাস্টার, আর তার পকেটেই পাওয়া গেল কিনা চোরাই মাল! মানুষ চেনা কি কঠিন!"

জয়ন্ত এতক্ষণ গুম্ হয়ে বসে একমনে কি যেন চিন্তা করছিল, ইন্দুবাবুর কথা শুনে মুখ তুলে মৃদু হাস্য করলে।

আমি বললুম, "সত্য কথা। গৌরীবাবুর ভিতর থেকে হত্যাকারীর চেহারা আবিষ্কার করা অসম্ভব বলাও চলে।"

জয়ন্ত বললে, "না মাণিক, অসম্ভব নয়! আকৃতির উপরে প্রকৃতি নির্ভর করে না। সুন্দর দেহেও বাস করতে পারে অসুন্দর মন। ধর, এই গাড়িতে আছি আমরা তিনজন—তুমি, আমি, ইন্দুবাবু। আমাদের দেহ সবাই দেখছে, কিন্তু আমাদের মন কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ মনই হচ্ছে ক্রিয়ার কর্তা, দেহ উপলক্ষ মাত্র। তোমার বা আমার বা ইন্দুবাবুর মন কি করতে পারে, বাহির থেকে সেটা জানবার উপায় নেই।"

ইন্দুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "না মশাই, খানকয় হীরার লোভে আমার মন কোনদিনই নরহত্যা করতে চাইবে না। তবে আপনি যা বললেন, যুক্তিসঙ্গত। মন হচ্ছে রহস্যময়। নিরীহ স্কুলমাস্টারেরও মনে খুন করবার প্রেরণা জাগে।"

জয়ন্ত আর কিছু না বলে বাইরের দিকে মুখ ফেরালে। ধু-ধু প্রান্তর পরিণত হয়েছে যেন বিরাট জ্যোৎস্না-সরোবরে। মাঝে মাঝে তার দেখা যাচ্ছে যেন তালীকুঞ্জের স্বপ্নদ্বীপ।

ইন্দুবাবু আসন ত্যাগ করে বাথরুমের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চীনা চৌ-চৌ কুকুরটা এতক্ষণ পরে আমাদের দিকে তদারক করতে এল। একবার আমার আর একবার জয়ন্তের পা শুঁকে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল হল বোধ হয় সন্তোষজনক।

কুকুরটা বড়ই আদুরে। জয়ন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে তার জানুর উপরে দুই পা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমি তার জন্যে কিছু খাবারের খোঁজে টিফিন-বাক্সটা খুলে ফেললুম। আমিও কুকুর ভালোবাসি।

এমন সময়ে ইন্দুবাবু বাথরুমের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দিয়ে ডাকলেন, "জনি, জনি!"

কুকুরটা ছুটে গেল মনিবের কাছে।

ইন্দুবাবু সচমকে বলে উঠলেন, "জনি, তোর বগ্‌লস্‌টা কোথায় গেল?"

জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, "আমার কাছে।"

—"কেন?"

—"বগ্‌লস্‌টা পরীক্ষা করছি।"

—"মানে?"

—"দেখছি এটা অসাধারণ বগ্‌লস, ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এর ভিতরটা ফাঁপা।"

হঠাৎ ইন্দুবাবুর মুখের উপর থেকে সরে গেল শান্ত ভদ্রতার আবরণ এবং সেখানে ফুটে উঠল তাঁর হিংস্র মনের কুৎসিত আভাস! ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "আপনি কি বলতে চান?"

জয়ন্ত কিছুই বলতে চাইলে না, কেবল বগ্‌লস্‌টা নিয়ে আসনের গদীর উপর ঝাড়তে লাগল।

বিদ্যুতের মত চাকচিক্য নিয়ে গদীর উপরে ঝরে পড়ল কয়েক খণ্ড স্ফটিক! চোরাই হীরা!

ভীষণ এক চীৎকার করে ইন্দুবাবু জয়ন্তের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, "আমার পরিচয় তুমি জানো না। চুপ করে বসে থাকো। মাণিক, গাড়ি পরের স্টেশনে থামলেই তুমি নেমে গিয়ে পুলিস ডেকে আনবে। বুল্‌চন্দানিকে খুন করেছে এই ইন্দু।"

চ

ট্রেন আবার ছুটছে। কামরার ভিতরে কেবল আমি ও জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলতে লাগল, "ইন্দু নিশ্চয়ই পুরাতন পাপী, নরহত্যা ও চুরির জন্যে সে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

"পুলিস খুব সহজে টোপ্ গিলেছে। রক্তাক্ত রুমাল আর হাতঘড়ির উপরে নির্ভর করে গৌরীবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আমি এত সহজে ভুলি নি। কারণ তার আগেই আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলুম।

"নিহত বুল্‌চন্দানির কামরায় গিয়ে রক্তাক্ত মেঝের উপরে আমি দেখেছিলুম কুকুরের কয়েকটা পদচিহ্ন। সে কামরায় কোন কুকুর ছিল না, তবে সেই পদচিহ্ন কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই কুকুর ছিল হত্যাকারীর সঙ্গে!

"বুঝতেই পারছ, তারপর থেকেই আমার সন্দেহ আকৃষ্ট হয়েছিল কার দিকে? ইন্দুর কুকুরই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে!

"ইন্দু যখন বাথরুমে যায়, তখন আমি তার কুকুরটাকে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম, তার থাবায় রয়েছে রক্তের দাগ! আমার সন্দেহ পরিণত হল দৃঢ় ধারণায়।

"বুঝলুম, ইন্দুই পুলিসকে বিপথে চালনা করবার জন্যে বেচারা গৌরীবাবুর পকেটে হাতের কায়দায় চালিয়ে দিয়েছিল রুমাল ও ঘড়িটা।

"কিন্তু আসল চোরাই মাল গেল কোথায়? পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে ইন্দুর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি। আর চোরাই মাল না পেলে ইন্দুর বিরুদ্ধে কোন মামলাই রুজু করা চলবে না।

"তখন আমার লক্ষ্য পড়ল কুকুরটার বগ্‌লসের উপরে। সেটা বিশেষ কৌশলে তৈরি ফরমাশী বগ্‌লস্। ভিতরটা ফাঁপা। হাতের চাপ দিয়ে অনুভব করলুম তার মধ্যে রয়েছে কতকগুলো কঠিন জিনিস।

"তারপর আর কিছু বলা বাহুল্য।"

ডবল মামলার হামলা

আজকের প্রাতরাশটা হয়েছিল পুরোদস্তুর পূর্ণভোজনের সামিল। চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে এবং একটি আরামসূচক 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করে একটা মোটাসোটা চুরোট ধরিয়ে ফেললেন ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু।

দৈনিক প্রভাতী খানাপিনার অব্যবহিত পরেই উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশনের ভার ছিল আমার উপরে। আমি সামনের টেবিলের উপর থেকে টেনে নিলুম খবরের কাগজখানা।

জয়ন্ত বার করলে তার রুপোর শামুকের নস্যদানী। সে একটিপ নস্য নাসিকার সাহায্যে আকর্ষণ করতেই সুন্দরবাবু বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, "হুম্! তোমার ঐ নোংরা সেকেলে নেশাটা তুমি কি কস্মিন্‌কালেও ছাড়তে পারবে না হে?"

জয়ন্ত বললে, "কে বলে নস্য সেকেলে নেশা? সব ব্যাপারেরই উঠতি-পড়তি আছে, নস্যেরও রেওয়াজ মাঝে কিছু কমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নস্যের চলন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আপনি জানেন কি; এক ইংলণ্ডেই বৎসরে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার নস্য তৈরি হয়?"

হুস্ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্ , বল কি হে? খামকা আধকোটি পনের লাখ টাকা নস্যাৎ! বড়ই বড়ই, বড়ই অন্যায়!"

—"তারপর শুনুন। নস্য নোংরা নয় মশাই, নস্য হচ্ছে রাজকীয় নেশা, তার আভিজাত্য অতুলনীয়। নস্যের উৎপত্তি আমেরিকায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বার সেখানে গিয়ে কলম্বাস তার ব্যবহার দেখে এসেছিলেন। ষোল শতাব্দীতে নস্যের আমদানি হয় য়ুরোপে। তারপর সেখানকার বড় বড় রাজা, রানী, সেনাপতি, আমীর-ওমরাও, রাজনৈতিক, কবি, শিল্পী, অভিনেতা—এমন কি সাধুসন্ন্যাসী পর্যন্ত নস্যের সেবাইত হয়ে পড়েন। আমি তো তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের মতন ব্যক্তিও ছিলেন নস্যগত প্রাণ। তাঁর সোনার নস্যদানী ছিল অসংখ্য, সেগুলিরও মোট দাম হবে লক্ষাধিক টাকা। নস্যের এত কদর কেন শুনবেন?"

সুন্দরবাবু গাত্রোত্থান করে বললেন, "না ভাই, এখন আমার নস্য-কাহিনী শোনবার ফুরসৎ নেই।"

—"কেন, ত্বরা কিসের?"

—"তদন্ত।"

—"কিসের তদন্ত?"

—"আত্মহত্যার। এক ভদ্রলোক পুত্রশোকে আত্মহত্যা করেছেন। বিশেষ হন্তদন্ত হতে হবে না, কারণ জোর-তদন্ত নয়, একান্ত সহজ মামলা। তবু একবার যেতে হবে।"

—"আপনার হাতে ঐ খামখানা কিসের?"

—"এর মধ্যে ঘটনাস্থলের আর লাসের খানকয় ফোটো আছে।"

—"একবার দেখি না!"

ফোটোগুলো নিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে যেন নিজের মনেই বললে, "মৃতদেহের ডানহাতে রয়েছে একটা রিভলভার। ঐটেই বোধহয় আত্মহত্যার অস্ত্র। ডানহাতের মণিবন্ধে দেখা যাচ্ছে একটা হাতঘড়িও।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কোন কোন খেয়ালী লোকের ডানহাতেই থাকে হাতঘড়ি।"

—"তা থাকে বটে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে একটু বেশিরকম খেয়ালী বলেই মনে হচ্ছে।"

—"এ কথা বলছ কেন?"

—"মৃতদেহের সামনে রয়েছে দাবা-বোড়ের ছক। কয়েকটা ঘুঁটি এখনো ছকের উপরে সাজানো আছে। তাহলে কি আত্মহত্যার আগে ভদ্রলোক দু-এক চাল দাবা খেলে নিয়ে সখ মিটিয়ে ছিলেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। কারণ

মামলাটার প্রাথমিক তদন্তে গিয়েছিলেন আমার এক সহকারী। তবে ভদ্রলোক যে রিভলভারের গুলিতে মারা পড়েছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। গুলিটা তাঁর বক্ষ ভেদ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই বুলেটটাও পাওয়া গিয়েছে।"

—"রিভলভার আর বুলেটটা দেখবার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে।"

—"এখনি দেখাতে পারি, আমার গাড়ির ভিতরেই আছে।"

সুন্দরবাবুর হুকুমে একজন পাহারাওয়ালা একটা ছোট ব্যাগ এনে দিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া রিভলভার, বুলেট ও আরো কোন কোন জিনিস।

জয়ন্ত খুব মন দিয়ে রিভলভার ও বুলেটটা পরীক্ষা করলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, "সুন্দরবাবু, মামলাটা মোটেই সহজ নয়!"

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "তার মানে? তোমার কথায় সোজাও বাঁকা হবে নাকি?"

—"রিভলভারটার মালিক ছিলেন তো মৃত ব্যক্তিই?"

—"তাইতো শুনেছি।"

—"তাহলে এটা হচ্ছে বড়ই জটিল মামলা। এ সম্বন্ধে আপনি আরো যা জানেন, শুনতে পেলে সুখী হব।"

অতঃপর জয়ন্তের অন্বেষণার ফলে নতুন যে রহস্যনাট্যের যবনিকা উঠে গেল, তা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত। একটা একান্ত সাধারণ মামলা কেবল অসাধারণ হয়েই উঠল না, তার উপরে আরোপিত হল আর একটা এমন নতুন ও রোমঞ্চকর মামলা, যা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর!

* * * *

সুন্দরবাবু বললেন, "ভাই জয়ন্ত, মামলাটা নিয়ে এখনো আমি মাথা ঘামাবার সময় পাই নি। আজ দু'দিন সর্দিজ্বরে পড়ে আমি বিছানা নিয়েছিলুম। প্রাথমিক তদন্তের পর আমার সহকারী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেটুকু ছাড়া আর কিছুই জানি না। শোনো—

"যিনি আত্মহত্যা করেছেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। বয়স পঞ্চান্ন। তিনি দক্ষিণ বাংলার এক জমিদার। দেশ ছেড়ে উত্তর-কলকাতায় বাস করতেন। বিপত্নীক। তাঁর একমাত্র সন্তান সত্যেন্দ্র গত মাসে কলেরা রোগে মারা গিয়েছেন। প্রকাশ, তারপর থেকেই রবীন্দ্রবাবু অত্যন্ত মন-মরা হয়ে থাকতেন এবং তাঁর আত্মহত্যার আসল কারণও নাকি ঐ পুত্রশোক।

"রবীন্দ্রবাবুর এক সহোদর দেশেই থাকতেন, কিন্তু তিনিও এখন পরলোকে

এবং তাঁরও একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণই এখন রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বনিবনাও ছিল না, সম্পত্তি-সংক্রান্ত মতানৈক্যই নাকি এই মনোমালিন্যের কারণ।

"রবীন্দ্রবাবুর বাড়ি ত্রিতল। একতলা ব্যবহার করে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীরা এবং পাচক, দ্বারবান, দাসদাসী ও অন্যান্য লোকজন। দোতালায় বৈঠকখানা এবং তাঁর মৃত পুত্রও সেখানে থাকতেন। ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নগৃহ ছাড়া আর কোন ঘর নেই।

"পর্শু গিয়েছে কালীপুজোর রাত্রি। শরীর সুস্থ ছিল না বলে রবীন্দ্রবাবু সেদিন সন্ধ্যার পরেই ত্রিতলে উঠে যান এবং পরদিনের সকালেই ঘরের ভিতরে পাওয়া যায় তাঁর মৃতদেহ। ঘরের দরজা খোলাই ছিল—যদিও তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রবাবুর দরজা খুলে শয়ন করার অভ্যাস ছিল না?

"বাড়ির লোকজনরা বলে, রবীন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল বলে সন্ধ্যার পর আর কোন লোক সেদিন ত্রিতলের ঘরে যায় নি। অন্যান্য দিনেও সে ঘরে একজন ছাড়া আর কোন বাইরের লোকের প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না। সেই একজন হচ্ছেন সত্যানন্দ বসু, রবীন্দ্রবাবুর প্রধান ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অন্য পাড়ার বাসিন্দা, প্রায়ই রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। রবীন্দ্রবাবুর দাবাখেলার সখ ছিল অত্যন্ত প্রবল, সত্যানন্দবাবুর আবির্ভাব হলেই দুজনে দাবার ছক পেতে বসে যেতেন। কিন্তু সবাই একবাক্যে বলেছে, ঘটনার দিন সত্যানন্দবাবু একবারও সেই বাড়িতে পদার্পণ করেন নি।

"নিজের হাতে রিভলভার ছুঁড়ে রবীন্দ্রবাবু আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু বাড়ির কেউ রিভলভারের শব্দ শুনতে পায় নি; অন্তত শুনতে পেলেও বুঝতে পারে নি, কারণ সেদিন ছিল কালীপুজো,—বোমার ও বাজীর দুমদাম শব্দে সারা সহর হয়ে উঠেছিল মুখরিত। রবীন্দ্রবাবুর ভাইপো দীনেন্দ্র খবর পেয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। সত্যানন্দবাবুকেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আজ তদন্তে গিয়ে আমি প্রথমেই তাঁদের এজাহার গ্রহণ করব।"

জয়ন্ত বললে, "আমিও যদি সঙ্গে যাই, তাহলে আপনার কোন আপত্তি আছে?"

—"মোটেই না, মোটেই না! মাণিকও যেতে পারে। কিন্তু জয়ন্ত, হঠাৎ তোমার এই আগ্রহের কারণ কি? কোন সূত্র-টুত্র পেয়েছ নাকি?"

—"যথাসময়েই জানতে পারবেন।"

—"ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরেছে! এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন বাবা?"

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

*　　*　　*　　*

রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ি। সদর দরজায় পুলিস পাহারা।

দোতলার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট দুই ভদ্রলোক। একজন প্রৌঢ়, মাথায় কাঁচা-পাকা লম্বা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, চোখে কালো চশমা, দোহারা চেহারা, পরনে পাঞ্জাবী ও পায়জামা। একান্ত বিষণ্ণ ভাবভঙ্গি!

আর একজন যুবক, বয়স বাইশের বেশি নয়, সুশ্রী, ফরসা, একহারা দেহ, জামাকাপড়ে বাবুয়ানার লক্ষণ। মুখ-চোখ ভাবহীন।

যুবকের দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "আপনিই বোধহয় দীনেন্দ্রবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আর উনি?"

—"সত্যানন্দবাবু—আমার জ্যাঠামশাইয়ের বিশেষ বন্ধু।"

—"উত্তম। বাড়ির আর সবাইকে ডাকুন, আমি সকলের এজাহার নেব।"

সকলেরই আবির্ভাব। একে একে প্রত্যেকেই এজাহার দিলে। বিশেষ কোন নতুন তথ্য প্রকাশ পেল না।

এইবারে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দীনেন্দ্রবাবু, আপনার জ্যাঠা কি ন্যাটা ছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তার বাঁ হাতই বেশি চলত।"

—"তাই তিনি ডানহাতেই কবজী-ঘড়ি ব্যবহার করতেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনাদের মনোমালিন্যের কারণ কি?"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে দীনেন্দ্র বললে, "মনোমালিন্যের উৎপত্তি হয় তিনটি মুক্তার জন্যে।"

—"তিনটি মুক্তা?"

—"হ্যাঁ, তিনটি মহামূল্যবান মুক্তা।"

—"ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।"

—"বুঝিয়ে বলছি। আমার প্রপিতামহ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্যেই আমাদের বংশের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে তিনি ইংরেজ ফৌজে রসদ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী হয়ে পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন। সেই দেশব্যাপী অশান্তির আর বিশৃঙ্খলার যুগে কি উপায়ে জানি না, তিনি প্রচুর ধনদৌলতের মালিক হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ছিল তিনটি অপূর্ব ও অমূল্য মুক্তা—শুনেছি তিনি তা পেয়েছিলেন কোন ভাগ্যহীন নবাবের কাছ থেকে। মুক্তা

তিনটি আমিও দেখেছি। দুটির আকার পায়রার ডিমের মত, একটি আরো বড়। তেমন বড় বড় মুক্তা আমি আগে কখনো দেখি নি, আজকের বাজারে তাদের দাম অন্তত দুই আড়াই লক্ষ টাকাও হতে পারে। এই মুক্তা তিনটি আমার পিতামহের অধিকারে আসে উত্তরাধিকারসূত্রে। তারপর আমার জ্যাঠামশাই আর আমার পিতা দুজনেরই দাবি ছিল তাদের উপরে। কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার বাবার দাবি অগ্রাহ্য করে বলেন, তাঁর বাবা ঐ মুক্তা তিনটি কেবল তাঁকেই দিয়ে গিয়েছেন। এই নিয়েই প্রথমে মনোমালিন্য, তারপর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে বললে, "বটে, এমন ব্যাপার! সেই মুক্তা তিনটি এখন কোথায় আছে?"

—"শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘরে লোহার সিন্দুকে। কিন্তু সে ঘর তো এখন পুলিসের জিম্মায়।"

সুন্দরবাবু করলেন একটি নিষ্ঠুর প্রশ্ন "তাহলে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর ফলে আপনিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন?"

দীনেন্দ্র বিরক্ত মুখে বললে, "লাভ-লোকসানের হিসাব এখনো আমি খতিয়ে দেখি নি মশাই!"

—"কিন্তু পুলিস তা দেখতে বাধ্য।"

—"দেখুক।"

জয়ন্ত এইবারে সত্যানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর জন্যে আপনি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন।"

সত্যানন্দ করুণ স্বরে বললেন, "কাতর হব না? তিনি আর আমি ছিলুম হরিহর আত্মার মত, বহু সুখ-দুঃখের দিন আমাদের একসঙ্গে কেটে গিয়েছে।"

—"তাহলে আপনারা ছিলেন পুরাতন বন্ধু?"

—"না, ঠিক তা বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছর চারেক আগেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে পুরাতন বন্ধুত্বের মতই।"

—"রবীন্দ্রবাবু আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে ভালোবাসতেন?"

—"হ্যাঁ, আমি এলেই তিনি পাড়তেন দাবার ছক।"

—"রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর দিনেও তাঁর সঙ্গে আপনি দাবা খেলেছিলেন?"

—"আজ্ঞে না, সেদিন আমি নিজের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই পারি নি।"

—"কেন?"

—"অসুস্থতার জন্যে। উদরাময়।"

—"কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে বা পরে রবীন্দ্রবাবু দাবা খেলেছিলেন।"

অত্যন্ত বিস্মিতের মত সত্যানন্দ নিজের দীর্ঘ দাড়ির ভিতরে অঙ্গুলিচালনা করতে করতে বললে, "কেমন করে জানলেন?"

—"তাঁর মৃতদেহের সামনে পাতা ছিল দাবার ছক আর সেই ছকের উপরে সাজানো ছিল গোটাকয়েক ঘুঁটি।"

—"ও, তাই বলুন। তা হতে পারে। যারা দাবা খেলতে অভ্যস্ত, তারা মাঝে মাঝে নতুন চালের কৌশল আবিষ্কার করবার জন্যে একা একাই ছকে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে।"

—"ঠিক। সেটা আমিও জানি। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।"

*　　　*　　　*　　　*

সুন্দরবাবু সদলবলে প্রথমে বাড়ির একতালার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

তারপর দ্বিতল। চারখানা বাস করবার ঘর, তারপর পাইখানা ও গোসলখানা। বাইরের দিকে একফালি বারান্দা থেকে লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা বোধহয় মেথরের ব্যবহারের জন্যে?"

দীনেন্দ্র বললে, "হ্যাঁ।"

—"নিচের শুঁড়ীগলিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?"

—"বাড়ির বাইরেকার হাতায়।"

—"কোন লোক যদি সদর দরজার বদলে ঐ শুঁড়ীগলি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় ওঠে, তাহলে বাড়ির লোক তাকে দেখতে পাবে না,—তাই নয় কি?"

—"হ্যাঁ।"

তারপর ত্রিতলে রবীন্দ্রবাবুর শয়নকক্ষ। তালাবন্ধ দরজার চাবি ছিল পুলিসের কাছে। দরজা খুলে সকলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে খাট, একদিকে ড্রেসিং টেবিল, একদিকে একটা প্রকাণ্ড আলমারি এবং একদিকে একটা ভারি, সেকেলে ডালা-দেওয়া লোহার সিন্দুক। খান দুই চেয়ার। কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে ছোট বিছানা পাতা। গুটি দুই তাকিয়া।

মৃতদেহ 'মর্গে' পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মেঝের বিছানার একাংশে ও একটা তাকিয়ার উপরে রয়েছে শুক্‌নো রক্তের ছোপ। বিছানার মাঝখানে দাবার ছক, তার উপরে ও আশেপাশে কতকগুলো ঘুঁটি।

সুন্দরবাবু বললেন, "দীনেন্দ্রবাবু, এইবারে আপনি সিন্দুক খুলে মুক্তো-টুক্তো কি আছে বার করুন। আমরা এখনো সিন্দুক পরীক্ষা করি নি। এই নিন রবীন্দ্রবাবুর চাবির গোছা, এটা লাশের পাশেই পাওয়া গিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সাবধান দীনেন্দ্রবাবু, আপনি সিন্দুকের হাতলে হাত দেবেন না, চাবিটা আমাকে দিন, আমিই সিন্দুক খুলছি।"

সুন্দরবাবু কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্তের চোখের ইশারা দেখেই তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

সিন্দুকের মধ্যে তথাকথিত একটিমাত্র মুক্তাও আবিষ্কৃত হল না। পরিবর্তে পাওয়া গেল একতাড়া দলিল দস্তাবেজ, অন্যান্য কাগজপত্র, একশো টাকার বারোখানা নোট, কতকগুলো পুরাতন মোহর ও কিছু খুচরো টাকা প্রভৃতি।

দীনেন্দ্র বললে, "কি আশ্চর্য, মুক্তাগুলো কে নিলে?"

সত্যানন্দ বললেন, "কে আবার নেবে বাবা? তোমার জ্যাঠা ছেলের শোকে আত্মঘাতী হয়েছেন, বাইরের কেউ এখানে আসে নি। চোর এলে কি অতগুলো টাকা আর মোহর সিন্দুকের ভিতরেই ফেলে রেখে যেত?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঠিক কথা। পায়রার ডিমের মত ডাগর ডাগর মুক্তো যদি রূপকথার অশ্বডিম্ব না হয়, তাহলে সেগুলো অন্য কোথাও লুকানো আছে, খুঁজে দেখতে হবে।"

সুন্দরবাবুর গা টিপে দিয়ে জয়ন্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পিছু পিছু গিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "আবার গা-টেপাটেপি কেন? তোমার আবার কি গুপ্তকথা?"

—"সিন্দুকের হাতলে কারুর আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করে দেখুন।"

—"মানে?"

—"পরে বুঝবেন।"

*　　　*　　　*　　　*

দিন দুই পরে 'দুরভাষে'র মধ্যস্থতায় শ্রুতিগোচর হল থানায় বিরাজমান সুন্দরবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ঃ "হ্যালো! জয়ন্ত? শোনো। তুমি যা বলেছ তাই!"

—"আমি কি বলেছি?"

—"রবীন্দ্রনারায়ণ রায় আত্মহত্যা করেন নি।"

—"নবীন সহকারীর রিপোর্টের উপর নির্ভর না করে একটু মাথা ঘামালে আপনিও এটা বুঝতে পারতেন।"

—"আমি কিন্তু তোমারও চেয়ে বড় একটা আবিষ্কার করেছি।"

—"আপনাকে অভিনন্দন দিচ্ছি।"

—"তারপর থেকে আমার অবস্থা হয়েছে কি-রকম জানো? যাকে বলে একেবারে সসেমিরা!"

—"ভাবনার কথা।"

—"সব শুনলে তোমারও আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যাবে।"

—"ভয়ের কথা।"

—"ফোন ছেড়ে সবেগে থানায় ছুটে এস।"

—"যথা আজ্ঞা।"

থানায় গিয়ে আমরা দেখলুম, সুন্দরবাবু তখনও উত্তেজিত ভাবে ঘরের ভিতরে পদচালনা করছেন।

—"ভো সুন্দরবাবু, অতিথি হাজির। আপনার সন্দেশ পরিবেশন করুন।"

—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল। রবীন্দ্রবাবু যে আত্মহত্যা করেন নি, সেটা তুমি কেমন করে ধরতে পারলে আগে সেই কথাই বল।"

—"দেখলুম মৃতের ডানহাতে রয়েছে হাতঘড়ি। কোন কোন খেয়ালী ব্যক্তি ডানহাতেও ঘড়ি ধারণ করে বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম। সাধারণত যারা ন্যাটা, অর্থাৎ ডানহাতের কাজ সারে বামহাতে, তারাই হাতঘড়ি ব্যবহার করে ডানহাতে। অতএব ধরে নিলুম রবীন্দ্রবাবু ন্যাটা। সেক্ষেত্রে বামহাতে রিভলভার নিয়েই তাঁর আত্মহত্যা করবার কথা। কিন্তু রিভলভার ছিল তাঁর ডানহাতে। তাই দেখেই প্রথমে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়। কিন্তু তা হচ্ছে সামান্য সন্দেহ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।"

—"বেশ, তারপর?"

—"তারপর দেখলুম মৃতের সামনে দাবার ছক। যে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুত, তার মনের অবস্থা হয় ভয়ানক অস্বাভাবিক, তার দাবা খেলবার বা নতুন চাল আবিষ্কার করবার সখ কিছুতেই হতে পারে না। রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয় সেদিন সহজ আর স্বাভাবিক মন নিয়েই আর কারুর সঙ্গে দাবা খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, আত্মহত্যার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। সুতরাং—"

—"সুতরাং তোমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল, কেমন এই তো?"

—"হ্যাঁ। তারপর রিভলভার আর বুলেট দেখেই নিঃসন্দেহে আমি বুঝতে পারলুম যে, এটা হচ্ছে আত্মহত্যার নয়, নরহত্যার মামলা। রবীন্দ্রবাবুর হাতের রিভলভারটা ছিল ২২-ক্যালিবারের ছোট রিভলভার, তার ভিতর থেকে ৩৮-ক্যালিবারের বুলেট নির্গত হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যে বুলেটটা হয়েছে রবীন্দ্রবাবুর মৃত্যুর কারণ, সেটা বেরিয়েছে কোন ৩৮-ক্যালিবারের রিভলভার থেকে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহলে হত্যার কারণ চুরি?"

—"সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

—"তবে সিন্দুকের ভিতর থেকে টাকা আর মোহরগুলো চুরি যায় নি কেন?"

—"এই খুনে-চোর হচ্ছে অতিশয় চতুর। সে পুলিসকে ভুল পথে চালাতে চায়। সে লাভ করতে চায় তিন-তিনটি মহামূল্যবান্ অতুলনীয় মুক্তো, তার কাছে কয়েক শত টাকা তুচ্ছ। সে দেখাতে চায় চুরি বা হত্যা করবার জন্যে কেউ ঘটনাস্থলে আসে নি। তাই রবীন্দ্রবাবুর হাতে তাঁর নিজের রিভলভার গুঁজে দিয়ে আর টাকাগুলো ফেলে রেখে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে ভেবে দেখতে পারে নি যে, ন্যাটা রবীন্দ্রবাবুর ডান হাতে রিভলভার থাকতে পারে না—বিশেষত ২২-ক্যালিবারের রিভলভার। তার আরো একটা মস্ত ভ্রম হয়েছে। দাবার ছক আর ঘুঁটি সে তুলে রেখে যায় নি। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই এমনি সব ছোটখাটো ত্রুটি থেকে যায় বলেই হত্যাকারী শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

—"জয়ন্ত, অনেক কথাই তো তুমি ভেবে দেখেছ। কিন্তু তুমি কি বলতে পারো, হত্যাকারী কে?"

—"বাড়ির লোকদের কথা মানলে বলতে হয়, বাহির থেকে কোন ব্যক্তিই সেদিন বাড়ির ভিতরে আসে নি। অথচ সেদিন রবীন্দ্রবাবুর পরিচিত কোন লোক তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, সেই খেলোয়াড় ব্যক্তি কে?"

—"আমি জানি সে কে!"

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, "আপনি জানেন!"

—"নিশ্চয়! তোমার আগে আমিই তাকে আবিষ্কার করেছি।"

—"বাহাদুর! কিন্তু কে সে?"

—"বাড়ির কেউ নয়।"

—"দীনেন্দ্র?"

—"না।"

—"সত্যানন্দ?"

—"সেও নয়।"

—"তবে?"

—"তার নাম নফরচন্দ্র প্রামাণিক।"

* * * *

স্তব্ধভাবে স্থির হয়ে বসে রইল জয়ন্ত—নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত। কিন্তু মস্তিষ্ক চালনা করতে লাগল তুরন্ত গতিতে। তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, "বুঝেছি। আপনার এই আবিষ্কারের মূলে আছে আমারই অভিভাবন।"

—"অভিভাবন! সে আবার কি চীজ্?"

—"Suggestion-এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে অভিভাবন।"

—"মাথায় থাক্ আমার বাংলা পরিভাষা, এর চেয়ে ইংরেজীই ভালো। কিন্তু আমার আবিষ্কারের সঙ্গে তোমার Suggestion-এর সম্পর্ক কি?"

—"আমি কি আপনার কাছে প্রস্তাব করি নি যে, রবীন্দ্রবাবুর লোহার সিন্দুকের হাতলটা আঙুলের ছাপের জন্যে পরীক্ষা করা হোক্?"

—"তা করেছিলে।"

—"তা করা হয়েছে কি?"

—"হুঁ।"

—"আর তারই ফলে বোধ করি তথাকথিত নফরচন্দ্র প্রামাণিক নামধেয় ব্যক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে?"

সুন্দরবাবু ফিক্ করে হেসে ফেলে বললেন, "ভায়া হে, তোমার উপরে টেক্কা মারা অসম্ভব দেখছি! হ্যাঁ ঠিক তাই! সিন্দুকের হাতলে ছিল আঙুলের ছাপ। পুলিসের 'ফাইলে' সেই আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া গেছে। সে ছাপ হচ্ছে নফরচন্দ্র প্রামাণিকের।"

—"ঐ মহাপুরুষের পরিচয় কি?"

—"অতিশয় চিত্তোত্তেজক। পুলিসের কাছে রক্ষিত অপরাধীদের ইতিহাসে দেখি, সাত বৎসর আগে নফরচন্দ্র একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উপযোগী প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তার পর-বৎসরেই দু-দুটো খুন আর অর্থলুণ্ঠন করে সে আবার অভিযুক্ত হয় রাহাজানির মামলায়। বিচারে তার প্রতি পনের বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে সে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়। সেই থেকেই নফরচন্দ্র ফেরার। যে তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

—"আপনি তাকে দেখেছেন।"

—"না, তার কোন মামলাই আমার হাতে আসে নি।"

—"নফরচন্দ্র যখন দাগী আসামি, পুলিসের কাছে নিশ্চয়ই তার ফোটো আছে?"

—"আছে বৈকি! এই নাও।"

শ্মশ্রুগুম্ফহীন এক সাধারণ চেহারার লোক—সুশ্রী বা কুশ্রী কিছুই বলা যায় না, কেবল জোড়াভুরুর তলায় দুই চক্ষু দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ক্রূরতার আভাস। বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।

সুন্দরবাবু অভিযোগপূর্ণ স্বরে বললেন, "আত্মহত্যার মামলা হয়ে দাঁড়ালো নরহত্যার মামলা! তার সঙ্গে এল আবার তিন-তিনটে হত্যাকাণ্ডের নায়ক ফেরারী

নফরচন্দ্রের মামলা! বাপ রে, এখন এই ডবল মামলার হামলা একলা সামলাই কেমন করে? নফরের মত ধড়িবাজের পাত্তা পাওয়া কি সোজা কথা? পুলিসের কেউ যা পারে নি, আমি তা পারব কেন?"

তীক্ষ্ননেত্রে নফরচন্দ্রের ফোটোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার বক্‌বকানি থামান। এখানে স্বচ্ছ কাগজ আছে?"

—"স্বচ্ছ কাগজ?"

—"হ্যাঁ, ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রেসিং পেপার!"

—"মরছি নিজের জ্বালায়, এখন তোমার ঐ সব ছাঁকা বাংলা বুলি ভালো লাগছে না! কেন, সোজাসুজি বলতে পারো না কি—ট্রেসিং পেপার চাই? তা থাকবে না কেন? কিন্তু ও জিনিস নিয়ে তোমার আবার কি হবে?"

—"একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।"

জয়ন্তের অল্পস্বল্প ছবি-আঁকার হাত ছিল। সুন্দরবাবুর দিকে পিছন ফিরে বসে ফাউন্টেন পেন ও ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সে ফোটো থেকে নফরচন্দ্রের একখানা হুবহু প্রতিলিপি তুলে নিলে। তারপর সেই নকল-করা মুখের উপরে যথাস্থানে এঁকে ফেললে লম্বা চুল, কালো চশমা, ঘন গোঁফদাড়ি!

সুন্দরবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আরে গেল, ও আবার কি ছেলেমানুষি হচ্ছে শুনি?"

—"সুন্দরবাবু, এখন দেখুন দেখি, এই লোকটিকে কি চেনেন বলে মনে হচ্ছে?" জয়ন্ত প্রশ্ন করলে কৌতুকপূর্ণকণ্ঠে।

সুন্দরবাবু প্রথমে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই ছবিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর দেখতে দেখতে যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাঁর দুই চক্ষু। তিনি চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আরে আরে, এ যে রবীন্দ্রবাবুর বন্ধু সত্যানন্দ বসুর মুখ!"

জয়ন্ত রুপোর শামুকদানী থেকে একটিপ নস্য নিয়ে হাস্যমুখে বললে, "ছবিতে আঁকা মুখে লম্বা চুল, কালো চশমা আর গোঁফদাড়ি বসিয়ে দিতেই নফরচন্দ্রের মূর্তির ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে সত্যানন্দ স্বয়ং! এমন যে হবে আমি তা আগেই অনুমান করেছিলুম। আমি নফরকে চিনতুম না, তার জীবনীও জানতুম না, কিন্তু এই মামলার সমস্ত দেখে-শুনে আমি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিলুম সত্যানন্দকেই। চেহারার রকমফের করে নাম ভাঁড়িয়ে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে নফরচন্দ্র বহাল তবিয়তে হতভাগ্য রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিতালি জমিয়ে ফেলেছিল—প্রথম থেকেই তার কুদৃষ্টি ছিল সেই মুক্তা তিনটির উপরে। সকলের অগোচরে শুঁড়ীপথ দিয়ে ঢুকে মেথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে পাপকার্য

সেরে আবার অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু এইবারে তাকে মুখোস খুলতে হবেই। নফরচন্দ্র এখনো আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে—কারণ এখনো সে সন্দেহ করতে পারে নি যে, আমরা তাকে সন্দেহ করেছি। সুতরাং উঠুন! জাগুন! ছুটুন সবাই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের আস্তানার দিকে!"

—"হুম্! তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু!"

* * * *

নফর ওরফে সত্যানন্দের বাড়ি।

চারিদিকে পুলিস পাহারা বসিয়ে সদরের কড়া নাড়তে নাড়তে সুন্দরবাবু ডাকলেন, "সত্যানন্দবাবু, সত্যানন্দবাবু!"

বারান্দা থেকে উঁকি মারলে সত্যানন্দের মুখ। পুলিস দেখে তার ভাবান্তর হল না। সহজ স্বরেই শুধোলে, "অধীনের গোলামখানায় আপনারা যে?"

—"মামলা সংক্রান্ত একটা জরুরি কথা জানতে এসেছি।"

—"বেশ করেছেন। বেয়ারা গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছে। সোজা উপরে চলে আসুন।"

দোতালার ঘরের ভিতরে প্রথমে প্রবেশ করলেন সুন্দরবাবু, তারপর জয়ন্ত, তারপর আরো দুজন পুলিস কর্মচারী।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ হাসিমুখে বললে, "অনুগ্রহ করে সকলে আসন গ্রহণ করুন।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বসবার সময় নেই।"

—"কিন্তু আপনারা কি জরুরি কথা জানতে চান? যা বলবার সব তো আমি বলেছি!"

—"কিন্তু একটা কথা বলেন নি।"

—"কি?"

—"আপনি নফরচন্দ্র নামটা ত্যাগ করলেন কেন?"

পর-মুহূর্তে সুন্দরবাবুর বক্ষের উপরে নিক্ষিপ্ত হল যেন দুর্যোধনের মহাগদা! আচম্বিতে নফরচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সুন্দরবাবুর বুকের মাঝখানে করলে প্রচণ্ড পদাঘাত এবং বপুষ্মান্ সুন্দরবাবুরও দেহ ঠিকরে গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে একেবারে জয়ন্তের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন ও গুরুভার দেহপতনের শব্দ!

মেঝের উপরে অল্প ছটফট করেই নফরচন্দ্র ওরফে সত্যানন্দের মূর্তি নিশ্চেষ্ট ও একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার কপাল থেকে বেরুতে লাগল ঝলকে ঝলকে রক্ত!

সুন্দরবাবু আপসোস্ করে বলে উঠলেন, "হায় হায় হায় হায়! নফ্‌রা আমাকে লাথি মেরেও ফাঁকি দিলে, ব্যাটাকে ফাঁসিকাঠে দোল খাওয়াতে পারলুম না! ছি জয়ন্ত, ওকে তোমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "উচিত তো ছিল, কিন্তু আপনি এমন কম্‌লির মতন আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন যে আমার অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ! তবে আপনার এ-কূল ও-কূল দু-কূল নষ্ট হয় নি, নফরচন্দ্রের লাস দাখিল করতে পারলেও আপনার ভাগ্যে লাভ হবে পুরস্কারের পঞ্চসহস্র মুদ্রা!"

পুরস্কারের কথা মনে হতেই সুন্দরবাবু একমুখ হাস্য করলেন। তারপর বুকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "নফরা তো পটল তুললে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর মুক্তো তিনটে কোথায় লুকিয়ে রেখে গেল?"

জয়ন্ত বললে, "আশা করি এখানে খানাতল্লাস করলেই মুক্তা পাওয়া যাবে। আর নফরের হাতের ঐ রিভলভারটা দেখুন। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রবাবু মারা পড়েছেন ঐ রিভলভারের বুলেটেই।"

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

সেদিন সুন্দরবাবু আমাদের প্রভাতী চায়ের আসরে হাজিরা দিতে এত বিলম্ব করে ফেলেছিলেন যে, আমরা তাঁর আসার আশায় দিয়েছিলুম জলাঞ্জলি।

অবশেষে তিনি এলেন বটে, কিন্তু অতিশয় খাপ্পা অবস্থায়। রাগে ফুলতে ফুলতে এবং আপন মনে এই বলতে বলতে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন—"হ্যাঁরে ফাজিল ছোক্‌রা, একবার যদি হাতের মুঠোয় পাই, পুলিসের কেরামতিটা বুঝিয়ে দেব!"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললুম, "কি ব্যাপার সুন্দরবাবু, আপনার দ্বিতীয় রিপু হঠাৎ এতটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল কেন?"

ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ে সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, ঐ শশী চৌধুরীর কথা বলছি! একবার বিলাতে টহল মেরে এসে নিজেকে সে মস্ত বড় কেও-কেটা বলে ধরে নিয়েছে!"

—"অর্থাৎ?"

—"বলে কি জানো? বাঙালী পুলিস হচ্ছে 'ফুলিস' জীব! দৈব সহায় না হলে আমরা নাকি কোন মামলায় সফল হতে পারি না! যে কোন চতুর ব্যাক্তি আমাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করতে পারে—ইত্যাদি!"

—"শশী চৌধুরী ব্যক্তিটি কে?"

—"আমার প্রতিবেশী। ব্যাঙ্কে মোটা মূলধন গচ্ছিত রেখে বাপ গিয়েছে পরলোকে, আর ছেলে ইহলোকে বসে করছে তার দৈনন্দিন সদ্ব্যবহার। অবিবাহিত। আত্মীয় বলতে কেউ নেই। লণ্ডনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে বিলাতী পুলিস দেখে আমাদের আর আমলেই আনতে চায় না। আমরা যে অপদার্থ এটা প্রমাণ করবার জন্যে সে নাকি বাজি রাখতেও রাজী আছে!"

জয়ন্ত বললে, "আরে, ও-সব ছেঁড়া কথা ছেড়ে দিন—এদিকে চা যে শীতল পানীয় হয়ে ওঠার উপক্রম!"

সুন্দরবাবুর মৌখিক উচ্ছ্বাস সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি এক হাতে টোষ্ট ও আর এক হাতে সিদ্ধ ডিম তুলে নিলেন।

* * * *

তিন দিন পরে।

'দূরভাষে' সুন্দরবাবুর বাণী এসেছে—"জয়ন্ত, ঝটিতি পা চালিয়ে আমাদের পাড়ার ত্রিশ নম্বর বাড়িতে চলে এস। ভীষণ হত্যাকাণ্ড! লাস লোপাট!"

ত্রিশ নম্বর খুঁজে পেতে দেরি লাগল না। মাঝারি আকারের বাগানের মাঝখানে একখানা সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ি। ফটকের কাছে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন সুন্দরবাবু।

—"কে খুন হয়েছে মশাই?"

—"সেদিন চায়ের আসরে যাঁর কথা বলেছিলুম, সেই শশী চৌধুরী!"

—"বলেন কি!"

—"সেদিন তাঁর কথায় রেগে গিয়েছিলুম, কিন্তু আজ তাঁর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! বেচারা আর বাজি রাখতে পারবে না! হায় রে পোড়াকপাল, এই তো মানুষ—এই আছে, এই নেই! তবু এত লাফানি-ঝাঁপানি!"

—"শশীবাবুকে খুন করলে কে?"

—"সেইটেই তো আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। খালি খুনী নয় হে, লাসও অদৃশ্য!"

—"লাস নেই? সে আবার কি কাণ্ড?"

—"শোনো তবে সংক্ষেপে সব কথা। শশীবাবু মাঝে মাঝে সখ করে নিজেই নিজের মোটর চালিয়ে বেড়াতে যান। গতকল্যও গিয়েছিলেন সন্ধ্যার পর। তারপর তিনি কত রাত্রে কখন যে ফিরে আসেন, বাড়ির লোকজন কেউ তা বলতে পারে না। তবে তিনি যে গাড়ি নিয়ে ফটক দিয়ে বাগানের ভিতরে

ঢুকেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সকালে দেখা যায়, বাগানের একধারে খালি গাড়িখানা রয়েছে, ভিতরে চালক বা আরোহী কেউ নেই, কিন্তু গাড়ির ভিতরে সব জায়গায় রক্ত ছড়াছড়ি। একটা হাতখানেক লম্বা রক্তাক্ত লোহার ডাণ্ডাও পাওয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই মারণ-অস্ত্র।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ির ভিতরে খোঁজ নিয়েছেন তো?"

—"সে কথা আর বলতে? খানাতল্লাসের কিছুই আর বাকি নেই, তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি। বাড়ির ভিতরে লাস বা অন্য কিছুই নেই, তবে গাড়ির ভিতরে আরো তিনটে জিনিস পাওয়া গিয়াছে ঃ শশীবাবুর ছিন্নভিন্ন চুড়িদার পাঞ্জাবী, একপাটি জুতো, আর মণিব্যাগ—সবই রক্তাক্ত। পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম আর মণিব্যাগের টাকাকড়িও অদৃশ্য। শশীবাবুর হাতে সোনার হাতঘড়ি ছিল, আর আঙুলে ছিল খুব দামী হীরার আংটি। অর্থলোভেই কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে।"

—"কিন্তু লাস না পেলে কাউকে তো খুনী বলে গ্রেপ্তার করাও চলবে না।"

—"সেই তো হচ্ছে সমস্যা। অপরাধী মহা ধড়িবাজ। খুনখারাপি হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের হাতে রক্তাক্ত মোটর ছাড়া আর কোনই প্রমাণ নেই।"

—"গাড়িখানা কোথায়?"

—"আমার সঙ্গে এস।"

বাগানের বাঁধানো পথের উপরে খানিক এগিয়েই গাড়িখানা পাওয়া গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, "বাঁধানো পথ, খুনীর পায়ের ছাপ পাবার উপায় নেই। হত্যাকাণ্ডের সময়ে যে লোহার ডাণ্ডাটা ব্যবহার করা হয়েছে, তারও একদিকে রুমাল জড়ানো পাছে আঙুলের ছাপ পড়ে, সেইজন্যেই এই সতর্কতা।"

—"কিন্তু শশীবাবু হয়তো নিহত না হয়ে কেবল আহত হয়েছেন।"

—"গাড়ির ভিতরে কত রক্ত দেখছ? এত রক্তপাতের পর কোন মানুষ কি বাঁচতে পারে? আর একটা আহত মানুষকে চুরি করার মানেও হয় না।"

সত্য, গাড়ির ভিতরে যেন রক্তগঙ্গা! গাড়ির গায়ে রক্ত, পিছনের বসবার গদীতে রক্ত, তলদেশেও চাপ চাপ রক্ত—দেখলে মাথা ঘুরে যায়! শুধু সামনের গদীতে নেই রক্তের ছোপ।

জয়ন্ত একমনে তীক্ষ্ণ চোখে সেই রক্তাক্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা ছোট শিশি আনিয়ে অল্প একটু রক্ত তুলে নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "এই দেখ লোহার ডাণ্ডাটা। এর ওপরেও রক্তের দাগ দেখছ?"

"দেখছি" বলে ডাণ্ডাটাও সে ভালো করে পরীক্ষা করলে।

আমি বললুম, "কিন্তু বাগানের পথে কোথাও একফোঁটা রক্ত নেই!"

—"তাও দেখছি আর ভাবছি; আজকের তারিখ কত?"

সুন্দরবাবু বললে, "এপ্রিল মাসের পয়লা।"

—"তারিখটা মনে রাখবেন।"

—"তা রাখব বৈ কি! তোমার আর কি বক্তব্য আছে?"

—"পরে জানার। চল মাণিক!"

—"তারিখের কথা তুললে কেন? তুমি কি বলতে চাও, লাস লুকিয়ে অপরাধী আমাদের 'এপ্রিল ফুল' বানাতে চায়?"

—"ঠিক তাই।"

*　　*　　*　　*

জয়ন্তের আহ্বানে আজ দুপুরেই সুন্দরবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন।

—"কি ব্যাপার জয়ন্ত, অসময়ে জরুরী তলব কেন?"

—"গুমখুনের মামলাটা নিয়ে এখনো মাথা ঘামাচ্ছেন তো?"

—"দস্তুরমত ঘামাচ্ছি, কিন্তু কিছুই সুরাহা করতে পারি নি।"

—"নিজের ঠিকানায় আমি খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলুম, পড়ে দেখুন।"

জয়ন্তের হাত থেকে খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে সুন্দরবাবু পাঠ করলেন ঃ

"বাবু শশীনাথ চৌধুরী! আমরা 'এপ্রিল ফুল' হই নি। অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ ও আমার সঙ্গে দেখা না করলে সমূহ বিপদে পড়বেন।"

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, "এই বিজ্ঞাপনের অর্থ কি? এ কোন্ শশী চৌধুরী?"

জয়ন্ত বললে, "যে শশী চৌধুরীর রক্তাক্ত গাড়ি আমরা দেখেছি!" শশীবাবু আমার বিজ্ঞাপনের উপদেশ শুনেছেন। তিনি বহাল-তবিয়তে আপাতত পাশের ঘরেই লজ্জিত মুখে অপেক্ষা করছেন। আমরা ডাকলেই দেখা দেবেন।

"প্রথমে রক্তাক্ত গাড়িখানা দেখেই আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল। দেহের উপরে প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাত করলে রক্ত পড়ে ছিটকে। কিন্তু গাড়ির সর্বত্র রক্ত দেখে আমার মনে হয়েছিল, কেউ যেন তা সাবধানে লেপন করে দিয়েছে! দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য ছিল, শশীবাবু নিজেই গাড়ির চালক, অথচ চালকের আসন রক্তহীন। তৃতীয়তঃ, বাগানের পথে ছিল না একবিন্দু রক্তের ছাপ। একটা রক্তাপ্লুত দেহকে স্থানান্তরিত করতে গেলে মাটির উপর রক্ত পড়বে না, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

তারপর দেখলুম লোহার ডাণ্ডাটা! মারাত্মক প্রহার করা হলে ডাণ্ডার উপরে মানুষের গায়ের ছাল-চামড়ার টুকরো পাওয়া যেত, কিন্তু সে সব কিছুই ছিল না।

তারপর বাড়িতে এসে শিশির রক্ত নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে আমার সমস্ত সন্দেহই দূর হয়ে গেল। গাড়িতে যে রক্ত পাওয়া গিয়াছে তা মানুষের নয়, পশুর রক্ত। তখন বেশ বুঝলুম, শশীবাবু সশরীরে সুস্থ অবস্থায় ইহলোকেই বর্তমান আছেন, কিছুদিন লুকিয়ে থেকে পুলিসের সঙ্গে একটু তামাসা করতে চান।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তামাসা? পুলিসের সঙ্গে তামাসা? আমি শশীবাবুকে গ্রেপ্তার করব।"

আমি বললুম, "আহা হা, চেপে যান সুন্দরবাবু, চেপে যান! ব্যাপারটা এখনো তামাসাই আছে, বেশি টানাটানি করলে রীতিমত প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে যে!"

রিভলভার

উপস্থিতবুদ্ধি যে কাজ করে মন্ত্রশক্তির মত, তার একটা দৃষ্টান্ত দেখেছিলুম।

অনেকদিন আগেকার ঘটনা, জয়ন্ত তখনও সখের গোয়েন্দা বলে পরিচিত হয় নি। সে আর আমি একসঙ্গে কলেজে পড়ি।

আজ আমি কোন গোয়েন্দার গল্প বলব না। কিন্তু যে উপস্থিতবুদ্ধি হচ্ছে ভালো গোয়েন্দার একটি প্রধান গুণ, জয়ন্তের মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল প্রথম—অর্থাৎ যখন সে গোয়েন্দা হয়নি তখন—থেকেই। তারই একটা নজির।

পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছিলুম গোমো জংশনে। এই শৈলসংকুল, বন্য ও নির্জন জায়গাটি তখনও বায়ুভক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি এবং সেই কারণেই সেখানে গিয়ে অস্থায়ী ডেরা বাঁধবার জন্যে আমাদের মনে জেগেছিল বিশেষ আগ্রহ।

আগেভাগে যাচ্ছিলুম বলে গাড়িতে ভালো করে পুজোর ভিড় জমে নি। ইন্টারক্লাসের যে কামরায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম তার ভিতরে তিনজনের বেশি আরোহী ছিলেন না। দুজন মাড়োয়ারী ও একজন বাঙালী।

গাড়ি ছাড়বার আগে আরো এক বাঙালী ভদ্রলোক কামরার দরজা খুলেই বলে উঠলেন, "আরে, সুরেনবাবু যে! নমস্কার!"

জয়ন্তের পাশের লোকটি বললেন, "নমস্কার তারিণীবাবু। কলকাতায় এসেছিলুম কিছু জিনিসপত্তর সওদা করতে।"

—"তাহলে এখন ধানবাদেই ফিরছেন তো?"

—"তা ছাড়া আর কি! জানেন তো, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত!"

—"বেশ, বেশ, আমিও তো ঐ মসজিদেরই আর এক মোল্লা! দুজনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

বোঝা গেল সুরেনবাবু ও তারিণীবাবু দুজনেই ধানবাদের বাসিন্দা।

* * * *

ট্রেন ছুটছে সবেগে এবং সশব্দে।

দিনের আলো নিবিয়ে এসেছে অন্ধকার এবং তারপর অন্ধকারকে পাতলা করে বনের মাথায় উঠেছে চাঁদ। বাইরে, দেখা যাচ্ছে রহস্যময় ছায়াছবি।

মাড়োয়ারী দুজন একটুও সময় অযথা নষ্ট করে নি, গাড়ি হাওড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এক-একখানা বেঞ্চের উপরে বিপুল বপু ততোধিক বিস্তীর্ণ ভুঁড়ি নিয়ে হয়েছে সটান লম্বমান এবং তাদের শব্দায়মান নাসাযন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করছে আমাদের সকলকার কর্ণপীড়া।

একটি নতুন বেতের বাস্কেটের উপরে হস্তার্পণ করে তারিণীবাবু শুধোলেন, "হ্যাঁ সুরেনবাবু, বাস্কেটটা কার?"

—"আপাতত আমারই বটে।"

—"তার মানে?"

—"ধানবাদের কয়লার খনির মালিক রামরতনবাবুকে চেনেন তো? তাঁরই ফরমাসে বাস্কেটটা কিনতে হয়েছে। ওর ভেতরে আছে কতকগুলো খেলার সামগ্রী।"

—"খেলার সামগ্রী?"

—"হ্যাঁ, ছেলেদের বায়না। দামী খেলনা। বড়লোকদের ছেলেমেয়েরা দামী দামী বিলিতী খেলনা না হলে খেলে সুখ পায়না। হগ্ সাহেবের বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আমি রামরতনবাবুর তাঁবে থাকি, তাঁর অনুরোধ আমার কাছে হুকুমেরই সামিল।"

বাস্কেটের ডালায় তালা-চাবি ছিল না। তারিণীবাবু সাগ্রহে ডালা তুলে একে একে খেলনাগুলো পরীক্ষা করলেন। জয়ন্তও সেইদিকে চোখ ফেরালে সকৌতুকে।

সুরেনবাবু তিক্তস্বরে বললেন, "দেখলেন তো, কেবল অর্থের অপচয়! খেলনাগুলো কিনতে যে টাকা লেগেছে, আমাদের মত ছাপোষা মানুষদের একমাসের সংসারখরচ চলে যেত।"

উত্তরে তারিণীবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

*   *   *   *

একটা ষ্টেশনে যখন ট্রেন ছাড়বার বাঁশী বেজে উঠেছে, হঠাৎ একদল কুদর্শন লোক হুড়মুড়িয়ে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। গুণে দেখলুম তারা পাঁচজন।

তাদের চেহারা ও আবির্ভাব সন্দেহজনক এবং প্রথম আচরণ ও ভয়প্রদ।

দলের মধ্যে সব-চেয়ে লম্বাচওড়া, কালোকুৎসিত ও দৈত্যের মত দেখতে লোকটা এগিয়ে গিয়ে একজন মাড়োয়ারীর ভুঁড়ির উপরে চটাস করে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "এই ডালরুটিচোট্টা, এটা ঘুমোবার জায়গা নয়, উঠে পড়্!" সে বাংলায় কথা কইলে বটে, কিন্তু তার উচ্চারণ বাঙালীর মত নয়। তার পরনেও ছিল ধুতির বদলে লুঙ্গী।

চড় খেয়ে মাড়োয়ারীর নাকের ডাক থেমে গেল, শোনা গেল মুখের আর্তনাদ। সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

পর-মুহূর্তেই পাঁচ মূর্তিরই হাতে দেখা গেল এক-একখানা চক্‌চকে ছোরা!

আমি সচমকে উঠে দাঁড়িয়ে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালুম। সে স্থির হয়ে বসে আছে এবং তার মুখের নিশ্চিন্ত ভাব দেখলে মনে হয়, কামরায় যেন শান্তিভঙ্গের কোন কারণই ঘটে নি!

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মাড়োয়ারীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। সে লাফ মেরে ওদিকে দরজার কাছে গেল গাড়ি থামাবার শিকল টেনে দেবার জন্যে—কিন্তু তার আগেই দৈত্যের মত লোকটার প্রচণ্ড লাথি খেয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সুরেনবাবু চুপিচুপি কাতর স্বরে বললেন, 'অ তারিণীবাবু, এরা যে ডাকাত! এখন কি হবে?"

তারিণীবাবু তখন একেবারে বোবা, তাঁর সারা দেহ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

*   *   *   *

মূর্তিমন্ত দৈত্যটা শানিত ছোরাখানা নাচাতে নাচাতে বাজখাঁই গলায় বললে, "যদি বাঁচতে চাও, যার কাছে যা আছে এখনি বার করে দাও, নইলে—"

কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোবার আগেই আমার পিছন থেকে জয়ন্ত বিষম ক্রোধে চীৎকার করে বলে উঠল, "খবর্দার! আর একটা কথা কয়েছ কি এক পা নড়েছ, তাহলে কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না!"

সবিস্ময়ে পিছন ফিরে দেখে নিজেই চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না! সে তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, দৃপ্ত তার ভঙ্গি! দুইচক্ষে তার ক্রোধের আগুন এবং হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

কি আশ্চর্য! আমাকেও লুকিয়ে জয়ন্ত কি একটা রিভলভার পকেটে করে নিয়ে এসেছে? এমন তো কখনো হয় না! জয়ন্ত যে রিভলভারের অধিকারী, এটাও ছিল আমার অজানা!

জয়ন্ত আবার চেঁচিয়ে বললে, "আমার এই রিভলভারে বুলেট আছে অর্ধডজন। তোদের মত পাঁচজন দুরাত্মার পক্ষে তাই-ই হবে যথেষ্ট! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্, নইলে কুকুরের মত মারা পড়বি! মাণিক, এইবারে তুমি গাড়ি থামাবার শিকলগাছা টেনে দাও তো!"

তারপরের কথা বেশি বলা বাহুল্য। ট্রেন থামল আচম্বিতে, দলে দলে লোক এল ছুটে, ডাকাতরা হল বন্দী।

* * * *

সুরেনবাবু জয়ন্তকে সম্বোধন করে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "ও মশাই, আপনি যে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন! আমি কিনেছি খেলনার রিভলভার, আর তাই দেখিয়ে পাঁচ-পাঁচটা ডাকাতকে আপনি করলেন কুপোকাত!"

জয়ন্ত একগাল হেসে বললেন, "তারিণীবাবু যখন বাস্কেটের খেলনাগুলো পরীক্ষা করছিলেন, তখনই আমি ঐ নকল রিভলভারটা দেখতে পেয়েছিলুম!"

এতক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে তারিণীবাবু চমৎকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ধন্য, ধন্য!"

দৈত্যের মত ডাকাতটা গর্জ্জন করে উঠল নিষ্ফল আক্রোশে।

ইতি

পলাতক চায়ের পেয়ালা

একটা তদন্ত সেরে মানিকের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল জয়ন্ত। হঠাৎ রাস্তার ধারের একখানা বাড়ির একতলার জানালা থেকে আত্মপ্রকাশ করলে ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর সুপরিচিত মুখখানি ও তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়ি।

—'হুম! বলি ও জয়ন্ত! একবার এদিকে পদচালনা করবে কি? কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়ে গিয়েছি ভায়া! বাড়ির ভিতর এসো।'

একতলার যে ঘরের ভিতরে তারা প্রবেশ করলে, বোধহয় সেটা বৈঠকখানা। একটা গোলটেবিলের উপরে রয়েছে চায়ের পেয়ালা এবং 'টোস্ট' ও 'এগ-পোচ' প্রভৃতির পাত্র।

জয়ন্ত বললে, 'ব্যাপার কী? এখানে বসে এত বেলায় প্রাতরাশ সারছেন যে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এতক্ষণ ফুরসত হয়নি ভায়া! কিন্তু তোমরা জানোই তো, চা-টা না খেলে আমার বুদ্ধি খোলে না, তাই পাড়ার একটা দোকান থেকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য আর পানীয় আনাতে বাধ্য হয়েছি! তোমাদের জন্যে আনাব নাকি?'

—'নিশ্চয়ই নয়! একদিনে দু-বার প্রাতরাশ আমাদের ধাতে সহ্য হয় না।'

—'তাহলে তোমরা বসে বসে শোনো আর আমি খেতে খেতে বলি।'

জয়ন্ত ও মানিক আসনগ্রহণ করলে পর সুন্দরবাবু বললেন, 'গৌরচন্দ্রিকা না করে খুব সংক্ষেপেই ব্যাপারটা বলি শোনো। এসেছি এখানে একটা চুরির মামলায়, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে পিছনে অন্য কোনও রহস্যও থাকতে পারে। এই বাড়িখানার মালিক হচ্ছেন পরিতোষ রায়চৌধুরি। হরিপুরের জমিদার। বেশির ভাগ মফস্বলেই থাকেন, কাজের তাগিদে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। এবারে একখানা বাগান কেনবার জন্যে তাঁর কলকাতায় আবির্ভাব হয়েছিল। বাগানখানা আজই কেনবার কথা, তাই কাল তিনি ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকার নোট আনিয়ে নিজের শোবার ঘরের আলমারির ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই টাকা চুরি গিয়েছে।'

—'কেমন করে?'

—'তা কেউ জানে না।'

—'পরিতোষবাবু কী বলেন?'

—'তাঁর কিছুই বলবার শক্তি নেই। কারণ কাল রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

—'স্বাভাবিক মৃত্যু?'

—'হুম, আমারও মনে জেগেছে এই জিজ্ঞাসা। কিন্তু লাশের কোথাও সন্দেহজনক কোনও চিহ্নই নেই। পরিতোষবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক হচ্ছেন বিখ্যাত ডাক্তার এস. এন. সিংহ। তাঁর মতে হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুন পরিতোষবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি কিছুকাল থেকেই বুকের অসুখে ভুগছিলেন, কাল সন্ধ্যাতেও তিনি নাকি বুকের ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন।'

—'এ কথা কে আপনাকে বললে?'

—'মুরারিবাবু।'

—'তিনি কে?'

—'পরিতোষবাবুর প্রতিবেশী। তিনিও আগে ডাক্তারি করতেন, এখন ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। রাস্তার ওপারেই সামনের ওই বাড়িখানায় তিনি থাকেন। সর্বশেষে তিনিই কাল জীবিত অবস্থায় পরিতোষবাবুকে দেখে গিয়েছেন।'

—'মৃতদেহের সৎকার হয়েছে?'

—'না। পরিতোষবাবু এবারে একলাই কলকাতায় এসেছেন। হরিপুরে তাঁর পরিবারবর্গের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে, তাঁরা এখনও এসে পৌঁছননি।'

—'আপনি সমস্যায় পড়েছেন বলছেন, কিন্তু আপনার সমস্যাটা কী?'

—'একই রাত্রে পরিতোষবাবুর মৃত্যু আর টাকা চুরি কি সন্দেহজনক নয়? অথচ মৃত্যুর জন্যে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নেই, কারণ এস. এন. সিংহের মতো বিখ্যাত ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তা না হলে লাশ আমি মর্গে পাঠাতে বাধ্য হতুম।'

—'আচ্ছা, চুরির কথাই হোক। আলমারিতে দশ হাজার টাকার নোট আছে, এ খবর আর কেউ জানত?'

—'সন্তোষবাবু জানতেন। তিনি পরিতোষবাবুর ম্যানেজার, এই বাড়িতেই থাকেন। টাকাটা তিনিই ব্যাংক থেকে তুলে এনেছিলেন।'

—'মুরারিবাবু কী বলেন?'

—'টাকার কথা তিনি নাকি কিছুই জানতেন না।'

—'এ বাড়িতে আর কে থাকে?'

—'দুজন দারোয়ান, দুজন বেয়ারা, একজন পাচক।'

—'রাত্রে পরিতোষবাবুর শয়নগৃহের দরজা কি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল?'

—'না।'

—'মৃতদেহটা আমি একবার দেখতে পারি কি?'

—'অনায়াসে! চলো।'

॥ দুই ॥

মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে একটা আলমারি—টাকা ছিল তার ভিতরেই। একদিকে একখানা পালঙ্ক। রাস্তার ধারের জানালার সামনে একটি ছোটো টেবিল ও একখানা চেয়ার। মেঝেতে কার্পেটের উপরে পাতা একটি ছোটো বিছানা, মৃতদেহ ছিল তার উপরেই।

পরিতোষবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। পরনে কেবল গেঞ্জি ও কাপড়। মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন ঘুমোচ্ছেন!

জয়ন্ত বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলে। তারপর পকেট থেকে একখানা আতশি কাচ বার করে মৃতদেহের বাম হাতের বুড়ো আঙুলের উপরে রেখে কী দেখতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, 'সুন্দরবাবু, এই ক্ষত চিহ্নটা আপনি কি দেখেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ক্ষতচিহ্ন?'

—'হ্যাঁ। অত্যন্ত ছোটো একটা ক্ষত, প্রায় অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে, বিশেষ ভাবে না দেখলে চোখেই পড়ে না।'

ভালো করে দেখে সুন্দরবাবু বললেন, 'ধেৎ, এ একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'পরিতোষবাবুর ম্যানেজার সন্তোষবাবু আর তাঁর প্রতিবেশী মুরারিবাবুকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

তাঁরা দুজনেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। দুজনেরই অত্যন্ত সাধারণ চেহারা, বর্ণনা করবার মতো কিছুই নেই।

জয়ন্ত শুধোলে, 'সন্তোষবাবু, পরিতোষবাবুর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে গিয়েছিল কেমন করে?'

সন্তোষবাবু বললেন, 'কাল সকালে পেনসিল বাড়তে গিয়ে কর্তার হাত সামান্য একটু ছড়ে যায়। মাত্র দু এক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল, কর্তা তা আমলেই আনেননি।'

মুরারিবাবু বললেন, 'এ বিষয়ে আমি আরও দুএকটা কথা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে পরিতোষবাবু বললেন, 'বুড়ো আঙুলটা একটু টনটন করছে।' আমিও আগে ডাক্তারি করতুম। কোনও ক্ষতকেই অবহেলা করা উচিত নয় বলে আমি নিজের বাড়িতে গিয়ে 'লাইজলের' শিশিটা নিয়ে আসি। তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে পর একটা চায়ের পেয়ালায় জল ভরে তাতে দশ ফোঁটা 'লাইজল' ঢেলে পরিতোষবাবুকে বলি, সেই জলে মাঝে মাঝে কাটা আঙুলটা ভিজিয়ে রাখতে। ঠিক সেই সময়েই পরিতোষবাবু বুকের কাছে ব্যথা বোধ করেন। আমি তাঁকে শুয়ে পড়তে বলে বাড়ি ফিরে যাই।'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে কাল আপনি-এ বাড়িতে দুবার এসেছিলেন?'

—'না, তিনবার।'

—'তিনবার?'

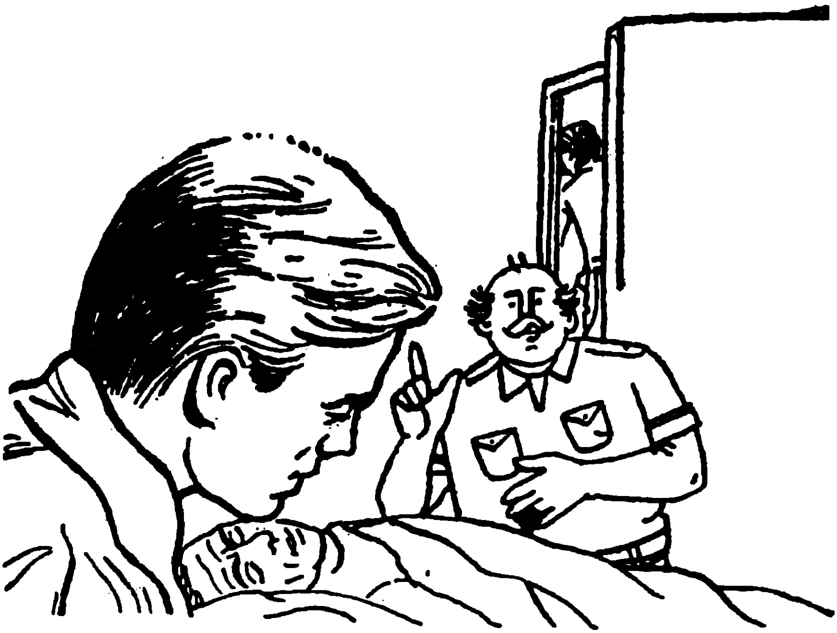

জয়ন্ত বেশ খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলে

—'হ্যাঁ, আমি একটু রাতে আর একবার এসেছিলুম, সন্তোষবাবু সে কথা জানেন।'

—'আবার এসেছিলেন কেন?'

—'পরিতোষবাবুর বুকের ব্যথাটা কেমন আছে জানবার জন্যে। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলুম, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজেই তাঁকে না জাগিয়েই আবার আমি ফিরে যাই।'

কথা শুনতে শুনতে জয়ন্ত ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করছিল। সে বললে, 'মুরারিবাবু, আপনি যখন তৃতীয়বার এ ঘরে আসেন, সেই লাইজলের পেয়ালাটা কোথায় ছিল।'

—'ওই টেবিলটার উপরে।'

—'কিন্তু সেটা এখন আর ঘরের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

মুরারিবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'আমি কেমন করে বলব?'

—'সন্তোষবাবু কি পেয়ালাটাকে সরিয়ে রেখেছেন?'

সন্তোষবাবু দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! পেয়ালাটা কি তাহলে জ্যান্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে সরে পড়ল?'

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, বাড়ির ভিতরে খুঁজে দেখুন পেয়ালাটা

কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা ! সেই-ই হচ্ছে যত নষ্টের মূল! ততক্ষণে আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে চাই।' বলেই সে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে জয়ন্ত আবার একতলার বৈঠকখানায় ঢুকে একজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললে, 'সুন্দরবাবু আর মানিকবাবুকে সেলাম দাও।'

মিনিটখানেক পরে সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'জয়ন্ত, বাড়ির কোথাও চায়ের পেয়ালাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।'

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, 'পাবেন না তা আমি জানি। সুন্দরবাবু, এটা খুব সহজ মামলা। অপরাধী বোকা আর অপরাধটাও কাঁচা, যদিও সে খুন আর চুরি দুই-ই করেছে।'

—'কী বলছ হে?'

—মৃতদেহে ক্ষতচিহ্ন দেখে আর পেয়ালা অদৃশ্য হয়েছে শুনেই আমার মন আসল সূত্র খুঁজে পেয়েছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগল, পেয়ালায় নিশ্চয় 'লাইজলে'র বদলে এমন কোনও মারাত্মক পদার্থ ছিল, যা আর কারুর জানা উচিত নয়। তাই সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আর সেটা সরাবার সুযোগ পেয়েছিলেন মুরারিবাবুই, কারণ তিনি বারবার এখানে আনাগোনা করেছিলেন। আসবার সময় দেখেছিলুম, এ পাড়ায় একটি মাত্র ঔষধের দোকান আছে। সেখানে গিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, কাল সন্ধ্যার সময়ে মুরারি সেখান থেকে দুটো জিনিস কিনেছে—'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' আর 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড'। খানিকটা জলের সঙ্গে 'সিয়ানাইড অফ পটাসিয়াম' গুলে নিয়ে একটুখানি 'হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড' মিশিয়ে দিলেই তা পরিণত হবে মারাত্মক 'প্রুসিক অ্যাসিডে'। মনুষ্যদেহের অতি তুচ্ছ আঁচড়ও তার সংস্পর্শে এলে মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য। মুরারি নিশ্চয় কোনও গতিকে (খুব সম্ভব পরিতোষবাবুর মুখেই) জানতে পেরেছিল আলমারির মধ্যে দশ হাজার টাকার নোটের অস্তিত্ব। সুন্দরবাবু, 'একটা বড়ো মামলা নিয়ে আমি এখন বড়োই ব্যস্ত, আপাতত আমার আর কিছুই করবার নেই, বাকি তদন্তটা আপনিই সেরে ফেলুন। চলে এসো মানিক!'

পরদিন টেলিফোনের ঘন্টি ধরে জয়ন্ত শুনতে পেলে, সুন্দরবাবু বিপুল উল্লাসে বলছেন, 'হুম জয়ন্ত, হুম! সঠিক তোমার আন্দাজ। মুরারি অপরাধ স্বীকার করেছে। তুমিই ধন্য!'

ব্রহ্মরাজের পদ্মরাগ

জয়ন্তের হাতে বাজছে বাঁশি। যখন কাজের অভাব হয় তখন বাঁশি হয় তার সাথী। ইজিচেয়ারে কাত হয়ে মানিক পড়ছে খবরের কাগজ।

সকালের কচি রোদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে।

সিঁড়ির উপরে ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। জয়ন্তের বাঁশি হল বোবা। দরজার সামনে দেখা দিলে বিপুল একটি ভুঁড়ি। গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর ভুঁড়ি—কলকাতায় অদ্বিতীয় (অন্তত মানিকের মতে)।

জয়ন্ত বললে, 'সুপ্রভাত!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কীহে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে থামলে কেন?'

মানিক খবরের কাগজখানা পাশের টেবিলে নিক্ষেপ করে বললে, 'আপনার ভয়ে।'

—'হুম! মানে?'

—'কোকিল কোনওদিন মত্ত হস্তীর মন মজাতে সাহস করে না।'

—'আমি মত্ত হস্তী? মানিক!'

জয়ন্ত চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি ভৃত্যের উদ্দেশে বললে, 'মধু! চা, টোস্ট, এগ-পোচ। শিগগির নিয়ে আয়—সুন্দরবাবুর খিদে পেয়েছে!'

সুন্দরবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'নাঃ, এর পরে আর রাগ করা চলে না দেখছি! কী বলো হে মানিক?'

মানিক সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ! সেটা বোকামি হবে। আপনি আর যা কিছু হোন, বোকা নন।'

—'হুম সার্টিফিকেটের জন্য ধন্যবাদ' বলেই সুন্দরবাবু চেয়ারকে শব্দিত করে বসে পড়লেন।

জয়ন্ত বললে, 'তারপর? এত সকালে এদিকে যে?'

—'চাকরির দায়ে।'

—'নতুন 'কেস?'

—'নতুন প্রহসনও বলতে পারো।'

—'প্রহসন?'

—'হুঁ, কিন্তু এ প্রহসনটা বিয়োগান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।'

—'ব্যাপারটা কী?'

—'খুবই সহজ, কিন্তু অপূর্ব!'

—'ঘটনাটা খুলেই বলুন না!'

—'বলছি। সব ঘটনাই খুলে বলব, আগে 'ব্রেকফাস্ট'টা সেরে নিই, কারণ মধু এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে'—বলেই সুন্দরবাবু বিপুল বিক্রমে 'এগ-পোচ'কে আক্রমণ করলেন।

॥ দুই ॥

সুন্দরবাবু যা বললেন, তা হচ্ছে এই

মোহন মল্লিক কলকাতার একজন বিখ্যাত ধনী। তাঁর শখও যথেষ্ট। সম্প্রতি তিনি একখানি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন পদ্মরাগ মণি ক্রয় করেছেন।

মণিখানি ছিল ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থিবোর রত্নভাণ্ডারের একটি প্রধান অলঙ্কার। থিবো রাজ্যচ্যুত হবার পর মণিখানি অন্য লোকের হাতে গিয়ে পড়ে। তারপর নীলামে ওঠে। মোহনবাবু সেখানি চল্লিশ হাজার টাকায় কিনে নেন। মণির আসল দাম নাকি ষাট হাজার টাকার কম হবে না।

কাল সকাল বেলায় মোহনবাবু নিজের বৈঠকখানার টেবিলের সামনে বসে থিবোর মণি পরীক্ষা করছিলেন, এমন সময় তাঁর বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রবাবু আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

সুরেনবাবু বললেন, 'ওহে মোহন, ইনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ যাদুকর বিধুভূষণ বসু। তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে, তাই এঁকে নিয়ে এলুম।'

মোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বিধুকে অভ্যর্থনা করে বললেন, 'আসুন বিধুবাবু, বসতে আজ্ঞা হোক। সুরেনের মুখে আপনার ম্যাজিক দেখাবার শক্তির কথা শুনেছি, নানা খবরের কাগজেও সেই কথা পড়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।'

সুরেনবাবু ও বিধুবাবু টেবিলের অন্য ধারে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

মোহনের হাতের দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু বললেন, 'তোমার হাতে ওটা চকচক করছে কী হে?'

মোহনবাবু বললেন, 'থিবোর মণি—কাল তোমাকে যার কথা বলেছিলুম। অপূর্ব এর সৌন্দর্য, একবার হাতে নিয়ে দ্যাখো।'

সুরেনবাবু মণিখানি নিয়ে বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'চমৎকার, চমৎকার!'

বিধুবাবুও মণিখানি নিজের হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, 'এ মণির বিশেষত্ব কী?'

মোহনবাবু বললেন, 'সবচেয়ে দামী পদ্মরাগ-মণির রঙ হয় কপোত-রক্তের মতো। এখানি সেই জাতীয়, আকারেও অসাধারণ।'

বিধুবাবু আর কিছু না বলে মণিখানি ফিরিয়ে দিলেন। মোহনবাবু রত্নটিকে একটি হাতির দাঁতের কৌটোর মধ্যে পুরে টেবিলের উপরে নিজের সামনে রেখে দিলেন। তারপর বিধুবাবুকে অনুরোধ করলেন, ম্যাজিকের দুই-একটি নমুনা দেখাবার জন্যে।

বিধুবাবু হাসিমুখে মোহনবাবুর অনুরোধ রক্ষা করলেন। তাঁর মন রাখবার জন্যে কেবল দু-একটি নয়, আধঘণ্টা ধরে নানানরকম ভেল্কির খেলা দেখালেন। তারপর হঠাৎ 'জরুরি কাজ আছে' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। খানিক পরে প্রস্থান করলেন সুরেনবাবুও।

মোহন মল্লিক রত্নটিকে আর একবার দেখবার জন্যে কৌটোটি খুলেই চমকে উঠলেন সবিস্ময়ে! কৌটো খালি, থিবোর মণি অদৃশ্য।

॥ তিন ॥

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে প্রধান ঘটনা। এরপর আর কী শুনতে চাও?'

জয়ন্ত বললে, 'ঘটনাটা নতুন ধরনের বটে। এটা কি চুরির মামলা?'

—'তাছাড়া আর কী বলব? মণিখানা যে টেবিলের উপর থেকে পড়ে হারিয়ে যায়নি, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

—'কিন্তু চোর বলে কাকে সন্দেহ করেন?'

—'মোহনবাবুর মতে, সুরেনবাবু কোনওরকম সন্দেহের অতীত। তিনি বলেন, সুরেন কেবল তাঁর বিশ্বস্ত বাল্যবন্ধু নন, তিনি অত্যন্ত সাধু আর তাঁর নিজের সম্পত্তির মূল্য ত্রিশলক্ষ টাকা।'

—'তাহলে বাকি রইল কেবল বিধু?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু মোহনবাবুর সমুখে বসে কেমন করে সে চুরি করলে?'

—'সে যাদুকর। নানারকম হাতের কায়দা জানে। লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়াই হচ্ছে তার পেশা। আমার বিশ্বাস, অদ্ভুত ভেল্কি দেখিয়ে দর্শকদের অন্যমনস্ক করে কোনও কৌশলে সে থিবোর মণি হস্তগত করে সরে পড়েছে।'

—'খুব সম্ভব, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। আপনি এখন কী করতে চান?

—'আমি যাচ্ছি তার বাড়ি খানাতল্লাস করতে।'

—'তার বাড়ি কোথায়?'

—'মানিক বসু লেনে। কাঠাখানেক জায়গার ওপর ছোট্ট একখানা পুরনো দোতলা বাড়ি—উপরে দুখানা ঘর। তিন নম্বর বাড়ি। সে বিখ্যাত যাদুকর হতে পারে, কিন্তু তার অবস্থা ভালো নয়।'

—'কিন্তু থিবোর মণি কি সে এতক্ষণে সরিয়ে ফেলেনি?'

—'অসম্ভব। মোহনবাবু পুলিশে খবর দিতে একটুও দেরি করেননি। বিধুর বাড়ির চারিদিকে পুলিশের পাহারা বসেছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে, কাল থেকে আজ পর্যন্ত সে একবারও বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি।'

—'কিন্তু তার বাড়িতে মণি না পেলে তাকে চোর বলে গ্রেপ্তার করতেও তো পারবেন না?'

—'না। তার বিরুদ্ধে আদালতে গ্রাহ্য হয় এমন প্রমাণ কোথায়?'

—'বেশ, তবে চেষ্টা করে দেখুন।'

—'তোমরাও এসো না আমার সঙ্গে!'

—'আপনার আপত্তি নেই?'

—'বিলক্ষণ! কী যে বল!'

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে চেয়ারের উপরে এলিয়ে চুপ করে রইল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ মিনিট কাটল—তবু সে নীরব ও নিস্পন্দ!

মানিক জয়ন্তের স্বভাব জানত। সে বুঝলে তার বন্ধু এখন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত।

সুন্দরবাবু অধীর কণ্ঠে বললেন, 'ওহে ভায়া, বলি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

জয়ন্ত সাড়াও দেয় না, নড়েও না, চোখও মেলে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আর তো দেরি করতে পারি না!'

জয়ন্ত হঠাৎ চোখ খুলে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে চিৎকার করে উঠল, 'হয়েছে, হয়েছে!'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, 'হুম!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ কালীপুজো না?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত কেন!'

—'বিধুর বাড়ি খানাতল্লাস করে যদি বামাল না পান, তাহলে আমি কি করব জানেন?'

—'কী আবার করবে?'

—'জয় মা কালী বলে বাজি ছুড়ব!'

—'মানে?'

—'ভেবে দেখলুম, বিধু চোর চূড়ামণি না হয়ে যায় না।'

—'কিন্তু বাজি ছোড়ার মানে কী?'

—'পরে বলব। আপাতত মানিককে নিয়ে আপনি বিধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হোন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমিও আপনার সঙ্গে যোগদান করব। বুঝলেন?'

—'কিছুই বুঝলুম না। এখন যাবে না কেন?'

—'এখনও আমার বাজার করা হয়নি' বলেই জয়ন্ত উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—নস্য নিতে নিতে।

হতাশ ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে সুন্দরবাবু বললেন, 'বরাবরই জানি জয়ন্ত ছোকরার মাথায় ছিট আছে। এইবারে ছিট বোধহয় পাগলামিতে পরিণত হবে। চুরির সঙ্গে কালীপুজোর আর বাজি ছোড়ার সম্পর্ক কী বাবা?'

মানিক বললে, 'তা জানি না। তবে এটা জানি, জয়ন্ত খুশি হলেই ঘন ঘন নস্য নেয়।'

—'হুম, খামকা বাজার করবার জন্যে ওর এত মাথাব্যথা হল কেন? মানিক, তোমার বন্ধুটি একেবারে অদ্ভুত।'

—'যা বলেছেন!'

—'এখন চলো, পাগলকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, বিধুর বাড়ির দিকে পদচালনা করা যাক।'

॥ চার ॥

খানাতল্লাস ব্যর্থ হল। বিধুর সমস্ত বাড়িখানা তন্নতন্ন করে খুঁজেও থিবোর পদ্মরাগ মণির কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ছোটো বৈঠকখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু নিরাশ-স্বরে বললেন, 'মানিক, আমাদের কাদা ঘাঁটাই সার হল।'

একজন কালো, রোগা, বেঁটে লোক তাঁদের কাছে এসে অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'মশাই, আর আপনাদের এখানে কোনও প্রয়োজন আছে?' তিনি বিধুবাবু।

এমন সময় জয়ন্তের প্রবেশ। তার হাতে একটা লম্বা ব্যাগ। সে এসেই বললে, 'কী ব্যাপার?'

বিধুবাবু বললেন, 'আপনি আবার কে?'

—'জনৈক ব্যক্তি। খানাতল্লাস শেষ হয়েছে?'

—'বুঝেছি, আপনিও পুলিশের কোনও কেষ্ট-বিষ্টু। দেখুন, আমার মতো একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে অকারণে আজ আপনারা যে হয়রানটা করলেন, আমি তা ভুলব না। আমি চোর? আমি থিবোর মণি চুরি করেছি? তাহলে আমার সমস্ত বাড়ি তছনছ করেও চোরাই মাল পাওয়া গেল না কেন? এ কথা আমি লাটসাহেবের কানে তুলব।'

জয়ন্ত দুই ভুরু কপালে উঠিয়ে বলল, 'কার কানে তুলবেন?'

—'লাটসাহেবের কানে।'

—'লাটসাহেব আপনার বিশেষ বন্ধু বুঝি?'

—'বন্ধু না হতে পারেন, কিন্তু লাটসাহেব আমাকে চেনেন। আমি তাঁর সামনে ম্যাজিক দেখিয়েছি। তিনি আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

—'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

বিধুবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'দেখবেন সেই সার্টিফিকেট?'

—'নিশ্চয় দেখব!'

বিধুবাবু রেগে টং হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, আমি খুঁজতে কিছু বাকি রাখিনি। মণি এখানে নেই। আর অপেক্ষা করা মিছে।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। একদিকে একখানা চৌকি, তার উপরে ময়লা শতরঞ্চি পাতা। আর একদিকে ছোট্ট একটা দেরাজহীন টেবিল, তার উপরে ব্লটিং প্যাড, দোয়াতদান ও পিনকুশন এবং খানতিনেক চেয়ার, এছাড়া ঘরে আর কোনও আসবাব নেই।

সে বললে, 'এ ঘরটাও খোঁজা হয়ে গেছে?'

—'এ ঘরে খোঁজবার কী আছে? এটা হচ্ছে বাইরের বৈঠকখানা, সর্বদাই খোলা পড়ে থাকে। বিধু এত নির্বোধ নয় যে, এমন প্রকাশ্য জায়গায় অত দামী রত্ন ফেলে রাখবে!'

—'আমি কৌশল করে বিধুকে এখান থেকে সরিয়ে দিলুম—যান, যান, আপনারাও বাইরে যান, আপনারাও বাইরে যান—শিগগির!' জয়ন্ত একরকম জোর করেই সুন্দরবাবু ও মানিকবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে ঘর থেকে বার করে দিলে!

॥ পাঁচ ॥

সুন্দরবাবু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'জয়ন্তের যত ছেলেখেলা! চলো, আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই গে!'

মানিক সচমকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন! আগুন!'

দেখা গেল, বিধুবাবুর বৈঠকখানার জানালা-দরজা দিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া!

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আগুন! আগুন!'

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আগুন! আগুন!'

জয়ন্ত এক লাফে দরজার বাইরে এসে পড়ে বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করলে, 'আগুন! আগুন!'

পুলিশের অন্যান্য সব লোকও এক সঙ্গে চিৎকার করতে লাগল, 'আগুন! আগুন! আগুন!'

বিধুবাবু কোথা থেকে পাগলের মতো ছুটে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন ঝড়ের মতো। পরমুহূর্তেই আবার বেরিয়ে এলেন।

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, 'না, না, আগুন নয়—খালি ধোঁয়া!'

মানিক উঁকিঝুঁকি মেরে বললে, 'ঘরের ভেতরে ও দুটো কী?'

জয়ন্ত বললে, 'কিছু না, smoke rocket! আজ কালীপুজো কিনা, রকেট ছুড়তে হয়। ...ওকি বিধুবাবু, পায়ে পায়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছেন কেন? সুন্দরবাবু!'

—'হুম?'

—'ওঁকে গ্রেপ্তার করুন, পকেটে থিবোর মণি আছে!'

এইবারে বিধুবাবু দৌড় মারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন দুদিক থেকে দুজন পাহারাওয়ালা তাঁকে ধরে ফেললে। বিধুবাবু তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'আমার কাছে কিছু নেই—আমার কাছে কিছু নেই!'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তার পকেটে হস্তচালনা করে বললে, 'এটা কী বিধুবাবু?'

—'পিনকুশন!'

জয়ন্ত তখনই একখানা ছুরি বার করে কুশনের মখমল ফালা-ফালা করে ফেললে এবং তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা রক্তবর্ণের সমুজ্জ্বল রত্ন!

জয়ন্ত বললে, 'এই দেখুন সুন্দরবাবু, ব্রহ্মরাজ থিবোর পদ্মরাগ মণি!'

সুন্দরবাবু চমৎকৃত হয়ে খানিকক্ষণ সেই অপূর্ব রত্নের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত যাদুকর কে? বিধু? না তুমি?'

॥ ছয় ॥

আবার জয়ন্তের ঘর। উদর-ভক্ত সুন্দরবাবুর সামনে এক প্লেট খাবার। চা-ভক্ত মানিকের হাতে এক পেয়ালা চা। নস্য-ভক্ত জয়ন্তের হাতে নস্যের ডিবে।

জয়ন্তের উক্তি 'সুন্দরবাবু, মানিক! এ মামলায় চোর যে কে, গোড়া থেকেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। সমস্যা ছিল কেবল একটি মাত্র : চোরাই মাল কোথায় লুকনো আছে?'

সুন্দরবাবু বললেন, চোরাই মাল বিধুর বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে যায়নি। আমারও বিশ্বাস হল তাই। কিন্তু বাড়ির কোথায় আছে সেই মণি? জিনিসটার দাম যতই বেশি হোক,

আকার তো বড় নয়,—কৌশলে লুকিয়ে রাখা খুবই সহজ। সাধারণভাবে খানাতল্লাস করলে তাকে যে আবিষ্কার করা যাবে না, এটাও আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

আর একটা সন্দেহও আমি করলুম। বিধু বেশ জানত, মোহনবাবু পুলিশে খবর দেবেন আর পুলিশের সন্দেহ পড়বে তারই উপরে এবং পুলিশ তার বাড়িতে খানাতল্লাস করতে আসবে। সুতরাং কোনও গুপ্তস্থানে মণিখানাকে লুকিয়ে সে পার পাবে না, কারণ পুলিশ এসে আগেই সন্ধান করবে বাড়ির কোথায় কোথায় গুপ্তস্থান আছে। অতএব আমি আন্দাজ করলুম, বিধু যদি বুদ্ধিমান হয় তবে মণিখানাকে কৌশলে লুকিয়ে রাখবে কোনও প্রকাশ্য স্থানেই। শেষ পর্যন্ত আমার আন্দাজটা সত্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। যখন শুনলুম বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হারামণি মেলেনি, তখন আমার সন্দেহ পড়ল এই বৈঠকখানার উপরেই। কারণ, বৈঠকখানা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশ্য জায়গা।

গোড়া থেকেই আমি স্থির করেছিলুম, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে কোনও স্থানেই মণি লুকনো থাক, তার ঠিকানা আদায় করব চোরের কাছ থেকেই—অর্থাৎ রোগ ব্যক্ত হবে রোগীর নিজের মুখেই। কিন্তু কোন উপায়ে আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? ভাবতে ভাবতে ধাঁ করে মাথায় এল এই অগ্নি-পরীক্ষার কথা।

বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগলে লোকে সর্বাগ্রে সামলাতে চায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে। তখন আগুন দেখে সে আর সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে! এখানে আসবার আগে আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি দুটো smoke rocket! হাতে হাতে রকেটের মহিমা দেখলেন তো? বাড়িতে আগুন লেগেছে শুনেই বিধু প্রথম ঝোঁকের মুখে পুলিশের কথা ভুলে ছুটে এল এই মহামূল্য মণিখানি রক্ষা করতে। আমি উঁকি মেরে দেখলুম, পাগলের মতো সে বাইরের ঘরে ঢুকে আর কোনওদিকেই না তাকিয়ে 'পিনকুশন'টি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তখনই বুঝতে পারলুম, পদ্মরাগ বিরাজ করছে ওই আলপিনের গদির মধ্যেই! সুন্দরবাবু, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! এমন আশ্চর্য অগ্নি-পরীক্ষার কথা আর কখনও শুনিনি!'

—'কিন্তু আমি শুনেছি।'

—'কী রকম?'

—'প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসদেশে এক ভুবনবিখ্যাত পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিলেন, তাঁর নাম ফ্রাইন।'

—'প্রায় আড়াই হাজার বছর? বাবাঃ!'

—'সেই সময়ে একজন অমর শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম প্রাক্সি তেলেস। তিনি একদিন বললেন, 'ফ্রাইন, তোমাকে আমি আমার হাতে গড়া একটি মূর্তি উপহার দেব।' ...ফ্রাইন বললেন, 'কিন্তু আমি চাই তোমার গড়া সর্বোৎকৃষ্ট মূর্তি!...শিল্পী বললেন, 'বেশ, তাই দেব।' ...ফ্রাইন ভারি চালাক মেয়ে। শিল্পী তাঁর কোন মূর্তিটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করেন তা জানবার জন্যে তিনি আমারই মতো অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করলেন; ফ্রাইনের একজন লোক হঠাৎ

মিথ্যা খবর দিলে প্রাক্সি তেলেসের শিল্পশালায় আগুন লেগেছে। শিল্পী তখন সর্বাগ্রে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন তাঁর গড়া 'Eors'-এর মূর্তিটিকে। ফ্রাইন তখন বললেন, 'আমি চাই ওই মূর্তিটিকেই!' বুঝেছেন সুন্দরবাবু! বিংশ শতাব্দীতে আমি ব্যবহার করেছি প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার এই পুরাতন অগ্নি-পরীক্ষার পদ্ধতি! কেমন, ভুল করেছি কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভুল কী হে? তুমি বাহাদুর!'

জয়ন্তের প্রথম মামলা

॥ এক ॥

আমার বন্ধু জয়ন্ত গোয়েন্দাগিরি করে এখন যথেষ্ট যশস্বী হয়েছে। সে যে কত মামলার কিনারা করেছে তার আর সংখ্যা হয় না। কিন্তু তার প্রথম মামলার কথা আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। মামলাটি যদিও বিশেষ অসাধারণ নয়, তবু তরুণ বয়স থেকেই সে যে কী রকম আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিল, আমার এই কাহিনির ভিতরে তার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমি আর জয়ন্ত তখন 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র। সে যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে, জয়ন্ত তখনও একথা জানত না বটে, কিন্তু সেই সময় থেকেই দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিজ্ঞান, নামজাদা গোয়েন্দা ও অপরাধীদের কার্যকলাপ নিয়ে দস্তুরমত মস্তিষ্ক চালনা শুরু করে দিয়েছে। সময়ে সময়ে অতি তুচ্ছ সূত্র অবলম্বন করে সে এমন সব বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করত যে, আমরা—তার সহপাঠীরা—বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারতুম না।

একটি বৈকাল। জয়ন্ত ও আমি গোলদিঘিতে পায়চারি করছি। এমন সময়ে তপনের সঙ্গে দেখা। সেও আমাদের কলেজে 'থার্ড-ইয়ারে'র ছাত্র। বনেদি বংশের ছেলে। তার পূর্বপুরুষরা আগে বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাদের আধুনিক অবস্থা ততটা উন্নত না হলেও এখনও তারা ধনবান বলে পরিচিত হতে পারে। আজও তাদের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবে সমারোহের অভাব হয় না।

জয়ন্তকে দেখেই তপন বলে উঠল, 'আরে, আরে, তোমাকেই খুঁজছি যে। কদিন কলেজ বন্ধ, তোমার সঙ্গে দেখা হয় না।'

জয়ন্ত শুধোলে, 'আমাকে খুঁজছ কেন?'

—'একটা হেঁয়ালির অর্থ জানতে চাই।'

—'কী রকম হেঁয়ালি?'

'আমাদের বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর কিছু নয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এসব ব্যাপারে তোমার মাথা খুব খেলে কিনা তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

—'ঘটনাটা বলো।'

—'এই ভিড়ে নয়, আমার বাড়িতে চলো। মনে করো না কেবল ঘটনাটা বলবার জন্যেই তোমাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। যৎসামান্য ঘটনা, তুচ্ছ চুরি.....কোনও ছিঁচকে চোরের কীর্তি! কিন্তু তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে, তাই একসঙ্গে বসে চা-টা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করতে চাই।'

আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, 'কী হে মানিক, রাজি আছ?'

আমি বললুম, 'মন্দ কী! অন্তত খানিকটা সময় কাটানো যাবে তো।'

॥ দুই ॥

তপনদের সাজানো-গোছানো বৃহৎ বৈঠকখানা। চা এল, খাবার এল।

তপন বললে, আগে ঘটনাটা শোনো, তোমার মত বলো, তারপর অন্য গল্পসল্প।...দ্যাখো, আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় তারাশংকর চৌধুরি ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালি মানুষ। কোন খেয়ালে জানি না, তিনি গুটিকয় দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়েছিলেন। বিষ্ণু, মহাদেব, কৃষ্ণ, রাধা, কালী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী—এই সাতটি মূর্তি। ওর মধ্যে লক্ষ্মীর মূর্তিটিই সবচেয়ে বড়ো—লম্বায় এক ফুট। অন্য অন্য মূর্তির কোনওটি আট ইঞ্চি লম্বা, কোনওটি ছয় ইঞ্চি। মূর্তিগুলি বেশ ভারী। কী দিয়ে গড়া জানি না, বাবা বলতেন পিতলের মূর্তি। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় ছিল না, কারণ প্রত্যেক মূর্তির আপাদমস্তক ছিল রঙিন এনামেল দিয়ে ঢাকা। ঠাকুর ঘরের মধ্যে একটি 'গ্লাস-কেসের'র ভিতরে মূর্তিগুলি সাজানো ছিল—আমার প্রপিতামহের আমল থেকেই। আমার ঠাকুরদাদা কি বাবা, ও-মূর্তিগুলো নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাননি, আমিও মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি, কিন্তু সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাদের নিয়ে রীতিমত মাথা না ঘামিয়ে পারেনি।'

—'কে সে?'

—'কোনও অজ্ঞাত চোর।'

—'তাহলে মূর্তিগুলি চুরি গিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কবে?'

—'তিনদিন আগে।'

—'মূর্তিগুলি কি মূল্যবান?'

—'মূল্যবান হলে সেগুলিকে কাঁচের আধারে ও-ভাবে ঠাকুরঘরে ফেলে রাখা হত না।'

—'শিল্পের দিক দিয়েও তাদের কোনও মূল্য থাকতে পারে তো?'

—'মোটেই নয়, মোটেই নয়। অতি সাধারণ মূর্তি, শিল্পীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে

না। কেবল এনামেল করা মূর্তি এইটুকুই যা বিশেষত্ব। তবে সেজন্য কেউ তাদের খুব বেশি দাম দিয়ে কিনতে রাজি হবে না। কিন্তু মজার কথা কি জানো? আমার অতি খেয়ালি প্রপিতামহ তাঁর উইলেও মূর্তিগুলির উল্লেখ করতে ভোলেননি।'

—'কী রকম?'

—'উইলে তিনি বলেছেন, তাঁর কোনও বুদ্ধিমান বংশধরের জন্যে ওই মূর্তিগুলি আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি রেখে গেলেন, যে ও-গুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে। মূর্তি আর পুঁথি যেন সযত্নে রক্ষা করা হয়।'

—'বটে, বটে! এতক্ষণ পরে একটা চিত্তাকর্ষক কথা শুনলুম। সত্যনারায়ণের পুঁথি কী তপন?'

—'সেকেলে হাতে লেখা একখানা পুরাতন পুঁথি। সত্যনারায়ণের পূজার সময়ে পুঁথিখানি পাঠ করা হয়।'

—'আচ্ছা, পুঁথির কথা পরে হবে, আগে চুরির কথা বলো।'

—'পরশু দিন মামাতো বোনের বিয়ে ছিল। বাড়ির সবাইকে নিয়ে মামার বাড়িতেই রাত কাটাতে হয়েছিল। কাল সকালে ফিরে এসে দেখি, 'গ্লাস-কেসে'র ভিতর থেকে মূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়েছে।'

—'ঠাকুরঘরের দরজা কি তালাবন্ধ থাকত না?'

—'থাকত বইকি! চোর অন্য কোনও চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলেছিল।'

—'মূর্তি ছাড়া আর কিছু চুরি যায়নি?'

—'না। এও এক আশ্চর্য কথা। ঠাকুরঘরের লক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর ছিল আকবরি মোহর, কিছু কিছু রুপোর বাসন কোসন, গৃহদেবতা রঘুনাথের রুপোর সিংহাসন, সোনার ছাতা, চূড়া, পইতা আর খড়ম। চোর কিন্তু সেসব স্পর্শও করেনি। সে যেন খালি মূর্তিগুলো চুরি করবার জন্যেই এখানে এসেছিল।'

—'পুলিশে খবর দিয়েছ?'

—'এই সামান্য চুরির মামলা নিয়ে পুলিশ হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

—'কারুর উপরে তোমার সন্দেহ হয়?'

—'কাকে সন্দেহ করব? দাস, দাসী, পাচক, দারোয়ান সকলেই বাবার আমলের পরীক্ষিত লোক, এতদিন পরে তাদের কারুর ওই তুচ্ছ মূর্তিগুলোর উপরে দৃষ্টি পড়বে কেন? তারা ছাড়া বাড়িতে থাকেন শীতলবাবু। তাঁর কর্তব্য দুরকম। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ানো আর এটা-ওটা-সেটার তত্ত্বাবধান করা। তিন বছর কাজ করছেন, প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন হয়ে উঠেছেন। গরিব হলেও লেখাপড়া জানা নিরীহ সচ্চরিত্র ব্যক্তি—সকল রকম সন্দেহের অতীত।'

জয়ন্ত বললে, 'তোমাদের ওই সত্যনারায়ণের পুঁথির কথা এইবার বলো। তোমার প্রপিতামহ ওই পুঁথিখানাকেও যখন সযত্নে রক্ষা করতে বলেছেন, তখন ওর মধ্যেও নিশ্চয় কোনও বিশেষত্ব আছে।'

তপন বললে, 'বিশেষত্ব? পুঁথির ভিতরে আবার কী বিশেষত্ব থাকবে?' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ভেবে সে আবার বললে, 'না, না, একটা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই মূর্তি চুরির কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না।'

জয়ন্ত বললে, 'হয়ত কোনওই সম্পর্ক নেই। তবু বিশেষত্বের কথাটা শুনে রাখা উচিত।'

তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'পুঁথিখানা আমি এখনই নিয়ে আসছি, তুমি স্বচক্ষে দেখতে পার।'

॥ তিন ॥

তপন নিয়ে এল পুঁথিখানা।

জয়ন্ত তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, 'খুব প্রাচীন পুঁথি বটে। কিন্তু তপন, আর কোনও বিশেষত্বই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'পুঁথি যেখানে শেষ হয়েছে, বিশেষত্বটা খুঁজে পাবে সেইখানে।'

যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করে কিছুক্ষণ মৌন মুখে বসে রইল জয়ন্ত। আরও লক্ষ করলুম, তার দুই চক্ষে ফুটে উঠেছে জ্বলন্ত কৌতূহল।

পুঁথি থেকে মুখ তুলে অবশেষে সে বললে, 'এখানে ভিন্ন হাতের একটু লেখা রয়েছে।'

তপন বললে, 'হ্যাঁ, হিজিবিজি হেঁয়ালি। কোন ভাষা, কিছু বোঝবার যো নেই। কৌতূহল জাগায়, কিন্তু কৌতূহল মেটায় না। বহু চেষ্টা করে শেষটা হার মেনেছি।'

—'তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরদাদাও নিশ্চয় পুঁথির এই লেখা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ, তাঁরাও কিছুই বুঝতে পারেননি।'

—'তপন, বড়োই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তোমার প্রপিতামহ যে বুদ্ধিমান বংশধরের জন্যে এই পুঁথিখানি সযত্নে রক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, তিনি এখনও তোমাদের পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেননি।'

কিঞ্চিৎ বিরক্ত স্বরে তপন বললে, 'তোমার কথার অর্থ বুঝলুম না।'

—'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' জয়ন্ত উঠে পড়ে দেওয়ালে ঝুলানো প্রকাণ্ড একখানা দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পুঁথিখানা তুলে ধরে আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একখণ্ড কাগজের উপরে কী সব লিখে যেতে লাগল। তারপর ফিরে এসে কাগজখানা আমাদের সামনে টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে বললে, 'এইবারে পড়ে দ্যাখো।'

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে আমরা দুজনে এই কথাগুলি পাঠ করলুম

'অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না। সর্বদা দেবদেবীর মূর্তি স্মরণ করিবে। নিশ্চিত জানিও, তোমার অভাব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। চিন্তা দূর করিবে। লক্ষ্মীছাড়া হইলে জীবনে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষ কাজে লাগে না। জগদীশ্বর কত রূপে দ্রষ্টব্য।'

তপন চমৎকৃত কণ্ঠে বললে, 'ওই হেঁয়ালির ভিতরে এই সব কথা ছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু যা তুমি হেঁয়ালি বলে ভ্রম করছ, তা হচ্ছে আমাদের সরল মাতৃভাষাই। কেবল উলটোভাবে সাজানো।'

—'উলটোভাবে সাজানো মানে?'

—'এ হচ্ছে একরকম সাদাসিধে গুপ্তলিপি। ইংরিজিতে একে বলে "Looking Glass cipher" (বা দর্পণ-গুপ্তলিপি)। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইতালিয় চিন্তাশীল চিত্রশিল্পী 'লিওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি' এই উপায়ে গুপ্তলিপি রচনা করে গিয়েছেন। আয়নার সামনে ধরলেই এরকম গুপ্তলিপি খুব সহজেই পাঠ করা যায়।'

তপন বললে, 'এত সহজে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করে তুমি যথেষ্ট বাহাদুরির পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু এটা আমাদের কোনও কাজে লাগবে? এ তো কতকগুলি মামুলি উপদেশ মাত্র! সকলেই যা জানে, তার জন্যে আবার গুপ্তলিপির কী প্রয়োজন?'

—'ঠিক বলেছ তপন! এরকম মামুলি উপদেশের জন্যে গুপ্তলিপির প্রয়োজন হয় না। তার উপরে উপদেশগুলো কেমন যেন খাপছাড়া! আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? তোমার প্রপিতামহ এই গুপ্তলিপি রচনার সময়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন! যেমন বেনারসের একরকম কৌটোর ভিতরেও আবার কৌটো থাকে, তেমনি এই গুপ্তলিপির প্রথম রহস্যের ভিতরেও অন্য কোনও রহস্য আছে। তোমরা এখন দয়া করে বাইরে যাও, আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও, একবার চেষ্টা করে দেখি, গুপ্তলিপির আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারি কিনা!'

॥ চার ॥

বৈঠকখানার পাশেই ছিল তপনদের লাইব্রেরি। তপন আমাকে সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

সাধারণত বাঙালিদের বাড়িতে এত বড়ো লাইব্রেরি চোখে পড়ে না। মস্ত ঘরের চারিদিকের দেওয়ালের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি। ভিতরকার বইগুলোর নাম পড়তে পড়তে কেটে গেল খানিকক্ষণ।

ফিরে বললুম, 'তপন, এখানে যতগুলো বই-এর নাম পড়লুম, সবই দেখছি পুরনো যুগের।'

—'তা তো হবেই। এ ঘরের চারভাগের তিনভাগ কেতাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন আমার প্রপিতামহ। বই কেনা আর বই পড়াও ছিল তাঁর আর এক অদ্ভুত খেয়াল।'

—'বই কেনা আর বই পড়াকে তুমি অদ্ভুত খেয়াল বলে মনে করো! জানো, আমরা পশুত্বের ধাপ থেকে মনুষ্যত্বের ধাপে উঠতে পেরেছি কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা?'

—'জানি। তবু যে কোনও বিষয়েই বাড়াবাড়িটাকে আমি 'ফ্যাড' বলেই মনে করি।'

—'না। যা আমাদের মনকে উন্নত করে, প্রশস্ত করে, তার বাড়াবাড়িও নিন্দনীয় নয়। দেখছি তোমার প্রপিতামহ একজন অত্যন্ত সুধী ব্যক্তি ছিলেন।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিলে—'তপন! মানিক! শিগগির এ ঘরে এসো।'

আবার বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলুম, জয়ন্ত একখণ্ড কাগজের দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে বসে আছে।

তপন শুধোলে, ব্যাপার কী ভায়া? গুপ্তলিপির ভিতর থেকে আর কোনও নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছ নাকি?'

—'পেরেছি। তোমাদের বাড়ির যত অনর্থের মূলেই আছে এই অর্থ!'

—'অর্থটা শুনি!'

—'এখন নয়। অর্থটা ইঙ্গিতময়, শুনলেও ভালো করে বুঝতে পারবে না। অর্থটা প্রকাশ করবার আগে আমি একটা কথা জানতে চাই।'

—'কী কথা?'

—'সত্যনারায়ণের পুঁথির এই বিশেষত্ব নিয়ে তুমি আর কারুর সঙ্গে আলোচনা করেছ?'

—'আগে আগে করতুম বৈকি! কিন্তু কেউই ওই হেঁয়ালি বুঝতে পারেনি। শেষটা হতাশ হয়ে হাল ছেড়েদি। কেবল গতমাসে শীতলবাবুর কৌতূহল দেখে পুঁথিখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলুম বটে!'

—'তারপর?'

—'শীতলবাবু পরদিন পুঁথিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তিনিও কিছুই বুঝতে পারেননি।'

—'শীতলবাবুকে একবার এখানে ডাকবে?'

—'তিনি বৈকালেই দেশের জন্যে বাজার-হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না।'

—'দেশের জন্যে বাজার-হাট?'

—'হ্যাঁ। তাঁর কোনও আত্মীয়ের বিয়ে, তাই এক হপ্তার ছুটি নিয়ে কাল তিনি দেশে যাচ্ছেন।'

—'কাল কখন?'

—'খুব ভোরের গাড়িতে। সূর্যোদয়ের আগেই তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

—'শীতলবাবু কি তোমাদের বাড়ির দোতলায় থাকেন?'

—'না বাড়ির একতলায়, খিড়কির বাগানের সামনেই।'

—জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'তপন, আজ রাত্রে তোমার বাড়িতে আমাদের জন্য একটুখানি জায়গা হবে?'

তপন বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'তার মানে?'

—'আমি আর মানিক আজ তোমাদের বাড়িতে রাত্রিবাস করতে চাই।'

—'যদিও তোমার এই প্রস্তাবের কারণ বুঝতে পারছি না, তবু সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। কেবল রাত্রিবাস কেন, ডানহাতের ব্যাপারটাও আমার এখানে সেরে নিও।'

—'আপত্তি নেই। আর এক কথা। আমি আবার দক্ষিণ খোলা না হলে ঘুমতে পারি না।'

—'নির্ভয় হও। আমার বাড়ির দক্ষিণদিকে আছে বাগান আর পুকুর—এখানা সেকেলে বাড়ি কিনা! আমার শয়ন গৃহও সেইদিকে। তোমরাও আমার সঙ্গে ঘরেই শয়ন করবে।'

॥ পাঁচ ॥

তপন যে গুরুতর আহার্যের ব্যবস্থা করেছিল, একটিমাত্র ডানহাতের সাহায্যে কোনও মানুষই তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, খানিক পাতে ফেলে আমরা উঠে পড়তে বাধ্য হলুম—তপনের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

বাগানের দিকে দোতলার বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করলুম তিনজনে। জ্যোৎস্নামাখা রাত, বাগানের তাল নারিকেল পাতায় পাতায় আলোর ফুলঝুরি, সরোবরের নৃত্যশীল জলে চন্দ্রকরের চকমকি। মৃদু পত্রমর্মর, বাতাসের ঠান্ডা দীর্ঘশ্বাস, ঝিল্লিদের ঘুমপাড়ানে ঝঙ্কার।

খানিকক্ষণ চলল গল্প। তারপরেই ঘুমে চোখ ভরে এল। জয়ন্তও ঘন ঘন হাই তুলতে শুরু করেছে দেখে তপন বললে, 'চলো, এইবার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।'

শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ ভাবলুম, জয়ন্ত গুপ্তলিপির এমন কী গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেছে, যে জন্য আজ এখানে তার রাত কাটাবার দরকার হল? জিজ্ঞাসা করলেও এখন সে জবাব দেবে না জানি, তাই তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি। সময়ে সময়ে নিরতিশয় রহস্যময় হয়ে ওঠে জয়ন্ত। ....এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম নিজের অজ্ঞাতসারে।

আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙে—কে আমাকে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি, জয়ন্ত!

তারপর সে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল তপনকেও।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল রাত দুটো।

তপন সবিস্ময়ে বললে, 'এত রাতে একী ব্যাপার জয়ন্ত?'

—'কোনও কথা নয়! একেবারে একতলায় নেমে চলো। সিধে শীতলবাবুর ঘরে।'

—'সেকী, কেন?'

—'কথা নয়, কথা নয়! যা বলি শোনো!'

ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়লুম। সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামলুম। খানিক এগিয়ে একা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তপন বললে, 'এই শীতলবাবুর ঘর।'

দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আলোর রেখা।

জয়ন্ত বললে, 'তপন, শীতলবাবুকে ডাকো।'

তপন ডাকলে, 'শীতলবাবু, শীতলবাবু!' ঘরের আলো গেল নিভে। কোনও সাড়া নেই।

তপন আবার ডাকলে, 'শীতলবাবু! ঘরের আলো নেভালেন কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন?'

এবার ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমি তপন। দরজা খুলুন।'

দরজা খুলে একটি লোক বাইরে এসে বললে, 'এত রাতে ব্যাপার কী? কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি?'

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হাতের 'টর্চ' জ্বেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে 'সুইচ' টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

শীতলবাবুও ঘরে ঢুকে ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'কে আপনি? আমার ঘরে আপনার কী দরকার?'

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হাতের 'টর্চ' জ্বেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে...

তপন বললে, 'চুপ করুন শীতলবাবু! উনি আমার বন্ধু!'

শীতলবাবু বললে, 'কিন্তু আপনার বন্ধু এত রাত্রে আমার ঘরে ঢুকে কী করতে চান?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি দেখতে চাই একটা ভিজে পোঁটলা আপনি ঘরের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'পোঁটলা? কীসের পোঁটলা?'

কিন্তু জয়ন্ত আর তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের মনেই বললে, 'হুঁ। এই তো ঘরের মেঝেয় রয়েছে জলের দাগ! এই তো একটা জলে ভেজা জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! হ্যাঁ, টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একেবারে চৌকির তলায়—' বলতে বলতে সে মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে প্রবেশ করল চৌকির তলদেশে এবং সেইভাবেই আবার যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন দেখা গেল, সে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটা চটের থলি!

তারপর সে থলির ভিতর হাত চালিয়ে একে একে বার করলে রাধা, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কালী, মহাদেব ও সরস্বতী—এই সাতটি দেব-দেবীর এনামেল করা মূর্তি।

তপন নির্বাক, বিষম বিস্ময়ে। শীতলবাবুও নির্বাক, দারুণ আতঙ্কে।

হঠাৎ বিষ্ণু মূর্তিটি তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, 'আরে একী! বিষ্ণুঠাকুরের ডান পায়ের উপর থেকে খানিকটা এনামেলের আবরণ তুলে ফেললে কে? বুঝেছি, এ হচ্ছে সুচতুর শীতলবাবুর কাজ! উনি সন্দেহ করেছিলেন এনামেলের পাতলা আবরণ কেবল বোকাদের চোখ ঠকাবার জন্যে, কিন্তু ওর তলায় আছে কোনও মহার্ঘ ধাতু! তপন, দেখতে পাচ্ছ কি, বিষ্ণু মূর্তিটির পা কী গিয়ে গড়া?'

তপন হতভম্বের মতো বললে, 'কী?'

—'সোনা। খালি পা কেন, সমস্ত মূর্তিটাই নিশ্চয় সোনা দিয়ে গড়া!'

—'বল কী জয়ন্ত!'

—'হ্যাঁ! কেবল বিষ্ণু মূর্তি নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্তিই নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি। আন্দাজ মনে হচ্ছে—এ মূর্তিগুলির মোট ওজন এক মণের কম নয়।'

আমি তো স্তম্ভিত!

জয়ন্ত লক্ষ্মীদেবীর সবচেয়ে বড়ো মূর্তিটি তুলে নিয়ে বললে, 'তপন, এইবারে আমি তোমাকে অধিকতর অভিভূত করতে চাই। দেখছি লক্ষ্মীদেবীর দেহের তুলনায় ঝাঁপিটি অতিরিক্ত বড়ো। ঝাঁপির ভিতরটা ফাঁপা। কিন্তু ঝাঁপির ঢাকনিটা ভেঙে খুলে ফেললে কে? নিশ্চয়ই শীতলবাবুর কীর্তি! শীতলবাবু ঝাঁপির ভিতরে কী ছিল?'

শীতলবাবু শুষ্কস্বরে বললে, 'আমি জানি না।'

—'আহা, জানেন বৈকি! ঝাঁপির ভিতরে যা ছিল এখনই আমাকে ফিরিয়ে দিন।'

—'ঝাঁপির ভিতর কিছুই ছিল না।'

—'এখনও মিথ্যা কথা? তপন তাহলে আর দয়া নয়, তুমি এখনই থানায় ফোন করে দাও, পুলিশ এসে শেষ ব্যবস্থা করুক।'

পুলিশের নামেই শীতলবাবু ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'আমাকে ধরিয়ে দেবেন না, আমাকে ধরিয়ে দেবেন না!'

—'তাহলে ঝাঁপির ভিতরে কী ছিল দিন।'

শীতলবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে জামার পকেটের ভিতর থেকে একটি ছোটো কাগজের মোড়ক বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত আগে মোড়কটা খুলে তার ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। তারপর বললে, 'তপন, শীতলবাবুর মস্তিষ্ক যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী, সেটা তিনি প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু অপরাধী হিসাবে তিনি একেবারে শিশুর মতো কচি আর কাঁচা।'

তিনি যদি এত তাড়াতাড়ি বামাল নিয়ে এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা না করতেন, তাহলে আমরা কিছুতেই ওঁর নাগাল পেতুম না। যাক ও কথা, এটা হচ্ছে শীতলবাবুর প্রথম অপরাধ। আর উনি এই অপরাধটা করেছেন বলেই তুমি হলে সব দিক দিয়েই আশাতীতরূপে লাভবান। কারণ উনি অপরাধটা না করলে তুমিও আমাকে ডাকতে না, আর তাহলে তোমাদের এই দেবদেবীর মূর্তিগুলোও এনামেলের চাদরে গা ঢাকা দিয়ে ওই কাচের আধারেরই শোভাবর্ধন করতেন, এ জীবনেও তুমি তাঁদের আসল চেহারা দেখতে পেতে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি ওঁকে ক্ষমা করবে, না পুলিশের হাতে সমর্পণ করবে?'

তপন বললে, 'আমি ওঁকে ক্ষমাও করব না, পুলিশেও দেব না। শীতলবাবু বিশ্বাসহন্তা। উনি যেন এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যান।'

শীতলবাবুর অধিকাংশ মোটঘাট বাঁধাই ছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করে বাকি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'জয়ন্ত, ওই মোড়কটার ভিতরে কী আছে?'

জয়ন্ত হাসিমুখে মোড়কটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে, 'সাত রাজার ধন এক মানিক!'

প্রকাণ্ড এক হীরক খণ্ড! অতবড় হিরা আমি কখনো চক্ষেও দেখিনি!

তপনের বোধহয় মাথা ঘুরে গেল। সে একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করে ধপাস করে চৌকির উপর বসে পড়ল।

॥ ছয় ॥

জয়ন্ত বললে, 'আমি কেন শীতলবাবুর উপরে সন্দেহ করেছিলুম, এখন সেই কথাই শোনো।'

'এনামেল করা মূর্তিগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান, আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি যে অতিশয় দরকারি, এতদিন কেন যে তোমাদের এমন সন্দেহ হয়নি, সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। গুপ্তলিপির রহস্য তোমরা জানতে না বটে, কিন্তু এটা তো সকলেই জানতে যে, তোমার প্রপিতামহ উইলে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন, যে ওই মূর্তিগুলির আর পুঁথির সদ্ব্যবহার করতে পারবে, সে তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে, হয়তো অভাবে পড়নি বলেই তোমরা ও-কথাগুলির উপরে বিশেষ ঝোঁক দাওনি। হয়তো অভাবে পড়লেই তোমাদেরও মাথা খুলে যেত।'

'আমি গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করবার আগেই ওই কথাগুলি শুনেই নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলুম দেব-দেবীর মূর্তিগুলি মহামূল্যবান। অবশ্য গুপ্তলিপি পড়বার পর ও-সম্বন্ধে আমার আর কোনও সন্দেহই থাকেনি।'

'বাড়ির লোকই যে চুরি করেছে এটা বুঝতেও আমার বিলম্ব হয়নি। ঠাকুরঘরের তালার জন্য নতুন একটা চাবি গড়বার সুযোগ হয় বাড়ির লোকেরই। বাইরের চোর মূর্তিরহস্য জানত না, অতএব কেবল মূর্তিগুলো চুরি করেই সরে পড়ত না। ঘটনার দিন রাত্রে বাড়িতে ছিল দাস-দাসী, পাচক আর দারোয়ানরা। নিশ্চয়ই তাদেরও কেউ চুরি করেনি, কারণ তাহলে সে ঠাকুরঘরের সোনা রুপোর জিনিসগুলোও ফেলে যেত না। বাড়ির ভিতরে তাদের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে কেবল শীতলবাবু। আমার যুক্তি বললে, সেইই চোর।'

'কিন্তু কেন সে বেছে বেছে কেবল মূর্তিগুলোই চুরি করলে? আমার মতো সেও কি ভিতরের রহস্য আবিষ্কার করবার কোনও সুযোগ পেয়েছিল? তপনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, পেয়েছিল। মাসখানেক আগে সে হস্তগত করেছিল পুঁথিখানা। খুব সম্ভব আমার মতো তাড়াতাড়ি সে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। সেই চেষ্টাতেই তার কিছুদিন কেটে যায়। তারপর নতুন চাবি গড়িয়ে চুরি করে সে প্রথম সুযোগেই।'

'কিন্তু চোরাই মাল সে রাখলে কোথায়? অতরাত্রে মূর্তিগুলো নিয়ে নিশ্চয় সে বাড়ির বাইরে যেতে সাহস করেনি, কেউ না কেউ তাকে বেরুতে দেখতে পারে। আর বাইরেই বা সে যাবে কোথায়, তার বাসা যখন এই বাড়িতেই? কিন্তু চোরাই মাল সে নিজের ঘরে রাখতেও ভরসা করবে না। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে তার ঘর খানাতল্লাস করতে পারে। অতএব চোরাই মাল সে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে, যা তার ঘরের বাইরে কিন্তু বাড়ির বাইরে নয়। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায়? তার ঘরের পাশেই আছে বাগান আর পুকুর। বাগানের মাটি খুঁড়ে বা পুকুরের জলে ডুবিয়ে মূর্তিগুলো লুকিয়ে রাখা যেতে পারে।'

'শীতলবাবু বুদ্ধিমান, কিন্তু কাঁচা অপরাধী। ধরা পড়বার ভয়ে দুদিন যেতে না যেতেই স্থির করলে, কোনও ওজরে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পথ দেখতে পেলুম। সে দেশে যাবে কাল সকালে। আর যাবার সময়ে বহুমূল্য মূর্তিগুলো নিশ্চয়ই এখানে ফেলে রেখে যাবে না, আজ রাত্রে সেগুলোকে গুপ্তস্তান থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। সুতরাং আজ এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে আমি তপনের কাছ থেকে চাইলুম একখানা দক্ষিণ খোলা, ঘর, কারণ এ বাড়ির দক্ষিণে যে বাগান আছে, সেটা আমার অজানা ছিল না।'

'আমি ঘুমোবার ভান করে তোমাদের সঙ্গেই শুয়েছিলুম। তারপর তোমাদের নাসাগর্জন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যা দেখবার আশা করেছিলুম, রাত পৌনে দুটোর সময়ে দেখতে পেলুম ঠিক সেই দৃশ্যই। সন্তর্পণে বাগানে এসে দাঁড়াল শীতলবাবু। তারপরে পুকুর পাড়ে গেল। জলের ভিতর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুললে পৌঁটলার মতো কী একটা জিনিস। তারপরের কথা বলবার দরকার নেই।'

॥ সাত ॥

আমি বললুম, 'কিন্তু এখনও আমরা আসল কথা শুনতে পেলুম না।'

জয়ন্ত বললে, 'কী কথা শুনতে চাও?'

—'গুপ্তলিপির ভিতর থেকে তুমি দ্বিতীয় কি অর্থ আবিষ্কার করেছ?'

—'কেবল আমি নই, শীতলবাবুও আবিষ্কার করেছে।'

—'অর্থটা কী?'

জয়ন্ত আমাদের সামনে একখণ্ড কাগজ খুলে ধরলে—তার উপরে লেখা ছিল গুপ্তলিপির সেই উপদেশগুলি 'অভাবে স্বভাব নষ্ট করবে না প্রভৃতি।'

তারপর সে বললে, 'তপনের প্রপিতামহ সাবধানতার উপরে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। যদি কেউ Looking glass cipher—এর গুপ্তকথা ধরতেও পারে, তাহলেও সে আসল গূঢ় অর্থ বুঝতে পারবে না, কথাগুলোকে উপদেশ বলেই গ্রহণ করবে। কিন্তু ভালো করে এই উপদেশের শব্দগুলোকে লক্ষ কর। মোট লাইন আছে ছয়টি। এখন প্রত্যেক লাইন থেকে যদি কোনও প্রথম আর শেষ শব্দ নিয়ে পরে পরে সাজিয়ে যাও, তাহলে পাওয়া যাবে এই কথাগুলি : 'অভাবে দেব-দেবীর মূর্তি তোমার অভাব দূর করিবে। লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।' দেখছ, এখানেও সাবধানতা! স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, কেবল ইঙ্গিত। 'কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে ওই ইঙ্গিতই যথেষ্ট।'

আমি বললুম, 'তাহলে উপন্যাসের মর‍্যালটা দাঁড়াল কী?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'মনীষা থাকলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অসৎ পথে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠকতে হয়, যেমন শীতলবাবু।'

—'আর মনীষা না থাকলে?'

—'সৎপথে নির্বোধকেও লাভবান করে। যেমন তপন।'

তপন সহাস্য বদনে বললে, 'যতই আজ বাক্যবাগুরা বিস্তার কর, কিছুই আমি গ্রাহ্য করব না। আমার সোনার দেব-দেবীদের শত শত প্রণাম করে এখনই দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকে তুলে রাখব।'